নব্যভারত

ত্রয়স্ত্রিংশ খণ্ড—১৩২২।

ভক্তি-স্বপ্ন।

বড় সাধ করিয়া ঘর সাজাইয়াছিলাম,—[illegible] সাজসজ্জা, কত আসবাব, কত সুখ-স্বপ্ন, [illegible] বাসনা-কামনা পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল। [illegible] অরুণালোকে জাগিয়া দেখিলাম, [illegible] —পাখী গাহিতেছে, ঝরণা ঝরিতেছে, মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে, সাগর নাচিতেছে,—সুষুপ্তির পর নব-জাগরণ আসিয়াছে,—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা প্রকৃতি হাস্যময়ী। এহেন সময়ে কেহ কি ভাবিতে পারে যে, আবার আকাশে ঘনমেঘ উঠিবে, আবার বিজলী খেলিবে, আবার কাল-রাত্রি আসিবে? কত সুমধুর মিলন, কত আস্ফালন, কত [illegible], কত আহ্বান, কত কোলাকুলি, কত নব জাগরণ। এহেন সুখ-চিত্রে মজিয়া কেহ কি ভাবিতে পারে যে, নির্ব্বাণ আসিতেছে,—শ্মশানের কালভেরী বাজিতেছে, বিচ্ছেদের মহা-অগ্নি জ্বলিতেছে? [illegible] কিন্তু এ জগতে ঘটি-[illegible] উঠিল, কত সূর্য্য ডুবিল, [illegible] কত মহাজন ডুবিলেন, [illegible] রহিল কেবল স্মৃতি। স্মৃতির [illegible] যেন জগত রহিয়াছে। [illegible] সম্মোহন, না ইতিহাস? ইতিহাস না অটুট চিহ্ন না [illegible] তাহারই [illegible],

প্রকৃতির ললাটে যে অজ্ঞেয় রেখা, ঐ রেখাঙ্কিত কাহিনী জীবকে উদ্বোধিত করে, নিয়মিত করে, ভাল মন্দ বিচারে সক্ষম করে, প্রেয়ের দ্বন্দ্ব প্রতিনিবৃত্তিতে মানব-প্রাণে শ্রেয়কে জাগাইয়া রাখে। মরণ-নদীর তীরে ঘর বাঁধিয়া, অস্থৈর্য্যের ভ্রুকুটীতে মানব নিয়ত চিন্তান্বিত,—কি করি, কোথায় যাই, কিসে শান্তি পাই, এই চিন্তায় মানব প্রতিনিয়ত ব্যতিব্যস্ত; কিন্তু শ্রেয় বুদ্ধি মানবকে এই অস্থৈর্য্যের ভিতরে এক অচ্যুত ধ্রুবত্বে অটল করিতেছে,—সকলে সকল অবস্থাকে জয় করিয়া শেষে এক মহাবাণী-নিবদ্ধ বিধানে আত্মসমর্পণ করিতেছে। যে বিধানে যখন মানুষ মজে, এই সংসার-কুজ্ঝটিকায় ম্রিয়মাণ হইয়াও সে তখন আশায় এক নবজাগরণের স্বপ্নে মাতিয়া উঠে। মানুষ নানা পতন এবং মরণের পথ দিয়া যেন তখন অমরত্বে উন্নীত হয়।

প্রকৃতি, মহামায়ার মহালীলা-ক্ষেত্র। চক্ষু মেলিয়া যে প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত মহামায়াকে দেখিতে না পায়, চক্ষু বুঝিয়া ঈশ্বর-ধ্যান-ধারণা তাহার পক্ষে মিথ্যার ভেল্কী। তিনি সর্ব্ব ঘটে প্রকট, সর্ব্ব অবস্থায় প্রস্ফুট।

[illegible]

ভৈরব গর্জ্জন, পাখীর কলকণ্ঠে তাঁহারই সুস্বর, সতীর সতীত্বে তাঁহারই মাধুর্য্য, শিশুর নয়নে তাঁহারই পবিত্রতা-জ্যোতি,—অনন্ত প্রকৃতিতে অনন্তের প্রদীপ্তি, অনন্তরূপিণী মা অনন্ত-প্রকৃতিতে প্রকাশিত। যাহা দেখি, তাহাতেই তিনি, যাহা শুনি, তাহাতেই তিনি,—তিনিময় এই জগৎ, তিনিময় ব্রহ্মাণ্ড, তিনিময় দ্যুলোক, ভূলোক। মানব যখন বিশ্বাস-অঞ্জন নয়নে লেপন করিয়া দাঁড়ায়, এই ধরা তখন মাধুর্য্যে পূর্ণ,—সে আর কিছু দেখিতে পায় না, কেবল একেরই প্রকট লীলা দেখিতে পায়। দেখিয়া দেখিয়া আত্মহারা হয়, দেখিয়া দেখিয়া গভীরে আত্মসমর্পণ করে, তখন পুলকে তাহার চিত্ত বিভোর—তখন মরণ-সুষুপ্তি চলিয়া গিয়াছে, রিপু ও ইন্দ্রিয় তখন নির্ব্বাণ হইয়াছে, তখন তন্ময়ত্বে মানুষ পৌঁছিয়া ভক্তি-নারদের সুধা-বিনিন্দিত বীণার তন্ত্রীতে স্বর মিলাইয়া শুধু কৈবল্যের জয় ঘোষণা করিতে থাকে। নিরাশা বা অন্ধকার, অহঙ্কার বা আত্মাভিমান সব তখন তিরোহিত;—একের মহা জ্যোতিতে মানুষ তখন জ্যোতিস্নান,—তখন চতুর্দ্দিকে শুধু "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কৈবল্যের নিত্যানন্দময় পরামুক্তিতে তখন সে নিমজ্জিত।

তাঁহাকে সর্ব্বঘটে যিনি দেখেন, তিনি আর ভেদাভেদ গণিতে পারেন না, বিষ্ঠা-[illegible] তাঁহার [illegible]ান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে তাঁহার অ[illegible] [illegible] ভক্তি-নদীর শান্তিঘাটে অ[illegible] সদা স্নাত। তাঁহার ললাটে, ব[illegible], লোচনে নাসিকায় [illegible] ব্রতপরায়ণতা[illegible] জ্যোতি খেলিতেছে। তিনি আত্মজয়ী, তিনি সংসারজয়ী, [illegible] মরণজয়ী। তিনি সদা-স[illegible] [illegible] জীবন, এ প্রাণ, এ দেহ, [illegible] সকলই ত তাঁহার, তাঁহার জিনিষ তাঁহাকে দিতেই তিনি উল্লসিত। তিনি ভাবেন, এ জীবন-ফুল ফুটিয়াছে শুধু তাঁহার চরণে অঞ্জলি দিবার জন্য, তাই তিনি জীবন-ফুল তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিয়া কৃতার্থ হন। চলিতে, ফিরিতে, যাইতে শুধু তাঁহাকে দেখেন। তাঁহার জীবনের কাজ শুধু

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।"

তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। ঋষিরা চিরদিন বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রিয়কার্য্য অর্থাৎ জগতের সেবা। জগতের সেবা করিতে করিতে যখন কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হয়, ভক্ত তখন জীবন্মুক্তি লাভ করেন এবং সর্ব্বদা ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার গুণ-কীর্ত্তনে দেহপাত করেন।

জীবন্মুক্তি-সাধনা জীবের চরম লক্ষ্য। মানব জন্মিয়া খাইতে ও শুইতে শিখে, তৎপর বসিতে, তৎপর হাঁটিতে, তৎপরে কথা বলিতে, তৎপর ক্রমে ক্রমে কত কি শিখে। তৎপর কৈশোর, তৎপর যৌবন, তৎপর প্রৌঢ়, তৎপর বার্দ্ধক্য এবং তৎপর অন্তিমে পরিসমাপ্তি। এই জীব-লীলায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম-সাধনই জীবের লক্ষ্য। যিনি যে অবস্থাতেই থাকুন, দেহধারী জীবমাত্রকেই কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হইবে। ক্ষুৎপিপাসা ও রিপুর অধীন করিয়া, এই ভবের বাজারে মহাচক্রী প্রতিনিয়ত কর্ম্মযোগের মহা-[illegible] জীবকে ঘুরাইতেছেন। ইচ্ছা করিলেও [illegible] নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন [illegible] কর্ম্ম-সাধনার এক পক্ষে প্রেম-সাধনা, [illegible] জ্ঞান-সাধনা। এই সংসার-[illegible] বা[illegible] [illegible]জনের পরিচর্য্যায় প্রেমের [illegible] এই বিশ্বনাট্য[illegible] চক্ষু কর্ণের অনুভ[illegible] [illegible] উঠে, "[illegible]

কই,—জন্মাবধি নিরবধি জানি না শ্রীরাধা বই", অথবা "ক" লিখিতে "কৃষ্ণ"—অথবা কালরূপ দেখিলে কৃষ্ণ-প্রেম-স্ফুরণ। এই অহেতুকী প্রেম-সাধনের মহামন্ত্র সাধন করিতে করিতে জীব শিব-ধামে উপনীত হয়। আগে পরিচয়, তৎপর সম্ভোগ, তৎপর আত্মস্থ, তৎপর নিমজ্জন। জ্ঞানে পরিচয়, প্রেমে সম্ভোগ, সম্ভোগে কর্ম্ম, তৎপর নিমজ্জনে ভক্তি। জানিতে জানিতে, সম্ভোগ করিতে করিতে, সেবা করিতে করিতে যখন বিশ্বরূপে উপনীত হওয়া যায়, তখন আপনার জ্ঞান প্রেম সব উড়িয়া গিয়াছে, তখন খ্রীষ্ট বলিতেছেন "I and my father are one." ভক্তি-শাস্ত্রে সাত্ত্বিকতার অষ্টবিধ গুণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, বৈস্বর্য্য, বেপথু বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় (মূর্চ্ছা)।

"স্বেদঃ স্তম্ভোঽথরোমাঞ্চ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয়।

ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া নিষ্কাম ভাবে যাঁহারা সাধনার পথে কর্ম্মযোগকে অবলম্বন করেন, কর্ম্মযোগ তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে সাত্ত্বিকতায় উপনীত করে। আমি কেন আছি, তাহা জানিনা; কোথায় চলিয়াছি, তাহাও জানি না; জানি শুধু এই—কাহার প্রেরণায় কে জানে, আমি না খাটিয়া থাকিতে পারি না। পিতা মাতাকে তিনিই কাছে আনিলেন, ভ্রাতা ভগ্নীকে তিনিই চিনাইলেন, স্ত্রীপুত্রের সহিত যোগ তিনিই সংস্থাপন করিলেন। আবাল্য শুধু খাটিতেছি, কিন্তু তবুও খাটুনির নিবৃত্তি নাই। নিত্যই নব-প্রেরণা আসিতেছে, নিত্যই নবভাবে আদিষ্ট হইতেছি,—খাটো খাটো খাটো। অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগের কত নিগূঢ় তত্ত্বই প্রকাশ করিলেন। খাটিতে জন্ম, খাটিতে স্থিতি, খাটুনির পরিসমাপ্তিতে কৈবল্য প্রাপ্তি বা বিশ্বরূপে নিমজ্জন। এই খাটুনিকে অনুশীলনই বল, যোগাভ্যাসই বল, বা মায়াই বল, বা যাহাই বল, এই খাটুনির হাতে কাহারও নিস্তার নাই। খাটিতে হইবেই, ইহাই যদি বিধান হয়, তবে আর ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কি করিব? কত খাটুনি ব্যর্থ হইতেছে, কিন্তু তবুও নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না? তবে আর ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কি করিব? তাঁহার বিধানই যদি হইল খাটুনি, তবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাতে ফল অর্পণ করিয়া খাটিয়া যাই না কেন? তাঁহাকে ফল অর্পণ করিয়া যাঁহারা নিষ্কাম ভাবে খাটিতে পারেন, তাঁহারা ধন্য, তাঁহারা কৃষ্ণার্পণের মাধুর্য্য বুঝিয়াছেন। আর যাঁহারা ফল না পাইয়াও খাটিয়া খাটিয়া ক্লান্ত এবং শ্রান্ত হইতেছেন—কখনও আশায়, কখনও বা নিরাশায় মজিতেছেন, তাঁহাদের মায়ার ঘোর ছলনা আজও কাটে নাই, সংসার-পাকে শুধু তাঁহারা ঘুরিতেছেন। ভক্ত-রামপ্রসাদ বলেন—"মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোক ঢাকা বলদের মত।" যাঁহারা সার অসার বুঝিয়াছেন,—তাঁহারা "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিয়া কর্ম্ম-সাধনায় আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়া মায়াতীত কৈবল্যে উপনীত হইতেছেন।

বাস্তবিক, কর্ম্মবন্ধনেও মানুষের [illegible] নাই, কর্ম্মচ্যুতিতেও মানুষের কর্তৃত্ব [illegible]। জীবন ভরিয়া, জীবন ব্যাপিয়া কেবল এ[illegible] ইচ্ছার কাজ চলিতেছে। "সকলই ক[illegible] পার ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। সকলই [illegible] তুমি, লোকে বলে করি আমি।" অ[illegible] অস্তিত্ব বা জীবের স্বাধীনত্ব কেবল নয়নের [illegible] মাত্র,—জগৎ ব্যাপিয়া প্রতিনিয়ত কেবল [illegible] মহাইচ্ছা-শক্তির কার্য্য চলিতেছে। স[illegible]

শাস্ত্র, সকল দর্শন, সকল সাধক ভক্ত,—ঈশা মুসা, নানক কবীর, চৈতন্য নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য শঙ্কর, ইমারসন কারলাইল, ম্যাটসিনি টলষ্টয় এই এক শক্তির জয় ঘোষণা করিয়াই জীবনকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। নামান্তরে কিছু আসিয়া যায় না, সেই মহা-ইচ্ছা-শক্তিকে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। একে স্থিতি, একে গতি, একেই মুক্তি। মধ্যে যত চিন্তা, সব চিন্তাই অসার—দ্বৈত জ্ঞানের কোন দার্শনিক ভিত্তি নাই,—কেবল কৈবল্য জ্ঞানই সার জ্ঞান, একের ধ্যানই সার চিন্তা। তাঁহাকে প্রকটই দেখ, বা অপ্রকটই ভাব,—"এই""এই"ই বল, বা "নেতি" "নেতিই" বল, তিনি একই, তিনি নিত্য-নিরঞ্জন, তিনি ভূমা মহান, অপার অগম্য; আবার সময়ান্তরে তিনি জনক জননী, ভাই বন্ধু, আত্মীয় পরিজন। তিনি জলে স্থলে, আকাশে অন্তরীক্ষে;—আবার তিনিই আমার প্রাণে, হৃদয়ে, দেহে, সর্ব্বাঙ্গে। তিনি অচ্যুত, অব্যয়, শাশ্বত, তিনিই আবার সান্ত, সাকার, ক্রিয়াশীল। অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত রূপ তাঁহারই রূপ, অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত গুণ তাঁহারই গুণ,—অনন্ত সৃষ্টির অনন্তত্বে তাঁহারই ব্যাপ্তি। নি, তিনি, তিনি—শুধু তিনি জলে স্থলে, ; চৈতন্যে প্রকাশবান। দেখ এবং মজ, এবং দেখ। দেখিয়া মজিয়া আত্মসমর্পণ ; দ্বৈত-ভাব, দ্বৈত-চিন্তাকে কখনও হৃদয়ে দিও না। ভক্তির-অঞ্জন চক্ষে লেপন —জগন্ময়, ভুবনময়, দেহময়, চিন্তাময় ব্রহ্মকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

সাধকেরা বলেন, ভক্তিতেই মুক্তি। র উদয় হইলে জীবের দেহ-বন্ধন ছিন্ন মায়ার জাল কাটিয়া যায়—ভেদাভেদ-জ্ঞান হয়—এক জ্ঞান এবং এক ধ্যানে [illegible] জ্জন হয়। মানুষ তখন আর দ্বি-চিন্তা, দ্বি-জ্ঞান, দ্বি-উপাসনায় মজে না, তখন প্রাণ মন সব ইন্দ্রিয়াতীত দেবত্বে সমর্পিত, তখন জীব শিবময় কৈবল্যে উপনীত। শুধু কথার কথায় নয়, ভাষার গাথায় নয়, গল্প কাব্যের বাণীতে নয়, সর্ব্বঘটে তাঁহাকে দেখিয়া মানুষ তখন তন্ময় হইয়া যায়। ইন্দ্রিয় এবং রিপু ইত্যাদি তখন নির্ব্বাণ। সেই নির্ব্বাণ-ভস্মস্তূপের দ্বারা তপস্যা এবং সাধনার সোপান রচিত হইয়াছে,—সেই সোপান ধরিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত, নিরালম্ব, নিঃসঙ্গ এবং নির্ব্বিকার যোগে পৌঁছিয়াছে। গৈরিক নামাবলী, জপ-তপ প্রভৃতি বহিরঙ্গ সাধনায় সে নিত্যানন্দ ধামে উপনীত হওয়া যায় না। সরল আন্তর-স্বভাব-সাধন ভিন্ন সে চিন্ময় বস্তু চিরদুর্লভ, সরল-স্বভাব-সাধন কণ্ঠবন্ধন-ছিন্নদের বাজারে পাওয়া যায়, গুরুগিরির দুর্গম শৈলশেখরে তাহা মিলে না। সেখানেও দলাদলির ইন্ধন, সেখানেও ব্যক্তিত্বের ঘোষণা, সেখানে নির্ব্বাণের রাজত্ব নয়। অন্যের কথায় সন্দেশের মিষ্টত্বের ধারণা হয় না; অন্যের কথায় নিজের নিজত্ব ফুটিয়া উঠে না—নিজ-বিশেষত্বে নিজ-সাধনা বলে ফুটিয়া উঠিতে হইবে। আত্ম-নিবৃত্তিই চরম সাধন। নির্ব্বাণের পথই সহজ পথ—স্বভাবের অনুসরণই কৃতিত্বের নিয়ামক। অধিক আর ব্যাখ্যা করিতে পারিলাম না, ভাষায় কুলাইল না—তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাতে মজিতে হইলে আত্মার মূলে, স্বভাবের অন্তরালে নিয়ত অনুসন্ধান করার প্রয়োজন। সহজ সহজ, সরল সরল, অতি সরলতাই এই পথের নিয়ামক। সম্ভোগ কর, নিজে ডোব—নান্য পন্থা বিদ্যতেঅয়নায়। হৃদয়-গ্রন্থি, আত্মার-গ্রন্থি ছিন্ন হইলে ভূমা মহেশ্বর প্রকট মূর্ত্তিতে [illegible] হইবে। সরল-[illegible] মান

সহায়। নিজের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। আর কিছুই নয়, কিছুই নয়।

ভক্তির সাধন ভক্তিই। আত্মজ্ঞান এবং অহংজ্ঞান ভক্তির অন্তরায়। আত্মত্ব মূলক অহঙ্কারের বিনাশ হইলেই অহেতুকী ভক্তিতে উপনীত হওয়া যায়। প্রকৃতি-সাধনই ভক্তির অনুকূল অবস্থা। কর্ম্মজীবন ছিন্ন হইলেই জগন্ময়ে আত্ম বিসর্জ্জন সম্ভব। অন্য উপায় নাই, অন্য পথ নাই।* সংযম এ পথের সহায়—সংযম ভিন্ন ভক্তি-পথ অতি দুর্গম।†

তা যেন হইল, কেহ কেহ বলেন, ভক্তি যে একটা শক্তি, তাহার প্রমাণ কি? শাস্ত্রকারেরা বলেন, ভক্তাধীন ভগবান। যথা "যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম, (গীতা ৪-১১) মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে। (গীতা ১৪, ২৫) "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম। অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগং শান্তিরপৈশুনম। দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম। তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা। ভবন্তি সম্পদং দৈবী মভিজাতস্য ভারত। (১৬শ-১-২-৩) "ঈশ্বর সর্ব্বভূতানং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া। (১৮-৬১) সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহংত্বা সর্ব্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। (১৮-৬৬) সমস্ত গীতা এই এক কথাই ঘোষণা করিতেছে, ভগবানে প্রীতি হইলে সকল সংশয় ছিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হইলে ভক্তির উদয় হয়, এবং ভক্তির উদয় হইলে পরামুক্তি লাভ হয়। সে অবস্থায় জীবের দুর্জ্জয় বল লাভ হয়। সে বলে রিপু, ইন্দ্রিয় ও সংসার জয় ত সোজা কথা—এ জগতের সকলকে পরাস্ত করা যায়। কোরাণ বাইবেল, ভাগবত উপনিষদ, চরিতামৃত ভক্তমাল, পুরাণ তন্ত্র এই কথাই বারম্বার বলিয়াছেন। আসুর শক্তি নাশের একমাত্র বল কেবল নিরালম্ব ভক্তিতেই পাওয়া যায়। এই রূপে পাওয়া যায়,—মানুষ যখন অনন্যগতি হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, এবং কাতর ভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তখন ভগবান সেই প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। অনন্যগতি হইয়া প্রার্থনা করিলে ধ্রুব প্রহ্লাদের প্রার্থনা যে পূর্ণ হয়, সেবিষয়ে এক বিন্দুও সংশয় নাই। অনন্যগতি হওয়া, সংশয়ের অধীন মানবের পক্ষে বড় কঠিন, এই জন্যই সব প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। অনন্যগতি হও, তোমার সকল প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ইহা অভ্রান্ত কথা। পৃথিবীর অসংখ্য ভক্তের জীবনে এই কথাই প্রকট হইয়াছে।

গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, সে সময় হইতেও ভারতের মহাসঙ্কটের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে ভক্তির পথ অনুসরণ করা সকলেরই একমাত্র কর্ত্তব্য। যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে ভারতের শাস্ত্র আবার ভারত-উদ্ধারের কারণ হইবে। জগতের ইতিহাস এই কথাই অটুট ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, সকল ভক্ত-জীবন এই কথারই সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে অধিক কথা না বলাই ভাল—তাই আমরা নিবৃত্ত হইলাম। নিরালম্ব ভক্তি-বল সাধনার জন্য সকলকে নব বর্ষে কাতর ভাবে আহ্বান করিতেছি। সকলে ভক্ত হউন, ভক্তাধীন ভগবান সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

---

* গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৮ হইতে ৭২। † গীঃ ১৬-২০।

মহাবীর-পূজা।

পৃথিবীর ইতিহাস আবহমান কাল পর্য্যন্ত বীরত্বের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। বীরত্বের বিজয় দুন্দুভি বাদিত না হইলে যেন ইতিহাসের ইতিহাসত্ব রক্ষা পায় না। আপাততঃ এই বীরত্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, প্রথমটীকে শারীরিক ও দ্বিতীয়টীকে আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে। জিগীষা প্রথমটীর মূল ভিত্তি, দ্বিতীয়টী ধর্ম্মের উপর সুনিহিত। প্রথমের পরিণাম যুদ্ধ প্রভৃতি, দ্বিতীয়ের পরিণাম জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ ও ভগবানে ভক্তি। প্রকৃত মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি দ্বিতীয়ের উপর নির্ভর করে। যে মহাপুরুষগণে দ্বিতীয় বীরত্বের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাঁহাদের পদরজঃস্পর্শে পৃথিবী পূত হইয়াছে। তাঁহারা মৃত হইলেও জগতের নরনারীগণের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন, তাই তাঁহারা মৃত হইলেও অমর এবং মানুষ হইলেও দেবতা। তাঁহারা কালের দুর্ভেদ্য আবরণ হইতে চিরমুক্ত বলিলেও দোষাবহ হয় না। তাদৃশ বীরগণের পদ-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই মানব এই দুঃখবহুল সংসারে থাকিয়াও অপার্থিব সুখের মধুরিমা আস্বাদন করিতে পারে।

যে বীরত্বের অন্তস্তলে নরশোণিতের পূতিগন্ধ সর্ব্বদা বিস্তৃত এবং যাহা স্বজন-বিয়োগ-বিধুর নরনারীগণের উষ্ণ অশ্রুধারায় কলুষিত, এবং যাহার প্রভাবে আনন্দের কোলাহল নিদারুণ করুণ বিলাপে পরিণত হয়, এবং সংসারে মহামারীর আবির্ভাব হয়, এবং যাহার বিষময় ফল জগতে প্রভূত অকল্যাণের অবতারণা করে, তাদৃশ [illegible] অন্তরালে পশুভাব যে কিয়ৎ পরিমাণেও লুক্কায়িত নাই, তাহা কে বলিতে পারে? পশুগণ নৈসর্গিক ক্ষুধার অসহ্য তাড়নে উৎপীড়িত হইয়াই হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহারা দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী, কিম্বা যশোলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া শোণিতপাতে প্রবৃত্ত হয় না।

যে বীরত্বের মধ্যে প্রেমময় ভগবানের ছায়া প্রতিফলিত না হয়, এবং স্বর্গীয় সুবিমল জ্যোতিতে যাহা সমুদ্ভাসিত হয় না, তাহা চিরকালই জগতে মহাভীতির সঞ্চার করিবে। যে বীরত্বে দেবত্বের অভিব্যক্তি, তাহাতে সৈন্যের কোলাহল নাই, সঙ্গিনের গগনভেদী শব্দ নাই, এবং অস্ত্রের ঝনঝনি নাই, মাতঙ্গের বৃংহিতে এবং তুরঙ্গের হ্রেষারবেও তাহার স্থান মুখরিত হয় না তাদৃশ বীরগণের লক্ষ্য মানুষ বা অন্য কোন জন্তু নহে, যাহা অমৃত ও পরম সত্য, তাহাই তাঁহাদের শরব্য বা লক্ষ্য,—

"তদেৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি"

(মুণ্ডকোপনিষদ)

মুণ্ডক শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, "হে সোম্য! উপনিষদ শাস্ত্র-জ্ঞানরূপ ধনুক গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপাসনারূপ নিশিত শর সন্ধান করিবে। ইন্দ্রিয়গণকে বিনিবর্ত্তন রূপ আকর্ষণ করতঃ তদ্গত চিত্তে সেই ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবে।

"ধনু গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসা
নিশিতং সন্ধীয়ত,
আয়াম্য তদ্ভাগবতেন চেতসা লক্ষ্যং
তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥"

(মুণ্ডকোপনিষদ্)

অনন্ত অমৃত সাগরে রাজ্য বিস্তার করিতে

সরস্বতী বা ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, এই ত্রিবেণীর পথে অস্খলিত পদে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত বীরত্ব লাভের উপায় পূর্ব্বকথিত ত্রিবেণী, প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহ-শক্তি নহে। মহাবীরগণের সমর-সচিব বিবেক, যম, নিয়ম প্রভৃতি অশ্বারোহী সৈন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অস্তেয়, শৌচ, সন্তোষ, দয়া, দান, ক্ষমা ও সত্য প্রভৃতি পদাতিকগণে তাঁহাদের হৃদয়-দুর্গ সর্ব্বদা সুরক্ষিত, এবং দম্ভ, অহঙ্কার, কাম ও ক্রোধ প্রভৃতি প্রবল শত্রুগণ, তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। ইঁহাদের বীরত্ব প্রকাশ ত্যাগে, ভোগে নহে। মহাবীরগণের শারীরিক শক্তি অপেক্ষা মানসিক শক্তিই পূজার্হ ও জগতের চির আদর্শ। পিতৃ সত্য পালনের জন্য রাজ্যত্যাগেই রামচন্দ্রের দেবত্ব বিকাশ। তাই তাঁহার পূত চরিত্র ভারতের চির অনুকরণযোগ্য। তাঁহার বীরত্ব ত্যাগে, রাক্ষস-বধে নহে। ভক্তিবীর বালক ধ্রুবের ত্যাগ স্বীকারের কথা ভাবিতে বসিলে, কাহার হৃদয় বিস্ময়-রসে আপ্লুত না হয়, ? কাহার বাগ্মিতা ক্ষণকালের জন্য নীরবতায় বিলীন না হইয়া যায় এবং কাহার কপোলযুগল আনন্দাশ্রুপাতে অভিষিক্ত না হয়? বালকের ভক্তি-মিশ্রিত ত্যাগে, কালিন্দীতটস্থিত মধুবন, সুরকুল-নিষেবিত নন্দনকানন অপেক্ষাও পবিত্র ও গৌরবান্বিত। ভক্তিমদিরোন্মত্ত বালক যখন আপন ভাবে বিভোর হইয়া অশ্রুস্খলিত-কণ্ঠে তাহার বাঞ্ছিত ধন পদ্মপলাশলোচনকে বর-রূপে উপস্থিত দেখিয়া বলিল :—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্র গুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নাপ দিব্য রত্নং।
স্বামিন্! কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে॥

হইয়া, দেবতা ও মুনীন্দ্রগণের পরম গুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম, হে নাথ! আমি কাচের অন্বেষণ করিতে গিয়া রত্ন লাভ করিলাম, আমি আজ কৃতার্থ হইয়াছি, বর-প্রার্থনা করি না। ভক্তিবীর বালকের মুখ হইতে, এই বিস্ময়কর বাক্য বহির্গত হইতে না হইতে, মধুবন কুলায়-স্থিত বিহঙ্গগণের মধুর কাকলী যেন কণ্ঠে রুদ্ধ হইল। কুলুকুলুনাদিনী কালিন্দীর সুনীল তরঙ্গমালা স্থগিত রহিল। প্রফুল্ল কুসুম বিহারী অলিকুলের উন্মাদ গুঞ্জন ক্ষণকালের জন্য মৌনে মিশিয়া গেল, এবং মধুবন-কুঞ্জচারী, কুসুম পরিমল-বাহী মৃদুমন্দ সমীরণ স্তম্ভিত হইল। যমুনার জলে ও মধুবনে যেন মূর্ত্তিমতী নীরবতা ক্ষণিক রাজ্য বিস্তার করিল। কুসুমে অলি, যমুনায় তরঙ্গ, এবং কুলায়ে বিহঙ্গ, সকলই যেন বিস্ময়মুগ্ধ ও ভাবে বিভোর হইয়া রহিল। চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া প্রতিধ্বনিও বলিয়া উঠিল "স্বামিন্! কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে"। ধ্রুবের মহাবীরত্ব তদবধি ভারতে মহাগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইল।

পৃথিবীর বহুসংখ্যক লোক, যাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ভক্তিভরে পূজা করে, হিন্দুগণও যাহাকে ভগবানের দশাবতারের অষ্টম বলিয়া ভক্তি করিয়া থাকে, সেই মহাবীর শাক্যসিংহ ও ঈশ্বরের পুত্র মহর্ষি ঈশায় যেরূপ বীরত্বের অভিব্যক্তি হইয়াছিল, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান্ বা সিজারে তাহার শতাংশের এক অংশও প্রকাশিত হইয়াছে কি? ইঁহাদের বীরত্ব কালের অদম্য স্রোতে ভাসিয়া গিয়া নিবিড় অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার চিহ্নও

খানিকার আবরণ হইতে চিরবিমুক্ত, উহা নিত্য নূতনের ন্যায় চিরদিন নরনারী-হৃদয়ে তরুণ তপনের বিমল আলোক-মালা বিকীর্ণ করিয়া থাকে।

যাহার বীরত্ব প্রভাবে, স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-বন্ধন ও পতিপ্রাণা প্রেয়সী ভার্য্যার প্রেমনিগড় মৃণাল-তন্তুর ন্যায় ছিন্ন হইয়া গেল, পাষাণে পদ্ম বিকসিত হইল, সাহারার মরুস্থানে শান্তিময়ী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইল, এবং বর্ষার দুর্দ্দিনে বাসন্তী সুষমা ফুটিয়া উঠিল, এমন কি, পূতিগন্ধপূর্ণ বন্ধকারাগারেও সুশীতল সুগন্ধ মলয়-মারুত বহিতে লাগিল, সেই মহাবীর বিশ্বম্ভর বা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া যে ভক্তিরসামৃত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দেবাসুর নির্ব্বিশেষে সকলেই তাহার পরম মধুরিমার আস্বাদনে পরম কৃতার্থ হয় নাই কি?

মহাবীরগণ প্রেমের অমোঘ অস্ত্রদ্বারা নরনারী-হৃদয় যেরূপ অনায়াসে জয় করিয়া থাকেন, এবং তাহারা যেরূপ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ও প্রেমচন্দনে চিরদিন পূজিত হইয়া থাকেন, অন্য কোন বীর তাদৃশ পূজা লাভে সমর্থ হন কি? প্রেম, ভক্তি ও ত্যাগে যাহাদের তেজস্বিতার অভিব্যক্তি, তাহারাই প্রকৃত পূজার্হ মহাবীর। মহাবীরগণের বীরত্বে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা, আশার আহ্বান, যশোলিপ্সার নিদারুণ উত্তেজনা, এবং স্বার্থপরতার উদ্বোধন নাই। তাঁহাদের কার্য্যে কামনার গন্ধ, কলঙ্কের কালিমা বা দোষের সম্পর্ক নাই। তাঁহারা ভগবানের রাজ্যে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনার্থই কর্ম্মযোগের যোগী হইয়া থাকেন, পাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারেন না। গীতায় উক্ত হইয়াছে:—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা॥

অহঙ্কার কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়, অহঙ্কারের ঊর্দ্ধে কর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই। মহাবীরগণ কর্ম্মফল ভোক্তা অহঙ্কারের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত সুতরাং তাহাদের বুদ্ধিও নির্লিপ্ত—

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥
(গী ১৮ অ, ১৭)

কাঠিক শ্রুতি বলিয়াছেন যে, বিষয়প্রবণ ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা বহির্ম্মুখীন, সুতরাং উহারা অন্তরাত্মার দর্শন করিতে পারে না। অল্পসংখ্যক বীরই অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছায় বহির্ম্মুখীন ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্ম্মুখীন করিয়া অন্তরাত্মার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান মৈক্ষ—
দাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্ব মিচ্ছন্॥
(কঠ উ, ২য়)

জগৎ যে দিন ঈদৃশ মহাবীরগণের পূজা বিস্মৃত হইবে, সংসার সেদিন, পশুবাসযোগ্য ভীষণ অরণ্য বা পিশাচকুল-নিষেবিত মহাশ্মশানে পরিণত হইবে, এবং নির্ম্মল পূত-সলিলা ভাগীরথী ও দুর্গন্ধ শোণিত-সলিলা বৈতরণীর কোনও প্রভেদ থাকিবে না। সংসারের নরনারীগণ ভক্তির কুসুমাঞ্জলি ও প্রেমচন্দন দ্বারা তাদৃশ মহাবীরগণের পূজা করে বলিয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, নতুবা মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব একত্রে মিশিয়া যাইত।

শ্রীঅনঙ্গমোহন চৌধুরী।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা।

আর্য্যাবর্ত্তে প্রচার।

ব্লাভাস্কির বোম্বাই নগরস্থ বাটীতে অবিরাম জনস্রোত চলিত। স্থানীয় ও দূরদেশাগত সর্ব্বজাতীয় দর্শক ও অনুসন্ধিৎসুর জন্য তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। সিনেট সাহেব লিখিয়াছেন :—

"বোম্বাইয়ের বাটীতে তাঁহার সাক্ষাৎলাভার্থ অবিশ্রান্ত লোক-সমাগম হইত। তিনি প্রত্যুষে উঠিয়া রুসীয় সংবাদ পত্র এবং থিওসফিষ্ট পত্রের জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতেন, এবং সমিতির কার্য্যার্থ নানা স্থানে চিঠিপত্র লিখিতেন। দিবাভাগের অধিকাংশ সময়, যে সকল স্থানীয় ব্যক্তি তাঁহার দর্শনার্থ আসিতেন, তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপে কাটাইতেন। যে যাহা প্রশ্ন করিত, তিনি তাহার উত্তর প্রদান করিতেন। কখনও কখনও উপস্থিত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যহীন বৃথা বাক্যব্যয় তাঁহার য়ুরোপীয় সঙ্গীদের ভাল লাগিত না। কিন্তু তিনি উঁহাদের মতামত গ্রাহ্য না করিয়া সকলের কথাই শুনিতেন। কখনও কোন পণ্ডিতের সহিত হিন্দুধর্ম্মের একটা [illegible] লইয়া তুমুল তর্ক হইতেছে, ব্লাভাস্কি পণ্ডিতের উক্তির সহিত বেদের প্রকৃত অর্থের অসঙ্গতি দেখাইয়া দিতেছেন। আবার এই গোলমালের মধ্যে হয়ত তিনি সুদূরস্থ গুরুদেবের আহ্বানধ্বনি শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তর্ক ছাড়িয়া কোন নির্জ্জন গৃহে গিয়া অবহিতচিত্তে গুরুর আদেশ শ্রবণ করিতেন। বোম্বাই-প্রবাসী য়ুরোপীয়গণের সহিত তাঁহার বড় তিনি সাহেবদের সঙ্গলাভের জন্য একটুও লালায়িত ছিলেন না। তাহারা কেহ দেখা করিতে আসিত না বলিয়া কিছুমাত্র দুঃখিতও ছিলেন না। পাশ্চাত্য সমাজের নিয়মানুসারে নবাগত ব্যক্তিকেই প্রথমতঃ স্থানীয় লোকদিগের বাটীতে গিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, তৎপর তাহারা ঐ ব্যক্তির বাটীতে আসিয়া ভদ্রতার প্রতিদান করিয়া যায়। ব্লাভাস্কি এই সকল সামাজিক নিয়মের মোটেই বশীভূত ছিলেন না। কি বাল্যে, কি পরবর্ত্তী জীবনে, তিনি সামাজিকতার নিগড় হইতে চিরমুক্ত ছিলেন। এই জন্য সাহেবরা তাঁহার বাটীতে আসিত না। তজ্জন্য তিনি দুঃখিত না হইয়া বরং সুখী ছিলেন। একে ত তিনি আধুনিক সভ্যতা ও তথা-কথিত সভ্য জাতিদিগের প্রতি বড় অনুরক্ত ছিলেন না; তার পর মেশামেশি হইলেই তাহাদের সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাঁহাকে যোগদান করিতে হইত। কিন্তু ঐ সকল অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে যারপর নাই অপ্রীতিকর হইত। ইহার প্রথম কারণ, তাহার পরিচ্ছদাদির কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। অনেক সময়েই স্বচ্ছন্দে এক খানা র‍্যাপার গায়ে দিয়া কাটাইতেন। আবার সর্ব্বদাই সিগারেটের ধূমপান করিতেন। সুতরাং সামাজিক অনুষ্ঠানস্থলে তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্যের ও স্বাধীনতার অনেক ব্যাঘাৎ উপস্থিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, সুরাপান ও শুকর মাংসাহারের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। কিন্তু এই

সঙ্গী। ইহাতেও তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাৎ হইত। সুতরাং য়ুরোপীয় সমাজ যে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিত, তজ্জন্য তিনি দুঃখিত ছিলেন না। কিন্তু এরূপ একজন তীক্ষ্ণ মনিষাসম্পন্ন বিখ্যাত মহিলা তাঁহাদের এত নিকটে থাকিতেও তাঁহারা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিতেন না,—তাঁহার বিস্তৃত জ্ঞানভাণ্ডারের পরিচয় লইতে অগ্রসর হইতেন না,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। বোধ হয়, ইহার মূল কারণ দাম্ভিকতা ও সামাজিক বন্ধন।”

ব্লাভাস্কি পরে সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী বাটীতে উঠিয়া যান। এই বাটী জনতা-পূর্ণ পল্লী হইতে দূরে থাকায় এখানে লোকের গতায়াত একটু কম ছিল, এবং তজ্জন্য ইঁহারা সময় পাইতেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মিঃ সিনেট ব্লাভাস্কিকে তাঁহার সিমলার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তদনুসারে তিনি ২১শে আগষ্ট সিমলা যাত্রা করিলেন। পথে মিরাটে অবতরণ করিয়া স্বামী দয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর সহিত অলকটের এক সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। অলকটের প্রশ্ন এবং স্বামীজীর উত্তরের বিস্তৃত বিবরণ সেই সময়কার ‘থিয়সফিষ্ট’ পত্রে দ্রষ্টব্য। আমরা অলকটের ‘ডায়রি’ গ্রন্থ হইতে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

প্রশ্ন। কোন ক্রিয়া যোগশক্তি সম্ভূত কিনা, জানিবার উপায় কি ?

উঃ। তিন প্রকারের আশ্চর্য্যজনক ক্রিয়া হইতে পারে। যাহা হস্ত-কৌশলে সম্পন্ন হয়, তাহা অধম। যাহা রসায়ন সংযোগ বা যন্ত্র সাহায্যে সম্পন্ন হয়, তাহা মধ্যম। উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহা যোগশক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রথম দুইটী ব্যবহার-বিদ্যার অন্তর্গত। যাহা মানবের ইচ্ছা শক্তি-সম্ভূত, তাহাই যোগক্রিয়া।

প্রশ্ন। আত্মার ধর্ম্ম কি ?

উঃ। আত্মার ইচ্ছা-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি প্রভৃতি চব্বিশটী শক্তি আছে। এইগুলি বাহ্যবস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হইলে যে ফল হয়, তাহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত, ব্যবহারিক বিদ্যা। আর ঐ গুলি আন্তর জগতের উপর প্রযুক্ত হইলে যে ক্রিয়া হয়, তাহা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানান্তর্গত যোগবিদ্যা। যথা, বৈদ্যুতিক তারবার্ত্তা ব্যবহারিক বিদ্যার অধীন। তারের বা অন্য কোন যান্ত্রিক সাহায্য বিনা দূরস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কথোপকথন যোগ বিদ্যার অন্তর্গত। এই বিদ্যা বলে কোন প্রকার বাহ্যিক বস্তুর সাহায্য না লইয়া দূরের বস্তুকে নিকটে আনা যায়,—ইহাকে আকর্ষণ বলে। ইহা অস্বাভাবিক নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মাধীন। প্রাচীনেরা প্রকৃতির এই সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ অবগত ছিলেন।

প্রঃ। এই যোগ-শক্তি লাভ করিতে হইলে কি কি আবশ্যক ?

উঃ। শিখিবার ইচ্ছা, কামনা জয় ও জিতেন্দ্রিয়তা, সাধুতা, সৎসংসর্গ, পবিত্র আহার, পবিত্র স্থানে বাস, তত্ত্ববোধশক্তি, নির্জ্জনতা। পাচটী বস্তু পরিত্যজ্য, যথা, অজ্ঞানতা, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়বশতা, স্বার্থপরতা, এবং মৃত্যু-ভয়।

প্রঃ। যোগ-ক্রিয়া তবে প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ নহে ?

উঃ। কখনই নহে। হটযোগ দ্বারা পরচিত্ত-জ্ঞানাদি ফল লাভ হয়। রাজযোগ দ্বারা মানব সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রাজযোগী

এমন কি, যে ভাষা সে কখনও শিক্ষা করে নাই, তাহাও অনায়াসে জানিতে পারে।

প্রঃ। জড় বস্তুর (যথা, পত্র, মুদ্রা, পেন্সিল, চিত্র ইত্যাদি) দ্বিত্ব-সম্পাদন (Duplication) ক্রিয়া অনেক দেখা গিয়াছে। ইহার অর্থ কি?

উঃ। আকাশে সর্ব্ববস্তুর পরমাণু সূক্ষ্ম ভাবে বিদ্যমান। যোগী উহা আহরণ পূর্ব্বক ইচ্ছামত আকারে আকারিত করিতে পারে।

প্রঃ। ব্লাভাস্কি বহু দর্শকের সম্মুখে পুষ্প বর্ষণ প্রভৃতি (ব্লাভাস্কির ঈদৃশ কয়েকটী ক্রিয়া স্বামী দয়ানন্দ স্বয়ং গতবর্ষে কাশীধামে অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত দর্শন করিয়াছিলেন) যে সকল ক্রিয়া দেখাইয়াছিলেন, সেগুলি আপনি কি মনে করেন?

উঃ। ঐ গুলি শুদ্ধ যোগ-শক্তি-সঞ্জাত। উহা তামাসা নহে। উহাতে প্রতারণার লেশ মাত্র নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার কিছুকাল পরেই যখন সমিতির প্রতি স্বামীজীর বিরূপ ভাব প্রকট-মূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন তিনি এই উক্তির বিপরীত কথা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

পরন্তু পরাবিদ্যা-সমিতির প্রতি স্বামীজীর মনোভাব যে অনুকূল নহে, তাহা বুঝা গেল। সেই জন্য এইখানেই তাঁহার সম্মতিক্রমে সমিতিকে আর্য্য-সমাজ হইতে পৃথক করা হইল। তবে বিচ্ছিন্ন হইলেও উভয় সমিতি যাহাতে পরস্পর নির্ব্বিরোধে আপন আপন কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তাহার অন্যথাচরণ করা হইবে না, ইহাও স্থিরীকৃত হইল।

সিমলায় ব্লাভাস্কির অলৌকিক ক্রিয়া-উপস্থিত হইল। সেখানে তাঁহার চা-পান-ঘটিত, ব্রচ্‌ (Brooch) ঘটিত এবং অন্যান্য ক্রিয়া সিনেট-কৃত 'রহস্য জগৎ' (Occult world) নামক গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের পাঠক অবশ্যই জানেন, একদা কোন শৈলশৃঙ্গে চা-পান-সমিতির এক 'সেট' পান পাত্রের অভাব হইলে কি প্রকারে ব্লাভাস্কি নির্দ্দিষ্ট লতাগুল্মজড়িত পর্ব্বত-গাত্র খুঁড়িতে খুঁড়িতে আবশ্যকীয় পাত্র পাওয়া গিয়াছিল; কি প্রকারে ব্লাভাস্কির নির্দ্দেশ মত মিঃ হিউমের বাগানে তাঁহার পত্নীর বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট একটী মূল্যবান ব্রচ্‌ পাওয়া গেল। ব্লাভাস্কির অধ্যাত্ম শক্তির পরিচয় পাইয়া অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ সমিতির সভ্য হইলেন। তখন লর্ড রিপন (Lord Ripon) ভারতের বড় লাট ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সচিবগণের সহায়তায় ব্লাভাস্কি ও অলকট গুপ্ত পুলিশের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। ব্লাভাস্কিকে রুসিয়ার গুপ্তচর বলিয়া যে অযথা সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল।

সিমলা হইতে ইঁহারা পঞ্জাব অমৃতসহরে আগমন করিলেন। স্থানীয় আর্য্য-সমাজ ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু এক দিন ইঁহাদের মুখে সর্ব্ব ধর্ম্মই সত্যমূলক, এই বাণী শ্রবণ করিয়া উক্ত সমাজের সভ্যগণ একেবারে অদৃশ্য হইলেন, এমন কি, ইঁহাদের যে আতিথ্য সৎকার করিতেছিলেন, তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন। ব্লাভাস্কি ও অলকট এই ব্যাপারের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সভ্যদিগকে খুঁজিতে বাহির হইলেন, এবং সহরের এক স্থানে জনৈক সভ্যকে পাইয়া উঁহাদের মনোগত ভাব অবগত হইলেন।

পরে যে কয় দিন ইঁহারা

অমৃতসহরে ছিলেন, আর্য্য-সমাজই ইহাঁদের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

অমৃতসহরে অবস্থানকালীন রতনচাঁদ ও শ্রীশচন্দ্র বসু নামক লাহোর-আর্য্য-সমাজের দুই জন সভ্য ব্লাভাস্কির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। রতনচাঁদের সহিত বাক্যালাপে তাঁহার দর্শন শাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তি আছে দেখিয়া ব্লাভাস্কি প্রীত হইলেন, এবং তাঁহাকে একটী কার্য্যভার দিতে ইচ্ছা করিলেন। সিনেট সাহেব তত্ত্ব-সন্ধিৎসু ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের মর্ম্ম বোধ করাইবার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে প্রস্তুত, এরূপ কোন উপযুক্ত লোক মিলে নাই। ব্লাভাস্কি রতনচাঁদকে এই কার্য্যের ভার দিবার প্রস্তাব করিলেন। সোজাসুজি ভাবে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলে কোন সংশয়ের অবসর থাকিত না। কিন্তু তিনি ইহা মহাত্মাদের আদিষ্ট কার্য্য বলিয়া উহার উপর একটা অসাধারণ গুরুত্ব স্থাপন করিলেন। এমন কি, তিনি বলিলেন, মহাত্মারা শীঘ্রই রতনচাঁদকে পত্র দ্বারা আদেশ জ্ঞাপন করিবেন। তিনি আরও বলিলেন যে, কার্য্যকালে তিনি চিন্তা প্রেরণ দ্বারা রতনচাঁদকে শক্তির উন্মেষ করিয়া দিবেন। রতনচাঁদ ব্লাভাস্কিকে শ্রদ্ধা করিলেও তখনও এতদূর অগ্রসর হন নাই। তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল। প্রথমতঃ বোধ হয় তিনি ব্লাভাস্কি-পূজিত মহাত্মাদের অস্তিত্বেই সন্দিহান। তারপর মহাত্মারা পত্রলেখালেখি করেন, এরূপ কথা সম্ভবতঃ তাঁহার নিকট নিতান্তই অমূলক বলিয়া বোধ হইয়া থাকিবে। অধিকন্তু যোগবলে শক্তি-সঞ্চার-ক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতায়ও বোধ হয় তিনি আস্থাবান ছিলেন না। অতএব তিনি আপনাকে মহাত্মা কর্ত্তৃক ভারপ্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বা সিনেটের নিকট পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন। তবে তিনি ব্লাভাস্কির নিকট প্রকাশ্যে সম্মতি জানাইয়া কেন বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক, পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি অবিলম্বেই পত্র দ্বারা ব্লাভাস্কিকে জানাইলেন যে, উক্ত কার্য্য গ্রহণে তিনি অক্ষম। রতনচাঁদ যাহা বিশ্বাস করেন না, বা যাহার প্রমাণ পান নাই, তাহা তিনি স্বীয় বিবেকবুদ্ধি অনুসারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইবেন, ইহা কিছুই অস্বাভাবিক নহে, এবং এই ঘটনার এই স্থানেই শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু নিন্দাপরায়ণগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তাহারা ইহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়া ব্লাভাস্কি ও তাঁহার মহাত্মাবর্গকে অতল তলে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অকপটচিত্তা ব্লাভাস্কি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, অবিশ্বাস রতনচাঁদকে এক শুভ সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিল।

অমৃতসহর হইতে ইঁহারা লাহোরে আগমন করিলেন। লাহোরে পরাবিদ্যা-সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং উক্ত রতনচাঁদ ও শ্রীশচন্দ্র বসু স্বেচ্ছায় সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। এতদ্দ্বারা ব্লাভাস্কি বা সমিতির প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার যে বিন্দুমাত্র হানি হয় নাই, ইহাই প্রমাণিত হয়। লাহোরে ব্লাভাস্কিকে রাখিয়া অলকট কার্য্যোপলক্ষে মূলতান গমন করেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ব্লাভাস্কি ভয়ানক পঞ্জাবী জ্বরে (Punjab fever) আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। অথচ ডাক্তার আনিবার প্রস্তাবে তিনি আপত্তি করিলেন। কিন্তু রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া অলকট ডাক্তার আনি-

লেন। ডাক্তার বলিলেন, রোগ সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ব্লাভাস্কি সুস্থ হইলেন। লাহোরে এই সময়ে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে এক দিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজি ভাষার উপর অসাধারণ অধিকার ও বাগ্মিতায় ইঁহারা চমৎকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তত্ত্বাংশে উক্ত বক্তৃতার সারবত্তা সম্বন্ধে ইঁহাদের মত উচ্চ-প্রশংসাসূচক নহে।

লাহোর হইতে কানপুর হইয়া এলাহাবাদে আগমন করিলেন। এলাহাবাদে কয়েক দিন থাকিয়া ব্লাভাস্কি কাশী গমন করিলেন। অলকট পূর্ব্বেই এখানে আসিয়াছিলেন। কাশীর মহারাজ যথোচিত শ্রদ্ধা সহকারে ব্লাভাস্কির অভ্যর্থনা ও সংকার করেন। তিনি অনেক সময়ে পণ্ডিতগণ সমভিব্যাহারে ব্লাভাস্কিকে দর্শন করিতে আসিয়া তৎসহ শাস্ত্রতত্ত্ব লইয়া বিচার আলোচনা করিতেন। এক দিন মহারাজ বহু-সহস্র অর্থ সহ নিজের কোষাধ্যক্ষকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া ব্লাভাস্কিকে সেই অর্থোপহার প্রদান পূর্ব্বক কয়েকটী অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন। ব্লাভাস্কি সেই অর্থোপহার অগ্রাহ্য করিয়া অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনে স্পষ্টতঃ অস্বীকৃত হইলেন। কাশী-নরেশ দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলে, ব্লাভাস্কি উপস্থিত সম্পদ-হীন ভদ্র ব্যক্তিদিগের শিক্ষার জন্য কয়েকটী ক্রিয়া দেখাইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বোম্বাইয়ের স্থর সুমঙ্গলও ব্লাভাস্কিকে অর্থ-লোভ দেখাইয়া হতাশ হইয়াছিলেন। ক্ষুব্ধ ও বৃদ্ধ করিয়াছিলেন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় তাঁহার এক খানা অত্যাবশ্যকীয় দলিল হারাইয়া যায়। ব্লাভাস্কি উহার পুনঃ প্রাপ্তির সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। অলৌকিক ক্রিয়া দর্শনে বঞ্চিত হইলেও ব্লাভাস্কির প্রতি মহারাজের শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অলকট এবারও কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীকে সংস্কৃত ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সংস্কৃতের উন্নতি ও প্রচারের উপর জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। তদানীন্তন প্রধান পণ্ডিত ও বহু রাজন্য কর্ত্তৃক গুরুবৎ পূজিত বালা শাস্ত্রীকে তিনি এই কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটী সভা আহুত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় বপুদেব শাস্ত্রী সভাপতি হইয়াছিলেন, এবং আংলো-সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক বালা শাস্ত্রী, দামোদর শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, গঙ্গাদেব শাস্ত্রী প্রভৃতি কাশীর শীর্ষ স্থানীয় হিন্দু পণ্ডিত-বর্গ এবং কালেজের ইংরাজি সংস্কৃতাধ্যাপক বাবু প্রমদা দাস মিত্র ও অধ্যক্ষ জি, থিবো মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইল :—

"যেহেতু পৃথিবীর সর্ব্বদেশবাসী আর্য্য-বিদ্যা-হিতৈষীবর্গের ভ্রাতৃভাববদ্ধ একতা ও সমবেত চেষ্টায় সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈদিক দর্শন বিজ্ঞানের বিশেষরূপ উন্নতি হইবে, যে হেতু এই মহৎ উদ্দেশ্যের কল্পে পরাবিদ্যা-সমিতির অকৃত্রিম যত্ন সর্ব্বত্র সুবিদিত, এবং উক্ত সমিতির আয়ত্বাধীনে উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী যে সকল সুযোগ সুবিধা আছে, তাহার

সাহায্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, অতএব ধার্য্য হইল যে, এই সভা পরাবিদ্যা-সমিতির সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থ উভয় সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত উপায়ানুযায়ী পরাবিদ্যা-সমিতির ঐকান্তিক সহায়তা করিতে সদা প্রস্তুত থাকিবেন।

অলকট ও ব্লাভাস্কির প্রকাশ্যরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্বীকার সত্ত্বেও ইঁহাদের কার্য্যের সহিত হিন্দুত্বের দুর্গস্বরূপ কাশীর স্বনামখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর এই আন্তরিক সহানুভূতি পরাবিদ্যা-সমিতির সর্ব্বকল্যাণকামী উদার অসাম্প্রদায়িকতার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ।

কাশীত্যাগ কালে ব্লাভাস্কি ও অলকট রামনগর প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ মহারাজকে তাঁহার যত্ন ও স্নেহের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে পুনরায় কাশী আগমনের জন্য এবং ভবিষ্যতে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। তৎপর মহারাজ একখানি মূল্যবান শাল ব্লাভাস্কিকে উপহার প্রদান করিলেন। ব্লাভাস্কি উহা গ্রহণ-সূচক স্পর্শ পূর্ব্বক প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলে, মহারাজা অতীব দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ব্লাভাস্কি অগত্যা উপহার গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ কাশী-নরেশের তৃপ্তি সাধন করিলেন।

কাশী হইতে এলাহাবাদ হইয়া ইঁহারা ৩০শে ডিসেম্বর (১৮৮০ খ্রীঃ) ফিরিয়া আসিলেন। নববর্ষের প্রারম্ভে অলকট বৌদ্ধ শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য সিংহল যাইতে মনস্থ করিলেন। ব্লাভাস্কি 'থিয়সফিষ্ট' পত্রের কার্য্যের নিমিত্ত অলকট্‌কে তখন সিংহল যাত্রা স্থগিত রাখিয়া বোম্বাই থাকিতে বলিলেন। ব্লাভাস্কি বড় হইয়াছিলেন, এবং প্রায় এক সপ্তাহ অলকটের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, শেষে অলকটের সিংহল যাত্রায় ব্লাভাস্কি সম্মতি দিয়াছিলেন। অলকট বলেন, এই সময়ে তাঁহারা জনৈক মহাত্মার দর্শন লাভ করেন। তাঁহার দর্শন দানের অব্যবহিত পরেই পরাবিদ্যা সমিতির নিয়মাবলী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয়, এবং তৎফলে 'সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব' (Universal Brotherhood) স্থাপনই সমিতির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত হয়। অধ্যাত্ম শক্তির অনুসন্ধান গৌণ উদ্দেশ্য রূপে রক্ষিত হইল। উহার যথোচিত অনুশীলনের জন্য পরে 'Eastern school of Theosophy' অর্থাৎ 'ব্রহ্মবিদ্যার প্রাচ্য-শিক্ষা-সঙ্ঘ' নামে একটী অন্তরঙ্গ-সভা স্থাপিত হইয়াছে।

'এলিকসার অব লাইফ' (Elixir of life) অর্থাৎ 'মৃত্যু-জয়ের উপায়' নামক সুলিখিত ইংরাজী গ্রন্থের লেখক মির্জ্জা মুরাদ আলি বেগ এই সময়ে ব্লাভাস্কির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। লোকটা প্রকৃত পক্ষে য়ুরোপীয়, নাম মিটফোর্ড (Mitford), মুসলমান হইয়া ঐ জাতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি কোন দেশীয় রাজষ্টেটে অশ্বারোহী সেনাধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন, এবং বহু অধ্যয়ন-সম্পন্ন ও ধীমান ছিলেন। কিন্তু লালসা-বশে কোন রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া স্বীয় পাপেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য একজন মুসলমান ফকিরের সাহায্যে আভিচারিক ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎফলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলেও পরে মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছিল। অনধিকারী বা অজিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে অলৌকিক শক্তিলাভ কতদূর

আলির পরিণাম হইতে বুঝা যায়। বিকৃতমস্তিষ্ক মুরাদ সমিতির সভ্য হইতে ইচ্ছুক হইলেন। অলকট তাঁহার মানসিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সভ্য করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু ব্লাভাস্কি লোকটার বুদ্ধি-প্রাখর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাই তিনি উঁহাকে সমিতিতে গ্রহণ করিবার জন্য অলকটকে বলিলেন। মির্জ্জা মুরাদের ইচ্ছা সফল হইল। কিন্তু কিছু কাল পরেই মির্জ্জা সাহেব যেরূপে ব্লাভাস্কির দয়ার প্রতিদান করিলেন, তাহা তাঁহার মস্তিষ্ক বিকারেরই ফল বলিতে হইবে। সুতরাং ইহা ভয়ানক হইলেও উন্মত্তের পক্ষে অসম্ভব নহে। এক দিন মির্জ্জা মুরাদ আলি পরাবিদ্যা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী ও তাঁহার গুরুবর্গ সব শয়তানের অবতার, এই বলিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ব্লাভাস্কির প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মহাত্মারা অবশ্যই মির্জ্জা মুরাদের মারাত্মক আক্রমণের অতীত, আর বোধ হয়, তাঁহাদেরই আশীর্ব্বাদে ব্লাভাস্কির জীবন রক্ষা হইল। হতাশ মির্জ্জা কিছু দিন পরে রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, পরে আবার ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার কিয়ৎ কালান্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। যাহা হউক, তাঁহার 'Elixir of life' এক খানা উপাদেয় গ্রন্থ। অলকট বলেন, গ্রন্থ মির্জ্জার লিখিত হইলেও ব্লাভাস্কির প্রেরিত চিন্তা-প্রসূত। লিখন কালে ব্লাভাস্কি স্বয়ং মির্জ্জার পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বীয় চিন্তা সঞ্চার দ্বারা লেখকের চিন্তাকে অনুরঞ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন। ইহা সত্য হইলেও, বাহ্য বিচারে মির্জ্জার কৃতিত্বই স্বীকার্য্য।

এপ্রেল মাসে (১৮৮১ খ্রীঃ) অলকট বাটীতেই রহিলেন। এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা সিংহলে যে বীজ বপন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা যে কালে এক প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইবে, অলকট এবার তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন। সিংহলে পদার্পণ করিবা মাত্র প্রথম প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ স্কুলের তিন শত ছাত্র আসিয়া তাঁহাকে সানন্দ অন্তরে অভ্যর্থনা করিল। এবার তিনি বৌদ্ধ শিক্ষার সুবিস্তার কল্পে অর্থ সংগ্রহ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সদ্ভাব স্থাপন, এমন কি, চিরবিরোধী হিন্দু বৌদ্ধে সৌখ্যস্থাপন প্রভৃতি নানা হিতকর কার্য্যে প্রায় আট মাস কাল সিংহলে ব্যাপৃত ছিলেন। বৌদ্ধগণের স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে ঘোরতর অজ্ঞতা দেখিয়া উহা দূরীকরণার্থে অলকট 'বৌদ্ধ প্রশ্নোত্তর মালা' (Budhist Catechism) নামক যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই সময়ে উহা সমাপ্ত হইল, এবং আচার্য্যগণের সহিত বহুদিবসব্যাপী বিচার আলোচনার পর সুমঙ্গলের মতানুসারে বৌদ্ধ সমাজ কর্ত্তৃক প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে গৃহীত হইল। এই গ্রন্থ ২২টী বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, এবং অদ্য উহা প্রত্যেক বৌদ্ধ-স্কুলে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। ডিসেম্বর মাসে তিনি বোম্বাই ফিরিয়া আসিলেন। ব্লাভাস্কি তাঁহার কার্য্যে সাতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিলেন, এবং বলিলেন, উহা সম্পূর্ণরূপ মহাত্মাগণের অনুমোদিত। তিনি পূর্ব্বে আপত্তি করিয়াও শেষে অলকটের সিংহল গমনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা অলকট বুঝিলেন, এবং ইহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্লাভাস্কি সকল সময়ে মহাত্মাগণের আদেশপরিগ্রহে অভ্রান্ত নহেন।

খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী সমিতির

সপ্তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইল। প্রায় এক মাস অন্তে অলকট পণ্ডিত ভবানীশঙ্কর সমভিব্যাহারে আর্য্যাবর্ত্ত অভিমুখে প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে প্রচার ও সমিতির শাখা স্থাপন করিয়া তিনি বহরমপুরে উপস্থিত হইলেন। বহরমপুরের নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রমুখ উদ্যমশীল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মহা সমারোহের সহিত অলকটকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই কয়েক ব্যক্তির আগ্রহ, উৎসাহ, শ্রদ্ধা এবং পরাবিদ্যা-সমিতির কার্য্যে আন্তরিক যত্ন ও প্রাণপণ পরিশ্রম দেখিয়া অলকট একান্ত প্রীত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক ইঁহাদের অকপট উন্নতি-চেষ্টায় তাৎকালীন বহরমপুর-শাখা-সমিতি আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। এই নগরের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ ঐতিহাসিক রামদাস সেন সমিতির সভ্য হইলেন।

বহরমপুর হইতে অলকট কলিকাতায় আগমন করিলেন। কয়েক দিন পর ব্লাভাস্কিও কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। বঙ্গের শিক্ষিতগণ ইঁহাদের কার্য্যকলাপ অবগত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই ইঁহাদিগকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। রাজধানী কলিকাতাবাসী বঙ্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাই ইঁহাদিগকে প্রীতি-অর্ঘ্য অর্পণ পূর্ব্বক সানন্দে 'স্বাগত' করিলেন। মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইঁহাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক নিজ প্রাসাদে আনয়ন করিলেন। ব্লাভাস্কি যে দিন আসিলেন, সেই দিন সন্ধ্যায় (৬ই এপ্রেল, ১৮৮২ খ্রীঃ) মহারাজের প্রাসাদে পরাবিদ্যা-সমিতির বঙ্গীয় শাখা গঠিত হইল। তৈষী সাহিত্যিক, আধুনিক সের জনক প্যারীচাঁদ মিত্র সভাপতি, দার্শনিক পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজা শ্যামাশঙ্কর রায় সহকারী সভাপতি, ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রের কর্ণধার নরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদক, বলাইচাঁদ মল্লিক ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইলেন, এবং অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। 'ভারতী' সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ও আরও দুই তিনটী সম্ভ্রান্ত মহিলাও সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলন ও উৎসাহ কোলাহলের প্রায় সম-সময়ে অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সহসা সশব্দে দয়ানন্দ-স্বামী-নিক্ষিপ্ত এক প্রচণ্ড আগ্নেয়াস্ত্র কলিকাতায় আসিয়া পতিত হইল। কোন কোন স্থানীয় পত্র উহার প্রতিধ্বনি করিয়া অলকট ও ব্লাভাস্কির প্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। অকারণে স্বামীজীর এই প্রকাশ্য-যুদ্ধ ঘোষণায় অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী কলিকাতাবাসীদের মধ্যে নিন্দা অসূয়াপূর্ণ এক পত্র প্রচার করিয়া ইঁহাদের প্রতি যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, অলকট বলেন, উহা নিতান্ত ভদ্ররীতি-বিরুদ্ধ ও সভ্য-সমাজের নিন্দনীয়। সুতরাং উক্ত আক্রমণের প্রচণ্ডতা সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, ইহার অব্যবহিত পরেই অলকট কলিকাতা টাউন-হলে 'ব্রহ্ম বিদ্যাই ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি' এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। কলিকাতার সমগ্র বিদ্বৎসমাজ উক্ত বক্তৃতা শ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইঁহারা কলিকাতায় সাধারণের যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে দয়ানন্দ স্বামীর আক্রমণের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ রূপে বিফল হইয়াছিল,তাহা বলা বাহুল্য। ক্রমশঃ।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

পুরাতন প্রসঙ্গের পরিশিষ্ট।

সূচনা

বন্ধু বিপিনবিহারী কহিলেন, তুমি ঢাকা-কলেজের ঐতিহাসিক উপাদান কিছু সংগ্রহ করিও। শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভুবন-মোহন সেন মহাশয়কে দেখিয়া বন্ধুর মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। সুযোগাভাবে এতদিন বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী জানিতে পারিলাম, ভুবনবাবু ভবানীপুরে আসিয়াছেন। প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান্ রাজেন্দ্র প্রসাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরুর চরণ-বন্দনা করিলাম। গুরুপরম্পরা তিনপুরুষের সম্মিলনে সেখানে তীর্থ-সঙ্গমের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই তীর্থ-তর্পণের,ফল বর্ত্তমান প্রবন্ধ।

(জন্ম—জুলাই ১৮৪৮,
প্রবেশিকা পরীক্ষা, ডিসেম্বর, ১৮৬৫,
বি-এ, জানুয়ারী ১৮৭১,
ঢাকাকলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ১৮৭১,
ময়মনসিং জিলাস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক,
নওয়াখালী জিলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক,
ফরিদপুর জিলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক,১৮৭৮,
ঢাকাকলেজিয়েট্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক,
১৮৯৬-১৯০৩)

গ্রাম্য-শিক্ষা।

"ঢাকা হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে আমদীয়া গ্রামে আমাদের নিবাস ছিল। মা শিক্ষিতা ছিলেন না বটে, কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং আমাদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগিনী ছিলেন। তিনি একজন great disciplinarian ছিলেন। গ্রামে কোন পাঠশালা ছিলনা, কলার পাতে লিখিতাম, আর সে কালের বটতলার ছাপা শিশুবোধক পড়িতাম। শিশুশিক্ষা আমি পড়ি নাই, কিন্তু তখন শিশুশিক্ষা সবে প্রকাশিত হইয়াছিল, শুনিয়াছি। ডেঙ্গর সিং আমাদের বাড়ীর শিকদার ছিল। সে চাকর হইলেও খুব ক্ষমতাশালী (influential) ছিল। তাহাকে আমরা অভিভাবকের ন্যায় ভয় করিতাম। যাহা হউক, এইরূপে ঘরে বসিয়া জননী ও ডেঙ্গর সিঙ্গের তত্ত্বাবধানে নামতা, হিসাব, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে লাগিলাম। ইংরাজী A. B. C.ও আমাকে ধরান হইয়াছিল। কিন্তু পারিবারিক দুর্ঘটনাবশতঃ বাড়ীতে আমার লেখা পড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তৎপর আমাকে গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র শিক্ষার জন্য যাইতে হইয়াছিল। মাণিকগঞ্জে থাকিতে কাগজে হাতের লেখা দেখিয়া লেখা মক্স করিতাম। বাড়ীতে গেলে পাড়াশুদ্ধ সকলের চিঠি লিখিয়া দিতে হইত। আর সকলের চিঠি লিখিতে তত বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু ডেঙ্গর সিং চিঠি লিখাইতে আসিলে, আমার ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িত। সে নিজে লেখা পড়া জানিত না, কিন্তু তাহার বিষয়বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল, এবং প্রায়ই লম্বালম্বা পত্র লিখাইত। পত্র মনোমত না হইলে সে ধমক দিয়া বলিত, 'কি লেখাপড়া শিখেছ যে, একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখিতে পার না?' ডেঙ্গর সিংহের প্রতাপে আমরা থর থর কাঁপিতাম।

"ডেঙ্গর সিংহ তামাক-সেবার প্রতি আমার বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিয়াছিল। তজ্জন্য আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। একবার ঢাকা হইতে ডেঙ্গর সিঙ্গের সঙ্গে বাড়ী যাইতেছিলাম। আমার একটা ছোট কাপড়ের পুটলী ডেঙ্গর নিজেই বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। বেলা দুপুরের সময় রৌদ্র খা খা করিতেছিল। আমরা একটা মস্ত মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। এই সময় মাঠের একপ্রান্তে, প্রায় আধমাইল দূরে, ধোঁয়া দেখিতে পাইয়া ডেঙ্গর সিংহ আমার কাছে বোচকা ফেলিয়া তামাক খাইতে ছুটিল। ধূমপানের জন্য সেই দুপ্রহর রৌদ্রে তাহার উপসর্গ ও বিড়ম্বনা দেখিয়া আমার মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। তদবধি আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, জীবনে এ অনর্থ আমি কখনও জুটিতে দিব না। আমাদের পরিবারে এখন কেহই ধূমপান করে না।

স্কুল ও পাঠ্য।

"১৮৬৩ সনে এপ্রেল মাসে পগোজ (Pogose) স্কুলের ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। তখন আমার বয়স ১১ কি ১২। আর্ম্মাণী পগোজ সাহেব ১৮৩৫ সনে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমি ৭ম শ্রেণীতে ৬মাস, এবং ৬ষ্ঠ, ৫ম, ৩য়, ২য়, ও ১ম শ্রেণীতে এক এক বৎসর, মোট এই ৫॥ বৎসর স্কুলে পড়ি। ৫ম শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণীতে আমাকে ডবল প্রমোশন দেওয়া হইয়াছিল। স্কুলে প্রথম Murrays' Spelling Book পড়িতাম। তখন P. C. Sarcarএর First Book সদ্য বাহির হইয়াছিল, কিন্তু আমি পড়ি নাই। অন্যান্য বইএর মধ্যে Ancient History, Indian History, Pott's Geometry, Barnard Smith's Arithmetic, Geography প্রভৃতি পড়ান হইত। স্কুলে আমরা সংস্কৃত পড়ি নাই, বাঙ্গালায় এণ্ট্রান্স দিয়াছিলাম। এণ্ট্রান্সস্কুলে University Course ইংরাজী পড়া হইত। দীনবাবু হেড মাষ্টার ছিলেন। আমি যখন এণ্ট্রান্সক্লাশে উঠিলাম, তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হইয়া গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে গেলেন। কালে তিনি ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। একজন শিক্ষক অঙ্ক কষাইতেন। তিনি প্রায়ই আঁক দিয়া ঘুমাইতেন। মনে আছে, একবার একটা ফলে ২ কম হইয়াছিল। অঙ্ক মিলিতেছেনা বলিয়া ছাত্র তাঁহাকে জাগাইলে, তিনি বলিলেন, 'দুই যোগ করিলেই যখন ফল পাওয়া যায়, তখন উহা লইয়া আমাকে বিরক্ত কর কেন?'

মেস ও বাসা খরচ।

"মনে পড়ে, বর্ষাকালে প্রথম ঢাকা গিয়াছিলাম। বাড়ী হইতে ঢাকা পায় হাটিয়া যাইতে হইত, বর্ষাকালে নৌকায় যাওয়া যাইত। আমরা ঢাকার মেসে থাকিতাম, নয়াবাজারে ও ইসলামপুরে মেসে ছিলাম। মাসে ৫।৬৲ টাকা খরচ পড়িত। প্রথমে নিজেরা রান্না করিয়া খাইতাম। আমি সকলের ছোট ছিলাম। প্রভাত সেন (পরে Dy. Inspector of schools), কৈলাস সেন (পরে Asstt. Inspector of Schools), হরিমোহন সেন (পরে Dy. Magistrate) আমার সঙ্গে ছিল। হরিমোহন বয়সে আমার বড় ছিল। সেই আমার অভিভাবক হইয়াছিল। তখন তাহার নির্ম্মলচরিত্র (spotless character) ছিল। স্কুলের বেতন ১৲ লাগিত, দুইবেলা খাওয়ার খরচ মাসে ২৸/১০। চাকরের বেতন ও

ঘরভাড়া আলাদা দিতে হইত। চাকর রোজ /১০ হিসাবে প্রত্যেকের নিকট হইতে লইয়া দুইবেলা মাছভাত খাওয়াইত। জল খাবার মুরী খাইতাম, পরে পাউরুটী ও দুধ। বাবার নিকট হইতে খরচার টাকা আনিতাম। তিনি মানিকগঞ্জে থাকিতেন।

ছাত্রজীবন ।

"তখন ছাত্রদের মধ্যে সাহস (physical courage) বড় একটা ছিলনা। ছেলেরা সাধারণতঃ নম্র ও সোজা ছিল। আত্মপ্রতিষ্ঠা (self-assertion) তখন আসে নাই। পড়াশুনার মধ্যে আমরা কেবল ইংরাজী লিখিতে ও বুঝিতে শিখিতাম। আর বেশী কিছু শেখা হইত না। এখন শিক্ষার 'standard raised' (পাঠ্য বিষয় উন্নত ও কঠিন) হয়েছে। ক্রিকেট খেলা কখনও হইত। Club ছিল, তাহাতে essay (প্রবন্ধ) লেখা হইত। তখনকার ছেলেরা morally inferior (ইন্দ্রিয়-ঘটিত নৈতিক চরিত্রে হীন) ছিল। ছাত্রদিগের মধ্যে সহানুভূতি ও রোগীর সেবার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজ ।

"প্রভাতবাবু ও হরিমোহন ব্রাহ্মসমাজে যেত। ঢাকায় কোন ব্রাহ্ম ছিলেন না। আদি সমাজের মত একটা সমাজ ছিল। সেখানে গান ও স্তোত্র পাঠ হইত। প্রভাত বাবু ও হরিমোহন একদিন আমাকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মসমাজে লইয়া গিয়াছিল। তখন আমি 6th কি 5th ক্লাশে পড়ি। হরিমোহন সেকেণ্ড ইয়ারে ফেল হয়ে চাকরী লইয়া গেল। তার পর আমি পাঁচদোনায় গোলোকরায়ের বাসায় মামার তত্ত্বাবধানে গেলাম। সেই বাসার কাছে দীনবাবুর বাসা ছিল। দীননাথ সেন পগোজ স্কুলের Headmaster ছিলেন। এই সময় বঙ্গবাবুর সঙ্গে আলাপ হইল। বঙ্গবাবু, চন্দ্রমোহন ঘোষাল, তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী দীনবাবুর কাছে যাইতেন। চন্দ্রশেখর আমার ক্লাশফ্রেণ্ড। দীনবাবুর উদ্যোগে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ-বিল্ডিং স্থাপিত হইয়াছিল। দীনবাবু ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। বঙ্গবাবু, চন্দ্রশেখর, তারকবাবু সকলেই ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। দীনবাবু আমাকে খুব ভালবাসিতেন। আমি তাঁহার. কাছে পড়িতাম না, নীচের শ্রেণীতে পড়িতাম। আমাদের বাসায় আরও কয়েকটী ছাত্র ছিল। বাসা ভাড়া লাগিত না, আমরা সকলে দুই তিনটা মেস করিয়া খাওয়া দাওয়া করিতাম। ২য় শ্রেণীতে উঠিয়া আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলাম। বাসার সকলে সমাজে যাইতে নিষেধ করিত। এই সময় বাসা পরিবর্ত্তন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

"রামশঙ্কর বাবুর ছেলে গিরিজাশঙ্কর কুসংসর্গে পতিত হইয়াছিল, এইরূপ সংবাদ তাহার বাবার কাণে গিয়াছিল। গিরিজাশঙ্কর মেসে থাকিত। দীনবাবু তাহাকে মেস হইতে তুলিয়া আনিয়া বঙ্গবাবুর তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্রবাসায় রাখিতে পরামর্শ দেন। বঙ্গবাবুর চাকরী হইল। ক্রমে তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী যাইয়া সেখানে জুটিল। রামশঙ্কর বাবু তাহাতে আপত্তি করিলেন না। বরং তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, সচ্চরিত্র পড়াশুনা করে, এরূপ ছেলে গিরিজাশঙ্করের সঙ্গে থাকে। কারণ সেই দৃষ্টান্তে তাহারও মতিগতি ফিরিতে পারে। আমিও এণ্ট্রান্স ক্লাশে সেই বাসায় গেলাম। রামশঙ্করবাবু বাবাকে জানিতেন। তাঁহার চরিত্র ও সেতারে নিপুণতার কথা রামশঙ্কর বাবুর সবিশেষ জানা ছিল। অতএব

তিনি আপত্তি করিলেন না। আমরা খোরাকী-খরচ নিজেরা দিতাম।

"ব্রাহ্মসমাজের তখন কিছু বুঝিতাম না। কিন্তু ভাল লাগিত বলিয়া যাইতাম। এই সময় অঘোরনাথ গুপ্ত ঢাকায় গেলেন। তিনি ব্রাহ্ম M. V. স্কুলের শিক্ষক হইয়া আসেন। বিজয়বাবু অঘোরবাবুকে ঢাকায় বসাইয়াছিলেন। বিজয়বাবুর চেষ্টায় স্থাপিত সেই মধ্য-বাঙ্গালা স্কুলটী ক্রমে M. E. ও H. E. স্কুলে উন্নীত হইয়া বর্ত্তমান জুবিলী স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

কেশববাবু।

"১৮৬৫ সালের শেষাংশে কেশববাবু ঢাকায় গিয়াছিলেন। তখন আমি এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ি। ব্রজসুন্দর বাবু তখন ডিপুটী, ঢাকায় তাঁহার বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীতে কেশববাবুকে বাসা দেওয়া হইয়াছিল। তখনও ব্রহ্ম-মন্দির হয় নাই। কেশববাবু যখন সেখানে গেলেন,তখন আমরা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছি। মনে আছে, আমি প্রায় দুই সের কি আড়াই সের পরিমাণে একঘটি দুধ লইয়া কেশববাবুর বাসায় গেলাম। বিজয়বাবু রাঁধিতেছিলেন, কেশববাবু পান সাজিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি এনেছ? দুধ? তবে আর কিসের অভাব?'

আন্দোলন ও উৎপীড়ন।

"পূজার সময় বাড়ী গেলাম। তখন খুব আন্দোলন ও শাসন আরম্ভ হইল। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীমোহন আমার কাছে পড়িতে আসিয়াছিল। বাবা তখনও খরচের টাকা বন্ধ করেন নাই। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিলাম। তখন পরীক্ষা শক্ত ছিল, কিন্তু এত বই ছিল না। সেবার শতকরা ২৩ জন পরীক্ষার্থী কৃতকার্য্য হইয়াছিল। আমি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথম হইয়া ১৪৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলাম। সেবার মোটে ৪ জন সে ডিবিসনে প্রথম বিভাগে পাস হইয়াছিল। 1st yearএ বাড়ী যেতে পারি নাই। কালীমোহনের ইংরাজী পড়া বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে সংস্কৃত পড়িতে বাড়ী নিয়ে গেল। বৃত্তি পাইয়া স্বাধীন হইলাম, এবং সকল প্রকার উৎপীড়নে ও অত্যাচারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধর্ম্মমত পোষণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলাম। First Arts দিয়া বাড়ী গেলাম। এই সময় নবকুমার চক্রবর্ত্তীকে তাহার অভিভাবকেরা ধরিয়া বাঁধিয়া নৌকায় করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছিল। সে পলাইয়া আমাদের বাড়ীতে আমার কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা সঙ্গত-সভা করিতাম। সভা আমাদের Source of inspiration ছিল।

আর্থিক অবস্থা।

"এলে পরীক্ষায় ২০৲ বৃত্তি পাইয়াছিলাম। তখন মাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া কালীমোহনকে আবার ঢাকা লইয়া আসিলাম। কথা ছিল, তাহাকে বলপূর্ব্বক ব্রাহ্ম করা হইবে না এবং ব্রাহ্ম হইবার জন্য উপদেশও দেওয়া হইবে না। কেবল তাহার পড়াশুনা ও চরিত্রের প্রতি আমি দৃষ্টি রাখিব। সে যদি আপনা আপনি পড়াশুনা করিয়া, নিজে বুঝিয়া, মত পরিবর্ত্তন করে, সে জন্য আমি দায়ী হইব না। আমি ধরিয়া বাঁধিয়া, জোর জবরদস্তি করিয়া, ধর্ম্ম প্রচারের পক্ষপাতী নই। আমার কলেজের বেতন ৬৲ দিতাম। দুই জনের খরচ বৃত্তির টাকায় চলিত না। এজন্য 3rd yearএ টিউসন করিতে হইত। 3rd ও 4th yearএ handnote দিয়া টাকা কর্জ্জ করিতে

হইয়াছিল। নানা কারণে শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। ভাল পড়া শুনা করিতে পারিলাম না। কিন্তু বিজয়বাবুর উৎসাহে ১৮৭০ সালের জানুয়ারী মাসে বি-এ পরীক্ষা দিয়া পাশ হইলাম।

ঢাকা কলেজ।

"পগোজ স্কুল হইতে এণ্ট্রাস পাশ হইয়া ১৮৬৬ সালে ঢাকা কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। ১৮৩৫ সনে ঢাকায় একটী ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। ১৮৪১ সনে উহা কলেজে উন্নীত হয়।* আমরা যখন পড়ি, তখন মিষ্টার ব্রেন্যাণ্ড কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। আমাদের বার ফার্ষ্ট ইয়ারে ৩০।৪০ জন ছাত্র ছিল, সেকেণ্ড ইয়ারে কিছু বেশী, থার্ড ইয়ারে মাত্র ১৬ জন। মুসলমান ছাত্র একটীও ছিল না। আর্ম্মানী দুই এক জন ছিল। তখন আর্ম্মানীরা ঢাকায় খুব influential community ছিল, পগোজস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও আর্ম্মানী ছিলেন। 1st year এ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ নাগের কাছে গণিত পড়িতাম এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্তের কাছে ইংরাজী পড়িয়াছি। তা ছাড়া সংস্কৃত পণ্ডিত বাঙ্গালী ছিলেন। আর কোন প্রফেসর বাঙ্গালী ছিলেন না। পূর্ব্বে এলে, বি-এতে সংস্কৃত পড়ান হইত না। আমরা সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত পড়ি। বাঙ্গালা কোর্স ছিল, তাহাতে রোমের ইতিহাস, কে এম বাড়ুয্যের রাজদূত প্রভৃতি হইতে extract ছিল। পণ্ডিত মহাশয় শ্রীনাথ তর্ক পঞ্চানন কেবল গল্প করিতেন এবং রাগিলে এক এক জনকে ২০।২৫৲ টাকা জরিমানা করিতেন। তাহার এক পয়সাও আদায় হইত না। তিনি হেরম্ব বাবুর আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র বি-এ পাশ করিয়া নদীতে ডুবিয়া মারা গিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় সময় সময় সেই কথা উল্লেখ করিয়া আমাদিগের চপলচিত্তে তাঁহার পদ ও ব্যক্তিত্বের গৌরব মুদ্রিত করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি রাগিয়া ও অভিমান করিয়া বলিতেন, 'যে বি-এ পাশ করিয়া নদীতে ডুবিয়া মরিল, আমি তাহার খুড়া, তোরা কি আমাকে যে সে লোক মনে করিস?' শম্ভুবাবু পরে সব জজ হইয়াছিলেম। সাহেব প্রফেসরদিগের মধ্যে মিঃ বেলেট ও ডাঃ মার্টিনের নাম উল্লেখ যোগ্য। বেলেট সাহেব মাতাল, দুষ্ট ও অত্যাচারী ছিল। পড়াইত না, কিন্তু ইংরাজী (language) বেশ জানিত। মার্টিন সাহেব পড়াইতে পারিতেন না, কিন্তু খুব ভাল মানুষ (good natured) ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ ছিল না। বেলেট ভয়ানক লোক ছিল। অর্দ্ধেক course ও সারা বৎসরে শেষ হইত না। কিন্তু ইংরাজীতে এমন insight দিয়া দিত যে, সমস্ত কোর্স না পড়িয়াও পাশ করা যাইত। খুব ছোট ছোট কথা ব্যবহার করিয়া মানে বলিয়া দিত।

---

* It was originally opened as a school by the General Committee of Public Instruction in the year 1835. In 1841 it was converted into a college, when a Principal was appointed and an increase made to the staff of teachers. The college building was erected partly by public subscription in 1841.

PRINCIPALS

1841	J. Ireland M. A.
1844	T. Wise
1846	G. Lewis
1856	W. Brennand offg.
71	L. Clint B. A.
1857	W. Brennand

Calcutta University Calendar, 1914, p 248, দ্রষ্টব্য।

সে যেদিন আসিয়া চেয়ারে বসিত, সেদিন কিছুই পড়াইত না। কলেজ ক্লাশেও বেঞ্চের উপড় দাঁড় করাইয়া দিত, আর ছুতানাতা করিয়া অত্যাচার করিত। We saw disaster in his morning's face. আর যেদিন পড়াইত, সেদিন ক্লাশে, আসিয়া বসিত না, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়াইত। কেহ বড় শব্দ প্রয়োগ করিলে ভেঙচাইত। He was more a baffoon than a professor. আমি, রজনী ঘোষ, বসন্ত, দক্ষিণা যখন ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, বেলেটের অত্যাচারে থাকিতে না পারিয়া মিঃ ব্রেণাণ্ডের নিকট দরখাস্ত দিয়াছিলাম। দক্ষিণাকে একবার বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দেয়; সে সাহেব চলিয়া গেলে, আমাদিগকে গালাগালি করিয়াছিল। আমাকে একদিন অকারণ task দিলে, আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রাগ করিয়া বসিয়া ছিলাম, task করি নাই। তখন পরীক্ষার সময়, আমার কোন অপরাধও ছিল না। বেলেট আমাকে বিরক্ত দেখিয়া, আর পড়াইল না। আমি বাহিরে যাইবার ছুটী চাহিয়া দরখাস্ত করিলাম। ছুটী কিজন্য চাই, জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিলাম 'টাকা আনিতে'। ছুটি মঞ্জুর করিল, আমি বাসা হইতে টাকা আনিয়া Transferএর দরখাস্ত করিলাম। আমাদের friends অনেক ছিল। বন্ধুরা আমাকে দরখাস্ত করিতে দিল না। তাহারা বলিল, 'তুমি একা যাবে কেন? গেলে সব যাব।' ৪টার পর দীনবাবুর বাসায় সকলে একত্র হ'য়ে Principalএর নিকট general application দেওয়া হইল। দক্ষিণা সকলের আগে নাম সই করিল। কে সই করিবে? জিজ্ঞাসা করিলে, সে অগ্রসর হইয়া বলিল 'I will sign first' দরখাস্ত দেওয়া হইল। ব্রেণ্যাণ্ড বোধ হয় মার্টিন সাহেবের কাছে বলিয়াছিলেন। মার্টিন 3rd yearএর ছেলেদের সামনে বেলেটকে বন্ধুভাবে উপদেশ দিতে গিয়াছিলেন। বেলেট চটিয়া গেলেন। ব্রেণ্যাণ্ড সাহেব like a father উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তদবধি বেলেটের অত্যাচার বন্ধ হইল। বেলেটের চরিত্রের ভাল দিকও ছিল। 2nd yearএর পরীক্ষার সময় আমার অসুখ হয়। আর এক জনের ও অসুখ হল। তখন ৬ দিন পরীক্ষা দিতে হইত। বি-এতে ১২ পেপার, ফাষ্ট আর্টস এ ১০ পেপার। খুব খাটিতে হইত। যাহা হউক, বেলেট নিজের গাড়ী আমাদের জন্য পাঠাইয়া দিত এবং রোজ দুইবেলা বাসা হইতে পরীক্ষাস্থলে ও পরীক্ষাহল হইতে বাসায় আমাদিগকে পৌছাইয়া দিত।

"মিঃ ব্রেণ্যাণ্ড অসাধারণ লোক ছিলেন। His example was inspiring. He was an emblem of justice and uprightness. সাহেবেরা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা (regard) করিতেন। কিন্তু তিনি ভাল পড়াইতে পারিতেন না। গণিত তিনি খুব ভাল জানিতেন। কিন্তু ছাত্রেরা কি হইলে ভাল বুঝিতে পারে, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি কোন স্কুলে বা কলেজে শিক্ষা পাইয়া ছিলেন না। Hindu Astronomyতে তিনি খুব পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার এ সম্বন্ধে বইও আছে। তিনি 'খুব গরিবের ছেলে ছিলেন। এদেশে তিনি ৮০৲ বেতনে Merchant আফিসের কেরাণী হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার হাতের লেখা খুব ভাল ছিল। পড়াশুনার অসুবিধা

হয় বলিয়া, অল্পদিন পরেই সে চাকরী ত্যাগ করিয়া তিনি হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ১০০৲ বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। সামান্য বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। শব্দের 'root' কে শব্দের 'মাবাপ' বলা হইত। অসাধারণ বিদ্যানুরাগ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে তিনি কালে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন। তখন দীনবাবু তাঁহার কাছে পড়িতেন। তিনি M. A. পর্য্যন্ত পড়াইতেন। কিন্তু ভাল put করিতে পারিতেন না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মিঃ ব্রেণ্যাণ্ডের বিশেষ গুণ এই ছিল যে he was never late, never absent and always punctual. অঙ্ক কষিতে কষিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। মনে আছে একদিন স্নান না করিয়া ছুটিয়া কলেজে আসিয়া গ্যারেট সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে, কোন কঠিন প্রশ্ন লইয়া ভাবিতে ভাবিতে সময়ের ঠিক না পাইয়া, লেট হইবার ভয়ে স্নান না করিয়াই কলেজে আসিয়াছেন। মিঃ ব্রেণ্যাণ্ড ছাত্রদিগকে জরিমানা বা প্রহার করিতেন না, কথায় সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি ছাত্রদিগকে পিতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। হাইকোর্টের উকীল বসন্ত বসু আমার ২।১ বৎসরের ছোট, কিন্তু class-friend. তাহার পিতা প্রিন্সিপ্যালের কাছে নালিস করিয়াছিলেন যে, আমরা তাঁহার ছেলেকে খারাপ করিতেছি। মিঃ ব্রেণ্যাণ্ড উত্তর দিয়াছিলেন,

"I don't believe that. I know them personally. Had my boys been here and were I to select any Indian company for them, I would have selected their Company."

কালীপ্রসন্ন ঘোষ আগে খুব ব্রাহ্মসমাজে যেতেন। পরে যখন তিনি ছোট আদালতের Head-clerk ছিলেন, তিনি অত্যন্ত ব্রাহ্মবিরোধী হইয়াছিলেন। এবং আরও কেহ কেহ মকর্দ্দমা দেখিতে আসিয়া নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন। মিঃ ব্রেণ্যাণ্ড বসন্তকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, Why do'nt you obey your father ? আমরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম, 'সার, উহাকে উহার বাবা বিবাহ দিতে চান, কিন্তু ও স্বীকার করে না বলিয়া তিনি রাগ করিয়াছেন।' এতটুকু কলেজের ছাত্রের এই বয়সে বিবাহ হইবে শুনিয়াই তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। তিনি আমাদিগকে আর কিছুই বলিলেন না।

"ঢাকা কলেজের কয়েক জন ভাল ভাল ছাত্রের নাম—রামশঙ্কর সেন, ভগবানচন্দ্র বসু, (ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) ভগবানচন্দ্র বসু (২), গৌরনারায়ণ রায়, ডাঃ পি, কে, রায়, সার কে, জি, গুপ্ত, কালীমোহন বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (এডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্) প্রভৃতি।

সেবা ও সহানুভূতি।

"এলে পরীক্ষা দিবার কালে আমার খুব অসুখ হইয়াছিল, তাহা বলা হইয়াছে। বাসার ছাত্রেরা খুব সেবা করিয়াছিল। তখনও ছাত্রদিগের মধ্যে সেবা ও সাহানুভূতির ভাব বেশ ছিল। K. G Gupta ও Dr. Roy আমার এক বৎসরের জুনিয়ার। তাঁহারা আমার যথেষ্ট সেবা ও যত্ন করিয়াছিলেন। ভয়ে কেহ কলেরা রোগীর সেবা করিতে চাহিত না। কলেরা যে infectious বা contagious রোগ নহে, তখন লোকে তাহা জানিত না। ঢাকায় কলেরা epidemic হইত। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা তখন

রোগীর সেবা করিত। আমাদের মেসের চাকরের একবার কলেরা হইয়াছিল। আমরা সকলে তাহার সেবা করিয়াছিলাম। চাকরকে তখন চাকরের মত দেখিতাম না। সে যেন আমাদেরই একজন (As if he was one of us)। আমরা ৫৲ যোগাড় করিয়া Dr. Simsonকে আনাইয়াছিলাম। তিনি আসিলেই লোকে মনে করিত, অর্দ্ধেক রোগ সারিয়া গেল। He was a wonderful personality and had unbounded influence. দরিদ্রের কাছে টাকা না পাইলেও তিনি আসিতেন। শুনিয়াছি, একবার নবাবপুরে কোন delivery case এ সিমসন সাহেবকে লইয়া গিয়াছিল। বেচারা এত দরিদ্র যে তাহার ঘরে কিছুই ছিল না সে একখানা ভাঙ্গা থাল আনিয়া সাহেবকে দিয়া বলিল, 'সাহেব আমার এমন কিছুই নাই যে, তোমাকে দিতে পারি। তুমি এই থাল খানা লইয়া যাও।' তাহার চালে দুইটা লাউ ছিল। সাহেব বলিলেন, 'কেন, তোমারত দেবার মত যথেষ্ট রহিয়াছে।' সে যোড়হাতে বলিল, 'হুজুর কি আছে?' সিমসন কদু দেখাইয়া বলিলেন, 'ঐত'! সে হাসিতে হাসিতে লাউ দুইটী কাটিয়া আনিয়া দিল। সাহেব মহানন্দে দুই কদু ভিজিট লইয়া কুঠীতে ফিরিয়া গেলেন এবং তাহার যত ঔষধ লাগিল, তিনি নিজে দিলেন।

বিবিধ।

"উয়ারী তখন জঙ্গল, কেহ সেখানে যেতে সাহস করিত না। মুসলমান ডনগির গুণ্ডারা অন্ধকার রাত্রিতে অত্যাচার করিত। মিউটিনির সময় আমি মাণিকগঞ্জে। গ্রামে কিছুই গোলযোগ টের পাই নাই। ঢাকা হইতে একটা রেজিমেণ্ট চট্টগ্রামের দিকে যাইতে পথে লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছিল। ঢাকার কামানের শব্দ আমরা ভোরে (Early in the morning) শুনিয়াছিলাম। সেদিন ভলাণ্টিয়ারেরা দেশী সৈন্যদিগকে কৌশলে নিরস্ত্র করিতে গিয়াছিল, তখন যুদ্ধ হইয়াছিল। কতগুলি ফাঁসী ও দেওয়া হইয়াছিল।"

মিঃ ব্রেণাণ্ড সম্বন্ধে আমরা ৺গৌরমোহন বসাক মহাশয়ের নিকটও কিছু শুনিয়াছিলাম। গৌরমোহন বাবু তখন ছাপরা জেলাস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। এখন তিনি স্বর্গে। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি যখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, একদিন তেল মাখিয়া, গামছা কাঁধে করিয়া, বুড়ীগঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছিলেন। পথে দেখিলেন, ছোট লাট ও ম্যাজিষ্ট্রেট সহর পরিদর্শনে বাহির হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গৌরমোহন বাবুকে জানিতেন। তিনি তাঁহাকে সেই অবস্থায়ই ডাকাইয়া বলিলেন, লাট সাহেবের একটা পাঠশালা দেখিতে ইচ্ছা হয়েছে, তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া দেও। তিনি তাঁহার নগ্নদেহের প্রতি দৃষ্টি করিলে, লাট সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'Never mind that'. তিনি পাঠশালার কি আর দেখাইবেন? কতকগুলা ছাত্র দাঁড় করাইয়া নামতা পড়িতে বলিলেন। 'এক অক্কে এক, দুই দুগুণে চার' এক সঙ্গে সকলকে সুর করিয়া পড়িতে শুনিয়া লাট সাহেব ভারি খুসী। গৌরমোহন বাবু লেট হইবার ভয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিলেন। তিনি মিঃ ব্রেণ্যাণ্ডের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, লাট সাহেবের প্রয়োজনে গৌরমোহনকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। গৌরমোহন বাবু যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া কলেজে যাইয়া

দেখিলেন, ব্রেণ্যাণ্ড সাহেব বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি দূর হইতে গৌরমোহন বাবুকে দেখিয়াই চাপরাশী পাঠাইলেন এবং তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া খুসী হইয়া বলিলেন, "His Honor pleased! you did very well, Gourmohun."

ডাঃ মার্টিন সম্বন্ধে অনেকে অনেককথা জানেন। আমার জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু আরা-জিলাস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। মার্টিন সাহেব তখন পাটনা ডিবিসনের স্কুল-ইনস্পেক্টর। বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'Sir, why did you not join the civil service?' মার্টিন হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'Babu, the best men stay at home, and the next best join the civil service.' ডাক্তার মার্টিনের বোধ হয় বলিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি থার্ডক্লাসের লোক। একথা তাঁহার বিনয়ের না সত্যপ্রিয়তার পরিচয় প্রদান করে, পাঠকগণ বিচার করিবেন।

ভুবন বাবু এখন দেওঘরে বাস করেন। চরিত্রবলে ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় তিনি কর্ম্মজীবনে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি এখনও জীবিত, অতএব তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে আমরা সঙ্কুচিত। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার প্রত্যেকটী কথা ওজন করিয়া সত্যমিথ্যার কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লইলে, খাঁটি সোণায় দাঁড়াইতে পারে।

ঢাকা কলেজ সম্বন্ধে যাঁহারা তাৎকালিক ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ দিতে পারেন, তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদের নিকট নব্যভারত আফিসে পত্র লিখিলে অত্যন্ত বাধিত হইব। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের, বিশেষতঃ ঢাকা নগরীর, সামাজিক, সাহিত্যিক ও নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার চিত্র অঙ্কিত করিবার উপাদান যাঁহারা প্রত্যক্ষ জীবন হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকটও সবিনয় প্রার্থনা, দয়া করিয়া নিম্নস্বাক্ষর-কারীকে তাঁহাদের ঠিকানা জানাইবেন।

শ্রীরসিকলাল রায়।

* * *

সবুজ পত্রের সম্পাদক ও তাঁহার সবুজ চাবুক।

(১)

বল কবি প্রকাশিয়া,
কোন্ মন্ত্র সাধনিয়া,
   পাইলে এ সবুজ চাবুক?
সাঁই সাঁই মৃদুস্বরে,
এ যখন গান ধরে,
   জেগে উঠে যতেক ভাবুক।

(২)

কিবা শোভা শ্যামলিমা,
নয়নে অঞ্জন দিয়া,
   ইচ্ছা হয় দেখি চির দিন।
স্পর্শে এর ভাষা রাণী,
ব্যক্ত করে সুধা বাণী,
   শ্যাম ভাব উথলে নবীন।

(৩)

উগারিয়া হলাহলে,
কখন তির্য্যগে চলে,
   কভু করে পন্নগ গর্জ্জন।
কভু ঋজুভাব ধরি,
ঢালে সুধা বুক ভরি,
   পিয়ে করি নন্দন ভ্রমণ।

(৪)

ভাষায় সৌন্দর্য্য বান,
আনিয়াছ বরীয়ান্,
   আনন্দে ধরেছে গান রবি!
অমিত বিক্রমশালী,
ওহে জগতের আলি,
   চিত্র কর ম্যাডোনার ছবি।

(৫)

শিক্ষিত সংযত করে,
পীন জঘন 'পরে,
ক্ষীণ কঠিন স্বরে,
cat of nine tails তব।
সাঁই সাঁই সাঁই তানে,
যখন ভিহ্বর হানে,
অভিনয় দেখি অভিনব।

(৬)

উক্তিগুলি যুক্তিপূর্ণ,
মস্তিষ্ক পরশে তূর্ণ,
ছাড়া ছাড়া ভাব নাহি ওঠে।
শুন বলি ওহে গুণি!
কাণ পেতে যবে শুনি,
সহস্র কমল প্রাণে ফোটে।

(৭)

প্রতিভা ধর্ষিতা যার,
রক্ষা তার নাহি আর,
চাবুকের দারুণ বর্ষণে।
গাঁ গাঁ শব্দ উচ্চারিয়া,
প্লুত স্বর আলোড়িয়া,
অঙ্গ ঢাকা দেয় কোন্ বনে ;

(৮)

"মৃণাল" মাধুর্য্য হন্তৃ,
নারায়ণী সেনা মন্ত্রী,
ভয়ে ভ্রমে সাহিত্য-কাননে।
"বস্তুতন্ত্র" অশ্বডিম্ব,
তিক্ত যেন কৃষ্ণ নিম্ব
পলাইল চাবুক-স্পর্শনে।

(৯)

করিল যে অভিমানী,
মৃণাল-সৌন্দর্য্য হানি,
তার তরে কুরবক লতা।
হ'লে পরে অনুষ্ঠিত,
চিত হ'ত প্রমোদিত,
সংজ্ঞা পেত মূর্চ্ছিত মমতা।

(১০)

দুষ্পাচ্য শিক্ষার উক্তি,
মুক্তাহীন শূন্য শুক্তি,
ক্ষীণ প্রতিভার ব্যভিচার।
বৃষ কণ্ঠে করি মন্ত্র,
"টেনিসনে" অর্দ্ধ চন্দ্র,
দিতে চায় বালিশ দুর্ব্বার।

(১১)

রণ-রঙ্গে ক্ষিতি-তলে,
লঘু হস্তে সুকৌশলে,
ঘুরাও চাবুক কবিবর।
ভাবুকের মনোলোভা,
স্নিগ্ধ সবুজের শোভা,
ছাইয়া ফেলুক চরাচর।

(১৩)

রজত-তটিনী সিক্তা,
ভাবের ঘুস্থণ লিপ্তা,
ভাদরের নদী বঙ্গভাষা।
বুকেতে সোণার তরী,
পদ্ম-রাগে আছে ভরি,
ভবিষ্যৎ পুরুষের আশা।

(১৩)

লাগাও নিতম্বে মূর্দ্ধে,
দক্ষিণে বামেতে উর্দ্ধে,
রাসভ উঠুক হুঙ্কারিয়া।
অন্ধকার দূরে যাক্,
সৌন্দর্য্যে ধরণী ছাক্,
মূর্খ যাক্ বিলীন হইয়া।

(১৪)

ভাষায় থাকেনা রস,
চিন্তা "হেগেলের" বশ,
চর্ব্বিত চর্ব্বণে সদা রত।
বুঝি বা না বুঝি ভাই,
মাথা মুণ্ড লেখা চাই,
মূর্খ বর্গে ক'রাতে প্রণত।

(১৫)

রবি বস্তুতন্ত্রহীন,
অতএব চিরদীন,
এযে হেয় প্রতিভার বাণী।
লাগাও নিতম্বে মূর্দ্ধে,
দক্ষিণে বামেতে উর্দ্ধে,
হাতে লও কুরবক রাণী।

(১৬)

অনুর্ব্বর রজঃহীনা,
অমার্জ্জিত বুদ্ধি কি না,
কোথা পাবে সুষমা দর্শন।

আবল্যে নয়ন ঘোর,
ঢক্কা রবে শ্রুতি ভোর,
আন্ধারেতে আচ্ছাদিত মন।

(১৭)

শ্রোতা নাই সহৃদয়,
বিশ্ব উষরতা ময়,
তোল কবি শ্যামল প্লাবন।
যৌবনে ডুবিয়া রবি,
আঁকিছে উর্ব্বশী ছবি,
চোকে ভাসে সোণার স্বপন

(১৮)

দুটী সখা তুমি রবি,
বার্দ্ধক্যে যৌবন লভি,
ভাষায় দিয়াছ নব প্রাণ।
দেবতার অনুগ্রহে
লভিয়াছ বর দোঁহে,
চাবুক তোমার ভাগ্যে,
রবীন্দ্রের ভাগ্যে মিঠা গান।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

অদ্বৈতবাদে শঙ্করাচার্য্য যেরূপ সুপ্রসিদ্ধ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে রামানুজাচার্য্যও তদ্রূপই সুপ্রসিদ্ধ। বেদান্তের এই দুইটী দিক্ই দুইজন মহাপুরুষ অবলম্বন করিয়া দুইটী দর্শন শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। বেদের শেষভাগই বেদান্ত। বেদের যাহা সার, তাহাই উপনিষৎ। জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদই উপনিষৎ। উপনিষদেরই অপর নাম বেদান্ত। আচার্য্য শঙ্কর উপনিষদ্‌কে অদ্বৈত-মতানুকূল করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন বলিয়া স্বীয় অদ্বৈতবাদের নামও বেদান্ত হইয়াছে। এই অদ্বৈতবাদাত্মক দর্শনের নাম বেদান্ত-দর্শন। আচার্য্য রামানুজ উপনিষদ্‌কে বিশিষ্টাদ্বৈতপর বলিয়া বুঝাইয়াছেন। এবং উপনিষৎ প্রমাণের সাহায্যে যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাত্মক দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার নামও বেদান্তদর্শন। তবে বেদান্তদর্শন বলিতে শাঙ্কর-দর্শনই সাধারণতঃ বুঝায়। এই শাঙ্কর-দর্শনের অপর নাম মায়াবাদ।

শঙ্কর নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী। রামানুজ পরমেশ্বরবাদী। শঙ্কর একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই স্বীকার করেন, ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত অপর কোন সত্তা স্বীকার করেন না। রামানুজ ব্রহ্মসত্তা, জীবসত্তা ও জগৎসত্তা—ত্রিবিধ সত্তাই স্বীকার করেন।

শঙ্কর মতে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব স্থানীয়। ব্রহ্ম ব্যতীত, জীবজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। অতএব শঙ্কর অদ্বৈতবাদী, ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন দ্বৈত বস্তুর অস্তিত্ব নাই বলিয়া শঙ্কর অদ্বৈতবাদী।

রামানুজ মতে ব্রহ্ম যেমন সত্য, জীবজগতও তদ্রূপ সত্য। ব্রহ্ম—পরমেশ্বর। জীব—চিৎ। জগৎ—অচিৎ অর্থাৎ জড়। জীবজগৎ ব্রহ্মের শরীরস্থানীয়। ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর শরীরী, চিদচিৎ তাঁহার শরীর। ব্রহ্ম বলিতে চিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে, কেবল মাত্র ব্রহ্মকে বুঝিলে চলিবে না। এই জীবজগদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মই সত্য। অতএব রামানুজ চিদচিদ্বিশিষ্ট পরমেশ্বরবাদী। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী।

শঙ্কর মতে জীবজগতের ব্যবহারিক সত্তা, পারমার্থিক সত্তা নহে। ব্রহ্মেই জীবজগতের ভ্রান্তি। আর এই ভ্রান্তি অনাদিকাল ধরিয়া

চলিয়া আসিতেছে। মরুভূমে মরীচিকায় যেরূপ জল ভ্রম হইয়া থাকে, ব্রহ্মেও তদ্রূপ জীব জগতের ভ্রম হয়। স্বপ্নে কল্পিত সৃষ্ট বিষয় যেমন জাগ্রদ্বিষয়ের প্রতিচ্ছবি, এই জীবজগৎ প্রপঞ্চও তদ্রূপ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত মাত্র। প্রতিবিম্বকে বিবর্ত্ত বলে। ব্রহ্মই জীবজগতের আকারে বিবর্ত্তিত হন বলিয়া অদ্বৈতবাদের অপর নাম বিবর্ত্তবাদ।

রামানুজ মতে জীবজগচ্ছরীর বিশিষ্ট ব্রহ্মই সম্পূর্ণ। দেহবিশিষ্ট জীবাত্মা যেমন শরীর, জীবজগৎ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মও তদ্রূপ শরীরী। আঁটি, শাঁস ও খোলা, তিনে মিলিয়া যেমন ফল; দুইটী বাদ দিয়া কেবল শাঁস রাখিলে যেমন তাহাকে সম্পূর্ণ ফল বলা যায় না; তদ্রূপ জীব, জগৎ ও পরমেশ্বর, এই তিনে মিলিয়া এক এবং ঐ এক বিশিষ্ট এক।

শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম জ্ঞানলভ্য। আর সে জ্ঞান তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদান্ত বাক্য হইতেই জন্মে। জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও নিত্য, তবে বেদান্ত-বাক্য হইতে জ্ঞানোৎপত্তি, ইহার তাৎপর্য্য—অজ্ঞানের নিবৃত্তি মাত্রই বাক্যার্থ হইতে জন্মে, ফলে জ্ঞানই জন্মে। অজ্ঞানের নিবৃত্তিই জ্ঞানলাভ, অজ্ঞান নিবৃত্তি ব্যতীত জ্ঞান লাভ বলিয়া কিছু লাভ হয় না। কারণ স্বর্গাদির মত জ্ঞান প্রাপ্য বস্তু হইলে অনিত্য হইয়া পড়ে, স্বপ্রকাশও বলা যায় না। বেদান্তবাক্য শ্রবণের পর বেদার্থমনন, বেদার্থমননের পর বেদার্থের তদ্গত ভাবে ধ্যান। জগৎ মিথ্যা, এই জ্ঞানই অজ্ঞান। জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞান ভ্রান্তি মাত্র। এই ভ্রান্তিময় জগন্মিথ্যাত্ব জ্ঞানের বিনাশই অজ্ঞান নিবৃত্তি। দেহাদিতে আত্মচৈতন্যের যে অধ্যাস, তাহা অজ্ঞান। এই অবিবেকজাত অজ্ঞান বশে "আমার দেহ" ইত্যাদি অভিমান বশে জীব বদ্ধ হয়, দুঃখ পায়। এই দেহাত্মাভিমানই অজ্ঞান। এই দেহাত্মাভিমান অনাদি কাল ধরিয়া বদ্ধমূল। ইহা দৃঢ়তর সংস্কার রূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই বদ্ধমূল সংস্কারের নাশ, এই আরোপিত দেহাভিমান নিবৃত্তি, এই অজ্ঞানান্ধকার বিদলন বড়ই দুঃসাধ্য। বেদান্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন, এই অজ্ঞানের আত্যন্তিক নাশ। ইহাই আত্মস্বরূপ জ্ঞান বা মোক্ষ। অজ্ঞান নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান প্রাপ্য নহে বলিয়া ফল নহে, তবে ফলের মত। ফলমিব ফলং জ্ঞানং। জ্ঞানই মোক্ষ।

রামানুজ বলেন, ভক্তিরূপাপন্ন উপাসনা দ্বারাই পরমেশ্বর লাভ। পরমেশ্বর লাভই উপাসনার ফল। ইহাই মোক্ষ। সংসারবন্ধনচ্ছেদ ও পরমেশ্বর-সেবাই মোক্ষ। তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যার্থ হইতে উপাসনাত্মক প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিতে পারে না। কারণ বাক্যার্থ প্রত্যক্ষ নহে। এই অপ্রত্যক্ষ বাক্যার্থ হইতে কখনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। বাক্যার্থজ্ঞান জন্মিলে পর ধ্যানের আরম্ভ। ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তের একাকার স্মরণ প্রবাহই ধ্যান। এই ধ্যানই ভাবনা। প্রকর্ষে প্রত্যক্ষদর্শনসমানাকার হইয়া উঠে। তখন প্রত্যক্ষসমানাকারা স্মৃতিসন্ততিই ধ্যান। আর এই স্মৃতিসন্ততি রূপ ধ্যানই ভক্তিরূপাপন্ন উপাসনা। এই উপাসনা দ্বারাই পরমেশ্বর লাভ। "জগৎ মিথ্যা, ইহাই অজ্ঞান" এই যে অদ্বৈতবাদীর কথা, ইহাও ঠিক নহে। জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ প্রতিনিয়ত পরিণামশীল বলিয়া অসৎ বা জড়। অসৎ বা জড় অনিত্য বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া মরুভূমে মরীচিকাবৎ শুক্তিকায় রৌপ্যবৎ মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে। জগতের অনিত্যতার নাম মিথ্যাত্ব—ইহা মানিলে অদ্বৈতবাদীর

মরুভূমে মরীচিকার মত, শুক্তিকায় আরোপিত রজতের মত অজ্ঞানজন্য ভ্রান্তিরূপ মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয় না। দেহাত্মাভিমান অজ্ঞান হউক, কিন্তু ইহার নিবৃত্তি সংসার বন্ধনের উচ্ছেদই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহা মানা যায় না। পরমেশ্বর লাভই প্রয়োজন। অজ্ঞান নিবৃত্তি ব্যতীত পরমেশ্বর প্রাপ্তি স্বতন্ত্র বস্তু। অজ্ঞান নিবৃত্তিই জ্ঞান নহে।

শঙ্কর বলেন—অজ্ঞান জ্ঞানের প্রাগভাব নহে। অজ্ঞান একটী ভাব বস্তু। জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে জ্ঞানের যে অভাব—তাহা জ্ঞানের প্রাগভাব। অজ্ঞান জ্ঞানপ্রাগভাব হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। কারণ জ্ঞান প্রাগভাব—অভাব। অভাবকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু আমিই অজ্ঞ, জ্ঞানহীন—এইরূপে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ঘটে। অতএব "অহং অজ্ঞ" এই প্রকারে প্রত্যক্ষীকৃত অজ্ঞানকে জ্ঞানের অভাব বলা যায় না। অজ্ঞান প্রত্যক্ষীকৃত হইতেছে, অজ্ঞানের কার্য্যও প্রত্যক্ষীকৃত হইতেছে, অতএব অজ্ঞানকে স্বতন্ত্রভাব বস্তু বলিতে হয়। অন্ধকার যেমন আলোকের অভাব হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, অথচ আলোক দ্বারাই বিনাশ্য। অজ্ঞানও তদ্রূপ স্বতন্ত্র বস্তু হইয়াও জ্ঞান বিনাশ্য।

রামানুজ বলেন—অজ্ঞান জ্ঞানের প্রাগভাব। অজ্ঞান একটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। জ্ঞানের উদয়ে যখন অজ্ঞানের বিনাশ, তখন অজ্ঞান জ্ঞান প্রাগভাব হইবে না কেন? অজ্ঞান যখন জ্ঞানের অভাব, বিপরীত জ্ঞান বা অন্যথাজ্ঞান, তখন ইহাকে স্বতন্ত্র বস্তু বলিবার প্রয়োজন নাই। অন্ধকার বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু নাই। আলোকের অভাবই অন্ধকার। অতএব অজ্ঞান যখন জ্ঞান বিনাশ্য, তখন অজ্ঞান জ্ঞানেরই অভাব। নহিলে জ্ঞানের দ্বারা নাশ হইতে পারে না। কারণ কোন ভাব বস্তুই জ্ঞানের বিনাশ্য হইতে দেখা যায় না। অজ্ঞান যদি ভাব বস্তু, তবে জ্ঞান তাহাকে নাশ করিবে কিরূপে? বিশেষ কোন শক্তির সাহায্য না পাইলে জ্ঞানকে যে কোন ভাব বস্তুর বিনাশক হইতে দেখা যায় না। আর শক্তিবিশেষের সাহায্য পাইলে জ্ঞান কেন, অজ্ঞানও ভাব বস্তুর বিনাশক হইতে পারে।

শঙ্কর বলেন—উপাধি পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অণুরূপে আত্মার ব্যবহার করা হয় মাত্র। প্রকৃত জীব ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া মহান্ ব্যাপক। বুদ্ধির গুণ জীবে আরোপিত হয় বলিয়া অণু। অত্যন্ত সূক্ষ্ম, দুর্জ্ঞান বলিয়া অণীয়ান। অণু হইলে সমস্ত শরীরাবচ্ছেদে সুখদুঃখ অনুভব হইত না।

রামানুজ বলেন, জীবাত্মা অণুই। ব্রহ্মই উপাধি পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবাত্মা—ইহা স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদীর নিরুপাধি ব্রহ্মের অসদ্ভাব হইয়া পড়ে। সমস্ত শরীরাবচ্ছেদে সুখ দুঃখ অনুভব হইবার কোন বাধা নাই।

শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও চৈতন্যস্বভাব। জ্ঞান, সত্য, আনন্দ ও চৈতন্য আত্মা বা ব্রহ্মের গুণ নহে। গুণ হইলে আত্মা বা ব্রহ্ম সগুণ হইয়া পড়ে। যাহার গুণ আছে, তাহার গুণের নাশও মানিতে হয়। তাহা হইলে আত্মার অনিত্যত্ব স্বীকার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

রামানুজ বলেন—ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞান-বিশিষ্ট, অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানাকার। সত্য গুণ-সমন্বিত, অসত্য—অনিত্য-সমন্বিত নহেন। চৈতন্যও গুণ। প্রদীপপ্রভা যেমন প্রদীপকে ত্যাগ করিয়া সমস্ত গৃহব্যাপিনী, চৈতন্যগুণও তদ্রূপ।

ব্রহ্ম আনন্দেরও আধার। সত্য,জ্ঞান,আনন্দ ও চৈতন্য—এ গুলি কল্যাণ গুণ, নিত্যগুণ। ব্রহ্ম সগুণ ত বটে। নিত্যগুণ কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। জ্ঞানের দ্বারা নিরূপণ করিতে হয় বলিয়া ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত তিনি জ্ঞানের আধার।

শঙ্কর বলেন—মুক্তি স্বস্বরূপজ্ঞান মাত্র। মুক্তিতে জীবের জীবত্ব উপাধি বিলীন হইয়া ব্রহ্মস্বরূপই অবশিষ্ট থাকে। মুক্তিকালে মুক্তপুরুষের প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না, জীবাত্মায় লীন হয়। ইন্দ্রিয় ও মন প্রাণে মিলাইয়া যায়। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" অত্রৈব সমবনীয়ন্তে প্রাণা"। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাণের উৎক্রান্তি ব্রহ্মলোকগামী সগুণোপাসকের হইয়া থাকে। ব্রহ্মলোকগামী কখন কখন ক্রমমুক্তিলাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। ব্রহ্মের সহিত মুক্তির ক্রমমুক্তি।

রামানুজ বলেন—মুক্তি স্বস্বরূপ জ্ঞান নহে। জীব যখন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, তখন জীবের স্বস্বরূপ জ্ঞানে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? পরমেশ্বর সাযুজ্য লাভই মোক্ষ, ইহা সংসার-বন্ধনচ্ছেদক বটে। মুক্তপুরুষের প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া থাকে,ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্ঞানীর প্রাণ বাহির হয়—ইহাই প্রসিদ্ধ। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" বলিয়া জীবাত্মা হইতেই প্রাণের উৎক্রান্তির নিষেধ; দেহ হইতে নহে। সগুণোপাসক মুক্তির অধিকারী। নির্গুণ ব্রহ্মের গুণ বা আকার না থাকিলে উপাসনাই হইতে পারে না।

শঙ্কর বলেন, "আমি শরীরবিশিষ্ট, এই প্রকার যে দেহাত্মাভিমান—তাহাই অহংজ্ঞান। অহংজ্ঞান ভেদ-বিষয়ক, অধ্যস্ত। অহংজ্ঞানের সাক্ষী পরমাত্মা। পরমাত্মা অহংজ্ঞানের বিষয় নহেন। অবিষয় পরমাত্মা কখনই অহংপ্রত্যয়ের বিষয় হইতে পারেন না। মুক্তিকালে এই অহংজ্ঞান—দেহাত্মাভিমান থাকে না, তবে বিশুদ্ধ ভেদলেশ-বর্জ্জিত "অহংব্রহ্ম" আমি বিশুদ্ধ আত্মা—এইরূপ বিশুদ্ধ অহংজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। বিশুদ্ধ অহংজ্ঞানই আত্মজ্ঞান। আমাদের অহংজ্ঞান অবিশুদ্ধ, কারণ শরীর, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও অবিদ্যা—এই সকলের সহযোগে উৎপন্ন এই অহংজ্ঞান মুক্তিকালে থাকিতে পারে না। আমাদের এই অহংজ্ঞান অহঙ্কার, ইহা আত্মার স্বরূপ নহে।

রামানুজ বলেন—আত্মা অহং প্রত্যয়েরই বিষয়। মুক্তিকালে এই অহংজ্ঞানও বিদ্যমান থাকে। যদি মুক্তিতে এই অহংজ্ঞান না থাকিবে, তবে জীবের জীবত্বই নষ্ট হইয়া যাইবে; তাহা হইলে এই অহংজ্ঞান নাশরূপ মোক্ষ কে চাহিবে? আত্মবিনাশ কাহারও আকাঙ্ক্ষনীয় হইতে পারে না। আমিই যদি না থাকিলাম, তবে মোক্ষে আমার উপকার কি? মুক্তিতে বরং অহংজ্ঞানের প্রাবল্য দেখা যায়। বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্ট অবিশুদ্ধ আত্মা মুক্তিকালে না থাকিলেও বিশুদ্ধ অহংপ্রত্যয় যদি থাকে, তবে অহংজ্ঞান রহিল না কৈ? আমিই মনু, আমিই সূর্য্য ছিলাম—এই প্রকারে অহংপদার্থেরই অনুবৃত্তি মুক্তপুরুষে দেখা যায়। অহংজ্ঞানের বিষয় যদি আত্মা নহেন, তবে আত্মাকে নির্ব্বিষয় বলিতে হয়। আত্মা সবিষয়, নির্ব্বিষয় নহে। নির্ব্বিষয় কোন প্রমাণেরই বিষয় হইতে পারে না। যাহা কোন প্রমাণের বিষয়ই নহে, তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? নির্ব্বিষয় হইলে আকাশকুসুমের মত তুচ্ছ হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ "অহং"ই আত্মার স্বরূপ।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও গোরক্ষা

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা ভিন্ন হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিতই হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা ত দূরের কথা, বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম যাহাতে চূর্ণ হইয়া একাকার হয়, তজ্জন্যই কতকগুলি লোকের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ চতুর্ব্বর্ণের ঘোর বিরোধী। তাঁহারা বঙ্গে ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই বলিতে বদ্ধপরিকর। অথচ তাঁহারাই চতুর্ব্বর্ণ সমাজের ফলভোগ করিতে প্রয়াসী। বিগত কালীঘাটের ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীতে একটী প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাবটী এই—ব্রাহ্মণগণ অবশ্য-বর্ত্তব্য-জ্ঞানে গোপালন করিবেন। এই প্রস্তাব দেখিয়া আমরা ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর বিচারশীলতার সম্পূর্ণ অভাব দেখিতে পাইলাম। কারণ চতুর্ব্বর্ণহীন ব্রাহ্মণ-শূদ্রের সমাজে প্রকৃত গোপালন অসম্ভব। ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমান অবস্থায় গোপালন ব্রতী হইলে তাঁহাদের দুগ্ধের সংস্থান হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে গোরক্ষা হইবে না। গোরক্ষার জন্য বৈশ্য সমাজের আবশ্যক। যে সমাজে বৈশ্য নাই, সেই সমাজে গোপালন চলিতে পারে না। গোরক্ষার জন্য বৈশ্য সমাজের অত্যাবশ্যক, যদি হিন্দু ধর্ম্ম রাখিতে হয়, তবে বৈশ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যাঁহারা বৈশ্য সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছে, সমাজের কল্যাণার্থ তাঁহাদিগকে উন্নত করিয়া বৈশ্যসমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নতুবা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না; গোবংশ ধ্বংসের মুখে ধাবিত হইবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রাহ্মণগণ গোপালন করিয়া পাপভাগী হইতেছেন। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে তাঁহাদিগের গোপালন পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ গোপালনে পাপগ্রস্ত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অনিবার্য্য। মনে করুন, একজন গরীব ব্রাহ্মণ একটী গাভী প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সেই গাভীর একটী এঁড়ে বাছুর হইল। বাছুরটী বড় হইলে ব্রাহ্মণ আর এড়ে প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হন না। অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং এড়ের উগ্রতা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা। তখন তিনি বাধ্য হইয়া গো-হন্তার নিকট বা গোমুষ্কছেদনকারীর নিকট এঁড়ে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন। গো-হন্তাকে বা গোমুষ্কছেদনকারীর নিকট গো বিক্রয় মহাপাপ। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ গোপালনে পাপগ্রস্ত হইবেন মাত্র। কোন হিন্দুকৃষক এঁড়ে ক্রয় করে না। কারণ সেও চিরদিন এঁড়ে প্রতিপালন করিবে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই গোমুষ্ক-ছেদনকারীকে বিক্রয় করিবে। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ কি করিয়া নিষ্পাপভাবে গোপালন করিতে পারেন? যদি ব্রাহ্মণগণ মিলিতভাবে বঙ্গে বৈশ্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা ও নিয়মিত করিতে পারেন, তবে একদিন ব্রাহ্মণকে গোপালন বিধান দিতে পারেন। বৈশ্যসমাজের কর্ত্তব্য হইবে, আমরণ গো প্রতিপালন করা। গো-ঘাতক বা গোমুষ্ক-ছেদনকারীকে গো বিক্রয় করিতে পারিবে না, ছিন্নশুষ্ক বৃষের দ্বারা চাষ আবাদ করিতে পারিবে না। ঐরূপ বৃষ দ্বারা চাষ

আবাদ করান হইলে মুষ্ক-ছেদনের অনুমোদন করা হয়। অনুমন্তা ও কর্ত্তা সমপাপী বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে। বর্ত্তমানে এই পাপে ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বৈশ্য ও অন্যান্য শ্রেণীসমভাবে পাপী। সুতরাং ভ্রষ্ট হিন্দু-সমাজকে সুসংস্কৃত করিতে হইলে চতুর্ব্বর্ণ সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। মাহিষ্য, সদ্গোপ প্রভৃতিকে বৈশ্যোচিত অধিকার দিউন এবং তাঁহাদিগকে যথাশাস্ত্র কৃষিবাণিজ্য গোপালনে নিযুক্ত করুন। যিনি যথাশাস্ত্র গোপালনে পরাঙ্মুখ হইবেন, তিনি বৈশ্যসমাজ-ভ্রষ্ট হইবেন, যে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ যথাশাস্ত্র গোপালন না করিবেন, অর্থাৎ অশক্ত গো বা কৃষক গোহন্তা বা গোমুষ্ক-ছেদনকারীকে বিক্রয় করিবেন, তিনি সমাজ-চ্যুত হইবেন, এই ব্যবস্থা হইলে গোরক্ষা হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মও রক্ষা পায়।

হিন্দুসমাজের লোকে মুসলমান বা খ্রীষ্টানের গরুর গলায় ছুরী দেওয়াকেই গোহত্যা বলেন। কিন্তু হিন্দুগণ যে শনৈঃ শনৈঃ গোহত্যা করিতেছেন, তাহা কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে না। গো-বিনাশের প্রথম কারণ নিষ্ঠুর গোদোহন। দুগ্ধের দুর্ম্মূল্যতা এবং দুগ্ধের অতি লোভ বশতঃ নবজাত বৎসের বয়স পঞ্চদশ দিবস অতীত না হইতেই নিষ্ঠুরভাবে হিন্দুগণ গো দোহন করিতে থাকেন, আবার বাছুরটী হৃষ্টপুষ্ট না হইতেই বিকাল বেলাও তাহাকে মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা হয়। এইরূপ নিষ্ঠুর দোহনে বৎসগুলি জীবন্মৃত হইয়া যায়। কার্ত্তিক-মাসে ঘাসের কষ্টের সময় নাড়ীমড়া হইয়া অধিকাংশ বাছুর মরিয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বৃষ দ্বারা গোবৎসোৎপাদন। বঙ্গদেশে বৃষোৎসর্গের বৃষগুলি প্রায়ই গোঘাতকের হস্তে বিনষ্ট হইতেছে। পূর্ণ-বয়স্ক বৃষ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, সদ্গোপ কোন জাতিই আমরণ বৃষ প্রতিপালন করে না। অপূর্ণবয়স্ক বৃষ দ্বারা গাভীর উৎকর্ষ দেখান হয়। এইরূপ অপুষ্টবীর্য্য বৃষ দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে গোগণ দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় হইয়া পড়িতেছে; বঙ্গদেশে বিগত পঞ্চাদশ বৎসরের মধ্যে গরু এত দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় হইয়া পড়িতেছে যে, বঙ্গদেশের বৃষ দ্বারা আর এক্ষণে কৃষিকার্য্য চলে না। পশ্চিমে গরু ভিন্ন আর চাষের কার্য্য চলিতেছে না। গাভীগণও স্বল্পক্ষীরা হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে গোবংশ ক্রমে নির্ম্মূল হইতে চলিয়াছে। যদি বঙ্গে কৃষি রক্ষা করিতে হয়, তবে নিষ্ঠুর গো-দোহন প্রথা রহিত ও গোবীর্য্য সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক। গোমুষ্ক-ছেদন এইভাবে অনবরত চলিলে পরিণামে বৃষগণ মার্জ্জারের আকৃতি প্রাপ্ত হইবে।

অনেকে বলেন, বৃষের মুষ্ক ছেদন না করিলে তদ্দ্বারা চাষ আবাদের কার্য্য ভাল চলিবে না। বৃষের উগ্রতা অসহনীয় হইবে। আমরা বলি, তাহাদের নাসা বিদ্ধ করিয়া রজ্জুবদ্ধ করিলে অনায়াসেই তাহাদের উগ্রতা নিবারিত হইবে। ছিন্নমুষ্ক বৃষ অপেক্ষা যে সবৃষণ বৃষ দুর্ব্বল ও কার্য্যে অক্ষম হইবে, অমাদের সে বিশ্বাস নাই। বৃষের মুষ্ক ছেদন নিবারিত হইলে কৃষিকর্ম্মও চলিবে, পুষ্টবীর্য্য বৎসোৎপাদক বৃষও যত্র তত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, মিঃ ঘশোওয়ালা ভারতে গোবধ-নিবারণকল্পে গোরা সৈনিকদিগের জন্য অষ্ট্রেলিয়া হইতে গোমাংস আনয়নের যুক্তি দিয়াছিলেন।

সে দেশে নাকি অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ গরুকে গুলি করিয়া মারা হয়। এই কথা শুনিয়া অনেকেই বিস্মিত হইবেন; কিন্তু যদি তাঁহারা দেশের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করেন, তবে ইহাতে তাঁহাদের বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। প্রতিবৎসর সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ অঞ্চলে অসংখ্য অকর্ম্মণ্য গোবধ হইতেছে। এতদ্দেশের পাইকার নামধারী মুসলমানগণ ১।০ হইতে ৫৲ মূল্যে বৃদ্ধ ও রুগ্ন গরু খরিদ করিয়া পূর্ব্বদেশে চালান দেয়। পদ্মানদীর খেয়াঘাটে আমরা প্রতিনিয়ত এইরূপ দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ গরু পার করিতে দেখি। এই সমস্ত অক্ষম গরুর কতকগুলি পথেই মারা যায়, কতক ময়মনসিংহ অঞ্চলে বা তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী অঞ্চলে প্রাণে প্রাণে উপস্থিত হয়। সেখানে পাইকারগণ অনেক বেশী মূল্য প্রাপ্ত হয়। শুনিয়াছি, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহের কসাইগণ ঐ সকল গরু বেশী মূল্যে খরিদ করে, চামড়ার মূল্যেই তাহাদের লাভ হয়, মাংস ফাউমাত্র। এই অবাধ গো-হত্যা আমাদের চক্ষের উপর চলিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার গুলি করিয়া হত্যা ও এই হত্যা একই প্রকারের। এই হত্যার ব্যাপারে বহু হিন্দুসন্তানও পরোক্ষভাবে লিপ্ত। অনেক হিন্দুর পাল হইতে পাইকারগণ এই সকল বৃদ্ধ ও রুগ্ন গরু ক্রয় করে। পাটুনিগণ এই সকল নদী পার করিয়া দেয়। সুতরাং হিন্দুগণ গো-হত্যার সাহায্যকারী। যদি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয়, তবে এই সকল কৃতঘ্ন হিন্দুসন্তানগণকে গোহন্তাকে গো বিক্রয় বন্ধ করিতে হয়।

এইরূপ গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের যদি ক্ষমতা থাকে, তবে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রাধান্য মানি, কায়স্থ-সমাজের গৌরব করি, মাহিষ্য সমিতির গুরুত্ব অনুভব করি, নতুবা ঐ সকল সমিতি আত্মাভিমান চরিতার্থ করিবার সমিতি মাত্র।

বর্ত্তমান হিন্দুজাতির উন্নতি না হইবার সর্ব্বপ্রধান দুইটী কারণ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে একটী রক্ষণশীলগণের দেশাচার-রূপ সঙ্কীর্ণপ্রথা এবং অপরটী পাশ্চাত্য স্রোতে ভাসমান উদারচেতাগণের উচ্ছৃঙ্খলতা। এই দুইটীই আমাদিগের ডুবিয়া মরিবার স্বখাদ-সলিল। এই প্রচলনদ্বয়ের সহিত হিন্দুধর্ম্মের কোন সম্বন্ধই নাই।

কেবল কতকগুলি স্বার্থপরতার নিদর্শনস্বরূপ দেশাচারের দ্বারা এই জাতি বহু দিন হইতে শাসিত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মের দ্বারা শাসিত হইলে এই ভারতবর্ষ আজ বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া মরণোন্মুখ হইত না, ইহা অখণ্ডমণ্ডলাকাররূপেই বিরাজ করিত—একতা ইহার মূলমন্ত্র হইত, বসুধা ইহার পদানত হইত। দেশাচাররূপ সঙ্কীর্ণতাই এই জাতিকে প্রথম মেরুদণ্ড-হীন করিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণতারূপ মলিনতা, এই দেশাচারের চড়া একদিনে পড়ে নাই। তিল তিল করিয়া, বিন্দু বিন্দু করিয়া হিন্দুধর্ম্মের ভরা নদীবক্ষে ইহা পুঞ্জীভূত, ঘনীভূত এবং সঞ্চিত হইয়াছিল। তাহার পর একমাত্র দেশাচারই হিন্দুর ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই অদ্ভুত দেশাচারের সহিত প্রকৃত হিন্দুত্বের কোন যোগই ত দেখিতে পাই না। দেশাচার ত পরিবর্ত্তনশীল সময়োপযোগী বিধি, ইহার প্রবর্ত্তক কতকগুলা অপরিণামদর্শী স্বার্থপর কাণ্ডজ্ঞানহীন মানব, যাহারা অম্লানবদনে অনায়াসে নস্য লইতে লইতে বলিতে পারে, “হীনং দূষয়তীতি হিন্দুঃ”। হিন্দুশব্দের এইরূপ যাঁহারা অর্থ করিয়া থাকে, তাহারা এই অনাথ হিন্দুধর্ম্মের উপর কি না করিতে পারে? দেশশত্রু, জাতীয়শত্রু, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে এই সব স্মৃতিচঞ্চু নস্যগ্রাহীর দল, দেবীবর ঘটকের দল। সর্ব্বপ্রথম ইহারাই কুমন্ত্রণা দ্বারা এই বিরাট হিন্দুজাতিকে অধঃপাতে দিয়াছে। হিন্দু শব্দটীর অর্থ অন্বেষণ করিতে হইলে অমরকোষ অভিধানের কুত্রাপি মিলিবে না, মোল্লার দরগায় দৌড়াইতে হইবে। মোল্লা তাঁহার পারসী অভিধান খুলিয়া বলিবেন,—হিন্দুর অর্থ “জালিয়াত, যাদুকর” ইত্যাদি।

আর আমরাও এমনি অপদার্থ যে, মুসলমান প্রদত্ত এই নামটীকেই একদিন শিরোধার্য্য করিয়াছিলাম, আজিও করিতেছি। “দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা!”—ইহা অম্লানবদনে উচ্চারণ করিতে পারে, আমরা

ত সেই জাতি! এখন আর সেই মুসলমানের তলোয়ারের আমল নাই। তাই আমাদিগের পূজ্যপাদ চূড়ামণি মহাশয়েরা "হীনং দূষয়তীতি হিন্দুঃ"—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া মহা সত্যবাদিতার পরিচয় প্রদান করেন।

হিন্দু শব্দটীতে যেমন গলদ, হিন্দুধর্ম্ম বলিতেও আমরা তেমনি গলদ দেখিতে পাই। আমাদের হিন্দুধর্ম্ম যে কি, তাহার সদুত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। হিন্দুধর্ম্ম বলিতে যেন কতকগুলা স্মৃতিচঞ্চু অনুমোদিত বিধি নিয়মকেই বুঝায়। বর্ত্তমান পণ-প্রথা—তাহাও যেন হিন্দুধর্ম্মের অবশ্য-প্রতিপাল্য ব্যাপার! পণ না দিলে যেন চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হইয়া যাইবে! কেবল কতকগুলা জঘন্য প্রথাই যদি হিগৃধর্ম্মের যথাসর্ব্বস্ব হয়, তাহা হইলে এই হিন্দুজাতি যত শীঘ্র ধরাবক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ততই মঙ্গল। অর্থ দিলেই যদি হিন্দুধর্ম্ম বজায় থাকে, তবে আর কেন ওই অগাধ শাস্ত্ররাশির দোহাই দাও, বেদগীতা ষড়দর্শনের দোহাই দাও? এখনও হিন্দুর যাহা কিছু আছে, টিকি, পৈতা, গায়ত্রী বা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি সব কর্ম্মনাশায় ও কীর্ত্তিনাশায় ফেলিয়া দাও! কালধর্ম্মে ভাসিয়া যাও, কলির ধর্ম্মে ভাসিয়া চল। হইবেও তাহাই, হইতেছেও তাহাই। যেদিন হইতে ব্রাহ্মণ ছিন্নমস্তার ন্যায় নিজের রুধির নিজেই পান করিয়াছে, সে দিন হইতে হিন্দুর আশা ভরসা চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে। তবুও আমরা এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রত্যাবর্ত্তনপ্রিয়, পুনর্জ্জন্মবিশ্বাসী জাতি, আশা একেবারে আমরা ছাড়িতে পারি না, তাই আবার সেই পুরাতনকে নূতনরূপে দেখিতে চাই। আজিকার নড়িখোলা হয়ত কোন সুদূর ভবিষ্যতে অকুলপদ্মায় পরিণত হইতে পারে—আজিকার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ হয়ত কালে সমগ্র ভারতকে পবিত্র হোমকুণ্ডে পরিণত করিতে পারে।

একদিকে যেমন রক্ষণশীলদলের এই অচলায়তন, চারিদিকেই প্রাচীর, দেশাচারের কারাগার, অন্যদিকে তেমনি কালাপাহাড়গণের হিন্দুধর্ম্মের যথাসর্ব্বস্ব ভাঙ্গিবার চেষ্টা! তাহার ফলে শূন্যবাদ, ব্যভিচার, জাতির নৈতিক অবনতি। একদিকে অহিফেনের মৌতাত, অন্যদিকে মদ্যের উন্মত্ততা, একদিকে হিন্দু সমাজের উত্থান-শক্তি-রহিত বহু দিনের ব্যাতব্যাধি, অন্যদিকে পাশ্চাত্য-সভ্যতা-সংক্রামিত উপদংশ। পুরাতন বহু দিন হইতে বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছেন, নূতন পাশ্চাত্য সংসর্গে উপদংশ রূপ নূতন উপসর্গের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। তাহার পর উপযুক্ত চিকিৎসকেরও দারুণ অভাব, সুগৃহিণীরও অভাব!

চিকিৎসক কে? অর্থাৎ যিনি অবতার হইয়া এই বিষম ধর্ম্মের গ্লানি হইতে রক্ষা করিবেন। বর্ত্তমানে তাহারও সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। যখন Super man আসেন, তখন দলবল লইয়া আসেন। চৈতন্য একা আসেন নাই, সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া আসিয়াছিলেন। অবতার অবতীর্ণ হইবার এ সময় নয়, এখন যে আমরা ভাটার টানে ভাসিয়া ক্রমশঃই নিম্নগামী হইতেছি। ঐকান্তিক অভাব না হইলে অবতারের সম্ভাবনা নাই।

হিন্দুধর্ম্ম সুগৃহিণী-স্বরূপ। যাহার পেটে যেমনটী হজম হয়, আমাদিগের এই ধর্ম্মজননীও অধিকারী ভেদে তেমনটী মুখের কাছে আনিয়া ধরেন! কিন্তু আমরা যে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, তাই আমরা মায়ের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াও সেই সদানন্দময়ী স্নেহময়ী জননীর স্তনযুগল হাত্‌ড়াইয়া পাই না। চক্ষু থাকিতে অন্ধ বলিয়াইত আমাদের জাগা ঘরে চুরি হইয়া যাইতেছে। আমরা নকলে ভুলিতেছি, মায়ের আসল বাণী "বীরবাণী" "দেববাণী" ধরিতে পারিতেছিনা। আমাদের শ্যামা মাকে ধরিতে পরিতেছিনা।

"কেন মা তোর পাগলিনীর বেশ?
রাজার নন্দিনী হয়ে শ্মশানে প্রবেশ।"

ইহাই যেন কে চক্ষের অলক্ষ্যে মনের অজ্ঞাতসারে বলিয়া দিতেছে।

কোথায় সে শঙ্কর, যাঁহার জ্বলন্ত দীপ্ত তেজ, ত্যাগ-মন্ত্রে এই ভারতবর্ষ হইতে বিষম নাস্তিকতার ভূত পলাইয়াছিল? কোথায় সে চৈতন্য, যিনি পতিতকে কোলে করিয়া বিষম দেশাচারকে সায়েস্তা করিয়া দিয়াছিলেন? কোথায় সে বিবেকানন্দ, যিনি হিন্দু ধর্ম্মের

সনাতনী মহিমা জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ?

চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, কঠিন দেশাচারের পদদলন হইতে পতিত জনকে হিন্দু ধর্ম্মের ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার জন্য। বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন, পৃথিবীর অপরাপর জাতির নিকট হিন্দু ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য ঘোষিত করিবার জন্য। সমগ্র ভারতবাসী, দীন দঃখী ভারতবাসী যে আমাদেরই ভাই, ইহাই আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য, ভারতবাসী যে Red Indian বা কাফ্রীর জাতি নহে, ইহাই জগৎকে দেখাইবার জন্য। শঙ্কর, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, এই ত্রিশক্তির একত্রে আবির্ভাবের বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রের শাসন, আচণ্ডালে প্রেম এবং দেশ বিদেশে প্রচার, এই তিনটী উপায় দ্বারা আবার এই হিন্দু জাতির জড়দেহে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে, সনাতন হিন্দু সভ্যতাকে সকল সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় করিতে হইবে, হিন্দু জাতিকে সকল জাতির জগৎগুরু করিতে হইবে।

ইহা পাগলের প্রলাপ নহে। ইহা হইতেই হইবে। হিন্দুর শাস্ত্র-জলধি নিরর্থক হইয়া আসে নাই। আজিও এই হিমাচল সমুন্নত, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী প্রবাহিত, ভারতবর্ষের কেন্দ্রে কেন্দ্রে বহু তপস্যার সঞ্চয় হইতেছে। একদিন ভারতের পবিত্র হোমধূমে সমগ্র জগৎ যে আচ্ছন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। Light from the east once more, ইহাই ত যথার্থ জ্ঞান-পিপাসু পাশ্চাত্য মনীষিগণের চিরাকাঙ্ক্ষিত বাণী। পাশ্চাত্য জগতের ভোগধর্ম্মের লয় হইলেই পূর্ব্ব গগনে ত্যাগের নব রবিচ্ছটা জ্বলিয়া উঠিবে। সেই জ্ঞানখড়্গে ভারতবর্ষের মহান্ যজ্ঞস্থলে সঙ্কীর্ণতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতারূপ দুইটী অজ্ঞান মহিষাসুর দ্বিখণ্ডিত হইবেই। আর এই মহা বিনাশের পর-মুহূর্ত্তেই মায়ের অমল মূর্ত্তি মেঘমুক্ত শশীর ন্যায় আবার ভারত-গগন আলোকিত করিবে, তাহাতে ভারতবাসী হিন্দু জাতির চক্ষু খুলিয়া যাইবে। সেই প্রত্যাবর্ত্তনের দিন কবে আসিবে, যে দিন হিন্দু হিন্দুর স্বরূপকে ধরিতে পারিবে ? ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই যে, পরিবর্ত্তন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নহে, প্রত্যাবর্ত্তনই আমাদিগের উদ্দেশ্য। যাহা হারাইয়াছি, তাহা ফিরিয়া পাওয়াই আমাদিগের অভিপ্রেত। বাহিরের নূতনকে আমরা চাহিনা, আমাদিগের ঘরের পুরাতনেরই নূতন মূর্ত্তি আমরা দেখিতে চাই, সেই শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা চিরসচ্ছলতার, চির নবীনতার কল্যাণ মূর্ত্তি আমরা আবার প্রতি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। সেই ভুবনমোহিনী মাতৃমূর্ত্তিকে যেন আর না ভুলি, আর না হারাই, বিমাতার কুহকে পড়িয়া যেন আসল মাকে ত্যাগ করিয়া দূরে না থাকি, ইহাই যেন আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য হয়।

নারীজাতীর সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষাদীক্ষার প্রতি উদাসীনতা ও উপেক্ষা দেখাইয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ দিন দিন কিরূপ অধঃপতনের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে, পৃথিবীর সভ্যজাতি মাত্রই আজ তাহা দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতেছেন। যে হিন্দু সমাজের গৃহে গৃহে একদিন বিদুষী মহিলারা বিরাজ করিতেন, আজ সে হিন্দু সমাজে সহস্র গৃহ খুঁজিয়াও একটী বিদুষী মহিলা বাহির করা সুকঠিন! যে হিন্দু শাস্ত্র "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" বলিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে ব্যবস্থা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সে হিন্দুসমাজ আজ কেবল মাত্র বালকগণের শিক্ষাদীক্ষা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত! বর্ত্তমান যুগের মোহান্ধ হিন্দুজাতি আজ একথা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না যে, এক পায়ের উপর নির্ভর করিয়া পথ চলা অসম্ভব। পঙ্গু হইয়া গিরি উল্লঙ্ঘনচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। যদি পথ চলিতে হয়, তবে দুই পায়ের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। যদি পর্ব্বত অতিক্রম করিবার বাসনা থাকে, তবে এক পদের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না—আমাদিগকে দুই পদের উপর নির্ভর করিয়াই দাঁড়াইতে হইবে। সমাজের বালক বালিকা উভয়কেই সর্ব্বাঙ্গীণ সুশিক্ষা দান করিতে হইবে।

অশিক্ষিতা নারী লইয়া সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করা কিরূপ অশান্তিকর ব্যাপার, বর্ত্তমান সময়ে

অনেক শিক্ষিত লোকই একথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। পুরুষ বাহিরের কর্ম্ম-কোলাহল ও জীবন-যুদ্ধের বিভীষিকায় সমস্ত দিন ব্যাপৃত রহিয়া গৃহে আসিয়াও যদি একটুকু আনন্দ ও শান্তি না পান, তবে তাঁহার জীবন বস্তুতঃই বিড়ম্বনাময়। নারীগণের প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ হিন্দু-পরিবার আজ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও যদি আমাদের চক্ষু না ফোটে, তবে বুঝিব, ধ্বংসই আমাদের গন্তব্য স্থল। পৃথিবীর যে কোন উন্নত জাতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, দেখিতে পাই, নারীজাতির উন্নতিই তাহার মূল। সত্য বটে নারী জাতি গৃহকর্ম্ম ও সন্তান-পালনেরই অধিকারিণী; কিন্তু একথাও ঠিক যে, শিক্ষা ব্যতীত এই দুইয়ের কোন কার্য্যই সুসাধিত হইতে পারে না। নারী শুধু ভোগ সুখের ক্রীড়াপুত্তলি নহে,—নারীই মনুষ্য সমাজের ভাগ্য-বিধাত্রী,—নারীই মনুষ্য সমাজের প্রাণ,—নারীর ক্রিয়াতেই মনুষ্য জীবিত ও অনুপ্রাণিত। অতএব দেখা যায়,নারীর শিক্ষাদীক্ষা কিছুতেই উপেক্ষার বস্তু নহে। বাল্যে নারী যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষার মধ্যে বর্দ্ধিত হন, উত্তরকালে অবশ্যম্ভাবী রূপে সমাজ তাহারই ফলভোগ করে। এহেন নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা-বিধানের ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। উহার অন্যথাচরণ কেবল পাপ নহে,—উহা আমাদের ভাগ্যবিধাতার এক তীব্র অভিশাপ।

মনুষ্যসমাজ কতকগুলি নরনারীর সমষ্টি মাত্র। সমাজের প্রকৃত উন্নতি বা অভ্যুদয় নরনারীর শিক্ষাদীক্ষার উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে। পৃথিবীর সকল সমাজের সম্বন্ধেই এই একই কথা প্রযুজ্য। সমাজের কি স্ত্রী, কি পুরুষ, দুই-ই সর্ব্বাংশে শিক্ষিত না হইলে কোন সমাজই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে পারে না। সমাজের ভবিষ্যৎ আশাভরসা-স্থল শিশুগণের প্রাথমিক শিক্ষা ও চরিত্রগঠন সম্পূর্ণরূপে নারীদিগের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং নারীগণের শিক্ষা কোন প্রকারেই উপেক্ষণীয় নহে।

যে নারী জাতি শিশুগণের শৈশব দোলা দোলাইয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার কালে শিশুর পরিণত শক্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সমাজ-শক্তি নিয়ন্ত্রিত করেন। সুতরাং নারীর দায়িত্ব কেবল সহজ নহে। কেবল মাত্র নারীজাতিই ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের শুভাশুভ বিধানে সক্ষম, অপরে নহে। মানবের চরিত্র গঠন কার্য্যে নারীর প্রভাব অতুলনীয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মহাপুরুষগণের অতীত জীবনের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাই,—তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা বা অপর কোন সদাশয় মহিলার শুভ সংস্পর্শে আসিয়াই জীবনে উন্নত হইয়াছেন। একমাত্র সাধ্বী ও শিক্ষিতা মহিলারাই মহাপুরুষগণের জনয়িত্রী বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিতা হইয়াছেন। কৌশল্যা ব্যতীত আর কয় জন নারী রামচন্দ্রের মত পুত্রধনে অধিকারিণী হইয়াছেন? শচীদেবী ব্যতীত আর কয়টী মহিলা চৈতন্যের ন্যায় পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন? মহাপ্রাণা মেরী ব্যতীত আর কয়টী রমণী যিশুর ন্যায় অপূর্ব্ব ধনের অধিকারিণী হইয়াছেন? সুতরাং দেখা যায়, সমাজে নারীচরিত্রের প্রভাব অসাধারণ। নারীর শিক্ষাদীক্ষার উপরই সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে।

যদিও আমি এই প্রবন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে বিশেষ পরিচিত বাবু অকিঞ্চন দাস ও হাবাসপুর-নিবাসী বাবু সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাসের লেখা হইতে ভাব ও কতক কতক অংশ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু ইহা আমাদের সামাজিক গঠনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে যে, ঋষি ও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করা আজকাল বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। তাহা না করিলে, বর্ত্তমান যুগের "জীবন-সংগ্রামে" বিলয় প্রাপ্ত হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলা বিশেষ আবশ্যক। বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, দেশাচার ও লোকাচার পর পর প্রতিপাল্য। তাহার বহু ঋষিবাক্য আমাদের শাস্ত্র-মহোদধি মন্থন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ বলেন যে, কি লৌকিক, কি পারলৌকিক, উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মই অবলম্বনীয়, শাস্ত্রের বিধান না পাইলে শিষ্টাচার প্রমাণ। বেদ-

ব্যাস মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদের পক্ষে বেদ সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ এবং সর্ব্বশেষে লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য করেন, সেই ব্যক্তি কদাচ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, অথবা সুখ বা মোক্ষও প্রাপ্ত হয় না। যথায় বেদে বা স্মৃতিতে (বা পুরাণে) স্পষ্ট নিষেধ বা সাক্ষাৎ বিধি নাই, সে বিষয়ে দেশাচার ও কুলাচার দ্বারা ধর্ম্মনিরূপণ করিবে। সেই জন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে, ইহা কার্য্য ও ইহা অকার্য্য; এইরূপ ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ। এই জন্য ধর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমান থাকিয়া শাস্ত্র-বিধানোক্ত জানিয়া কার্য্য কর এবং এই ভগবান-বাক্যের পোষকতায় প্রয়াগ-পারিজাত নামক স্মৃতি গ্রন্থে দেখা যায় যে, বেদের সহিত স্মৃতির বিরোধ ঘটিলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ, স্মৃতি এবং লোকাচার বা দেশাচারে বিরোধ ঘটিলে দেশাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। এবং এই জন্য মনু দ্বাদশ অধ্যায়ের ১০৮ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্র বা বেদে কোন বিধি না থাকিলে সেরূপ স্থলে শিষ্ট ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিবেন, তাহাই শঙ্কাহীন ধর্ম্মস্বরূপ। মনুর অনুশাসন সমর্থন করিয়া কলির নেতা পরাশর তাঁহার স্মৃতির ৮ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, বেদসংহিতা পুরাণাদি-শাস্ত্রজ্ঞ চারিজন বা তিন জন যাহা বলিয়া থাকেন, তাহাই ধর্ম্ম; অনভিজ্ঞ সহস্র লোকের বাক্য ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদির পর রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান আদর্শ। আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও গার্হস্থ্য জীবনের অনুশাসন বিধি অনেকই এই মহাভারত বা রামায়ণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেই জন্য এই অতুলনীয় পুস্তকদ্বয় আমাদের এত আদরের জিনিষ।

হিন্দুর চিরারাধ্য সনাতন গ্রন্থদ্বয়—রামায়ণ ও মহাভারত। এই গ্রন্থদ্বয়ের ন্যায় মানব চরিত্রের এমন অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ বুঝি আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। যে হিসাবেই গ্রহণ কর, ঐতিহাসিক হিসাবেই গ্রহণ কর, আর গল্প হিসাবেই গ্রহণ কর, এমন উপদেশপূর্ণ, অভিজ্ঞতাপূর্ণ কাহিনী এক ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করে নাই; "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে"। এই ভারতই যে জগৎ! বাস্তবিকই এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। কান্তাবাণীচ্ছলে বাল্মীকি ও বেদব্যাস রামায়ণ ও মহাভারতে জ্ঞানের কত গহন কথাই না বর্ণনা করিয়াছেন!

বর্ত্তমান যুগের উন্মার্গগামী উদীয়মানগণ মহাভারত ও রামায়ণের নামে নাসিকাকুঞ্চন করেন বটে, কিন্তু মহাভারত ও রামায়ণের উপর যে হিন্দুর হিন্দুত্ব ও পূর্ণজীবন নির্ভর করিতেছে, তাহা কয় জনে তলাইয়া বুঝে? মহাভারত ও রামায়ণ, আমাদিগের জাতীয় জীবন গঠনের দুইটা উপাদান, আমাদিগের পূর্ব্ব গৌরব প্রবুদ্ধ করিবার দুইটা দ্বার স্বরূপ! মহাভারত ও রামায়ণ আমাদিগের যেন দুইটী দিব্য চক্ষু বিশেষ! এই গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্যে আমরা কি অতীত, কি বর্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ, অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণের ন্যায় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারি। রামায়ণ ও মহাভারতের জ্ঞানগর্ভে যে তত্ত্ব সমূহ স্বপ্নের আকারে এত দিন প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ তাহা সত্যের আকার ধারণ করিতেছে। যে বাল্মীকি অভূতপূর্ব্ব মনীষা ও প্রতিভা-বলে রাম না হইতেই রামায়ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে বেদব্যাস বর্ত্তমান যুগের ইউরোপীয় কুরুক্ষেত্রের ছবি কোন অতীতযুগে ভারতীয় কুরুক্ষেত্রে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন, সেই ত্রিকালদর্শী মহাত্মাগণের রচিত রামায়ণ, মহাভারত কি কেবলই কল্পনার সামগ্রী!

আজ যদি সমগ্র হিন্দু জাতি রামায়ণী ও মহাভারতীয় আদর্শে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিত, তাহা হইলে এরূপ দৈন্য ও জড়তায় হিন্দুর জীবন-যাত্রা প্রবাহিত হইত না। তাহা হইলে স্বর্ণ-প্রসবিনী ভারতভূমি এরূপ দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টা শ্মশান-ভূমে পরিণত হইত না।

হিন্দুর অধঃপতনের আরম্ভ এক দিনে হয় নাই—হিন্দুর অধঃপতনের আনুপূর্ব্বিক একটা ধারা বহিয়া গিয়াছে। তিল তিল করিয়া হিন্দুর ধ্বংসাবলী আজি এক মহা সর্ব্বতাকারে

পরিণত হইয়াছে। সেই অধঃপতনের সূচনা আমরা রামায়ণী যুগ হইতেই দেখিতে পাই।

রামায়ণ ও মহাভারত সৃষ্টি হইয়াছিল কেন? যে বিরোধ ও অন্তর্বিপ্লব আজ শুধু ভারতে নয়, সমগ্র জগতকে বিষম আগ্নেয়-গিরি করিয়া তুলিয়াছে, সেই সর্ব্বনাশকারী সর্ব্বধ্বংসী মহা বিনাশের পথ রোধ করিবার জন্যই রামায়ণ ও মহাভারতের সৃষ্টি! বাল্মীকি ও বেদব্যাসের অলক্ষিত ইঙ্গিত যদি আজ সমগ্র মানব জাতি বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে জগতে আজ এ দুর্ব্বিসহ হাহাকার উপস্থিত হইত না—মানব-বিদ্বেষে নিখিল বিশ্ব কখনই কলুষিত হইত না। জগতকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্যই বাল্মীকি ও বেদব্যাসের ভূয়োদর্শন রামায়ণ ও মহাভারতাকারে রচিত হইয়াছিল।

রামায়ণী যুগে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই,—বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে তখনও অমল ভ্রাতৃপ্রেম কলুষিত হয় নাই—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন যেন একই সৌভ্রাত্রমালায় চারিটী গ্রথিত ফুল! পিতা-মাতার দারুণ নির্য্যাতনে বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও চারি জনের কি সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী বিরল বিমল ভ্রাতৃ-অনুরাগ! রামায়ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ যে অপূর্ব্ব এক-প্রাণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, বুঝি সহোদরের মধ্যেও এমন নিরাবিল দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা যায় না।

ত্রেতায় একপাদ ধর্ম্ম কমিয়াছিল বলিয়াই রঘু-বংশপতি দশরথ বিষম স্ত্রৈণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভরত-মাতা কৈকেয়ী বিমাতা-রাক্ষসীর অংশ অভিনয় করিয়া দশরথকে পুত্র-নির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য করাইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপিও মাতৃপ্ররোচনায় রামের সিংহাসন লাভ করিতে ভরতের মন টলে নাই; তথাপিও রামের অনুগামী হইতে লক্ষ্মণের পদ ইতস্ততঃ করে নাই। ভাই ভাইয়ের জন্য কি করিতে পারে, রামায়ণ তাহা দেখাইয়াছে। স্ত্রীর প্ররোচনায় পুত্রকে বনবাস দিলে পিতার কি দুর্দ্দশা হয়, রামায়ণ তাহা দেখাইয়াছে। আর রামায়ণ দেখাইয়াছে, বিভীষণের ভীষণ বিশ্বাসঘাতক মূর্ত্তি! বিভীষণ ধর্ম্মভীরু হইলেও যে বিশ্বাসঘাতক শত্রু-সহায়ক, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? বিভীষণ রাবণের সহোদর বলিয়াই ভ্রাতৃত্বের ইতিহাসে অমার্জ্জনীয় দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য আজিও বিভীষণের নামে মানব হৃদয়ে যুগপৎ আতঙ্ক ও ঘৃণার উদ্রেক হয়! বিভীষণ কি সর্ব্বলোক-জয়ী রাবণেরই সহোদর? নিকষার স্তনযুগল বুঝি বিভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তাই বুঝি রাক্ষস-বংশে জন্মিয়াও রাবণ ও বিভীষণে এইরূপ বৈষম্য দেখিতে পাই! মহাকবি বাল্মীকি বাছিয়া বাছিয়াই বুঝি এইরূপ গৃহশত্রু বিশ্বাস-ঘাতকের নাম বিভীষণ রাখিয়াছেন, যেন নামেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে! ধন্য কবি বাল্মীকি! আজ তোমারই বিভীষণ-চিত্র মানব ইতিহাসের কত পৃষ্ঠাই না কলঙ্কে মলিন, রক্তে রঞ্জিত করিয়াছে! বিভীষণ-চরিত্রে তুমিই বিশ্বকে গৃহশত্রু হইতে সাবধান করিয়া দিয়াছিলে। কিন্তু, মানব-জগৎ তোমার রামায়ণী বাণীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই। তাই ভারতের এবম্বিধ যৎপরোনাস্তি অধঃপতন! ভারতের অধঃপতনে জগতেরও অধঃপতন!

তাহার পর মহাভারতীয় যুগ। ধর্ম্ম তখন দ্বিপাদ হইয়াছেন। দ্বাপরেই মহাভারতের উৎপত্তি। শ্রীকৃষ্ণ তখন নটের গুরু। ভারতের তখন সর্ব্বত্রই বৈশ্যপ্রভাব—ধনধান্যে দেশ পূর্ণ। ভোগতরঙ্গে ও সচ্ছলতায় দেশ উদ্বেলিত। তখন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অধঃপতনাবস্থা ও শিশ্নোদরময় বৈশ্য বৃত্তির চূড়ান্ত! স্বয়ং ভগবান বৈশ্য-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন—পূর্ণকলায় বৈশ্য-বৃত্তির অভিনয় চলিয়াছে। দ্বাপর যুগের একদিকে যেমন ভীষণ জ্ঞাতিবিরোধময় কুরুক্ষেত্রের অবতারণা, অন্যদিকে তেমনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্ববংশ যদুবংশের ধ্বংসায়োজন! কি বিরাট লোকক্ষয়কর ব্যাপার! একদিকে দুর্য্যোধনের সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিদানে কাতরতা, অন্যদিকে যদুকুল নির্ম্মূলের জন্য অত্যাশ্চর্য্য মুষলপ্রসব। ভগবানের সব কার্য্যই অদ্ভুত রহস্যে পরিপ্লাবিত! ধর্ম্মরূপী যুধিষ্ঠির তখন পাশা খেলায় সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন, স্বয়ং ভগবান তখন

বস্ত্রহরণ ও লজ্জা নিবারণ, উভয় কার্য্যেই ব্যস্ত—একদিকে গোপীগণকে লজ্জাদান করিতেছেন, অন্যদিকে দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ করিতেছেন, লীলার কি সর্ব্বদিক-প্রসারিণী অভিব্যক্তি! শঠে শাঠ্য, দুষ্কৃতগণের দলন এবং ভক্তগণের পোষণ হেতুই দ্বাপরে পূর্ণব্রহ্মের লীলাভিনয়। যে যেমন, ভগবান তার প্রতি ঠিক তেমনই ব্যবহার করিতেছেন। এক দিকে শত কুরু, অন্য দিকে পঞ্চপাণ্ডব। এক দিকে বিশাল নারায়ণী সেনা, অন্যদিকে সারথিবেশে শ্রীকৃষ্ণ। কি অপূর্ব্ব সমাবেশ! বর্দ্ধিতায়তন ভোগসমাকুল দ্বাপরের বৈশ্যপ্রবৃত্তির ধ্বংসের যেমন প্রয়োজন হইয়াছিল, আজিও এই আন্তরিকতা-শূন্য, মৌখিকতাপূর্ণ উদর-সর্ব্বস্ব পাশব-বৃত্তি দমনের একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অসংযমী জগতে এখন সংযমের ভাব আনিতে হইবে। তাই প্রকৃতি আজ প্রতিশোধ লইতে বসিয়াছেন—ভূভারহারী ভবদেব আজ তাঁহার প্রলয়-শিঙ্গা বাজাইতেছেন।

মহাভারতীয় যুগে ভ্রাতৃত্বের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। মহাভারত দেখাইয়াছে, সৌভ্রাত্রের অভাবে, একতার অভাবে একটা জাতির কিরূপে অধঃপতন ঘটে। কুন্তী ও গান্ধারীর শত শত ক্রন্দনেও ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধিদাতাগণের শত শত পরামর্শে ও কুরু-পাণ্ডবের বৈরীভাব প্রশমিত হয় নাই। এতাদৃশ বিরোধ-ভাব সত্ত্বেও মহাভারত দেখাইয়াছে, বহিঃশত্রুর আক্রমণে কুরু-পাণ্ডব একশত আট ভাই! দ্বেষ-হিংসার মধ্যেও এই যে মৈত্রীভাব,—ইহার স্বরূপ সম্যকরূপে ধরিতে পারি নাই বলিয়াই এই স্বর্গাদপি গরীয়সী সিংহবাহিনী মহাভূমির সন্তান হইয়াও আমরা আজ ভীরু ফেরুপাল! বহিঃশত্রুর আক্রমণে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিদানকাতর দুর্য্যোধনও তখন পাণ্ডবদিগের নিকট অবনতমস্তক, সাহায্যপ্রার্থী! পাণ্ডবেরাও তদ্রূপ। এই এক প্রাণময় আত্ম-বোধই ভারতবাসীর প্রতি ত্রিকালদর্শী বেদব্যাসের অলক্ষিত ইঙ্গিত! এই নীতি-বোধ দ্বারাই জাতীয় অভ্যুত্থান ঘটে। যে জাতির এইরূপ ভাবে মিলিবার শক্তি নাই, সে জাতির উত্থান শক্তির সম্ভাবনা কোথায়? মহাভারতে বেদব্যাস এই নীতিই আমাদের চক্ষে ধরিয়া আমাদিগের ভবিষ্যৎকে সাবধান করিয়া দিতেছেন!

কিন্তু হায়, কালস্য কুটিলা গতি। আজ যাহারা ইন্দ্রতুল্য দেবরাজের সন্তান, কাল তাহারা পথের ভিখারী! ইহাই কালের অনিবার্য্য দুরতিক্রম্য নিয়ম। এ ভারতে সুখ-সমৃদ্ধির কত বস্তু না ছিল। কতরূপ বিজ্ঞান-বল, কল-কৌশল, কৃষি, বাণিজ্য, নৌবল, বিমান, অস্ত্রশস্ত্র, উদ্ভাবনী শক্তি, কত না ছিল! মহাভারত ও রামায়ণ আমাদিগেরই প্রাচীন সভ্যতা ও সুখ সমৃদ্ধির ইতিহাস। আজ আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি-কলাপ অদ্ভুত ও স্বপ্নকল্প বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে। নাগপাশ, সম্মোহন অস্ত্র প্রভৃতি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের কেবলমাত্র কল্পনা বলিয়াই বোধ হইতেছে! প্রাচীন ভারতের সভ্যতা কি কেবলই তবে অদ্ভুত কল্পনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল? ভারতীয় দর্শন-জ্ঞান প্রভৃতি যাহা কিছু সাধনা, সব কি কবি কল্পনার বিষয়ীভূত? কেমন করিয়া বলিব কল্পনা! আজিও এই অধঃপতিত ভারতবর্ষের ধ্বংস-স্তূপের ইষ্টক ও প্রস্তরাবলীর মধ্যে বিচরণ করিলে বুঝিতে পারি, ভারতীয় পূর্ব্বপুরুষগণের পতনের গুরুত্ব ও উত্থানের সমধিক মহত্ত্ব! প্রাচীন ভারতের সুমহান সভ্যতা অবনত হয় নাই, যেন সেই সভ্যতারই অনুরূপী আকাশস্পর্শী হিমালয়ের চূড়া অবনত হইয়াছে! বল্মীক-স্তূপের ন্যায় ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যেমন তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছিল, ইহার পতনবেগও তেমনি বিন্দু বিন্দু করিয়া গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় ধ্বংসের মহাসাগরে নিপতিত হইয়াছে। কালচক্রের আবর্ত্তনে সেই বিপুল গৌরব-বাহিনী কত কাহিনীপূর্ণা স্বর্ণ-প্রসবিনী ভারতভূমি আজ ভগ্নাবশেষ শ্মশানের ভস্মরাশি মাখিয়া কেবলই কাল গণিতেছেন। ভারতের পুনরুত্থানের পথ মহাভারত ও রামায়ণ-বর্ণিত ভারত-সভ্যতার উচ্চশিখর বুঝি চিরদিনের ন্যায় কুজ্ঝটিকার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও মেঘাবেষ্টনেই আচ্ছন্ন থাকিবে। প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর হিন্দুর নব-

জীবনের পুনরুত্থান আজি এরূপ স্বপ্নবৎ। কারণ, রামায়ণ ও মহাভারত—হিন্দু জীবনের যাহা স্তম্ভস্বরূপ, তাহাই আমরা ভুলিয়াছি। রামায়ণ ও মহাভারতের উপদেশাবলীর আদর্শে যদি আমরা কখনও জাতীয় জীবন গঠন করিতে পারি, তবেই কোন সুদূর ভবিষ্যতে এই ভারতভূমির অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আমাদের অনুসেবন ও রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটায় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান বিপর্য্যয় ও সামাজিক অবনতি ঘটিয়াছে। নৈতিক, ধার্ম্মিক ও সামাজিক বিপ্লব বহু শতাব্দী হইতে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সবগুলিই ইহার বক্ষে সামান্য সামান্য আঁচড় বা প্রভাব রাখিয়া চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, কেহই ইহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই। একনিষ্ঠতাই হিন্দুত্বের ভিত্তি। সমষ্টির ভিতর দিয়া ব্যষ্টিকে দেখাই একনিষ্ঠতা। শূদ্র জাতি-বিদ্বেষী বলিয়া যে বর্ণ ধর্ম্মের নিন্দা আছে, তাহা অমূলক। পুরাকালের কৃষ্ণকায় অনার্য্যেরাই শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইত। তাহারা আর্য্য তন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিল এবং সেই জন্য পাছে তাহাদের সহিত সংমিশ্রণে আর্য্যরক্ত দূষিত হয় ও সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয় ও বেদ-বিহিত ধর্ম্মের বিঘ্ন সংঘটিত হয়, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে হিন্দুর গণ্ডির দূরে দূরে রাখা হইয়াছিল। কোন উচ্চ জাতির সহিত সম্মিলনে ক্রমোন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যায়; এবং তাহার ফলে গরীয়ান অংশ লঘু হইয়া পড়ে, ও লঘীয়ানেরও স্বাভাবিক তেজ অবসন্ন হইয়া যায়। আমাদের দেশের ফিরিঙ্গিরা বিষম সংযোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের মাহিষ্য ও কায়স্থ জাতিই তাঁহাদের আপন আপন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ গ্রহণে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া সমাজে দলাদলি, বিপ্লব ও অশান্তির পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। সে কথা কাহারও অবিদিত নাই। শিক্ষিত কায়স্থগণ দ্বাদশদিবস অশৌচধারী ও নব্য মাহিষ্যগণ বহু শাস্ত্রীয় আলোচনার পর পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন সকল সামাজিক ব্যাপার লইয়া সংবাদপত্রাদিতে কায়স্থ ও মাহিষ্য সমাজের মধ্যে খুবই অশৌচ-বৈষম্য দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি আলোচনা করিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি অত্র স্থলে নিষ্প্রয়োজন।

অতএব হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ বড়ই গর্হিত কাজ হইয়াছে, আমরা এখন চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে নিজেদের অবস্থা বুঝিতেছি। কৃষি, বাণিজ্য, শাস্ত্র, ইতিহাস, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি সকল দিকই আমাদের আন্তরিকতা-শূন্য। গোধন ও পক্ষিকুল ধ্বংসে কৃষকদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। পক্ষিকুল কৃষির এক প্রধান সহায়। এ সম্বন্ধে ২।১ কথা অত্র স্থলে বলা আবশ্যক, তাহা ক্রমশই বিবৃত হইতেছে।

বিশ্ববিধাতার যাবতীয় সৃষ্টপদার্থের একটী না একটীর আবশ্যক দেখা যায়। সেই আনন্দ-ঘনমূর্ত্তি শ্যামসুন্দরের জগৎব্যাপী প্রেম, তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার অশেষ গুণাবলী, প্রত্যেক সৃষ্ট জীবজন্তু, স্থাবর জঙ্গম, কীট পতঙ্গ, জড় ইত্যাদি অব্যক্তভাষায় জগতের স্থূলজীবের নিকট প্রকাশ করিয়া সেই সচ্চিদানন্দবিভুর অসংখ্য লীলার মহিমা প্রচার করিতেছে। পশু পক্ষী আদি জীবের অস্তিত্বের সার্থকতা কৃষককুলের দ্বারায় বিশেষরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। হিংস্র জীবজন্তু দ্বারায় কৃষকগণের উপকার ও অপকার স্থান, কাল ও কার্য্যবিশেষে সাধিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যদেশসমূহে পক্ষীকুলদ্বারা কৃষির কি কি হিত ও অহিত সাধিত হয়, তাহার বিবরণী কৃষি বিভাগ হইতে বহু অর্থব্যয়ে সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। দেশের যাবতীয় কৃষকসম্প্রদায় এই সকল বিবরণী বিশেষ যত্নে পাঠ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। আমেরিকার কৃষিবুরোর দ্বারায় তদ্দেশীয় এই সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য পরিচালিত হয় এবং বিলাতে এগ্রিথিবোর্ডের হস্তে এই সকল ভার সমর্পিত আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা মহাদেশে উঁই, পোকা, উচ্চিঙ্গড়ে আদি পোকার অত্যাচারে দেশের যাবতীয় সকল

নেবুরবাগান, আপেল বাগান প্রভৃতি, এমন কি, বনের রক্ষিত বাহাদুরি কাষ্ঠের বিশেষ ক্ষতি হয়। পাইন, বার্চ ওকাদি বৃক্ষের গুঁড়ি ছেঁদা, পাতা ভক্ষণ, আলু কীঠদষ্ট, আপেল ভোমরাধরা, প্রভৃতি বহুবিধ পোকা, পতঙ্গাদির দ্বারা রোগ আনীত হইয়া দেশের বাগানগুলিকে ছাইয়া ফেলে এবং কৃষককুলের সমূহ ক্ষতি করে। দেশে মহা হাহাকার পড়িয়া গেলে, শেষে কৃষি-বুরো অনুসন্ধান কমিটি বসাইয়া জানিলেন যে, ইউরোপের সুন্দরী বিলাসিনীদের বেশভূষা সম্পাদনের জন্য সমগ্র দেশের পক্ষিকুল যে প্রত্যেক বৎসর পালক ব্যবসায়ীগণের লাভের জন্য কোটী কোটী বিনষ্ট হয়, তাহারই জন্য কীটকুল বৃদ্ধি লাভ করিয়া এই দেশের ক্ষতির কারণ হইয়াছে। কমিশন বসাইয়া পুনশ্চ ঠিক হইল যে মার্কিন যুক্তরাজ্যের মধ্যে বহু স্থানে ইগ্রেট, বক, কাদাখোঁচা, গ্রুজ, ফেজাণ্ট, মুর্গী, আদি শত শত প্রকারের সুন্দর পক্ষিকুলকে অমানুষিক নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া তাহাদের পালক সংগ্রহ করিয়া তাহার জোর ব্যবসা লণ্ডন, পারি, নিউইয়র্ক প্রভৃতি নগরে চালান হইয়া থাকে। দেশের এই হানির বিষয় অবগত হইয়া কৃষককুল অত্যন্ত তারস্বরে আন্দোলন আরম্ভ করিয়া প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলে, তিনি পক্ষিরক্ষণ জন্য একটী আইন বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে মার্কিন রাজ্য পক্ষিকুলের রক্ষণের পথ উন্মুক্ত হইলে, পোকাকুলের ক্রমিক অন্তর্দ্ধানে কৃষককুলের অনুযোগের কারণ তিরোহিত হইল। দেশে পক্ষিকুলের কৃপায় পোকার বংশ ধ্বংস হইতে লাগিল। আমেরিকা হইতে এই বালাই দূর হইলে, তাহার ক্রমিক প্রকোপ ভারতে আসিয়া পড়িল। যদিও এদেশে বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস শীকার বন্ধ রাখার ব্যবস্থা আছে, তাহা কাগজে কলমে। কার্য্যতঃ তাহা দেশের হিতের জন্য অনুষ্ঠিত ও প্রতিপালিত হয় না। তাহা ছাড়া, আমাদের এই বিশাল দেশের বহুজাতীয় গোবংশের এবং মৃগকুলের যথেচ্ছ নৃশংস হননে মাংসখাদকগণ তুষ্ট না হইয়া, শেষে শ্বেতাঙ্গ বিলাসিনীগণের কুহকে পড়িয়া জগৎপিতার সুন্দর পক্ষিরাজ্যের সমূল ধ্বংসের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। দেশের স্বাধীন সুন্দর সুন্দর পক্ষিবংশের ক্রমিক উচ্ছেদসাধনে, পোকাকুলের দৌরাত্ম্য দিন দিন বাড়িতেছে, এবং সেই জন্য, কীটপতঙ্গাদি-কৃত দেশের ক্ষতির পরিমাণ খতাইয়া দেখিলে কত কোটী টাকার আমাদের দেশের নিঃস্ব কৃষক কুল প্রতি বৎসর হারাইতেছেন তাহা কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন? আমাদের দেশের কৃষিবিভাগ হইতে এই সকল বিষয়ের তথ্য জানিবার কোন উপায় নাই। এ সম্বন্ধে আমি বসুমতী, আলোচনা, ডেলিনিউস্, বেঙ্গলী, ব্যবসায়ী, বসুধা, নব্যভারত পত্রিকায় বহু প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি; সহৃদয় পাঠক তাহা পাঠ করিলে আমাদের বর্ত্তমান অভাব অভিযোগ ও তীব্র জীবন-সমস্যায়, দিনে কি রাতে, কি কর্ত্তব্য তাহা জানিতে পারিবেন। যতদিন না আমরা—ভারতবাসী,—গোরক্ষা ও পক্ষিরক্ষায় যত্নবান হইব, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের পুনরুত্থানের আশা নাই! ততদিন সভ্যজাতির মধ্যে আমাদের স্থান নাই। বিগত-জাতীয়-গৌরব লইয়া আমরা লম্ফ ঝম্ফ করি, মিছা আস্ফালন করি। কিন্তু মজ্জাগত স্থৈর্য্য আমাদের কই? আমাদের বিলাস-ত্যাগের সেরূপ ইচ্ছা কোথায় যে, ভগবানের এই বিশাল পরিবার মধ্যে সামান্য একটী স্থান অধিকার করিতে পারিব?

আমাদের দেশের গোকুল ক্রমে খাদ্যের অভাবে রোগের প্রকোপে এবং অন্যান্য অভাবনীয় কারণে তিরোহিত হইতেছে। ভারত, কৃষি-প্রধান দেশ; গো-বলই আমাদের দেশের কৃষির প্রধান সহায় এবং পক্ষিকুল ও কৃষিজাত সামগ্রীর পরিপোষক। এদেশে উভয়েরই ধ্বংস হইতেছে, কিন্তু তাহার দিকে রাজার বা দেশের বড়লোকের আদৌ দৃষ্টি নাই। রাজসদনে আবেদন উপস্থিত করিলে, এমনই দেশের ব্যবস্থা-প্রণালী যে, যথাস্থানে তাহা গিয়া পঁহুছায় না; তাহার উপর কর্ণপাত হওয়া বা তাহার অনুসন্ধান হওয়া ত দূরের কথা। এহেন দেশের কৃষককুল অনশনে

মরিবেনা ত কি হইবে? সকল দেশের কৃষকদের রাজদপ্তরে প্রতিনিধিত্ব আছে, কিন্তু কৃষিপ্রধান ভারতে তাহা নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর অনুতাপ ও আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আমাদের দেশের শিকারীগণ নৃশংসরূপে কত শত শত পাখীর পালকের ও খাদ্যের জন্য নিত্য হনন করে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। হিন্দুর প্রধান তীর্থস্থান কাশী, গয়া, ব্রজ, মথুরা প্রভৃতি স্থানের ময়ূরাদি সুন্দর পাখী ও মৃগকুলের যথেচ্ছ বিনাশ, শিকারী সাহেবদের হাত হইতে রক্ষার জন্য কত চেষ্টাই না হইতেছে; কিন্তু কাজে কিছু যে হইবে, তাহার আশা আমার মনে হয় না; কারণ কাগজে কলমে সবই আছে, কাজের সময় কিছুই হয় না। মথুরা, বৃন্দাবন আদি স্থানের মৃগ ময়ূরাদির গোরাগণের হাত হইতে রক্ষার জন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র ভারতে সেই আদর্শ-পুরুষ, সেই শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের রক্ষিত গো মৃগ পক্ষীর ভারতে যে যথেচ্ছ বিনাশ ও হনন হইতেছে, তাহার জন্য কি করিতেছেন! এই জন্য কি রাজদরবারে সমগ্র ভারতীয় বৈষ্ণব ও হিন্দু মুসলমানের সমবেত আবেদন করা অচিরাৎ প্রয়োজন নহে?

পূর্ব্বে আমি আমার পাঠকগণকে কতক পরিমাণে দেখাইয়াছি যে পক্ষিকুল দ্বারা আমাদের দেশের কৃষির অশেষবিধ রক্ষা ও হিতসাধিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে আজ কাল যে বহু প্রকার দুরারোগ্য সংক্রামক ও উৎকট রোগের প্রকোপ-বিস্তার দেখা যায়, তাহার অন্যতম কারণের মধ্যে আমার মনে হয় যে, যথেচ্ছ পক্ষিকুল ধ্বংস প্রধান। আমরা ভারতবাসী, চিরকাল রাজভক্ত নিরীহজাতি, আমাদের জীবনধারণের উপায়গুলি দিন দিন নানা কারণে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে এবং নানা প্রকার কীটপতঙ্গ রোগাদির প্রভাবে খাদ্য সামগ্রী মহার্ঘ্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছে। ইংরাজ আমলের প্রথমাবস্থায় খাদ্য সামগ্রীর মূল্য এবং বর্ত্তমান মূল্য তুলনা করিলে আমাদের জীবন-সমস্যার তীক্ষ্ণতা উপলব্ধি হইবে। তালিকা দেখুন :—

১৭৮১।২ সালে বাসমতী চাল টাকায় ৩১ হইতে ৩৮ সের, আতপ ৩৭ হইতে ৫৪ সের ৮ ছটাক, ভিন্ন প্রকারের ধান ৯৫ হইতে ১২৯ সের ৮ ছটাক, গম ৫৬ হইতে ৬৪॥০ সের, মক্কা ১২৫ হইতে ১৩৯ সের, যব ১২৫ হইতে ১৩০ সের, জিনোরা বা জুদলিয়া ১১৬ হইতে ১৩৩, অড়হর ১০০ হইতে ১০৫ সের, ঐ ডাল ৫৯ হইতে ৬২ সের, খেসারি ১৬১॥০ হইতে ১৮৪॥০ সের, ছোলা ১০০ হইতে ১০৪ সের, তিসি ৭২ হইতে ১০০ সের, সরিষা ৬০॥০ হইতে ৬২।০ সের, মড়ুয়া ১০৬ হইতে ১৩৯ সের টাকায় বিক্রয় হইত। এখন এই সকল খাদ্যদ্রব্যের কি মূল্য, তাহা প্রায় সকল গৃহস্থই জানেন। তখনকার ১৲ টাকায় যে চাল পাওয়া যাইত, তাহার এখন মূল্য ৬ হইতে সাত গুণ পড়ে। মিঃ জেমস্ রেগিন্যাল্ড হ্যাণ্ডের পুস্তক পাঠে আমরা ইহা জানিতে পারি। খাদ্য সামগ্রীর এইরূপ অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি? সরকার বাহাদুর ইহার কারণ নির্ণয় জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া মিঃ দত্ত মহাশয়ের কর্তৃত্বে এক কমিশন বসাইলেন। কিন্তু তাহাতে দেশের লোকের কোনই লাভ হইল না। যে সকল কারণে দেশের এই অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সমীকরণ করিতে হইলে বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের এবং স্বয়ং গভর্ণমেণ্টের রাজস্বের বহু হানির সম্ভাবনা। দরিদ্রের ক্রন্দন এক ভগবান ভিন্ন আর কে শুনিতে পায়? রাজদপ্তরে কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব নাই। বিলাতে এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বিলাত আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য পাশ্চাত্য কৃষিপ্রধান দেশের শ্রমসহিষ্ণু বড় লোক, জমিদারগণ ও বৈজ্ঞানিক কৃষিবৃত্তি অনুসেবন করিয়া বিশেষ লাভবান হন। জালার মত তরবুজ, কুমড়া আদি তরকারী আমাদের দেশের অজ্ঞ কৃষকদের কাছে স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। দেড় দুই সের ওজনের বেগুন আমি নিজে ফলাইয়াছি; ২৫ সের ওজনের মিশ্রীবৎ মিষ্ট তরমুজ আমি গয়ায় উৎপাদন করিয়াছি। আমাদের দেশের কৃষকপুত্রেরা সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া লাঙ্গল ধরিতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন; বড়লোকের ছেলেরা কৃষিবৃত্তিকে ঘৃণা করেন।

তাই তাঁহাদের ঘৃত দুগ্ধের এত অভাব। বড়লোকেদের গোরুগুলি কৃষ্ণের কৃপায় জীব বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের কৃষির, গোরক্ষা, গোপালনের এই অজ্ঞতার জন্য দেশের এত দুর্দ্দশা, এত তীব্র জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। তাহার সামঞ্জস্য করার কি সময় আসে নাই? মিঃ এম্ এন্ বসু, মিঃ সমর্দ্দার প্রভৃতি দেশের অগ্রগণ্য অর্থশাস্ত্রবিদ্‌গণের এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয় আশু মনঃসংযোগ করা উচিত নহে কি?

এখন দেখা যাক, পক্ষিরক্ষার জন্য আমরা কি করিয়াছি? তীর্থস্থানের ময়ূরাদি পাখিগণের গোরা ও সাহেব শিকারীদের হাত হইতে রক্ষার জন্য আমাদের দেশের বৈষ্ণব হিন্দুগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট সময়ে সময়ে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি সমর বিভাগের বড়কর্ত্তার সে আর্ত্তনাদে আসন টলিয়াছে। তিনি ঐ সকল তীর্থ সমূহের পাখিকুলকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। দেশের অপর সময়ে ও অপরাপর স্থানের পাখীদের রক্ষার কোন বিধিবদ্ধ আইন নাই। কিন্তু সন্তানোৎপাদনের সময়ে, অর্থাৎ বর্ষাকালে, দেশীয় পাখীদের হনন করা নিষিদ্ধ হইলেও তাহার বিধি কয়জন পালন করিয়া থাকে? আমাদের দেশে পাখীর পালকের ব্যবসা নিষিদ্ধ হইলেও, কত শত শত মন পালক বিদেশীয় ললনাদের বিলাস সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য রপ্তানি হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? ভারতীয় বড়লাট বাহাদুরের দপ্তর হইতে ১৯১০ সালের আট আইন দ্বারা শিকারী পক্ষী ও কতিপয় পশু রক্ষার জন্য একটী আইন পাশ করান হইয়াছে বটে এবং যদিও ইহার পরিসর ও কার্য্যক্ষেত্রে কয়েকটী প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট বিস্তৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার দ্বারায় দেশের পক্ষীকুলের সম্যক রক্ষা বিধান না হওয়ায়, ভারতের সকলদেশেই পোকার উপদ্রবে শস্যের বিশেষ ক্ষতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দ্বারায় কৃষককুল যে কি অধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তাহার দিকে আমাদের দেশের চিন্তাশীল মহানুভব ব্যক্তিগণ দৃষ্টিপাত করেন কি? গো এবং পক্ষীকার বিধি আমরা বাদসাহ আকবরের আইন-ই-আকবরিতে দেখিতে পাই। কিন্তু জানিনা মোগল বাদসাহগণ অপেক্ষাশতগুণ সুসভ্য ইংরাজরাজের ষ্টেটুটবুকে গো এবং পক্ষিরক্ষণী আইন বিধিবদ্ধ হইয়া কেন শোভাবর্দ্ধন করিতেছে না? যে তৃণ দন্তে ধরিয়া কেন সবল ব্যক্তি তাহাকে মারে না। ভারতের গো জাতি হিন্দুকে মধুর দুগ্ধ এবং হত্যাকারীগণকে কটু এবং তিক্ত দুগ্ধ, জাতি বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দান করে না। সকলকেই পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করেন। কিন্তু নিষ্ঠুর লোক তাহার গলায় ছুরিকা প্রদান করিয়া হত্যা করে। মরণেও তিনি আমাদের পাদুকা দিয়া সেবা করেন। এহেন নিরীহ, তৃণাদপি হীন গো-মাতার আবেদনে মোগলসম্রাট আকবর, অবাধ গো-হনন রহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান নির্ব্বাণোন্মুখ কৃষিরক্ষার্থ আমাদের সুসভ্য রাজা কি গো ও পক্ষী রক্ষা বিধি করিতে পারেন না? গো-রক্ষার্থ আজকাল অনেক কথা সংবাদ-পত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু পক্ষিরক্ষার জন্য কাহারও মাথা আজিও ঘামে নাই।

বিলাতের মিঃ জেম্‌স্ বকল্যাণ্ড পৃথিবীর পক্ষিকুল সংরক্ষণে ব্রতী। তাঁহার জীবনের প্রধান এ মুখ্য উদ্দেশ্য পৃথিবীর সুন্দর পাখীকুলকে রক্ষা করা; সেই জন্য তিনি পার্লিয়ামেণ্টে "প্ল্‌মেজ বিল" পেশ করাইয়া আইন রূপে বিধিবদ্ধ করাইতে চান। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কৃষিবিভাগ শস্যসমূহকে কীটকুলের কবল হইতে রক্ষার জন্য বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। পাখীকুল কীটের আক্রমণ হইতে ভারতীয় শস্যকে রক্ষা করে। এই পাখিকুল রক্ষার জন্য ঐ সকল বিভাগ আদৌ মনযোগ করেন নাই। আশা করি, আশু তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে পড়িবে। বিহারের কথা আমি জানি। ঐ দেশের গয়াজেলার মধ্যে শীতকালে শিকারীগণ রসনা-সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য সহস্র সহস্র বটের, বগেরী, চাহা, মুরগাব্, সুরখাব্, তিতর, ময়ূর, বন্যমুর্গী প্রভৃতি নিহিত করিয়া থাকে। ইহাদের অবাধ হত্যা, গো-কুলের অবাধ হত্যার মত

বিধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আশু কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে আমি বঙ্গীয় প্রদেশিক সমিতিতে আলোচনা ও বিচার পেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু কাজে উল্লেখযোগ্য কিছুই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত হয় নাই। এই সকল দেশহিতকর কাজ দেশের সংবাদপত্র ও মুখ্য লোকগণের যোগদান ও আন্দোলন করা বিশেষ প্রয়োজন।

আমাদের ভারতবর্ষের সিন্দুপ্রদেশের অন্তর্গত বেরগ্রামের নিকট পালকের জন্য ইগ্রেট বক্‌পোষা ব্যবসায় আরব্ধ করা হইয়াছে। লঙ্কা ও আফ্রিকায় যেমন অষ্ট্রীচ্ পালন ব্যবসায় আছে, এই দেশে তদনুকরণে বক-ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। তাহার বিষয় কোন পাঠক আমাকে সবিশেষ জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। পক্ষিরক্ষার জন্য সমগ্র সভ্য জগতে মিঃ জেমস্ বক্‌ল্যাণ্ড পৃথিবীব্যাপী আলোচনা ও আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার একান্ত বাসনা যে, অবিলম্বে আমাদের দেশের, বিশেষতঃ তীর্থস্থানের পক্ষিকুল বধের ও শিকারী হস্ত হইতে বিধিদ্বারা রক্ষিত হয় এবং তীর্থগুলির ও দেশের কৃষককুলের শ্রম সার্থক হউক। কিন্তু আমাদের এই বিশাল দেশের মধ্যে এ দিকে দৃষ্টিপাত আজও করেন নাই। আমেরিকাদি সভ্যদেশের কৃষি বুরোর মত পড়া, পাঠ করা; আমাদের দেশের কৃষিবিভাগের এদিকে তীব্র দৃষ্টি কর্ত্তব্য।

এখন আমরা বেশ দেখিলাম ও বুঝিলাম যে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, কাব্য, ইতিহাস, আদির সনাতন ও প্রাচীন আদর্শ হইতে স্খলিত হওয়ায় আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের যাবতীয় বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আমরা আন্তরিকতা হারাইয়াছি এবং অনুকরণতাপ্রিয় অত্যধিক হইয়াছি বলিয়া আমাদের আর্য্য-বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মণগণ সমাজে প্রতিষ্ঠা হারানতেই সমাজের মধ্যে অশান্তি ও বিপ্লব দেখা দিয়াছে, ইহার ফলে সকল জাতিই আপন আপন পদবী ভগ্ন ও মস্তকহীন হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়া বিষম আন্তর্গণিক বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত করিয়া বিপ্লব করিবার প্রয়াস পাইতেছে। এই বিপ্লবে কায়স্থ ও মাহিষ্য সমাজ ঝম্ফ প্রদান করিয়া আবর্ত্তনে পড়িয়া বিপর্য্যস্ত ও হীন বল হইতেছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই যে হিন্দু ধর্ম্মের মেরুদণ্ড, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু আজকাল ঐ দুই সমাজ তাঁহাদের নষ্ট গৌরব ও সমাজে প্রতিষ্ঠা পুনঃ স্থাপিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন বলিয়া আমরা যারপর নাই সন্তুষ্ট, কিন্তু এই দুই সমাজ মধ্যে অশৌচ বৈষম্য লইয়া যে বিষম গোলযোগ সময়ে সময়ে দেখা যাইতেছে যে, দলাদলি সমাজদ্বয়কে ক্ষুব্ধ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে আশার সঞ্চার হয় না, যে হেতু এই বিবাদে সমাজ-শক্তি ক্রমশঃ হীনবল ও হতপ্রভ হইতেছে। এ সম্বন্ধে সে দিন পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাহার আলোচনা পত্রিকা ও কায়স্থ পত্রিকা বিগত দুই বৎসর ধরিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। এইজন্য আমাদের সামাজিক আন্তর্গণিক, ব্যবসায়িক উন্নতি করিতে হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলা কর্ত্তব্য এবং ইহার রক্ষা করিতে হইলে গোবল ও কৃষি বলের উন্নতি ও রক্ষা বিধান করা বিশেষ কর্ত্তব্য এবং কৃষি বলের পোষণের জন্য পক্ষিরক্ষা বিশেষ প্রয়োজন !!!

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

* * *

শোক-গীতি।

(মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখলের পরলোক গমনে।)

একি শুনিলাম হায়, অকালে তপন নাকি
যায় অস্তাচল ?

এ যে গো মধ্যাহ্ন বেলা এখনো আকাশ ধরা
আলোকে উজ্জ্বল !
একি দেব ! অকস্মাৎ কি শুনিনু বজ্রাঘাত
তুমি নাকি নাই—

সেই সর্ব্ব-লোকপ্রিয়,   রাজনীতে অদ্বিতীয়,
সকলের ভাই !
সেই আত্মত্যাগী যোগী   সে মহান চিত্তজয়ী
উদার হৃদয়,
সেই মাতৃভক্ত বীর   দীপ্ত মণি অবনীর,
সে করুণাময় !

২

এখনো তোমার দেশ   সহিছে কতই ক্লেশ
কত ভ্রান্তি বশে,
এখনো স্বদেশী তব   পড়ি কত নিম্নতলে
প্রতিপত্তি যশে ;
এখনো অন্নের লাগি   ফিরিতেছে ভিক্ষা মাগি
ভারত-সন্তান,
তুমি যে তাদেরি তরে,   খাটিছ সহস্র করে
পণ করি প্রাণ !
তোমার আশ্বাস বাণী   শুনিছে ভারতবাসী
দৈববাণী প্রায়,
চেয়ে আছে তোমা পানে,   তৃষিত চাতক যথা
মেঘ পানে চায় !
তুমি আপনার জন,   তুমি সহোদর ভাই
সুহৃদ, বিশ্বাসী,
তুমি সদা রাজ-প্রিয়,   শুভাকাঙ্ক্ষী অদ্বিতীয়
জানে দেশ-বাসী।

৩

তুমি যে চাহিলে দেব !   স্তূপীকৃত অর্থরাশি
পারিতে অর্জ্জিতে,
পরের মঙ্গল তরে   করিলে তপস্যা কিনা
দারিদ্র্য বরিতে !
গুরুশিষ্য এক সাথে   দেবাশীষ নিয়া মাথে
উৎসর্গিলে প্রাণ,
করিলে প্রসন্ন মনে,   দেশ-জননীর-পদে
আত্ম-বলিদান !

৪

আজি সে সাধের দেশ   জননী ভারতভূমি
কোথা যাও ছাড়ি,
মায়ের নয়ন মণি   জগত উজ্জ্বল নিধি
কে লইল কাড়ি ?—
কত বাধা অবহেলি,   অকূল জলধি ঠেলি
গেলে সে বৃটনে,
সাহস সুযুক্তি ন্যায়ে   চমকিত করি দিলে
ভূপতির মনে !
যেখানে যখন গেছ   বিশ্ব বরণীয় রূপে
লভিয়াছ জয়,
তেজস্বী যশস্বী শূর   কৌরব গৌরব যথা
বীর ধনঞ্জয় ?

* * * *

নিরখি ও কর্ম্মবীরে   শমন স্তম্ভিত যেন
সবিস্মিত আঁখি—
লিখি যাহা লিখিবার—   থামিল লেখনী তব,
তবে নিল ডাকি !

৫

অভাগী ভারত মাগো !   যে “গোপাল” পেয়েছিলে
তপস্যার জোরে,
ও পোড়া কপালে আহা,   ক’দিন রহিবে তাহা
হরি নিল চোরে !
এখন সম্বল শুধু   নয়নের জল সহ
প্রিয় পুত্র-স্মৃতি,
অমর জীবন তার   মনে করি অনিবার
গাও শোকগীতি।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

সাংখ্য-সূত্র।

২১। অন্যথা কূটস্থত্বের হানি হয়।

বন্ধন আত্মার ধর্ম্ম বলিয়ে আর আত্মা কূটস্থ হইতে পারে না।

শ্রুতিতে আছে, আত্মা কূটস্থ অনাদি। মুক্তির অন্তরায় অবিবেক নাশ ব্যতীত, এই কূটস্থ স্বরূপ লাভ হয় না। আর মুক্তের পুনর্ব্বন্ধন সম্ভব হইলে কূটস্থত্বের হানি হইত।

(বিজ্ঞান ভিক্ষুর এ সূত্র নাই।)

২২। আর ইহাতে মুক্তি হয়, কোন বিরোধ নাই।

আত্মার ধর্ম্মান্তর যোগে মুক্তি হয়, একথা বলিলেও কোন ক্ষতি নাই। মুক্তি হইলে আর সংসার যোগ হয় না, উক্ত হইয়াছে। যদি ধর্ম্মান্তর যোগে ইহা সিদ্ধ হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? (অনিঃ)।

অন্তরায় ধ্বংসে মোক্ষত্ব সিদ্ধি হইলেও তাহাতে পুরুষার্থত্বের বিরোধ হয় না। বিঃভিঃ।

২৩। অধিকারী ত্রিবিধ হেতু কোন নিয়ম নাই।

অধিকারী ত্রিবিধ—মৃদু, মধ্য ও তীব্র। নিয়ম=শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সম্বন্ধে নিয়ম। তীব্র বা অধিমাত্র অধিকারী শ্রবণের পরেই মুক্ত হইতে পারে। মধ্যম অধিকারী শ্রবণ ও মননের পর মুক্ত হয়। মৃদু অধিকারীর পক্ষে শ্রবণ,মনন ও নিদিধ্যাসন, তিনই প্রয়োজন।

অতএব মুক্তির জন্য বা অবিবেক দূর করিবার জন্য একরূপ উপায় সকলের পক্ষে সম্ভব নহে।

২৪। (বিবেক জ্ঞান) দৃঢ় করিবার জন্য এই ক্রম (উক্ত হইয়াছে)।

অথবা যাহারা মন্দাধিকারী,তাহাদের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের এই সাধনাক্রম দ্বারা বিবেক দৃঢ় করিতে হয়। শ্রুতিতে আছে,—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

কেবল শ্রবণই জ্ঞানের সাধন নহে। জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য সকলকেই তাহার পরবর্ত্তী মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। (বিঃ ভিঃ)

২৫। যাহা স্থিরতা জনক ও সুখজনক, তাহা আসন। অন্য নিয়ম নাই।

পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি অনেক, (৮৪ প্রকার) আসন আছে।

এরূপ নিয়মের প্রয়োজন নাই, যেহেতু যোগার্থ যে আসন, তাহা স্থৈর্য্যজনক ও সুখজনক হইলেই হইল।

২৬। মননির্বিষয় হইলে ধ্যান (সিদ্ধি) হয়।

ধ্যান=সমাধি। নির্ব্বিষয়=বৃত্তিনিরোধ। বিজ্ঞান ভিক্ষু ধ্যানকে মুখ্য সাধন বলিয়াছেন।

পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে ধ্যান অর্থে একাগ্রতা। কোন একদেশে হৃদয় পুণ্ডরীকাদিতে চিত্তকে স্থির রাখিলে ধারণা সিদ্ধি হয়। তাহা দূর হইলে ধ্যান। ধ্যানে ধ্যেয় বিষয় থাকে। এ স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, ধ্যানে মনে কোন ধ্যেয় বিষয় থাকে না। পাতঞ্জল দর্শন মতে ইহা নির্ব্বিকল্প সমাধি।

২৭। উভয়ে অবিশেষ হইলেও, উপরাগ নিরোধ হেতু ইহার বিশেষত্ব।

সুষুপ্তি ও ধ্যান—এ উভয়েই মনের বৃত্তিনিরোধ হয়, মন নির্ব্বিষয় হয়। কিন্তু সুষুপ্তিতে বিষয় বাসনা অস্ফুট ভাবে থাকে, সমাধিতে তাহা থাকে না, ইহাই প্রভেদ বা বিশেষত্ব।

সামান্যতঃ যোগ ও অযোগ উভয় অবস্থাতে পুরুষ অবিশেষ হইলেও, উপরাগ নিরোধই যোগাবস্থায় বিশেষত্ব। (বিঃ ভিঃ)

২৮। পুরুষ নিঃসঙ্গ হইলেও, অবিবেক হেতু এই উপরাগ হয়।

প্রকৃতির উপরক্তি দ্বারা আত্মার উপরাগ। অবিবেক=প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞানের অভাব। পুরুষে বিজ্ঞানের প্রকৃতির প্রতিবিম্বহেতু এই উপরাগ হয় (বিঃ ভিঃ)।

২৯। সেই উপরাগ, জবাস্ফটিকের মধ্যে উপরাগের ন্যায় (তাহা তাত্ত্বিক নহে) তাহা অভিমান মাত্র।

জবাকুসুমের সহিত স্ফটিকের সম্বন্ধ হইতে স্ফটিক যেরূপ রঞ্জিত হয়, আত্মা প্রকৃতি সম্বন্ধে সেরূপ রঞ্জিত হয়। তাহাতে অবিবেকহেতু পুরুষ—আমি রঞ্জিত হইয়াছি, এইরূপ মনে কর ইহা অভিমান।

যেমন জবাপুষ্পের সান্নিধ্য হইলেও স্ফটিকের প্রকৃত উপরাগ হয় না, কিন্তু জবাপুষ্পের প্রতিবিম্ব গ্রহণ হেতু রক্ত আমি স্ফটিক এইরূপ অভিমান মাত্র হইয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধির প্রতিবিম্ব গ্রহণ হেতু পুরুষের উপরাগ অভিমান হয়। তাহা অবিবেক হেতু। যতদিন অবিবেক থাকে, তত দিন এই উপরাগ অভিমান থাকে। অবিবেক নিবৃত্তি হইলে তাহারও নিবৃত্তি হয়। এই দুঃখাত্মক বৃত্তির উপরাগ মোক্ষের অন্তরায়। চিত্ত লয়ে সে উপরাগ ধ্বংস হয়। যোগে চিত্তলয় সিদ্ধ হয়।

সুতরাং তাহাতে মোক্ষের অন্তরায় দূর হয় (বিঃ ভিঃ)।

৩০। ধ্যান ধারণা অভ্যাস বৈরাগ্যাদি দ্বারা তাহার নিরোধ হয়।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে, "যোগশ্চিত বৃত্তির নিরোধঃ। চিত্তবৃত্তির যে নিরোধ,তাহা যোগ। বা চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় এস্থলে উক্ত হইয়াছে।"

সমাধি দ্বারা যে ধ্যান হয়, তাহা যোগের কারণ। ধ্যানের কারণ—ধারণা, ধারণার কারণ—অভ্যাস; অভ্যাসের কারণ—বিষয় বৈরাগ্য। (বিঃ ভিঃ)

৩১। আচার্য্যেরা বলেন, লয় বিক্ষেপ ব্যাবৃত্তিতে বা তাহা অতিক্রম করিলে, এই নিরোধ হয়।

লয়—স্বপ্ন, সুষুপ্তি। বিক্ষেপ—জাগ্রত অবস্থা। এই জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা অতিক্রম করিতে পারিলে সমাধি সিদ্ধ হয়।)

ধ্যানের দ্বারা—নিদ্রা ও প্রমাণাদি বৃত্তির নিরোধ হয়। তাহাতে বৃত্তি দ্বারা পুরুষের বিষয়োপরাগ নিরোধ হয়। বৃত্তির নিরোধে প্রতিবিম্বের নিরোধ হয়। (পাতঞ্জল দর্শন (১।১-৩ সূত্র) দ্রষ্টব্য। স্মৃতিতে আছে—

"নিত্য সর্ব্বত্র শুদ্ধাত্মা বৃত্তিসন্নিধিমত্তয়া।
যথা যথা ভবেদ্‌বুদ্ধিরাত্মা তদ্বদিহেষ্যতে॥"

অতএব অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারাই মোক্ষের অন্তরায় দূর হয়—ইহাই সিদ্ধান্ত। (বিঃ ভিঃ)

৩২। চিত্ত প্রসাদের অভাব হেতু স্থান নিয়ম নাই।

যোগের উপযুক্ত স্থান আছে। যেস্থানে চিত্তের প্রসন্নতা হয় না, তাহা যোগের স্থান নহে। সে স্থানে যোগ অভ্যাস অকর্ত্তব্য।

বিজ্ঞান্ ভিক্ষুর পাঠ স্বতন্ত্র। তাঁহার অর্থ এই,—কেবল চিত্ত প্রসন্নতার দ্বারাই ধ্যান সিদ্ধি হয়। যে প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি (যাহার চিত্তে বিষয় রাগাদি দোষ নাই) সর্ব্বত্রই তাহার ধ্যান সম্ভব। আর যাহার চিত্ত মলিন, সে গুহা বা যে কোন স্থানেই ধ্যান করুক, তাহার সাধন হয় না। এ জন্য ধ্যানের জন্য স্থির নিয়ম নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মসূত্রেও আছে—যত্রৈকাগ্রতা "তত্রাবিশেষাৎ।" (বিঃ ভিঃ)

৩৩। প্রকৃতিই আদি উপাদান; শ্রুতি আর সকলকে কার্য্য বলিয়াছেন।

আর সকল = অহঙ্কার ইত্যাদি। মহত্ত্বাদি সমুদায়।

আদি উপাদান = মূল কারণ।

৩৪। প্রকৃতির ন্যায় পুরুষ নিত্য হইলেও, তাহা জগৎকারণ নহে। তাহার জগৎ কারণ যোগ্যত্ব নাই।

পুরুষ নিষ্ক্রিয় বলিয়া—নিশ্চল বলিয়া জগৎ কারণ নহে। পুরুষ নির্গুণ নিঃসঙ্গ বলিয়া জগতের উপাদান হইতে পারে না।

৩৫। শ্রুতি বিরোধ হেতু এ সম্বন্ধে কোন কুতর্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

শ্রুতিতে আছে—"বহ্বীঃ প্রজা পুরুষাৎ সম্প্রসূতা"। ইহাতে বিবর্ত্তনবাদ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সাংখ্যকার বলেন,তাহা সিদ্ধান্ত না। কোন শ্রুতিই পুরুষকে উপাদান কারণ বলেন নাই। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ কল্পনা করিয়া (পুরুষ প্রকৃতিকে অভেদ করিয়া) উক্ত স্থলে আত্মাকে জগৎ কারণ বলা হইয়াছে।

"অজামেকাং * * *" ইত্যাতি শ্রুতিতে প্রকৃতিকেই জগৎকারণ বলা হইয়াছে। তবে পুরুষকেই অধিষ্ঠানকারণ স্বীকার করায় সাংখ্য পণ্ডিতদের আপত্তি নাই।

৩৬। পরম্পরা মতে প্রধানের কারণত্ব প্রতিপন্ন হয়। যেমন পরমাণুকে পরম্পরা রূপে কারণ বলা যায়।

স্থাবরাদির কারণ পৃথিবী, তাহার কারণ পরমাণু ইত্যাদি।

ইহার অর্থ এই যে, অনুমান দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি ভূতের কারণ গন্ধাদি তন্মাত্র, তন্মাত্রের কারণ অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণ বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বের কারণ প্রধান বা প্রকৃতি ইহা পরম্পরা ক্রমে সিদ্ধ হয়। বৈশেষিক দর্শনে এইরূপ পরম্পরা ক্রমে ও পরমাণুকে কারণ বলা হয়।

৩৭। সর্ব্বত্র কার্য্য দর্শন হইতে প্রকৃতির বিভুত্ব।

সকল পদার্থ অস্থায়ী, বিকারী, তাহার ব্যাপক হইতে পারে না।

যেমন পরমাণু ঘটের ব্যাপক, তেমনই প্রকৃতি জগতের ব্যাপক।

আমরা কার্য্যই দেখিতে পাই। কারণ দেখিতে পাই না। তাহা অনুমেয়, সে কারণ প্রকৃতি। আর সকল কার্য্যের মূলই প্রকৃতি। কার্য্য ব্যাপ্য, কারণ ব্যাপক। যাহা ব্যাপক তাহা বিভু। এ জন্য প্রকৃতির বিভুত্ব।

৩৮। পরমাণুবৎ গতিযুক্ত হইলেও তাহার আদ্যকারণত্বের হানি হয় না।

যাহাতে গতি বা ক্রিয়া যোগ আছে, তাহা ব্যাপক নহে। প্রকৃতিতে গতি আছে, পরমাণুর ন্যায় তাহার গতি আছে। সুতরাং প্রকৃতিতে কিরূপে আদ্য কারণ বলা যায়? যেমন পরমাণুর গতি সত্ত্বেও ঘটের কারণ, সেইরূপ প্রকৃতি গতিশীল হইয়াও জগতের কারণ।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। গুণের পরস্পর সংযোগ হয়, অজন্য ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গতিরূপ ক্রিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। যেমন বৈশেষিক দর্শন মতে, পার্থিব পরমাণুর গতি সত্ত্বেও তাহা ঘটের কারণ হয়।

এস্থলে অর্থ এই যে, প্রকৃতিকে সর্ব্ব কারণ ও বিভু বা ব্যাপক বলা হইল। কিন্তু যখন প্রকৃতি চঞ্চল পরিণামী,—সুতরাং গতিযুক্ত—তখন তাহাকে কিরূপে ব্যাপক বা বিভু বলা যায়। গতির জন্য স্থান ব্যবধান আবশ্যক। প্রকৃতি বিভু ও সর্ব্বব্যাপক হইলে, তাহার গতি থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি মূল কারণ হইতে পারে না। বৈশেষিক দর্শনে এরূপ আপত্তি আছে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন যে পরমাণুকে মূল কারণ বলিয়াছেন, তাহাও ত গতিযুক্ত। সুতরাং বৈশেষিক দার্শনিক পণ্ডিতগণের এ আপত্তি অগ্রাহ্য।

৩৯। যে সকল দ্রব্য প্রসিদ্ধ আছে, প্রধান তাহার অধিক হইলেও দোষ নাই। কেননা দ্রব্যের কোন সংখ্যা নিয়ম নাই।

বৈশেষিক দর্শন মতে, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এই চারি ভূত, এবং আকাশ, কাল, দিক্ আত্মা, ও মন—এই নয় দ্রব্য মাত্র প্রসিদ্ধ আছে। প্রকৃতি ইহাদের অন্তর্গত নহে। অথচ প্রকৃতি দ্রব্য। কেননা, তাহার সংযোগ বিভাগ ও পরিণাম আছে। প্রকৃতির দ্রব্যত্ব স্বীকারে দোষ নাই, কেননা দ্রব্য নয় প্রকার হইবে, এমন নিয়ম নাই।

আর সকল দ্রব্যও কার্য্য নহে। কেননা উক্ত মতে আত্মা কার্য্য নহে।

৪০। সত্ব রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে, তাহারা প্রকৃতির স্বরূপ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সত্ব রজঃ ও তমঃ, ইহারা দ্রব্য। গুণ বা রজ্জুর ন্যায় পুরুষকে বদ্ধ করে বলিয়া ইহাদের গুণ বলে।

এই তিন গুণ ও প্রকৃতির তদাত্ম্য আছে।

সত্বাদি গুণ প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে। তাহারা প্রকৃতির স্বরূপ। যদি ধর্ম্ম বলা হয়, তবে তাহা কার্য্যরূপ ধর্ম্ম না সংযোগরূপ ধর্ম্ম। কার্য্যরূপ ধর্ম্ম বলিলে, এক প্রকৃতিতে দ্রব্যান্তর সংযোগ ব্যতীত সেই বিচিত্র গুণত্রয়ের উৎপত্তি অসম্ভব হয়। আর যদি গুণ (আকাশে শব্দের ন্যায়) নিত্যধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে, যেই ধর্ম্ম হইতেই জগৎ উৎপত্তি কল্পনা করা যায়, তাহা হইতে অতিরিক্ত প্রকৃতি নিষ্প্রয়োজন হয়। সত্বাদিকে প্রকৃতির কার্য্য যে বলা যায়, সে পৃথিবী হইতে দ্বীপের উৎপত্তির ন্যায় প্রকৃতির অংশ রূপে বলা হয়।

৪১। নিজের উপভোগের প্রয়োজন না থাকিলেও, প্রধান পুরুষের জন্য সৃষ্টি করে। যেমন উষ্ট্র পরের জন্য কুঙ্কুম বহন করে।

প্রধান বা প্রকৃতি যে পুরুষের ভোগ ও মোক্ষার্থ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার নিজ প্রয়োজন নাই। এস্থলে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ৩। ৫৬, ৫৭—দৃষ্টব্য।

৪২। কর্ম্মবৈচিত্র্য জন্য সৃষ্টি বৈচিত্র্য হয়।

প্রকৃতি উপাদন অভিন্ন হইলেও নিমিত্ত কারণ কর্ম্ম বিভিন্ন বলিয়া সৃষ্টি বিভিন্ন হয়।

স্বর্ণ এক হইলেও কর্ম্মভেদে মুকুট হারাদি ভেদ হয়।

কর্ম্ম=ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এই দুইরূপ কর্ম্ম, অথবা কর্ম্মবীজ। (বিঃ ভিঃ)

৪৩। সাম্য ও বৈষম্য হইতে দুই রূপ কার্য্য হয়।

সাম্য বা প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম হইতে প্রলয় হয়; আর প্রকৃতির মহদাদি ভাবে বিসদৃশ পরিণাম হইতে সৃষ্টি হয়।

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই প্রকৃতি। গুণত্রয়ের ন্যূনাতিরিক্ত ভাবে অবস্থানই বৈষম্য, আর তুল্যরূপে অবস্থানই সাম্য। গুণত্রয়ের বৈষম্য হইতে সৃষ্টি আর সাম্যাবস্থাই প্রলয়। (বিঃ ভিঃ)

দুইরূপ কার্য্য—অর্থাৎ সৃষ্টি ও লয়। স্থিতি সৃষ্টিরই অন্তর্গত। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় লয়, আর বৈষম্য অবস্থায় সৃষ্টি ও স্থিতি।

৪৪। যে পুরুষ বিমুক্ত বোধ করেন, প্রধান আর তাহার সম্বন্ধে সৃষ্টি করে না। লোকেও দেখা যায় যে, বন্ধন মুক্ত হইলে, আর বন্ধন চাহে না।

পুরুষের দ্বারা প্রকৃতি সাক্ষাৎকার হইলেই, প্রকৃতি কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া সেই পুরুষ হইতে বিযুক্ত হয়। কাজেই সে পুরুষের জন্য আর প্রকৃতি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। যেমন ভৃত্য প্রভুর কার্য্য করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলে, আর সে প্রভুর জন্য কার্য্য করে না।

৪৫। প্রকৃতি অন্য (বদ্ধ) পুরুষের নিকট উপভোগ নিমিত্ত উপসর্পণ করে বটে, কিন্তু তাহাতে মুক্ত পুরুষের ভোগ হয় না। কেন না, তাহার নিমিত্তের অভাব হয়।

মুক্ত পুরুষের ভোগের নিমিত্তকারণ নষ্ট হয়। অবিবেক সেই প্রকৃতি পুরুষ সংযোগের নিমিত্ত কারণ।

যে পুরুষ মুক্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে আর প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত হয় না সত্য, কিন্তু তাহাতে প্রকৃতির প্রবৃত্তি শেষ হয় না। তখন অন্য বদ্ধ পুরুষ সম্বন্ধে প্রকৃতির সৃষ্টি ব্যাপার থাকে। কিন্তু তাহার সহিত আর মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধ থাকে না।

৪৬। পুরুষ বহু (ইহা সাংখ্যশাস্ত্রে) ব্যবস্থিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কোন পুরুষ মুক্ত হইলেই সৃষ্টি নাশ হয় না, কারণ অন্য বদ্ধ পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত থাকে। ইহাতে বহুপুরুষবাদ আসিয়া পড়ে। কিন্তু বহুপুরুষবাদ সাংখ্যশাস্ত্র-সম্মত। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই বাদ শ্রুতিসম্মত।

"অজামেকাং...শ্রুতি। পূর্ব্বে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা বহু পুরুষ প্রতিপাদক।

"যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি...ইতি" শ্রুতি। ইহা বহু পুরুষ প্রতিপাদক।

"একমেব পরংব্রহ্ম...একত্বমনুপশ্যত..." ইত্যাদি শ্রুতিও একত্ববাদ প্রতিপাদক, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

৪৭। যদি উপাধিভেদে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়, বলা যায়, তবে দ্বৈতাপত্তি হয়।

উপাধি—মিথ্যা হইলে তাহা দ্বারা ভেদ হইতে পারে না। উপাধি সত্য হইলে পুরুষও উপাধি—এই দ্বৈত স্বীকার করিতে হয়।

উপাধিকে অবিদ্যাজন্য বলিলে, অবিদ্যাকে সত্য বলিতে হয়, তাহাতেও দ্বৈতাপত্তি হয়। পর সূত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। (বিঃ ভিঃ)

অদ্বৈতবাদ অনুসারে—পুরুষ বহু নহে, পুরুষ একই। তবে যে বহু পুরুষ আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, উপাধি-ভেদই তাহার কারণ। দেহরূপ উপাধি ভেদে পুরুষ বহুত্ব হয় মাত্র। এই বাদের দোষ দেখাইবার জন্য এস্থলে বলা হইতেছে যে, তাহা হইলে উপাধিকে অথবা উপাধির কারণকে স্বতন্ত্র দ্বিতীয় তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং দ্বৈতাপত্তি হয়।

৪৮। উভয় দ্বারাই প্রমাণ বিরোধ হয়।

উভয় দ্বারা—অর্থাৎ উপাধি সত্য হইলে বা অসত্য হইলে, এ উভয় দ্বারাই অদ্বৈতবাদের প্রমাণের বিরোধ হয়।

উপাধি সত্য হইলে দ্বৈত সিদ্ধান্ত হানি হয়। অসত্য হইলে, তাহা কিরূপে পুরুষো বহুত্বের কারণ হইতে পারে?

উপাধিকে অবিদ্যা জন্য বলিলেও সেই দোষ হয়। (বিঃ ভিঃ)

৪৯। উভয়রূপে (এই বহুপুরুষ বাদের সহিত) অবিরোধ হয়। ইহাতে পূর্ব্বাপর শ্রুতির বিরোধ হয় না। অতএব অদ্বৈতবাদের প্রমাণ নাই।

অদ্বৈত শ্রুতি সামান্যপর বা জাতিপর, অথবা প্রশংসাপর এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে, তাহার দ্বৈত শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় না।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও বহুপুরুষ অঙ্গীকৃত। বৈদান্তিকের পূর্ব্ব বা উত্তর পক্ষে তাহার বাধা হয় না। বৈদান্তিক বিকারের অনিত্যতা স্বীকার করেন। তাহাতে বাক্যের আরম্ভ মাত্রেই প্রকৃতি সিদ্ধ হয়। আর একাত্ম সাধক প্রমাণাভাবে উভয় পক্ষেও সিদ্ধ হয় না? (বিঃ ভিঃ)

এ সূত্রে ও পূর্ব্ব সূত্রে উভয় শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 'উভয়' অর্থে উপাধির সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব হইতে পারে, দ্বৈত শ্রুতি ও অদ্বৈত শ্রুতি হইতে পারে, অথবা অদ্বৈতবাদীর পূর্ব্বপক্ষ বা উভয় পক্ষ হইতে পারে। যে অর্থই গ্রহণ করা যাউক, এই উভয় পক্ষ দ্বারা সাংখ্যের বহুপুরুষপদের বাধা হয় না।

৫০। প্রকাশের দ্বারা তাহার সিদ্ধি হইলে কর্ম্মকর্ত্তৃ বিরোধ হয়।

আত্মার স্বপ্রকাশকত্ব দ্বারা আত্মার একত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহ নিজে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না।

একই আত্মা সর্ব্ব উপাধি মধ্যে স্বয়ং প্রকাশিত হন, ইহা বলা যায় না। প্রত্যেক উপাধি মধ্যে সেই উপাধি দ্বারা প্রকাশ্য আত্মা উপাধি ভেদে ভিন্ন, স্বীকার করিতে হয়।

প্রকাশ্য প্রকাশকের সম্বন্ধ ব্যতীত প্রকাশ সিদ্ধি হয় না। আলোক প্রকাশক, কিন্তু প্রকাশ্যের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত তাহা নির্ণয় হয় না। অতএব চৈতন্যরূপ প্রকাশের দ্বারাই চৈতন্যের স্বরূপ সিদ্ধি হয়—ইহা বলা যায় না। যে কর্ত্তা—সে কর্ম্ম হয় না। যেমন জলের দ্বারা সূর্য্যে প্রতিবিম্ব সমবদ্ধ হয়, তেমনই বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা চৈতন্যে চৈতন্য প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ হয়। সুতরাং আত্মা স্বপ্রকাশ,—ইহার অর্থ—আত্মা অন্যের দ্বারা প্রকাশ্য নহে, তাহার জন্য অন্য উপাধির প্রয়োজন নাই, ইহা বলা যায় না।

আত্মা আপনি আপনাকে প্রকাশ করে, ইহা প্রমাণ-বিরুদ্ধ। (বিঃ ভিঃ)

৫১। যাহা জড় হইতে অন্য অথচ যাহা জড়কে প্রকাশ করে, তাহাই চিৎরূপ।

চিৎ জড় হইতে ভিন্ন—জড়ের প্রকাশক। চিৎ প্রকাশরূপ, প্রকাশধর্ম্মযুক্ত নহে। এই জন্য শ্রুতিতে "নেতি নেতি" এই নিষেধ মুখেই চৈতন্যের ইঙ্গিত করা আছে। এই যে অলৌকিক প্রকাশরূপ, ইহার দৃষ্টান্ত অভাবে ব্যাপ্তি গ্রহণ হয় না। তাহা অসম্প্রজ্ঞাত যোগে গম্য। কিন্তু সে অবস্থায় যোগীর জ্ঞান চেষ্টা অভাবে,ইহার কোন লিঙ্গ থাকে না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিযুক্ত যোগীর চরম চেষ্টা সত্ত্বেও জ্ঞানে লিঙ্গ থাকে। এজন্য সে লৌকিকের ন্যায় আত্মার অনুমান করিতে পারে। এ জন্য সে অনুভব রূপ চৈতন্যকে প্রতিপাদন করিতে পারে।

"ইক্ষু ক্ষীর গুড়াদীনাং মাধুর্য্যস্যান্তরং মহৎ।
তথাপি ন তদাদাতুং সরস্বত্যপি শক্যতে॥"

এ জন্য যাহা জড়ের বিপরীত, তাহাকেই চৈতন্য বলিয়া ইঙ্গিত করা হয়। চিত্তে অভিব্যক্ত ভাব কি চৈতন্যরূপ? না, অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় বৃত্তিবিরোধ হইলে যে অলৌকিক অবস্থা,তাহা চৈতন্যরূপ? না, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় বৃত্তিজ্ঞানই চৈতন্যরূপ? অথবা দুঃখ নিবৃত্তি দ্বারা তাহা আনন্দরূপ? আনন্দরূপা কি ভাবাত্মক? সুখ মাত্রেই কি আনন্দ? যখন অজ্ঞাত সুখের জ্ঞান হয় না, তখন আনন্দ ও জ্ঞান এক নহে। আনন্দস্বরূপকে চৈতন্য স্বরূপ বলিলে অদ্বৈত হানি হয়।

যেমন পঞ্চভূত অবিশেষ হইলেও জন্তুরূপে পরিণত পিণ্ডের সেইরূপ সম্বন্ধ হইতে চৈতন্য হয়, আর চৈতন্য স্বপ্রকাশ হইলেও আত্মারই অংশে জড়ত্ব হয়। ইহাও আপত্তি হইতে পারে।

এইরূপে চৈতন্যস্বরূপ প্রমাণের দ্বারা ইঙ্গিত করিতে হইলে নানা আপত্তি হয়। (অনিঃ)

বৈশেষিকেরা বলেন,স্বনিষ্ঠজ্ঞান দ্বারা আপনি আপনার বিষয় হওয়া যায়। তাহাতে কর্ত্তৃকর্ম্ম বিরোধ হয় না। সূর্য্যাদির ন্যায় চেতনে প্রকাশরূপ ধর্ম্ম নাই। চিৎস্বরূপ পদার্থ জড়কে

প্রকাশ করে। জড়ের ব্যাবৃত্তি মাত্রেই চিৎ—চিৎ জড় হইতে ভিন্ন ধর্ম্মযুক্ত কিছু নহে। এই জন্য বিধর্ম্মরূপে "নেতি নেতি" এই ভাবে শ্রুতিতে আত্মার উপদেশ আছে। স্মৃতিতে আছে—

"ইদংতৎ ইতি নির্দ্দিষ্টুং স্বরূপাৎপি ন শক্যতে।

এই সূত্রে চিৎ জড়কেই প্রকাশ করে, আত্মাকে প্রকাশ করে না—এরূপ অর্থ নহে।

এই দুই সূত্রের অর্থ গ্রহণ করা কঠিন। প্রথম সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বৈতবাদ মতে আত্মা স্বপ্রকাশ, সর্ব্ব উপাধিতে আত্মা আপনাকেই প্রকাশ করেন। ইহা সঙ্গত নহে। কারণ আত্মা আপনাকে আপনি প্রকাশ করে বলিলে কর্ত্তৃ কর্ম্ম দোষ হয়, যিনি কর্ত্তা তিনি কর্ম্ম হইয়া পড়েন। আত্মা জড়কেই প্রকাশ করে, চিৎ স্বরূপ আত্মা অচিৎ জড় হইতে ভিন্ন। জড়ের প্রকাশক রূপে তাহা প্রতিপন্ন হয়। আত্মা আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে না। জড় সম্বন্ধে আত্মার অভিব্যক্তি হেতু সর্ব্ব জড়ের বা সর্ব্ব দেহের উপাধির একই প্রকাশক আত্মা স্বীকার করা যায় না। প্রতি উপাধি সম্বন্ধে তাহার প্রকাশক আত্মা পৃথক্। এই অর্থে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ সিদ্ধ হয়। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

অপূর্ব্ব গীতা।

দেখলে পরে অতিরিক্ত　　　হলেও হতে পার্ত্ত তিক্ত
বিশ্বপটের দৃশ্য গুলি।　এখন চুকে গেছে বালাই।
চক্ষু গেলেই মোক্ষ প্রাপ্তি ; থাকে নাক কোন জ্বালাই।
এই দুছত্র পড়্বা মাত্র,　　　চুলকে মাথা এবং গাত্র,
কহেন পাঠক, একটু খানি ভেবেচিন্তে কাম্ড়ে আঙ্গুল :—
"কথাটা ঠিক ; কিন্তু মোরা কাট্‌ছিনে কেউ নিজের লাঙ্গুল"।
তবে একটু বুঝিয়ে বলি :—　　　চোখ থাকতেই অলি-গলি—
ভরা যত গলিচ্ পচা, নজরেতে পড়েই পড়ে।
আমার দেখ! মোহন দৃশ্যই তোলা আছে স্মৃতির ঘরে।
তোমার দেখ্‌ছি জিদটি বেজায়!　　　রাখ্‌বেই রাখ্‌বে চক্ষু বজায়?
ধনুর্ভঙ্গ পণের ফলেই হয়না লব্ধ সিদ্ধি-সীতা।
চক্ষুর এখন নেইক ক্ষতি ; শুন আমার নূতন গীতা।
মনোযোগে শোন শাস্ত্র,　　　মায় সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র,
অর্জ্জুন এবং স্বয়ং কৃষ্ণ কংস এবং কুরুঘাতক,
সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার বঙ্গবাসী প্রিয় পাঠক।
দিনের আলো হলে বোঝাই,　　　ভাল হচ্চে চক্ষু বোঁজাই ;
নইলে তোমার আলোর খেলা থাক্‌বে নাক মোটেই বজায়।
তোমার পোড়া আঁখি তোমায় মজাবে ভাই হাল্‌কা মজায়।
ধর না এই জীবন-যাত্রায়,　　　পালা ছেড়ে সং-এর মাত্রাই
বাড়িয়ে দিলে বেড়েই যাবে শানাবেনা অন্নে সন্নে ;
দৃষ্টান্ত :—মাসিক পত্র, ছাঁপছে চিত্র-পটে গল্পে।
শুনুন পাঠক গীতার বাণী　　　(পাঠিকারা একটু খানি
সরে দাঁড়ান ;) আলোর ঝলক্, রচে রূপের ক্ষুদ্র সীমা।
অপার পথের দেদার দৃষ্টি, ঝল্‌সে তাহে রুদ্ধ কি-না?
ভারি কলসী বেঁধে গলায়,　　　যাওগো ডুবে অতল তলায়।
একি হল অবশেষে? আমার উপদেশের জ্বালায়।
ছট্‌ফটিয়ে গীতা ফেলে,ডাঙ্গা খুঁজে, পাঠক পালায়। শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আর্য্যভট।

'দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং যজেত' ইত্যাদি বেদবিহিত ক্রিয়া সকলের কালজ্ঞান জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য বেদে বহু স্থানে জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত তিথি-নক্ষত্র-মাসাদির আলোচনা আছে। সেই সকলের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক মহামুনি লগধ বেদাঙ্গজ্যোতিষ নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আরও ১৮ অষ্টাদশ মহর্ষি জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; কশ্যপাদির গ্রন্থে তাঁহাদের নাম দৃষ্ট হয়,—

সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বসিষ্ঠোহত্রি পরাশরঃ।
কশ্যপো নারদোগর্গো মরীচি র্মনুরঙ্গিরাঃ ॥
লোমশঃ পৌলিশশ্চৈব চ্যবনোযবনো ভৃগুঃ।
শৌনকোহষ্টাদশশ্চৈতে জ্যোতিঃ শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ ॥

পরাশরের গ্রন্থে এই অষ্টাদশ সংখ্যা হইতে অতিরিক্ত পুলস্ত্যের নাম পাওয়া যায়, সুতরাং তাঁহার মতে ঊনবিংশতি সংখ্যক মুনি জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক।

তাঁহার গ্রন্থে এক স্থানে লোমশ ও অন্য স্থানে রোমক শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং লোমশ ও রোমক শব্দ এক জনেরই নাম, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার উক্তি এই,—লোমশো যবনঃ সূর্য্যশ্চ্যবনঃ কশ্যপো ভৃগুঃ ইত্যাদি।

অন্যত্র—

পুলস্ত্যাচার্য্য গর্গাত্রি রোমকাদিভিরীরিতম্ ইত্যাদি।

বরাহমিহির কৃত পঞ্চ সিদ্ধান্তিকায় আমরা রোমক সিদ্ধান্তের পরিচয় প্রাপ্ত হই।

তিনি পৌলিশ, রোমক, বশিষ্ঠ, সূর্য্য ও ব্রহ্মা, এই পাঁচ জনের মত সিদ্ধান্তিকায় উল্লেখ করিয়াছেন,—

পৌলিশ রোমক বাশিষ্ঠ সৌর পৈতা মহাস্তুপঞ্চসিদ্ধান্তাঃ। এই রোমক, রোমনগরবাসী জ্যোতির্ব্বিৎ।

সূর্য্যারুণ সংবাদে সূর্য্য অরুণকে বলিয়াছেন—

রোমকং রোমকায়োক্তং ময়া যবনজাতিষু।
জাতেন ব্রহ্মণঃ শাপাৎ তথা তুর্যবনস্থচ।
রোমকে নগরে তচ্চ রোমকেন চ বিস্তৃতম্।
ইত্যাদি।

উপরোক্ত জ্যোতিষ গ্রন্থগুলি সিদ্ধান্তশাস্ত্র হইলে, উহা বর্ত্তমান প্রচলিত সিদ্ধান্ত শাস্ত্রগুলির ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। প্রচলিত সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের মতে পাটীগণিত, বীজগণিত, পৃথিবীস্থ নানাদেশ নদনদী প্রভৃতির বর্ণনা গ্রহবোধোপযোগী যন্ত্রাদির নির্ম্মাণও গ্রহবোধের উপায় ত্রুটি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত কালের গণনা, ব্রাহ্মমান, মনুষ্যমান প্রভৃতির প্রভেদ, গ্রহগণের গতি, ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুই প্রকার গণিত, গ্রহবিষয়ক নানা প্রকার প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর যে গ্রন্থে থাকে, তাহাকে সিদ্ধান্ত গ্রন্থ বলে। ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

ত্রুট্যাদি প্রলয়ান্তকালকলনামানপ্রভেদঃ ক্রমাৎ
চারশ্চ দ্যুসদাং দ্বিধাচগণিতং প্রশ্নাস্তথা সোত্তরাঃ।
ভূধিষ্ণ্য গ্রহসংস্থিতেশ্চ কথনং যন্ত্রাদি যত্রোচ্যতে
সিদ্ধান্তঃ স উদাহৃতোহত্রগণিতস্কন্ধ প্রবন্ধে বুধৈঃ।

বর্ত্তমান কালের এতাদৃশ সিদ্ধান্ত গ্রন্থের প্রথম প্রবর্ত্তক মহামতি আর্য্যভট। আমরা তিন জন আর্য্যভটের নাম জ্যোতিষ গ্রন্থে দেখিতে পাই। মহাসিদ্ধান্ত-প্রণেতা আর্য্যভট, বৃদ্ধার্য্যভট ও লঘ্বার্য্যভট। মহাসিদ্ধান্তে পাতাধিকারে আর্য্যভট, বৃদ্ধার্য্যভটের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তৎপ্রণীত গ্রন্থও পরাশরের মত অবলম্বন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করার কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই—

বৃদ্ধার্য্যভট প্রোক্তাৎ সিদ্ধান্তাদ্যন্মহাকালাৎ।
পাঠৈর্গতমুচ্ছেদং বিশেষিতং তন্ময়াস্বোক্ত্যা।

লঘ্বার্য্যভটের গ্রন্থও পাওয়া যায় এবং ভাস্করাচার্য্য গোলাধ্যায়ে ভুবনকোশের টীকায় "অতোহযুত ঘ্নং ব্যাসে ২০০০০ দ্বিকাগ্ন্যষ্টষমর্ত্তু মিতঃ ৬২৮৩২ পরিধিরার্য্যভটাদ্যৈরঙ্গীকৃতঃ",

এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহাও আর্য্যভট মহাসিদ্ধান্তে দেখা যায় না। লম্বার্য্যভটের গণিত পাদে দৃষ্ট হয়,—

চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্টিস্তথা সহস্রাণাম্।
অযুতদ্বয় বিষ্কম্ভস্যাসন্নো বৃত্ত পরিণাহঃ।

এই তিন জন আর্য্যভটের মধ্যে আমরা মহাসিদ্ধান্ত ও আর্য্যভটতন্ত্রনামক গ্রন্থপ্রণেতা আর্য্যভটের বৃত্তান্তই এ প্রবন্ধে বর্ণনা করিব। তিনি কাল ক্রিয়াপাদের দশম শ্লোকে লিখিয়াছেন—

ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম
জন্মনোঽতীতাঃ।

অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এই তিন যুগ অতীত হইয়া কলির ও ৩৬০০ শত বৎসর গত হইলে, ২৩ বৎসর বয়সে আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম। কলির ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইলে শকবৎসরের প্রবর্ত্তন হয়; সুতরাং ৪২১ শকে আর্য্যভট আর্য্যভটতন্ত্র নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহা হইতে ২৩ বিয়োগ করিলে ৩৯৮ শকে তাঁহার জন্ম জানা যায়।

আর্য্যভট কুসুমপুরে বর্ত্তমান পাটনা নগরে অবস্থান করিতেন, ইহা তাহার প্রণীত আর্য্যভটতন্ত্রের গণিতপাদ হইতে অবগত হওয়া যায়।

ব্রহ্ম কুশশিবুধ ভৃগু রবি কুজজীব কোণ
ভগণান্ নমস্কৃত্য।
আর্য্যভটস্ত্বিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চ্চিতং
জ্ঞানং।

আর্য্যভট গণিতবিষয়ে অতিশয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতগৌরব মহামতিমান্ ভাস্করাচার্য্য লীলাবতী নামক পাটীগণিতে যে সকল গণিতের নিয়ম লিখিয়াছেন, তাহার প্রায় সবগুলিই ইঁহার প্রণীত মহাসিদ্ধান্তে দেখা যায়। পরন্তু তিনি গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, ঘন ও ঘনমূলের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ের যে প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান সময়ে ৯ নয় সংখ্যা বিয়োগ করিয়া গুণফলের শুদ্ধতা পরীক্ষিত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, আরব দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অলহুশ ৯৮০—১০২৭ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে প্রথম এই নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং লুকসাদিবর্গ নামক ইউরোপীয় গণিতজ্ঞ পণ্ডিত (১৫১০ খ্রীঃ ইহার মৃত্যু হয়) সর্ব্বপ্রথম এই নিয়ম ইউরোপে প্রচার করেন। কিন্তু আমরা এই নিয়ম কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তিকালে প্রণীত আর্য্যভটের মহাসিদ্ধান্তে দেখিতে পাই। তাহার নিয়মগুলি এই—

(ক) গুণফলের শুদ্ধতা।

গুণ্য, গুণক ও গুণফলের অঙ্কগুলি পৃথক পৃথক যোগ কর; যোগফলে যদি দশক বা দশক স্থানীয় অঙ্ক হয়, তাহারও অঙ্কগুলি যোগ করিয়া একক স্থানীয় অঙ্ক কর। গুণ্যের একক স্থানীয় অঙ্ককে গুণকের একক স্থানীয় অঙ্ক দ্বারা গুণ করিয়া তাহারও উপরি লিখিত নিয়মে, একক স্থানীয় অঙ্ক নির্ণয় কর। যদি এই অঙ্ক গুণফলের একক অঙ্কের সমান হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, গুণফল ঠিক হইয়াছে।

গুণ্য—৮৯৬৩৫, গুণক—২৮৭,
গুণফল—২৫৭২৫২৪৫

গুণ্য অঙ্কগুলির যোগ ৩১, ইহার অঙ্কদ্বয়ের যোগ ৪১, গুণকের অঙ্কযোগ ১৭, ইহার অঙ্কযোগ ৮। গুণ্য ও গুণকের এককাঙ্কদ্বয়ের খতি ৮ × ৪ = ৩২, ইহার অঙ্কযোগ ৫, ইহা গুণফলের অঙ্কযোগ ৩২ এর অঙ্ক যোগ ৫ পাঁচের সমান; সুতরাং জানা গেল গুণফল শুদ্ধ হইয়াছে।

(খ) ভাগফলের শুদ্ধতা।

ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষের অঙ্কগুলি পৃথক্ পৃথক্ যোগ করিয়া তাহাদের একক স্থানীয় অঙ্ক গ্রহণ কর। ভাগফল ও ভাজকের একক স্থানীয় অঙ্কদ্বয়ের গুণ করিয়া তাহারও পুনর্ব্বার একক স্থানীয় অঙ্ক লও, এবং তাহা ভাগশেষের একক স্থানীয় অঙ্কের সহিত যোগ করিয়া তাহারও একক স্থানীয় অঙ্ক লও। যদি এই অঙ্ক ভাজ্যের একক অঙ্কের সমান হয়, তবে জানা যাইবে, ভাগফল ও ভাগশেষ উভয়ই ঠিক হইয়াছে। যথা—

ভাজ্য ৩৫৪২৬৯৮৩১, ভাজক ৫২৩১, ভাগফল ৬৭৭২৫, ভাগশেষ ৩৫৬। পূর্ব্বনিয়মে

ভাজ্যের এককাঙ্ক ৫,ভাজ্যের এককাঙ্ক ২,ভাগ ফলের এককাঙ্ক ৯, ভাগশেষের এককাঙ্ক ৫।

ভাগফল ও ভাজকের একক অঙ্কদ্বয়ের ঘাত ৯×২=১৮,১+৮=৯, ইহার সহিত ভাগশেষের অঙ্ক যোগ করিলে ৯+৫=১৪, ১+৪=৫ ইহা ভাজ্যের এককাঙ্কের সমান; সুতরাং ভাগফল ও শেষ নির্ণয়ে অশুদ্ধি নাই।

(গ) বর্গমূলের শুদ্ধি।

বর্গরাশি, বর্গমূল ও শেষের অঙ্কগুলির পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এককাঙ্ক নির্ণয় করত বর্গমূলের এককাঙ্কের বর্গের সহিত শেষের এককাঙ্ক যোগ কর। যদি তাহা বর্গের একক স্থানীয় অঙ্কের সমান হয়, তবে শুদ্ধ হইয়াছে জানা যায়।

বর্গরাশি ৮৮২২৩, বর্গমূল ২৯৭, শেষ ১৪, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বর্গরাশির এককাঙ্ক ৫, বর্গমূলের এককাঙ্ক ৯, শেষের এককাঙ্ক ৫।

বর্গমূলের এককাঙ্কের বর্গ ৮১, ইহার এককাঙ্ক ৯, ইহার সহিত শেষের অঙ্ক ৫ যোগ করিয়া ১৪, ইহার এককাঙ্ক ৫ বর্গরাশির এককাঙ্কের সমান; সুতরাং জানা গেল অঙ্ক ঠিক হইয়াছে।

(ঘ) ঘনমূলের শুদ্ধতা।

ঘন, ঘনমূল ও শেষের অঙ্কগুলির পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এককাঙ্ক নিশ্চয় করিয়া, ঘনমূলের এককাঙ্কের ঘনের এককাঙ্কের সহিত শেষের এককাঙ্ক যোগ করিয়া, তাহার এককাঙ্কের সহিত ঘনরাশির এককাঙ্কের সমতা হইলে ঘনমূলও শেষ শুদ্ধ হইয়াছে জানা যায় যথা—

ঘন ১৭৫৯৩, ঘনমূল ২৬, শেষ ১৭। ঘনের পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এককাঙ্ক ৭, ঘনমূলের এককাঙ্ক ৮, শেষের এককাঙ্ক ৮, ঘনমূলের এককাঙ্কের ঘন ৫১২,ইহার এককাঙ্ক ৮, ইহার সহিত শেষের এককাঙ্ক ৮ যোগ করিলে ১৬ হয়, ইহার এককাঙ্ক ৭ ঘনের এককাঙ্কের সমান; সুতরাং ইহা শুদ্ধ।

উপর্য্যুক্ত নিয়ম পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে,ইহাই ৯ বিয়োগ করিয়া শুদ্ধতা জানিবার উপায়ের প্রথম সোপান। ইহা হইতেই পরবর্ত্তী সময়ে ৯ বিয়োগ নিয়মের আবিষ্কার হইয়াছে। আর্য্যভট্ট কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এই নিয়ম তাহার পরবর্ত্তী কোন গণিত গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন নাই।

আর্য্যভট্টের নিয়মগুলি এই,—

গুণ্য গুণক গুণন ভুবাং রাশীনাং
স্বাঙ্কযোগকঃ কার্য্যঃ।
ক—স্থানান্তস্তদ্বদ্ভাজ্য ভাজকাপ্তি
শেষকাদীনাম্॥
তদ্গুণ্য গুণক হতি যুতি তুল্যে গুণনোদ্ভবে
স্ফুটং গুণনম্।
আপ্তি চ্ছেদক ঘাতে শেষযুতে যো ভবেদঙ্কঃ॥
তেন সমানে ভাজ্যে স্পষ্টং লব্ধং তথা শেষম্।
বর্গৈক্যে পদযুতি কৃতি শেষৈক্য সমে স্ফুটৌ
স্বপদ বর্গৌ॥
ঘনযোগ সমে ঘনপদযোগ ঘনৈক্যে
সশেষকে তৌ চ।
এবং গুণাদীনাং শোধনিকেয়ং সুখোপায়াৎ॥

উপর্য্যুক্ত শ্লোকে যে "ক স্থান" শব্দটী আছে, তাহার অর্থ একক স্থান, আর্য্যভট্টের সিদ্ধান্তে ক শব্দে ১ সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে।

রূপাৎ কটপযপূর্ব্বা বর্ণা বর্ণক্রমাৎ ভবন্ত্যাঙ্কাঃ
এতনৌ শূন্যং প্রথমার্থে আ চ্ছেদে এ তৃতীয়ার্থে॥

প্রথম বর্গ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ,।
দ্বিতীয় বর্গ—ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন।
তৃতীয় বর্গ—প, ফ, ব, ভ, ম।
চতুর্থ বর্গ—য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ।

ক=১, খ=২, গ=৩, ঘ=৪, ঙ=৫, চ=৬, ছ=৭, জ=৮, ঝ=৯, ঞ=১০।

ট=১, ঠ=২, ড=৩, ঢ=৪, ণ=৫, ত=৬, থ=৭, দ=৮, ধ=৯, ন=০।

প=১, ফ=২, ব=৩, ভ=৪, ম=৫।

য=১, র=২, ল=৩, ব=৪, শ=৫ ষ=৬, স=৭, হ=৮।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর ভ্রমণ মত প্রচার আর্য্যভটের অন্ত এক অক্ষয় কীর্ত্তি। যদিও আর্য্যভটের বহু পূর্ব্বেই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণের ভ্রমণ স্বীকার করিয়াই আর্য্য ঋষিগণ গ্রহগণের কল্পভগন অর্থাৎ সৃষ্টির আরম্ভ হইতে সৃষ্টির অন্ত পর্য্যন্ত কালে যতবার গ্রহগণের আবর্ত্তন হইবে, তাহার পরিমাণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা স্পষ্টভাবে পৃথিবীর ভ্রমণ মত প্রকাশ করেন নাই। আর্য্যভটের

গ্রন্থেই আমরা স্পষ্টভাবে তাহা জানিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন,—

অনুকুল গতি র্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং
যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সম পশ্চিমগানি লঙ্কায়াং।

গতিশীল নৌকার আরোহিগণ যেরূপ তীরস্থ পর্ব্বতকেও নৌকার বিপরীত দিকে গমনকারী বিবেচনা করেন, তদ্রূপ পৃথিবী পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিক গমন করিলেও আমাদিগের ধারণা, নক্ষত্রগণ পশ্চিমদিকে যাইতেছে। লঙ্কা বিষুবদ্বৃত্তের পশ্চিমদিকে নিম্নস্থ দেশ, এজন্য সেস্থানে মস্তকোপরি নক্ষত্রগুলিকে যাইতে দেখা যায়, এজন্যই 'সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াং' এইরূপ লিখিয়াছেন।

আর্য্যভটের পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তকারগণ যুক্তিবিরুদ্ধ উপায়ে পৃথিবীর ভ্রমণমত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন,

"আবর্ত্তনমুর্ব্ব্যাশ্চেন্নপতন্তি সমুচ্ছ্রয়াঃ কস্মাৎ।"

ইত্যাদি। যদি পৃথিবীর ভ্রমণ হইত, তাহা হইলে উচ্চ অট্টালিকাদি কেন পড়িয়া যায় না? পৃথিবীর সহিত অট্টালিকা প্রভৃতিরও সমান গতি হওয়ায় তাহাদের পতনের সম্ভাবনা নাই।

আর্য্যভটের প্রধান শিষ্য শিষ্যধীবৃদ্ধিদ নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থের প্রণেতা লল্লাচার্য্যও পৃথিবীর ভ্রমণ মতের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই,—

যদি চ ভ্রমতি ক্ষমা তদা স্বকুলায়ং কথ-
মাপ্নুয়ুঃ খগাঃ? ইত্যাদি।

পৃথিবীর সহিত বায়ুরও ভ্রমণ হয়, ইহা লল্লাচার্য্য না বুঝিয়াই এরূপ লিখিয়াছেন।

আর্য্যভটের অন্য এক বিশেষেত্ব।

তিনি অক্ষর দ্বারা সংখ্যার কাজ সম্পাদন করিয়াছেন। যেমন সৃষ্টির আদি হইতে লয় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মারদিন ৪৩২০০০০০০০ বৎসর তাহাকে অর্য্যভট লিখিয়াছেন—

"কল্পে সূর্য্যাদীনাংভগণা ঘড ফেননেননমু-
নীনাঃ।"

পূর্ব্ব প্রদর্শিত নিয়মে ঘ = ৪, ড = ৩, ফ = ২, ন = ০। স্বরভেদে সংখ্যার ভেদ হয় না, সুতরাং ৪৩২০০০০০০০ হইল।

ভুবন কোশ বর্ণনে আর্য্যভটের বিশেষত্ব।

ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি অন্য সিদ্ধান্তকারগণ লিখিয়াছেন, গঙ্গানদী বিষ্ণুপদ হইতে নির্গত হইয়া মেরুপর্ব্বতে চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। তাহার একাধারা মেরুপর্ব্বতের পূর্ব্বদিকস্থ মন্দর পর্ব্বতের অন্তঃপাতী অরুণ নামক সরোবরের সহিত মিশ্রিত ও পুনর্ব্বার তথা হইতে ভদ্রাশ্ব নামক বর্ষে গমন করিয়াছে, তাহার নাম সীতা নদী। এক প্রবাহ মেরুপর্ব্বতের দক্ষিণস্থ গন্ধমাদন পর্ব্বতের অন্তর্গত মানস-সরোবরের সহিত মিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছে, তাহার নাম অলকনন্দা। এক স্রোত মেরু পর্ব্বতের পশ্চিমদিকস্থ বিপুল নামক পর্ব্বতস্থ মহা হ্রদ নামক সরোবরের সহিত মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে কেতুমান বর্ষে গমন করিয়াছে, তাহার নাম চক্ষু নদী এবং এক প্রবাহ মেরুর উত্তর দিকস্থ সুপার্শ্ব নামক পর্ব্বতের অন্তঃপাতী শ্বেত নামক হ্রদে মিশ্রিত হইয়া উত্তর কুরু বর্ষে গমন করিয়াছে, তাহার নাম ভদ্রা নদী।

আর্য্যভট উপরোক্ত ৪টী সরোবর হইতে ৪টী পৃথক্ পৃথক্ নদী উৎপন্ন হইয়া উল্লিখিত চারিদেশে গমন করিয়াছে, এইরূপ বলিয়াছেন।

আর্য্যভটের অন্য বিশেষত্ব।

লল্লাচার্য্য ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রায় সকল সিদ্ধান্তকারই অন্যের মত খণ্ডন করিতে যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু আর্য্যভট কখনই অন্যের মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান নাই। নিজে যাহা যুক্তিযুক্ত বুঝিয়াছেন, তাহাই স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

কলির ৬৫৩ বর্ষে যুধিষ্ঠির রাজত্বে করিতেন। সে সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল,– আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ ইত্যাদি।

আর্য্যভট লিখিয়াছেন, এক কল্পে সপ্তর্ষি মণ্ডল ১৫৯৯৯৮ বার ভ্রমণ করেন। সে মতে গননা করিলে ৬৫৩ কলিবর্ষে অশ্লেষা নক্ষত্রের শেষ ভাগে সপ্তর্ষি মণ্ডলের স্থিতি হয়, তাহার ১০ বৎসর পরে মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি মণ্ডল গমন করেন। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব

সময়ে 'আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ' এই বরাহমিহিরের উক্তির সহিত আর্য্যভটের মত এক হইতেছে।

ভারত-গৌরব মহামতিমান্ আর্য্যভটের বিষয়ে অনেক বর্ণনীয় আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে ইচ্ছা করি না। তৎপ্রণীত আর্য্যভট-তন্ত্র ও মহা সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ গ্রন্থদ্বয় তাঁহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।

হিন্দুদিগের নভোবায়ু-বিজ্ঞান

বর্ত্তমানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় নূতন শাখারূপে নভোবায়ুবিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে। বহু পুরাকালেই ভারতবর্ষে এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা সমারব্ধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে এই বিজ্ঞানের কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, আমাদিগের উপস্থিত আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহাই প্রকাশিত হইবে।

নভঃ ও বায়ুর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ-যোগ, তাহা আমরা বায়ুর "নভস্বান্" নাম হইতেই বুঝিতে পারি। নভের সহিত মেঘেরও যোগের বিষয় নভের "মেঘবর্ত্ম" নাম হইতে জানিতে পারা যায়, যথা, "নভসং মেঘাবর্ত্ম বিহায়সম্।" সুতরাং নভোবায়ু-বিজ্ঞানের দ্বারা প্রধানতঃ মেঘ ও বায়ুর বিজ্ঞানই বুঝা যায়। আমাদের প্রচলিত "জলবায়ু" শব্দ এবং "আব্‌হাওয়া" শব্দ দ্বারা আমরা যাহা বুঝি, "নভোবায়ু"ও তাহাই বুঝাইয়া থাকে। মেঘেই জলের কারণ বলিয়া মেঘ দ্বারা যে জল বুঝাইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

নভ, মেঘ ও বায়ুর আধার কিন্তু সূর্য্য, নভের অধিষ্ঠাতা, এই জন্যই সূর্য্যের এক নাম "নভোমণি", "নভশ্চক্ষু।" ইহা হইতে সূর্য্যের সহিত যে নভের প্রধান সম্পর্ক, তাহা বুঝা যাইতেছে। সুতরাং নভোবায়ু বিজ্ঞানের সূর্য্যই যে মূল হইতেছে, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস প্রভৃতি পরিবর্ত্তন সূর্য্যের দ্বারাই যে হইতেছে, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে স্পষ্টই সূর্য্য-রশ্মিকেই শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতির কারণ বলিয়া বর্ণনা করা যায়, যথা—

"সূর্য্যরশ্মি সহস্রেচ বর্ষাশীতোষ্ণ নিঃস্রবঃ ॥"
"সূর্য্যের সহস্র রশ্মিতে বর্ষা,
শীত ও উষ্ণের সম্পর্ক।"

সূর্য্যের রশ্মিদ্বারা জল হইতে বাষ্প আকৃষ্ট হইয়া মেঘে পরিণত হয় এবং সূর্য্যের উত্তাপে বায়ু প্রবহমান হয়, ইহা হইতেই মেঘ ও বায়ুর সহিত সূর্য্যের সম্বন্ধ হইতেছে এবং ইহাদের পরিবর্ত্তনে পৃথিবীতে ঋতু প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হয় বলিয়াই, সূর্য্য ঋতু প্রভৃতি পরিবর্ত্তনের মূল কারণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সূর্য্যের গতি পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রতি মাসে যে বিভিন্নতা হয়, তাহা হইতেই বার মাসের বার সূর্য্য কল্পিত হইয়া সূর্য্য "দ্বাদশাত্মা" নামে অভিহিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক সূর্য্য পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়া দ্বাদশ সূর্য্য দ্বাদশ আদিত্য হইয়াছে।

সূর্য্যের যেমন আমরা দ্বাদশ রূপ দেখিতে পাই, বায়ুরও আমরা তেমনই সপ্তরূপ দেখিতে পাই, যথা,—

"প্রাবাহো নিবহশ্চৈব উদ্বহঃ সংবহস্তথা।
বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবহস্তথৈবচ ॥
অন্তরীক্ষে চ বাহ্যেতে পৃথঙ্মার্গবিচারিণঃ।
মহেন্দ্র প্রবিভক্তাংশা মরুতঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ ॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত দেবী-পুরাণে কাল
ব্যবস্থানামাধ্যায়।

লিঙ্গপুরাণে ইহাদের যে সপ্তনাম পাওয়া যায়, সেই সপ্ত নামই অধিক প্রচলিত। সেই সপ্তনাম এই—

"আবহঃ প্রবহশ্চৈব ততশ্চানুবহস্তথা। ৩৭
সংবহো নিবহশ্চাম ততশ্চোর্দ্ধং পরাবহঃ।
দ্বিজাঃ পরিবহশ্চেতি বায়োর্বৈ সপ্তনেময়ঃ ॥" ৩৮
৫৩ অধ্যায়।

এই সপ্তবায়ুর প্রত্যেকের সাত সাত প্রকার ভেদ ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ বায়ু ৪৯ প্রকারের হয়। উর্দ্ধোর্দ্ধ-ক্রমে নভোমণ্ডলে ও তৎবহির্দ্দেশে বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন স্তরেরই যে পূর্ব্বোক্ত ভেদ ও নাম, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণের দিগ্বিজয় বর্ণনা উপলক্ষে আমরা অষ্টপ্রকার বায়ুস্তর বা "বায়ুমার্গের" উল্লেখ প্রাপ্ত হই। যাঁহারা আকাশের ঊর্দ্ধদেশের ভিন্ন ভিন্ন বায়ুস্তর আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধ্যবসায় ও পর্য্যবেক্ষণ যে অসাধারণ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

মেঘের আমরা প্রধান চারি জাতির উল্লেখ প্রাপ্ত হই। যথা—

"আবর্ত্তং বিদ্ধি সংবর্ত্তং পুষ্করং দ্রোণমম্বুদম্।"

"আবর্ত্ত, সংবর্ত্ত, পুষ্কর ও দ্রোণ।"

ইহাদের প্রকৃতি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"আবর্ত্তো নির্জ্জলোমেঘ সংবর্ত্তশ্চ বহূদকঃ।
পুষ্করো দুষ্করজলো দ্রোণঃ শস্যপ্রপূরকঃ॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত জ্যোতিস্তত্ত্বম্।

"আবর্ত্ত মেঘ জলহীন, সংবর্ত্ত বহুজল-বিশিষ্ট, পুষ্কর মেঘ স্বল্প জল বর্ষণকারী—দ্রোণ শস্যপোষণকারী।"

যে প্রকারে মেঘের উৎপত্তি ও বর্ষণ হয়, তাহা পুরাণে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"তেজোহ সর্ব্বভূতেভ্য আদত্তেরশ্মিভির্জ্জলম্।
সমুদ্রাত্বস্তসাং যোগাদ্রশ্ময়ঃ প্রবহন্ত্যপঃ॥
অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
সর্ব্বভূতহিতার্থায় বায়ুভূতাঃ সমন্ততঃ॥"

"(সূর্য্য) তেজই সমস্ত বস্তু হইতে কিরণজাল যোগে জল আহরণ করে। সমুদ্রের জলের সহিত সম্পর্ক হইতে সমুদ্র হইতেও রশ্মি সকল জল আহরণ করে। সেই জলরূপ মেঘ (অভ্র) হইতে বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্বসৃষ্টির উপকারের জন্য বায়ুযুক্ত জল (বৃষ্টি) সর্ব্বত্র পতিত হয়।"

শীতলবায়ুর সংস্পর্শে বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হওয়ায় প্রাকৃতিক নিয়মই এখানে বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া বৃষ্টি পাতের বর্ণনায় পাওয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

মেঘ সকল কতদূর ঊর্দ্ধদেশে থাকিয়া বর্ষণ করে, তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"জীমূতা নামতে মেঘা যদেভ্যজীবসম্ভবাঃ।
বিদ্যুদ্গুণবিহীনাশ্চ জলধারাবলম্বিনঃ॥
মৃদুসেকা মহাকায়া আবহস্থচ সানুগাঃ।
ক্রোশমাত্রাচ্চ বর্ষন্তি ক্রোশার্দ্ধদপিবাপুনঃ।
পর্ব্বতাগ্র নিতম্বেষু বর্ষন্তি বিপিনেষুচ॥
বলাকা গার্ভিশ্চৈব বলাকা গর্ভধারিণঃ।
ব্রহ্মজা নামতে মেঘা ব্রহ্মানিঃশ্বাস সম্ভবাঃ॥
দ্বিতীয়ং প্রবহং বায়ুং মেঘাস্তেতু সমাশ্রিতাঃ।
ইতো যোজন মাত্রাচ্চ সার্দ্ধোর্দ্ধাংদ্বিকৃতাদপি॥
বৃষ্টি সর্গাদ্বিবস্তেষাং ধারাসারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

"বিদ্যুৎ-বিরহিত জলধারার আধার যে সকল মেঘ হইতে জীব জন্মে, তাহাদিগকে জীমূত বলে। ইহারা বৃহদাকার এবং স্বল্পবেগে জলবর্ষণ করে। ইহারা অর্দ্ধক্রোশ বা এক ক্রোশ উপর হইতে বর্ষণ করিয়া থাকে।

যে সমস্ত বলাকা গর্ভসঞ্চারকারী বলাকা বা গর্দ্দভ নামক মেঘ এক ক্রোশ বা অর্দ্ধক্রোশ উপর হইতে পর্ব্বতের উপর ও মধ্যদেশ এবং অরণ্যে বর্ষণ করে—তাহাদিগকে ব্রহ্মজ মেঘ বলিয়া থাকে, কারণ ইহারা ব্রহ্মনিঃশ্বাস হইতে সঞ্জাত। ইহারা দ্বিতীয় প্রবহবায়ুকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে এক যোজন, দেড় যোজন, বা দুই যোজন ঊর্দ্ধ শূন্য হইতে ইহাদের বর্ষণ হইয়া থাকে বলিয়া ইহারা ধারাসার নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।"

তৃতীয় পুষ্করাবর্ত্তক প্রলয়কারী মেঘ সর্ব্বোর্দ্ধ বায়ুস্তরে বর্ত্তমান। ইহারা বিচিত্রাকৃতি—ঘোর গর্জ্জনকারী এবং ভয়ঙ্কর বিদ্যুদগ্নির আধার। যথা—

"শক্রেণ পক্ষাবচ্ছিন্না পর্ব্বতানাং মহৌজসাম্।
কামগানাং প্রবর্ত্তানাং প্রজানাং শিবমিচ্ছতা॥
পুষ্করাবর্ত্তকাস্তেন কারণেনেহ বিশ্রুতাঃ।
নানারূপইরাশ্চৈব মহাঘোরস্বনাশ্চতে॥
কল্পান্তবৃষ্টেঃ স্রষ্টারঃ সংবর্ত্তাগ্নের্নিয়ামকাঃ।
বর্ষন্তি তে যুগান্তেষু তৃতীয়াস্তেপ্রকীর্ত্তিতাঃ॥
অনেকরূপ সংস্থানাঃ পূরয়ন্তো মহীং জলৈঃ।
বায়ুং পরিবহং তেস্ত্বারাশ্রিতাঃ কল্পসাধকাঃ॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত ব্রহ্মাণ্ডে ৫৮ অধ্যায়ঃ।

"সপক্ষ মহাবল পর্ব্বত সকল যদৃচ্ছাক্রমে উড্ডয়ন করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্রলোক-দিগের হিতেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যাহাদের পক্ষচ্ছেদ করিয়াছিলেন, তাহারা এই কারণেই পুষ্করাবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ইহারা বিবিধরূপ যুক্ত ঘোর গর্জ্জনকারী প্রলয় বৃষ্টির উৎপাদক প্রলয়াগ্নির আধার। ইহারা প্রলয়ের সময় বর্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা তৃতীয় প্রকার মেঘ বলিয়া কীর্ত্তিত। ইহারা অনেক

রূপধারী জলের দ্বারা পৃথিবী প্লাবন করিয়া থাকে বলিয়া প্রলয়-সধক।"

তুষার ও নীহার পর্জ্জন্য ও দিগ্‌গজ নামক মেঘ সকল হইতে নির্গত হইয়া থাকে। ইহারা সকল মেঘের শ্রেষ্ঠ। ইহারা সর্ব্বোর্দ্ধে পরিবাহ বায়ুস্তর অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান থাকে। ইহাদের এইরূপ বিবরণ পুরাণে পাওয়া যায় :—

"তেষাং শ্রেষ্ঠশ্চ পর্জ্জন্যশ্চত্বারশ্চৈব দিগ্‌গজাঃ ॥
গজানাং পর্ব্বতানাং চ মেঘানাং ভোগিভিঃ সহ।
কুলমেকং দ্বিধাভূতং যোনিরেকা জলংস্মৃতম্ ॥
পর্জ্জন্যো দিগ্‌গজাশ্চৈব হেমন্তে শীতসম্ভবম্।
তুষারনর্ষং বর্ষন্তি বৃদ্ধাহ্যন্ন বিবৃদ্ধয়ে ॥
ষষ্ঠঃ পরিবহোনাম বায়ুস্তেষাং পরায়ণঃ।
যোঽসৌ বিভর্ত্তি ভগবন্ গঙ্গামাকাশ গোচরাম্।
দিব্যামৃত জলাং পুণ্যাং ত্রিপথামিতি বিশ্রুতম্।
তস্যা বিস্পন্দিতং তোয়াং দিগ্‌গজাঃ পৃথুভিঃ
করৈঃ ॥
শীকরান্ সম্প্রমুঞ্চন্তি নীহার ইতি সম্মৃতঃ ॥

১৭ হইতে ২২, মৎস্যপুরাণ, ১২৫ অধ্যায়।

"এতন্মধ্যে পর্জ্জন্য শ্রেষ্ঠ। ইহা ছাড়া চারিটী দিগ্‌গজও প্রধান। গজ, পর্ব্বত, মেঘ ও সর্প, ইহারা এককুলজাত, একই কুল দুই ভাগে পরিণত হইয়াছে, পরন্তু একমাত্র জলই ইহাদিগের যোনি। পর্জ্জন্য ও দিগ্‌গজগণ হেমন্তকাল বৃদ্ধি লাভ করতঃ জগতে অন্ন বৃদ্ধির জন্য শীতসম্ভূত তুষার বৃষ্টি করিয়া থাকে। পরিবাহ নামক ষষ্ঠ বায়ু ইহাদিগের আশ্রয়। সেই শক্তিশালী বায়ু দিব্য অমৃত জলশালিনী পুণ্যা ত্রিপথগামিনী আকাশবাসিনী বিখ্যাত গঙ্গাকে ধারণ করে। দিগ্‌গজগণ সেই গঙ্গার প্রবাহমান জল লইয়া শীকরাকারে পরিত্যাগ করে, তাহাই নীহার বলিয়া জ্ঞাতব্য।"

এখানে আমরা দিগ্‌গজ সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য রহস্য জ্ঞাত হইতেছি। দিগ্‌গজ প্রকৃত পক্ষে হস্তী নহে, কিন্তু মেঘ মাত্র। ইহারা চারিদিকে ঊর্দ্ধপ্রদেশে স্থির ভাবে বিরাজমান থাকাতেই তত্তদ্দিকের গজরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা যে 'জলহস্তী' নামার কথা শুনিতে পাই, তাহা এই দিগ্‌গজ নামক মেঘকেই বুঝাইয়া থাকে।

"পুণ্ড্র" নামক একপ্রকার মেঘের উল্লেখ পাওয়া যায়, যহা হিমালয় ও তদুত্তর ঊর্দ্ধভূগাগে তুষার বৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। পুরাণে ইহার এইরূপ বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে :—

"দক্ষিণেন গিরির্থোঽসৌ হেমকুট ইতিস্মৃতঃ ॥
উদগ্‌হিমবতঃ শৈলস্যোত্তরে চৈব দক্ষিণে।
পুণ্ড্রং নাম সমাখ্যাতং সম্যগ্ বৃষ্টি বিবৃদ্ধয়ে ॥
তস্মিন্ প্রবর্ত্ততে বর্ষং তং তুষার সমুদ্ভবম্।
ততো হিমবতো বায়ু হিমঃ তত্র সমুদ্ভবম্ ॥
আনয়ত্যাত্ম বেগেন সিঞ্চয়ানো মহাগিরিম্ ॥"

২২ হইতে ২৫, মৎস্যপুরাণ, ১২৫ অধ্যায়।

"মেরুর দক্ষিণাংশে হেমকুট গিরির দক্ষিণ ভাগাবধি হিলালয়ের উত্তর দক্ষিণ প্রদেশে পুণ্ড্র নামক মেঘ বাস করে। এই মেঘে বৃষ্টি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সেখানে যে বর্ষণ হয়, তাহা তুষার-সঞ্জাত। এজন্য হিমালয়ে হিমবায়ু প্রবাহিত হয়। ঐ মেঘে আত্ম বেগে হিমকণারাশি আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই হিমগিরিকে সিঞ্চন করিয়া থাকে।"

তুষারের সহিত যে শীত বায়ুর সম্বন্ধ, এখানে আমরা তাহাই জানিতে পারিতেছি।

হিমালয় পর্ব্বতের পরে যে আর বৃষ্টি হয় না, তাহারও বর্ণনা পুরাণে আছে, যথা—

"হিমবন্তমতিক্রম্য বৃষ্টিশেষং ততঃপরম্ ॥"

মৎস্যপুরাণ, ১২৫ অধ্যায়।

মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় না। হিমালয়ের উত্তরে যে গিরি মরুভূমি আছে, এখানে তাহাই বুঝাইতেছে।

'করকা' মেঘেরই বিকার, তাহাতেই ইহার এক নাম 'মেঘকফঃ'। মেঘ কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া 'করকা' হয় বলিয়া করকার এক নাম "মেঘাস্থিও পাওয়া যায়। ইহার শিলা নাম এই কাঠিন্যেরই পরিচায়ক।

বিদ্যুৎ মেঘ হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ইহার এক নাম "মেঘাগ্নি"। এই বিদ্যুতের ভিন্ন ভিন্ন বল ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাকৃতিক অবস্থার জ্ঞাপক বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

"বাতায় কপিলা বিদ্যুদতেপায়হি লোহিতা।
পীতা বর্ষয় বিজ্ঞেয়, দুর্ভিক্ষায়াসিতাভবেৎ ॥

"কপিল বর্ণ বিদ্যুৎ বায়ু সূচনা করে, লোহিত বিদ্যুৎ তাপ সূচনা করে, পীত বিদ্যুৎ

বর্ষণ সূচনা করে এবং অসিত বিদ্যুৎ দুর্ভিক্ষ সূচনা করে।”

হিন্দুগণের মধ্যে নভোবায়ু, বিজ্ঞানের যে বহুল প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা পঞ্জিকা হইতেই প্রাপ্ত হই। পঞ্জিকাতে বৎসরের পূর্ব্বেই বৎসরের মেঘ, জল, বায়ু, রৌদ্র প্রভৃতির গণনা করিয়া রাখা হইয়া থাকে। বৎসরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্ব্বস্থানেরও পৃথক্ পৃথক্ স্থানের জন্য পরিগণিত হয়। সমুদ্র,পর্ব্বত ও পৃথিবীর সমতল স্থলের জন্যই বিশেষ বিশেষ ভাবে গণিত হয়। কেবল প্রাগুপ্ত পরিবর্ত্তন নহে,জড় ও জীব প্রকৃতিক,সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক প্রভৃতি যত প্রকার পরিবর্ত্তন পৃথিবীতে সম্ভবপর, তাহারও গণনা পঞ্জিকার অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। পাঠকগণ সকল সালের পঞ্জিকায় তাহা দেখিতে পাইবেন।

পঞ্জিকার গণনা যে অমূলক কল্পনা নহে, ইহার গণনার শুদ্ধতা যে এক সময়ে পরীক্ষা দ্বারা বিচারিত হইত এবং গণনার ভ্রমের জন্য যে কঠোর শাসন প্রচলিত ছিল, তাহার বিশ্বস্ত প্রমাণই আমরা গ্রীক্ ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ হইতে জানিতে পারি। এখানে আমরা মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে একটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

“তাঁহারা (পণ্ডিতগণ) জনসাধারণের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা বর্ষারম্ভে মহতী সভায় সমবেত হইয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে অনাবৃষ্টি, বর্ষা, সুবাতাস, ব্যাধি ও শ্রোতৃবর্গের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় গণনা করিয়া বলিয়া দেন। সুতরাং রাজা ও প্রজা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া পূর্ব্বেই অভাবের জন্য সুব্যবস্থা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ের যথাবিহিত প্রতীকার করিতে সমর্থ হন। যে পণ্ডিত ভবিষ্যৎ গণনায় ভ্রম করেন, তাঁহাকে আর কোনও দণ্ডভোগ করিতে হয় না, কেবল তিনি সমাজে নিন্দিত হন ও অবশিষ্ট জীবনের জন্য তাঁহাকে মৌনব্রত অবলম্বন করিতে হয়।”

খনার বচনের যে বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচলিত আছে এবং যাহা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহা হইতে নভোবায়ু-বিজ্ঞান যে ব্যবহারিক আকার প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণেরই জ্ঞানের বিষয় হইয়াছিল, আমরা জানিতে পারি। এখানে আমরা খনার কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—তৎসমস্ত হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নভোবায়ু-বিজ্ঞানের বহুতত্ত্বই খনার বচনে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে :—

মেঘ দেখিয়া বৃষ্টিগণনা।

“কি কর শ্বশুর লেখাজোখা।
মেঘেই বুঝ্‌বে জলের রেখা॥
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা॥
কৃষককে বলগে বাঁধতে আল।
আজ নাহয় হবে কাল॥

বায়ু হইতে বৃষ্টিগণনা।

বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়।
সে বৎসর বর্ষা হবে খনায় কয়॥
ভাদ্‌রে মেঘ বিপরীত বায়,সেদিন ঝড় বৃষ্টি হয়।

কুয়াসা হইতে বৃষ্টিগণনা।

পৌষের কুয়া বৈশাখের ফল।
যদ্দিন কুয়া তদ্দিন জল॥
শনির সাত মঙ্গলের তিন, আর সব দিন দিন।

রামধনুর ফল গণনা।

পশ্চিমেধনু নিত্য ঘরা, পূবের ধনু বর্ষে ঝড়া।

চন্দ্রসভার ফলগণনা।

চাঁদের সভার মধ্যে তারা,বর্ষে পাণি মুষলধারা।
দূরসভা নিকট জল, নিকট সভা রসাতল।

বর্ষাগণনা।

দিনে জল রাতে তারা,এই দেখ্‌বে সুখের ধারা।
পৌষগরমি বৈশাখে জাড়া (শীত ?)।
প্রথম আষাঢ়ে ভর্‌বে গাড়া॥
খনাবলে শুনহে স্বামী,শ্রাবণ ভাদর নাইক পাণি॥
পূর্ব্বেতে উঠিল কাঁড় (রামধনু ?)।
ডাঙ্গা ডোবা একাকার।
চৈতেতে ঘর ঘর, বৈশাখে ঝড় পাথর।
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে, তবে জান্‌বে বর্ষা বটে।

শস্যগণনা।

কর্কট ছরকট সিংহশুখা, কণ্যা কাণেকান।
বিনাবায়ে তুলাবর্ষে কোথা রাখবি ধান॥
যদি বর্ষে আগণে, রাজা যান মাগনে।
যদি বর্ষে পৌষে,কড়ি হয় তুষে।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্যদেশ।
যদি বর্ষে ফাল্গুনে, চিনাকাউন দ্বিগুণে।

জ্যৈষ্ঠে শুখো আষাঢ়ে ধারা।
শস্যেরভার না সহে ধরা॥
মাঘমাসে বর্ষে দেবা, রাজাছেড়ে প্রজার সেবা।
যদি বর্ষে মকরে, ধান হবে টেকরে॥
যদি হয় চৈত্রে বৃষ্টি, তবে হয় ধানের সৃষ্টি।
কাত্তির পূর্ণিমাকর আশা, খনাবলে শুনরে চাষা।
নির্ম্মল মেঘে যদি বাত বয়,
রবিশস্যের ভার ধরণী না সয়।
মেঘকরে রাত্রে আর হয় জল,
তবে জেন মাঠে যাওয়াই বিফল।

শস্য ও মৎস্যগণনা।

আষাঢ়ে নবমী শুকল পখা,
কি কর শ্বশুর লেখা জোখা।
যদি বর্ষে মুষলধারে, মধ্যসমুদ্রে বগা চরে।
যদি বর্ষে ছিটা ফোঁটা, পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা।
যদি বর্ষে নিমিঝিমি, শস্যের ভার নাধরে মেদিনী।

বন্যাগণনা।

পূর্ণ আষাঢ় দক্ষিণা বয়, সেই বৎসর বন্যা হয়।
আমে ধান্, তেঁতুলে বান্।

দক্ষিণ বাতাসে বাদল ও বন্যানিবৃত্তি।

বাদল বামণ বান্, দক্ষিণা পেলেই যান্।

মহামারীগণনা।

চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বান্, নরেরমুণ্ড গড়াগড়ি যান

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে গণনা দ্বারা যে জলবায়ুর পূর্ব্বানুমান (weather forecast) হয়, পৌষ মাসের প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যেই হিন্দুগণ যে তাহার পূর্ব্বাভাস পাইতেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বচন হইতেই জানিতে পারা যায় :—

“আগেপাছে চাঁপধনু মীনবধি তুলা।
সকর কুম্ভ বিছা দিয়া মাস কাটাইয়া গেলা॥”

পৌষমাসে বারমাসের ফল জানিবার জন্য ইহাকে বারভাগ করিয়া প্রত্যেক আড়াই দিনে এক এক মাসের ফল জানিতে পারা যায়। আগের সওয়াদিন ও শেষের সওয়া দিনে ধনুরাশি অর্থাৎ পৌষ মাসের ফল পাওয়া যায়। তৎপর প্রত্যেক আড়ইদিনে মীন অর্থাৎ চৈত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ফল জানিতে পারা যায়। তারপর ফাল্গুন, মাঘ ও অগ্রহায়ণের ফল জানা যায়।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জাতিভেদ বা বর্ণভেদ।

আমাদের দেশের বর্ণভেদ বিষয়ে আমি একটী প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আমার মনের ভাব সকল আমি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। জাতিভেদ বা বর্ণভেদদ্বারা যে সকল অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, তাহা একটী একটী করিয়া আমি ক্রমে ক্রমে লিখিব। বিষয়টী পঞ্চভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক, এই পাঁচ ভাগ।

প্রথম, শারীরিক। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, এক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ বীজ রোপণ করিলে, সে ক্ষেত্রের উর্ব্বরত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। কেবল পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, কেন বলিতেছি? সামান্য একজন চাষাও এ কথা জানে। সেই জন্য চাষারা, কোন জমিতে পুনঃ পুনঃ কৃষি কার্য্য হইলে, কয়েক বৎসরের জন্য সে ক্ষেত্রকে ফেলিয়া রাখে। আর একটী কথা। যদি এক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ এক প্রকার শস্যের বীজ বপন করা হয়, তাহা হইলে, তাহাতে সে প্রকার বীজ বপন না করিয়া অন্য প্রকার শস্যের বীজ বপন করা আবশ্যক হয়। নতুবা কৃষিকার্য্য ভাল হয় না।

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যেমন, মনুষ্যের সম্বন্ধেও সেইরূপ। সন্তানোৎপত্তি বিষয়ে এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইয়া থাকে। এক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ এক প্রকার বীজ রোপিত হইলে, তাহাতে সুফল হয় না। অর্থাৎ মাতৃগর্ভে যে শিশুদেহ সংগঠিত হয়, তাহা উপযুক্তরূপ সবল ও সুস্থ হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা এ তত্ত্বটী অনেক গবেষণাদ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

বর্ণভেদের জন্য একটী বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে। বিবাহক্রিয়া একটী সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ থাকাতে, এক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ এক প্রকার বীজ রোপিত হইতেছে। বৈজ্ঞিক তত্ত্বানুসারে ইহাতে অত্যন্ত অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে। ইয়োরোপে এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান হইয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ইহাতে বংশপরম্পরায় ক্রমে বংশের শারীরিক

অবনতি ঘটিয়াছে। আমাদের দেশেও সেই রূপ হইতেছে। বহুকাল হইতে, একটী সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বিবাহ ক্রিয়া বদ্ধ থাকাতে ক্রমশঃ বংশপরম্পরায় শারীরিক অবনতি ঘটিতেছে। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ, সেই জন্য, একান্ত প্রয়োজনীয়। এখন ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের বিবাহ, কায়স্থ জাতির মধ্যে কায়স্থের বিবাহ, এইরূপ প্রথা প্রচলিত। সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে বা সকল শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে এখনও নহে। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত নাই। কিন্তু ইহাতে যে জাতীয় শারীরিক অবনতি হইতেছে, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। এ বিষয়ে আমিই যে এদেশে একথা প্রথম লিখিতেছি, এমন নহে। শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার এক খানি গ্রন্থে (বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার) একথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মত অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যাইবে, এক সঙ্কীর্ণ সীমায় বিবাহ বদ্ধ থাকা, জাতীয় শারীরিক অবনতির এক প্রধান কারণ।

বর্ণভেদ-প্রথার দ্বিতীয় অনিষ্ট মানসিক। শারীরিক অনিষ্ট হইলেই মানসিক অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। শরীরের সহিত মনের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, শরীরের অবনতি হইলেই মানসিক অবনতি হইবেই হইবে। বংশপরম্পরায় শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইতেছে। সুতরাং মনও অবশ্যম্ভাবী রূপে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইবে; ইহাতো কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। আমাদের জাতির যে কেবল শারীরিক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হইতেছে, এমন নহে, মানসিক দুর্ব্বলতাও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে।

তার পর সামাজিক অনিষ্ট বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিব। সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বিবাহ বদ্ধ থাকাতে, পাত্র ও পাত্রী পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ ভাবে, আমি জানি, কায়স্থ জাতির মধ্যে পাত্র ও পাত্রী পাওয়া বড়ই কঠিন হইয়াছে। সেই জন্য, অর্থ দিয়া পাত্র ও পাত্রী সংগ্রহ করা আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষতঃ যদি কোন যুবা, বি-এ, কিম্বা এম এ পাস করিলেন, তবে তাঁহার মূল্য অতিশয় বাড়িয়া গেল। অনেক টাকা না দিলে আর তাঁহাকে কেহ আপনার কন্যার জন্য পাইতে পারেন না। এদেশে চিরকালই কন্যাদায় এক বিষম দায়। তার পর, আজকাল সেইদায় যে কত বৃদ্ধি হইয়াছে, কি বলিব? দুঃখী লোকের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া এক মহা বিপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কত মাতা পিতা যে এজন্য আপনাদিগকে বিপদগ্রস্ত মনে করিতেছেন, তাহা আর কি বলিব?

বিবাহের সীমা যত দিন অতিশয় সঙ্কীর্ণ রহিবে, ততদিন এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই।

সামাজিক বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া এখন রাজনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে বর্ণভেদ কি অনিষ্ট করিতেছে, সে বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিব।

আমাদের দেশের অনেকেই আজকাল রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে অতিশয় উৎসাহী। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, সামাজিক উন্নতি না হইলে রাজনৈতিক উন্নতি হইবে না। ইয়োরোপীয়েরা আমাদের সঙ্গে সমকক্ষভাবে মিশিতে চান না কেন? ইহার একটী প্রধান কারণ, আমাদের সামাজিক দুর্দ্দশা। আমাদের স্ত্রীলোকেরা যতদিন অবরোধে অবরুদ্ধ, যতদিন আমরা স্বামীস্ত্রীতে মিলিত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে সামাজিক ভাবে আত্মীয়তা করিতে না পারিব, ততদিন যে তাঁহারা আমাদের সঙ্গে সমকক্ষভাবে মিশিতে সম্মত হইবেন না, ইহার তুল্য সত্য কথা, আর কিছুই নাই।

আমাদের সামাজিক উন্নতি না হইলে, ইয়োরোপীয়েরা আমাদের সঙ্গে সমকক্ষভাবে মিশিতে কখনই ইচ্ছা করিবেন না। তাহা হইলেই ইহা স্থির হইল যে, আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। সকলের মূল ধর্ম্ম। ধর্ম্মোন্নতি হইতে সামাজিক উন্নতি হয়; এবং সামাজিক উন্নতি হইতে রাজনৈতিক উন্নতি।

কিন্তু আমাদের দেশে এখন কি হইতেছে? রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, সামাজিক উন্নতির জন্য তাহার তুলনায় কিছুই হইতেছে না।

সুতরাং ইহা সত্য যে, রাজনৈতিক উন্নতি আশানুরূপ কখনই হইবে না। প্রথমে ধর্ম্মোন্নতি। তারপর ধর্ম্মোন্নতি হইতে সামাজিক উন্নতি। তারপর, সামাজিক উন্নতি হইতে রাজনৈতিক উন্নতি। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

বর্ণভেদ যে সামাজিক উন্নতির ব্যাঘাৎ করিতেছে, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। এখন এ বিষয়ে আর কিছু বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সে কথাটী এই যে, আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোক লইয়াই দেশ। যাঁহারা সম্ভ্রান্ত লোক বা ভদ্রলোক, তাঁহারা কয়জন? দেশ বলিলে কি বুঝায়? অধিকাংশ লোককে তো বুঝায়? কিন্তু সেই অধিকাংশ লোক দেশের নিম্নশ্রেণীর লোক। যাহারা নীচ বংশোদ্ভব, তাহারাই অধিকাংশ লোক। যাহাদের সহিত ভদ্রলোকেরা আহার ব্যবহার করেন না, যাহাদের সহিত আদান প্রদান চলেনা, তাহাদেরই লইয়াই দেশ। তাহারা সমাজে অস্পৃশ্য ও ঘৃণিত হইয়া রহিয়াছে। অথচ তাহারাই দেশের অধিকাংশ লোক।

ইহার ফল কি হইয়াছে? ইহার এই ফল হইয়াছে যে, তাহারা হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিতেছে। দশ বৎসর অন্তর লোক সংখ্যা গণনা হইতেছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, মুসলমান সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এবং হিন্দু সংখ্যা কমিতেছে। এ বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে। হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক এ সমাজে উপযুক্ত ব্যবহার না পাইয়া মুসলমান সমাজে চলিয়া যাইতেছে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, যাহাদের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, তাহারা যদি চলিয়া যায়, তাহাতে হিন্দুদিগের দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। এ কথার উত্তর এই যে, যদি এমন বল যে, যাহাদের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, এমন সকল ব্যক্তি হিন্দুসমাজ হইতে চলিয়া যাউক, তাহা হইলে, হিন্দু সমাজের কি থাকে? বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, এমন লোক হিন্দুসমাজে কয় জন? সেরূপ সকল লোক যদি চলিয়া যায়, হিন্দুসমাজের দশা কি হয়?

দেব দেবীতে বিশ্বাস নাই, জাতিভেদে বিশ্বাস নাই, একেশ্বরে বিশ্বাস করে, এমন সকল লোক যদি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যান, হিন্দুসমাজের কি থাকে? যাহারা বিলাত যাইতেছে, তাহারা সমাজচ্যুত হইতেছে, যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য সমাজচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্র সমাজ সংগঠন করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে সেই সকল লোক যদি যোগ দেয়, তাহা হইলে সেই নূতন সমাজই তো হিন্দুসমাজ হইয়া দাঁড়ায়। অন্ততঃ একথা বলা যায় যে, হিন্দুসমাজ, দুই প্রকাণ্ড ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এ দেশে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল, তখন সেইরূপই হইয়াছিল।

এখন যে ব্রাহ্মসমাজ সংগঠিত হইয়াছে, ইহার সহিত যদি এদেশের সকল একেশ্বরবাদী যোগ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ কি আর একটী ক্ষুদ্র সমাজ থাকে?

এখন মূল বিষয়ে পুনর্ব্বার আসি। হিন্দু সমাজ যে ক্রমে ক্ষুদ্রতর হইতেছে, এবং মুসলমান সমাজ যে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহার কারণ হিন্দু সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক এখানে উপযুক্ত ব্যবহার না পাইয়া মুসলমান সমাজে যাইতেছে। বর্ণভেদই সমাজের বলক্ষয়ের কারণ।

আমি ক্রমে ক্রমে দেখাইলাম যে, বর্ণভেদ দ্বারা এদেশের লোকের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সকল বিষয়ের অনিষ্ট হইতেছে। এখন আর একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

আমার শেষ কথা বর্ণভেদের আধ্যাত্মিক ফল। বর্ণভেদ দ্বারা এই আধ্যাত্মিক অনিষ্ট হইতেছে যে, মানুষ যে মানুষের ভাই, মানুষে মানুষে যে একটা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ আছে, তাহা রক্ষা পায় না। ব্রাহ্মণ কি মনে করিতে পারেন যে, শূদ্র তাঁহার ভাই। সকলে এক পরমেশ্বরের পুত্র কন্যা, এই জ্ঞান, বর্ণভেদ দ্বারা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

মানুষে, মানুষে, সকল বিষয়েই প্রভেদ। কেবল একটী স্থল আছে, যেখানে মানুষে মানুষে এক। কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ; কেহ সম্ভ্রান্ত, কেহ

সামান্য; কেহ সাধু, কেহ অসাধু, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী; এইরূপ মানুষে মানুষে কত প্রভেদ, কিন্তু একটী বিষয় আছে, যে খানে সকলে সমান। যিনি পৃথিবীর রাজা এবং যিনি দুঃখী নগণ্য প্রজা, তাহারাও সমান। সেইটী এই যে, আমরা সকলেই এক পরমেশ্বরের সন্তান। যিনি জগতের মাতা পিতা, আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান। এই একটী সম্বন্ধে আমরা সকলে এক, সকলে সমান। কিন্তু বর্ণভেদ সেই সাধারণ পবিত্র সম্বন্ধ নষ্ট করিয়া দিতেছে। বর্ণভেদের জন্য, মানুষ পরস্পরকে ভাই বলিয়া মনে করিতে পারে না। সেই সকলের মা বাপ এক পরমেশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে সমকক্ষ ভাবে দাঁড়াইতে পারেনা। যাহার ছায়া স্পর্শ করিলে গঙ্গাস্নান ব্যবস্থা, তাহাকে কেমন করিয়া ভাই বলিবে? হে জগদীশ্বর, হে জগতের মা বাপ, এই মহা অমঙ্গল হইতে এই হতভাগ্য দেশকে রক্ষা কর। তোমা ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে?

পরলোকবাসী শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,
শ্রীমিডিয়ম নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্গণিকা।

(১)

ইউরোপীয় সমর ভারতে যে দুর্দ্দিন আনয়ন করিয়াছে, এরূপ শীঘ্র হয় নাই। যুদ্ধের ফল যাহাই হউক, আর কিছুদিন যুদ্ধ চলিলে ভারতের অসংখ্য লোক অনাহারে মরিবে। জমীদার, উকীল, মোক্তার, মহাজন, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, কবিরাজ সকল শ্রেণীর আয় কমিয়া গিয়াছে—রেল ষ্টিমার কোম্পানীর যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবে না। কত লোকের যে চাকরী গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। স্বাস্থ্যকর স্থানে আর লোক যাইতেছে না, সুতরাং সর্ব্বত্রই অনেক বাড়ী খালি রহিয়াছে। দ্রব্যাদি দুর্মূল্য হইয়াছে, অন্যদিকে কর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় সকলেই ম্রিয়মাণ। এরূপ দুর্দ্দিন বোধ হয় ভারতে শীঘ্র উপস্থিত হয় নাই। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়াছে। প্রতিদিন আশা করি, ভাল সংবাদ পাইব, কিন্তু প্রতিদিনই নিরাশ হইতেছি। এই কাল-সমর যে আর কত দিন চলিবে, এবং কতদিন যে দারুণ কষ্ট থাকিবে, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। এই সঙ্কটে সকলেরই কায়মনোবাক্যে বিধাতার নিকট শান্তি স্থাপনের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। বিধাতার কৃপা ভিন্ন সুবুদ্ধির উদয় হইবে না, অহংজ্ঞান বিলুপ্ত হইবে না, প্রভুত্বপরায়ণতা বিদূরিত হইবে না। সুতরাং কষ্টের দিনের অবসান হইবে না।

(২)

মুসলমানপাড়া-বোমা-মোকদ্দমার আসামী হাইকোর্টের সুবিচারে মুক্তি পাওয়ায়, এ দেশের সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজ-সংবাদ পত্র-মহলে খুব আন্দোলন চলিতেছে। নির্দ্দোষী লোককে শাস্তি দিতে তাহাদের এরূপ ইচ্ছা কেন? ধন্য জেঙ্কিন্স এবং আশুতোষ, তাঁহারা না থাকিলে, এই অশান্তির দিনে কত নিরপরাধী ব্যক্তি যে শাস্তি পাইত, তাহার সংখ্যা হয় না। মাসিকপত্রিকা রক্ষা-কল্পে আশুতোষ পল্লীচিত্রের-মকদ্দমায় যে কৃতিত্ব, সহৃদয়তা এবং গভীর আইন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। তাঁহার ন্যায়-বিচার এদেশে অক্ষয় শান্তি আনয়ন করুক। আর প্রধান-বিচারপতি জেঙ্কিন্স মহোদয় যেন নরদেহে দেবতা; যে দুর্দ্দিনে তিনি এদেশের প্রধান বিচারপতি হইয়া আসিয়াছেন, সেই দিন হইতে অশান্তি অরাজকতার মস্তকে অশনিপাত হইয়াছে। এরূপ নিরপেক্ষ বিচারক এদেশে অভ্যুদিত না হইলে এদেশ ঘোর অরাজকতায় পূর্ণ হইয়া যাইত। পুলিস চোর ডাকাত ধরিতে আজকাল আর চেষ্টা করেন না, কেবল রাজনীতি-চক্রে লোককে ফেলিতে চাহেন। কাহার গৃহে কখন সি-আই-ডি প্রবেশ করিবে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। অশান্তি, অশান্তি, ঘোর অশান্তি চতুর্দ্দিকে।

ধন-প্রাণ-মান-ইজ্জত লইয়া সকলে অস্থির। এহেন দুর্দ্দিনে আশার একমাত্র স্থল মহামতি জেঙ্কিন্স। তাঁহার কৃতিত্বে, বিচার-দক্ষতায়, এবং নিরপেক্ষতায় পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক।

(৩)

এদেশের রেলওয়েগুলি অত্যাচারের কেন্দ্র-স্থল হইয়া উঠিয়াছে। মহিলা-নিগ্রহ এখন সর্ব্বত্রই দেখা যায়. মাতৃ-জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে যে দেশের কৃতবিদ্যগণ কুণ্ঠিত, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? সকলের ঘরেই মা বোন আছে, অথচ সকলেই মহিলাদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও কুটিল-কটাক্ষপাত করেন। ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। ঘুষ ত এ দেশের সর্ব্বত্রই চলিতেছে, রেল-ষ্টেশনে ইহা যেন জীবন্ত মূর্ত্তি ধরিয়াছে। আদালতে সকলে যায় না, সুতরাং সকলকে যে স্থানের ঘুষের হস্তে পড়িতে হয় না, কিন্তু রেলওয়ের ঘুষের হস্তে সকলকেই পড়িতে হয়। অনেক ষ্টেসনেই মেঠাই-ওয়ালা আছে, তাহারা ষ্টেসনের কর্ত্তাদিগকে ঘুষ দিয়া পচা মাল চালাইয়া যাত্রীদিগের সর্ব্বনাশ করে। তাহারা অত্যাচারের প্রতিমূর্ত্তি। লোকের প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার করে, ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। অনেক সময় টাকা ভাঙ্গাইতে দিলে পয়সা দেয় না। "দেই দিচ্চি" করিতে করিতে রেল ছাড়িয়া যায়। তাহাদের কাছে পুলিস যায় না, ষ্টেসনের কর্ত্তারা যান না,—তাহারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করে। এরূপ অত্যাচার অল্পাধিক পরিমাণে সকল ষ্টেশনেই দেখা যায়। রানাঘাট-ষ্টেশন এই অত্যাচারের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। সর্ব্বসাধারণে সতর্ক হইবেন।

(৪)

মাঘ মাসের "মানসী"র ছবি সম্বন্ধে ২৪শে ফাল্গুনের (১৩২১) প্রবাহিণী বলেন—"প্রথমেই "ত্রস্তা" নামে একখানি কামোদ্দীপক, জঘন্য রঙিন ছবি। এক উলঙ্গ যুবতী, বোধ করি, কোন পুরুষের পদ-শব্দে সচকিত হইয়া, তাড়াতাড়ি আপনার বস্ত্রহীন অঙ্গের উপরে একখানা পর্দ্দা টানিয়া আবরণ দিবার চেষ্টা করিতেছে। ছবিখানি বিলাতী, সুতরাং ইহার অঙ্কন-প্রণালী প্রশংসনীয়। কিন্তু তাহার গুণই দোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ সুচিত্রকরের কাম-চিত্র যতটা উজ্জ্বল হয়, কুচিত্রকরের আঁকা পট ততটা হয় না। "মানসী" বারংবার এমনি রুচি-বিকৃতির পরিচয় দিতেছে। যাঁদের ঘরে মা-বোন আছেন, তাঁরা "মানসী" পাইলে ঘৃণা ও লজ্জায় অধোবদন হইবেন। য়ুরোপ ও ভারতের সমাজের ভিতরে যে বিভেদ-রেখা আছে, 'মানসী'র পরিচালকেরা কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছে? বিশেষ, 'মানসী' যদি কেবল ললিত-কলা-বিষয়ক পত্র হইত, তাহা হইলেও তাহার স্বপক্ষে দু একটা বলিবার কথা থাকিত। কিন্তু, তা ত নয়! 'মানসী' যে বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতার সাথী হইবার এবং আমাদের পবিত্র শুদ্ধান্তে প্রবেশ করিবার স্পর্দ্ধা রাখে! আধুনিক মাসিক সাহিত্যের এই স্বেচ্ছাকৃত অশ্লীল চিত্র-প্রকাশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করে, বাঙ্গালার পাঠক-সমাজের ভিতরে কি এখন মানুষের মত মানুষ নাই? কাগজ সম্পাদকের নহে,—সাধারণের। যিনিই সম্পাদক হউন, তাঁহার ব্যক্তিগত কুরুচিকে সাধারণের ভিতরে তিনি কখনই প্রচারিত করিতে পারেন না। তাঁহার এ অধিকার নাই।"

এই ছবি-প্রসঙ্গে ফাল্গুন (১৩২১) মাসের 'মানসী'তে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় দুতিগিরির উত্তেজনায়, যাহারা ছবি প্রকাশ করে না, তাহাদিগের প্রতি শ্লেষ বর্ষণ করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন লোক বলিয়া জানিতাম। তাঁহার "সঙ্কল্পে"র পরিণতির পরেও ছবি সম্বন্ধে তিনি সংযত হইতে পারিতেছেন না, ইহাতে আমরা যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। "সমাজের আগ্রহ দেখিয়া পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা" হইলে সুরুচি ও শ্লীলতা বর্জ্জন করিতে হইবে, কে বলিল? এই সূত্রে মদ্যপান ও ব্যভিচারকেও পোষকতা করিতে হইবে কি? কাগজ উঠিয়া যায়, যাউক, আমরা সমাজের অসংযত আগ্রহ অনুসারে চলিতে পারিব না।

কাল ও কালের খেলা।

মনুসংহিতায় কাল সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যখন পঞ্চভূতের সমবায়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপাদন করিতে থাকেন, তখন গ্রহনক্ষত্র-সরিৎসাগর-শৈলাদির সহিত কাল ও কাল-বিভাগেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কালং কালবিভক্তীশ্চ নক্ষত্রানি গ্রহাংস্তথা।
সরিতঃ সাগরান্ শৈলান্ সমানি বিষমানি চ ॥
১ অঃ ২৪ ॥

ভগবানের আত্মবিকাশই সৃষ্টি। সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভ রূপে অবস্থিত ব্রহ্মা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের উদ্ভব এবং প্রকৃতি ও পুরুষের বিকার হইতে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টির আরম্ভ, এ সিদ্ধান্ত সমীচীন হইতে পারে; কিন্তু কালকে গ্রহনক্ষত্র সরিৎসাগরের সঙ্গে তুল্যরূপে সৃজন করা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ, তাহা ভাবিবার বিষয়। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ক্রমে অনেক বস্তুর কল্পনা করা যায়। পাহাড় পর্ব্বত, সরিৎ সাগর ছাড়িয়া দিয়া বায়ু, বিদ্যুৎ, আলোক, শব্দ প্রভৃতি সকল বস্তুরই জড় অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, কিন্তু উহাদের সহিত কালের প্রকৃতিগত বৈষম্য এত অধিক যে, কোন সৃষ্ট বস্তুর সহিত কালকে একাসনে স্থান দেওয়া সঙ্গত মনে হয় না। মনু যে কালকে সৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, ইহার উদ্ভব সম্বন্ধে কোন স্থির মীমাংসা হইতে পারে না; সেই জন্য সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই সান্ত। মনু-কথিত বিশ্বরচনা কালেরই কোন কোন নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে আরব্ধ হইয়াছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এক কালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল; তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষ্যের অতীত, লক্ষণাদ্বারা অননুমেয়, তর্ক ও জ্ঞানের বহির্ভূত, যেন উহা এক প্রগাঢ় নিদ্রায় সুপ্ত ছিল। যথা,

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥
১ অঃ ৫ ॥

ইহা কালসৃষ্টির পূর্ব্বের কথা, তথাপি এখানে 'আসীৎ' শব্দদ্বারা কালই সূচিত হইয়াছে। চিন্ময় ব্রহ্ম 'সৎ' অবস্থা হইতে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করেন, সুতরাং পৌর্ব্বপার্য্য সম্বন্ধহেতু কালের বর্ত্তমানতা দৃষ্ট হয়। কাল যদি সৃষ্ট বস্তুই হয়, তবে বিশ্বরচনার পূর্ব্বে উহার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিতে হইবে। তর্কহিসাবে যদি ধরা যায়, রচনা সৌকার্য্যার্থ সর্ব্বপ্রথম কাল সৃষ্টির আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মের জাগ্রতাবস্থার পূর্ব্বেই উহা সম্পন্ন হয়; অর্থাৎ মূলাধার ব্রহ্ম হইতে উহার উৎপত্তি হয় নাই। এরূপ ধারণা হইতে ব্রহ্ম ব্যতীত কালের দ্বিতীয় স্রষ্টার প্রয়োজন হইতেছে, ভগবানের অসীমতত্ত্ব ও অনন্তত্ব গুণের খর্ব্বতা করা হইতেছে। সুতরাং কাল সৃষ্টবস্তু সমূহের কেহ নয়, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

সৃষ্ট বস্তু যদি না হইল, তবে কাল কি? সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যাণ্টের মতে কাল ধারণা বা সংস্কার বিশেষ। গ্রহনক্ষত্রাদির ন্যায় ইহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই, পরন্তু জাগতিক

ব্যাপার মাত্রই কালরূপ সংস্কারের অধীন। ইহা এমনই একটা কিছু যে, নিজের অস্তিত্ব না থাকিলেও ঘটনা পরম্পরার উপর ইহার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ। তিনি বলেন যে, যে কোন বস্তু, যে কোন পরিবর্ত্তন বা যে কোন ধারণা জ্ঞানগোচর হইতে গেলে স্থান (Space) ও কালের (Time) সাহায্য আবশ্যক। বহির্জগৎ বা অন্তর্জগৎ, কোন জগতের কোন জিনিষের স্থান ও কাল হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। আমরা বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারি না, তাহার কারণ এই যে, উহারা যখনই আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে, তখনই স্থান ও কালের ভিতর দিয়া আসায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। এই দুই বস্তু যেন দুই খানি কাচফলক। কাচের ভিতর দিয়া মানুষ যেমন দ্রব্যসকলের মূল প্রতিকৃতি দেখিতে পায় না, অথচ দৃষ্টিশক্তির হীনতাপ্রযুক্ত স্থল বিশেষে কাচই যেমন দেখিবার একমাত্র উপায়; সেইরূপ, আমরা বস্তুর স্বরূপ জানিতে না পারিলে ও স্থানও কালের ভিতর দিয়াই উহাদিগকে দেখিতে পাই। এমন কোন বস্তুরই কল্পনা করা যায় না, যাহা কিয়ৎপরিমাণে স্থান অধিকার করিয়া না আছে, অথবা কালদ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইতেছে। উহা যদি বাহ্য জগতের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে কালেরই কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে উহা সংঘটিত হইয়াছিল, সৃষ্টির পর হইতে আমি যে মুহূর্ত্তে উহার বিষয় চিন্তা করিতেছি, তন্মধ্যে কিয়ৎকাল গত হইয়াছে এবং আরও কিয়ৎকাল অবধি উহা বিদ্যমান থাকিবে। গ্রহনক্ষত্রাদি, এক কথায় সমস্ত জগৎ এইরূপে কালের অধীন, অর্থাৎ ইহাদের সৃষ্টি, স্থিতি, আবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইলে কাল হইতে স্বতন্ত্র ভাবে চিন্তা করিবার উপায় নাই। অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ হইতে যে জ্ঞান জন্মিতেছে, কাল-সূত্রে গ্রথিত হইয়া তাহার পৌর্বপার্য্য রক্ষা পায় বলিয়াই ঐ সকলের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। কালসূত্র যদি ছিন্ন হইয়া যায়, ঘটনা সমূহের যদি পৌর্ব্বপার্য্য রক্ষা না হয়, তাহা হইলে আদ্যোপান্ত সমুদয় ধারণাই স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইবে। তাহার ফলে কোন্ দিন আমি কি করিয়াছি, কোন দিন বা কোন্ সময়ে কি বলিয়াছি, দুদিন পূর্ব্বে কেমন ছিলাম, ইত্যাকার কোন ঘটনাই আমার বুঝিবার বা বুঝাইবার ক্ষমতা থাকিবে না। উন্মাদরোগীদিগের অবস্থা এইরূপ; শিশুদিগের জ্ঞানোন্মেষের প্রথম অবস্থাও কতকটা এইরূপ।

কাল যদি সংস্কারই হইল, তবে এই সংস্কারের মূল কি? কোন কোন মনস্তাত্বিকের মতে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও স্মৃতিই এই সংস্কারের মূল কারণ। শিশু দৈনিক জীবনে কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলে তাহার মনে একটী নূতন ভাবের সঞ্চার হয়। স্মৃতিশক্তিবশতঃ এই ভাবটী তৎক্ষণাৎ অপসৃত হয় না। 'এখন' সে যাহা দেখিতেছে, পূর্ব্বে তাহা দেখে নাই; অথবা পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিল, এখন আর তাহা দেখিতে পাইতেছে না। পূর্ব্ব ঘটনাটী সে চিনিয়া রাখিয়াছিল, উহা এখন তাহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে 'তখন' যাহা ছিল, 'এখন' তাহা নাই। এইরূপে অতীত ও বর্ত্তমানের জ্ঞান জন্মে। আবার, বর্ত্তমান ও অতীত হইতে ভবিষ্যতের জ্ঞান সঞ্চার হয়। ক্ষুধার্ত্ত শিশু সন্দেশ দেখিলে খাওয়ার জন্য কাঁদিতে থাকে।

তাহার কারণ, সন্দেশ-ভক্ষণ-জনিত আনন্দানুভূতি পূর্ব্বে ছিল, এখন অনুরূপ দ্রব্যের দর্শনে সেই স্মৃতি জাগ্রত হইল। সন্দেশ খাওয়ার আনন্দ তাহার 'এখন' নাই, অথচ 'পরে' হইবে, এইরূপ ধারণার উদ্রেক হওয়ায়, তাহা হইতে ভবিষ্যতের জ্ঞান আসিতে থাকে। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে, অভিজ্ঞতা সহকারে ক্রমে তাহা কালের সংস্কারে পরিণত হয়।

মনোবিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত যে সারগর্ভ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, কালের সংস্কার কি বর্ত্তমান জীবনে আরব্ধ হইয়া বর্ত্তমান জীবনেই পর্য্যবসিত, না তাহার মূলে আরও কিছু গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। দৈনন্দিন ঘটনাবলীই যদি ইহার একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে ইহার প্রভাব এত প্রবল হইবে কেন? গোষ্পদের বারিগণ্ডূষ হইতে সমুদ্রের জ্ঞান সম্ভব হইলেও, মুহূর্ত্তের জ্ঞান হইতে অনন্ত কালের সংস্কার হওয়া অসম্ভব মনে হয়। মনের ক্ষমতা যতই অধিক হউক, উহার কার্য্যে আমরা যতই অভ্যস্ত হই না কেন, কাল যে অনন্ত; কোন ঘটনাই যে কাল-বহির্ভূত নয়, বিশ্বরচনা যে কালে আরব্ধ হইয়া কালেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে, এমন কি, ব্রহ্মের সগুণ বা জাগ্রতাবস্থার পূর্ব্বেও যে কাল বিদ্যমান ছিল, এবম্বিধ ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইত না। এখানে হয়ত প্রশ্ন হইবে, সভ্যসমাজ-ভুক্ত বলিয়া আমাদের মানসিক ক্রিয়াগুলি পরিমার্জ্জিত হওয়ায় সমীকরণ, বিষমীকরণ, একীকরণ, স্মৃতি ও উদ্ভাবনী-শক্তি দ্বারা সহজেই এইরূপ ধারণা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই, অসভ্য বর্ব্বর শ্রেণীর লোকেরা ইহাতে অপারক। ইহার উত্তর এই যে, বর্ব্বর লোকদিগের মধ্যে এই ধারণা এত পরিস্ফুট না হইলেও, কাল বলিয়া যে একটা কিছু আছে, উহার যে বিরাম নাই, উহা যে ক্রমান্বয়ে গত হইতেছে, এইরূপ বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় ইতর প্রাণীদিগেরও যে সময়ের ধারণা কিঞ্চিৎ পরিমাণে নাই, এমন বলা যায় না। গৃহপালিত পশুকে কোন এক স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার প্রদান করিলে দেখা যায়, দুই এক দিন পরে আহারার্থ পশুটী যথা সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। হিংস্র জন্তুরাও একবার যেখানে যে সময়ে শিকার প্রাপ্ত হয়, পুনরায় শিকারান্বেষণে সেই সময়ে সেই স্থানে আগমন করে। আমরা মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে 'জ্যাক' 'জো' নামধারী বিলাতী বানরের কাহিনী পাঠ করিয়া থাকি। ইহারা নাকি ঘড়ি ধরিয়া অর্থাৎ ঘণ্টা মিনিট হিসাবে আহার, বিহার, শয়ন, ভ্রমণ, ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বৃন্দাবনের বানরদিগকে দ্বিপ্রহর গৃহস্থদিগের বিশ্রামকাল জ্ঞান করিয়া, সেই সময়ে চৌর্য্যবৃত্তির সুযোগ অনুসন্ধান করিতে শুনা যায়। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ইতর প্রাণীদিগের এই সকল কার্য্যে স্বাভাবিক জৈবশক্তির (Natural propensity) প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। হইতে পারে, কিন্তু স্থান বিশেষে নিরূপিত সময়ে আগমন হেতু কালের সংস্কারও কিয়ৎ পরিমাণে আছে বলিতে হইবে। অর্থাৎ এই সংস্কার কেবল মাত্র মনুষ্যজীবনেই সীমাবদ্ধ হয় নাই, মানবের অধস্তন স্তরেও ইহার আধিপত্য রহিয়াছে এবং ইহা পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি ইত্যাদি মানসিক শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, পরন্তু এই সংস্কার জন্ম-জন্মান্তর লব্ধ, জীব হইতে জীবান্তরে নীত।

কালের অস্তিত্ব যতই রহস্যময় হউক, উহা যে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-সাধক, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কাল-সূত্রে গ্রথিত হয় বলিয়াই আমরা অতীত ঘটনাবলী স্মরণ রাখিতে পারি। অতীত জীবনের প্রত্যেক ঘটনার সহিত কালের ব্যবধান হেতু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনা-সমূহের এক প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অমুক ঘটনা, অমুক ঘটনার এত পূর্ব্বে বা এত পরে ঘটিয়াছিল, এইরূপ বলিতে পারি, কেন না ইহাদের পরস্পরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। অবিরাম ঘটনা-স্রোত বহিতে থাকিলে পরস্পরের সান্নিধ্য হেতু প্রত্যেকের বিশেষত্ব হ্রাস প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ভাবে স্মরণ রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ঘটনা দ্বারাই কালের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়? যাঁহার জীবনে যত অধিক স্মরণীয় ঘটনা বা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাঁহার জীবন-কাল তাঁহার নিকট তত অধিক স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মোটের উপর, যে সঞ্চিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লইয়া আজ আমরা সদসৎ নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহাতে কালেরই খেলা দেখিতে পাই। বর্ত্তমানেও চলা, ফেরা, আহার, বিহার, প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে আমরা কালের অধীন। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের উপর কালের আধিপত্য ঘনীভূত হইতেছে। জীবনকে যতই মূল্যবান জ্ঞান করিতেছি, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের মূল্যও তত বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ, a moment once lost is lost for ever.

কালের আর এক প্রকৃতি, অবস্থানুসারে ইহার হ্রস্বদীর্ঘত্বানুভব। একই কাল এক জনের নিকট জলের মত চলিয়া যায়, অপরের নিকট দুর্ব্বহ মনে হয়। সুখ দুঃখের তারতম্যই এই ভেদ-জ্ঞানের কারণ। সুস্থ, সবল, ক্রীড়া কৌতুকাসক্ত, নিশ্চিন্ত লোকের পক্ষে কাল যেমন দ্রুতগামী; রুগ্ন, জরাগ্রস্ত, চিন্তাক্লিষ্টের পক্ষে তেমনি মন্দগামী। সারকাস ও থিয়েটার দর্শকের নিকট কাল কোন্ দিক দিয়া গত হয়, স্থির থাকে না; পীড়িত পুত্রের জননীর নিকট এক ঘণ্টা কাল যেন এক বৎসর। প্রণয়ী-যুগলের মিলন কাল যেমন শীঘ্র, বিচ্ছেদ কাল তেমনি ধীরে অতিবাহিত হয়। ক্লিওপেট্রা-প্রেমে ভরপুর এণ্টনি যখন বলিয়াছিলেন—

Let Rome in Tiber melt and the wide
Arch of the ranged empire fall! Here is my space.
Kingdoms are clay; our dungy earth alike
Feeds beast as man.

তখন কাল নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট খরস্রোতে বহিতেছিল। পক্ষান্তরে, মেঘদূতের যক্ষ-পত্নী কালের দৈর্ঘ্য বিশেষ রূপেই বুঝিতে পারিয়াছিল, যখন তাহাকে শাপ-মোচনের অবশিষ্ট দিনগুলি এক এক করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল।

“শেষান্মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা।
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলী মুক্ত পুষ্পৈঃ॥

দুষ্মন্তদর্শনাভিলাষিণী শকুন্তলারও কাল এইরূপে কাটিয়াছিল। রেলযাত্রীর পক্ষে ষ্টেশনে বসিয়া গাড়ীর প্রতীক্ষা যেমন কালের অচলত্ব প্রতিপাদন করে, পরীক্ষা-মন্দিরে পরীক্ষার্থীর নিকট উহা তেমনি সচল বোধ হয়।

স্থল বিশেষে কাল আবার ভয়াবহ। সৃষ্টি মাত্রই কাল প্রভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এই জন্য কাল সর্ব্বগ্রাসী।

“মাকুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।”

যমের অপর নাম কাল, তাহার কারণ, কালের করাল কবল হইতে কাহারই পরিত্রাণ নাই। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী মৃত্যু-দিবসের অপেক্ষায় কাঁপিতে থাকে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সমূহ হইতে অবস্থা বিশেষে কালের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

কাল যে কি জিনিষ, তাহা বুঝিবার যো নাই। ইহা যেন এক জীবন্ত প্রহেলিকা, থাকিয়াও নাই, না থাকিয়াও আছে। কে জানে কোথা হইতে এই প্রহেলিকার উদ্ভব হইল এবং বিশ্ব-সংসারের উপর কিরূপে উহার দুর্দ্দমনীয় লৌহশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল! যখনই মনে করি, কাল কিছুই নয়, মনেরই বিকার মাত্র, তখনই যেন অন্তস্তল হইতে শত শত উত্তর আসিতে থাকে, কাল নিশ্চয়ই কিছু, এ 'কিছু'র তথ্য কোন্ গুহায় শায়িত, কে বলিয়া দিবে? শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

নববর্ষ।

(রাহুকেতুর প্রতি)

আস্‌ছে আসুক নূতন বছর তোদের কিবা তায়,
কাটা মুণ্ডে দগ্ধ তুণ্ডে কেম্‌নে হাসি পায়?
কোন বা আশায় কোন্ ভরসায় মনেতে সুখ জাগে,
ছিন্নকায়া শবের ছায়া কোন্ বা কাজে লাগে?
বিশ্বভরা গ্রহতারা ছুট্‌ছে হাস্য মুখে,
নবোদ্যমে পরাক্রমে আগুন জ্বলে বুকে!
ধ্রুবলক্ষ্যে কর্ম্মকক্ষে চল্‌ছে দিবা রাতি,
চিরশ্রমণ বিশ্বভ্রমণ কি জ্যোতিষ্ক জাতি!
নূতন হর্ষে নূতন বর্ষে নূতন বীর্য্য তেজে,
বিশ্বরাজ্যে বিরাট কার্য্য কিরীট পরে সে যে!
কেউ বা নৃপ শল্যাধিপ কেউবা সলিল-রাজ,
মেঘবাহন বজ্রদাহন বিশ্বশাসন কাজ!
ঐক্যে সখ্যে দেবতা তারা সবাই পূজে পায়,
ঐক্যহীন চণ্ডাল তোরা ছিন্ন শীর্ষকায়!
তাদের জ্যোতি পুণ্য স্পর্শে হর্ষে ধরা হাসে,
তোদের পাপের মলিন ছায়া ছুঁইলে জাতি নাশে!
কে দৈবজ্ঞ জানে সে যজ্ঞ হিন্দু মোসলমান,
ছিন্নমুণ্ড লাগ্‌বে যোড়া রাহুকেতু পাবে প্রাণ!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

শ্যামের বাঁশী।

"বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে ত্রিভঙ্গ মুরারি শ্যামের রাধানামে সাধা বাঁশী বাজিত—আর সে বাঁশীর স্বরে যমুনা উজান বহিত, ব্রজ-গোপীগণ কুলমান লজ্জাভয় ত্যজিয়া, সংসারের খুঁটিনাটি কাজ ফেলিয়া নিত্যকৃত্যে জলাঞ্জলি দিয়া, ত্বরিতচরণে, স্রস্তবসনে, আকুলমনে, উদাসপ্রাণে, সেই রাধারমণ বংশীবদনের সঙ্গে মহারাসে মিলিবার জন্য, লীলানন্দ-রসে মজিবার জন্য, বনপথে ছুটিত, কণ্টক-কঙ্কর কুশাঙ্কুর কিছুই গ্রাহ্য করিত না। সাফ কবিকল্পনা! আর কবিকল্পনা যেমন হয়—কালিদাস, শেক্‌স্‌পীয়র, জয়দেব, ভারত-চন্দ্র, নিধুবাবু, সর্ব্বত্র যেমন দেখি—সব আদিরসে ওতপ্রোত, কামিনী ও কামনা তাহার সর্ব্বস্ব। যমুনা উজান বহার কথা ত রঞ্জিকা গঞ্জিকার রঙ্গীন স্বপন, গোপীগণ

ফ্রী লভের (free love) সাকারা মূর্ত্তি, আর কৃষ্ণটি একেবারে ডন জুয়ানের দ্বাপরের সংস্করণ! এই সব লইয়া আবার ভক্ত ভাবুক ভাগবতগণ বড়াই করেন—শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।" *

শাক্তবংশে জন্মিয়া, ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া, জনৈক বৈষ্ণব বন্ধুর অনুরোধে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধান্তর্গত রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়াছিলাম ও পাঠান্তে তাঁহার নিকট এই তীব্র মন্তব্য প্রকটন করিতেছিলাম, এমন সময় খঞ্জনী বাজাইয়া গৌরদাস বাবাজী দ্বারে সাড়া দিলেন। বাবাজীর গলা বড় মিঠা, আবার ধরণধারণ অনেকটা হাল ফ্যাশানের। তাই বাবাজী আসিলে আনন্দ-লাভ করিতাম। আজ কিন্তু ঠিক এই সময়ে বাবাজীর সাড়া পাইয়া একটু থতমত খাইলাম। বাবাজী সব কথা শুনিয়া ফেলিয়াছে না কি? যদিও আমি ধর্ম্মসম্বন্ধে স্পষ্টবাদী, স্বাধীনচিন্তাশীল, কুসংস্কারবর্জ্জিত বীরপুরুষ (শত্রুপক্ষ নাকি অসাক্ষাতে বলে, 'কালা-পাহাড়') তথাপি, কেন জানি না, গৌরদাস বাবাজীকে একটু মনে মনে ভয় করিতাম।

বাবাজী আমাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন—"বাবুজী, পাগলের মত কি কতকগুলা প্রলাপ বকিতেছিলেন, পাষণ্ডের মত কি অজস্র অকথা-কুকথা বলিতেছিলেন?" (উঃ! লোকটার কি বুকের পাটা! আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বজাধারী, আমাকে কি না বলে পাষণ্ড!) "আপনি নাকি শান্তিপুরের পবিত্র মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন? নদীয়ার পুণ্যভূমিতে না আপনার নিবাস?" (বাবাজী ভুলিয়াছিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় জগাই-মাধাইও নদীয়ার অধিবাসী ছিলেন।) "আচ্ছা, আপনি ত ইংরাজী-বিদ্যাবিশারদ; টেনিসনের খণ্ডকবিতাগুলির রূপক-ব্যাখ্যায় মজবুত ও মসগুল!" (বাবাজী আবার এ সব খবরও রাখে?) "আর আপনার মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার এই শ্যামের বাঁশীর মর্ম্মার্থটা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না? ধিক্, আপনার বিদ্যাবুদ্ধিতে!"

আমি কীল খাইয়া কীল চুরি করিয়া বেশ একটু সপ্রতিভভাবেই বলিলাম—" তা' বাবাজী, তুমিই না হয় আমার মত ইংরাজী-নবীশকে রাসলীলার গুহ্য তত্ত্বটা বুঝাইয়া দাও। পাষণ্ডকে উদ্ধার করিয়া তোমার গৌরদাস নাম সার্থক কর।" বাবাজী গাঢ়স্বরে বলিলেন—"তবে শ্রবণ করুন।

"এই শ্যামের বাঁশী রণভেরী নহে, জয়ঢক্কা নহে, 'বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে' নহে, শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্য শঙ্খও নহে; ইহা 'মা ক্লৈব্যং গচ্ছ' বলিয়া মানুষকে কঠোর কর্ত্তব্যপালনে উদ্বুদ্ধ করে না, 'যুধ্যস্ব' বলিয়া জীবকে সংসার-সংগ্রামে আহ্বান করে না, অথবা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest) নীতিও ঘোষণা করে না"—(বাবাজীর মুখে ইংরাজী বুলি শুনিয়া তাক্ লাগিয়া গেল। কালে কালে কতই দেখিব!) "ইহা এই শ্যামা জন্মদা কর্ম্মভূমি ভারতভূমির বেণুবনের যদৃচ্ছাজাত বাঁশের বাঁশী। আহা! সরল বাঁশের বাঁশী কি গুণ জানে!" বলিতে বলিতে বাবাজী ভাবে গদ্‌গদ হইলেন। ভাবিলাম, এইবার বাবাজীর দশাপ্রাপ্তি হয় আর কি? যাহা হউক, আমার মত 'পাষণ্ডে'র নিকটবর্ত্তিতা দশাপ্রাপ্তির তাদৃশ অনুকূল

---

* পাঠক মহাশয়ের নিকট সানুনয় অনুরোধ এইটুকু পড়িয়াই লাঠি ধরিবেন না, শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া লেখক দণ্ডনীয় কি না, স্থির করিবেন।

নহে বলিয়াই হউক, অথবা প্রাতে শূন্যোদরে তুরিতানন্দের সেবার সুযোগ পান নাই বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার আরাধ্য দেবতার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য-প্রভাবেই হউক, বাবাজী খুব সামলাইয়া লইলেন।

সামলাইয়া লইয়া বাবাজী বেশ একটু জোর গলা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

“ব্রজগোপীগণ কেহ ঘরের পাট করিতেছেন, কেহ রান্না চড়াইয়াছেন, কেহ দুধ জ্বাল দিতেছেন, কেহ কাপড় কাচিতেছেন, কেহ কুটনা কুটিতেছেন, কেহ বাঁটনা বাঁটিতেছেন, কেহ আহারে বসিয়াছেন, কেহ পতিসেবা করিতেছেন, এমন সময় শ্যামের বাঁশী বাজিল—আর অমনি হাতের কাজ ফেলিয়া সব উধাও হইয়া ছুটিল—ইহা কি আপনার কাছে নিতান্তই অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়? ইহা কি আদিরসাশ্রিত অভিসার ভিন্ন আর কিছুই প্রতীয়মান হয় না?

“এই আর্য্যভূমিতে চারিযুগ ধরিয়া অসংখ্য সাধুসন্ন্যাসী সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, লোকালয় ত্যাগ করিয়া, গিরিকন্দরে নিভৃতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরমপুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন ও আছেন, তাঁহারা এই শ্যামের বাঁশীর স্বর-সুধার আস্বাদ পাইয়াই গৃহত্যাগী হয়েন নাই কি? এখনকার রেল-মেল জাহাজ-ষ্টীমারের আমলের সৌখীন তীর্থযাত্রার বহুপূর্ব্ব হইতে কত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী অক্লান্ত কায়িক ক্লেশ করিয়া, বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করিয়া, দুর্গম পথে পদব্রজে শতসহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া, শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তম-দর্শনে চলিতেছে, গয়াকাশী শ্রীবৃন্দাবন নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ, সাবিত্রী, গঙ্গোত্রী, বদরিকাশ্রম, কেদারখণ্ড, চন্দ্রনাথ, পরশুরামকুণ্ড প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে উপনীত হইতেছে, এই একাগ্রতা ও ঐকান্তিকী ভক্তির ভিতর কি শ্যামের বাঁশীর স্বরলহরীর উচ্চগ্রাম কর্ণগোচর হইতেছে না?

“অথবা এই জপতপ ও তীর্থযাত্রাকে যদি নব্যশিক্ষাগর্ব্বে আপনারা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেন, তবে বলি—

“সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলকামনায়, জরামরণব্যাধিশোকতাপের উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া, কান্তাসাহচর্য্য ও রাজভোগ তুচ্ছ করিয়া, ‘জগতের দুঃখে স্বকপিলবস্তোঃ শাক্যসিংহ যবে ত্যজিল গার্হস্থ্যে,’ তখন তিনি এই শ্যামের বাঁশীর আকুল আহ্বানে গৃহে অতিষ্ঠ হইয়া মহাভিনিষ্ক্রমণ করেন নাই কি? আবার যখন ভগবান্ বুদ্ধের পবিত্র নামে সমাজে ঘোরতর অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন কলুষিত অধোনীত সমাজকে উদ্ধার করিবার মানসে কিশোরশঙ্কর পুত্রগতপ্রাণা জননীর স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন, তখনও কি তিনি এই শ্যামের বাঁশীর উদাত্ত স্বরে উত্তেজিত উচ্ছ্বসিত হয়েন নাই? আর এই সোণার বাঙ্গালার সোণার গৌরাঙ্গ যখন সুপবিত্র ভাগীরথীতটে পুণ্যধাম নবদ্বীপে পাষণ্ড উদ্ধারের জন্য, ‘জীবে দয়া নামে রুচি’ প্রচার উদ্দেশে, হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া, স্নেহময়ী মাতা ও পতিব্রতা পত্নীর মায়া কাটাইয়া গৃহের বাহির হইলেন, তখনও সেই শ্যামের বাঁশীর পাগলকরা সুর তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে নাই কি?

“এ সব দেবাত্মা অবতারের কথা ছাড়িয়া দিলেও যখন দেখি, বিপন্নের আর্ত্তিপ্রশমনের জন্য, রোগীর শুশ্রূষার জন্য, নৃশংস সমর-রাক্ষসের হস্তে নিগৃহীত সৈনিকের সেবার জন্য, কারাবাসীর কষ্টনিবারণের জন্য, মহা-

মনাঃ হাউয়ার্ড ও ফাদার ডামিয়েন, সেবাব্রতধারিণী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর প্রভৃতি উৎসৃষ্টপ্রাণ, তখনও কি বুঝিতে বাকী থাকে যে, এ সকলকেই 'সেই বাঁশীর স্বরে উদাস করে, বল কে কা'রে ধরে' রাখে' ? সে দিনও যে দামোদরের প্রবল বন্যায় বিপন্ন বিধ্বস্ত গ্রামবাসীদিগের বিপদুদ্ধারের জন্য দলে দলে বিদ্যালয়ের যুবক চিরাভ্যস্ত বিদ্যাচর্চ্চা ত্যাগ করিয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিল, সে ক্ষেত্রেও সেই শ্যামের বাঁশীর করুণ রাগিণী তাহাদের কাণে বাজে নাই কি ?

"যাক, এ সব গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা হয় ত আপনার কর্ণে খড়মের শব্দের মত 'খটখটায়তে'। সাধারণ মানবের সাধারণ জীবনের ভিতরও একবার সন্ধান করিয়া দেখুন দেখি, শ্যামের বাঁশীর সুরের রেশ শ্রুতিগোচর হয় কি না ?

"আচ্ছা, আপনার ব্যবসায়ের কথাই ধরুন না কেন ? গুরু প্রতিদিনের অভ্যাসমত মনে মনে সাহিত্য-গণিত-দর্শন-বিজ্ঞানের কোন কঠিন প্রশ্ন সমাধান করিতেছেন, এমন সময় প্রীতিভাজন ছাত্র পাঠ লইতে আসিল, আর গুরু অমনি প্রিয় শিষ্যের আহ্বানে সেই কঠিন প্রশ্ন অসমাহিত রাখিয়া, নিত্যানুষ্ঠিত আলোচনাকার্য্য স্থগিত করিয়া, শিষ্যকে সস্নেহে বিদ্যাদানে ব্রতী হইলেন, এই গুরুশিষ্য-সংবাদে সেই প্রেমময় পুরুষের বংশীধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন না কি ? আবার পড়ুয়া বালক প্রভাতে স্নেহময় গৃহশিক্ষক বা অভিভাবকের ডাক শুনিয়া, সুকোমল শয্যাতল ত্যাগ করিয়া, সাগ্রহে তাঁহার সস্নেহ উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, এও সেই লীলাময়ের বংশীরব নহে কি ? মা ঘরে বসিয়া গৃহস্থালীর কাজ করিতেছেন, আর দূরে ক্রীড়াঙ্গনে আদরের শিশুটী 'মা, মা', বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, অমনি মা হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া, ছুটিয়া গিয়া, শিশুকে কোলে তুলিলেন, এই স্নেহের উচ্ছ্বাসের ভিতরও আর এক ভাবে শ্যামের বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইতেছেন না কি ? আবার কিশোর বালক খেলাঘরে ঘরকন্না সাজাইয়া আপন মনে খেলা করিতেছে, এমন সময় স্নেহময়ী মা তাহার নাম ধরিয়া আদর করিয়া ডাকিলেন, আর শিশু ধূলাখেলা ছাড়িয়া মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এখানেও আর এক ভাবে সেই শ্যামের বাঁশীর সাড়া পাইলেন না কি ? বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগত বালক অন্দরে মায়ের কাছে বসিয়া খাবার খাইতেছে, আর সদর দ্বারে ক্রীড়াসঙ্গীদিগের সঙ্কেতধ্বনি শুনিল, মুখের গ্রাস মুখেই রহিল, অমনি বালক সঙ্গিগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিল, এই বাল্যপ্রণয়ে, এই সৌহার্দ্দ্যের আকর্ষণে, শ্যামের বাঁশীর বিচিত্র রাগিণী শুনিতে পাইতেছেন না কি ? আপনাদের গ্রীক পুরাণে প্রেমিকপ্রবর লীয়াণ্ডার (Leander) বিল্বমঙ্গলের ন্যায় সাঁতারিয়া অকূল পাথার পার হইয়া প্রিয়ার সহিত মিলিত হইতেন, ইহাতে হয় ত শ্যামের বাঁশীর আওয়াজ স্পষ্ট শুনিতে পান, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর যখন মাতার বিমল স্নেহস্মরণে অধৈর্য্য হইয়া অকুতোভয়ে দামোদরের প্রবল স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া মাতৃচরণান্তিকে উপস্থিত হইলেন, এখানেও কি শ্যামের বাঁশীর, স্নেহের আহ্বানের, সাড়া পাইতেছেন না ? ফলতঃ, প্রেম, স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা, মৈত্রী, শ্রদ্ধা, ভক্তি, এ সবই ত সেই ভগবানের ডাক, সেই শ্যামের বাঁশী,

সেই
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুং।"

গৌরদাস বাবাজী শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই ভিন্ন ভিন্ন রস একত্র মিশ্রিত করিয়া এক অত্যদ্ভুত মহাদ্রাবক প্রস্তুত করিতেছিলেন, বুঝিলাম, তাহাতে এই পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল, সুতরাং রসসঙ্কর লক্ষ্য করিয়াও লক্ষ্য করিলাম না। *

বাবাজী বলিতে লাগিলেন—"দেখুন, এই স্বর শুনিলে মানুষ সংসারের খুটিনাটি কার্য্য বিস্মৃত হয়, পার্থিব ভোগবিলাসে, পার্থিব কর্ম্মকলাপে ডুবিয়া থাকে না, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া পারমার্থিক প্রেমরাজ্যের দিকে ধাবিত হয়। শুধু তাহা কেন? এই স্বর হৃদয়ের তারে ঠিকমত ঝঙ্কৃত হইলে, এই প্রেমের আহ্বান হৃদয়ে স্থায়িভাব পাইলে, যমুনা উজান বহে, প্রকৃতির নিয়মের বিপর্য্যয় হয়, দস্যু রত্নাকর সাধু ভক্ত ঋষিতে পরিণত হয়, উদ্ধত ক্ষত্রবলে বলীয়ান্ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের চরণে লুঠাইয়া পড়েন—জগৎ ভরিয়া জয়ধ্বনি উঠে—'বাল্মীকির জয়'—কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রেমের জয়, মধুর রসের জয়, বিশ্ব তখন মধুময় হয়,—মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু মধু মধু।

"এই প্রেম যখন বিশ্বজনীন হয়, তখনই মহারাস। সেই মহারাসে বুদ্ধ-শঙ্কর, গৌর-নিতাই, নানক-কবীর, তুকারাম-তুলসীদাস, বিজয়কৃষ্ণ-শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ-কাঙ্গাল-হরিনাথ নাচিয়াছিলেন। ইহাই বৈষ্ণবের রাধাভাব—ইহা অভিসার নহে, কামকেলি নহে, এই সঙ্কেতস্থান আপনাদের ইংরাজী কবিতা ও কাহিনীর trysting-place বা place of assignation নহে।"

বাবাজীর হৃদয়-যমুনা দুই কূল ছাপাইয়া আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল, (পাঠক হয় ত বলিবেন, 'শিলা জলে ভেসে যায়, দখিলেও না হয় প্রত্যয়,)—এমন সময়ে অদূরে কলেজের ঘড়ীতে দশটা বাজিল। আমি আবার কর্ম্মকোলাহলময় বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিলাম। বলিলাম, "বাবাজী, আর না, তোমার রচিত আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয় প্রেমের জগতে বিচরণ করা চলিবে না, ব্যবহারিক জগতে, কর্ম্মজীবনে আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে,—'ঐ বাজে হারা'—উহা কর্ম্মের ভেরীরব, কর্ত্তব্যের সঙ্কেতধ্বনি, উহাতে প্রেম স্নেহ মাধুর্য্য কবিত্বরস আছে কি না, জানি না, কিন্তু উহা যে বস্তুতন্ত্রতাময় কঠোর সত্য, ইহা বিলক্ষণ বুঝি।"

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইঙ্গিত।

শিশু তোমায় ভালবাসি! শিশু হ'তে চাইনা ফিরে।
উজল্ আমার রক্ত সন্ধ্যা, ছায়া আমার পূর্ব্ব তীরে।
ভালবাসি তোমায় যুবা! লওগো হেসে আমার প্রীতি;
তোমার দিবার শুভ্র আলো, আনে তীব্র তাপের স্মৃতি।
অস্তাচলের তলায় বহে স্নিগ্ধ নদী অন্ধকারে;
মনে পড়ে গ্রামের কূলের ছায়ায় ঢাকা চন্দনারে *।
তেম্‌নি ধারা চিন্তা-হরা ধরায় যেন আমায় নাওয়ায়;
তাত্‌বে না আর অঙ্গ আমার, পিছনপথের গরম হাওয়ায়।

---

* একা গৌরদাস বাবাজীর অপরাধ কি? আজকাল অনেক নামজাদা লেখকই শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য এইরূপ খিচুড়ি পাকাইতেছেন। ইঁহারা সকলেই এক এক গৌরদাস. অর্থাৎ ইংরাজের চেলা, ইংরাজী ভাবের ঘিয়ে ভাজিয়া সংস্কৃত ডিস্ (dish) সাজাইতেছেন।

* লেখকের গ্রামের তীরের নদী।

পিছনে মোর ক্ষুদ্র বিশ্ব, সাম্‌নে রাজ্য বড় ডাগর ;
শৈল-পারে শৈল-মালা, সাগর পরে আরও সাগর।
"চিত্রে ভরা এমন ধরা, যাচ্ছ ফেলে, কিযে দেখে" ?
মুছে গেছে বর্ণচিত্র। ফেরাস্ নারে পিছু ডেকে।
"বুঝ্‌বে প্রিয় পরিজনের প্রীতি-দীপ্ত স্নিগ্ধ আলো" ?
কাঁদাস্ নারে তোরা আমায়,সামনে যখন আঁধার কাল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য।

আর্হত বা জৈন মত।

অনন্তর শঙ্কর বাহ্লিক দেশে গমন করিলেন। বাহ্লিক দেশ আধুনিক ভারতবর্ষের বাহিরে, বর্ত্তমান পারস্য-রাজ্যস্থিত। তথায় অবস্থান কালে,একদা তিনি শিষ্যদিগের নিকট স্বীয় ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে জৈন বা আর্হত মতাবলম্বী কতিপয় পণ্ডিত তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া, তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বিচারের বর্ণনা পাঠকের নিকটে সহজ-বোধ্য করিবার জন্য আমরা সংক্ষেপে আর্হত বা জৈন মতের বর্ণনা করিতেছি (সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য)।

(ক) জীব এবং অজীব।

আর্হত মতে তত্ত্ব দ্বিবিধঃ :—চিৎ বা বোধাত্মক জীব, এবং অচিৎ বা অবোধাত্মক বা জড়াত্মক অজীব। জীব ত্রিবিধ,— সংসারী, মুক্ত, এবং নিত্যসিদ্ধ। অর্হৎ বা জিন নিত্যসিদ্ধ। অন্যেরা কেহ বা সাধনাদ্বারা মুক্ত, কেহ বা বদ্ধ। যাহারা এক জন্ম হইতে জন্মান্তর লাভ করে,তাহারাই বদ্ধ বা সংসারী। সংসারী জীব দুই প্রকার :—সমনস্ক এবং অমনস্ক যাহারা শিক্ষা, ক্রিয়া, এবং আলাপাদি গ্রহণে সমর্থ, তাহারা সমনস্ক। যাহারা তাহার বিপরীত, তাহারা অমনস্ক। অমনস্ক জীব দুই প্রকার :—'ত্রস' বা চলনশীল, এবং 'স্থাবর'। শঙ্খ, কৃমি প্রভৃতির ন্যায় যাহাদের অন্তত দুইটী ইন্দ্রিয় আছে, তাহারা 'ত্রস' বা চলনশীল। 'ত্রস' চারিপ্রকার :—দুই, তিন, চার, অথবা পাঁচ ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট। পৃথিবী, জল, তেজ,বায়ু, এবং বনস্পতি সকল 'স্থাবর'। পৃথিবীকে যে কায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে, কি করিবে, সে পৃথিবী-কায়ক, বা পৃথিবী-জীব। জল, বায়ু প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ।

(খ) জীব, আকাশ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুদ্গল, এবং অস্তিকায়।

আর্হত মতে নিত্য এবং অনিত্যাত্মক তত্ত্ব কাহারো কাহারো মতে সপ্ত, কাহারো কাহারো মতে নব, যথা:—জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সম্বর, বন্ধ নির্জ্জর, এবং মুক্তি। বোধাত্মক জীব এবং অবোধাত্মক অজীবের যোগে জীবাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, এবং পুদ্গলাস্তিকায়—এই পঞ্চপ্রকার ভেদযুক্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি। কালত্রয়-সম্বন্ধ হেতু স্থিতি-বাচক 'অস্তি' শব্দ, এবং অনেক-প্রদেশবর্ত্তিত্ব হেতু শরীর-বাচক 'কায়' শব্দ, উভয় যোগে 'অস্তিকায়' শব্দ, ইহাদিগের প্রতি প্রযুক্ত হয়। ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, এবং আকাশাস্তিকায় একত্বশালী (Singular, not generic), এবং নিষ্ক্রিয়। ইহারা দ্রব্যসকলের দেশান্তর-প্রাপ্তির কারণ। অবস্থিতি এবং গতি ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত। প্রবৃত্তিদ্বারা ধর্ম্মাস্তিকায়ের, এবং স্থিতিদ্বারা অধর্ম্মাস্তিকায়ের অনুমান হয়। যেখানে এক বস্তু আছে,

সেখানে অন্য বস্তুর প্রবেশের নাম 'অবগাহ' (Penetrability), এবং তাহা আকাশের কার্য্য। আকাশাস্তিকায় দুই প্রকার :—লোকাকাশ, এবং অলোকাকাশ। উপর্য্যুপরিস্থিত লোক সকলের মধ্যে যে আকাশ বর্ত্তমান,তাহার নাম লোকাকাশ। তাহাদের উপরিস্থিত মোক্ষ স্থানের নাম অলোকাকাশ। পুদ্গলাস্তিকায় স্পর্শ, আস্বাদন,এবং বর্ণ-যুক্ত। তাহা দুই প্রকার :—অণু, এবং স্কন্ধ। যাহা ভোগের অবিষয়, তাহাই অণু। দ্ব্যণুকাদি ভোগ্যবস্তুই স্কন্ধ। দ্ব্যণুকাদির ভঙ্গ বা বিগলনে অণুর উৎপত্তি, এবং অণুসকলের পরস্পর যোগে দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি। 'পূর্ণ করে', অর্থাৎ গঠন করে, এবং 'বিগলিত বা ভগ্ন করে', এজন্য বলা হয় পুদ্গল। সৎকর্ম্ম-পুদ্গলের নাম পুণ্য, তাহার বিপরীত পাপ।

(গ) আশ্রব :—শরীরের চলনে আত্মার চঞ্চলত্ব। জলমধ্যগত যে দ্বার দিয়া নদীর জল বহির্গত হয় (Sluice-gate) তাহাকে 'আশ্রব' বলে। কর্ম্ম সকলও সেইরূপ 'যোগ' রূপ দ্বারদ্বারা আত্মার মধ্যে প্রবাহিত হয়, এজন্য 'যোগের'ই নাম 'আশ্রব'। আর্দ্রবস্ত্র যেরূপ বায়ুদ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে আহৃত ধূলিকণা সকল গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ কষায় বা পাপরূপ জলদ্বারা আর্দ্র হইয়া, যোগরূপ বায়ুদ্বারা সর্ব্বপ্রদেশ হইতে আনীত কর্ম্মসকল গ্রহণ করে। কুগতি-প্রাপ্তিদ্বারা আত্মার 'কষণ' অর্থাৎ হিংসা করে, এজন্য ক্রোধ, মান, মায়া, এবং লোভকে কষায় বলা যায়। অহিংসাদিকে শুভকায়যোগ, এবং সত্য, মিত, এবং হিতভাষণাদিকে শুভবাক্‌যোগ বলা যায়। কায়, মন এবং বাক্যের সহিত পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের যোগের নাম আশ্রব। পুণ্যের আশ্রব শুভ, এবং পাপের আশ্রব অশুভ।

(ঘ) বন্ধ :—মিথ্যাদর্শন, অবিরতি, প্রমাদ, এবং কষায় হেতু 'যোগ' দ্বারা নানাস্থান হইতে আনীত কর্ম্মবন্ধের হেতুভূত 'পুদ্গল' সকল, আত্মা স্বীয় সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে গ্রহণ করে, এবং আপনাতে যোগ করে, তাহাকেই 'বন্ধ' বলে। বন্ধ নানাপ্রকার। তন্মধ্যে প্রকৃতিবন্ধ বা কর্ম্মবন্ধ আবার অষ্ট প্রকার :—(১) জ্ঞানাবরণীয় অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান লাভেও মোক্ষ-সিদ্ধি হয়না, যে হেতু জ্ঞানদ্বারা বস্তু লাভ হয় না, মনের এরূপ ভ্রম ধারণা। (২) দর্শনাবরণীয়,—অর্থাৎ আর্হতদিগের দর্শনের অভ্যাসদ্বারা মোক্ষ-সিদ্ধি হয় না,—এরূপ ভ্রম। (৩) 'বেদনীয়' অর্থাৎ কোন বস্তু যুগপৎ আছে এবং নাই মনে করিলে, অসিধারাতে মধুলেহনের ন্যায় মনে যে যুগপৎ সুখ এবং দুঃখের দ্রক হয়, সেইরূপ ভাব। (৪) 'মোহনীয়' অর্থাৎ তীর্থঙ্করদিগের উপদেশ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ, অতএব তাহাদিগেরও জ্ঞানাভাব, এইরূপ ভ্রম,—অথবা তত্ত্বালোচনায় অশ্রদ্ধা, এবং অসংযত চরিত্র। (৫) 'আয়ুস্ক' অর্থাৎ দেহধারণের প্রতি আসক্তি। (৬) 'নামিক' অর্থাৎ স্বীয় নামেতে অহঙ্কার। (৭) 'গোত্রিক' স্বীয় গ্রোত্রে অভিমান বা (৮) 'অন্তরায়' বা দানাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে কাতরতা, অথবা দানাদিকে মোক্ষলাভের বিঘ্নকর জ্ঞান। ইহারই নাম কর্ম্মাষ্টক। জৈন মতে এই কর্ম্মাষ্টকের ক্ষয়ে মুক্তির উদয়।

(ঙ) সম্বর :—পূর্ব্বোক্ত আশ্রবের নিরোধের নাম সম্বর। সম্বরদ্বারা আত্মাতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রবেশের পথ নিরুদ্ধ হয়। সম্বর নানা প্রকার, যথা, গুপ্তি, সমিতি, ইত্যাদি। কায়মনোবাক্যের নিগ্রহদ্বারা সংসারগতির কারণভূত আশ্রব হইতে আত্মাকে

রক্ষা করার নাম 'গুপ্তি'। প্রাণীগণের পীড়া পরিহার পূর্ব্বক সঞ্চারণের নাম 'সমিতি'। সংসার-গতির কারণ 'আশ্রব', এবং মোক্ষলাভের কারণ 'সম্বর'।

(৬) নির্জর:—তপঃ প্রভৃতির দ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের নির্জরণ বা ক্ষয় সাধনের নাম নির্জর। নির্জরের প্রভাবে এই দেহদ্বারাই চির প্রবৃত্ত পাপপুণ্য এবং সুখদুঃখের ক্ষয় সাধিত হয়। সংসারের বীজভূত কর্ম্মসকলকে নিঃশেষরূপে জরণ বা পরিপাক করে, এই জন্য বলা হয় নির্জর। নির্জর দ্বিবিধ:—কামাদি-পাকজ, এবং কর্ম্ম-নির্জর। কর্ম্ম স্বীয় ফল দান করিলে পর স্বভাবতই কর্ম্মের যে ক্ষয় হয়, তাহার নাম কাম-পাকজ নির্জর, আর তপস্যার বলে কর্ম্ম স্বয়ংই যখন মুক্তিলাভরূপ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায় হয়, তখন সেই কর্ম্মকেই "কর্ম্ম-নির্জর" বলা যায়।

(৭) মোক্ষ:—মিথ্যাদর্শনাদি বন্ধকারণের নিরোধ হেতু অভিনব কর্ম্ম-প্রবাহের নিরোধ হইলে, এবং নির্জরদ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, কর্ম্মবন্ধ হইতে যে আত্যন্তিক মুক্তি লাভ হয়, তাহারই নাম মোক্ষ। মৃত্তিকা-লিপ্ত অলাবু (লাউ) জলে ডুবিয়া যায়, কিন্তু সেই অলাবু মৃত্তিকা হইতে মুক্ত হইলে, পুনরায় জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। আত্মাও সেইরূপ কর্ম্ম-বন্ধন-মুক্ত হইলে, স্বীয় স্বভাব-সিদ্ধ অসঙ্গত্ব ধর্ম্ম হেতু উর্দ্ধে আরোহণ করে, কারণ অগ্নি-শিখার ন্যায় উর্দ্ধগতিই আত্মার স্বভাব।

সপ্তভঙ্গী-নয় অথবা স্যাৎবাদ।

আর্হতগণকে একপ্রকার অনিবর্বাচ্যবাদী অর্থাৎ কতকটা Agnosticদিগের মত বলা যায়। আর্হতগণ বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকত্ববাদের বিরোধী, কারণ তাঁহারা বলেন, যদি কোন স্থায়ী আত্মা না থাকে, তবে লৌকিক কর্ম্মফল-ভোগের নিয়ম বিফল হয়। একজন কর্ম্ম করে, আরেক জন তাহার ফল ভোগ করে, এরূপ সম্ভব নয়। ক্ষণিকত্ববাদ অস্বীকার করিলেও আর্হতমতে বস্তুর স্বভাব সত্ত্ব কি অসত্ত্ব, ঠিক্ বলা যায় না। এজন্য তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ চারিপ্রকার মত প্রচলিত:—সৎবাদ, অসৎবাদ, সদসৎবাদ, এবং অনির্ব্বচনীয়-বাদ। এতদ্ভিন্ন আরও তিন প্রকার মত আছে, তাহা সদসদাদি বাদ-চতুষ্টয়ের সহিত অনির্ব্বচনীয়বাদের যোগ মাত্র। আবার তাঁহারা যখন কোন বস্তু আছে কি নাই বলেন, সেই সঙ্গে তাঁহারা "কথঞ্চিৎ" অর্থে 'স্যাৎ' বা 'হয়ত' শব্দের যোগ করেন, কারণ তাঁহারা অনৈকান্তিকত্বের বা অনিশ্চিতত্বের পক্ষপাতী, যথা 'স্যাদস্তি' 'স্যান্নাস্তি' ইত্যাদি। তাঁহাদের উপদেশ যে, যখন কোন বস্তু আছে বলিতে চাও, তখন বলিবে 'হয়ত আছে'—"স্যাদস্তি", বা যখন কোন বস্তু নাই বলিতে চাও, তখন বলিবে 'হয়ত নাই'—'স্যান্নাস্তি'। 'স্যাৎ' শব্দ এস্থলে অনেকান্তত্ব-দ্যোতক, অথবা কথঞ্চিৎবোধক। ইহারই নাম 'স্যাদ্বাদ'। স্যাদ্বাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বদা 'একান্ত' বা নিশ্চয়তা ত্যাগ। যখন কোন বস্তুসম্বন্ধে বাদী সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে 'সেই বস্তু কি আছে', তখন 'হয়ত আছে' 'স্যাদস্তি', এই উত্তর শ্রবণে সে লজ্জায় নীরব হয়। তাহাতেই স্যাদ্বাদির জয় নিশ্চিত। অন্যান্যমতাবলম্বীর পক্ষ-প্রতিপক্ষ আছে, কিন্তু স্যাদ্বাদী * অপক্ষপাতী, কারণ সকল প্রকার মতই তাহার নিকট সমান। এই স্যাদ্বাদকেই জৈনগণ সর্ব্বদা সপ্তভঙ্গী-নয় নামে উল্লেখ করেন। একান্ততা ত্যাগ করিয়া

---

* আধুনিক Theosophist কতকটা "স্যাদ্বাদী" কি না, তাঁহারাই বলিতে পারেন।

কিরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হয়, সপ্তভঙ্গী-নয় তাহাই প্রদর্শন করে, যথা :—(১) 'স্যাদস্তি' 'হয়ত আছে', (২) 'স্যান্নাস্তি' 'হয়ত নাই', (৩) 'স্যাদস্তিচ নাস্তিচ 'হয়ত' উভয় আছে এবং নাই', (৪) 'স্যাদবক্তব্যং' 'হয়ত বাক্যে প্রকাশ হয় না', (৫) 'স্যাদস্তি চাবক্তব্যং' 'হয়ত আছে, কিন্তু বাক্যে প্রকাশ হয় না', (৬) 'স্যান্নস্ত চা বক্তব্যং', 'হয়ত নাই কিন্তু বাক্যে প্রকাশ হয় না'। (৭) 'স্যাদস্তি চ নাস্তিচাবক্তব্যং' হয়ত 'উভয় আছে এবং নাই, কিন্তু তাহা বাক্যে প্রকাশ হয় না'। এই 'স্যাদ্বাদ' দুই প্রকার মাত্র প্রমাণ স্বীকার করে, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান।

'জিন' বা অর্হৎই জৈনদিগের দেবতা এবং গুরু। তাঁহাদের মতে তিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা। বৌদ্ধদিগের যেমন বুদ্ধ, জৈনদিগের পক্ষেও সেইরূপ জিন, বা অর্হৎ। জৈনগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত :—(১) শ্বেতাম্বর, এবং (২) দিগম্বর।

আর্হতপণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিচার।

আর্হত পণ্ডিতগণের সহিত শঙ্করাচার্য্যের যে বিচার হইয়াছিল, মাধবাচার্য্য তাহা এইরূপে বর্ণন করিতেছেন :—

আর্হত। জীব (বোধাত্মক), অজীব (জড়াত্মক), আশ্রব (ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি বা কর্ম্ম), শ্রিতবৎ (মিথ্যা বা অশুভ প্রবৃত্তি), সম্বর (শমদমাদি শুভ প্রবৃত্তি), নির্জ্জর (পুণ্যাপুণ্যনাশের সাধন), বন্ধ, এবং মোক্ষ, এই সপ্ত প্রকার পদার্থ, এবং অস্তিনাস্তি ইত্যাদি সপ্তভঙ্গী-নয় কেন স্বীকার কর না।

শঙ্কর। হে আর্হত, তোমাদের মানিত জীবাস্তিকায়ের স্বরূপ পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা কর।

আর্হত। হে বিদ্বন্, জীবাস্তিকায় দেহেরই তুল্য-পরিমাণবিশিষ্ট, এবং কর্ম্মাষ্টকদ্বারা দৃঢ়রূপে বেষ্টিত।

শঙ্কর। জীব যদি দেহের সমান পরিমাণবিশিষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা বড়ও না হয়, ছোটও না হয়, তবে ত জীব ঘটাদিরই তুল্য। তাহা হইলে ঘটাদির ন্যায় জীবও নিত্য হইতে পারে না। আবার মনুষ্য-দেহ পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন গজ-দেহে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে, তখন সে সমগ্র গজ-দেহ কিরূপে অধিকার করিবে? অথবা যখন পতঙ্গ-দেহে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবে, তখন সমগ্র জীব কিরূপে তাহাতে সমাবেশ লাভ করিবে?

আর্হত। জীব যখন কোন ক্ষুদ্রতর দেহ পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন সে নূতন অবয়ব লাভ করে, এবং যখন কোন বৃহত্তর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রতর দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন জীব তাহার অবয়বের কতক অংশ পরিত্যাগ করে। এইরূপে জীব যখন যে দেহ ধারণ করে, তখন তত্তৎদেহের সহিত তাহার সমব্যাপ্তি হেতু, জীব সেই সেই দেহের সমান পরিমাণই থাকে।

শঙ্কর। যদি শরীরের ন্যায় জীবের পক্ষেও অবয়বের সমাগম এবং অপগম সম্ভব হয়, তবে শরীরাবয়বের জড়ত্বের ন্যায়, সেই সকল জীবাবয়বেরও জড়ত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত হয়। সেই সকল অনাত্মভূত অবয়ব কিরূপে জীবের মধ্যে আবির্ভাব এবং তিরোভাব লাভ করিবে?

আর্হত। সেই সকল অবয়বও জন্ম বা ক্ষয়-রহিত, কখনও প্রকাশিত হয়, কখনও অপ্রকাশিত থাকে। হস্তী প্রভৃতি প্রাণীবিশেষে তাহা সমস্তই প্রকাশিত হয়, আর

পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী-বিশেষে তাহা সমস্ত প্রকাশিত হয় না।

শঙ্কর। বল দেখি সে সকল অবয়ব চেতন কি অচেতন? যদি চেতন হয়, তবে যেহেতু অবয়ব সকল অনেক, এবং তাহাদের পরস্পর বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না, তখন সেই সকল চেতন অবয়বের পরস্পর বিরোধ হেতু শরীর উন্মথিত হইবে। আর যদি জীবাবয়ব সকল অচেতন হয়, তবে তাহাদের যোগে শরীরে চৈতন্য লাভ অসম্ভব। অচেতন অবয়বকে জীবাবয়বই বলা যাইতে পারে না।

আর্হত। হে বিদ্বন্, অনেক অশ্ব যেমন একমত হইয়া একটী রথ চালনা করে, সেই রূপে জীবাবয়ব সকলও বিরোধ-রহিত হইয়া, চৈতন্যযোগদ্বারা শরীর চালনারূপ কার্য্য নিষ্পন্ন করুক।

শঙ্কর। হে সুমতে, সারথিরূপে অশ্ব সকলের উপরে একজন চালক থাকে বলিয়াই অনেক অশ্ব একমত হইয়া রথচালনা-কার্য্য নিষ্পন্ন করে। কিন্তু এস্থলে তোমাদের কল্পিত অবয়ব সকলের উপরে সেরূপ কোন নিয়ামকের অভাব হেতু ঐকমত্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

আর্হত। হে যতিরাজ, জীবাবয়বের তাদৃশ উপগম অথবা অপগম নাই বা হইল। তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। জলৌকা যেমন অবলীলাক্রমে কখনও সঙ্কুচিত এবং কখনও বা প্রসারিত হয়, জীবও সেইরূপ বৃহত্তর শরীরে প্রসারিত, এবং ক্ষুদ্রতর শরীরে সঙ্কুচিত হয়।

শঙ্কর। জড় পদার্থের ন্যায় জীবের পক্ষে যদি আকুঞ্চন-প্রসারণাদি বিকারভাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তবে জীব ও ঘটাদি অপরাপর জড়বস্তুর ন্যায় নশ্বর হইবে। জীব নশ্বর হইলে কৃতের নাশ বা সদ্বস্তুর অসত্তা, এবং অকৃতের অভ্যাগম বা অসদ্বস্তুর সত্তা সম্ভব হয়। আবার এরূপ হইলে সংসার-সাগরে নিমগ্ন স্বকর্ম্মাষ্টক-ভারে পীড়িত জীবের পক্ষে জলমগ্ন অলাবুবৎ সতত ঊর্দ্ধ-গমন-শীলতারূপ জীবের মোক্ষলাভ-বিষয়ক তোমাদের সিদ্ধান্ত সাধিত হয় না। হে আর্হত, তোমাদের কথিত সপ্তভঙ্গী-নীতিরও আমরা আদর করি না। কারণ সৎ এবং অসৎ—এরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একাধারে যুগপৎ স্থিতি সম্ভব হয় না। এইরূপে আর্হত বা জৈনগণ শঙ্করের সহিত বিচারে পরাজিত হইলেন।

জৈন দার্শনিক।

জৈন-দর্শন আমাদিগের নিকটে বৌদ্ধ দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর অপরিচিত অনেকের ধারণা যে, জৈন দর্শন এবং ধর্ম্ম,বৌদ্ধ দর্শন এবং ধর্ম্মেরই শাখা-বিশেষ। জনগণ নিজেরাও বোধ হয় ভিন্নসম্প্রদায়ীদিগকে তাহাদের শাস্ত্রালোচনার অধিকার এবং সুবিধা প্রদানে অনিচ্ছুক। যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রতিপক্ষের উক্তি হইতেও প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মতত্ত্বের অনুশীলনে এবং আত্মার বিকাশ-সাধন-বিষয়ে জৈনগণ অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে শঙ্কর জৈনদার্শনিকদিগের মতের এইরূপ উল্লেখ করিতেছেন:—“স্রোতঃসন্তান-নিত্যতান্যায়ে নাত্মনো নিত্যতা স্যাৎ” (সূত্রভাষ্য, ২-২-৩৫)। ‘নদীপ্রবাহের নিত্যতার ন্যায় আত্মার নিত্যতা’—(Compare Emerson's “No man can see the same thing twice”)। জৈনগণ বৌদ্ধ ক্ষণিকত্ববাদের বিরোধী। অতএব তাহাদের এই কথার ভিতরে বৈদান্তিকদিগের সোপাধিক

এবং নিরুপাধিক (কুটস্থ) ভেদেরই কতক আভাস দৃষ্ট হয়। অধ্যাত্ম ধর্ম্ম-সাধনাবিষয়ে জৈনদিগের আদর্শ যে কত উচ্চ, তাহা তাহাদের পদার্থ বিচার * পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হয়। মোক্ষ সম্বন্ধেও জৈন মত প্লেটো (Plato) প্রভৃতি অতি উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মতেরই অনুরূপ। মোক্ষ-বিষয়ক জৈন মত শঙ্কর এইরূপ বর্ণন করিতেছেন :—"কর্ম্মাষ্টক-পরিবেষ্টিতস্য জীবস্য অলাবুবৎ সংসার-সাগরে নিমগ্নস্য বন্ধনোচ্ছেদৎ ঊর্দ্ধগামিত্বং ভবতি" (সূত্রভাষ্য, ২-২-৩৫)। (জ্ঞানাবরণীয়াদি) কর্ম্মাষ্টক-পরিবেষ্টিত সংসার-সাগরে নিমগ্ন জীবের মৃত্তিকাদ্বারা উপলিপ্ত জলমগ্ন অলাবুর মৃত্তিকার অপগমে ঊর্দ্ধারোহণের ন্যায়, কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদে (জীবের) ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়। প্লেটো আত্মার ঊর্দ্ধগমন-শীলত্ব পক্ষীর পক্ষপুটের উপমাদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। জৈন দার্শনিক তাহাই মৃদুপলিপ্ত জলমগ্ন অলাবুর মৃদপগমে ঊর্দ্ধারোহণের উপমাদ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।

সূত্রভাষ্যে শঙ্করের কৃত জৈন মত খণ্ডন।

শঙ্করাচার্য্য নিজে তাঁহার সূত্রভাষ্যে যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া জৈনমত খণ্ডন করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদও এস্থলে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। শঙ্কর জৈন দার্শনিকদিগের প্রতি কতদূর সুবিচার করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। শঙ্কর বলিতেছেন :—"দিগম্বর বা জৈনমতে সাতটি পদার্থ :—জীব, অজীব, আশ্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ, এবং মোক্ষ। সংক্ষেপে দুইটি পদার্থও বলা হয়—জীব ভোক্তা) এবং অজীব (ভোগ্য), কারণ যথাসম্ভব অন্য সকল এই দুইয়েরই অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ভিন্ন তাহারা আবার পঞ্চ অস্তিকায় নামক প্রপঞ্চেরও বর্ণন করেন :—জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, এবং আকাশাস্তিকায়। তাহাদের শাস্ত্রোক্ত এ সকলেরও আরও অনেক প্রকার অবান্তর ভেদ তাঁহারা স্বীকার করেন। আবার তাঁহারা সর্ব্বত্র এই সপ্তভঙ্গী-নয় নামক ন্যায়েরও অবতারণা করেন :—(১) স্যাদস্তি, (২) স্যান্নাস্তি, (৩) স্যাদস্তিচ নাস্তিচ (৪) স্যাদবক্তব্যঃ, (৫) স্যাদস্তি-চাবক্তব্যশ্চ, (৬) স্যান্নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ, (৭) স্যাদস্তি চ নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ। একত্ব-নিত্যত্বাদি বিষয়েও তাঁহারা এই সপ্তভঙ্গী-নয় প্রয়োগ করিয়া থাকেন (যথা, স্যাদেকঃ স্যাদনেকঃ, স্যান্নিত্যঃ স্যাদনিত্যঃ, ইত্যাদি)। এসম্বন্ধে আমরা বলিতেছি যে, এরূপ মত সঙ্গত নয়। কেন ? কারণ একই পদার্থে তাহা অসম্ভব। একই ধর্ম্মীর মধ্যে শীতোষ্ণের যুগপৎ সমাবেশের ন্যায় সদসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ সমাবেশ অসম্ভব। আর তাঁহাদের যে সপ্ত পদার্থ, তাহা যে সংখ্যক এবং যেরূপ বলিয়া নির্দ্ধারিত, তাহা কি সেরূপই অথবা সেরূপ নয় ? যদি নিশ্চয় করিয়া তাহা না বলা যায়, এবং তাহা যদি এরূপও হইতে পারে, এরূপ

---

* "আস্রব-সম্বর-নির্জ্জরাস্ত্রয়ঃ পদার্থাঃ প্রবৃত্তি-লক্ষণা। তত্র মিথ্যাপ্রবৃত্তিরাস্রবঃ। সম্যক্-প্রবৃত্তী তু সম্বরনির্জ্জরৌ। ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিরাস্রবঃ। অন্যে তু কর্ম্মাণ্যাস্রবমাহুঃ। সেয়ং মিথ্যা-প্রবৃত্তিরনর্থহেতুত্বাৎ। শমাদিরূপা প্রবৃত্তিঃ সম্বরঃ। সা হ্যাস্রবস্রোতসো দ্বারং সংবৃণোতি। নির্জ্জরস্তু নাদিকালপ্রবৃত্তিকষায়কলুষপুণ্যাপুণ্য-প্রহাণহেতুঃ। বন্ধোঽষ্টবিধং কর্ম্ম। তত্র ঘাতিকর্ম্ম চতুর্বিধং। জ্ঞানাবরণীয়ং, দর্শনাবরণীয়ং, মোহনীয় মন্তরায়ং। ঊর্দ্ধগমনশীলোহি জীবো ধর্ম্মাধর্ম্মাস্তিকায়েন বদ্ধস্তদ্বিমোক্ষাৎ যদূর্দ্ধং গচ্ছত্যেব স মোক্ষঃ"। "ভামতী ২-২-৩৩॥

নাও হইতে পারে, তাহা হইলে সংশয়ের ন্যায়, এরূপ অনির্দ্ধারিত জ্ঞান প্রমাণের অযোগ্য। যদি বল যে বস্তু অনেকাত্মক হওয়াতে, নির্দ্ধারিত আকারে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা সংশয়-জ্ঞানের ন্যায় অপ্রমাণ হইতে পারে না,—আমরা বলিতেছি, তাহা নয়। যাহারা সর্ব্ববিষয়ে নিরঙ্কুশ অনেকান্তত্ব বা অনিশ্চয়তা স্বীকার করেন, বস্তুত্বাবিশেষত্ব হেতু তাহাদের নির্দ্ধারণও স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি ইত্যাদি বিরুদ্ধ কল্পনার বিষয় হওয়াতে, তাহাও অনির্দ্ধারণাত্মক বা সংশয়যুক্তই হইবে। এরূপ নির্দ্ধারণকর্ত্তার নির্দ্ধারণের ফল স্যাৎপক্ষে অস্তিতা, এবং অস্যাৎপক্ষে নাস্তিতা হইবে। এরূপ হওয়াতে, যখন সেই তীর্থঙ্করের প্রমাণ, প্রমেয় প্রমাতৃ, প্রমিতি, সকলই অনির্দ্ধারিত, তখন তিনি প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য উপদেশ করিবেন কিরূপে! আর যাঁহারা সেই তীর্থঙ্করের উপদেশ অনুসরণ করিবেন, তাঁহারাই বা সেই অনির্দ্ধারিতস্বরূপ উপদিষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবেন কিরূপে? ফল নিশ্চিতরূপে অবয়বের উপগম এবং অপগম দ্বারাও জীবের দেহ পরিমাণত্ব মত অব্যাহত ভাবে প্রতিপন্ন করা যায় না। কেন? কারণ তাহা হইলে আত্মা সম্বন্ধে বিকারাদি দোষের অনুমান সিদ্ধ হয়। অবয়বের উপগম এবং অপগম দ্বারা দিবানিশি আপূর্য্যমান এবং অপক্ষীয়মান হইলে জীবের বিক্রয়াবত্ত্ব অপরিহার্য্য। বিক্রিয়াবত্ত্ব স্বীকার করিতে গেলে চর্ম্মাদির ন্যায় জীবের অনিত্যত্বের আশঙ্কা অপরিহার্য্য। তাহা হইলে (জৈনদিগের) বন্ধমোক্ষের মত,—যথা কর্ম্মাষ্টক পরিবেষ্টিত হইয়া (মৃদ্‌লিপ্ত) অলাবুবৎ সংসার সাগরে নিমগ্ন জীবের সেই কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদ হইলে, ঊর্দ্ধগামিত্ব লাভ হয়,—বাধিত হয়। আর কি? উপগত এবং অপগত অবয়ব সকলের উপগম এবং অপগমধর্ম্মবত্ত্ব হেতু শরীরাদির ন্যায় তাহাদেরও অনাত্মত্বই প্রতিপন্ন হয়। আত্মার অবয়ব সকলের এরূপ পরিবর্ত্তন স্বীকার করিলে, কোন অপরিবর্ত্তিত নিয়ত অবস্থিত অবয়ব বিশেষই আত্মা হইবে, অথচ 'এইটিই সেই' বলিয়া তাহার নিরূপণ করাও অসাধ্য। আর কি? যে জীবাবয়ব সকল আসিতেছে, তাহারা কোথা হইতে আসিতেছে, আর যে সকল অবয়ব চলিয়া যাইতেছে, তাহারাই বা কোথায় চলিয়া যাইতেছে,—তাহাও বলা কর্ত্তব্য। যে হেতু জীব অভৌতিক, অতএব ভূত সকল হইতে জীবাবয়ব প্রাদুর্ভূত হয়, এবং ভূত সকলেই বিলীন হয়, এরূপ বলা যাইতে পারে না। অন্য কোন সাধারণ অথবা অসাধারণ জীবাবয়বের আধারও নিরূপণ করা যায় না, কারণ তাহার প্রমাণাভাব। আর কি? আর এরূপ হইলে, আত্মার পরিমাণ এবং রূপ অনবধারিতই থাকিতেছে, কারণ যে সকল অবয়ব আসিতেছে এবং যাইতেছে, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। উল্লিখিত দোষ হেতু পর্য্যায়ক্রমে আত্মার অবয়বের উপগম এবং অপগমের মত গ্রহণ করা যায় না। আবার যদি বল পর্য্যায়ক্রমে পরিমাণের অনবস্থা সত্ত্বেও স্রোতঃসন্তান বা জল প্রবাহের নিত্যত্বের ন্যায় আত্মারও নিত্যতা হইতে পরে। রক্তপট বা বৌদ্ধদিগের মতে বিজ্ঞানের অনবস্থা সত্ত্বেও বিজ্ঞান-সন্তান বা বিজ্ঞান-প্রবাহের নিত্যতার মতের ন্যায় দিগম্বর (জৈন)-দিগের ও আত্মার নিত্যতা মত স্রোতঃসন্তান নিত্যতার ন্যায় হইতে পারে'—এই আশঙ্কা করিয়া উত্তর করা

---

* "স্যাদিত্যব্যয়ং তিঙন্তপ্রতিরূপকং কথঞ্চিদর্থকং", রত্নপ্রভা।

যাইতেছে :—সেই সন্তান বা প্রবাহ যদি অবস্তু হয়, তবে (বৌদ্ধদিগের) নৈরাত্ম্যবাদ বা শূন্যবাদই দাঁড়ায় (যাহা জৈনগণ স্বীকার করেন না)। সেই সন্তান বা প্রবাহ যদি বস্তু হয়, তবে (তাহা সন্তানী দেহাদি হইতে ভিন্ন হইলে কূটস্থবাদ, এবং সন্তানী হইতে অভিন্ন হইলে) আত্মার অনিত্যত্ব, এবং জন্মাদি বিকার-দোষ প্রসঙ্গ, অতএব সন্তানাত্ম- পক্ষও তাহাদের পক্ষে অসঙ্গত"। ২-২-৩৬

শঙ্কর আবার বলিতেছেন :—"আবার জৈনেরা মোক্ষাবস্থাগত জীবের অন্ত্য পরিমাণের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। তাহা হইলে সেই অন্ত্য পরিমাণের ন্যায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আদ্যমধ্যম জীব পরিমাণেরও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়, এবং এই পরিমাণত্রয়ের মধ্যে কোন প্রকার ইতর-বিশেষ থাকে না। তাহা হইলে জীবের এক নিত্য শরীর-পরিমাণতাই স্বীকার করিতে হয়, বর্দ্ধিত অথবা ক্ষয়-প্রাপ্ত শরীরান্তর-প্রাপ্তি স্বীকার করা যায় না। অথবা অন্ত্য জীব পরিমাণের অবস্থিতত্ব বা নিত্যত্ব হেতু, পূর্ব্ববর্ত্তী আদি এবং মধ্য অবস্থাদ্বয়েও জীবের পরিমাণ অবস্থিত বা নিত্যই হইবে,—অতএব জীবকে নির্ব্বিশেষভাবে সর্ব্বদাই অণু অথবা মহান্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল কারণে জীবের শরীর-পরিমাণত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না।" ব্রহ্ম-সূত্র ২-২-৩৩ হইতে ৩৬॥

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলন

গতবারে কলিকাতায় যাইতে পারি নাই, এবারও রাজসাহীতে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে নানা কারণে উপস্থিত হইতে পারি নাই; তাই বর্দ্ধমানে যাইব, এটা পূর্ব্বাবধি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এইরূপ ব্যাপারে একাকী যাওয়াতে বিশেষ আমোদ নাই—দুই চারি জন সঙ্গী যুটাইতে পারিলে বেশ হয়, এইরূপ ভাবনা করিতেছিলাম, ভগবৎকৃপায় সঙ্গীও ভালই যুটিলেন। কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয়, আসাম-প্রত্নতত্ত্বাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি এবং স্কুল ও কলেজের কয়েক জন ছাত্র সম্মিলনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অতীব আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের সঙ্গে যাত্রা করিলাম।

এবার ইষ্ট-বেঙ্গল-ষ্টেট-রেলওয়ে কন্‌সেশন টিকেট দিয়াছিলেন, কিন্তু ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান-রেলওয়ে তাহা দেন নাই। তাই আমরা নৈহাটি পর্য্যন্ত টিকেট এখানে (গৌহাটিতে) করিতে পারিয়াছিলাম। নৈহাটিতে দুই একজন স্বেচ্ছাসেবক থাকিলে আমাদের নানাবিষয়ে সুবিধা হইত, এই নিমিত্তে সম্মিলন-কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা একাধিকবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণে অক্ষমতা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন।

নৈহাটিতে নামিয়া গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক আমরা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া টিকেট্ কিনিয়া কোনও প্রকারে গাড়ী চাপিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু বেণ্ডেল্ ষ্টেশনে পৌছিয়া গমনোন্মুখ গাড়ীতে আরোহণ করিতে গিয়া যে বিভ্রাটে পড়িয়াছিলাম, তাহা বহুকাল

স্মরণ থাকিবে; পিতৃপুণ্যে প্রাণটা রক্ষা পাইয়াছিল। যাউক ঐ সকল ব্যক্তিগত কথা; তবে ঠিক্ যে, যদি দুই একজন স্বেচ্ছাসেবক সেই স্থলে থাকিতেন, তবে ঐরূপ দুর্ঘটনা সম্ভাবিত হইত না।

আমরা কয়েকজন পূর্ব্বেই লেখাপড়া করিয়া স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল মহাশয়ের শরণাগত হইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। অতএব বর্দ্ধমানে পৌঁছিয়া শ্যামবাজারে শৈলেন্দ্র বাবুর বাটীতে দাখিল হইয়া তদীয় অমায়িক ব্যবহার ও উদার আতিথেয়তায় আপ্যায়িত হইতে লাগিলাম। অপর সঙ্গিগণ অভ্যর্থনা-সমিতির আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

আমরা শুক্রবার অপরাহ্নে বর্দ্ধমানে পৌঁছি। শনিবার অপরাহ্নে সভাধিবেশন; তাই পূর্ব্বাহ্নে রাজ-শকটে সহর পরিভ্রমণ করা গেল। জনৈক স্বেচ্ছাসেবকের সহায়তায় দর্শনীয় স্থান সমূহ দেখিয়া আসিলাম। নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের আফগানের সমাধিস্থল, কৃষ্ণসায়র, পশুশালা প্রভৃতিতে গিয়া সম্মিলনে সমাগত অন্যান্য বহু ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইল। আমরা দামোদর নদ এবং ইহার বাঁধও দর্শনীয় মনে করিয়াছিলাম। তবে দামোদর এখন শুষ্কোদর; দেখিয়া মনে হয় না যে, উহার পরাক্রমে রাঢ়ভূমি ব্যতিব্যস্ত হইতে পারে।

অপরাহ্ণ প্রায় আড়াই ঘটিকার সময়ে সম্মিলনাধিবেশনের কার্য্যারম্ভ হইল। মহারাজাধিরাজের দেব-মন্দির-প্রাঙ্গণে সভার স্থান করা হইয়াছিল। স্থানটী সুবিস্তৃত হইলেও অভ্যাগত ও দর্শকমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অন্যান্য স্থানে দেখিয়াছি, সভামণ্ডপে একটী বিস্তৃত মঞ্চ থাকে, তাহাতে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ স্থান লাভ করেন। এখানে তাহা হয় নাই—এখানে একটী ক্ষুদ্র মঞ্চে সভাপতিগণ ও ২।১ জন কর্ম্মভারগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন মঞ্চোপরি আর কাহাকেও দেখিলাম না। এই বন্দোবস্ত ভাল হয় নাই, কেন না অভ্যাগত ও দর্শক 'ইনিকে' 'উনিকে'? ইত্যাদি প্রশ্নদ্বারা মঞ্চোপরি উপবিষ্ট বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের পরিচয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেন; বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার সুযোগ ঘটিলনা। সভাপতিগণের উপবেশন স্থলের সন্নিকটেই অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এটা অবশ্য অশোভন নহে; তবে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সদস্যগণের নিমিত্তেও একটু বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিলে ভাল হইত। এ বিষয়ে বর্দ্ধমানের ভদ্রলোকদিগের আমি দুষিতেছিনা; তাঁহারা সম্মিলন সম্বন্ধে সুব্যবস্থার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়কে, এমন কি, "সম্মিলনের গণেশ" শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তৌফী মহাশয়কেও পূর্ব্ব হইতেই আনিয়া কর্ম্মে বৃত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এতটা কথা তাঁহাদেরও খেয়াল হয় নাই।

গান ও মঙ্গলাচরণের পরে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের বক্তৃতা পাঠ হইল। পাঠ অতি সুন্দর, সুস্পষ্ট হওয়াতে এই অভিভাষণের সমস্ত কথা শ্রোতৃবর্গের বোধগম্য হইয়াছিল। বক্তৃতাটীর ভাষাও সুন্দর হইয়াছিল, অনাবশ্যক বাগড়ম্বর না থাকায় ইহা সংক্ষিপ্তও হইয়াছিল। ফলতঃ এতাদৃশ বক্তৃতা যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপই হইয়াছিল। তৎপর যথারীতি নির্ব্বাচনের পর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর-

প্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই, মহাশয় স্বীয় অভিভাষণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বরের মৃদুতা হেতু সভামণ্ডপের মধ্যস্থলে অবস্থিত আমরাও অভিভাষণটী স্পষ্ট শুনিতে পাই নাই। ফল যাহা হয়, তাহাই হইল—সভাতে গোলমাল আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থলে বক্তৃতা পাঠ করিতে লাগিলেন; কিন্তু একবার আসরে গণ্ডগোল ঢুকিলে তাহা দূর করা সুকঠিন; রাখালবাবুরও স্বর তেমন উচ্চ গ্রামের ছিলনা। যদি স্বয়ং মহারাজাধিরাজ পড়িতে পারিতেন, তবে হয়তো বা গোল থামিত, বক্তৃতাটীও শুনা যাইত। যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয় প্রবীণতম প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ; যত্ন করিয়া বক্তৃতাটী লিখিয়াছিলেন। হস্তিবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বিষয়ে বাঙ্গালীর গৌরবের ধারা যে বহু প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই দেখান তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু “পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।” গোলমালে সব নষ্ট হইল—কেহ শুনিল না, কেহ বুঝিল না। বক্তৃতাটী বিতরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যাঁহাদের পাওয়া উচিত ছিল, তাঁহাদের হাতে খুব কমই পৌঁছিয়াছে। আবার মলাটে “লেখকের অনুমতি ভিন্ন এই প্রবন্ধ কেহ মুদ্রিত বা ভাষান্তরিত করিতে পারিবেন না” এই কথা লেখা থাকায় ইহা সাময়িক পত্রাদিতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পথও রুদ্ধ হইয়া গেল। জানিনা এটা এরূপে ‘রিজার্ভ’ করা কেন হইল ? সম্মিলন সভায় পঠিত অভিভাষণ সাধারণের সম্পত্তি হওয়াই তো বিধি, যত প্রচারিত হয়, ততই ভাল; এবং লেখকের পক্ষে ইহাতে শ্লাঘা ও গৌরব মনে করাই উচিত। তবে “লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোন্ন বিজ্ঞাতু মর্হতি।”

অতঃপর দুই একটী অনুল্লেখযোগ্য কার্য্যের পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফি মহাশয় জানাইয়া দিলেন যে, উইল বাড়ীতে (যেস্থানে সভাপতিগণ অবস্থান করিতেন) সন্ধ্যার পরে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হইবে, তাহাতে সাহিত্যিক সকলেই উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। অর্থাৎ কোনও কমিটী গঠিত হইলনা, যাঁহার ইচ্ছা উপস্থিত থাকিয়া বিষয় নির্ব্বাচন করিবেন। কাজটা ভাল হইল না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে “সকলের যে কাজ তা কাহারই নয়” (এভ্‌রি বডিজ্‌ বিজনেস্ ইজ্‌ নোবডিজ্‌)। ফল এই দাঁড়াইল যে, উইল বাড়ীতে যাঁহারা অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত অতি কম লোকেই বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে গিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের বাটিকার একপার্শ্বে সান্ধ্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়। এইটী অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, এতদুপলক্ষে অনেকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়। মহারাজাধিরাজ যে ভাবে প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাপ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ প্রশংসনীয়। আপামর সমস্ত অভ্যাগতের মুখেই মহারাজাধিরাজের অমায়িকতার প্রশংসাবাদ ধ্বনিত হইয়াছে। কেবল সান্ধ্য সম্মিলনে নয়, প্রত্যহ দুইবেলা বাসায় বাসায় গিয়া বড় ছোট নির্ব্বিশেষে সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খবর নেওয়া—এটা বড় কম কথা নয়। মহারাজাধিরাজ দীর্ঘজীবী হউন—তাঁহার এই আদর্শে আমরা যেন অনুপ্রাণিত হইয়া ক্ষুদ্রের প্রতি মমত্ব দেখাইতে পারি।

কেবল মহারাজাধিরাজ কেন, বর্দ্ধমানের বড় ছোট সকলেই উদার অমায়িকতা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত অভ্যাগতের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত বনবিহারী কাপুর, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধগণ হইতে অজাতশ্মশ্রু স্বেচ্ছাসেবকগণ পর্য্যন্ত বিনয় ভদ্রতা প্রভৃতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। আমরা সম্মিলনের আতিথ্যগ্রহণ করিতে পারি নাই—কিন্তু যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে খাদ্যপানীয় প্রভৃতির উৎকর্ষের প্রশংসা শুনিয়া পুলকিত হইয়াছি। কি করিলে অভ্যাগতগণ সন্তুষ্ট হইবেন, কি হইলে তাঁহাদের তৃপ্তি হইবে, কিসে তাঁহারা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিবেন, অনবরত এই চিন্তাই যেন স্বয়ং মহারাজাধিরাজ হইতে বালক স্বেচ্ছাসেবক পর্য্যন্ত সকলেরই মনে এই কয়দিন জাগরুক ছিল। ধনৈশ্বর্য্যের সঙ্গে এখানে ‘প্রাণ’ ছিল; তাই অভ্যর্থনা ব্যাপার সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে।

আমোদ প্রমোদ বিভাগেও কোনরূপ ত্রুটী ছিলনা। থিয়েটর, চণ্ডীর গান, কীর্ত্তন, সমস্তই তিনটী রাত্রি ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। থিয়েটারে মহারাজাধিরাজ কর্ত্তৃক রচিত “শিবশক্তি” প্রভৃতি কয়েকটী পালার অভিনয় হইয়াছিল। বাণীর উপাসক মহারাজাধিরাজ ‘লক্ষ্মীসরস্বতীর’ চিরবিসংবাদ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় দিন প্রবন্ধ পাঠের নিমিত্তে নির্দ্ধারিত ছিল। পূর্ব্বাহ্নে ৭॥টা হইতে ১০টা এবং অপরাহ্নে ২॥টা হইতে ৫॥টায় সভাধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা সম্মিলনের ন্যায় এখানেও প্রবন্ধপাঠের সৌকর্য্যার্থে সভা চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়াছিল। ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মণ্ডপে হইয়াছিল; কিন্তু সাহিত্য ও দর্শন শাখা একই মণ্ডপে কৃত্রিম প্রাবরক দ্বারা ব্যবহিত দুইটী আসরে অধিবেশিত হইয়াছিল। স্বয়ং সম্মিলন-সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-শাখাধিনায়ক হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহোদয়গণ যথাক্রমে দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই এক একজন মহারথ, অভ্যাগত সকলেরই একান্ত ইচ্ছা ইঁহাদের বক্তৃতা শুনেন। কিন্তু যুগপৎ চারিটী শাখায় কার্য্যারম্ভ হওয়াতে, কেহ কেহ একবার এখানে, একবার ওখানে, এইরূপ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন; অপরেরা কোনও একটী শাখাধিষ্ঠিত হইয়া স্থির হইয়া একজনের বক্তৃতাই শুনিলেন, অপর সভাপতিত্রয়ের বক্তৃতা তাঁহাদের শুনা হইলনা। আমি বিজ্ঞান শাখায়ই ছিলাম—সেখানে শ্রোতৃসংখ্যা কম ছিল এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হওয়াতে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণ মনঃসংযোগ সহকারে শুনিবার আগ্রহ হইয়াছিল। অপর অভিভাষণগুলি পশ্চাৎ পড়িয়াছিলাম।

চারিটী শাখা বিভাগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। দেখিলাম, সম্মিলনের কলকাঠি যাঁহাদের হাতে, তাঁহারা কয়েকজন ভিন্ন এই শাখা বিভাগে সকল সাহিত্যসেবীরই বিশেষ আপত্তি।* বিষয়-

---

* এরূপ বিভাগ যে কেন হয়, আমরা বুঝি না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, অন্যতম সভাপতি, মহাশয়ও আমাদিগের নিকট ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক স্থানে, পরে পরে, ৪টী বিভাগের অধিবেশন

নির্ব্বাচন সমিতিতে কলিকাতার সাহিত্যিক ভিন্ন শুনিয়াছি খুব কম ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন ; তথাপি এই শাখা বিভাগ কায়েম করিবার একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা পরিগৃহীত হইতে পারে নাই। এমন কি, সম্মিলনের তৃতীয় দিন কোনও মোসলমান সাহিত্যসেবী একটু উত্তেজনা সহকারে এই শাখা-বিভাগ দূরীভূত হউক, এই প্রস্তাব সভাস্থলে উত্থাপিত করিয়াছিলেন, সভাপতি মহাশয় তাহা মিটাইয়া দেন। ফল কথা, শাখা বিভাগের বিরুদ্ধেই বেশীর ভাগ সাহিত্য-সেবীর মত দেখা গেল। ইহাতে অভীপ্সিত কাজও হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। দুই শত আন্দাজ প্রবন্ধ আসিয়াছিল ; ৬।৭ ঘণ্টার মধ্যে এক এক শাখায় গড়ে ৫০টী প্রবন্ধ যদি আলোচিত হইয়া থাকে, তবে ঐ গুলির কিরূপ সদ্গতি হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য।

শাখা বিভাগের প্রয়োজনীয়তা প্রথমতঃ উপলব্ধ হয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লইয়া। যখন প্রথম বিজ্ঞান ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে সাহিত্যসম্মিলনে ঢুকে, তখনই বলিয়াছিলাম— সাবধান, সাহিত্যের আসর বিজ্ঞান যেন জুড়িয়া বসে না। চুঁচুড়া ও চট্টগ্রামে বিজ্ঞানের পৃথক্ আসর হইয়াছিল, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া 'দর্শন' এবং 'ইতিহাস'ও কলিকাতার সাহিত্য হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। কিন্তু 'দর্শন' ও 'ইতিহাস' সাহিত্যের অঙ্গীভূত—অনেক সময় একই প্রবন্ধে খাঁটি সাহিত্যের সঙ্গে ঐ গুলি দৃঢ় সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু বিজ্ঞান পৃথক্ জিনিস। বৈজ্ঞানিকেরা ইচ্ছা করিলে পৃথক্ সম্মিলন করিতে পারেন এবং সেই বিষয়ে প্রায়শঃ কলেজের ছাত্র ও প্রফেসরগণ প্রবন্ধ লেখক হওয়াতে তাঁহারা অনায়াসে গ্রীষ্মের বন্ধে কোনও কলেজের লেবরেটরিতে একত্র হইয়া প্রাণ খুলিয়া বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারেন—তাহাতে স্থানীয় সাধারণেরও শিক্ষা লাভ হইতে পারে। এইরূপে বর্ষে বর্ষে এক এক স্থানে হইলে বিজ্ঞানের তথ্য দেশময় প্রচারিত হইতে পারে।

সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন পৃথক্ পৃথক্ হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। প্রবন্ধের জন্য এত অনুরোধ আমন্ত্রণ না করিয়া সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা মৌলিক প্রবন্ধ আহ্বান করিলেই হয়—যে গুলি আসিবে, সকলই যে পাঠযোগ্য হইবে, এমন নহে। সপ্তাহ কি দশদিন পূর্ব্বেই প্রবন্ধের আমদানী বন্ধ করিয়া বাছনি করিবার ভার বিশেষজ্ঞগণের উপর অর্পণ করিলে তাঁহারা কোন্ কোন্ প্রবন্ধ সমগ্র পঠিত হওয়া উচিত, কোন্ কোন্‌টা অংশতঃ অথবা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জিত হওয়া উচিত, ইত্যাদি নিরূপিত করিয়া দিতে পারেন। এইরূপে নির্ব্বাচিত পঠিতব্য বিষয় একদিন দুই বেলায় অথবা বড় জোর দেড় দিনে তিন বেলায় শেষ হইয়া যাইতে পারে।

শাখা-বিভাগ দ্বারা প্রবন্ধ পাঠকেরও উৎসাহ ভঙ্গ ঘটিয়াছে। পূরা আসরে প্রবন্ধটী পঠিত হইল না, এই প্রথম দুঃখ ; দ্বিতীয়তঃ, শাখায় যখন পঠিত হয়, তখন শ্রোতার অত্যন্ত অভাব ঘটে। আবার লোকেরা শাখা হইতে শাখান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহাতে গণ্ডগোলও কম হয় নাই। কলিকাতায় কি হইয়াছিল, জানি না ; এখানে তো যাহা দেখিলাম, তাহাতে শাখাগুলির শোচনীয়

হইলেই ভাল হয়। অনেক বিষয়ই অঙ্গাঙ্গী ভাবে লিখিত ; সব স্থলে বিভাগ সঙ্গত হয় না। সব প্রবন্ধ কোন বারেই শেষ হয় না ; —বাছিয়া বাছিয়া পড়িলেই হইতে পারে। আশা করি, ভবিষ্যতে সতর্ক হইবেন।

নঃ সঃ।

অবস্থাই সূচিত হইল। কর্ত্তৃপক্ষীয় মহাশয়েরা এটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বোধ হয়। তাই তিন বেলার স্থলে দুই বেলায়ই প্রায় প্রবন্ধ পাঠ যো-সো করিয়া সারা হইয়া গেল। তৃতীয় দিনের জন্য অল্পই থাকিল।

শাখা-সভাপতিগণের অভিভাষণ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। সকলগুলিই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। তবে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'সম্বোধন'টীতে যতদূর 'কাজের কথা' বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, গবেষণার কথা ছাড়িয়া সোজাসুজি ভাবে মামুলি কথাই বেশ গোছাইয়া বলিয়াছেন। যদুবাবু ঐতিহাসিক তথ্য যাহাতে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, এই সম্বন্ধে 'অনুসন্ধানের' যুগ; কর্ম্মীরা স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে 'মাল' সংগ্রহে ব্যস্ত—সাচ্চা-ঝুটা দেখিবার সময় পরে আসিবে। হীরেন্দ্র বাবু সুদীর্ঘ উপাদেয় অভিভাষণে ভারতীয় দর্শনের কথাই মাত্র বলিয়াছেন, বোধ হয়, ইউরোপীয় দর্শনের কথা প্রবন্ধ-বিস্তৃতি-ভয়ে আলোচনা করেন নাই। যোগেশ বাবু তাঁহার প্রবন্ধটী যতদূর পারেন, আমাদের ন্যায় বিজ্ঞানানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বোধগম্য করিয়া সরল সহজ কথায় রচনা করিয়াছেন। উপসংহারে বিজ্ঞান ও দর্শনে একটা সম্মিলনের চেষ্টা করিয়া তিনি মধুরেণ সমাপন করিয়াছেন।

চারিশাখায় পঠিত অপরাপর প্রবন্ধাবলীর কোনটীই সম্পূর্ণ শুনিতে পাই নাই—লোকের গোলমালেই হউক, অথবা শাখা-বিভাগের উপর বিদ্বেষ বশতঃই হউক, কিম্বা অপর কোনও কারণেই হউক, মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই; এক স্থানে স্থির হইয়াও বসিতে পারি নাই। তবে আমার ন্যায় অনেককেই তদবস্থ দেখিলাম। একটু লাভও যে না হইয়াছে, এমন নহে—অনেক পরিচিত এবং ইতঃপূর্ব্বে অপরিচিত সাহিত্যসেবিগণের সঙ্গে যথাক্রমে আলাপ ও পরিচয় হইয়াছে।

তৃতীয় দিন প্রাহ্ণে ৭॥ ঘটিকার সময়ে পুনশ্চ উইল-বাড়ীতে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হয়—তাহাতে উপস্থিত ছিলাম। একটী খুব প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকুলেসন পরীক্ষায় ইংরাজী ভিন্ন অন্যান্য বিষয় বঙ্গভাষায় যাহাতে গৃহীত হয়; ইণ্টারমিডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষায় যাহাতে বঙ্গ-সাহিত্য রীতিমত অধীত হয়, এবং বঙ্গ-সাহিত্যে (প্রাকৃত সহ) যাহাতে এম্-এ পরীক্ষা দেওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করণার্থ বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হইবে। প্রস্তাবটীর প্রথমাংশ নূতন নহে,—সাহিত্য পরিষদ এ বিষয় বহু আন্দোলন করিয়াছেন, এবং নব রেগুলেশন মতে ছাত্রেরা ইতিহাসের উত্তর ইচ্ছা করিলে মাতৃভাষায় দিতে পারে, তাহার বিধানও আছে। দ্বিতীয়াংশও নূতন বিষয় নহে, পূর্ব্বে এফ্-এ ও বি-এতে পুরা দমে বঙ্গ-সাহিত্যের পরীক্ষা হইত, এখনও আই-এ পরীক্ষায় নারীগণের জন্য সাহিত্য পাঠ্য আছে। কিন্তু শেষাংশ অর্থাৎ বঙ্গভাষায় এম-এ পরীক্ষার প্রস্তাব অভিনব বটে। পরন্তু ইহা খুব সমীচীন প্রস্তাব। পালিতে ও প্রকৃতে এম্-এ দেওয়া যায়, বঙ্গভাষা কি দোষ করিল? তবে আমার বোধ হয়, সংস্কৃতের একটু সামান্য জ্ঞান যাহাতে হয় বঙ্গভাষায় এম-এ পাঠ্যে তাহার কিঞ্চিৎ বিধান থাকা অবশ্যক। অবান্তর হইলেও জনৈক পণ্ডিত মানমন্দির স্থাপন পূর্ব্বক জ্যোতিশ্চর্চ্চার জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন, তাহাতে বঙ্গের বিক্রমাদিত্য পুণ্যশ্লোক

মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মাসিক ২০০৲ হইলেই একটী চলন-সই মান-মন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে জানিয়া, তাহা প্রদানার্থ প্রতিশ্রুত হইলেন। মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন।

মধ্যাহ্নে সভামণ্ডপে সম্মিলন-কার্য্যারম্ভ হইল। প্রথম দিনে যেরূপ লোক সমাগম হইয়াছিল, তৃতীয় দিনে তাহার অর্দ্ধাংশও দেখা যায় নাই, অভ্যাগত অনেকেই চলিয়া গিয়াছিলেন। দর্শকবৃন্দের কৌতূহল অনেকটা বোধ হয় কমিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, প্রস্তাবগুলি যথারীতি পেশ হইয়া পাশ হইতে লাগিল। অপরাহ্ণ ৪॥টার ট্রেনেই অবশিষ্ট অভ্যাগতের অধিকাংশ চলিয়া যাইবেন, তাই কার্য্য কিঞ্চিৎ তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইবার পরে ধন্যবাদ আদান প্রদানান্তে প্রায় ৩॥ ঘটিকার সময়ে সম্মিলনের কার্য্য পরিসমাপ্ত হইল। শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

সম্মিলন-প্রসঙ্গ।

যথাকালে বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনী হইতে নিমন্ত্রণ পত্রাদি পাইয়া, প্রস্তুত হইলেও, দৈবদুর্ব্বিপাক আমার যাওয়ার গুরুতর প্রতিবন্ধক হইয়া পড়িল। সুতরাং যাওয়া রহিত করিয়া আপন কাজে মনোনিবেশ করিলাম।

সম্মিলনের পূর্ব্ব দিবস বেলা ১১ টার সময় ঢাকায় আসিয়া বন্ধুবর পূর্ণ বাবুকে সঙ্গে লইলাম। তিনিও বর্দ্ধমান যাইবেন, পূর্ব্বেই কথা ছিল। তবে তিনি বারবেলা এবং ত্র্যহস্পর্শের দোহাই দিয়া না যাওয়ার জন্য অনেক বক্তৃতা করিয়াও আমার অনুরোধ এবং সাহিত্যের খাতির ছাড়াইতে পারিলেন না। অতঃপর সশরীরে যাত্রা করিলেন। যে ব্যক্তি বারবেলায় প্রতিবেশীর বাড়ী বেড়াইতে যাইতেও রাজী হয় না, সে আজ কিনা উৎকট 'সাহিত্যিক' রূপে পদ্মার পাড়ি জমাইতে অগ্রসর হইল। সুতরাং আশা করা যায়, অতঃপর বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্দ্দিন ঘুচিয়া যাইবে।

নারায়ণগঞ্জ-ষ্টীমারে উঠিয়াই সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। যতীন্দ্র বাবু আমাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গল্প-গুজব করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। তিনি কলিকাতা বৈবাহিক সন্দর্শনান্তে সাহিত্য-সম্মিলনে গমন করিবেন। নৈহাটী পর্য্যন্ত আমাদের কন্‌শেসন্ টিকিট ছিল। সুতরাং তথায় যাইয়া পুনরায় টিকিট কিনিবার জঞ্জাল ভোগ করিতে হইল। টিকিট-বাবু কাহাকেও দয়া করিয়া টিকিটের পিঠে '৪ দিন' লিখিয়া দিলেন। কিন্তু আমার প্রতি ত্রিরাত্রি বাসের ছাপমারা হুকুমই বহাল রহিল।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা কথা বলিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। বিশুদ্ধ বঙ্গের সহৃদয় বন্ধুগণ আমাদিগকে 'বাঙ্গাল', 'জঙ্গুলে রাজ্যের মানুষ', 'মগের মুলুকের জানোয়ার' প্রভৃতি বলেন—কিন্তু বড়ই আশ্বাসের সংবাদ এই যে, সে দেশে স্থানে স্থানে যে জঙ্গল দেখিলাম, তাহাতে আমাদের 'ভাওয়ালের গড় গজালিও' হারি মানে। সুতরাং চালনীর পক্ষে সূঁচের নিন্দাটা খুব মোলায়েম সত্য বলিয়া সন্দেহ না হওয়াই উচিত।

পথিমধ্যে ট্রেণে সুকবি শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর

রায়চৌধুরী মহাশয়ের সাহচর্য্য লাভ হইল। তিনিও বর্দ্ধমান-যাত্রী।

বর্দ্ধমান ষ্টেসনে স্বেচ্ছাসেবকগণ—'সম্মিলন' ছাপযুক্ত কুলি ও গাড়ী লইয়া উপস্থিত ছিলেন। ভদ্রলোকের তরুণ, কিশোর ছেলেরা যে ভাবে আমাদের বিছানাপত্র মাথায় করিয়া লইতেছিলেন—তাহাতে কুণ্ঠিত হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

রাজকলেজে আমরা আশ্রয় প্রাপ্ত হইলাম। আমরা যুগল-বন্ধু, আমাদের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং রঙ্গপুরের তিন জন। জনৈক সাহিত্যিক কিয়ৎকাল আমাদের এখানেই বিছানা রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শেষটা বাঙ্গালদের গায়ের বোঁট্কা গন্ধে তিনি আপন দলেই আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইলেন।

রাজদেওয়ান বাবু অতুলানন্দ রায়চৌধুরী মহাশয় আমাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আদর অভ্যর্থনা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং আহারাদির সম্বন্ধে অতি হিংসুক ব্যক্তিও বর্দ্ধমানের নিন্দা করিবার পথ পাইবেনা, স্বয়ং মহারাজাধিরাজ প্রত্যহ প্রাতঃকালে আসিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রত্যেকের কুশল প্রশ্ন, সুবিধা অসুবিধার কথা এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। অতুল বাবুর ত কথাই নাই। ভদ্রলোকটী দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত কার্য্য করিয়াও ক্লান্ত নহেন। মুখে হাসি—কথায় বিনয় ও সৌজন্য।

যথারীতি সভারম্ভ হইল। সভাপতি হইলেন, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি তদীয় অভিভাষণ মুদ্রণের অবাধ অধিকার প্রদান করেন নাই। ভালই করিয়াছেন, এসকল সংকীর্ণতা দুএক জনের মধ্যে না থাকিলে চলিবে কেন? কিন্তু তাঁহার অভিভাষণের সমালোচনা করিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ সভাপতির গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। উহা পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ হইলেও সভাপতির যোগ্য হয় নাই। সমাজ বা ধর্ম্ম বিশেষের উপর ঝোঁক দিয়া সাধারণ পাঠক হয়ত কিছু লিখিতে পারেন। সভাপতির পক্ষে তাহা সমাচীন নহে। এসম্বন্ধে ইতিহাস শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদুবাবু অল্পকথায় বিশেষ দক্ষতার সহিত আপন উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। দর্শন শাখার মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ এবং বিজ্ঞান শাখার যোগেশ বাবুর অভিভাষণ তাঁহাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কিন্তু যিনি মূল গায়েন, সেই প্রবীণ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে সাহিত্যের কথাটাই সর্ব্বত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। তিনি হাতী ঘোড়া প্রভৃতির কথা আলোচনায় যতটা মনোযোগ দিয়াছিলেন, গরীব সাহিত্যসেবীদিগের প্রাণপাত শ্রমে বর্দ্ধমান গমনের দিকে তেমন কৃপাদৃষ্টি পাত করিলে, তাঁহার প্রবন্ধটী সার্থক হইত। সম্মিলনের সভাপতি বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হউন, আপত্তি নাই, তাহা 'নারায়ণ' সহিয়া লইবেন; কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান তাহা পরিপাক করিবার জন্য সভায় উপনীত হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে বর্দ্ধমান রাজের প্রশংসা করিয়া ভালই করিয়াছেন। কারণ, এই শ্রেণীর লোকের সাহায্য ব্যতীত সাহিত্য পরিপুষ্ট হইবে না। কিন্তু তিনি ছাপান হরফে কিরূপে মহারাজের "অভিভাষণ সুন্দর হইয়াছে" বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন?

একজন কলিকাতাবাসী—অপর বর্দ্ধমানের লোক। এই শ্রেণীর অপ্রস্তুত প্রশংসা আমরা সমর্থন করিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বোধনে বিংশ গৌরব বর্ত্তমান। শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন বটে,কিন্তু বৈদ্য জাতিকে উপেক্ষার তলে ফেলিয়া রাখিলেন কেন ? এদেশের পূর্ব্বাপর ইতিহাস আলোচনা করিলে বৈদ্যজাতির কৃতিত্ব অত্যন্ত উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। শাস্ত্রী মহাশয় সম্ভবতঃ তাহা অনবগত নহেন।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ জমিদারগণের নাম করিবার সময় শাস্ত্রী মহাশয় সুসঙ্গের অতি প্রাচীন রাজ বংশের কথাটা বিস্মৃত হইয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বোধনের ৩৪ পৃষ্ঠায় আরও একটী প্রকাণ্ড অসত্য বর্ত্তমান আছে। তিনি লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ একজন খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন।... পূর্ব্ববঙ্গে ও বরেন্দ্রে তাঁহার বংশধরেরাই গুরুগিরি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শিষ্যশাখা অসংখ্য।" এই নির্জ্জলা মিথ্যা কথাটা প্রচারের পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা উচিত ছিল। এই শ্রেণীর অনধিকার-চর্চ্চা শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বটে।

বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় রগড় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসুর "বর্দ্ধমানের ইতিকথা"। নগেন্দ্র বাবুর বেজায় গরজ কিনা,—তাই গঙ্গার বালুস্তূপ খুঁড়িয়া বল্লালের রাজধানী বিক্রমপুর বাহির করিয়াছেন। আর তাহার সাক্ষী কয়েকজন চাষী। অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গের জগদ্বিখ্যাত বিক্রমপুরটাকে পশ্চিম বাঙ্গালায় লইয়া যাওয়ার একটা প্রস্তাব। এই বাঙ্গালের রাজ্যে কোন কিছু ভাল থাকিতে পারে—নগেন্দ্র বাবু এবং তাঁহার পূর্ব্বাপর কতিপয় মহাত্মার এমন অসঙ্গত ধারণা নাই। স্বদেশ-প্রীতির কি উৎকট নিদর্শন ! ট্রেনে বসিয়া রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত দালানগুলি দেখিয়া আমার সহযাত্রী বন্ধু বলিলেন—"হয়ত আর একশত বৎসর পর কোনও বিদ্যার্ণব বা বিদ্যাদিগ্‌গজের মৌলিক গবেষণার ফলে এই সমুদয় দালানের ইষ্টক হইতে মস্‌লিনের জন্মভূমি "ঢাকা" নগরী আবিষ্কৃত হইবে। হয় ত বাঙ্গাল রাজ্যের চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, আনন্দমোহন, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে পশ্চিম বঙ্গের মানুষ ছিলেন বলিয়া নির্ণীত হইবেন। ব্রহ্মপুত্র হয় ত বীরভূমের বালুকাস্তূপের অন্তরাল হইতে আত্মপ্রকাশ করিবেন এবং কামাখ্যা মন্দির "কাল্‌নাকোর্ট" ষ্টেসনের নিম্নে পাওয়া যাইবে।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিং বক্তব্য আছে। ঐ পুস্তিকা K. V. Seyner বিজ্ঞাপন বলিয়াই প্রথমে ভ্রম হইয়াছিল। কারণ উহাতে ঐ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন ত আছেই, তদতিরিক্ত "প্রকাশক কে, ভি, সেন য়্যাণ্ড ব্রাদার্স কলিকাতা" লিখিত। এবং অভিভাষণের মুখ-পত্রে "বর্দ্ধমান-অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি,বর্দ্ধমানাধিপতি, মহারাজাধিরাজ মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যার বিজয় চন্দ্‌ মহতাব বাহাদুরের অভিভাষণ।" এই কথাগুলি কাহার উক্তি ? স্বয়ং মহারাজের, না কে, ভি, সেনের ? অতঃপর মহারাজের অভিভাষণ। তিনি বর্দ্ধমান জিলার পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা করেন নাই,সুতরাং মনে হয়, সম্মিলনটা কেবল মাত্র মহারাজের।* যাহা হউক, আমরা এই পর্য্যন্ত পাইয়াই সন্তুষ্ট।

---

* অভিভাষণে বর্দ্ধমানবাসীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, নঃ সঃ।

আমরা এই অভিভাষণের একটা কথা বাস্তবিকই বুঝিতে পারি নাই, কথাটা এই—"আপনারা যে রাঢ়ের রাণী (?) বর্দ্ধমানকে এত দিন ভুলিয়াছিলেন, তাহা কেবল কালবৈগুণ্যে; তবে সন্তান যেমন অশেষ দোষ করিলেও (?) কেবল একবার "মা" বলিয়া মার কাছে আসিলেই জননী তাহাকে বুকে টানিয়া লন, তেম্‌নি আপনারা তত্ত্বানুসন্ধান ও সাহিত্য প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া আজ যখন রাঢ়-জননী বর্দ্ধমানের ক্রোড়ে সমবেত হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিয়া তাঁহার ও বঙ্গের সুসন্তানগণকে নিজ সাধ্যানুরূপ সমাদর করিতে চেষ্টা করিবেন।" এই অংশে "অশেষ দোষ করিলেও" কাহার প্রতি প্রযুজ্য হইয়াছে? এই অভিভাষণের উপমান এবং উপমেয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলে ভাল হইত।

বর্দ্ধমান হইতে সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে গান ও কবিতার যে পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে বর্দ্ধমানে ছোট বড় অনেক প্রাচীন কবির নামই আছে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের নামটী নাই। মাত্র একটী কবিতার অঞ্চল ছায়ায় রায় গুণাকর চুপটী করিয়া বসিয়া আছেন। আর একটী রগড়, বিষয়-নির্ব্বাচন-কমিটীতে আহ্বান বাণী। ব্যোমকেশ বাবু যে ভাবে আমাদিগকে বিষয়-নির্ব্বাচন-কমিটীতে আহ্বান করিয়াছিলেন—তাহা নিতান্তই হাস্যজনক। এই সকল সঙ্কীর্ণতা লইয়াই ত পশ্চিম বঙ্গ আসর মশগুল করিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, কেহ প্রতিবাদ করেন না। তবে আশা করা যায়, অতঃপর প্রতিক্রিয়া হইবে।

এই সাহিত্য-সম্মিলনে আমরা উত্তর বঙ্গের লোক বড়ই কম দেখিয়াছি। মহারাজ জগদীন্দ্রনাথকে রাজ-অতিথি ধরিয়া লইলে কেবল মাত্র রমাপ্রসাদ বাবুকেই উত্তর বঙ্গের প্রতিনিধি বলা চলে। তিনিও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শুনিলাম, রাজসাহীতে এবার পশ্চিম বঙ্গের কর্ত্তারা একটু উষ্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই যদি আমাদের সম্মিলন হয়, এই লইয়া যদি আমরা গর্ব্ব করি, এর পরেও যদি আমরা স্বায়ত্তশাসন চাহিতে নিজে নিজেই কুণ্ঠিত হইয়া না পড়ি, তবে বলিতে হইবে যে, আমাদের লাজের সীমা বহুদূর অর্য্যন্ত প্রসারিত। সাহিত্য-সেবায় একটা দলাদলি বহুকাল হইতেই চলিতেছিল। ভাবিয়াছিলাম, তাহা ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে বেশ মনে হয়, সাহিত্য-সম্মিলনের আরও ভাগবথরা হইবে। ময়মনসিংহ সম্মিলন হইতে আসিয়া লিখিয়াছিলাম—পূর্ব্ববঙ্গেও হয়ত নূতন সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠা হইবে। এবার আশা করি, আমার ভবিষ্যৎ বাণী সার্থক হইবে। আমরা পূর্ব্ব বঙ্গের দুই একজন উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধিকে এবার সম্মিলনের পায়ে দণ্ডবৎ দিতে শুনিয়াছি। এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহে এই বিষয় লইয়া বেশ একটু আন্দোলোনও চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, অগৌণেই পূর্ব্ববঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হইবে। কয়েকজন আপকাওয়াস্তের কার্য্যে বঙ্গদেশে এক স্বজাতি-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিল, জানি না, ইহা নির্ব্বাপিত হইবে কি না?

আমরা এস্থলে আর একটা অনাবশ্যক (?) কথার আলোচনা করিব। সাহিত্য-সম্মিলনে স্বয়ং কিম্বা পরিবারের কেহ সভাপতি না হইলে আমাদের 'ঠাকুর' মহাশয়েরা সম্মিলনে পদার্পণ করেন না। শুনিলাম, ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ এবার রাজসাহীর সভাপতিত্ব পর্য্যন্ত

প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। (সম্ভবতঃ একবার বড় হইয়া ছোট হওয়াটা অপমানজনক বিবেচনা করেন)।

সাহিত্য-সম্মিলনের চারিটী শাখায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ থাকিলেও, আমরা তাহা হইতে সর্ব্বথা বঞ্চিত ছিলাম। সভাপতি মহাশয়েরা শাখায় শাখায় মন্ত্রপাঠ করিলেন, আর আমরা সদলবলে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলাম। কেবল করতালি, বাজে গল্প, ও জুতার মস্‌মসানি ভিন্ন কিছু শুনিতে পাই নাই। এ সকল শুনিবার জন্য পকেটের টাকাগুলি ষ্টেশনে দান করার অভিপ্রায় আর যেন না হয়, ঈশ্বরের নিকট এই সুমতি ভিক্ষা করি। শুনিলাম, আগামীতে, যশোহরের সাহিত্য-নায়ক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যাহাতে এক সভায় সমুদয় বিষয় ধীরে সুস্থে আলোচনা হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। আমরা হেমেন্দ্রবাবুর সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তারা গরীব সাহিত্যসেবী প্রতিনিধিগণের উপর আগামী বৎসর হইতে ২৲ টাকা ট্যাক্স ধরিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। **কেন?** গরীব বেচারীরা লোকের ভিড়ের মধ্যে অতিকষ্টে গা রাখিয়া ৩য় শ্রেণীর ট্রেনে কন্‌সেশন লয়, তার উপর আবার 'ইন্‌কাম্‌ ট্যাক্স কেন? এই বদ্‌ মতলবটা পরিত্যাগ করাই একান্ত প্রার্থনীয় এবং বাঞ্ছনীয়। তবে কথা এই যে, কর্ত্তৃপক্ষ আপন 'গোঁ' সহজে ছাড়িবেন, এমন আশঙ্কা আমাদের নাই।

এবারকার সভায় "বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ প্রচলন" প্রস্তাবটীই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন। যোগেশবাবু অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত সকরুণ হৃদয়ে এই প্রস্তাবটী দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।

আর একটী প্রস্তাব শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপন সম্বন্ধে। ময়মনসিংহ-সম্মিলনে শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাব প্রথম উপস্থিত করেন এবং তিনি তাহাতে অর্থদানে প্রতিশ্রুতও হন। কিন্তু ইহাতে লাভের ভাগ কম দেখিয়াই, না অন্য কোনও অপ্রকাশ্য কারণে কর্ত্তারা পশ্চাৎপদ হইয়াছেন?,

বর্দ্ধমানের কথা।

স্বয়ং মহারাজাধিরাজ আদর্শ বিনয় এবং শিষ্টাচারের সহিত সেবীদিগের প্রত্যেককে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। প্রথম সম্মিলনের দিন অপরাহ্নে উদ্যান-সম্মিলনী ছিল। স্বয়ং মহারাজ এবং রাজা বনবিহারী কাপূর মহোদয় সর্ব্বত্রই অতিথিগণকে সম্ভাষণ করত আপ্যায়িত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে চণ্ডীর গান, বিবিধ বাদ্য, কীর্ত্তন ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত ছিল। উদ্যান-সম্মিলনীতে পান, চুরুট, সোডা, লেমনেড, ডাব ও জলখাবার প্রচুর বন্দোবস্ত ছিল।

মহারাজের অতিথি সৎকারের বন্দোবস্তে বিন্দুমাত্রও ত্রুটী ছিল না। আহারাদির আয়োজনও অপর্য্যাপ্ত ছিল। বর্দ্ধমানের খাওয়ার ব্যবস্থা দর্শনে ময়মনসিংহের সেই অতুলনীয় ভোজ্য ব্যবস্থার কথা আমাদের মনে পড়িল। খাওয়াদাওয়ার সম্বন্ধে ময়মনসিংহে যাহা হইয়াছিল, তাহার আর জোড়া হইল না। ঔদরিক ব্রাহ্মণের (অবশ্য আমার কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্ম, মুসলমান বন্ধুগণকেও ভোজন ব্যাপারে বিশেষ কৃপণ বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ নাই) প্রধান

লক্ষ্যই ঐ খাওয়াটার দিকে। বর্দ্ধমানে দেখিলামও তাই। কিসের সভা সম্মিলন, কেবল মিঠাই, ফলফলারী, ডাব, সরবত, সোডা, বরফ আর লেমনেড। বাড়ীতে এক গ্লাস জলে যাহার তৃষ্ণা নিবারণ হয়, সে আজ ডাবের জলে বরফ দিয়া একটু মিশ্রির সরবত মিশাইয়া মুখে দিতেছে! সাহিত্যের চাষে সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যায় কি না!!

বর্দ্ধমানের এক নূতন দৃশ্য কবুতর। এজন্য কবুতরখানা-রোড একটা সৃষ্টি হইয়াছে। এই কবুতরগুলির জন্য সুবিস্তৃত দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য খোপ করা আছে এবং ৯টী কার্নিস দেওয়া আছে। লোকমুখে শুনিলাম, এখানে লক্ষাধিক কবুতর বাস করে। মহারাজের রাজ্যে এই জালালী কবুতর বধ বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ।

বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে দর্শনীয় সামগ্রীর অভাব নাই। চিত্র, পুস্তক, প্রতিমূর্ত্তি, শিল্প দ্রব্য প্রভৃতি দেখিয়া চক্ষু স্থির হয়। দেয়ালজোড়া বিশাল দর্পণগুলি দেখিয়া রাজসূয় সভায় দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশার কথা মনে পড়িল।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে (১) মহাবীর শের খাঁর ও কাপুরুষ কোতব উদ্দীনের সমাধি। রূপসী পত্নী মেহেরকে হইয়া শের খাঁ দিল্লী ছাড়িয়া বাঙ্গালায় আসিলেন। কুমার সেলিম বাদশাহ হইয়া মেহেরকে কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিলেন না। অবশেষে কোতব উদ্দীনকে শেরের প্রাণ সংহারার্থে প্রেরণ করেন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের নিকট এই মর্ম্মস্পর্শী করুণ কাহিনী অবিদিত নাই। কি নৃশংসতার সহিত শের খাঁকে হত্যা করা হইয়াছিল! মহাবীরের সমাধি দেখিয়া সসম্ভ্রমে মস্তক নত হইল। তাহারই পার্শ্বে কোতব উদ্দীনের সমাধি। (২) নবাব হাটে রাণী বিষ্ণুকুমারীর প্রতিষ্ঠিত চক্রাকার ১০৯ শিব-মন্দির। প্রত্যেকটী শিব এবং মন্দির প্রায় একরূপ। (৩) গোলাপবাগে মহারাজের অগণিত গোলাপ গাছ। সুন্দর বাগান। সেখানে একটী চিড়িয়াখানা আছে। পশু পক্ষী বড় বেশী নাই। হরিণগুলির বড় দুরবস্থা দেখিলাম। রাজ-সরকারের অর্থ ব্যয় যে কম হয়, তেমন বোধ হইল না, কিন্তু পশু পক্ষীগুলি উপযুক্ত খাদ্যাদি প্রাপ্ত হয় না। (৪) কৃষ্ণ-সায়র বর্দ্ধমানের অন্যতম দর্শনীয় দীর্ঘিকা। সুনীল জলরাশিশোভিত বিশাল ‘সায়র’ দেখিয়া বড়ই আনন্দ বোধ হইল।

বিদায়।

তৃতীয় দিনের সভা ‘ব্রাহ্মণেভ্যোনমঃ’র মত খুব তাড়াতাড়ি শেষ করা হইল। সকলেই লটবহর সাজাইয়া গমনোন্মুখ। সুতরাং বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা সত্বর করাই প্রয়োজন। পাল্‌টাপাল্‌টি ধন্যবাদ রীতিমত বর্ষিত হইল। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমান-পতির বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, মূল্যবান এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল। সংক্ষেপে মহারাজ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রশংসার্হ।

ভবিষ্যৎ।

আগামী বৎসর যশোহরের নিমন্ত্রণ সংবাদ বাবু ললিতচন্দ্র মিত্র জ্ঞাপন করিলেন। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের উপযুক্ত পুত্র ললিত বাবু নিমন্ত্রণ করিবার সময় যখন বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখন আমরা পিতৃ-ভক্তের সহিত অশ্রু মোচন না করিয়া পারি নাই।

অগ্রিম বায়না।

গত বৎসর হইতেই এক বৎসর আগে আগে নিমন্ত্রণ চলিতেছে। আশার কথা বটে,

তবে ভয়ের কারণও আছে। কথায় বলে—‘খর নদীতে চড়া পড়ে’। যশোহরের পরবৎসর বাঁকীপুরে সাহিত্য-সম্মিলন হইবে। আমাদের পরদেশী স্বদেশী বন্ধুগণ দেশের মানুষ দেখিতে চাহেন। দেশের কথা শুনিতে চাহেন। এই নিমন্ত্রণটী বিশেষ মূল্যবান, সন্দেহ নাই।

প্রস্থান।

সভা হইতে বাসায় যাইয়াই ‘ঘরমুখো বাঙ্গালী—রণমুখো সেপাইর’ মত গাঁটুরী লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। যেন অতিরিক্ত আদর যত্ন, স্বেচ্ছাসেবকগণের কেবল ‘ডাব চাই কি মহাশয়’, ‘লেমনেড ?’ “সোডা ?’ ইত্যাদি কেবল দেহি দেহির অত্যাচার, পোলাও মাংসের বিকট মূর্ত্তি (তখন যেন ঐ গুলি মনে করিতে ভাল লাগিত না)—আমাদিগকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। ট্রেণে বোঝাই হইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

নৈহাটীতে।

রাত্রিতে নৈহাটী আসিয়া ‘পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার’ জলে সান্ধ্যকৃত্যাদি করত বিশ্রাম করিলাম। পরদিন প্রাতঃস্নান করিয়া হুগলীর ইমাম বড়া, চুঁচুড়ার কদমতলার একখানি সারস্বত তীর্থ-মন্দির (সময়াভাবে আমরা অক্ষয় বাবুর সহিত দেখা ও আলাপাদি করিবার অবকাশ পাই নাই) এবং চন্দননগর ভ্রমণ করিয়া প্রায় ৩টার সময় পুনরায় নৈহাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। বন্ধুবর ত ক্ষুধার জ্বালায় আমার প্রতি অভিধান-বহির্ভূত নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ঠাণ্ডা হইলেন। পরদিন প্রভাতে যুগলবন্ধু শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-ভূমি নবদ্বীপ দর্শন করিতে গেলাম।

নবদ্বীপ।

নবদ্বীপে চৈতন্য-চতুষ্পাঠীতে আশ্রয় লইলাম। চতুষ্পাঠীর সহৃদয় ছাত্র মহোদয়গণ আমাদিগের মত অপরিচিত ব্যক্তিগণকে যে ভাবে গ্রহণ করিলেন, তাহার বর্ণনা ভাষার আয়ত্ত নহে। এমন সহৃদয়তা ও আতিথেয়তা জীবনে আর উপভোগ করিবার অবকাশ পাই নাই।

এখানে চৈতন্যদেব ও বিষ্ণুপ্রিয়া, সোণার গৌরাঙ্গ এবং অদ্বৈত-নিবাস দর্শন করিলাম। পোড়া মা এবং তারা দেবী ও বুড়া শিবই নবদ্বীপের আদি দেবতা এবং সর্ব্বজনমান্য। এখানে বৈষ্ণবদিগের যে কয়টী আঙ্গিনা বা বাড়ী আছে, সর্ব্বত্রই ‘ভেট’ বা ট্যাক্স দেওয়ার নিয়ম আছে। সেই ট্যাক্সও অন্ততঃ এক সিকি হওয়া চাই। সুতরাং দরিদ্রের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন-সাধ হৃদয়েই লীন হইয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গেল, অন্ততঃ প্রত্যহ ৩৲টী টাকা হইলে বৈষ্ণবভক্তগণ নবদ্বীপের পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন। আবার এ সকল স্থানের বৈরাগী নামধারী প্রাণীগুলি এমন অভদ্র এবং বেয়ারা যে প্রকাশ করা অসম্ভব। সে দিন “শ্রীধর অঙ্গন” নামক স্থানে তত্রত্য গোমস্তা উপেন্দ্র নন্দীর জনৈক ব্রাহ্মণের উপর যে আক্রমণ দেখিয়াছিলাম, তাহা রৌদ্র ও বীভৎস রসের দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছিল। ছিঃ! সখ্য প্রেমের অবতার চৈতন্যদেবের সেবকগণের এই সকল ব্যবহার ঘৃণার যোগ্য সন্দেহ নাই।

নবদ্বীপে একটী সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে। শুনিতাম, দেশের যত উন্মার্গগামিনী বিধবার ভ্রূণহত্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান নবদ্বীপ। সম্প্রতি এখানে মাতৃমন্দির (Maternity Orphange & Hospital) নাম দিয়া ঐ সকল স্ত্রীলোক ও তাহাদের সন্তান পালনের ব্যবস্থা হইতেছে। জনৈক উন্নত চরিত্র ব্যক্তির উপরই এই কার্য্যের

অধ্যক্ষতা প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই মাতৃমন্দিরের নামটী পরিবর্ত্তন এবং এই মন্দিরে বিশেষ শুভানুধ্যায়ী হইলেও স্থানীয় যে দুই চারি জনকে ঘন ঘন ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিলাম, তাহাদের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

এ দিকে কনস্সেশনের মেয়াদও যায়। কাজেই ঘরের ছেলে ঘরে যাত্রা করিলাম। গোয়ালন্দ ষ্টীমারে বসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলাম, সাহিত্যসেবার তাড়নায় এই দুর্ব্বৎসরেও দ্বাবিংশতিটী মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। হৃদয় খুঁজিয়া দেখিলাম, ফলের ঘরে একটী অশ্বডিম্ব মাত্র। অনুতাপে অন্তরটা ভরিয়া উঠিল। একটী ক্ষুদ্র বৈঁচীর ফলও যদি পাইতাম—মনকে বুঝাইবার যো ছিল। অনর্থক ২২৲টী টাকা এই পথে না ফেলিয়া গৃহিণীর হাতে রাখিয়া দিলে একটা আশঙ্কার হাত হইতে দীর্ঘকালের জন্য এড়ান যাইত। মনকে বুঝাইলাম—"গঙ্গাস্নানে টাকা খরচ হইয়াছে—কুচ্ পরোয়া নেই।" গুরুঠাকুর শিষ্যের নূতন জুতা জোড়াটা শিষ্যের অনুপস্থিতিতে আত্মসাৎ করিলে, শিষ্যপুত্র প্রশ্ন করিল, "বাবা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব কর্ত্তা?" কর্ত্তা অম্লান বদনে বলিলেন, "বলিস্—জুতা কুকুরে নিয়ে গেছে।"

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সীতাভোগ-সম্মেলনে।

সবে যাব বর্দ্ধমান করিয়া আমোদ,
বিফল জনম বিনা আমোদ প্রমোদ।

প্রথম উল্লাস—উদ্যোগ।

গত বৎসর টাউন হলে পাঁচকড়ি বাবু, সুরেশ বাবু ও জলধর বাবু, যশোহরের যদুবাবু, হেমেন্দ্র বাবু ও খগেন্দ্র বাবুর মুখের কথা চাপা দিয়া বর্দ্ধমানের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমাদিগের প্রাণটা তখন হইতেই সীতাভোগ-সীতাভোগ করিতেছিল এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলাম, রবাহুত হইয়াও এবার 'সাহিত্যিক' সাজিতে হইবে। সুতরাং ছয়মাস আগে হইতেই সাড়া পড়িয়া গেল, সম্মিলনে কে যাইবে। এক মাস পূর্ব্বে এবারকার হতভাগ্য এপ্রিলের মন্থর গতিতে ধিক্কার দিয়া মনের সঙ্কল্প 'doubly sure' করিয়া রাখিলাম যে, বসন্তের হিসাব নিকাশ পার হইয়া মধুমাস পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলে সোমিলকের ন্যায় অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে বর্দ্ধমান যাইতেই হইবে। বন্ধুদিগের সকলের মুখেই বর্দ্ধমানের আলোচনা ক্রমশঃই বর্দ্ধমান হইল, উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কথায় কেহ কাণ দিল না। হাতুরী, খন্তা, শাবল লইয়া সেণ্টিমিটার, ডেসিমিটার, ষ্টেট টিউব ও পালা পরেন লইয়া, উত্তর বঙ্গ যে সাহিত্য সেবা করিতেছেন, তাহার মর্ম্ম সাহিত্য পরিষদ বুঝিল না। এই দুঃখে ব্যোমকেশ কিল খাইয়া কিল চুরি করিয়া আসিলেন, কিন্তু পাঁচকড়ির মুখের লাগামকে সামলাইবে? Walls have ears. ধন্য পণ্ডিতরাজ, ধন্য আমরা দলাদলিপ্রিয় বাঙ্গালী জাতি!

ক্রমে ক্রমে তিনখানা নিমন্ত্রণ পত্র হস্তগত হইল। অতিরিক্ত পত্রদ্বয় সম্মেলনের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। সাহিত্য-পরিষদ জানিতে চাহিলেন, আমি তাঁহাদের ডেলিগেট হইতে ইচ্ছা করি কি না। আমি 'ডেলিগেট' হইতে চাই কি না, একথা বলা

আমার পক্ষে 'ডেলিকেট'। সুতরাং আমি ঐ উত্তরই তাঁহাদের দরবারে পেশ করিলাম। পরে দেখিলাম, আমা হেন ব্যক্তিকেও তাঁহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া সাহিত্য-পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পাঠশালায় মহারাজাধিরাজ আমাদের 'ক্লাশফ্রেণ্ড', জলধর বাবু ও উপেন্দ্র বাবু গুরু মহাশয়। অতএব বর্দ্ধমানের অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রিত না হইয়া কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া যাওয়াই সঙ্গত ছিল। জলধর বাবু এক মাস আগে হইতে আনাগোনা করিতেছিলেন, শান্তপ্রকৃতি বিনয়ী হরিদাসও অভ্যর্থনাকারীদিগের মধ্যে এক জন। সুতরাং আমাদের জন্য পৃথক ঘর, মশারি ও বিছানার ব্যবস্থা থাকিবে। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের কেহ যদি ভুল ক্রমে বিছানা ও মশারি না আনেন, তাঁহাদের জন্য ৩০০ শত দুগ্ধফেননিভ শয্যা ও মশারি প্রস্তুত হইয়াছিল, এ সংবাদ আমাদের কাণে পৌছিয়াছিল। আমরা অধ্যাপক ললিতকুমার এবং বন্ধু বিপিনবিহারী ও রামকমল, এক সঙ্গে যাইয়া একত্র থাকিব, স্থির হইল। সম্ভব হইলে বিপিনের বন্ধু হেমেন্দ্র বাবু আমাদের দলে যোগ দান করিবেন, এরূপ আশা বা আশঙ্কা থাকিল। কিন্তু ললিতবাবু তাঁহার পুত্র ভজা ও রজনী-গুপ্ত-স্মৃতি-পুস্তকালয়ের অপর প্রতিনিধিদিগের সহিত শুক্রবার যাইবেন, স্থির করিলেন। অতএব আমরা Trinity সম্মেলনে একটী স্বতন্ত্র Unit হইবে, মনে করিলাম। দল বান্ধিয়া যাওয়ায় প্রতিবাদ করিয়া কোন এক মহারাজ বাহাদুর নাকি বলিয়া বসিলেন,—

"একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।"

কেহ ২ বলিলেন, শুকপক্ষী হাতে করিয়া যাইতে হইবে, বিছানা মশারি সঙ্গে নিতে পারিব না।

শুক্রবার ত্র্যহস্পর্শ। 'সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি বৃহস্পতির বারবেলায় ঘরের বাহির হইলেন, কিন্তু মঘা, অশ্লেষা ও ত্র্যহস্পর্শে পা বাড়াইতে সাহস করিলেন না। কি জানি কি হয়, সম্মিলন বিষম ঠাঁই। ললিত বাবুও ত্র্যহস্পর্শের ভয়ে শনির আদ্যন্ত ফেলিয়া আমাদের ন্যায় প্রাতঃস্নান করিয়া দিনের পাপ এড়াইয়া অবশেষে গুরু-শিষ্য সংবাদ সমর্থন করিতে প্রস্তুত হইলেন। কাগজে দেখিলাম, রজনীগুপ্ত-স্মৃতি-লাইব্রেরী আমাদিগকে তাঁহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। কায়স্থ-পত্রিকা বলিলেন, আপনি আমাদের প্রতিনিধি। নব্যভারতের প্রবীণ সম্পাদক আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু দেবীপ্রসন্নবাবু বলিলেন, আমি সম্মেলনে যাইব না, আপনি আমার প্রতিনিধি। কিন্তু আমরা সেখানে ভারতবর্ষের 'ঘরের লোক' হইব, স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছি। অতএব আমরা আমাদেরই প্রতিনিধি—জননী বঙ্গভাষার অঞ্চলের নিধি, কাণাকড়ি।

দ্বিতীয় উল্লাস-যাত্রা।

বিপিনবিহারী টাইম্‌টেবল দেখিয়া announce করিয়া গেলেন, 7 up Express বা প্রাতে ১০টার গাড়ীতে যাইতে হইবে। রামকমল হাওড়ায় লোক, আগে থাকিতে ষ্টেশনে আসিয়া তিন জনের টিকিট করিয়া রাখিবে। বিপিনের single টিকিট, আমাদের দুই জনের weekend return. মধুমাসে ভাগলপুরে বন্ধু কোকিল কূজন শুনিয়া উতলা হইলেন, বর্দ্ধমানের ভবিষ্যৎ আনন্দকোলাহলের association. কান্তাবিরহবিধুর সখার হৃদয়ের প্রজ্বলিত অনলে ইন্ধন যোগ করিয়াছিল। সুতরাং বিপিন শিকলকাটা পাখীর

মত আমাদিগকে পথে ফেলিয়া একা ভাগলপুর পলায়নের সঙ্কল্প করিলেন। আমাদিগকে কলিকাতার মরুভূমিতে এক যাত্রায় পৃথক্ ফল ভোগ করিতে ফিরিয়া আসিতে হইবে ভাবিয়া, আমি মনে মনে বন্ধুর অত্যাচারের সমালোচনা করিতে লাগিলাম। বিপিনের ও রামকমলের কাপড়চোপড় আমার ব্যাগে যাইবে, পরামর্শ হইল, সুতরাং তোরঙ্গ বা ব্যাগটীরও আয়তন কিঞ্চিৎ বাঙ্গালী গৌরব জাতীয় হইয়া পড়িল।

শনিবার, ৩রা এপ্রিল, সকাল সকাল ভাতে ভাতে মাথনমুখ করিয়া দিনের পাপ এড়াইয়া ট্রাম ধরিতে ছুটিলাম। ১লা এপ্রিলের ভয় না থাকিলেও, এবং ১২টায় বর্দ্ধমানে পৌছিয়াই অন্নব্যঞ্জনের ঠাঁই করা থাকিবে, জলধর বাবু এমন ভরসা দিলেও, ইংরাজের আবছায়া বাঙ্গালী সাহিত্য-সিপাহী খালিপেটে লড়াই করিতে পারে না। সপুত্রক অধ্যাপক ললিত বাবুর সহিত তাড়াতাড়ি চাটায় হ্যারিসন রোড ট্রামে আশ্রয় করিলাম। ("সপুত্রঃ সাহিত্যমাচরেৎ"ইতি সাহিত্য কোষঃ।) আমার বৃহদাকার ব্যাগটী দেখিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন, আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইল, আমি বিপিন ও রামকমলের বোঝা বহিতেছিলাম। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যাঙ্গের টিপ্পনি করিলেন, 'আপনি কি বিপিনের চেয়েও অধিক দিন মাষ্টারী করিতেছেন?' (অবান্তর হইলেও এস্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক, ললিতবাবু আমাকে ও মুর্শিদাবাদের নিখিল বাবুকে কিছুতেই ছাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, পাছে কেহ সেই নাজরের বলে তাঁহার বয়স বেশী মনে করে।)

হাওড়া পুলের উপরে একটু একটু টের পাওয়া গেল, বর্দ্ধমানে কেমন ভিড় হইবে। শুক্রবারের ইংরাজী থবরের কাগজে a mountain of সীতাভোগ ও a tankful of fishএর ইস্তাহার বাহির হইয়াছিল। সুতরাং সাহিত্যভৃঙ্গগণ গুণ গুণ স্বরে গান করিতে করিতে, প্রফুল্ল শতদল বর্দ্ধমান সম্মিলনের পানে উর্দ্ধশ্বাসে মধুলোভে ছুটিলেন। জনৈক মুটের মাথায় বহুসংখ্যক বিছানা দেখিয়া তাহাদের মালিক খুজিতে ইতস্ততঃ নয়ন সঞ্চালন করিয়া পশ্চাতে জনৈক পীতবসন সাধু দেখিতে পাইলাম। অধ্যাপক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম 'ঐ বিছানার রাশি বোধ হয় এই সাধুটীর?' তিনি বলিলেন, 'বোধ হয়, স্থবির কি না?'

৯ টাতে আমরা প্লাটফর্ম্মে পৌছিলাম। ললিত বাবু ভীত হইলেন, এক দুই করিয়া গণিয়া না জানি কতদূরে যাইয়া ১০ নং প্লাটফর্ম্ম পাওয়া যাইবে! কিন্তু তাঁহার কিশোর কুমার শ্রীমান্ 'ভজা' আশঙ্কা নিরসন করিলে, আমরা উভয়েই নিশ্চিন্ত হইলাম। অধ্যাপক মহাশয় ১৷৹ টাকা ফেলিয়া দিয়া একখানা বর্দ্ধমানের রিটার্ণ টিকিট ও দুটী পয়সা ফেরত চাহিলে, মানিনী শ্বেতাঙ্গিনী সুন্দরী যুবতী সে অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাকে যে নীরব দৃষ্টির অভিমানের দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন 'সেভেন্ অপ এক্স্প্রেস্' তখনই আমাদের উভয়ের উপর দিয়াই হু হু শব্দে চলিয়া গেল! যাহা হউক, তিনি ১৶১০ ব্যয় করিয়া, ললাটে উদ্গত স্বেদবিন্দু মুছিতে মুছিতে দুই চারিটি সেক্স্পিয়র-ডিকুইন্সী-প্যারাডাইজলষ্ট জাতীয় ইংরাজী শব্দে রিটার্ণ টিকিটের মিয়াদের কথা প্রসঙ্গে মেম সাহেবের সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিয়া 'মুইষেটিক্স লইচি' বলিয়া নিশ্চিত হইলেন। আমি রামকমল ও বিপিনের

বিরহে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। বিনা টিকিটে প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ নিষেধ। রামকমল ঈষৎ পরিবর্ত্তিত নাম গ্রহণ করিয়া কোন্ যাত্রার দলে বাছা হনুমান সাজিয়া পদ্ম আঁখির গান ধরিয়াছে, তাহাই ভাবিয়া চিন্তাসাগরে হাবুডুবু খাইতেছিলাম, এমন সময় পরিষদের ‘রামকমল’ কাণ্ডারী হইয়া প্লাটফর্ম্মে যাইতে বলিলেন। ‘দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার, খানায় হইয়া পার’ বিনা টীকিটেই প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিলাম। পরিষদের উদ্যোগে তিনখানা ইণ্টার গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছিল। তাহার একখানায় অধ্যাপক মহাশয় প্রবেশ করিলেন। এমন সময় ব্যক্তিবিশেষকে দেখিয়া কেহ কেহ ‘নিতবর’ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। বৃহস্পতিবার না যাইয়া সেই ব্যক্তি শনিবার বর্দ্ধমান যাইতেছেন দেখিয়া, অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম, বিস্ময়ের কারণ নাই, ইনি বোধ হয় তাঁহার double.

রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের জামাতা সাত্ত্বিক-প্রকৃতি মহেন্দ্রকান্তি মহেন্দ্রের সহিত প্লাটফর্ম্মে সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের সহিত আলাপ করাইয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি শুকদেবের নেংটীর ন্যায় তোরঙ্গ ফেলিয়া পাদমেকং অন্যত্র যাইতে সাহস করিলাম না। মহেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনিও সম্মিলনে যাইতেছেন কি না? কিন্তু তিনি মাথা নাড়িলেন। কথায় কথায় তিনি মন্তব্য করিলেন, কতকগুলি চিন্তা করিবার লোকেরও ত দরকার। আমি retort না দিয়া পারিলাম না, তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন, যাহারা বাঙ্গালা লেখে তাহারা সকলেই চিন্তাহীন, frothy and irrelevant? তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তাঁহার কথার উদ্দেশ্য তাহা নহে—সাধনা করিতে পারিলে তাহা সাহিত্যসেবা অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধ ও চৈতন্য ত সাহিত্যসেবা করেন নাই। আমি বলিলাম, তাহা বটে, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ ও চৈতন্যের উক্তি যে সাহিত্য-বারিধির গোড়া পত্তন করিয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা জগতে নাই।

আমাদের গাড়ী ক্রমেই গুলজার হইয়া উঠিল। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, বাবু যতীন্দ্রমোহন সিংহ, বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী, রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন, বাবু চারুচন্দ্র বসু, পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী, কবি শ্রীমান্ কালিদাস রায় প্রভৃতি আসিয়া একে একে আমাদের দল পুরু করিলেন। রামকমল আসিয়া আমাকে টিকিটের চিন্তা হইতে উদ্ধার করিলেন, বিপিন ঢিমে তেতালা মুরুব্বিয়ানা চালে প্রায় ৯॥০ টায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অক্টোজেনেরিয়ানদের পুরাতন প্রসঙ্গ ও জীবন-স্মৃতি লিখিতে লিখিতে বন্ধু কাঁচা বয়সেই একটু সেকেলে (antiquated) হইয়া পড়িতেছেন। ডাক্তার দেবপ্রসাদ আসিয়া জানালা হইতে উকি মারিয়া ললিত বাবুর সহিত রহস্যালাপ করিয়া গেলেন। ললিত বাবু apology করিয়া বলিলেন, Temperance Associationএর সভাপতি, শুঁরীলেনে বাস, অতএব শুরীরত্ন উপাধি ঠিক হইয়াছে বলিয়া আমি যে স্থানান্তরে মন্তব্য করিয়াছি, তাহা ভুল হইয়াছে, যেহেতু এখন জানিতে পারিলাম, Suri laneএ আসিবার আগেই আপনি ঐ উপাধি পাইয়াছিলেন। সর্ব্বাধিকারী হাসিয়া বলিলেন, ডাঃ পি, সি,

রায় ও আমার দেখা না পাইয়া লিখিয়া আসিয়াছিলেন,—

Bravo! Suriratna is a fit title for the President of the Temperance Federation!

কিন্তু আমি উত্তর লিখিয়াছিলাম,—

'না জানে পরম তত্ত্ব কাঁটালের আমসত্ব
ইত্যাদি।'

তিনি পরে দেখা হইলে হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঠিক উত্তর হইয়াছে।'

দীনেশ বাবু চারু বাবুকে রহস্য করিয়া বলিলেন, আপনাকে একটু ফর্সা দেখাইতেছে। ললিত বাবু বলিলেন, 'হাঁ চারু বাবু ও আমি আছি বলিয়া আপনি ভদ্রলোক হইতে পারিয়াছেন, লোকে আপনাকে তবু একটু পরিষ্কার মনে করে। কবি বলিয়াছেন,—

রাবণ ঘৃণিত কি না হতনা জানিত,
রামের চিত্রেতে যদি না হত চিত্রিত।'

অমাদের রিজার্ভ গাড়ী overcrowded হইল, খগেন্দ্র ও হেমেন্দ্র অদৃশ্য হইলেন। ভাইস-চ্যান্সলারের চাপরাসী গাড়ী ছাড়িবার প্রাক্কালে আমাদের গাড়ীতে আরোহণ করিল। ললিত বাবু দীনেশ বাবুকে বলিলেন, আপনারা সব সরুন, যাঁহারা পরীক্ষক হইয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাসীর জায়গা করিয়া দিন। চাপরাশী সে রসিকতা বেশ উপভোগ করিল। আমাদের অদৃষ্ট বৈয়াকরণিকের সূত্রে—

'শ্বানং যুবানং মঘবানম্'

গাড়ী ছুটিল; গরমে ও ঠেসাঠেসিতে আরোহীদিগের কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই। অনেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন, অনেকে তোরঙ্গ পাতিয়া বসিয়াছিলেন, কোন কোন বিনয়ী ব্যক্তি সৌজন্য দেখাইতে বেঞ্চ ছাড়িয়া দিয়া নীচে নামিয়া বসিয়াছিলেন। ললিতবাবু ভীমকায় আশুতোষ শাস্ত্রীমহাশয়ের চাপে 'পাষাণ চাপা' পড়িয়াও মুখের হাসি হারাণ নাই। অতএব সম্মেলনের উদ্দেশ্য রেলগাড়ীতেই অর্দ্ধেক সিদ্ধ হইয়াছিল। বাহ্য বিষয়ে উদাসীন সাহিত্য-ঋষিগণ আধ্যাত্মিক সুখভোগে নিরত হইলেন। গাড়ীতে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল—

(১) সীতাভোগের প্রত্নতত্ত্ব—বক্তা অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২) বর্দ্ধমানের পুরাতত্ত্ব—বক্তা একাধিক, অধ্যাপক ললিতকুমার, পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) বিদ্যাসুন্দরের সমালোচনা—বক্তা পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

ললিতবাবুর মতে সীতার অগ্নিপরীক্ষার পরেই শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে আদর করিয়া অভিনব ভোগ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই সীতাভোগ। আমাদের অনুমান হয়, তাঁহার এইমত সমীচীন নহে। বাল্মীকির তপোবনে সীতাকে যে সাধের উপকরণ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই প্রকৃত সীতাভোগ। চণ্ডীতে আছে—

নিধানি করিয়া থই   তাহাতে মহিষ দই
কুল-করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি।

ললিতবাবু পণ্ডিত লোক হইয়াও কিরূপে এত বড় ভুল করিলেন, ভাবিয়া বিস্মিত হই। এই প্রসঙ্গে বন্ধুবর শশীবাবুর অনুপস্থিতির কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা হইল। দৈনিক বসুমতীর নববর্ষ প্রসঙ্গে সে কারণের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সোমিলকোপাখ্যান-বর্ণিত বর্দ্ধমানপুর

বর্ত্তমান বর্দ্ধমান কিনা, অনেকেই আলোচনা করিলেন। কিন্তু কেহই কোন সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন না। ফরিদপুর জেলার পালং থানার অন্তর্গত কলিকাতা ও হুগলী গ্রামই ব্রিটিশ ইতিহাসোক্ত কলিকাতা ও হুগলী কি না, তাহা বিচার করিয়া নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক, বর্ত্তমান বিচার আগামী বর্ষের সাহিত্য-সম্মেলনের জন্য স্থগিত রহিল।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ব্যাখ্যা করিলেন, কাশ্মীরের কোন সুরসিক পণ্ডিত কাব্য পড়াইতে পড়াইতে কর্ণাট রাজকন্যাকে করতলগত করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু রাণী সেই সুপুরুষের দিব্যকান্তিতে মুগ্ধ হইয়া এবং রাজকন্যাকে অধীর দেখিয়া রাজার নিকট তাঁহার প্রাণভিক্ষা লইয়াছিলেন। সেই উপাখ্যান অবলম্বনে সংস্কৃতে বিহ্লন কবি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। তাহারই ছায়া লইয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। গুণসিন্ধু ও বীরসিংহ রায়গুণাকরের স্বকপোল কল্পনা মাত্র।

পথে দুই এক ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই প্লাটফর্মে গাড়ীর দরজার কাছে আমার 'বৃন্দাবনের কুঞ্জসহচর' মোহনরূপ, মধুরকণ্ঠ খগেন্দ্রনাথকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "খগেনবাবু কি স্থান না পাইয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে পায় হাটিয়া আসিতেছেন?" বন্ধু হাসিয়া অদৃশ্য হইলেন।

আমাদের গাড়ীর জনৈক আরোহী মশারি বিছানা লইয়া পথে এক ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলে, আমাদের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল, লোকটা কি তবে ডেলিগেট নয়? কি ভীষণ প্রতারণা! তাহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক সম্মেলনে লইয়া যাওয়াই অধিকাংশের মত হইল। কিন্তু বেচারা তখন পগার পারে।

আমি ভুল করিয়া বর্দ্ধমান মনে করিয়া পথে আর কোথাও নামিয়া না পড়ি, বন্ধু বিপিন ও রামকমল সেজন্য যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পথে আর কোন বিষয়ে বিভ্রাট বাধে নাই। আনন্দ কলরবে মুখরিত হইয়া, বঙ্গের গৌরব রত্নরাজি বক্ষে লইয়া, বাহিরের প্রখর সৌরকরোত্তপ্ত ও অন্তরের প্রচণ্ড অনলদগ্ধ হইয়াও কলের গাড়ী মহোল্লাসে ছুটিল এবং—

কলিকাতা বর্দ্ধমান তিন দিনের পথ,
দুই ঘণ্টায় উত্তরিল গাড়ী মনোরথ।

তৃতীয় উল্লাস—অভ্যর্থনা।

এক্‌স্‌প্রেস্‌ ট্রেণ গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করাইয়া আমাদিগকে বর্দ্ধমান ষ্টেসনে প্রসব করিয়া ফেলিয়া গেল। ষ্টেসন লোকে লোকারণ্য। সে জনতা ও সাহিত্যসেবকের ভিড় দেখিয়া ত্র্যহস্পর্শকে ধন্যবাদ দিতেছিলাম। ভাগ্যে বগুড়ায়, কৃষ্ণনগরে ও বর্দ্ধমানে এক সঙ্গে তিন বৈঠক বসিয়াছিল! ইষ্টারে কেবল এক সাহিত্য-সম্মেলন হইলে বর্দ্ধমানে সীতাভোগ-সম্মেলনে ৮ কোটি ডেলিগেটের পদরেণু বালিয়াড়ি গঠন করিত। মহারাজাধিরাজের ৫২ লক্ষের তহশীল বোধ হয় সীতাভোগ, পোলাউ-মাংস ও ডাব যোগাইয়া নিঃশেষ হইত। ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য।

আমরা জনতার একপার্শ্বে মণিহারা ফণীর ন্যায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কৃতকর্ম্মা পলিতকেশ রাজাসাহেব স্বয়ং ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর ডেলিগেটের কাছে অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যদিগের ভিড় জমিয়া গেল। ললিতবাবু

জলধর বাবুকে খুঁজিয়া সংবাদ দিলে, তিনি ছুটিয়া আসিলেন এবং আমাদিগকে একজন ভলাণ্টিয়ারের হাওলা করিয়া দিলেন। ভলাণ্টিয়ার আমাদিগকে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর জীর্ণ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গা ঢাকা দিলেন। অসংখ্য মোটর, ফিটন ভাড়াটিয়া (সম্মেলনের ছাপমারা) গাড়ী প্রস্তুত ছিল। যাহারা যোগাড় করিতে পারিল, মোটরে যাইয়া বসিল। মোটর বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদিগের জন্য reserve করা ছিল। বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত বলিলে কেহ যেন ভ্রমক্রমে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি মনে না করেন। বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত বলিলে যাহাদের ইংরাজী উপাধি অনেক, চাকুরীতে বড় পদ,* খেতাবে মহারাজা, রাজা, দেওয়ান বাহাদুর, রায় বাহাদুর এবং প্রচুর অর্থাগম আছে, তাহাদিগকেই বুঝিতে হইবে। এই পার্থক্য সৃষ্টির অপরাধ বোধ হয় মহারাজাধিরাজের নহে (তাঁহার দরবারে মুড়ী মুড়কীর একদর), fawning snob পারিষদদিগের। কোন দৈনিক পত্রে পড়িলাম, বর্দ্ধমানের ভদ্রলোকেরাও আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু Hearsay is no evidence. আমাদের গাড়ীখানা নিতান্ত বিনয়ী, সকলকে পথ ছাড়িয়া দিয়া ভদ্রলোকের মত আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। ঘাটিতে ঘাটিতে স্বেচ্ছাসেবকেরা গাড়ী আটকাইয়া আমাদের নাম লিখিয়া লইল এবং আমরা কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমরা কাগজে Willbaria নাম পড়িয়াছিলাম, সুতরাং বলিয়া দিলাম, উইলবাড়ী। জনৈক বন্ধু একবার মেজাজ খারাপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কোথায় যাব তা কি আমরা জানি?'

একখানা গাড়ী পথিপার্শ্বে গাড়ী-লীলা শেষ করিয়া নশ্বর দেহের পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিল। স্বেচ্ছাসেবকদিগের মধ্যে কর্ম্মিষ্ঠতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা যথেষ্ট রহিয়াছে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু উপযুক্ত পরিচালক ও কার্য্যের সুব্যবস্থা করিবার লোক তাঁহাদের পশ্চাতে অধিক ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। দুপ্রহরের রৌদ্র অগ্রাহ্য করিয়া যুবকেরা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ছুটাছুটি করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া কাহার না চক্ষু জুড়ায়?

এক এক করিয়া পাছের গাড়ীগুলি আগে চলিয়া গেল, 'আমরা রৈনু পড়ে।' যথাসময়ে গাড়ী উইলবাড়ী পৌঁছিলে দেখি, হরিদাসবাবু অভ্যর্থনা করিতে দ্বারে দণ্ডায়মান। তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া আমাদের ব্যাগ বহিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। আমরা তাঁহার সমাদরে ও বিনয়ে মুগ্ধ হইয়া ব্যাগটী কাড়িয়া লইলাম। উইলবাড়ীর কোন্ দিক দিয়া কোথায় ঘুরিয়া দোতালায় একটা সুন্দর প্রশস্ত ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না—যেন আমরা গোলক ধান্ধায় একপাক ঘুরিয়া লইলাম। আমাদের সেই ঘরটীতে ৪টী মশারি টাঙ্গাইবার স্থান ছিল, লোক আমরা '৩ ইয়ার' এবং সপুত্রক অধ্যাপক ললিতবাবু। ক্রমে নগেনবাবু (সোম) খগেনবাবু ও হেমেন্দ্র বাবুরা তিনটী প্রাণী আসিয়া নরক গুলজার করিলেন।

উইলবাড়ীর নামকরণ সম্বন্ধে কেহ বলিলেন, কে একজন উত্তরাধিকারীর অভাবে মহারাজাধিরাজের কোন পূর্ব্ব পুরুষকে বাড়ী

---

* চাকুরীর মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমি সম হয়ে আছি।

উইল করিয়া দিয়াছিল বলিয়া উহার নাম 'Will বাড়ী'। ললিতবাবু বলিলেন, 'তাহা নহে, উইল করিয়া এবাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম উইলবাড়ী হইয়াছে।' আমরা পৌঁছিয়া দেখি, প্রত্যেক বিছানায় একখানি করিয়া তালের হাতপাখা। ভলাণ্টিয়ারেরা 'কি চাই' যাচিয়া গেল। সোডা-লেমনেড-জল খাবারে আমাদের রুচি ছিল না, ডাবের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। যাঁহারা অভুক্ত ছিলেন, অন্ন ব্যঞ্জন ধ্বংস করিতে গেলেন। সেই ভোজনের পারিপাট্যের বিশেষত্ব ছিল কলাইর ডাইল ও মাছের টক। বর্দ্ধমানের উহাই গৌরব। সে গৌরবের পরিচয় যাহাতে with vengeance হয়, মহারাজ সে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সভামণ্ডপে যাইবার পূর্ব্বে শুনিতে পাইলাম, কণ্ঠে সভাপতি মহাশয়ের মাল্যদান-ঘটিত কেলেঙ্কারীর কথা চারিদিকের বাতাসে গুঞ্জরিত হইতেছিল। তাহা শুনিয়া আমাদের সেই মধুকানের ঢিমেতেতালা মনে পড়িল—

"রাই তুমি অমূল্য মালা গাঁথিছ কাহার
কারণে।" *

বাঙ্গালী 'আত্মবিস্মৃত' জাতি, দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া তাল ঠিক রাখিতে পারে না। কর্ম্মস্থলের রামু, ঘরের খুটিনাটি ঝগড়া বিবাদের রামু, দশ জনের রামু ও জননীর সেবা-মন্দিরের রামু এক হইলে চলিবে কেন? বস্তুতঃ কি সাদা, কি কাল, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই, আমি হেন ব্যক্তি যাহাকে সাদা বলিব সে-ই সাদা, আর যাহাকে কাল বলিব সে-ই কাল, এরূপ অহং জ্ঞান অপদার্থ বাঙ্গালী চরিত্রের মূল শিথিল করিয়া দিয়াছে। এইজন্যই আমরা আত্মশক্তির উপর দাঁড়াইতে চেষ্টা না করিয়া কেবল যোগাড়ের ফলারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াই। পক্ষান্তরে আমরা একটু উর্দ্ধে উঠিলে আর মানুষকে মানুষ জ্ঞান করি না।

চতুর্থ উল্লাস—সম্মেলন।

সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল, আমরা পঞ্চ পাণ্ডব দরজায় আসিয়া দাড়াইলাম। দরজায় আসিবার পথে একস্থানে দেখি, বৃদ্ধ সাহিত্য-সেবক অক্ষয়চন্দ্র টেবিল চেয়ারে বসিয়া সিঙ্গারার ম্যালেরিয়া-তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন। সেখানে ডেলিগেটদিগকে ব্যাজ দেওয়া হইতেছিল। আমরা ৫ জনে পাঁচটী সংগ্রহ করিয়া লইলাম। পরে শুনিলাম, সেখানে গার্ডেন-পার্টির কার্ডও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহা পাই নাই। আশাতীত লোকসমাগমে কার্ড অপেক্ষা কার্ডের খদ্দের বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা সংখ্যায় ৪ জনের অধিক হইলেও এক গাড়ীতেই যাইব স্থির হইল। মহারাজ বাহাদুর বহু চেষ্টা করিয়াও সকলের জন্য গাড়ী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তবে ষ্টেশন হইতে বাসাবাড়ী যাইবার জন্য সকলেরই যানের বন্দোবস্ত ছিল। দুপ্রহরের রৌদ্রে অপরিচিত পথে হাটিয়া যাওয়া কলিকাতার কলের জল ও বালাম চাউল ধ্বংসকারীদের কর্ম্ম নয়। এক একখানা গাড়ী আসিবামাত্র ডেলিগেট্‌রা তাহা অধিকার করিতে লাগিলেন। আমরা ৪॥০ জন অবশিষ্ট রহিলাম। ইতোমধ্যে আর একখানা গাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই বঙ্গবাসীর বিহারী বাবুরা দুই তিন জন আসিয়া দরজায় পৌঁছিলেন, আমরা তখন গাড়ীর প্রতীক্ষায় রাজপথে। কিন্তু ললাটের ফের—একখানি গাড়ী আসিবামাত্র বৃদ্ধ

---

* গত ৮ই এপ্রিলের বসুমতী ও ১২ই এপ্রিলের দৈনিকচন্দ্রিকা দ্রষ্টব্য।

বিহারী বাবু ক্ষিপ্রতার সহিত ছুটিয়া আসিয়া আইনের ভয় অগ্রাহ্য করিয়াও চলিষ্ণুশকটেই আরোহণ করিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের activity ও agility দেখিয়া মোহিত হইয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমি মনে মনে আবৃত্তি করিলাম—

রথ রাখ রথ রাখ থাক,
বারেক ফিরিয়ে দেখ।
আর হবে না দেখাদেখি
দেখি দেখি দেখ দেখ॥

তার পরদিন বিহারী বাবু নাকি সত্য সত্যই অদৃশ্য হইয়াছিলেন।

রাজবাড়ীর সভামণ্ডপ অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়াছিল। আমরা যখন সেখানে পৌঁছিলাম, সভাগৃহে লোক-সমুদ্র 'থই থই' করিতেছিল। শুনিলাম, মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ৩০০০ আসনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে নস্থানং তিলধারণং। সাত আট শত লোকের আন্দাজ করা হইয়াছিল, কিন্তু ১৪ শতের উপর আগন্তুক সভায় যোগদান করিলেন। বর্দ্ধমানের অক্ষয় ভাণ্ডার ও অগণিত কর্ম্মচারী ছিল বলিয়াই এরূপ আশাতীত লোক সমাগম সত্ত্বেও সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিয়াছে। দ্বারে মাথায় পাগড়ী রায় বাহাদুর মণিলাল সিংহ সকলকে বিনয়ের সহিত হাস্যমুখে অভিবাদন করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতেছিলেন। আমরা মঞ্চের নিকট উপস্থিত হইলে কে যেন হাঁকিয়া বলিলেন, ডেলিগেটদিগকে ওদিকে বসিতে দেও। তদনুসারে আমরা সকলের পশ্চাতে কাঁটাল তলায় আশ্রয় লইলাম। ললিত বাবুকে পদ্মনাথ হাত করিলেন। এত কড়াকড়ি বন্দোবস্ত সত্ত্বেও দেখিতে পাইলাম, ডিরেক্টার আফিসের অনেক ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী, সঙ্কল্পের বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মঞ্চে আরোহণ করিয়াছেন। আমাদের কাছে অখিল মিস্ত্রীর গলির রজনীগুপ্ত-স্মৃতি লাইব্রেরীর প্রতিনিধির দল আসিয়া জুটিলেন, প্রবাসীর চারুবাবু তাঁহার দলবল লইয়া আসিলেন, ক্রমে হেমেন্দ্রও আসিলেন। অতএব "The World is round অথবা Birds of a feather flock together."

বর্দ্ধমানে সমবেত সাহিত্যসেবক ও ডেলিগেটদিগকে আমরা প্রধানতঃ ৩০ ত্রিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি যথা,—

(১) মৌলিক গ্রন্থকার, (২) কবি, (৩) মাসিক পত্রের লেখক ও সম্পাদক, (৪) সংবাদপত্রের লেখক ও সম্পাদক, (৫) ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক, (৬) বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক ও ভৌগোলিক, (৭) জ্যোতিষী ও গণিতবিদ্, (৮) দার্শনিক,(৯) স্কুলপাঠ্য ও বাল-সাহিত্য-লেখক, (১) ইংরাজী ও সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদক ও বাঙ্গালা পুস্তকের অপহারক, (১১) প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ সম্পাদক, (১২) সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদক ও অধ্যাপক, (১৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পরীক্ষক,(১৪) বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক ও ছাত্র, (১৫) থিয়েটার ও যাত্রার দলের অভিনেতা, (১৬) গায়ক, বাদক ও কীর্ত্তনীয়া, (১৬) ডাক্তারী ও কবিরাজী পুস্তকের লেখক ও পাঠক, (১৮) মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রের স্বত্বাধিকারী ও কর্ম্মচারী, (১৯) বাঙ্গালা পুস্তকের প্রকাশক এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজার, (২০) লাইব্রেরী ও রিডিং রুমের পরিচালক ও সদস্য, (২১) বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রেতা, (২২) বাঙ্গালা পুস্তক ক্রেতা, (২৩) মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রের গ্রাহক ও পাঠক, (২৪) অর্থ দ্বারা সাহিত্য-পরিষদের উৎসাহ-দাতা, (২৫) বাঙ্গালা ভাষার

লেখকদিগের পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্র শ্বশুরসুত প্রভৃতি, (২৬) বাঙ্গালা বক্তা ও শ্রোতা, (২৭) বাঙ্গালা পুস্তকের ও কাগজের চিত্রকর, মুদ্রাকর ও দপ্তরী, (২৮) বাঙ্গালা কাগজে বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা উৎসাহদাতা, (২৯) বাঙ্গালা লেখক ও গ্রন্থকার যাহাদিগের ভিটায় বসত করে ও যাহাদের নিকট হইতে টাকা ধার করে, এরূপ ভূস্বামী ও উত্তমর্ণ, (৩০) উচ্চপদস্থ ও ধনী সাহিত্যসেবকগণের আরদালী, চাপরাশী ও ভৃত্যবর্গ।

যাহা হউক, এই সকল সাহিত্যরথীর রথচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া আমরা কাঁটাল তলায় মাথার আটায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। প্রত্যেক আসনে একখানা করিয়া হাতপাখা ছিল। তাহা মুহুর্মুহুঃ সঞ্চালন করিয়া মধ্যাহ্নের উষ্ণতা বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় প্রায় ২॥ টায় সহসা সম্মেলনের কার্য্যারম্ভ হইল।

প্রথম দিনের সম্মেলনের কার্য্য সূচী।

(১) স্বস্তিবাদ, (২) সভাপতির গলদেশে দেবেন্দ্রবিজয় বাবু ও মূর্ত্তিমান্ পরিষদ ব্যোমকেশবাবু কর্ত্তৃক বিরোধী মাল্য অর্পণ, (৩) আবাহন সঙ্গীত—

বাণীর মন্দিরে বঙ্গের সন্তান
　　পূজিতে মায়ের চরণকমল
স্বাগত আজি জ্ঞানদার দ্বারে
　　অবনত শিরে, ভক্ত সকল।
স্বাগত, ওহে বাণী-পুত্রগণ !
　　বর্দ্ধমানের নব মন্দিরে,
কর আলোকিত নবীন জীবন
　　জ্বালিয়া প্রদীপ আশার তীরে—
বর্ষিত হ'ক বাণি শুভাশীষ
　　হোক তোমাদের সাধনা সফল।
ইত্যাদি।

(৪) কপিঞ্জল প্রণীত আবাহন কবিতাপাঠ, (৫) কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের আবাহন বন্দন-গীত—

কাশীরাম যেথা গাহিল প্রথম পীযূষবাহিনী গাথা,
শ্রীকৃষ্ণদাস রচিল মধুর চরিতামৃত কথা।
প্লাবিত যেদেশ পতিতপাবন গোরার প্রেমের
বানে,
যেখানে কোমল কমলাকান্ত মগ্ন ছিল ধ্যানে।
এই সেই দেশ এস হে ভক্ত পূজ্য অতিথি বেশে,
'মুকুন্দ' 'জ্ঞান' 'লোচনানন্দ' বৃন্দাবনের দেশে।
গঙ্গা অজয় সীকরসিক্ত যেথাকার বায়ু সতত বহে,
যেথাকার সাধু কমলেকামিনী হেরে ভীম
কালিদহে।
পথেঘাটে যার বাউল এবং কণ্ঠের মধুগীতে,
ভকতি উৎসব ছাইয়া দেয় নিতি নরনারীচিতে।
এই সেই দেশ এসহে ভক্তপূজ্য অতিথি বেশে,
মুকুন্দ জ্ঞান লোচনানন্দ বৃন্দাবনের দেশে।
ইত্যাদি।

কুমুদরঞ্জনের আর একটী অভিনন্দন-কবিতা আমাদের ভাল লাগিয়াছিল,—

স্বাগত, সব কোবিদবৃন্দ ধন্য কর এসে,
পঞ্চানন্দ, বন্যা আর ম্যালেরিয়ার দেশে।
এসো সবে অমল ধবল বিমল বসন পরে,
বর্দ্ধমানের রাঙ্গা মাটী দেবে রঙিন করে।
স্নেহ প্রীতির কুঙ্কুম এযে পরাগ উল্লাসেরি,
যেথায় যাবে সাথে সাথে রইবে সবায় ঘেরি।
এসো আজি সুহৃদ্ বেশে মধুর হেসে,
'নরজা' এবং 'কর্জ্জনা' ও 'গর্দ্দান মারির' দেশে।

*　　*　　*

শুষ্ক রাঢ়ের কাষ্ঠ ভাষা প্রাণটা ত তার শাদা,
আমাদের এই দীন আয়োজন ধন্য কর দাদা।
মাছের টক আর কলাই ডালে উঠবে কি গো মন ?
আমাদের যে নারদ ঋষির মতন নিমন্ত্রণ।
মাঠের নামলা মটর সুটি টাটকা মুড়ি গুড়,
রাজা দিবেন সীতাভোগ ও মোহন মতিচুর।
না পেলেও নিন্দা যেন ক'রনাকো শেষে,
'নরজা' এবং 'কর্জ্জনা' ও 'গর্দ্দানমারী'র দেশে।
ইত্যাদি।

(৬) কবি কালিদাস রায়ের অভিনন্দন গীত—

এস সুধীগণ মানস মোহন এস বাঙ্গালার পুণ্য ক্ষেত্রে,
চাহ ভারতীর মিলন ভবনে প্রেমে ছল ছল উজল নেত্রে।

হেথা কাশীরাম অমৃত সমান প্রচারিল মহাভারত মন্ত্র,
বাঙ্গালীজাতির একাধারে বেদসংহিতা স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র।
হেথা মহামতি কবি দাশরথি নবীন গীতার সরল ছন্দে,
শাক্ত বিষ্ণু উপাসক দলে বাঁধিল মধুর মিলন বন্ধে।
ইত্যাদি।*

(৭) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র।

(৮) মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবের অভিভাষণ।

মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান-সাহিত্য-শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে, বর্দ্ধমান পুরবাসিগণের পক্ষ হইতে এবং সেই নগরে প্রতিষ্ঠিত বর্দ্ধমান রাজার পক্ষ হইতে স্পষ্ট মিষ্ট অনতিদীর্ঘ অভিভাষণে সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহার রাজ গর্জ্জন কণ্ঠস্বর সুবৃহৎ সভামণ্ডপের প্রতিপ্রান্ত হইতে প্রত্যেকে স্পষ্ট ভাবে শুনিতে পাইয়াছিলেন। মহারাজের সচিত্র, লোভনীয়, মুদ্রিত অভিভাষণ একখানা বহু কষ্টে ভলেণ্টিয়ারদের নিকট হইতে আমরা সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

(৯) সভাপতি বরণ।

মহারাজের প্রস্তাবে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং ফরিদপুর পাংসা নিবাসী মৌলবী রওশান আলীর সমর্থনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, বাল্মিকীর-জয় ও মেঘদূত-ব্যাখ্যা-প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। সভাপতি বরণের প্রস্তাব কাশিমবাজারের মহারাজার সমর্থন করিবার কথা ছিল। কিন্তু বর্দ্ধমানাধিপতি বলিলেন, 'তিনি ট্রেণ ফেল করিয়া মালগাড়ীতে (অর্থাৎ মোটরে) আসিতেছেন।' রওশান আলী বলিলেন, "আমরা বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুরের নিমন্ত্রণেই যে সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি তাহা নহে, আমার বর্দ্ধমানবাসীদিগের আহ্বানে, চারিদিকে সাহিত্যের উদ্বোধনের যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার প্রেরণায় এখানে সকলে আসিয়া মিলিত হইয়াছি।" তাঁহার উক্তি "সত্য হউক হে ভগবান।"

প্রস্তাব-সমর্থক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল অনুপস্থিত। পাঁচকড়িবাবু জননীর রুগ্ন শয্যা ছাড়িয়া এবং বিপিন বাবু অন্য যে কোন কারণেই হউক বর্দ্ধমানের দরবারে বার দেন নাই। সুরেশচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতার কঠিন রোগের অজুহাতে না গেলেও পারিতেন, কিন্তু গিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলেন।

(১০) গত বৎসর জজ বরদা বাবু কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন, এবার জজ বঙ্কিম বাবু কবিতা পাঠ করিলেন, তাঁহার ভ্রাতার কবিতা গীত হইল। তাঁহার কবিতা পাঠের সময় আমাদিগকে সারদা বাবুর অভাব সবিশেষ বোধ করিতে হইয়াছিল। রায় যতীন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে বঙ্গাধিপ ক্ষৌণীশচন্দ্রের দরবারে, সারদা বাবু ও নগেন্দ্র বাবু (বসু) বগুড়ায়। (১১) তৎপর সভাপতি মহাশয়ের সম্বোধন পাঠ আরম্ভ হইল। যাঁহারা বাঙ্গালাকে শুদ্ধ বা মার্জ্জিত করিয়া লইতে চান, শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগকে একটু বিদ্রূপ করিয়াছেন (অনেক বি-এ পরীক্ষক সাবধান); কিন্তু 'আপনি করিয়া কর্ম্ম দূষহ অপরে।' অভিভাষণে তাঁহার আপত্তি থাকিলে 'অভিবাদ, আভাষণ, সমাভাষণ, প্রতিভাষণ, আমন্ত্রণ, সম্ভাষণ, আলাপ প্রভৃতি শব্দের যে কোনটী তিনি ব্যবহার করিতে পারিতেন, সম্বোধন নাম ধরিয়া ডাকা (to address by name)। সম্বোধন করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগের মুখ ফিরাইলেন, কি আত্মবিস্মৃত জাতিকে

---

* বঙ্গবাসীতে কুমুদরঞ্জন বলিতেছেন, কালিদাসের এক কবিতা তাঁহার নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্যক্ বোধিত করিলেন, তাহা নিশ্চয় বুঝা গেল না। তাঁহার ক্ষীণ বামাকণ্ঠ প্যাণ্ডালের সুদূর প্রান্তে আমাদের নিকট পৌঁছিল না। সম্মুখে ডেলিগেট এবং পশ্চাতে ভলাণ্টিয়ারগণের পরস্পর বাক্যালাপে যেটুকু মিহি আওয়াজ আসিতেছিল, তাহাও ডুবিয়া গেল। এমন সময় হঠাৎ চটপট করতালি-ধ্বনি নাটোর ও কাশিমবাজারের মহারাজদিগের আগমন-সংবাদ সূচনা করিল।

মহারাজে মহারাজে ধূলপরিমাণ,
দশবিশ গণ্ডা সভার জ্ঞান।

ইঁহাদের আগমনে সভার চতুর্দ্দিকে কোলাহল গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। সভাপতি মহাশয় বাধা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় বঙ্গের গৌরব-গাথা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের একছত্র সম্রাট বলিয়া মনে হইতেছিল না, মনে হইতেছিল, রাজচ্ছত্রের ছায়াতলে ভাট ও চারণের গীত ধ্বনিত হইতেছে। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতি এবার বর্দ্ধমানে জাগরণের উদ্বোধনমন্ত্র পাঠ করিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের তিনটী গৌরব অস্তমিত হইলেই আমরা সভা মণ্ডপ ত্যাগ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। শাস্ত্রী মহাশয়ের সরল, সহজ,স্বাভাবিক ভাষা আটপরে চাকরাণীর মত, কিন্তু রাজ-সভার পাটরাণীর মত হয় নাই,তাহা বুঝিলাম। ভাষা সরল হইলেও তাহার মধ্যে লালিত্য, মাধুর্য্য, ওজস্বিতা, সতেজ প্রাণের স্রোত ও ভাবের টান থাকিতে পারে, এক টানা, একঘেয়ে, নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, common place হইবে কেন? কায়স্থ জাতি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ হইলেও,আমরা একথা বলিতে বাধ্য যে, গজরাজের বেষ্টনীতে তাঁহার অভিভাষণের উদরে যে কত অসার, অস্বাস্থ্যকর তর্কের বিষয় অজীর্ণ রোগের বীজাণু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই—কিন্তু তাহাতে নাই কেবল হতভাগিনী বাঙ্গালা ভাষার স্থান।

বর্দ্ধমানের নিমন্ত্রণ পত্রের উত্তরে আমি জানাইয়াছিলাম, আমাদের একটু পান (চা) দোষ আছে। প্রাতে ৮টার সময় নাকে মুখে দুটী অন্ন গুজিয়া সাহিত্যসমরে বর্দ্ধমান অভিযানে ছুটিয়াছিলাম। প্রখর রৌদ্রে দারুণ গ্রীষ্মে পটমণ্ডপে বাহ্য প্রকৃতি মানবমনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল। আমরা চা-পানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলাম। মহারাজের প্রসাদে রাজপ্রাসাদে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের প্রাঙ্গণে অসংখ্য ডাব, লেমনেড সাহিত্যসেবায় আত্মবলি দিতেছিল। ডাবের জলে শাণের উপর ankledeep জলকাদার সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের মনে উঠিতেছিল, সেই field of the cloth of goldএর মদিরার উৎসের কথা। নারিকেল ফলাম্বুও পানীয় বটে, ইহা আমাদের—উহা তাহাদের। 'পেয়ালা ভরি ভরি' চা পান করিয়া অকৃত্রিম সাহিত্য-সেবকেরা রাজার ভাণ্ডার উজার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং শেষকালে আমাদের ভাগ্যে তাহা জুটিল না, আমরা তিন বন্ধু উইল-বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পথে নামিলাম। বিপিনের ব্যগ্রতা এত অধিক যে, তিনি এই হতভাগ্য দ্বয়কে ফেলিয়াই আর এক গাড়ীতে ভাগে উঠিয়া পড়িলেন। কিন্তু অদৃষ্টে সুখ থাকিলে কেহ তাহার প্রতিবাদী হইতে পারে না, আমি ও রামকমল এক ফিটন গাড়ীতে চড়িয়া বন্ধুর প্রতি পশ্চাৎ হইতে অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া রাজা মহারাজা না হউক, অন্ততঃ দেওয়ানবাহাদুরের মত

গম্ভীর চালে চালিত হইলাম। বিপিনের থার্ডক্লাসের অদৃষ্ট দেখিয়া আমার মনে কৃপার সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহার অনুশোচনা হইয়াছিল কিনা, বলিতে পারি না।

রাজবাড়ীর পথে গাড়ী আটকাইয়া সেচ্ছাসেবকেরা কি বলিল ও কি করিল, তাহা বুঝিলাম না। এই অবসরে অপর দুইটী ভদ্রলোক আমাদের অর্দ্ধশূন্য যানে আরোহণ করিলেন। পথে তাঁহাদের বোলচাল ও মন্তব্য বেশ উপভোগের বস্তু হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের পথঘাট দেখিয়া একজন বলিলেন, এখানকার রাস্তাঘাট বাড়ীঘর সবই যেন গোলক ধাঁধাঁ। আগে বোধ হয় লোকদিগকে ধরিয়া আনিয়া ইহার মধ্যে ছাড়িয়া দিত। তাঁহারা সাহিত্য-সভার প্রতিনিধি। সাহিত্য-সভার ‘গৌরব’ করিয়াও একটু কিছু বলিলেন এবং সাহিত্য-পরিষদের কথা উত্থাপন করিয়া কাসিমবাজারের মহারাজের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

ক্রমে চাল-চিড়া মুড়ী-মুড়কীর দোকান, খড়ের ঘর, মাটির দেওয়াল, পচাপুকুর পার হইয়া, এনোফেলিন মশক বংশের শিরে লক্ষ অভিসম্পাতের অশনি নিক্ষেপ করিয়া আমরা উইল-বাড়ীতে রাজভবনে উপনীত হইলাম। বর্দ্ধমানের গড়ের এখন আর সেকালের সে রং ও শ্রী এখন দেখিলাম না।

অতএব আমাদের মনে ঘোরতর সন্দেহের উদয় হইল, এই সেই সোমিলকোপাখ্যানোক্ত এবং ভারতচন্দ্রবর্ণিত বর্দ্ধমান কিনা। আমরা অনেক ‘চিন্তার পর করিলাম স্থির’, রাঢ়ের বর্দ্ধমান প্রাচীন বর্দ্ধমানের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত একটা আধুনিক নগর মাত্র। যেমন বিলাতের অনেক নগরের নাম আমরা আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে পাই, সেইরূপ কোন প্রাচীন নগরের নাম প্রদেশান্তরে আধুনিক নগরে দেখিতে পাওয়া কিছু বিস্ময়ের কথা নহে। আশা করি, প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় প্রতীচ্য বঙ্গের আমাদের এই প্রত্নতত্ত্বেষণা সমর্থন করিবেন। *

আমরা চলিয়া গেলে সম্মেলন সভায় কি কি কার্য্য হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই, এমন কি, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া সুরসিক সর্ব্বাধিকারী মহাশয় গত সম্মেলনের বিবরণ পাঠ কালে তাঁহার উপর যে একটু কটাক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাও শুনিতে পাই নাই। লোকমুখে শুনিতে পাওয়া গেল, আমরা চলিয়া আসিলে সভাপতি মহাশয়ের সম্বোধনের শেষাংশ তাঁহার প্রতিনিধি রাখাল বাবু পাঠ করিয়াছিলেন। প্রথম হইতে সেই ব্যবস্থা হইলে আমাদিগকে বোধ হয় বাসায় ফিরিয়া যাইতে হইত না। স্থবিরকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমল হইতে প্রতিনিধিদ্বারা অভিভাষণ পাঠ করান একটা রোগ হইয়া পড়িল দেখিতেছি। আমরা মুদ্রিত অভিভাষণ আজ পর্য্যন্ত যোগাড় করিতে পারি নাই। শুনিলাম তাহার ‘copy right’ পটলডাঙ্গায় বিক্রীত হইয়াছে, এবং সেই ক্ষোভে সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সেই রাত্রিতেই বর্দ্ধমানে পটল তুলিবার যোগাড় করিয়াছিলেন। সম্বোধন-বাণীর অবরোধ রক্ষা করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় সুবিবেচকের কার্য্য করিয়াছেন। যেহেতু শাস্ত্রে আছে, যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনঃ জনঃ।

---

* প্রবাসীর চারুবাবু শের আফগানের কবর দেখিতে যাইয়া যে সুড়ঙ্গ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্যরূপ ধারণা জন্মিয়াছে।

পঞ্চম উল্লাস—গার্ডেন পার্টি।

বাসায় আসিয়া জঠর-জ্বালায় অধীর হইলাম, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইল। জানিলাম, মহারাজ বাহাদুরের কৃপায় এক রেজিমেণ্ট চাকর চাকরাণী,পাচক পাচিকা উইল-বাড়ীতে মজুত রহিয়াছে, পানদোষের সার্থকতা করিতে 'চা' প্রস্তুত করিতে order দিলাম। কিন্তু তাহা আমাদের নিকটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়া গেল। সাহিত্য-রথীদিগের উদরে জহ্নুমুনি প্রবেশ করিয়াছিলেন, গণ্ডূষে চারবারি শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল। সুতরাং ভৃত্যেরা নিরুপায় হইয়া ভলাণ্টিয়ার দ্বারা সংবাদ পাঠাইল, সেখানে সশরীরে উপস্থিত না হইলে আমাদের তৃষ্ণা ও ক্লান্তি নিবারণের আর কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। গার্ডেন-পার্টিতে যে light refreshment অর্থাৎ চব্যচোষ্যের আয়োজন হইয়াছিল, আমরা তাহার বিশেষ কোন খবর রাখিতাম না, সুতরাং নিরাশ হইয়া শয্যাশায়ী হইলাম। এমন সময় সপুত্রক ললিত বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিরাশ-তরঙ্গাকুল সাগর বক্ষে তাঁহাকে আমরা 'নোঙ্গর' স্বরূপ প্রাপ্ত হইলাম। তিনি বলিলেন, গার্ডেন পার্টি ৫টাতে হইবে, মহারাজা সকলকে মৌখিক আমন্ত্রণ করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল সেখানে যাওয়াই কর্ত্তব্য। তদনুসারে আমরা সকলেই পদব্রজে রওনা হইলাম। অর্দ্ধপথে হরিদাসবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি বাগানে আমাদিগকে না দেখিতে পাইয়া গাড়ী লইয়া ছুটিয়া উইলবাড়ী 'গবেষণা' করিতে যাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, মহারাজাধিরাজ আমাদিগকে (অর্থাৎ ললিতবাবু প্রভৃতিকে) উদ্যান-সম্মিলনে খুজিতেছিলেন। বর্দ্ধমানের উদ্যান-সম্মিলনের আনন্দে ভারতেশ্বর বড়লাটের ন্যায় বিশিষ্ট অতিথি সকলও বিভোর হইয়া গিয়াছেন,বঙ্গের সাহিত্য-সেবকগণের অদৃষ্টে সেই নন্দন কাননের সুখ-সম্ভোগ ভুলক্রমে বিধাতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরাও যে মোহিত হইলাম, তাহা বলাই বাহুল্য। সেখানে পৌঁছিবা মাত্র হরিদাসবাবু মহারাজের নিকট আমাদিগকে উপস্থিত করিলেন। মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে বিপিন অভাব ও অভিযোগ জানাইলে মহারাজ ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। আমাদের ন্যায় অযোগ্য অধমের সহিতও মহারাজ তদ্রূপই সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেখানে বৃদ্ধ কালওয়াতের মধুর ঝঙ্কার উঠিতেছিল। কার্পেটে বসিয়াছিলেন ডাঃ দেবপ্রসাদ। মহারাজ আমাদিগকে সেখানে বসাইয়া রাজা সাহেবের উপর আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। হেমেন্দ্র ও ললিত বাবু পাশকাটাইয়া গা ঢাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ তাঁহাদিগকেও খুজিয়া বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন। প্রচুর আহার্য্য চা, সরবৎ, রাজভোগ ও দেবভোগ আমাদের চতুর্দ্দিকে সজ্জিত হইয়া দর্শকবৃন্দের রসনায় সলিল সঞ্চার করিল। আমরা যুগপৎ শ্রুতি ও রসনার সাহায্যে ইন্দ্রিয় সুখভোগে নিরত হইলাম।

বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সুন্দরে মধুরে আনন্দ উপভোগ করিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। নাট্যাভিনয় দেখিবার সুযোগ হয় নাই। দেখিলে সেখানে অনেক আমোদজনক বস্তু ও রহস্য জানিতে পারিতাম। চণ্ডীর গানে সাহিত্যিকগণের তত আগ্রহ দেখিলাম না। মহারাজাধিরাজ আমাদিগের চিত্ত বিনোদন করিতে আগ্রহান্বিত, আমরা

কেন প্রীত হইব না? কেহ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রাণে আনন্দকণা সেচন করিতে চায়, আমরা তাহাতে বিমুখ হইলে বিধাতার নিকট অপরাধী হইব। প্রীতি, সন্তোষ ও আনন্দ উদ্যান-সম্মিলনের অপূর্ব্ব দান।

ষষ্ঠ উল্লাস—প্রবাসে প্রথম রজনী।

বাগান মেলা হইতে ফিরিবার পথে সদর ঘাটিতে স্বেচ্ছাসেবকেরা আমাদিগকে নির্ম্মলবাগে যাইতে বলিল। আমরা বলিলাম, আমরা উইল-বাড়ীর লোক সেখানেই যাইব। তাহারা বিনয় করিয়া বলিল, উইল-বাড়ীতে যদি কোনরূপ অসুবিধা হইয়া থাকে ত আপনারা নির্ম্মলবাগে যাইতে পারেন। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ললিত বাবু তখনও বাহিরে। হেমেন্দ্র বাবু সবান্ধব নির্ম্মলবাগে স্থানান্তরিত হইলেন। খগেন বাবুও আমাদিগের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া স্নিগ্ধ মধুর সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পানাপুকুরে ডুবিয়া মরিতে নিরুদ্দেশ হইলেন। সোম নগেন্দ্রনাথ পাশের ঘরে হরিদাস বাবুর দোসর হইয়া আমাদিগের সহিত ১ ঘণ্টার জন্য বাক্যালাপ বন্ধ করিলেন। হেমেন্দ্র বাবু ললিত বাবুকে নির্ম্মলবাগের দিকে আকর্ষণ করিলেও তিনি উইল-বাড়ীতে বসিয়াই অনুপ্রাসের অনুরোধে বিপ্রকর্ষণ বলে বসুমতীর বন্ধুত্ব রক্ষা করিলেন। ভলাণ্টিয়ারেরা পুনঃ পুনঃ ডাব, চা, লেমনেড, সোডা, জলখাবার হাঁকিয়া যাইতে লাগিলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁহারা যোড় হাতে "মহাশয়দিগের কি চাই" জিজ্ঞাসা করিয়া আপ্যায়িত করিয়া গেলেন। আমরা বারান্দায় ঢালা বিছানায় শয়ন করিয়া সম্মেলনের সমালোচনায় নিযুক্ত হইলাম।

জনৈক সাহিত্য-সেবক আসিয়া নানা প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া পরে বলিলেন, আপনারা আমাকে খাতির করেন না, সাহিত্য-সেবকদিগের অন্তঃপুরে আমার সর্ব্বত্রই মহা সমাদর। তিনি তাঁহার কোন বউ দিদির গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। ললিতবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তিনি আপনার বউ দিদি কি রকম, তাঁহার সহিত আপনার আলাপ হইল কোথায়? তিনি উত্তরে বলিলেন, 'এই রকম করে হয়ে যায়। তাঁহার স্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল। একবার তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের বাড়ী কোন নিমন্ত্রণে উপস্থিত হই নাই বলিয়া অনুযোগ করেন। আমি অভিমান করিয়া বলিলাম, বউদিদি অনুরোধ করেন নাই বলিয়া আমি আসি নাই। অবগুণ্ঠনবতী বউদিদি পর্দ্দার আড়াল হইতে তাহা শুনিতে পাইয়া একটী রসগোল্লা লইয়া আসিয়া আমার মুখে পুরিয়া দিয়া কাণ মলিয়া দিলেন। সেই হইতে তাঁহাদের সহিত আমার আত্মীয়তা হইল। এখন তাঁহার কনিষ্ঠের মত সে বাড়ীতে আমার অবাধ গতি।'

আমরা সকলে হাসিয়া খুন। এই 'বালকের ন্যায়' সরল সাহিত্যিকটিকে আমরা অনেকক্ষণ সম্ভোগ করিলাম। বর্দ্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা-পোলাউ কালিয়া ভুলিতে পারি, কিন্তু এই 'বউদিদি ও রসগোল্লা' চিরদিন আমাদের সাহিত্যের স্মৃতি সরস রাখিবে।

অন্যান্য আলোচনার মধ্যে কুমুদরঞ্জনের 'নরজা'*এবং'কর্জ্জনা' ও গর্দ্দানমারি' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নরজার সাঁকো, কর্জ্জনার খাল ও গর্দ্দানমারির মাঠ ডাকাতের আড্ডার জন্য বর্দ্ধমানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আজ

---

* বর্দ্ধমানের প্রবাদবাক্য 'যাদ পেরুলি নর্জ্জা, ত নেয়ে ধুয়ে ঘর যা।'

সেই বৰ্দ্ধমানের জাতীয় ভাণ্ডার বঙ্গবাসীর সেবার জন্য উন্মুক্ত!

হরিদাস বাবুর আহ্বানে ভোজনের বৈঠকে যাইয়া মহাসমারোহের ব্যাপার অবলোকন করিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। সে পোলাউ-মাংস-মিঠাই-মণ্ডা দধী-ক্ষীরের ঘটা দেখিয়া আমরা সাহিত্য-মন্দিরের দীনসেবক কি বরযাত্রী, তাহা ঠাওর করিতে পারিলাম না! দীয়তাং ভুজ্যতাং সাড়া পড়িয়া গেল।

হাঁ হাঁ দেয়ং হুঁ হুঁ দেয়ং দেয়ংতর্জ্জনী গর্জ্জনে,
শিরঃকম্পেঽপি দাতব্যং নদেয়ং ব্যাঘ্র ঝম্পনে।

—এই পরিবেশণ নীতির সার্থকতা দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলাম। আমি হেমেন্দ্র বাবুকে বলিলাম, 'হেমেন্দ্র বাবু এরা যে পোলাউ খাইয়ে মুখ মেরে দিল।' তিনি বলিলেন, 'এমন মুখ রাখিনে।' বৈঠকে লোকের সংখ্যা দেখিয়া মনে হইল, বুঝি সম্মেলনের সকল লোকেই সে রজনীতে উইল-বাড়ীর অতিথি। বস্তুতঃই তাহাই হইয়াছিল—বিষয় নির্ব্বাচন সভার অধিবেশন উইল-বাড়ীতে হইয়াছিল। আহারের ঠাঁই হইলে সাপুটিয়া সকলে উঠিয়া আসিয়া হাত ধুইয়া গণ্ডূষ করিয়া বসিলেন। যাহা যউক, ভুরি ভোজনের অন্নযজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া আমরা শয়ন-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। কোন বন্ধু মশারির ভিতর নীরব মশা লুকাইয়া আছে কি না পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলে, মশা ও মশারি তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হইল। বৰ্দ্ধমানের সর্ব্বনেশে মশা ডাকে না, কিন্তু দংশন করিয়া হলাহল ঢালিয়া দেয়। শয়নের পরও সেচ্ছাসেবকেরা বরফ-জল-সোডা-লেমনেড সাধিয়া গেলেন।

নিদ্রার ক্রোড়ে সুখস্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমরা আবুহোসেনের মত রাজসিংহাসনে বসিয়া সাহিত্য-সভার অধ্যক্ষতা করিতেছি। অপ্সরা-দেবকন্যা-ফেয়ারী-হুরেরা পূর্ণিমার জোছনার মত সুধাকণ্ঠের সঙ্গীতলহরী দিগদিগন্ত বাতাসে ছড়াইয়া পারিজাত কুসুমের মালা গাথিয়া চারিদিকে কাঁচা সরার উপর নৃত্য করিতে করিতে আমাদের কণ্ঠে দিতে আসিয়াই হঠাৎ যেন আলাদীনের প্রদীপের অনুচর সেই ভীষণ বিকটাকার দৈত্যের রূপ ধারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য জিন-দানব-দৈত্য-বানর-কটক শাখায় শাখায় লম্ফ ঝম্ফ করিতে করিতে হাতাহাতি, কেশাকেশি, মারামারি, কাটাকাটি করিয়া গগনভেদী-চিৎকারে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ছিল। আর সেই sweet dream এর অপ্সরাগণের—

Voice in my dreaming ear melted away.

সপ্তম উল্লাস—প্রথম প্রভাত।

প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া বন্ধুদিগকে চিমটি কাটিয়া জাগাইলাম। চতুর্দ্দিকে গ্রথিত ইষ্টকস্তূপ নিস্তব্ধতার মধ্যে সাহিত্যসেবকগণকে ধিক্কার দিয়া ধ্যানমগ্ন মহর্ষির ন্যায় অবস্থিত, আমরা মলমূত্র ত্যাগে ব্যস্ত। সেই সৌধসমাকীর্ণ প্রান্তরে ব্রাহ্মণের বেদধ্বনি শুনিলাম না, ভক্তের ভজন শুনিলাম না, মুসলমানের আজান শুনিলাম না, খ্রীষ্টানের hymn শুনিলাম না, বৈষ্ণবের কীর্ত্তন শুনিলাম না, শিখের পাঠ শুনিলাম না, শৈবের 'হর হর ব্যোম ব্যোম ধ্বনি' শুনিলাম না, শাক্তের স্তব শুনিলাম না, ব্রাহ্মের প্রার্থনা শুনিলাম না, সাহিত্য-সেবকের আবৃত্তি শুনিলাম না; তবে শুনিলাম কি? কেবল পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, আমি কি হনুরে। কেহ কি বলিতে পারেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাণ (soul) কোথায়?

যাহা হউক, প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া

কুইনাইনের বটিকাসহ চাযোগ করিতে করিতে কবি কুমুদরঞ্জনের সহিত আলাপ হইল। তাঁহার বালকের ন্যায় সরল, মধুর অনাড়ম্বর মূর্ত্তিতে আমরা ভাবপ্রবণতার চিত্র দেখিতে পাইলাম। এই রকম আর একদিন দেখিয়াছিলাম, কবিবর বন্ধু গোবিন্দ দাসকে। আমরা ললিত বাবুকে প্রহরী রাখিয়া সদলবলে উইল-বাড়ীর সাহিত্যকুঞ্জ পর্য্যটনে বহির্গত হইলাম।

ইতিহাস শাখার সভাপতি যদুবাবুর নিকেতনে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া সুখী হইলাম। মাষ্টার মহাশয় তখন প্রবন্ধলেখকদিগের exercise correct করিতে ব্যস্ত ছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ ও মন্মথ বাবু তাঁহার chums. আমরা মন্মথ বাবুকে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক মহৌষধ সেবন করাইয়া রজনীতে ষ্টেজ ম্যানেজ করিবার উপযোগী করিয়া রাখিয়া কুঞ্জান্তরে গমন করিলাম। (সরকার) যদুবাবুর আশ্রমে পদ্মনাথ আমাদের দলপুষ্টি করিলেন। পথে যশোহরের ভবিষ্যৎ host রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদারের কুটীর। পণ্ডিত পদ্মনাথের সহিত যদুবাবুর সাহিত্যালোচনা বেশ জমিয়া গেল। আমি বিপদ গণিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলাম এবং বন্ধু রামকমলকে হারাইয়া ফেলিবার ভয়ে বাহিরের দ্বারে আড়ি পাতিয়া (পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন) রামরাবণের বাণ বৃষ্টির ন্যায় সাহিত্যরথিদ্বয়ের সাহিত্য চর্চ্চার কথা কাটাকাটি শ্রবণ করিয়া কৌতূহল নিবারণ করিতেছিলাম। পদ্মনাথ by the bye প্রস্তাব করিলেন, ডেলিগেটদিগকে এরূপ দলে দলে বাসা দেওয়া অত্যন্ত ভুল, একজন বাঁকুড়ার ডেলিগেটের সহিত একজন চট্টগ্রামের ডেলিগেট, এইরূপ যোড়া বাঁধিয়া দিলে সাহিত্যসেবকদিগের মধ্যে প্রীতি ও মিলনের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। তাহা শুনিয়া ললিত বাবু মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ, আমরা যে তাহাদের কথাবার্ত্তাই বুঝিতে পারিব না।' আমি ভাবিতেছিলাম, সেই two rabbitsএর কথা, one fat and one lean.

অষ্টম উল্লাস—শাখা সভা।

সেদিন প্রাতেই শাখা সভার অধিবেশনের কথা। আমরা বাসা হইতে ললিত বাবুকে সঙ্গী করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া প্যাণ্ডালে গেলাম। বলা বাহুল্য, উইল-বাড়ীতে সকলের জন্যই যান মজুত ছিল। প্রাতে প্রায় ৭টায় বৈঠক বসিবার কথা ছিল। কাঁঠাল তলায় ইতিহাসের শাখায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সভাপতি, লিচুতলায় দর্শনের শাখায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি, নাট্যমঞ্চে বিজ্ঞান শাখায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় সভাপতি এবং ডাইসে পটমণ্ডপের কেন্দ্রস্থলে সাহিত্যের গুড়িতে শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং অধিনায়ক। বিজ্ঞানশাখায় পাখা ছিল না, এ ঘর হইতেও প্রহরীরা সেখানে পাখা লইয়া যাইতে দিতেছিল না। অতএব boiling temperatureএর জন্য চিন্তিত হইবার কারণ ছিল না। রায় বাহাদুর যদুনাথ ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ইতিহাস ছাড়িয়া সাহিত্যের রসে এবং শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য দর্শন ও সাহিত্য ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানে মজিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। এবার বিজ্ঞান বিভাগের pindrop silence, দর্শনের গাম্ভীর্য্য, ইতিহাসের রোয়াব ও discipline এবং সাহিত্যের কলরব তাহাদের নিজনিজ বিশেষত্ব ছিল। কলিকাতা হইতেই আভাস পাইয়াছিলাম যে, এবার ইতিহাসের শাখায় গজকচ্ছপের লীলা হই-

যার আশা আছে। অধুনা রাঢ়ে দেবগ্রাম বিক্রমপুর আবিষ্কার করিয়া নগেন্দ্র বাবু বর্দ্ধমানের মহারাজাকে প্রত্নতত্ত্বের আসরে নামাইবার চেষ্টায় ছিলেন, লোকমুখে এইরূপ প্রকাশ। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র গুপ্তের ও যতীন্দ্র রায়ের বিক্রমপুরের ও ঢাকার ইতিহাস নাকোচ হইয়া যায় দেখিয়া তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া লাঠি ধরিতে প্রস্তুত। এমন মজার কাছে রাজার বাড়ী খাজা খাওয়া অতি তুচ্ছ। শুধু তাহাই নহে, সম্মেলনের অধিরাজ সাহিত্য-শাখার অধীনরাজের পদ শূন্য করিয়া ইতিহাসের করদ হইবেন, এরূপ নোটিশ পাওয়া গিয়াছিল। অতএব সভাপতি মহাশয় এবার একাধারে বহুরূপী।

সকালে বিকালে শাখা সভার অধিবেশন হইল। যাহারা একাধিক বিষয়ের অনুরাগী, তাহাদেরই বিষম বিপদ। কখনও নায় কখনও পায় চলিয়া, ৪ শাখায় লম্প ঝম্প করিয়া সময় কাটান ছাড়া কোন এক বিষয়ে ডুবিয়া তলাইবার যো তাহাদের ছিলনা। সকালবেলা প্রায় সম্বোধনেই কাটিয়া গেল। সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে সভাপতির পদে যুগলমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। আট বৎসরের অষ্টমূর্ত্তি সারি বাঁধিয়া চেয়ার পাতিয়া বসাইলে আরও ভাল হইত। শাখায় শাখায় কেবল যে আমরাই ঘুরিয়াছিলাম, তাহা নহে, মহারাজকেও ঘুরিতে দেখিয়াছিলাম। মহারাজ ইতিহাসের কক্ষে আসিলে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা ফোকাস করিতে আরম্ভ করিল। একজন যুবক ভলান্টিয়ার চেহারা দুরস্ত করিয়া মহারাজের পাছে ডানদিকে সরিয়া ছবিতে উঠিবে সাধ করিয়া ফিট হইয়া সবে দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় মহারাজ তাহাকে কি আদেশ করিলেন। বেচারা তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইল। কিন্তু দুইচার পা বাড়াইয়াই ক্যামেরার দিক ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইয়া

‘As a school boy to school’

চলিয়া গেল। কঠোর কর্ত্তব্য এমনই করিয়া আমাদিগকে সাধের কামনা বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য করে। এই অবৈতনিক ভলেণ্টিয়ারের কাছে সাহিত্য-সেবকেরাও কি কিছু ঋণ করিতে পারেন না?

গতবৎসর পণ্ডিতরাজ রাজমহিষীর দুগ্ধ পান করিয়া অভিভাষণ শেষ করিয়াছিলেন, এবার পরিষদরাজ—সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় বিপদগ্রস্ত হইবার ভয়ে ‘রাজমার্গে বংশপরিচালনা’ করেন নাই, কিন্তু ‘বর্ত্তমান কলা ও চাঁপা কলা’ দিয়া সম্বোধন সমাপ্ত করিয়াছেন। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের বুলিতে যদি আমরা তাঁহার ‘বাড়িয়ে গুছিয়ে’ লিখিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে কথার সংখ্যায় বাঙ্গালা অভিধান কতবড় হইবে এবং কথার ভারে নৈহাটীর ভাষা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে কি না, তিনি একবার ভাবিয়া দেখিবেন। মহারাজের বেলা রসের সার চুটকী, অথচ বাঙ্গালা কাব্যটা চুটকীতে অবসান হইবার ভয়ও তাঁহার আছে। সম্বোধনের মূল্য যাহাই হউক, শাস্ত্রী মহাশয়ের অনেক কাজের কথায় আমরা সায় দিতে পারি। বর্দ্ধমানের ইতি-কথায় ইতি দেওয়াই কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা ইতি কথা (অনর্থক কথা) মাত্র। বাঙ্গালা ভাষার কি অভিভাবক নাই? দর্শন হইতে ইতিহাসের পথে প্রাতে কবি দেবকুমার, প্রমথনাথ, কালিদাস ও হেমেন্দ্র বাবু প্রভৃতির সহিত একবার অর্দ্ধচক্রে বসিয়াছিলাম—ভৈরবী চক্রে নহে, আলোক চিত্র চক্রে। বন্ধুরা যূথভ্রষ্ট হইলে আমি বাসায়

ফিরিয়া আসিয়া চিন্তা করিতে বসিলাম। হরিদাস কলিকাতা চম্পট দিলেন। বিপিন বিকৃত মুখে ফিরিলে বুঝিলাম, একটা কিছু অনর্থ ঘটিয়াছে; একটু শান্ত হইলে রামকমল বলিল, একজন কে বৃদ্ধ গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু জনৈক উচ্চপদস্থ অভ্যর্থনার অভিভাবক তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, এ গাড়ীতে নয়, ইহা রায় বাহাদুর মহাশয়ের জন্য রাখা হইয়াছে। বৃদ্ধকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সেই বাবুটী আবার বলিলেন, এইটুকু পথ হাটিয়াই যান না কেন মহাশয়, দাঁড়াইয়া আছেন কেন? বিপিন কাছেই ছিল, রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিল, তুমিত বড় বেয়াদব দেখ্‌ছি। এই বৃদ্ধ হাঁটিয়া যাইবেন, আর গাড়ী রায় বাহাদুরের জন্য থাকিবে? বাবু তখন যোড় হাতে বলিলেন, 'অপরাধ হইয়াছে।'

অপরাহ্নে আবার বৈঠক বসিয়া যথারীতি কার্য্যারম্ভ হইল। সাহিত্য ও দর্শনের আসর পাশাপাশি। ইতিহাস ও বিজ্ঞান এক এক কোণে, তাহাদের বালাই নাই। দেখিলাম, দার্শনিক ও সাহিত্যের প্রবন্ধ পাঠকেরা পরস্পর আড়া আড়ি করিয়া ক্রমে গলা চড়াইয়া দিয়া মণ্ডপ বেশ গুলজার করিয়া বসিয়াছেন। দারুণ গ্রীষ্মে এই কালোয়াতদিগের মধুর কণ্ঠ শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতেছিল। প্রবন্ধেরই বা বাহার কত? কাহারও শ্বশুরসুত, কাহারও অনুগত, কাহারও পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র, কাহারও সম্পর্কিত আর কেহ সাহিত্য সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গৌরবান্বিত হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখে। সেই অপরাধে সাহিত্যমণ্ডপে সমবেত সাহিত্য-সেবিগণের মস্তকে কাঁঠাল রাখিয়া তাহারা যশের কোষের রসাস্বাদন করিবে। ৪র্থ শ্রেণীর মাসিক কাগজেও তাহার অনেক প্রবন্ধ ছাপিতে দিলে হয় ত ফিরাইয়া দেওয়া হইত, অথবা কাটিয়া ছাটিয়া বাদ দিয়া দশমাংশে গিয়া ঠেকিত। তাহা প্রকাশিত হইলেও পাঠকদিগের যাহার যেমন ইচ্ছা,সে পাতা না কাটিয়াই পত্রিকা পাঠ শেষ করিতে পারিতেন। কিন্তু এখানে কর্ম্মের ফেরে পোলাউ মতিচুরের লোভে সে সকল উদরসাৎ করিতে হইল। 'রাম নামের এমনই মহিমা।' তাই ললিতবাবু মন্তব্য করিতেছিলেন, সাহিত্য-শাখা আমাদের dead letter office, যত বেওয়ারিশ মাল ঐখানে মজুত। দর্শনের ডালে বন্ধুবর খগেন্দ্রনাথের 'বিশ্বের জাগরণ' শুনিবার আশায় দুইটী অপূর্ব্ব প্রবন্ধের অত্যাচার আমাদিগকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাহার একটী মুদ্রিত প্রবন্ধ বিতীর্ণ (না বিতরিত ?) হইলে দেখা গেল, বৈদ্যুতিক উপায়ে রোগবিশেষ চিকিৎসার বিজ্ঞাপন দেওয়াই উহার প্রধান উদ্দেশ্য।

যদুবাবু সভাপতির আসনে মাষ্টারি করিয়া প্রবন্ধ পাঠকদিগকে দুরস্ত রাখিয়াছিলেন। সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐতিহাসিক প্রবন্ধটী উপাদেয় হইয়াছিল। গজকচ্ছপ সংগ্রামের সময় আমরা দুরদৃষ্টক্রমে অনুপস্থিত ছিলাম, শুনিলাম, শাখা সভাপতি মহাশয় বেশ tactfully সেই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, নূতন বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণ যদি অনুসন্ধান করিয়া ও গর্ত্ত খুড়িয়া বল্লালসেনের কোন নিদর্শন বা আর কোনরূপ প্রমাণাদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তখন বিচার করা যাইবে।

অপরাহ্নে যদুবাবু (মজুমদার) ইস্তাহার দিলেন, আগামী বৎসর যশোহরে সম্মেলনের অধিবেশন হইবে—'সম্ভবতঃ মহারাজাধিরাজ

সভাপতি হইবেন। ইহাতে আমার মনে আনন্দ আর ধরে না, যেহেতু যশোহর আমার মথুরাপুরী। হেমেন্দ্র বাবুর মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল কেন বলিতে পারি না। আগামী বৎসর জানিতে পারা যাইবে, আমাদের সাহিত্যে প্রকৃত অনুরাগ কতটুকু।

সীতাভোগের পর কৈ ডিম্বে রুচি হইবে ভাল; ম্যালেরিয়া তত্ত্বের গবেষণাও পুরাদমে চালাইবার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

জলধর বাবু আমাদিগকে রাজশকটে তুলিয়া লইয়া বাসায় পৌঁছাইয়া দিলেন। ললিত বাবু তখন ভজহরিকে সঙ্গে লইয়া সাহিত্যরসে মগ্ন। জলধর বাবুর প্রায় আহার নিদ্রাত্যাগ; তিনি বলিলেন, মহারাজ বলিতেছিলেন, ‘জলধর, তোমার আর আমার মাতৃদায়।’ মহারাজ বর্দ্ধমানে জননী বঙ্গভাষার সেবায় পুরোহিত, তাঁহার মাতৃদায় ত বটেই। কবে সেই দিন আসিবে, যে দিন বঙ্গভাষার প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারী সাহিত্যের সেবাকে মাতৃদায় মনে করিতে পারিবেন?

নবম উল্লাস—মজলিস।

অপরাহ্নে সভা বসিবার পূর্ব্বেই সারদা বাবু, নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি বগুড়া হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া সম্মেলনে মিলিত হইলেন। আমাদের পাশের ঘর বগুড়া-ফেরতা গঙ্গাকুমার বাবু (পরিব্রাজক) এবং তাঁহার দুই একটী সঙ্গী অধিকার করিলেন। তাঁহাকে চিনিতাম না, অনেকক্ষণ বগুড়ার সভার কথা এবং আরও অনেক কথা লইয়া তাঁহার সহিত রসিকতা করিয়া সময় বেশ সুখে কাটিল। সন্ধ্যায় মজলিস বেশ জমকিয়া উঠিল। অমৃতবাজারের মৃণালকান্তি অসুস্থ হইয়া আসিয়া বসিলেন এবং রাখাল বাবু গভীর জল হইতে তত্ত্ব লইবারে ললিত বাবুর বৈঠকে আড্ডা দিতে আসিলেন। জলধর বাবুও আসিয়া আপ্যায়িত করিয়া গেলেন। মৃণালকান্তি বাবুর সহিত জনৈক বন্ধুর শিশির বাবুর জীবনের অনেক incidents ও episodes সম্বন্ধে আলাপ চলিল। ডাক্তার আসিয়া মৃণাল বাবুকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে টিউবের কুইনাইন heavy doseএ দিতে চাহিলাম। কিন্তু তিনি মাথা ধরায় ম্যালেরিয়ার প্রতীকার গ্রহণ করিলেন না, আমিও ডাক্তার থাকিতে অনধিকার চর্চ্চায় বিরত হইলাম। সে রাত্রিতে মৃণাল বাবু ভোজনের পর কম্পজ্বরে ভুগিয়া বর্দ্ধমান-ম্যালেরিয়ার একটু আস্বাদ পাইয়াছিলেন। চির-প্রফুল্ল রাখালবাবু পাষাণের কথা লিখিয়া অমর হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে দ্রোণ স্তূপের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ব্রিজ্জি দেশের নাম করিলেন। আমরা স্থানান্তরে সারণ জিলায় দিঘোয়ারার নিকট সতীস্থানকেই দ্রোণস্তূপ বলিয়া সন্দেহ করিয়াছি, তাঁহাকে সে কথা বলিলাম। বাঁকীপুরের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আমাদের ইঙ্গিত ধরিয়া আজ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে অগ্রসর হন নাই।

ভোজনের সময় ললিত বাবুর বিদ্রূপ-রহস্য বুঝিতে না, পারিয়া ডিরেকটার আফিসের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী কুঞ্জ বাবু তাঁহার সহিত একটু কথা কাটাকাটি করিয়াছিলেন। কোন এক সাপ্তাহিক সম্পাদকের কে এক আত্মীয় যুবক নাকি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া prominent হইয়াছিলেন। তিনি একটু রসিকতার চেষ্টা করিয়া ললিতবাবুকে বলিলেন, ললিত বাবু অনেক agitate করিয়া মাছের ঝোল আদায় করিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় উত্তর করিলেন, ‘সব জায়গায়ই একই রকম, যেমন প্রবন্ধ পাঠের বেলা, তেমনই ভোজনের

বেলা; যে কাজ গুছিয়ে নিতে পারে, সেই চালাক।' পরে জানা গেল, সেই ব্যক্তি চলিয়া যাবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়া সেদিন প্রাতেই প্রবন্ধ পাঠ সারিয়া লইয়াছিলেন।

দশম উল্লাস—প্রত্যাবর্ত্তন।

তৃতীয় দিনে ১১টায় বৈঠক বসিবার কথা। আমাদের সীতাভোগে অরুচি হইয়া গেল, অতএব আমরা প্রাতেই পলায়নের চেষ্টা দেখিলাম। বিপিন ১০টার ট্রেনে ভাগলপুরে যাইবেন, অতএব তাঁহাকে একটু বিরহবেদনায় অভিভূত করিবার অভিপ্রায়ে আমরা ৭টার ট্রেণে কলিকাতা ফিরিবার সঙ্কল্প করিলাম। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ব্যাগ নিজেই বহিয়া লইয়া ছুটিলাম। আসিবার কালে বিপিন আমাদিগকে অম্লান বদনে বিদায় দিলে আমি ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া বলিলাম, 'বিপিন তুমি আদৌ অভিভূত হইলে না?' জনৈক ভলাণ্টিয়ার ব্যাগ স্কন্ধে করিয়া যাইতে চাহিলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম—কিন্তু ব্যাগ দিলাম না। তিনি আমাদের অনুব্রজী হইলেন। কিছু দূর চলিয়াই একখানা নির্ম্মলবাগের মার্কমারা সম্মেলনের গাড়ী পাওয়া গেল। গাড়ী অনেক ঘুরিয়া বান্ধাঘাট ও সরোবরের পাশ দিয়া আমাদিগকে ষ্টেশনে লইয়া চলিল।

"সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটা-ভস্ম-ধারী সারি সারি।"

পথে ভলণ্টিয়ার তাঁহার নিজের বাসার কাছে নামিয়া গেলেন। অতএব তাঁরই প্রসাদে এক চক্র ঘুরিয়া আমাদের সহর দেখা হইয়া গেল। ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই দেখি, একখানা গাড়ী হুস করিয়া ছুটিয়া গেল। তার পরের ট্রেণে আমরা আসিব। ক্রমে মৃণালকান্তি আসিলেন, কিন্তু তিনি উপরের ক্লাশের লোক। আমাদের অষ্ট বজ্র অভাবনীয় ভাবে একত্র হইলেন। সকলেই একঘটী জল দিবেন ভাবিয়াছিলেন, সাহিত্য-সম্মেলনে রহিলেন কে?

সীতাভোগের রব শুনিয়া সম্মেলনে গিয়াছিলাম, অতএব সীতাভোগে রসনার প্রীতি সাধন করিয়া ষ্টেসন হইতে সীতাভোগের ছান্দা বান্ধিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। সদল শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ, কবি ভুজঙ্গধর, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি সকলেই আমাদের গাড়ী গুলজার করিলেন। প্রসূন-সম্পাদক নির্ম্মলবাগের ভূতের ভয়ের ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার বিবরণটী এই—

"তাঁহার কোন পরিচিত ডাক্তার বর্দ্ধমান ছিলেন। একদিন রাত্রিতে একটী লোক আসিয়া বলিল, তাহার স্ত্রী শয্যাগত—মুমূর্ষু। ডাক্তার গাড়ী করিয়া নির্ম্মলবাগে পৌছিলেন। উপরে উঠিয়া দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক কঙ্কালসার শয্যায় পড়িয়া আছে। সঙ্গের লোকটী তখন অদৃশ্য। স্ত্রীলোকটীকে পৃথিবীর কোন জীব বলিয়া মনে হইতেছিল না। তাঁহার মনে শঙ্কা হইবামাত্র চারি দিকে অট্ট হাস্য। তিনি যেমন সিঁড়ী দিয়া নামিতে যাইবেন, সেই কঙ্কাল স্ত্রীলোক উঠানে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া ডাকিতেছে! ডাক্তার কোন মতে বাড়ী আসিয়াই জ্বরে শয্যাগত হইলেন। সেই রোগেই তাঁহার ডাক্তারীলীলা শেষ হইল।" নির্ম্মলবাগের অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, এরূপ গল্পে গাড়ীতে আমাদের সময় কাটিল বেশ।

আমরা চলিয়া আসিলে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় এম-এ পরীক্ষা হইবে এবং অন্যান্য পরীক্ষায়ও বাঙ্গালার বহুল প্রচলন হইবে। ঘটিরাম পরীক্ষকদিগের পোয়াবার। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

নাকি জ্যোতিষ চর্চ্চার উন্নতির জন্য মাসিক দুইশত টাকা সাহায্য করিবেন,বঙ্গে মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে। সে যাহা হউক, আশা করি, পরিষদ আগামী বৎসর আর আমাদিগকে ডালে ডালে না ঘুরাইয়া এক এক বেলা এক এক বিষয়ের পূরা বৈঠক বসাইবার বন্দোবস্ত করিবেন। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ বাবু বলিতেছিলেন, এরূপ সম্মেলনে প্রত্যেক সংবাদ পত্রের চারিজন করিয়া সংবাদদাতা উপস্থিত না থাকিলে পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইবার উপায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখিবেন।

বর্দ্ধমানে আমরা এবার সাহিত্যরস সম্ভোগ করিতে গিয়াছিলাম। সে রসে বিভোর হইয়া যে চিন্তানিধি মাথায় করিয়া বহিয়া আনিয়াছি, তাহার পরিচয় একটু দিতেই হইবে, নচেৎ প্রবন্ধ অঙ্গহীন থাকিবে।

কেহ বলেন, রাজা মহারাজা সাহিত্যের আসরে আমরা চাই না, কেহ বলেন চাই। যাঁহারা চাইনা বলেন, তাঁহাদের ভয়, সাহিত্য-সেবকেরা ক্রমে চাটুকার হইয়া পড়িবে, সাহিত্যে স্বাধীনতা থাকিবে না, স্বাধীনতা-হীন সাহিত্য দেশের কোনই উপকার করিতে পারেন না। যাহারা চাই বলেন, তাঁহাদের যুক্তি, সাহিত্যে রাজা মহারাজার কৃপাকটাক্ষে ও পৃষ্টপোষকতাই চিরকাল শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। রাজা মহারাজা না থাকিলে প্রত্নতত্ত্বের ও সাহিত্য-পরিষদের মেও ধরিবে কে? আমরা সাহিত্য-সেবা করিব বটে, কিন্তু টোপ ফেলিয়া দুই এক জন গৌরীসেন যোগাড় করিয়া রাখা দরকার। আমরা বলি, যে যুগে সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার ছিল না, মুদ্রা যন্ত্র ছিল না, তখন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক রাজা মহারাজা ছিলেন। আজ কাল লোকমণ্ডলীই লেখকদিগের প্রকৃত patron. Dr. Johnson হইতে ইংলণ্ডের patron বদলিয়া গিয়াছে। তাই বলিয়া আমরা রাজা মহারাজাকে সাহিত্যের আসরে বরণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।* সাহিত্যে জাতিভেদ, বর্ণভেদ,পদভেদ বা বৃত্তিভেদ নাই। সাহিত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন শ্রেণীতে পদের, অর্থের ও আভিজাত্যের গৌরব ভুলিয়া বাণীর চরণের নির্ম্মাল্যকে শ্রেষ্ঠতম গৌরব মনে করিতে হইবে। বশিষ্ঠের আশ্রমে দশরথ যখন শান্তি ও উপদেশের জন্য যাইবেন, তখন তাঁহাকে রাজবেশ ছাড়িয়া রাখাল বেশে শিষ্যের ন্যায় যাইতে হইবে। আর বশিষ্ঠকেও বলি, তিনি যদি তেমনি করিয়া অভিপ্রায় ও স্বার্থ শূন্য হইয়া জগতের কল্যাণ কামনা করিয়া সাধারণের হিতের জন্য, আত্মার তৃপ্তির জন্য, আনন্দ বিতরণের জন্য সাহিত্যের পুরোহিত হইয়া দশরথের গৃহে যাইতে পারেন, তাহা হইলে দেখিবেন, সার্ব্বভৌমিক সম্রাটের কিরীট তাঁহার চরণ তলে লুণ্ঠিত হইবে। সাহিত্য-সেবকগণ Diogenesএর মত যদি বলিতে পারেন, “Stand a little on one side so that you may not keep the sun off me”, রাজা মহারাজা ও সেকেন্দারের মত বলিবেন, “If I were not Alexander, I would be Diogenes.” বিধাতা তোমাকে যে পদের ও বিত্তের সম্পদ দিয়া বড় করিয়াছেন, তুমি যদি সে গৌরব ভুলিতে না পার, আমরাও যে মস্তিষ্ক শক্তি ও প্রতিভার গৌরবে

---

* আমাদের মনে হয়, বর্দ্ধমান সম্মেলনের একটি আশু ফল গত ১৫ই এপ্রিলের ইংলিসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইংরাজ-ললনাদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে অনুরোধ।

গৌরবান্বিত হইয়াছি, তাহার সম্মান বজায় রাখিতে তোমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিব। পঞ্জাবকেশরী পুরু সেকেন্দারের চরণে পতিত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতে পারেন, কিন্তু Kalanos ও সাধু Mandanis তাঁহাকে তৃণজ্ঞান করেন নাই। আমরা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলিতেছি না। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিবাদ-ভঞ্জন করিবার প্রস্তাব করিতেছি মাত্র।

যাউক সে কথা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া আমরা সাহিত্যের মন্দিরে মিলিতে গিয়াছিলাম, হিংসা বিদ্বেষের হলাহল উদ্গিরণ করিয়া সেই ক্ষুদ্র দল লইয়াই আবার গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, মিলনের উদ্দেশ্য সফল হইল কই? তুমি নেতা—তোমার অর্থের মান, তোমার উপাধির মান, তোমার পদের মান, তোমার ক্ষমতার মান লইয়া তুমি অহংকারের ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতে দরবারে যাইবে, দরিদ্র সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে ঐক্য ও মিলন স্থাপন করিবে কে? এই সম্বন্ধে আমরা নিম্নে সম্পাদক কবি গিরিজানাথের (রাণাঘাটের বার্ত্তাবহ, ২৭শে চৈত্র, ১৩২১) মন্তব্য একটু উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আজকার মত আমাদের কথা শেষ করিতেছি,—

"বৈঠকের বাড়াবাড়ি—সম্মিলনের ছড়াছড়িই বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব। কংগ্রেসের বৈঠক—প্রাদেশিক সভার বৈঠক—সাহিত্য-সম্মিলনীর বৈঠক—ব্রাহ্মণ সভার বৈঠক—বিবিধ জাতি সমিতির বৈঠক—কত নাম করিব? বৎসরে মাস বাদ যায় না—যে মাসে কোন না কোন বৈঠক বা সম্মিলনী নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সম্মিলনের অন্ততম উদ্দেশ্য প্রীতির আদান প্রদান ও সখ্যবৃদ্ধির দিকে সম্মিলনীগুলির লক্ষ্য একেবারেই থাকে না। তাহার পরিচয়—কি সাহিত্য, কি সমাজ, কি রাজনীতি—সকল ক্ষেত্রে। সেই দলাদলি—সেই বিদ্বেষ—সেই বিতণ্ডা—সেই ভেদ সর্ব্বত্র। বর্দ্ধমানেও তাহার অভাব দেখিলাম না। সাহিত্যের পদমর্য্যাদা, আভিজাত্যের গৌরব—বিদ্যার অহঙ্কার যদি দেখিতে চাও, তবে একবার সাহিত্যমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখিও—সারস্বত সম্মিলনেও কি অবিনয়—কি অসৌজন্য—কি প্রগল্‌ভতার প্রভাব। কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠার লীলাভিনয়—কেবল আত্মপ্রকটনের প্রয়াস।" *

শ্রীরসিকলাল রায়।

---

* গত সংখ্যা নব্যভারতে পুরাতন প্রসঙ্গের পরিশিষ্ট নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাতে শ্রীযুত ভুবনমোহম সেন মহাশয়ের কথা বলিয়া যে অংশ 'কোটেশনের' মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, উহা তাঁহার নিজের লিখিত বিবরণ নহে। তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিয়া যে সকল উত্তর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, আমরা তাহার মর্ম্ম লিখিয়া লইয়া পরে উহা প্রবন্ধাকারে খাড়া করিয়াছিলাম। ইহাতে এক আধটুকু ভুল ভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নহে। প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি ভুবন বাবুর নিকট পাঠাইতে পারা যায় নাই। কোন কোন ব্যক্তিগত মন্তব্য সাধারণের নিকট প্রকাশিত হওয়া ভুবন বাবুর অভিপ্রেত ছিল না বলিয়া জানিতে পারিলাম। সুতরাং ঐরূপ মন্তব্য তাঁহার মুখের কথা বলিয়া প্রকাশিত হওয়াতে ভুবনবাবু মনে আঘাত পাইয়াছেন। ভুবন বাবুর নিকট আমরা চিরঋণী, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও ক্লেশের কারণ হইলে আমাদের পক্ষে দুঃখের কথা! অতএব উল্লিখিত প্রবন্ধে কোন ব্যক্তিগত মন্তব্য দ্বারা ভুবন বাবুর অথবা অপর কাহারও মনে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা থাকিলে, আমরা তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

নবজড়তত্ত্ব ।*

জড় পদার্থ আমরা সচরাচর কঠিন, তরল ও বায়ব্য, তিন অবস্থায় দেখিতে পাই। অনেক বস্তুই ইহার একাধিক অবস্থায় থাকিতে পারে। জলকে তুষার ও বাষ্পাকারে সহজেই পরিণত করা যায়, কিন্তু সাধারণ বায়ু তরল ও কঠিন করিতে সেরূপ সহজে পারা যায় না, অনেক ধাতুও সেইরূপ অতি কষ্টে বায়ু করা গিয়াছে। কতকগুলিকে এখনও সকল অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায় নাই।

চাপ প্রয়োগে সকল পদার্থেরই আয়তন হ্রাস হয়, তাপে প্রায়ই আয়তন বৃদ্ধি হয়; ইত্যাদি ব্যাপার দেখিয়া অনুমান করা হইয়াছে, কঠিন প্রভৃতি সর্ব্ব অবস্থায়ই জড় পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সমষ্টিতে গঠিত এবং অণুগুলি পরস্পর সংলগ্ন নহে, প্রত্যেক দুয়ের মধ্যে ব্যবধান আছে। চাপে ব্যবধান কমে, তাপে বাড়ে। অণুগুলি স্থির নহে, নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। পদার্থের কঠিন অবস্থার এই গতি সামান্য কম্পন মাত্র, তরলে কম্পনের সহিত স্থানান্তর গমনও আছে; বায়ব অবস্থায় বেগে স্থানান্তর গমনই অত্যধিক, তবে অণ্বন্তরে বা আধার পাত্রের গাত্রে আঘাত পাওয়ায় সর্ব্বদাই গতির দিক ও পরিমাণের পরিবর্ত্তন হইতেছে, কখনও এক ইঞ্চির শততম অংশের অধিক দূর সরল রেখায় হইতে পারে না।

রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগের নিয়ম সমূহ আবিষ্কৃত হইলে,—তার ব্যাখ্যার জন্য অনুমান করা হইল—অণুগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু দিয়া গঠিত এবং সেই পরমাণু অবিভাজ্য। একই মৌলিক পদার্থের পরমাণু পরস্পর সব সমান। ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর বিভিন্ন প্রকৃতি। নির্দ্দিষ্ট আয়তনের নির্দ্দিষ্ট মৌলিক পদার্থে কতগুলি পরমাণু আছে, তাহাও পণ্ডিতগণ গণিয়া ফেলিয়াছেন, হাইড্রোজেন নামক লঘুতম বায়ুর পদ্ম সংখ্যক পরমাণুর পরিমাণ এক রতির প্রায় পদ্মতম অংশ।

রাসায়নিকের এ গণ্ডীর ভিতর পরমাণু যেন এখন আর আবদ্ধ থাকিতেছে না। বিগত ২০।২৫ বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিক মহলে যে কাণ্ডকারখানা চলিয়াছে, তাতে যেন বোধ হয়, অণুরও 'অণীয়ান্' আছে, পরমাণুও বিভাজ্য। তাই বলিতেই এ প্রবন্ধ।

একটী কাচনলের দুই স্থলে দুই খণ্ড ধাতু প্রবেশ করাইয়া যদি তার ভিতর হইতে ক্রমশঃ বায়ু নিষ্কাশিত করা যায় এবং ধাতুখণ্ডদ্বয় সাহায্যে ভিতরে তাড়িত স্রোত চালিত করা যায়, দেখা যাইবে, বায়ুর চাপ যত কমিতে থাকে, ভিতরে দৃশ্যমান আলোক রাশি ততই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। চাপ একান্ত অল্প হইলে ভিতরে আলোক কিছুই থাকে না, কাচের গাত্র হইতে মাত্র হরিৎ-পীত-মিশ্র একরূপ আলোক বাহির হয়। ভিতরে বস্তুবিশেষ রাখিয়া বৈজ্ঞানিক এই অদৃশ্য আলোকের পথ দেখাইয়াছেন। বোধ হয় যেন বিয়োগ বা ঋণতড়িৎপ্রান্তস্থিত ধাতু খণ্ড হইতে তলের লম্বপথে সরলরেখায় কোন কিছু বাহির হইয়া সম্মুখস্থ কাচ গাত্রে বেগে আঘাত

---

* বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে taken as read.

করে এবং সেই আঘাত স্থল হইতেই ঐ হরিৎ পীতালোক বাহির হয়। পথে স্থূল ধাতু পত্রের ন্যায় কোনও বাধা থাকিলে কাচ গাত্রে তাহার ছায়া পড়ে, কেন না কাচের সে স্থান হইতে আর পূর্ব্বরূপ আলোক বাহির হইতে দেখা যায় না।

এই প্রবাহে রক্ষিত ধাতু খণ্ড উত্তপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ হয়, বায়ু চালিত ঘরট্টের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষ যুক্ত যন্ত্র ইহাতে আবর্ত্তিত হয়। তবেই এই প্রবাহে শক্তিরও প্রবাহ হয়। শক্তির প্রবাহ জগতে মাত্র দুইরূপে হইতে দেখা যায়। একরূপে বস্তুকণ সমূহ শক্তি লইয়া কামানের গোলার ন্যায় ছুটিয়া যায়, অন্যরূপে প্রবাহের গতিতে কোন বস্তুর স্থানান্তর গতি হয় না, শুধু শক্তিরই হয়। দ্বিতীয় প্রকারের প্রবাহকে তরঙ্গ বলে। তরঙ্গ কি, আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। এক পথে অবস্থিত বস্তু সমূহের প্রত্যেকেরই যদি একইরূপ কম্পন গতি বা একইরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু এইরূপ কম্পন বা অবস্থা পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভ যদি সকল বস্তুর একই সময়ে না হইয়া একের পর এক এইরূপ পর পর হইয়া যায়, তবে সেই বস্তু সমূহের ভিতর দিয়া ঐ রূপ কম্পন বা অবস্থা পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে বলা হয়। সাধারণতঃ তরঙ্গ বলিতে আমরা জলের উপর দিয়া জল কণার বৃত্তাকার গতির তরঙ্গই বুঝি। কম্পন গতির দিক অনুসারে তরঙ্গ তিন ভাগে বিভক্ত। অগ্র পশ্চাৎ কম্পন তরঙ্গ, যেমন বায়ু বা অন্য বস্তুতে শব্দতরঙ্গ। পার্শ্ব কম্পন তরঙ্গ, যেমন ব্যোমে আলোক তরঙ্গ, বিকীর্ণ তাপতরঙ্গ এবং তারহীন তাড়িত বার্ত্তাবহ ব্যোমতরঙ্গ। এতদুভয় কম্পনের মিশ্রণে গতির তরঙ্গ, যেমন জলের তরঙ্গ। শেষোক্ত তরঙ্গের জলকণাগুলির উত্থান পতন অগ্র পশ্চাদ্‌ গমন দুই-ই হয়। কোন প্রকার তরঙ্গেরই শক্তিবহ বস্তুকণার কোনটাই স্থিরাবস্থার স্থান হইতে অধিক দূরে যায় না, ইতস্ততঃ ঈষন্মাত্র চলাচল করে মাত্র। জল তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত তৃণের প্রতি মনোযোগ দিলে একথা বেশ বুঝা যায়। শ্রেণীবদ্ধ লোকের সম্মুখ দিয়া সংএর গাড়ী চলিয়া গেলে সংদর্শন মাত্র প্রতি লোকে যে হাস্য করে, তাহাতে লোকের ভিতর দিয়া এক হাস্যতরঙ্গ চলিয়া যায়, বলা যাইতে পারে।

কোনও চৌম্বক বা তাড়িত বল ক্ষেত্রেই আলোকের ন্যায় কোন তরঙ্গ-প্রবাহের গতির দিক পরিবর্ত্তন হয় না। তড়িদ্‌ যুক্ত বস্তু কণার স্রোত মাত্র এ অবস্থায় দিক্‌ পরিবর্ত্তন করে। আমাদের বিরল বায়ু কাচ নলে ঋণ প্রান্ত হইতে যে প্রবাহ সরল পথে প্রবাহিত হয়, তাহা তাড়িত বা চৌম্বক বল ক্ষেত্রে দিক্‌ পরিবর্ত্তন করে। উহা তবে কোন তড়িত্বান্‌ বস্তুকণার স্রোত। বলক্ষেত্রে প্রবাহ কোন্‌ দিকে বক্র হয়, তাহা দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই কণা ঋণতড়িত্বান্‌। ইহা যখন ঋণপ্রান্ত হইতে আগত, তখন ইহাই হওয়া স্বাভাবিক।

পণ্ডিতগণ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, এই বস্তুকণাগুলি পদার্থের অণুমাত্র। তবে বায়ব্য অবস্থায়ও অণু সরল রেখায় এতদূর যাইতে পারে না, তাই তাঁহারা মনে করিলেন, ত্রিদশ বস্তুর এ এক তুরীয় বা অতিবায়ব্য অবস্থা। ইহাতে অণুর অণ্বন্তরের সহিত আদৌ সাক্ষাৎকার হয় না বলিলেই চলে। সুতরাং আধার গাত্রে না পৌঁছিলে গতি পরিবর্ত্তনও হয় না।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, চৌম্বক বা তাড়িত

বল ক্ষেত্রে ইহাদের গতির দিক পরিবর্ত্তন হয়। বস্তুকণাগুলি যখন ছুটিয়া আসে, তখন ঋণ তড়িৎ লইয়া আসে, সে তড়িৎ টুকু কাচ নলে রক্ষিত উপযুক্ত পাত্রে সংগ্রহ করা যায়। এই তাড়িত পরিমাণ এবং চৌম্বক ও তাড়িত বলক্ষেত্রে প্রবাহপথের বক্রতা পরিমাণ প্রভৃতি দেখিয়া কণাগুলির গতির বেশ গুরুত্ব এবং কণাবাহিত তাড়িৎ সকলেরই পরিমাণ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, এই কণা পরিমাণ লঘুতম বায়ু হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা অন্ততঃ সহস্র গুণ কম, তবে এ পরমাণুরও অংশ আছে। নলমধ্যস্থ বা ঋণ তড়িৎ প্রান্তস্থ ধাতুর পরিবর্ত্তনে তাড়িৎকণ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

প্রবাহ নলগাত্রে যে স্থানে আঘাত করে, সেখানে কাচ না থাকিয়া যদি পাতলা এলুমিনিয়ম পত্র থাকে,তবে এই স্রোতকে বাহিরে লইয়া আসা যায়। তড়িৎকণ তবে ধাতুপত্র ভেদ করিতে পারে, পরমাণু কিন্তু পারে না। বাহিরে আসিলেও স্রোত ভিতরের ন্যায়ই সরল পথে থাকে এবং তাড়িত চৌম্বক বলক্ষেত্রে বক্র হয়। বাহিরে ইহার আরও কতকগুলি ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। অ-তড়িদ্বহ সাধারণ বায়ু এই প্রবাহে তড়িদ্বহ হয়। বায়ুর তড়িদ্বহীকরণ আরও কতিপয় উপায়ে হইয়াছে।

বহুকাল হইতেই জানা আছে, তড়িত্বান্ বস্তুর দ্রুত গমনে তাড়িত স্রোতের ন্যায় কার্য্য হয় এবং তাড়িত স্রোতের চৌম্বক বল ক্ষেত্র আছে। সুতরাং এক তড়িৎকণ হইতে স্থির তড়িৎ, তাড়িৎ স্রোত এবং চুম্বক তিনেরই ব্যাখ্যা করা যায়। তড়িৎকণ নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র পথে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিলে পার্শ্বে যে তরঙ্গাকারে শক্তির বিকিরণ হইবে, ইহাও গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে দেখান যায়। তবে আলোক, বিকীর্ণ-তাপ প্রভৃতির উৎপত্তিও এই তড়িৎকণ হইতে হইল। শুধু তাই নয়, সূক্ষ্ম রন্ধ্রে আগত কোন নির্দ্দিষ্ট ধাতু কল্পের বিকীর্ণ আলোক কাচ-ফলকের ভিতর দিয়া দেখিলে যে স্থলে একটী মাত্র রেখা পাওয়া যায়, আলোক পথ চৌম্বক বল ক্ষেত্রে থাকিলে তার বহুত্ব কেন হয়, শুধু বর্ত্তমান অনুমানেই তার ব্যাখ্যা হইয়াছে।

কোন বস্তু কোন পথে লইতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন, চৌম্বক, তাড়িত বল ক্ষেত্রে না হইলেও সেই বস্তু তড়িত্বান করিয়া সেই পথে ততদূর লইয়া যাইতে তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তির প্রয়োজন। কারণ এই কার্য্যে উৎপন্ন চৌম্বক বলক্ষেত্রের জন্য শক্তির প্রয়োজন। যেন তড়িত্বান্ হইলেই বস্তুর বস্তুপরিমাণ বাড়িয়া যায়। বেগ বৃদ্ধির সহিত এই অতিরিক্ত বস্তু পরিমাণ বোধের বৃদ্ধি হয়। তড়িৎকণ সম্বন্ধেও এই সত্যের পরীক্ষা হইয়াছে। রেডিয়াম্ প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত কয়েকটী ধাতু হইতে সর্ব্বদাই অন্যান্য বস্তুর সহিত ঋণতড়িৎকণ নির্গত হইতেছে। সকল কণার সমান বেগ নয়। দেখা গিয়াছে, যে কণার বেগ কম, তার সম্বন্ধে বস্তু পরিমাণ বোধও কম। তবেই তড়িৎকণের বস্তুপরিমাণ অন্ততঃ অংশতঃ ইহার বেগ ও তড়িৎটুকুর উপর নির্ভর করে। অনেক পণ্ডিত বলেন, অংশতঃ না বলিয়া সর্ব্বতোভাবে বলিতেই বা কি আপত্তি? ইহাঁদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। তাই যদি হয়, আর পরমাণু যদি নিয়ত ভ্রমণশীল তড়িৎকণ দিয়া গঠিত মনে করা যায়, তবে ত শুধু এই তড়িৎকণের ধর্ম্মেই পরমাণুর এবং তৎশক্কের পরমাণুসমষ্টি বস্তুর ও বস্তুপরিমাণ বোধ হইতে। তাহা

হইলেই এক ক্ষুদ্র তড়িৎকণ হইতে স্থির তড়িৎ, তাড়িত স্রোত, চুম্বক, আলোকের ন্যায়, বস্তুমাত্রের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বস্তুপরিমাণ বোধের ব্যাখ্যা হইল। এ সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা গবেষণা চলিতেছে।

ঋণ তড়িতের কথাই এতকাল বলিয়া আসিতেছি। যোগ তড়িতের কথা ত কিছুই হইল না। যোগ তড়িৎকণ পরমাণুর অধিকাংশ হইতে এখনও বিশ্লিষ্ট করা যায় নাই। যাইবে কি না, কে জানে? এখনকার অনুমান এই যে, পরমাণু বিশ্লিষ্ট হইলে যখন এক বা একাধিক ঋণতড়িৎকণ বাহির হইয়া যায়, তখন তার অবশিষ্টাংশই যোগ তড়িদ্বহ। ইহার পরিমাণ করিতে যাইয়া পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, ইহা প্রায় পরমাণু পরিমাণের সমান। যদি সহস্র যোগ তড়িৎকণ এবং সহস্র ঋণতড়িৎকণ লইয়া কোন পরমাণু গঠিত হয়, তার দুটী কি একটী ঋণতড়িৎকণ বাহির হইয়া চলিয়া গেলে বাকী ৯৯৮ বা ৯৯৯ ঋণ তড়িৎকণ এবং সহস্রের সকল যোগ তড়িৎকণ লইয়া পরমাণুর অবশিষ্টাংশ যোগ তড়িদ্বহ।

এখন জিজ্ঞাস্য, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু কি একই প্রকার যোগতড়িৎকণ এবং একই প্রকার মাত্র ঋণতড়িৎকণ দিয়া গঠিত? তাহাতে বিচিত্রতা কি আছে? বিভিন্ন পরমাণুতে বিভিন্ন সংখ্যক তড়িৎকণ থাকিতে পারে, বিভিন্ন পরমাণুতে তড়িৎকণ বিভিন্ন প্রকারে ভ্রমণ করিতে পারে। পূর্ব্ব হইতেই, বিভিন্ন পরমাণুর, আপেক্ষিক গুরুত্ব লইয়া, রাসায়নিক পণ্ডিত মৌখিক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ করিয়া, বলিয়া আসিতেছেন—"বর্ত্তমান মৌলিক পদার্থগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সূক্ষ্মতর মৌলিক পদার্থের যোগে উৎপন্ন বলিয়া সন্দেহ হয়।" তড়িৎকণ তত্ত্ব তড়িৎকণরূপ মহাভূতদ্বয়কে সকলভূতের উপাদান সেই সূক্ষ্মতর মৌলিক পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে।

এ অনুমানে বিশ্বাস স্থাপন করিবার আরও হেতু আছে। পূর্ব্বোক্ত রেডিয়ম নামক নবাবিষ্কৃত ধাতু হইতে নিয়ত ঋণতড়িৎকণ স্রোতের সহিত, সূক্ষ্মতর যোগ তড়িদ্বহের স্রোত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হিলিয়ম নামক অন্য এক মৌলিক পদার্থের স্রোতও বাহির হয়। বিশুদ্ধ রেডিয়ম হইতে অন্যবিধ বিশুদ্ধ মৌলিক পদার্থ হিলিয়মের উৎপত্তি! এরূপ অন্যান্য উদাহরণও আছে। নূতন অনুমান মতে ইহার ব্যাখ্যা অতি সহজ। দুই বস্তুই যখন একই উপকরণে গঠিত, তখন এক হইতে অন্যের উৎপত্তিতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। রজত হইতে তবে অন্যধাতু নির্ম্মাণ হয় ত অসম্ভব নয়, সেই অন্য ধাতু স্বর্ণ বা তাম্র, অবশ্য জানি না। স্বর্ণ হইলেও খনিজ স্বর্ণ হইতে গৃহজ স্বর্ণ সুলভ হইবে কি না, তাহাও বিবেচ্য।

তড়িৎকণ হইতে জগতের নানা ব্যাপার ব্যাখ্যাত হইল, ইহা পরমাণুর ভিতরেই আছে, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু পরমাণু হইতে বিশ্লিষ্ট না হইলে ত ইহা দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। বিশ্লিষ্ট হইতে হইলে কি আমাদের কাচনলের ভিতরে মাত্র হইবে? তড়িৎকণের উৎপত্তি অসংখ্য উপায়ে হয়। কাচনলে প্রথমে ইহার পরিচয় হইয়াছে বলিয়া এতকাল কাচনলের কথা বলিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত বায়ুর তড়িদ্বহীকরণ আর কিছুই নয়—শুধু বায়ুর অণুপরমাণু হইতে তড়িৎকণের বিশ্লেষ। যেরূপেই হউক, পরমাণু বেগে আহত হইলেই তাহা হইতে দুই একটী তড়িৎকণ ছুটিয়া যায়। তড়িৎকণ

ছুটিয়া অন্য পরমাণুকে আঘাত করিলে, দ্বিতীয় পরমাণু হইতে আবার তড়িৎকণ বাহির হইবে। কখন কখন এক তড়িৎকণ এক যোগ-তড়িদ্বহের সহিত মিশিয়া পরমাণু প্রস্তুত করিতে পারে। পরমাণু এইরূপে অনবরত ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে। কাচনলের গাত্রে যে স্থান হইতে আলোক বাহির হয়, সে স্থান হইতে রঞ্জন কিরণ নামক একরূপ তরঙ্গ বাহির হইয়া বায়ুকে এইরূপে তড়িদ্বহ করিয়া থাকে, তরঙ্গে আহত হইয়া বায়ুর পরমাণু ভাঙ্গিয়া যায়। দুইটী বিভিন্ন বস্তু শুধু পরস্পর স্পর্শ করিলে উভয়ের কতকগুলি পরমাণু ভাঙ্গিয়া তড়িৎকণের উৎপাদন করে, তাই একটী ঋণতড়িৎকণের ও অপরটী যোগ তড়িত্বান্ হয়। রেডিয়ম প্রভৃতি পূর্ব্বের ধাতুর পরমাণু স্বতঃই ভাঙ্গিতেছে ও তড়িৎকণ প্রস্তুত করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নব পরমাণুও সৃজন করিতেছে।

শ্রীরামেন্দ্রনাথ ঘোষ।

কুম্ভমেলা।

বহুকাল হইতে কুম্ভমেলা দেখিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের কোণে লুক্কায়িত ছিল। এবার সুযোগ বুঝিয়া সেই বাসনাটী আরও প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং শত বাধা অতিক্রম করিয়া অবশেষে সত্য সত্যই আমি হরিদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আশৈশব সাধুদিগের অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগের অমানুষিক বিভূতি প্রদর্শনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া, সাধু মহাত্মাদিগের প্রতি এমনি একটা অজ্ঞাত ও অননুভূত আকর্ষণ আমাদিগের অস্থিমজ্জার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে যে, প্রতিদিন তাঁহাদের শত শত অসাধু ব্যবহার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াও, ভাল সাধু সন্ন্যাসীর নাম শুনিবা মাত্র প্রাণ স্বতঃই তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। কুম্ভমেলার ইতিবৃত্তে অনেক সাধু মহাত্মার নাম এবং তাঁহাদিগের অলৌকিকত্বের কাহিনীও পাঠ করিয়াছিলাম। প্রত্যক্ষ দর্শন ও সংবাদ পত্র পাঠে কল্পনায় দর্শন আকাশ পাতাল প্রভেদ। যদিও সুনিপুণ শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্যে অনেক সময়ে কল্পনা বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া উঠে, কিন্তু তথাপি কল্পনা প্রাণহীন কল্পনা বই আর কিছুই নয়; বাস্তবতার সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। এবার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিব ভাবিয়া মনে খুবই আনন্দ হইল। সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি সাড়ে আটটা, কোন দিন বা নয়টা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাধু-দর্শন করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, নয়টার পর আর লোক চলাচল বড় একটা থাকিত না। ৪ঠা এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ১০ দিন হরিদ্বারে ছিলাম; প্রায় প্রতিদিনই এইরূপ ঘুরিতাম। কত সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসী দেখিলাম, কেহ বিভূতি-ভূষিত-কলেবর, কেহ বা জটাজুট-সমন্বিত-বস্ত্রাচ্ছাদিত, অর্দ্ধ নগ্ন বা সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কেহ শরীর বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, কেহ বা স্বামীজিদের মত সুন্দর সজ্জায় বিভূষিত, কেহ শরশয্যারূঢ়, কেহ ঊর্দ্ধবাহু, কেহ বৃক্ষ শাখায় দোলায়মান রজ্জুবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডোপরি বাহুদ্বয় স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান ও মৌনী রহিয়াছেন, কেহ বা

সমস্ত দিন যাগ-যজ্ঞ-নিরত, কেহ বা গঞ্জিকা দেবীর সেবায় অহর্নিশ বিভোর (বলা বাহুল্য ইহাদের সংখ্যাই অধিক), কেহ রাস্তায় রাস্তায় বা গৃহে গৃহে পয়সার জন্য যাত্রীদিগের নিকট বারংবার কাতর প্রার্থনা করিতেছেন, কেহ বা সুযোগ সুবিধাটা পাইলে তাহার সদ্ ব্যবহারও করিতেছেন, কত শত জন ভিক্ষার জন্য সারা দিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, অথচ কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতেছেন না, দল বাঁধিয়া ওঁ ওঁ শব্দ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকের লোকদিগকে চমকিত করিয়া একবার উপস্থিত হইতেছেন এবং পর মুহূর্ত্তেই আবার পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছেন। এ সমস্ত দলে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই আছেন। কত শত সন্ন্যাসী হরিদ্বারের দারুণ শীতে গঙ্গার তীরে অনাবৃত দেহে ধূনোর আগুন মাত্র সম্বল করিয়া বা তাহাও না পাইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, আবার কত শত জন বা রাজার হালে পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ান রহিয়া অসংখ্য শিষ্যবৃন্দ দ্বারা পরিসেবিত হইতেছেন। অধিকাংশ সন্ন্যাসীই কলিকাতার গঙ্গাতীরবাসী গঞ্জিকা-সেবী সন্ন্যাসীবৃন্দের ন্যায়। যাঁহার শিষ্য সংখ্যা যত অধিক, তিনি তত বড়, প্রথমতঃ আমাদের এইরূপই মনে হইয়াছিল; ক্রমে বুঝিলাম, যিনি যত বড় বড় লোক শিষ্য করিতে পারিয়াছেন, তিনি তত বেশী বড়। যাঁহাদের রাজা মহারাজা শিষ্য আছেন, তাঁহারা হয় ত দিবসে একাধিকবার হস্তি-পৃষ্ঠে বহির্গত হইয়া শোভা-যাত্রা করিয়া থাকেন, আর যাঁহাদের সেইরূপ সুবিধা নাই, তাঁহারা কদাচিৎ আশ্রমের বহির্ভাগে অশোভন ভাবে দৃষ্ট হন। মোটামুটি সাধু সন্ন্যাসীর কথা এই পর্য্যন্ত বলিলেই । আমি যেখানে ছিলাম, সেখানে নোয়াখালী জেলার একটী বাবু ছিলেন; কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—"আজ ২৪ দিন যাবৎ প্রতিদিন ১০ মাইল করিয়া ঘুরিতেছি; কতই ঘুরিলাম, কত সাধু সন্ন্যাসীই দেখিলাম, কিন্তু হায়, কোথাও ত প্রাণ গলিল না।" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—শুনিয়াছিলাম রাজারা হাজার হাজার টাকা লইয়া সাধুদের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হন, তাঁহারা অনাবশ্যক বোধ হইলে সময় সময় তাহা অগ্রাহ্য করেন, হাজার হাজার কম্বল ও বহু খাদ্য দ্রব্যও অনাবশ্যক বোধ হইলে উপেক্ষিত হইয়া থাকে ইত্যাদি। এমন কোথাও কিছু দেখিলেন কি ?" আমরা অনেকগুলি বাঙ্গালী, মহাত্মা ভোলানন্দ স্বামীর সেবাশ্রমে বাস করিতাম। প্রতি রাত্রেই কে কোথায় কি দেখিয়াছি, তাহার আলোচনা হইত; কিন্তু কৈ এমন একটা ঘটনার কথা একদিনও কারো নিকট শুনিতে পাইলাম না। তবে একটা কথা আছে—এ সব যে দেখিব, এমন সুকৃতি আমাদের কি আছে? মহাপুরুষ হয়ত অনেক আসিয়াছিলেন, কিন্তু এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, তাঁহাদের দর্শন পাইব, বা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিব। মহাপুরুষগণ নাকি ছদ্ম বেশে ঘুরিয়া বেড়ান, যাঁহার তেমন কপাল, সেই মাত্র দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। এইরূপ কথাবার্ত্তা ও মনোভাব লইয়াই প্রতি রাত্রে আমাদিগকে শয্যায় আশ্রয় লইতে হইত।

সৌভাগ্যক্রমে যে কয়জন সাধু মহাত্মার নিকট আমরা বিশেষ ভাবে গমন করিয়াছিলাম, তাঁহাদের বিষয় সব শেষে কিছু কিছু বলিব। সর্ব্বাগ্রে কুম্ভমেলার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহা ও হরিদ্বারের বিষয় কিছু বলি।

কুম্ভমেলার পৌরাণিক কাহিনী—দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন। মন্থন করিতে করিতে সর্ব্বপ্রথমে গরল উত্থিত হইল। সেই গরল পান করিয়া ভোলানাথ নীলকণ্ঠ হইলেন। যখন অমৃত উত্থিত হইল, তখন দেবতাদের প্ররোচনায় দেবরাজ-পুত্র জয়ন্ত সেই অমৃত-কুম্ভ হরণ করিলেন, (ভাল জিনিষের লোভ দেবতাগণও সামলাইতে পারেন না) অসুরগণই বা ছাড়িবে কেন? প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া সমুদ্র মন্থন করা হইল, যখন অমৃত উত্থিত হইল, তখন দেবতাগণ তাহা হরণ পূর্ব্বক একাকী পান করিবেন? তাও কি প্রাণে সহ্য হয়? অসুরগণ আসুরিক বিক্রমে জয়ন্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। জয়ন্ত বেচারা লুকোচুরি খেলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে এক এক স্থানে কুম্ভটীকে লুকাইয়া রাখিতে লাগিল এবং যখনই অসুরগণ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উপক্রম হইতে লাগিল, তখনই পুনরায় কুম্ভটী লইয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। এইরূপে দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে ভগবান বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া অসুরদিগকে বঞ্চনা পূর্ব্বক দেবতাদিগকে অমৃত পান করাইয়া বিবাদের অবসান করিলেন। অমৃত-কুম্ভ লইয়া পলাইবার সময় হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী, এই চারি স্থানে উহাকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। সেই চারি স্থানেই বার বৎসর পরে পরে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে।

হরিদ্বার—হিন্দুর তীর্থমাত্রই অসংখ্য দেবদেবীর মন্দিরে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বত্রই পঙ্গপালের মত অসংখ্য পাণ্ডার দল যাত্রীদিগকে অস্থির করিয়া তুলে। হরিদ্বারে দেবমন্দির ও পাণ্ডা নাই বলিলেই হয়। ভীম গোড়ায় শিবলিঙ্গ ও তৎসংলগ্ন সূর্য্য-কুণ্ড, পাহাড়ে শিবলিঙ্গ, চণ্ডীর পাহাড়ে কালীমূর্ত্তি এবং কনখলের ওদিকে দক্ষকুণ্ড ও সতীকুণ্ড, এই কয়টী মাত্র উল্লেখযোগ্য দেবদেবীর মন্দির। আমাদের দেশস্থ একজন যাত্রী একদিন বলিয়া ফেলিলেন, "কৈ, এখানে দেবদেবীর মন্দির নাই, তবে কি দেখিব?" দেবদেবীর মন্দির না দেখিলে আবার অনেকের মন উঠে না। নয়ন-মুগ্ধকর প্রাসাদ বা অট্টালিকাদিও নাই; বোটানিকেল গার্ডেন বা ইডেন গার্ডেন ইত্যাদির ছোট খাট অনুকরণও কুত্রাপি নয়নগোচর হইল না। একটী মাত্র বড় রাস্তা ষ্টেসন হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর হরিদ্বারের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার ধারেই ছোট খাট একটী পোষ্ট আফিস; গঙ্গার ধারে ধারে "ব্রহ্মকুণ্ড" হইতে কতক দূর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আছে; পরে তাহাই আবার বাজারের রাস্তার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। বাজার বলিতে দুপাশে কয়েক খানা দোকান বই আর কিছুই নয়। কুম্ভমেলার সময় অবশ্য অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী সমবেত হয় বলিয়া অসংখ্য যাত্রীও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে যায়; কিন্তু অন্য সময় লোক যায় কেন? এই হরিদ্বারের এত নামই বা কেন? তাহার একমাত্র কারণ হরিদ্বারের অতুল সম্পত্তি—গঙ্গা। এক গঙ্গা সত্য সত্যই সমস্ত হরিদ্বারকে স্বর্গদ্বার করিয়া রাখিয়াছে। কি সুন্দর গঙ্গা! কার লেখনী এত শক্তিশালিনী যে, সেই গঙ্গাকে চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতে পারে? কি প্রাণস্পর্শী চিত্তোন্মাদক অশ্রান্ত কল কল রব—শুনিতে শুনিতে মহাপাষণ্ডেরও প্রাণ যেন দৃশ্য জগৎ

---

* এইস্থানে অমৃত-কুণ্ড লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। ইহা গঙ্গার পার্শ্ব-সংলগ্ন কতকটা বৃত্তাকার গঙ্গারই অংশ বিশেষ। এখানেই যাত্রীগণ স্নান করে।

অতিক্রম করিয়া কোন্ এক অদৃশ্য স্বর্গরাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হয়। এমন অপূর্ব্ব মধুমাখা কল কল রব জীবনে কখনও শুনি নাই, হয় ত আর নাও শুনিতে পারি। 'কল কল রব' "তর তর বেগে" ইত্যাদি বাক্য গ্রন্থে পড়িয়াছি, কত সময় নিজেরাও লিখিয়াছি, কিন্তু এবার বুঝিলাম 'কল কল রব', 'তর তর বেগের' অর্থ কি? কোথায় কল্পনা, আর কোথায় বাস্তবতা! এক গঙ্গাই সমস্ত হরিদ্বারের প্রাণ! তাঁর কি নৃত্য! কি হাসি! কি চাঞ্চল্য! কি রঙ্গ! কি খেলা! সরলা সুন্দরী বালিকার ন্যায় সে অবিশ্রান্ত ছুটিতেছে, নাচিতেছে, সোহাগ ভরে এর ওর গায় ঢলিয়া পড়িতেছে, যে দেখিতেছে, সে-ই মুগ্ধ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় কিছুকাল দণ্ডায়মান না থাকিয়া পারিতেছে না! তাহার চক্ষু মন বুঝিবা সবই সেই খেলা দেখিতে দেখিতে কোন এক অপার্থিবলোকে কি এক অপূর্ব্ব লীলা-সাগরে বিলীন হইয়া যাইতেছে! কি স্বর্গীয় দৃশ্য! আর তার জল?—সে যেন সত্য সত্যই ভগবৎ-পাদ-নিসৃত প্রেম-ধারা। এমন স্ফটিকবৎ আবিলতালেশশূন্য সলিলরাশি ত আর কোথায়ও দেখি নাই? স্বচ্ছ সলিলরাশি হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে; কোথায়ও প্রস্তরখণ্ডগুলিকে সজোরে আঘাত করিতেছে; কোথায়ও তাহাদিগকে উল্লম্ফন করিয়া আবার দ্রুতগতি ছুটিতেছে; কোথায়ও বা তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে; আবার কোথায়ও বা একটুকু বাধা পাইয়া রাগে ফুলিয়া উঠিতেছে; কি সুন্দর সে খেলা, দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। সমস্ত হরিদ্বারে যদি আর কিছুই না থাকিত, তথাপি এক গঙ্গাই হরিদ্বারকে আনন্দময়, মধুময় ও প্রাণময় করিয়া রাখিত। কোথায় কলিকাতার গঙ্গা, আর কোথায় হরিদ্বারের গঙ্গা! কলিকাতার গঙ্গা আবিলতাময়ী স্রোতস্বিনী, আর হরিদ্বারের গঙ্গা স্বচ্ছ, স্ফটিকবৎ সলিলবিশিষ্টা হৃদয়-প্রাণ-মন-তোষিনী। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না, হরিদ্বারের গঙ্গার দিকে তাকাইলে মুগ্ধ হইতেই হইবে। এই জন্যই বুঝিবা সাধু-মহাত্মারা গঙ্গার এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তার পর সেই জল আবার কি শীতল—ঠিক যেন বরফ; যতই পান করিবে, ততই আরো পান করিতে সাধ যাইবে; ইচ্ছা হইবে সমস্ত গঙ্গা এক চুমুকে নিঃশেষিত করিয়া ফেলি; অথচ বেশী জল পান করিলে, অসুখ হওয়া ত দূরের কথা, বরং বেশী ক্ষুধারই উদ্রেক হয়; এমনি সে জলের অপূর্ব্ব হজমী শক্তি!

মিউনিসিপালিটি—মিউনিসিপালিটির ব্যবস্থা অতি সুন্দর। প্রত্যেক বাড়ীতে অনেকগুলি করিয়া পায়খানা এবং তাহা আলকাতরা দ্বারা বিশেষ ভাবে লিপ্ত; ধাঙ্গর অবিশ্রান্ত দণ্ডায়মান। পায়খানা হইতে একজন লোক উঠিয়া যাওয়া মাত্র তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে। সব পায়খানায়ই বাল্টী পাতা। এতদ্ব্যতীত বস্তি হইতে দূরে দূরে চেটাই দিয়া ঘেরাও করিয়া স্ত্রীলোক ও পুরুষদের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনেকগুলি নূতন পায়খানা সহরের চারিদিকেই প্রস্তুত করান হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই একাধিক ধাঙ্গর অনবরত দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহা পরিষ্কার করিতেছে। মিউনিসিপালিটির লোক ঘুরিয়া ঘুরিয়া এসব তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং কিঞ্চিৎমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হইলে বেচারা ধাঙ্গরকে বেশ দুই এক ঘা বসাইয়া দিতেছেন। ধাঙ্গরগণ কোনওরূপ বক্সিস্ চাহিতে পারিবে না, সর্ব্বত্র ইহা

ঘোষিত হইয়াছিল। কলিকাতার চৌরঙ্গীর রাস্তার মত ধাঙ্গরগণ অবিশ্রান্ত রাস্তার খড়কুটা কুড়াইতেছে।

পুলিশ—কনেষ্টবলগণ একটুকু দূরে দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া এক দিক দিয়া যাওয়ার ও অপর দিক দিয়া আসার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। কিছু দূর ব্যবধানেই কনেষ্টবলগণের এক একটা আড্ডা স্থাপিত হইয়াছে। সদয়-হৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বত্র ঘুরিয়া সব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। বাস্তবিকই এখানে মিউনিসিপালিটির ও পুলিসের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি! সত্য বলিতে কি, সকলেই এক বাক্যে গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা করিয়াছেন। শুনিয়াছি, প্রয়াগে নাকি গঙ্গার চড়ার উপরে এক স্থানেই সন্ন্যাসীগণের সমাবেশ হইয়াছিল; কিন্তু হরিদ্বারে তাহা হইতে দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ বহু দূরে দূরে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে দক্ষকুণ্ডের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার উভয় তীরে দূরে দূরে সন্ন্যাসীগণ আশ্রম স্থাপন করায় দেখিবার পক্ষে যাত্রীগণের একটুকু অসুবিধা হইলেও, স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, বলিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ভাষায় কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া এখানে ওখানে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন—তাহার কয়েকটী এই—গঙ্গার জলে বা কোন কুয়ার নিকটে ময়লা কাপড় কাচিতে পারিবে না; বা সাবানাদির দ্বারা গায়ের ময়লা পরিষ্কার করিতে পারিবে না। গঙ্গার জলে কুলকুচো করিয়া ফেলিতে পারিবে না। অচেনা কোনও সন্ন্যাসীর নিকট কেহ কোনও প্রসাদাদি খাইতে পারিবে না। এরূপ স্থলে শুধু প্রসাদ কপালে স্পর্শ করাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিবে। ইত্যাদি।

এখন সাধু মহাত্মাদের কথা কিছু বলিব, কিন্তু, হায়, যাহার হৃদয় অপবিত্র, মন কুচিন্তাজালে পরিবেষ্টিত, নয়ন কুটিলদৃষ্টিসম্পন্ন, সে মহাত্মাদের হৃদ্‌গত স্বর্গীয় ভাব কেমন করিয়া বুঝিবে? সাধু মহাত্মাদিগকে বুঝিতে হইলে গভীর আত্মদৃষ্টি চাই, অকপট বিনয় ও নিষ্কলঙ্ক হৃদয়খানি চাই। কালিমাবিজড়িত দর্পণে সূর্য্যরশ্মিই প্রতিফলিত হয় কি? সর্ব্বাগ্রে দর্পণ খানি মাজিয়া ঘসিয়া মলিনতা-বিমুক্ত না করিলে, দর্শনীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব তাহাতে প্রতিফলিত হইবে কেন? সাধুমহাত্মাদিগকে বুঝিতে হইলে অকপট বিনয়-ভূষণে সজ্জিত হইয়া, নিষ্কলঙ্ক আকুলহৃদয় লইয়া যাইতে হয়; তবে ত তাঁহাদের অসাধারণত্ব, মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইবে? আরও একটা কথা, দু'দশ মিনিট তাঁহাদের পাশে বসিয়াই তাঁহাদিগকে চেনা যায় না। একজন অতি সাধারণ লোককেই কি আমরা অল্পক্ষণের জানা শুনায় কিছু বুঝিতে পারি? তবে সাধুমহাত্মাদিগকে দু'দশ মিনিট দেখিয়া আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? এতদ্ব্যতীত আমাদের মধ্যে যে একটা ভয়ানক মহাব্যাধির বীজ সতত বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার প্রভাবে আমরা লোকের গুণ দেখিতে পারি কৈ? আমাদের সকল ইন্দ্রিয় প্রতিনিয়ত অপরের দোষানুসন্ধানেই তৎপর। সুতরাং কেমন করিয়া আমরা সাধুমহাত্মাদিগকে বুঝিব? তবে বাহ্যিক ব্যবহার দর্শন করিয়া আমাদের মত সাধারণ লোক যেটুকু বুঝিতে পারে, ভয়-ক্ষুব্ধ প্রাণে তাহাই লিখিতেছি,—আশা করি, সাধু

ভক্তগণ সে জন্য কোনও অপরাধ লইবেন না।

মহাত্মা ভোলানন্দ স্বামী—আমরা ইঁহার আশ্রমেই ছিলাম। ইনি সত্য সত্যই ভোলানাথ এবং আনন্দময়। সকলের সঙ্গেই কথা বার্ত্তা বলিতেছেন। লোকের সুবিধার জন্য সারাদিন গঙ্গাতীরস্থ তাঁহার আশ্রমের সম্মুখ ভাগের উচ্চ ভূমির উপর একখানা চৌকিতে উপবিষ্ট থাকেন; যে কেহ দর্শন করিতে উপস্থিত হয়, সকলের সঙ্গেই বেশ চিরপরিচিতের মত হাসিমুখে আলাপ করিয়া থাকেন। আমি উপস্থিত হইবা মাত্র, "কিরে, কোথেকে এলি ?" বলিয়া অতি স্নেহবিজড়িত কণ্ঠে আমায়ও সম্ভাষণ করিলেন। ইঁহাকে দেখিলেই ভক্তি হয়। ইনি আশ্রমেই থাকেন; আশ্রম হইতে কিছুদূরে তাঁহার সেবাশ্রম বা ধর্ম্মশালা নামক প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা গঙ্গার উপরে দণ্ডায়মান। মেলা উপলক্ষে আর একটী দ্বিতল ও বৃহত্তর বাড়ীও ভাড়া লইয়াছিলেন। এই দুই বাড়ীতে তিনচার শত যাত্রী বাস করিত; কাহাকেও ভাড়া দিতে হইত না। আশ্রমে দুবেলাই অসংখ্য-লোক আহার পাইত। আহারের সময় বুঝিয়া উপস্থিত হইলেই হইল, তাহাতে গৃহী-সন্ন্যাসী বলিয়া কোনও ইতরবিশেষ নাই। ইনি সন্ন্যাসীদের মত উদাসীন বলিয়া মনে হইল না; সব দিকেই বেশ চোখ আছে বলিয়া মনে হইল। আমায় বলিলেন--"তোরে কে চিনে ?" উত্তরে আমি একজনের নাম করিলে আবার বলিলেন—"দেখিস্ শেষে বোমাটোমা করে একটা বিভ্রাটে ফেলিস্ না।" আমাদের কয়েকজন আত্মীয়—আত্মীয়া যে দিন প্রথম আসিলেন, আত্মীয়াগণ প্রণাম করিবা মাত্র বলিলেন—"আগুন সাবধান মা"; কারণ আশ্রমের সকল ঘরই খড়নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতিদিন দুইবেলা কতক সময় সেবাশ্রমে যাইয়া সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে চলিতেছে কি না, তাহা স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেন। তাঁহার আশ্রমে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। সন্ধ্যার সময় সশিষ্য সমবেত লোক লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া তিনি অতি সুললিত প্রাণস্পর্শী স্বরে "একং পূর্ণং নিত্যং সর্ব্বাধিষ্ঠানং—হর সর্ব্বাধিষ্ঠানং" ইত্যাদি বন্দনা দ্বারা আরতি করেন এবং পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আরও অনেকগুলি সুন্দর স্তোত্র সুর করিয়া সকলে পাঠ করেন। তার পর তিনি যৎসামান্য কিছু আহার করিলে আশ্রমস্থ সকলে আহার করিতে বসেন। প্রতিদিনই এইরূপ হইত। দর্শনার্থ আগত পুরুষ রমণী সকলকেই প্রায় তিনি একই উপদেশ দিতেন—মোটামুটি তাহার মর্ম্ম এইরূপ—ভগবানের যে নাম তোমার ভাল লাগে, তাহা প্রত্যেক শ্বাস ত্যাগের সময় ৩০ বার জপ করিতে হইবে। বাম হস্তের কর দ্বারা এই সংখ্যা ঠিক রাখিতে হইবে। এইরূপে এক প্রশ্বাসে ৩০ বার জপ হইলে ডান হাতের মালায় একটী দানা সরাইবে। এই প্রকারে ১০৮ বার প্রশ্বাসের দ্বারা প্রক্রিয়া করিয়া ১০৮টী দানা সরাইলে তবে ১ মালা জপ হইল। এইরূপে প্রাতে ৯টী পূরা মালা ও সন্ধ্যায় ৯টী পূরা মালা জপ করা কর্ত্তব্য। নাম উচ্চারণ এমন স্বরে করিতে হইবে, যেন নিজের কাণে শুনা যায়। প্রথমে ৩০ বার নাও হইতে পারে; কিন্তু অভ্যাস করিলে ক্রমে হইবে। কিছু দিন এইরূপ করিলে মন স্থির হইয়া ভজন সাধন অনেকটা সহজসাধ্য হইবে। ইত্যাদি।

বাবা গম্ভীরানাথ—নামটীও যেমন চেহারাটীও ঠিক তেমনি। গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি;

বস্ত্রাদিতে সন্ন্যাসীর মত কোন লক্ষণই নাই, সামান্য একখানা থানের ধুতি ও মোটা লংক্লথের একখানা চাদর। সাধারণ লোকের মতই প্রায় বসিয়া থাকেন; কথাবার্ত্তা অতি অল্পই বলেন। আমরা অনেক দিন অনেক বার তাঁহার নিকট গিয়াছি; কদাচিৎ কারো সঙ্গে দুই একটা কথা বলিতে শুনিয়াছি। যেন স্থির সমুদ্র, তরঙ্গের লেশ মাত্রও তথায় নাই; সহস্রাধিক শিষ্যমণ্ডলী সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গনে উপবিষ্ট; যে যাহার কার্য্যে রত। সময় সময় তাঁহারা আসিয়া একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; তিনি দুএকটী কথায় উত্তর দিয়া সকলকে বিদায় করিতেছেন। ইনি বড়ই অল্পভাষী। অধিকাংশ শিষ্যই তাঁহার স্বদেশ—গোরখপুরের, সুতরাং সকলেরই কর্ণে একটা কাঁচের রিং ঝুলান আছে। একদিন সন্ধ্যার সময় বাবা গম্ভীরানাথের ওখানে ছিলাম। হঠাৎ একটী বংশীধ্বনি হইল, অমনি দলে দলে শিষ্যবৃন্দ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে নমস্কার করেন। "গুরুর আদেশ"—কি এই রকম একটী কথা সকলেরই মুখে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রুত হইল। ইঁহার আশ্রমেও অসংখ্য লোক আহার পাইয়া থাকে। বাবা গম্ভীরানাথকে আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছিল; আরও ভাল লাগিত, যদি না তিনি গাঁজা খাইতেন। ইঁহার নাকি অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতা আছে; কিন্তু আমরা তাহা দেখিবার সুযোগ পাই নাই।

কেশবানন্দ—ইঁহার আশ্রম গঙ্গার ওপারে। মহাত্মা ভোলানন্দ স্বামীর আশ্রমের নিকটস্থ মাটীর পুল পার হইয়া একটুকু অগ্রসর হইলেই ইহার আশ্রম। ইনি বাঙ্গালী। আমরা যখন তথায় গেলাম, তখন কাশীমবাজারের স্বনামধন্য মহাত্মা রাজা মণীন্দ্রনাথও সেখানে ছিলেন। স্বামীজি দন্তধাবন করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন "শাস্ত্রমত ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নীলধারা পর্য্যন্ত যেখানে ইচ্ছা স্নান করিলেই হইবে। সুতরাং ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইবার দরকার কি? আর দ্বারভাঙ্গার মহারাজার নিকট গেলে জোর তিনি আমার আশ্রমে ৫০টী করিয়া টাকা মাসে মাসে দিবেন; সেজন্য তাঁর নিকটই বা যাওয়ার দরকার কি? আমার গঙ্গা জল আর বিল্বপত্র ত রয়েছে?" ইত্যাদি। আমরা অল্পক্ষণই সেখানে ছিলাম। এক ঘরে দেখিলাম, অনেক মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতেছে; বুঝিলাম, এখানেও অনেক লোক আহার পায়। ইনি বৈষ্ণব, শুনিলাম, গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য।

মনোরঞ্জন বাবুর 'কুম্ভমেলা' পাঠে যে কয়েকজন মহাত্মার নাম অবগত হইয়াছিলাম, শুনিলাম, তন্মধ্যে এই তিন জনই মাত্র এখন জীবিত আছেন।

স্বামী মহানন্দগিরি—ইঁহার কোনও আশ্রমাদি নাই। শিষ্যাদিও বোধ হয় বিশেষ নাই। যে দিন প্রথম কনখলে গিয়াছিলাম, সে দিন নানক-পন্থীদের আশ্রমে ইঁহার দর্শন লাভ হয়। রক্তবর্ণ রেশমী বস্ত্রে ইহার সমস্ত শরীর আবৃত ছিল; হাতে অনেকগুলি শঙ্খ-বলয় রহিয়াছে। মালারই বা সংখ্যা কত। সুদীর্ঘ চিম্‌টা হস্তে। পথে চলিতে অবিরাম ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হয়। ইনিও বোধ হয় বাঙ্গালী। ইনি নিজেই বলিলেন—লোকে তাঁহাকে স্বামীজি বলে; তবে তাঁহার নাম মহানন্দগিরি। ইনি তারার উপাসক; তবে তাঁহার তারা—বৈষ্ণবী। ইঁহার স্বরচিত হিন্দি ও বাঙ্গালায় তারা-বিষয়ক অনেক

কবিতা পাঠ করিয়া আমাদিগকে শুনাইতে লাগিলেন। কথায় কথায় বলিলেন, "আজ এগার বৎসর ভাত ছেড়েছি; সাত বৎসর দুধ ছেড়েছি; চার বৎসর মিষ্টি ছেড়েছি; সম্প্রতি শুধু ফল মূল খাইয়াই থাকি। আবার বলিলেন—এবার কুম্ভমেলার পর হইতে আমি মৌনী হইব; এখনকার মত আর কাহাকেও পদস্পর্শ করিতে দিব না; দিনে ৭টা ও রাত্রিতে ৫টা আলুসিদ্ধ মাত্র খাইব।" আবার বলিলেন,"তাঁহার সঙ্গে যতই প্রণয় বাড়িতেছে, ততই রূপরস ইত্যাদির জন্য স্পৃহা আপনা হইতেই কমিয়া যাইতেছে।" অযাচিত ভাবে অবিশ্রান্ত তিনি অনেক কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—কোন্ জায়গার রাজা তাঁহাকে তাঁহার কণ্ঠস্থিত রুদ্রাক্ষের মালাছড়া দিয়াছেন, কোন্ সন্ন্যাসী মালাছড়ার জন্য কত শত টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তবু তিনি দেন নাই, ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন। ইনি একটু নির্জ্জনতাপ্রিয়। তিনি নিজে লইয়া না গেলে আমরা বোধ হয় কখনই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতাম না। লোকটী বেশ আনন্দময় বলিয়াই বোধ হইল; তবে অধিক কথা বলায় আমাদের যেন ততটা ভাল লাগিল না।

মহাত্মা শঙ্করগিরি—ইনি অল্প কিছুকাল যাবৎ ভীমগোড়ায় বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে ইনি মঙ্গলগিরি নামক অপর এক মহাত্মার সঙ্গে একত্র বাস করিতেন। ইনি বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন। বেলুড়ের স্বামীজিদের মত সুন্দর পোষাক পরিহিত। একজন পণ্ডিত তাঁহার আশ্রমে বসিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন; আমরাও একটু শুনিলাম। ইঁহার বিষয় আর বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই।

শুনিলাম,নাগা সম্প্রদায়ের মোহান্ত আলেখ বাবাও আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ ঘটে নাই।

হরিদ্বারের পথে গাড়ীতে একজন সাধু দেখিয়াছিলাম, তাঁহার নাম মনীশ্বরানন্দ—তিনি ব্যাখ্যা করিলেন, যাঁহার মন ঈশ্বরেতে আনন্দ পায়। ইনি অদ্বৈতবাদী। হরিদ্বারে একদিন ইঁহার সঙ্গে অনেক ঘুরিয়াছিলাম। ইনি একটুকু একটুকু ইংরেজী জানিতেন, তাই কথা বলিবার সুযোগ হইয়াছিল। কথায় কথায় সন্ন্যাসীরের সম্বন্ধে ইনি বলিলেন—

"Most of them are beggars and cheats; they don't know anything; they are only filling up their bellies with the help of the rich men; they don't know how to speak with a man." etc.

ইঁহাদের অনেকে ভিক্ষুক এবং প্রবঞ্চক; ইহারা কিছুই জানে না; ধনী লোকের অর্থে নিজদের উদরপূর্ত্তি করিতেছে; কেমন করিয়া লোকের সঙ্গে কথা বলিতে হয়, তাহাও ইহারা জানে না।";আবার বলিলেন—

"I have been wandering here and there for these days; but I have found only 2 or 3 real shadus; your Bholagiri is one of them. He is a very greatman."

"আমি এই কয়দিন যাবত এখানে সেখানে ঘুরিতেছি, কিন্তু মাত্র ২।৩ জন খাঁটি সাধু দেখিলাম, তন্মধ্যে একজন ভোলাগিরি; তিনি একজন খুব বড় লোক।" ইঁহার সঙ্গে ২।৩ ঘণ্টা সূর্য্যকুণ্ড পাহাড়ের উপর বসিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল; অনেক গান হইল—তিনি এই গানটী গাহিয়াছিলেন—আমার নোট বুকে তাঁহার হস্তলিখিত দেবনাগরি অক্ষর হইতে যতদূর বুঝিলাম, বাঙ্গালা হরপে লিখিলাম।

শঙ্করা রাগিণী।
চোণ্ডী চৌণ্ড মুণ্ড ॥
হেরল মহী, মহিষাসুর সংহারণী,
অধমনকো গতি দিজে ॥
সন্ত পালনী উর দীননদুখিয়ন তীহুঁলোক
বিরত জৈসিকিজে ॥

ব্যাখ্যা করিতে বলায় তিনি বলিলেন—চণ্ডী মানে Goddess; চণ্ডমুণ্ড মানে খুব চওড়া মুণ্ড যাঁহার, অর্থাৎ মস্তক বিশ্ববিস্তৃত। আমি বলিলাম—লোকে ত বলে চণ্ড নামক অসুরের মুণ্ড গলায় বলিয়া তাঁহাকে চণ্ডমুণ্ডা বলা হয়—উত্তরে তিনি বলিলেন - They are ignorant people অর্থাৎ তাহারা অজ্ঞান। ইত্যাদি। এই সন্ন্যাসীর কথা বার্ত্তায় ও চাহনীতে বেশ একটুকু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আসিবার তিন চারি দিন পূর্ব্বে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নাই।

এবারে ভীমগোঁড়া, সূর্য্যকুণ্ড, চণ্ডীর পাহাড়, দক্ষ ও সতীকুণ্ডের একটুকু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া আমি প্রবন্ধ শেষ করিব।

ভীমগোঁড়া—কথিত আছে, মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এখানে পদাঘাত করায় সবেগে জল উত্থিত হয় এবং একটী কুন্ত বা ছোটপুকুর প্রস্তুত হয়। ইহার জল অতি কদর্য্য, তথাপি অধিকাংশ ঐ দেশীয় যাত্রীগণ অবিশ্রান্ত ইহাতে স্নান করিতেছে। এবং ইহার মধ্যে স্থাপিত শিবলিঙ্গে জল সেচন করিতেছে।

সূর্য্যকুণ্ড—এই পাহাড়টী একেবারে সহরের মধ্যেই। একস্থানে ইহাকে কাটিয়া ইহার নিম্নে পথও করা হইয়াছে। সহরের দিক দিয়া উঠিতে গেলে কতকটা পর্য্যন্ত বড়ই খাড়া; তারপর ততটা নয়। ইহার উপর হইতে সহর ও গঙ্গা অতি সুন্দর দেখায়। ইহার উপরেও শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে।

চণ্ডীর পাহাড়—গঙ্গার ওপারে প্রায় এক-মাইল পথ চলিলে তবে চণ্ডীর পাহাড়। পাদদেশেই এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত; ইহা অতি উচ্চ পাহাড়; কিন্তু রাস্তাগুলি এমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিয়াছে যে, প্রায় ৩।৪ মাইল পথ ঘুরিয়া তবে ইহার উপরে উঠা যায়। দুইটী শৃঙ্গে দুইটী মন্দির বিরাজমান, দ্বিভুজ কালীর মূর্ত্তি তাহাতে স্থাপিত। আমরা যেপথে উঠিয়াছিলাম, সেপথে অনেক লোক দেখিয়া অন্য পথে নামিলাম। এ পথটী বড়ই ঢালু। এখানেও পাদদেশে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত মন্দির বর্ত্তমান। তবে এই মন্দিরটী পূর্ব্ব-কথিত মন্দির অপেক্ষা শান্তিপ্রদ।

দক্ষকুণ্ড—কনখল হইতে কিছু দূরে গঙ্গার নিকটে অবস্থিত। এখানে দক্ষ প্রজাপতির বাড়ী ছিল। তিনি এখানে যজ্ঞ করেন; সেই যজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া সতী দেহত্যাগ করেন; পরে মহাদেব কর্ত্তৃক দক্ষের যেখানে লাঞ্ছনা হয়, তাহাই দক্ষ কুণ্ডনামে বিখ্যাত। এখানে যাত্রীগণ গঙ্গাস্নান করিয়া দক্ষকুণ্ডে জল ও বিল্বপত্র প্রদান করিয়া থাকে।

সতীকুণ্ড—দক্ষকুণ্ড হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে। এখানেও একটী কুণ্ড আছে; জল অতি কদর্য্য। যাত্রীগণ এখানেও স্নান করেন। এই সতীকুণ্ডেই সতী পতি-নিন্দা শ্রবণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

আর একটী কথা না লিখিলে বড়ই অন্যায় করা হয়—তাই অতি সংক্ষেপে তাহা লিখিতেছি—আর্য্যসমাজের অসাধারণ সেবার কথা। হরিদ্বারের চতুর্দ্দিকে ৪।৫ টা ষ্টেসন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাঁহারা ১৫।২০ জন করিয়া ১৫।২০টী জলপূর্ণ-পাত্র সহ বিদ্যমান। যাত্রীদের কত রূপ যে সেবা করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না। হরিদ্বারে ত বহু

সংখ্যক সভা সমিতি করিয়া তাঁহারাই ধর্ম্মপ্রচার করিতেছে—অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছে—রাস্তায় ঘাটে অবিশ্রান্ত পুস্তকাদি বিতরণ করিতেছে, কনখলের পথে দেখিলাম—প্রকাণ্ড ২ দুটী গৃহ পুস্তকে পূর্ণ। এসবের অধিকাংশই বিতরিত হইতেছে। আর্য্যসমাজের কার্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের একটুকু-গন্ধও কোথায় না পাইয়া কেমন একটা দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম।

ভাবিয়াছিলাম আরও কত কি লিখিব; কিন্তু প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইতেছে; তাই সংক্ষেপে একরকম শেষ করিলাম।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা।

আর্য্যাবর্ত্তে প্রচার।

১৯শে এপ্রেল কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ইহাঁরা সমুদ্র পথে মান্দ্রাজ যাত্রা করিলেন। মান্দ্রাজের টি, সুব্বা রাও, দেওয়ান রঘুনাথ রাও, বিচারপতি শ্রীনিবাস রাও, টিপু সুলতানের বংশ সম্ভূত মাননীয় মির হুমায়ুন জা প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের উদ্যোগে ইহাঁদের সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। বিরাট সভায় অলকট সমিতির উদ্দেশ্যাদি বুঝাইয়া দিলেন। সভায় উপস্থিত যাবতীয় লোকের দৃষ্টি ব্লাভাস্কির উপর নিবদ্ধ ছিল। মান্দ্রাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সমিতিতে যোগ দান করিলেন।

মান্দ্রাজ হইতে ইহাঁরা নৌকাযোগে নেলোর নামক স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন। ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ কালীন ইহাঁরা সমিতির প্রধান কেন্দ্র এবং আপনাদের বাসের উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান করিতেন। মান্দ্রাজে প্রচার সময়ে ইহাঁরা তন্নিকটবর্ত্তী আদিয়ারে একটী বিস্তীর্ণ সম্পত্তির সন্ধান পাইয়া তথায় গমন করিলেন, এবং তথাকার বিক্রেয় বৃহৎ বাটীর সুসংস্থান, প্রকৃতিক শোভা, স্বাস্থ্য এবং নগর কোলাহল হইতে দূরাবস্থান হেতু শান্ত নির্জ্জনতায় মুগ্ধ হইয়া দর্শন মাত্র তথায় বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানটি ক্রয় করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল।

ইহাঁরা বোম্বাই ফিরিয়া বরোদা রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। যুবক গাইকোবার এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সমিতির প্রতি খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। দেওয়ান সাহেব আধ্যাত্মিক শক্তির প্রমাণ স্বরূপ ব্লাভাস্কির অলৌকিক ক্রিয়া দেখিতে চাহিলেন। দেওয়ান সাহেব একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক হইলেও প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু ছিলেন না। ব্লাভাস্কী তাঁহার কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্ত উল্লেখ যোগ্য কোন ক্রিয়াই দেখাইলেন না। কিন্তু নায়েব দেওয়ান মহাশয়ের বিদ্যাবত্তা ও অকৃত্রিম জ্ঞান পিপাসার পরিচয় পাইয়া ব্লাভাস্কি একটী অদ্ভুত ক্রিয়া দ্বারা মানবের আধ্যাত্ম শক্তির প্রমাণ প্রদান করিলেন। ইনি মসী লেখনী ব্যতিরেকেও কোন বস্তুতে যে লিপি সংযোগ (precipitated writing) হইতে পারে, ইহার প্রমাণ প্রার্থী ছিলেন। ব্লাভাস্কী একখানা সাদা কাগজ হাতে লইয়া মসীলেখনী স্পর্শ না করিয়া

মুহূর্ত্ত মধ্যে তদুপরি একখানি পত্র সন্নিবিষ্ট করিলেন।

বরোদার কার্য্য শেষ হইলে অলকট ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে আবার সিংহল গমন করিলেন। ব্লাভাস্কি কার্য্যব্যপদেশে বোম্বাই বাটীতেই রহিলেন। কিছু দিন পরেই তিনি শঙ্কাজনক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে—সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি তিনি মিঃ সিনেট ও তাঁহার পত্নীকে যে পত্র লিখেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"বোধ হয় শীঘ্রই তোমাদের নিকট আমার চির বিদায় নিতে হইবে। আমি মূত্রাশয়ের পীড়ায় আক্রান্ত, রক্ত দূষিত হইয়া নানা স্থানে ব্রণ বিস্ফোটক উৎপত্তি হইতেছে। বোম্বায়ের জল বায়ু এবং মানসিক উদ্বেগই ইহার কারণ। আমি এতদূর স্নায়বিক দুর্ব্বলতাগ্রস্ত হইয়াছি যে হঠাৎ বাবুলার (ব্লাভাস্কীর প্রিয় ভৃত্য) নগ্ন পদবিক্ষেপেই চমকাইয়া উঠি, আর আমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতে থাকে। ডাডনি (বোধ হয় ডাক্তার) বলে যে আর ২।১ বৎসরের বেশী বাঁচিব না, কিন্তু চিত্তের কোন আবেগ উপস্থিত হইলে যে কোন মুহূর্ত্তে মৃত্যু হইতে পারে। দেবতারা জানেন,—এরূপ আবেগ আমার দিনের মধ্যে বিশ বার হয়। তবে আর আমার রক্ষার উপায় কি? গুরুদেব আমাকে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি মাসেকের জন্য স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন। তিনি নীলগিরি পর্ব্বত হইতে একজন চেলাকে পাঠাইয়াছেন। ইনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, কোথায় জানি না, তবে হিমালয়ের কোন স্থানে নিশ্চিত।

"আমি লিখিতে পারিতেছি না, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল। তবে এখন বিদায়! আমার দেহান্ত হইলে আমাকে একটা প্রবঞ্চক বলিয়া মনে স্থান দিও না। কারণ সকল কথা তোমাদের নিকট প্রকাশ না করিলেও যতটুকু বলিয়াছি তাহা সব সত্য জানিবে। আমি মরিয়া গেলে কেহ যেন 'মিডিয়ম' সাহায্যে আমার প্রেত দেহকে আহ্বান করিয়া আমার অবমাননা না করে। নিশ্চিত জানিও আমার প্রেত দেহে আগমন অসম্ভব, কারণ প্রেত দেহ বলিয়া যে একটা জিনিষ, তাহা আমার বহুকাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

ব্লাভাস্কির গুরু দর্শনার্থ হিমালয় অভিমুখে গমন সম্বন্ধে মিঃ সিনেটের গ্রন্থে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিয়া দিলাম :—

"মাদাম ব্লাভাস্কি মহাত্মাদের দর্শনার্থ যাইতেছেন শুনিয়া শ্রীযুক্ত রাম স্বামীয়ার নামক একজন দীক্ষার্থী (ইনি এক জন ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার ছিলেন) তৎসঙ্গে যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাম স্বামীয়ার সমিতির কোন সভ্য বন্ধুকে এ বিষয়ে যে পত্র লিখেন তাহাতে এই হিমালয় যাত্রার কতক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামস্বামীয়ার স্বীয় বন্ধুকে লিখিতেছেন :—

"* * * গতবার বোম্বাই নগরে যখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তিন্নেভেলিতে আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিয়াছিলাম। সরকারি কার্য্যে এবং নানা উদ্বেগে আমার স্বাস্থ্য হানি হওয়ায় আমি ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া ছুটীর আবেদন করিলাম। ছুটী মঞ্জুর হইল। গত সেপ্টেম্বর মাসে এক দিন ঘরে বসিয়া পাঠ করিতেছি, এমন সময় আমার পরমারাধ্য গুরু-সুস্পষ্ট স্বরে আদেশ করিলেন যে তৎক্ষণাৎ আমাকে

বোম্বাই গিয়া ব্লাভাস্কির অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইতে হইবে, এবং যেখানেই হউক তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া তিনি যেখানেই যান, আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আমি কার্য্যাদি শেষ করিয়া গৃহত্যাগ করিলাম, কারণ গুরুদেবের কণ্ঠস্বর আমার নিকট স্বর্গীয় বাণী, তাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। আমি সন্ন্যাসীবেশে বহির্গত হইলাম। বোম্বাইয়ে আসিয়া দেখিলাম ব্লাভাস্কি নাই। তোমার নিকট শুনিলাম তিনি অতীব পীড়িতাবস্থায় হঠাৎ একজন চেলার (মহাত্মাদের কোন শিষ্য) সহিত কয়েক দিন মাত্র হইল বোম্বাই হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তুমিও আর কোন সম্বাদ দিতে পারিলে না। এখন তোমার নিকট বিদায় হইবার পর যাহা যাহা ঘটিল বলিতেছি।

'কোথায় যাইব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত টিকিট করিলাম। কিন্তু এলাহাবাদে পঁহুছিলে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরে আমাকে বহরমপুর যাইতে আদেশ করা হইল। আজিমগঞ্জ ষ্টেশনে গাড়ীর মধ্যে ভগবদিচ্ছায় কয়েকটী বাঙ্গালি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহাঁদের কাহারও সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। ইহাঁরা যে পরাবিদ্যা-সমিতির সভ্য তাহাও জানিতাম না। ইহাঁরাও মাদাম ব্লাভাস্কির অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। ইহাঁদের কেহ কেহ ব্লাভাস্কি দানাপুরে আছেন এইরূপ সংবাদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় গিয়া তাঁহার কোন খোঁজ খবর না পাইয়া বহরমপুর ফিরিয়া আইসেন। ব্লাভাস্কি তিব্বত যাইতেছেন শুনিয়া ইহাঁরাও মহাত্মাদের পাদমূলে আত্মসমর্পণার্থ তাঁহার অনুমতিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। অবশেষে ব্লাভাস্কি ইহাঁদিগকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে আসিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নিজেরই এক্ষণ তিব্বত যাওয়ার নিষেধ আছে। তিনি দার্জ্জিলিং-এর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে থাকিবেন, এবং সিকিম সীমান্তে মহাত্মাদের দর্শনলাভ করিবেন, কিন্তু তথায় ইহাঁদের যাওয়ার অনুমতি নাই।……ভাই নবীন (৺নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট) ব্লাভাস্কি কোথায় আছেন আমাকে বলিলেন না,—বোধ হয় তিনি নিজেও তখন জানিতেন না। তথাপি ইনি এবং ইহাঁর সঙ্গীরা মহাত্মাদের দর্শনাশায় সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর নবীনবাবু আমাকে কলিকাতা হইতে চন্দননগর লইয়া গেলেন। চন্দননগরে ব্লাভাস্কির দেখা পাইলাম, কিন্তু তিনি গাড়ীতে উঠিতে উদ্যত, একজন দীর্ঘাকৃতি কৃষ্ণকায় কেশ শ্মশ্রুবিশিষ্ট চেলাকে দেখিলাম। পরিচ্ছদে বোধ হয় ইনি তিব্বতীয়। তিনি আমাকে বলিলেন আমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, তিনি মাদামকে নিরাপদে পৌছাইয়া দিতে আসিয়াছেন মাত্র। আমি চেলাকে আমার সঙ্গে নিতে অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শুনিলেন না,—বলিলেন তাঁহার প্রতি অপর কোন আদেশ নাই। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অন্যান্য বাঙ্গালি ভ্রাতারাও ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দননগর হইতে নদী পার হইয়া অপর তীরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশনে সকলে আসিলেন। যখন ট্রেণ আসিল, ব্লাভাস্কি গাড়ীতে উঠিলেন; আমি দেখিলাম তথায় চেলাও আছেন! ব্লাভাস্কির জিনিষপত্র তখনও সব গাড়ীতে তোলা হয় নাই, তখনও গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়ে নাই,—সময় হয় নাই,—কিন্তু সমস্ত নিয়ম

অতিক্রম করিয়া গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া গেল। নবীনবাবু, অপর বাঙ্গালীরা, ব্লাভাস্কির নিজের ভৃত্য, সকলেই পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। আমি কোন ক্রমে শেষ গাড়ীটাতে লম্ফ দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক, এবং একজনের স্ত্রী ও কন্যা গাড়ীতে পূর্ব্বেই উঠিয়াছিলেন,—ইঁহারাও সমিতির সভ্য ও শিক্ষার্থী। চিঠি পত্রের বাক্সটা ছাড়া ব্লাভাস্কির অপর সমস্ত জিনিষ পত্র চাকরের সঙ্গে ষ্টেশনে পড়িয়া রহিল। কিন্তু যাঁহারা সেই ট্রেণে তাঁহার সহিত রওনা হইলেন, তাঁহারও সময় মত দার্জ্জিলিং পহুঁছিতে পারিলেন না। ইঁহারাও আর একটী অভাবনীয় আকস্মিক ঘটনাবশতঃ দার্জ্জিলিঙ্গের ৫।৬ ষ্টেসন পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন, এবং ব্লাভাস্কির কয়েক দিন পরে দার্জ্জিলিং পহুঁছিলেন! মাদামের ভৃত্যসহ নবীনবাবু পাঁচ দিন পরে পহুঁছিলেন!! এই সকল ঘটনায় সহজেই অনুমান হয় যে আমরা সকলে ব্লাভাস্কির অনুসরণ করি, ইহা মহাত্মাদের ইচ্ছা ছিল না। অবশ্য তাঁহাদের অনিচ্ছার কারণ তাঁহারাই জানেন ।”

“মাদাম ব্লাভাস্কি ২।৩ দিন মহাত্মাদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ফিরিলেন, তখন দেখা গেল তিনি সেই সঙ্কটাপন্ন জটিল ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।”

অলকট সিংহল হইতে ফিরিলে ইঁহারা ১৭ই ডিসেম্বর আদিয়ার যাত্রা করিলেন। মান্দ্রাজে পৌছিবামাত্র স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিগণ ইঁহাদের প্রত্যুদগমন করিলেন। কিয়ৎ দিন পরে মান্দ্রাজবাসীরা রাজা গজপতি রাওএর অধিনায়কত্বে এক প্রকাশ্য সভায় ইহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। মান্দ্রাজের উপকণ্ঠস্থিত আদিয়ারের মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। যে স্থানে এই ক্ষুদ্র কায়া তটিনী বিস্তৃতাকার ধারণ করিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সাগর সঙ্গমের সন্নিকটে ইঁহাদের বাসগৃহ এবং পরাবিদ্যা সমিতির কার্য্যালয়াদি অবস্থিত। এই শান্ত মনোহর আশ্রমে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কাটাইবেন, ইহা মাদামের বাসনা ছিল। কিন্তু হায়! তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার অদৃষ্ট ভাণ্ডারে আরও কত দুঃখ যন্ত্রণা সঞ্চিত আছে। আদিয়ারে আপাততঃ তিনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেকটা উন্নতি বোধ করিলেন।

কিয়দ্দিন বিশ্রামান্তে অলকট বঙ্গদেশে প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। গতবার সিংহল ভ্রমণ কালীন তিনি দেহজ নানা রোগ দূর করিবার শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তথায় এবং এ যাত্রা বঙ্গবিহারে তিনি অন্ধ, খঞ্জ, মুক, বধির, আতুর, প্রভৃতি কত চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে তাঁহার দৈব স্পর্শে, কখনওবা কেবল ইচ্ছা মাত্রে, নিরাময় করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এসকলের বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে দ্রষ্টব্য। এ যাত্রায় বঙ্গের স্বনামধন্য পণ্ডিত হারানাথ তর্কবাচস্পতি অলকটকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্বহস্ত প্রস্তুত অন্নদ্বারা আহার করাইয়াছিলেন, এবং সমন্ত্র উপনয়ন দীক্ষা প্রদান করিয়া অপূর্ব্ব গৌরবে ভূষিত করিয়াছিলেন। অলকট বলেন সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির জন্য তাঁহার ঐকান্তিক পরিশ্রমই এই অতুলনীয় ও অযাচিত সম্মান লাভের একটী হেতু। অলকট বৌদ্ধ হইলেও তর্ক বাচস্পতি মহাশয়ের সম্মান রক্ষার্থ উপবীত ত্যাগ করেন নাই।

অলকটকে যে অভিনন্দন ভাগলপুরে প্রদত্ত হয়, তাহাতে হিন্দুগণ উন্মুক্ত হৃদয়ে আবেগ পূর্ণ

কবিত্বালঙ্কার ভূষিত সংস্কৃত ভাষায় ইঁহাদের যশোগীতি গান করিয়াছিলেন। উহাতে ব্লাভাস্কি সম্বন্ধে এই মর্ম্মে উল্লেখ দৃষ্ট হয় :—

"মহাত্মাগণের আদেশানুগামী যিনি অধঃপতিত আমাদের কল্যাণ কামনা রূপ বেদীর অগ্রে সমস্ত আত্মসুখ বলিদান করিয়াছেন, সেই সদাশয়া সর্ব্ব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী মহিলার জননী হৃদয়সুলভ স্নেহধারা হইতে, এবং হে কর্ণেল, তোমার যত্ন হইতেও পুরাতন জীর্ণশীর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা নবরস আস্বাদন করিয়া পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে—ইত্যাদি।"

আদিয়ার যাত্রার প্রাক্কালেও বঙ্গবাসীরা ইঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা সূচক অভিনন্দন দান করিয়াছিলেন। উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আপনারা আমাদের নগরে উপস্থিত প্রাচ্য ধর্ম্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যা দ্বারা যে উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা যার পরনাই কৃতজ্ঞ। ...আপনারা ভারতের শিক্ষিত সন্তানগণের অন্তরে তাহাদের বহুকাল উপেক্ষিত প্রাচীন শাস্ত্রাদির পঠনালোচনার প্রবল বাসনা উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছেন। যদিও এদেশের সুখ সম্পদ এবং রাজনৈতিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার আবশ্যকতা আছে, এবং একথা আপনারা কখনও অস্বীকার করেন নাই—তথাপি নাস্তিকতাপ্রবল পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল সমূহের প্রতিরোধার্থ প্রাচ্য বিদ্যার অনন্তভাণ্ডার নিহিত রত্নরাশির অনুসন্ধান করাও যে আমাদের সর্ব্বথা বিধেয়,—ইহা আপনারা বিশেষরূপে আমাদের চিত্তে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। ...চার বৎসরের মধ্যে আপনাদের সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রচারের চেষ্টা যেরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহা সমিতির গত বার্ষিক অধিবেশনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। লাহোর সিমলা হইতে সিংহল পর্য্যন্ত, কলিকাতা হইতে কাঠিয়াবার পর্য্যন্ত, গুজরাট হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত, সমগ্র দেশের হিন্দু, পার্শী, বৌদ্ধ, ইহুদি, মুসলমান, য়ুরোপীয়, ধর্ম্ম ও বর্ণগত ভেদ ভুলিয়া, ভারতের উন্নতির জন্য, একত্র সম্মিলিত, এই অপূর্ব্ব দৃশ্য উক্ত অধিবেশনে আমরা দেখিলাম। আর ইহা আমরা বুঝিলাম যে পুনরুজ্জীবনের জন্য, এবং জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এইরূপ সম্মিলন একান্ত প্রয়োজনীয়। * ইত্যাদি।"

এই ভারতহিতৈষীদ্বয়ের জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের নিষ্কাম সাধনা বিভিন্ন মত সংঘর্ষের মধ্যে সৌখ্য মিলনের মধুর ধারা আনয়নের অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা যেন সেই বৈদিক ঋষির দেবকণ্ঠ বিঘোষিত বোধন মন্ত্রের সঞ্জীবনী সুধা বহন করিয়া আনিতেছিল। ইঁহাদের উদ্বোধন বাণীও যেন ঋষিকণ্ঠের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছিল।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং নংবো মনাংসি জানতাম্,
দেবা ভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।

অর্থাৎ, পরস্পর বিরোধ ছাড়িয়া সম্মিলিত হও, একত্র হইয়া চল, সম্মিলিত হইয়া পরস্পর সত্য বিচার কর, অসূয়া পরিশূন্য হইয়া জ্ঞান-প্রভায় চিত্ত আলোকিত কর। যাঁহারা সুর, যাঁহারা দেবপদারূঢ়, তাঁহারা চিরদিন অভীষ্ট লাভের এই শাশ্বতী রীতিতেই একতা- * বদ্ধ সৌখ্য প্রেমের পথে আপন আপন কর্ত্তব্যের অনুসরণ করেন, জগদাত্মার উপাসনা করেন।

---

* অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে ইহার কিয়ৎকাল পরেই জাতীয় মহাসমিতির (The Indian National Congress) উদয় হইল। পরাবিদ্যা-সমিতির ছায়ায় সম্পন্ন ভারতীয় সর্ব্ব জাতির সম্মিলন রূপ মহাযজ্ঞ হইতেই জাতীয় মহাসমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্রলাভ হইয়াছিল।

এই সৌভ্রাত্রের আশ্বাস-বাণী বহুদিনের বিরোধ-বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীর চিত্তে এক নব ভাবের জাগরণ করিয়া দিয়াছিল। উহার প্রভাব ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই সর্ব্বত্র ভারত-সন্তান প্রীতির পূর্ণার্ঘ্য হস্তে এই মহিয়সী নারী ও তাঁহার সহযোগীর নিকট দণ্ডায়মান। স্থানে স্থানে অভিনন্দন দান ভারতবাসীর গভীর কৃতজ্ঞতার ক্ষীণ নিদর্শন মাত্র।

পরাবিদ্যা-সমিতির উদ্দেশ্য ও ভারতের সহিত সম্বন্ধ।

ব্লাভাস্কির যোগসিদ্ধি ও তাঁহার সহযোগী অবিরাম কর্ম্মময় সাধনা অল্পকাল মধ্যে ভারতবাসীর চিত্ত কতদূর অধিকার করিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্যই আমাদিগকে তাঁহার ভারতে প্রথম কয়েক বৎসরের কার্য্য-বিবরণ একটু বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। সাধারণ্যে প্রচারের ভার প্রধানতঃ অলকটের উপরই ছিল। তজ্জন্য অলকটের সাধারণ সংসৃষ্ট কর্ম্ম কথাও আমাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে বলিতে হইয়াছে। স্মরণ রাখা উচিত, অলকটের কর্ম্ম ব্লাভাস্কি জীবনেরই, সম্পূর্ণ না হউক, অন্ততঃ আংশিক ব্যাখ্যা-স্বরূপ। কারণ ব্লাভাস্কি শক্তি, অলকট বিকাশ; ব্লাভাস্কি তত্ত্ব, অলকট প্রকাশ; ব্লাভাস্কি মন্ত্র, অলকট ক্রিয়া। ব্লাভাস্কির জ্ঞানালোক মধ্যবর্ত্তী পরিচালক অলকটের ভিতর দিয়া জগতে ব্যাপ্ত। সুতরাং ব্লাভাস্কির আরব্ধ-ব্রত-সাফল্যের সীমা-বিস্তার কতক পরিমাণে অলকটের কর্ম্ম-পরিসর দ্বারা পরিমেয়। কিন্তু তাঁহার এই সাফল্য অন্য দিক হইতেও দ্রষ্টব্য। সাফল্যের অন্তরালে তাঁহার স্বীয় বিরাট উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব যে নিমিত্ত কারণরূপে দেদীপ্যমান, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহার যোগ আর তাঁহার সহযোগীর কর্ম্ম প্রযুক্ত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যই সাফল্যের উপাদান কারণ স্বরূপ। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য অবশ্যই আমাদের আলোচ্য। যদি তাঁহার যোগ শক্তি উদ্দেশ্যের প্রতি প্রযুক্ত না হইয়া কেবল বিভূতি প্রদর্শনেই পর্য্যবসিত হইত, তবে তাহার মূল্য কত হইত আমরা জানি না। তবে সম্ভবতঃ উহা চপলার আলোক রেখার ন্যায় সহসা মানবকে একটু চমকিত, স্তম্ভিত, বিস্ময়-বিপ্লুত, অথবা বড় জোর, পথের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া একটু আনন্দ উৎফুল্ল করিয়াই সমাপ্ত হইত। কিন্তু যখন আমরা দেখিতে পাই যে উহা ঈদৃশ সাময়িক উত্তেজনাতেই পরিসমাপ্ত না হইয়া মানব সমাজে এক পরিস্ফুট মহা মঙ্গলের সূত্র পাত করিয়াছে, তখন তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতি স্বতঃই আমাদের মন আকৃষ্ট হয়। যখন আমরা দেখিতে পাই, উহা মানবকে কেবল চমকিত না করিয়া তাহার উচ্চতর চিন্তা-রাজ্যকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থতার দিকে লইয়া যইতেছে, তখন আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, পরন্তু উহা বুঝিবার জন্য অগ্রসর হই। আর উহা বুঝিতে হইলেই তৎপ্রবর্ত্তিত পরাবিদ্যা সমিতির উদ্দেশ্য গুলির পরিচয় গ্রহণ আবশ্যক। উন্মুক্ত আকাশ-পথে কামগামিনী বিহঙ্গীর ন্যায় পৃথিবীর নগরে নগরে, অরণ্যে অরণ্যে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে যে উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণে আপনার শক্তিময় মঙ্গলগর্ভ জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, গুরুর আদেশ তাঁহাকে উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যুগান্তরকারী গ্রন্থ প্রণয়নে এবং পরা-

বিদ্যা সমিতির প্রবর্ত্তনে কি মহৎ লক্ষ্যের দিকে একাগ্র করিল, তাহাও বোধ হয় আমরা সমিতির উদ্দেশ্য আলোচনায় বুঝিতে পারিব। পরন্তু, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্লাভাস্কি-জীবনের এই সদাকল্যাণমুখী নিরাবিল প্রবাহেও স্থল বিশেষে অতর্কিত শৈলপ্রতিঘাতে দুই একটী ঘূর্ণাবর্ত্তের উৎপত্তি করিয়াছিল। আমরা আর্য্য সমাজের আক্রমণের উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। মিশনরি সম্প্রদায়ের মারাত্মক অভিসন্ধি ও যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। সেই সকল ঘটনার মূলতত্ত্ব দুই দিক তুলনা করিয়া জানিতে ও বুঝিতে হইলেও পরাবিদ্যা সমিতির উদ্দেশ্য গুলির সহিত আরও একটু পরিচিত হওয়া আবশ্যক। অতএব আমরা পাঠককে এই প্রয়োজনীয় পরিচয় লাভে সহায়তা করিবার চেষ্টা করিব।

এই সমিতির উদ্দেশ্য তিনটি, যথা,—

(১) জগতে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা।

(২) জগতের সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্ব এবং তৎসংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর আলোচনা।

(৩) মানবের আত্মনিহিত কিন্তু সুপ্ত (latent) অবস্থার স্থির শক্তির উদ্বোধন ও বিকাশার্থ যথোপযুক্ত যত্নানুসন্ধান।

উদ্বোধন ও বিকাশার্থ যথোপযুক্ত যত্নানুসন্ধান।

উদ্দেশ্য এই তিনটি হইলেও, প্রথমটির সাধনই সমিতির প্রধান লক্ষ্য। কোন ব্যক্তি এই সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইলে, তিনি প্রথমটি স্বীকার করিতে বাধ্য, অপর দুইটির অনুসরণ করা, না করা তাঁহার ইচ্ছা।

জগতে ধর্ম্ম লইয়া কলহ, মত লইয়া বিবাদ চির দিন চলিয়া আসিতেছে। এবং এই কলহ বিবাদ অশেষ অনর্থের সৃজন করিয়াছে। এমন কি ধর্ম্মের নামে পৃথিবী অনেক বার নরশোণিতে সিক্ত হইয়াছে। লুথারের সংস্কার প্রচারের পর খ্রীষ্টের ধর্ম্ম-জগতে যে ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলে কত নর হত্যা, কত শোণিত পাত, কত অত্যাচার উৎপীড়ন ঘটিয়াছে তাহা 'ইনকুইজিসনের (Inquisition) ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে 'ক্রুসেড্' (Crusade) বা জেহাদ্এর যুদ্ধ-ব্যাপারও তাহার অন্যতম প্রমাণ। ভারতবর্ষেও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংঘর্ষে কত লোক অত্যাচারিত, উপদ্রুত ও নিহত হইয়াছে, তাহাও ইতিহাসে বর্ত্তমান। তার পর কৃপাণ হস্তে কোরাণ প্রচারের প্রয়াসের ফল হইতেও ভারতবর্ষ রক্ষা পায় নাই। মামুদ হইতে ঔরঙ্গজেব পর্য্যন্ত ইহার প্রমাণ শত শত ভগ্ন, লুণ্ঠিত হিন্দু মন্দিরে ও দেবমূর্ত্তিতে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় এই বিবাদ কলহের প্রধান কারণ অজ্ঞানতা। পরস্পর পরস্পরকে না জানা, এক জাতির অন্য জাতিকে না বুঝা, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে না চেনা, এক ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া ধারণা,—এই সকলই উক্ত বিবাদের প্রধান কারণ। এই অজ্ঞান হইতেই গোঁড়ামির জন্ম। অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণার চক্ষে দেখা, অন্য ধর্ম্মকে অপকৃষ্ট বলিয়া ধারণা, নিজের মত বা বিশ্বাস ভাল হউক, উহার পোষণ বা সমর্থন করিতে গিয়া অপরের ধর্ম্মমত বা বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ বা অযথা সমালোচনাস্ত্র নিক্ষেপ অথবা উহাকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা, এই সকলের নাম গোঁড়ামি। ঈদৃশ গোঁড়ামি হইতে পৃথিবীতে বিরোধ

বিতণ্ডা অবশ্যম্ভাবী। গোঁড়ামী অজ্ঞানেরই রূপান্তর।

অতএব এই বিরোধ বিতণ্ডা দূর করিতে হইলে, এবং পৃথিবীতে আভ্যন্তরিক, আন্তর্জাতিক ও আন্তর্ধর্ম্মনীতিক শান্তি সংস্থাপন করিতে হইলে প্রথমতঃ এই অজ্ঞানের নিরসন আবশ্যক। প্রকৃত জ্ঞানের প্রচার দ্বারাই উহা সংসাধ্য। কোন এক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা, অথবা কোন মত বিশেষের প্রমাণ চেষ্টা দ্বারা ইহা সুসাধ্য নহে। বরং উহাতে বিরোধ বিতণ্ডা ঘনীভূত হইবার আশঙ্কা আছে, কলহের ভিত্তি আরও দৃঢ় হইতে পারে। ধর্ম্ম প্রচার কখনই নিন্দনীয় নহে, কিন্তু গণ্ডিবদ্ধ প্রচারকের সঙ্কীর্ণতা দোষে অনেক সময় ফল বিপরীত হইতে দেখা গিয়াছে। অপর ধর্ম্মের অবিরোধ কোন এক ধর্ম্মের প্রচার সন্নীতির পরিপোষক, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাও উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণরূপে ফলোপধায়ক নহে। যুগপৎ সকল ধর্ম্মের আলোচনা, সকল শাস্ত্রের অধ্যয়ন যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তত্ত্ব-নিরূপণ ফলে ধর্ম্মজগতের এই দুরবস্থার অনেক পরিমাণে প্রতিকারের আশা করা যায়। এমন একটী মন্দির চাই, যেখানে কোরাণ, বাইবেল, আবেস্তা, ললিতবিস্তার, বেদ, উপনিষৎ, একত্র স্থাপিত ও পূজিত হইবে। যেখানে সকল ধর্ম্মাক্রান্ত লোক একত্র পাশাপাশি দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে, যুগপৎ সকল শাস্ত্রের, সকল ধর্ম্মের বন্দনা, আরাধনা করিবে,—এক মহা সত্যের দিকে আকৃষ্ট হইবে, এক উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইবে; যখন সর্ব্বশাস্ত্রই বন্দনীয়, সকল ধর্ম্মই পূজনীয়, তখন কাহাকেও আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা, এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমন্দিরের সেবকগণের নিকট প্রত্যেক ধর্ম্মই সেই মহাসত্যে পহুঁছিবার এক একটী উপায়, এক একটী পথ। গুরু কৃপায় সর্ব্বশাস্ত্রদর্শিনী মাদাম ব্লাভাস্কি বর্ত্তমান যুগের জন্য এইরূপ একটী ধর্ম্মসংঘের আবশ্যকতা বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি পরাবিদ্যা-সমিতিকে এইরূপ ধর্ম্মসম্মিলনের এক মহামন্দির রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই মহামন্দিরের বেদীতে ত্রিশুল, ক্রুশ, চক্র, চন্দ্রকলা, সমভাবে পূজিত হইতেছে এবং উহার সম্মুখে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সকলেই ভ্রাতৃভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সেই মহাসত্যের জয় ঘোষণা করিতেছে। তাই ইহার অভ্রভেদী উচ্চ চূড়া সমগ্র সভ্য মানব সমাজের লক্ষ্য হইয়াছে এবং, আভ্যন্তরীন উদার নীতি সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় লোকের সহানুভূতি ও প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী, কিন্তু কেন্দ্রস্থল ভারতবর্ষ। আমেরিকায় উহা প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু পরে কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া ভারতে ছুটিয়া আসিল, এবং অল্প সময় মধ্যে শত শত শাখা প্রশাখায় সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইল। ভারত হইতেই ইহার অমোঘ শক্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। এ স্থলে ভারতবর্ষ কেন সমিতির প্রধান কেন্দ্ররূপে মনোনীত হইল, তাহার একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা পূর্ব্বে একবার প্রশ্ন করিয়াছি, এতদ্দেশ থাকিতে সমিতির প্রবর্ত্তকগণ ভারতের দিকে আকৃষ্ট কেন, ভারতকে স্বদেশ বলিয়া আহ্বান করে কেন? ব্লাভাস্কির সহিত পরিচয়ের অনতিপরেই অলকট একদা রাত্রে তাঁহার আমেরিকার গৃহে রুদ্ধদ্বার কক্ষে একাকী বসিয়া পাঠ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব

তেজমণ্ডিত উন্নতকায় মহাপুরুষ দণ্ডায়মান। বিস্ময়াবিষ্ট অলকট যেন যন্ত্রচালিত হইয়া তাঁহার পদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার অন্তর্ভেদী প্রখরোজ্জ্বল অথচ স্নেহকোমল স্থির দৃষ্টিতলে আপনাকে তুলনায় অতি ক্ষুদ্রজ্ঞানে সঙ্কুচিত ভাবে তদীয় আদেশ শ্রবণ করিলেন। অলকট সেই মহাপুরুষের আদেশ উপদেশের রহস্য কথা সাধারণের পক্ষে অনাবশ্যক বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু বলিয়াছেন, সেই মহাত্মার দর্শন ফলেই তিনি স্বদেশের সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া ভারত আগমনে সংকল্পবদ্ধ হইলেন। মহাত্মা অলকটকে কিরূপে ভারতের দিকে চালিত করিলেন, আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের বোধ হয় ভারতভূমি যে এই সার্ব্বজনীন সমিতির কেন্দ্রস্থল হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, বরং সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই পুণ্যভূমিই জগতের সমস্ত প্রধান প্রধান ধর্ম্মের জন্মভূমি,—এ উক্তি একটু বিস্ময়োৎপাদক হইলেও নিতান্ত অলীক নহে। বরং ইহার স্বপক্ষে অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উপস্থিত করিয়া থাকেন। এবিষয়ে জনৈক পণ্ডিত অনুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা নিম্নে উহার কয়েকটীর সারাংশমাত্র অতি সংক্ষেপে প্রদান করিতেছি। *

বাইবেলোক্ত অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল জেন্দাবেস্তা। জেন্দাবেস্তা হইতে য়াহুদিদিগের ধর্ম্মে অনুস্যূত হইয়া পরে বাইবেলে ঐ গুলি গৃহীত হইয়াছে। জেন্দাবেস্তায় বর্ণিত ঈশ্বরতত্ত্ব, সয়তানবাদ, স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্বকথা, সমাধি হইতে পুনরুত্থান, মৃত্যুর পর ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিচারান্তে অনন্তস্বর্গ বা নরক লাভ, জগৎ সৃষ্টিতত্ত্ব, ইত্যাদি য়াহুদি ধর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত। মুসার পঞ্চতন্ত্রে প্রাচীন বাইবেলে, (Pentateuch—Old Testament) এই সকল মত অবিকল উদ্ধৃত। যিশু স্বয়ং য়াহুদি ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণপ্রচারিত নব্য বাইবেলেও (New Testament) এই সকল ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ অনুমোদিত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের ধর্ম্মমত গুলিও অবিকল ঐরূপ। বাইবেল ও কোরাণের সাদৃশ্য দেখিবার জন্য বেশী আয়াসের প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ জুরোস্ত্রীয় (Zoroastrianism), য়াহুদীয় (Judaism), খ্রীষ্টীয় এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মমতগুলি এক ছাঁচে ঢালা। ইহাদের মধ্যে জুরোস্ত্রিয় জেন্দাবেস্তার ধর্ম্মই প্রাচীনতম। ইহারই ধর্ম্মমতগুলি ক্রমে য়াহুদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্য দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন মহম্মদীয় ধর্ম্মের অন্তস্থল স্পর্শ করিয়াছে। য়াহুদীয়, খ্রীষ্টীয় এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মের সাদৃশ্য অনেকটা অনুভবগম্য, কেন না, এই তিনটীই সেমিটিক জাতীয় ধর্ম্ম, এবং ইহাদের জন্মস্থানগুলি পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী। কিন্তু য়াহুদীয় ধর্ম্ম কি প্রকারে জুরোস্ত্রিয় ধর্ম্মের ছায়া প্রাপ্ত হইল, ইহা অনুসন্ধানযোগ্য। অনুসন্ধান ফলে ইহার যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই :—

১মতঃ,—প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্পিগেল (Dr. Spiegel) বলেন, জুরোস্তার এবং এব্রাহাম সমকালীন লোক, এবং এক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। বাইবেলের মতে এব্রাহামের সময় খ্রীষ্ট জন্মিবার ১৯২০ বৎসর পূর্ব্বে। এব্রাহাম য়াহুদি জাতির পিতামহ স্থানীয়। ইঁহারা যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন, উহার নাম 'আরাণ', 'হারাণ' বা 'আর্য্যনাম বিগ'

---

* "The Fountain head of religion" (by Ganga Prosad, M. A. M. R. A. S.) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(আর্য্যদিগের বীজভূমি)। উহা পারস্যের পূর্ব্বস্থিত অকসাস (Oxus) এবং জাকসারটিস (Jaxartes) এই দুই নদের মধ্যবর্ত্তী দেশ।

২য়তঃ,—আবেস্তা এবং বাইবেলের প্রাচীনাংশ (Old Testament) উভয়ই খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অলেকজান্দ্রিয়া নগরে গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়। ইহা উক্ত উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে ভাব বিনিময়ের একটী প্রকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

৩য়তঃ,—খ্রীঃ পূঃ ৫৮৭ অব্দে বাবিলোনের বিখ্যাত রাজা নেবুসাদনেজর পালেস্তিন নগর আক্রমণ পূর্ব্বক অনেক য়াহুদিকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই ঘটনা ইতিহাসে বাবিলোনীয় অবরোধ (Babylonian Captivity) নামে প্রসিদ্ধ। এই আক্রমণ ফলে য়াহুদিদিগের সাহিত্য গ্রন্থাদিও বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রায় এক শতাব্দী পরে পারস্যের রাজা সাইরাস্ বাবিলোনের সাম্রাজ্য উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং অনেক যাহুদিগকে জারুসেলমে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আপনাদের লুপ্ত হিব্রু সাহিত্যের পুনরুদ্ধার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। ইহার পরেই এজ্রা (Ezra) ও নেমায়া (Nehemiah) খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে প্রাচীন বাইবেলের প্রথম গ্রন্থ পঞ্চক (Pentateuch) সঙ্কলিত করেন। ইহা দ্বারা পারসিকদিগের ধর্ম্ম ভাব কিরূপে য়াহুদি ধর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইল, তাহা বুঝা যায়। মাদাম ব্লাভাস্কি এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। শুধু তাহাই নহে। তিনি বলেন, উক্ত গ্রন্থ পঞ্চকের প্রকৃত রচয়িতা এজ্রা ও নেমায়া, মুসা (Moses) নহে। *

[illegible] ধর্ম্মের উক্ত ধর্ম্মমতগুলি যেমন জুরোস্ত্রীয় ধর্ম্মমূলক য়াহুদীয় ধর্ম্ম হইতে গৃহীত, তেমনি উহার নৈতিক অংশগুলি বৌদ্ধনীতির ছায়াবলম্বনে রচিত। ইহা এত সুস্পষ্ট যে, দৃষ্টিমাত্রেই প্রতীয়মান হয়, এবং ঐ সকল খ্রীষ্টীয় নীতির উৎপত্তিস্থল কোথায়, তাহা অনায়াসে আবিষ্কৃত হইতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মের দয়া, দাক্ষিণ্য, দীনতা, ক্ষমা ইত্যাদি ভাব-প্রধান ধর্ম্মনীতিই খ্রীষ্টীয় নীতির বিশেষত্ব। কেবল ইহাই নহে, 'যীশুর জীবন-চরিত' (Life of Jesus) নামক গ্রন্থের রচয়িতা খ্রীষ্টভক্ত রেনান (Renan) বলেন,—

"We find in the Budhist books parables of exactly the same tone and the same character at the Gospel parables" "But there is nothing in Judaism which could have furnished with a model for the parables." *

অর্থাৎ, বাইবেলে শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে সব গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে, উহার রীতি প্রকৃতি ঠিক বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত গল্পগুলির অনুরূপ। য়াহুদীয় ধর্ম্মে ইহার কিছুই নাই। কাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মঠনির্ম্মাণ প্রণালী, মঠসংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান-প্রণালী, বৌদ্ধমঠ ও ধর্ম্মের এত অনুগামী যে, উভয়ে সাদৃশ্য অতীব বিস্ময়কর। খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজক আব্বে হক্ (Abbe Huc) তিব্বত ভ্রমণান্তে বলিয়াছেন,—

"বৌদ্ধ লামাগণের বেশভূষা, সঙ্গীত সাহচর্য্যে উপাসনা প্রণালী, কৌমার ব্রহ্মচর্য্য,

---

* Vide "Secret Doctrine" Vol. I, by H. P. Blavatasky.

* Vide R. C. Dutt's "History of Civilization in Ancient India" vol. II.

সন্ন্যাস, মহাপুরুষ পূজা, উপবাস প্রথা,—ইত্যাদি অবিকল আমাদের অনুরূপ।" *

এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে বৌদ্ধ গ্রন্থের সুবিখ্যাত অনুবাদক রিস্ ডেভিড্স (Rhys Davids) মহোদয় বিস্ময়ব্যঞ্জক বাক্যে বলিয়াছেন :—

"If all this be chance it is a most stupendous miracle of circumstanecs—it is in fact ten thousand miracles"

অর্থাৎ, "এ সকল সাদৃশ্য যদি কেবল আকস্মিক ঘটনা মাত্র হয়, তবে ইহার তুল্য বিরাট দৈব ব্যাপার আর হইতে পারে না, বস্তুতঃ ইহা অযুত প্রমাণ দৈব ঘটনার সঙ্গে তুলনীয়।"

কিন্তু এই সাদৃশ্যের মূলানুসন্ধান করিলে 'প্রমাণাভাবাৎ' বলিয়া দৈবের আশ্রয় গ্রহণ করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। খ্রীষ্টের জন্মের বহুপূর্ব্বে বৌদ্ধ-প্রচারকগণ গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন। অশোকের শাসন লিপিতে দৃষ্ট হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের পতাকা সিরিয়া দেশেও উড্ডীন হইয়াছিল। খ্রীষ্ট জন্মের এক শত বৎসর পূর্ব্বে পালাস্তিনে (Palestine) একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল! উক্ত সম্প্রদায় 'এসেনিস্' (Essenes) নামে খ্যাত, এবং উহা যে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই একটী শাখা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এমন কি, খ্রীষ্টের অভিষেক গুরু জন্ (John the Baptist) স্বয়ং একজন 'এসেনিস' ছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মিশরের তদানীন্তন 'থেরাপিউট' (Therapeuts) নামক সম্প্রদায় এই এসেনিস দিগেরই অন্যতম শাখা বলিয়া পরিগণিত।

সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উপর কিরূপে বিস্তার লাভ করিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহা দেখিয়াই বোধ হয়, ইংলণ্ডের মুক্তি পথপ্রদর্শক সেই রোমীয় মহাজন সেণ্ট অগস্তিন (St. Augustin) বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—

"যাহা অধুনা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ, তাহা প্রাচীন জাতিগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল,—এমন কি, মনুষ্য সৃষ্টির সময় হইতেও তাহার অভাব ছিল না। খ্রীষ্ট আবির্ভূত হইবার পর সেই পূর্ব্ব-প্রচলিত প্রাচীন সত্য ধর্ম্ম খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ হইল।*

যাঁহারা সাম্প্রদায়িক খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে একমাত্র মুক্তির উপায় বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করেন, এবং তৎবহির্ভূত নরনারী মাত্রের জন্য অনন্ত নরক ব্যবস্থা করেন,—সেই আধুনিক খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-যাজকদের মতে এবং মহাত্মা সেণ্ট

---

* এ সম্বন্ধে আর্থার লিলি (Mr. Arthur Lillie) নামক অপর একজন লেখক বলেন—"The good Abbe has by no means exausted the list and might have added confessions, tousure, relic worship, the use of flowers, lights and images before shrines and alters. the signs of the cross, the trinity in unity, the worship of the queen of heaven, the use of religious books in a tongue unknown to the bulk of the worshippers, the aureale or nimbus, the crown of Sainto and Budhas, waifs to angels, penance, flagellations, the flabellum or fan, popes, cardinals, bishops, abbots, presbyters, deacons, the various archetectural designs of the Christian temple."

Quoted in R. C. Dutt's Ancient India, vol. II.

* What is now called the Christian religion had existed among the ancients, and was not absent from the beginning of the human race, until Christ came in the flesh, from which time the true religion, which existed already, began to be called Christianity.—Quoted in "The Fountain-head of religions."

অগস্তিনের উল্লিখিত উক্তিতে যেন আকাশ পাতাল প্রভেদ।

পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানবের আরাধ্য এই মহান্ বৌদ্ধ ধর্ম্ম বেদ মাতারই সন্তান, এবং উহা এই ভারতেই সঞ্জাত, বর্দ্ধিত, সুংপুষ্ট ও আচরিত। তারপর যে পারশিক ধর্ম্মের ছায়া বাইবেলে, এবং বাইবেলের মধ্য দিয়া কোরাণে প্রতিবিম্বিত, সেই পারশিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জুরোস্তারের সহিত বেদ-ব্যাসের মিলন হইয়াছিল,—ইহা ঐ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে। তাহা হউক বা না হউক, আবেস্তা গ্রন্থোক্ত মন্ত্র, স্তুতি প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্র, স্তুতির এত অনুগামী যে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আবেস্তা ও বেদধর্ম্মাবলম্বী, উভয়েই আর্য্য নামে অভিহিত। উভয়েরই মতে উপনয়ন সংস্কার পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকৃত। গোসেবা উভয়েরই নিত্য ধর্ম্ম। পারসিকদের যজ্ঞ বিধি, অগ্ন্যুপাসনা, বেদোক্ত হোমানুষ্ঠানেরই স্পষ্ট অনুকরণ। আবেস্তার ভাষা, শব্দ প্রয়োগ, ছন্দোবন্ধ পর্য্যন্ত বৈদিক ভাষাদির কিঞ্চিৎ বিকৃত উচ্চারণ বিশেষ। ঈশ্বর সম্বন্ধে বেদের উচ্চ আদর্শ আবেস্তায় কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরবর্ত্তী বাইবেলে ও কোরাণে ঈশ্বরের প্রতিবল ও সমকক্ষ এক সয়তানের অস্তিত্ব কল্পনা দ্বারা যতটা বিকৃত হইয়াছে, ততটা নহে।

ফলতঃ পারসিকেরা যে ভারতবর্ষ হইতেই ধর্ম্মলাভ করিয়া অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের সম্পূর্ণ অভিমত। পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলেন,—

"জুরোস্ত্রীয় ধর্ম্মাবলম্বীগণ যে পূর্ব্বে উত্তর ভারতে বাস করিত এবং তথা হইতেই পারস্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে, ইহা নিশ্চিত। এমন কি, ভৌগোলিক প্রমাণও উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল।" *

বৈদিক ধর্ম্ম যে অন্য কোন ধর্ম্মের সহায়তা গ্রহণ করে নাই, ইহা পণ্ডিত মোক্ষমূলর মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। † কালের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিলেও বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর ধর্ম্ম গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সকল কথায় প্রমাণীত হয় যে, ভারত-ভূমিই সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষ ভাবে সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি-ক্ষেত্র।

যাহা হউক, ভারতভূমি ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি ক্ষেত্র হউক বা না হউক, উহা যে আজ জগতের অপরাপর দেশাপেক্ষা সকল ধর্ম্মের অধিকতর সমাবেশ-স্থল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রায় সহস্র বৎসর গত হইল, মুসলমান এদেশে আসিয়াছে। তদবধি মুসলমান ধর্ম্ম হিন্দু স্থানে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। তবে দুঃখের বিষয়, জ্ঞানের আলোকে নয়, গোঁড়ামির অন্ধকারে। বাক্যে বা যুক্তিতে না পারিলে বল প্রয়োগে, অধিকাংশ স্থলে, শেষোক্ত উপায়েই ধর্ম্ম প্রচারিত হইত। অন্য উপায়ও ছিল, যেমন, অখাদ্য খাওয়াইয়া, বা ছলনায় 'কলমা' পড়াইয়া হিন্দুকে স্বধর্ম্ম-চ্যুত করা

---

* The Zoroastrians were a colony from North India * * * It can now be proved even by geographical evidence that Zoroastrians had been settled in India before they emigrated into Persia &c &c." "Chips from a German Workshop." Vol I.

† The Vedic religion was the only one the development of which took place without any extraneous influences. · Even in the religion of the Hebrews, Babylonian, Phœnician, and at a later time Persian influences have been discovered.—"India, what can it teach us."

হইত। ইহাও বল প্রয়োগের রূপান্তর। জ্ঞানের আলোকে হইলে, পরস্পর পরস্পরকে জানিত, চিনিত, বুঝিত। জ্ঞানের আলোকে হইলে অস্ত্রাঘাত, নরশোণিতপাত, কলহ, বিবাদের কোন অবসর থাকিত না। এই গোঁড়ামির বিষময় ফল স্বরূপ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্যের বীজ অদ্যাপি, সহস্র বৎসর পরেও, সমাজ-শরীর হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। সময়ে সময়ে এক এক জন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া এই শুষ্ক মরুতেও বন্যা বহাইয়া প্রেমাঙ্কুর জন্মাইয়া গিয়াছেন। এক দিকে কবীর, নানক, ও তৎপরবর্ত্তী গুরু সম্প্রদায় এই পরস্পর বিবদমান জাতিদ্বয়ের সংযোগকর এক মিলনসূত্র ধারণ করিয়াছিলেন। অপর দিকে আমাদের এই বঙ্গদেশে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ কি এক অপার্থিব মত্ততায় দেশ মাতাইলেন, যাহাতে,

হাসিয়া কান্দিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি
কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥

শুধু চণ্ডালে ব্রাহ্মণে নহে, দেখিতে পাই, হিন্দু মুসলমান পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিতেছে। কিন্তু এই প্রেমভাবও জনসাধারণ কর্ত্তৃক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বিশেষের প্রচার-মূলক বোধে, বিস্তৃত রূপে মুসলমান-সমাজ-শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে নাই, এবং রাজ-শক্তি প্রতিকূল থাকায় উপযুক্ত রূপে ফল প্রসব করিতে পারে নাই। বরং ঐ সকল মহাপুরুষদিগের অনুবর্ত্তী কোন কোন মহাত্মাকে কিরূপ লোমহর্ষণ নির্য্যাতন, অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। গোঁড়ামি দানবের দলন কি কঠিন কার্য্য! সেই সময়কার এক মাত্র উদারনৈতিক সম্রাট আকবর হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের আচার্য্যদিগকে একত্র করিয়া এক ধর্ম্ম-সংঘ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং রাজ্য মধ্যে আপামর সাধারণ সকলকেই বিনা বাধায় স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মাচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার এই মহত্ত্বের জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইবার উপযুক্ত। বস্তুতঃ হিন্দুগণ বোধ হয় এই জন্যই আকবরকে চিরকাল প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিতেছে। কিন্তু সম্রাট আকবরকে সাধারণ প্রজার ন্যায় নির্য্যাতন ভোগ না করিতে হইলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট অনেক নিন্দাবাদ সহ্য করিতে হইয়াছে। এমন কি, তিনি ইস্লাম ধর্ম্মে অনাস্থাবান, কপট এবং স্বধর্ম্মের অনিষ্টকারী বলিয়া কোন কোন মুসলমান-লেখক কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছেন। এবং অনেকের মতে পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপকারী, অধীন প্রজার মর্ম্মচ্ছেদকারী ঔরঙ্গজেব আকবর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া অবধৃত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সম্রাট আকবরের চেষ্টাও সফল হয় নাই। তাই বলিতেছি, জ্ঞানের আলোকে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত বা গৃহীত হইলে এদেশে বিপরীত ফল প্রসব করিত না। যাহা হউক, মুসলমানের আগমনাবধি এতাবৎ কাল যে রূপেই হউক, মুসলমান ধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, ফলে আজ কোন স্বাধীন মুসলমান রাজ্যাপেক্ষা ভারতে মুসলমানের সংখ্যা বেশী ছাড়া কম হইবে না। এবং তাহাদের ধর্ম্মালোচনারও অনেক সুযোগ আছে, এবং খুব উৎসাহের সহিতই হইয়া থাকে।

মুসলমানের পর অনেক যুরোপীয় জাতি এদেশে বাণিজ্যোর্থ আসিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম প্রচারও করিতে লাগিল। পর্ত্তুগীজদিগের প্রবেশাবধি এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের অল্পাধিক পরিমাণে প্রচার চলিতেছে। তৎপর ইংরাজ রাজত্ব স্থিরতর হইলে, কেরি, মার্সমান, ওয়ার্ড-প্রমুখ প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-যাজকগণ শ্রীরামপুরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার কল্পে বিশেষ আয়োজন করিলেন। মিশনরি স্কুল কলেজ স্থাপিত হইয়া সেই সময়ে ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাইবেলের, ধর্ম্মতত্ত্বও যুবকগণের মস্তিস্কে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ফলে, দলে দলে হিন্দু যুবকেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে পীড়ন, অত্যাচার, বল প্রয়োগ, অস্ত্রস্ফালন ছিল না বটে, কিন্তু এ ধর্ম্ম প্রচারও সম্পূর্ণ জ্ঞানের আলোকে হয় নাই। কেন না, ইহাতেও সত্যাপেক্ষা পরধর্ম্মের প্রতি সেই ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং গোঁড়ামি অধিকতর পরিমাণে মিশ্রিত ছিল। তাহা ছাড়া হিন্দু সন্তানগণ আপন ধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধানে তখন একান্তই বিমুখ ছিল। হিন্দুর দর্শন, উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতি অমূল্য শাস্ত্র গ্রন্থরত্ন তখনও কীটদষ্ট তাল পত্র ও দুর্ব্বোধ্য হস্তলিপির সমুদ্র তলে নিমগ্ন। যে কতিপয় টোলের পণ্ডিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন, তাঁহারা সেই অগাধ জলসঞ্চারী মকর তিমির সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারেন, কিন্তু বাহিরের আলোক সে স্থলে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না, তাঁহারাও উহা ভালবাসিতেন না। সুতরাং সেই সময়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানের আলোকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত, বা গৃহীত হয় নাই। ঐ সকল গ্রন্থ তখন সম্যক্ প্রচারিত, বা আলোচিত হইলে উহাদের আলোক সম্পাতে প্রচারকের ধর্ম্ম-তত্ত্ব কিরূপ দেখাইত, বা উহা অবলম্বনের কোন প্রয়োজন হইত কি না, তাহা অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঘটনাতেই সুস্পষ্ট।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই অতলমগ্ন হিন্দুর বেদ উপনিষদের উদ্ধারকর্ত্তা। ঐ সকল গ্রন্থের কিয়দংশ প্রকাশিত হইলেই লোকেরা যাহা দেখিতে পাইল, তাহাতে ইংরাজি শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পথ একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা স্বগৃহে ফিরিয়া স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ-সঞ্চিত সেই উদ্ধৃত রত্নের জ্যোতিতে মোহিত হইল। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ প্রথমতঃ হিন্দুসমাজের একাঙ্গীভূত হইয়াই ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতেছিল। তাঁহার মূল উদ্দেশ্য বোধ হয়. এরূপ ছিলনা যে, ঐ সমাজ হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রূপান্তরিত হয়। তাঁহার বেদান্ত গ্রন্থাদির অনুবাদ ব্যাখ্যা ইত্যাদি দেখিলে তাঁহাকে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের পথানুগামী বেদান্ত ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। * এবং তাঁহার লিখিত মাতামত দেখিয়া অনেকে এরূপ অনুমান করেন যে, তৎপ্রচারিত নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা অধিকার তত্ত্বকে বাদ দিয়া একটী পৃথক ধর্ম্মের আকারে পরিণত হয়, ইহা তাঁহার কল্পনা ছিল না। তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে অভীপ্সিত সংস্কার ক্রম শিক্ষার দ্বারা হিন্দু সমাজের অভ্যন্তর হইতেই উদ্ভূত হইত, তজ্জন্য সমাজ ত্যাগ করিয়া বাহিরে

---

* রাজা রামমোহন রায় কৃত বেদান্ত গ্রন্থাদির অনুবাদ সম্পূর্ণ রূপে শঙ্কর মতানুযায়ী। যথা, এক স্থানে তিনি লিখিতেছেন :—

"ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ হয়েন, যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার হয়; এবং উপাদান কারণ

যাইবার কোন প্রয়োজন হইত না। তাহার প্রমাণ মহাত্মা দয়ানন্দ স্বরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজের কার্য্য প্রণালীতে পরিদৃষ্ট হয়। এই সমাজের অধিকাংশ সভ্য গুণকর্ম্ম-নিরপেক্ষ জাতিভেদের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়াও এবং নিরাকারবাদের আনুষ্ঠানিক প্রচারক হইয়াও সনাতন সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া আছেন, এবং থাকিয়া তাঁহাদের লক্ষ্যানুযায়ী ক্রমশিক্ষা দ্বারা পুরাতন সমাজকে দয়ানন্দের আদর্শ অনুরূপ সংস্কৃত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অথচ পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু সমাজ' যে বঙ্গদেশ অপেক্ষা বেশী শিথিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না, বরং ইংরাজি শিক্ষার অপেক্ষাকৃত অল্প প্রসার হেতু ঐ অঞ্চলের সামাজিক শাসন ও কঠোরতা বেশী হওয়াই সম্ভব। রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী আচার্য্য ও ব্রহ্মোপাসকগণ হিন্দু শাস্ত্রের একটী প্রধান সত্য অধিকার-তত্ত্ব একেবারে ভুলিয়া গিয়া জ্ঞানী মূর্খ সকলের নিকট নিরাকার-বাদ প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং সময়ের পরিপক্কাবস্থায় যাহা সম্ভব, সেই সকল সংস্কারে তৎপূর্ব্বেই হস্তক্ষেপ করিয়া কিঞ্চিৎ সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত করতঃ একটী পৃথক সমাজে পরিণত হইলেন। পূর্ব্বইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, হিন্দু শাস্ত্রসম্মত অনেক ধর্ম্মমত প্রচলিত সমাজ ধর্ম্ম হইতে সাময়িক পৃথকত্ব অবলম্বন করিয়া কালক্রমে পুনরায় উহারই কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে। সনাতন সমাজের এই অদ্ভুত পরিপাক ও পরিপোষণ শক্তি দেখিয়া অধুনাতন ব্রাহ্মসমাজের শেষ পরিণতি ঐরূপ হইবে, কিনা কে বলিতে পারে? যাহা হউক, উপরে দেখা গেল যে, ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক হিন্দু শাস্ত্রের এক দেশ মাত্র প্রচারিত হইতেছিল। এই একদেশ-দর্শিতা সর্ব্বতোমুখী জ্ঞানের পরিচায়ক নহে। সুতরাং ইহা দ্বারা কখনই বিভিন্ন ধর্ম্ম মতের সমন্বয় ও সত্যাবিষ্কার দ্বারা মত-ভেদ-জনিত কলহ বিবাদ ও পরস্পর ঘৃণা বিদ্বেষের নিবৃত্তি হইতে পারে না।

যেমন সত্য রজ্জুতে যখন ভ্রম দ্বারা সর্প হয়, তখন সেই মিথ্যা সর্পের উপাদান কারণ সেই রজ্জু হইয়া থাকে, অর্থাৎ রজ্জুকে সর্পাকারে দেখা যায়, আর যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ হয়, অর্থাৎ ঘটাকারে মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ হয়।"

"ব্রহ্ম আত্ম সংকল্পের দ্বারা আপনি আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত নাম রূপের আশ্রয় হইয়াছেন, যেমন মরীচিকা অর্থাৎ মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্যের রশ্মিতে যে জল দেখা যায়, সেই জলের আশ্রয় সূর্য্যের রশ্মি হয়, বস্তুতঃ সে মিথ্যা জল সত্যরূপ তেজকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় দেখায়, সেইরূপ মিথ্যা নাম রূপময় জগৎ ব্রহ্মের আশ্রয়ে সত্যরূপে প্রকাশ পায়। নাম আত্মায় রূপ যাহা দেখ, সে সকল কল্পনা মাত্র, বস্তুতঃ ব্রহ্ম সত্য হয়েন, অতএব নশ্বর নামরূপের কোনমতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যাইতে পারা যায় না।'

রাজার নিম্নলিখিত মন্তব্য তাঁহার শাঙ্কর মতানুরাগিতার স্পষ্ট পরিচায়ক :—

যদ্যপিও ভগবান আচার্য্যের কৃত ভাষ্যকে মোহের লিখিত করিয়া কহা সকলেরই দুষ্কৃতের কারণ হয়, তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-দিগের অত্যন্ত অপরাধজনক হইবেক, যেহেতু পূজ্যপাদ ভগবান ভাষ্যকারের শিষ্যানুশিষ্য প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন, সেই ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন, আর শ্রীধর স্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের শিষ্য শ্রেণীতে ছিলেন, তাঁহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কি অন্য সম্প্রদায়ে সর্ব্বদা মান্য এবং চৈতন্য দেবও ঐ টীকাকে মান্য করিয়াছেন, আর সেই শ্রীধর স্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখেন যে, ভাষ্যকার মতং সম্যক্ তদাখ্যাতৃ গিরিস্তথা ইত্যাদি।—রামমোহন রায়-কৃত বেদান্তসারের বঙ্গানুবাদ।

এইরূপে ভারতবর্ষ হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মের সমাবেশ স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে এক্ষণে প্রবল নহে, তথাপি ভারত-রূপ মধ্যমণির বেষ্টনি রেখার পাদাংশ মাত্রে মুসলমান ধর্ম্ম এবং অপর তিন অংশে বৌদ্ধধর্ম্ম উজ্জ্বল ভাবে অবস্থিত। বিশেষতঃ, ভারতই সমগ্র বৌদ্ধ জগতের একমাত্র মহাতীর্থ। সুতরাং ভারতবর্ষই যে পরাবিদ্যা সমিতির কেন্দ্রস্থল হইবার উপযুক্ত, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

তারপর, এমন সময় পরাবিদ্যা সমিতির উদ্ভব হইল, যখন এই ভারতেই উক্ত বিভিন্ন ধর্ম্মের সংঘর্ষ জনিত এক বিরাট কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। কোথাও বিপ্লব, কোথাও পরস্পর আক্রমণ, কোথাও তিল মাত্র সত্যের সঙ্গে তাল পরিমাণ নিন্দা, পরিবাদ, কলহ, বিবাদ, বিমিশ্রিত। সুতরাং শান্তির পতকাধারী সর্ব্ব বিবাদের অন্তকারী পরাবিদ্যা-সমিতির কেন্দ্রস্থল যে ভারতবর্ষ মনোনীত হইল, ইহা অতীব সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ ইহা যেন এক প্রকার উক্ত সময়ের প্রয়োজনোচিত বিধি-নির্দ্দেশ বলিয়াই অনুমিত হয়।

আরও এক কথা এই যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সমাবেশ-স্থল হইলেও ইহা হিন্দু প্রধান দেশ। হিন্দু ধর্ম্মের একটী প্রধান নীতি এই যে, প্রত্যেকেই স্ব-ধর্ম্মাচরণে শ্রেয়ঃলাভ করিতে পারে। তজ্জন্য অপর ধর্ম্ম গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। এইরূপ যাহার অন্তর্নিহিত নীতি, তাহার শান্তিপ্রিয়তা স্বভাবসিদ্ধ। হিন্দু সমাজের এই নীতি—যাহা হিন্দুর নিত্যপাঠ্য ভগবৎ স্তুতি গাথায় অতীব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত, যাহার দৃষ্টান্ত প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম গ্রন্থের উপরিভাগে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য, সেই মাহাবাক্যে, "রুচিনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিল পথযুষাং নৃণাং একগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"* "হে দেবদেব! রুচির বৈচিত্র্য হেতু লোকে সরল কুটিল নানা পথাবলম্বী হইয়া তোমাকে পাইবার জন্য ছুটিতেছে, অম্বুকণার শেষ গতি যেমন একমাত্র অর্ণব, তেমনই দেব, নানা ধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই একমাত্র শেষ গতি তুমি,—হিন্দু সমাজের এই উদার নীতিই পরাবিদ্যা সমিতির মিলন-মন্দিরের উপর খোদিত। সুতরাং ইহার প্রচারিত সত্যের অনুকূল ক্ষেত্র এই হিন্দুর দেশ ভিন্ন আর কোথায় হইবে? সেই জন্য এই সমিতি ভারতে পদার্পণ করিবামাত্র শান্তিপ্রিয় হিন্দু উহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক স্বগৃহে আহ্বান করিয়া আনিল।

আর্য্যঋষি সেবিত উপরোক্ত সত্যের উপর স্থাপিত শান্তিবার্ত্তা আমেরিকার মুখ দিয়া নবভাবে পুনরায় ভারতে ঘোষিত হইল। আবার উহার প্রায় সমকালে ঐ সত্যের প্রকট মূর্ত্তি স্বরূপ আর এক শক্তি এ দেশেই কলিকাতার অদূরে দক্ষিণেশ্বরের কালী-মন্দিরে জাগরিত হইতেছিল। এই শক্তি এক দরিদ্র, "মূর্খ" ব্রাহ্মণ সন্তানের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইল। ইহাঁর জন্ম পল্লীগ্রামে, ব্যবসায় "পূজারি-গিরি," বিদ্যা অক্ষর পরিচয় মাত্র। কিন্তু ইহাঁর অপার্থিব প্রেম, বৈরাগ্য, ত্যাগ, ইহাঁকে সচ্চিদানন্দ-ধাম হইতে আগত কোন দুর্জ্ঞেয় মহাজীব বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিল। ইহাঁর অদ্ভুত চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহাঁর চরণ তলে একত্রিত হইতে লাগিল। নিরা-

---

* মহিম্ন স্তব বলিয়া খ্যাত, শ্রীমহাদেব-স্তোত্র।

কারবাদী, সাকারবাদী, অজ্ঞেয়বাদী, নাস্তিক, বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলে দলে দলে সেই মাতৃপ্রেমে বিভোর শিশুর ন্যায় সরল ব্যক্তির নিকট সত্য নির্ণয়ার্থ উপস্থিত হইতে লাগিল, আর তাঁহার সেই কৃষকের ভাষায় কথিত তত্ত্ব-কথা অমৃত অপেক্ষা মধুর বোধে পান করিতে লাগিল। পরাবিদ্যা-সমিতির তত্ত্ববাণী প্রধানতঃ ইংরাজি ভাষায় এবং কৃতবিদ্য সমাজেই প্রচারিত হইত। দক্ষিণেশ্বরের সেই নিরক্ষর আত্মহারা ব্রাহ্মণের পক্ষে ঐ সমিতি বা উহার প্রবর্ত্তকদিগের পূর্ব্বে কোন পরিচয় পাইবার উপায় বা অবসর ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার মুখ হইতেও সেই শান্তি বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল। দক্ষিণেশ্বর সর্ব্ব ধর্ম্ম সম্মিলনের এক পুণ্য-ক্ষেত্র হইল। আর তিনি কিরূপে সেই মহা সত্যে উপনীত হইলেন, তাহা জানিয়া লোকে অবাক্ হইল। তাঁহার জ্ঞান পুস্তকলব্ধ নহে, তর্কযুক্তির উপর স্থাপিত নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষ। তিনি পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম নিজে অনুষ্ঠান করিয়া বুঝাইলেন যে প্রত্যের ধর্ম্মই ঈশ্বর-প্রাপ্তির এক একটী পথ। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়"—এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। এই পুরুষোত্তমের চরিত্র বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইহাঁর ভিতর এই যুগলীলার নিদর্শন পাইতেছি যে, ইনি পরাবিদ্যা-সমিতির উৎপত্তির প্রায় সমসময়ে আবির্ভূত হইয়া একই সত্যের প্রচার করিতেছিলেন। পরাবিদ্যা-সমিতি যাহা জ্ঞান, বিজ্ঞান, তর্ক যুক্তির দ্বারা বুঝাইতেছিল, ইনি তাহাই প্রেম, ভক্তি, কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা সপ্রমাণ করিতেছিলেন। একদেশ-দর্শিতা, গোঁড়ামি, "মতুয়ারি-বুদ্ধি (Dogmatism), পরম সত্য লাভের এই সকল অন্তরায়ের মূলে কুঠারাঘাত হইতে লাগিল। নিরাকারবাদ, সাকারবাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, সকলই এক সূত্রে গাঁথা, কোন বাদেই বিতণ্ডার কারণ নাই, অনুক্ষণ চিন্ময়ী লীলার সমুদ্রাবগাহী সেই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব জীবনে ইহা সকলে প্রত্যক্ষ করিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই সমুদ্রে সেই সর্ব্বধর্ম্ম-মিলন-বায়ুর অনুকূলে আপন তরী ভাসাইয়া দিলেন। তাঁহার নাবিকত্বে এই তরী কোথায় গিয়া ঠেকিল, এস্থলে সে বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু ইহাও সেই যুগধর্ম্মের একটা দিক নির্দ্দেশ করিতেছে। মহাপুরুষের ভাব-মথিত চিৎ সমুদ্রে আর একটী তরঙ্গ জলধির অপর পারে আমেরিকার কূলে গিয়া আঘাত করিল, এবং চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভা প্লাবিত করিয়া পরাবিদ্যা-সমিতি কর্ত্তৃক কর্ষিত পূর্ব্বপ্রস্তুত ক্ষেত্রে বেদান্তোক্ত জ্ঞান ভক্তি বীজ রোপিত করিল। আমেরিকা হইতে যে তরঙ্গ প্রাচ্যের প্রাচীন বার্ত্তা বহন করিয়া ভারতে আসিয়াছিল, অনতিদীর্ঘকাল পরে উহারই প্রতিদান স্বরূপ ভারত হইতে একটী তরঙ্গ আমেরিকায় গিয়া উপস্থিত হইল। এই ভাব-বিনিময় সেই যুগধর্ম্মেরই বিকাশ, সেই ঐকতানেই মুখরিত।

পরাবিদ্যা সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য যে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ভিত্তিস্থাপন। তদ্দ্বারা জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-মূলক বিদ্বেষ ভাব পৃথিবী হইতে তিরোহিত করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। তুমি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হও না কেন, এই সমিতির সভ্য হইলে অপর ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করা তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ। তুমি নিজে যে সম্মান চাও, অপরকে সেই সম্মান দিতে তুমি বাধ্য। পরাবিদ্যা-সমিতি

সর্ব্বপ্রথম ইহাই চায়। সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হউক, ইহাই সমিতির প্রধানতম কামনা।

সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, প্রথম উদ্দেশ্যেরই পোষক। জগতের ধর্ম্মতত্ত্ব এবং তৎসংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থাদি যতই আলোচনা করা যায়, ততই অনুভব হয় যে, সকল ধর্ম্মেরই মূল ভিত্তি এক। কাল সহকারে প্রত্যেক ধর্ম্মের উপরই কতকগুলি আবর্জ্জনা জমিয়াছে! সে গুলি সংস্কারযোগ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে গুলিকে অপসারিত করিতে গিয়া ধর্ম্মটী পর্য্যন্ত মিথ্যাজ্ঞানে ত্যাগ করা, অর্থাৎ সংস্কারের নামে সংহার ক্রিয়া, সূক্ষ্মদর্শীর কার্য্য নহে! বাহ্যিক আচার ব্যবহার সংক্রান্ত যাহা কিছু বিভিন্নতা, তাহার অধিকাংশই দেশ-কাল অবস্থাজাত। সে বিভিন্নতা অপরিহার্য্য, অথচ উহা মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র মারাত্মক নহে। কারণ মূলধর্ম্ম সর্ব্বত্রই এক। * ধর্ম্মের বাহ্যাংশ লইয়াই প্রায়শঃ কলহ বিবাদ হইতে দেখা যায়। কিন্তু বিশেষ অনুধারণ করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, এই বাহ্যাংশেরও মূল ভিত্তি এবং চরম লক্ষ্য এক। অতএব বিবাদের মূলহেতু অজ্ঞান এবং বিরুদ্ধবাদীর অতথ্য প্রতিপাদন প্রয়াস (Misconception and Misrepresentation)। সকল ধর্ম্মের সম্যক আলোচনার অভাব বশতঃই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যতই ঐ সকল শাস্ত্রের আলোচনা ও বিচার হইবে, ততই পরস্পরের মধ্যে একত্ব অনুভূত হইবে। সুতরাং সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও প্রথম উদ্দেশ্যেরই অনুসরণ করিতেছে। এজন্যই সমিতি সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকে।

সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞানের প্ররোচক। পরন্তু ইহাও প্রথম উদ্দেশ্যেরই পোষক। আত্মানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, প্রকৃত আমি যাহা, তাহা পাঞ্চভৌতিক শরীর নহে। শরীরের ধ্বংশ অনিবার্য্য, কিন্তু আমার প্রকৃত সত্ত্বার ধ্বংশ নাই। এবং প্রকৃত 'আমি' ও 'তুমি'র মধ্যে ভেদ-জ্ঞান অসম্ভব। উহা এক অবিভক্ত অমৃত সিন্ধুর কণা। সুতরাং এই আত্মানুসন্ধান, ভ্রাতৃভাব কেন, সর্ব্বজীবে আত্মদর্শনের সোপান স্বরূপ।

অতএব পরাবিদ্যা-সমিতির প্রতিষ্ঠোপণে বিশ্বমানব হিতার্থে নিয়োজিত ব্লাভাস্কির সুদূর-প্রসারিত মঙ্গল দৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। আর এই বিশ্বমানব হিতায় জীবনোৎসর্গেই ব্লাভাস্কির বিশেষত্ব, মহত্ত্ব, সাফল্য ও পুণ্য প্রতিষ্ঠা।

অতঃপর আমারা এই সমিতি সম্বন্ধে কতক গুলি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

---

* পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলেন,—"There has been no entirely new religion since the beginning of the world.",—অর্থাৎ পৃথিবীর আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন ধর্ম্মই হয় নাই, যাহাকে সম্পূর্ণরূপে একটী নূতন ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

শ্রীমতী আনি বেসান্ত কৃত "Ancient Wisdom" গ্রন্থে ইহা সর্ব্বজাতির শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তত্ত্বসন্ধিৎসুর উহা দ্রষ্টব্য।

ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের অভিভাষণ।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩২২।

সোদর-প্রতিম বন্ধুগণ,—

ত্রিপুরা আমার জীবনের সুখ-স্বপ্ন। যে দিন হইতে প্রাণ-প্রতিম কৈলাসচন্দ্র সিংহ, ভক্ত-সাধক আনন্দচন্দ্র নন্দী, কর্ম্মের প্রকটমূর্ত্তি মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রাজর্ষি বীরচন্দ্র মাণিক্য, পূত-চরিত্র নবদ্বীপচন্দ্র মাণিক্য এবং কৈলাস চন্দ্র দত্ত, দেশহিতৈষী গুরুদয়াল সিংহ এবং তদীয় সহধর্ম্মিণী সাধ্বী গুণময়ী দেবী প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, সেই দিন হইতে ত্রিপুরার সুখ-স্বপ্নে আমি আত্মহারা। বাঙ্গালায় দুটী রাজ্য ছিল, যেখানে বাঙ্গালা ভাষা রাজভাষা ছিল। একটী রাজ্যে বর্ত্তমানে ইংরাজীর প্রচলন হইয়াছে, কিন্তু আগরতলায় বাঙ্গালা ভাষা, চির-প্রচলিত, চির-আদৃত, এবং চির-পূজ্য। বাঙ্গালা-ভাষাঙ্কিত রৌপ্য-মুদ্রা আগরতলা বাদে আর কোথাও দেখা যায় না। যেমন কলিকাতার ঠাকুর পরিবার, তেমনি ত্রিপুরা আগরতলার রাজ-পরিবার বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে সর্ব্বদাই বদ্ধ-পরিকর। বঙ্গদেশের সকলে জানেন না, আগরতলার রাজ-পরিবার বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে কত শতাব্দী ব্যাপৃত। এই বংশের কত কত মহাত্মা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে বদ্ধ-পরিকর, তাহার সংখ্যা হয় না। বীরচন্দ্র মাণিক্য হইতে দেবী অনঙ্গমোহিনী পর্য্যন্ত এই বংশের কত কত জন বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে চেষ্টা করিয়াছেন। আগরতলা হইতে একখানি সুপরিচালিত. মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজপরিবারের ঘরে ঘরে যে সকল পুস্তক লিখিত ও পঠিত হয়, সে সকলের অধিকাংশই অপরিজ্ঞাত। অন্যদিকে অপরিজ্ঞাত ত্রিপুরার অগণ্য হস্তলিখিত পুঁথি। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের পরই, বাঙ্গালার প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিৎ। তাঁহার রাজমালা, দারুব্রহ্ম, সাধক-সঙ্গীত প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গালা ভাষার গৌরব। ঢাকার ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য তৎপর এই বিভাগে সমুদিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে রাখালদাস, আবদুল করিম, অক্ষয়কুমার, নিখিলনাথ, হরিসাধন প্রভৃতি মহোদয়গণ সেই কার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বিদ্যানিধি এম-এ মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শীতলচন্দ্র দুই বিষয়ে এম-এ উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে কৈলাসচন্দ্রের-প্রবর্ত্তিত প্রত্নতত্ত্বানুশীলনে নিযুক্ত হইয়া শুধু ত্রিপুরা নয়, সমগ্র বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষার সুখ-স্বপ্ন আমাদের জীবনের নিয়ামক। সেই সুখ-স্বপ্নের কেন্দ্র ত্রিপুরা। দেশসেবা আমাদের জীবনের ব্রত। ত্রিপুরা দেশসেবা-ব্রতে অদম্য উৎসাহে ব্রতী। সুতরাং ত্রিপুরা আমাদের জীবনের সুখ-স্বপ্ন। ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনী আমার ন্যায় অকৃতী দরিদ্র ব্যক্তিকে এই মহিমান্বিত সভাপতির পদে বৃত করিয়া আমাকে এবং তৎসহ

আমার বংশ এবং দেশকে ধন্য করিয়াছেন। আপনাদের দয়া স্মরণে আমি আজ আত্মহারা। আমি যে দেশকে যৌবন কাল হইতে ভালবাসিয়াছি, সেই দেশের গৌরবান্বিত পদ লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছি। আপনাদিগকে আজ কৃতজ্ঞ হৃদয় ধন্যবাদ দিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছি। বিধাতা আপনাদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করুন।

ত্রিপুরার পশ্চিমে মেঘনা নদী। মেঘনার অপর তীরে ফরিদপুর এবং ঢাকা। দক্ষিণে নোয়াখালি, উত্তর-পশ্চিমে ঢাকা ও ময়মনসিংহ, উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীহট্ট ও পূর্ব্বে স্বাধীন ত্রিপুরা। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থান সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা প্রকৃতির কাম্যকানন। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে নদ নদী, বিল, হাওর, পুকুর, বিটপীশ্রেণী-পরিশোভিত অপূর্ব্ব দেশ। প্রকৃতির এরূপ মধুময় রাজ্য বাঙ্গালার আর কুত্রাপি নাই। যেমন জল, তেমনি বায়ু; যেমন শস্য, তেমনি শিল্প; যেমন অধিবাসী, তেমনি অনুষ্ঠানসমূহ। বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত, কিন্তু ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই হয়। সহরে প্রায় ৪০০ শত পুষ্করিণী এবং দীঘী, কিন্তু কোন পুষ্করিণীর জল খারাপ দেখিবে না। গ্রামে গ্রামে যাও, কুত্রাপি খারাপ জল দেখিতে পাইবে না। ত্রিপুরায় বড় বড় বিল আছে, হাওর আছে, ছোট ছোট নদী, নালা, ডোবা আছে, সকলের জলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনেক সময় ভাবিয়াছি, এ দেশের মৃত্তিকায় এমন কোন জিনিস আছে, যাহাতে জলকে সুপেয় করিয়াছে। জলের অভাবে কোন স্থলের শস্য মারা যায় না। প্রকৃতি যেন সদা হাস্য মুখে কুমিল্লাকে উর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছে। মাটী সোণা হয়, প্রবাদ বাক্যে শুনিয়াছি; কিন্তু বৃক্ষ প্রস্তরে পরিণত হয়, তাহা সোণামুড়ায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শুনিয়াছি, পাহাড়ের লোকেরা কিছু কিছু স্থূলবুদ্ধি হয়, কিন্তু ময়নামতীর বস্ত্র বয়নে শিল্প-সৌকর্য্যের পারিপাট্য দেখিয়া আমরা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি। মাটীর গুণে এদেশে শুধু বৃক্ষ প্রস্তরে পরিণত হয় নাই, জল এদেশে অমৃতে পরিণত হইয়াছে, এদেশের মৃত্তিকা স্বর্ণপ্রসূ হইয়াছে। আর এদেশের লোক? জল বায়ু তাঁহাদের হৃদয়কে যেন সদা উর্ব্বর, উৎসাহী এবং কর্ম্মপটু করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে যাও, দেখিতে পাইবে, সর্ব্বত্র অসংখ্য অসংখ্য হস্তলিখিত পুঁথি রহিয়াছে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কুমিল্লার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ পুস্তক প্রথমে আগরতলার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সাহায্যে কুমিল্লায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এ গৌরব ত্রিপুরাকে চিরদিন সর্ব্বোচ্চ-গৌরবে মণ্ডিত করিয়া রাখিবে।

উৎসাহ এবং গুণগ্রামে ত্রিপুরা বাঙ্গালার সর্ব্ব প্রধান দেশ। ফরিদপুর, ঢাকা, নোয়াখালি, মৈমনসিংহ এবং শ্রীহট্টের বিশেষত্বে যেন এই দেশ মহিমান্বিত। বৈদ্য-কায়স্থের আদান-প্রদানে, কোন কোন স্থলে কায়স্থ-সাহার রক্ত-বিনিময়ে, শিক্ষা-দীক্ষার সমীচীনতায়, বুদ্ধি-প্রতিভার স্ফুরণে এই দেশ জাতীয়তার মহাপ্রাঙ্গনে যেন অনন্ত লীলামাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। তাহা উপেক্ষার জিনিস নয়, অনুধ্যান এবং অনুচিকীর্ষার বিষয়।

মেঘনায় ভারতের দুই প্রধান নদী মিলিয়াছে। ক্ষুদ্র সুরমা নদী ক্রমে ক্রমে বিশালদেহ হইয়াছে, তার সহিত মিলিয়াছে ভারতের প্রধান দুই নদী। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে

পদ্মায়, পদ্মা মিলিয়াছে মেঘনায়। শীতলাক্ষা, ধলেশ্বরী, কীর্ত্তিনাশা প্রভৃতি আরো কত নদী মিলিয়াছে। এইরূপে মেঘনার সৃষ্টি। মেঘনা, ভারতের অসংখ্য কীর্ত্তিরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া, যেন ত্রিপুরার চরণ ধৌত করিয়া কি এক মহা সাধনায় আবহমান উদ্বুদ্ধ করিতেছে। যেন বলিতেছে—জাগো, জাগো, জাগো; জাগিয়া, ভারতের অতীত কাহিনীর স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া মনুষ্যত্বের বিজয় ভেরী নিনাদিত করিয়া সুষুপ্ত ভারতকে জাগাও। কি মোহন-তন্ত্রীর মোহন সুর গো!

চাঁদপুরের নীচেই মেঘনা। মেঘনা কত শত শত বৎসর ধরিয়া একই তানে আহ্বান করিতেছে। সে শুধু আজ নয়—কত শত বৎসর ধরিয়া সেই আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হইয়া ত্রিপুরার পল্লীতে পল্লীতে জাগরণ ঘুরিতেছে। এত প্রাচীন পুঁথি বোধ হয় আর কোন দেশে নাই।* সকল পুস্তক সংগৃহীত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ব্ব গৌরব প্রকটিত হইবে। ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনী লুপ্ত রত্নোদ্ধার করিতে পারিলে, এই দেশের মহত্ত্ব দেশ বিদেশে বিঘোষিত হইবে এবং বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে ত্রিপুরার স্থান যে কত উচ্চ, তাহা প্রমাণিত হইবে।

নভোমণ্ডলে অগণ্য নক্ষত্র মধ্যে চির-ভাস্বর এক সূর্য্য এবং এক চন্দ্র। ত্রিপুরার ভাগ্যেও চির-ভাস্বর এক সূর্য্য ত্রিপুরার রাজবংশ এবং এক চন্দ্র অপূর্ব্ব তটশালিনী মেঘনা। এই দুই গৌরবে ত্রিপুরা মহামহিমান্বিত;—যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর—ত্রিপুরার এই দুই গৌরব বিলুপ্ত হইবার নয়। এই রাজবংশ যে অগণ্য কীর্ত্তি-কলাপে ত্রিপুরাকে বিভূষিত করিয়াছে,সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইবার নয়। তাহা রাজমালাতে কৈলাসচন্দ্র কীর্ত্তন করিয়া অমর হইয়াছেন। আর মেঘনা ভারতের নানা দেশের কীর্ত্তি-স্মৃতি তটে ঢালিয়া দিয়া যেন এই দেশকে অতুল শোভায় ভূষিত করিয়াছে। ত্রিপুরার পাহাড়শ্রেণী এবং মেঘনার অপূর্ব্ব মিলনে

---

* "এই প্রবন্ধ রচনার সময় রতিদেব কৃত "মৃগলব্ধের একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি দৈবক্রমে আমার হস্তগত হয় এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হই যে, ত্রিপুরা চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে অনেক অপ্রকাশিত পুঁথি আছে। এই সংবাদ পাইয়া নিজে নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া সঞ্জয়কৃত মহাভারত, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ব, রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা, দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদচরিত্র, রামরাম দত্তের দণ্ডীপর্ব্ব, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাসের মহাভারতোক্ত উপাখ্যান প্রভৃতি বিবিধ হস্তলিখিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করি। তখন বঙ্গভাষার একখানা বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প মনে স্থির হয়। * * * একদিন রাত্রি ১০টার সময় ত্রিপুরা জেলার গৈলারা গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথ হারাইয়া ফেলি। * * কিন্তু এই সব বহুদর্শিতার মধ্যে দুখের কথা না আছে, এমন নয়; পাহাড়-বেষ্টিত দেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ মধ্যে মধ্যে বড় প্রীতিকর হইয়াছে। ঘনশ্যাম পত্রচ্ছাদাদিত চিত্রপটের ন্যায় সারি সারি বৃক্ষশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে নির্ম্মল পুকুরের জলে ঝাপটা বাতাসে নির্ম্মল ঢেউ উঠিতেছে, তাহাতে পদ্মফুলগুলি পাতা লইয়া এক একবার ডুবিয়া যাইতেছে, এই সব এখনও যেন স্মৃতিতে জাগরূক রহিয়াছে। * * এই সময় ত্রিপুরেশ্বরের সাহায্য হস্তগত হওয়াতে শোভাবাজারের রাজাবাহাদুরের সাহায্য গ্রহণ করার আবশ্যক হয় নাই। * * * পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমন্ মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য দেববর্ম্মণ বাহাদুর আমার পুস্তকের এই খণ্ডের সমস্ত মুদ্রাঙ্কন ব্যয় বহন করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার দানশীলতা বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধ।" শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, কুমিল্লা, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়, বি-এ মহাশয় বলিয়াছেন, তিনি কুমিল্লার পল্লী হইতে অনেক হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন।

কাঠিন্যে কোমলতা মিলিয়া মিশিয়া এই দেশকে যেন সাহিত্য-সেবার বিশেষ উপকরণে ভূষিত করিয়াছে। তাহা বুঝিয়া, দেশান্তর হইতে আসিয়া, এই দেশের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

এরিসটোক্রেসি এবং ডেমোক্রেসির দ্বন্দ্ব জগতের চিরপ্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু ত্রিপুরার ইতিহাসে তাহার মহামিলন ঘোষিত হইয়াছে। দাতা গোপীনাথ, দেওয়ান রামদুলাল মুন্সি, গোলাম রসুল মেঞা প্রভৃতি মহা মহা সাধকের বংশানুক্রমিক সাধনার বলে, ঐ দুই চির-বিরোধী সমস্যার পূরণ যেন এই মহাদেশে হইয়াছে। ধন্য রাজবংশ, ধন্য ত্রিপুরার প্রাচীন ঠাকুর বংশ, ধন্য ত্রিপুরার সম্ভ্রান্ত বংশ, ধন্য ত্রিপুরার জনসাধারণ। সোণায় সোহাগার এরূপ অপূর্ব্ব মিলন আর কোন দেশে দেখি নাই। বুঝিবা এইজন্যই গুরুদয়াল সিংহ, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বর্দ্ধন প্রভৃতি মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ত্রিপুরার উন্নতির বার্ত্তা প্রচার করিয়া মহা প্রস্থান করিয়াছেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের গেজেটিয়ার বলেন, স্বাধীন ত্রিপুরা বাদে, ত্রিপুরার ৩টী সাবডিভিসন, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, এবং চাঁদপুর। জনসংখ্যা ২১১৭৯৯১, কুমিল্লায় ৯৫৭৬৯৯, ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ৩০০৯৩৩ ও চাঁদপুরে ৪৮৩২০৮। ইহার মধ্যে মুসলমান শতকরা ৭০.৫ হিন্দু শতকরা ২৯। হিন্দুর অধিকাংশই বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণ ৩৫০০০,কায়স্থ ৭০০০০, যোগী ৬৮০০০, কৈবর্ত্ত ৭২০০০, নমশূদ্র ৭১৫০০০, পরামাণিক ২৫০০০, সাহা ৪৪০০০। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ১৩৪০ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ত্রিপুরায় ছিল। অধিবাসীগণের অবস্থা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা খুব ভাল। ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই হয়। * ১৪৮৬০০০ একার ভূমি চাষ হয়, তন্মধ্যে ৩১·৬ একারে ধান বাদে অন্য চাষ হয়। ধান চাষই বেশী, এবং পাট চাষ শতকরা ২১ মাত্র। † এ দেশে যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই, বোধ হয়, পাট চাষের অনাধিক্যই তাহার কারণ। এবং লোকের অবস্থাও যে অনেকটা ভাল, তাহার কারণও ইহাই। দুর্ভিক্ষ এদেশে প্রায়ই হয় না। গেজেটিয়ারও এই কথা বলেন। এবার চাঁদপুরের অনটনের যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহার কারণও পাটের চাষ। এ বৎসরও কুমিল্লার অন্যত্র যে অনটন নাই, তাহার কারণ এই যে, সর্ব্বত্র ধানের চাষ বেশী। সকলের ঘরেই খাদ্য থাকে, সুতরাং অভাব প্রায় হয় না। লোকের স্বাস্থ্য এবং অবস্থা মোটের উপর ভারতের অনেক স্থান হইতেই ভাল। এদেশ সম্বন্ধে আর কয়েকটী কথার উল্লেখ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ১৮৫৭ সালের মিউটিনীতে ত্রিপুরা উদ্বেলিত হয় নাই। † ময়নামতীতে এবং

* A long series of officers have reported that the people of Tipperah are well off in comparison with those of most parts of India, and there seems no doubt that their condition has improved in recent years. Eastern Bengal District Gazetteers, Tipperah, p. 43. and see page 34.

† Rice is by far the most important crop in the District, and in spite of the popularity of jute the proportion of the land given up to it is increasing. In 1903 the normal area under rice was 843000 acres or 63 percent. 1907—08 it was 1013000 acres or nearly 69 percent. Other food-grains,mostly pulses, occupy less than one fifteenth of the cropped area. Next to rice in order of importance comes jute, which occupies normally about 21 percent. Ibid p. 47.

† Gazetteers, Page 19.

ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ১২০০০ পুরুষ এবং ১০০০ মহিলা কাপড় বুনিয়া থাকে। ১২০০ লোক লোহার কাজ করে, ৫০০০ লোক কুম্ভকারের কাজ করে, ৩০০০ লোক স্বর্ণ রৌপ্যের কাজ করে, ৩১০০ লোক সূত্রধরের কাজ করে। ইহা বাদে অন্যান্য কাজেও অনেক লোক নিযুক্ত আছে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১০০টী পোষ্ট আফিস ছিল। কুমিল্লাতে ২খানি সাপ্তাহিক কাগজ ও ২খানি মাসিক কাগজ ছিল এবং ব্রাহ্মণবেড়িয়া ও চাঁদপুর ২খানি কাগজ আছে। কুমিল্লা মিউনিসিপালিটী ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রাহ্মণবেড়িয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং চাঁদপুর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীন ২০৫১ স্কুল আছে, ছাত্রসংখ্যা ৭১০০০। ১২ ডিসপেন্সারি আছে। ১৯টী হাইস্কুল আছে, ৫০টী মাইনার ও ৪০ ছাত্রবৃত্তি স্কুল, বালিকাবিদ্যালয়—ছাত্রবৃত্তি ১. ৩ অপার প্রাইমেরি, ৬২৮ লোয়ার প্রাইমেরি, ১৭টী বালিকা বিদ্যালয়ে কেবল কোরাণ শিক্ষা হয়। কুমিল্লাতে একটী সুপরিচালিত কলেজ এবং একটী উচ্চ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী, বরিশাল ও মৈমনসিংহে কলেজ আছে, কুমিল্লাতেও আছে। সংবাদ পত্র অন্যান্য দেশেও আছে, কুমিল্লাতেও আছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানেও ব্রাহ্মসমাজ আছে। অন্তঃপুর মহিলাগণের শিক্ষার জন্য ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভা ১২৭৮ সালে মহাত্মা কৈলাসচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদীর্ঘকাল এই সভার কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে সভ্যগণের অনন্য-সাধারণ উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিপুরা কোন দেশ অপেক্ষা উন্নতিতে পশ্চাৎপদ নহে, ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

ত্রিপুরায় মুসলমান সংখ্যা অধিক, আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি; এই জন্য অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এদেশে মুসলমান নেতাগণের সংখ্যা অধিক। জাতীয়তা-বোধ, ধর্ম্মানুগত-চিত্ততা মুসলমানদিগের মধ্যে যেরূপ বদ্ধমূল, এরূপ আর কোথাও নয়। হিন্দুদিগের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিষ্ঠা, অকৈতব প্রেম-বিহ্বলতা এবং তন্ময়তা এদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। একদিকে মুসলমানের ধর্ম্মানুরাগ, অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যের প্রেম-বিহ্বলতা এই দেশকে জাতীয়তার সোপানে উন্নীত করিয়াছে। আমাদের দেশের প্রধান অভাব জাতীয়তা-বোধ-হীনতা। দলাদলি এবং হিংসা-বিদ্বেষে বঙ্গের সকল মহৎ কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইতেছে। শিক্ষাবিভাগ, সংস্কার-বিভাগ, রাজনীতি-বিভাগ, সাহিত্য-বিভাগ—সর্ব্বত্রই দলাদলি,—সর্ব্বত্রই জাতীয়তা-বোধ-হীনতা। রাজা-প্রজার বিরোধ, ধনী-দরিদ্রের বিরোধ, জ্ঞানী-মূর্খের বিরোধ, সম্প্রদায়-সম্প্রদায়ে বিরোধ—বঙ্গভূমিকে সৌন্দর্য্যহীন করিয়া ফেলিতেছে। আমাদের বড় আশা ছিল, সাহিত্যে দলাদলি প্রবেশ করিবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাহিত্যেও দলাদলি প্রবেশ করিয়াছে। এজন্য সকল সহৃদয় ব্যক্তিই ম্রিয়মাণ। প্রকৃত ধর্ম্মভাব ভিন্ন যে কাজে হাত দেওয়া যাইবে, তাহাতেই অহং-ভাব প্রকাশিত হইবে। দেশের কাজ করিবার সময় অহংকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু তাহা আমরা পারি না বলিয়াই দলাদলি সৃজন করিয়া বসি—শিব গড়িতে বানর গড়িয়া ফেলি। যদি আমাদের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ থাকিত, কখনও এরূপ হইত না। ত্রিপুরা জাতীয়তা-বোধের পুণ্য-ভূমি,—মহোৎসাহের লীলাক্ষেত্র। আমাদের

আশা আছে, এই মুসলমান-বৈষ্ণবপ্রধান দেশে অহং-বোধের পরিবর্ত্তে জাতীয়তা-বোধ চির-ভাস্বর থাকিবে এবং সেই সূত্র ধরিয়া বঙ্গে ভেদাভেদ-বোধের নিরসনে জাতীয় একতা নামিয়া আসিবে।

তুমি বড়, কি সে বড়, সে বিচার লইয়া মারামারি করিবার এখন সময় নয়। পশ্চিম বড়, কি পূর্ব্ব বড়,—আমরা জাতীয়তা-সাধন-ক্ষেত্রে সে কথা সর্ব্বদা যেন ভুলিয়া যাই। পশ্চিমবঙ্গের বৈষ্ণব-সাহিত্য, বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে বদ্ধমূল হইয়াছে; পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান পীরের গান, কবি আলওয়াল প্রভৃতির কবিতা পশ্চিমবঙ্গে, প্রেম-প্রবাহে, কালে প্রচারিত হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, কিন্তু চট্টগ্রামের থরন্দীপে আজিও বৌদ্ধপ্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বৌদ্ধপ্রভাব লইয়া মাণিকচাঁদ যে গাথা রচনা করিয়াছিলেন,--তাহাও পশ্চিমবঙ্গে কালে আদৃত হইবে। বৌদ্ধধর্ম্মযুগের কীর্ত্তিগাথা আবার বঙ্গে ধ্বনিত হইতেছে। কলিকাতার বৌদ্ধ-ধর্ম্মাঙ্কুর সভার প্রতিষ্ঠাতা ঐ থরন্দীপের অধিবাসিবৃন্দ। পশ্চিম বঙ্গের বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বৃন্দাবনদাস, গোবিন্দদাস,কৃত্তিবাস, কাশীরাম, কবিরাজ গোস্বামী,রামমোহন,ভারতচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র,রমেশচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদেরই ভাষাপ্রবর্ত্তক, এবং পূর্ব্ববঙ্গের মাইকেল, নবীনচন্দ্র, শিশিরকুমার, দীনবন্ধু, মদনমোহন, দীনেশচরণ, কৃষ্ণচন্দ্র, কাঙ্গাল হরিনাথ, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি আমাদেরই ভাষা-সংস্কারক। পূর্ব্ববঙ্গের রাই-উন্মাদিনী, স্বপ্নবিলাস, সদ্ভাবশতক, কবিকাহিনী, কবিতাকদম্ব, মনসার ভাসান, বিজয়বসন্ত, পাগলা কানাই ও ইহুবিশ্বাসের জারি এবং কবিওয়ালাগণের গান কখনও উপেক্ষিত হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গ শ্রীচৈতন্যের পিতা মাতাকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। সেই মূল হইতে বৈষ্ণব-সাহিত্যের উন্নতি। বহুকাল দুই দেশে এইরূপ আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। পরিত্যাগ আমাদের শাস্ত্রে নাই—সকলকে লইয়াই আমাদের পূর্ণতা ও আমাদের গৌরব;—আমরা ভেদাভেদের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া যেন আমাদের পূর্ণতা না ভুলিয়া যাই। মেঘনা বহিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আনিয়াছে, শ্রীহট্টের শ্রীচৈতন্যের বৈরাগ্য এবং নিষ্ঠা, নামে রুচি এবং জীবে দয়া; পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে একতা, সদ্ভাব এবং স্বদেশানুরাগ পশ্চিম বঙ্গে প্রবাহিত হয়। তাহা হইলেই পূর্ণতা সাধিত হইবে, নচেৎ কিছুতেই কিছু হইবে না।

এক সময়ে কৈলাসচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। সে সকলের তীব্রতা এখনও আমাদের প্রাণে জাগিতেছে। তাহা স্মরণে আমরা লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সহিতও সাহিত্য-কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার তীব্রতা স্মরণেও আমরা ম্রিয়মাণ। ঈশ্বরগুপ্তের সময়ে রচনায় আমোদ প্রমোদ চলিত, কিন্তু বিদ্বেষ-শ্লেষ্মা বর্ষিত হইত না। বড় বড় লোকের বড় বড় ভুল। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কলহের উন্মুক্ত পথ ধরিয়া এদেশে সাহিত্যে অভিনব দলাদলি সৃজিত হইতেছে, এবং সেই দলাদলিতে পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিম বঙ্গ পৃথক হইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে। ইহা স্মরণ করিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত।

"দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!"

আমরা বড় সাধে সাহিত্য-পরিষদকে সাদর-

আহ্বান করিয়াছিলাম; জ্ঞানী মূর্খ, বড় ছোট, রাজাপ্রজা—সব ভাই এক হইয়া যাইব, আশা করিতেছিলাম, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে কি দেখিতেছি? কেবল "আমি বড়", কেবল "আমি বড়"—এইরূপ বাহাদুরী-কলহ চতুর্দ্দিকে জাগিতেছে! উপযুক্ত সময় হয় নাই, এখনই সাহিত্য-সম্মেলন চারিভাগে বিভক্ত হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্য এখনও এক-ভাবাপন্ন; এখনই চারি বিভাগের বিশেষত্ব ঘোষিত হইতেছে কেন? এমন এক সময় ছিল, যখন বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিতে, পত্র লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে কৃতী ব্যক্তিগণ অপমান বোধ করিতেন; কাল-প্রভাবে সে দিন চলিয়া গিয়াছে; —এখন সর্ব্বত্রই বাঙ্গালা ভাষার আদর হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়েও বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন হইয়াছে। এই শুভদিনে যদি আত্মীয়তা, সদ্ভাব, অঙ্গাঙ্গীভাব বদ্ধমূল হইত, তবে কত সুখের বিষয় হইত। তবে আশা এই, তাঁহারা যদি আমাদিগকে কাটিয়া ছাটিয়াও ফেলিতে চাহেন, আমরা যেন সেরূপ কখনও না করি। "মেরছ মেরেছ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?" —নিত্যানন্দের এই মহা শিক্ষা যেন আমাদের সাধনার বিষয় হয়। ত্রিপুরা,—জীবনের সুখ-স্বপ্ন ত্রিপুরা যেন এই মহামন্ত্র সাধন করিয়া অক্ষয় গৌরব সংস্থাপন করিতে পারেন। তাহা হইলে ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনীর জীবন-ধারণ সার্থক হইবে।

আশা বড় বেশী,—কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্য ত সামান্য নয়। বীরচন্দ্র মাণিক্য, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, আনন্দচন্দ্র স্বামী প্রভৃতি মহাজনবর্গ যে দেশে অহেতুকী প্রেম-বার্ত্তা ও স্বদেশানুরাগ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, সে দেশ সম্বন্ধে আশা করিব না কেন? আর কেহ যাহা পারে নাই, এই ত্রিপুরা তাহা পারিবে বলিয়া আমি আশা করিতেছি। কেন না, সাহিত্যের সকল অনুকূল অবস্থা এদেশে বর্ত্তমান। এদেশীয়দের দেহে স্বাস্থ্য, পেটে অন্ন, মস্তকে প্রতিভা, হৃদয়ে প্রেম, সর্ব্বাঙ্গে উৎসাহ। এদেশ সাহিত্য-সেবার বিশেষ চিহ্নিত দেশ। এই দেশ নিশ্চয় সাহিত্য-সেবা-মন্ত্র দ্বারা বঙ্গে জাতীয় একতা আনয়ন করিতে পারিবে।

আমরা বাল্যকাল হইতে ক্ষীণ লেখনীতে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছি, সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি না হইলে জাতীয় একতা সুদূর-পরাহত। সাহিত্যই জাতীয় একতার মূল সূত্র। এই সূত্রে সকলকে প্রাণে প্রাণে বাঁধিতে হইবে। ভেদের কথা, বড় ছোটর কথা—এক্ষেত্রে আমরা শুনিতে চাহি না। সহস্র সহস্র লোকের চেষ্টা ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে না। যাহার যে শক্তি আছে, এই পুণ্যক্ষেত্রে তাহা ঢালিয়া দিয়া একপ্রাণ, এক-হৃদয় হউন। "সবাই এক মায়ের ছেলে, কাকে দিব ছেটে ফেলে, ভাই বলে সকলেরে হৃদয় মাঝে দিব স্থান"—কবির এই কথা আমাদের মূল মন্ত্র হউক। সকলের সমবেত চেষ্টায় সাহিত্য-সেবার সূত্র ধরিয়া এদেশে জাতীয় একতা অবতরণ করুক। বিধাতা এই কাজে আমাদের সহায় হউন।

আমরা যে সকল কথা বিবৃত করিয়াছি, তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অন্যায় নয় যে, এদেশের নরনারী সুস্থ এবং সবল, আহারে বিহারে স্বচ্ছল এবং স্বানুবর্ত্তী। সিদ্ধান্ত এই—এদেশ ধর্ম্মের অনুকূল। সিদ্ধান্ত এই—এদেশ সাহিত্যের বিশেষ অনুকূল। এই জন্যই এদেশের পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য হস্তলিখিত পুঁথি রহিয়াছে। এই সাহিত্য-

সম্মিলনীকে সেই সকল সংগ্রহ করিতে হইবে। সে সকল সংগৃহীত হইলে তাহা প্রকাশিত করিতে হইবে। তাহা প্রকাশিত হইলে আমাদের সিদ্ধান্তের অকাট্য সাক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাইবে যে, এদেশের জলবায়ু সাহিত্যের বিশেষ অনুকূল ছিল বলিয়াই এদেশে প্রাচীন কালে এত পুঁথি রচিত হইয়াছিল। যদি সাহিত্য-সম্মিলনী এই মহাকার্য্য সাধন করিতে পারেন, পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পশ্চিমবঙ্গ কুণ্ঠিত হইবেন। তৎপর আধুনিক সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইবেন। যখন তাহা সাধিত হইবে, তখন বীরচন্দ্র মাণিক্য এবং কৈলাসচন্দ্র সিংহের মহাসাধনার ফল ফলিবে। সেই দিনের উৎসাহে বুক বাঁধিয়া আমরা জীবন ধারণ করিতেছি।

তবে দাঁড়াও, ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনি, আশার নব-আলোক হস্তে লইয়া, আজ মাভৈঃ মাভৈঃ রব তুলিয়া, ভেদাভেদ নাশ করিতে একবার আমার সম্মুখে দাঁড়াও। এখানে গুরুদয়াল সিংহের জীবনব্যাপী তপস্যা পরিসমাপ্ত হইয়াছে—এখানে কৈলাসচন্দ্র দত্তের তপস্যা নীরব হইয়াছে, এখানে একবার উনি, ইনি, তুমি কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াও, এ বঙ্গে যাহা কখনও হয় নাই, তোমাদের দ্বারা সেই অসাধ্য সুসাধিত হইবে। এখানে রজনীনাথ, ওখানে মহেশচন্দ্র, সেখানে দ্বিজদাস, স্থানান্তরে রামকানাই, সারদাকান্ত, অনঙ্গমোহন, মহেন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র, প্রকাশচন্দ্র, অন্যত্র শ্রীশচন্দ্র, শীতলচন্দ্র, ওখানে আবদুল রসুল, সেখানে সেরাজুল ইসলাম, অনরেবল সামসুলহুদা, এখানে বিধুভূষণ, ওখানে কমনীয়কুমার, জগচ্চন্দ্র সেন প্রভৃতি, সেখানে রাজবংশ, ঠাকুরবংশ—আমি কত নাম করিব, কিই বা জানি, কিইবা বুঝি, কি আর বলিব; আজ বিনীত ভাবে সকলকে আহ্বান করিতেছি, সাহিত্য-সেবার ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে মহা সাধনায় একাত্মক হইয়া ত্রিপুরার গৌরব বাড়াইতে সকলে দাঁড়াও, ত্রিপুরা কাঁপুক, বঙ্গ কাঁপুক, ভারত কাঁপুক। ত্রিপুরার নবোদ্দীপ্ত উৎসাহ আজ ঘোষণা করুক—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে আমারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তোমাদের আশার স্বপ্ন সফল হইলে আমার জীবনের সুখস্বপ্নও সফল হইবে। আমার সকল আশা তখন মায়ের চরণে উৎসৃষ্ট করিয়া বলিতে পারিব, মায়ের মহা ইচ্ছাই এদিনে পূর্ণ হইয়াছে।

সম্মিলনের সফলতা।

(২)

এত অল্প দিনের মধ্যেই সম্মিলন গুলির ক্রমাবনতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহা বলিয়াছি। কেন এরূপ হইল, তাহা বলিতে গিয়া সংক্ষেপে কতিপয় কারণেরও উল্লেখ করিয়াছি। সমস্ত কারণ বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নহে। এক্ষণে কি উপায়ে ঐ সকল কারণের কুফল গুলিকে নিবৃত্ত করা যায়, তাহাই চিন্তনীয়। কি মৌলিক কি আনুসঙ্গিক, কোন কারণকেই সম্পূর্ণ নিষ্ফল

করা যায় না, তবে যথাসম্ভব জ্ঞান ও চেষ্টা থাকিলে কুফলকে দমন অথবা সংযত করা যাইতে পারে। এই নিমিত্ত পুনরায় এ বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। সুধিগণ যদি চিন্তা করেন এবং সৎসাহসের সহিত উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলেই এতবড় একটা প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল সম্মিলনের সফলতার দিকেই লক্ষ্য করিতে হইবে; কারণ একাগ্র সাধনা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। তবে যদি এক ফল লাভ করিতে অন্য সুফল ও লাভ হয়, ভালই; কিন্তু ঐ ফল সুফল হইলেও তাহা আমাদের প্রধান লক্ষ্য নহে, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

সাহিত্য সম্মিলনের উদ্দেশ্য পূর্ব্বে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি; এক্ষণে [ঐ উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া] কিভাবে আবশ্যকীয় অনুষ্ঠান গুলি নিষ্পন্ন হওয়া উচিত তাহাই ইঙ্গিত করিব।

স্থান।

পর বৎসর সম্মিলন কোথায় বসিবে, তাহা পূর্ব্ব বৎসর সম্মিলন ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ স্থির হইয়া যায়; কদাচিৎ স্থির হয়ও না। যে স্থানে পর বৎসর সম্মিলন বসিবে সেইস্থানের জনৈক ব্যক্তি পূর্ব্ব সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া "নিমন্ত্রণ" করিয়া থাকেন। যিনি নিমন্ত্রণ করেন তিনি সাধারণতঃ বাধ্য হইয়াই নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণের প্রধান কারণ "মুখ রক্ষা" করা; প্রকৃত সাহিত্যিক আগ্রহ নহে। সকলেই জানেন, একটা স্থানের সমস্ত লোকের কখনই সাহিত্যিক আগ্রহ থাকিতে পারে না। কেহ বা অনুরোধে পড়িয়া, কেহ বা তামাসা দেখিবার নিমিত্ত, কেহ বা নিজের নামজারি করিবার উদ্দেশ্যে সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করেন অথবা সম্মিলনে উপস্থিত হন। ইহাই মোটা কথা; তথাপি ইহার ব্যভিচার যে নাই-ই, তাহা নহে। অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, সমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াও সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ অথবা সম্মিলন স্থলে উপস্থিত হন, একথা সত্য। সাহিত্যিক উৎসাহ বিস্তার করাও যখন সম্মিলনের একটা গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তখন উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে দোষ গণ্য হইতে পারে না। যে কারণেই হউক, সুভাবে পরিচালিত হইলে, সুফল হইবেই। যিনি "নিমন্ত্রণ" করিয়া থাকেন, তিনি যদি স্থানীয় প্রধান দিগের সহিত যুক্তি করিবার সময় পান ভালই; নচেৎ নিজের দায়িত্বেই নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। আমি জানি, ইহাতে স্থানীয় কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এবং যাহাতে নিমন্ত্রণকারী "জব্দ" হন, সেরূপ চেষ্টাও হইতে পারে। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহাদিগের দেশ-হিতৈষিতা নিশ্চয়ই প্রবল হইয়া সমস্ত সংকীর্ণভাব দূর করিয়া দিবে এবং তাঁহারা প্রাণপণে সম্মিলনের সফলতার দিকেই যত্নবান হইবেন। এস্থলে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। অধুনা একপ্রকার অতি সংকীর্ণ দেশ হিতৈষিতা দেখা যাইতেছে। ইহাকে "জেলা হিতৈষিতা" নাম দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক জেলার অধিবাসী যেন মনে করেন, সেই জেলার কার্য্যে অন্য জেলার লোকের প্রাধান্য হইলে তাঁহাদিগের অপমান হয়। এই ভাব আলোচ্য বিষয়ে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। অন্য বিষয়ে কখন কখন এ ভাবের আবশ্যকতা থাকিতে পাবে; কিন্তু যে অনুষ্ঠান সমস্ত দেশটার কল্যাণকর, তদ্রূপ স্থলে এ ভাব পরিত্যাগ করা উচিত। যিনি

সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করিলেন, তিনি স্থানীয় ব্যক্তি হইয়াও যদ্যপি সেই স্থানের অধিবাসী না হন, তাহা হইলেও স্থানীয় জনগণ এই কার্য্যে কখনও বাধা উপস্থিত না করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে এত কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আমি জানি এ সকল কথা উল্লেখ করা বর্ত্তমান সময়ে সম্পূর্ণ নিরর্থক নহে।

অভ্যর্থনা সমিতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভা।

মোটের উপর "নিমন্ত্রণ" সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, স্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই কার্য্য হইতে পারিলে, তাহাই ভাল। নচেৎ নিজ দায়িত্বেই নিমন্ত্রণকারী ঐ কার্য্য করিতে পারেন। তৎপরে, তিনি স্থানীয় প্রধানগণকে ঐ কথা জানাইলে, সকলে মিলিত হইয়া একটী "অভ্যর্থনা সমিতি" গঠিত করিবেন। এই সমিতিতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই থাকিবেন। স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা সকলেই এই সমিতির সহিত যুক্ত হইবেন। ইঁহাদিগের সংখ্যা ৩০ জন হইতে ৬০ জন পর্য্যন্ত হইলেও কোন হট্টগোলের আশঙ্কা নাই; কিন্তু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক না হয়। এই সমিতিদ্বারাই নির্ব্বাচিত হইয়া ৮।১০ জন ব্যক্তি একটী "কার্য্য নির্ব্বাহক সভা" গঠিত করিবেন। এই সভা যথাসম্ভব ক্ষুদ্র হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহার সভ্যগণ সাহিত্যিক উৎসাহ এবং স্থানীয় আধিপত্য অনুসারে নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। অন্য কোন প্রকার খাতির মৌরতে এই নির্ব্বাচন দূষিত হওয়া উচিত নহে। ধন, আধিপত্য, বিদ্যা, কার্য্যকুশলতা, "মুখবন্ধ", হিংসা, দলাদলি—সকলই অভ্যর্থনা সমিতিমধ্যে স্ব স্ব স্থান অধিকার করিতে পারে; কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করিতে কেবলই সাহিত্যিক উৎসাহ, স্থানীয় আধিপত্য এবং কর্ম্মকুশলতা বিবেচনা করিতে হইবে, আর কিছুই নহে।

কিন্তু "অভ্যর্থনা সমিতির" সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন কিরূপে? তিনি অবশ্যই স্থানীয় ব্যক্তি হইবেন। কিন্তু যিনি সাহিত্যিক কৃতীত্ব দেখাইয়াছেন, অথবা অন্য প্রকারে যিনি সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, তিনিই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইবেন। এ ক্ষেত্রে ধনবল গণনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা অত্যাবশ্যক নহে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যদি কেবল মাত্র ধনীই হন, অন্য উপযোগীতা না থাকে, অভাব পক্ষে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তদ্রূপ স্থলে সাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বী, সাহিত্যিক উৎসাহপূর্ণ, ও কর্ম্মকুশল জনৈক ব্যক্তি সম্পাদকরূপে মনোনীত হওয়া আবশ্যক।

"অভ্যর্থনা সমিতি"ই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবেন; এবং সম্মিলনের বিভিন্ন শাখার সভাপতিও নির্ব্বাচিত করিবেন। কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা করিলে "সম্মিলনের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা" নামক কলিকাতায় যে স্থায়ী সভা আছে, তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন এবং করাও বোধ হয় সঙ্গত।

অভ্যর্থনা-সমিতি সম্মিলনের স্থান প্রস্তুত করিবেন; সমাগত সাহিত্যিকগণের অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করিবেন। প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করিবেন; কিন্তু অতিরিক্ত সংখ্যক প্রবন্ধ সংগ্রহ হইলে, সমিতির বিবেচনা মত কতিপয় প্রবন্ধের লেখকগণকে স্ব স্ব প্রবন্ধের সারমর্ম্ম লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিবেন। তাহা না পাইলে, সে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইবে না। সাহিত্যিক উৎকর্ষ না থাকিলে সম্মিলন ক্ষেত্রে কোন প্রবন্ধই পঠিত হইবে না। এ বিষয়

চক্ষু লজ্জা ও খাতির সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সমিতি সাহিত্যিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠান করিতে পারেন। সে সকল পদার্থ প্রদর্শিত হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উহাদিগের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। কোন ক্রমেই এই সকল পদার্থ ম্যাজিক লণ্ঠন কিম্বা অন্য কিছুর সাহায্যে "বাজি" দেখাইবার ন্যায় প্রদর্শিত হইবে না।

অভ্যর্থনা সমিতির গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ব্যয় সংক্ষেপ করা। ১০।২০।২৫ হাজার টাকা সম্মিলন উপলক্ষে ব্যয় করাও যে কথা, সম্মিলনকে গলা টিপিয়া মারাও সেই কথা। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। সমাগত সাহিত্যিকগণের অধিকাংশকেই স্থানীয় ব্যক্তিগণ নিজ বাটিতে নিজ ব্যয়ে স্থান দিবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে দুই চারিজন সাহিত্যিককে স্থান দিলেই সম্মিলনের অধিক অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক হইবে না। আহারের ধুম্‌ধাম্ যথাসাধ্য বর্জ্জনীয়। স্থানীয় ভদ্র লোকগণ নিতান্ত পক্ষে যে সকল সাহিত্যিককে নিজ বাটীতে স্থান দিতে সমর্থ হইবেন না, তাঁহাদিগের নিমিত্তই সম্মিলনের অর্থ ব্যয়িত হইবে। আমার বিবেচনায়, ৩০০০৲ টাকার উর্দ্ধ কথনই ব্যয় হওয়া উচিত নহে।

অভ্যর্থনা সমিতি সম্মিলনের স্থান নির্ম্মাণ করিবেন। ইহাতেও ব্যয় বাহুল্য করিবেন না; এবং উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ কথনই করিবেন না। হয় ত ফরাসের নতুবা চেয়ারের ও বেঞ্চের ব্যবস্থা করিবেন। ফরাস হইলেই ভাল হয়। সকল সাহিত্যিকই সমান আসনে বসিবেন, আসনে কোন পার্থক্য থাকিবে না। কেবল সভাপতিকে এবং বিভিন্ন শাখা সভাপতিগণকে কিঞ্চিৎ অধিক সম্মান দেখাইবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগের আসনের সামান্য কিছু পার্থক্য থাকিবে।

সম্মিলনের গুরুতর কার্য্য, সাহিতিকগণকে নিমন্ত্রণ করা। এক্ষণে এতদ্দেশে ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অতি বৃহৎ, বহু সাহিত্যিক জাত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নিমন্ত্রণ পাইবার যোগ্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত অতি ক্ষুদ্রের দাবী অন্যের অপেক্ষা প্রবলও হইতে পারে। কিন্তু স্থানাভাব, অর্থাভাব, লোকাভাব ইত্যাদি কারণ বশতঃ বঙ্গের সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যককে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলকে, নিমন্ত্রণ করা বোধ হয় সম্মিলনের সাধ্য হইবে না। তবে, যদি তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বিশেষ প্রতিভাশালী থাকেন তিনি অবশ্যই নিমন্ত্রিত হইবেন। এই উপলক্ষে একটী কথা না বলিয়া নীরব থাকা যায় না। ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, কোন্ শ্রেণীর সাহিত্যিকগণ নিমন্ত্রিত হইবার যোগ্য? এ স্থলে সর্ব্বপ্রকার খাতির ও চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া কেবল সম্মিলনের উদ্দেশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে। উদ্দেশ্যের প্রতিকুল সাহিত্যিক, যত বড়ই হউন না কেন, তিনি নিমন্ত্রিত হইবার যোগ্য নহেন। উদ্দেশ্যের অনুকুল সাহিত্যিক যত ক্ষুদ্রই হউন না কেন, তিনি নিমন্ত্রিত হইবার যোগ্য। উদ্দেশ্য পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছি—সাহিত্যের সহায়তায় জাতীয় উন্নতির উপায় বিধান করা; সেই উদ্দেশ্যের অনুকুল জ্ঞান অর্জ্জন করা, বিস্তার করা, তদ্রূপ সাহিত্যিক সৃষ্টি করা। সুতরাং, যে সকল সাহিত্যিক বঙ্গসাহিত্যকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন, সর্ব্ববাদিসম্মতরূপেই যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে মঙ্গলের বীজ বপন করিতেছেন, তাঁহারা [সে চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবার অঙ্গীকার না করিলে]

কখনই নিমন্ত্রণের যোগ্য নহেন। আমি কোন মাসিক পত্রিকায় কিছু দিন পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম; উহাতে আত্মহত্যা করা অতি সঙ্গত কার্য্য, এইরূপ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। নিশ্চয়ই এই সাহিত্যিক অস্পৃশ্য, ইনি কখনই নিমন্ত্রণ পাইবার যোগ্য নহেন। এক জন উপন্যাস-লেখক জাতীয় আদর্শ বহুদিন হইতে কলঙ্কিত করিতেছেন; তাঁহার অঙ্কিত কোন কোন নরনারী চরিত্রে ঘৃণাজনক সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ রসিকতা এবং কখন কখন ব্যভিচার পর্য্যন্তও লক্ষিত হয়; কিন্তু পরিণামে তাঁহার কোন দণ্ড বিধান হইতে দেখা যায় না। এরূপ সাহিত্যিক বর্জ্জনীয়। জাতীয় চরিত্রকে উন্নত, পুষ্ট, ও পবিত্র করিতে হইবে, জাতিকে ধনে বংশে বাড়াইতে হইবে; শক্তি সামর্থ্যে বড় করিতে হইবে; ঐক্য ও সাধনা শিখাইতে হইবে। যে সাহিত্যিক এই সকল উদ্দেশ্য বিফল করিতেছেন এবং বিফল করিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন, তিনি যত বড়ই হউন, সম্মিলনের সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। তিনি অনুতপ্ত হইলে গ্রহনীয়। এই সকল কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিয়া, অভ্যর্থনা সমিতি সাহিত্যিকগণকে নিমন্ত্রণ করিবেন; এই কথা স্মরণ রাখিয়াই সম্মিলনের সভাপতি এবং বিভিন্ন শাখা সভাপতিগণকে নির্ব্বাচিত করিবেন। ইহার অন্যথা কখনই হইতে পারিবে না।

প্রবন্ধ সংগ্রহ করা যত কঠিন, প্রাপ্ত প্রবন্ধের সংখ্যাও ততই অধিক হইতে দেখা যায়; সুতরাং অধিকাংশ প্রবন্ধ পড়িবার, কি বর্ষান্তে মুদ্রিত করিবার যোগ্য হয় না। অভ্যর্থনা সমিতি প্রবন্ধ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম করিতে পারেন। যে সকল প্রবন্ধে কিছু-না-কিছু মৌলিক * অনুসন্ধানের চিহ্ন প্রকাশ পায়, যাহাতে নূতন তথ্য অবগত হওয়া যায়, যাহাতে পুরাতন তথ্য সকল বিশদভাবে বিবৃত করা হয়, যাহাতে বর্ত্তমান সময়ের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়, যাহাতে ধনীগণ এবং উপযুক্ত বংশগঠন করিবার তত্ত্ব ও প্রণালী সকল, স্বাস্থ্যবিধানের ও সামাজিক অভাব পূরণের উপায় সকল অবগত হওয়া যায়, যাহাতে চরিত্র গঠন ও চিন্তাশীলতা বাঞ্ছনীয় পথে সফলতা পাইবার যোগ্য হয়; ফলতঃ, যাহাতে সম্মিলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা হয়, তাদৃশ প্রবন্ধই সম্মিলনে পঠিত হইবার যোগ্য। আবশ্যকীয় জ্ঞানের ও কর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস যাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাও পঠিত হইবার যোগ্য। কিন্তু যাহার ঐ সকলের কিছুই নাই, বরং উহাদিগের প্রতিকূল ভাব উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে, তাহা পঠিত হইবার যোগ্য নহে। এইরূপ নিয়ম সাহিত্যিকগণকে পূর্ব্ব হইতেই জানাইয়া দেওয়া উচিত। যে সকল প্রবন্ধ সম্মিলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিশেষ ভাবে অনুকূল, তাহার সার মর্ম্ম প্রচারক দ্বারা গ্রামে গ্রামে প্রচার করা অভ্যর্থনা সমিতির বিশেষ আবশ্যকীয় কর্ম্ম।

যে সকল প্রবন্ধ সম্মিলনে পাঠ করিবার যোগ্য বলিয়া অভ্যর্থনা সমিতি বিবেচনা করিবেন, তাহাদিগের সংখ্যা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে পাঠ করিবার সময়াভাব না হয়। সময়াভাব বশতঃ, প্রবন্ধগুলিকে যেমন তেমন করিয়া আসরে উপস্থিত করা অত্যন্ত অসঙ্গত। যাহা পড়িতে হইবে, তাহা সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে পড়িতে হইবে। অভ্যর্থনা সমিতি

---

* বিবিধ গ্রন্থ মধ্যে অনুসন্ধান করাকেও মৌলিক অনুসন্ধান বলা যাইতে পারে।

পাঠ্য প্রবন্ধ মনোনীত করিবার পর, "বিষয়-নির্ব্বাচক সমিতি" কর্ত্তৃক উহা পুনরায় মনোনীত হওয়া আবশ্যক। এই শেষ নির্ব্বাচন অনুসারেই প্রবন্ধ পঠিত হইবে।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন—এই চারি শাখার প্রবন্ধ সকল এক স্থানেই অর্থাৎ সম্মিলন ক্ষেত্রেই পঠিত হইবে; কিন্তু এক সময়ে নহে। যে সময়ে যে শাখার প্রবন্ধ সকল পঠিত হইবে, তাহা সম্মিলনের সভাপতি স্বীয় অভিভাষণ পাঠের পর সকলকে জানাইয়া দিবেন। সেই সময়ে সেই শাখার সভাপতির নিতৃত্বে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সম্মিলনের সভাপতি তখন কিছুই করিবেন না।

সভাপতি ও শাখা সভাপতি নির্ব্বাচন।

সভাপতি ও শাখা সভাপতি নির্ব্বাচন করা বড়ই কঠিন কর্ম্ম। দুর্ভাগ্য ক্রমে, এই কার্য্য সম্মিলনের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া অনেক সময়েই করা হয় না। নানা অবান্তর কারণ আসিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলাইয়া দেয়। সাহিত্যিক হিসাবে কৃতী এবং বর্ত্তমান যুগের উচ্চাশা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত ব্যক্তিই সম্মিলনের সভাপতির যোগ্য। তিনি বঙ্গ-সাহিত্য সেবী না হইলেও চলে, কিন্তু ভক্ত হওয়া চাই। তিনি মৌলিক গবেষণায় বিখ্যাত, দেশ পূজ্য, বঙ্গ সাহিত্যিকে সদুপদেশ দিবার যোগ্য, একান্ত সাধক এবং স্বয়ং আদর্শ চরিত্র হওয়া অত্যাবশ্যক। যদি মৌলিক গবেষণায় বিখ্যাত ব্যক্তি অপ্রাপ্য হন, তবে যিনি সৎ-সাহিত্য প্রচার করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, তাঁহার যদি উল্লিখিত অন্যান্য গুণ থাকে তবে তিনিও সম্মিলনের সভাপতি হইবার যোগ্য। এইরূপ ব্যক্তি-ভিন্ন অন্য কেহই সম্মিলনের সভাপতি হইবার যোগ্য নহেন। কেবল মাত্র ধনী অথবা রাজা সম্মানে ভূষিত বলিয়া কেহ সভাপতি হইবার যোগ্য নহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি, অবসর মত কখন একটু আধটু সাহিত্যালোচনা করিয়া থাকিলেও, তাহা গণনীয় নহে। চরিত্রহীন, বিলাসী, চটুল, ব্যক্তি যেরূপই কেন হউন না, কিছুতেই সভাপতি মনোনীত হইবার যোগ্য নহেন।

শাখা সভাপতিগণ বঙ্গসাহিত্যের সেবক হওয়া অত্যাবশ্যক। সম্মিলন সভাপতির যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, ইহাদিগেরও সেই সকল গুণ থাকা প্রয়োজন; কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা কম মাত্রায় থাকিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু ইঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সাধক ও বিখ্যাত সেবক হওয়া চাই ই; শুধু ভক্ত হইলে হইবে না। ইঁহারা মৌলিক গবেষণায় বিখ্যাত হওয়ার আবশ্যক নাই; হন ভালই, না হইলেও ক্ষতি নাই। ইঁহারা সম্মিলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সচেষ্ট হওয়া চাই। সে উদ্দেশ্য ইঁহারা কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

সভাপতি এবং অন্যান্য সাহিত্যিকগণ সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে, সামাজিক ভাবে মেশামেশী অবশ্যই করিবেন; এ কর্ত্তব্যপালন করিতেই হইবে। মোটামোটি এই সকল বিধি পালন করা আবশ্যক। কাহাকেও নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেওয়া হইবে না। আড়ম্বর ও চটুলতা সর্ব্বথা বর্জ্জন করিতে হইবে। সম্মিলন ক্ষেত্রে একটা গাম্ভীর্য্যে ও উৎসাহের বায়ু সতত বহিতে থাকিবে। সম্মিলন সর্ব্ব বিষয়ে উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিবে। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রাধান্য থাকিবে; মানব বিজ্ঞান + কখনই পরিত্যক্ত হইবে না।

+ মানবতত্ত্ব।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে যে সকল দোষের কথা বলিয়াছি এবং এক্ষণে যে সকল বিধি নিষেধের কথা উল্লেখ করিলাম তাহা ব্যতীত অনেক দোষ এবং অনেক প্রতিকারের উপায় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনে উদয় হইবে, সন্দেহ নাই। যদি তাঁহারা শ্রম স্বীকার করিয়া, নিন্দা ও দুর্নাম অগ্রাহ্য করিয়া, সে সকল আলোচনা করেন এবং স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্য এবং বঙ্গীয়-সমাজ তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী থাকিবে। এ কর্ত্তব্য উপেক্ষা করা যায় না। সাহিত্যালোচনা, সৎপথে সজ্জন কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে, সমাজের অশেষ মঙ্গল ; তদ্ধেতু ইহার অধোগতি দেখিয়াও নীরব থাকা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আশা করি, সুধিগণ স্বীয় চিন্তায় ও বহুদর্শীতার ফল সাধারণো প্রচার করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন।

শ্রীশশধর রায়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি।

জাতীয় মহাসমিতির অনুকরণে প্রাদেশিক সমিতির সৃষ্টি। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোককে একত্র করিয়া এক জাতীয় জীবন ও জাতীয় শক্তির সৃষ্টি, তাহার পরিপোষণ ও সংরক্ষণ, দেশের অভাব ও অভিযোগ দূরীকরণ মহাসমিতির লক্ষ্য। এই মহান্ উচ্চ দেশহিতব্রত গ্রহণ করিয়া মহাসমিতি এক এক বৎসর এক এক প্রদেশে সম্মিলিত হইয়া স্বীয় ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া আসিতেছে। প্রাদেশিক সমিতির লক্ষ্য, স্বীয় প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার লোককে একত্র করিয়া প্রাদেশিক জাতীয় জীবনের ও শক্তির সৃষ্টি, ও তাহার সর্ব্বপ্রকার অভাব অভিযোগ বিহিত উপায় অবলম্বনে দূরীভূত করা। মহাসমিতির কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র ভারতময়। প্রাদেশিক সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র নিজ নিজ প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; সুতরাং তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ।

প্রাদেশিক সমিতির বীজ যে দিন বাঙ্গলায় প্রথম উপ্ত হইল, লোকে আশা করিয়াছিল যে অচিরে ইহার শিকড় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্চস্তর ভেদ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে এবং কালসহকারে এই বীজ এক মহা মহীরুহে পরিণত হইয়া দেশবাসীকে সুশীতল ছায়া ও সুফল প্রদান করিবে। এই আশা কতদূর ফলবতী হইয়াছে, ইহাই এক্ষণে আলোচ্য বিষয়। ইহা যে ফলচ্ছায়াসমন্বিত মহীরুহে পরিণত হয় নাই, এ কথা বলিলে বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না। ইহা অঙ্কুরিত হইলেও, ইহার মূল দেশের সর্ব্বস্তরে আজও প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।

সমাজ বলিলে যেমন শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বুঝায় না, তেমনি দেশ বলিলে শুধু কলিকাতা এবং জেলাসমূহের প্রধান প্রধান সহরগুলিকে বুঝায় না। দেশ ইহার বাহিরে দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। সুদূর পল্লীই সমাজ ও দেশের প্রাণ, অস্থি ও মজ্জা। প্রাদেশিক সমিতি কি, তাহার উদ্দেশ্য কি, প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা পল্লী-সমাজ কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। সুতরাং, প্রকৃত দেশ ইহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। শুধু পল্লীবাসীর কথা বলি কেন, যাহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত তাহাদেরও আন্তরিক সহানুভূতি ও যত্ন যে পরিমাণে এই সমিতি পাইতে অধিকারী, তাহা পাইতেছে না। এই আন্তরিক সহানুভূতি ও যত্নের অভাবে, দেশের শক্তি প্রাদেশিক সমিতিতে উপযুক্ত পরিমাণে সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির বয়ঃক্রম কিঞ্চিদধিক বিংশতি বৎসর হইবে। বঙ্গবাসীর জীবনের হিসাবে এই সমিতি যে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। কিন্তু যৌবনের উদ্যম, উৎসাহ, কর্ম্মশীলতা, শক্তি ও স্পন্দন কিছুই ইহাতে পরিলক্ষিত হইতেছে না। ইহার কারণ, দেশের শক্তি আজও যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তাহার কিছুই এই সমিতি লাভ করিতে পারিতেছে না। যাঁহারা এই প্রাদেশিক সমিতির

জন্মদাতা, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কালের আবর্ত্তে কক্ষচ্যুত হইয়া কোথায় খসিয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা এই সমিতির প্রতি দেশের মনপ্রাণ আকৃষ্ট করিতে পরিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি না। দেশ সুপ্তিমগ্ন ও অবসাদ-গ্রস্থ। তাহাকে জাগাইতে এবং জাগ্রত রাখিতে হইলে যে শক্তির ও উদ্দীপনার প্রয়োজন, তাহার সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু দেশ বড় ভাব-প্রধান। তাই, যেই কোন আন্দোলনের বায়ু প্রবাহিত হয়, অমনি আমরা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠি। সে বায়ু দেশের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া, তরঙ্গ শুধু উপর উপর নাচিয়া চলিয়া যায়। আমরা যেমন সামান্য আন্দোলনেই সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠি, অচিরেই আবার ততোধিক অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়ি। জাতীয় মহাসমিতি এবং প্রাদেশিক সমিতি সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যবহার ঠিক সেইরূপই হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর হইতে, দেশের এই অতি প্রয়োজনীয় দুইটী সমিতির উপর আমরা যেন দিন দিন উদাসীন ও আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছি। সমিতির স্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকগণ যেন আর আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। যে শিক্ষিত সম্প্রদায় একদিন সমিতির স্তাবক ও সেবক ছিল, আজ তাহাদিগের মধ্যেও অনেকেই ইহার চিরন্তন ধারাবাহিক কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া, ইহার প্রতি দিন দিন বীতানুরাগ ও বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন।

জাতীয় মহাসমিতি এবং প্রাদেশিক সমিতি যে আমাদিগের দেশের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহা স্বীকার করি এবং তাহাদিগের দীর্ঘজীবন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। সমিতির কার্যপ্রণালী দেখিয়া কিন্তু তাহাদিগের দীর্ঘজীবন আশা করিতে পারি না। বৎসরে একবার, দেশের কয়েকজন গণ্য মান্য ব্যক্তি একত্র হইয়া,সেই চিরপুরাতন নির্দ্ধারণগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া ব্রত-পালন করায়, সমিতি গন্তব্য পথে যে অগ্রসর হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। অগ্রসর হইয়া থাকিলেও, তাহা ব্যয়বাহুল্যের এবং জীবন কালের তুলনায় অতি সামান্য। সমিতির উদ্দেশ্য পালনে যে ঘোর অন্তরায় আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করি। উন্নতির পথ তো চিরদিনই দুর্গম, বিপদ সঙ্কুল; সে পথ কখনই সরল, সুগম, কুসুমাস্তীর্ণ নহে। সে পথে অগ্রসর হইতে হইলে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতেই গৌরব ও কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। আমরা এই সময়ের মধ্যেই আকাশের চাঁদ হাতে দিতে বলি না। কিন্তু আবার শুধু বক্তৃতা শুনিয়াই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেও চাই না। আমরা বেশী কিছু না চাহিলেও, অন্ততঃ ইহা অবশ্যই চাহিতে পারি যে আমরা সমিতির সাহায্যে গত বৎসর অপেক্ষা এবারে একপদও অগ্রসর হইয়াছি, একটী নূতন তত্ত্বও শুনিয়াছি এবং শিখিয়াছি, দেশের মধ্যে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটু বিস্তার লাভ করিয়াছে। কার্য্যতঃ যে ইহার কিছু হইতেছে, ইহা কেহই স্বীকার করেন না। সমিতি যদি জীবনী-শক্তি লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু হইতে চায়, তবে ইহার কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। দেশের প্রকৃত রোগ বিশ্লেষণ করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের প্রকৃত অভাব কি, কি উপায়ে সেই অভাব দূর হইতে পারে, গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন্ বিষয়ে আমরা কতটুকু আশা করিতে পারি এবং আমাদিগের আত্মশক্তির উপরই বা কোন্ বিষয়ে কতটুকু নির্ভর করিতে পারি, তাহা দেশ মধ্যে বুঝাইয়া দেওয়া, সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এই কর্ম্মযুগে, আত্মনির্ভরতার দিনে, আমরা শুধুই পরমুখাপেক্ষী হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইব, ইহা কখনই আশা করা যায় না। আমাদিগকে অনেক বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে,নিশ্চয়; কিন্তু পর-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া আত্মশক্তি বলে, যে যে বিষয়ে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারি, তাহার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে আত্মপ্রত্যয় জন্মে না এবং স্বীয় কর্ম্মশীলতার বিকাশ হয় না। এই কর্ম্মানুরাগ এবং আত্মপ্রত্যয় জন্মাইয়া দেওয়ার জন্য সমিতির যত্ন ও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দেশের মর্ম্মব্যথা বুঝাইয়া দিয়া, দেশ মধ্যে

প্রকৃত সহানুভূতির সৃষ্টি ও প্রসার, সমিতির অন্যতম কর্ত্তব্য কার্য্য। এই মর্ম্মব্যথায় জাগরিত হইয়া যে দিন দেশময় সহানুভূতির স্রোত প্রবাহিত হইবে, সেদিন সমিতির মহা ব্রতের উদ্‌যাপন হইবে। "প্রাদেশিক সমিতি" এই নাম সে দিন সার্থক হইবে। গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশের সম্বন্ধ কি, দেশের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কি, তাহা যেমন একদিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে,তেমনি অন্য দিকে, রাজভক্তি ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি দেশের লোকের কর্ত্তব্য কি এবং দেশের ও সমাজের প্রতি আমাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য কি, তাহাও সমিতিকে বুঝাইয়া ও শিখাইয়া দিতে হইবে। রাষ্ট্রনীতির শিক্ষা, দেশ মধ্যে বিস্তৃত ভাবে প্রচার করিতে পারিলে সমিতির উদ্দেশ্য সফল হইবে। সমিতির বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী এই শিক্ষাবিধানের পক্ষে কতদূর উপযোগী, বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সমিতি দেশের মন প্রাণ আকৃষ্ট করিয়া শক্তিসঞ্চয় করুন, ইহাই সমিতির প্রতিষ্ঠাতাগণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। সমিতির সমালোচনা করার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। সমিতির প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আছে। ভক্ত সেবক না হইলেও, সমিতির বিরুদ্ধবাদী নহি। সমিতি যাহাতে প্রকৃত শক্তিশালী হইয়া দেশের হিতসাধন করিতে পারে, তাহাই আমাদের প্রার্থনা ও কামনা। শুধু উপদেষ্টা হইলে চলিবে না, নিজে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, দেশকে কর্ম্ম করিতে শিখাইতে হইবে। কর্ম্মই শক্তি জাগাইয়া তুলিবার প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা কর্ম্মহীন জীবনের দুঃখ ও দৈন্যের বোঝা মস্তকে লইয়া দীর্ঘকাল কাটাইয়াছি। এখন কর্ম্মময় জীবন লইয়া কোথায় যাইতে পারি তাহাই দেখা প্রয়োজন। বাঙ্গালী জীবনের বর্ত্তমান গতি ও লক্ষ্য কি তাহা আমরা প্রকৃত উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ তাহা যে বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছেন, বলিতে পারি না। লক্ষ্য ও গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া তাহা দেশ মধ্যে বুঝাইয়া দিলে, লোকে সমিতির উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে এবং তখন তাহারা সমিতির সহিত এক প্রাণ হইয়া কার্য্য করিবে। তাহা না করিয়া, গবর্ণমেণ্টের বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং দেশের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে শুধু নির্দ্ধারণ লিপিবদ্ধ ও বক্তৃতা করিয়া যে কোন্ উপকার হইবে, বুঝিতে অক্ষম। চাই সাধনা তবেই সিদ্ধি, চাই কঠোর তপস্যা তবেই মুক্তি। সাধনার পথ ও প্রণালী,—কর্ম্ম এবং বক্তৃতা দুইই—শুধু বক্তৃতা নয়। সমিতি শুধু বক্তৃতাময় না হইয়া কর্ম্মময়ও হউক, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। সে কর্ম্ম সাধনাও বিহিত উপায়ে সংযত ভাবে করিতে হইবে। তাহাতে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা আসিলে চলিবে না। সে কর্ম্ম-সাধনায়, চাই সংযম, নিষ্ঠা ও ভক্তি। সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে সমিতির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির গত বৎসরের অধিবেশন জেলা নদীয়ায় কৃষ্ণনগরে হইয়াছিল। 'গত বৎসর' এই কথায় পাঠকগণ কিছু বিস্মিত হইবেন। তাঁহারা জানেন, ইং ১৯১৫ সালের ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল তারিখে কৃষ্ণনগরে উক্ত সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল; সুতরাং গত বৎসর বলায়, সময় নির্ণয়ে আমি মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছি। সমিতি বাঙ্গলা প্রদেশের, আমি ও আমার পাঠকবর্গ আমরা সকলেই বাঙ্গালী। বাঙ্গলা দেশে নিজের একটা সাল প্রচলিত আছে; সুতরাং সেই সনের হিসাবে সমিতির বয়ঃক্রম গণনা করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া আমি 'গত বৎসর' বলিয়াছি। ইহাতে বোধ হয় সঙ্গত আপত্তি করিবার কিছুই নাই। ১৮ বৎসর পূর্ব্বে, কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সমিতির একবার অধিবেশন হইয়াছিল। তখন মাতৃ-মন্ত্রের উপাসক এবং দেশহিত ব্রতের ভক্ত সাধক মনোমোহন ঘোষ ও তাঁহার সহযোগী তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সগৌরবে বিদ্যমান ছিলেন। সেইবারে তাঁহাদের আন্তরিক যত্নে ও পরিশ্রমে এই মহাযজ্ঞ আরব্ধ ও সুসম্পন্ন হইয়াছিল। হায়! আজ তাঁহারা কালসাগরে ভাসিয়া কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা গিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের ব্রত পড়িয়া রহিয়াছে। তাই স্মৃতি আজ ধীরে ধীরে এই প্রসঙ্গে তাঁহা-

দিগের কথা জাগাইয়া তুলিতেছে। তাঁহাদের মহা প্রস্থানের পর, নদীয়া জেলার অধিবাসীগণ এই দীর্ঘকাল মায়ের কথা, দেশের ব্যথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া, শুধু আপনার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সংসারের ভাবনা ও চিন্তায় আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া ছিলেন। যে জেলা একদিন ভক্তি প্রবাহের প্রধান উৎস এবং প্রেমতরঙ্গের লীলাভূমি ছিল, সেই জেলার অধিবাসী আজ আমরা দেশ-মাতৃকার প্রতি প্রেম ও ভক্তি শূন্য হইয়া, সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে জীবন যাপন করিতেছি, ইহা দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আমাদিগের জীবনের গতি দীর্ঘকাল ধরিয়া অন্যদিকে ছুটিতেছিল, এমন সময় দেশনায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাদর আহ্বানে সেই গতি, প্রচলিত পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কয়েকদিনের জন্য স্বদেশমুখী হইল। তাই আমরা ১৩২১ সালের ২০শে ও ২১শে চৈত্র তারিখে কৃষ্ণনগরে আর একবার বঙ্গজননীর পদে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করিতে পারিয়াছি। মাতৃপূজার স্থান ও দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া ঘোষণাপত্র প্রচার হইলে, বঙ্গের প্রায় সকল জেলা হইতেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া এই পুণ্যব্রতে যোগদান করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় গত অধিবেশনে প্রতিনিধির সংখ্যা অতি অল্পই হইয়াছিল। তাহার অন্য হেতু থাকিলেও, বিশেষ কারণ এই যে উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিনে, বর্দ্ধমানে সাহিত্য সম্মিলনীর, বগুড়ার কায়স্থ সমিতির, বহরমপুরে মোক্তার সমিতির এবং বীরভূমে ব্রাহ্মণ সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু সমিতির অধিবেশন হওয়ার কোথাও প্রতিনিধির সংখ্যা আশানুযায়ী হইতে পারে নাই। যে সময়ে জাতীয় মহাসমিতি এবং প্রাদেশিক সমিতির প্রতি লোকের বিশ্বাস ও আশার নদীতে ভাটা পড়িয়া আসিতেছে, সেই সময়ে যে প্রায় দুই শত প্রতিনিধি কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাই যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। প্রতিনিধিবর্গের সংখ্যা খুব বেশী হইবে, এই মর্ম্মে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মহাশয় অনেক স্থান হইতে পত্র পাইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির আন্তরিক যত্নে ও চেষ্টায়, উপস্থিত প্রতিনিধিগণ পরম আপ্যায়িত হইয়াছেন। তাঁহাদের সুখ ও সাচ্ছন্দের কোন ত্রুটী হয় নাই। তজ্জন্য অভ্যর্থনা সমিতি সকলের ধন্যবাদার্হ। রায় প্রসন্নকুমার বসু বাহাদুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে এবং জীর্ণ শরীরে এই ভার গ্রহণ করিয়া তিনি সকলকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরের মহারাজা তাঁহার সুবৃহৎ নাটমন্দিরে সমিতির অধিবেশনের জন্য স্থানদান করিয়াছিলেন। মহারাজা তাঁহার নাটমন্দিরে স্থানদান না করিলে, বহু অর্থব্যয়ে সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইত। এই প্রকারে তিনি সমিতির অধিবেশনে যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য নদীয়া জেলার অধিবাসিগণ মহারাজার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। তিনি শুধু নাটমন্দিরে স্থানদান করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না—তিনি প্রতিনিধি বর্গের অভ্যর্থনার জন্য এক উদ্যান-সম্মিলনীর আয়োজন করিয়া তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিবর্গ যথাসময়ে উপস্থিত হইলে, মহারাজা একে একে তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা এবং তাঁহাদিগের জলযোগের সুব্যবস্থা করিয়া, সকলকে মধুর ভাবে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার সৌজন্যে সকলেই পরিতুষ্ট হইয়াছেন।

এবারে প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—বহুলপ্রচারিত অমৃতবাজার-পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়। তাঁহাকে এই মাতৃপূজার পৌরোহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমিতির স্থাপয়িতা এবং কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। দেশের রোগ নির্ণয়ে যাঁহারা সক্ষম হইয়াছেন, দেশের মর্ম্মব্যথায় যাঁহারা নিরন্তর অন্তরে বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন, ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট দেশের করুণ ক্রন্দনে যাঁহারা অশ্রুমোচন করিয়া থাকেন, দেশের প্রকৃত কল্যাণ যাঁহা-

দিগের কামনা ও জীবনের পরম সাধনা, ঘোষ মহাশয় তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। শুধু একজন নয়,তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে অতি উচ্চাসন পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করি। বৃদ্ধ বয়সে, রুগ্ন শরীরে, জীর্ণ দেহতরী লইয়া, মানব যখন জীবনের শেষ খেয়ার জন্য নীরবে ও নির্জ্জনে আত্মচিন্তায় রত থাকে, ঘোষ মহাশয় ঠিক সেই সময়ে এবং সেই অবস্থায়ও দেশ হিতব্রতে ব্রতী। মাতৃপূজার শুভ দিনে স্বদেশবাসীর সাদর আহ্বানে তিনি গৃহের সুখ ও সাচ্ছন্দ্য এবং নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া, জীবনের মহাব্রত উত্থাপনের এবং মহামন্ত্র সাধনার জন্য কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলেন। গাড়ী ষ্টেসনে আসিবার পূর্ব্বেই স্থানীয় বহু গণ্যমান্য লোক তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গাড়ী আসিবামাত্রই অনেকদিনের নীরবকণ্ঠে মাতৃপূজার মহামন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' ফুটিয়া উঠিয়া দিঙ্ মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিল। সাদরে গাড়ী হইতে অবতরণ করাইয়া, সসম্মানে এবং মহাসমারোহে তাঁহাকে বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। পরদিন সমিতির প্রথম অধিবেশন।

সভামণ্ডপের বহির্দ্দেশে দুইটী তোরণ,পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া, হাসিতে হাসিতে প্রতিনিধিবর্গ এবং উপস্থিত সভ্যগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তদুপরি রক্তবর্ণের পতাকা মলয়হিল্লোলে দুলিতে দুলিতে কত অতীত কথা হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়াছে। দুইদিনের জন্য যে একটু উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতেই আশা মুহূর্ত্তের জন্য যেন চঞ্চলা চপলার ন্যায় প্রাণে দেখা দিয়া আবার নিরাশার আঁধারে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

যথাসময়ে মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি প্রতিনিধিবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া সভাপতি মহাশয় মণ্ডপে শুভাগমন করিলে, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বেদীর উপর আসন প্রদান করিলেন। তৎকালে সভ্যগণের রুদ্ধ কণ্ঠে "বন্দে মারতম্" ধ্বনি ফুটিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহা মর্ম্মস্পর্শ করিয়া প্রাণ আকুল করিতে পারিল না। প্রতিধ্বনি কোন উত্তর না দিয়া, নীরবে যেন বলিয়া দিল "বন্দেমাতরম্ শুধু তোদের মুখের—প্রাণের কথা নহে; আজও তোরা ঐ প্রণব উচ্চারণের উপযুক্ত হইতে পারিস্ নাই!" অধিবেশনের দুই দিনেই অনেকবার ঐ মহামন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইলাম, উহা একবারও আমাদের সুপ্তিমগ্ন প্রাণকে জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই—একবারও তাহাতে প্রাণ মাতৃপ্রেমে উদ্বেলিত হইয়া উঠে নাই। হৃদয়ে দেশভক্তি ও মাতৃপ্রেম নাই, তাই সে রব শুধু মুখে ফুটিয়া কোথায় ভাসিয়া গেল—মন টলাইতে পারিল না।

সকলে আসন গ্রহণ করিলে একটী জাতীয় সঙ্গীত দ্বারা উদ্বোধন ক্রিয়া সমাপন করা হইল। তদপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় প্রতিনিধিবর্গকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। অশীতি বর্ষ বয়সে তিনি যে সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। তিনি যে তাঁহার অভিভাষণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইবেন, কোন ক্রমেই এ আশা করা যাইতে পারে না। বার্দ্ধক্যজনিত তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অনতিদূরবর্ত্তী স্থানেও শ্রুতিগোচর হইতেছে না দেখিয়া, তিনি অভিভাষণের প্রথম কিয়দংশ নিজে পাঠ করিয়া, অবশিষ্টাংশ পাঠের ভার তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতস্পুত্রের উপর অর্পণ করিলেন। উক্ত সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে দেশের স্বাস্থ্য, উচ্চ ও প্রাথমিক শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তুষ্টি, অরাজকতা, ডাকাইতি ও হত্যাকাণ্ড, গবর্ণমেণ্টের রাজ্য-রক্ষা-বিধি প্রণয়ন, যুদ্ধ ও তাহার ফলাফল এবং plain living এই কয়েকটী বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে, দুর্দ্দমনীয় ভোগ ও অর্থ লালসা দেশ মধ্যে যে অধিকার বিস্তার করিয়াছে, তৎপ্রতি সভাপতি মহাশয় ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা

দেশের শুভলক্ষণ নহে। তিনি যে দেশের একটী প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আন্তরিক প্রীতিলাভ করিলাম। দুঃখের বিষয়, তিনি এই রোগের কারণ কিছুই নির্দ্দেশ করেন নাই। রোগের উৎপত্তি ও প্রসার এবং তাহার অপকারিতা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলে, কিছু উপকার হইবার আশা করিতে পারিতাম। বর্ত্তমান সময়ে ধন-তৃষ্ণা ও ভোগ-লালসা যে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষিত অনেকেই বলিবেন এবং বলিতে শুনিয়াছি, ইহা ভোগ লালসা নহে—প্রকৃত সভ্যতা। ইহা আদর্শ সভ্যতার কোন উপদান কিনা বলিতে পারি না, তবে এই পর্য্যন্ত এক্ষণে বলা যাইতে পারে, উহা পাশ্চাত্য সভ্যতার একটী অঙ্গ। ভোগ-প্রধান পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদিগের বর্ত্তমান আদর্শ; তাহারই অনুসরণে আমরা দিন দিন ভোগের পথে অগ্রসর হইতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতায় যে মহামূল্য রত্নরাজি আছে,—আমরা তাহার অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছি, তাহার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি বড়ই কম! কিন্তু তাহার মন্দের ভাগ—অন্ততঃ যাহা আমাদিগের দেশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী,—আমরা তাহারই নিকটবর্ত্তী হইতেছি। এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে একটী কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। বিলাত-প্রত্যাগত চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগকে দেশীয় পরিচ্ছদে সমিতিতে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়াছি। কিন্তু বঙ্গজননীর ভক্ত সন্তান ব্যারিষ্টার দত্ত মহাশয়কে বিলাতী পরিচ্ছদে মাতৃপূজায় যোগদান করিতে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির নিকট আমরা নিশ্চয়ই অন্যরূপ আশা করিয়াছিলাম। মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চোগা চাপকান পরিধান না করিয়া, খাঁটী দেশী পরিচ্ছদে উপস্থিত হইলে, উপস্থিত কার্য্যের সহিত সর্ব্বাংশে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেন। ইহা শুধু মনের ক্ষণিক আবেগ বা ভাবুকতা নহে। ইহাই জাতীয়ত্বের প্রকৃত লক্ষণ। জাতীয় জীবন গঠনে ইহার মূল্য অনেক বেশী। বিলাত প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে যাইবার সময় প্রয়োজন মত আমরা অন্যরূপ পরিচ্ছদ অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারি। রাজদরবারে কিম্বা বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার সময়, রাজ-ব্যবস্থানুযায়ী পোষাক পরিধান করিতে বাধ্য হইতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া, বাঙ্গালার প্রাদেশিক সমিতিতে যোগদান করিবার সময়ও যে আমাদিগকে বিলাতী পরিচ্ছদ কিম্বা চোগা চাপকান ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। বরং, তাহা না করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জাতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, যাহা কিছু দেশের তাহারই প্রতি আকৃষ্ট হইতে হইবে। দেশে যে অনেক কুসংস্কার ও মন্দ আচার ব্যবহারের আবর্জ্জনা-রাশি স্তূপীকৃত হইয়াছে, তাই বলিয়া তাহাকে আদর করিয়া বরণ করিতে হইবে, বলিতেছি না।

তদনন্তর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুমোদনে, দত্ত মহাশয় প্রভৃতির সমর্থনে সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। ঘোষ মহাশয় নিজে তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রুগ্ন দেহ সে ভার বহন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তিনি অভিভাষণের প্রথম কিয়দংশ এবং উপসংহার টুকু নিজে পাঠ করিয়া, অবশিষ্টাংশ পাঠের ভার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। উক্ত অভিভাষণ দেশের একটী খাঁটী চিত্র। তাহাতে বাগ্মীতা বা ওজস্বিনী ভাষার গুরুগম্ভীর-নিনাদ নাই বটে, কিন্তু দেশের মনের কথা, প্রাণের ব্যথা সরল শব্দ-বিন্যাসে দিব্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহাতে শব্দের আড়ম্বর নাই, ভাবের গভীরতা আছে। বাঙ্গালী জীবনের প্রধান অভাব ও অভিযোগ কি, কি উপায়ে তাহার নিরসন হইতে পারে, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের লক্ষ্য কি এবং কোন্ পথে আমাদিগের জীবনের গতি পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন। দেশের যাহা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহার কিছুই তাঁহার আলোচনার বিহির্ভূত হয় নাই।

আমাদের দুঃখ ও দৈন্যের জন্য যে আমরা নিজেই অনেকটা দায়ী এবং আমাদের কল্যাণ যে অনেকখানি আমাদিগের নিজেদেরই আয়ত্তাধীন, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। তিনি অনেকের মত পরকে সম্পূর্ণ দায়ী করেন নাই। পাশ্চাত্য ভাবে প্রণোদিত হইয়া নূতন জাতীয়-জীবন গঠন এবং সুখ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে গৃহ-সংস্কারের প্রয়োজন। নিজেদের যাহা দোষ তাহা স্খালন, নিজেদের যাহা অতি কর্ত্তব্য তাহা পালন না করিলে, আত্মশক্তি জন্মিতে পারে না। আত্মশক্তি না জন্মিলে, নিজেদের দুঃখ দৈন্যের বোঝা চিরদিনই মস্তকে বহন করিতে হইবে। অন্যে সে ভার লাঘব করিবে না,—জগতে কোথাও কেহ কোন দিন তাহা করে নাই,—সে আশা বৃথা। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ও ক্ষুৎপিপাসাতুর দেশবাসীর মলিন বেশ ও অস্থিচর্ম্মসার জীর্ণদেহ দেখিয়া তিনি অন্তরে যে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছেন, সেই মর্ম্মান্তিক অনুভূতির পূর্ণ বিকাশ—তাঁহার এই অভিভাষণ। চিররুগ্ন ও কঙ্কালসার দেহ লইয়া বাঙ্গালী, জাতীয়-জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া অনেক দূরের কথা, তাহার অস্তিত্বই এখন ঘোর শঙ্কটাপন্ন এবং সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই এই মুমূর্ষু জাতির স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে তিনি যেমন তাঁহার পত্রিকায় পয়ঃপ্রণালী এবং উৎকৃষ্ট পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিবার জন্য অবিশ্রান্ত লেখনী পরিচালন করিয়া আসিতেছেন, তেমনি এই প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে, সমবেত সভ্যমণ্ডলীর মন প্রাণ আকৃষ্ট করিবার জন্য,তাহার অভিভাষণে ঐ উভয় বিষয়ের যথাযোগ্য আলোচনা করিয়াছেন। স্বাস্থ্যই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। সেই স্বাস্থ্যই আমাদের সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাগ্রে চিন্তা ও আলোচনার বিষয়। অগ্রে স্বাস্থ্য পরে শিক্ষা, ইহাই তাঁহার স্বদেশ-সেবার মূলনীতি। এক দিকে দারিদ্র্যবশতঃ উপযুক্ত খাদ্যাভাব, অন্য দিকে জল নিকাশের সুব্যবস্থার অভাব, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি ও প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ। ম্যালেরিয়া ও কলেরার কবল হইতে এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে, উৎকৃষ্ট পানীয় জলের এবং জল নিকাশের সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য, জেলা সমূহের বিভাগ, পথকর ও পূর্ত্তকর, স্বায়ত্ত শাসন, স্বদেশী শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় তিনি যেভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আন্তরিকতা ও গভীর চিন্তাশীলতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সরল ভাষায় দেশের প্রকৃত অভাব বুঝাইয়া দিয়া, তাহা দূর করিবার উপায় তিনি চক্ষে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি দেশকে যেমন দেখিতেছেন, যেমন বুঝিতেছেন, তাহার তেমনি চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন। তাহাতে কল্পনার ছায়া নাই। তিনি কর্ম্মযোগী, তাই দেশ-মাতৃকার সেবার জন্য তিনি প্রত্যেক জেলায় প্রতিনিধি লইয়া একটী কেন্দ্র সমিতি গঠন ও বেতন ভোগী এজেণ্ট নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব্বে কোন সভাপতি কর্ম্মের এরূপ কোন পথ দেখাইয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

প্রভাত গগণে উষার কণক রাগের ন্যায় বাঙ্গালী জীবনে জাতীয়তার ক্ষীণালোক প্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল কিরণ মালার ন্যায় জাতীয়তা যাহাতে আমাদিগের জীবনাকাশ উদ্ভাসিত করিতে পারে তজ্জন্য আমাদিগকে সর্ব্বোতভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই জাতীয়তাই আমাদিগের জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য, ইহাই বাঙ্গালীর জীবন যাত্রার দিক নির্ণায়ক যন্ত্র। সভাপতি মহাশয় এই জাতীয়তার প্রতি বিশেষ ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; যে যে উপায়ে এই মহাভাবের পুষ্টি সাধন এবং প্রসারণ হইতে পারে, তিনি তাহার পথও দেখাইয়া দিয়াছেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন তৎপ্রদর্শিত পথের মধ্যে একটী পথ। কিন্তু কি উপায়ে এই প্রার্থনীয় সদ্ভাব সংস্থাপিত ও দৃঢ় হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি নীরব রহিয়াছেন। আমরা তাঁহার ন্যায় বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট এই মহারোগ নিরসনের ফলপ্রদ বিধিব্যবস্থা পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। আমাদিগের সে আশা ফলবতী হয় নাই।

স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি প্রেম ও প্রীতি এই জাতীয়তার প্রধান উপাদান বলিয়া মনে করি। সুতরাং যে যে উপায়ে আমাদিগের হৃদয়ে এই প্রেম ও প্রীতির উন্মেষ ও বিকাশ হইতে পারে, তাহারই প্রতি সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি বিধান প্রভৃতি হিন্দুদিগের সদনুষ্ঠানে মুসলমানদিগের টানিয়া আনা এবং ঐরূপ মুসলমানদিগের অনুষ্ঠিত দেশহিতকর কার্য্যে হিন্দুদিগের অগ্রসর হইয়া যোগদান করা, প্রেম ও প্রীতি বিকাশ ও সম্প্রসারণের একটী প্রকৃষ্ট উপায়। যতই এই উভয় জাতি কার্য্যক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হইবে, ততই দিন দিন তাহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান বিদ্বেষ ও ব্যবধান হ্রাস হইয়া পড়িবে। তখন কর্ম্মসূত্র উভয় জাতিকে একত্রে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিবে, উভয়ের লক্ষ্য ও গতি এক হইবে। জাতীয় মহাসমিতি এবং প্রাদেশিক সমিতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সহযোগ নাই বলিয়া উক্ত দুইটী প্রতিষ্ঠান, পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিয়াও শক্তিশালী, হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। যতদিন হিন্দু মুসলমানের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক থাকিবে, ততদিন তাহাদিগের মধ্যে কোনরূপ মিলন অসম্ভব। এইদেশে উভয়েরই জন্মস্থান, শৈশবের ক্রীড়াভূমি ও শিক্ষালয়, যৌবনের কর্ম্মক্ষেত্র, বার্দ্ধক্যের বিশ্রাম আগার এবং অন্তিমের শেষ শয্যা। উভয়ের সম্মিলনে দেশের উন্নতি; তদভাবে যে দশা, তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না।

পরদিন যথা সময়ে সভা-গৃহে সমবেত হইলে, "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তৎপর সেই প্রচলিত পন্থা অনুসারে পূর্ব্ব দিনের বিষয় নির্দ্ধারণ সভার নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব সমূহের উত্থাপন, অনুমোদন ও সমর্থনের বক্তৃতা চলিতে লাগিল। সে বক্তৃতা কখন ভাষার ঝঙ্কারে সভাগৃহ আন্দোলিত করিল, কখন আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে ও সমালোচনায় হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিল, আবার কখন বা অস্ফুট মৃদু কলতানের ন্যায় মঞ্চে উঠিয়াই বিলীন হইল; শ্রোতৃবর্গের কাণে তাহা পহুছিল না। তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। কেবল একটী নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া দুই একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। দেশে ভদ্র লোক বলিয়া যাহারা অভিহিত ও পরিচিত, তাঁহারা স্বহস্তে শারীরিক পরিশ্রমের কোন কার্য্য করা নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন। এই ভাব দূর করিয়া যাহাতে স্বহস্তে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি ও তৎপ্রতি সকলের শ্রদ্ধা জন্মে, তদুদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রদিগের মধ্যে শারীরিক পরিশ্রমের কোন প্রকার কার্য্য প্রচলন করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব সমিতিতে পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা সমিতির উদ্দেশ্য সাধু বলিয়া মনে করি; কিন্তু তাহা সাধনার যে উপায় সমিতি অবলম্বন করিয়াছে তাহা কোন মতেই প্রকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বহস্তে শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে কাহার কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই ভাব দেশ মধ্যে প্রচলন করা আমাদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন—ইহা আমাদিগের ঘরের কথা। সুতরাং, আমাদিগের নিজেরাই ইহা করা কর্ত্তব্য। ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ভার অযথা বৃদ্ধি করা সঙ্গত মনে করি না। এই সামান্য সংস্কার টুকু যদি আমরা নিজে নিজে করিতে না পারি, তবে আর আমাদিগের আশা কোথায়? সমিতি এই সম্বন্ধে যে নির্দ্ধারন করিয়াছেন তাহাতে ইহাই স্পষ্ট প্রকাশ পায়, আমরা যেন কোন প্রকার ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক বা প্রস্তুত নহি। আমাদিগের কল্যাণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তৎসমুদয় পরে করিয়া দিবে; আমরা শুধু তাহার ফল ভোগ করিব। ইহাই কি আমাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়ের লক্ষণ? ইহার নাম উন্নতি না অবনতি? স্বহস্তে কর্ম্মকরার প্রতি অনুরাগ যে একটু একটু করিয়া দেশে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা কি সমিতি অস্বীকার করিবেন। যাহাতে সেই অনুরাগ দিন দিন পূর্ণ

বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার উপায় করা আমাদিগেরই কর্ত্তব্য। কৃষি ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেকরা এক কথা, আর শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ দূর করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা আর এক কথা।

দেশের প্রতি যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা এই দুইদিনে প্রতিপালন করিয়া দেশনায়কগণ, প্রতিনিধি বর্গ ও শ্রোতৃমণ্ডলী স্ব স্ব গৃহে ও আপন কর্ম্মক্ষেত্রের সংকীর্ণ গণ্ডীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই,—অনেকেই কেন প্রায় পোনে ষোল আনাই—যে ভাব লইয়া আসিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাব লইয়াই ফিরিয়া গেলেন। তাঁহারা শূন্য-হৃদয়ে আসিয়াছিলেন, শূন্যহৃদয়েই চলিয়া গিয়াছেন। আপন আপন ঘরকন্না ফেলিয়া দুই দিনের জন্য যে আমরা সমিতিতে গিয়াছিলাম, ইহাই আমাদিগের স্বদেশানুরাগের যথেষ্ট প্রমাণ! আমরা যে এই দুইটী দিনের জন্য প্রাণ ভরিয়া দেশের কথা ভাবিব, দেশের বিষয় আলোচনা করিব, সে শিক্ষা ও দীক্ষা আজও যেন আমরা পাই নাই। প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন ব্যতীত কাহাকেও কৃষ্ণনগরে যাইবার সময়, কিম্বা তথায় অবস্থান কালে,অথবা তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়, দেশের বিষয় আলোচনা করিতে দেখিলাম না। আমরা যেন কোন আমোদ প্রমোদের জন্য সেখানে গিয়াছিলাম। তাহা ভিন্ন কোন গুরুতর উদ্দেশ্য যে ছিল, তাহা আমাদিগের মনে স্থান পায় নাই। কোন কার্য্যেই আমাদিগের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নাই, তাই দুই চারি জনের যাহা কিছু চেষ্টা, যাহা কিছু উদ্যম ও উদ্যোগ, সমস্তই বৃথা হইতেছে। নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ভিন্ন আজও আমরা দেশের কথা একপ্রাণ হইয়া গভীর ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিতে শিখিলাম না। এই উক্তি যে অতিরঞ্জিত নয়, খাঁটি সত্য, তাহা এই অধিবেশনের আর একটী দৃশ্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। সমিতির প্রধান পাণ্ডাগণ দুইটী দিনও সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিতে পারিলেন না। দ্বিতীয় দিবসে, তাঁহারা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট নির্দ্ধারণ গুলির প্রস্তাব, অনুমোদন ও সমর্থন কার্য্য শেষ করিয়া অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া পড়িলেন, আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না। অভিনয় শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার অবসর তাঁহারা পাইলেন না। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রথমদিন উপস্থিত হন নাই। দ্বিতীয় দিন অল্প সময়ের জন্য একবার দর্শন দিয়াছিলেন মাত্র। তিনি কি করিতে আসিলেন, কি করিয়া গেলেন, তাহা তিনিই জানেন। তাঁহাদিগের এই দৃষ্টান্ত যদি সকলেই অনুকরণ করে, তবে উন্নতির আশা কোথায়, তাহা পাঠকবর্গ চিন্তা করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন। শ্রীগিরীশচন্দ্র সান্যাল।

সাংখ্যসূত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৫২। ইহাতে (অদ্বৈত) শ্রুতির বিরোধ হয় নাই। সংসার অনুরাগীদিগের বৈরাগ্যের জন্য তাহা সিদ্ধ হয়।

আত্মা এক অদ্বৈত, আত্মা স্বপ্রকাশ—এইরূপ শ্রুতি আছে। তাহা বৈরাগ্য সাধনার জন্য। সুতরাং দ্বৈতসিদ্ধি সম্বন্ধে তাহার বিরোধ হয় না। আরও আত্মা স্বপ্রকাশ নহে—জড়ের বিরুদ্ধ ধর্ম্মী ও জড়ের প্রকাশক বলিয়া তাহাকে জানা যায়। কিন্তু শ্রুতিতে আছে, আত্মা স্বপ্রকাশ, অসৎ মিথ্যা। ইত্যাদি শ্রুতিও এইরূপে ব্যাখ্যাত হয়।

উক্ত সিদ্ধান্তে অদ্বৈত শ্রুতির বিরোধ হয় না। তাহার কারণ, বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিরা পুরুষাতিরিক্ত স্বীকার করে, তাহাদের বৈরাগ্য উৎপাদন নিমিত্তই অদ্বৈত শ্রুতি উক্ত হইয়াছে। সৎ অদ্বৈত জ্ঞান দ্বারা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। (বিঃ ভিঃ)

৫৩। জগৎ সত্য। অদুষ্টকারণ

জন্যত্ব হেতু ও বাধক অভাব হেতু ইহা সিদ্ধ হয়।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে ইহা এক যুক্তি। অদ্বৈতবাদ অনুসারে জগৎ মিথ্যা। কিন্তু জগৎ মিথ্যা বলা যায় না। জগৎ অসত্য,ইহা কোন প্রমাণে সিদ্ধ হয় না। নিদ্রাদি দোষ জন্য বলিয়া স্বপ্ন বিষয় মিথ্যা। সেইরূপ পীত-রোগ জন্য বস্তু যে পীতবর্ণ দেখায়, তাহা ঐ দোষ জন্য-মিথ্যা। এইরূপে করণের দোষে বা আসক্তি জন্য ভ্রান্তি দর্শন হয়। যেখানে সেরূপ দোষ নাই—সেখানে ভ্রম বা মিথ্যাত্ব কল্পনা করা যায় না। জগৎ জ্ঞান কোন দৃষ্ট কারণ জন্য নহে। মহদাদি প্রপঞ্চে এরূপ কোন দোষ নাই। মহদাদির কারণ প্রকৃতি বা হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি (যথা পূর্ব্বং অকপয়ৎ)। ইহা কোন দোষযুক্ত নহে।

জগৎ সম্বন্ধে বাধক প্রমাণও নাই। শ্রুতিতে আছে বটে 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' ইহা অবিদ্যা হেতু নানাত্ব দোষ। ইহা জগৎ মিথ্যাত্বের প্রমাণ নহে। ইহা প্রকরণানুসারে বিভাগাদি প্রতিষেধপর। ইহা প্রপঞ্চের অত্যন্ত তুচ্ছতাপর নহে। ইহাতে ব্রহ্মভিন্ন কিছুই সৎ নাই, এই অর্থ বুঝিতে হইবে। ভগবদ্গীতাতে আছে—

সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বং।

শ্রুতিতে আছে—

বাচারম্ভন বিকারুনামধেয়ং মৃত্তিকা
ইত্যবগম্যং।

ইহাতে নিত্য অথচ অপারমার্থিক এরূপ সত্তায় অভাব জানা যায়। অন্যথা মৃত্তিকার অসিদ্ধি হয়। মৃত্তিকার বিকারীভূত পদার্থ অত্যন্ত তুচ্ছ নহে।

ন নিরোধো ন বোৎপত্তি র্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্নৈ চৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।"

ইহাদ্বারা আত্মাতিরিক্ত কূটস্থ নিত্য, পরমার্থ সত্তার স্বভাব বুঝা যায়। আত্মার নিরোধ স্বভাবও বুঝা যায়। অন্যথা এরূপ জ্ঞানে মোক্ষ প্রতিপাদিত হইত না।

সাংখ্য দর্শন অনুসারে, জগৎ যে সত্য তাহার দুইটী কারণ। এক, ইহা অদৃষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন, দ্বিতীয় ইহার বাধক কিছু নাই। সাংখ্য সৎকার্য্যবাদী। এ জগতের কারণ মূল প্রকৃতি। জগৎ তাহারই পরিণাম। এই জগৎ কারণ প্রকৃতি অদৃষ্ট। তাহা স্বপ্নের ন্যায় কোন দোষ যুক্ত নহে। আর এই জগতের বাধক কিছু নাই। যেমন স্বপ্নে জ্ঞান জাগ্রত অবস্থায় মিথ্যা সিদ্ধ হয়, জগৎ জ্ঞান কিছু দ্বারাই সেরূপ মিথ্যা সিদ্ধ হয় না। ঐ গাছটা তুমি আমি বা যে উহাকে লক্ষ্য করে, সেই দেখিতে পায়। সুতরাং উহা আমার বা তোমার ভ্রম জ্ঞান নহে। উহা সত্য। সেইরূপ এই জগৎ সত্য, তাহা কিছুতেই ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। ইহার কোন বাধক নাই।

৫৪। প্রকারান্তরে ইহার উৎপত্তি সম্ভব নহে।

সৎ হইতেই ভাবের উৎপত্তি হয়, অন্য প্রকারে বা অভাব বা যাহা নাই,তাহা হইতে পারে না। অসতের উৎপত্তি অসম্ভব। সূক্ষ্মরূপ সতেরই অভিব্যক্তি হইতে পারে। ইহা দ্বারা অসৎ কার্য্যবাদ নিরাশ হইয়াছে।

৫৫। কর্ত্তা—অহঙ্কার, পুরুষ নহে।

কারণ পুরুষ অপরিণামী। অভিমান বিশিষ্ট অন্তঃকরণ অহঙ্কার; তাহাই কর্ত্তা। কেননা অভিমানের পরে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। অপরিণামী পুরুষে অহঙ্কার বা ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নাই। তাহা বুদ্ধিতে আছে।

গীতাতে আছে,

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মানিসর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে॥

৫৬। অহঙ্কারের কর্ত্তৃতে অর্জ্জিত কর্ম্মের ভোগ চৈতন্যে পর্য্যবসিত হয়।

অবিবেক হইতে কর্ম্মার্জ্জন। তাহা হইতেই ভোগ। আত্মজ্ঞান বিচার বলে বিবেক উৎপত্তিতে চিত্তের অবসান হইলে আর কর্ম্মার্জ্জন হয় না, আর কর্ম্ম উপভোগ হয় না। জ্ঞানদ্বারা কৃতকর্ম্ম নাশ হয়। (অণিঃ)।

"জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে অথা"

অহঙ্কার পরার্থ সংহত। পুরুষ এইজন্য অহঙ্কার কৃত কর্ম্ম ভোগকারী। যে অহঙ্কার যে পুরুষকে গ্রহণ করিয়া এই আমি, ইহা আমার, এইরূপ বৃত্তি উৎপাদন করে, সেই অহঙ্কারের

কর্ম্মই সেই পুরুষ ভোগ করে। অন্যে তাহা ভোগ করে না।

অজ্ঞান হেতু পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ হয়; প্রকৃতিতে পুরুষের অধিষ্ঠান হয়। সেই হেতু প্রকৃতির পরিণামে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতির রজোগুণ হইতে পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার অনুসারে কর্ম্ম হয়। পুরুষের তাহা প্রতিবিম্বিত হয়। এ জন্য পুরুষ এই অর্জ্জিত কর্ম্ম ভোগ করে।

৫৭। নিমিত্ত সম্ভব জন্য, চন্দ্রাদি লোক হইতেও পুনরাবর্ত্তন হয়।

নিমিত্ত অর্থাৎ অবিবেক কর্ম্মাদি বীজ বর্ত্তমান থাকায় বা তাহার বিনাশ না হওয়ায়, তাহার জন্যই চন্দ্রাদি লোক প্রাপ্ত হইলেও, আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। চন্দ্রাদি লোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত।

৫৮। পূর্ব্বের ন্যায় কেবল উপদেশ দ্বারা তাহা (মোক্ষ) সিদ্ধ হয় না।

মন্দাধিকারীর কেবল শ্রবণ মাত্রেই মুক্তি হয় না। তাহাদের মনন ও যোগসাধন প্রয়োজন। যোগ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ।

যেমন মনুষ্যলোকে কেবল উপদেশ শ্রবণ মাত্র বিবেক জ্ঞান হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মাদি লোকেও,. কেবল এক মাত্রই শ্রবণ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয় না। সে লোকে এই যোগ সাধন সম্ভব নহে। এইজন্য সে সব লোক হইতেও পুনরাবর্ত্তন হয়। (বিঃ ভিঃ)

৫৯। (প্রথম শ্রবণ, পরে মনন ও পরে নিদিধ্যাসন এইরূপ)পরম্পরা ক্রমে জ্ঞানসিদ্ধ হইলে তবে মুক্তি হয়, ইহাই শ্রুতি।

কেবল শ্রবণের দ্বারা সিদ্ধির যে শ্রুতি আছে, তাহাতে এই পারম্পর্য্য বুঝিতে হইবে।

শ্রুতি অনুসারে কেবল ব্রহ্মলোকে গমন হইলেই মুক্তি হয় না। ব্রহ্মাদি লোকবাসীদেরও শ্রবণ মননাদি পরম্পরায় জ্ঞান সিদ্ধি হইলে, তবে মুক্তি হয়। তবে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিতে কিছু বিশেষ আছে। (বিঃ ভিঃ)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, চন্দ্রলোক হইতে পুনরাবর্ত্তন হয়। সে স্থলে 'আদি' অর্থে ব্রহ্মলোক বুঝিতে হইবে না। ধূপিতৃযানে চন্দ্রলোকাদি লোকে গতি হয়। পিতৃযানে ব্রহ্মাদি লোকে গতি হয়। দেবযানে গতি হইলে পুনরাবর্ত্তন হয়। দেবযানে গতি হইলে ক্রমমুক্তি হয়।

সাংখ্য মতে, ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবর্ত্তন হয়, কারণ কেবল তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ শ্রবণে বা উপদেশ দ্বারা মুক্তি হয় না। তাহার জন্য (যোগ) সাধন প্রয়োজন। মনুষ্য লোক ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। যাহা হউক, ইহা বলা যায় যে, এ স্থলে এই মনুষ্য লোকের কথাই উক্ত হইয়াছে।

৬০। শ্রুতিতে আত্মার গতি উল্লিখিত আছে। আত্মা ব্যাপক হইলেও উপাধিযোগে ভোগ করে, ও দেশ কালাদি লাভ করে। দৃষ্টান্ত আকাশ।

আকাশ পূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও যেমন ঘটাদি উপাধি যোগে পরিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার দেশান্তরে ও কালান্তরে গমন ব্যবহার হয়, এস্থলেও সেইরূপ আত্মা সম্বন্ধে গতির শ্রুতি আছে—

ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা।
ঘটো নীতেনাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ॥

কর্ম্মবশতঃ যে দেহে উপভোগ হয়, সেই সূক্ষ্ম দেহ গমনে আত্মার গতি লাভ হয়। যদিও আত্মা ব্যাপক চিৎরূপ সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে সমকালিক, কিন্তু জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহা দেখা যায় না। আত্মা ব্যাপক রূপে বৃত্তিজ্ঞান জন্মায় না। দেহাদি পরিচ্ছিন্ন রূপেই তাহার জ্ঞান হয়। যেমন সূর্য্য প্রকাশ স্বভাব হইলেও অব্যাপক বলিয়া এক কালে সর্ব্বস্থান প্রকাশ করে না। * * * কিন্তু যখন জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মাশয় দগ্ধ হয়, দৃষ্ট দেহ সংঘাতে রজস্তম মলা দূর হয়, যখন জ্ঞানব্যাপক হয়, তখন অধিকারী আত্মাতে আর বৃত্তিজ্ঞান জন্মায় না। আত্মজ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশ স্বভাব। তাহা ব্যাপক যেমন ব্যাপক আকাশ প্রাদেশিক ধূমাদি সম্বন্ধে মলিন হয় না। কিন্তু ঘটাদি অবচ্ছিন্ন হইলে তাহার মাত্র কতক অংশ মলিন মনে হয় ও তাহা হইতে

দূরবর্ত্তী সমুদয়কে মলিন বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে কিন্তু আকাশের মলিনতা হয় না। ব্যাপক আত্মা সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

আত্মার সহিত মনের সংযোগেই জীবাত্মা। মন প্রকৃতির দ্বারা ব্যাপ্ত। প্রকৃতির ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, সুখ দুঃখাদি অহঙ্কার ইন্দ্রিয়, তাহার বিষয় জন্মাদি আত্মাতে যুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

প্রকৃতির সাত্ত্বিক অংশ স্বচ্ছ। তাহাতে প্রতিবিম্বিত আত্মা, প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বাদি আপনাতে আরোপ করে। প্রকৃতির প্রতিবিম্ব হেতু আত্মাতে মিথ্যাভিমান হয়। যেমন জলের কম্পনে তাহাতে প্রতিবিম্বিত স্থির চন্দ্র কম্পিত হইতেছে, বোধ হয়। মলিন দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ মলিন বোধ হয়।

কেবল বিবেকীই কৈবল্যদর্শী, সেই আত্মার ব্যাপকত্ব অসঙ্গত্ব অপরিগামীত্ব জানিতে পারে। কর্ত্তাভিমান মিথ্যা বুঝিতে পারে। ধ্যান পরিপাকে, বাসনা ক্ষয় হয়, মনোলয়ে বাসনা নাশ হয়। তখন দেহ ভঙ্গে আর অন্য দেহ লাভ হয় না, জীবাত্মা পরমাত্মায় একত্ব সিদ্ধ হয়। তখন আত্মার আর ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ত্তৃত্ব যোগ হয় না। আত্মা অবাঙমানসগোচর হইলেও ইহার অপরোক্ষ অনুভূতি হয়, আত্মাবোধ আনন্দময় হয়।

উপরিউক্ত অনিরুদ্ধের ব্যাখ্যা বেদান্তসম্মত। তাহা সাংখ্য-সম্মত নহে। এস্থলে সূত্রের অর্থ এই যে, আত্মা ব্যাপক কিন্তু শ্রুতেতে তাহার গতি—স্বর্গাদিতে গতি উপদিষ্ট হইয়াছে। উপাধিযোগেই আত্মার এই গতি হয়, তাহার দেশ কালাদি লাভ হয়। আত্মা উপাধি বা দেহ হইতে মুক্ত হইলে তাহার ব্যাপক স্বরূপ লাভ হয়, তখন তাহার কোন গতি হয় না।

৬১। (আত্মার) অধিষ্ঠান না থাকিলে শরীর পুতিভাব যুক্ত হয়। এ অন্য তাহা সিদ্ধ হয় না।

যাহা ব্যাপক, যাহা নিত্য, যাহাতে পূর্ব্ব পশ্চাৎ ভাব নাই, তাহা দেহোৎপত্তির সমকাল হইতেই দেহে অধিষ্ঠিত হয়।

আত্মার অধিষ্ঠান হেতু শরীরোৎপত্তি সিদ্ধ হয়।

আত্মার অধিষ্ঠানই দেহের উৎপত্তির কারণ। দেহোৎপত্তির পরে তাহাতে আত্মার অধিষ্ঠান হয় না। আত্মার অধিষ্ঠান না থাকিলে শুক্র শোনিতযোগে যখন দেহ উৎপত্তি হয়, তখনই তাহা পচিয়া যাইত।

৬২। আত্মার সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত কেবল অদৃষ্ট দ্বারা দেহ রক্ষা সম্ভব নহে। যেমন বীজ ব্যতীত কেবল জলাদি দ্বারা অঙ্কুর উৎপাদন সম্ভব নহে।

নিরাশ্রয় অদৃষ্টের দেহ সম্বন্ধ করিবার সামর্থ্য নাই। তাহার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নাই।

শুক্রাদিতে সাক্ষাৎ ভোগ কর্ত্তার সম্বন্ধ দেখা যায় না। কিন্তু পুরুষ অদৃষ্টের আশ্রয়। এজন্য দেহ নির্ম্মাণ পুরুষ সংযোগ দ্বারা সম্ভব হয়।

৬৩। ইহারা (অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম) অহঙ্কারের ধর্ম্ম। আত্মা নির্গুণ। ইহাদের আত্মধর্ম্ম হওয়া অসম্ভব।

বৈশেষিক মতে অদৃষ্টের সম্বন্ধ দ্বারা আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব। কিন্তু অদৃষ্ট আত্মার ধর্ম্ম নহে। এজন্য ভোক্তা নির্গুণ পুরুষ অদৃষ্ট দ্বারা শরীরের হেতু হইতে পারে না। (বিঃ ভিঃ)

৬৪। অন্বয় ব্যতিরেক (প্রমাণ) দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে (কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি) বিশেষণ যুক্ত হইয়াই (আত্মার জীবত্ব হয়।)

দেহ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ও ইন্দ্রিয়াদি সংযোগে বিশিষ্ট হইয়াই আত্মার জীবত্ব হয়। ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া জীবাত্মা ঈশ্বর হন। তিনিই জগৎস্রষ্টা হন। যথা—ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জন তিষ্ঠতি…………। অহং বিশিষ্ট পুরুষই জীব। (বিঃ ভিঃ)। শ্রুতিতে আছে,

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবো স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্তায় কল্পতে।"

ইহা দ্বারা জীবের পরিচ্ছিন্নত্ব উপপন্ন হয়। কিন্তু জীব পরিচ্ছিন্ন নহে। সাংখ্য মতে ঈশ্বর অসিদ্ধ, এজন্য আত্মা পরমাত্মায় ভেদ

নাই। এই সূত্রে এইরূপ আশঙ্কার নিরাশ হইয়াছে।

জীব ধাতুর অর্থ বল ও প্রাণধারণ, জীবত্ব = প্রাণীত্ব। তাহা অহঙ্কার বিশিষ্ট পুরুষের ধর্ম্ম। ইহা কেবল পুরুষের ধর্ম্ম নহে। অন্বয় ব্যতিরেক হইতে ইহা বুঝা যায় যে, অহঙ্কার তাহার প্রাণধারণের অতিশয় সামর্থ্য দেখা যায়। চিত্তবৃত্তি নিরোধে অহঙ্কার শূন্য হইলে সে সামর্থ্য দেখা যায় না। কেন না, তখন প্রবৃত্তি হেতু রাগ উৎপাদক অহঙ্কারে অভাব থাকে। অতএব অন্তঃকরণ উপাধি যুক্ত জীবাত্মা পরিচ্ছিন্ন, পরমাত্মা আখ্যাত কেবল পুরুষ হইতে ভিন্ন। শাস্ত্রে আছে—

“যদাত্মভেদ বিজ্ঞান জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ।
ভবেৎ তদা মুনিশ্রেষ্ঠ পাশচ্ছোদো ভবিষ্যতি॥
আত্মনঃ দ্বিবিধং প্রাহুঃ পরাপরবিভেদতঃ।
পরস্তু নির্গুণঃ প্রোক্ত অহঙ্কারযুতোহপরঃ॥

ইহা দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মায় ভেদ কথিত হইয়াছে।

৬৫। কার্য্য মাত্রই অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্বাধীনে সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরের অধীনে সিদ্ধ হয় না। কারণ তাহার প্রমাণ নাই।

প্রমাণ নাই অর্থাৎ জগতের উৎপাদন জ্ঞানের প্রমাণ নাই।

অহঙ্কাররূপ যে কর্ত্তা, কার্য্য সিদ্ধি তাহার অধীন। সৃষ্টি সংহার তাহা হইতেই হয়। সৃষ্টি সংহার উপযোগী সামর্থ্য অহঙ্কার হইতেই হয়। বৈশেষিকেরা যে সৃষ্টিকে অহঙ্কৃত পরমেশ্বরের অধীন বলেন, তাহা নহে। অহঙ্কার বিহীন নিত্য ঈশ্বর যে সৃষ্টি করেন, তাহার প্রমাণ নাই। “অহং বহু স্যাম্”— এই শ্রুতি হইতে সৃষ্টি যে অহঙ্কার পূর্ব্বক তাহা জানা যায়। এস্থলে অহং শব্দের অনুকরণ অগ্রে স্বীকার করা যায়। এ সূত্র দ্বারা অহঙ্কার উপাধিক ব্রহ্মার ও রুদ্রের সৃষ্টি সংহারকত্ব উপপন্ন হয়।

৬৬। অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্ব অদৃষ্টের উদ্ভবের সমান।

অদৃষ্ট উদ্ভবের ন্যায় তাহার কর্ত্তৃকত্ব, হইলে তাহা কালরূপ নিমিত্ত উপেক্ষা করে। এই সৃষ্টি বিষয়ে কালবশতঃই প্রকৃতির চাঞ্চল্যাদি কর্ম্মের অভিব্যক্তি হয়। অন্য কোন কর্ত্তা স্বীকার করিলে তাহাতে অনবস্থ দোষ হয়। এই অনবস্থা দোষ পরিহার জন্য সৃষ্টিতে কাল বশতঃ প্রকৃতির অভিব্যক্তি স্বীকার করা যায়। সেইরূপ অহঙ্কারও কালাদি নিমিত্ত হেতু জন্মে, তাহার অন্য কারণ নাই। (বিঃ ভিঃ)

৬৭। তাহা মহৎ হইতে অন্য।

অহঙ্কার মহত্ত্বের কার্য্য। অহঙ্কারের কারণ যাহা, তাহা কার্য্য নহে।

অহঙ্কার হইতে সৃষ্টি পালনাদি হয়, মহত্তত্ত্ব হইতে হয় না। (বিঃ ভিঃ)

বিষ্ণু বিশুদ্ধ সত্বস্বরূপ। তাঁহার কামাদি অভিমান নাই। কেবল পরানুগ্রহ, তাঁহার প্রয়োজন। তিনি অহঙ্কারোপাধিক হইয়া পালন করেন। মহত্তত্ত্বোপাধিক বলিয়া তিনি বিষ্ণু মহান্, পরমেশ্বর ব্রহ্ম।

“যথাহ বাসুদেবাখ্যং চিত্তঃ তন্মহদাত্মকং।

বিজ্ঞান ভিক্ষুর এই ব্যাখ্যা পৌরাণিক। এই সূত্র হইতে জানা যায় যে, সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্ব হইতে সৃষ্টি হয় না। মহত্তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে সৃষ্টি হয়।

৬৮। পুরুষের সহিত প্রকৃতির কর্ম্মনিমিত্ত হইলেও তাহা বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি।

ধারা বাহিক অবিদ্যা কল্পনার দ্বারা তাহার নিমিত্ত নির্ণয় হয় না। তাহার নিমিত্ত কি? প্রকৃতির সহিত পুরুষের স্বস্বামিত্বই পুরুষের প্রভুত্ব। তাহা কর্ম্ম নিমিত্ত। অবিদ্যা প্রবাহ রূপে অনাদি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্বে প্রকৃতির পরিণাম হয়। এই অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতি পুরুষকে যেন আপনার স্বামী মনে করে, স্ব-স্বামী ভাব হয়। এবং এই সম্বন্ধ হেতু প্রসবধর্ম্মী প্রকৃতি মহান্‌কে প্রসব করেন, মহান্ অহঙ্কারকে উৎপাদন করেন, এবং এই অহঙ্কার হইতে সৃষ্টি হয়। অহঙ্কারের কর্ত্তা ভাব হইতে সৃষ্টি হয়। এই যে স্বস্বামী ভাবে পুরুষ প্রকৃতির সম্বন্ধ, ইহা অনাদি। কর্ম্ম নিমিত্ত এই পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ হয়,

আর এই সংযোগ জন্যই কর্ম্ম হয়। সুতরাং ইহা বীজার্থবৎ অনাদি।

৬৯। পঞ্চশিব বলেন, এই স্বস্বামী ভাব অবিবেক নিমিত্ত।

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত অবিবেক, সে পর্য্যন্ত স্বস্বামী ভাব থাকে।

প্রকৃতি পুরুষের ভোক্তৃ ভোগ্য ভাব অবিবেক নিমিত্ত। এ অবিবেক অনাদি।

পূর্ব্ব সূত্র অনুসারে পুরুষের প্রতি প্রকৃতির স্বস্বামী ভাব, কর্ম্ম নিমিত্ত। কিন্তু এই ভাব যেমন কর্ম্ম নিমিত্ত, সেইরূপ এই কর্ম্মও এই ভাব নিমিত্ত। পঞ্চশিবাচার্য্য বলেন যে, এই স্বস্বামী ভাব অবিবেক নিমিত্ত। পুরুষের অধিবিবেক হেতু প্রকৃতির সহিত তাহার সংযোগ হয়, তখন প্রকৃতিতে এই স্বস্বামী ভাব হয়।

অবিবেক প্রলয় কায়ে বাসনারূপ কার্য্যের ন্যায় বিদ্যমান থাকে। বিবেকের প্রাণভাব অবিবেক নহে।

৭০। সাংখ্য সনন্দনাচার্য্য বলেন, উক্ত স্বস্বামীভাব লিঙ্গ শরীর নিমিত্তক।

যাহা লয় হয়, তাহা লিঙ্গ। ইহা সূক্ষ্ম অতিবাহিক শরীর। যে পর্য্যন্ত স্থূল শরীরে সূক্ষ্ম শরীরের গমন হইবে, সে পর্য্যন্ত এই স্বস্বামী সম্বন্ধ হইবে ও বন্ধন হইবে।

লিঙ্গ শরীর দ্বারাই পুরুষের ভোগ হয়। এই মতে অবিবেক অনাদি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। লয়কালে লিঙ্গ শরীর থাকে না বটে, কিন্তু লিঙ্গ শরীরের কারণ ও পূর্ব্ব সৃষ্ট লিঙ্গ লয়ে লিঙ্গ শরীর উৎপাদক অবিবেক ও কর্ম্মাদি থাকে। তাহা দ্বারাই স্বস্বামী ভাব হয়। লিঙ্গ শরীর হইতে অবিবেক বশতঃ বাসনা ও কর্ম্ম হয়, ও বাসনা কর্ম্ম হইতে আবার লিঙ্গ শরীর হয়।. (বিঃ ভিঃ)

৭১। সে যাহাই হউক, উক্ত সম্বন্ধ উচ্ছেদই পুরুষার্থ, তাহাই পুরুষার্থ।

এই স্বস্বামী সম্বন্ধ কর্ম্ম নিমিত্ত হউক বা অবিবেক নিমিত্ত হউক, বা লিঙ্গ-শরীর নিমিত্ত হউক, তাহার উচ্ছেদই পুরুষার্থ।

প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্য ভোক্তা সম্বন্ধ যে নিমিত্তই হউক, তাহার উচ্ছেদই পরম পুরুষার্থ।

আরম্ভে দুঃখনিবৃত্তি পরম পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। উপসংহারে সুখদুঃখ উভয় সাধারণ ভোগ নিবৃত্তিই পুরুষার্থ রূপে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সুখকে দুঃখ মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। সুতরাং সুখভোগ ও দুঃখভোগের অন্তর্গত। এজন্য আরম্ভ উপসংহারে বিরোধ নাই।

ভগবান্ বিষ্ণুই কপিল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অখিল লোক হিতার্থ এই সাংখ্যশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। কোন কোন বেদান্তী বলেন, সাংখ্য-প্রণেতা কপিল বিষ্ণু নহেন। তিনি অগ্নির অবতার। স্মৃতিতে আছে—
অগ্নি স কপিলো নাম সাংখ্যশাস্ত্র প্রবর্ত্তকঃ।"

কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। অন্য স্মৃতিতে আছে—

এতন্মে জন্মলোকহস্মিন্ সুমুক্ষুনাং দুরাগয়াৎ।
প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্ভূতায়াত্মদর্শনং।

ইহাতে জানা যায় যে, বিষ্ণুর অবতার, দেবহূতির পুত্রই সাংখ্য উপদেষ্টা।

অগ্নির পুত্র কপিল ও বিষ্ণুর অবতার কপিল, এরূপ দুই কপিল স্বীকারের প্রয়োজন নাই। অগ্নি কালের ন্যায় বিষ্ণুর শক্তি বিশেষ।

সাংখ্য কুল্যাঃ সমাপূর্ণা বেদান্ত মথিতামৃতৈঃ।
কপিলর্ষি জ্ঞানযজ্ঞে ঋষীনা পারয়ৎ পুরা॥
তত্র চঃ শ্রদ্ধয়া তস্মিন্ গুরৌচ স্থিরভাবতঃ।
তৎপ্রসাদ লবেনেদং তৎশাস্ত্রং বিবৃতং ময়া।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের সার সংগ্রহ।

বিষয়	সূত্র সখ্যা।
১। আত্মা আছে	১
২। তাহা দেহ হইতে ভিন্ন	২ ৪
৩। দুঃখ নিবৃত্তিই পুরুষার্থ	৫
৪। সুখলাভ পুরুষার্থ নহে	৬-৯
৫। আত্মা নির্গুণ	১০
৬। অবিবেক হেতু দুঃখভোগ	১১
৭। অবিবেক অনাদি	১২-১৩
৮। বিবেকদ্বারা অবিবেক নাশ	১৪-১৬
৯। তাহার ফল	১৭-১৯
১০। অন্তরায় দূর-মুক্তি	২০-২২

১১।	অধিকারী ভেদে সাধনা ভেদ	২৩-২৪
১২।	আসন, ধ্যান	২৫-২৬
১৩।	ধ্যানফলে উপরাগ নিরোধ	২৭
১৪।	অবিবেক হেতু উপরাগ	২৮ ২৯
১৫।	ধ্যান সিদ্ধি	৩০-৩১
১৬।	ধ্যানের স্থান নিয়ম নাই	৩১
১৭।	সৃষ্টির প্রকৃতির উপদান	৩৩
১৮।	পুরুষ উপাদান নহে	৩৪ ৩৫
১৯।	প্রকৃতি (প্রধান) পরম্পরা রূপ কারণ	৩৬
২০।	প্রধানের বিভুত্ব	৩৭
২১।	প্রধান গতিশীল	৩৮
২২।	প্রধান ও ত্রিগুণ দ্রব্য	৩৯-৪০
২৩।	প্রধান পুরুষের জন্য সৃষ্টি করে	৪১
২৪।	কর্ম্ম-বৈচিত্র্যে সৃষ্টিবৈচিত্র্য	৪২
২৫।	সাম্যবৈষম্যে সৃষ্টিলয়	৪৩
২৬।	মুক্ত পুরুষ জন্য প্রধান সৃষ্টিকারণ	৪৪-৪৫
২৭।	পুরুষ বহু, তাহার একত্বসিদ্ধ হয় না	৪৬-৪৯
২৮।	আত্মা প্রকাশক	৫০-৫১
২৯।	বহু পুরুষবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে	৫২
৩০।	জগৎ সত্য	৫৩-৫৪
৩১।	অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্ব	৫৫
৩২।	অহঙ্কার অর্জ্জিত কর্ম্ম পুরুষের ভোগ	৫৬
৩৩।	সেই হেতু প্রত্যাবর্ত্তন হয়	৫৭
৩৪।	জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন	৫৭-৫৯
৩৫।	উপাধি যোগে আত্মার গতি	৬০
৩৬।	শরীরে আত্মার অধিকার	৬১-৬৩
৩৭।	জীবত্ব	৬৪
৩৮।	অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্বে কার্য্যসিদ্ধি	৬৫-৬৬
৩৯।	অহঙ্কার মহৎ হইতে ভিন্ন	৬৮
৪০।	পুরুষপ্রকৃতির জন্য স্বস্বামীভাব নিবৃত্তিই মুক্তি	৬৯-৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব ।

(ক) পুরুষ ।

	তত্ত্ব ।	পূর্ব্বোক্ত বিষয় সংখ্যা ।
১।	পুরুষ (আত্মা) দেহাতিরিক্ত	১-২
২।	বহু	২৭-২৯
৩।	প্রকাশক	২৮
৪।	উপাধি হেতু গতি	৩৫
৫।	শরীরে অধিষ্ঠান	৩৬

(খ) পুরুষার্থ ।

৭।	জীবত্ব	৩৭
৮।	পুরুষার্থ	৩-৪
৯।	অত্মার বন্ধন	৫-৬-৭-১০
১০।	মুক্তি	৭-৯-১০-৪০
১১।	সাধনা	১১-১২-১৩-১৫-১৬

(গ) সৃষ্টি ।

১২।	সৃষ্টি-তত্ত্ব	১৭-২৬
১৩।	জগৎ সত্য	৩০
১৪।	অহঙ্কার কর্ত্তা	৩১-৩৪-৩৮-৩৯

সাংখ্যকারিকার সূচীপত্র ।

	বিষয়	কারিকার শ্লোক সংখ্যা ।
১।	দুঃখনিবৃত্তি	১
	তাহার উপায়	১
২।	ব্যক্ত, অব্যক্ত	২
৩।	সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব	৩
৪।	প্রমাণ	৪ ৭
৫।	মহদাদি অনুপলব্ধির কারণ	৭
৬।	সৎকার্য্যবাদ	৯
৭।	ব্যক্ত ও অব্যক্তের বৈধর্ম্ম্য ও সাধর্ম্ম্য, তাহাদের হইতে পুরুষের বৈধর্ম্ম্য	১০-১১
৮।	ত্রিগুণ	১২-২৩
	ব্যক্ত ও তাহার অব্যক্ত কারণ, সকলই ত্রিগুণাত্মক, ত্রিগুণের পরিণাম	১৪-১৬
৯।	পুরুষ	১৭-১৯
১০।	প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ, তাহার কারণ	২০-২১
১১।	সৃষ্টিক্রম	২২
১২।	বুদ্ধি	২৩
১৩।	অহঙ্কার	২৪-২৫
১৪।	দশ ইন্দ্রিয় ও মন	২৬-২৮
১৫।	করণের সামান্য অসামান্য বৃত্তি	২৯-৩০
১৬।	কারণের বিভাগ ও বৃত্তিক্রিয়া	৩৩-৩৭
১৭।	তন্মাত্র (অবিশেষ) তাহা হইতে স্থূলভূত (বিশেষ)	৩৮
১৮।	বিশেষের বিভাগ যথা :— স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, মহাভূত	৩৯
১৯।	সূক্ষ্ম শরীর বিভাগ	৪০-৪১
	সূক্ষ্ম শরীরের স্থূল শরীর গ্রহণ	৪২

২০।	তাহার নিমিত্ত নৈমিত্তিক ভাব (কারণ)	৪৩
২১।	তাহার ফল (আট প্রকার ভাব) (ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি বুদ্ধির ৮ ভাবের ফল)	৪৪-৪৫
২২।	পঞ্চাশৎ প্রত্যয় সর্গ (গুণভেদে বুদ্ধির কার্য্যবিভাগ)	৪৬-৪৭
	বিপর্য্যয় আশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধির ভেদ	৪৮-৫১
২৩।	ভাব ও লিঙ্গ সর্গ (?)	৫২
২৪।	ভৌতিক সর্গ	৫৩-৫৮
২৫।	পুরুষার্থ প্রধানের সৃষ্টি	৫৫-৬০
২৬।	সৃষ্টি নিবৃত্তি	৬১
২৭।	পুরুষের বন্ধন ও মুক্তি	৬২-৬৩
২৮।	বিবেক জ্ঞান (ও সৃষ্টি নিবৃত্তি)	৭৪ ৬৬
২৯।	ফল জীবন্মুক্তি (কিন্তু প্রারব্ধ ভোগ,	৬৭
৩০।	কৈবল্য	৬৮

সাংখ্য সূত্রসংখ্যা।

অধ্যায়	বিজ্ঞানভিক্ষু ধৃত সূত্র সংখ্যা	অনিরুদ্ধ ধৃত সূত্র সংখ্যা	মন্তব্য।
	১৬৪	১৬২	বিজ্ঞানভিক্ষু ধৃত ১৩ ও ৪৩ সূত্র অনিরুদ্ধে নাই।
	৪৭	৪৬	বিজ্ঞানভিক্ষুর শেষ সূত্র (৪৭) অনিরুদ্ধে নাই।
	৮৪	৮৩	বিজ্ঞানভিক্ষুর ৫ সূত্র অনিরুদ্ধে নাই।
	৩২	৩২	
	১২৯	১৩০	অনিরুদ্ধের ৬৯ সূত্র বিজ্ঞান ভিক্ষুর নাই।
	৭০	৭১	অনিরুদ্ধের ২১ সূত্র বিজ্ঞান ভিক্ষুর নাই।
	৫২৬	৫২৪	

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

মহেশ কাকা।

মহেশ কাকা আমাদের বাড়ীর অনেকদিনের পুরাতন ভৃত্য। আমার যখন বয়ঃক্রম দুই বৎসর হইবে, তখন সে আমাদের গৃহে আগমন করে। মনে পড়ে তাহাকে "সুয়োরাণী, দুয়োরাণীর" "রাক্ষস খোক্কসের" গল্প করিতে কত উপদ্রব করিয়াছি। সে আমাকে লইয়াই থাকিত। সে বলিত, তাহার বাপ, মা, ভাই বোন কেহই নাই। আমি তার সব। আমিও তাহাকে এক মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না। সর্ব্বদাই তাহার কাছে থাকিতাম। একদিন খেলিতে খেলিতে আমি আমার পিতৃদেবের একখানি প্রিয় ফ্রেমকরা ছবি ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। পিতৃদেব গৃহে আসিয়াই খুব রাগারাগি আরম্ভ করিলেন। অপরাধ স্বীকার করিতে আমার খুব ভয় হইতে লাগিল ; কিন্তু মহেশকাকার কাছে সব খুলিয়া বলিলাম। মহেশ কাকা বলিল "দাদু আমার, তোমার বাবার কাছে সব বলিয়া ক্ষমা চাও। বাবা যদি মারেন, মার খেলেই বা, মার খাবার ভয়ে কি মিছে কথা বলবে? দাদু আমার সত্য, কথা বল। ঈশ্বর তোমাকে ভালবাস্‌বেন।

তুমি মিছে বল্‌লে আমার মনে ভারী কষ্ট হবে।” আমি বাবার কাছে সব বলিয়া ক্ষমা চাহিলাম। বাবা ক্ষমা করিলেন। মহেশকাকা আসিয়া আমাকে কোলে করিয়া চুম্বন করিলেন।

মহেশকাকা আমাকে বলিতেন, “দাদু, সকাল সন্ধ্যায় তুমি ঈশ্বরের নাম গান কোরো, তোমার তাতে ভাল হবে।”

১৩০৮ সালে, আমার বেশ মনে আছে, আমাদের গ্রামে ভীষণ কলেরা আরম্ভ হয়। আমার মহেশকাকা বিনা আহ্বানে সকলের আগে রোগীর শয্যার পাশে, দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, কাটাইয়া দিতেন। তাঁহার প্রশান্ত মুখে কোনও দিন বিরক্তির চিহ্ন দেখিতাম না। আমি ক্রমে বড় হইতে লাগিলাম। আমি পড়িতাম, মহেশকাকা আমার নিকট বসিয়া থাকিতেন। আমি গণিত ভাল জানিতাম না। মহেশকাকা বলিতেন “যারা তোমাদের ক্লাশে ভাল নম্বর পায়, তারাও তোমারই মত মানুষ। তুমি কেন পারিবে না? একবার না পার আবার কর, তাহা হইলে পারিবে।” আমি তখন হইতে খুব যত্ন করিয়া গণিত করিতে লাগিলাম এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। তখন মহেশকাকার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতাম যে, তাহা গভীর আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। সে আনন্দ-ভাসিত মুখ কখন ভুলিব না।

যথাসময়ে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিবার জন্য উদ্যোগ করিলাম। আসিবার সময় মহেশকাকা বলিলেন “দাদু আমার, কলিকাতায় ভাল হোয়ে থেকো, মন্দ সংসর্গে যেয়ো না; আর দুবেলা ঈশ্বরের নাম কোরো।” কলিকাতায় কয়েক মাস আমার ভাল রূপেই কাটিল, কিন্তু এপ্রিল মাসে আমি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলাম। পিতৃদেব মহেশকাকাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ আসিলেন। আমি যে কয়েকমাস শয্যাশায়ী ছিলাম, মহেশ কাকা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার পার্শ্ব ত্যাগ করেন নাই। আমি সারিয়া উঠিলাম, কিন্তু মহেশকাকা এই কাল রোগে যে শয্যাশায়ী হইলেন, সে শয্যা ত্যাগ করিয়া আর উঠিলেন না। দুরন্ত কাল আমার মহেশ কাকাকে লইয়া গেল। এতদিনের পর মহেশ কাকাকে হারাইয়া যে কি কষ্ট হইল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মহেশকাকার প্রত্যেক কথাই এখনও আমার স্মৃতি-পথে জাগরিত আছে ও চিরকালের জন্য থাকিবে।

মহেশকাকা এক অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণের তেজ, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য ছিল। কঠোরতা ও কোমলতার এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না। তিনি নারীর কোমল প্রাণ লইয়া এ সংসারে আসিয়া সকলকে ভালবাসিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন পরকে আপন করিতেন, এমন আর কয়জনে পারে? তিনি সংযমী, আত্মত্যাগী, গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার এই সকল অনন্যসাধারণ গুণগুলি সকলের আদর্শ হওয়া উচিত।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

আবিরাবীর্ম´ এষি।

(“বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের” বর্দ্ধমান অধিবেশনে পঠিত)

সহস্র হৃদয় রচি’ জননীর পূজার মন্দির
সাজাইয়ে স্তরে স্তরে অর্ঘ্যরাজি আনন্দে গভীর
প্রতীক্ষা-ব্যাকুল সবে! সবাকাব প্রাণের স্পন্দন
অনন্ত আকাশ ‘পরে জাগাইয়ে অপূর্ব্ব কম্পন
উথলিছে ঊর্দ্ধ পানে, যেন দিব্য অনাহত-ধ্বনি
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিরচিয়ে সুশাশ্বত-মিলন-শরণী
ধ্বনিছে অন্তরাকাশে!
অয়ি বিশ্ব-পূজিতা জননি!
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী অয়ি! উদ্ভাসিয়া নিখিল অবনী
এস, প্রকাশিত হও! হেথা তুমি হও অধিষ্ঠান!
দূরে যাক্ অন্ধকার, ঘুচে যাক্ বাধা-ব্যবধান,
তোমার চরণ-প্রান্ত হোক্ সত্য-মিলনের স্থান
সন্তানগণের তব! কণ্ঠে কণ্ঠে বন্দনার গান

মুহুর্মুহুঃ পরশিয়া আন্দোলিয়া উদার অম্বর
বরষিয়া দিকে দিকে অফুরন্ত পীযুষ-নির্ঝর
জাগিয়া উঠুক্ আজি !

হে চিন্ময়ী, শ্বেতাব্জবাসিনি !
কে জানে সে কোন্ মহাযুগান্তের বিচিত্র কাহিনী
ধ্যান-রত মহর্ষির বিকশিত-চিত্ত-শতদলে
অজ্ঞাতে স্থাপিলে তুমি ওই রক্ত-চরণ-কমলে
আশীষ্-নির্ম্মাল্য হেন, অকস্মাৎ সম্মুগ্ধ পরাণ
শিহরিয়া হর্ষ ভরে মাগো, তোমা করিল আহ্বান
কি ব্যাকুল ঋক্-ছন্দে ! সেইদিন বিশ্ব-জগতের
অস্ফুট-হৃদয়-রাজ্যে শুভক্ষণে নব বসন্তের
পশিল মধুর বার্ত্তা, হ'ল বিশ্বে প্রভাত প্রথম
স্নিগ্ধ রবিকরোজ্জ্বল ! প্রথম গাহিল বিহঙ্গম
উন্মুক্ত গগন তলে, ত্যজি' সুখে নিশীথ-আশ্রয়
প্রচ্ছন্ন নীড়ের কোল ! সেই দিন প্রথম মলয়
বহিল ভুবন মাঝে সত্য-শিব-সুন্দর রাজার
আনন্দ-সন্দেশ লয়ে ! আলিঙ্গিতে মহাপারাবার
লক্ষ পথে লক্ষ নদী লক্ষ বাহু করিয়া বিস্তার
ধাইল প্রথম হায়, প্রেম-গানে মুখরি' সংসার
তৃষিত ধরণী প্লাবি' !

ধ্যানময়ী, ভকত-বৎসলে !
মগ্ন রহি' নিশিদিন বসুধার তুচ্ছ কোলাহলে
কোথা হেন ধ্যান-বল পাবে আজি অভাগ্য তনয়
আহ্বানিতে তোমা হেথা ! কোথা হেন মহান্ হৃদয়
বাজায়ে জীবন-শঙ্খ আকর্ষিতে ভাগীরথী সম
পবিত্র জাহ্নবী-ধারা ! মাগো ! তব কৃপা অনুপম—
চির-কৃপাময়ী তুমি ! তব সেই করুণা-গৌরব
বারেক রাখিতে আজি সঞ্জীবিয়া সবে অভিনব
প্রকাশ করুণা করি' ! লভি' তব শ্রীপদ-ধূলায়
সত্য হোক্ সমুজ্জ্বল, পুণ্য হোক্ সুখদ ধরায়,
মহৎ হউক্ আরো গ্লানি-হীন মহৎ ভাস্বর,
পূর্ণ হোক্ শূন্য হৃদি !

হে কল্যাণি ! হের একবার
জ্ঞানী গুণী সুতবৃন্দ অর্চ্চিবারে চরণ তোমার
মিলিলা হেথায় আজি ! অয়ি বাণি ! অয়ি সরস্বতি !
লহ তুমি সবাকার সুনিভৃত মর্ম্মের আরতি
প্রকাশি' সবার প্রাণে জ্যোতির্ম্ময়ী বরাভয়া-বেশে
আশ্বাসিয়া হাস্যমুখে ! এ পুণ্যদ মাহেন্দ্র-নিমেষে
হে বীণা-বাদিনী মাতঃ ! সবাকার হৃদয় মাঝার
তব ওই সুধা-স্রাবী মধুময় বীণার ঝঙ্কার
মুখরি' তুলগো আজি ! যার যাহা আছে সাধনার,
যে যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, জীবনের লক্ষ যাহা যার,
সব হোক্ মধুময়---সব হোক সার্থক শোভন—
প্রসাদী-পুষ্পের প্রায় !

পূজার্থির এই সম্মিলন
পরস্পর প্রাণে প্রাণে এনে দিক্ নিবিড় বন্ধন
প্রত্যক্ষ প্রকাশে তব ! ভুলি সব পার্থক্য আপন
তোমাতে ডুবিয়া যাই ! কোটি আত্মা একত্রে গাঁথিয়া
অন্তর-বাসিনী অয়ি ! ও চরণে অঞ্জলি সঁপিয়া
আজি যেন নত শিরে বহি তব করুণার দান
অনাবিল শান্তি আর প্রীতিমাখা অক্ষয় কল্যাণ।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

দৈব ও পুরুষকার।

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের নাম প্রাক্তন বা দৈব। ইহকৃত কর্ম্মের নাম পৌরুষ বা পুরুষকার। দৈব ও পুরুষকার, দুইই পুরুষের কার্য্য, দুইই পুরুষ-ব্যাপারাধীন। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম পুরুষাধীন হইলেও ইহজন্মে তাহা বুঝা যায় না বলিয়াই দৈব নিষ্পাদ্য বলিয়া বোধ হয়; তজ্জন্যই ইহার দৈব আখ্যা। দৈব আকাশ হইতে বৃষ্টির মত নামে না, মাটীর ভিতর হইতে সুবর্ণের মত নির্গত হয় না, দেবতা হইতে করুণার মত নিষ্কারণে ভক্ত-মস্তকে বর্ষিত হয় না। যে যেমন কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, সে তেমনই ফলভোগ করিবে—ইহাই পরমেশ্বরের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। দৈব বিধাতার মঙ্গলকর দান নহে—মানবেরই কৃত, সৃষ্ট। যে যেরূপ কর্ম্ম করে, সে যদি তদ্রূপ ফল না পায়, তাহা হইলে শুভ ও অশুভ কর্ম্মের আর পার্থক্য থাকে না। ফলের বৈপরীত্য ঘটিলে সকলেই বটবীজ হইতে আম্রফলের আশা করিত। যে জাতীয় বীজ রোপণ করা যাইবে, তজ্জাতীয় বৃক্ষই উৎপন্ন হইবে। আমরা অনেক সময়ে কৃতকর্ম্মের ফল সদ্য সদ্য প্রাপ্ত হই, কখনও বা বাল্য কালের কৃত-কর্ম্মের ফল যৌবনে, বা যৌবনের ফল বার্দ্ধক্যে লাভ করি—ইহাই পৌরুষ বা পুরুষকার। পুরুষকারের গৌরব মাল্যের মত সাদরে মস্তকে পাতিয়া লই। বৈফল্য দৈবের ঘাড়ে চাপাইয়া স্বস্তি পাই, ইহা আমাদের অন্যায়। আবার কখন কখন অনেক পুণ্য বা পাপ কর্ম্মের ফল বর্ত্তমান শরীরে পাই না। পাই না বলিয়া যে পাইব না, তাহা নহে।

দেহান্তে লিঙ্গ শরীরে বা দেহান্তরে কৃত কর্ম্মের ফল পাইতেই হইবে। ঐ ভাবী ফল যাহা আমরা দেহান্তেও সঙ্গে লইয়া যাই, দেহান্তরে তৎফলে জন্মগ্রহণ করি, ও তদ্দেহে ফল ভোগ করিতে বাধ্য হই—তাহার নামই অদৃষ্ট কর্ম্ম। আর এমন অনেক কর্ম্ম-ফল ভোগ করি, যাহা বর্ত্তমান শরীরের কর্ম্মের ফল নহে, তাহাই দৈব বা অদৃষ্ট। আমাদের মধ্যে কেহ রাজগৃহে, কেহ অসভ্য সাঁওতালদের ঘরে, কেহ বা যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ জন্মগ্রহণ কদাপি আমাদের বর্ত্তমান শরীর-নিষ্পাদ্য কর্ম্মের ফল নহে, উহাই দৈব বা অদৃষ্ট। শিশু জন্মিবামাত্র মরিয়া গেল বা দারুণ যন্ত্রণা পাইতে লাগিল, তাহা শিশুর বর্ত্তমান দেহের কর্ম্মফল হইতে পারে না। অথচ পিতামাতার কর্ম্মের জন্য অজ্ঞান নিরপরাধ শিশু কষ্ট ভোগ করিবে, অপরের কর্ম্মফল অপরে ভোগ করিবে, ইহা কদাপি সম্ভব নহে। তবে পিতামাতা উপলক্ষ্য বা নিমিত্ত কারণ। শিশুরই পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্মফলে উক্ত পিতামাতার সন্তান হইয়াছে; শিশুরই জন্মান্তরীন ভোগের জন্য পিতা মাতার অত্যাচার-প্রবৃত্তি, তৎফলে কষ্টভোগ শিশুকে পাইতে হয়। এই আগত বা আগামী কর্ম্মফল বা দৈব আমাদের নির্দ্দিষ্ট সসীম মনোবৃত্তির আয়ত্তে আইসে না, প্রত্যক্ষ দ্বারা বা অনুমান দ্বারা জানা যায় না। এইজন্য এই কর্ম্মফল অজ্ঞাত ও অদৃষ্ট। অ-দৃষ্ট বলিয়া ইহার একটী নাম অদৃষ্ট। অবশ্যম্ভাবী বলিয়া নিয়তি। দাড়াইল পূর্ব্বকৃত পুরুষকারই দৈব।

দৈব ও পুরুষকারে বিরোধিতা নাই।

বলিয়াছি, দৈব ও পুরুষকর্ম্ম, পুরুষকারও পুরুষকর্ম্ম। একটী পূর্ব্বজন্মের, অপরটী বর্ত্তমান শরীরের, ইহাই পার্থক্য। সাধারণতঃ দৈব ও পুরুষকারের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ ঘটে না। যাহার যে জাতীয় দৈব, পুরুষ প্রবৃত্তি তজ্জাতীয়ই হইয়া থাকে। আর প্রবৃত্তি অনুরূপই পুরুষ কর্ম্ম। যে যেমন দৈব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুরূপই সে কর্ম্ম করিয়া যাইবে; কাজেই দৈবের বিরুদ্ধে সচরাচর পুরুষকারের গতি নাই। শুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্টের ফলে প্রথম তদনুরূপ জন্মলাভ, তদনন্তর—তৎসদৃশ পুরুষ-প্রবৃত্তি, পশ্চাৎ তত্তুল্য পুরুষকর্ম্ম। দৈব্য কারণ, পুরুষকার তাহার কার্য্য—এই কারণ ও কার্য্যের বিরোধ সম্ভাবনা কোথায়? দৈবের ফল পুরুষকার হইলে, পরস্পর বিরুদ্ধতা থাকিতে পারে না। পুরুষকার যখন দৈবের অনুকূলে, তখনই ইহার সাফল্য, যখন দৈবের প্রতিকূলে, তখনই বৈফল্য। তুল্যরূপ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কাহাকে কৃতকার্য্য, কাহাকে বা অকৃতকার্য্য দেখা যায়। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অদৃষ্ট কাহার অনুকূলে, কাহারও বা প্রতিকূলে বিদ্যমান ছিল। অদৃষ্ট সর্ব্বপ্রকারেই অ-দৃষ্ট ও অজ্ঞাত; ইহার অনুকূলতা ইয়ত্তা করা অসম্ভব। কাজেই অদৃষ্ট অনুকূল কি না, ইহা বুঝিয়া কার্য্য করা মানবের পক্ষে সম্ভব নহে। পূর্ব্বজন্মের কৃতকর্ম্ম ইহজন্মে যখন ফল দান করে, তখনই তাহার অস্তিত্ব বোঝা যায়। কর্ম্মফল কি প্রকার, ইহা জানিলে এই সংসার-মায়ার এই কঠোর বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, ভবের লেখা ধূলার প্রতি সত্যতা বোধ থাকে না। বিধাতার ইচ্ছাও ইহা নহে যে, মানব আপনাদের অতীত ও ভবিষ্যৎতত্ত্ব সম্যক্ আয়ত্ত করে। "ফলানু মেয়াঃ প্রারব্ধাঃ" পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের তত্ত্ব জানিবার আশা ত্যাগ করিয়া, পুরুষকারের সাধনা করিয়া যাইলে বোঝা যাইবে, অদৃষ্ট অনুকূল কি না? দৈব জানিলে কেহই আর পুরুষকার সাধনায় অগ্রসর হইবার প্রয়োজন বোধ করিবে না। প্রতিকূল জানিলে পুরুষকার-প্রবৃত্তিই জন্মিবে না।

দৈব স্বীকারের উপযোগিতা।

সাধারণতঃ মানবেরা যখন কঠোর পুরুষকারের সেবা করিয়া বিফল-মনোরথ হয়, তখন পুরুষকারের উপর অনাস্থা আসাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এই অনাস্থা, এই বীতশ্রদ্ধা মানবকে কর্ম্মবিমুখ, অলস ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। দৈব মানিবার পক্ষে দ্বিতীয় উপকার, সান্ত্বনালাভ। সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ব্যক্তির তরণীর মত এই সান্ত্বনা প্রকৃতই জীবের পক্ষে জীবনের অবলম্বন।

মানবের তৃষ্ণা-রাক্ষসী, লালসা-পিশাচীর ব্রহ্মাণ্ডোদর কিছুতেই পূর্ণ হয় না। কামনার হুতাশন ভোগের ঘৃতক্ষেপে নির্ব্বাপিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরও লেলিহান শিখা-বিস্তার করিয়া প্রজ্জ্বলিত হয়। দুরাশা বিসবল্লীর বিষাক্ত বাতাসে মানব নিরন্তরই আচ্ছন্ন থাকে, কাজেই তদুপরি নৈরাশ্যও জাড্য তাণ্ডব নৃত্যে ঐ মানব সমাজে বিচরণ করে। ফলে শোকাকুল, দুঃখাতুর মানব-জীবনের উপর, ধর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া নানাবিধ অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহে। সে সময়ে দেবতার মত করুণাময় দৈব মানবগণকে আশ্বস্ত ও রক্ষা করিয়া থাকেন। আমার পুত্রের জীবন-কুসুম অকালে শুকাইয়া গেল, আমার জীবনানন্দদায়িনী প্রিয়তমা যৌবনেই স্বর্গে যাইলেন, এই অবস্থায় যদি স্থির ধারণা করা যায় যে, আমারই ইহা দৈব; দুরদৃষ্ট বশতঃই এই মনস্তাপ আমাকে পাইতে হইয়াছে, এই ভবিতব্যতার অলঙ্ঘ্যতার জন্যই সমস্ত যত্ন নিষ্ফল হইয়াছে, তাহা হইলে মানব আবার আশান্বিত হইয়া কার্য্যকরণে অগ্রসর হইতে পারে। নিয়ত শোকদুঃখ-প্রচুর সংসারে, অদৃষ্টে বিশ্বাস মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের মত কার্য্য করে।

অন্ধভাবে দৈব স্বীকারের অপকারিতা।

অন্ধভাবে দৈব স্বীকারের আবার অনেক অপকারিতা দৃষ্ট হয়। অন্ধভাবে দৈব অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ প্রায়ই বিশ্বাসের অমৃতাস্বাদ পান না, কিন্তু নিষ্ক্রিয়তার অবসাদ জ্বালাটী ষোল আনাই লাভ করেন। ইঁহারা মনে করেন, দৈব অনুকূল থাকিলে আমি ঘরে বসিয়া মানিক পাইব,—ধূলিমুষ্টি কুড়াইয়া লইলে তাহা নিমেষে স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত হইয়া যাইবে, বিনা যত্নে বিনা শ্রমে অগাধ সম্পত্তি লাভের অধিকারী হইব। কিন্তু বস্তুতঃ মানিক আকাশ হইতে বৃষ্টিধারার মত নামিয়া আসে না, ধূলি মুষ্টিকে স্বর্ণমুষ্টি করিবার মত নূতন পরশমণিও মানবের ভাগ্যে মেলে না, ধনসম্পত্তিও উৎসের মত মাটীর ভিতর হইতে বাহির হয় না। এইরূপ ব্যক্তি পুরুষকারে আস্থাহীন হইয়া ক্রমে অলস ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া উঠে। সাধারণতঃ অজ্ঞ মানবের স্বভাবই এই যে, নিজেদের দোষগুলি স্কন্ধ হইতে কোন মতে নামাইতে পারিলে স্বস্তি বোধ করে। নিজেদের দোষেই কুফল ফলিতেছে, ইহা স্বীকার করিয়া কল্পিত আত্মপ্রসন্নতাটুকু নাশ করিতে চাহে না। কে সহজে বলিতে চাহে, কে মুক্তকণ্ঠে আপনার অবিমৃষ্যকারিতা অক্ষমতা প্রভৃতি দোষ স্বীকার করে? নিজেদের দোষ স্বীকার করিয়া দেশের কাছে, দশের কাছে অপদস্থ হইতে কে চাহে? কাজেই সকলেই আপনাপন দোষ ও পাপগুলির আবরণ দিবার চেষ্টা পায়। কখন দৈব, কখন সমাজ, কখন ধর্ম্ম, কখনও বা স্বীয় পিতৃপুরুষের দোহাই দিয়া আপনাদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বিচারক মাত্রেই বুঝেন,—ইহা একটী নূতন চাতুরী, অভিনব কৌশল মাত্র। ইহাতে আপনাদিগকে দোষনির্ম্মুক্ত করা যায় না। ইহজন্মের দোষ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইলেও যাইতে পারে, কিন্তু গতজন্মের দোষ হইতে উদ্ধার কোন মতেই হয় না। বর্ত্তমান দেহের দোষ বা পাপ না বলিয়া, অতীত জন্মের দোষ বা পাপকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় মাত্র। এই রোগটী আমার কোন দোষে হয় নাই—ইহা বুঝিলেও কেহ বোঝে না—ঐ রোগের কারণীভূত অত্যাচার পূর্ব্বে আমারই কৃত। ইহাতে মানবের অজ্ঞতা, অহমিকাই প্রকাশ পায়। নিরপরাধ সমাজ, নির্দ্দোষ ধর্ম্ম, উদাসীন দৈবের স্কন্ধ অত্যন্ত দৃঢ় যে, অজ্ঞ অহমিকাসম্পন্ন মানবগণের পাপ ও দোষের ভার বহন করিয়াও, তাহাদিগকে বিদ্রোহী হইতে দেখা যায় না। আজ কাল ইহা একটী 'মেনিয়া' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মেনিয়া অজ্ঞতাপ্রচ্ছন্ন কপটতা ও অহমিকা হইতেই জাত। ইহার দ্বারা মানবগণের অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, ত্বক্, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, জীবাত্মা পর্য্যন্ত বিজড়িত ও আচ্ছন্ন আছে। মানবগণ পাপী হইলেই ধর্ম্ম অকর্ম্মণ্য, সমাজ অধঃপতিত, দৈব ধিক্কৃত হইয়া থাকে। আবার মানব পুণ্যবান্ হইলে ধর্ম্ম-চতুষ্পাদ, সমাজ উন্নত, দৈব প্রশংসিত হইয়া থাকে।

দৈববাদী মতে দৈবানুকূলতা পুরুষকারের ধর্ম্ম।

সাধারণতঃ দৈবের অনুকূলে পুরুষকারে তদ্রূপ। অর্থাৎ যাহার যেমন প্রাক্তন কর্ম্ম, তাহার প্রবৃত্তিও তদ্রূপ। পুরুষকার জন্মান্তরীণ প্রবৃত্তিরই অনুরূপ। পুরুষকার দৈবানুকূল বলিয়া দৈবের অধীন। পুরুষকারকে দৈবানুরূপ বলিলেই তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্য দৈবের বিরুদ্ধে পুরুষকার প্রযুক্ত হইলে, পাষাণাহত ক্ষুরধারার মত তাহার শক্তি নষ্ট হয়। আরব্ধ কার্য্য ব্যর্থ হয়ই। যখন পুরুষকার সফল, তখন দৈব অনুকূল; যখন বিফল, তখন দৈব প্রতিকূল বুঝিতে হইবে। পুরুষকারের প্রত্যক্ষ দ্বারা দৈবের অনুমান করিতে হইবে। ইহা সাধারণ কথা। দৈববাদী এই সাধারণ কথাটী এরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া রাখিয়াছেন যে, অসাধারণও যে কিছু থাকিতে পারে, তাহা ইয়ত্তা করেন না। এই সাধারণ বা সামান্য নিয়মের বলে দৈববাদী দৈবের আসন ঊর্দ্ধে দিয়া পুরুষকারকে আমলই দেয় না, বড় জোর হয়ত অতিনিম্ন আসনে বসাইয়া থাকে। অন্ধভাবে দৈবের অনুসরণকারীদেরই সাধারণত দৈববাদী আখ্যা। দৈববাদীদের এরূপ ধারণার অবশ্য হেতু আছে। যখন দেখা যায়, দৈবের প্রতিকূলে পুরুষকারের প্রবৃত্তি নাই বা দৈবের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত পুরুষকারের সফলতা দৃষ্ট হয় না, তখন পুরুষকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? দৈবের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার মত সামর্থ্যই বা কোথায়? এই দৈববাদী মতে দাঁড়াইল,- পুরুষকার সর্ব্বত্রই দৈবানুকূল।

পুরুষকারবাদীমতে পুরুষকার দৈবানুকূল নহে। অন্ধভাবে দৈবের অনুসরণকারীকে যেমন সাধারণতঃ দৈববাদী বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ যাঁহারা দৈবের প্রামাণ্য উড়াইয়া দিয়া অন্ধভাবে পুরুষকার অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকে পুরুষকারবাদী বলা যাইতে পারে। আমরা যাহা সিদ্ধান্ত করিব, তাহা উক্ত প্রকার দৈববাদ বা পুরুষকারবাদ নহে। সেই সিদ্ধান্তীকে দৈববাদী বা পুরুষকারবাদী বলিয়া বিশেষিত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে।

অন্ধভাবে যাঁহারা পুরুষকার আশ্রয় করেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, দৈব বা অদৃষ্ট বলিয়া কোন জিনিষ নাই। জন্মান্তর আছে, কি নাই, তাহারই যখন নিশ্চয়তা নাই, তখন দৈবের প্রাধান্য কি? যে কোন কর্ম্ম যদি নির্দ্দোষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, বিঘ্নের সম্ভাবনা যদি না থাকে, তাহা হইলে কার্য্য সুসিদ্ধ হয়। যে স্থানে পুরুষকার বিফল, যে স্থলে কর্ত্তার দোষ, উপকরণের উপাদানের দোষ। বীজ অঙ্কুরিত হইল না, ইহা হয় বীজের দোষ, নয় কৃষকের পুঁতিবার দোষ, নয় ত বা বৃষ্টি রৌদ্র আদি সহকারী কারণের আধিক্য অল্পতা প্রভৃতি দোষ। কর্ত্তা নিজের দোষ না বলিয়া দৈব প্রতিকূল ছিল, ইহাই বলেন, তাহার কারণ ঐ পূর্ব্বোক্ত অহংমিকা অজ্ঞতা প্রভৃতি। ইহা আপনার অনুষ্ঠান বৈফল্যের কৈফিয়ৎ মাত্র। জাতীয় উন্নতি অবনতি ব্যক্তিগণের পুরুষকারের ফল হইতেও দৈবের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা কোথায়? ব্যক্তির অভ্যুদয়, পতন ব্যক্তিরই পুরুষকার লভ্য, ইহাতে দৈবের হাত কোথা? বীজ না পুঁতিলে শস্য হইবে না, পুঁতিয়াও জল রৌদ্র প্রভৃতি যাথাযথ বন্দোবস্ত না করিলেও শস্য হইবে না। এ ক্ষেত্রে দৃষ্ট, প্রত্যক্ষ পুরুষকার প্রমাণ ত্যাগ করিয়া অনুমান-লভ্য দৈব মানিতে যাইবার আবশ্যকতা কি? পুরুষকার-বিহীন ব্যক্তিকে যখন উন্নতি লাভে অকৃতকার্য্য দেখা যায়, তখন পুরুষকারের স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই বলিব কি করিয়া? নিদ্রিত সিংহের মুখে মৃগ প্রবেশ করে না, গৃহের ভিতর শুইয়া কেহ মণি মাণিক্য পায় না। তবে কিরূপে বলা যাইবে, পুরুষকার দৈবের অধীন। যে ফল দেখা যায়, তাহা প্রত্যক্ষতঃ পুরুষকারের ফল না বলিয়া অদৃষ্ট দৈবের ফল বলিতে হইবে কেন? এই কল্পনা দৃষ্ট-বিরুদ্ধ। পুরুষকারের সাহায্য ব্যতীত যখন দৈবের ফল দান সামর্থ্য নাই, পক্ষান্তরে দৈবের সাহায্য পুরুষকারে আবশ্যক আছে কি না, এ সম্বন্ধে যখন নিশ্চয়তা নাই—তখন দৈব অপেক্ষা পুরুষকারই শ্রেষ্ঠ,

ইহা মানিতে হইবে। দৈব থাকিলেও তাহা যখন পুরুষকারের অধীন, তখন পুরুষকারকে আবার দৈবানুকুল বলা যায় না।

দৈব ও পুরুষকার পরস্পর অনধীন।

(সিদ্ধান্ত)

দৈবানুকূল পুরুষকারের যেমন স্বতন্ত্র প্রাবল্য নাই বলিয়া পুরুষকারকে দৈবাধীন বলা যায়, তদ্রূপ পুরুষকার ব্যতীত দৈবও কখন ফলোন্মুখ হয় না বলিয়া দৈবকেই কেন পুরুষকারাধীন না বলা যাইবে? দৈবও পূর্ব্বজন্মের পুরুষকার। আমরা নিয়তই দেখিতে পাই, দৈব বা প্রাক্তনকর্ম্ম পুরুষকারের মধ্য দিয়াই ফলদাতা হইয়া থাকে। পুরুষকার-নিরপেক্ষ দৈবের কখনই ফলদাতৃত্ব দেখা যায় না। আবার দৈব প্রতিকূল থাকিলে পুরুষকার প্রায়শঃ সাফল্য লাভ করে না। বিশেষতঃ দৈব ও পূর্ব্বজন্মকৃত পুরুষকারের নামান্তর মাত্র। কাজেই দৈব-নিরপেক্ষ পুরুষকারকেও ফলদাতা হইতে দেখা যায় না। তাই বলিতেছি, পরস্পরই পরস্পরের অধীন, পরস্পরই পরস্পরের অনুকুল। অন্ধ দৈববাদী ও অন্ধপুরুষকার বাদী উভয়েই ভ্রান্ত। সূক্ষ্ম-ভাবে দৈবপুরুষকার তত্ত্ব সম্যকভাবে যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা দৈবকেই বড় বলুন, আর পুরুষকারকেই বড় বলুন, ফল সমানই। দৈবও পূর্ব্বজন্মের পুরুষকার, পুরুষকারও দৈবানুরূপ।

মাঘ কবি বলিতেছেন :—

“নালম্বতে দৈষ্টিকতাং ন নিষীদতি পৌরুষে।
শব্দার্থৌ সৎকবিরিব স্বয়ং বিদ্বানপেক্ষতে॥”

অভিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি কেবল দৈব অবলম্বন বা কেবল পুরুষকারকে অবলম্বন করিবেন না। কবি যেমন শব্দ ও অর্থ উভয়ই অপেক্ষা করেন, ধীরজন তদ্রূপ দৈব ও পুরুষকার উভয়কেই আশ্রয় করেন।

পুরুষকার সর্ব্বত্র দৈবানুকুল নহে।

পুরুষকার সর্ব্বত্রই দৈবনিরপেক্ষ, ইহা যেমন মানা যায় না, সেইরূপ পুরুষকার সর্ব্বত্রই দৈবানুকূল—ইহাও মানা যাইতে পারে না। সাধারণতঃ পুরুষকারের প্রবৃত্তি দৈবানুকুল ; দৈব-প্রতিকুলতা বশতঃ পুরুষকারের বৈফল্য ; তথাপি এই নিয়ম অব্যভিচারী নহে। দৈবপ্রতিকূলে আরব্ধ পুরুষকার কখনই জয়ী হইতে পারে না, ইহা বিধাতার ঐকান্তিক ব্যবস্থা নহে।

কখন কখন বলবান্ পুরুষকার দৈব-বিরুদ্ধেও অভ্যুত্থিত হয়। কর্ত্তার দৃঢ় একান্ততা, ঐকান্তিক সাধনা বা অঘটন পটীয়সী ঐশী করুণার গুণে দৈব প্রতিকূলেও পুরুষকার ফলদাতা হইয়া থাকে। দৈবের বিরুদ্ধে বলবান্ পুরুষকার আবশ্যক। দৈবের প্রতি-কুলে যখন পুরুষকে যাইতে হয়, বলা বাহুল্য, তাহাকে তখন দৈব ও পুরুষকারের একটা অস্ত্রঝনঝনাহীন কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়। সে সময়ে মেষদ্বয়ের মত দৈব ও পুরুষকার ঘোরতর সংগ্রামে ব্যাপৃত রহে, একতর অন্যতরের পরাজয়ের জন্য স্বতঃ-পরতঃ চেষ্টিত থাকে। যাহার বল অধিক, জয়শ্রী তাঁহাকেই আলিঙ্গন করে—

“প্রকর্ষ তন্ত্রা হি জয়শ্রিয়ঃ”

কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, শাস্ত্র-নিয়ন্তৃত সৎপথে থাকিয়া সৎকার্য্য করিয়াও অনিষ্টপাত হইতেছে, বুঝিতে হইবে, সেস্থলে প্রাক্তন দুর্দ্দৈবের বলবত্তা অধিক ; এস্থলে দৈবের জয় ; পুরুষকারের পরাজয়। আবার যে স্থলে কল্যাণকর ঐহিক কর্ম্মদ্বারা প্রাক্তন দুর্দ্দৈব খণ্ডিত হইয়া যায়, জানিতে হইবে, তথায় ঐহিক কর্ম্মের বলবত্তা অধিক। এ স্থলে পুরুষকারের জয়, দৈবের পরাজয়। দৈবানুকুলে প্রযুক্ত অল্পমাত্র পুরুষকারই ফলদাতা হইয়া থাকে। দৈব প্রতিকুলে প্রযুক্ত পুরুষকারকে ফলদাতা হইতে হইলে তাহা শক্তি সহকৃত হওয়া আবশ্যক। দৈব যেখানে পুরুষকার অপেক্ষা প্রবল, সে স্থলে পুরুষকার ব্যর্থ। দৈব যে স্থলে দুর্ব্বল, সে স্থলে দৈব প্রতিকুলে আরব্ধ হইলেও পুরুষকার সফল। দৈব প্রতিকুলে পুরুষকারের সাফল্য, ইহা বিশেষ কথা।

দৈব কখন পুরুষকার নাশ্য, কখন বা নহে কেন?

দৈব বা প্রাক্তন কর্ম্ম দুই প্রকার। এক ফলোন্মুখ, অপর অফলোন্মুখ। ফলোন্মুখকে প্রারব্ধ বলে। অফলোন্মুখকে সঞ্চিত বলে। যে কর্ম্মফল ভোগের জন্য বর্ত্তমান দেহ ধারণ,

সেই অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফলের নামই প্রারব্ধ। প্রারব্ধ কখনই ঐহিক কর্ম্মদ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মবাদী ঋষি, ভগবদ্ভক্ত, যোগীবরকে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষকেও প্রারব্ধ ভোগ পর্য্যন্ত দেহধারণ করতঃ মর্ত্ত্যে অবস্থিতি করিতে হয়। যে হাতের ঢেলা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা লভ্যস্থানে পড়িবেই, অন্যথা হইবে না, ইহাই "নিয়তি কেন বাধ্যতে।"

"অবশ্য ভবেষনবা গ্রহ গ্রহা,
যয়া দিশা ধাবতি বেধসঃ স্পৃহা।
তৃণস্য বাত্যেন তয়ানুগম্যতে
জনস্য চিত্তেন ভৃশাবশাত্মনা।"

ইহাও প্রারব্ধের গুণকীর্ত্তন।

আর যাহা ঠিক বর্ত্তমানশরীরের আরম্ভক নহে, অর্থাৎ যে যে কর্ম্মের ফলভোগের জন্য বর্ত্তমান জন্ম গৃহীত হয় নাই, তাহারই নাম সঞ্চিত। এই প্রাক্তন কর্ম্ম পুরুষকার-নাশ্য বলিয়া প্রারব্ধ নহে, সঞ্চিত।

"জ্ঞানাগ্নি সর্ব্ব কর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুত্যের্জ্জুন।

এস্থলে প্রারব্ধব্যতীত সর্ব্ব কর্ম্মই জ্ঞান নাশ্য। সঞ্চিত ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সর্ব্বশব্দের প্রতিপাদ্য। সঞ্চিত কর্ম্ম দেহীর অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকে বটে, কিন্তু তাহার ফল-দানের স্থিরতা নাই। কবে দিবে, নিশ্চয়ই দিবে কিনা, ইহারও নির্দ্ধারণ নাই। কখন বর্ত্তমান দেহে, কখন পরবর্ত্তী দেহে ফল দেয়, কখনও বা প্রবলতর পুরুষকার দ্বারা বিনষ্ট হয়। প্রারব্ধাত্মক দৈব পুরুষকার নাশ্য নহে, এই দিক্‌টী অবলম্বন করিয়াই দৈববাদী দৈবের জয়ঢক্কা বাজাইয়া থাকেন। সঞ্চিতাত্মক দৈব কঠোর পুরুষকারনাশ্য—এই দিক লক্ষ্য করিয়াই পুরুষকারবাদী পুরুষকারের জয়বার্ত্তা ঘোষণা করেন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন, চিকিৎসা, ভগবদনুগ্রহ প্রভৃতি দ্বারা সঞ্চিত—সফলোন্মুখ কষ্টই খণ্ডিতই হইয়া থাকে।

শাস্ত্রের উপদেশও এই যে, যতক্ষণ ঐহিক সৎকর্ম্মদ্বারা দুরদৃষ্ট বা দুর্দ্দৈব খণ্ডিত না হয়, ততক্ষণ ঐহিক সৎকর্ম্ম পুনঃ পুনঃ করিয়া যাইতে হইবে।

"যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।"

উত্তম ব্যক্তিরা ফল সমাপ্তি পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সহজে অবসন্ন হয়েন না। চানক্যের নীতিও এই—

"প্রারব্ধমুত্তমর্জ্জনা ন পরিত্যজন্তি।"

অখণ্ডনীয় প্রারব্ধ, অপরিবর্ত্তব্য দৈব, অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তি খণ্ডিত না হইলেও কাহারও হতাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ কে জানিতে পারে যে, প্রাক্তন দৈবপ্রারব্ধ, কি সঞ্চিত? কে বুঝিতে পারে যে, দুর্দ্দৈব অখণ্ডনীয়, কি খণ্ডনীয়? প্রারব্ধ কি সঞ্চিত, ইহা কাহারও বোঝা সম্ভব নহে। কাজেই প্রারব্ধের বিরুদ্ধেও পুরুষকারের পরিচালনা করা অতীব আবশ্যক। যাহা হইবার, তাহা হইবে, ইহা বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ইহা শাস্ত্রের উপদেশ নহে বা উদ্দেশ্যও নহে। পরিণামে সাফল্য কি বৈফল্য, তাহা অগ্রে জানিবার সম্ভাবনা কোথা? সামান্য পুরুষকার দ্বারা যে দৈব খণ্ডিত হইল না, বলবৎপুরুষকার দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইবে না, কে বলিতে পারে? সৎকর্ম্মের ফল শুভ, অসৎকর্ম্মের ফল অশুভ। কোনটী সৎ, কোনটী অসৎ, তাহা বুঝিবার তিনটী উপায়। প্রথম শাস্ত্রে যাহা উপদিষ্ট, তাহাই সৎ, দ্বিতীয়, যাহা মহাপুরুষ বা সাধু কর্ত্তৃক আচরিত বা স্বীকৃত, তাহা সৎ। তৃতীয়, বিবেক পরিশুদ্ধ মনে যাহা অনুকূল বলিয়া অবধারিত, তাহাই সৎ। শাস্ত্র, গুরু, মহাপুরুষ পরম্পরা ও আত্মানুভূতি দ্বারাই সদসৎকর্ম্মের ইয়ত্তা করিতে হয়। কর্ম্মমাত্রেই কতকগুলি ঐহিক, কতকগুলি জন্মান্তরীয়। জন্মান্তরীয় কর্ম্মই দৈব। পরলোকে লিঙ্গ দেহে বা পরবর্ত্তী জন্মে কর্ম্মই সংস্কার বা বাসনারূপে দেহীর অন্তঃকরণে বদ্ধমূল থাকে। তজ্জন্য দেহী ঐ সংস্কার বা বাসনাত্মক কর্ম্ম লইয়া পরলোকে লিঙ্গদেহে পরবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ কৃত কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করে। সংস্কারাত্মক বাসনাময় কৃতকর্ম্মই দৈব বা অদৃষ্ট। দৈবকে, সূক্ষ্মাত্মক কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। পুরুষকার দৃষ্ট স্থূলকর্ম্ম। দৈব অদৃষ্ট সূক্ষ্ম কর্ম্ম।

দৈবও কার্য্য। পুরুষকারও কার্য্য। অতীত জন্মের কার্য্য অদৃষ্ট বলিয়া নামান্তর মাত্র দৈব। অতএব সূক্ষ্ম ভাবে বুঝিলে উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধতা সম্ভব কিরূপে?

"তস্মাৎপ্রাক্ পৌরুষাদ্দৈবং নান্যৎতৎ-প্রোজ্ঝ্যদৃশ্যতঃ।" (যোগবাশিষ্ঠ)। দৈব যে পুরুষকার হইতে প্রকৃত পদার্থান্তর নহে, তাহার স্পষ্টই প্রমাণ বিদ্যমান।

দৈবসম্পন্ন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ পুরুষকার বিহীন হয়েন, তবে দৈব উষর ক্ষেত্রে রোপিত বীজের মত নিষ্ফল হইয়া থাকে। লক্ষ্মী কথনই পৌরুষবিহীন ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন না।

স্ত্রীভিঃ যন্তইব স্ত্রীভিরজসঃ পরিভূয়তে"

পুরুষকারশূন্য অলস ব্যক্তি লক্ষ্মীকর্ত্তৃক চিরদিনই অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। দৈবের অত্যন্ত বলবত্তা থাকিলে অবশ্য কথন কথন মানবকে পুরুষকারে যত্নবান্ করিয়া তুলে, কথন কথন অল্পমাত্র পুরুষকারের দ্বারা সুমহৎ ফললাভ হইয়া থাকে—তাহা বলিয়া তাহাতে পুরুষকারের মূল্য কমে না। দৈবের মহিমাও নাশ পায় না। শাস্ত্রে কথন দৈবের, কথন বা পুরুষকারের মহিমাগুণ কীর্ত্তন শুনিয়া অন্ধভাবে দৈবের অনুসরণ বা দৈবে অবিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের উচিৎ নহে। আবার বলি—

"নালম্বতে দৈষ্টিকতাং ন নিষীদতি পৌরুষে।
শব্দার্থৌ সৎকবিরিব স্বয়ং বিদ্বানপেক্ষতে॥"

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

* * *

চৈতন্য-গোফা। (১)

কামরূপ জিলার উত্তর গোহাটী হইতে ১৫।১৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে হাজো গ্রাম। মণিকুট শৈল হাজো গ্রামের মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই মণিকুট শৈলের শীর্ষ দেশে হয়গ্রীব মাধবের মন্দির, মন্দিরাভ্যন্তরে হয়গ্রীব বিরাজমান। ভুটিয়াদিগের বিশ্বাস, হয়গ্রীব তাহাদিগের পর্ব্বত হইতে এই মণিকুটে আসিয়াছেন। তাই প্রতি বৎসরে শীত ঋতুতে ভুটিয়া প্রভৃতি পর্ব্বতবাসীগণ আসিয়া মাধবের পূজার্চ্চনা ও মানসিক উদ্যাপন করিয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিব্বতের দালাই লামা মহোদয় আসিয়া যখন কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের অতিথি হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি একবার গৌহাটী পর্য্যন্ত আসিয়া কামরূপের তীর্থক্ষেত্রগুলি দর্শন করেন এবং বিশেষ রূপে হয়গ্রীব মাধবের পূজা ও উপাসনা করিয়া যান।

চৈতন্য মহাপ্রভু এই মাধব দর্শনে আসিয়া যে গুম্ফায় অবস্থান পূর্ব্বক হয়গ্রীবকে দর্শন করেন, সেই স্থানই চৈতন্য-গোফা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই পুণ্যক্ষেত্র চৈতন্য-গোফা বঙ্গবাসীর অনেকেরই নিকট বোধ হয় পরিচিত নয়, ইহা দুঃখের বিষয়। যে ক্ষেত্র হইতে বঙ্গের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে হরিনাম মহাপ্রভু চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রথম প্রচারিত হয়, সেই ক্ষেত্রই মণিকুটের চৈতন্য-গোফা। ইহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ নব্যভারতের পাঠক পাঠিকাগণের তথা বঙ্গবাসীর সম্মুখে, পরম ভাগবত মহাত্মা ভট্টদেব কবিরত্নের (২) কৃত "সৎ সম্প্রদায় কথা" (৩) পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া উপস্থিত করিতেছি।

---

(১) গুম্ফা=গোফা; ইদানীং স্থানীয় জনগণ ভাষায় ইহাকে "ধোকা" বলিয়া থাকেন।

(২) কবিরত্ন ভট্টদেব—ইনি মহাপুরুষ দামোদর দেবের প্রধান শিষ্যগণের একতম। মনস্বী ভট্টদেবের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেকগুলি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে দু একখানা মাত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইনিই আসামের, বোধ হয়, সমস্ত ভারতের দেশীয় ভাষার প্রথম গদ্য-লেখক। ১৫০০ শকের শেষ ভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

(৩) কথা=গদ্য। সৎ সম্প্রদায় কথা প্রায় চারি শত বৎসরের প্রাচীন। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে লিখিত আছে। ঐতিহাসিকের বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের ইহা অবশ্য-পাঠ্য। মহাত্মা ভট্টদেব এই পুস্তকখানি তিনখানি বড় পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখিয়াছেন, ইহা

"পরে মহাপ্রভু তৈরপরা আসি করতিয়ার তীরে রহিলা। * * * * তেখনে চৈতন্যভারতী প্রভু মাধব দর্শনে মণিকুটে আসিলা। বরাহকুণ্ডর উপরে গোফাতে বহি মাধব দর্শন হিল; পাচে রত্নেশ্বর বিপ্রক (৪) শরণ লগাই ভাগবত পঢ়ই রত্নপাঠক নাম দি মাধবর দ্বারত ভাগবত পঢ়িবে দিলা আরু যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন কর্ম্মকে মাধবর দ্বারাত প্রবর্ত্তিহিলা। পাছে মহাপ্রভু পশু´কুঠারে (৫) যাই নামর নির্ণয় লেখি ব্রহ্মকুণ্ডত স্নান করি উলটি আসি সেই গোফাতে রহিলা। পাচে মাগুরীর কণ্ঠ ভূষণক আরু কবিশেখরক কণ্ঠহার কন্দলিক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াইলা। পাচে হাতে বীণা ধরি কৃষ্ণ নাম গাই নারদর চেষ্টা দেখাইলা * * * পাচে চৈতন্যে বোলে হে দামোদর নশ্বর বস্তুত খেদন কর।

তুমি ঈশ্বরর পার্ষদ, লক্ষ্মীর কোপে গৌতম বংশত জন্মিছা। পুনু তান বরে তিনি পিঠত পূজ্য হুই নিজ ঐশ্বর্য্যকে পাই এই রহস্য কই তত্ত্বজ্ঞান দি উড়েষাক গৈলা...... পাচে দামোদরে প্রভু চৈতন্যক প্রণাম করি আসি শঙ্করত বার্ত্তা কই কচুবাড়ী গ্রামে রহিলা। পাচে নিত্যানন্দ শিষ্য মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারী মণিকুটে আসি চৈতন্য গোফাতে থাকি অনন্ত কন্দলিক হরিদেব সন্তদেবক, যাদবেন্দ্রপুরিক, রামদাসক শরণ লগাই ষোল্ল নাম দিলে। * * হে নরনারী দেখা কৃষ্ণ চৈতন্যে বলো নিত্যানন্দ সমে অবতরি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মক দেখাই পূর্ব্বদিশে সপ্রেমা ভকতি প্রচারিলা॥

অদ্বৈতে দ্বয়িতা নাস্তি নিত্যানন্দোরসালয়ঃ।
আনন্দজন-কল্লোলী চৈতন্যো জগদ্বীশ্বরঃ॥

শঙ্করে পূর্ব্বে দামোদর মুখে চৈতন্যর বার্ত্তা শুনি দেখিবে ইচ্ছা আছিল। * * * * রাম রাম গুরু সমে মণিকুটে গৈলা। পাচে মাধব দর্শন হুই রত্ন পাঠকর মুখে ভাগবত শুনি বোলে হে রত্ন পাঠক, এহি শাস্ত্র ইঠাইত কোণে প্রবর্ত্তাইল। শঙ্করে বোলে এখন প্রভু চৈতন্য কত আছে। পাঠকে বোলে এই গোফতে আছিল এখন বাই ওড়েষাত আছে। এই শুনি শঙ্করে রাব রাম গুরু সহিতে পশ্চিমে চলি ওড়েষাক গৈলা (৬)। * * * * * মহাপ্রভুক দেখিতে চাওঁ। * * * * * তাতে মহাপ্রভু চারিনাম উচ্চারিলা। সেই তান মন্ত্র ভৈলা। * * * * * মহাপ্রভু পূর্ব্বদেশী দুইপ্রাণী আসি কাতরে পূজিছে বোলে কলি কালত কাত ভক্তি রহিবেক, আমাক বা কি আজ্ঞা করে, সি দেশত বা হরি নাম কোলে দিবেক। চৈতন্যে বোলন্ত * * * * * * * সি দেশক গৈতে শঙ্করক জানি * * * * * তাঙ্ক আমার এই আজ্ঞা, আমার শিষ্য কণ্ঠভূষণর মুখে ভাগবত শুনি, শঙ্করে গীত পদ করিবেক * * * * * আরু এই বত্রিশ শ্লোকে শরণ পটল খানি রাম রামে নি মোর শিষ্য দামোদরে হাতত দিবেক। সেই পটল ক্রমে সি দেশত হরিনাম দিবেক, এই আমার আজ্ঞা কই পঠাবা। পাচে ব্রহ্ম হরি দাসে * * * * * চৈতন্যর এই সকল আজ্ঞাকে শঙ্করত রাম রামতো কই শঙ্করক দিলে নাম মালিকা,

---

এই পুস্তকের মুখবন্ধ শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায়, যথা :—

"চৈতন্য সংগ্রহং দৃষ্ট্বা, সংগ্রহং কৃষ্ণ ভারতেঃ।
নৃসিংহকৃত্য মালোক্য কথয়ামি কথামিমাম্॥"

(৪) আসামের প্রথম বৈষ্ণব এবং প্রথম চৈতন্য-শিষ্য।

(৫) পরশুরাম কুণ্ড। মণিকুট হইতে পরশুরাম কুণ্ড যাইতে তখন প্রভুচৈতন্য শিষ্যোপযুক্ত লোকের দর্শন লাভ করেন নাই। এই সময়ে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তট প্রদেশ কিরাত প্রভৃতি জাতীয় লোকদিগের অধীনে ছিল। হিন্দুর বসবাস ছিলনা বলিয়াই বোধ হয়। কারণ মণিকুট পশু´কুঠার যাত্রায় প্রভু চৈতন্য দেবের সহিত কোন মানবেরই সাক্ষাত হওয়ার বিবরণ ভট্টদেব উল্লেখ করেন নাই। আমরা অনুমান করি, বর্ত্তমান মটক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক চৈতন্য দেবের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান পাইয়া থাকিবেন। দামোদর, প্রভুর তৃতীয় শিষ্য।

(৬) শ্রীক্ষেত্রে শঙ্কর ও রাম রাম গুরু প্রভুর নিকট তত্ত্বজ্ঞান ও দীক্ষা প্রাপ্ত হন।

রাম রামক দিলে শরণ পটল থানি।”

“সৎসম্প্রদায় কথা”র ৩০ পৃষ্ঠা হইতে ৩৬
পর্য্যন্ত উদ্ধৃতাংশ।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মণিকূটে আসিয়া রত্নেশ্বর বিপ্রকে দীক্ষা দিয়া হয়গ্রীব মাধবের সম্মুখে ভাগবত পাঠে নিযুক্ত করেন। এই রত্নপাঠক আসামের তদানীন্তন প্রথম বৈষ্ণব। কণ্ঠভূষণ কবিশেখর কণ্ঠহার কন্দলি তাঁহার দ্বিতীয় দীক্ষা। ইহার পরই ৺দামোদর দেবকে দীক্ষিত করেন। শঙ্কর ও রাম রাম উড়িষ্যায় গিয়া শেষে “শরণ” প্রাপ্ত হন। ইহাদের পর নিত্যানন্দের শিষ্য মুকুন্দ ব্রহ্মচারী অনন্ত কন্দলী, হরিদেব, সন্তদেব, যাদবেন্দ পুরী ও রামদাসকে দীক্ষা দিয়া ষোল নাম দেন।

মহাপ্রভুর শিষ্যবর্গের প্রচারিত ধর্ম্ম অধুনা আসামে দামোদরী, হরিদেবী, এবং মহাপুরুষীয়া নামে খ্যাত হইয়াছে।

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ।

সঙ্কলিকা।

(৫)

বঙ্গ হইতে উড়িষ্যা ও বিহারকে বিভাগ করার কুফল অল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্ব প্রকারে ফলিতেছে। উড়িষ্যা ও বিহারের স্কুল কলেজ হইতে বাঙ্গালী ছাত্রগণ, কৃতিত্বের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেও, গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি এবং বোর্ডিং সমূহে আর স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না। এই বিসদৃশ নিয়মব্যপদেশে বাঙ্গালী ও তত্তৎস্থানের অধিবাসীগণের মধ্যে মহাসংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে। বাঙ্গালী-বিদ্বেষে এসব দেশ পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ঐ সকল দেশের যে সকল মহাত্মা বাঙ্গালী সদ্ভাব পোষণ করেন, তাঁহাদিগকেও নানা প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে, নানা প্রকারে তাঁহাদিগকেও অপমানিত করা হইতেছে। প্রতিভা-সংঘর্ষণে বাঙ্গালী প্রতিভা পরাজিত হয় হউক, তাহাতে আক্ষেপ নাই। কিন্তু অসদুপায়ে বাঙ্গালীদিগকে নিগৃহীত হইতে হইলে সকলকেই দুঃখিত হইতে হয়। আমরা উৎকল ও বিহারের একান্ত পক্ষপাতী; চিন্তা এবং কার্য্যে এই দুই স্থানের উন্নতি-সাধনে বদ্ধপরিকর, কিন্তু আমরা নানা অযোগ্য ঘৃণিত ব্যবহারে বেদনা পাইতেছি। ভাল ভাল লোকদিগকেও বাঙ্গালী বিদ্বেষে ইন্ধন দিতে আগ্রহান্বিত হইতে দেখিয়াছি, তাহাতে আমরা মর্ম্মে মরিয়া রহিয়াছি। দেখিয়া শুনিয়া দিন দিনই আমরা অবাক্ হইয়া যাইতেছি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি, কটকের শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর মহাশয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের লোক এবং উৎকলের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সহিত সংযুক্ত। তিনি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি—প্রতিভাশালী এবং সুবক্তা। তিনি বাঙ্গালীর প্রতি সদ্ভাব পোষণ করেন বলিয়া তাঁহাকে নানা জঘন্য উপায়ে অপমানিত করার চেষ্টা হইতেছে। শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি, যে সত্যবাদী স্কুলের উন্নতির জন্য বহু কৃতবিদ্য বাঙ্গালী কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন, সেই স্কুলের কোন কোন শিক্ষকও নাকি বিশ্বনাথ বাবুর পারিবারিক মিথ্যা কুৎসা ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে সাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছেন। তিনি বাঙ্গালী-বিদ্বেষ অন্তরে পোষণ করেন না, ইহা তাঁহাদের নিকট গুরুতর অপরাধ। আমরা নানা অযৌক্তিক কথা এবং উড়িষ্যা ও বিহার সংবাদ-পত্রের উদ্গীরিত বাঙ্গালী-বিদ্বেষের অসংযত লেখা পাঠ করিয়া অন্তরে মরিয়া রহিয়াছি। প্রতিভায় ও কবিত্বে বাঙ্গালীকে পরাজয় করা অসম্ভব বলিয়া এইরূপ অসদুপায় অবলম্বন করিতেছেন। হায়, এই বাঙ্গালী-বিদ্বেষের পরিণাম কি হইবে? ক্রমে ক্রমে ক্রমে—উৎকল ও বিহারের সর্ব্বসাধারণ নানাপ্রকারে ঘর্ষিত, পেষিত, নিষ্পিষ্ট এবং অবহেলিত হইয়া সামান্য অবস্থায় পরিণত হইবে নাকি? মহামিলন ভিন্ন ভারতীয় জাতিসমূহের উন্নতির আর গত্যন্তর নাই। বাঙ্গালী-প্রতিভা ভারত-ললাটের সুশোভিত ও মহিমান্বিত তিলক। বাঙ্গালীকে খর্ব্ব কর, ঐ মহাশোভা বিলুপ্ত হইবে। সাবধান, সাবধান।

(৬)

পূর্ব্বে ই-বি-এস-আর-রেলের দামুকদিয়া হইতে সারাঘাট ষ্টেশনে ষ্টিমার দ্বারা যাইতে হইত, এখন ভেড়ামারা-পাক্‌সী ষ্টেসন সংযুক্ত হইয়াছে, লোয়ার গ্যাঞ্জেস্ সেতু দ্বারা। অনেকের ধারণা, পদ্মার উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া আর, আর, গেলেস্-প্রমুখ ইঞ্জিনিয়ারগণ অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। নিম্ন গঙ্গায় সেতু হইয়াছে বটে, কিন্তু পদ্মায় সেতু হয় নাই। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা মিলিয়া পদ্মা উৎপন্ন করিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার সংযোগ-স্থল হইতে মেঘনার সঙ্গম-স্থল পর্য্যন্ত পদ্মা নামে অভিহিত। সেই পদ্মার উপর সেতু নির্ম্মিত হয় নহে। বহু দিন পূর্ব্বে গোয়ালন্দকে রক্ষা করার জন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে পদ্মাকে বাঁধিবার চেষ্টা হইয়াছিল. কিন্তু তাহা স্রোত-প্রাবল্যে কোথায় ভাসিয়া গিয়া গোয়ালন্দের সেই সময়ের কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। সেই হইতে গোয়ালন্দে আর পাকা বাড়ী ঘর হয় নাই। গোয়ালন্দ-ষ্টেশন নানা স্থানে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। পদ্মার প্রবল প্রতাপ যখন বিলুপ্ত হইবে, তখন পূর্ব্ব বঙ্গের মহা গৌরবও বিলুপ্ত হইবে। এই মহানদীকে যিনি সেতু দ্বারা বা অন্য উপায়ে বাঁধিতে পারিবেন, তিনি মানব-জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি-ভূষিত হইবেন, সন্দেহ নাই। তাহা আজও হয় নাই, কখনও হইবে কি না, তাহাই বা কে জানে?

দামুকদিয়া হইতে সারাঘাটে যখন ষ্টিমার দ্বারা পার হওয়া যাইত, তখন পাসেঞ্জারদিগকে ১২ মাইলের ভাড়া দিতে হইত। এখন পাকসীর গঙ্গার পোল মাত্র ১ মাইল পরিসর হইয়াছে, এখনও ১২ মাইলের ভাড়া দিতে হইতেছে। ইহাতে প্যাসেঞ্জারদিগকে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে কলিকাতার ভাগীরথীর পোলে যেরূপ কর আদায় হইত, পাক্‌সীর পোলে সেই রূপ কর আদায় হইলে অল্প সময়ের মধ্যে খরচার টাকা উঠিতে পারে। এ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি।

এই পাকসীর গঙ্গার পোল সুনির্ম্মিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন বিখ্যাত ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার বলিয়াছেন, গঙ্গা অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। পাক্‌সীর পোলের ধারে গঙ্গায় যেরূপ চর পড়িয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে পাক্‌সীর নদী মরিয়া যাইবে। যদি মরিয়া যায়, গঙ্গা কোথায় যাইবে? গঙ্গা গেলে পূর্ব্ব বঙ্গের অবস্থা কিরূপ হইবে? এ সকল কথা ভবিষ্যতের প্রণিধানের বিষয়। আমাদের মনে হয়, গঙ্গা অন্য পথ ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গকে চির সুফলা এবং শস্যশ্যামলা করিয়া রাখিবে।

(৭)

নূতন বিধিবদ্ধ ভারত-রক্ষা আইন (১৯১৫—৪ আইন) সর্ব্বসাধারণের মতে ভীতি সঞ্চার করিয়াছে। সম্প্রতি মুসলমানপাড়া বোমা মকদ্দমায় সুবিজ্ঞ বিচারক জেঙ্কিন্স এবং মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ পুলিসের প্রতি যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠে সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। এ হেন পুলিসের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সর্ব্বসাধারণ ভীত এবং সন্ত্রস্ত হইয়াছেন। কাহার কখন কি বিপদ উপস্থিত হইবে, কে জানে? একে মহা যুদ্ধের জন্য সকলেরই দারুণ অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে—চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিয়াছে, তারপর আবার মহা ভীতিতে সকলে ম্রিয়মাণ। শান্তি, স্বাস্থ্য, সুনিদ্রা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিতেছে। এই দুর্দ্দিনে, ইংলণ্ডে মন্ত্রী পরিবর্ত্তিত হইল। ইহা আর একটা বিষম দুর্ঘটনা, সন্দেহ নাই। দুই দল মিলিলেন, সমালোচনা-সংঘর্ষণ তিরোহিত হইল, ইহা আনন্দের কথা, কিন্তু সকলেই জানেন, ইংলণ্ডের গৌরব পার্টি-লিডারস্। পক্ষান্তরে তীব্র সমালোচনাই ইংলণ্ডকে ভুল ভ্রান্তির হস্ত হইতে এপর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়াছে। অন্য পক্ষের সমালোচনার ভয় না থাকিলে কোন মন্ত্রীই কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন না,—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুলভ্রান্তি করিতেন। ইংলণ্ডকে পার্টি-লিডারগণই এপর্য্যন্তই দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়ছেন। কিন্তু সেই পার্টি-লিডারসগণ একদলভুক্ত হইলেন, ইহার ফল কি হইবে, কে জানে?

এই মহা যুদ্ধের অবসানে এই মন্ত্রী-মিলন থাকিবে না, ঘোষিত হইয়াছে। সে ভাল

কথা। কিন্তু এই যুদ্ধে মহাত্মা রবার্টস্ এবং মর্লীর ভবিষ্যত বাণী যে সুষুপ্তিতে ডুবিতে চলিল, আমাদিগের ইহা এক মহা দুঃখ। ভাবিয়াছিলাম, কালে চার্চ্চিল-কিচনারের ভুল-ভ্রান্তির তীব্র সমালোচনা হইবে। কিন্তু সে পথ বন্ধ হইল। যুদ্ধের অবসানের জন্য সকলেই উংকণ্ঠিত, কিন্তু এইরূপ মহা মিলন, জেদ বজায়ের পথ ধরিয়া, অপিচ সমালোচনা-ভীতির নিরসনে, সে ত্বরিত-সম্ভাবনাকে আরো বহু দূরে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধারম্ভ হইতে যে অন্ন চিন্তায় ভুগিতেছি, তাহা বহু বংসর ব্যাপী হইবে না, কে জানে? আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্তরে মরিয়া রহিয়াছি।

(৮)

আমরা কার্য্যোপলক্ষে গত মে মাসে কটক গিয়াছিলাম। এই মে মাসে কটকের ভিক্টোরিয়া টাউন-স্কুলের পারিতোষিক বিতরিত হইয়াছিল। মে মাস সর্ব্বত্রই গরমের জন্য প্রসিদ্ধ। কটকে মে মাসে এই গরম মূর্ত্তিমান হয়। এবার সে স্থলের গরম অসহ্য হইয়াছিল। কটকের কাছারী স্কুল প্রভৃতি এই সময় প্রাতে হইতেছিল। এই গরমের সময়, অপরাহ্নে পারিতোষিক বিতরণের সভা না হইলেই ভাল হয়। কাল-বৈশাখীর সময় প্রাঙ্গণে সভা করিতে হইলে উংকণ্ঠিত চিত্তে আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। আমাদের মনে হয়, এ সময়ে প্রাইজ-সভা না করিয়া, স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মধুসূদনের জন্মতিথি মাঘী-শ্রীপঞ্চমীতে দিন করিলেই ভাল হয়। এইরূপে ঐ মহাত্মার জন্মদিনকে একটী উংসবে পরিণত করা যাইতে পারে।

এই পারিতোষিক সভার আয়োজন উদ্যোগ খুব ভাল হইয়াছিল। সভাপতি হইয়াছিলেন, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব। এই স্কুলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য নাই। মধুসূদন গবর্ণমেণ্ট-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, স্বীয় শরীরের রক্ত জল করিয়া এই স্কুল চালাইতেছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-সভাপতি করায় মহাত্মার মহা উদ্দেশ্য খর্ব্ব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ছাত্রগণের খেলার স্থান সম্বন্ধে সাহায্য করিবেন। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মধুসূদন এরূপ চেষ্টা করিলে বহুদিন পূর্ব্বে ফল ফলিত। তাঁহার সেরূপ ইচ্ছা হয় নাই। দেশের অধিকাংশ কলেজ ও স্কুলই যখন গবর্ণমেণ্ট-সাহায্য মস্তকে লইতেছেন, তখন এ স্কুলই বা নিরপেক্ষ থাকিবে কেন? কিন্তু তাহাতে ঐ মহাত্মার মহা উদ্দেশ্য খর্ব্ব হইবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মন্তব্য আহ্বান করিলেন না, নিজে দুকথা বলিয়া সভা শেষ করিলেন। ছাত্রদের আবৃত্তিও শেষ হইতে দিলেন না! ইহাতে অনেকেই মনোক্ষুণ্ণ হইলেন। বিশেষতঃ যে মহাত্মার রক্তবিন্দু দ্বারা এই স্কুল সংরচিত, তাঁহার কোন কথাই তিনি উল্লেখ করিলেন না, কোন ভদ্রমহোদয়কেও উল্লেখ করিতে অবসর দিলেন না।

কোন বন্ধু বলিলেন, কটকে সভাপতির উপযুক্ত ব্যক্তি মিলে নাই। এ কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। দৃষ্টান্ত স্থলে বন্ধু বলিলেন—"দেখেন না, কটকের উংসাহ কেমন, এত উকীল ও হাকিম কটকে আছেন, এই সভায় তাঁহাদের অনেকেই আসেন নাই। উহা কেবল "money-making machine." পয়সা উপার্জ্জনই এখানকার নিয়ামক।" এরূপ কথা শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।

কটক-ভিক্টোরিয়া-টাউন-স্কুল মধুসূদনের অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহার অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না, কিন্তু দেশের উন্নতির কথা ভুলিতে পারিতেন না। এরূপ স্বদেশানুরাগী, বঙ্গ বা উংকলে বড় অধিক দেখি নাই। তিনি উংকলে ছিলেন যেন বঙ্গের মহামতি বিদ্যাসাগর। কৃতিত্ব গবেষণা, দয়া, দাক্ষিণ্য, পবিত্রতা, ভক্তি তদীয় জীবনের ভূষণ ছিল। উংকলে এমন সংকার্য্য ছিল না, যাহার সহিত তাঁহার যোগ ছিল না। তিনি ও রাধানাথ রায় উংকলকে উন্নতির উচ্চ মঞ্চে তুলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সেই মধুসূদনের অক্ষয়কীর্ত্তি কটক-ভিক্টোরিয়া-স্কুলে বিধাতার আশীর্ব্বাদ এবং সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্য বর্ষিত হউক।

(৯)

৮ই ও ৯ই জ্যৈষ্ঠ, শনি ও রবিবার কুমিল্লা সহরে ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আমরা এই অধিবেশনে উপস্থিত হইবার অবসর পাইয়া ধন্য হইয়াছি। প্রাচীন কথা বাদ দিলেও, যে ত্রিপুরা স্বনামধন্য শীতলচন্দ্র বিদ্যানিধি, চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, সেরাজুল ইসলাম, আবদুল রসুল, সামসুল হুদা, প্রকাশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, নবদ্বীপচন্দ্র, রজনীনাথ প্রভৃতি লোককে উদ্ভূত করিয়াছে, সেই ত্রিপুরা তুচ্ছ স্থান নহে।

ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনীর অভিভাষণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। সভাস্থলে ত্রিপুরার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কুমিল্লার প্রায় অধিকাংশ উকীলই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্কুলের ছাত্রদের কুমিল্লার সভায় যোগ দিবার অধিকার নাই। বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদিগের দ্বারাই টাউন-হল পূর্ণ হইয়াছিল। এরূপ উৎসাহপূর্ণ সভা আমরা বড় অধিক দেখি নাই। কুমিল্লা নবোৎসাহে যেন মাতিয়া উঠিয়াছিল।

আগরতলার রাজবংশ অতি প্রাচীন। এই রাজবংশ বাঙ্গালা ভাষার পৃষ্ঠপোষক। বাঙ্গালা ভাষা, রাজভাষা। ইহা মহা গৌরবের কথা। দ্বিতীয় গৌরব, অবৈতনিক শিক্ষা দান। স্বাধীন ত্রিপুরার সর্ব্বত্রই অবৈতনিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। আমরা এই গৌরবান্বিত আগরতলা দেখিতে গিয়াছিলাম। আগরতলার কুঞ্জবনের উপর দাঁড়াইলে চতুর্দ্দিকের পাহাড়শ্রেণীর যে অপূর্ব্ব শোভা দেখা যায়, এরূপ শোভা অতি অল্প স্থলেই দেখিয়াছি, যে কোন স্থলের সহিত ঐ ভুবনমোহন শোভা তুলিত হইতে পারে। রাজপ্রাসাদের দৃশ্যও উত্তম। আগরতলার নিকটবর্ত্তী পাহাড় সমূহে ভাল চা-বাগান হইতে পারে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশী। কুঞ্জবন ও রাজপ্রাসাদ বাদে দেখিবার বা উল্লেখ করিবার মত আগরতলায় আর কিছু নাই। একটা এণ্ট্রান্স স্কুল ও একটী বালিকাবিদ্যালয় আছে; একটী মেডিকেল স্কুল ছিল, তাহা এবার উঠিয়া গিয়াছে।

আগরতলা দলাদলির জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। রাজাকে এই দলাদলির প্লাবনে পড়িয়া সর্ব্বদা হাবুডুবু খাইতে হয়। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর এবং তদীয় ভ্রাতা উমেশচন্দ্র প্রভৃতি এক পক্ষের নেতা। তাঁহারা বুদ্ধিমান্ এবং প্রতিভাশালী। কিন্তু গাড়োয়ান বা ভৃত্যবর্গের উপর তাঁহাদের কোন প্রভুত্ব নাই। তাহারা মুখের উপর দুকথা শুনাইয়া দেয়। এরূপ আর কোথাও দেখি নাই। আমরা তাঁহাদের নিকট সহৃদয়তা ও সৎব্যবহার পাইয়া উপকৃত হইয়াছি। তাঁহারা চেষ্টা করিলে কি দলাদলি প্রশমিত হইতে পারে না? পারে—কিন্তু সে চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। এইরূপ দলাদলিতে আগরতলা ডুবুডুবু—পেচকের লীলাভূমি, অর্থগৃধ্নুদিগের নৃত্য-আলয়। মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক দিন বলিয়াছিলেন, ভারতের কোন দেশীয় রাজধানীতে ধন ও সুন্দরী স্ত্রী নিরাপদে থাকিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষার গৌরবস্থল ও অবৈতনিক শিক্ষার বিনোদ-নিকেতন আগরতলা কি সে কথার অতীত হইতে পারিবে না? ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট সাহেব যুদ্ধে গমন কথায় রাজ্য উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারে উপনীত হইয়াছে। কে শোচনীয় পরিণাম হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে? কে জানে, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে?

কুমিল্লার একদিকে সোণামুড়া, অন্যদিকে ময়নামতী ও লালমাই পাহাড়শ্রেণী। সেখানে মরা গাছ কালপ্রভাবে প্রস্তরে পরিণত হয়। অতুল শোভার ভাণ্ডার। তিপ্রা ও কুকি ত্রিপুরার বিশেষত্ব। সতররত্ন ত্রিপুরার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, কিন্তু কাল তাহাকে ধ্বংসের মুখে লইয়া চলিয়াছে। আগরতলার রাজা সে কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছেন না। মেডিকেল স্কুল তুলিয়া দিলেন, এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রক্ষা করিতে উদ্যোগী হইলেন না! তাঁহার মন কোন্ দিকে, পাঠকগণ চিন্তা করিয়া লইবেন। চাক্লা রোসনাবাদের ম্যানেজার মহোদয় ইচ্ছা করিলেই সতর-রত্নটীকে রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা হয় না কেন, জানি না। তিনি কৃতী, বিদ্বান, স্বদেশপ্রেমিক, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক, তিনি স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি

সাধনে সচেষ্ট হইবেন না কেন? তাঁহার নিকট আমরা অনেক প্রত্যাশা রাখি। বিধাতা সংকাজে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করুন। কুমিল্লা, সোণামুড়া ও আগরতলায় যে সকল সহৃদয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

(১০)

বঙ্গ-সাহিত্যের বাজারে বড়ই মন্দা পড়িয়াছে। এবারকার বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মেলনের বিবরণ তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। পাঠকগণ বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মেলনের সব বিবরণ পাঠ করিবেন। "গোচারণের-মাঠ"-প্রণেতা ও"বাল্মীকির জয়"-প্রণেতা এখন ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত নহেন যে, আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার তাঁহারা খোঁজ রাখেন না। অথচ তাঁহারাই নেতৃত্ব করেন। একজন চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলনে ম্যালেরিয়ার কাহিনী প্রচার করিলেন, অন্যজন হস্তিচিকিৎসা প্রভৃতির কথা বর্দ্ধমানে ঘোষণা করিয়া শেষে বৈদ্য বিদ্বেষে ইন্ধন দিয়া আসিলেন। সাহিত্যের খোঁজ না রাখিলে যাহা হয়, দুইবার দুই সম্মেলনে তাহাই হইল। সাহিত্যের কোন বিশেষ কথা তাঁহাদের অভিভাষণে আমরা পাইলাম না। পরন্তু নানারূপে নানা প্রকার দলাদলির পরিচয় পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথা শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রথমকয়েক বৎসরের নব্যভারতে আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই চর্ব্বিত-চর্ব্বণের আলোচনা করিয়া শাস্ত্রী-মহাশয় "নারায়ণে" মহা গবেষক বলিয়া পরিচিত। সময়ান্তরে প্রবন্ধের অনাটনের দিনে, "প্রবাসী" তাহা উদ্ধৃত করিয়া মহাসুখী। এই শ্রেণীর পত্রিকা ছবির জন্য অযথা ব্যয় না করিয়া, ভাল প্রবন্ধের জন্য ব্যয় করিলে, বহুপত্রিকায় প্রকাশিত সভাপতির অভিভাষণ পুনর্মুদ্রিত করিয়া স্বীয় পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিতে হইত না। 'সাহিত্যমঙ্গল' পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে অতি উত্তম সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা না ছাপাইয়া ঠাকুরদাসের নামে বঙ্কিম-সংখ্যা নারায়ণ যে অসম্পূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, গবেষণা সাহিত্য হইতে বিদায় লইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পর বঙ্কিম-সংখ্যা হইলে ক্ষতি ছিল না, এখন তাহা কেন? এইরূপে কি বিদ্যাসাগর-সংখ্যা, মাইকেল-সংখ্যা, কেশবচন্দ্র-সংখ্যা প্রতিবৎসর বাহির হইবে? যদি স্মৃতি-সংখ্যা করিতে হয়, বঙ্কিম-প্রতিভার স্ফুরণ দেখাইতে বদ্ধপরিকর হও, ললিতমোহন প্রভৃতি ব্যক্তিকে ধর, জ্যোতিশ্চন্দ্র প্রভৃতির উদ্বমনে তাহা সুসিদ্ধ হইবার নয়। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে খর্ব্ব করিতে ভালবাসেন, তাঁহাদের দ্বারে যাওয়া ভাল নয়, অথবা যাঁহারা সাহিত্যের কোন সংবাদ রাখেন না, এবং সেই কথা ঘোষণা করিতে একটুও কুণ্ঠিত নন, সেইরূপ নির্লজ্জদের সাহায্য গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। সাহিত্য-বাজারে হইল কি? এক দিকে ছবি, অশ্লীল গল্প-বাহুল্যতা আসর গ্রাস করিতেছে, অন্যদিকে যা-তা-লেখা বাজারে কাটিয়া যাইতেছে এবং শুনিতেছি, সেজন্য লোকেরা আস্ফালন করিয়া বলিতেছেন, "টাকা থাকিলে বড় বড় লোককে নামাইয়া প্রবন্ধ আদায় করিব।" টাকা দ্বারা সকলকে কেনা যায়, ইহা বাল-সুলভ আস্ফালনের কথা নয় কি? পরন্তু আর এক শ্রেণীর লোক অন্যের লেখা নিজ নামে প্রচার করিয়া বা চুরি-বিদ্যার জয় ঘোষণা করিয়া মহা বাহাদুর হইয়া দাঁড়াইতেছেন। এই অরাজকতার দিনে সাহিত্য-সভা ও সাহিত্য-পরিষদ কি করিতেছেন? আমরা ললিতমোহন, পাঁচকড়ি এবং চন্দ্রোদয়কে বিশেষ ভাবে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অরাজকতার দিনে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হউন। তাঁহাদের উপর আমরা অনেক আশা রাখি। তাঁহাদের দ্বারা যেন বঙ্গ সাহিত্যের অরাজকতা বিদূরিত হয়।

(১১)

বাঙ্গালীর গৌরব, "বাঙ্গালী জাহাজ" খানি সমুদ্রগর্ভে স্থানলাভ করিয়াছে শুনিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। বিবেচনা করিয়া, পরীক্ষা করিয়া জাহাজ খানিকে পাঠাইলে আর এরূপ মনস্তাপের কারণ হইত না। পরীক্ষা এবং

শিক্ষা দীক্ষার অভাবে এইরূপ কুফল ফলিয়া থাকে। আমাদের দেশের বড় লোকদের কার্য্যপটুতা দেখিয়া দিন দিন আমরা অবাক্ হইতেছি। এই শোচনীয় দৃষ্টান্তের পর আর কি এইরূপ মহৎ কার্য্যে কেহ টাকা দিবে?

(১২)

আমাদের বড় লোকদের বিবেচনা ও কার্য্যদক্ষতার ত্রুটীতে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের পাঁচলক্ষ টাকা লোকসান হওয়ায় তাহার চরম অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। অন্যদিকে শুনিতেছি, হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কেরও বহু লক্ষ টাকা আমাদের কোন স্বোথিত নেতা অন্য আত্মীয়ের সাহায্যে অপহরণ করিয়াছেন! বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের কালিমা-চিত্র কাল বিধৌত করিয়াছিল, তাই স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণ আবারও মুক্তহস্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের দুরদৃষ্ট বশতঃ আবার শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত। অবিমৃশ্যকারিতা, না কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীনতা, না অকর্ম্মণ্যতা, না অবহেলা, না চৌর্য্যবৃত্তির পরিপোষকতাই এইরূপ পরিণামের নিয়ামক? আর নীরবতার সময় নাই, যাহার যে শক্তি থাকে, এই দুর্দৈব হইতে দেশকে রক্ষা করিতে সকলে বদ্ধপরিকর হউন। এ সকল ব্যাপার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে?

(১৩)

সাধারণ-ব্রহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী ক্রমেই বক্তৃতা-কণ্ডূয়নের চরম দশায় উপস্থিত হইতেছে। এসম্বন্ধে অনেক লেখালেখি হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সকল সমাজেই পূজার ক্রম, অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ প্রণালী আছে, কিন্তু এসমাজে তাহা দেখা যায় না।

সানুভূতি-সিদ্ধ আরাধনাই গরীয়ান্, মুখস্থ আরাধনা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার্য্য! কিন্তু সে কথা শুনে কে? অনেকেই বড় বড় কথায় মন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া আরাধনার সময় বক্তৃতা যুড়িয়া দেন। ভাষার শব্দাড়ম্বরে কর্ণকুহর যেন ঝালাপালা হইয়া উঠে। সে আরাধনায় প্রায়ই পূজার ক্রম প্রতিপালিত হয় না,—সপ্তস্বরূপ কখনই ব্যাখ্যাত হয় না। সানুভূতি এবং অন্তঃপ্রদীপ্তির কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাতে সময়ে সময়ে এত কষ্ট হয় যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তপস্যা-নিরত যোগী ঋষিগণ কখনও এরূপ বক্তৃতা-কণ্ডূনের প্রশ্রয় দিতেন না। দিন দিনই ব্যবসাদারী উপাসনা-প্রণালীর আদর বাড়িতেছে। এদেশে তপস্যা-নিরত এমন কোন ব্যক্তি কি নাই, যিনি ইঁহাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন যে, আরাধনা বক্তৃতা নয়। হায়, কোথায় যাইয়া প্রাণজুড়ান ধর্ম্মকথা শুনিয়া কৃতার্থ হইব? চতুর্দ্দিকেই যে শুধু বক্তৃতা-কণ্ডূয়ন-স্পৃগ।

এই উপলক্ষে আর একটী কথা উল্লেখ করিতেছি। যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজ সমূহে বৈতনিক প্রচারক নিয়োগ হইতেছে,তাহা সমীচীন নহে। প্রচারকদিগকে উৎসবাদি করিবার জন্য নানা দেশে না পাঠাইয়া, রামকৃষ্ণ-মিসনের ন্যায় স্থানে স্থানে স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র সংস্থাপন করা উচিত। বহুদিন পূর্ব্বে নব্যভারতে আমরা "আসাম ও বাঙ্গালী" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধের ফলে চেরাপুঞ্জীতে মিসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় ছিলাম, সে সময়ে এ সম্বন্ধে যথাবিহিত কার্য্য করিতে অবসর পাইয়াছিলাম। তৎপর এরূপ কার্য্য আর হয় নাই। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ প্রবন্ধে উদ্বুদ্ধ হইয়া চেরাপুঞ্জীর প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন। সেখানে তিনি যে কার্য্য করিতেছেন, তাহার তুলনা হয় না। নানা স্থানে এইরূপ প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিলে প্রভূত কাজ হইতে পারে। ৺ মথুরানাথ বসু মহাশয় গোপালগঞ্জে প্রচার-কেন্দ্র সংস্থাপন করিয়া প্রভূত কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রচার-কেন্দ্র হইতে শিক্ষা, চিকিৎসা, দরিদ্রের সাহায্য, নানা অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে অধিবাসীদিগকে রক্ষা-কল্পে যত্ন ও চেষ্টা করিলে জনসাধারণ আকর্ষিত না হইয়াই পারে না। এইরূপ কার্য্য করিলে,অনেক সহৃদয় ব্যক্তি অর্থ সাহায্য করিতে পারেন এবং প্রচারকদিগকেও অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে বা পরচর্চ্চা-নিরত হইতে, বা শুধু যজন-যাজন-ঘটিত প্রশংসা-

লোলুপ হইয়া থাকিতে হয় না। নানাস্থানে নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়াইলে এবং নানা বড় লোক তাঁহাদের পরিচিত আছেন বলিয়া বেড়াইলেই সম্মান বাড়ে না। প্রকৃত কাজ হাতে লইয়া গান্ধির ন্যায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিলেই সম্মান লাভ হয়। অপিচ সম্মান প্রতিপত্তি-নিরপেক্ষ হইয়া শুধু কেবল সেবার জন্য সেবা না করিতে পারিলে দেশের কোন উপকার হয় না। রামকৃষ্ণ-মিসন যে প্রণালীতে কাজ করিতেছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণ-যোগ্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য অনেক টাকা পাইয়াছেন, তাহা দ্বারা জমী বাড়ী না কিনিয়া এইরূপ প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করুন না কেন? সর্ব্ব স্থানে না হয়, দাতা যে স্থানে টাকা ব্যয় করিতে বলিয়াছেন, সেই স্থলেই প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করুন না কেন? তাহা করিলে দেশের অনেক উপকার হইবে। বক্তৃতা বা উপাসনা করিয়া বেড়াইতে দিলে কোনই ফল ফলিবে না। বক্তৃতার দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন কাজের দিন আসিয়াছে। যাহার হাতে কোন কাজ নাই, তাহার জীবন ধারণ বৃথা। ব্রাহ্মসমাজ বহু অর্থ ব্যয়ে নিমন্ত্রণ-লোলুপ, সম্মান-প্রত্যাশী, পরনিন্দাকারী এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছেন দেখিয়া আমরা যারপর নাই দুঃখিত। তাঁহাদের অনেকের তপঃ-প্রবৃত্তি নাই, গবেষণায় মতি নাই, অধ্যয়নে রতি নাই, সাধন ভজনে স্পৃহা নাই, তাঁহারা সংযত বা উর্দ্ধরেতাঃ হইতে পারেন না, শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষা ও যজন যাজন করিয়া দিন কাটাইয়া দেন। ব্রাহ্মসমাজের বহির্ভূত অধিকাংশ শিক্ষিত শ্রেণী সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। বৈতনিক প্রচারকদিগকে তাঁহারা কেটিকিষ্টের ন্যায় মনে করেন, সম্মানের চক্ষে দেখেন না। তাঁহারা এই প্রচারক শ্রেণীর লোক অপেক্ষা অনেক উন্নত। তিনটী গুণ থাকিলে লোকদিগকে আকর্ষণ করা যায়, পাণ্ডিত্য, ধর্ম্মভাব ও প্রেম। শঙ্কর ও দয়ানন্দকে জ্ঞানের জন্য লোকেরা আদর করিত, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্যকে ধর্ম্মের জন্য আদর করিত, নিত্যানন্দ রামকৃষ্ণ প্রভৃতিকে ধর্ম্মভাব ও প্রেমের জন্য আদর করিত। তোমার পাণ্ডিত্য থাকিলে তোমার কথা শুনিতে লোক আকৃষ্ট হইবে। তাহা না থাকে, চরিত্র ও ধর্ম্মভাব থাকিলেও আকৃষ্ট হইবে। তাহাও যদি না থাকে, প্রাণ দিয়া মানুষকে যদি ভালবাসিতে পার, তবেও লোক আকৃষ্ট হইবে। কোন কিছু না থাকিলে, শুধু দলাদলির কথা বা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির কথা শুনিতে লোক আসিবে কেন? আমাদের মনে হয়, শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে আর কাজ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন খাসিয়াদিগের ন্যায়, কোল, সাঁওতাল, ভীল, কুকি প্রভৃতি অসংখ্য অসভ্য জাতিকে জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নত করিবার জন্য এইরূপ কেন্দ্র-সংস্থাপনের একান্ত প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজ এহেন কার্য্যে হাত দিলে সর্ব্ব-সাধারণের সহানুভূতি এবং বিধাতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন। তাহা যদি না পারেন, তবে "চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা" নীতি অবলম্বন করুন।

১৪

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে এবার দুইজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপাধি পাইয়াছেন; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "নাইট" হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় "রায় সাহেব" হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে "সোণার বাঙ্গালা, তোমায় ভালবাসি" সঙ্গীত রচনার পর, আমরা স্বদেশানুরাগের বাজার হইতে হারাইয়াছি। এবং ষ্টেট-মকদ্দমার পর হইতে বঙ্গবাসীকে গবর্ণমেণ্ট নিজ দলভুক্ত করিয়াছেন। এই দলের হারাণচন্দ্র পূর্ব্বে রায় সাহেব হইয়াছেন, এবার বিহারীলাল হইলেন। রায়-সাহেবী পদটা "বঙ্গবাসীর" একচেটিয়া হইল দেখিতেছি। এই সূত্রে উপাধি-লোলুপতা এদেশে না বাড়িলে রক্ষা।

১৫

ঘুষের প্রবল স্রোত পূর্ব্বে পুলিস এবং আফিস আদালতেই প্রবাহিত হইত, এখন দেখিতেছি, শিক্ষা-বিভাগেও এই স্রোত বহিতেছে! পাশের তদ্বির, ভর্ত্তির তদ্বির, কত তদ্বিরের কথা আজ কাল শুনিতেছি। মেডিকেল, প্রেসিডেন্সি প্রভৃতি বড় বড় কলেজের উপচরগণকে কাঞ্চন মূল্য না দিলে

কিছুতেই প্রবেশ করা যায় না। সকলেই তাহা জানেন, কিন্তু কেহই উচ্চবাচ্য করেন না। সর্ব্বত্রই প্রিন্সিপাল আছেন, প্রোফেসর আছেন, সব যেন ঢাকের বাওয়া, কার্য্যকালে সকলেই নিরুদ্দেশ। ব্যাপার মন্দ চলিতেছে না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। মনোরমার জীবন-চিত্র। প্রথম-খণ্ড। শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা লিখিত, মূল্য ১৷০। গ্রন্থকার, তাঁহার জীবনের অনেক কথা প্রসঙ্গ ক্রমে এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া, সঙ্কোচ ও সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার ভাষা এই—“আর এক সঙ্কট। কোন মহিলার জীবন-চরিত লিখিতে হইলে তাঁহার স্বামীর বিবরণ পরিত্যাগ করা যায় না, সেরূপ করিলে গার্হস্থ্য চিত্র একান্তই অসম্পূর্ণ থাকে।” * * * কিন্তু আমার “সিংহ বিক্রম” নাই, সুতরাং আমি সশঙ্কিত রহিলাম।”

আজকাল আপনার কথা কে না বলে এবং আপনার ঢাক কে না বাজায়? তিনি যে পত্রিকার সম্পাদক, সে পত্রিকাও বঙ্গের “শ্রেষ্ঠ” পত্রিকা বলিয়া ঘোষিত। ইনি, তিনি কত জনই আজকাল “আমার কথা”, “আমার জীবনী”, “আমার শ্রুতি-স্মৃতি”, কত কি লিখিতেছেন! কোন কোন মহাপুরুষ অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া অন্যের দ্বারা নিজ-কৃতিত্ব ঘোষণা করিতেছেন। কেহ বা অন্যের দ্বারা লেখাইয়া নিজ নামে তাহা প্রকাশ করিতেছেন! বাঙ্গালায় এইরূপ কত কি ব্যাপার হইয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় মনোরঞ্জন বাবুর সঙ্কোচের কারণ কি, আমরা বুঝিলাম না। যদিও এই পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার জীবনের অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা আসিয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা পড়িতে ক্লেশ বোধ হয় না, মনে হয় না যে, তিনি নিজ কৃতিত্ব ঘোষণার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ধার্ম্মিক ব্যক্তি, সে রূপ কাজ তিনি কখনও করিতে পারেন না। “মনোরমার চিত্রে” তাঁহার নিজের কথা যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব-দীনতা প্রণোদিত; তাহাতে সঙ্কোচের কোন কারণ নাই।

আমরা এই পুস্তকখানি বিশেষ আগ্রহ সহকারে পড়িয়াছি। এ পুস্তকের প্রথমে যে প্রশংসাপত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না, তাহা যে গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাও মনে হয় না। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র মহাশয় ৺আনন্দচন্দ্র মিত্রের “হেলেনা বধ” কাব্যের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজকাল যাহাকে তাহাকে এইরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায়। অন্যে করে করুক, মনোরঞ্জন বাবু তাহা করিবেন কেন? তাঁহাকে এইরূপ ঘৃণিত কাজের অতীত হইতে দেখিতে চাই। যিনি চরিত্র-গৌরবে অচ্যুত পদ পাইয়াছেন, ইঁহার, উঁহার, তাঁহার প্রশংসাপত্র সংগ্রহ-লোলুপ রূপে তাঁহাকে দেখিতে আমরা একান্ত অনিচ্ছুক।

আর একটী কথা—এ পুস্তকের মূল্য নির্দ্ধারিত না হইলেই ভাল হইত। স্ত্রী এবং স্ত্রীর জীবনী, একই কথা। কেন এই অপূর্ব্ব পুস্তকের মূল্য নির্দ্ধারিত হইল, আমরা বুঝি না। মনোরঞ্জন বাবু ক্ষমা করিবেন, এরূপ কাজ করিতে তাঁহাকে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

এই সকল কথার পর আসল কথা লিখিতেছি—এ পুস্তকখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। মনোরমার জীবন-চিত্র পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। ভাষার প্রাঞ্জলতা, ভাবের গাম্ভীর্য্য এবং মার্জ্জিত রুচির সমাবেশে এই গ্রন্থ উপন্যাস অপেক্ষাও প্রীতিকর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। “মনোরমা” যেন এক স্বর্গের দেবী, তিনি যখন মর্ত্ত্যলোকে ছিলেন, তখন যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনিই কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি অসময়ে স্বর্গারোহণ করিলে অনেকেই ভাবিতেন, এই অমূল্য জীবন কি বৃথা যাইবে? ভাবিতেন, কবে

তাঁহার অমূল্য জীবন-কথা ঘরে ঘরে প্রচারিত হইবে? মনোরঞ্জনবাবু ধন্য যে সাধ্বীর অমূল্য জীবন কথা প্রচার করিতে অবসর পাইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা অসচ্ছল নয়। তিনি এই গ্রন্থের বিশ ত্রিশ সহস্র বঙ্গের ঘরে ঘরে বিনামূল্যে বিতরণ করুন। এই বিলাসিতার দিনে, এই মিথ্যা অসার গল্প প্রচারের দিনে, বঙ্গে ইহা ঘোর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারিবে। যেরূপ দারিদ্র্য-সংগ্রামে এই দম্পতির জীবন যাপিত হইয়াছে, তাহা পড়িলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। ধর্ম্মের শক্তি যাঁহারা অস্বীকার করেন, মনোরমার জীবন-চিত্র তাঁহাদিগকে পাঠ পরিতে অনুরোধ করি; সন্দেহ-জালে যাঁহারা দোদুল্যমান, এই বিশ্বাসী দেবকন্যার "জীবনী" পাঠ করিতে তাঁহাদিগকেও একান্ত মনে অনুরোধ করি। মনোরমার জীবনী অক্ষয় বিশ্বাস মন্ত্রে লিখিত, ভক্তিতত্ত্বের ইহা অপূর্ব্ব ইতিহাস। বঙ্গের বর্ত্তমান অবিশ্বাসের দিনে ঘরে ঘরে এই পুস্তক প্রচারিত হউক।

২। সতীধর্ম্ম। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত, মূল্য ১৲। স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনে ধারাবাহিক উপদেশ-রাশি। আমরা প্রথম সংস্করণের সময় পুস্তকের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছি। আর কিছু বক্তব্য নাই। সর্ব্বত্র এই গ্রন্থের আদর হউক।

৩। সমাজ-সঙ্গীত। শ্রীহরকালী সেন প্রণীত, মূল্য ৵০। কয়েকটী সুন্দর সঙ্গীত এই পুস্তকে আছে।

৪। নবীনা। সংসার-চিত্র। শ্রীকুলদাচরণ সরকার প্রণীত, মূল্য।৴০। ক্ষুদ্র গল্প। লেখা মন্দ নহে।

৫। মৃত্যুপথ। শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲। পরলোক সম্বন্ধে শ্রুতি যে সংবাদ দিতেছেন, এ গ্রন্থে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সুচিন্তিত গবেষণাপূর্ণ বিবৃতি। সব মতের সহিত আমাদের মতের মিল না থাকিলেও একথা লিখিতে সঙ্কুচিত নই যে, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কবিতা এবং অসার গল্প রচনার দিনে এইরূপ চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

৫। বিজন-বিনয় (কাব্য) শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবীশ প্রণীত, মূল্য ॥০। সতীর কাহিনী কবিতায় লিখিত। পুস্তকের মর্ম্মে মর্ম্মে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি ও সদ্ভাব জড়িত। সুন্দর পুস্তক।

৬। গো-ধন। শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ২৲। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের নিবন্ধ। যে দেশে এরূপ সুন্দর পুস্তক প্রকাশিত হইতে পারে, সে দেশ সম্বন্ধে আমরা নিরাশ নই। গোজাতির যাবতীয় কথা এরূপ সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। পড়িয়া আমরা যারপর নাই উপকৃত হইলাম। ঘরে ঘরে এই পুস্তকের আদর হউক।

৭। সুরভি। শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ। ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। লেখা প্রাঞ্জল এবং সুমিষ্ট।

জীবন-পথে।

এ পথে সকলে যাত্রী—কে আছে বসিয়া,
নীরবে একাটী হায় বল কে হেথায়?
যত জীব আছে সব যেতেছে চলিয়া,
জীবনে জীবের ভবে বিরাম কোথায়?
পথে যেতে যেতে দেখা, পথে পরিচয়;
দেখিতে দেখিতে পান্থ করে পলায়ন,
এত পরিচিত তবু সে ত মোর নয়,
আজি পথে অগ্রে ছুটে হ'ল অদর্শন!

এ কি এ! কালের কোলে অন্তহীন পথ,
কে কারে আপনা ভাবে কে কার জীবনে!
পথে শত বাধাবিঘ্ন—ব্যর্থ মনোরথ,
কি লাভ এ দু'দিনের ক্ষণ আলাপনে?
কে জানে যায় কে কোথা? কোথা কার দেশ?
কোথা সে বিরাম-কুঞ্জ? কোথা পথ শেষ?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

ছেলেরা খাইবে কিরূপে ?

পুরাতনে নূতনের ঢেউ লাগিয়াছে। কল্য যেখানে লোকাকীর্ণ জনপদ, অদ্য তাহা জল-গর্ভে। পূর্ব্বে যেস্থানে বিশালোরসী ভাগীরথী কলনাদে প্রবাহিত হইত, অধুনা সেখানে সৌধপূর্ণ সুন্দর নগরী উত্থিতা। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। জড় জগতে যেমন, সমাজেও তেমনি পরিবর্ত্তন হইতেছে। অবস্থানুসারে কখন বা এই পরিবর্ত্তন শনৈঃ শনৈঃ শব্দে, কখন বা দ্রুতবেগে সংঘটিত হয়। আমাদিগের প্রাচীন সমাজে ইংরাজি শিক্ষা ও শাসনের ঢেউ লাগিতেছে। এই তরঙ্গে সমাজের কোন স্থান ভাঙ্গিতেছে, কোন স্থানে নূতন চরের উদ্ভব হইতেছে। প্রাচীন প্রথা-প্রিয় ব্যক্তিগণ দুঃখে "হতোহস্মি হতোহস্মি" বলিয়া হাহাকার করিতেছেন। নবীন-তন্ত্র যুবকগণ উৎসাহোৎফুল্ল লোচনে উন্নতির নবযুগের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আশঙ্কা ও আশা সমাজকে আলোড়িত করিয়া অনেক নূতন সমস্যা তুলিয়াছে ও তুলিতেছে। তাহার মধ্যে একটী এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার পৈতৃক ব্যবসার অনুসরণ করিত। গোপ গোসেবা ও কৃষিকার্য্য করিত। মদক মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত। স্বর্ণকার গহনা গড়িত—ইত্যাদি। যেটুকু লেখাপড়া ও শুভঙ্করী তাহাদিগের ব্যবসায়ের হিসাব পত্র রাখার জন্য আবশ্যক হইত, গ্রাম্য পাঠশালায় তাহারা তাহাই শিক্ষা করিত। উচ্চ চাকুরী করিবার বা জীবিকানির্ব্বাহ বিষয়ে ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহারা হৃদয়ে পোষণ করিত না। স্ব স্ব জাতির ব্যবসায়ে থাকিয়া তাহারা গ্রাম্য কুঞ্জ-কুটীরে সন্তুষ্ট চিত্তে, সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিত। শূদ্র জাতির কার্য্য সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

ষিপ্রাণাং বেদবিদুষা গৃহস্থানাং যশস্বিনাম।
শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্ম নৈঃশ্রেয়সঃ পরঃ॥

অর্থাৎ—বেদপারগ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠাবান গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণদিগের যথাসম্ভব যাবৎ প্রকার কর্ম্মের সহায়তা রূপ শুশ্রূষাই শূদ্রজাতির মঙ্গলবহ কার্য্য। ইহার কারণ ব্রাহ্মণের নিকট থাকিয়া, ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার দেখিয়া, তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথাবার্ত্তা শুনিয়া শূদ্র সহজে পবিত্রতা ও জ্ঞান লাভ করিত। যদি এতদ্দ্বারা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তবে শূদ্র কি করিবে, তৎসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন —

ব্রাহ্মণাদির শুশ্রূষা দ্বারা যদি শূদ্রদিগের স্ত্রীপুত্রাদির ভরণাচ্ছাদন না হয়, তবে বিবিধ কারুকর্ম্ম ও শিল্প দ্বারায় বৃত্তি নিষ্পন্ন করিবেন। ব্রাহ্মণ-সেবাতে অতি অল্পসংখ্যক শূদ্রের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং তখন অধিকাংশ শূদ্রই স্ব স্ব জাতির শিল্প-কার্য্য করিয়া জীবিকা নিষ্পন্ন করিত। প্রাচীনকালে এই ছিল শূদ্র জাতির স্বধর্ম্ম। হিন্দু শাস্ত্র বলিতেছেন—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ।"

শাস্ত্র যাহা শিক্ষা দিতেন, রাজার শাসনে তদনুসারে কার্য্য হইত। ইহার দৃষ্টান্ত রামায়ণে

পাওয়া যায়। দক্ষিণে শৈবলপতি শূদ্ররাজ শম্বুক তপস্যা, বেদপাঠ ইত্যাদি করিতেন, তজ্জন্য শাস্ত্রের কঠোর বিধানে বাধ্য হইয়া দয়াময় রামচন্দ্রকে তাহার শিরশ্ছেদন করিতে হইয়াছিল। নবযুগের কবি এই ঘোর নিয়মের প্রতিবাদ করিয়া শম্বুকের মুখে বলিতেছেন—

"—এ নিয়ম নহেত বিধির
মহারাজ! রচিয়াছে যে ক্ষমতা বিপ্র
প্রকৃতির বিধি তুচ্ছ করি তাহা
হয়ে যাবে ধূলায় বিলীন উর্দ্ধ-
ভিত্তি নিম্নচূড় মন্দিরের মত এক দিন।"

যাহা হউক, প্লেটোর রিপবলিকেও একশ্রেণী অন্য শ্রেণীর কার্য্য করিতে পারিবেনা, এই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইংরাজ ভারতে আসিয়া, উচ্চ শিক্ষার দ্বার জাতি নির্ব্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে শূদ্রেরা পৈতৃক ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন অতিবাহিত করিত। ইংরাজ-শাসনে তাহারা যে পরিমাণে উচ্চশিক্ষা পাইতে লাগিল, সেই পরিমাণে নিজ ব্যবসা ত্যাগ পূর্ব্বক চাকুরী ও ওকালতি প্রভৃতি কার্য্যের জন্য লালায়িত হইল। কেনই বা না হইবে? রাম শ্যাম দুই ভাই। রাম উচ্চশিক্ষা গুণে হাকিমী করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যান, সেখানে বসিবার জন্য চেয়ার পান, মহা সম্মান ও অভ্যর্থনা পান। তাঁহার সহোদর শ্যাম স্বর্ণকারের ব্যবসা চালাইতে লাগিল, প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তথাপি শ্যাম কোন ভদ্রলোকের বাটীতে গেলে চেয়ার পাওয়া দূরে থাকুক, বসিবার কোন আসনই পায় না, প্রায়ই তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, অথবা মৃত্তিকার উপর উপবেশন করিতে হয়। ইউরোপীয় democracyর নিকট হিন্দু সমাজে সকলেরই উচ্চশিক্ষা পাইবার সমান অধিকার আছে। এইটুকু মাত্র লইল, কিন্তু ব্যবসায়ী ও চাকুরে ব্যক্তিকে সমান আদর করিতে শিখিল না। সুতরাং লোকের চাকুরী ও ওকালতি প্রভৃতি কার্য্য করিবার জন্য ঝোঁক হইল। ক্রমে চাকুরীর সংখ্যা অপেক্ষা উমেদারের সংখ্যা অধিক হইল, (Bar overcrowded), "বার ওভার-ক্রাউডেড" হইল। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি কার্য্যের অভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। এই রূপে কর্ম্মের ও অন্নের অভাব হওয়ায় সমাজ-বিষাদে ও বিপদে পূর্ণ হইল। বেকার শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে এই অন্নাভাব তাহাদিগকে কুপথগামী করিবে, সমাজ-দ্রোহিতার ও রাজদ্রোহিতার বীজ কোন কোন স্থানে বপন করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

ইংরাজি শাসন ও শিক্ষার বীজমন্ত্র এই যে, উন্নতি, জ্ঞান, সম্মান ও অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে সকলেরই সমান অধিকার। সুতরাং ইংরাজ-শাসনের সময়, হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে, ব্যবসায়কে আর বর্ণভেদের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। কেবল যে ইংরাজ-শাসনই বর্ণভেদ অনুসারে ব্যবসার ভেদের প্রতিকূল, তাহা নহে, ফরাসিবিপ্লবে Equality, Fraternity and Libertyর যে ভেরি বাজিয়াছিল, আজিও তাহা ভারতবাসীর কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং সমাজকে এক নূতন সাম্যভিত্তির উপর গঠন করিয়া, সকলকেই জ্ঞানী, সুখী ও সঙ্গতি-সম্পন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা অনেক উচ্চ উদার-প্রকৃতি ভারতবাসী অদ্যাপি হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন। এক্ষণও অনেক শিক্ষিত

ভারতবাসী ইউরোপ ও মার্কিন দেশের democracyর মন্ত্রে মুগ্ধ। কোন কোন ইংরাজীশিক্ষিত বঙ্গবাসী বলিয়া থাকেন.—"দেখুন, মার্কিনদেশে কেমন চমৎকার ব্যবস্থা আছে! একজন মুচি বা মুটেমজুরও কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হইতে পারে। সকলেরই সমান অধিকার।" কিন্তু চিন্তাশীল বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফ্রুড (Frude) এই নিয়মটী সমাজের পক্ষে অনিষ্টজনক বিবেচনা করেন। তিনি বলিয়াছেন,পদ একটীমাত্র, তাহার জন্য সহস্র সহস্র লোক ঘোড়দৌড়ের ন্যায় ধাবিত হয়। একজন মাত্র গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে, আর সকলের প্রভূত যত্ন শ্রম উদ্বেগ কষ্ট সকলই পণ্ড হয়। ইহাতে সমাজের অনিষ্ট বই কোন ইষ্ট নাই।

ইউরোপীয় ও মার্কিনসমাজ অসংযত প্রতিযোগিতার উপর স্থাপিত। লোকে এই Free competitionকে Fair competition বলিত। কিন্তু ইদানীং কার্লাইল-প্রমুখ মহাত্মাগণ এই অসংযত প্রতিযোগিতাকে "mutual hostility" "cut-throat competition" বিবেচনা করিয়া ইহার অনিষ্টকারিতা দেখাইয়া দিতেছেন। সমাজে যতই সহৃদয়তা ও সুবিবেচনা প্রবেশ করিতেছে, ততই হৃদয়হীন Competition পরিবর্ত্তে সহানুভূতিময় Co-operation প্রচলিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে সকল প্রস্তাব বিপজ্জনক Socialism বলিয়া উপহসিত ও পরিত্যক্ত হইত, ইউরোপে তাহা ক্রমে আইনরূপে প্রবর্ত্তিত করা হইতেছে।

এক সময়ে ইংলণ্ডে সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাণিজ্যসম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়মের দ্বারা সাধারণের অনিষ্ট সাধিত হইতেছিল। তখন Adam Smithএর Wealth of Nations Free প্রচারিত Trade বা অবাধ বাণিজ্যের সূত্রগুলি বিশেষ উপকার করিয়াছিল। কিন্তু ঐ অবাধ প্রতিযোগিতা অবস্থাভেদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সর্ব্বত্র প্রয়োগ করায় সমাজের বিশেষ অমঙ্গল হইয়াছে, এবং অনেককে অধিকতর স্বার্থপর করিয়াছে। পূর্ব্বেকার Political Economy কেবলমাত্র স্বার্থপরতা ও প্রতিযোগিতার উপর স্থাপিত। অধুনা সেই Political Economy মুছিয়া ফেলিয়া, নূতন সহৃদয় Political Economy রচিত হইতেছে। স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে পরার্থপরতা প্রচলিত করা হইতেছে। তাই Ruskin বলিয়াছেন ;—

"And all our hearts have been betrayed by the plausible impiety of the modern economist, telling us that, 'to do the best for ourselves, is finally to do the best for others.' Friends, our great Master said not so, and most absolutely we shall find this world is not made so. Indeed, to do the best for others, is finally to do the best for ourselves ; but it will not do to have our eyes fixed on that issue."

এই কথা বলিয়া রস্কিন প্লেটোর 'Critias' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি এখানে তাহার ভগ্নাংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম ;—

* * For they saw that, if only their common love and virtue increased,all these things (material possessions) would be increased with them ;. but to set their esteem and ardent pursuit upon material possesion would be to lose that first, and their virtue and affection together with it

ইহার মর্ম্ম এই যে, সমাজে সাধারণ প্রীতি ও মর্ম্ম যদি বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে তৎসঙ্গে ধনও বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু ধনের উপরই যদি প্রীতি স্থাপন করা যায় এবং তাহাই যদি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে প্রথমে ধন নাশ হইবে, এবং তৎসঙ্গে ধর্ম্ম নাশ ও স্নেহ নাশ হইবে।

এখন আমাদিগের সমাজে মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে অনেকেই অন্নাভাবে ঘুরিতেছে, তাহার প্রতীকারের জন্য free competitionএর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না; প্রত্যেকে স্ব স্ব পন্থা খুঁজিয়া বাহির করুন, এই কথা বলিলে আর চলিবে না। আমরা অমৃত জ্ঞানে ইউরোপীয় স্বার্থপর অবাধ প্রতিযোগিতা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা বর্জ্জন করিয়া পরদুঃখকাতর, পরসেবাপরায়ণ সহযোগিতা অবলম্বন করিতে হইবে, মানবপ্রীতির স্বর্গীয়ভাবে আমাদিগের অনুষ্ঠানকে পরিচালিত করিতে হইবে। পিতা যেমন পুত্রের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য চিন্তিত হন, চেষ্টা করেন, সমাজকে তেমনি স্নেহের সহিত তাহার এই সকল বেকার পুত্রগণের জীবিকার জন্য ভাবিতে হইবে, উদ্যোগী ও যত্নবান্ হবতে হইবে—সময়ের ও অবস্থার উপযোগী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

একে ত অনেক মধ্যবিত্ত লোক কাজ পাইতেছে না, তাহার উপর ইংরাজী আদর্শ ও শিক্ষা গুণে, একান্নবর্ত্তী পরিবার ক্রমেই লুপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে যাহারা উপার্জ্জনে অক্ষম ছিল,তাহারা সক্ষম ভ্রাতার সহিত একান্নবর্ত্তী পরিবারের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইত। অধুনা একান্নবর্ত্তিতা উঠিয়া যাওয়ায় অক্ষম ভ্রাতা আর সক্ষম ভ্রাতার পরিবারে স্থান পায় না। এখন এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, এক ভ্রাতা রাজপ্রসাদ-তুল্য ভবনে সুখৈশ্বর্য্যে নানাবিধ ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন; আর এক ভ্রাতা এক মুষ্টি অন্নের জন্য নৈরাশ্য-ক্লিষ্ট বদনে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে রাজপথে ঘুরিতেছে। হা হিন্দু! তোমার দেশে, গ্রামের মধ্যে একজন অভুক্ত থাকিলে অন্যলোকে আহার করিবে না, একদিন এই নিয়ম ছিল। আর এখন? হা হিন্দু! ভাইয়ের কথা দূরে থাকুক; তোমার সমাজে এমন একদিন ছিল, যখন কেহ সঙ্গতিসম্পন্ন হইলে, কেবল মাত্র ভাই ও তাহার পরিবারকে প্রতিপালন করিত, এমন নহে; জ্ঞাতি কুটুম্বর মধ্যে যে কেহ দরিদ্র থাকিত, স্নেহের আকর্ষণে তাহাদিগকে নিজ পরিবারের মধ্যে টানিয়া লইয়া, নিজের পুত্র কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিত। আমরা কি সেই দেবোপম মহাপুরুষগণের বংশধর, আমরা কি সেই হিন্দু জাতি? না, আমরা সে জাতি নহি। আমরা যে হিন্দুজাতি ভাবি, সেটা একটা স্বপ্ন, ভ্রম। যদি ভ্রম না হয়, আমরা কেমন করিয়া এত নীচাশয় ও স্বার্থপর হইয়া উঠিলাম!

একদিকে দারিদ্র্য যেমন মধ্যবিত্ত লোকদিগকে নিপীড়িত করিতেছে, অন্যদিকে ইংরাজের আদর্শে বিলাতী ধনতত্ত্বের ভ্রান্ত শিক্ষায় সমাজের চালচলন, standard of of living ক্রমেই উচ্চ হইতেছে। ইংরাজী ধন-বিজ্ঞানের গ্রন্থে আমরা পড়িয়াছি, standard of living উচ্চ না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, মানুষ সভ্য হয় না। আমেরিকায় নাকি কতকগুলি আদিমনিবাসী আছে, তাহারা বিলাস-সামগ্রী আদৌ চাহে না। তজ্জন্য তাহাদিগকে সভ্য করা বড় কঠিন। এই মতটী নিতান্ত ভ্রান্ত। প্রাচীন হিন্দুসমাজ প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি উচ্চ সভ্যতা, দর্শন, বিজ্ঞান, শাস্ত্র বিলাসের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে সম্বদ্ধ নহে। বরঞ্চ যে সকল ঋষি এই সকল দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিলাস-

বর্জ্জিত তপস্বী। ইউরোপেও চিন্তাশীল সুধী ব্যক্তিগণের মধ্যে Plain living and high thinkingয়ের সমাদর হইতেছে।

অবশেষে আর একটী মাত্র দুর্ভাগ্যের কথা বলিব। খাদ্য দ্রব্যাদি এমন দুর্ম্মূল্য হইয়াছে যে, মধ্যবিত্ত লোক তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেছে।

এখন এই ঘোর বিপদে মধ্যবিত্ত লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সমাজ কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন ?

ইংরাজি কলকারখানার প্রতিযোগিতার মুখে যে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ শিল্পের দ্বারা আপাততঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহা বোধ হয় না। কলকারখানা চালাইতে হইলে যে বিপুল মূলধন ও ব্যবহারিক শিক্ষা আবশ্যক, তাহা মধ্যবিত্ত লোকের নাই। সুতরাং যদিও সেদিকে একবারে নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত নহে, তথাপি আপাততঃ প্রধানত অন্য পথই দেখিতে হইবে। সেই পথ কৃষিকার্য্য। একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "হে ভারতীয় যুবকবৃন্দ, চাকুরীর মস্তকে বামপদ প্রদান পূর্ব্বক কৃষিকার্য্যে মন দেও, দেখি উন্নতি করিতে পার কি না।" ঠিক কথা।

Famine Commission Reportয়ে প্রকাশ যে, ভারতে ১৩৭ সহস্র বর্গমাইল উর্ব্বর জমি পতিত আছে। গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীগণ অনুসন্ধান-মতে স্থির করিয়াছিলেন যে, একমাত্র ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকায়, যেখানে কখনই অনাবৃষ্টি হয় না, প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ বিঘা উর্ব্বর জমি কৃষিকার্য্যের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এই দুইটী অনুসন্ধানের পর ইহার কতক কতক জমি উঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বাদে এখনও ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচুর অকর্ষিত উর্ব্বর ক্ষেত্র, অনূঢ়া কন্যার ন্যায়, সৎপাত্র রূপ কৃষিকার্য্যক্ষম ব্যক্তিগণের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এক্ষণে ক্ষেত্র ও ভদ্র কৃষকের মধ্যে বিবাহ সম্পাদন করবার ঘটক আবশ্যক। আপাততঃ দূরবর্ত্তী দেশের জমির বিষয় আলোচনা না করিয়া নিকটবর্ত্তী জমির বিষয় আলোচনা করিব। ভদ্রলোকের পক্ষে নিকটে জমি পাওয়া যত সহজ মনে হইতে পারে, তাহা নহে। জমিদার যতই উদার-প্রকৃতি হউন, কোন ভদ্রলোক জমি পাট্টা করিয়া লইবার চেষ্টা করিলে দেখিতে পান যে, তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইবার অনেক বিঘ্ন আছে। কৃষকগণ যে নিরিখে জমি লইতে পারে, ভদ্রলোকগণ সে নিরিখে জমি লইতে পারেন না। কারণ, রাম ঘোষ বা আবদুল সেখ নিজের মাঠে নিজে লাঙ্গল চষে। গাঙ্গুলী মহাশয় নিজের মাঠে নিজে লাঙ্গল ধরিতে পারিবেন না। তাহাতে ভদ্রলোকের পক্ষে কৃষিকার্য্যে খরচ অধিক পড়ে, সুতরাং লাভ কম হয়।

অনেক জমিদার মৌরসী মকররি পাট্টা দিতে সম্মত নহেন। প্রজার লাভ যেমন বৃদ্ধি হইবে, খাজানাও তেমনি বৃদ্ধি হইবে, ইহা সঙ্গত। তবে প্রজা জমির জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জমিতে সার দিয়া, কোন কোন স্থানে বা বাঁধ দিয়া, কোন স্থানে বা বৃক্ষ রোপণ করিয়া, ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া জমির উন্নতি সাধন করে। এইরূপ স্বকৃত উন্নতির ধনে যে লাভ হয়, তাহার ভাগ অনেক প্রজা জমিদারকে দিতে ইচ্ছুক নহে। সুতরাং তাহারা খাজানার নিরিখ বৃদ্ধিতে সহজে সম্মত হয় না। নিরীহ ভদ্রলোক ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া জমির

উন্নতিসাধন পূর্ব্বক ভবিষ্যতে পাছে জমিদারের সহিত মামলাতে জড়িত হন, এই আশঙ্কায় মৌরসী ও মকররি পাট্টা না পাইলে জমি পাট্টা লইতে সাহসী হন না।

কোন কোন জমিদার শিক্ষিত লোককে জমি দিতে ইচ্ছুক নহেন। ভদ্রলোক প্রজা হইলে তাহারা ছোট লোক বা অশিক্ষিত প্রজার ন্যায় আনুগত্য স্বীকার করেন না, বরঞ্চ জমিদার নিরিখ বৃদ্ধি বা অন্য কোন উপায়ে আয় বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলে শিক্ষিত প্রজা তাহা আইন-বিরুদ্ধ মনে করিয়া তাহাতে নিজে অসম্মত হইবেন, এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে অশিক্ষিত প্রজারাও তাহাতে অসম্মত হইয়া জমিদারকে বাধা দিবে, কোন কোন জমিদার এইরূপ আশঙ্কা করেন। যদি সুশিক্ষিত লোক জমিদারের নিকট জমির পাট্টা পাইতে পারেন, তাহা হইলেও একখণ্ডে অপেক্ষাকৃত অধিক জমি না পাইলে কৃষিকার্য্য দ্বারা তাহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। একটী ভদ্রলোক এক শত বিঘা আমন জমি এক লপ্তে প্রচলিত নিরিখে পাইলে তাহার দিন গুজরান হইতে পারে। কিন্তু অনেক স্থানেই একখণ্ড বিস্তৃত ভূমি পাওয়া দুষ্কর। অধিকাংশ জমি যাহা বিলি হয়, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড। চাসাদিগের তাহাতে পোষায়, ভদ্র লোকের তাহাতে পোষায় না।

তৎপরে, অধিকাংশ ভদ্রলোক কৃষিকার্য্যে অতিশয় অনভিজ্ঞ। একজন পেন্‌শন-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি খুব কম নিরিখে জমি লইয়াও লাভ করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, আমি কৃষিকার্য্য কিছুই জানি না। একজন অভিজ্ঞ কৃষাণও যোগাড় করিতে পারি নাই। এই বৎসর যে ফসল হইয়াছে, তাহা কাটিবার জন্য সময় মত মজুর পাই নাই।" আমরা দেখিতে পাই যে, যে সকল শিক্ষিত যুবক চাকুরী না পাইয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহারা প্রায়ই লাভ করিতে পারিতেছেন না। তাহার প্রধান কারণ কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞতা।

আমি এই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিবার উপায় পরে আলোচনা করিব। তবে এই প্রবন্ধে কয়েকটী উপায় কেবল মাত্র উল্লেখ করিব।

১। আমি নব্যভারতের এক সংখ্যায় মিউনিসিপালিটী ও জমিদার, এক যোগে, মিউনিসিপালিটীর অন্তর্ব্বর্ত্তী জঙ্গল ও পতিত জমি বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটী আইন প্রণয়ন করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলাম। সেই আইন হইলে ভদ্রলোকে সহজে জমি পাইতে পারেন, গবর্ণমেণ্টের বিনা ব্যয়ে মিউনিসিপালিটীর জঙ্গল পরিষ্কার হইতে পারে, এবং নগর স্বাস্থ্যজনক হইতে পারে। এই সম্বন্ধে জেলার একজন মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার প্রস্তাবের মূল কথা উৎকৃষ্ট, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এইরূপ একটা আইন করাইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

২। ইংলণ্ডে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের Small Holdings and Allotment Act আছে। আমাদিগের দেশে কতকটা ঐরূপ একটা আইন করিলে ভদ্রলোকে সহজে জমি পাইতে পারেন।

৩। গবর্ণমেণ্টে যে সকল বিদ্যালয় ও কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র স্থাপিত করিয়াছেন,

তাহার সংশ্রবে কৃষি উপনিবেশ সংস্থাপন করার চেষ্টা করা উচিত।

৪। হ্যামিল্টন সাহেব বাদার জমি সুবিধাজনক সত্ত্বে ভদ্রলোককে পাট্টা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সেইরূপ বন্দোবস্ত এখনও হইতে পারে।

৫। জমিদারগণের দ্বারা অথবা স্বদেশ-হিতৈষী কোন সভা দ্বারা কৃষি-বিদ্যা-সম্বলিত উপনিবেশ স্থাপন করা যাইতে পারে। এ বিষয় আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যথাসম্ভব আলোচনা করিব। কিন্তু আমাদিগের চিন্তাশীল অভিজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আমি বিনীত ভাবে আবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা বর্ত্তমান ঘোর সঙ্কটে কৃষিকার্য্যের দ্বারা মধ্যবিত্তগণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় উদ্ভাবন করুন। এ বিষয় লেখা ও কার্য্য, দুইই আবশ্যক।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

জন্মান্তরবাদের মূল।

জন্মান্তরবাদ ও তাহার মূল কর্ম্মবাদ যে বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষা, এই সংস্কার বর্ত্তমানে বিশেষরূপে প্রবল দেখা যায়। এই সংস্কার ভিত্তিহীন এবং বেদেই যে জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদের প্রকৃত মূল, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই আমরা উপস্থিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

কুম্ভকারের চক্রে যেমন হস্তসম্পর্ক রহিত হইলেও পূর্ব্ববেগবশেই ঘুরিতে থাকে, আমাদের আত্মাও, তেমনই, দেহসংযোগ নষ্ট হইলেও পূর্ব্বকর্ম্মের সংস্কারবশেই ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে এবং প্রারব্ধকার্য্যের সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহার ভ্রমণ নিবৃত্ত হয় না। দেহ ধারণ-ব্যতিরেকে আবার এই কার্য্যসমাপ্তি সম্ভবপর নহে। তাহাতেই ইহার দেহধারণ আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইহাই আত্মার যোনিভ্রমণ ইহাই আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ। এই প্রকারে কর্ম্মসমাপ্তির জন্য জন্মান্তর হয় বলিয়াই কর্ম্ম জন্মান্তরের মূল হইয়াছে।

কার্য্য দুইপ্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়, সৎকার্য্য ও অসৎকার্য্য। সৎকার্য্য দ্বারা আমরা ক্রমে সত্যের অর্থাৎ নিত্যতত্ত্বের স্বরূপতা প্রাপ্ত হই, আর অসৎকার্য্য দ্বারা তদ্বিপরীত অসত্য অর্থাৎ অনিত্যরূপ প্রাপ্ত হই। সহজ কথায় সৎকার্য্য দ্বারা আমরা দিব্য দেহ ধারণ করি এবং অসৎকার্য্য দ্বারা পার্থিব দেহ ধারণ করি।

বৈদিক ঋষিগণ যে পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্ম-প্রভাব সম্যকরূপেই পরিজ্ঞাত ছিলেন—বেদে তাহার যথেষ্ট নিদর্শনই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে আমরা দুইটী ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে।

"সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেনেষ্টাপূর্ত্তেন পরমেব্যোমন্।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চ্চাঃ।"৮

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৪ সূক্ত।

"সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদিগের সঙ্গে মিলিত হও, যমের সহিত ও তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্ত (নামক গৃহে) প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর।"

বাজ্যসি বাজিনেনা সুবেণীঃ সুবিতঃ
স্তোমং সুবিতো দিকংগাঃ।
সুবিতো ধর্ম্ম প্রথমানুসত্যা সুবিতোদেবাস্ত
সুবিতোঽনুপত্ম ॥" ৩
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ৫৬ সূক্ত।

"হে পুত্র! তুমি বিলক্ষণ বলী ও ছিলে। যেরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলে, তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও। উত্তম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার উত্তম ফল প্রাপ্ত হও। উত্তম দেবং ও উত্তম সূর্য্যের সহিত একীভূত হও।"

পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গধামে যাওয়ার যে উল্লেখ উপরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় অসৎকার্য্যের দ্বারা ঊর্দ্ধগতি হইতে পারে না, অধোগতিই হইয়া থাকে এই জন্যই উর্দ্ধলোক বেদে সুকৃতলোক (অর্থাৎ পুণ্যকার্য্যের লোক) নামে আখ্যাত দেখা যায় যথা—

যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং
সুকৃতামুলোকম্ ॥" ৪
ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৬ সূক্ত।

হে জাতবেদ বহ্নি! তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আছে, তাহাদিগের দ্বারা এই মৃত ব্যক্তিকে পুণ্যবান্ লোকদিগের ভুবনে বহন করিয়া লইয়া যাও।"

পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা আমরা যে কেবল সুকৃতলোকেই নীত হই, তাহা নহে—সেই লোকের উপযোগী দেহ প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ দেবরূপেও যে পরিণত হই,বেদে ও তাহার স্পষ্ট উল্লেখই দেখা যায়, যথা—

'যে তাতৃষুর্দেবতা জেহমানা ছোত্রাবিদঃ
স্তোমতষ্টাসো অর্কৈঃ।
আগ্নে যাহি সুবিদত্রেভিরর্ব্বাঙ্ সত্যৈঃ
পিতৃভির্ধর্ম্মসদ্ভিঃ॥ ১০
ঋগ্বেদ, ১৮ম মণ্ডল, ১৫ সূক্ত।

"হে অগ্নি! যে সকল পিতৃলোক হোম করিতে জানিতেন এবং বিবিধ ঋক্‌রচনাপূর্ব্বক স্তবপ্রস্তুত করিতেন. সুতরাং যাঁহারা নিজ সৎকর্ম্ম প্রভাবে এক্ষণে দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন,যদি তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণা যুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে লইয়া আমাদিগের নিকট এস.তাঁহারা বিশেষ পরিচিত,তাঁহারা যজ্ঞে উপবেশন করেন, তাঁহারই পিতৃলোক তাহাদিগের জন্য এই সকল উৎকৃষ্ট ক্রব্য অর্থাৎ দ্রব্য রহিয়াছে।"

মৃত্যুর পর কেবল যে বিশেষভাবে দিব্য দেহ ধারণের উল্লেখই বেদে পাওয়া যায়, তাহা নহে, সাধারণ ভাবে নবদেহ ধারণের উল্লেখও বেদে পাওয়া যায়, যথা—

"অবসৃজ পুতরগ্নে পিতৃভ্যোযস্ত আহুতশ্চরতি
স্বধাভিঃ।
আয়ুর্ব্বসান উপবেতু শেষঃ সংগচ্ছতাং তন্বা
জাতবেদাঃ ॥ ৫"
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১৬ সূক্ত।

"হে অগ্নি! যে তোমার আহুতি স্বরূপ হইয়া যজ্ঞের দ্রব্য ভোজন করিয়া আসিতেছে, সেই মৃতকে পিতৃলোকের নিকট প্রেরণ কর। ইহার যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা জীবন প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হউক; হে জাতবেদা! সে পুনর্ব্বার শরীর লাভ করুক।"

এই প্রকারে নব নব দেহ ধারণ করতঃ আত্মা যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই বিচরণ করে, বেদে তাহা স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

"সহোভির্ব্বিশ্বং পরিচক্রমূ রজঃপূর্ব্বা ধামান্য-
মিতামিমানাঃ।
তনূষু ভুবনানি যেমিরে প্রাসারয়ন্তপুরুষ-
প্রজাম্বনু ॥" ৫
ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল, ৫৬ সূক্ত।

"তাঁহারা নিজ ক্ষমতাবলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়াছেন। যে সকল প্রাচীন ভুবনে কেহ যায় নাই, তাঁহারা তথায় গিয়াছেন। তাঁহারা নিজ শরীরের দ্বারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করিয়াছেন। প্রজাবর্গের প্রতি নানাপ্রকারে প্রভাব বিস্তারিত করিয়াছেন।"

জীবাত্মা বিশ্বাত্মারই অংশ, সুতরাং বিশ্বাত্মার ন্যায় সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই যে ইহারও কার্য্যক্ষেত্র হইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। অনন্ত বিশ্বাত্মার অনন্ত কর্ম্মবীজ জীবাত্মায় নিহিত থাকায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ অনন্ত কার্য্যক্ষেত্রে অনন্ত দেহযোগেই যে সেই অনন্ত কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্‌যাপন হওয়া প্রয়োজন হইবে, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।

জীবাত্মার নবদেহ পরিগ্রহণ বেদের অন্যত্র আরও স্পষ্টরূপে বর্ণিত দেখা যায়, যথা—

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমাচ পরাচ
পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি
ভুবনষ্বন্তঃ। ৩

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১১৭ সূক্ত।

"দেখিলাম, এক গোপাল তাহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে, নানা পথে ভ্রমণ করিতেছে। সে কখন অনেক বস্ত্র একত্রে পরিধান করিতেছে, কখন পৃথক্ পৃথক্ পরিধান করিতেছে। এইরূপে সে বিশ্ব সংসার মধ্যে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছে।"

রমেশ বাবুর অনুবাদ।

সায়ণ উদ্ধৃত ঋকের উপর যে টীকা করিয়াছেন, শ্রদ্ধাস্পদ রমেশ বাবু তাহার এইরূপ অনুবাদ দিয়াছেন—"অর্থ, জীবাত্মার ধ্বংস নাই, নানা যোনি ভ্রমণ করেন, কোন জন্মে নানাগুণ ধরেন, কোন জন্মে দুটী একটী গুণ ধরেন। নিকৃষ্ট যোনিতে অল্পই গুণ থাকে, উৎকৃষ্ট যোনিতে অনেকগুণ প্রদর্শন করা হয়।"

সায়ণ যে বস্ত্র স্থলে গুণ অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বস্ত্রের উপমা দ্বারা পুনর্জ্জন্ম বর্ণনা যে ঋষিদিগের কিরূপ অভিমত, তাহা গীতায় পুনর্জ্জন্ম বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটীর তাৎপর্য্য আলোচনা করিলেই নিঃসংশয় রূপে বুঝিতে পারা যায়, যথা—

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথাশরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ (পুরাতন) বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ জীবাত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ গ্রহণ করে।"

বস্ত্রকে পুনর্জ্জন্মের রূপক বলিয়া ধরিলে একত্রে অনেক বস্ত্র পরিধানের অর্থ এক যোনিতে বা এক জাতিতে বহু জন্ম গ্রহণ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

বেদের সদসৎ কর্ম্মমার্গের পরিবর্ত্তে 'জ্ঞানমার্গ' ও 'কর্ম্মমার্গের' বিভাগ দ্বারা উপনিষদে জীবাত্মার 'দেবযান' ও 'পিতৃযান, এই দুইটী পথ কল্পিত হইয়াছে। 'দেবযানে'র পথে আত্মার গতি হইলে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। 'পিতৃযানের' পথে গতি হইলেই তাহার পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। এতৎ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদের সিদ্ধান্ত

এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছেঃ—

"এতেন প্রতিপাদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং
নাবর্ত্তন্তে॥"

"এই পথে (দেবযান পথে) ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গত হইয়া এই মানব আবর্ত্তে পুনরাবর্ত্তিত হয় না।"

"তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা অথৈতম-
ধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে॥"

চন্দ্রলোক প্রাপ্ত জীবগণ কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকিয়া অনন্তর পুনর্ব্বার ঐ পথে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে।

উপনিষদের বর্ণনার পূর্ব্বোক্ত 'দেবযান' ও 'পিতৃযান' মার্গকে যথাক্রমে "অর্চ্চিরাদি মার্গ" (আলোকমার্গ) ও "ধূমাদিমার্গ" (অন্ধকারমার্গ) বলিয়াও বুঝিতে পারা যায়। গীতা উপনিষদের মর্ম্মানুসরণ করিয়াই এই উভয় মার্গকে শুক্ল ও কৃষ্ণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"শুক্ল কৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥"

"প্রকাশময় অর্চ্চিরাদি শুক্লাগতি এবং তমোময় ধূমাদি কৃষ্ণাগতি—জগতের এই দুই মার্গ অনাদিরূপে প্রসিদ্ধ আছে, এই দুইএর মধ্যে একটী দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অপরটী দ্বারা পুনরায় সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয়।"

অবতারবাদ পুনর্জ্জন্মবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। গীতায় ভগবদুক্তি হইতেই আমরা তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হই, যথা—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন।
তান্যহং বেদসর্ব্বাণি নত্বং বেত্থ পরন্তপ।"৫
৪র্থ অধ্যায়।

"হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সে সমুদায় জানি, কিন্তু তুমি (অবিদ্যাবৃত্ত বলিয়া) তাহা জান না।" "ভগবানের পুরাণ পুরুষ" আখ্যা এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ হইতে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

উপনিষদের মর্ম্ম গীতায় নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই গীতা উপনিষদ নামেও পরিচিত হইয়া থাকে।

বেদে দেবত্ব প্রাপ্তিই আত্মার চরমগতি রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

"মহিম্ন এষাং পিতরশ্চনেশিরে দেবা দেবেষ্বদ-
ধুরপি ক্রতুম্।
সমবিব্যচুরুত যান্যত্বিষুরৈষাং তনূষু নিবিশুঃ
পুনঃ॥৪"
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল,৫৬ সূক্ত।

আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মত মহিমার অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্রিয়াকলাপ করিয়াছেন। যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দীপ্তি পাইয়া থাকে, তাঁহারা তাহাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবতাদিগের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

উপনিষদে দেব-ভাবের উচ্চাদর্শরূপ ব্রহ্মভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেদের দেবত্বভাবের স্থলে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিই আত্মার চরম গতিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতেই উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মেই পরিণত হন।" গীতায় এই উপনিষদ্ ভাবেরই অনুবাদ।

এই প্রকারে মুক্তির বৈদিক আদর্শই উপনিষদ্ ও গীতায় অনুসৃত ও পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধ আদর্শের কোন প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। গীতায় আমরা বৌদ্ধ মুক্তিবাচক 'নির্ব্বাণ' শব্দের

প্রয়োগ দেখিতে পাইলেও তাহা ‘ব্রহ্মনির্ব্বাণ রূপে বিশোধিত হইয়া উপনিষদের ব্রহ্মসারূপ্য বা ব্রহ্মসাযুজ্য ভাবের অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে. যথা—

“এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃপার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২’
গীতা—২য় অধ্যায়।

“হে পার্থ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী, ইহা পাইয়া (বিশুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ) সংসারমোহ প্রাপ্ত হন না, মৃত্যুকালেও ইহাতে থাকিয়া ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না)।” আর্য্যমিশন অনুবাদ।

গীতার অবতারবাদে এক নূতন প্রকারের জন্মান্তরবাদ প্রচারিত হইয়াছে। অবতার সম্বন্ধে ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেনঃ—

“যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥”

জীবাত্মারই পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে এবং ইহার সদাসৎ প্রবৃত্তিই সাধারণতঃ পুনর্জ্জন্মের কারণ হয়। কিন্তু অবতারে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহাতে জীবাত্মার পরিবর্ত্তে পরমাত্মারই পুনর্জ্জন্ম হয়, কিন্তু এই পুনর্জ্জন্ম পরমাত্মার কোন কার্য্যের ফলরূপে না হইয়া সংসারের সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলরূপেই হইয়া থাকে। অবতারবাদরূপ এই নূতন জন্মান্তরবাদকে আমরা বৈদিক কর্ম্মবাদমূলক বলিয়াই মনে করি; বৌদ্ধধর্ম্ম-মূলক বলিয়া মনে করিতে পারি না—কারণ বৌদ্ধধর্ম্মে যখন পরমাত্মারই কোনস্থান নাই, তখন ইহার অবতার বা পুনর্জ্জন্ম আবার কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

অবতার, জন্ম বিষয়ে জীবাত্মার ন্যায় কর্ম্মফলের অধীন না হইয়া কর্ম্মফলের অতীত রূপে যে প্রতীয়মান হন, তাহাতেও বেদ উপনিষদের কর্ম্মফলাতীত দেবত্ব ও ব্রহ্মত্বের আদর্শেই যে ইহাঁর কল্পনা হইয়াছে, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বর্গীয়“জ”এর জীবন-কথা *

একদিন জনক-জননীর পদ-পঙ্কজে প্রণাম পূর্ব্বক কয়েকজন সাধুসজ্জন ও ভক্ত মহাজনের সহিত মিলিত হইয়া পদব্রজে ব্রজধামে গমন করিলাম। ব্রজধামের বিজন বিপিনের এক নিভৃত নিকুঞ্জে আমরা ভজন-পূজন-দর্শন-মানসে প্রবিষ্ট হইলাম। দেখিলাম, সুসজ্জিত-কুঞ্জ-কুটীরে ব্রজ-কিশোরের বামে ব্রজেশ্বরী রাধারাণী মোহন সাজে সজ্জিত হইয়া বিরাজ করিতেছন। আর এক জটাজুটধারী অজিন-পরিহিত জরাজীর্ণ পূজারী রাধাকৃষ্ণের রাজীব চরণে সাজি ভরিয়া পুষ্পরাজি অঞ্জলি স্বরূপ অর্পণ করিতেছেন। ব্রজধামের ব্রজকিশোর ও ব্রজেশ্বরীর পবিত্র পদরজ হইতে আরম্ভ করিয়া পূজারীর জটাজূটে, কৃতাঞ্জলিপুটে ও সাজির পুষ্প-রাজিতে আমাকে বিরাজমান দেখিয়া সাধু সজ্জন ও ভক্তমহাজন আমার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

---

* লেখকের“পঞ্চব্যঞ্জনের আত্ম-কথা” নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের প্রথমাংশ। সমুদয় অংশ ‘ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনে” পঠিত।

তারপর, "ব্যঞ্জন" নামক জননী-জন্মভূমিতে উপনীত হইয়া দেখিলাম,জড়-জগতের উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে জৈবজগতের জীব জন্তু ও জনসমাজেও আমার ভজন পূজনের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। অতিঅল্প কালমধ্যে নির্জ্জন কুঞ্জ-কুটীর হইতে জনাকীর্ণ রাজভবনেও আমার প্রভাবের প্রভূত প্রসার দেখিয়া অল্পপ্রাণ অন্তাস্থ 'য'এর চিত্তক্ষেত্রে জিঘাংসা বীজ উপ্ত হইল। তাই আর সে কালবিলম্ব না করিয়া বৈয়াকরণরূপ হুজুরের এজলাসে হাজির হইয়া আমার জোর-জবরদস্তি সম্বন্ধে জঘন্য মিথ্যাপবাদ সৃজন পূর্ব্বক নালিশ রুজু করিল।

বৈয়াকরণ-কাজি আইন-নজিরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই আমার উপর হুকুম জারি করিয়া জুলুমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তদবধি অন্তাস্থ "য" বাংলা-ভাষা-জননীর বানান-রাজ্যে নানাভাবে রাজত্ব করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় জীমূত-গর্জ্জনে আপন ক্ষমতা জাহির করিতেছে। এমন কি, অন্তাস্থ 'য' বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের যুগে সুযোগ বুঝিয়া সংস্কার-প্রয়াসী মুষ্টিমেয় যুবকের সাহায্যে আমাকে বাংলার বানান-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া একচ্ছত্র সম্রাটরূপে কালযাপন করিতে যত্নপর হইয়াছে। অন্তাস্থ 'য' এইরূপ আকাশ কুসুম-বৎ অলীক সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে দিবস-যামিনী উন্মার্গগামী যুবকগণের সহিত একযোগে ষড়যন্ত্র করিতেছে। *

আমার উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইলে জগতের জীবজন্তুর ও উদ্ভিজ্জ-পদার্থের ক্ষুদ্র বীজ হইতে জন্মভূমির জনক-জননী, আত্মজ, অনুজ, অগ্রজ প্রভৃতি স্বজনবর্গ এবং জীর্ণ-পর্ণকুটীরবাসী প্রজা হইতে রাজাধিরাজের জীবন বিনাশ করিয়া ভীষণ অরাজকতা সৃজন করিতে হইবে। কিন্তু বিশাল বিশ্বের বিধাতা পৃথ্বীরাজ জগদীশ্বরের রাজ্যে এরূপ জঘন্য জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করা সম্ভবপর কিনা, জানি না। উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণের সাহায্যে যদি অন্তাস্থ 'য'এর পক্ষে এরূপ কার্য্য সম্পন্ন অনায়াস-সাধ্য হইত, তবে সে নীরবে বসিয়া কালাতিপাত করিত কিনা সন্দেহ।

বৈয়াকরণ রূপ কাজির জোর-জবরদস্তি ও জুলুমের ফলে আমার ন্যায় উচ্চবংশজাত সজ্জনের গর্ব্বও যে কতকটা খর্ব্ব না হইয়াছে, এমন মনে করিবেন না। কিন্তু তথাপি আমাকে আজও জগতে নানারূপে বিরাজমান দেখিতে পাইবেন। আমিই জগদ্বিখ্যাত ইংরাজ-রাজ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ-সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দুরূহ প্রজারঞ্জন ব্রত পালনার্থ মুক্ত-হস্তে অজস্র অর্থদান করিয়া থাকি। ভারতের রাজপ্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের সহায়তায় আমি জাহ্নবী-তীরবর্ত্তী কলিকাতা মহা নগরী হইতে পাঞ্জাবের অন্তর্গত প্রাচীন দিল্লীনগরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া আনিয়াছি। আর কলিকাতা হাইকোর্টের

---

* এ স্থলে সুধী সজ্জনদিগকে জানাইয়া রাখা প্রয়োজন যে, কেবল অন্তাস্থ 'য' এর জোর জুলুমের কথা উল্লেখ করাই আমার উদ্দেশ্য। অন্তাস্থ 'য' ও 'য' ফলার উপর আমি কোন প্রভুত্ব জাহির করিতে সাহসী নই। কারণ ইহারা বর্ণমালার দেহে শুক্র-শোণিতের ন্যায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের দুইজনকে বহিষ্করণ বা বর্জ্জন করা অসম্ভব। সুতরাং ইহাদের উভয়ের সহিত চিরদিন সখ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করি।

চিফ জষ্টিস্ জেন্‌কিন্সরূপে আমিই রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর আইন নজীরের ত্রুটি উল্লেখ করিয়া রুলজারী করিয়া থাকি। মিশনারীর মুক্তিফৌজে ও জেনানা-মিশনে আমার কীর্ত্তি-ধ্বজা ও বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন দেখিয়া বিস্মিত হইবেন॥ আমারই জমীদারের জমাদারের ভয়ে খাজানা পরিশোধের জন্য দরিদ্র প্রজাকুল ঘর-দরজা ও জমি জমা ইজারা রাখিয়া কুসীদজীবীর নিকট হইতে উচ্চহারে টাকা কর্জ্জ লইয়া থাকে। স্বদেশ-জাত দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের আন্দোলনের প্রথম সময়ে মোজা-গেঞ্জি বুনিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন পূর্ব্বক জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার পথ আমিই প্রদর্শন করিয়াছি। আর বোধ হয় জানিলে সুখী হইবেন—আমি স্বহস্তে সম্মার্জ্জনী দ্বারা নিজ বাসগৃহের জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা পরিস্কার করিতে কখনও লজ্জা বোধ করি না। এতদ্ব্যতীত জ্যোতিস্মান্ ভাস্করের তেজঃপুঞ্জে, ভ্রমর-গুঞ্জিত কানন-কুঞ্জে, সজল নয়নের কাজলে, সাহাজানের তাজমহালে, রাজা রামচন্দ্রের প্রজারঞ্জনে, ব্রজকিশোরীর মান-ভঞ্জনে, রাজপুতের আত্ম বিসর্জ্জনে, পশু-রাজের গর্জ্জনে, শ্রমজীবীর জীবিকা-অর্জ্জনে, মিঞাজানের বিবিজানে, নন্দনজাত পারিজাতে, মুসলমানের হজরতে, আজগবী গল্প গুজবে, সজীবে নির্জ্জীবে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, বিজ্ঞে প্রাজ্ঞে, অস্থিমজ্জায়, কলকব্জায়, ঘর দরজায়, সাজ সজ্জায়, মাছ ভাজায়, রাজা প্রজায়, সন্ধ্যা পূজায়, বিজলি-চমকে, জাক্ জমকে, জলদজালে, মঞ্জুল মঞ্জীলে, জলে জঙ্গলে, মাদ্রাজে গুজরাটে, গেজেটে বজেটে, উজীরে নাজীরে, নজীরে হাজীরে, হুজুরে খেজুরে, পিঞ্জরে কুঞ্জরে, মঞ্জরে মঞ্জীরে, সরোজে পঙ্কজে, অগ্রজে অনুজে, দনুজে মনুজে, জলজে অণ্ডজে, সেমিজে কামিজে, কলেজে নলেজে, কাজে অকাজে, তাজে তোয়াজে, অজে গজে—এমন কি, বর্দ্ধমানের রাজাধিরাজে ও ময়ূরভঞ্জের মহারাজে আমি খোস মেজাজে বিরাজ করিতেছি।

অতঃপর বিজ্ঞানজগতে আমার কথঞ্চিৎ পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছি। জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন্‌রূপে 'ষ্টীম্ ইঞ্জিন', জর্ম্মনীর কাউণ্ট্ জেপেলিন্‌রূপে বিমান পোত (জেপেলিন্) আইজাক্ নিউটন্‌রূপে 'জগতের মাধ্যাকর্ষণ' এবং জগদীশচন্দ্ররূপে 'জড়জগতের জীবনী-শক্তি' প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তথ্যরাজি ও সাজ সরঞ্জাম আবিষ্কার করিয়া আমিই জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি। "জগজ্জ্যোতি" নুরজাহানের রূপলাবণ্যের লূতাতন্তু-জালে আমিই জাহাঙ্গীরকে ঊর্ণনাভের ন্যায় জড়িত করিয়া রাখিয়াছিলাম। দিল্লীর মোগল রাজবংশে ঔরঙ্গজীব রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি হিন্দু প্রজাপুঞ্জকে জিজিয়া নামক দুর্ব্বহ করভারে জর্জ্জরিত করিয়াজিলাম। মির্জ্জাফর ও জগৎশেঠের জঘন্য জাল-জুয়া-চুরী ও বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর রক্ত-রঞ্জিত রণ-প্রাঙ্গণে সিরাজদৌল্লা পরাজিত হইলে, আমিই বিজেতা ইংরেজ জাতির গৌরবজ্জ্বোল ললাট রাজতিলকে বিভূষিত করিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় বিদ্বজ্জন-সমাজে সকলেই জ্ঞাত আছেন। আমার কৃপায় সিংহলরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ ও পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের হৃদয়ে ক্ষত্রিয়োচিত রজোগুণ ও তেজঃপুঞ্জ সঞ্জাত হইয়াছিল। দশরথাত্মজ রামচন্দ্র আমারই আজ্ঞায় হরধনু ভঙ্গ করিয়া

জনকনন্দিনী জানকীকে জীবন-সঙ্গিনী জায়ারূপে লাভ করিয়া জগদ্‌বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আর এশিয়ার রাজকবি রবীন্দ্রনাথ প্রাজ্ঞের ন্যায় আমারই উপদেশের অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রাঞ্জল ভাষায় 'গীতাঞ্জলির' ইংরেজী অনুবাদ করিয়া একলক্ষ বিশ হাজার টাকা মূল্যের নোবল্ প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তারপর মার্জ্জার রূপে আমি জীবন্ত মৎস্যের কাঁটা খাইয়াও হজম করিয়া ফেলি। আর অতল জলধির জল হইতে রজ্জুর সহায়তায় অনেক মজ্জমান ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিয়া আমি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছি। আমারই রোজ, জিঞ্জারেড, লাইম্‌জুস্,প্রভৃতি সুশীতল পানীয় জলের বলে আপনারা সকলেই গ্রীষ্মজ্বালা জুড়াইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গোয়ালন্দের তরমুজে, দশসেরা খরমুজে, ঘরের সাজান মেজে, দর্জ্জীর জরীর কাজে—এমন কি, কামানের গুরুগম্ভীর আওয়াজে ও ফৌজের কুচ-কাওয়াজে আমাকেই সতেজে বিরাজমান দেখিতে পাইবেন।

আমারই খবরের কাগজের সহায়তায় রাজ্যমধ্যে জঘন্য অরাজকতা ও হাজার হাজার টাকার রাহাজানির কথা জনসমাজে জানাজানি হইয়া পড়ে। পূজার বাজারে রাধাবাজারের জুয়েলারের দোকানে বসিয়া আমি জহরী স্বরূপ হীরা জহরৎ লইয়া নাড়াচাড়া করি। আর জমি-জমা-সংক্রান্ত বিবাদভঞ্জনের জন্য আমি রেজেষ্টরী করা জরুরী দলিল ও নামজারীর কাগজপত্রে লইয়া জেলা জজের এজলাসে হাজির হইয়া জবানবন্দী দিয়া আসি। অঙ্ক-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জ্যামিতির ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজে আমারই খোঁজে ব্যস্ত। আমিই বক্তিয়ার খিলজী রূপে সপ্তদশজন অশ্বারোহী সেনাসহ তদানীন্তন হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের পরিত্যক্ত রাজধানী অধিকার পূর্ব্বক বঙ্গবিজয় করিয়াছিলাম। আমিই এক সময়ে কুটীলা জটীলা রূপে দিবস রজনী রসরাজ ব্রজরাজের জায়া রাধারাণীর দোষ খুঁজিয়া বেড়াইতাম বলিয়া, আজ সে লজ্জাজনক কাজের জন্য অনুতাপ জ্বালায় মরিতেছে। তারপর ইংরাজী-জানা বাবুদের বন-ভোজনে আমি গাজীপুরী তামাকের সঙ্গে অতি জাকজমকে জমকাল অলবোলার মাথায় বসিয়া সরফরাজী করিয়া থাকি। এই সমুদায় ব্যতীত পুঁজিপাটায়, বাজে জমায়. খাজাঞ্চিখানায়, খাজানা-বাজানায়, জলা জায়গায়, গালিগালাজে, বিলিবন্দেজে, জেলাজজে রসুন পেঁজে, সাজগোজে, পিলসুজে, ননদ-ভাজে, হিজিবিজীতে, গিজ্‌গিজীতে, পাঁজি কাজিতে, ভোজবাজিতে, জোৎদারে, ইজারাদারে, জমি জিরেতে, ও বজ্জাতে আমার ইজ্জৎ বেজায় রকমে বজায় রহিয়াছে।

জ্যোতির্ব্বিদের রচিত পঞ্জিকার কলেবরে অনুসন্ধান করিলে জ্যৈষ্ঠ মাসের জামাই ষষ্ঠীতে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে, জগন্নাথের রথে, গিরিরাজ-তনয়া দশভূজা ও জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর পূজায়,—এমন কি, মোসলমানের রোজা ও ইদজ্জোহায় আমার সংবর্দ্ধনার আয়োজন দেখিতে পাইবেন। অনুগ্রহ করিয়া কলিকাতার নানা জায়গায় ও নানা জিনিষে খোঁজ লইলে আমার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। চীনাবাজারের জুতায়, লালবাজারের হাজতে, মেডিক্যাল কলেজের হাউস্‌সার্জ্জনে, বহুবাজারের জামা জ্যাকেট্ ও সেমিজ্‌কামিজে, বড়বাজারের ব্যবসায় বাণিজ্যে, ইংরাজের কীর্ত্তিস্তম্ভ হাওড়া-ব্রিজে —এমন কি, জাহ্নবী-জল-বিহারী জাহাজেও

আমাকে বিরাজমান দেখিতে পাইবেন। আর অভিজ্ঞ কবিরাজের জ্বর-বজ্র ও অজীর্ণ-নিসূদন বটিকা, মকরধ্বজ ও সঞ্জীবন সালসা, জীরকাদি মোদক, কুব্জপ্রসারিণী তৈল, শিলাজুত, বিজয়ভৈরব, কুটজালেহ, দন্তমঞ্জন, উন্মাদভঞ্জন, রসরঞ্জন এবং জবাকুসুম, গন্ধরাজ, কেশরঞ্জন প্রভৃতির জাক্‌জমক-পূর্ণ বিজ্ঞাপনে আমিই জনসমাজে নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি জ্ঞাপন করিয়া থাকি। ঐতিহাসিক সময়ের রাজন্যবৃন্দের মধ্যে দিল্লীর পৃথ্বীরাজ, কনোজরাজ জয়চন্দ্র, রাজপুতবীর জয়মল্ল ও রাজসিংহ এবং মারাঠা বংশীয় শিবাজী, শম্ভুজী, বালাজী প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তি-গণের সহিত আমি প্রীতির হৈমসূত্রে জড়িত আছি। প্রাচীন ভারতের জড়ভরত, জৈমিনি, জনক, জরৎকারু, অনুধ্বজ, অজামিল, ভরদ্বাজ, পাতঞ্জল ও কপিঞ্জল প্রভৃতি ভক্ত মহাজনের পুণ্যপূত পদরজে আমিইত একদিন জন্মভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলাম।

মুসলমানের রোজারজ্‌মানে, মস্‌জিদের আজাহানে আমি আজও সাধু-সজ্জনের ধর্ম্ম-জীবনের জীবনী-শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকি। চাটার্জ্জী বানার্জ্জী কোম্পানীর ম্যানেজার স্বরূপ আমি অনেক সময় দেরাজ হইতে কাগজ লইয়া জমাখরচ লিখি এবং ডজন হিসাবে জিনিষ খরিদ করিলে এজেণ্ট-দিগকে উচ্চহারে কমিশন দিয়া বেশ দু পয়সা রোজগার করি। ক্ষুধা যখন জঠরানল প্রজ্বলিত করিয়া আমাকে জ্বালাতন করিতে থাকে, তখন আমি অনন্যোপায় হইয়া তাজা-মাছের ভাজা বা টাট্‌কা খাজাগজা কি জিলিপি প্রভৃতি ভোজ্যবস্তু ভোজন করিয়া উদর জ্বালা জুড়াইয়া থাকি। আমিই শিশুরাজ্যে জুজুরূপে উপস্থিত হইয়া শিশু-দিগকে ভয়ে জীবন্মৃত ও জড়সড় করিয়া তুলি। জগতের বিভিন্ন সাম্রাজ্যে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী আমারই কৃপায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্গীতজ্ঞের গান বাজ্‌নায়, নবাবজাদার বজ্‌রায়, নিজামরাজ্যের জঙ্গবাহাদুরে, বিষজিহ্ব অজগরে—এমন কি, দশভূজার পূজার পরে লক্ষ্মী কোজাগরে খোঁজ করিলে আমার সাক্ষাৎ পাইবেন। রজনী শেষে তেজোদীপ্ত অরুণদেবের রজতোজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে আমিই কুজ্ঝ-টিকার জলদজাল ভেদ করিয়া তন্দ্রা-জড়িত জনসমাজে নবজাগরণের স্পৃহা জাগ্রত করি। কখন কখন আমি জনাকীর্ণ জনপদে উপস্থিত হইয়া 'ভোজনে চ জনা-র্দ্দনং', 'বিবাহে চ প্রজাপতিং' প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেবদ্বিজে ভক্তি জন্মাইতে প্রয়াস পাই। এমন কি, ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে আমি পদব্রজে অতি সহজে জলধির জলরাশি সোজাসোজী অতিক্রম করিতেও পারি। মৃত্যুঞ্জয়; বৃষভধ্বজের জটাজূট-বিজ-ড়িত মূর্দ্ধজে ও আজানুলম্বিত ভুজদ্বয়ে আমিই ভুজঙ্গরূপে বিষ-জিহ্বা বিস্তার করিয়া সগৌ-রবে বিরাজ করিতেছি। আর আমিই এক সময়ে রাজসিক ভোগবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া জাপানে জনৈক জিতেন্দ্রিয় বৌদ্ধ পরিব্রাজককের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক জগজ্জনের মঙ্গল-মানসে 'নলিনী দলগত জলমিব' চঞ্চল জীবনকে জীর্ণবাসের ন্যায় বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম।

তারপর জননী জন্মভূমি! তোমার ব্রজধামের নিভৃত নিকুঞ্জের কুঞ্জ-কুটীরে জীবনের জাহ্নবী-রূপিণী ব্রজেশ্বরী রাধারা-ণীকে সঙ্গে লইয়া আমিই একদিন মোহন

সাজে সজ্জিত হইয়া ব্রজকিশোর রূপে বিশ্ববিমোহন বিনোদ-নিঃস্বনে বাঁশরী বাজাইতাম। তোমারই মঞ্জু-কুঞ্জে বিকশিত পুষ্প-পুঞ্জে আমারই ভ্রমর গুঞ্জন, মুঞ্জরিত তরুরাজির অন্তরালে আমারই কোকিল-কূজন মানবের কর্ণকুহরে জীবন জুড়ান, প্রাণ-মাতান সুরে ধ্বনিত হইতেছে। আর জাতীয় জীবনের নবজাগরণের শুভ সুপ্রভাতে আমারই স্নেহভাজন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন তোমার চরণাম্বুজে শ্রদ্ধার স্রক্‌-চন্দনের অঞ্জলি অর্পণ করিয়া 'মুরজ মন্দ্রে' গাহিলে পরঃ—

"সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত
হইল গভীর রাত্রি,
বন্দিল সবে, 'জয় মা জননী' জগত্তারিণী
জগদ্ধাত্রি!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া
স্পর্শ;
গাইল, 'জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি!
ভারতবর্ষ?"

অন্ত্যস্থ 'য'এর ঔদার্য্য।

কতিপয় বীর্য্যবান্ ও শৌর্য্যশালী যুবকের সহিত একযোগে ব্যোমযানের সাহায্যে আমি গগন পর্য্যটনে যাত্রা করিবার উদ্‌যোগ করিতেছিলাম। কিন্তু এমন সময় কোন এক বন্ধু প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, আপনাদের ন্যায় আচার্য্যতুল্য শ্রদ্ধেয় সভ্যমণ্ডলীর বহু ব্যক্তিই বর্গীয় 'জ'এর রচনা মাধুর্য্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ন্যায্য পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার বিরুদ্ধে অন্যায় কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহা শুনিবামাত্র যুগলাশ্ব-যুক্ত যানে আরোহণ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ত্বরিত গতিতে আপনাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আপনারা সকলেই যদি যোগীর ন্যায় স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক এই অযোগ্যের বাক্যে মনোযোগ করেন, তবে মদৃশ ব্রহ্মচর্য্যনিরত আর্য্যের হৃদয়ে শৌর্য্য, বীর্য্য ও ঔদার্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। স্বীয় বর্ণনীয় বিষয় বিশদ্‌রূপে বর্ণনা করিয়া আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করা আমি বিধেয় ও শ্রেয়ঃ মনে করি না। সুতরাং যথাসাধ্য সংক্ষেপে বক্তব্য বিষয়ের কয়েকটী সার তথ্য ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইব।

বর্গীয় 'জ' ব্রজধামে ব্রজকিশোরের বামে ব্রজেশ্বরী রূপে বিরাজমান বলিয়া সজ্জনের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু যদি দয়া করিয়া যথাযোগ্য মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, সে রমণীয় মূর্ত্তিতে আমার যুগলমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। শুনিলাম, স্বীয় কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ কতিপয় কদর্য্য যুবকের সহিত আমি ষড়যন্ত্র করিয়া দিবস যামিনী যাপন করিতেছি। এমন কি, আমি নাকি সুযোগ বুঝিয়া বৈয়াকরণ মহাশয়ের বিচারালয়ে অভিযোগ আনয়ন পূর্ব্বক আশ্রয়-ভিখারী হইয়াছি। নীচাশয় ব্যক্তির অসূয়া-পরতন্ত্র হইয়া এরূপ যাথার্থ্য-শূন্য অভিযোগ উত্থাপন করা ঘৃণনীয় কার্য্য কিনা, তাহা সাহিত্যাচার্য্য ও বিদ্যোৎসাহী যুবকগণের বিচার্য্য। যাহা হউক, এইরূপ হীনবীর্য্য ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রগল্‌ভতার প্রাচুর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া আত্মমহিমা প্রকাশ করা যে ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। তবে বলিয়া রাখি যে, আমার বক্তব্য বিষয়ে যুক্তির ছিটা ফোটা ভিন্ন রচনা সূর্য্যের কিরণচ্ছটা দেখিতে পাইবেন না।

বাংলা বানান-ক্ষেত্রে আমি ত স্বয়ং ভগবান্-স্বরূপ অবস্থিত। ভগবান্ যেরূপ

ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে স্থিতি বা পালন এবং শিবরূপে প্রলয় সংঘটন করিয়া স্বীয় সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্য ব্যক্ত করিতেছেন, আমিও তদ্রূপ বাংলা ভাষায় তিনরূপ লীলা খেলা করিয়া বঙ্গীয় শিক্ষিত অশিক্ষিত সমুদায় সম্প্রদায়ের নিকটই স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া রহিয়াছি অন্ত্যস্থ 'য' রূপে আমার সৃষ্টি,'য' ফলা রূপে আমার স্থিতি এবং অন্ত্যস্থ 'য়' রূপে আমার প্রলয় শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া অনেকেই আমার পদারবিন্দে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে। পৃথিবীর আলোক-দাতা সূর্য্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া কদর্য্য চৌর্য্যবৃত্তি পর্য্যন্ত অনেকানেক বিষয়েই আমার সৃষ্টি-তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য দেখিতে পাইবেন। ধার্য্য কার্য্যে. শৌর্য্যে বীর্য্যে, ধৈর্য্যে স্থৈর্য্যে, আর্য্যে আচার্য্যে, নার্য্যে অন্যার্য্যে, গাম্ভীর্য্যে মাধুর্য্যে, ঔদার্য্যে কৌমার্য্যে, সাহায্যে সে কর্য্যে, আনুচর্য্যে, সাহচর্য্যে, এমন কি. বামুন ভট্টাচার্য্যের ব্রহ্মচর্য্যেও আমার সৃষ্টি-চাতুর্য্যের প্রাচুর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন. তার পর আমি 'য' ফলা রূপে অন্যান্যস্থল ব্যতীতও গণ্যমান্য ব্যক্তি হইতে জঘন্য ও ঘৃণ্য মনুষ্যের বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে নিত্য সত্য-সত্যই অকথ্য রহস্যের সৃষ্টি করিয়া সহাস্য আস্যে অবস্থিতি করিতেছি। তাই, অদ্যাপি কর্ত্তব্যে ধর্ত্তব্যে, হন্তব্যে গন্তব্যে, বক্তব্যে মন্তব্যে, আলস্যে সদস্যে, পাঠ্যে নাট্যে, গদ্যে পদ্যে, আদ্যে মধ্যে. সভ্যে ভব্যে, সত্যে পথ্যে, পণ্যে পুণ্যে, মান্যে শূন্যে. ধন্যে ধান্যে, বৈশ্যে শস্যে, চর্ব্যে চোষ্যে, শিষ্যে পোষ্যে, ভাগ্যে ভোগ্যে; শল্যে মাল্যে, চাপল্যে চাঞ্চল্যে, কার্পণ্যে লাবণ্যে, অরণ্যে শরণ্যে, পাণ্ডিত্যে সাহিত্যে—এমন কি, পূর্ব্বোক্ত শৌর্য্য বীর্য্য ইত্যাদিতেও আমি প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে স্থিতি শক্তির আধিপত্য প্রদর্শন পূর্ব্বক স্মরেণ্য ও বরেণ্য হইয়া রহিয়াছি। আর কোন অলঙ্কার-প্রয়াসী মূর্খ যুবক যদি আমার বিলয় ঘটাইতে চেষ্টা করে, তবে আমি অন্তাস্থ 'য়' রূপে প্রলয়মূর্ত্তি প্রকট করিয়া স্বীয় মহীয়সী শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি—প্রমত্ত প্রয়াসের তাড়নায় কেহ ঐরূপ আয়াস-সাধ্য ব্যাপারে স্বীয় শক্তি প্রয়োগ ও নিয়োগ করিলে, আমি 'বসিয়া' 'শুইয়া', 'খাইয়া', 'যাইয়া' ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া 'দিয়াছিলেন' 'গিয়াছিলেন,' 'নিয়াছিলেন', 'বুঝিয়াছিলেন,' প্রভৃতি সমাপিকা ক্রিয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়াগুলিকে 'ধরিয়া,' 'মারিয়া,' 'কাটিয়া,' 'চুষিয়া', পিষিয়া, 'ঘাষিয়া' ও নিষ্ক্রিয় করিয়া দয়ামায়া-শূন্য হইয়া হাসিয়া খেলিয়া প্রলয়-পয়োধির অতল-সলিলে ডুবাইয়া মারিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিব না।

বর্গীয় 'জ' উপায়ান্তর না দেখিয়া কৌশলে ভেদনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক অন্ত্যস্থ 'য়' ও 'য' ফলাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বীয় আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। এমন কি -সে পাদটীকার অতি গোপনীয় ভাবে উহাদের সহিত প্রীতির হৈমসূত্রে সংযুক্ত হইবার আশায় আকুল হৃদয়ের প্রণয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ প্রয়াসে আয়াস স্বীকার করা বর্গীয় 'জ'এর পক্ষে কি মূর্খতার পরিচায়ক নহে? কারণ উহারা উভয়েই আমার রূপান্তর মাত্র। রাধা-কৃষ্ণের যেরূপ প্রণয়, দেহ-শোণিতে যেরূপ সম্বন্ধ ও হর-পার্ব্বতীতে যেরূপ মিলন, আমরা তিনটীও

তদ্রূপ প্রেমের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সূত্রে সংযুক্ত আছি।

এক কথায় বলিতে গেলে, বর্ণ-বিন্যাসের সুরম্য উদ্যানে যেন আমরা তিনটী যূথিকা ফুল একবৃন্তে ফুটিয়া উঠিয়া মলয় হিল্লোলে বিশ্বভুবনে সৌরভধারা ছড়াইতেছি। যাহা হউক, আমাদের তিন জনের প্রভেদ ও বিচ্ছেদের কল্পনা যে একেবারেই গ্রহণীয় নহে, তাহা সাহিত্য-সেবী সুধী ব্যক্তিগণের নিকটে ব্যক্ত করা বাহুল্য মাত্র।

আমি যে তিনরূপে লীলা-খেলা করিতেছি, তাহা পূর্ব্বেই যথাসম্ভব ব্যক্ত করিয়াছি। এইক্ষণ আমার প্রভাব-প্রতাপের আরও যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি।

আমারই মনোযোগের ফলে গঙ্গা যমুনার সংযোগে প্রয়াগে এক চিরস্মরণীয় তীর্থক্ষেত্রের উদ্ভব হয় নাই কি? স্নেহলতার আত্মদানের পর আমিই আধুনিক যুগের যুবকগণকে যৌতুকগ্রহণে বিরত করিয়া বিংশবর্ষীয়া যুবতীর সহিতও পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবার ব্যবস্থা দিয়াছি। এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, থিয়েটারে গায়ক রূপে বা নায়ক-নায়িকা-বেশে অভিনয় করিয়া টাকা পয়সা আয় করা আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। আমারই উপদেশানুসারে সংযমের নিয়ম-পালন-পূর্ব্বক যথোচিত উদ্যম ও মনোযোগ সহকারে ব্যায়াম করিলে সকলেই স্বাস্থ্য-সামর্থ্য লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন। ভগবদ্গীতায় জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, বিভূতি-প্রভৃতি অধ্যায়ে আমার উপদেশামৃতের আস্বাদ পাইয়া ম্রিয়মাণ ব্যক্তির হৃদয়েও চৈতন্যের সঞ্চার হয়। শুনিলে বোধ হয় অনেকেই ভয় পাইবেন যে, আমি যমরূপে বলশালী যুবককে পর্য্যন্ত শমন-ভবনে প্রেরণ করিয়া থাকি। আমিইত যাদব-যদু-নন্দন-রূপে গলায় যূথিকার মালা পরিয়া যমুনার কদমতলায় যামিনীযোগে প্রিয়াসনে কেলি করিতাম। তারপর 'যোগের' সহিত আমাকে যুক্ত দেখিয়া প্রয়োগে নিয়োগে যেন আমাকে বিয়োগ না করেন। আর অনুগ্রহ করিয়া তালাস করিলে কলিকাতার রাস্তায় গোয়ালা, কয়লাওয়ালা ও অন্যান্য ফেরিওয়ালার সহিতও আমাকে দেখিতে পাইবেন। এতদ্ব্যতীত যোগমায়ার দয়ায়, অযোধ্যার সীতায়, কায়ার ছায়ায়, সম্রাটের মৃগয়ায়, কাঠুরিয়ার বোঝায়, সঞ্চয়ের অপচয়ে, হিমালয়ের দেবালয়ে, পরিণয়ের প্রণয়ে, সদয়ে নির্দ্দয়ে, বিদায়ে আদায়ে, অক্ষয়ে অব্যয়ে, যাগেযোগে, বিয়োগে প্রয়োগে, সংযোগে নিয়োগে, নয়ন-বয়ানে, যামিনী-যাপনে, এমন কি, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও রায় মহাশয়ের তনয়ের সদয় ব্যবহারে আমি অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছি।

সদাশয় ভদ্রমহোদয়গণ! যথাযোগ্য বর্ণনা-বৈচিত্র্য-সংযোগে আপন মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছি। এইক্ষণ স্বীয় ঔদার্য্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বক্তব্য বিষয় সমাপ্ত করিতেছি। বঙ্গীয় ভাষা-জননীর অর্চ্চনা-মন্দির হইতে বর্গীয় 'জ'কে বিতাড়িত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। সত্য বলিতে কি, ঐরূপ নীচতামূলক উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে কখনও আমি কোন যুবকের সহিত ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত হই নাই। পরন্ত কোন কোন স্থলে আমি উহাকে আশ্রয় দান করিয়া আমার সহিত মিলনসূত্রে সংযুক্ত হইবার যথেষ্ট সুযোগ

দিয়াছি। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বর্গীয় 'জ'এর কোন আধিপত্য না থাকিলেও, বাণিজ্য-রাজ্য হইতে আমি অদ্যাপি তাহাকে বহিষ্কৃত করি নাই। আমারই সূর্য্যদেবের জ্যোতিঃ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া অন্ধ-তামসে চিরনিমগ্ন করা আমি বিধেয় ও যুক্তিযুক্ত মনে করি না। মৃত্যুঞ্জয়, ধনঞ্জয়, জয়দুর্গা ও জয়াবিজয়ার ভজনালয়ে অর্চ্চনার আয়োজনে আমিই প্রয়োজন মত তাহাকে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছি। এমন কি, ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী নগরেও আমি তাহাকে স্থানদান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করি নাই। আর আমারই দয়ামায়ার ফলে সকলে অদ্যাপি বিজয়ী সৈন্যের জয়-ঢাকে ও বিজয়-বৈজয়ন্তীতে বর্গীয় 'জ'এর ঔজ্জ্বল্য জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাইবেন। তারপর যাগযজ্ঞে, যম-জ্বালায়, জলযোগে, জল-যানে, যুদ্ধ-জাহাজে ও অজা-যুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধভাব তিরোহিত হইয়া যে যুগলমিলন হইয়াছে, তাহাও আমার ঔদার্য্যের পরিচায়ক। আমার এই প্রকার প্রশংসনীয় কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনা করিয়া কেহ যদি আমার ঔদার্য্য স্বীকার্য্য মনে না করেন, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই দীনহীন অযোগ্য ব্যক্তির দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়?

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়।

'শ্যামের বাঁশরী'।

সারা বিশ্বময় শ্যামের বাঁশরী
বাজিছে, তুমি কি শুনিছ?
জগৎ জুড়িয়া কি করুণ গীতি
ধ্বনিছে, তুমি কি বুঝিছ?

অই ব্রজপুরে গোপিকার দল
শ্যামের আহ্বান শুনিয়া,
পতি পুত্র ফেলি ফেলিয়া সংসার
যেতেছে ত্বরিতে ছুটিয়া।

আজি যে গিয়াছে স্বরগের দ্বার
তাহাদের কাছে খুলিয়া,
সার্থক করিয়া লইবে জীবন
কৃষ্ণের চরণ লভিয়া।

কি হইবে ফিরি সংসারের ডাকে
যাক না সে পথ ভুলিয়া,
গ্রাম হ'তে গ্রামে ঘুরিয়া ফিরিয়া
উঠুক বাঁশরী বাজিয়া।

জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, বিষাদের ছবি
মানবের দেহে হেরিয়া,
রাজার নন্দন সে তথাগতের
উঠিল পরাণ কাঁপিয়া,

ভাঙ্গিল স্বপন, চমকি কাহার
আদেশ লক্ষ্য করিয়া,
চলে যুবরাজ উদাস হৃদয়ে
গহন কাননে ছুটিয়া।

ধন, রাজ্য, সুত, জীবন-সঙ্গিনী
কোথায় রহিল পড়িয়া,
মানবের তরে মুক্তিপথ লাগি
বসিল নয়ন মুদিয়া।

আসিল চৈতন্য, মৃদঙ্গ মন্দিরা
সঘনে উঠিল বাজিয়া
"বল হরিবোল" ভক্তির তরঙ্গে
বঙ্গভূমি গেল ভাসিয়া।

রাজার শাসন করিয়া লঙ্ঘন
দেবের আহ্বান মানিয়া
করতালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া
উঠে ভক্তদল মাতিয়া।

তারা যে ভুলেছে মধুর সঙ্গীতে
গোপন অন্তর মাঝে,
দিবানিশি অই মুরতিমোহন
শ্যামের বাঁশরী বাজে।

প্রতীচ্য গগনে ভৈরব হুঙ্কারে
পাঞ্চজন্য শঙ্খ গর্জ্জিয়া,
সমর-প্রাঙ্গণে ডাকিছে সন্তানে
'রাখ মান রিপু নাশিয়া'।

আজি আর বল কে রহিবে ঘরে
মায়ের আহ্বান শুনিয়া,
দলে দলে অই ছুটেছে সকলে
সৈনিকের বেশে সাজিয়া।

জীবন মরণ সম করি জ্ঞান
মাতৃভূমি তরে হাসিয়া,
প্রসন্ন বদনে শমন সদনে
যেতেছে সকলে চলিয়া।

হেথা হতভাগ্য বাঙ্গালার দ্বারে
দেখ গো নয়ন খুলিয়া,
অই রামকৃষ্ণ মিশনে'র ডাকে
যুবক উঠেছে জাগিয়া।

কোথা আর্ত্ত কোথা বিপন্ন মানব
ভ্রমে দেশে দেশে খুজিয়া,
শরীরের রক্ত করিতেছে জল
তাদের সেবায় লাগিয়া।

কোথা মহাযোগ, কোথা তীর্থভূমি,
কে সহে যাতনা আসিয়া,
দেখিতে যুবক ব্যস্ত জনতায়
আপনারে দেয় ঢালিয়া।

নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ মহান—
উঠ জয়-গীতি গাহিয়া,
তাদের পশ্চাতে পুণ্যের নিশান
ধর গো সকলে মিলিয়া।

দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী ব্যাদানি বদন
লক্ষ নরনারী গ্রাসিয়া,
লইতেছে ভাই ভগিনী তোমার
মরণের কোলে টানিয়া।

শুনিছ না তুমি ক্রন্দনে তাদের,
জগৎ জননী ডাকিয়া
কহিছে "এস গো দুদিনের তরে
বিলাস বাসনা ছাড়িয়া,

"যার যাহা আছে লয়ে এস আজ
দেহ তব থলে ঝাড়িয়া,
ভিখারিণী আমি, ভিক্ষা দেহ মোরে
দুঃখীর জীবন লাগিয়া।"

কে আছে এমন হৃদয় যাহার
যাবে না সে ডাকে গলিয়া,
মায়ের নয়নে অশ্রু দেখি, তাঁর
কাতর ক্রন্দন শুনিয়া।

এস তবে ভাই এস গো ভগিনী
যার যাহা আছে লইয়া,
গ্রাম হ'তে গ্রামে শ্যামের বাঁশরী
অই যে উঠিছে বাজিয়া।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।

বিগত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের নব্যভারতে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকারক ও উপাসনা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, বর্ত্তমান নববিধান সমাজেও সেই মারাত্মক ভাব প্রবেশ করিয়াছে। নববিধানবাদী হইয়াও সমাজ ও মণ্ডলীর কল্যাণের জন্য আজ এ কথা প্রকাশ্য পত্রে লিখিতে বাধ্য হইলাম। আমি যতদূর বুঝিতেছি, আপনিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক অবনতিতে মর্ম্মাহত হইয়া মণ্ডলীর কল্যাণের জন্য সমাজের অগ্রণী ও নেতাদিগের সমক্ষে এই দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিতে বাধ্য হইয়াছেন; আমিও আপনার পথানুবর্ত্তী হইয়া নববিধান-সমাজের অধঃপতনের কাহিনী না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে নববিধান সমাজও স্বীয় আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হইতে অনেক দূরে চলিয়া যাইতেছে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সময় হইতে নববিধান সমাজের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। এখানেও ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মোপাসনা ক্রমশঃ বক্তৃতার ভাবে পরিণত হইতেছে। আরাধনায় সে আধ্যাত্মিকতা নাই, প্রার্থনায় সে প্রাণ নাই, এবং উপাসনা সংক্রান্ত আর আর বিষয়েও হৃদয়ের সে একতা ও যোগ নাই। শুষ্ক ও নীরস উপাসনা মণ্ডলীকে কতদিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে, তাহা জানি না। উপাসনার এই প্রাণহীনতার সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিভীষিকা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সময়ে যাঁহারা বিধাতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া প্রচার-ব্রত গ্রহণোপলক্ষে ব্যাকুল প্রাণে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, ভক্ত কেশব তাঁহাদিগকে যে মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম মন্ত্র এই—

> "Gold and Silver ye shall not seek. Ye shall not serve as hireling nor carry on independent trades for money's sake. Nor shall ye defile your fingers by receiving corrupt compensation for the services eye render."

বর্ত্তমান প্রচারক-দল তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন। নবোৎসাহে উৎসাহান্বিত প্রচারক দল কেশবচন্দ্রের উচ্চ মন্ত্র গলাধঃকরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সত্য সত্য ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের আবরণের মধ্যে সাক্ষাৎ বণিক-বৃত্তির প্রশ্রয়দান করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী সদাশয় কুচবিহার-মহারাজা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোপলক্ষে বৎসর বৎসর অনেক টাকা ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। আমি প্রায় সপ্তাধিক বৎসর কাল কুচবিহারে থাকিয়া দেখিলাম যে, তথায় দানশীল মহারাজার দান কোন অর্থলোলুপ প্রচারকের হস্তে যারপর নাই অপব্যবহারিত হইয়াছে। এমন একজন প্রচারক আসিলেন, যিনি মাসিক বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া তথায় পাঁচ বৎসর কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার অর্থগৃধ্নুতা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি তাঁহার চলন চালন ও ধরণ ধারণে তত্রত্য প্রধান ও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণাস্পদ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে যখন ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়িত হইয়া চলিয়া

যাইতে বাধ্য হইলেন, সত্য সত্য তিনি যে মাসের ২রা তারিখে কুচবিহার পরিত্যাগ করেন, সে মাসের দুই দিনের বেতন পর্য্যন্ত না লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। চাকুরি বজায় রাখিবার জন্য ও প্রবল অর্থপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তিনি সেই পাঁচ বৎসর কাল সত্য ও ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অর্থের সঙ্গে এইরূপ সাংঘাতিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকাতে আর আর কার্য্যকারকগণ ন্যায় ও নীতির সীমা অতিক্রম করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। শুনিলে কেনা বিস্মিত হইবেন যে, তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের অপর একজন কার্য্যকারক তাঁহার চাকুরীটাকে Pensionable করিয়া লইতেও লজ্জিত হয়েন নাই! ষ্টেটের জনৈক দ্বিপত্নীক হিন্দু, সমাজের সঙ্গীতকারকের আসন গ্রহণ করিয়া সত্য সত্য নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন। ষ্টেটের চাকুরী প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি বিবাহিত। পরে ব্রাহ্মসমাজের চাকুরী প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার পূর্ব্ব-বিবাহিত পত্নী ও তজ্জাত বালিকা কন্যা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় হিন্দুমতে বিবাহ করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের উচ্চাসনে বসিয়া উচ্চ নীতির উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। আবার একজন অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্ম ভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় মহারাজার সময় হইতে আদিম ব্রাহ্ম অথবা অন্য কোন একটা বিশেষ privilegeএর উপর মাসিক বৃত্তি পাইয়া আসিতেছেন। আমি কতদূর দেখিতেছি, এই বাতাস অল্পাধিক পরিমাণে কুচবিহারের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। সমাজের কল্যাণের জন্য মহারাজার দান অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু প্রচারক ও কার্য্যকারকগণ তাঁহাদের জীবনের ব্রত ও বীজমন্ত্র ভুলিয়া গিয়া যদি অর্থপিপাসার নিকট আত্ম বিক্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষা ও দীক্ষা কলিকাতার মিউনিসিপাল মার্কেটে বিক্রয় করাই ভাল ছিল। আমার সমক্ষে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পড়িয়া আছে, যাহা দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বর্ত্তমান প্রচারক ও কার্য্যকারক-দল ধন মান ও স্বার্থের সমক্ষে তাঁহাদের বিশ্বাস ও ধর্ম্মমতও সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এতৎ সম্বন্ধে ক্রমশঃ আরও আলোচনা করিবার অভিপ্রায় থাকিল।

জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী,
নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ।

* * *

মাহিষ্য জাতির প্রাচীন

বঙ্গদেশে অনেক জাতীয় রাজবংশ ও জমিদার পরিবার অভ্যুত্থিত হইয়া জীবনের খেলা সাঙ্গ করিয়া কালের স্রোতে বিস্মৃতির তামসী গর্ভে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় মাহিষ্য বা কৃষি কৈবর্ত্তজাতি এক মহান্‌শক্তি-শালী জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন; তাঁহাদের স্থাপিত কীর্ত্তি-কলাপ সভ্য জগতে উদ্‌ঘাটিত হইয়া ইহাদিগের প্রাচীন প্রভূত শক্তির পরিচয় দিতেছে। এই জাতি যে এককালে সমগ্রবঙ্গের শাসক ছিলেন, বর্ত্তমান ঐতিহাসিক

গবেষণা তাহা প্রকাশ করিতে ক্রটী করে নাই। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি একে একে তাহার সমুদয় উল্লেখ করিব

দ্বাপরের শেষ ভাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতভূমে বর্ত্তমান ছিলেন। এই কালে শল্য যুযুৎসু, যাঁহারা ভারত যুদ্ধে এত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা মাহিষ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। গোপরাজনন্দও মাহিষ্য ছিলেন।* গোপরাজ নন্দের প্রতিষ্ঠা বৃন্দাবন ধামে প্রাচীন যুগে কিরূপ ছিল, তাহা বৈষ্ণব মাত্রই অবগত আছেন। এই নন্দই কৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা ছিলেন।

তমলুক (প্রাচীন তাম্রলিপ্তি) রাজা যুধিষ্ঠিরের যুগে একটী পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। স্বয়ং নরনারায়ণ কৃষ্ণার্জ্জুন রাজা তাম্রধ্বজকে সহজে যুদ্ধে পরাজিত করিতে না পারিয়া ছলনা ও স্তবে সখ্যভাব স্থাপন করিয়া স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই তমলুকে, বর্ত্তমানকালে, মহাভারতীয় যুগের প্রাচীনকীর্ত্তি-সমূহ প্রায় বিনষ্ট হইলেও, অদ্যাবধি তাহার ক্ষীণ ভগ্নাবশেষ বক্ষে লইয়া ইহা অতীতের সাক্ষ্য প্রদান জন্য দণ্ডায়মান আছে। রাজবাটীর সম্মুখে বিষ্ণু হরির শিলামূর্ত্তি সেই অতীত যুগের স্মৃতি পথিকের হৃদয়ে আজিও জাগরুক করিয়া দেয়।

তমলুকের রাজাদিগের যে বংশ তালিকা আছে, তাহাতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন্ রাজা কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। তবে ধ্বজবংশীয় রাজগণ ৫০২৬ বৎসর পূর্ব্বে যে সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বংশতালিকা দেখিলে ধ্বজ, এবং রায় বংশীয় ভূপতিগণ এবং গঙ্গারাঢ়ীগণ অধিরূঢ় ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। (সেবানন্দ ভারতী-কৃত তমলুকের ইতিহাস এবং মদ্‌কৃত মাহিষ্য-প্রকাশ প্রথম ভাগ ৩৭৫—৩৮০ পৃ দ্রষ্টব্য।

তমলুকে "নৈতা ধোপানীর ঘাট" নামক স্থানটী একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। ইহার প্রাচীনত্ব ইহা দেখিলেই উপলব্ধি হয়। তমলুকের ত্রিশক্রোশ উত্তর পশ্চিমে প্রাচীন রাজধানী কাণসোণা (কর্ণ-সুবর্ণ) অবস্থিত। এইখানে কয়েকটী প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান তমলুক প্রাচীন তাম্রলিপ্তি হইতে অনেক সংকীর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন তাম্রলিপ্তে হিউন্ স্যাং অনেক বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধ-মন্দির অবলোকন করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান তমলুকে তাহার অস্তিত্ব নাই। ২।১টী সামান্য স্তূপ ব্যতীত আর এখন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। চীন পরিব্রাজক-দৃষ্ট শত শত বৌদ্ধ-মন্দির কোথায় গেল, তাহাদের পরিণাম অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। বোধ হয়, এইগুলি রূপনারায়ণ নদের গর্ভে লীন হইয়াছে, অথবা রাজবাটীর সীমার মধ্যে ভগ্ন হইয়া স্তূপে পরিণত হইয়াছে। তমলুক হইতে কাণসোণা পর্য্যন্ত ভূভাগে রাস্তার পার্শ্বে স্থানে স্থানে স্তূপ দৃষ্ট হয়। আমার বোধ হয় যে, তাহা খনন করিলে বৌদ্ধ কীর্ত্তি প্রকাশিত হইতে পারে। (কর্ণ সুবর্ণ এবং তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে মাহিষ্য প্রকাশ প্রথম ভাগের ৩০৭ হইতে ৩১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (See Julien's Hiouen Thsang Vol. iii)! তমলুকের রাজ-

---

* মাহিষ্য-প্রকাশ, প্রথম ভাগ ৫৩৭ পৃষ্ঠা ও শ্রীমদ্ভাগবৎ নবম স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

বংশের মধ্যে "ভূঁঞ্যা" গোষ্ঠীকেও আমরা দেখিতে পাই। হণ্টার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, দীনেশ বাবু-প্রমুখ বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং মাহিষ্যদ্বেষী মহোদয়গণের মতের পোষকতা করিয়া এই জাতির অভ্যুদয় প্রাচীনকালে যে অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু এ বিষয়ে আমার যাহা মত এবং যাহা শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকগণ বহু অনুসন্ধান করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা মাহিষ্য-প্রকাশে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তমলুকের কালুরায়কে ডাঃ হণ্টার কালু ভূঞ্যা বলিয়া ইহাকে "Fisher king, powerful aboriginal chief" প্রভৃতি নামে ভূষিত করিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করি নাই। (Statistical Account of Bengal, Vol III p, 67)

বিষ্ণুপুরাণোক্ত "প্রাধান্যেন ঈরীতঃ" ন্যায়ে বিদ্যাধর রায় এই রাজবংশের বহু পরবর্ত্তী খ্যাতিযুক্ত ও মর্য্যাদাবান নরপতি ছিলেন। কারণ এই নামটী আধুনিক বলিয়া মনে হয়, মহাভারতীয় যুগের নামের সহিত এই নামের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। এই রায় উপাধিধারী রাজাগণ গঙ্গারাঢ়ী বংশীয় ছিলেন, তাহাও ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধ মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। (See Journal of the R. A. S. Bengal). বৈঁচবেড়ে গড় তমলুক হইতে ৮ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত হইলেও তাহা আদিতে তমলুক গড়ের অন্তর্গত ছিল। মহাভারতের যুগে তমলুকের বিশাল রাজ্য পূর্ব্বে সমুদ্রের লবণাক্ত-বারি বিধৌত হইয়া পশ্চিমে মাহিষ্যমণ্ডল ওঁকার দ্বীপ প্রভৃতি আলিঙ্গন করিয়া পূত-সলিলা নর্ম্মদা নদীর আদি লীলাক্ষেত্র ও উৎপত্তির স্থান অমরকণ্টক নামক স্থানুদেশ হইতে সপ্তপুরা গিরিরাজিকে স্পর্দ্ধার সহিত বেষ্টন করিয়া বিরাজিত ছিল। সেই ভূভাগ এখন সামান্য তমলুক পরগণায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। জিষ্ণু হরির লীলা-খোদিত মূর্ত্তি, ৺ বর্গভীমা দেবীর প্রাচীন মন্দির, পুনরায় আমাদের মনে বৌদ্ধযুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বর্গভীমা দেবীর মন্দির এখানকার মধ্যে একটী দেখিবার জিনিষ। ৺বর্গভীমা দেবী একখানি প্রস্তরের সম্মুখ ভাগ খোদিত করিয়া বাহির করা মূর্ত্তি। এইরূপ প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি এতদঞ্চলে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা বুদ্ধগয়ার প্রস্তরখণ্ডে খোদিত মূর্ত্তির ন্যায়। এই দেবীর উদ্দেশে প্রদত্ত জমীর ছাড়পত্র আছে। ১৫৬৮ সালে কালাপাহাড় তাহা প্রদান করেন। মারহাট্টাগণও যখন উপর্য্যুপরি বঙ্গদেশ লুণ্ঠনে রত থাকেন, তাঁহারা এই স্থানে আসিয়া শৈব এবং শাক্ত বিধায় দেবীর পূজা দিতে এবং ছাড় দিতে ত্রুটী করে করেন নাই। মহারাষ্ট্রনেতা সদাশিব রাও ভাও দেবীর প্রচণ্ডামূর্ত্তিদর্শনে ষোড়শোপচারে পূজা দিতে বিস্মৃত হন নাই। তমলুকের ইতিহাস এবং মাহিষ্য-প্রকাশ ১ম ভাগ ৪০০পৃঃ দেখ)। তাহা ছাড়া তমলুকে অনেকগুলি রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত আধুনিক দেবমন্দির আছে। একটী বড় দীঘির অভ্যন্তরে নির্ম্মিত বলিয়া মন্দিরের চূড়া মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সে সম্বন্ধেও অনেক প্রবাদ-বচন প্রচলিত আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার মধ্যে কি আছে, তাহা না উদ্ঘাটন করিলে স্থিররূপে বলা যায় না। তমলুক প্রভৃতি

মেদিনীপুরস্থ পঞ্চ স্বাধীন মাহিষ্য রাজ্যের কথা আমরা লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক ৺ গদাধর ভট্টের কুলজীতেও দেখিতে পাই। রিজলী, হণ্টার, ষ্ট্রীল, মোক্ষমুলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই কুলজীর কথা সকলেই আপন আপন পুস্তকে লিখিয়া ইহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাহা দেখেন নাই। সবই অনুসন্ধানের কথা। অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আমি এই কুলজী মান্দ্রাজ হইতে আনিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাহাও মাহিষ্য-প্রকাশে সন্নিবিষ্ট আছে। ইহা ব্যতীত লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক সুবিখ্যাত পণ্ডিত গোবর্দ্ধণাচার্য্য কৃত মাহিষ্যের কারিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাও দ্বিতীয় ভাগে যথা সময়ে প্রকাশিত হইবে। লাট কঙ্ক, তুর্খা, ময়না, কুতুব্‌পুর, সবঙ্গ প্রভৃতির প্রাচীন ইতিহাস কি এই জাতির প্রাচীন গৌরব তারস্বরে ঘোষিত করিতেছে না? লাট কঙ্করাজ্য মাহিষ্যের একটী বহু প্রাচীন রাজ্য। এ সম্বন্ধে মৎ প্রণীত উপরোক্ত পুস্তকের ৩৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। রায় যশোবন্ত রায় ভাকুত্তার রায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গের নবাব সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি এবং ঢাকার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ডেপুটীগভর্ণর ছিলেন।

কঙ্করাজ্যের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে মোগল রাজপ্রাসাদে বিশাল ভূখণ্ড রাজা মধুসূদন সিংহ সামন্ত রায়ের রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহার ইতিহাস, যাহা সেদিন ২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ এবং আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

“মাহিষ্য জাতির সম্বন্ধে আমার অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। ইহারা যে কি এবং কে, তাহা সংবাদ পত্রের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। ইঁহারা বঙ্গের কৃষি-কৈবর্ত্ত জাতি—যাঁহারা সে দিন ঢাকা অঞ্চলে প্রকাণ্ড দরবারে বঙ্গের প্রথম শাসনকর্ত্তা (Governor) লর্ড কারমাইকেল মহোদয়কে আবেদন পত্র দিয়া আপনাদের সমাজের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে এই মাহিষ্য শক্তি উপেক্ষা করিবার বস্তু নহে। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত মল্লিখিত মাহিষ্য-শক্তি প্রবন্ধটী পাঠ করিলে ভাল হয়। মাহিষ্য জাতির ক্রমিক ইতিহাসে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে এই জাতি সম্বন্ধীয় কয়েকখানি প্রকাশিত পুস্তক পাঠ করিতে হয়। তাহাতে সকল ঐতিহাসিক সত্যই প্রকাশিত হইবে। ভরত গড়ের, কোলহল পর্ব্বতের, তিব্বত দেশের নবাবিষ্কৃত পালি ভাষার পুস্তক এবং তাম্র-ফলকাদি দেখিলে বেশ জানা যাইবে যে, বঙ্গের মাহিষ্য জাতিই সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর শাসনদণ্ড পরিচালনকারী বঙ্গের পালরাজগণ। এ সত্য অপলাপ করা বড় কঠিন। অক্ষয় বাবু, বিজয় বাবু, নিখিল বাবু, পরেশ বাবু, লালমোহন বাবু এ সম্বন্ধে কি বলেন? এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণাপূর্ণ বিবরণ মদ্বন্ধু ঢাকা-নিবাসী বাবু বসন্তকুমার রায় শীঘ্রই প্রকাশিত করিবেন বলিয়া আমি তাহাতে বিরত হইলাম।

মাহিষ্যগণ বঙ্গের কৃষি-কৈবর্ত্ত-জাতি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতার জাতি। এ বিষয়ে ভ্রান্তিবিজয়, মাহিষ্য-প্রকাশ, মাহিষ্য-বিবৃত, মহেন্দ্র-মোহমুদ্গার, দীনের উক্তি, ব্যবস্থা পঞ্চবিংশতি, মাহিষ্য বান্ধব, মাহিষ্য সমাজ, ফটিকচন্দ্র চৌধুরী-লিখিত বাবু সারদাচরণ মিত্রের

উক্তির আক্রমণ, বৈশ্যাচার বা বর্ণপরিচয়, উদ্বোধন, নিবেদন, সুবর্ণী মাহিষ্য সভা, নাকোল সভার বিবরণ. বঙ্গীয় পুরোহিত, সুদর্শনচন্দ্র-বিশ্বাস-প্রণীত "বঙ্গীয় মাহিষ্য পুরোহিত," "মাহিষ্য প্রসঙ্গ," "বিজ্ঞাপন বুভুৎসা," "ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ ব্যাসক্ত নহেন," "মাহিষ্যাশৌচ নির্ণয়," "প্রত্যুত্তর লিপি" প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিবেন। মাহিষ্যপ্রকাশ সংশোধিত হইয়া পরিবর্দ্ধিতা-কারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা প্রত্যেক মাহিষ্যেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

প্রায় ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার দক্ষিণস্থিত সুন্দরবন বা বাদা প্রদেশ বর্ত্তমান কালের মত দুর্ভেদ্য বনে আবৃত বা স্বাপদ-সংকুল ছিল না। ভগবানের লীলায় আজ যে স্থান সৌধাবলী-শোভিত জনাকীর্ণ নগর বলিয়া পরিচিত, তাহা শত বর্ষ পরে বনাকীর্ণ হইয়া মানুষের পরিবর্ত্তে হিংস্র স্বাপদকুলের অভিলষিত বাসস্থান হইয়া দাঁড়ায়। সুন্দর-বনের সম্বন্ধেও সেই কথা। সুন্দরবন আবাদ করিতে করিতে কত মন্দির, হর্ম্ম্য. পুষ্করিণী, তোরণ ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে. তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে, দিনাজপুর জেলাস্থ মহিপাল দীঘির সন্নিকট, কোলহল পর্ব্বতে, এবং অনেক অপর স্থানে মাহিষ্য জাতির অতীত গুণ গরিমার নিদর্শন পাওয়া যায়। লাট এবং কঙ্কদ্বীপে মাহিষ্য রাজার রাজধানী ছিল, তাহা আমি মাহিষ্য প্রকাশ প্রথম ভাগে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছি। লাটদ্বীপ বর্ত্তমান লাটুদহ। কঙ্কদ্বীপের বিষয় বড় কিছু বলা হয় নাই। কারণ যে সময় ঐ পুস্তক প্রণয়ন করি. সেই সময়ে কঙ্কদ্বীপ সম্বন্ধে বিশেষ কোনরূপ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এখন তাহা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

বাবর বাদসাহের রাজত্বকালে মহারাজ সিংহবাহু মোগল সম্রাটের পক্ষ হইয়া রাণা সঙ্গের বিরুদ্ধে ফতেপুরশিকরীর জগৎ-বিখ্যাত সমরে প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া অসম সাহসিক বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সিংহবাহু সিংহ কর্ণাটদেশ-বাসী ছিলেন। আকবর বাদশাহের রাজত্ব-কালে ইনি পাঁচ হাজারির পদে উন্নীত হইয়া পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধেও খুব সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। আইন-ই-আকবরিতে ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। বাদসাহ আকবর তাঁহার বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সুন্দরবনের জনাকীর্ণ জনপদে ৭০১০০/ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়া রাজা উপাধিতে ভূষিত করিয়া কঙ্করাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করান। ইঁহার পুত্র রাজা বিজয়সিংহ, তাঁহার পুত্র রামহরি সিংহ। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র মধুসূদন সিংহ। তিনি দিল্লিতে সাহ আলম বাদসাহের দশহাজারির সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি কোন শত্রুর হস্ত হইতে বাদসাহের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া বাদসাহ তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীত হইয়া "সামন্ত" উপাধি প্রদান করেন এবং ১৭১৪ খ্রীঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সুন্দরবনের অন্তর্গত কঙ্করাজের মধ্যে ৬৯৭০০/ বিঘা চৌহদ্দীভুক্ত নিষ্কর ভূমি ১১২নং ছাড় সূত্রে দান করেন। এই জমির চৌহদ্দী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—উত্তর—পীরালির খাল, পূর্ব্ব—কাকৃচির ও বেনাজী ঠাকুরের গাঙ্গদীঃ, দক্ষিণ—মেলোর গাঙ্গ, পশ্চিম—ষষ্ঠীতলার বাঁধ ও

ভেড়ী। আর এক দফায় ঐ বাদশাহ ১১০০/ বিঘা নিম্নলিখিত চৌহদ্দীভুক্ত নিষ্কর জমি কঙ্করাজ্যের সামন্তকে প্রদান করেন। ইহার মধ্যে রায়দীঘী, কঙ্কদীঘী প্রভৃতি গ্রাম আর পুষ্করিণী, চত্বর, চড়া ও লাটদিগের সমেত দান করেন। ইহার চৌহদ্দী—উত্তর—বাদার খাল, পশ্চিম—বকুলতলার খাল, দক্ষিণ ও পূর্ব্বে সমুদ্র বা বাদা। এই সিংহ সামন্তরাজগণ মাহিষ্য জাতীয় রাজা ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারের ১নং রাজস্ব বহি দেখিলে এই রাজবংশের সম্বন্ধীয় ছাড়পত্র দৃষ্টিগোচর হইবে। তাৎকালিক বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব মোবারিক উদ্দৌলা উপরোক্ত বাদসাহ শাহ আলমের সনন্দপত্র দৃষ্টে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর তারিখে নিজে ছাড় দেন। ঐ ছাড় রাজা মধুস্থদন সামন্ত দেব রায়ের নামে প্রদত্ত হয়। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদসাহ শাহ আলমের নিকট হইতে ফারমান হাসিল করিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের দেওয়ানি ভার ১২ই আগষ্ট ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত হন। এই সামন্ত রায় বাহাদুরের ছাড়পত্রে লর্ড ক্লাইব বাহাদুরের স্বাক্ষর করিয়া রাজা মধুস্থদন সামন্তের কঙ্করাজ্যের স্বামীত্ব স্বীকার করিয়া লন।

কেহ কেহ কঙ্কদ্বীপকে নদীয়া জেলার পূর্ব্বসীমাস্থিত কাঁকৃটি পরগণা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। পুনশ্চ কেহ কেহ যশোহর জেলার অন্তর্গত ঘোল্‌দা, মহেশপুর কঙ্ক রাজ্যের প্রাচীন নায়ক সূর্য্য মাঝির লীলাভূমি বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রাচীনকালে কঙ্কদ্বীপের অস্তিত্ব কোথায় ছিল, তাহা নিরূপণ করা বড়ই কষ্টসাধ্য। নদীর সিকস্তি পয়কস্তিতে দেশের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, প্রাচীন কোন রাজ্যের স্থান নির্ণয় করা বর্ত্তমানকালে একান্ত দুরূহ। ভৈরব ও চিত্রা নদীদ্বয় পূর্ব্বে সুন্দরবনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। ইহা এখন একেবারে মজিয়া গিয়া শস্যশ্যামলা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সাহনামা, আইন-ই-আকবরী, ও ফিরস্তার ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া আমরা এই সত্যে উপনীত হই। আমার বিবেচনায় এড়ুমিশ্রের কারিকার মতে (কঙ্কস্ত পূর্ব্বসীমায়াং চিত্রা যত্র বিরাজতে)” প্রাচীন কঙ্কদ্বীপের পূর্ব্বদিক দিয়া চিত্রা প্রবাহিত হইত। চিত্রার আসল মোহানা, যাহা সুন্দরবন হইয়া কঙ্কদীঘী, কঙ্কদ্বীপ, কঙ্কগ্রাম প্রভৃতি গ্রাম হইয়া প্রবাহিত হইত, তাহা বহুকাল হইতে মোগল সম্রাট বাদসাহ আকবরের রাজত্বকালীন মজিয়া গিয়া শস্যশ্যামলা উর্ব্বরা ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে ২৪ পরগণার বারুইপুর, জয়নগর প্রভৃতি অঞ্চলের গঙ্গার মজা অস্তিত্ব এখনও নিম্নস্তরের গাছ, বাটী, গণ্ডগ্রাম প্রভৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু চিত্রা ক্ষুদ্র নদী বিধায় তাহার অস্তিত্ব পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ধান্যক্ষেত্রের সহিত মিশিয়া গিয়া মনুষ্যের স্মৃতিপট হইতে চিরকালের মত মুছিয়া গিয়াছে। আমার বিবেচনা হয় যে, মাহিষ্যগণের কঙ্করাজ্য এই সুন্দর বনের মধ্যে কোন বিশেষ সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। এই কঙ্করাজ্য যে বিশাল পরিধিযুক্ত-নদীয়া জেলা হইতে আসমুদ্র সুদূর ২৪ পরগণার দক্ষিণস্থিত সুন্দরবনের কঙ্কদ্বীপ, কঙ্কনদী ইত্যাদি পূর্ব্ব লিখিত গ্রামগুলি আলিঙ্গন করিয়া বিস্তৃত ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ যেখানে বন, দুই তিন

শতাব্দী পূর্ব্বে সেইটী যে এক সমৃদ্ধিশালী বহু জনাকীর্ণ সৌধাবলী-শোভিত নগর ছিল না, তাহা কে বলিতে পারে? সুন্দরবনের ভিতর নবাবিষ্কৃত ভগ্নাবশেষ স্তূপাবলী, ভগ্নমন্দির ইত্যাদির দ্বারা অনেক নব নব ঐতিহাসিক তথ্য প্রচারিত হইতেছে। আমার অনুমান হয় যে, নদীয়া জেলার কাঁকটী পরগণা হইতে সুদূর সুন্দরবনের পূর্ব্বপ্রান্তঃসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূভাগ কঙ্ক-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই কঙ্করাজ্যের উল্লেখ আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। রাজা সিংহবাহু ক্রমে পদোন্নতি লাভ করিয়া বাদসাহের দরবারে একজন মহা সম্ভ্রান্ত ওমরাহ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। বাদসাহ তাঁহার কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজা মানসিংহের সহিত তাঁহাকে বাঙ্গালা দেশ জয়ের সময় পাঠাইয়াছিলেন।

মহারাজা টোডরমল্ল ও মানসিংহের উদ্যোগে বঙ্গের পাঠান রাজত্বের উচ্ছেদ এবং বাঙ্গালা দেশ মোগল করকবলে কবলিত হইবার পর, বাদসাহের আদেশে রায় সিংহবাহু সামন্ত দেওকে পূর্ব্বলিখিত বিশাল কঙ্করাজ্যের কতকাংশ দিয়া তাঁহাকে রাজা উপাধি এবং চামর, মুকুট, ডঙ্কা ইত্যাদি রাজচিহ্ন দ্বারা ভূষিত করিয়া ফারমান ও সনন্দ প্রদান করেন। সিংহবাহু রাজার রাজত্ব মহিষগোঠ, কঙ্কদীঘী, কঙ্কনদী, কঙ্কদ্বীপ প্রভৃতি গ্রাম লইয়া গঠিত, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাহিষ্য-সমাজ-সম্পাদক বলেন, ভবানীপুরের প্রখ্যাত জমীদার বাবু বরদাপ্রসাদ রায়চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষ বাবু কেশবলাল রায়চৌধুরী দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ৩০০ ব্রাহ্মণ পরিবার তাঁহার জমিদারী মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। ইহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। কারণ; তাঁহারা যে রাজা সিংহবাহুর সময় হইতে মহিষগোঠ, মাহিষ্য রাজমণ্ডল, কঙ্কদ্বীপ প্রভৃতি পঞ্চশত গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন, তাহা কোন্ ঐতিহাসিক অস্বীকার করিবেন? বাবু কেশবলাল রায় মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে কতিপয়ের নৈষ্ঠিকতা এবং কার্য্যকারিতায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মোত্তর দান করেন এবং অশেষ প্রকারে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন। এই সকল ঐতিহাসিক কাহিনী মাহিষ্যসমাজ পত্রিকায় সবিশেষ বিবৃত আছে। এক দফায় এগার শত বিঘা নিষ্কর জমি নিম্নলিখিত চৌহদ্দিভুক্ত মতে পূর্ব্বোক্ত বাদসাহ সাহ আলম তাঁহাদের রাজভক্তি, সাহসিকতা, উপস্থিতবুদ্ধি প্রভৃতি গুণে সন্তুষ্ট হইয়া সিংহ সামান্ত রাজগণকে প্রদান করেন। ইহার চৌহদ্দি উত্তরে বাদার খাল, পশ্চিমে বকুলতলার খাল, দক্ষিণে এবং পূর্ব্বে লোণাগাঙ্গ এবং সমুদ্র।

মুর্শিদাবাদের নবাব মোবারিক্ উদ্দৌলা বাদসাহ-প্রদত্ত উপরোক্ত সনন্দ ও ফারমান পত্র দৃষ্টে ১নং নকল বহিতে ৩২৫ নং ছাড় পত্র সূত্রে বিগত ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর তারিখে রাজা মধুসূদন সিংহদেব সামন্তরায়কে নিজ সহিযুক্ত ছাড় পত্র দিলেন। ঐ ছাড়-পত্রে তাৎকালীন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার ইংরাজ গভর্ণর লর্ড ক্লাইভ্ ১২ই আগষ্ট, ১৭৬৫ খ্রীঃ দেওয়ানী ভার গ্রহণ করিয়া ঐ ছাড়-পত্রে সহি করিয়া দিয়া অব্যাহতি দিলেন। তৎপরে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখে বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ ওয়ারেন্ হেষ্টীংস্ বাহাদুর পুনরায় ঐ ছাড়-পত্র দৃষ্টে নিজ সহিযুক্ত করিয়া ঐ রাজ্যাংশ

ছাড়িয়া দেন। পুনশ্চ লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে যখন দশশালা বন্দোবস্ত বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি ঐ প্রাচীন রাজ্যাংশ জয় করিলে রাজা মধুসূদন সামন্ত দেবরায় বাহাদুর উপরোক্ত প্রাচীন ছাড় ও ওয়াগুজাস্ত পত্রগুলি তৎসমক্ষে পেশ করিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র সামন্ত দেবরায় গভর্ণর লর্ড কর্ণওয়ালীশ বাহাদুর বিলাতের রাজা তৃতীয় জর্জবাহাদুরের সহি মোহরযুক্ত ফারমান আনাইয়া, তাহার উপর স্বয়ং নিজ সহিযুক্ত করিয়া ১৭৯১ খ্রীঃ ১৫ই জানুয়ারী তারিখে জেলার কর্ম্মচারী বিপলণ্ট সাহেব ও রামতনু বসু, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নামীয় আমলাগণের সহিযুক্ত ছাড়পত্র দেন। ঐ ছাড় ও ওয়াগুজাস্ত গুলির বলে রাজা হরিশ্চন্দ্র সমস্ত কালেক্টরীর সেরাস্তায় নিজ নামজারী করিয়া লয়েন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই বরাবর গদী পাইয়া থাকেন, এবং ইঁহারা ১৫ দিন অশৌচধারী। ইঁহাদের ছাড়ে লিখা আছে যে, এই রাজদত্ত জমী সম্বন্ধে কোন দাবী দাওয়া তমাদী হইবে না। কোনরূপ রাজ্য হইতে রাজ সরকার দ্বারা বেদখল হইলে প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট আবেদন করিলে বিলাতের ক্রাউন্ আফিসের রাজার খাস হুকুম ও নব ছাড়পত্র আনাইয়া দিবেন। তাহা যদি না দেন, তাহা হইলে নয় কোটি সিক্কা টাকা চাহিবা মাত্র দিবেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক সর্ত্ত ঐ ছাড়পত্রে সংযোজিত আছে।

এখন বেশ দেখা যাইতেছে যে, লাটকঙ্করাজ্য প্রাচীন মাহিষ্য রাজ্য ছিল, এবং এইখানেই ঐ জাতি বহুকাল পর্য্যন্ত আধিপত্য সংরক্ষণ করে।

প্রাচীন ময়না রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র ছিলেন। তাঁহার বিষয় মৎপ্রণীত মাহিষ্য-প্রকাশ প্রথম ভাগ গ্রন্থে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছি। ময়নাগড়ের রাজবংশ সবঙ্গ পরগণান্তর্গত বালিসীতা গড়জাত ভূপতিগণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটাগত মাহিষ্যজাতীয় গজপতি বংশোদ্ভব গঙ্গাবংশীয় চুড়ঙ্গদেব উৎকলে বিশাল রাজ্য বিস্তার করেন। রাজা কালিন্দীরাম সামান্ত তাঁহার একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বালিসীতা-গড়ের তিনিই আদি প্রতিষ্ঠাতা। গঙ্গাবংশীয় রাজা অনঙ্গ ভীমদেব কর্ত্তৃক ৺জগন্নাথ দেবের বিশাল মন্দির ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। (গৌড়ে ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ দেখ)।

ময়না-রাজবংশাবলী পাঠ করিলে বেশ জানা যায় যে, উৎকল-রাজ চুড়ঙ্গদেবের আত্মীয় সেনাপতি কালিন্দীরাম সবঙ্গ পরগণায় রাজত্ব করিতেন এবং নিয়মিত রাজকর প্রেরণ করিয়া সতত রাজানুগত থাকিতেন। পরে রাজপুত বংশীয় উৎকল রাজ দেবরাজের রাজত্বকালে রাজা কালিন্দীরাম নিয়মিত রাজকর প্রেরণ না করায়, দেবরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত সৈন্যদ্বারা যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দীকৃত হইয়া উৎকলে নীত হন। ময়নার ভূপতিগণ শক্তিসম্পন্ন রাজা ছিলেন। আমার বিবেচনা হয় যে, গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্রের ন্যায় স্বাধীন রাজার সঙ্গে যবন-সংঘর্ষ হইলে অবশ্যই কোন খানে তাহার উল্লেখ থাকিত। কিন্তু ইতিহাস-পৃষ্ঠায় তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাহা হইলেই বেশ দেখা যাইতেছে যে, যবন-কেন্দ্রের বহির্ভাগে এবং তাহাদের বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বে রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ মেদিনীপুরের মধ্যে ময়নার

রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে একাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ময়না-রাজবংশকে শক্তিসম্পন্ন ভূপতিবৃন্দ বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের কোন আপত্তি দেখিতে পাই না। বর্ত্তমান রাজার প্রপিতামহ রাজা আনন্দানন্দ বাহুবলীন্দ্রের ইংরাজাধিকার কালেই মৃত্যু হইলে তদীয় পিতা রাজা জগদানন্দের শেষ জীবনে এই প্রদেশ কোম্পানি বাহাদুরের করকবলিত হয়। সুতরাং রাজা আনন্দানন্দ কেবল মাত্র সপ্তবর্ষ বয়স্ক এক পুত্রকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া স্বর্গাধিরোহণ করিলে, অসহায় রাজকুমারকে সহৃদয় কোম্পানি বাহাদুরই রক্ষা করিয়া এবং তাঁহার নিকটস্থ আত্মীয় মহারাজ গোপাল ইন্দ্রনারায়ণকে তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া রাজ্য রক্ষা করিয়া দেন। নাবালক রাজা রাধাশ্যামানন্দ অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন, কিন্তু ঐ রাজকুমারের প্রতিভা ক্রীড়া করিবার কোনও স্বাধীন রঙ্গভূমি প্রাপ্ত হয় নাই। মহাত্মা হণ্টার এই রাজা সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন যে, রাজা একজন অপ্রাকৃত মানব ছিলেন, (The Raja was a superior man) যাঁহারা আবহমান কাল হইতেই মানবের উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের একটী বংশধর যে অপ্রাকৃত মানব হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে !! রাজা গোপাল ইন্দ্রনারায়ণ রাজা রাধাশ্যামের রক্ষক নিযুক্ত হইয়া কর্ত্তব্যপালন করিতে পারেন নাই। যদি সুজামুঠা ও গড়বেতা তৎকালে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারিত, তাহা হইলে পূর্ব্বকালে যোধপুর-নৃপতি উদয়পুরের শিশুরাজার রক্ষক হওয়াতে যেরূপ উভয় কুলে শোণিতপাত হইয়াছিল, এই বঙ্গীয় রাজন্য ভূমিতেও তাহাই সংঘটিত হইত। সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে উভয়েই কোম্পানি বাহাদুরের করতলগত হইয়াছিল। (৺গদাধরের কুলজির ১৭২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । রাজা কৃপানন্দের পুত্র রাজা জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্রের শেষ অবস্থায় এই সকল প্রদেশ মুরশিদাবাদের সম্পর্কে কোম্পানীর হস্তগত হয়। মহাত্মা রাজা জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র প্রবলপ্রতাপ গড়জাত ছিলেন। পলাশী যুদ্ধের অবসানে যে অরাজকতা ঘটে, তৎকালে তিনি অপ্রতিহত ভাবে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। তদীয় পুত্র রাজা ব্রজানন্দ বাহুবলীন্দ্রের সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তদীয় রাজ্য বন্দোবস্তের অধীনে আনয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ বন্দোবস্ত গড়জাতগণ কোন কালেই বুঝেন নাই।

মেদিনীপুরের পশ্চিম ভাগের বন্য প্রদেশীয় রাজগণ হইতে যে কর পাওয়া যাইত, তাহাদিগকে বশীভূত রাখিবার ব্যয় তাহা হইতে অধিক হইত। বোধহয় এই সকল কারণেও কোম্পানী বাহাদুর আর এই রাজাকে একটী করদরাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন নাই। যদি তৎকালে কর্ণেল টডের (Colonel Todd) ন্যায় কোন মহাত্মা ইঁহাদের কাহিনী কোম্পানীর কর্ণগোচর করিতে পারিতেন, তবে বোধ হয়, ইংরেজ বাহাদুর ইহাদিগকে পূর্ব্বগোচর হইতে বঞ্চিত করিতেন না। ইংরেজের দয়া উদ্রিক্ত না হইলে উড়িষ্যায় করদ নৃপতিগণ ও ভারতের রাজপুত রাজন্যগণ কি স্বস্ব পৈত্রিক রাজ্য ও গৌরব আজ পর্য্যন্তও রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন? মাহিষ্য রাজগণ কোম্পানী বাহাদুরকে যে নিজের কথা

জানাইতে পারেন নাই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ময়নাগড়ের রাজগণ নিজ নিজ রাজ্য রক্ষার্থে কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোনকালে নাম করিবার যোগ্যরূপে অস্ত্রধারণ করেন নাই, কিন্তু পুনঃ পুনঃ স্বকীয় দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়া নিজকে নিরাপদ মনে করিয়াছেন। আমরা বুঝি যে, রাজার এই কার্য্য উন্মত্ততা মাত্র; কিন্তু এই বীরজাতি-সুলভ উন্মত্ততা রাজগণ অতি সহজেই যে ত্যাগ করেন নাই, তাহা মহাত্মা হণ্টার, বেলী প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যে বন্দোবস্তের নাম শ্রবণে ক্রীতদাস বাঙ্গালী লালা-সংযুক্ত জিহ্বায় কৃতাঞ্জলীপুটে আবেদন করিত, সেই বন্দোবস্তের নাম শ্রবণে ময়নাগড়ের স্বাধীন ভূপতি কেন যে বিদীর্ণ-হৃদয় হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বৃটিশসিংহের বিরুদ্ধে ঘন ঘন দুর্গ দ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কি পাঠককে বুঝাইয়া দিতে হইবে?

আমার বোধ হয় যদি প্রথম অবস্থায় ময়নাগড়ের বা তমলুকের রাজগণ তাহাদের অতীত কাহিনী ও প্রাচীনত্ব যথোচিতরূপে কোম্পানীর কর্ণগোচর করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের পূর্ব্বগৌরব স্থির ও অক্ষুণ্ণ থাকিত। যে কোম্পানী বাহাদুরের কৃপাকটাক্ষে গোলাপসিংহের বংশধরগণ কাশ্মীরের ন্যায় স্বর্গ অদ্যাবধি ভোগ করিতেছেন, যে সহৃদয় ইংরেজ রাজার কৃপায় ইন্দর-রাজ রাণা প্রতাপসিংহ বলিয়া পরিচিত, যে রাজার দয়ায় আমরা প্রজাবর্গ সকল সুখ ও শান্তি ভোগ করিতেছি, যে রাজার কণামাত্র অনুগ্রহে এক কথায় গোয়ালিয়র-রাজ ভরতপুরের ন্যায় অজেয় ও দুর্ভেদ্য দুর্গ ফেরত পাইলেন, যাহাদের কৃপাকটাক্ষে কত বিশাল রাজ্য উন্নত ও অবনত হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহাদের ইচ্ছা হইলে দয়া করিয়া তমলুক ও ময়নাগড়ের ন্যায় প্রাচীন ক্ষুদ্র রাজ্যকে বিস্মৃতির পঙ্ক হইতে উত্তোলন করিয়া তত্তৎ স্থানীয় রাজগণকে ঐ ক্ষুদ্র রাজ্য ভিক্ষাও দিতে পারিতেন। আমাদের গুণগ্রাহী সম্রাটের পূর্ব্বপুরুষগণ যে এরূপ দান বহুবার করিয়াছেন, ইতিহাস-পৃষ্ঠায় তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন অনেক আছে। রাজাদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহারা সহৃদয় রাজপ্রতিনিধির নিকট এ বিষয় জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, এইরূপ বন্দোবস্তের হঠযোগে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই সমগ্র বঙ্গদেশ ময়নাগড় রাজগণের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; তৎপর ময়নাগড়ের বহুস্থান ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অতঃপর হইতেই তমলুক রাজগণের ন্যায় ময়নার রাজগণও হতশ্রী হইয়া ময়ণাগড়ে দীনভাবে কালযাপন করিতেন। ময়নারাজ তমলুক রাজবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে তমলুকের অনেক পুরাতন কাগজপত্র, দলিল সনন্দাদি ময়নার-রাজগণ দ্বারা অপহৃত হইয়া নষ্ট হইয়াছে। তাহাতে তমলুকরাজগণের যে বিষম অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, তাহা সংশোধনের আর উপায় নাই। তমলুকের ন্যায় ময়নারও বহু লবণকর ও জলপাই জমি কোম্পানী বাহাদুর দখল করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া উচিত। সরকার বাহাদুর ইহাদের দীনতার প্রতি কটাক্ষপাত করিলে সুখের বিষয় হয়।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

বিশ্বরূপ দর্শন।

"বিভূর্তে বৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ
দিদৃক্ষোরর্জ্জুনস্থাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥
দেবৈরপি সুদুর্দ্দশং তপোযজ্ঞাদি-কোটিভিঃ
ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥"

ন —

মোরে অনুগ্রহ তরে কহিলা আপনি,
অধ্যাত্ম সংজ্ঞিত গুহ্য পরম বচন,
তাহে মম মোহ এই হইল দুরিত। ১

হে কমলপত্র আঁখি! তোমার সকাশে,
শুনিলাম বিস্তারিত সৃষ্টিলয় কথা,
প্রাণীদের—আর তব মাহাত্ম্য অব্যয়। ২
এইরূপই বটে যাহা হে পরমেশ্বর,
বাখানিলা আপনাকে ; হে পুরুষোত্তম
দেখিতে বাসনা তব ঐশ্বরীয় রূপ। ৩

ওহে প্রভু যদি তুমি ভাবহ আমারে
সেরূপ দেখিতে যোগ্য—তবে যোগেশ্বর!
দেখাও আমারে তব স্বরূপ অব্যয়। ৪

শ্রীভগবান—

হের পার্থ! রূপ মম শত সহস্রেতে—
নানাবিধ অতি দিব্য নানাবর্ণযুত—
নানারূপ (কত আর) আকৃতি সংযুত। ৫

হের হে আদিত্যগণে বসু রুদ্রগণে
অশ্বিনী মরুতে—হের আশ্চর্য্য কতই
হে ভারত—কেহ পূর্ব্বে হেরে নাই হেন। ৬
গুড়াকেশ! হের আজ এই দেহে মম
একত্র সংস্থিত—সর্ব্ব চরাচর সহ
এ জগৎ—আর যাহা হেরিতে বসনা। ৭
কিন্তু তুমি তব এই নয়নের দ্বারা
নারিতে হেরিতে মোরে ; দিব্যচক্ষু তাই
দিলাম তোমারে—হের যোগৈশ্বর্য্য মম। ৮

সঞ্জয় —

হে রাজন! এইরূপ কহি তারপর
মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে তখন,
দেখালেন সে পরম রূপ ঐশ্বরীয়। ৯

কতই বদন তাহে—কত বা নয়ন—
অদ্ভুত দর্শন কত—কত দিব্য আর
আভরণ দিব্য কত উদ্যত আয়ুধ। ১০

দিব্য মাল্যাম্বরধারী, দিব্য গন্ধ আর
অনুলেপ সর্ব্ব অঙ্গে,—সকলই অদ্ভুত
সর্ব্বদিকে মুখে সেই - অনন্তদেবের। ১১
সহস্র সূর্য্যের প্রভা আকাশে উদয়
হয় যদি একেবারে, তবে হতে পারে
তাহা সেই মহাত্মার প্রভার তুলনা। ১২
নানাভাগে প্রবিভক্ত সমগ্র জগৎ
হেরিলা পাণ্ডব তাহা স্থিত একাধারে
সেথা সে দেব দেবের শরীর মাঝারে। ১৩
তখন বিস্ময়াবিষ্ট—হয়ে রোমাঞ্চিত,
প্রণমিয়া নতশিরে, করি কৃতাঞ্জলি
ধনঞ্জয় এইরূপ কহিতে লাগিলা :—১৪

দেখিতেছি দেব দেহেতে তোমার
সর্ব্বদেব সর্ব্ব ভূতগণ আর
ব্রহ্মা ঈশ—স্থিত কমল আসনে
সর্ব্ব ঋষি আর দিব্য সর্পগণে। .৫
অনেক উদর বাহু মুখ আঁখি
চৌদিকে অনন্ত রূপ নিরখি,
নাহি তব অন্ত মধ্য আদি আর
হেরি, ওহে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর। ১৬
তুমি গদা চক্র কিরীট-শোভিত,
তেজোরাশি—সর্ব্বদিক বিভাসিত,—
দীপ্তানল রবিদ্যুতি অপ্রমিত। ১৭

তুমিই অক্ষর জ্ঞাতব্য পরম
তুমি এ বিশ্বের পরম নিধান—
নিত্য ধর্ম্ম পাতা তুমিই অব্যয় –
তুমি সনাতন পুরুষ নিশ্চয় ।১৮

হরি—আদি মধ্য অন্ত বিরহিত –
তোমার—অনন্ত বাহু বীর্য্য যুত
শশি সূর্য্যনেত্র দীপ্তাগ্নি বদন
স্বতেজে সন্তপ্ত কর এ ভুবন ।১৯

স্বর্গ মর্ত্ত্য মাঝে, এই যে অন্তর,
একা ব্যাপ্ত তুমি,—সর্ব্বদিক আর
হেরি তব উগ্র এ রূপ অদ্ভুত
হতেছে মহাত্মা ত্রিলোক ব্যথিত। ২

এই সুরগণ তোমাতে প্রবেশে,
হয়ে কৃতাঞ্জলি কেহ ভয়ে তোষে
মহর্ষি সিদ্ধেরা ‘স্বস্তি’ কহি সবে
তব স্তুতি করে—উপযুক্ত স্তবে। ২১

রুদ্র আদিত্যেরা বসু সাধ্য যত,
বিশ্বদেব, অশ্বী উষ্মপা মরুত,
গন্ধর্ব্ব অসুর যক্ষ সিদ্ধগণ
হেরে সবে তোমা বিস্ময়ে মগন। ২২

বহু মুখ আঁখি উরু ও চরণ,
বহু বাহূদর করাল দশন—
হেরি মহাবাহু ! এরূপ মহান,
আমি ও এলোক ভয়েতে মগন ।২৩

নভস্পর্শী দীপ্ত অনেক বরণ—
ব্যাপ্তমুখ—দীপ্ত বিশাল নয়ন,
অতিভীত চিত্ত তোমারে নেহারি
ধৈর্য্য শান্তি বিষ্ণো ! লভিতে না পারি। ২৪

কত সুখ তব দশনে করাল—
নেহারি দেবেশ ! সম কালানল—
হই দিশাহারা—সুখ দূরে যায়
তুষ্ট হও দেব ! জগৎ-আশ্রয়। ২৫

এই সব ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দল
সহ যত ওই ভূপতি মণ্ডল,
কর্ণ-সূতপুত্র আর ভীষ্ম দ্রোণ—
সহ আমাদের (ও) সেনানী প্রধান। ২৬

তব ভয়ানক করাল দশন
বদনে পশিছে অতি বেগবাণ
কেহ দেখা যায় বিচূর্ণিত শিরে,
রয়েছে বিলগ্ন দশন অন্তরে। ২৭

বহু বারি বেগ নদীর যেমতি
ধেয়ে সিন্ধুপানে প্রবেশে—তেমতি
পশিছে—এসব বীর নরবর
সর্ব্বত্র জ্বলন্ত বদনে তোমার। ২৮

প্রদীপ্ত পাবকে পতঙ্গ যেমতি
পশে নাশ হেতু—অতি বেগে গতি,
তেমতি প্রবেশে বিনাশের তরে
লোক—তব মুখে অতি বেগ ভরে। ২৯

করিছ লেহন জ্বলন্ত বদনে
চারিদিক্ হতে গ্রাসি সর্ব্ব জনে।
ব্যাপিয়া তেজেতে এ জগৎ সব
সন্তাপিছে বিষ্ণো ! উগ্রদীপ্তি তব। ৩০

কহ—কে আপনি এ উগ্র আকার,
হও হে প্রসন্ন নমি দেববর,
জানিতে বাসনা কি আদি তোমার—
নাহি জানি তব কি প্রকৃতি আর। ৩১

শ্রীভগবান—

কাল আমি বৃদ্ধ—লোকক্ষয়কর
প্রবৃত্ত করিতে এ লোক সংহার
তোমা বিনা ওত রবে না জীবিত
প্রতি অনীকেতে যত যোদ্ধা স্থিত। ৩২

তবে উঠ তুমি যশোলাভ কর,
জিনি অরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য ভোগ কর,
আমা হ'তে পূর্ব্বে হত এ সকল
হও সব্যসাচি ! নিমিত্ত কেবল ।৩৩

দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ জয়দ্রথ আর
অন্য আর আছে যুদ্ধবীর যত যোদ্ধৃবর

হত আমা হতে ; যুঝ—নাহি ভয়,
নাশ সবে—রণে কর শত্রু জয় ।৩৪

সঞ্জয়—

কেশবের এই বচন শুনিয়ে
কাঁপিয়া কিরীটী—কৃতাঞ্জলি হয়ে
নমি পুনঃ কৃষ্ণে কহে গদগদ—
অতি ভীত হয়ে—হইয়া প্রণত ।৩৫

অর্জ্জুন—

উপযুক্ত বটে হৃষীকেশ !—তব
কীর্ত্তনে জগৎ—তুষ্ট রত সব ;
রক্ষগণ ভয়ে চৌদিকে পলায়
সিদ্ধগণ সবে প্রণমে তোমায় । ৩৬
কেন না মহাত্মা ! নমিবে তোমারে
শ্রেষ্ঠ তুমি ব্রহ্মা আদি কর্ত্তা পরে
অনন্ত দেবেশ ! জগৎ আধার
তুমি সদসৎ, পরম অক্ষর । ৩৭
তুমি আদিদেব পুরুষ পুরাণ—
তুমি এ বিশ্বের পরম নিধান,
জ্ঞাতা জ্ঞেয় তুমি—পরম সে ধাম,
ব্যাপ্ত বিশ্বরূপ অনন্ত মহান্ ! ৩৮
বায়ু যম অগ্নি শশাঙ্ক বরুণ—(ই)
প্রজাপতি পিতামহ পিতা তুমি
নমঃ নমঃ তোমা—সহস্র প্রণাম
পুনঃ বারবার তোমায় প্রণাম । ৩৯
নমি সম্মুখেতে আর পৃষ্ঠদিকে
হে সর্ব্ব ! তোমায় নমি সর্ব্বদিকে,
হে অনন্তবীর্য্য ! অমিত-বিক্রম,
সর্ব্বব্যাপী হও, সর্ব্ব সে কারণ । ৪০
সখা ভাবি ডাকি যে অবজ্ঞা ছলে
হে কৃষ্ণ, হে সখা, হে যাদব, বলে,
নাহি জানি হেন মহিমা তোমার,—
প্রমাদের বশে কিম্বা প্রেমে আর । ৪১
অবজ্ঞা করেছি—পরিহাস করে,
শয়নে আসনে ভোজনে বিহারে
হে অচ্যুত ! একা বা সম্মুখে কাহার—
সপ্রজ্ঞেয় ! ক্ষম সে সব আমার । ৪২
এই সরাচর লোক সবাকার
তুমি পিতা, পূজ্য শ্রেষ্ঠ গুরু আর ।
নাহি তব সম, কে অধিক তব,
লোকত্রয়ে ওহে অতুল্য প্রভাব । ৪৩
তাই নমি দেব ! দেহ নত করে
ঈশ স্তুত্য করি প্রসন্ন তোমারে ;
পিতা পুত্রে ক্ষমে সখাষ সখারে
প্রিয় প্রিয়জনে,—ক্ষম তথা মোরে । ৪৪
এ অদৃষ্টপূর্ব্ব নেহারি হৃষিত—
কিন্তু ভয়ে মন বড়ই ব্যথিত ;
তাই হে দেবেশ ! জগৎ নিবাস !
তুষ্ট হয়ে কর—সেরূপ প্রকাশ ।৪৫
গদা চক্র হস্ত কিরীটী তোমার
সেরূপ দেখিতে বাসনা আমার—
হে সহস্রবাহু ! বিশ্বরূপ ! তব
চতুর্ভুজ রূপে হও আবির্ভাব । ৪৬

শ্রীভগবান—

তুষ্ট হয়ে আত্মযোগে হে অর্জ্জুন
দেখানু তোমারে যেরূপ পরম
আদি-অন্তহীন বিশ্ব-তেজোময়ী
তোমা বিনা কারও পূর্ব্ব-দৃষ্ট নয় । ৪৭
বেদ যজ্ঞ অধ্যয়নে কিম্বা দানে
ক্রিয়া কিম্বা উগ্র তপস্যা সাধনে—
কুরুবীর ! হেন হেরিতে আমাকে
তোমা বিনা কেহ নারে নরলোকে । ৪৮
হয়োনা ব্যথিত বিমূঢ়-অন্তর
হেরি ঘোররূপ ঈদৃশ আমার
প্রীতমনে হয়ে নির্ভয় আবার
এই সেইরূপ নেহার আমার । ৪৯

সঞ্জয়—

বাসুদেব ইহা কহি অর্জ্জুনেরে
নিজ রূপ পুনঃ দেখালেন তারে ;

পুনঃ সে মহাত্মা সৌম্যরূপ ধরে
দিলেন আশ্বাস ভীত অর্জ্জুনেরে।৫৫

অর্জ্জুন—
হেরি তব এই সৌম্য মানবের রূপ
ওহে জনার্দ্দন! হল পুনর্জ্জন্ম লাভ,
হইলাম প্রকৃতিস্থ সুস্থির অন্তর। ৫১

শ্রীভগবান—
দর্শন-দুর্ল্লভ অতি এরূপ আমার
হেরিলে যা তুমি এবে, দেবতা নিশ্চয়
সেরূপ দেখিতে নিত্য করে অভিলাষ।৫২
বেদ পাঠ তপ দান কিম্বা যজ্ঞ করি
এইরূপে কেহ মোরে নারে হেরিবারে—
যেরূপে আমায় তুমি হেরিলে এখন। ৫৩
অনন্যভক্তির বলে কিন্তু হে অর্জ্জুন!
এইরূপে পারে শুধু আমারে জানিতে—
হেরিতে—ও স্বরূপেতে করিতে প্রবেশ।৫৪
যেই মম কর্ম্মকারী, আমা-পরায়ণ,—
আমা ভক্ত—হে পাণ্ডব! আসক্তি-বর্জ্জিত,
সর্ব্বভূতে বৈরহীন—সে পায় আমারে।৫৫

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

সুবিখ্যাত কবি বরদাচরণ মিত্র।

জন্ম—১২৬৮সাল—১লা মাঘ, ইং ১৮৬২ খ্রীঃ—১৩ই জানুয়ারী।
মৃত্যু—১০ই আষাঢ়, সোমবার, রাত্রি ১টা, ইং ১৯১৫—২৮শে জুন

কায়স্থ-কুলের মিত্রবংশ বাঙ্গালার গৌরব জষ্টিস দ্বারকানাথ ও রমেশচন্দ্র এবং সাহিত্যিক দীনবন্ধু প্রভৃতি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। এই বংশে সম্মানিত বরদাচরণ জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে এ দেশের যে অনিষ্ট হইল, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবে না। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী এই,—

কলিকাতার অধীন কুমারটুলিস্থ বনমালী সরকারের ষ্ট্রীটের বাড়ীতে কায়স্থকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা, সম্মানিত বেণীমাধব মিত্র মহাশয় কষ্টম হাউসের ইমপোর্ট বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। আজিও তথায় তাঁহার প্রতিকৃতি আছে। আদিতে এই মিত্রবংশ নদীয়া জেলার অধীন চাকদায় ছিলেন। ২০০ বৎসর হইল এইবংশ কুমারটুলিতে আছেন।

বরদাচরণ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে, ১৮৭৬ পর্য্যন্ত হেয়ার স্কুলে এবং ১৮৮২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। এ-ফে পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান অধিকার করেন, ১৮৮১ খ্রীঃ বি-এ পরীক্ষায় তৃতীয় ও ১৮৮২ খ্রীঃ এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম হইয়া ১০০৲ মূল্যের পুস্তক এবং সোণার মেডেল প্রাপ্ত হন। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা ৩ দিন দিবার পর দারুণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন, সুতরাং উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ১৮৮৪ খ্রীঃ ইউনিভারসিটি কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক হন। তিনি সি, এস, টনি সাহেবের বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৮৮৫ খ্রীঃ বরদাচরণকে ঢাকা কলে-

জের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু বরদাচরণ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টাটুটারি সিবিল সার্ব্বিশ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হওয়ায় সে পদ গ্রহণ করিতে পারেন না। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পাবনার এসিস্‌টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তৎপর ময়মনসিংহের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পরে ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তৎপর ত্রিপুরার কালেক্টর ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পলিটিকেল এজেণ্ট হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মেঘদূত ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরা হইতে উড়িষ্যার সেটেলমেণ্ট অফিসার হন এবং কার্য্যসাধন জন্য মধ্য প্রদেশে প্রেরিত হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বীরভূমের অস্থায়ী জজ হন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ফরিদপুরের অস্থায়ী এবং পরে স্থায়ী জজ হন। এই কাজে তাঁহাকে রংপুর, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, নদীয়া, কটক, যশোহর, খুলনা, বাকুঁড়া, মানভূম, সিংহভূম, মুর্শিদাবাদ, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে থাকিতে হয়। বীরভূম হইতে হুগলি বদলি হন। বীরভূম থাকার সময় জয়দেবের লীলাভূমি কেন্দুবিম্ব এবং কবি চণ্ডীদাসের জন্মভূমি “নান্নুর” পরিদর্শন করেন ও উভয় স্থানের মন্দির সংস্কারের ভার গ্রহণ করেন।

তিনি ভারতী, সাধনা, নব্যভারত, নবপ্রভা, প্রবাসী, প্রভৃতি পত্রিকায় লিখিতেন। থিয়জফিষ্ট, রেজ ও রায়ত, ইণ্ডিয়ান নেসন, কলিকাতা রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় ইংরাজিতে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইংরাজি কবিতা লিখিবারও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ইংরাজি লেখার এবং রমেশচন্দ্র তাঁহার বাঙ্গালা লেখার বিশেষ প্রশংসা করিতেন।

হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তকুলের কাশীনাথ দত্তের পৌত্রী তাঁহার সহধর্ম্মিণী। হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র তাঁহার পিশশ্বশুর ছিলেন; তাঁহার ৫ পুত্র ও ৫ কন্যা। জ্যেষ্ঠ হিরণ্যচন্দ্র হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, সম্প্রতি চিফ্‌জষ্টিস মহোদয়ের অনুকম্পায় মুন্সেফ হইয়াছেন। হুগলি হইতে অসুস্থ হইয়া ছুটী লইয়া কুমারটুলি আসিয়াছিলেন এবং সেইখানে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তিনি কায়স্থ সভার একজন প্রধান পরিচালক ছিলেন।

বরদাচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। তাঁহার উজ্জ্বল বিস্ফারিত নয়ন দুটী তদীয় অনন্য-সাধারণ প্রতিভার জয় সর্ব্বদা ঘোষণা করিত। প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একাধারে স্থান পাইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষানুরাগ, তাঁহার অধ্যবসায় তাঁহাকে কৃতিত্বের উচ্চমঞ্চে তুলিয়াছিল। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা তাঁহার গবেষণার সহচর ছিল, আমাদের দেশের সমাজে লালিতপালিত হইয়াও শিক্ষা, দীক্ষা, প্রতিভা ও জ্ঞানে তিনি সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের আদর্শ হইয়াছিলেন। তিনি চাকুরীকে জীবনের সম্বল করিয়াছিলেন। চাকুরী করিতে যাইয়া তিনি সহৃদয়তা এবং নিরপেক্ষতা কখনও হারাণ নাই। তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, সেখানকার সকলেই তাঁহার সহৃদয়তা এবং নিরপেক্ষতা দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া যাইত। প্রভুত্ব-পরায়ণতা তদীয় জীবনে কখনও দেখা যায় নাই—তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলকে তিনি মোহিত করিতেন। চাকুরী করিতে যাইয়া এ দেশের আর কোন ব্যক্তি তাঁহার ন্যায়

যশ পাইয়াছেন কিনা, আমরা তাহা জানি না। আমরা আশা করিতেছিলাম, তিনি অচিরে হাইকোর্টের জজ হইবেন; কিন্তু কালের দুর্লঙ্ঘ্য প্রহারে আমাদের আশা হত হইল। আমাদের এবং এদেশের এ দুঃখ কখনও ঘুচিবে না।

তিনি চাকুরী করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন সাহিত্যের উন্নতিতে নিবদ্ধ ছিল। তিনি সকল সময়ে শুধু সাহিত্যের উন্নতির চিন্তা করিতেন। বাঙ্গালা-ভাষা তাঁহার নিকট ঋণী, একথা বলিলে তদীয় জীবনের সব কথা বলা হয় না। তিনি আশা করিয়াছিলেন, পেন্সন প্রাপ্তির পর ভাল করিয়া মাতৃভাষার সেবা ও পরিচর্য্যা করিবেন। তাঁহার লেখা যেন অমৃতের খনি, যিনি মেঘদূত বা অবসর পড়িয়াছেন, তিনিই এ কথার সাক্ষ্য দিবেন। তাঁহার লেখা প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ, সরস এবং ভাবপূর্ণ। প্রতি নিবন্ধে তাঁহার চরিত্র ফুটিয়া বাহির হইত। মেঘদূতের অনেক অনুবাদ হইয়াছে, অনেক অনুবাদ আমরা পড়িয়াছি, কিন্তু তাঁহার অনুবাদের ন্যায় বিশুদ্ধ, প্রাণস্পর্শী, সরল, যথাযথ অনুবাদ আর পড়ি নাই। তাঁহার "জগদ্ধাত্রী" কবিতা সাময়িক পত্রে বাহির হইয়াছিল। সেরূপ কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই বাহির হইয়াছে। তাঁহার কবিতার সমালোচনার এ স্থান নয়, নচেৎ আমরা দেখাইতে পারিতাম, বিশুদ্ধতায়, সরসতায়, ভাব-মাধুর্য্যে এবং শিল্প-নৈপুণ্যে বাঙ্গালার যে কোন কবির সহিত তাঁহার লেখার তুলনা হইতে পারে। তাঁহার কবিতা এদেশে অক্ষয় হইবে।

ইংরাজি লেখায়ও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। কলমের জোরে তিনি অনেককে মোহিত করিতেন। লালবিহারী, শম্ভুচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্যক্তির সহিত তাঁহার ইংরাজি লেখার তুলনা হইতে পারে।

তিনি স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের কাজ করিতেন বলিয়া প্রকাশ্য সভা সমিতিতে যোগ দিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু কায়স্থ-সভায় তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কায়স্থ সভার যে উপকার হইয়াছে, তাহা চিরদিন তাঁহাকে সম্মানিত করিবে।

তাঁহার নিজ সম্পত্তি তাহার চরিত্র—প্রেম-পুণ্যে তিনি অজেয় ছিলেন। তিনি আদর্শ পুত্র, আদর্শ পিতা, আদর্শ বন্ধু। তাঁহার পিতৃমাতৃ-ভক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃ-ভক্তির সহিত তুলিত হইতে পারে। তাঁহার ভালবাসা সর্ব্ব শ্রেণীকে স্পর্শ করিত, তিনি যাঁহাকে একবার ভালবাসিয়াছিলেন, জীবনে তাঁহাকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি কত লোকের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার ভালবাসার পাত্র ছিলাম, আমাদের অনুরোধে তিনি বহু লোকের উপকার করিয়া তাঁহাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানে আমরা যারপর নাই বেদনা পাইয়াছি। তাঁহার চরিত্র আমাদের আদর্শ, তাঁহার নিরহঙ্কার মূর্ত্তি আমাদের শিক্ষাস্থল, তাঁহার বিনম্র সদয় ব্যবহার আমাদের উপভোগ্য, তাঁহার জীবনের তপস্যা আমাদের অনুধ্যেয় ছিল। এরূপ গুণী মানী, সর্ব্বশ্রেণীর পূজ্য, গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের উপাধি পান নাই কেন, তাহা প্রহেলিকা-পূর্ণ। তাঁহার তিরোধানে আমরা ম্রিয়মাণ, এদেশের সাহিত্যিকগণ বন্ধুহারা, কর্ম্মিগণ অঙ্গহারা, কায়স্থ-সভা

সহায়-হারা। তাঁহার কথা যত ভাবি, ততই বুক ফাটিয়া যায়—নয়ন হইতে অশ্রুপাত হয়। মনে হয়, তাঁহার যোগ্য যেন শুধু তিনিই ছিলেন। তিনি এদেশের যে স্থান শূন্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে শীঘ্র পূর্ণ হইবে, সে আশা নাই। বিধাতা তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন ও শোকদগ্ধ পরিবারে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

মথুরা-বৃন্দাবন।

শ্রীযুক্ত শ্রীম-কথিত কথামৃতে মহাত্মা **রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের** বৃন্দাবন দর্শন ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করিয়া,একসময়ে বৃন্দাবন যাইবার জন্য আমি উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলাম। তল্পীতল্পাও বাঁধিয়াছিলাম ; কিন্তু সে সময় বৃন্দাবনদর্শন সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। কেন ?—তার উত্তর দিতে আমি অক্ষম। সুতরাং এবার যখন হরিদ্বার যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, তখন বৃন্দাবন দেখিয়া যাইব বলিয়াও দৃঢ়সংকল্প করিলাম। আগ্রা হইতে অতি প্রত্যুষে মথুরার গাড়ীতে উঠিলাম। যুগপৎ কতশত চিন্তা আসিয়া আমার সমস্ত হৃদয়টাকে উদ্বেলিত করিয়া ফেলিল, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। স্বভাবের শোভার কথা কিছুই বলিব না। কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে তুমুল লড়াই বাঁধিয়া গেল। বাস্তবের অভিঘাতে পাছে বা কল্পনা-পরিকল্পিত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সম্ভোগে বঞ্চিত হই, তাই থাকিয়া থাকিয়া নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক কল্পনাকে জোড়ে আকৃড়াইয়া রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইলাম। কিন্তু আমার শতচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া পরিশেষে বাস্তবই বিজয়মাল্যে পরিশোভিত হইয়া আমার নয়ন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কি এক যাদুমন্ত্রে অপ্সরা-রাজ্য নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি মথুরা ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম।

তীর্থ-গুরুবৃন্দের নিয়োজিত চেলা-বাহিনীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বেশ একটা বাহাদুরী লইবার অভিপ্রায়ে আগন্তুক-সুলভ ইতস্ততঃ-দর্শন-লোলুপ নেত্রযুগলকে সংযত করিলাম : স্বচ্ছন্দ-মন্থর-গমনে পথ বহিয়া সহরের রাস্তায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তারপর যে মুহূর্ত্তে 'বাজিমাৎ' ভাবিয়া আমি আপন মনে একটুকু শ্লাঘা অনুভব করিতে লাগিলাম, অমনি থতমত খাইয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমার পুরোভাগে সুগোল সুঠাম-নধর-দেহ আতপত্রসহ এক যুবক আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, 'বাবু আপ্‌কো-নাম ক্যা হ্যায় ? What is your name ? what country, what country Babu, you Babu ? I, poor Panda, you richman Babu. ইত্যাদি অসংখ্য হাস্য-রসোদ্দীপক, শ্রবণ-সুখকর অর্থহীন প্রশ্নবাণ গোবেচারী আমার উপর অজস্র ভাবে বর্ষণ করিতে লাগিল। আমি মনে ভাবিলাম, লোকে পুলিশের গোয়েন্দার হাত এড়াইতে পারে, আমি এই ছাতুখোর লোকগুলির হাত এড়াইতে পারিলাম না ? আমি নিতান্তই মূর্খ। আমি যখন একম্বিধ কল্পনায় নিমগ্ন, তখন দেখিতে দেখিতে বহু-

সংখ্যক রথী,সারথী,পদাতিক আসিয়া আমায় বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। একবার 'ক্যাহুয়া' শব্দ কাণে গেলে আর রক্ষা নাই; চতুর্দ্দিকেই কেবল 'ক্যাহুয়া' 'ক্যাহুয়া' শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। ক্রমে আমি 'ন যযৌ, ন তস্থৌ' অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। অভিমন্যু সপ্তরথী পরিবেষ্টিত হইয়া মাতুল গোবিন্দকে স্মরণ করিয়াছিলেন, আর আমি এই সমস্তরথী, মহারথী পরিবেষ্টিত হইয়া বিপত্তিতে 'মধুসূদন',এই ঋষি বাক্য সার্থক করিতে লাগিলাম।

এখানকার পাণ্ডাদের কথায় যুগপৎ দুঃখ ও হাসি পায়। প্রায় সকলেইরই মুখে, I, poor Panda, Babu, He very largeman Babu. আরও কতই কাতরোক্তি! আমার কোনও নির্দ্দিষ্ট পাণ্ডা ছিল না; পথে বর্দ্ধমানের নিকটে—একটী বাবু 'বল্লভ চৌবে, এই নামটী বলিয়া দিয়াছিলেন,সুতরাং অনেক বক্তৃতাদির পর আমি বল্লভ চৌবের নাম বলিলাম। শুনিয়াছি, রামনাম শুনিলে ভূত পালায়; অবশ্য সত্য মিথ্যা পরখ করিয়া দেখিবার সাধ থাকিলেও গ্রহবৈগুণ্যে সুবিধাটা কখনও হয় নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পরিস্কার দিনের আলোকে উপনেত্রবিহীন প্রখরদৃষ্টি বিশিষ্ট আমার এই আপন চক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম, 'বল্লভ চৌবে' নামটী শুনিবামাত্র পাণ্ডাগণ একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল। তবে দুই একটা নাছোড়বান্দা হইয়া কাণে তুলো গুঁজিয়া দিয়াও কতকদূর পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করিতে ছাড়িল না। কিন্তু শেষে বেগতিক দেখিয়া তাহারাও যে পথে আসিয়াছিল, সে পথে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

মথুরা-সহরের একটী উচ্চ ফটক আছে। ফটকে একটী বড় ঘড়ি সন্নিবিষ্ট। ফটক পার হইয়া ক্রমে বল্লভ চৌবের বাড়ীতে পৌঁছিলাম। চৌবে মহাশয় বেশ লোক। খুব আদর যত্ন করিলেন। একটী লোক লইয়া আমি তখনই দর্শনেপ্সু হইয়া বহির্গত হইলাম। প্রথমে মথুরানাথের মন্দির দর্শন করিয়া দ্বারকানাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে বসিয়া কতকগুলি লোক্ পাখোয়াজ, এস্রাজ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র যোগে হিজিবিজি একরকম গান করিতেছিল। মনে হইল, তাহারা বেতনভোগী—বন্দী; কেন না তাদের গানে প্রাণের লেশ মাত্রও ছিল না। তাহারা শুধু হৈ হৈ করিয়া গোলমাল করিতেছিল, এবং যাত্রীদের নিকট হইতে পয়সা আদায়ের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। হঠাৎ বাস্তবের একটী কঠিন আঘাত আসিয়া আমার মর্ম্মকে ব্যথিত করিল। কিন্তু এমন সময় কল্পনা কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'এখনও ত বৃন্দাবন দেখ নাই'। কল্পনার প্ররোচনায় বাস্তবকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিলাম; কল্পনা তাহার সুকোমল করস্পর্শে মর্ম্মস্থলের ব্যথা অপনীত করিল। চাহিয়া দেখিলাম, বারান্দার একদেশে জনৈক বৃদ্ধা অনন্যমনে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত একখানা গীতা বা এবম্বিধ কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে নিরতা রহিয়াছেন। কল্পনার কথায় আর অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

এবারে রাধাগোবিন্দের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দির-সংলগ্ন একটী প্রকোষ্ঠে বিংশত্যাধিক বর্ষীয় জনৈক কৌপীনধারী যুবক সুর করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। রাধা গোবিন্দের মন্দিরে ব্রাহ্মণ যুবককে চণ্ডীপাঠ-নিরত দেখিয়া আমি যুগবৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলাম। বিস্ময়ের কারণ এই যে, সচরাচর বৈষ্ণবগণ শাক্ত-

দিগকে একটুকু নেকনজরে দেখিয়া থাকেন, এস্থলে তাহার ব্যতিক্রম; আনন্দের কারণ এই যে, বাস্তবিক ধর্ম্মার্থীর নিকট শাক্ত-বৈষ্ণব, হিন্দু খ্রীষ্টান ইত্যাদি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ধর্ম্মের কথা, ভগবানের কথা যে গ্রন্থে থাকে, তাঁহারা পরম সমাদরে নিষ্ঠার সহিত তাহাই পাঠ করিয়া থাকেন; যাঁহারা সারগ্রাহী, তাঁহারা সকল দ্রব্য হইতেই সার সংগ্রহে তৎপর। প্রকৃত ধর্ম্মার্থীর নিকট বেদ, গীতা,ভাগবৎ, কোরাণ বাইবেল সমস্তই ধর্ম্মার্জ্জনের সহায়—সুতরাং আদরের বস্তু। গ্রন্থ বিশেষ তাঁহার অধিকতর শ্রদ্ধা বা আদরের বস্তু হইতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া অপর গ্রন্থ তাঁহার নিকট হেয় এবং অশ্রদ্ধার বস্তু নয়। তবে যাহারা ধর্ম্মধ্বজী, তাদের কথা স্বতন্ত্র। আলাপে বুঝিলাম, তিনি রাধাকৃষ্ণ এবং কালী দুর্গা, সর্ব্বত্রই সমশ্রদ্ধান্বিত। তবে কালীদুর্গার নাম শুনিলেই যেমন বাঙ্গালীবৃন্দ মাংসের গন্ধ পাইয়া থাকেন, ওদেশীয় লোকেরা সেইরূপ পায় না। আমার মনে হয়, এইজন্যই বোধ হয় শাক্ত বৈষ্ণবের ঝগড়াটা বাঙ্গালায়ই বেশী বিদ্যমান। যুবকের নিবাস দিল্লী।

তারপর আমরা কংসের বাড়ী দেখিতে চলিলাম। একটী রাস্তা বেশ উপরের দিকে উঠিয়াছে; আমরা সেই রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে যমুনার তীরে একটা বেশ বড় জীর্ণ ইষ্টকবাড়ী দেখিতে পাইলাম। পাণ্ডামহাশয় অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলিলেন 'এটা কংসের বাড়ী'; কিন্তু আমার কেন জানি একটা খট্‌কা লাগিল। কংস এতবড় রাজা ছিলেন, তার বাড়ীটা এতটুকু হবে কেন? আজকালকার অচেতন বা পোষাকী রাজাদের বাড়ীও ত এতদপেক্ষা অনেক বড়। সম্মুখে ভদ্রবেশধারী একজন লোক পাইয়া আকারে ইঙ্গিতে হিন্দী-বাঙ্গালা-সংস্কৃত-ইংরেজী-মিশ্রিত ভাষায় তাঁহাকে অতিকষ্টে বুঝাইলাম যে, এই "পাণ্ডা বলিতেছে এ বাড়ীটা কংসরাজার; আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন কি?" তাহার কথায় আমি যা বুঝিলাম, তার মর্ম্ম এই—"ওরা এইরূপই বলে; এটা এক সময়ে ভরতপুরের রাজার একটী কেল্লা ছিল।" পাণ্ডাকে যখন যে কথা বলিলাম, তখন সে বসিল, "ও মুসলমান, তাই ঐরূপ বলিল।" সুতরাং আমি চুপ করিলাম। ভগ্ন ইষ্টকস্তুপের উপর একটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত, ইহার নাম 'কংসারি শিব' (অর্থ কি, পাঠক পাঠিকা ভাবিয়া দেখিবেন)। একজন অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারী ব্যাঘ্রচর্ম্মে বসিয়া অপূর্ব্ব গন্ধযুক্ত ধূম নির্গমনের দ্বারা মহাদেবের জয়-ঘোষণা করিতেছিলেন এবং তিনি যে মহাদেবের প্রকৃত সেবক, তাহার অকাট্য প্রমাণস্বরূপ পুরোভাগে কতকগুলি সুদীর্ঘ কল্কি পাশাপাশি সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যুবকের চেহারাটা বাঙ্গালী ছাঁচের, কথায়ও যেন বাঙ্গালার গন্ধ আছে, এমনই বোধ হইল; কিন্তু যুবক বলিল, সে হিন্দুস্থানী। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন।

এবার আমরা যমুনার কূলে কূলে চলিলাম। আমি ভক্ত নই, তবু কত অতীতের কাহিনী স্মৃতির মন্দিরে উকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। কি যেন একটা অভাব বেশ স্ফুটতর ভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম। যমুনা দর্শনে ভক্ত, ভাবুক বা ঐতিহাসিকের হৃদয়ে কিরূপ ভাবের উদ্রেক হয়, জানি না; আমার কিন্তু যমুনাকে শ্রীহীনা পতিবিয়োগ-

বিধুরা রমণীর ন্যায় বিষাদের একখানা প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। এমন একটা নিরানন্দের অস্পষ্ট ছায়া তাহার উভয়কূল ব্যাপিয়া বিরাজমানা রহিয়াছে, যাহা ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়কে আসিয়া স্পর্শ করে। আমরা চলিতে লাগিলাম। একটা স্নানের ঘাটে উপস্থিত হইলাম। ইহার নাম স্বামীঘাট; শুনিলাম, যাত্রীগণ এই ঘাটে স্নান করিতে পারেন না।

একটুকু পরেই আমরা বিশ্রাম-ঘাটে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটীই মথুরার শ্রেষ্ঠ সম্পদ; প্রকৃতপক্ষেই স্থানটী বড়ই রমণীয়, চিত্তদ্রাবক। যাত্রীগণ এই ঘাটেই স্নান করিয়া পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করিয়া থাকেন। এবারে যমুনার একেবারে কূলে গিয়া দাঁড়াইলাম। এখানে কচ্ছপ যূথের স্বচ্ছন্দ বিহার, নির্ভয় ও হিংসাশূন্য ভাব নিরীক্ষণ করিয়া যাত্রীমাত্রেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। অতি-জাগতিক রহস্যের আশ্রয় না লইয়াও বেশ উপলব্ধি করিলাম, 'হিংসাই হিংসার প্রসূতি'। আহা, মানুষ যদি মানুষের প্রতি এইরূপ অহিংস্রভাব পোষণ করিত ত কি সুখেরই হইত! দুরাত্মা কংসরাজকে নিধন করিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত কৃষ্ণ বলরাম যমুনার শীতলবারি-সম্পৃক্ত ক্লান্তি-অপনোদনকারী সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিবার নিমিত্ত এইস্থানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিয়াছিলেন; এবং বিশ্রামান্তে যমুনার পূত-নীরে অবগাহন করিয়া দুরাত্মাস্পর্শ-কলুষিত ক্লেদ অপনীত করিয়াছিলেন। তাই এই স্থানটীর নাম বিশ্রাম-ঘাট। কৃষ্ণ বলরাম বিষয়ক বৃত্তান্ত ব্যক্তিগত অভিরুচি ও সংস্কার অনুসারে প্রাণ ও মনকে বিভিন্নরূপে স্পর্শ করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু তবু এই স্থানটীর এমনি একটুকু মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, প্রতিনিয়ত পাপাসুর সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত-হৃদয় দুর্ব্বল মানব সন্ধ্যা-সমাগমে যখন এখানে আসিয়া উপবেশন করে, তখন জানি না কি একখানা অজ্ঞাত কর-স্পর্শে নিমিষের মধ্যে তাহার হৃদয়ের বেদনা প্রশমিত ও অপনীত হইয়া যায়; সে শান্তির অমৃত-নিষেকে সঞ্জীবিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। ধর্ম্মপিপাসু আত্মা সকল এই ঘাট-সংলগ্ন মন্দিরে ধ্যান ধারণায় অধিক সময় যাপন করেন।

আবার চলিতে লাগিলাম। একটা উচ্চ স্তম্ভ দেখিয়া পাণ্ডাকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম, কংসমহিষী স্বামীর সহমৃতা হইলে তাঁহার স্মরণার্থ ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সহরের ফটক পার হইয়া এবারে আমরা ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একটা উচ্চ মাটীর ঢিপির নিকটবর্ত্তী হইলে পাণ্ডা বলিল,ইহার নাম "কংসটিলা।" উপরে উঠিলাম। সেখানে একটা অপ্রশস্ত কুটীরে ২।৩টী গৌরকান্তি নধরবপু যুবক ব্রহ্মচারী বাস করেন। একজন ব্রহ্মচারী দেহের উৎকর্ষ সাধনার্থ কৌপিন পরিয়া খুব ডন্ দিতেছিলেন। আমি হিন্দীভাষায় অত্যধিক পারদর্শী বলিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই ইংরেজী নবীশের অনুসন্ধান করিতাম। কেননা, তাহা না হইলে আমাকে মূকবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। ইংরেজীর কথা শুনিয়া ডন্-নিরত ব্রহ্মচারী যুবক সগর্ব্বে বলিলেন, বাবু, হাম্ আচ্ছাতরুসে আংরেজী জান্‌তে হেঁ। অমনি আমি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম, "Why is it called Kangsa Tilla?" ব্রহ্মচারী যুবক একগাল হাসিয়া ফেলিলেন, "এত্তা

আংরেজী বাত্ হাম্ নেহি সম্‌ঝে, হাম্ খোরাসে আংরাজী জান্‌তে হৈ, Cat, fat, rat, hat ইস্‌মাফিক্ বহুত বাত জান্‌তে হেঁ।

আমার হিন্দীবিজ্ঞ ও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ইংরাজী বিদ্যার মাত্রা সমান বুঝিতে পারিয়া কোনরূপে হাসি চাপিয়া উঠিয়া পড়িলাম। ব্রহ্মচারীগণ নির্লোভ হইয়া থাকেন, এই ত জানিতাম। কিন্তু এই ব্রহ্মচারীগণ পয়সার জন্য বড়ই কাকুতি মিনতি ও শেষে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। পয়সা দিয়াছিলাম কি না, স্মরণ নাই। শুনিলাম, এই কংসটিলায়ই কংসরাজ কৃষ্ণবলরাম কর্ত্তৃক নিহত হন। প্রাণের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটী নীরব প্রার্থনা উত্থিত হইল, "ভগবন্, পাপ-কংসের অত্যাচারে আমার দেহরূপ মথুরানগরী যে ছারখার হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তুমি কি একবার এই দুর্দ্দান্ত অসুরকে বধ করিয়া তোমার পুণ্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে না?" পাণ্ডার তাড়নায় আবার তাহার অনুগমন করিতে লাগিলাম।

কংসটিলা-সংলগ্ন অনেকটা স্থান খুবই উচ্চ একটা প্রশস্ত টিলার মত। পাণ্ডার মুখে শুনিলাম, এই স্থানটার নাম রণভূমি বা রঙ্গভূমি। রণসজ্জা বা রঙ্গভূমির নিদর্শন স্বরূপ কোন চিহ্ন অবশ্য কোথাও পরিলক্ষিত হইল না। একটা মন্দিরের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে পাণ্ডা বলিল, "এটা উগ্রসেনের বাড়ী।" একটুকু পরেই আমরা রঙ্গনাথ শিবের আলয়ে উপস্থিত হইলাম। ইহা একটী বৃহৎ শিবলিঙ্গ। পাণ্ডা বলিল, "সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর যাবত ইহা স্থাপিত।" (পাণ্ডার কথার প্রমাণ, অবশ্য সে অথবা তাহার সমব্যবসায়ীগণ) এই শিবলিঙ্গটী পিত্তলের দ্বারা মণ্ডিত। কাশীর রাজা ইহা নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। এবারে আমরা রঙ্গভূমির শেষ প্রান্তে উপনীত হইলাম। একটা বাড়ীর বারেন্দায় গিয়া বসিলাম। বারেন্দার এক পাশ্বে অনেকগুলি মৃন্ময়ীমূর্ত্তি ভূমি-শর্য্যায় শায়িত রহিয়াছে অবলোকন করিলাম। প্রথম পংক্তিতে নন্দঘোষ বসুদেব, কৃষ্ণকোলে দেবকী ও অক্রূর; দ্বিতীয় পংক্তিতে ভীমকায় কুবলয় হস্তী ভূতলশায়ী—সম্মুখে বিজয়-উল্লাসে উৎফুল্ল কৃষ্ণ বলরাম। অপর প্রান্তে চানুর ও শলের সঙ্গে যুদ্ধনিরত বলরাম এবং মুষ্টিক ও তোশলের সঙ্গে যুদ্ধনিরত কৃষ্ণ বর্ত্তমান। এখানে আমার একটা খুব বড় রকমের পরাজয় হইয়াছিল, তাই এত খুঁটীনাটী কথা বলিলাম। চানুর, মুষ্টিকের নাম আমার বেশ জানা ছিল; কিন্তু শল ও তোশলের নাম যে শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি তাতো আমার আজও স্মরণ হয় না। তাই শল তোশলের মূর্ত্তি দেখিয়া আমি গৃহস্বামীকে খুব জেরা করিতে লাগিলাম। গৃহস্বামী একখানি হিন্দী কেতাব বাহির করিলেন এবং পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে ক্রমে শল তোশলের নাম বাহির করিয়া ফেলিলেন। আমি কিন্তু ঠকিয়াও ঠকিবার পাত্র নই। পলায়নপর হইয়াও সদপে বাহু চাপ্‌ড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, "পলাব নাতো দাঁড়াইয়া মার খাবো নাকি? কার ভয়ে দাঁড়াইয়া রব?" ঢোক গিলিয়া বলিলাম, "এ হিন্দী কেতাব হ্যায়, ইস্‌মে বহুত্ ঝুটাবাত্ লিখা হ্যায়। সংস্কৃত কিতাবমে এইসা বাত্ নেহি হায়।" বেচারা গৃহস্বামীকে অনেকক্ষণ বকাইয়াছিলাম।

স্মরণ হয় যেন, পিপাসার্ত্ত হইয়া একগ্লাস জলও পান করিয়াছিলাম। সুতরাং অম্লান বদনে তাহার হস্তে একটী তাম্রখণ্ড অর্পণ করিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িলাম। তাহার গৃহের অপর বারেন্দায় গোচারণ-নিরত ছিদাম, সুবল, মধুমঙ্গলাদি রাখালবৃন্দ-পরিবেষ্টিত ধরা-চূড়াধারী, মুরলীবদন গোপ-নন্দন কৃষ্ণ ও হলস্কন্ধ হলধর, শ্যামলী ধবলীর পশ্চাৎ ধাবমান। এরূপ অনেক মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি স্থাপিত, দর্শন করিলাম। আরও দেখিলাম, গৃহস্বামী-নন্দন নন্দ-নন্দনের অভাব অসহ্য বোধ করিয়া বালগোপাল বেশে তাহার একটী মূর্ত্তির উপর উপবেশন করিয়া নাসিকারন্ধ্র-নিঃসৃত-লালা সংশ্লিষ্ট অপূর্ব্ব পদার্থের উৎসেকের দ্বারা অনন্যমনে একটী মূর্ত্তির সেবায় আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছে। তাহার সেবায় ব্যাঘাত জন্মাইয়া পাপ সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা আর ছিলনা, তাই তাহার অলক্ষ্যে সরিয়া পড়িলাম। আমার পাণ্ডামহাশয় কোন দিন ভুলেও সরস্বতী-দেবীর আলয়ের ত্রিসীমানায় পদক্ষেপণ করেন নাই। তিনি একনিষ্ঠ হইয়া আজীবন শুধু বঙ্গদেশাগত রাধাশ্যামের ভক্তনিচয়ের সেবায়ই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; তিনি এই অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রসাদাৎ অচিরেই চতুর্ব্বর্গলাভ করিয়া ধন্য হইবেন, বোধ হয়,এই সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু এই গৃহস্বামীটী এখনও অব্যভিচারিণী ভক্তির আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হন নাই। তিনি শ্লোক আওড়াইয়া বলিলেন, “মথুরায় আসিলে চারটী কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথম যমুনায় স্নান, দ্বিতীয় কৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শন, তৃতীয় রঙ্গ[illegible]ন দর্শন, চতুর্থ ভগবানের পদস্পর্শ করা।”

শুনিলাম, মথুরায় চারিহাজার পাণ্ডা ও সাড়ে পাঁচহাজার মন্দির। পাণ্ডাগণের মধ্যে এখনই বেশ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। কোন কোন পাণ্ডা চাকুরী পর্য্যন্ত আরম্ভ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বিখ্যাত চৌবেগণ এখনও তীর্থযাত্রীগণের অপার (অযাচিত নয়) কৃপায় অপরাহ্নে সিদ্ধি পানে বুদ্ধি বাড়াইবার জন্য বাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ হন। কিন্তু চুণোপুঁটিদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কাকুতি-মিনতি শুনিলে বাস্তবিকই দুঃখের উদ্রেক হয়। তবু ইহারা কোন ব্যবসা বাণিজ্য বা লেখাপড়া করিবে না। তবে যে কারণেই হউক, মথুরার পাণ্ডাগণ এখন Cat, fat, large man, I, poor Babu, শিখ্‌তে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু বৃন্দাবনের পাণ্ডাগণ যেমন মূর্খ—তেমনি দুশ্চরিত্র ও বদরাগী। সে কথা বৃন্দাবন-প্রসঙ্গে বলিব। মথুরার রাস্তা ঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সোজা কথায় বলিতে গেলে, বৃন্দাবনের বিশেষত্বগুলি, অবশ্য ভালমন্দ, মথুরায় বোধ হয় ততটা স্থান পায় নাই। বৃন্দাবনের বিষয় পরে লিখিব।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

সমালোচনা।

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর আমিষ ও নিরামিষ আহার যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন, আমরা তাঁহাকে সর্ব্ব প্রথমে সমাদর করি। সে আজ প্রায় ২০ বৎসরের কথা। তাহার

পরে গ্রন্থখানির যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলীয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকায় ইহার সৌরভ পৌঁছিয়াছে। হিন্দি, তেলেগু, কাণাড়ী, গুজরাটী ভাষায় রূপান্তর দেখা দিয়াছে। একে একে তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন সুন্দর বাঁধান, তেমনি সুন্দর ছাপা, কিন্তু বাঙ্গালার সাধারণ লোক তেমন ধনবান নহে, বড় মানুষের ঘর ছাড়া ৭।৮ টাকার রান্নার বই সকলেই কিনিতে পারে না। বিশেষতঃ এখন মেয়েদের রন্ধনাদি গৃহস্থালীর কার্য্য শিখাইবার সময় আসিয়াছে, এবং তজ্জন্য চেষ্টাও হইতেছে। বেথুন বিদ্যালয়, ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয় ও মহাকালী পাঠশালায়, বোর্ডিংএ এবং স্কুলে মেয়েদের রন্ধনকার্য্য শিখান হইতেছে। সাধারণের উপযোগী করিবার জন্য শ্রীমতী গ্রন্থকর্ত্রী একখানি সংক্ষিপ্ত "আমিষ নিরামিষ আহার" ছাপাইয়াছেন। আমরা আশা করি, বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধারকেরা এই গ্রন্থখানি বালিকা-বিদ্যালয়ের পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিবেন, এবং পারিতোষিক ও পাঠাগারের জন্য নির্দ্দেশ করিবেন। পুস্তকখানির যত বহুল প্রচার হয়, তাহার জন্য কি গবর্ণমেণ্ট, কি হিতকরী সভাসমূহ, কি দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়, সকলেরই যথেষ্ট সাহায্য করা কর্ত্তব্য। নূতন গ্রন্থখানিতে পরিবার মধ্যে অনিবার্য্য সাধারণ রোগের জন্য গাছগাছড়া টোট্‌কা ঔষধ সমূহেরও ব্যবস্থা আছে; এবং ক্রিয়া কর্ম্মে বহু লোকের নিমন্ত্রণ হইলে কিরূপ আয়োজন করা কর্ত্তব্য, তাহাও দেখান হইয়াছে।

গ্রন্থকর্ত্রী নিজে পাককার্য্যে সিদ্ধহস্তা। তাঁহার নিজের হাতে পরীক্ষা করিয়া যে ব্যঞ্জনে যে সকল জিনিষ যত পরিমাণে আবশ্যক, সাধারণ গৃহস্থের উপযোগী করিয়া তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক প্রচার হওয়া অবধি বটতলার পাকরাজেশ্বর ও বিপ্রদাস বাবুর পাক-প্রণালী ধনবান ও মধ্যবিত্তের গৃহ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। আমাদের সম্পূর্ণ আশা, নব-প্রকাশিত-সংক্ষিপ্ত "আমিষ ও নিরামিষ আহার" পঞ্জিকার ন্যায় সাধারণ লোকেরও গৃহে গৃহে দেখা দিবে প্রজ্ঞাসুন্দরীর যত্নে শিক্ষিত লোকের গৃহস্থালী নূতন ভাবে সংস্কৃত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইয়াছি যে, এখন তিনি ইংরাজ-সমাজও আক্রমণের উদ্যোগী হইয়াছেন। "ইণ্ডিয়ান ডিসেস্ টু ইংলিস টেষ্ট" এখন তিনি রচনা করিতে নিযুক্ত আছেন। এখানি প্রকাশিত হইলে, আচার সম্বন্ধে তিনি আর একখানি নূতন পুস্তক রচনা করিবেন। তাঁহার মিষ্টান্ন পাকে অনেকেরই আচারের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে। সে অভাব তিনি পূর্ণ করিবেন। তাঁহার খুল্লতাত পৃথিবীর সাহিত্য-রুচি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি পুরনারীর অন্তঃপুরের আহার রুচি পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবেন, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

গ্রীকদর্শনের উৎপত্তি ও ইলিয়াটিক দর্শন।*

প্রাচীন গ্রীকগণ প্রথমতঃ সূর্য্য, অগ্নি, ঝটিকা, বিদ্যুৎ ও বজ্র প্রভৃতিকে দেবতা জ্ঞান করিতেন। শিশুর পুতুল-ক্রীড়ার ন্যায় স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ দেবতাসমূহ কল্পিত হইত। তাহার পর, হোমার ও হেসিয়ডের সমসাময়িক লোকদিগের বিশ্বাস ছিল যে, ঝটিকা বজ্রাদির অন্তরালে তাহাদেরই মত মানব-প্রকৃতি, অথচ অসীম ক্ষমতাশালী দেবতাগণ বিদ্যমান থাকিয়া তত্তৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তাহাদের কল্পিত দেবতা সকল তাহাদেরই তুল্য রাগ দ্বেষাদি রিপু সম্পন্ন; মানবের যশঃ সৌভাগ্যে ঈর্ষাপরায়ণ। তপস্যা ও বলি প্রভৃতি দেবতার ক্রোধ-প্রশমনের উপায়।

হোমারের দেবতাগণ উচ্ছৃঙ্খল, তরলমতি যুবক সদৃশ। তাহার স্থলে পিণ্ডার, ইশ্চাইলাস্ ও সফক্লিস্-কথিত অধিকতর ধীর প্রকৃতি ও জ্ঞানবান দেবতার আবির্ভাব হয়। দেবতাদিগের সংখ্যা অধিক হইলেও নৈতিক-চরিত্রের উৎকর্ষ হেতু, বহুর পরিবর্ত্তে একের আধিপত্য প্রসার লাভ করিল। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ক্রমে স্বভাব-দেবতার (Nature gods) প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দেবতা কে, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান দেবতা কেহ আছেন কিনা, এবং একমাত্র পিতৃস্থানীয় দেবাদিদেব হইতে অপরাপর অসংখ্য দেবতার সৃষ্টি সম্ভব কিনা, এবম্বিধ প্রশ্নের উদয় হয়। আরও কিছুকাল চিন্তার পর যখন বিচার বুদ্ধির সহিত অভিজ্ঞতার যোগ হইল, তখন তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে, অভিজ্ঞতা ব্যতীত শুধু কল্পনা দ্বারা জাগতিক ঘটনাবলীর মীমাংসা হইতে পারে না। 'দুই' আর 'দুই'এ চারি, অথবা ত্রিভুজ ক্ষেত্রের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান, এই সকল তথ্য খেয়ালের উপর নির্ভর করে না; উহারা অবশ্যম্ভাবী।

প্রথম সংস্কারক দলের নেতা থেলস্, জেনোফ্যান ও পাইথাগোরাস্ মানব ধর্ম্মাক্রান্ত শরীরি দেবতার কল্পনা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। যে সময় হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা হস্তপদবিশিষ্ট দেবতার সংস্কার পরিত্যাগ করেন, তখন হইতেই গ্রীকদিগের মধ্যে প্রথম দর্শন-শাস্ত্রের অভ্যুদয় হয়। তবে, পুরুষানুক্রমিক দৃঢ়মূল সংস্কার কতিপয় লোকের যুক্তিবলে সহজে উৎপাটিত হইতে পারে না, এজন্য বহুকালাবধি সাধারণের মধ্যে ঐ সংস্কার বিদ্যমান থাকিলেও, অতঃপর দেবতাদিগের আকার প্রকার ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

থেলস্ খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দে অর্থাৎ ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, মাইলেটাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আইওনিয়ান (Ionian) দর্শনের প্রবর্ত্তক। তাঁহার মতে সলিলই সৃষ্টির প্রথম

---

* প্রফেসার থিলির History of Philosophy অবলম্বনে লিখিত।

উপাদান। বস্তু মাত্রই জলের অবস্থাভেদে উৎপন্ন। পৃথিবী মহা সমুদ্রে ভাসমান, এবং জল হইতেই আবশ্যকীয় সারসংগ্রহ করে। থেলস্ গ্রীকদিগের প্রথম জ্যামিতিক, প্রথম জ্যোতির্ব্বিদ্ এবং প্রথম বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

আনাক্সিমিণ্ডার থেল্‌সের স্বদেশবাসী ও শিষ্য। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সৃষ্টির প্রথম উপাদান সলিল নয়, বায়ু পৃথিবীকে শস্যশালিনী করণার্থ বায়ু হইতে জলের উদ্ভব হইয়াছে। এই অনন্ত, অস্পষ্ট ও সূক্ষ্মতম পদার্থ জগতের আধাররূপে বর্ত্তমান, বস্তুমাত্রই স্ব স্ব অস্তিত্বের জন্য বায়ুমণ্ডলীর নিকট ঋণী। উহারা বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করে। নিয়তি কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথম জীবদেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছিল। প্রাণ দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবিষ্ট হয়। মৎস্য হইতে মানবের জন্ম। জীব ও জীবশ্রেণীর ধ্বংস আছে, কিন্তু তাহাদের উপাদানের ধ্বংস নাই। পৃথিবীর গঠন চোঙ্গার ন্যায় গোল অথচ লম্বাকৃতি, বায়ুমণ্ডলীর মধ্যে অপরাপর জ্যোতিষ্ক দ্বারা ধৃত রহিয়াছে।

আনাক্সিমিণ্ডারের শিষ্য আনাক্সিমিনিসের মতেও বায়ু জীবোৎপত্তির হেতু। জীবের আদি উপাদান স্বরূপ অসীম বায়ুরাশি কোন দৈবশক্তি পরিচালিত গতির দ্বারা প্রতিনিয়ত দ্রব কাঠিন্যভাব প্রাপ্ত হইতেছে। স্বজাতি হইতে পৃথগ্‌ভূত হয় বলিয়াই জীবদেহ পূর্ণতা লাভ করে, দেহের অংশগুলি যতই ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়, ততই জীব, সৃষ্টির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে থাকে।

থেল্‌সের সময় হইতেই জীবশক্তি সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। জীবন চিরস্থায়ী, জীব পরিবর্ত্তনশীল, জন্ম মৃত্যু জরাগ্রস্ত। একপক্ষে জীবনের স্থিতি, পক্ষান্তরে বিনাশ কিরূপে সম্ভব। ক্রমান্বয় এই সকল বিষয়ে লোকের চিন্তাস্রোত ফিরিতেছিল। তাহার ফলে ইউরোপীয় দর্শনের তিনটী প্রাচীন বিভাগের সৃষ্টি হয়। ঐ তিন বিভাগের নাম, ইলিয়াটিক প্রণালী, হিরাক্লাইটাস্ ও আনাক্সাগোরাসের মত। প্রথম দুই সম্প্রদায় পরস্পর বিরুদ্ধবাদী, তৃতীয়টী সামঞ্জস্যসাধক।

ইলিয়াটিক মতানুসারে জীবনই সার পদার্থ, জগতে জীবন ব্যতীত আর কিছুই নাই। হিরাক্লাইটাসের মতে জগৎ অসার, বস্তুমাত্রই ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল। যাহাকে স্থায়ী সত্ত্বা বলা যায়, তাহাও ভ্রম মাত্র। আনাক্সাগোরাস্ বাস্তব সত্ত্বা এবং পরিবর্ত্তন উভয়কেই স্থান দিয়াছেন। পরমাণুবাদীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

আনাক্সিমিণ্ডারের সময়ে জেনোফ্যান্ নামে আর একজন আইওনিয়ান ইলিয়া নগরে বসবাস করিতেন। তিনি জাতীয় দেবদেবীর প্রতি ঘোর বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন, এবং তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় একেশ্বরবাদের প্রচারার্থ বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈতবাদ আর ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব, উভয়ের কোন পার্থক্য নাই। জগতে ‘এক’ ছাড়া ‘দুই’ নাই। ঈশ্বর সর্ব্বদ্রষ্টা (All eye), সর্ব্বশ্রোতা (All ear) এবং সর্ব্বজ্ঞ (All thought) সৃষ্টি সাধনার্থ তাঁহার স্থান ত্যাগ আবশ্যক হয় না। ধারণা দ্বারা তিনি জগৎ সুশাসিত করিতেছেন। মানবগণ হোমার ও হেসিয়ডের প্রাধান্য স্বীকার করে বটে, কিন্তু

দেবতার প্রতি মনুষ্যোচিত ক্রিয়াকলাপের আরোপ করা, অথবা দেবতাদিগকে সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষাদির মূর্ত্তিতে উপাসনা করা নিতান্ত জঘন্য কার্য্য। তৎপরিবর্ত্তে একমাত্র অনন্ত মহাপুরুষের উপাসনা প্রয়োজন, যাঁহার পবিত্র আশ্রয়ে জীব নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, এবং যেখানে জন্ম, জরা মৃত্যুভয় নাই।

জেনোফ্যানের শিষ্য পারমিনাইডিস্ ইলিয়াটিক শাখার প্রথম দার্শনিকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাঁহার দ্বারা জেনোফ্যানের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলি আরও সুস্পষ্ট ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে ঈশ্বরে যখন পরিবর্ত্তন নাই এবং জগৎই ঈশ্বর, তখন জগতেরও পরিবর্ত্তন অসম্ভব। আমরা যাহাকে পরিবর্ত্তন বলি, তাহা দৃষ্টি-ভ্রম মাত্র। বাস্তবিক জন্ম ও মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই। জগতে যদি কিছু থাকে, তবে উহা সেই একমাত্র অনন্ত বিশ্বব্যাপী জীবন-সত্তা। বর্ত্তমান সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, বহুত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান এবং বস্তু মাত্রেরই যে সীমা-নির্দ্দেশ-স্পৃহা, তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ। যাহা আছে, তাহা চিরকালই আছে, তাহার লোপ বা পরিবর্ত্তন নাই। জীবন-সত্ত্বার যদি কখন কখন উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে জীবনসত্ত্বাই তাহার কারণ। একের অবিদ্যমানতায় যখন অন্যের উদ্ভব সম্ভবে না, তখন জীবন-সত্তা নিজে নিজেকে সৃষ্টি করিতেছে, বলিতে হইবে। নিজে নিজের সৃষ্টি করা, আর কেহ কাহারও সৃষ্টি না করা, উভয়ই এক। অতএব জীবন-সত্ত্বার সৃষ্টি হয় নাই, উহা চিরকালই বিদ্যমান: আবার, জীবনের অভাবকে যদি মৃত্যু বলা যায়, তাহা হইলে মৃত্যু বলিয়াও কিছু নাই; যেহেতু জীবনের অভাব হইতে জীবনের সম্ভাব সম্ভব নয়, অর্থাৎ মৃত্যু সত্য হইলে জীবন-সত্ত্বার লোপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাহা যখন হইতেছে না, তখন মৃত্যু অলীক, ভ্রান্তি মাত্র। অনেকের মতে জীবন চঞ্চল অর্থাৎ গতিশীল কিন্তু তাহাও ঠিক নয়। গতি তখনই সম্ভব, যখন তাহা স্থানের ভিতর প্রকাশ পায়। জগতে একমাত্র জীবন ছাড়া যখন আর কিছুই নাই, তখন জীবন গতিশীল বলিতে হইলে, উহা নিজে নিজেরই ভিতর চলাফেরা করিতেছে বুঝিতে হইবে। নিজে নিজের ভিতর চলাফেরা করাও আর আদৌ চলিতেছে না, উভয়ই এক কথা। সুতরাং জীবন গতিবিশিষ্ট নয়। পারমিনাইডিস্ গতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, কেন না গতির কল্পনা হইতে স্থানের (space) কল্পনা আসে। স্থান জীবন-সত্ত্বারই নামান্তর এবং জীবন গতিবিহীন, সুতরাং গতি অলীক, দৃষ্টিভ্রম (appearance)। এইরূপে পরমাণু বলিয়াও কোন জিনিষ নাই। পরমাণু স্বীকার করিতে হইলে অবকাশ বা অন্তর স্বীকার করা আবশ্যক। তর্কের খাতিরে যদি অবকাশ আছে, স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অবকাশের অথবা 'শূন্যে'র অবস্থিতি স্বীকার রূপ অসম্ভব কল্পনা অবলম্বন করিতে হইবে। শূন্য অর্থাৎ যাহা কিছুই নয়, তাহা থাকিবে কিরূপে? কোন কিছু থাকিতে হইলে প্রথমে তাহার নিজের অস্তিত্ব দরকার। অবকাশের যদি স্বাভাবিক অস্তিত্বই থাকে, তবে উহাও জীবন-সত্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং পরমাণুর কল্পনা ভ্রমাত্মক। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জীবন-সত্তা এক এবং অদ্বিতীয়, তাহার কারণ, উহা

কাহারও মুখাপেক্ষী নয়, নিজে নিজেরই উপর নির্ভর করিতেছে। উহা একাধারে সব, সুতরাং পূর্ণ এবং সুখ দুঃখাদি রহিত। সংক্ষেপতঃ, জীবন-সত্ত্বা অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয়, অচল, অবিচ্ছিন্ন, অবিভাজ্য, অসীম, এক এবং অদ্বিতীয়। জগন্ময় এক মহাসত্ত্বা সৃষ্টির কারণ রূপে বিদ্যমান, যাহাতে লৌকিক পার্থক্য সমস্তই বিলীন রহিয়াছে। সেই মহাসত্ত্বারই লৌকিক আখ্যা ঈশ্বর।

বৃহত্তর বা বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে পারমিনাইডিসের মত এই যে, অন্তর্দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ড এক ও অবিভাজ্য প্রমাণিত হইলেও, কতকগুলি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন শক্তিদ্বারা উহার লৌকিক সৃষ্টি, পরিবর্ত্তন বা প্রলয় সাধিত হইতেছে। এই সকল শক্তি প্রধানতঃ দুইশ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, শীত ও আঁধার এবং আলোক ও উত্তাপ। সূক্ষ্ম বিচারে যে জগতের আরম্ভ ও শেষ নাই, দৃশ্যতঃ তাহার উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি এবং ধ্বংস আছে। এই সকল পরিবর্ত্তন শীতাতপ ও আলোকাঁধারের জয় পরাজয়ের উপর নির্ভর করে। রাত্রি মূর্ত্তপদার্থ সমূহের জননীস্বরূপা, দিবাজনক স্থানীয় এবং শৈত্য ও উষ্ণতা পদার্থ মাত্রেই সংক্রামিত। জগতের গঠন কয়েকটী ঐককেন্দ্রিক বৃত্তের ন্যায়। উহারা পর্য্যায়ক্রমে দীপ্ত ও উষ্ণ, আঁধার ও শীতল, একের পর একটী এইরূপে সজ্জিত। সর্ব্ববহিঃস্থ বৃত্তটী অপর সকলকে বেষ্টন করিয়া আছে; উহা কঠিন, শীতল ও তমসাবৃত। সর্ব্বান্তরস্থ বৃত্তটীও কঠিন, তবে উহা অগ্নিময় তারকা-সমুজ্জ্বল এবং পৃথিবীর কেন্দ্রদেশে অবস্থিত। উহা আমাদের কল্পনা-প্রসূত গতির উৎপত্তিস্থল, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবভূমি; ন্যায়, ধর্ম্ম এবং ভালবাসার আকর।

পারমিনাইডিসের উপরোক্ত মতগুলি বিশুদ্ধ দর্শন মত বলিয়া প্রদত্ত বা গৃহীত না হইলেও, উহাতে আইওনিয়ান এবং পাইথাগোরিয়ান দর্শনের আভাষ পাওয়া যায়। গতির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের একটী প্রধান অবলম্বন ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দর্শন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার এবং তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। তৎকৃত অধ্যাত্মজগৎ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বিরোধ হইতেই মহাত্মা প্লেটোকৃত মায়াবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। তিনি যাহাকে জীবনসত্ত্বা (Being) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার দেহ-প্রাণ-মন কিছুই নাই। জগতে এক জীবনব্যতীত আর যত কিছু দেখিতে পাই, সবই দৈব, মায়া বা দৃষ্টিভ্রম। এজন্য তাঁহাকে জড়বাদী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু জড় ও শক্তিবাদের যে বৈপরিত্য ভাব, তাহা অনেক পরবর্ত্তীকালের কথা। পারমিনাইডিসের অদ্বৈতবাদ (Monism) যেন একখানি প্রস্তরফলক, উহা হইতে খোদিয়া যে কোন মূর্ত্তি গড়া যাইতে পারে। তাঁহার মত যতই অসম্পূর্ণ হউক, তদ্দ্বারা গ্রীক-দর্শনের যুগান্তর ঘটিয়াছিল।

ইলিয়াটিক শাখার অন্তর্গত মিলিসিয়াস্, কেনো এবং জর্জিয়াস্ নামে আর তিনজন গ্রীকপণ্ডিত পারমিনাইডিসের অনুকরণ করিয়াছিলেন। মিলিসিয়াসের মতে সৃষ্টিই যদি অসম্ভব হয়, তবে কিরূপে প্রথম বিশ্ব-রচনা হইল, সে বিষয়ের অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন, তাহার চেষ্টাও বৃথা। জীবন-সত্ত্বা, স্থান ও কালের অধীন নয়। পারমিনাইডিস্ জীবন-সত্ত্বাকে কালের অধীন না করিলেও, জগৎকে বৃত্তরূপে কল্পনা করিয়া স্থানের অধীন করিয়াছেন। সত্য বটে,

তিনি স্থানের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তবুও বৃত্তকল্পনা দ্বারা বিশ্বের সীমা নির্দ্দেশ করা যুক্তিসম্মত হয় নাই। যাহা অসীম, তাহাকে পূর্ণ বলা যায় না. পূর্ণতা হইতে সীমারই কল্পনা আসে। প্রকৃতপক্ষে জীবনসত্ত্বা অসীম হইলেও, বিশ্বপূর্ণতার পরিণতি; উহার একাংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, পৃথিবী তাহার কেন্দ্রস্বরূপ।

জেনো পারমিনাইডিসের ছাত্র। তিনি সর্ব্বপ্রথম দর্শনশাস্ত্রে তর্কের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সৃষ্টিতত্ত্বে ‘দুই’ এর কল্পনা আসিতে পারে না, ‘এক’ই ধারণার বিষয়। বিস্তার (Extension), পরিমাণ (Maznitude), গতি (Motion) এবং স্থান (Space), এ সকলের কিছুই বোধগম্য নয়। কোন বস্তুর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে, এরূপ বলিতে হইলে, সেই একই বস্তুকে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম উভয় আখ্যাই দেওয়া যাইতে পারে। বৃহত্তম, কেন না উহা অসংখ্য অংশে বিভাজ্য, ক্ষুদ্রতম, কেন না, বিস্তারবিহীন অংশের পরিমাণই হইতে পারে না।

গতিও ধারণা-বহির্ভূত; কারণ, যে বিন্দু হইতে গতির আরম্ভ হয়, তাহা হইতে উহার শেষ পর্য্যন্ত কল্পিত রেখাটী অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। বিন্দুর নিজের পরিমাণ না থাকায়, একটী একটা করিয়া সংখ্যাতীত বিন্দু যোগ করিলেও তাহাতে দূরত্ব পরিমিত হয় না। এ সম্বন্ধে এচিলিস্ ও কচ্ছপের এক গল্প আছে। এচিলিস্ একসময়ে বিদ্যুৎবেগে কচ্ছপের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, উভয়ের ব্যবধান যতই কম হউক না, এচিলিস্‌কে প্রথমে সেই ব্যবধানের অর্দ্ধেক অতিক্রম করিতে হইবে, তৎপরে বাঁকী অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক, আবার অবশিষ্টের অর্দ্ধেক, এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া চলিলেও দূর ফুরাইবে না। সদ্যঃ নিক্ষিপ্ত শরও ইহার একটী দৃষ্টান্ত। তীরকে তাহার লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিতে, গমন রেখার বিন্দুগুলিকে একটীর পর একটী করিয়া অতিক্রম করিতে হয়। বিন্দুর পরিমাণ না থাকায় একটী করিয়া বিন্দু অতিক্রম করা, আর যেখানকার শর সেইখানে থাকা, একই কথা। সুতরাং শরকে আমরা চলিয়া যাইতে দেখিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা নিশ্চলই আছে, উহার গতি দৃষ্টিভ্রম মাত্র।

জর্জিয়াস্ জেনোর ছাত্র, পঞ্চম শতাব্দীর লোক। তাঁহার মন্তব্যগুলি ইলিয়াটিক দর্শনের অনুরূপ হইলেও উপসংহারে তিনি জগৎকে নশ্বর সপ্রমাণ করিয়াছেন। জীবনসত্ত্বা বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে পারমিনাইডিসের মতে তাহা অনন্ত অথবা অসীম। জগতে কিছুই অসীম থাকিতে পারে না, কেন না স্থান (Space) ও কাল (Time) দ্বারা তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। বস্তু মাত্রেরই অস্তিত্ব স্থান ও কালের অধীন,—স্থানেই স্থিতি এবং কালেই উৎপত্তি হেতু কিছুই অনন্ত বা অসীম হইতে পারে না। জর্জিয়াসের মত হইতে নিহিলিজম্ (Nihilism) বা সৃষ্টি মাত্রই নাশশীল, এই মতের প্রচার হইয়াছিল।

উপরে পঞ্চদার্শনিকের মত প্রদত্ত হইল, উঁহারা ইলিয়াটিক দর্শনের প্রচারকর্ত্তা। উঁহাদের সকলেই জন্ম জরা মৃত্যু বা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধে একমত ছিলেন, অর্থাৎ উহাদিগকে মায়া বা ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার পর হইতে ইলিয়াটিক দর্শনের প্রতিপক্ষ বা হিরাক্লাইটাসের দল প্রবল হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

* * *

শাস্ত্রব্যাখ্যায় চপলতা।

গ্রন্থ ঘাটিতে ঘাটিতে “পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ-কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত” একখানা ছান্দোগ্যোপনিষদের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। গ্রন্থখানি আকস্মিক ভাবেই হাতে আসিয়াছে, একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যে কোনই আস্থা নাই বলিয়া, তাঁহাদের পুস্তিকাদি পাঠেও তেমন আগ্রহ নাই। এই পুস্তকের সঙ্গে সম্বন্ধ একটা দৈব ঘটনা বলিলেও চলে। হঠাৎ হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, এদিক্ ওদিক্ একটু পাঠ করিয়া দেখিলাম, আমার এই অনাস্থা আমাকে অনেক দুর্গন্ধ গ্রহণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই সকল পণ্ডিতের বর্ত্তমান সময়োপযোগী বিদ্যাবুদ্ধি নিতান্তই কম। কাজেই তর্জ্জন গর্জ্জন ও লম্ফঝম্ফ দ্বারা আসল বস্তুর অভাব পুরণ করিয়া লইবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা নূতন শিক্ষা দীক্ষার বিরোধী। বিরোধের কারণ তাঁহাদের অজ্ঞতা, নূতন ভাব গ্রহণের সামর্থ্যই তাঁহাদের নাই। শ্রেণীর লোকের উল্লিখিত পণ্ডিতগণের খুব পসার। নব্যদিগকে গালাগালি দিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া ইঁহারা আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। পণ্ডিত দুর্গাচরণও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তিনি স্থানে অস্থানে নব্য মতাবলম্বীদিগকে অনর্থক আক্রমণ করিয়াছেন। নব্য বলিতে যাঁহারা ভারতের অন্ধকার যুগকে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই বুঝিতে হইবে। এই পণ্ডিতেরা সেই অন্ধকারকে ধরিয়া রাখিতে চাহেন বলিয়াই এই বিরোধ। যাক্ সে কথা।

সাধারণতঃ যাঁহাদের পশ্চাতে একটা উপসর্গ আছে, আস্ফালন লম্ফ ঝম্ফ তাঁহাদেরই একচেটিয়া ব্যবসায় বলিয়া সকলে জানেন, পণ্ডিত মহাশয়ের পশ্চাতে দুইটা উপসর্গ - সাংখ্য ও বেদান্ত। সুতরাং আড়ম্বরের আধিক্য একটু বেশী হইবে, তাহা সহজেই স্বীকার করা যায়। কিন্তু আস্ফালনাদি তিনি এত বেশী করিয়াছেন যে, এই দুই উপসর্গেও তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ সাংখ্য আছে, বেদান্ত আছে,কিন্তু যাহার সঙ্গে লম্ফ ঝম্ফের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সেই ন্যায় তাহার নাই, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় অবশ্যই আছে,তবে তিনি বোধ হয় লজ্জাশীলতা বশতঃ পশ্চাতে লাগাইয়া দেন নাই। কেন না, শাস্ত্রেই আছে “বিদ্যা দবাতি বিনয়ম্।”

পণ্ডিত মহাশয় কিরূপ লম্ফ ঝম্ফ করিয়াছেন ও গালাগালি দিয়াছেন, এখন তাহারই আলোচনা করা যাইবে। পণ্ডিত মহাশয়ের মতে পূর্ব্ব আচার্য্যগণের ব্যাখ্যার সাহায্য না লইলে ছান্দোগ্যাদি উপনিষদের প্রকৃত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। এ বিষয়ে তাহার সঙ্গে কাহারও অমিল হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাঁহারই মতে আচার্য্যগণও একেবারে সর্ব্বজ্ঞ নহেন, “সর্ব্বজ্ঞকল্প”, সুতরাং তাঁহাদেরও ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিয়া গেল। বিশেষতঃ বিভিন্ন আচার্য্য যখন

বিভিন্ন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তখন সকল আচার্য্যের প্রধান আচার্য্য যে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, তাহা দ্বারাই স্থির করিয়া লইতে হইবে, কোন্ আচার্য্যের ব্যাখ্যা সমীচীন। যখন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, আচার্য্যগণ আপনাদের বিচার বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারাই সত্য নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন আপন আপন বিবেকের অনুসরণ না করিলে বাস্তবিক আচার্য্যগণের পন্থা অনুসরণ করা হইবে না। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় তাহাতে নিতান্তই নারাজ। কেন না, তিনি বলেন, "ইদানীন্তন স্বাধীনচেতা কোন কোন লোক সর্ব্বঙ্কষ বুদ্ধিবলে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ইহাকে (ছান্দগ্যোপনিষদকে) একটী কল্পনাকুশল কবির উদ্দাম লেখনী-প্রসূত উপন্যাস রূপে পরিচিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহা যে দেশের বিশেষ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যাঁহারা স্বাধীনতার দোহাই দিয়া আস্ফালন করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের স্বাধীনতা যে কতটুকু, তাহা তাঁহারাই জানেন। আমরা দেখিতেছি, তাঁহারা কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উচ্ছিষ্ট-ভোজী নিতান্ত পরাধীন। (আমরাও দেখিতেছি, নিরঙ্কষ পণ্ডিতের মুখে আর কিছু আটকায় না) কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রসঙ্গ ক্রমে যদি আমাদের শাস্ত্র বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও কথা বলিয়া গিয়া থাকেন, উক্ত প্রকার স্বাধীনচেতা মহোদয়েরা সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া দেশে একটা নূতন ধরণের মত জাহির করিতে চেষ্টা করেন। পণ্ডিতদিগের অবশ্যই জানা আছে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" সুতরাং নূতন ধরণের মত জাহির করাটা নিতান্ত অগৌরবের কথা নয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত হইলেই তাঁহার মতটা দোষের হয় না। শাস্ত্রে যবনাচার্য্যের মত স্বীকৃত হইয়া রহিয়াছে। তবে যে তিনি উচ্ছিষ্টের কথা বলিয়াছেন, সেটাকে আমরা তাঁহার রুচি-বৈচিত্র্যের কোঠায় ফেলিতে পারি। দশটা মতের মধ্য হইতে একটা মত বাছিয়া লইতে যতটা স্বাধীনতা থাকে, এখানেও অন্ততঃ ততটা স্বাধীনতা থাকিয়া যাইতেছে, পণ্ডিত মহাশয়ের লম্ফ ঝম্ফেও তাহার ব্যত্যয় হইতেছে না। এইখানে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি স্বীয় মত দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, সাংখ্য বেদান্তাদি উপসর্গ যুক্ত হইয়াও আমাদের পণ্ডিতেরা পণ্ডিতম্মন্যমানই থাকিয়া যান, বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন না। দৃষ্টান্তটী সত্যকাম জাবালোপাখ্যানের ব্যাখ্যা। উপাখ্যানটী এই,—"সত্যকামোহ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং গোত্রোন্বহমস্মীতি। সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্ বেদ তাত যদ্ গোত্রস্তুমসি, বহবহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভৈ, সাহমেতন্ন বেদ যদ্ গোত্রস্ত্বমসি, জবালা তু নামাহমস্মি, সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি।"

ইহার অর্থ এই,—জবালানন্দন সত্যকাম মাতা জবালাকে বলিলেন, হে পূজনীয়ে, আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে বাস করিব, আমার কি গোত্র, তাহা জানিতে চাই। জবালা সত্যকামকে বলিলেন, বাবা, তোমার কি গোত্র, তাহা আমি জানি না। আমি বহু সেবাপরায়ণা পরিচারিণী যৌবনে তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, আমি জানি

না, তুমি কোন্ গোত্র। আমার নাম জবালা, আর তোমার নাম সত্যকাম, সুতরাং বলিবে যে, তুমি সত্যকাম জাবাল। এই সহজ কথাটীর তিনি যে ঘোরালো ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং যে ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই যাঁহারা, তাঁহাদিগের প্রতি তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য-পরিচায়ক নানাবিধ কটুকাটব্য বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা এই, "জবালানামে একটী ব্রাহ্মণ-পত্নীর একমাত্র পুত্রের নাম সত্যকাম।" 'একটী ব্রাহ্মণ পত্নী' শ্রুতির কোন বাক্যের অর্থ, তাহা পণ্ডিতের উর্ব্বর মস্তিষ্ক ছাড়া আর কোথায়ও গজাইতে পারে না। কে "ইহাকে একটী কল্পনাকুশল কবির উদ্দাম লেখনী-প্রসূত উপন্যাসরূপে পরিচিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা বুঝিতে আর এখন কাহারও কষ্ট হইবে না। যাহা লইয়া বিবাদ, পণ্ডিত মহাশয় আগে হইতেই তাহা ধরিয়া লইয়া প্রতিপক্ষের অগ্রসর হইবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে যে ন্যায় শাস্ত্রের মুণ্ডপাত হইল, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। প্রতিপক্ষকে গালাগালি দিবার আনন্দেই তিনি বিহ্বল। এক পণ্ডিতের গৃহে চোর ঢুকিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় চক্ষুর নিমিষে চারি দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। এক দরজায় দাঁড়াইলেন নিজে, চোর সে দরজায় আসিলেই ধরিবেন। এক দরজায় রাখিলেন ভ্রাতৃবধূকে। ভাদ্র-বৌ, সুতরাং ছুঁতে নাই। তাঁহার যখন ভ্রাতৃবধূ, কাজেই চোরও ছুঁইবার ভয়ে সে দরজায় আসিবে না। এক দরজায় রাখিলেন চণ্ডী, চোরের সাধ্য কি যে লঙ্ঘন করে? আর এক দরজায় আস্তাকুঁড়, সেখান দিয়া গেলে স্নান করিতে হইবে, রাত্রিকালে স্নান নিষিদ্ধ, সুতরাং সে রাস্তায়ও চোর যাইবে না। এই মতলব আঁটিয়া পণ্ডিত চোর ধরিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। চোর কিন্তু জিনিষপত্র পুঁটুলী করিয়া আস্তাকুঁড় দিয়া পলায়ন করিল। চোর ধরিবার জন্য পণ্ডিত তখন অতিভোরে ঘাটে যাইয়া হাজির। কেন না, চোর তো আর রাত্রিতে স্নান করে নাই, এবং স্নান না করিয়া সে গৃহেই বা ফিরিবে কিরূপে? কাজেই, যাহাকে ঘাটে পাইলেন, তাহাকেই চোর বলিয়া ধরিলেন। পণ্ডিত দুর্গাচরণ কিন্তু এত হাঙ্গামায় যান নাই, তিনি এক কথায়ই প্রতিপক্ষের বাহির হইবার সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহাই তিনি ধরিয়া লইলেন। জবালা যদি ব্রাহ্মণ-পত্নী, তবে তিনি নিজ পুত্রের গোত্র জানেন না, বলিলেন কেন? কেনই বা তিনি পিতার নাম না দিয়া নিজের নামে পুত্রকে পরিচিত করিয়া দিলেন? জবালাকে ব্রাহ্মণ-পত্নী বলিয়া লইলে আখ্যায়িকাটা যে নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি আদৌ পতিত হয় নাই। সত্যকাম যখন গুরুর নিকটে যাইয়া হুবহু এই কঠোর সত্য কথাটা বলিয়া ফেলিলেন, তখন তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "নৈতৎ অব্রাহ্মণো বিরক্তুমর্হতি।" সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত মহাশয়ও তাঁহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "নূনং ব্রাহ্মণস্বমসীতি ভাবঃ।" সত্যকাম যদি ব্রাহ্মণ-পত্নীর পুত্র, তাহার জন্মে যদি কিছু 'কিন্তু' না থাকিবে, তবে গুরুই বা আশ্চর্য্য হইলেন কেন, আর পণ্ডিত মহাশয়ই বা 'নূনং' দিয়া তাহার ব্রাহ্মণত্ব সাব্যস্ত করিলেন কেন? সকলই কি অসংলগ্ন হইতেছে না? গুরু কি ইহাই বলিলেন না যে, তোমার মাতা

বহুচারিণী বলিয়া যদিও তোমার জনক কে, তাহা ঠিক বলিতে পারেন নাই, কিন্তু তোমার মধ্যে যখন ব্রাহ্মণোচিত সত্যনিষ্ঠা রহিয়াছে, তখন তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান। এতটুকুও আমরা জোর করিয়াই বলিতেছি। আসল ব্যাখ্যা বোধ হয় এই, গীতায় যে "গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" জাতি নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে, সেই জাতীয় কোন নিয়মানুসারে যদিও সত্যকাম জাবাল বহুচারিণী দাসীপুত্র, কিন্তু তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক মর্ম্ম সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া, জন্মগত জাতি নিরুপিত হইতে না পারিলেও, গুণানুসারে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, তুমি যখন সত্য হইতে বিচলিত হও নাই—"ন সত্যাদগাঃ," তখন তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই উপনীত করিতেছি। এরূপ ব্যাখ্যা ছাড়া কিছুতেই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আখ্যায়িকাটী বুঝা যাইবে না। পণ্ডিত মহাশয় যে ব্যাখ্যা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন এবং যাহার সঙ্গে মিলে নাই বলিয়া সকলকে গালি দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ব্যাখ্যা। "বহু অহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে" এই কথার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,—"যৌবনের প্রারম্ভেই তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম; তখন আমি গৃহকার্য্যে এবং অতিথি অভ্যাগতের সেবা কার্য্যে এতই ব্যাপৃত ছিলাম যে, পরিচারিকা হইতে আমার কিছুমাত্র পার্থক্য ছিল না; (এমন সময়েই তোমার পিতার মৃত্যু হয়); সুতরাং গোত্রাদি পরিচয় গ্রহণের আর অবসর পাই নাই।" ঐ কথা ক'টিকে ফেনাইয়া এত বড় করা চলে না—তাহা উপন্যাস হইয়া যায়। চলিলেও এই ব্যাখ্যায় আখ্যায়িকার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যে এমন একটা আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা রহিয়াছে, যাহার জন্য এই ব্যাখ্যা কিছুতেই গৃহীত হইতে পারে না। স্বামীর জীবদ্দশাতে তাহার নাম ও গোত্র জানা হয় নাই বলিয়া (যুবতীর পক্ষে ইহাই তো অসম্ভব) আর তাহা জানিবার উপায় নাই, ইহা কি একটা গ্রাহ্যযোগ্য কথা! সন্দেহজনক গুপ্ত বিবাহ হইলে অন্যে না জানুক, জাবালার পক্ষে তাহা ঠিক করা কিছু কষ্টসাধ্য হইত না। সে তো জানিত যে, তাহার স্বামী ছিল। এতদ্বারা কি ইহাই বুঝা যাইতেছে না যে, সত্যকামের পিতার ঠিকানা হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, জাবালা বহু পুরুষচারিণী, কাজেই সত্যকামের পিতা কে, তাহার নির্ণয় হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। সুতরাং তাহার গোত্র জানা গেল না। আর অন্য কোন কারণেই এরূপ হইতে পারিত না। মানুষ মরিলে তাহার নাম ও গোত্র তাহার সঙ্গে মরিয়া যায় না। গুরু পুরোহিত থাকে, জ্ঞাতি গোষ্ঠি থাকে, পাড়া প্রতিবাসীও অন্ততঃ থাকে। গৃহস্থাশ্রমস্থ ব্রাহ্মণপত্নীর পক্ষে অভ্যাগত সাধুজনের সেবা করা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যই বটে। (পণ্ডিত মহাশয় ভুলিবেন না যে, কুন্তীদেবী পিতৃগৃহে কন্যাবস্থায়ই অভ্যাগত সাধুজনের সেবা করিবার সময়েই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন—উগ্রংপর্য্যচরৎ তত্র ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্—তবে একজনের সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ণের পিতার ঠিকানা হইতে কষ্ট হয় নাই)। কিন্তু যে গৃহস্থের ঘরে এত অতিথি অভ্যাগতের ভিড় যে, তাঁহার পত্নীর পক্ষে স্বামীর নাম গোত্র জানিবারও অবসর নাই, তিনি

যে নামজাদা-সম্পন্ন গৃহস্থ হইবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। সেই গৃহস্থ যে পুত্রকে তর্পণাদিতে পিতৃপুরুষের নাম গোত্র সর্ব্বদাই উল্লেখ করিতে হইবে, সেইরূপ পুত্র রাখিয়া মরিয়া গেলেও তাহার নাম গোত্র উদ্ধার করিবার আর উপায় রহিল না, এই কথা আস্ফালন করিয়া বলিতে যাইয়া ও প্রতিপক্ষকে তজ্জন্য গালাগালি করিয়া পণ্ডিত দুর্গাচরণ কি ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন নাই যে, তাঁহার স্বদেশবাসী সব "অলাঙ্গুলশৃঙ্গ বলীবর্দ্ধ"? ধৃষ্টতারও একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। এই আখ্যায়িকা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, এই ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে সত্যকাম কখনই তর্পণ শ্রাদ্ধাদি কোন পিতৃকার্য্য করে নাই, এবং করার প্রয়োজন হয় নাই। কোন গৃহস্থাশ্রমস্থ ভদ্র ব্রাহ্মণপত্নীর পুত্রের পক্ষে ইহা সম্ভব কি? যে কোন যুক্তি অবলম্বন করা যাক্, দেখা যাইবে, সত্যকামের পিতৃবিবরণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। জননীর পক্ষে সে অন্ধকার ভেদ করা অসম্ভব।

পণ্ডিত মহাশয় বলেন, "শ্রুতির বহু অহং চরন্তী" কথার 'বহু' পদটী 'চরন্তী' ক্রিয়ার বিশেষণ; সুতরাং ইহার অর্থ হইতেছে যে, "আমি প্রভূত পরিমাণে পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম"। তিনি নিজেই কিন্তু ব্যাখ্যায় 'বহু'র অর্থ 'নানাবিধং গৃহকর্ম্ম' করিয়াছেন। একটা জিনিষকে ভুল বুঝাইতে গেলে এইরূপ অসঙ্গতি অনিবার্য্য। মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া কখন টেঁকে না। 'চরন্তী' কথাটার অনেক অর্থ হইতে পারে। পরিচারিণী কথাটা যখন সঙ্গেই আছে, তখন 'চরন্তীর' পরিচর্য্যা বোধক অর্থ করার কোনই প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। 'বহু ভ্রমণশীলা' অর্থটা বিশেষভাবে অন্যায্য নাও হইতে পারে। পরিচারিণীরূপে বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, এই অর্থ নিতান্ত অসঙ্গত নয়। তারপর তিনি বিশেষ উষ্মা করিয়া বলিতেছেন, "আমাদের স্বাধীনচেতা বিদ্বন্মন্য পণ্ডিতগণ ব্যাকরণের বেশী ধার ধারেন না, আচার্য্যগণের কথায়ও বড় একটা কর্ণপাত করেন না; তাই তাঁহারা একেবারে সোজাসুজিভাবে 'বহু' পদটীকে 'চরন্তী'র গায়ে মিশাইয়া সত্যনিষ্ঠা সতী জবালাকে 'বহুচারিণী' বেশ্যারূপে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। চর্ ধাতুর অর্থ যখন এক নয়, তখন 'চরন্তী' কথাটারও একটা বিশেষ কদর্থ থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহার সঙ্গে 'বহু' যোগ করিলেই সোজাসুজি 'বেশ্যা' অর্থ হইবে কেন? পণ্ডিত মহাশয় ইতিপূর্ব্বে যে কদর্থ করিয়াছেন, এখনও তাহা সহজেই করিতে পারেন, এখনও 'বহু ভ্রমণশীলা' অর্থ থাকিতে পারে। কোন্ অর্থ খাটিবে, তাহা শব্দার্থের দ্বারা নিরূপিত হইবে না, বাক্যের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কি অর্থ সঙ্গত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। জবালার বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আমি পরিচারিণী, যৌবনে (যৌবনের চাঞ্চল্যে? যৌবন কথাটা কেন ওখানে দেওয়া হইয়াছে, তাহার একটা সার্থকতা দেখাইতে হইবে না কি?) বহুলোকের সঙ্গে ফিরিয়াছি বা বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কাহার দ্বারা কোথায় তোমাকে লাভ করিয়াছি, তাহা আর নির্ণয় করা যাইবে না। ইহাতে যে জবালার সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবার কাহারও অধিকার নাই। তবে ইহার পরও তিনি যদি 'সতী'

থাকিতে পারেন, তবে থাকুন, কুন্তী ও দ্রৌপদী একাধিক পুরুষ দ্বারা সন্তান লাভ করিয়াও প্রাতঃস্মরণীয়াই আছেন। যে কালের যে আচার!

যাহা হউক, পণ্ডিত মহাশয় 'বিদ্বন্মন্য পণ্ডিতগণের ব্যাকরণ দোষ * দেখাইতে সমর্থ না হইলেও, বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে নিজের অনভিজ্ঞতা যে বিশেষ ভাবেই দেখাইয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। একটী যুগ্ম শব্দকে (Compound word) দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যে অন্য শব্দের প্রয়োগ উক্ত সাহিত্যের এমন একটা বিশেষত্ব যে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা যে প্রয়োজন, তাহা আমাদের বিশ্বাসই ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি, "আ যে ধামাণি দিব্যানি তস্থুঃ" তে 'আতস্থুঃ' একটা শব্দ। এই শ্লোকেরই পূর্ব্বপদ, "বি শ্লোক এতু" এর 'বি—এতু' এক শব্দ। কেনোপনিষদে "বেদাভি, হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি'র 'অভিসংবাঞ্ছন্তি' একটা গোটা শব্দ। কঠোপনিষদে "মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্" এর 'অতি সৃজ' একটা কথা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অবস্থিত। এই ছান্দোগ্যেই "উদ্বয়ন্তমসম্পরি……সূর্য্যমগন্ম," তে কোথায় 'উৎ' আর কোথায় ১১টি শব্দের পর 'অগন্ম' কিন্তু শব্দটা 'উদগন্ম'। পণ্ডিতজি নিজেই বলিয়াছেন, "উৎ উপসর্গস্থ 'অগন্ম' ইতি ব্যবহিত ক্রিয়য়া সম্বন্ধ"। ঋগ্বেদে "দশ বৃত্তানি অপতি বহিষ্মতে নি সহস্রানি বর্হয়ঃ" এর দশ সহস্রানি'ও 'নির হঁয়' প্রত্যেকে একটা একটী কথা ও "প্র দাব্যা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী ঋতা বৃধা মহীশুযে" (১।১৫৯।১) এর কোথায় প্র আর কোথায় শুষে, গোটা কথাটা কিন্তু প্রশুষে; আর দ্যাবা ও পৃথিবী (।৫৩।৬) মিলিয়া দ্বন্দ্ব সমাসে কথাটা যদিও 'দ্যাবা পৃথিবী'। সোজাসুজি একটার গায়ে আর একটা মিশাইয়া থাকা উচিত; কিন্তু ঋষি পণ্ডিত দুর্গাচরণের ব্যাকরণ না মানিয়া দুইটাকে আলাদা আলাদা রাখিয়া দিয়াছেন। ঋগ্বেদে এরূপ দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি মিলিবে। ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত দৃষ্টান্ত আছে। ছান্দোগ্য ২।২৪।১৩, 'রাজ্যায়' একটা শব্দ, কিন্তু ইহার 'রা' অক্ষরটাই একটী শব্দের দ্বারা 'জ্যায়' হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে,—"রাহমা জ্যায়"। "ইহা দেশের বিশেষ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক" যে "স্বাধীনচেতা' ঋষি "সর্ব্বঙ্কষ বুদ্ধিবলে" পণ্ডিত দুর্গাচরণের ব্যাকরণ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতেছেন। সাংখ্য বেদান্তের এরূপ অবমাননা আমরা আর সহ্য করিতে পারি না। বাঁচিয়া থাকিলে পণ্ডিতজির বিচারে ঋষির ৬ মাসের ফাঁসী হইত। তবে পণ্ডিতমহাশয় একথা বলিতে পারেন যে, ও ব্যাখ্যাটা কিয়ৎপরিমাণে আচার্য্য শঙ্করেরই অনুগমন। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন, "আচার্য্যগণের কথায়ও বড় একটা কর্ণপাত করেন না।" না করিবার পথ তিনিই করিয়া রাখিয়াছেন। কেন না, আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞকল্প,' সুতরাং

---

* পণ্ডিত দুর্গাচরণের নিজের ব্যাকরণ বিদ্যার একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থিত করিতেছি। এই উপনিষদেই 'প্রাজ্ঞালী কথাটা আছে। সাধারণতঃ লৌকিক প্রয়োগে কথাটা প্রাজ্ঞালি, শঙ্কর বলিয়াছেন "দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্"। পণ্ডিতজি অর্থ করিয়াছেন—"ছন্দের অনুরোধে দীর্ঘ হইয়াছে।" আসল অর্থ কিন্তু দীর্ঘত্বটা বৈদিক প্রয়োগ। দীর্ঘত্ব ছন্দের অনুরোধে নয়, বেদের অনুরোধে। এই যাঁহার নিজের বিদ্যা, তিনি আবার অন্যের দোষ দেখাইতে আসিয়াছেন। এদেশে সকলই শোভা পায়, নির্লজ্জতাই বা না পাইবে কেন?

তাহারও ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। সে সম্ভাবনাটা যে এখানেই ফলে নাই, তা কে বলিল? অনেক সময় যেখানে পণ্ডিতের গুলাইয়া যায়, বালকের বুদ্ধি সেখানে খেলে ভাল। সেই জন্যই শাস্ত্রে আছে—

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যর্ত্তৃণবদগ্রাহ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥

বিশেষতঃ আচার্য্যের সামাজিক মতাদি যে অত্যন্ত অনুদার ছিল, এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিষয়ে বর্ত্তমানকালের লোকের জ্ঞান যে বেশী, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু প্রয়োজন হইলে নিজের পছন্দ না হইলে শঙ্করকেও সে মানিতে হইবে না, সে কথা পণ্ডিত মহাশয়ই আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। বামদেব্য সামোপাসনা বিধানে স্ত্রীপুরুষ-ঘটিত অনেক কথা আছে। তাহার মধ্যে একটী কথা এই "ন কাঞ্চন পরিহরেৎ"। আচার্য্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"কাঞ্চিদপি স্ত্রিয়ং স্বাত্মতল্প প্রাপ্তাং ন পরিহরেৎ" (সঙ্গমার্থ আপনার শয্যায় সমাগত কোন স্ত্রীকেই পরিহার বা উপেক্ষা করিবে না)। এই সব উক্তিতে তদানীন্তন সময়ের কোন কোন ক্ষেত্রে ও যুগে যে বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় নীতিজ্ঞানের অল্পতা ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। শঙ্কর এখানে এমন স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, তাহার আর কটু ব্যাখ্যা বা অর্থান্তর হয় না। সুতরাং হালে পানি না পাইয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে কোন রহস্য অবশ্যই আছে, "সদ্গুরুর সাহায্য ব্যতীত সে রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় না।" আচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সৎগুরুর অনুসন্ধানে আমাদিগকে ছুটিতে হইবে। কিন্তু ছুটাছুটি বৃথা। যে গুরুর প্ররোচনায় শঙ্করকেও অগ্রাহ্য করিতে হইতেছে, সকল গুরুর গুরু তিনি তো অন্তরেই আছেন, তাঁহাকে আসনচ্যুত করিলেই বিপদ, নতুবা সকল গুরুই সাহায্য করিতে পারেন। যে স্বাধীনতাকে এত গালি দিয়াছেন, পরিশেষে তাহারই শরণাপন্ন হইতে হইল! ঘুরে শোও, ফিরে শোও, পৈতানেতে পা।

পণ্ডিত মহাশয়ের ভ্রান্তি এই যে, তিনি মনে করিয়াছেন, মানবের নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধি চিরদিনই একরকম রহিয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমানের আলোকে অতীতকে বুঝিতে না পারিয়া খাবরাইয়া গিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে উন্নত হইলেও নৈতিক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালও যে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অনেক স্থলে অনুন্নত ছিল, তাহা এখন আর প্রমাণ করিতে হয় না। স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত অনেক প্রাচীন প্রথাই এখন আর আমরা সদ্গুরুর আশ্রয় প্রয়োজন মনে করি না, চৈত্ত গুরুই যথেষ্ট। দয়ানন্দ চেষ্টা করিয়াও বৈদিক কোন কোন প্রথা পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন নাই। এমন সময় ছিল, যখন কেবল বিবাহ ছিল না, তাহা নহে, সন্তানোৎপাদনে পিতার প্রয়োজনীয়তা বোধই ছিল—Matriaichal system সেইখান হইতেই আরম্ভ হয়। বিবাহ যে ছিল না, কখন বিবাহ আরম্ভ হইল, তাহার উল্লেখ মহাভারতেই আছে। তারপর যত রকম পুত্রের উল্লেখ আছে, তাহা আর আমরা এখন স্বীকার করি না। বিবাহের বাঁধাবাঁধি এখন যে স্থানে আসিয়াছে, সেখানে থাকিবে কিনা, কে জানে। পাশ্চাত্য জগতে এখনই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। জগৎ বিবর্ত্তনশীল, ভুলিলে চলিবে না।

সুবিধা পাইলেই পণ্ডিত মহাশয় খোঁচা না দিয়া ছাড়েন নাই। একটী আখ্যায়িকা আছে, কুরুদেশ বজ্রাঘাতে শস্যহীন হইলে এক ব্যক্তি 'আটিকী' স্ত্রীসহ গ্রামান্তরে খাদ্য সংগ্রহের জন্য বহির্গত হইল। শঙ্কর 'আটিকী'র অর্থ করিয়াছেন, পয়োধরাদি স্ত্রীচিহ্ন যাহার অভিব্যক্ত হয় নাই। অমনি পণ্ডিতজি লম্ফ ঝম্ফ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, "পুরাকালে বালিকা বিবাহের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত, তাঁহাদের এই স্থানটীতে দৃষ্টি করা আবশ্যক মনে করি।" কথা এই, পুরাকাল কাহাকে বলে? ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া তন্ত্রপুরাণ সবই তো আমাদের কাছে পুরাকাল। উপনিষদের সময়ে ছিল বলিয়া বেদের সময়ে ছিল, তাহা প্রমাণ হইল না। উপনিষদের উত্তরকালে উঠিয়া গিয়াছিল, তাহাও তো হইতে পারে। সুতরাং অঙ্গীকারই করুন আর অস্বীকারই করুন, শুধু পুরাকাল বলিলে উভয়েই ঠিক হইবেন। কিন্তু কথাটা তো আর তা নয়। পুরাকালে বাল্যবিবাহ ছিল না, একথা সাধারণতঃ কেহ বলে না। বিষবৃক্ষের বীজ মাটীতে পুরাকালেই প্রোথিত হইয়াছিল। বাস্তবিক, যাঁহারা কেবল মাত্র বাল্য বিবাহকেই বিশুদ্ধ হিন্দুবিবাহ মনে করেন, তাঁহাদিগকেই বলা হয় যে, দেখ প্রাচীনকালে যৌবন বিবাহও প্রচলিত ছিল, প্রধানা নারীগণের যৌবনেই বিবাহ হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় উল্টা চাপ দিয়াছেন। কিন্তু তা যাই হউক, আটিকী কথাটার অর্থ কি শঙ্কর ঠিকই করিয়াছেন? 'অট্' ধাতুর অর্থ ভ্রমণ করা, ভদ্রলোক স্ত্রী লইয়া দূরদেশে হাঁটিয়া চলিয়াছেন। কেমন স্ত্রী? না, যিনি পর্য্যটনপটু। আটিকীর এই অর্থই কি সুসঙ্গত নহে? যাক্, আলোচনা দীর্ঘ হইয়াছে, আর বিবাদের প্রয়োজন নাই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সঙ্গণিকা।

(১৬)

২২শে জ্যৈষ্ঠ—শান্তিপুরের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সাহিত্যিক পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় পরলোক-প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১২৩৬ সালে তাঁহার জন্ম, ১৩২২ সালে মৃত্যু। তিনি আজীবন বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞানার্জ্জনই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন লোক অল্পই ছিল। আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ ও শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার রচিত অলঙ্কার বিষয়ক পুস্তক "কাব্যদর্পণ" ভাষাপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট সম্পূর্ণ উপাদেয় বলিয়া বিবেচ্য হয়।

গোস্বামি-মহাশয় টোলে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আপনার চেষ্টায় গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গণিত-বিজ্ঞান বাহির করিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তক প্রায় ৮০০০০ আশী হাজার বিক্রয় হইয়াছে। তাঁহার সীতাহরণ বহুকাল সিভিলিয়ানদিগের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। শেষ জীবনে সমগ্র মহাভারত হইতে নূতন ধরণে কথকতা রচনা

করিয়া যান। তাঁহার পুত্র শ্রীমান বীণাবন্ধু গোস্বামী তাঁহার রচিত কথকতা পুস্তক পাঠ করিয়া শত শত লোককে মুগ্ধ করিতেছেন। গোস্বামী মহাশয়ের তিরোধানে বাঙ্গালার বিশেষ ক্ষতি হইল।

(১৭)

শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। অধ্যবসায় এবং চেষ্টায় আমেরিকা যাইয়া তিনি উন্নতির উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি লুসিটেনিয়া জাহাজে ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন। সকলে অবগত আছেন, ঐ জাহাজ জার্ম্মাণীর টর্পেডো আঘাতে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে, এবং তৎসহ বহু নরনারী দেহত্যাগ করিয়াছেন। বোধ হয়, ইন্দুপ্রকাশও আর মর্ত্ত্যলোকে নাই। তিনি গৌরব-মণ্ডিত হইয়া দেশের উন্নতির চিন্তা লইয়া দেশে ফিরিতেছিলেন। তাঁহার দ্বারা এদেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে, আমরা আশা করিতেছিলাম; হঠাৎ দারুণ সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। পরিবারবর্গ শোকে ম্রিয়মাণ। "কোথায় রাম রাজা হবে, কোথায় বনে গমন" এই ঘটনায় এই প্রবাদটী কথায় কথায় সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিধাতার বিধানকে শিরোধার্য্য করিতেই হইবে। কিন্তু বড়ই মর্ম্মপীড়ক সংবাদ। বিধাতা শোকসন্তপ্ত পরিবারে সান্ত্বনা-বারি বর্ষণ করুন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ইন্দুপ্রকাশের একটী সুচিহ্নিত স্থান ছিল। কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় আছে। কবি নিত্যকৃষ্ণ বসুর ন্যায় তাঁহার কবিতা বড়ই সুমধুর হইত। উভয়ের অসাময়িক মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে।

(১৮)

ত্রিপুরা, নোয়াখালি ঢাকা, পাবনা, রংপুর, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার নানাস্থানে দারুণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে, এবং শুনিতেছি অনাহারে লোক মরিতেছে। ত্রিপুরা এবং নোয়াখালির অবস্থা অতিশয় দুঃখপূর্ণ, পড়িলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। গবর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসী সাহায্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ১৩০০ সালের ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষের সময়ে শ্রীযুক্ত বিটসন বেল সাহেব ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি একজন সহৃদয় ব্যক্তি, ফরিদপুরের জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা ফরিদপুর কখনও ভুলিবে না। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষেও তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় পাইতেছি। তাঁহার স্থানে গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত গ্রাউজ সাহেবকে সেবার ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পোপ সাহেবকে ম্যাজিষ্ট্রেট করেন। পরে আসেন, হেরাল্ড সাহেব। এক বৎসরের মধ্যে ৪ বার ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তন হেয়। হেরাল্ড সাহেব মাদারীপুরের সবডিবিসনাল আফিসার ফজল্ করিমের সহিত মিলিয়া কালাপাহাড় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্ভিক্ষ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। এবার সেই পূজ্য, মহামহিমান্বিত দেবোপম বেল সাহেবের নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষের অবসান হইবে বলিয়া আশা করিতেছি। সকলেই সাহায্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধের জন্য এবার সকল লোকই অল্পাধিক পরিমাণে অনাহার-ক্লিষ্ট। এইরূপ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ গবর্ণমেণ্ট-সাহায্য ব্যতীত প্রশমিত হওয়া কষ্টসাধ্য। যদি আশু ধান্যের ফসল ভাল হয়, তবে দেশ

রক্ষা পাইবে। নচেৎ গবর্ণমেণ্টকে দেশরক্ষাকল্পে প্রভূত চেষ্টা করিতে হইবে।

দেখিতেছি, দুর্ভিক্ষ বঙ্গের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। তাহার প্রধান কারণ পাটচাস। পাটচাসে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার ফলে অসংখ্য লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। যাহারা জীবিত, তাহারাও অর্দ্ধমৃত, কাজের অনুপযুক্ত, চাস কার্য্য তাহাদের দ্বারা ভালরূপ নির্ব্বাহিত হইতেছে না। ধান চাসে যেরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন, পাটচাসে সেরূপ প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে আশু টাকার মায়ায় অনেকেই এই অল্প আয়াস-সাধ্য চাসে মনোনিবেশ করে। তাহাতে ধানের উৎপত্তি দিন দিনই এদেশে কমিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে রেঙ্গুনের চাউলই পূর্ব্ববঙ্গকে রক্ষা করিতেছে। কোন স্থানে দেশী চাউল অধিক দেখিতে পাইবে না। যদি রেঙ্গুনে দুর্ভিক্ষ হয়, তবে বাঙ্গালাকে কে রক্ষা করিবে? পাটপাতা খাইলে কি জীবনধারণ হয়? শুধু টাকা থাকিলেই কি বাঁচা যায়? খাদ্য দ্রব্য কোথা হইতে আসিবে? কৃষকেরা পাট বেচিয়া যে টাকা পায়, তাহার অর্দ্ধেক মহাজন ও জমিদারের পকেটে যায়, অপরার্দ্ধ বিলাসিতা ও বাবুগিরিতে ব্যয় হয়। কোন কোন স্থলে টিনের ঘর বাড়িতেছে বটে এবং তাহা দেখিয়া কেহ কেহ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আমরা বহু বৎসর দুর্ভিক্ষের সেবা করিয়া দেখিয়াছি, টিনের ঘরের লোকেরা অধিক অনাহারের ক্লেশ সহ্য করে। ধান চাস হইলে ঘরে আহারের সংস্থান থাকিত। প্রতিবৎসর কিনিয়া খাইতে খাইতে তাহারা জেরবার হইয়া পড়িতেছে। অভাবগ্রস্ত বলিয়া তাহারা দাদনের প্রলোভন ভুলিতে পারে না, দাদন লইয়া পূর্ব্বকালের নীলচাসকারীদিগের ন্যায় নানা দুর্দ্দশায় ভুগিতেছে। তাহাদের কষ্টের কথা শুনিলে পাষাণও ফাটিয়া যায়, অথচ এদেশের একশ্রেণীর লোক পাটচাসে সর্ব্বদাই উৎসাহ দিতেছেন। ধানের চাস দিন দিনই কমিতেছে। যে জমিতে একবার পাট হয়, সে জমিতে সে বৎসর ধান চাস করিবার সময় থাকেনা। বিশেষতঃ পাটের জমি অনুর্ব্বরা হইয়া যায়, একবার যে জমিতে পাট হয়, ২।৩ বৎসরের মধ্যে সে জমিতে ভাল ধান হয় না। যে ধান জন্মে, তাহার অর্দ্ধেক রপ্তানি হইয়া যায়, অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাতে দেশের আহার সঙ্কুলান হয় না। এজন্য দেখিতেছি, রেঙ্গুনের চাউল বাদে, কোন স্থলেই ৫৲ কি ৫॥০ টাকার কমে দেশী চাউল মিলে না। দেশকে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে পাট চাস বন্ধ করিতে হইবে। আমরা দুর্ভিক্ষ-সেবকদিগের চরণ ধরিয়া মিনতি করিতেছি, তাহারা সাহায্য প্রদানের সময় পাট চাস বন্ধ করিতে যেন উপদেশ দেন। দেশের নরনারীদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি, যিনি যাহা পারেন, দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে প্রদান করিয়া দরিদ্রদিগকে রক্ষা করুন। এদেশের লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলে দেশের কলঙ্কের সীমা থাকিবে না। একষ্ট অপেক্ষা আর কষ্ট নাই। সহৃদয়তা এবং পরদুঃখকাতরতা এদেশের একমাত্র গৌরবের জিনিস। বিধাতার কৃপায় এদেশে তাহা চির-বদ্ধমূল হউক।

(১৯)

নব্যভারত প্রেস হইতে ২৫০০৲ টাকা

গবর্ণমেণ্ট ডিপজিট চাহিয়াছিলেন। নব্যভারত পত্রিকার কথা ঐ আদেশে কিছুই লিখিত না থাকিলেও, এত টাকা দিয়া প্রেস রক্ষা করা সমীচীন বিবেচিত না হওয়ায়, ১৫ই জুন হইতে, ২০ বৎসর পর, নব্যভারত-প্রেস বন্ধ হইয়াছে। ২০ বৎসর পর অনেকের অন্ন উঠিল। যাঁহাদের দ্বারা নির্দ্দোষী ব্যক্তিগণের অনিষ্ট সাধিত হইল, বিধাতা তাঁহাদিগের যেন মঙ্গল করেন। সহৃদয় পরদুঃখকাতর সম্পাদক মহাশয়গণ ভুলক্রমে "নব্যভারত" পত্রিকা আর বাহির হইবে না, এইরূপ কথা প্রচার করায় চতুর্দ্দিকের বন্ধুবর্গ বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। চতুর্দ্দিক হইতে বহু সহৃদয় ব্যক্তির পত্র পাইতেছি। এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় নব্যভারতের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, মূল্য আদায় বন্ধ হইয়াছে বলিলেও হয়। আমরা ৩৩ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কাগজখানি চালাইয়াছি। এই ৩৩ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেনের একটী প্রবন্ধ সম্বন্ধে কেবল একবার সতর্ক করিয়াছিলেন, আর কখনও প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই। গবর্ণমেণ্টের ডিপজিট সম্বন্ধীয় অনুজ্ঞাতেও নব্যভারত পত্রিকা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য নাই। শত সহস্র ব্যক্তির সাহায্য এবং সহানুভূতি পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহারা দেশ-সেবার সুবিধা করিয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। নব্যভারতের জন্য একজন কেরাণীও কখনও রাখি নাই, সুদীর্ঘকাল একাকী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। কখনও কখনও নিজ হস্তে কাগজ বিলিও করিয়াছি। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে "এরূপ নিরপেক্ষ কাগজ এদেশে আর হয় নাই।" আরো অনেক কথা বলিয়াছিলেন, সে সকল প্রশংসার কথা আমাদের না লেখাই ভাল। সকলের সকল মতের আদর করিতে যাইয়া আমরা অনেক প্রকারে অনেক সময় অপদস্থ হইয়াছি। বোধ হয়, তাহাতে বিরোধী উপদেবতার সংখ্যা বাড়িয়াছে। আমরা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও দেশের অনিষ্টকারী যা-তা বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া পত্রিকার আয় বৃদ্ধি করিতে পারি নাই। তাহাতেও পরশ্রীকাতর বিজ্ঞাপন-ওয়ালা উপদেবতার দল বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। পরিত্যক্ত সাহিত্যিককে আশ্রয় দেওয়ায়ও কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া থাকিতে পারেন। তাঁহারা নব্যভারতের বিরুদ্ধে লাগিয়াছেন কিনা, বুঝিতে পারিতেছি না। যদি সেরূপ কোন উপদেবতা পশ্চাতে লাগিয়া থাকেন, হয়ত নব্যভারত আর চালাইতে পারিব না। অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ গল্প কখনও ছাপাই নাই, কখনও কদর্য্য ছবি পত্রিকাস্থ করিয়া আয় বাড়াই নাই—৩৩ বৎসর অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া, বিশেষ অর্থকষ্ট সহ্য করিয়া কাগজ চালাইয়াছি। উদ্দেশ্য কেবল দেশের সেবা করা। ব্যক্তিগতভাবে সকলকেই আমাদের বন্ধু মনে করি; কাহারও প্রতি কখনও কোন বিদ্বেষভাব পোষণ করি নাই। আমরা আর কত দিন বাঁচিব? যাঁহাদের কৃপায় সুদীর্ঘকাল দেশের সেবা করিতে পারিয়াছি, তাঁহাদের চরণে আজ প্রণিপাত করিতেছি। তাঁহাদিগের হৃদয়ে কখনও আঘাত করিয়া থাকিলে তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। এসব কথা এইজন্য লিখিতেছি, পঞ্চাশাধিক সাধুভক্ত ও দেশহিতৈষীর জীবনাভিব্যক্তি "প্রণবে" ছিল, সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। উহা ধারাবাহিক কোন বিষয়ের বিবৃতি নয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সমষ্টি। কোন প্রবন্ধ আপত্তিজনক হইলে লিখিলেই আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতাম। রাজবিদ্বেষ বা রাজবিদ্রোহকে আমরা পাপ বলিয়া মনে করি। গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছেন, রাজবিদ্রোহের ইঙ্গিত ঐ পুস্তকে আছে। আমরা বলি,“রজ্জুতে সর্পভ্রম” হইয়াছে। যদি সেরূপ ইঙ্গিত থাকে, তবে আমাদিগের নামে মোকর্দ্দমা করিলে আত্মপক্ষ সমর্থনের অবসর পাইতাম এবং অপরাধী হইলে নয় জেল খাটিতাম। কিন্তু এরূপভাবে মিথ্যাপবাদ দিয়া পুস্তক কাড়িয়া লওয়ায় বড়ই দুঃখের কারণ হইয়াছে। ৩৮ ফর্ম্মার পুস্তক খানির অনুবাদ করিয়া আইন-আদালতে বিচারপ্রার্থী হওয়া কত ব্যয়সাধ্য, পাঠকগণ বিবেচনা করুন। যাহা হউক, এখনও কি করা হইবে, বিবেচনাধীন। এই জন্য অধিক কিছু লিখিলাম না।

“প্রণব”বাজেয়াপ্ত করার মধ্যে কোন উপদেবতার হাত ছিল কিনা,জানিনা। বহুদিনের পুরাতন নব্যভারত বন্ধ করার ব্রত কেহ গ্রহণ করিয়াছেন কি না, তাহাও জানিনা। যদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, নব্যভারতও বন্ধ হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু সে সম্বন্ধে আজ কোন কথা লিখিতে পারিলাম না। আমরা এখনই নব্যভারত বন্ধ করিব না, নব্যভারত চালাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। তবে রাজভক্ত এবং দেশভক্ত আমরা কখনও রাজাদেশের বিরুদ্ধে চলিব না। নব্যভারত বন্ধ করিতে যদি ইঙ্গিত করেন, কিম্বা যেরূপ কোন কার্য্যের পরিচয় পাই, তবে কাগজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইব যদি ভবিষ্যতে কোন প্রেসে নব্যভারত ছাপাইতে না পারি, তবে কাগজ চালাইবার আর উপায় থাকিবে না। যদি তাহা হয়, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে জাতীয় ভাষার উন্নতির চেষ্টা হইতে বিরত হইতেছি না, ইহা ভাবিয়া সকলে ক্ষমা করিবেন।

নব্যভারতের প্রায় পঞ্চাশ সহস্র টাকা মূল্য বাকী হইবে। ঋণও অনেক হইবে। পাঠকগণ আমাদের অবস্থা বিবেচনায় অনুকম্পা প্রকাশে আমাদিগকে ঋণ-মুক্ত করিলে চিরবাধিত হইব।

আমাদের আশা অনেক ছিল, তাহা সাধন করিতে পারি নাই। যে সময়ে নব্যভারতের জন্ম হইয়াছিল সে সময়ে বঙ্গদর্শন ও জ্ঞানাঙ্কুর ছিল না,আর্য্যদর্শন ও বান্ধব যায় যায় হইয়াছিল। নব্যভারত প্রকাশের পর নবজীবন, প্রচার ও সাধনা বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। সে সময়ে বাঙ্গালা লেখা ও বাঙ্গালায় কথা বলা বা বক্তৃতা করা ঘৃণার জিনিস ছিল। এইরূপ দুর্দ্দিনে নব্যভারত বাঙ্গালা দেশে কাজ করিয়াছেন। আজ কাল ঘরে ঘরে সুন্দর সুন্দর মাসিক পত্রিকার অভ্যুদয় হইয়াছে; এবং সাহিত্য-পরিষদ, সাহিত্য-সভা, সাহিত্যকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কৃতী ব্যক্তিগণও আজকাল বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চাকে জীবনের সারব্রত করিয়াছেন। এখন নব্যভারত বন্ধ হইলেও আক্ষেপের তেমন কারণ নাই। মনে করিব, নব্যভারতের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। দেখিয়া মরিতে পারিব যে, বাঙ্গালা সাহিত্য দিন দিন উন্নতির পথেই চলিতেছে। নব্যভারতের ভাগ্যে যে অবস্থাই ঘটুক, শত্রু মিত্র সকলে আশীর্ব্বাদ করিবেন, আমরা যেন উন্নতির চিন্তা লইয়া মরিতে পারি।

(২০)

সত্যবাদী স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস বি-এল মহাশয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যা নব্যভারতের সঙ্গণিকা পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন যে,তিনি জাতি-বিদ্বেষের ঘোর বিরোধী। গঞ্জামের "আশা" পত্রিকায় বাঙ্গালী-বিদ্বেষের মন্তব্য পাঠে তিনি বাঙ্গালী-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও তিনি পাঠাইয়াছেন। তাহা পড়িয়া কৃতার্থ হইলাম। সত্যবাদী স্কুলকে আমরা কি চক্ষে দেখি, নব্যভারতের পাঠকগণ তাহা জানেন! গোপবন্ধু বাবু দেবচরিত্রের লোক, তিনি যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ্টা নহেন, তাহাও জানি। সত্যবাদী স্কুল এইরূপ আন্দোলনের বিরোধী হইয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হউক, আমরা কায়মনোবাক্যে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি।

(২১)

আমরা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যার (১২) নং সঙ্গণিকায় হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি,তাহা হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে নয়, বেঙ্গল-ন্যাসন্যাল-ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে প্রযুজ্য। আমাদের ভ্রমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। বেঙ্গল-ন্যাসন্যাল-ব্যাঙ্ক বাঙ্গালার গৌরব, কিন্তু কতিপয় লোকের প্রতারণায় বহু টাকা অপহৃত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক চলিবে কিনা, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্যাঙ্কের টাকা অপহরণের কথা ৮ই মে অংশীদারদের নিকট লিখিয়াছিলেন, তদুত্তরে শ্রীযুক্ত জানকী নাথ রায়, শ্রীযুক্ত হরকিষণ ভাত্তার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল বাগ্রী, শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায়, এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু অংশীদারদের নিকট যাহা লিখিয়াছেন,তাহা ১৫ই জুনের (১৯১৫) ডেলি-নিউসে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহার দোষেই হউক, ব্যাঙ্কের বহু টাকা যে অপহৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর গৌরব এই বেঙ্গল-ন্যাসনেল-ব্যাঙ্কের পরিণাম ভাবিয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছি। এই ঘটনার পর আর কি কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিবে? যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারা ভক্ষক হইলে কে রক্ষা করিবে?

(২২)

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি কে হইবেন, এ সম্বন্ধে পত্রিকা-সকলে নানা মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে। এবার বাঙ্গালা হইতে সভাপতি মনোনয়নের কথা। আমাদের বিবেচনায়, এবার শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের নাম কিছুতেই উপেক্ষিত হওয়া উচিত নয়। তাঁহার ন্যায় কংগ্রেস-ভক্ত আর দ্বিতীয় কেহ আছেন কি না, আমরা জানি না। তিনি দেশ-হিতৈষী, বিজ্ঞ, সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, সুবক্তা এবং স্বার্থত্যাগী পুরুষ। তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য কংগ্রেস-ভক্ত ব্যক্তি যদি উপেক্ষিত হন, এবং যাহারা কংগ্রেসের কাজে কখনও যোগ দেন নাই, এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি মনোনীত হন, তবে দুঃখের সীমা থাকিবে না। আমরা আশা করি, কংগ্রেসের নেতৃবর্গ অম্বিকাচরণের কথা এবার বিস্মৃত হইবেন না।

(২৩)

বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা আজকাল অশ্লীল ইংরাজি গল্পের অনুবাদ এবং স্বেচ্ছারচিত কদর্য্য গল্প দ্বারা অশ্লীলতা দেশে ছড়াইতেছেন। "নারায়ণে" এই অশ্লীলতা সীমা অতিক্রম করিয়াছে। বিশিষ্ট ভদ্র-

ঘরের কাগজে এইরূপ কলুষিত ও অশ্লীলতা-পূর্ণ গল্প প্রকাশিত হইতেছে, ইহা যারপর নাই দুঃখের বিষয়। বিশেষত ব্রাহ্মসম্পাদকের কাগজে এইরূপ হওয়ায় সাধারণকে আর কিছু বলিবার নাই। সবুজপত্রে, মালঞ্চ প্রভৃতিতেও এইরূপ গল্প ছাপা হইতেছে, যাহা পাঠ করা যায় না। যাঁহাদের নিকট দেশের আশা ভরসা, তাঁহাদের দ্বারা এরূপ কাজ হইলে কে দেশকে রক্ষা করিবে? আমরা সম্পাদকগণের চরণে বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা দেশকে স্বেচ্ছাচারিতা এবং অবাধ ইন্দ্রিয়-লালসার হস্ত হইতে উদ্ধার করুন। বেশ্যাদির কদর্য্য কাহিনী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারে, পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারিতাম না। বঙ্কিম চন্দ্র একসময়ে "চুম্বিত করিলেন" লিখিয়া উপহসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন দিন দিন লোকের সাহস বাড়িতেছে। কেহ কিছু বলিতেছেন না। আষাঢ়ের সংখ্যা নারায়ণের উপরে শ্রাবণ সংখ্যা উঠিয়াছে। ইহাই কি কৃষ্ণলীলা-তত্ত্বের পরিণাম! কি জঘন্যতা!! থিয়েটারের বিরুদ্ধে "সঞ্জীবনী" প্রভৃতি পত্রিকা লিখিয়া থাকেন, কিন্তু এই সব গল্পের বিরুদ্ধে কিছুই লিখিতেছেন না দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিগণ যে সকল কাগজে সংশ্লিষ্ট, সেই সব কাগজে অমার্জ্জিত কুরুচি প্রশ্রয় পাইতেছে, এদুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। আর কাহার নিকট প্রত্যাশা করিব? সকলের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন কদর্য্য ছবি ও অশ্লীল গল্পের প্রচার কিছুতেই বন্ধ হইবে না।

(২৪)

বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র-মহলে আজকাল আবার কবির লড়াই আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইতেছি। বঙ্গবাসী, বসুমতী প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে যেরূপ ভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ চলিতেছে, কোন রূপেই তাহার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। যাঁহারা প্রাচীন সাহিত্যিক, তাঁহারা কেন এরূপ ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার করিতেছেন, বুঝি না। দোহাই বিধাতার, তাঁহারা ক্ষান্ত হউন। এরূপ করিলে যে লোকের রুচি-বিকৃতি ঘটে, তাহা সকলের মনে রাখা উচিত। অশিষ্ট এবং অসংযত লেখা সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জনীয়।

(২৫)

কটকের সুবিখ্যাত "ষ্টার-অব-উৎকল" প্রেসের জন্য গবর্ণমেণ্ট, বিদ্বেষমূলক লেখার দরুণ ২০০০৲ ডিপজিট চাওয়ায় ঐ প্রেস ও কাগজ, ২১শে জুলাই, ১৯১৫, হইতে বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া আমরা যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। ১০ বৎসরের অধিক কাল কাগজ খানি কৃতিত্বের সহিত নিরপেক্ষ ভাবে সম্পাদিত হইতেছিল। গবর্ণমেণ্ট-বিদ্বেষ-সূচক কোন লেখা উহাতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। ধীরতা এবং বিজ্ঞতার সহিত সপ্তাহে ৩ বার প্রকাশিত হইত। জাতি-বিদ্বেষ যখন উৎকলের সর্ব্বত্র পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে, সেই সময়ে এই নিরপেক্ষ কাগজ খানি উঠিয়া যাওয়ায় বড়ই অনিষ্ট হইল। বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে সম্পাদক মহাশয় যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে

* * *

প্রাপ্তগ্রন্থের স সমালোচনা।

৮। চীরব। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র প্রণীত, মূল্য ১।০। বঙ্কিমচন্দ্র ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের উপযুক্ত কৃতী সন্তান। তিনি পিতার আদর্শ ধরিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বদ্ধপরিকর, ইহা এদেশের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের ন্যায় দীনবন্ধু-পরিবারের লোকেরাও বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এইরূপে কৃতী সন্তান দীনবন্ধুর সুনাম এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইহাই উপযুক্ত স্মৃতি-সংরক্ষণ। এই আদর্শ পরিবারের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হউক।

আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার একান্ত পক্ষপাতী। তিনি সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি। এই জন্যই এই পুস্তকের নাম চীবর রাখিয়াছেন। অহঙ্কারের লেশ মাত্রও তাঁহার হৃদয়ের ত্রিসীমায় স্থান পায় না। তিনি এত বড় কবি, কিন্তু পুস্তকের নাম রাখিলেন, চীবর। কি দীনতা, কি আত্মত্যাগ। বঙ্কিমচন্দ্রের সুরুচিপূর্ণ সাত্ত্বিকভাবের লেখা এদেশে বহু-বিস্তৃত হউক। তিনি সাত্ত্বিকভাবের কবি, তাই "আমি" কবিতায় লিখিয়াছেন—

"কেমনে চিনিব আমি
আমার সে অন্তর্যামী;
নয়নের চেনা নিয়ে মরমের চেনা দাও,
সে নূতন পরিচয়ে নিকেতন মাঝে নাও॥"

পরন্তু "তুমি" কবিতায় আবার লিখিতেছেন—

"তোমাতে চিনা'তে হরি!
এলে কত রূপ ধরি;
কতরূপে আছ নিত্য কত তীর্থে এধরায়;
অনন্তে অজ্ঞাত যাহা, সান্তে তাহা জানা যায়।
এ ভূমায় ভাসিতেছ,
আমি হ'য়ে আসিতেছ;
আপনি অস্ফুট তুমি, আমাতেই ফুটিতেছ;
ব্রহ্মাণ্ডে আঁটে না যাহা, অণুতে তা' রাখিতেছ।

তুমি আমি চির সাথী,
আমাতে তোমার(ই) ভাতি,
তোমার(ই) মৃণালে আমি বিকশিত শতদল,
তোমার(ই) বরণ শোভা, তোমার(ই) সে পরিমল।

কবি, লেখক এবং চিত্রকর এদেশে ওদেশে অনেক আছে। কিন্তু কয়জন নরনারীর চিত্তে বিশুদ্ধতা এবং সাত্ত্বিকভাব মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন? কবি কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং কাঙ্গাল হরিনাথ এ পথের নেতা। তাঁহাদের সম-আসনে বসিতে পারেন, কবি বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার "চির আহ্বান" প্রভৃতি কবিতা বড়ই সুন্দর হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাত্ত্বিকতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া সোজা নয়। চীবর পুস্তকখানির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, ছত্রে ছত্রে তাহা প্রতিফলিত। পুস্তকখানি সুধীসমাজে আদৃত হইলে আমরা আনন্দিত হইব।

৯। চন্দ্রহাস-বিষয়া। শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রণীত, মূল্য ॥০। "জৈমিনি ভারতের" উপাখ্যান ভাগ লইয়া প্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় "চন্দ্রহাস" নাট্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ ঐ উভয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি সকলেরই পাঠের যোগ্য হইয়াছে। ছেলে বুড়, জ্ঞানী মূর্খ, সকলেরই প্রণিধানের বিষয়। অমূল্য কাহিনী, অমূল্য বিবৃতি।

ভাব ও রস।

ভাব কখন রসহীন, রস কখন ভাববর্জ্জিত হয় না। ভাব ও রস পরস্পর সাপেক্ষ। উভয়েই উভয়ের অধীন। পরস্পরের সিদ্ধি পরস্পরের আয়ত্তে। ভাব যেস্থলে দুর্ব্বোধ্য, অস্পষ্ট, রসের অনুভূতিও সেস্থলে যথাযথ হয় না। ভাব সম্যক্ বোধগম্য না হইলে কখনই রসের অনুভব জন্মে না। রসের অভিব্যক্তি হইল, অথচ ভাব বোঝা গেল না—ইহা সম্ভব নহে। ভাব বোঝা না যাইলেই বুঝিতে হইবে যে, রস সম্যক্ অনুভূত হয় নাই। ভাব ছাড়িয়া রস অবস্থান করে না। ভাবও অবশ্য রসবর্জ্জিত হয় না, কিন্তু রসরূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে ভাবের অভিব্যক্তি হইতে পারে না।

ভাব দুগ্ধ, রস ক্ষীর। ভাব কুসুমকলি, রস বিকচকুসুম। ভাব তণ্ডুল, রস ওদন। ভাব উপরে ভাসে, ভিতরে খেলে; রস ভিতরেই চির বিশ্রান্তি লাভ করে। ভাব অন্তরে উপ্ত হইলেও বৃক্ষরূপে বর্দ্ধিত, পশ্চাৎ ফল ফুলে সুশোভিত হয় না; ভাব চিত্তে স্থায়ী রেখাপাত করে না। রস বৃক্ষরূপে বর্দ্ধিত ফলফুলে সুশোভিতই হইয়া থাকে, চিত্তে স্থায়ী রেখাপাত করাই তাহার কার্য্য। ভাব স্থায়ী হইলেও অন্তর দ্রবীভূত, অলৌকিক আনন্দে তন্ময় করিয়া তুলে না। অন্তরকে দ্রবীভূত করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দে তন্ময় করাই রসের স্বভাব।

ভাব চিত্তের সাধারণ ধর্ম্ম। রস চিত্তের চমৎকারিতাময় অলৌকিক ধর্ম্ম। ভাব অন্তরের সামান্য স্নিগ্ধ অবস্থা মাত্র। রস অন্তরের অসামান্য অপূর্ব্ব দ্রবীভাবময় লোকত্তোরানন্দময়ী অবস্থাবিশেষ।

দুগ্ধ হইতে দধির মত, তণ্ডুল হইতে অন্নের মত রস ভাবেরই রূপান্তর মাত্র। ভাবেরই সম্যক্ পরিপুষ্টি ঘটিলে রস আখ্যা। ভাবের সর্ব্বাঙ্গীন সার্থক পরিণতিই রস। ভাবই গাঢ় হইয়া রসত্বে পরিণত হইয়া থাকে। ভাবের উদয় সহজে হইতে পারে, কিন্তু রসের অভিব্যক্তি সহজে হয় না। সহৃদয়ের হৃদয়ই রসানুভবের যোগ্য পাত্র। একটী কবিতা পাঠে, একটী সঙ্গীত শ্রবণে, একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িতা আলোচনায় ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সহজে রসত্বে পরিণত হয় না। ভাবেরই অসীম বিস্তৃতি, প্রগাঢ়তম গভীরতা ও চরম উৎকর্ষ সাধিত হইলে তখনই রসের অভিব্যক্তি—এই কারণে অনেক সুধীরাও রসকে গভীর ভাব নামেও ব্যবহৃত করিয়া থাকেন।

রস একটী অপূর্ব্ব তন্ময়তা, অলৌকিক আনন্দ, অনুপমেয় আবেশ। রস কেমন, তাহা বোঝা যায় না; বোঝান যায় না, কেবল দ্রবীভূত অন্তরে উপলব্ধি করা যায়, অনুভব করা যায়। রস ভাষায়, বাক্যে প্রকাশ্য নহে বলিয়াই অনির্ব্বাচ্য। বাহ্য সুখের সহিত অলৌকিক আনন্দ বিশেষাত্মক রসের তুলনাই হয় না বলিয়া ব্রহ্মস্বাদ সহোদর। ব্রহ্মানন্দ যেমন স্বয়ং বেদ্য, রসও তদ্রূপ স্বয়ং বেদ্য। ব্রহ্মানন্দ যেমন অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয়, রসও তদ্রূপ অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয়।

রজস্তমোভাবের মালিন্য রসে নাই।

রসে আছে খাঁটী সত্ত্বভাব। শোক ক্রোধ মোহের মালিন্য রসকে আদৌ স্পর্শ করে না। তাই রস শান্তিময়, অপূর্ব্ব সুখময়, ব্রহ্মানন্দ সহ উপমিত। করুণ রসে শোক, রৌদ্র রসের ক্রোধ স্থায়ী হইলেও. এই ক্রোধ ও শোক বাহ্য মালিন্যময় সংসারের ক্ষুদ্র শোক জঘন্য ক্রোধ নহে। করুণ রসে শোক যদি দুঃখপ্রদ হইত, তবে কোন্ সহৃদয় করুণ রসানুভবে ব্যগ্র হইত? শোক কে চাহে, শোকজনিত কষ্টভোগ করিতে কে চাহে? সহৃদয় রসজ্ঞ সুধী ব্যক্তিগণ যখন করুণ রসাশ্রিত গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য লালায়িত. তখন ঐ শোক কখনই দুঃখপ্রদ নহে। দুঃখপ্রদ হইলে উহাতে এমন একটী গভীর আনন্দ, অতুলনীয় শান্তি বিরাজমান, যাহার জন্য সহৃদয় ব্যগ্র না হইয়া থাকিতে পারে না, এই করুণ রসে যে রোদন, তাহা আনন্দের না হইলে কে সাধ করিয়া কাঁদিতে যাইত। সংসারের সাধারণ ক্ষুদ্র শোক আর করুণ রসের শোক, এক বস্তু নহে। আদিরসের রতিকে কাম মনে ভাবিয়া ইন্দ্রিয়-উত্তেজনা যদি কাহারও হইতে দেখা যায়, সেজন্য রতি কাম হইয়া যাইবে না। রতি ক্ষুদ্র রতি বা কাম নহে, শোকও ক্ষুদ্র বাহ্য শোক নহে। রৌদ্র রসের ক্রোধেও তদ্রূপ এই জঘন্য ক্রোধ নহে। কাব্যের কল্পনা—যাহা চিত্তের প্রশস্ততা ও গভীরতা-বর্দ্ধক, তাহাকে মিথ্যা বলা যেমন সাজেনা, করুণ রসের শোক, রৌদ্র রসের ক্রোধ, আদিরসের রতিকে কামনার দৃষ্টিতে সাংসারিক কুবৃত্তি বলাও তেমনই সাজে না। মিথ্যা, অতএব কাব্যের সার, কাব্যের অলঙ্কার কল্পনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেও, ক্রোধ শোক কামকেও তদ্রূপ হেয় বলিয়া নিষ্কাশিত করার ব্যবস্থা কর! কোন কোন ধার্ম্মিক আছেন,যিনি কাব্য হইতে আদিরসকে দুর করিতে চাহেন, শন্তিরস রাখিয়া করুণ রৌদ্র বীভৎস প্রভৃতি রসকেও স্থান দিতে ইচ্ছা করেন না। রজস্তমোভাব না থাকায় রসে বাহ্য মালিন্যের প্রভুত্ব নাই। রসজ্ঞের অভাবে যদি রস-বিকৃতি হইয়া তুচ্ছ কাম ক্রোধে শোক বীভৎস ভাবের উদ্রেক করে, বা কবির দোষে ঐ অস্বাভাবিক বিকৃতি উৎপাদন করে, সেজন্য রসের দোষ দেওয়া যায় না। রুচি-প্রবৃত্তির দোষে সদুপদেশও কুভাবে গৃহীত হইতে পারে।

এই যে ভাবের কথা বলিয়া আসিতেছি, উহার আলঙ্কারিক দত্ত নাম স্থায়ী ভাব। এই স্থায়ী ভাবই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া রস রূপে পরিণত হয়। বিভাব—আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। যাহাকে অবলম্বন করিয়া রসের বিকাশ—তাহাই আলম্বন; যথা নায়িকাদি। রসের যাহা উদ্দীপক, তাহাই উদ্দীপন বিভাব; যথা চন্দ্র তারা ফল পুষ্প কোকিল ভ্রমরাদি। অনুভাব—রূপ যৌবন বিলাস ভ্রূবিক্ষেপাদি। "নির্ব্বেদাবেগদৈন্যশ্রমমদ জড়তা" প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। ব্যভিচারী ভাব, ভাব হইলেও, উহা স্থায়ী নহে বলিয়া ভাবশব্দে গ্রহণ করি নাই।

চমৎকারিতা, তন্ময়তা, আনন্দবিশৈষ্ট্যও বৈচিত্র্যরসে বিদ্যমান থাকে। ব্যভিচারীভাবদ্বারা ভাবের বৈচিত্র্য সাধিত হইয়া চমৎকারিতার বৃদ্ধি করে, ফলে আনন্দাতিশয্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থায়িভাব প্রত্যেক রসের একটী; ব্যভিচারীভাব কতকগুলি করিয়া থাকে। তবে

নির্ব্বেদাবেগদৈন্য শ্রমমদ জড়তা লজ্জা মোহ প্রভৃতি যে কোন একটীকে কোন রসে থাকিতেই হইবে, এ নিয়ম নাই। আর ব্যভিচারীভাব বুদ্বুদের মত উঠে, বুদ্বুদের মতই মিলাইয়া যায়, স্থায়ী একেবারেই হয় না। ব্যভিচারীভাবগুলি বিদ্যুৎস্ফুরণের মত ফুটিয়া রসের বিকাশ ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করে, ফলে রসাত্মক বাক্য অমৃতবৎ উপাদেয় হইয়া উঠে। স্থায়ীভাব তাহার অবিরোধী, এই ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াই (বিভাব ও অনুভাবের দ্বারাও অবশ্য) রস সংখ্যা লাভ করে। ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে কোনগুলি বিরোধী, কোন্‌গুলি অবিরোধী—ইহা রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারেন; তথাপি আলঙ্কারিক তাহার তালিকা ঠিক করিয়া দিয়াছেন। কোন্ স্থায়ী ভাবের সহিত কোন্ ব্যভিচারীভাবের মিলন দোষের, রসানুভবের ব্যাঘাতকর, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন।

যাহার গলা নাই, তাহার গান গাওয়া যেমন সাজেনা, যাহার হৃদয় নাই, তাহারও রসানুভব করিবার সুখলাভ করিতে যাওয়া তেমনই সাজেনা। যার প্রাণ নাই, তাহাকে যতই কেন বোঝাও না, রসবোধ কোন মতেই জন্মিবে না। রস সহৃদয় সম্বেদ্য, স্বপ্রকাশ। সহৃদয় ব্যতীত অপরের রসের উপলব্ধি হয় না, উহার প্রকাশও কেহ করিয়া দিতে পারে না। চিন্তা যেমন দর্শনশাস্ত্রের প্রাণ; চিন্তা ব্যতীত দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি প্রাণহীন, রসও তদ্রূপ কাব্যের প্রাণ, রস ব্যতীত কাব্য জড়, মৃত। যিনি চিন্তাশীল নহেন, দর্শনশাস্ত্র পড়িলেও তাঁহার প্রকৃত ফল ফলে না, সহৃদয় রসজ্ঞ কাব্যপাঠও তাঁহার নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ রসকে কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন। শব্দ ও অর্থকে শরীর করিয়া রসকে সেই শব্দার্থ শরীরের আত্মা করায় রসেরই শ্রেষ্ঠতা উদ্বোধিত করিয়াছেন। কাব্য জড়, আত্মশূন্য শরীরতুল্য মৃত। শব্দার্থ কাব্যশরীরীর শরীর, কিন্তু রসাত্মক হইলে ঐ শব্দার্থ সজীব। শরীর আত্মযুক্ত থাকিলেই জীব। রস ব্যতীত শব্দার্থ প্রাণস্পর্শী হয় না; সে প্রাণহীন শব্দার্থপ্রয়োগ সম্পূর্ণ নিষ্ফল। রস চৈতন্য বিশিষ্ট হইয়াই শব্দার্থ অসীম কার্য্য করে।

রসের অভিব্যক্তি করায় কবির সহজ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেই রস রসভাব-সঙ্কর দুষ্ট হইল কিনা, তাহার সম্যক্ বোধের জন্য মহাকবিগণের কবিত্বালোচনা করা, আলঙ্কারিকগণের কবিত্ব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সমালোচনার উপর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অন্য বিরোধীভাবের দ্বারা সঙ্কর দোষ কি, কিরূপভাবে রসের বিকাশ অধিকতর সুন্দর—ইহারও একটী ইতিহাস পাওয়া যায়।

কাব্য পড়া শেষ হইয়া গেল, নাটকের আগাগোড়া অভিনয়ও শোনা শেষ হইল, কিন্তু প্রকৃত তন্ময়তা আসিল না, স্থায়ী প্রগাঢ় ভাবের রেখাপাত হইল না, প্রকৃত আবেশময় মাতোয়ারা, অসীম লোকোত্তর আনন্দ পাওয়া গেল না। ইহার কারণই এই রসসৃষ্টিনৈপুণ্যের অভাব বা বিরোধিরস ভাবান্তরের সঙ্কর-দোষ।

তৃষ্ণার্ত্ত একটু একটু করিয়া জলপান করে, সহৃদয় রসজ্ঞেরা অল্পে অল্পে ধারাবাহিক রসানুভব করিতে ভালবাসেন। অবিশ্রান্ত হুড় হুড় করিয়া জল ঢালিয়া

দিলে জল-পিপাসা মিটে না, সবেগে রসস্রোত প্রবাহিত করিলেই প্রকৃত রসানুভূতি জন্মে না। রসানুভব নিদ্রার আবেশের মত ধীরে ধীরেই রসিক ভাবুকের অন্তঃকরণ অধিকার করে, নববধূর মত ধীরে ধীরে লজ্জা আবরণ উন্মোচন করিয়া দেয়। সুষুপ্তির প্রগাঢ় তন্ময়তা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতময় কোলাহলের মধ্যে আইসে না - ইহা আজিকালি অনেকের ধারণা নাই। অভিনয় মঞ্চে দেখ, গর্ভাঙ্কের গর্ভাঙ্ক হু হু করিয়া চলিয়া যাইতেছে,রসের পর রসান্তরের সঙ্ঘর্ষ নিরন্তরই চলিতেছে, ঘটনার উপর ঘটনার স্তূপ ক্রমাগতই চাপান হইতেছে, শ্রোতৃবৃন্দের জয়োল্লাসের বিরতি নাই। ফলে অভিনয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে না, স্থায়ীভাব লইয়া শ্রোতৃবর্গ গৃহে ফিরিতেছে না। ছোট কবিতা ও গল্পের মধ্যে বিরোধিসংঘর্ষ বড় নাই, কিন্তু রস মোটেই জমে না। কোন একটী ভাবের উদ্রেক করিয়া দিতে পারিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল না ; ও ভাব প্রকৃত রসরূপে পরিণত লাভ করিয়াছে কিনা, দেখা আবশ্যক। ১৫।২০ বৎসর ধরিয়া কবিতা, ছোট গল্প ও উপন্যাস পড়িয়াছেন, এমন ব্যক্তি অনেকের মুখেই শুনিয়াছি যে, "সে সমস্ত বহি দেখিলেও পড়িয়াছি বলিয়া মনে করিতেও পারি না।" ছোট কবিতা সম্বন্ধে না হয় মার্জ্জনা করা গেল, কিন্তু গল্প পড়িয়াও যদি ঐরূপ ফল হইল, তাহা হইলে সে সকল গল্পাদিতে রস জমিয়াছিল বলিয়া কেহ কি মনে করিতে পারেন ?

ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের উপর মোহ রসানুভব নহে। গল্প শুনিবার জন্য উৎকট আগ্রহ শিশুগণেও দেখিতে পাওয়া যায়। বলিতে হইবে কি যে, উহা রসানুভব ? বিদ্যুতের মত বিস্ফুরণ, বুদ্বুদের মত উত্থান, ভূমিকম্পের মত আলোড়ন-রসের কার্য্য নহে।

আমাদের অনুরোধ, বাঙ্গালার কবিগণ সাহিত্যদর্পণ পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। অন্ততঃ রস, দোষ গুণরীতি অলঙ্কার, এই কয়টী বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করেন। ফল যে ভাল হইবে, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। সকলেই ত আর সহজ কবি নন যে, রস অলঙ্কার বোধ জন্মলব্ধ। প্রকৃত সহজ কবিদের অবশ্য রস ও অলঙ্কারতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞান আছে বলিয়া উহার প্রামাণ্য ও উপযোগিতা কম হইয়া যায় না।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা।

পরাবিদ্যা সমিতি কি এবং কি নয়।

যদি কেহ মনে করেন, পরাবিদ্যা-সমিতি একটা নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছে, বা করিতে প্রয়াসী, তবে তিনি ভ্রান্ত। যদি কেহ মনে, করেন, পরাবিদ্যা-সমিতি কোন প্রাচীন ধর্ম্ম বিশেষের শাখা মাত্র, তবে তিনিও ভ্রান্ত। পূর্ব্বে ইহার উদ্দেশ্য অলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, এবং সকলেরই বুঝা উচিত যে, এই সমিতি কোন নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ও নহে, অথবা কোন প্রচলিত ধর্ম্ম বিশেষের শাখাও নহে। বুঝা উচিত বটে, তথাপি ইহা অনেকে বুঝেন নাই। বোধ হয়, তাঁহারা

অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই বলিয়াই বুঝেন নাই। নতুবা, ইহা এত সুস্পষ্ট যে, যাঁহারা উক্ত সমিতির কিছু মাত্র পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের না বুঝিবার কোন কারণ নাই। তাই কেহ বলেন, ঐ সমিতি হিন্দু ধর্ম্মের প্রচার করে; কেহ বা একথা অস্বীকার করিয়া বলেন, উহা বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী। আবার কাহারও কাহারও নিকট এরূপও শুনা গিয়াছে যে, এই সমিতি হিন্দুর নিকট হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম, এবং অপর ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট তাহার ধর্ম্ম প্রচারের ভাণ করে মাত্র, কিন্তু উহার গুপ্ত উদ্দেশ্য শেষে সকলকে খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করা, কারণ উহার প্রচর্ত্তকগণ জন্মগত খ্রীষ্টিয়ান। অতএব সাধু সাবধান! * বলা বাহুল্য, অপর শ্রেণীর অনুসন্ধান-বিমুখ লোকের অপেক্ষা এই মতাবলম্বীরা আরও অজ্ঞ। ইঁহারা অজ্ঞ হইয়াও সমিতির স্কন্ধে একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক গুপ্ত উদ্দেশ্য চাপাইতে যত্নবান। এজন্য ইঁহাদের অজ্ঞতা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, থিওসফি কথাটীর অর্থ প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান। এই ব্রহ্মজ্ঞান কোন ব্যক্তির, বা কোন জাতির, বা কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। অধিকারী হইলে সকলের নিকটেই ইহার দ্বার উন্মুক্ত; সকল সম্প্রদায়ে, সকল জাতিতেই এইরূপ অধিকারী থাকিতে পারে, কাজেই সকল সম্প্রদায়ে, সকল জাতিতেই অল্পাধিক পরিমাণে ব্রহ্মজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব। সর্ব্ব-দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনায় দৃষ্ট হয় যে, সর্ব্ব জাতিতেই অল্পাধিক সংখ্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী মহাজনগণ উদ্ভূত হইয়া তত্তৎ জাতিকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। এই সার্ব্বজনিক, অসাম্প্রদায়িক ব্রহ্মজ্ঞানের অপর নাম বিদ্যা। পরতত্ত্ব যে বিদ্যার অধিগম্য, তাহাই পরাবিদ্যা। থিওসফিকাল সোসাইটি এই পরাবিদ্যার প্রচার করেন। সুতরাং পরাবিদ্যার যাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত, সর্ব্বধর্ম্মানুমোদিত প্রাপক, সেই ত্যাগ, শম, দম, উপরিতি, তিতিক্ষা, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতিরও প্রচার করেন। ইহাতে ধর্ম্মের বাহ্যিক অঙ্গের কোন অপেক্ষা নাই। তুমি পশ্চিমমুখ হইয়া ঈশ্বরকে ডাক, বা পূর্ব্বাস্য হইয়া পূজা কর, বা নতজানু হইয়া প্রার্থনা কর, বা প্রার্থনাচক্রের আবর্ত্তনে মন্ত্রজপ কর, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। তুমি জাতিভেদ মান, বা না মান, ত্রিসন্ধ্যা স্নান কর বা মোটেই না কর, শিখা-সূত্র-তিলক-কণ্ঠী ধারণ কর বা ত্যাগ কর, সাকার উপাসনা কর বা নিরাকারবাদী হও, তুমি আচারে আহারে, পরিচ্ছদে, বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে হিন্দু হও, বৌদ্ধ হও, খ্রীষ্টান হও, মুসলমান হও, তাহাতে সমিতির কিছুই বলিবার নাই। এ সকলই দেশ-কাল-অবস্থাজাত। সুতরাং এ সকল বিষয়ে ভেদ থাকিবেই। দেশ কালাতীত পরা বিদ্যার সহিত এ সকলের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। সমিতির কার্য্য পরাবিদ্যা প্রচার, এবং উহা লাভ করিবার যে সকল উপায়, তাহার আলোচনা। পরন্তু উক্ত বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে

---

* এক খানি মিশনরি-প্রচারিত পুস্তিকায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, শ্রীমতী আনি বেশান্ত-স্বয়ং (পরাবিদ্যা সমিতির বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট) শেষ জীবনে রোমান কাথালিক খ্রীষ্টান হইবেন। এ আশা সত্য হউক, বা মিথ্যা হউক, অজ্ঞ লোকের পক্ষে ইহা শুনিয়া সমিতির উপর উপরোক্ত উদ্দেশ্যের আরোপ করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

যেটি যাহার প্রকৃতির অনুকূল, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়তাকারী, সেটী তাহার সেবনীয়। উহাদের সম্বন্ধ দেশকাল পাত্র লইয়া, সুতরাং দেশকাল অবস্থানুযায়ী, এবং প্রয়োজনের তারতম্যানুসারে ঐ সকল আচার অনুষ্ঠান অল্পাধিক পরিমাণে অলম্বনীয় হইতে পারে। কিন্তু যাহা দুর্নীতির উত্তেজক, বা মানব মনকে অধোগামী করিয়া পশুত্ব-পাশে আবদ্ধ করে, সুতরাং যাহা পরা বিদ্যার প্রতিকূল, ত্যাগ-বৈরাগ্য সংযমের বিরোধী, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। পরাবিদ্যা সমিতি ইহা বলিয়া থাকেন।

পরাবিদ্যার কথায় অপরা বিদ্যার আলোচনাও অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য সকল শাস্ত্রের ব্রহ্ম-তত্ত্বের সহিত জগৎ-তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। আমাদের প্রত্যেক শাস্ত্রে, প্রত্যেক দর্শনে অনুলোম বিলোম ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ সংকোচ এবং জড়তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে কারণ অপরার জ্ঞান না হইলে পরাকে বুঝা কঠিন। কঠিন বলিয়া, এবং প্রকৃতির প্রেরণা বশতঃ অধিকাংশ লোকই অপরা লইয়া উন্মত্ত, পরার দিকে কম লোকই উন্মুখ। ইহার আর এক কারণ এই যে, মানব প্রকৃতি এবং বাহ্য প্রকৃতির স্তরে স্তরে জড় চৈতন্যের এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে ক্রীড়া চলিতেছে যে, উহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করা অতীব দুরূহ। বহির্ম্মুখ মানব এইজন্য প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তেই একের ধর্ম্ম অন্যের উপর আরোপ করিয়া বসে। অনেক বহির্ম্মুখ পণ্ডিতও এই 'বিপর্য্যয়' বুদ্ধির বশীভূত হইয়া জড়চৈতন্যের গোলক ধাঁধায় নানা পথের, নানা মতের উদ্ভাবন করিয়াছেন। যাঁহার দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখ হইয়াছে, দৃশ্য জগতের প্রকৃতিতত্ত্ব বোধ হয় তিনিই অনুভব করিতে সমর্থ। যাঁহারা প্রকৃতির পর পারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বোধ হয় তাঁহারাই বলিতে পারেন, এই জড় চৈতন্যের ছাড়াছাড়ি কোথায়। যাঁহারা ততদূর পৌঁছান নাই, তাঁহাদের পক্ষে বিচার আবশ্যক, জড় চৈতন্য, নিত্যানিত্য বস্তু বিচার আবশ্যক। এই বিচার প্রণালীর সহিত প্রকৃতি-বিজ্ঞান, রসায়ন-শাস্ত্র,জ্যোতিষ শাস্ত্র অনেক পরিমাণে জড়িত। জগতের ইতিবৃত্ত,জাতি-তত্ত্ব প্রভৃতির সহিতও উহার সংশ্রব আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত পাঠিত এই সকল অপরাবিদ্যার আলোচনা জগতে বহুল পরিমাণে হইতেছে সত্য। কিন্তু উহার উদ্দেশ্য অন্য রূপ বলিয়া গতি পরাবিদ্যার দিকে নহে, বরং বিপরীত দিকে। অধ্যাত্ম শাস্ত্র যেরূপ জগৎতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা মানবকে পরতত্ত্বের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে। অধ্যাত্ম শাস্ত্রানুগামী পরা-বিদ্যা-সমিতি ঐ সকল অপরা-বিদ্যার প্রয়োজনীয় অংশের আলোচনা দ্বারা নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকের,—আত্মজ্ঞান লাভের সহায়তা করিয়া থাকে। অর্থাৎ মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অপরা বিদ্যাকে যেন 'মোড় ফিরাইয়া' উহার বর্ত্তমান স্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া পরম তত্ত্বের দিকে লইয়া যাইবার জন্য এই সমিতি বিশেষ রূপে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই কার্য্য কতদূর গুরুতর, এবং পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায়, উপস্থিত যুগে, কতদূর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই অবিশ্বাসী-

দিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছে। যাহারা স্বধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে অসমর্থ, তাহারা চিরকালই ত্যজ্য। বিশেষতঃ ধর্ম্মের বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া যাহারা ব্যাপৃত, শাস্ত্রের ভাব অপেক্ষা আক্ষরিক অর্থ লইয়াই যাহারা অধিক ব্যস্ত, তাহারা স্বধর্ম্মত্যাগীর উপর খড়্গহস্ত হইবেই। এই স্বধর্ম্মত্যাগীদের ভিতর কেহ ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করিয়া থাকে, কেহ বা কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। শেষোক্তগণ সাধারণতঃ নাস্তিক নামে খ্যাত। ইহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইলেও, কি জাতীয়, কি বিজাতীয় কোন বিশেষ ধর্ম্মোক্ত আচার প্রণালীতে অনাস্থাবান হেতু সম্প্রদায় বিশেষে নাস্তিক নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। সম্প্রদায় বিশেষে ইহাদিগকে পাষণ্ড বলা হইয়া থাকে। পাষণ্ডদিগের সহিত সংশ্রব, এমন কি, আলাপ ব্যবহার পর্য্যন্ত ঐ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের নিষিদ্ধ কর্ম্ম। অর্থাৎ পাষণ্ডেরা সর্ব্ব প্রকারেই ত্যজ্য। এ ত্যাগের মূলে কেবল আত্মরক্ষাই যে রহিয়াছে,তাহা নহে। প্রবর্ত্ত সাধকদিগের পক্ষে প্রথমাবস্থায় অবিশ্বাসীর সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ আছে। কিন্তু যাহারা সাধক, তাহাদের পক্ষে ঘৃণা বিদ্বেষ নিতান্ত দূষণীয়, সাধনের অন্তরায় বলিয়া ঐ সকল প্রবৃত্তি তাঁহারা মনে স্থান দেন না। তাঁহারা পাপকে ঘৃণা করিলেও পাপীকে ঘৃণা করেন না। সুতরাং তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সকলে সাধক নহে, বরং অনেকেই উপরোক্ত নাস্তিক-নাম-প্রাপ্তদিগের অপেক্ষা কম অবিশ্বাসী নহে। "আলাপাৎ গাত্র সংস্পর্শাৎ নিশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ"—ইত্যাদি সতর্কীকরণ বাক্যের প্রয়োগস্থল স্বতন্ত্র, সর্ব্বত্র নহে, সুতরাং অনেকটা সীমাবদ্ধ। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই ত্যাগের মূলে একটা বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান, অথবা আত্মরক্ষা ও পর-বিদ্বেষ দুই-ই মিশ্রিত।

বস্তুতঃ যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান নহে, আত্মার অবিনশ্বরত্ব বা পরকাল স্বীকার করে না, তাহারাই নাস্তিক নামের যোগ্য। এই নাস্তিকদিগের মধ্যে সকলেই যথেচ্ছাচারী নহে। ইহাদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ দেখা যায়। ইহাদের কাহারও কাহারও মতে যাহা অধিকাংশ লোকের অধিক পরিমাণে মঙ্গলের নিদান, তাহাই কর্ত্তব্য। তাহা কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত হউক বা না হউক, তৎপ্রতি তাহাদের লক্ষ্য করিয়া প্রয়োজন নাই। এই 'উপযোগিতা'-মতবাদীরা (utilitarians) তদনুরূপ নীতির অনুসরণ করে। ইহারা সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যথেচ্ছাচারী নহে। কেহ কেহ বা প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) কেহ কেহ বা যুক্তিবাদী (Rationalist)। কেহ কেহ অজ্ঞেয়বাদী (agnostic)। ইহাদের মতে ঈশ্বর থাকিলেও তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (The unknown and unknowable)। * আবার আর এক শ্রেণী আছে,

---

* এই মতের একজন প্রসিদ্ধ পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর ভারতহিতৈষী বাগ্মীশ্রেষ্ঠ মিঃ ব্রাডল (Mr. Charles Bradlaugh)। তিনি বলেন—"The atheist does not say there is no God, but he says, 'I know not what you mean by God; the word God is to me a sound conveying no clear or distinct affirmation. I do not deny God, because I can not deny that of which I have

যাহাদের মত, "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ," অর্থাৎ যতদিন বাঁচ, ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিয়া লও, ঋণ করিয়াও ঘৃত পান কর। ইহাদিগকে চার্ব্বাক-মতাবলম্বী নাস্তিক বলে। ইহাদেরই অপর মূর্ত্তি পাশ্চাত্য দেশের শরীর-সর্ব্বস্ববাদী (Epicurians) যাহাদের উপদেশ 'খাও দাও, মজা কর' (Eat, drink and be merry)। ইহাদের মধ্যে নৈতিক বন্ধন খুব শিথিল হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ, যাহারা পরকাল স্বীকার করে না, জগতের কোন বিধাতা আছেন বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদের প্রবৃত্তি-পথের প্রতিরোধক এক প্রকার কিছুই নাই বলিলেও চলে। রাজবিধিকে ফাঁকি দিয়া তাহারা সহজেই স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে এবং সামাজিক জীবন দূষিত করিতে পারে। বিশেষ বিচারশীল ব্যক্তি ছাড়া ইহাদের অনেকেরই নৈতিক অবস্থা শোচনীয় কথা। যাহাদের নৈতিক জীবন দূষিত নহে, তাহারাও আধ্যাত্মিক হিসাবে এক প্রকার পতিত, ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন, কারণ, তাহারা ইহকাল ছাড়া পরকাল সম্বন্ধে একেবারেই দৃষ্টিহীন, দেহাতিরিক্ত আত্মাতেও সম্পূর্ণ বিশ্বাসহীন।

এই সকল পতিতকে সমাজ নিন্দা করে, বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। কিন্তু উহাদের উদ্ধারের জন্য কোন যত্ন করে না। পরাবিদ্যা-সমিতি প্রাণপণে সেই যত্ন করিয়া থাকে, এবং সেইজন্য উহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সঙ্গে নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী-দিগকেও এই সমিতি আলিঙ্গন দিয়াছে। নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী সমাজ-বিদ্বিষ্ট হইলেও মানব-সমাজ ছাড়া নহে। মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ-ক্ষেত্রে ইহারাও একটী বিশিষ্ট স্তর। ইহাদিগকে বাদ দিলে চলিবে না, তুলিয়া নিতে হইবে। সমাজ বিশেষ, বা সম্প্রদায় বিশেষ ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু যাহার কার্য্যক্ষেত্র সমগ্র মানব সমাজ, লক্ষ্য সমগ্র মানব জাতির আত্ম জ্ঞানের উন্মেষ, সেই পরাবিদ্যা-সমিতি ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারে না। বরং এই সকল জীব লইয়া ইহার প্রধান কার্য্য। ব্যাধিগ্রস্তের পক্ষে ঔষধের যত প্রয়োজন, অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্য-সম্পন্নের পক্ষে তেমন নহে। এই সমিতির ভিতর নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী দেখিয়া অনেকে মনে করে, উহা একটী 'অবিশ্বাসীর মেলা'। বস্তুত উহা অবিশ্বাসীর মেলা নহে, কিন্তু অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করাইবার একটী অমোঘ যন্ত্র। কত কত নাস্তিক এই সমিতির ছায়ায় আশ্রয় লইয়া, ইহার প্রচারিত জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আস্তিক্য বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সম্বন্ধে সমিতির বর্ত্তমান প্রধান উপদেশিকা শ্রীমতী আনি-বেশান্তের (Mrs Annie Besant) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আনি-বেশান্ত ও পরলোকগত পূর্ব্বোক্ত ভারতবন্ধু ব্রাড্‌ল (Mr. Bradlaugh) উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য নাস্তিক সমাজের প্রধান নেতা ছিলেন। এই আনি-বেশান্ত

---

no clear conception, and the conception of which by its affirmer is so incomplete that he is unable to define it to me.—Mrs. Besant's auto biography—P. 144.

মাদাম ব্লাভাস্কির সংস্পর্শে এবং তদীয় গ্রন্থপাঠে জড়বাদের রাজ্য ছাড়াইয়া আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠ হইলেন। যে আনি-বেশান্ত জগৎ-কর্ত্তা কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না আত্মার অবিনশ্বরত্ব দূরে থাকুক, দেহাতিরিক্ত কোন আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন না, যিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ষোল বৎসর কাল কেবল নাস্তিক্য প্রচারে স্বীয় অসামান্য প্রতিভা প্রযুক্ত রাখিয়াছিলেন, তিনি ব্লাভাস্কি-কৃপায় সত্য লাভ করিয়া কি বলিতেছেন, শুনুন ;—

"আমি নিজে পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি, আত্মা আছে, আর সেই আত্মাই আমি, আমার দেহ আমি নহে। আত্মা দেহ ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দে যত্র তত্র গমনাগমন করিতে পারে। আত্মার কার্য্যকারিতা জড়ীয় মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে না, বরং জড়ীয় আবরণ মুক্ত হইলে উহার কার্য্যকারী শক্তি আরও স্ফূর্ত্তি লাভ করে। আমি জানিয়াছি, ব্লাভাস্কি-কথিত মহাপুরুষগণ সশরীরে বিদ্যমান, যাঁহাদের শক্তির তুলনায় আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বালকের ক্রীড়া সদৃশ তুচ্ছ। আমি এ সকল বিষয় পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি, এবং ইহা ছাড়া আরও অনেক তত্ত্ব জানিয়াছি, তবু আমি এখনও রহস্য-বিদ্যালয়ের শিশু-শ্রেণীভুক্ত নিম্নাবস্থার ছাত্র মাত্র।"*

শ্রীমতী আনি-বেশান্ত এক্ষণ অধ্যাত্ম তত্ত্বে নিমগ্ন, এবং সমস্ত পৃথিবীতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিতেছেন। পরাবিদ্যা-সমিতি এক্ষেত্রে কতদূর কার্য্যকরী এবং উহার প্রচারিত জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল্য কত, ইহা দ্বারা কতকটা বুঝা যাইতে পারে।

এক্ষণ একটী প্রশ্ন এই হইতে পারে যে, সকল ধর্ম্মেই যখন অধ্যাত্ম জ্ঞান আছে, তখন পরাবিদ্যা-সমিতির কি প্রয়োজন? সকলে আপন আপন ধর্ম্মাচরণ করিলেই ত কালে উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে সত্য, কিন্তু অধ্যাত্ম জ্ঞানের যত প্রচার হয়, ততই মঙ্গল নহে কি? যে প্রণালীতে হউক, উহা জগতে যত ব্যাপ্ত হয়, ততই মঙ্গল নহে কি? কে বলিতে পারে যে, উক্ত জ্ঞান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সকল সম্প্রদায়ে, সকল জাতিতে আলোচিত ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? ধর্ম্মানুষ্ঠান সজীবভাবে সকল সমাজে চলিতেছে, স্বীকার করিলেও, এক্ষেত্রে পরবিদ্যা-সমিতি সকলের সহায়ক। কিন্তু ইহা ছাড়া এই সমিতির একটী বিশেষ কার্য্য আছে। সকলে আপন আপন ধর্ম্মাচরণ করিলে জগৎ হইতে শোক, তাপ, ঘৃণা, বিদ্বেষ দূরে পলায়ন করিত। কিন্তু হায়, কার্য্যে তাহার বিপরীতই দৃষ্ট হয়। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক জাতিই আপন ধর্ম্মপেটিকার কুঞ্জিটী হারাইয়া ফেলিয়াছে। কাজেই তন্নিহিত তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞাত, অবহেলিত হইয়া পড়িয়া আছে। আর লোকে কেবল বহিরাবরণ হইয়া ব্যাপৃত ও কলহে মত্ত। পরাবিদ্যা-সমিতি সেই কুঞ্জির সন্ধান বলিয়া দেয়, যদ্দ্বারা সকলেই সেই পেটিকা খুলিয়া আপন ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ও বুঝিতে পারে। এযুগে কি প্রণালীতে সেই সন্ধান সহজ-লভ্য, পরাবিদ্যা-সমিতি তাহার পথ দেখাইয়া দিয়াছে। *

---

* Vide "Annie Besant—an autobiography" P. 345.

*"ফলতঃ দেখা যায় যে, যে দেশেই থিয়সফি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেই ইহার সংসর্গে সেই দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম নবজীবন লাভ করে। থিয়সফির

বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। আজ বিজ্ঞান যাহা অনুমোদন করে না, কেহই তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। তর্কের বিষয়ীভূত সমস্ত বস্তু, সমস্ত প্রাকৃতিক তত্ত্ব, সমস্ত মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞানের বিচারালয়ে প্রমাণীকৃত না হইলে, কেহই সে সকল গ্রাহ্য করিবে না। বিজ্ঞান-গুরু যতক্ষণ না কোন বস্তুকে স্পর্শ করিয়া বলিবে,—'হঁা ঠিক্!'—ততক্ষণ উহার কোনই মুল্য নাই, উহা মিথ্যা, উহা অশুদ্ধ। বিজ্ঞানরাজ্যের ব্যবস্থাপক সভা হইতে যতক্ষণ না কোন তত্ত্ব পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইয়া নিস্ক্রান্ত হইল, ততক্ষণ কেহই উহার শাসন মানিবে না। যাহা শাসন করে, তাহাই শাস্ত্র। বিজ্ঞানই অধুকার শাস্ত্র। অপর যাহা ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়, তাহার শাসন উঠিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কথা যদি অবৈজ্ঞানিক হয়, তবে তাহাত অগ্রাহ্য নিশ্চিতই। আর যদি অবৈজ্ঞানিক নাও হয়, তথাপি অধুনাতন বিজ্ঞান যত দিন উহা অনুসন্ধান করিয়া অঙ্গীকার না করিবে, ততদিন লোকে উহাকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়াই মনে করিবে, অন্ততঃ উহাতে যে সন্দিহান থাকিবে, ইহা নিশ্চিত। বিজ্ঞানই এক্ষণকার রাজা, বিজ্ঞানই গুরু, বিজ্ঞানই ঋষি। কিন্তু এ-বিজ্ঞান জড় বিজ্ঞান। অধ্যাত্ম শাস্ত্রে যে বিজ্ঞানের কথা বর্ণিত হয়, যে বিজ্ঞান জ্ঞানের পরের অবস্থা, যাহা তত্ত্ব সাক্ষাৎকারমূলক, ইহা সে বিজ্ঞান নহে। দু-ই বিজ্ঞানে বস্তুগত্যা কোন প্রভেদ নাই। দু-ই প্রত্যক্ষমূলক। একটী যেমন পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের (observation and experiment) উপর স্থাপিত, অন্যটীও তদ্রূপ ঈক্ষিত ও পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং দুই বিজ্ঞানেই বিশ্বাসের ভিত্তি এক। কিন্তু উভয়ে অবস্থাগত ভেদ বিপুল। একটী স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম বিষয় লইয়া ব্যাপৃত, অপরটী সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম তত্ত্ব সংক্রান্ত। স্থূলেরই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মেরই স্থূল, ইহা সত্য। কিন্তু অবস্থাগত ভেদ অতীব বিস্তৃত বলিয়া এবং একটী স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অপরটী সূক্ষ্ম দর্শন সাধ্য বলিয়া, উপরোক্ত রীতিতে প্রমাণানুসন্ধান করিলে উভয়ের সামঞ্জস্যসাধন অনেক সময় সুকঠিন হইয়া পড়ে। যে সকল আন্তর ইন্দ্রিয় দ্বারা সূক্ষ্ম দর্শন সম্ভব, সাধারণ মানব জাতির বর্ত্তমান ক্রমবিকাশ-ক্ষেত্রে এখনও সে সব ইন্দ্রিয় বিকশিত হয় নাই। কাজেই আজ কাল বহির্ম্মুখ জগতে জড়বিজ্ঞানের প্রাধান্য সর্ব্বত্র স্বীকৃত। সেইজন্য অধ্যাত্ম বিষয় গুলিও সকলে জড় বিজ্ঞানের কষ্টি-পাথরে কসিয়া লইতে উদ্যত। তার পর, অন্ততঃ যেরূপে এই পরীক্ষা হওয়া উচিত, তাহাও না হওয়াতে সর্ব্বত্র ইহার ফল আশানুরূপ হয় না বলিয়া, ধর্ম্ম শাস্ত্র ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান গুলি ক্রমে কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছিল। ইহাই বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বিপ্লবের একটী প্রধান কারণ। পূর্ব্বোক্ত অবিশ্বাস, নাস্তিকতা ও তদানুষঙ্গিক দোষ পরম্পরার মূল এই। ধর্ম্মহীন শিক্ষা এই বিপ্লবের বলবান সহায়। জগতে সর্ব্বত্রই এই ধর্ম্ম বিপ্লবের চিহ্ন দৃশ্যমান। ধর্ম্মানুষ্ঠান বিলুপ্ত প্রায়। পরাবিদ্যা-সমিতি

সংশ্রবে আসিলে খ্রীষ্টান খ্রীষ্ট ধর্ম্মে অধিকতর আস্থাবান হয়, পার্সী জোরোয়াষ্টারের ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, বৌদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের সারবত্তা উপলব্ধি করে এবং হিন্দু ধর্ম্মের মহিমা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।" উপনিষদ্ (শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন-কৃত)।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আবিভূর্ত হইয়া, এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া সময়োচিত অস্ত্র প্রয়োগে উহার প্রবল স্রোতে বাধা দিতেছে। আর বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে যে কঠিন সাধ্য সামঞ্জস্য, তাহাও এই যুগোপযোগী ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে কতক পরিমাণে সুসাধ্য হইয়া আসিয়াছে। †

বর্ত্তমান বিজ্ঞান ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে। এবং তদনুপাতে ইহার ধর্ম্মহীনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মুখে শুনা যায় যে, য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতমণ্ডলীর এবং তদনুগ্রাহী অনেক লোকের কোনই ধর্ম্ম নাই। ইহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাংসারিক সুখসাধন। ইহাদের জাতীয় ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম। কিন্তু ইহাদের যুক্তিপ্রবণ চিত্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আর তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। ছয় দিবসে জগৎ রচনা, এই জগৎই ভগবানের আদি ও শেষ সৃষ্টি, অনন্ত স্বর্গ নরক, খ্রীষ্টীয় ভিন্ন অন্য ধর্ম্মে মুক্তি নাই, যীশু ভগবানের একমাত্র নিজ-জাত পুত্র, কন্যাবস্থায় মেরির-গর্ভে খ্রীষ্টের জন্ম, এই সকল মত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের নিকট নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। তারপর বাইবেলোক্ত খ্রীষ্ট ও তৎশিষ্যগণের অলৌকিক কার্য্য, যথা—সমুদ্রে পাদচারণা, পাঁচ খানি রুটি দিয়া পাঁচ সহস্র লোকের উদরপূর্ত্তি, স্পর্শ মাত্র কুষ্ঠ রোগীর ব্যাধি-মুক্তি, ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞানের অননুমোদিত বলিয়া ঐ সকল ব্যাপারে আর কেহ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। বিশেষতঃ অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত অলৌকিক ক্রিয়াদি যখন খ্রীষ্ট ধর্ম্মযাজক অবিশ্বাস্য বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন বাইবেলোক্ত অলৌকিক ক্রিয়াতে বিশ্বাস করিবার অধিকতর কোন হেতু আছে কিনা, ইহা বুঝা কঠিন। মহাযোগী ঈশার ঐ সকল ক্রিয়া সপ্রমাণ করিবার লোকও এক্ষণে আর য়ুরোপে নাই। অবিশ্বাসের এই কারণ ছাড়া আরও একটী কারণ আছে। উহা এই যে, খ্রীষ্টের উপদেশের মধ্যে যে সকল গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার ও বুঝাইবার লোক য়ুরোপে আর নাই বলিলেই হয়। যে সকল সম্প্রদায়ে রহস্য-বিদ্যা আলোচিত হইত, উহা এক্ষণ বিলুপ্ত। রোসি-ক্রুশীয়দিগের (Rosicrucians) সম্প্রদায় এক্ষণ নাম মাত্রে পর্য্যবসিত।* অনেকের মতে

---

† "থিয়সফির এই বিশেষত্বকে লক্ষ্য করিয়া Madame Blavatsky বলিয়াছিলেন যে, থিয়সফি দর্শন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সার সমন্বয় (the synthesis of religion, philosophy and science)। একথাটী সাতিশয় সত্য। এই এক কথায় তিনি ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহা স্মরণ রাখিলে থিয়সফি যে ব্রহ্মবিদ্যার যুগাবতার, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।" উপনিষদ পৃ ১০০।

* কথিত আছে, খ্রী: পঞ্চদশ শতাব্দীতে Ohristian Rosenkrew নামক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহারা মধ্য যুগের সেই 'পরেশ-পাথর' (Philosopher's stone) সন্ধানকারী রাসায়নিক (alchemists) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। Encyclopœdia Britanicaর একজন লেখক বলেন, উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু কর্ণেল অলকট বলিতেছেন, এক শতাব্দী পূর্ব্বেও জর্ম্মন পণ্ডিতগণ এই রোসিক্রুশীয়, মিশরীয় ও অন্যান্য রহস্য-বিদ্যার আলোচনায় ভরপুর ছিলেন, যথা—

"A century ago and more, Ge-

উহার কোন কালে অস্তিত্বই ছিল না। যাহা হউক, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব অধুনাতন প্রচারিত খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এবং তদাশ্রিত পাশ্চাত্য দেশ সমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এক্ষণে মাত্র উচ্চনীতিবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। উহার 'নীতি' অংশ সর্ব্বত্র সমাদৃত ও গৃহীত হইলেও আধ্যাত্মিকতার বিচারে উহা এক্ষণ আর য়ুরোপের স্বাধীন চিন্তাশীল লোকদিগের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ নহে। কারণ ধর্ম্মের সঙ্গে মানবচিত্তে জীব ও জগৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল দার্শনিক প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহার সমীচীন মীমাংসা উক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। বরং আধুনিক বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ অনেক কথা দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ ঐ সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা করিতে হয় অসমর্থ, নয় নিশ্চেষ্ট, অধিকন্তু বাইবেলের আক্ষরিক অর্থ ভিন্ন আভ্যন্তরিক অভিপ্রায় সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে তাহার উপর খড়্গহস্ত। এইরূপে পাশ্চাত্য জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মহীনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, অথচ পাশ্চাত্য চিন্তাশীল লোকদিগের মধ্যে ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা কিরূপে কোথায় পাওয়া যায়, তজ্জন্য কিঞ্চিৎ ব্যগ্রতাও জন্মিয়াছে। কিন্তু তথাকার দার্শনিকগণের গবেষণা এক্ষণও স্থির সিদ্ধান্ত হইতে বহু দূরে অবস্থিত। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক ও সুপ্রতিষ্ঠিত বটে, কিন্তু দর্শন সমাধিজ জ্ঞানের উপর স্থাপিত নহে বলিয়া যেন অন্ধকারে কোথায় কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সমাধিজ জ্ঞানের অভাবেও কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক এই অনুসন্ধান পথে যে অপূর্ব্ব মনস্বিতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যেন উপনিষদ্ জ্ঞানের ছায়া স্পর্শ করিয়াছে। ইহাও অতীব আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই। তবে সে পথ স্থিরতার আলোক-দীপিত নহে বলিয়া তাহাদের দর্শন এক এক বার সত্যের কাছাকাছি আসিয়া আবার কোথায় বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাই আত্ম-জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত আর্য দর্শন যেমন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত, উহা তদ্রূপ না হইয়া কেমন বিচারালোচনাতেই পর্য্যবসিত। আর্য দর্শনগুলির বিচারপ্রণালী বিভিন্ন হইলেও উহারা এক কেন্দ্রাভিমুখী। উহাদের স্থির সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক। সে লক্ষ্য আত্ম-জ্ঞান লাভ, বা মুক্তি। উহারা নানা উপায়ে কেবল লোকের মুমুক্ষুত্ব উদ্দীপ্ত করিতেছে, এবং এক সত্যের প্রচার করিতেছে। * পাশ্চাত্য

---

many was the centre and hottest nucleus of all this occult research, and if we now see a re-active tendency, it is but the natural working of unchangeable law.- O. D. L. Vol: III.

* বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকের মত এই, "প্রকৃত কথা এই, ঋষিরা বা ঋষিকল্প ব্যক্তিরা যে বিভিন্ন দর্শনের স্রষ্টা, সমুদয় দর্শনই উপকারার্থ রচিত হইয়াছে, ইহা ন্যায়রত্ন (মহামহোপাধ্যায় রাখাল দাস ন্যায়রত্ন) মহাশয়ের সর্ব্বদর্শন বিষয়ে সার মীমাংসা। ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান দার্শনিক বিচারে হইতে পারে না। তাহা বহু-তপস্যা-সাধ্য। গৌতম কনাদ বিবেচনা করিয়াছিলেন, শ্রুতি হইতে যখন নানা তাৎপর্য্য বাহির করা যায়, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ যখন শ্রুতি-সাহায্যে বুঝিবার উপায় নাই, তখন শ্রুতির এরূপ তাৎপর্য্য আমরা উপদেশ করিব, যদ্দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞানের একমাত্র

দর্শনে মুমুক্ষুত্বের, আত্ম-দিদৃক্ষার উদ্দীপনা নাই, ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নাই। কাজেই তদ্দ্বারা ঐ দেশের ধর্ম্মহীনতা দূরীভূত হয় নাই। পরাবিদ্যা-সমিতি এই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া তদ্দেশীয় ও অপরাপর দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির প্রচার, আলোচনা, ও তত্ত্ব নিষ্কাশন দ্বারা পাশ্চাত্য জাতি সমূহের এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার কল্পে কিরূপ যত্ন পরিশ্রম করিতেছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অবিদিত নাই। সুতরাং ইউরোপ ও আমেরিকায় বর্ত্তমান কালে পরাবিদ্যা সমিতির কি বিশেষ প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এদিকে আমাদের দেশের অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংসর্গে এ দেশীয় শিক্ষিতগণের মস্তিষ্কও যুক্তিবাদে পরিপূর্ণ হইয়াছে। অন্ধ বিশ্বাসের কাল আর নাই। এই কথা শাস্ত্রে আছে বলিলেই যথেষ্ট হইল না। ক্ষুদ্র বালকও উহার মূলে কি যুক্তি আছে, জানিতে চায়। যুক্তির আদর এ দেশে পূর্ব্বেও ছিল। (যুক্তিযুক্ত মুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। অন্যৎ তৃণমপি ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা ॥) যুক্তিযুক্ত বাক্য বালকে বলিলেও উপাদেয়, কিন্তু যুক্তিহীন বাক্য স্বয়ং ব্রহ্ম বলিলেও তাহা গ্রাহ্য নহে। কেবল শাস্ত্র বাক্যের পুনরুক্তি করিয়া বিচার করা উচিত নহে, যুক্তিহীন শাস্ত্রোক্ত বিচারে ধর্ম্মহানি হয় (কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যংবিচারণং। যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে ॥) ইত্যাদি বাক্যের অভাব নাই। তবে এ যুক্তিবাদও শাস্ত্রশাসন দ্বারা সংযত ছিল। যে যুক্তি প্রয়োগ করিবে, তাহা অশাস্ত্রীয় হইলে চলিবে না, যুক্তিও শাস্ত্রানুকূল হওয়া চাই। তাই শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অসাধারণ বিচারপটু ক্ষুরধারধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও উপদেশ করিয়াছেন, "দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং, শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্," দুস্তর্ক অবৈধ তর্ক হইতে বিরত থাকিবে, পরন্তু শ্রুতি মত,

---

উপায় উপাসনা বিষয়ে লোকের মতি দৃঢ় হইবে। 'সকলই ব্রহ্ম' এরূপ তত্ত্ব কথা শ্রুতি হইতে বাহির করা অপেক্ষা ভেদ সিদ্ধিই তাঁহারা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে অধিক উপযোগী জ্ঞান করিয়াছিলেন। জৈমিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ, ইহা স্থূল ভাবে প্রায় সকলেরই জ্ঞান আছে। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে জ্ঞান আমি যদি যাগ-যজ্ঞ মন্ত্রাদিতে করাইয়া দিতে পারি, তবেই জীব ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' করিয়া বিপথে পরিভ্রমণ করিলে কোনও ফল হইবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন 'মন্ত্রই ব্রহ্ম, আর ব্রহ্ম নাই, জানিও।' তিনি বিধি প্রত্যয়-ঘটিত শ্রুতি বাক্যের প্রামাণ্য গ্রহণ করিলেন, এবং তদনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রুতির তৎপথ্য লিপিবদ্ধ করিলেন। যেরূপ ভাবে শ্রুতি ব্যাখ্যা করিলে কোনও অনিষ্ট হইবে না, অথচ জীবের প্রকৃত উপকার হইবে, সকল আর্য্য দর্শনকারই তদুপযোগী দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন। ঋষিগণের কোন্ কার্য্য কি ফল উৎপন্ন করিতেছে, স্থূল বুদ্ধি বশতঃ আমরা তাহা না বুঝিতে পারি, কিন্তু তাহাদের সৎ কার্য্যের উপকারিতা কোনও না কোনও বিষয়ে কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিশ্চয়ই সাধিত হইতেছে। ঋষিকল্প শঙ্করাচার্য্যও সেইরূপ কোন সদুদ্দেশ্যে অদ্বৈতবাদ বিস্তার করিয়া থাকিবেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ইহাই বিভিন্ন আর্য্য দর্শন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মীমাংসা।" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম কৃত" ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাশীবাস" নামক গ্রন্থ।

বেদানুকূল তর্কের অনুসরণ করিবে। ইহার কারণ, এ দেশীয় আস্তিক দর্শনগুলির এক মাত্র উদ্দেশ্য জীবকে মুক্তি পথে আকৃষ্ট করা। ঐ সকল শাস্ত্র অসীম বুদ্ধিশক্তির পরিচায়ক হইলেও কেবল বুদ্ধির ক্রীড়ামাত্রে পর্য্যবসিত নহে, তর্কের উপরও স্থাপিত নহে। বরং তর্কে ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নাই, এই রূপ উক্তি দৃষ্ট হয় ("তর্কে প্রতিষ্ঠা"-ব্রহ্মসূত্র)। বুদ্ধিজাত বিচার দ্বারা এক প্রকার বুদ্ধিগত অনুভব (Intellectual perception) হয় সত্য, কিন্তু তাহার কোন স্থিরতা নাই। বুদ্ধির প্রাখর্য্যানুসারে একই বস্তুকে কেহ সত্য, কেহ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারে। কিন্তু আর্ষ দর্শন শাস্ত্রগুলি যে প্রত্যক্ষ অনুভবের উপর স্থাপিত বলিয়া কথিত হয়, তাহাকে সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞা বলে। উহাদের প্রযুক্ত যুক্তি পরম্পরা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিভিন্ন হইলেও সকলেই এক বেদ সিদ্ধান্তের অনুগামী, এবং সে সিদ্ধান্ত এই যে, মুক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ। বেদ-বহির্ভূত যুক্তি, বা লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা ঐ সকল সিদ্ধান্তের পরীক্ষা করিতে গেলে সত্যাসত্য নির্ণয় দুরূহ হইয়া পড়ে। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় সূক্ষ্মতত্ত্বরাশি প্রকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া, উহাদিগকে ইন্দ্রিয়াতীত বলা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা স্থূল ইন্দ্রিয়লব্ধ—তদতীত আমরা কিছুই ধারণা করিতে পারি না। সুতরাং যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, তাহা ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের মাপ-কাটিতে মাপিতে গেলে ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা। সেই জন্য এ দেশীয় শাস্ত্রে প্রধানতঃ যে চারিটী প্রমাণের দ্বারা বস্তু নির্ণয়ের উপদেশ আছে, সেই প্রত্যক্ষ-অনুমান-উপমেয়-শাব্দ নামক প্রমাণ চতুষ্টয়ের মধ্যে শেষোক্ত শাব্দ প্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভ্রম-রহিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা, তাহা প্রত্যক্ষ,অনুমান-উপমেয় প্রত্যক্ষেরই অনুগামী। ইন্দ্রিয়ের দোষ বা অপটুতা, বা দেশকালজাত অন্যবিধ কারণে ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ, এবং প্রত্যক্ষের অনুগামী অনুমান-উপমেয় প্রভৃতি অবশ্যই দোষদুষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইবেই। এই জন্য ঐ সকল প্রমাণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে চলে না, বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্পর্কে ত নহেই। কিন্তু শাব্দ প্রমাণে এই সকল ভ্রম-প্রমাদ অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি দোষ নাই, কারণ উহা আপ্তবাক্য। যাঁহারা 'ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব' ষড় বিকার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, যাঁহারা লব্ধাভীষ্ট, প্রাপ্তকাম, তাঁহারাই 'আপ্ত'। ইঁহারাই ঋষি, অর্থাৎ প্রকৃত দ্রষ্টা (seers)। ইঁহাদের সেই সকল ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বিকশিত, যদ্দ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত ব্যাপারের জ্ঞান সম্ভবে। ইহাঁদের দৃষ্টিভূত ভবিষ্যতের আবরণ ভেদ করিয়া বহুদূর প্রসর্পিত, এবং স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জাগতিক, পারলৌকিক ও পারমার্থিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। ইহাদের সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদাদি শাস্ত্র শাব্দ প্রমাণ বলিয়া অভিহিত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া এদেশে চিরকাল স্বীকৃত। যে স্থলে অপরাপর প্রমাণে বিরোধ, বা সংশয়, সেস্থলে বেদই মীমাংসক,—তদুপরি আর কোন প্রমাণ নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এক্ষণ বেদেরও প্রমাণ চাই। বেদ স্বয়ং প্রমাণ, একথা বলিলে হইল না, তার প্রমাণ কৈ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এটী বৈজ্ঞানিক যুগ।

বেদোক্ত বিধি নিষেধ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হইলেও উহা সপ্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু ঋষিগণ ঐ সকলের কোন কারণ ব্যক্ত করিয়া যান নাই। তাঁহারা যুক্তিসহ কোন বিষয় প্রমাণিত করিয়া যান নাই। তাহার এক কারণ এই যে, সেই প্রাচীন কালে ধর্ম্ম একটী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া (Practical) বলিয়া গণ্য ছিল, কেবল শুষ্ক বাক্যে, বা কাল্পনিক মতে (Theoretical), বা বুদ্ধিগত সম্মতি মাত্রে (Intellectual assent) পর্য্যবসিত ছিল না। বোধ হয়, তাঁহাদের কথা ছিল, "কার্য্য কর, প্রমাণ পাইবে।" সুতরাং তাহাদের প্রথা ছিল, আদৌ শ্রদ্ধা, আগে বিশ্বাস, তারপর প্রমাণ। কিন্তু এক্ষণকার অবস্থা অন্যরূপ। পাশ্চাত্য ভাবে পরিপূর্ণ ঋষি-সন্তান এক্ষণ বলিতেছেন, "আগে প্রমাণ দাও, তারপর বিশ্বাস করিব।" ইহাই পাশ্চাত্য প্রথা।* এই প্রথা এক্ষণ এদেশেও প্রবল। আর ইহাই যে ভারতে বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়ের একটী প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলে এদেশও ক্রমে নাস্তিকতা, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ প্রভৃতি কণ্টকারণ্যে আবৃত হইতেছিল। পরাবিদ্যা-সমিতি এই সময়ে যেন ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া এদেশে আসিল, এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানরূপ অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত হইয়া এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের ঐ সকল কণ্টকারণ্য ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। লোকে দেখিয়া অবাক্ হইল, যে পাশ্চাত্যদিগের দোহাই দিয়া এদেশীয় শিক্ষিতগণ জড়বাদের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছিল, তাহারাই আসিয়া আর্যজ্ঞানের উচ্চতা ঘোষণা করিতেছে, দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল! পূর্ব্বতন ঋষিগণের আবিষ্কৃত ধর্ম্মতত্ত্বের মূলে উজ্জ্বল সত্য সকল নিহিত আছে, এদেশীয় অবিশ্বাসীগণ তাহা পরাবিদ্যা-সমিতির নিকট জানিতে পারিল। শাস্ত্রের ব্যবহারিক অংশ, যাহা অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাধ্য, যুক্তিবাদীগণ বিচার করিয়া দেখিল সে যুক্তিহীন নহে, এবং ঋষিগণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইন্দ্রিয়াতীত পারমার্থিক বিষয় সপ্রমাণ করা অধুনাতন বিজ্ঞানের পক্ষে এক্ষণও সুসাধ্য নহে, কারণ বিজ্ঞান এক্ষণও ততদূর উন্নতিলাভ করে নাই। তবে পরাবিদ্যা-সমিতি যতদূর সাধ্য ইহাও অভিনব

---

* "The Oriental and European systems of conveying knowledge is as unlike as any two methods can be: the West pricks and pigmes the learner's controversial instinct at every step. He is encouraged to dispute and resist conviction. He is forbidden to take any scientific statement on authority. * * The East manages its pupils on a wholly different plan. It no more disregards the necessity of proving its teaching than the West, but it provides proof of a wholly different sort. It enables the student to search nature for himself, and verify its teachings, in those regions, which western philosophy can only invade by speculation and argument. It never takes the trouble to argue about anything. It says, 'so and so is fact; here is the key of knowledge; now go and see for yourself." * * Teaching and proof do not go hand in hand. They follow one another in due order."—Esoteric Buddhism by A. P. Sinnet.

উপায়ে সাধন করিতেছেন। রোগ নূতন, কিন্তু ঔষধ পুরাতন। সেই পুরাতন ঔষধই 'নূতন আকারে, নূতন আধারে রোগীর হস্তে প্রদত্ত হইতেছে। *

পরলোকে অবিশ্বাসীদিগের বিশ্বাসের জন্য সমিতি প্রেততত্ত্বের অল্পাধিক আলোচনা করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া অনেকে মনে করেন, এই সমিতি প্রেততাত্ত্বিকদিগের (Spiritualists) একটী সভা। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভূল। আধুনিক প্রেততত্ত্বের সহিত সমিতির কতটুকু সংশ্রব, এবং উহার মূলে ব্লাভাস্কির কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা আমরা তাঁহার মতামত উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, অতএব পুনরুক্তি অনাবশ্যক। প্রেততত্ত্বের সম্যক্ অনুসন্ধান জন্য লণ্ডনে মনস্তত্ত্ব-সন্ধিৎসু সভা (Society for physical research) এবং য়ুরোপ আমেরিকার অন্যান্য সভাও আছে। ইহাদের সহিত পরাবিদ্যা-সমিতির কোন সংশ্রব নাই। যাহারা দেহত্মবাদী, তাহাদের পরলোকে বিশ্বাস সর্ব্ব প্রথম আবশ্যক। এই জন্য মাদাম ব্লাভাস্কি তাঁহার অমানুষিক ক্ষমতার সাহায্যে পরলোকের অনেক তত্ত্ব উদ্ঘটিত করিয়া গিয়াছেন, এবং পরাবিদ্যা-সমিতি প্রয়োজন মত ঐবিষয়ের আলোচনা করে। কিন্তু পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে, এ সম্বন্ধে মাদামের স্পষ্ট উপদেশ যে, পূর্ব্বোক্ত প্রেততত্ত্ববাদিরা পরলোকবাসিদিগকে যে রূপে আহ্বান আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং উহাদের আতিবাহিক দেহ লইয়া যেরূপ ক্রিয়া কাণ্ড করে, তাহা নিতান্ত গর্হিত। এমন কি, মৃতের মঙ্গলকাঙ্ক্ষা ভিন্ন তাহার সহিত অন্য কোন সংশ্রব রাখা তিনি ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

---

* এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মতত্ত্বের গভীর ও প্রাঞ্জল আলোচনায় অলঙ্কৃত 'উপনিষদ' নামক উপাদেয় গ্রন্থে তাঁহার নিজের অননুকরণীয় ভাষায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"নানা কারণে পাশ্চাত্য জাতি সমূহ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে, প্রভূত্ব, প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করিতে সমর্থ হইল। তাহাদের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকতা ও নাস্তিকতা, জড়বাদ ও ইন্দ্রিয়-সুখবাদ, স্বার্থপরতা ও নির্ম্মমতা প্রচার লাভ করিতেছিল। ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণের জন্য এবং জগতে আধ্যাত্মিক আর্য্য সত্যের পুনঃ প্রচারের জন্য ব্রহ্ম বিদ্যাকে আবার অবতার গ্রহণ করিতে হইল। দেশ কাল বিবেচনা করিয়া তিনি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে জন্ম পরিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নামকরণ হইল থিয়সফি (Theosophy) থিয়সফি ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার গ্রীক অনুবাদ Theos — ব্রহ্ম; Sophia — বিদ্যা। এবং তিনি যুগের উপযোগী পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে শরীর আবৃত করিয়া জগতের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। যাহারা কেবল বাহিরের আবরণ দেখিল, তাহারা ইঁহাকে নূতন পরিচ্ছদে আবৃত দেখিয়া চিনিতে পারিল না। তাহারা বলিতে লাগিল, 'ইনি কে? ইঁহাকে ত আমারা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ইনি যদি আমাদের নিজ জন, তবে ইঁহার এ বেশ কেন?' কিন্তু যাহারা প্রাচীন ভারতের পুণ্য তপোবন ক্ষেত্রে ইহার কাষায় পরিবীতা লাবণ্যমণ্ডিতা সৌম্য শান্ত তত্ত্ব মূর্ত্তি মানস নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাদের কিছু মাত্র সন্দেহ রহিল না যে, ইনিই সেই পুরাতন ঋষিকুমারী, ভারতবাসীর চির-পরিচিতা চিরন্তনী ব্রহ্মবিদ্যা। ইত্যাদি" উপনিষদ;—পৃঃ ৯৭—৯৮।

(৪)

মহাশূন্য পূর্ণ করি জাগিছে যে অনাহত-ধ্বনি
তা'রি প্রতিধ্বনি মোর রুদ্ধ কণ্ঠে তুলিবে জননী
ভগ্ন হৃদয়েব তাই
বিরাম বিশ্রাম নাই !—
ও ইন্দু-আনন চাই'
উথলিছে দিবস রজনী !

(৫)

কে আমারে ভালবাসে কোন্ মহাসাগরের তীরে—
আমারি প্রতীক্ষা করি ভাসে সদা তপ্ত আঁখি নীরে
সব বাধা-ব্যবধান
হয়ে গেছে অবসান !—
এস হৃদে সুমহান্
প্রেমানন্দে দশদিক্ ঘিরে !

(৬)

আজি এ ত্রিবেণী মাঝে মুক্ত প্রাণে করিয়া গাহন
প্রাণে প্রাণে হৃদে হৃদে সত্য শাশ্বত-মিলন !
বিচ্ছেদ-অতীত দেশে
দাঁড়াইবে বধূ-বেশে !—
সর্ব্ব কর্ম্ম-অবশেষে
আত্মা সনে আত্মার বন্ধন !

(৭)

জননী ! করুণাময়ী ! এ পুণ্যদ ত্রিবেণীর কূলে
সাজাও বরণ-ডালা—ডুবাও ও শ্রীচরণ-মূলে !
বাজাও মঙ্গল-শাঁখ,
ভ্রান্তি-ক্লান্তি ঘুচে যাক্ !—
মরণ জীবন পাক্
তোমারি এ পূত পূজা ফুলে !

(৮)

ধ্যানময়ী ! প্রাণময়ী ! আজন্মের অয়ি ধ্রুব-তারা !
কতকাল পথে পথে ঘুরাবে এমনি আত্মহারা !
নির্ব্বাণের স্নিগ্ধ ছায়
চির-স্থির-সুষমায়
ঢেকে রাখ আজি হায়,
বরষিয়ে স্নেহামৃত-ধারা ! *

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

প্রতীক্ষায় ।

এস চির-বাঞ্ছিতা মানসচারিণি,
মঞ্জুল হৃদয়-কুঞ্জে লো চিরযৌবনা,
অয়ি উল্লাসময়ী বর্ষা-বিরহিণী,
সম্ভাষিছি এস কলমঞ্জীর-চরণা ;
এস লীলা চঞ্চল অঞ্চল উড়ায়ে,
মন্দ মধুছন্দে ভরি কেতকীর গন্ধে,
চূর্ণ কুন্তল উড়ে দিগন্ত মোহিয়ে,
বর্ণে ইন্দ্রধনু কান্তি নিন্দি শুভ্রকুন্দে !
লাবণ্য-লতিকা লাজ-লুলিত আননে,
বাহুতে বাহুতে বাঁধ মিলনের ডোর,
সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য ঝরে সুন্দর চরণে,
সুষমা-জড়িত স্বপ্নে এস চিত্ত-চোর,
মানসী প্রাবৃট-লক্ষ্মী এ বন ভবনে,
তপ্ত বুকে ঢাল ধারা অমৃত বর্ষণে ।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় ।

করুণা ।

(তব) বিশ্ব-বীণার সুমধুর তান
শ্রবণ বিবরে পশিয়া ;
শ্রোতার পরাণ আকুল করিছে
তোমার মহিমা গাহিয়া,
প্রতি পলে তুমি সত্ত্বা তোমার
করিছ জগতে ঘোষণা ,
যেদিকে তাকাই নিরখি কেবল
তোমার অসীম করুণা ।
পাতায় পাতায় রেখার মতন
হরপ গুলিন আঁকিয়া,
কোন্ যুগ হতে নীরবে যেতেছ
আপনার নাম গাহিয়া ।
কোকিলের সেই কুহু কুহু রব
মধুর চাঁদিমা জ্যোছনা
বিশ্বের যত ভালবাসাবাসি
প্রভো, তোমারি কেবল করুণা ।
তারকার হাসি গগনের গায়
কাননের শোভা হেরিয়া ;
হৃদয় খুলিয়া ভাবুক সুজন
তোমায় নিতেছে বরিয়া ।
মানব-হৃদয়ে প্রেম-বারিধারা
কে আর দিতেছে আনিয়া ;
বিশ্বপ্রেমের করুণাটুকু দিয়ে
রেখেছ তাহারে গড়িয়া ?
মানস মাঝারে সদা বিরাজিত
তাই বলি তোমা আপনা,
জগতের কোণে পাইয়াছি ঠাঁই
সেত, তোমারি প্রভো, করুণা,

---

* লেখকের অপ্রকাশিত কাব্য "ত্রিবেণীর" কবিতাটী এস্থলে সঙ্কলিত হইল ।

কি দিয়া পূজিব চরণ তোমার
কি আছে মোদের শকতি,
থাকে যেন সদা অচলা অটুট
যেটুকু দিয়েছ ভকতি।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র সেন, বি-এ।

মায়া।

(১)
হে মায়া স্বরূপ তব দেখা নাহি যায়,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
সাজিছ কতই সাজে
তোমার প্রকৃত তত্ত্ব কেহ নাহি পায়।
(২)
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কভু অধিষ্ঠাতা,
কভু বিষ্ণু পাশে রমা,
কভু-হর মনোরমা,
কভু গঙ্গারূপে পৃথ্বীতল প্রবাহিতা।
(৩)
প্রতি জীবে আছ তুমি অবিদ্যারূপিণী,
কখন হাসাও সুখে,
কখন কাঁদাও দুঃখে,
ভব বন্ধরূপে জন্ম মৃত্যু-বিধায়িনী।
(৪)
আছ তুমি সতীরূপে সাধুর আগারে
তাই তোমা বলে সতী,
পুন নহ কি অসতী—
প্রতি পুষ্প বিহারিণী ভ্রমরী আকারে।
(৫)
তব পাশচ্ছেদ ভবে মুক্তির কারণ
তাই তুমি সতী (১) নও,
অসতীও (২) কভু নও—
তোমার বিচিত্র কার্য্য প্রত্যক্ষ যখন।
(৬)
রূপ নাই, বিশ্বরূপে তবু প্রকটিতা,
গুণ নাই, তবু তুমি
সত্ত্বরজস্তমোভূমি,
তোমার মহিমা নাহি শব্দে প্রকাশিতা।
(৭)
নাম রূপহীনা অয়ি অব্যক্তরূপিণী!
অনির্ব্বাচ্যা তুমি ভবে,
পুন বিবর্ত্তিতা হবে—
ব্যক্তা হয়ে কার্য্যরূপে সর্ব্ব-বিমোহিনী।
(৮)
নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মেরে তুমি কর আবরিত,
তোমার প্রভাবে তাই,
জীব-আত্মা ঠাঁই ঠাঁই,
লভে সদা জন্ম-মৃত্যু ভ্রান্তি বিমোহিতা।
(৯)
ভ্রান্ত জীবে কি বুঝিবে মহিমা তোমার!
তুমি কত রূপ ধর,
জীব দুঃখ ত্রাণ কর—
মহামায়া শক্তিরূপে, বিশ্বের আধার।
(১০)
আদ্যাশক্তি বিশ্বমাতা বিশ্বের ঈশ্বরী,
অজ্ঞান সন্তানগণে
বড় দুঃখী রেখ মনে
অন্তিমে কোলেতে টেনো পাপ তাপ হরি'।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

কবি।

পরের দুঃখে ব্যথা লাগে যার
কোমল যাহার প্রাণ;
উথলে যাহার মুক্তকণ্ঠে
সরল প্রাণের গান;
আর্ত্তের সেবা লক্ষ্য যাহার
তুচ্ছ যাহার হেম;
বাতাসের মত উদার যাহার
সহজ অমল প্রেম;
শিশির-সিক্ত যাহার পুষ্প
প্রভাত-আলোকে ঝলে;
সন্ধ্যা দেখায় মানসী যাহার—
চিত্ত তুলসী-তলে;
বরষা যাহার কুঞ্জকুটীরে
পরাণ ভরিয়া কাঁদে;
বসন্ত যার নিশিদিন ধরি'
যৌবন রাগ সাধে;

১। সতী—নিত্যা।
২। অসতী—আকাশ-কুসুম তুল্যা সত্তাবিরহিতা।

কাব্য যাহার হৃদয়-সর্ব্ব
জীবন যাহার ছবি ;
সকলি তাহার সুন্দর চির-
সুন্দর সেই কবি ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন ।

বৈচিত্র্য ।

একি সখি অপরূপ
বিপরীত বৈচিত্র্য ভুবনে,
মধুর করিলে তুমি
দুঃখ দৈন্য আমার জীবনে ।
দাসত্ব মধুর এত,
এত সুখ পরাধীনতায়,
পরাজয়ে এত গর্ব্ব,
এত তৃপ্তি মুক্তিহীনতায় ?
চরণে লুটায়ে পড়া
সে যে হ'লো গৌরবের ধন,
বেদনা মধুর হ'লো
কাম্য হ'লো শরের বিঁধন !
চরণে অর্পণ করি
এ যোদ্ধার কবচ কৃপাণ,
তব পাশে বন্দী হওয়া
কাম্য হ'লো রণ অবসান ।
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া
একেবারে রিক্ত নিঃস্ব হওয়া,
তাহাতে আরাম এত ?
লঘু যাহে ভবভার বওয়া ।
কারাগার হ'লো স্বর্গ,
ভিক্ষাবৃত্তি শিরের ভূষণ,
তিরস্কারে সুধা ঝরে,
ভ্রূকুটিতে কুসুম বর্ষণ ।
করিলে সুখেরে সুধা
দুঃখে তুমি করিলে যে মধু
তিক্ত কটু হ'লো স্বাদু
স্পর্শে তব, ওগো প্রাণবধূ ।

শ্রীকালিদাস রায় ।

মায়ের মুরতি ।

(১)

আমার মায়ের মূর্ত্তি কে দেখিবি তোরা
প্রেম-পুণ্য উপাদানে সর্ব্ব-অঙ্গ গড়া ।
অনন্ত প্রশস্ত ওই নীলিম আকাশ
মায়ের মাথার গুচ্ছ কুন্তলের পাশ ;
প্রকৃতির মাঝে মা যে মিশায়েছে কায়—
আমার জননী তোরা কে দেখিবি আয় ।

(২)

মা হাসিলে ফুলগুলি ফোটে দলে দলে,
জননীর হাসিচ্ছটা দীপ্ত দিবাকরে,
কুসুম-পরাগ তাঁর চরণের রেণু,
কোকিল পাপিয়া কণ্ঠে বাজে তাঁর বেণু,
সাগর মন্থনে উঠে (তাঁর) অধরের সুধা ।
সন্তানের প্রাণে প্রাণে জননী যে বাঁধা ।

(৩)

আমার মায়ের মূর্ত্তি কে দেখিবি তোরা ?
তাঁহার ইঙ্গিতে ওঠে রবি শশী তারা ।
এ বিশ্ব জগৎ চলে তাঁহারি নিদেশে,
জীবন জাগিয়া উঠে তাঁহারি পরশে,
জননী যে প্রকাশিত প্রত্যেক সন্তানে,
দেখিবি মায়েরে যদি চেয়ে দেখ প্রাণে ।

(৪)

আমার জননী তোরা কে দেখিবি আয়—
মায়ের নিঃশ্বাস এই সুরভি মলয় ।
অবোধ অজ্ঞান যত সন্তানের দল
মায়ের মুরতি খুঁজে হয়েছে বিহ্বল ;
দেখিতে আমার মায়ে এত সাধ যদি
চেয়ে দেখ্, রে অবোধ, স্বহৃদয় প্রতি ।

(৫)

মায়ের সুন্দর মূর্ত্তি কে দেখিবি আয়
এ জগৎ মধুময় যার সুষমায় ।
মায়ের কটাক্ষে হের দামিনী চমকে ;
অন্নগ্রাস দেও মুখে, দেখ নাই যাকে !
কাঙ্গাল, চাঁড়াল, পাপী সবি মার ছেলে,
মার দেখা সেই পায় যে নিজেরে ভোলে ।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ ।

তখন ও এখন

মনে পড়ে মনে পড়ে আজ
জন্মেছিনু যেথা—সে ভবন,
ভোরে উঠি বাতায়নে আসি
হেরিতাম উদিতে তপন ।

জাগিতাম না জাগিতে ঊষা
যেত দিন কি সুখে তখন,
নিশান্তেই হলে আয়ু শেষ
মনে হয় বাঁচি যে এখন।

(২)

মনে পড়ে মনে পড়ে সেই
সুরভি গোলাপ সুবরণ
আলো করি সরসী সলিল
শতদল ফুটিত কেমন।
আন্দোলিত বাবুয়ের নীড়
সে চম্পক জীবিত এখন,
ভাই মোর নিজ জন্ম দিনে
করিল যে তরুটী রোপণ।

(৩)

মনে পড়ে মনে পড়ে শূন্যে
ভাসিতাম পাখীর মতন,—
ভেদি স্বচ্ছ বিমল অনিল
দুলিতাম দোলায় যখন।
জীবন—কতই ছিল লঘু
গুরুভার হয়েছে এখন,
সবেনা ললাট স্নিগ্ধ আর
নিদাঘের মেঘ বরিষণ।

(৪)

মনে পড়ে মনে পড়ে ওই
দীর্ঘ তাল তরু অগণন।
ভাবিতাম তুলি' উচ্চ শির
পরশিছে স্বরগ কেমন।
গেছে বটে শিশুর সে ভ্রম
সে আনন্দ কোথায় এখন?
স্বর্গ হতে বহুদূরে আজ
ছিল যাহা নিকটে তখন।

শ্রীরসময় লাহা।

দেবী।*

(১)

শূন্য করি সুরপুরী
লোকালয় পরিহরি
কে তুমি মা মহামায়া বিজন প্রান্তরে,
সন্তপ্ত সন্তানগণে ডাকিছ সাদরে?
অরণ্য মেখলা পরা,
কাতরা বিশাল ধরা,
করুণা কটাক্ষ-আশে লোটে পদতলে;
তুহিন পতন দলে
তরুলতা দলে দলে
মুকুতা নির্ঝর ঝরে ভাসে আঁখিজলে।
ভৈরবী মূরতি ঘোরা
পরিহরি ওমা তারা,
অপাঙ্গে বারেক হের করাল-বদনা,
আঁধার-কান্তার-মাঝে ফুটুক জ্যোছনা।

(২)

জনহীন এ কান্তারে
নিরমিলে কার তরে—
স্বরগ জিনিয়া কান্তি সুরম্য ভবন—
সৌধ-শিরে অনিবার
সুকৃতি পতাকা তার—
পবন হিল্লোলে দুলে চুমিছে গগন।
কাহার কল্যাণ তরে
পাপাচারী চণ্ডালেরে
পদাঘাতে পাতালেতে ক'রেছ প্রেরণ,
কহ মা কাহার ভাগ্য প্রসন্ন এমন?

(৩)

শুনিয়ে আকাশ-বাণী
তব আজ্ঞা অনুমানি
তোমারি কৃপায় মাগো এসেছি হেথায়।
বিষাদ অঞ্জলি পূরি
সন্তাপ হৃদয় ভরি,
এনেছি মা বলি দিতে চরণে তোমার।
হে মাতঃ করুণা কর—
সন্তান সন্তাপ হর
শিবানী সংসার-দুঃখে কর পরিত্রাণ,
তব অঙ্ক শঙ্কাশূন্য বৈকুণ্ঠ-সমান।

(৪)

মায়েরে সঙ্গেতে লয়ে
এসেছি মাতৃ আলয়ে,
অনন্ত জননী-প্রেমে লইতে আশ্রয়
এসেছি ফেলিয়ে দূরে পাপ লোকালয়।
ভুলিতে সংসার দুঃখ
ভুঞ্জিতে পবিত্র সুখ
হেন পুণ্য মাতৃ-রাজ্য না হেরি কোথায়,

---

* সারণ জিলান্তর্গত 'থাওয়ে' নামক স্থানের অরণ্য মধ্যস্থ মন্দিরের মহাকালী মূর্ত্তি দর্শনে লিখিত। লেখিকা।

আবার এরূপ অনেকের বিশ্বাস যে, পরাবিদ্যা-সমিতি, কিসে অষ্ট সিদ্ধির মত কতকগুলি ক্ষমতালাভ করা যায়, তাহারই উপদেশ দিয়া থাকে। বোধ হয়, সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্যটী দেখিয়া তাঁহারা ঐরূপ অনুমান করেন। তার পর মাদাম ব্লাভাস্কি ও কর্ণেল অলকট মহোদয়ের যোগশক্তি-প্রকাশ ঐরূপ অনুমানকে আরও দৃঢ় করিয়া থাকিবে। সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্যের অভিপ্রায় এই যে, যাহারা দেহাতিরিক্ত কিছুই মানে না, তাহাদিগকে দেহাদি সমস্ত জড় পদার্থকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে সমর্থ এক অদৃশ্য শক্তি যে প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই বীজাকারে প্রসুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাসবান করা, জড়ের উপর চেতনের ক্ষমতা কত, তাহা সপ্রমাণ করা। সুতরাং উক্ত উদ্দেশ্যটী এইরূপ নিম্নশ্রেণীর জড়বাদীদিগকেও ক্রমে আত্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করিবার একটী প্ররোচক ব্যবস্থা। কিন্তু যাহারা উচ্চাধিকারী ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রয়াসী, তাহাদের প্রতি সিদ্ধি অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিবার,—বরং যোগ-সিদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিবারই পুনঃ পুনঃ উপদেশ আছে। ব্লাভাস্কির সিদ্ধিপ্রদর্শন এবং সমিতির সাহিত্যে তৎসম্বন্ধে আলোচনা, তথা যোগ-সিদ্ধ পুরুষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টশক্তি ও কার্য্যাবলির বর্ণন ও তাহার তুলনায় ইন্দ্রজালাদির মর্ম্ম সমালোচন, এ সমস্তই অবিশ্বাসীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, যাহাতে তাহারা ক্রমে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হয়। যাহা সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাহার পক্ষে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম এবং এই সকলের অবান্তর প্রকরণাদিরও সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক, যাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই সমিতি দ্বারা উপকৃত হইতে পারে।

আর একটী কথা বলিয়াই আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। অনেকে মনে করেন, পরাবিদ্যা-সমিতির যে কোন সভ্য যাহা কিছু বলেন বা লিখেন, তাহা সমিতির অনুমোদিত। এ ধারণা ভুল। সমিতির সহিত ব্যক্তিগত মতামতের কোন সম্বন্ধ নাই; তজ্জন্য উহা কোন দায়িত্বও গ্রহণ করেন না। সমিতির মূল উদ্দেশ্য পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে কোন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে আপন মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। কেননা, ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সকলেই থাকিতে পারেন। কিন্তু কাহারও মত,—এমন কি, মাদাম ব্লাভাস্কি বা মহাত্মাগণের বাক্যও নহে—স্বীকার করিয়া লইতে অপর কেহ বাধ্য নহেন। সকলেই আপন ধর্ম্ম বিশ্বাসানুসারে জগতের হিতসাধন, সত্যের প্রচার, পতিতের উদ্ধার করুন,—ইহাই সমিতির অভিপ্রায়, মহাত্মাগণের উপদেশ।* সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী ব্লাভাস্কিও আপন

---

* অলকটের নিম্নলিখিত বাক্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

'Mrs. Besant's Central Hind College at Benares, my three Budhist Colleges, and two hundred schools in Ceylon, and my Pariah free schools in Madras are individual, not society activities"—O. D. L. Vol : III

অর্থাৎ "কাশীতে মিসেস বেশান্তের হিন্দুকলেজ, সিংহলে আমার তিনটী বৌদ্ধ কলেজ, এবং দুই শত স্কুল, মান্দ্রাজে আমার অস্পৃশ্য জাতিদিগের শিক্ষার জন্য ফ্রি স্কুল সমূহ,—এ সবই আমাদের ব্যক্তিগত কার্য্য, সমিতির সহিত ইহার সম্বন্ধই নাই।"

বিশ্বাসানুযায়ীই সমিতির সেবা করিয়া গিয়াছেন। অপর সভ্যদের প্রতিও সেই উপদেশ। ব্লাভাস্কির সহিত সকল বিষয়ে একমত হইতে কেহই বাধ্য নহেন, সকলে পারিবেনও না। এমন কি, ব্লাভাস্কিকে যে কতলোক শঠ প্রবঞ্চক বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, তাহা যদি সত্যও হয়, তথাপি তাহাতে সমিতির কিছুই আসিয়া যায় না। কেন না, সমিতির উদ্দেশ্যের সারবত্তা কোন ব্যক্তি বিশেষের মতামত, নিন্দা-প্রশংসা, বা চরিত্র-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না। এ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত কথা কয়েকটী প্রণিধান যোগ্যঃ—

"What we know is that inspite of all that people have said against this extravagantly abused woman for upwards of a quarter of a century, the fundamentals of theosophy stand firm, and this for the very simple reason that they are entensely independent of Madame Blavatsky. It is theosophy in which we are interested, and this would remain an immoveable rock of strength and comfort, an inexhaustible source of study, the most noble of all quests, and the most desirable of paths on which to set our foot, even if it were possible, which it is not, conclusively to prove that, H. P. Blavatsky was the cleverest trickster and most consummate charlatan of the age. *

অর্থাৎ "এই নারীকে শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশের অধিককাল ব্যাপিয়া লোকে অপরিমিতরূপে অজস্র গালাগালি দিয়াছে। কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মবিদ্যার মূলতত্ত্বের কিছু ক্ষতি হইয়াছে কি? কিছুই নহে। তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্মবিদ্যার অস্তিত্ব ব্লাভাস্কির চরিত্রের উপর নির্ভর করে না। আমাদের ব্রহ্মবিদ্যা লইয়াই কাজ। ব্লাভাস্কিকে এ যুগের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রজালিক বা প্রতারক বলিয়া প্রমাণিত করা যদি কাহারও পক্ষে সম্ভবও হয়—বলা বাহুল্য, ইহা অসম্ভব, তথাপি সেই ব্রহ্মবিদ্যা, যাহা মানবের বল, আশা, জ্ঞানের অক্ষয় উৎসরূপে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুসরণীয় পন্থারূপে, পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান, তাহা চিরদিন বিদ্যমান আছে ও থাকিবে।"

উপরোক্ত বাক্যের সহিত একটী কথা যোগ করা যাইতে পারে। তাহা এই যে, 'অপরিমিতরূপে' উৎপীড়িতা নারী যদি মানবজাতির হিতার্থ সেই বরণীয়া ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার ও প্রসার কল্পে আত্ম-জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন, তবে আমরা বলিতে বাধ্য যে,—

"কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা
পুণ্যবতী চ তেন"

তাঁহার দ্বারা মানবকুল পবিত্র, ধরিত্রী পুণ্যবতী হইয়াছে, তাঁহার জন্ম সার্থক, নিন্দার বোঝা মাথায় বহিয়াও,—তাঁহার জন্ম ও জীবন সার্থক হইয়াছে।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

---

* "Concerning H. P. B." by G. R. S. Mead.—"East and West," Feb. 1904.

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

'God save the King'

ঝিঁঝিট—একতালা।

("পদপ্রান্তে রাখ"—গানের সুর)

ঈশ্বর, রক্ষা কর বাদসায়।
বরিষ মঙ্গল, শান্তি কুশল,
রাখ পদ-ছায়ায়।
কর জয়ী তাঁর গৌরব নিশান
সাধিতে জগতে অশেষ কল্যাণ,
দেশে দেশে, বংশে বংশে
উঠুক তাঁর জয় গান।
কর মহীয়ান্ বাদসার নাম হে,
অমূল্য শোণিত ঢালিয়া ভারত
মিনতি করে তোমায়।

শ্রীকালানাথ ঘোষ।

বালক বালিকাগণের

(Drill Dialogue)

ড্রিল-কথোপকথন।

ছেলেরা—এক দুই এক দুই,
বীর-দর্পে ভাই,
তালে তালে পা ফেলে
চল সবে যাই।
নাই ভয়, করব জয়
আলস্য বিকার,
সব প্রাণ, এক প্রাণ,
অসাধ্য কি আর!

মেয়েরা—কোথা যাও, ফিরে চাও,
ওগো বীরদল,
পদ ভরে থর থরে
কাঁপে ধরাতল।
তোমরা যাবে বীর দাপে,
আমরা রব চেয়ে?
নই কি গো একই দেশের
ছেলে আর মেয়ে?

ছেলেরা—ব'য়ে যায় কাল-স্রোত,
ছুটিছে সবাই;
যাবে পথে? এস সাথে;
পিছে কেন ভাই?
পিছে প'ড়ে গেল ম'রে
কত দেশ জাতি;
অগ্রসর, অগ্রসর,
ধরি জ্ঞান-বাতি।

মেয়েরা—তোমাদের আছে জ্ঞান,
আছে গো সাহস;
বৃথায় জনম মোদের,
চির-পরবশ।

ছেলেরা—ব'ল না ব'ল না, ওকথা ব'ল না,
শুনিতে পরাণে বাজে;
কাজের সাগর চোখের উপর,
চল ঝাঁপ দিই কাজে।
কিছুনা কিছুত ক'রে যেতে হবে,
জীবন পেয়েছ যবে;
কাজ যে জীবন, কাজ যে ভূষণ;
কাজে মাতি এস তবে।

মেয়েরা—তোমাদের কথা শুনে
মৃত প্রাণ জাগে;
আশার নূতন বাতাস
প্রাণে যেন লাগে।

ছেলেরা—
আমাদের থাকে যদি জ্ঞান আর শক্তি;
তোমাদের শিরোমণি প্রেম আর ভক্তি।
জ্ঞান-প্রেম, শক্তি-ভক্তি মিলে গো যেখানে
অসম্ভব কিবা থাকে বলত সেখানে?

মেয়েরা—
তাই হ'ক, এক হ'ক উভয়ের বল;
তোমাদের সাথে গেলে রব না দুর্ব্বল।

ছেলেরা—
শুভক্ষণে খুলে গেছে শাস্ত্রের দুয়ার;
জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যে সবার অধিকার।

জগতে উঠেছে রোল "উন্নতি উন্নতি"
আমরাও ধরি তবে জগতের গতি।
প্রাচীনের যাহা ভাল তাহা ত লইব,
নূতনের যাহা ভাল তাহা কি ছাড়িব ?
মেয়েরা—আবার ধর্ম্মের জয় উঠিবে জগতে।
আবার নৈমিষারণ্য দেখিব ভারতে।
পাশে পাশে, সাথে সাথে চল সবে ভাই,
জীবনের মহালক্ষ্য বুঝেছি সবাই।
ছেলেরা ও) এক দুই, এক দুই,
মেয়েরা বীর-দর্পে ভাই
তালে তালে পা ফেলে
চল সবে যাই।
নাই ভয় করব জয়,
আলস্য, বিকার ;
সব প্রাণ একপ্রাণ
অসাধ্য কি আর !

শ্রীকালীনাথ ঘোষ

বসন্ত-আবাহন।

অন্তরে মম চির-বসন্ত জাগো।
সুন্দর শুভ শ্যামল সান্ত জাগো।
শীত-সঙ্কোচ ক্ষুব্ধ আননে,
ব্যথিত দলিত মৃত এ কাননে,
প্রভাত তপনে সান্ধ্য-স্বপনে
নিশীথ-শয়নে জাগো।
দিক্-মুখরিত গান্ধার-রাগে,
ঘন পল্লব গন্ধ-পরাগে,
চির মুকুলিত ফু'ল্ল সোহাগে,
নব অনুরাগে জাগো।
চঞ্চল তব অঞ্চল মেলি' ;
কুসুমিত নব সৌরভে খেলি,
অলির গুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে,
হিয়ার কুঞ্জে জাগো।
জাগো ওহে জাগো দখিণা বাতাসে,
জাগো নির্ম্মল দীপ্ত আকাশে,
জাগো মধুময় কৌমুদী-শ্বাসে,
নব-রস রাসে জাগো।
চির বসন্ত জাগো। দরবেশ।

সর্গীয় কবিবর
৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের
দ্বিচত্ত্বারিংশৎ স্মৃতি-সভা।

কবিকুঞ্জ-কাননের অকাল কোকিল,
মধুময় কুহুরব, নহে বীণা-ধ্বনি
সাগর কল্লোল সম, উথলি ধরণী
পাইলে নূতন সুরে ভাসি বীর রসে
মেঘনাদ তিলোত্তমা, মধুময় তানে
বীরাঙ্গনা ব্রজাঙ্গনা বঙ্গে অতুলনা।
মহাকবি, অন্ধকার বঙ্গভূমি যবে
প্রতীচ্যের মহামূল্য রতন আহরি
সাজাইলে মাতৃভাষা অমিত্র গ্রন্থনে
মিত্রাক্ষর শৃঙ্খলিত ভাষায় উদ্ধারি।
চিনে নাই তোমা কেহ, অন্ধ মোহ মদে,
বিদ্বেষ নেহারি যোগ্যতম অভ্যুত্থান।
তাই আজি বঙ্গভূমি জাতি বর্ণ ভুলি
অর্পিছে তোমার পদে কুসুম-অঞ্জলী।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

ত্রিবেণী।

(১)

ভক্তি প্রীতি-প্রেম মোর উচ্ছ্বসিত হয়ে অনিবার
তোমারি চরণ-প্রান্তে রচিতেছে তীর্থ মা আমার !
আসে কি আহ্বান-বাণী !—
ভুলি দুঃখ-দৈন্য গ্লানি,
দিতে হবে হে কল্যাণী,
আপনারে সেথা উপহার !

(২)

বিশ্বের সকল তীর্থ সে নবনী ত্রিবেণী-সঙ্গমে
অতর্কিতে আসি কবে মিলিয়াছে অয়ি নিরুপমে !
স্বর্গ কোথা জানি নাত !
পুণ্য কিবা চিনি নাত !
কেবলি ছুটেছি মাতঃ,
মগ্ন হতে সেথা প্রিয়তমে !

(৩)

ক্ষুদ্র জীবনের মোর যত কিছু কলঙ্ক কালিমা
সস্নেহে আপন করে মুছাইয়ে দিবে কি আজি মা !
পবিত্র সুন্দরতর
হবে চিত্ত-কলেবর !—
মুগ্ধ-নেত্রে চরাচর
চেয়ে রবে তোমারি মহিমা !

তবুও পাপের ছায়া
ঢাকিয়ে রেখেছে কায়া,
ক্ষিপ্ত আশা কাণে কাণে কত কথা কয়।
কি যেন ফেলেছি কাছে
কি যেন হারায়ে গেছে,
না পাই দেখিতে তবু আছে মনে হয়,
সংসার-কুজ্ঝটি ঢাকা হৃদয়-নিলয়।

(৫)

মর্ত্ত্যে তব করুণার
অংশরূপা অবতার
ছত্রধারী-কুলশোভা 'কিষণ-প্রতাপ' জায়া
পূর্ণশক্তিস্বরূপিণী
'হরশরণ'-নন্দিনী
'হোসেপুর' রাজলক্ষ্মী, শক্তিরূপা মহামায়া,
যাহার কল্যাণ তরে
নিয়ত তোমার দ্বারে
রাজরাণী ভিখারিণী কণা মাত্র করুণার।
রক্ষা কর শিবরাণী,
রাজরাণী আঁখিমণি—
রাজ-ইন্দ্র বংশধর 'আশ্রম-প্রতাপে' তার
বিপদ-সঙ্কুল ধরা স্বভাব-সন্তাপাগার,
শৈবকুল শিবাণী মা চির আশ্রয়ে তোমার।

(৬)

ভক্তিযোগে শক্তিহারা
ভব ঘোরে আত্ম-ছাড়া,
মহাশক্তি হৃদি মাঝে হওমা উদয়,
শক্তিরূপে আলো করি
বাহিতে জীবন-তরী,
ঘুচায়ে আঁধার, পথ দেখাও আমায়,
দীনা-হীনা অভাগীরে দেহ পদাশ্রয়।

কুমারী প্রফুল্লনলিনী সরস্বতী।

বৃন্দাবনে।

চৌবে ঠাকুরের কৃপায় একখানা এক্কায় উঠিলাম; মথুরা হইতে বৃন্দাবন তিন ক্রোশ—স্থির হইল, /১০ ছয় পয়সা দিতে হইবে। সবে এক্কায় এক পা দিয়াছি, এমন সময় এক কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ-বাহু, আরক্ত-লোচন, লোটাহস্ত পুরুষ আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল; কথায় বুঝিলাম, ইনি বৃন্দাবনের পাণ্ডা বা ব্রজবাসিন্। পেটে সরস্বতীর অস্তিত্বে সন্দেহ থাকিলেও মুখে ইহারা কখনও ব্রজবাসিন্ না বলিয়া ব্রজবাসী বলিবে না। আমি সর্ব্বত্র যে সনাতন রীতি অবলম্বন করিয়া থাকি, এস্থলেও তাহাই করিলাম। সত্যকথা বলিতে কি, 'বোবার শত্রু নাই' এই অমূল্য নীতি-বাক্যটী পালন করিতে আমি এমনি অভ্যস্ত হইয়াছিলাম যে, হরিদ্বার পথে দীল্লি হইতে শাহারণ পর্য্যন্ত কলিকাতার একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে নেহাৎ হাবা বলিয়াই ঠাওরাইয়াছিলেন এবং প্রকাশ্যেও পূর্ব্বোক্তরূপ রায় দিয়া আমায় কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এক্কা আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল; ব্রজবাসিন্‌ও এক্কা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন; শেষে অনন্যোপায় হইয়া এক্কায় উঠিয়া বসিলেন। এই লোকটাকে সঙ্গী করিতে আমি বড়ই অনিচ্ছুক ছিলাম; কিন্তু তাহার ইচ্ছার মাত্রা আমার অনিচ্ছার মাত্রাকে অতিক্রম করিয়াছিল; সুতরাং সে কিছুতেই নামিল না; শোণিত-শোষণকারী জলোকাবৎ এ মহাত্মাও বুঝিবা আমার রক্ত শোষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আমি তাহার শত প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া এদিক ওদিক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। আর একজন আরোহীর অপেক্ষায় এক্কা একস্থানে স্থির হইয়া

দাঁড়াইল। এমন সময়, "কোথায়ও ডাকবাক্স নাই?" এই কথাটী আমার মুখ হইতে বহির্গত হইল। পাণ্ডাজি, "দিন্ বাবু, আমি চিঠি বাক্সে ফেলে দিয়ে আস্‌ছি," বলিয়া আগ্রহ ও কাকুতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমি কিন্তু তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে কিছুতেই রাজী হইলাম না। পাণ্ডার হাবভাবে বোধ হইল, সে অতীত নীচ ভৃত্যের কার্য্য করিতেও পরাঙ্মুখ নয়; পরে শুনিলাম, তাহাও তাহারা করিয়া থাকে। হায়রে অর্থ! এক্কা-চালক মুসলমান, তাহার কথার মধ্যে একটী বঙ্গদেশ-সুলভ সুর বা টান বিদ্যমান; এই সুর-সাদৃশ্যের কারণ চিন্তায় আমি কতক সময় অতিবাহিত করিলাম। পরে দিল্লী যাইয়া একজন সুশিক্ষিত বন্ধুর নিকট শুনিলাম, দিল্লী অঞ্চলের কথা হইতেই বঙ্গদেশের কথায় ঐরূপ সুর হইয়াছে। মুসলমান সম্রাটগণের সময়ে ঢাকা নগরী উন্নতির চরমসীমায় উন্নীত হইয়াছিল। এ অঞ্চলের মুসলমানগণ ঢাকা নগরী ছাইয়া ফেলিয়াছিল। রাজানুকরণ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সমাদৃত; সুতরাং ঢাকায় এ অঞ্চলের মুসলমানগণের অনেক কথা প্রচলিত হইল এবং ক্রমে তাহা সমস্ত বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িল। শুনিলাম, বঙ্গদেশ-প্রচলিত বাইগন (বেগুণ), বিলাই (বিড়াল), আখা (উনুন) ইত্যাদি শব্দ দিল্লীতেও খুব প্রচলিত। রাজানুকরণের ফলে আজ পূর্ব্ববঙ্গের লোক 'বাঙ্গাল' বলিয়া উপহসিত হইতেছে। অতীত ও ভবিষ্যতের একটা আবছায়া নিমেষে চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়া গেল।

এবার এক্কা পূর্ণবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। ঝাকুনির চোটে অন্নপ্রাশনের অন্ন উদ্‌গমনের উপক্রম হইল; মনে হইল এক্কায় চড়িয়া শেষে অক্কা পাইয়া মক্কা যাইয়াই বা পড়ি, বৃন্দাবন দর্শন বুঝি আর অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না: নাড়ীভুঁড়ি পর্য্যন্ত বেদনা হইয়া গেল; অতিকষ্টে চলিতে লাগিলাম। পথে একস্থানে একটী সুদীর্ঘ-টিনের ঘর দেখিয়া পাণ্ডাজিকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; শুনিলাম, জয়পুরের রাজা গাভীদের থাকিবার সুবিধার জন্য ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এ অঞ্চলে গাভীদের সর্ব্বত্রই খুব আদর।

আগ্রা হইতে মথুরার পথে কলিকাতা যোড়াসাঁকো-নিবাসী এক মাদুর ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তার ঠিকানাটা আমার জানা ছিল। সুতরাং বৃন্দাবন নামিয়াই তাহার বাসা খুঁজিতে লাগিলাম। পাণ্ডাজি আমার অনুগমন করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প করিলাম,তাহার বাড়ী যাইবনা। কেননা, লোকটার চেহারা দেখিয়া দিবাভাগেই আমার ভয় হইতে লাগিল। বৃন্দাবনের পাণ্ডাগণের অনেক কীর্ত্তি ইতিমধ্যেই আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। মথুরা হইতে বৃন্দাবন তিন ক্রোশ মাত্র। শুনিলাম, ৪টার পর হইতে লোক চলাচল বন্ধ— ডাকাতের ভয়; রাস্তার উভয় পার্শ্বে লোকজনের বসতি নাই বলিলেই হয়। তবে ডাকাতি করে কে? একবার সকলকেই অনুমান করিয়া দেখিবেন। প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সাম্রাজ্যে এখনও এত ডাকাতের ভয় বিদ্যমান, শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। এই ডাকাতের ভয়টা আমায় একটুকু চিন্তিত করিয়াছিল। তাই পাণ্ডাজির বাড়ী যাইতে স্বীকৃত হইলাম না। মাদুরওয়ালাকে

খুঁজিয়া পাইলাম। কিন্তু সেই স্থানটী আমার পছন্দ হইল না, সুতরাং দিল্লীছত্রে চলিলাম। বৃন্দাবনে খুব কলেরা লাগিয়াছে, একথা আগ্রায়ই শুনিয়াছিলাম। মনে একটুকু ভয়েরও সঞ্চার হইয়াছিল। সুতরাং দিল্লীছত্রে যাইবার পথে যখন দুর্গন্ধময় গলি সকল অতিক্রম করিয়া চলিলাম, এবং নর্দ্দামার উভয় পার্শ্বে মক্ষিকাসমাকুল পুরীষ রাশি ইতস্ততঃ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল, তখন প্রাণের মধ্যে "সামাল সামাল" ডাক পড়িয়া গেল, পালাবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। আমার জীবনে এমন নোংরা জায়গা আর কোথায়ও দেখি নাই। বৃন্দাবনের মাহাত্ম্যের কথা নিমেষে ভুলিয়া গেলাম। প্রাণ লইয়া তিষ্ঠান ভার হইল। এমন একটী তীর্থস্থান এরূপ পূতিগন্ধময়—আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। শক্তিশালী ব্যক্তিগণ কি ইহার প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে পারেন না? এমন অপরিষ্কৃত স্থান যে, কলেরার চির আবাসস্থল হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? রাজা মহারাজাগণ অজস্র অর্থব্যয়ে বৃন্দাবনে কত নূতন নূতন মন্দির ও বিগ্রহাদি স্থাপন করিতেছেন; ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন কতশত মতে প্রকটিত করিয়া ধন্যবাদার্হ হইতেছেন; কিন্তু এদিকে কি কাহারও দৃষ্টি পতিত হইবে না? আমরা নরসেবা-নিরত মহাত্মাগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, অচিরে ইহার প্রতিবিধান করিয়া তাঁহারা অসংখ্য ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর প্রাণরক্ষা করুন। আমি সঙ্গিনী-বর্জ্জিত বলিয়া দিল্লীছত্রে উপেক্ষিত হইলাম। পাণ্ডা তখন একটী মতলব আঁটিয়া আমায় এক বঙ্গবাসীর বাড়ীতে লইয়া চলিল। বঙ্গবাসী নাম শুনিয়া আমি যেন অনেকটা ভরসা পাইলাম। এবার আমি অলক্ষিতে পাণ্ডার ফাঁদে পা ফেলিলাম। পূর্ব্বে খবর না লইয়া বৃন্দাবন যাওয়ার কত বিপদ, তাহা স্মরণ হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি একটা বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। একজন লোক আসিল; তাহার শরীরে বাঙ্গালীর রক্ত বিদ্যমান থাকিলেও কিন্তু সে ঐ দেশীয়। তবে বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারে। দোতলায় একটী ঘর ঠিক করিয়া আমার পুটলিটী রাখিয়া দর্শনার্থ বহির্গত হইলাম।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা স্মরণ হইল। বৃন্দাবনে ব্রজবালকগণের সুমধুর নৃত্যগীত শ্রবণ করিয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। অপূর্ব্বভাবের সমাবেশে আত্মহারা হইয়া তিনি কি আনন্দই না সম্ভোগ করিয়াছিলেন! আর অস্থিরমতি কলুষ-হৃদয় আমিও ত সেই বৃন্দাবনে উপস্থিত। মহাভাব-সাগরের একটী ক্ষুদ্র ভাবকণিকাও কি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিবে না? বহুকালের হৃদয়পোষিত স্বপ্নরাজ্য দর্শন করিয়াও কি আমি স্বর্গীয়-আনন্দ সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিব? হই না আমি অভক্ত, হই না আমি অপ্রেমিক; কিন্তু তিনি ত শুধু ভক্ত ও প্রেমিকেরই সম্পত্তি নন। তিনি যে পাতকী-তারণ, পতিত-পাবন, দীনশরণ। এই একমাত্র আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করিয়াই আমি বৃন্দাবনে আসিয়াছি, তিনি কি আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা জানিয়া হৃদয়ে প্রকাশিত হইবেন না? এইরূপ কতশত চিন্তা লইয়া আমি নন্দালয়ে উপস্থিত হইলাম। একটা পাহাড়ের মত উচ্চ বাড়ীর একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মন্থন-নিরত নন্দ ও নন্দরাণী, সম্মুখে নবনীত-প্রয়াসী বালক গোপাল হস্ত

প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান। বালক গোপালের দুইটী মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম; গৃহস্বামী বা নন্দালয়-স্বামী বলিলেন, একটী গোপাল ও অপরটী বলরাম। প্রশ্ন করিলাম—তবে একই মূর্ত্তি কেন? উত্তরে জানিতে পারিলাম, রাসের সময় বলরামকেও কৃষ্ণের মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সেই বেশেই তাঁহারা যশোদার নিকট নবনীত-প্রার্থী হইয়াছিলেন, —তাই বলরামের মূর্ত্তি ও কৃষ্ণের মূর্ত্তির পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই। আমি পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করায় গৃহস্বামী একটুকু উষ্ণ হইয়া উঠিলেন; হয়ত প্রশ্নগুলি ঠিক ভক্তজনোচিত হয় নাই; থাক্, সব কথা এখন আমার স্মরণ নাই। তবে রাগের মাথায় তিনি বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, "কৃষ্ণ কে? সে ত আমাদের পা ধুইবার জল দিত,ইত্যাদি"—কি দাম্ভিকতা! আমি নীরব থাকিতে পারিলাম না বলিয়া ফেলিলাম—"এই অহঙ্কারেই ত সব গোল্লায় গেল।" আর নয়, এবারে মানে মানে সরিয়া পড়িলাম। আমার পাণ্ডাও আমার উপর খুবই অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল; তাহাকে বুঝাইলাম, একটুকু ভিতরের খবর জান্তে ইচ্ছা করিয়াই,আমি এতগুলি প্রশ্ন করিয়াছি তাতে রাগ্‌লে চল্‌বে কেন?

সম্মুখেই কালীয়দমনের চিত্র। সদ্য প্রাণঘাতক হলাহল-উদ্গীরণকারী ভীষণ-দর্শন কালীয়নাগ ফণা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান; সেই সুবিস্তৃত ফণার উপরে কৃষ্ণ উপবিষ্ট। পুরোভাগে নাগপত্নী যুক্তকরে কাতর নয়নে পতির প্রাণদান ভিক্ষা করিতেছেন। তাকাইতে ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। সুতরাং এখানে আর বসিলাম না।

এবারে রঙ্গনাথ ঠাকুরবাড়ী বা শেঠদের ঠাকুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। প্রায় অশীতি বৎসর পূর্ব্বে মথুরা-নিবাসী জগৎ শেঠ নামক জনৈক ধনকুবেরের দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবন যাত্রীমাত্রই শেঠদের ঠাকুরবাড়ী দেখিবার জন্য লালায়িত। ঐশ্বর্য্যের এমন জাজ্বল্য নিদর্শন আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। তুঙ্গশীর্ষ তোরণ দ্বার অসংখ্য দেবদেবীর খোদিত মূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া শেঠজির অতুলনীয় অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপ ঘোষণা করিতেছে। তোরণদ্বার অতিক্রম করিলেই সুবিস্তৃত সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণ ও তৎসংলগ্ন রঙ্গনাথ দেবের মন্দির নয়নপথে পতিত হয়। মন্দিরের দরজায় অসংখ্য ঘণ্টা লম্ববান রহিয়াছে। এই ঘণ্টা সমুত্থিত অপূর্ব্ব ঝন্‌ঝনাৎকার রব সুদূরস্থিত নরনারীগণকে মন্দির দ্বার উদ্‌ঘাটন ও রুদ্ধকরণ বার্ত্তা জ্ঞাপন করে। মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে প্রায় চত্বারিংশ হস্ত-পরিমিত সুদীর্ঘ-স্বর্ণ-মণ্ডিত স্তম্ভ স্বর্ণমণ্ডিত বেদীর উপর বিদ্যমান থাকিয়া রবিকর-প্রতিফলিত হেমকান্তি রাশী বিকীরণ করিতেছে। জ্বলন্ত পাবক-শিখা যেন স্তম্ভীভূত হইয়া যাত্রীর চখে ধাঁধাঁ লাগাইবার জন্য বিদ্যমান রহিয়াছে; অথবা কার্পণ্য দোষ-দিগ্ধ কাঞ্চন-লোলুপ যাত্রীর মানস-চক্ষে কাঞ্চন-বিতৃষ্ণা প্রতিবিম্বিত করিবার জন্যই এই স্বর্ণস্তম্ভ বা সোণার তালগাছ দণ্ডায়মান। সুবিশাল মন্দিরের পুরোভাগে সুবিস্তৃত দরদালান—তলদেশ শ্বেত-কৃষ্ণমর্ম্মর আস্তৃত; স্তম্ভে স্তম্ভে বহু সংখ্যক খোদিত-দেবদেবী মূর্ত্তি। মন্দিরের অভ্যন্তরে স্বর্ণ-সিংহাসনে রঙ্গনাথ দেব বিরাজমান। মন্দিরের বহির্ভাগে রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি অসংখ্য মূর্ত্তি চিত্রিত। জনৈক

বর্ষীয়ান বৈষ্ণব প্রবেশ-পথ-পার্শ্বে একমনে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে নিমগ্ন। মন্দিরটী শান্তি ও ভক্তি-মাখান। মন্দির পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, মন্দিবের চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্যান্য গৃহে, বহুসংখ্যক দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত—কোনটী শ্বেত, কোনটী কৃষ্ণ, কোনটী প্রস্তর-নির্ম্মিত, আবার কোনটী বা পিত্তল বা চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত,—বলরাম, বনগোপাল, সনতকুমার, রামলক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়; বদরিনারায়ণ, পরশুরাম প্রভৃতি শ্রুত ও অশ্রুতপূর্ব্ব অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত। শুনিলাম, এই মন্দিরে হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত তেত্রিশকোটী দেবদেবীর মূর্ত্তিই বিদ্যমান। অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, অতুলনীয় ধর্ম্মস্পৃহা, অভাবনীয় দানশীলতার একত্র সমাবেশ। শেঠদের মন্দির বৃন্দাবনের আধুনিক সম্পত্তি হইলেও বর্ত্তমানে সর্ব্বজন-বিদিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

একটু পরেই আমরা লালাবাবুর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। অপূর্ব্বত্যাগী ভক্তচূড়ামণি লালাবাবুর নাম কে না শুনিয়াছে? ত্যাগের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কোথাও শুনি নাই। ঐশ্বর্য্যশালী শেঠজির মন্দিরের পার্শ্বেই সর্ব্বত্যাগী লালাবাবুর মন্দির - ঐশ্বর্য্য ও ত্যাগ যেন পাশাপাশি রাজত্ব করিতেছে। শেঠজির মন্দিরের সৌন্দর্য্য. বাহ্যিক চাকচিক্যে শুধু আকৃষ্ট ও আনন্দিত হইয়াছিলাম। এবার ভক্তের মন্দিরের আভ্যন্তরিণ সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া মুগ্ধ ও আত্মহারা হইলাম। ভক্তের মন্দিরের পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থাই ভক্তিরসে আপ্লুত—তোরণের নিকটবর্ত্তী সুদীর্ঘ ভূভাগে অসংখ্য দীনদরিদ্র ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মর্কটবৃন্দ দরিদ্রেব দুঃখে উদাসীন পান্থগণের বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া লাঞ্ছনারচ্ছলে যেন কিছু শিক্ষা প্রদান করিতেছে; তবে দুই একটা কাণ্ডজ্ঞান হীন বর্ব্বর মর্কট ভিখারীদের দুঃখ অনুভবে অশক্ত হইয়া অলক্ষিতে তাহাদের ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া মাঝে মাঝে একটুকু রসিকতা করিতেও ক্ষান্ত হইতেছে না। মর্কটবাহিনী অতিকষ্টে অতিক্রম করিলাম। সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়রাজ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উচ্ছ্বাস আনয়ন করিল; ভক্তি নিস্যন্দিনী অমিয়ধারা শুধু শ্রবণ পথে নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়-পথে আমার মরমে প্রবেশ করিতে লাগিল—আত্ম-বিস্মৃত আমি অসংখ্য ধর্ম্মপিপাসু নরনারী-পরিপূরিত সেই বিশাল মন্দিরের জন-সঙ্ঘের একপার্শ্বে আকুল হৃদয়ে বসিয়া পড়িলাম। কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, তাহা বুঝাইয়া বলিবার ভাষা কোথায় পাইব? ভাষা ও ভাবসম্পদবিহীন আমি কেমন করিয়া তাহা বর্ণনা করিব? কীর্ত্তন চলিতে লাগিল—চতুর্দ্দিকেই বঙ্গদেশীয় ভক্ত নরনারী ভক্তিরসাস্বাদনে বিভোর। কত নরনারী ভাবে বিহ্বল হইয়া দর দর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, অশ্রু, পুলক, স্বেদ, কম্প ইত্যাদি মহাভাবের লক্ষণ কাহারও দেহে পরিলক্ষিত হইতেছে; আনন্দে কাহারও নয়ন-যুগল উৎফুল্ল. কাহারও বা ব্যথিত হৃদয় প্রচ্ছন্ন বেদনার অভিব্যক্তির নিদর্শন স্বরূপ দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে পর্য্যবসিত হইতেছে—কাতরচাহনী অপরের নয়নগোচর হইয়া তাহাকেও আকুল করিয়া তুলিতেছে; কেহ বা নিমীলিত নেত্র, সঙ্গীত সুধাপান করিতে করিতে আত্মহারা। কি সুন্দর দৃশ্য! ভক্তির স্রোতে যেন সকলে ভাসিয়া

চলিয়াছেন সেই সর্ব্বজ্বালাহর, শান্তি-সুধাকর, প্রেম-পারাবার পতিতপাবন দয়াল শ্রীহরির প্রেমরাজ্যে। এই দৃশ্যটী যদি ভাগ্যে না ঘটিত, তবে শুধু বুকভরা অনুতাপ লইয়াই বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে হইত! অবস্থা অনুকূল নয় বলিয়া এই স্বর্গীয় সুখ অধিকক্ষণ সম্ভোগ করিতে পারিলাম না।

তারপর ব্রহ্মচারীর মন্দির দর্শন করিলাম: এই মন্দিরে হংসগোপাল—রাধাগোপাল ও নৃত্যগোপাল, এই তিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। শুনিলাম, জয়পুরের রাজা তাঁহার গুরুদেবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই মন্দির স্থাপন করিয়াছেন—তাঁহার গুরুদেবের তৈলচিত্র মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড দালানে বিদ্যমান। রাত্রে রাসযাত্রা হইবে, তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে দেখিতে পাইলাম।

পথে গোপেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া বংশীবটের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই সেই বংশীবট, যেখানে ষোড়শ সহস্র গোপিনীর সঙ্গে কৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেন—অতি সংকীর্ণ স্থান—ষোল হাজার গোপিনী কোথায় দাঁড়াইতেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কথাটা যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। অভক্ত আমি, অবিশ্বাসী আমি কেমন করিয়া এসব কথা বিশ্বাস করি? একটী ছোট মন্দিরের সম্মুখে একজন কথক কথকতা করিতেছিলেন—৪।৫ জন শ্রোতা সম্মুখে উপবিষ্ট দর্শন করিলাম। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে গোপিনীদের অসংখ্য ছবি চিত্রিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইলাম।

এবারে গোপীনাথের বাড়ীর সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম—মন্দিরদ্বার তখন রুদ্ধ ছিল। একটু পরেই উন্মুক্ত হইল; দর্শন করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। সর্ব্বত্রই "বাবু ভেট চড়াও" এই একই কথা শুনিলাম।

এবারে গোবিন্দজির পুরাতন মন্দির-সম্মুখে উপস্থিত, এক সময়ে ইহা প্রকাণ্ড সপ্ততল প্রাসাদের মত ছিল। হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী সম্রাট আওরঙ্গজেব শয়নাগার হইতে ইহার আলোক-রশ্মি অবলোকন করিয়া কাফেরদের দেবমন্দিরের আলো অসহ্য হওয়াতে, এই মন্দিরের উপরের চারিতলা ভাঙ্গিয়া ফেলেন; অদ্যাপিও ত্রিতলোপরি ভগ্নস্তম্ভাদি দিল্লীশ্বরের সেই দুষ্কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিবার জন্য উন্নতশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই মন্দিরটী এখন অনেকটা অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কবুতর বৃন্দের বিশ্রান্তালাপ ব্যতীত ইহার একচ্ছত্র নিস্তব্ধতার রাজত্বে অপর প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই। সন্ধ্যায় অস্পষ্টালোকে একটা নিরানন্দ ও বিষাদের ছায়া আসিয়া আমায় ঢাকিয়া ফেলিল; সহসা যেন অনিত্যতার করুণ সঙ্গীত হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল।

পাণ্ডার তাড়নায় অনিচ্ছাসত্বেও মন্থরগমনে তাহার অনুসরণ করিলাম। এবারে গোবিন্দজির বর্ত্তমান আবাসস্থল—প্রকাণ্ড বাড়ী,—সুবিস্তীর্ণ মর্ম্মর-খচিত প্রাঙ্গণ, মন্দিরের পুরোভাগে তীর্থযাত্রিগণের বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন স্বরে ও ছন্দে উচ্চারিত বন্দনাধ্বনিতে মুখরিত। এখানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক যাত্রীর সমাবেশ দেখিলাম।

তার পর জয়পুর-রাজমহিষীর ঠাকুরবাড়ী দর্শন করিয়া লক্ষ্ণৌর সা বিহারীলাল-প্রতিষ্ঠিত রাধারমণের সৌধোপম মন্দিরে উপনীত হইলাম। এই মন্দিরের সর্ব্বত্রই

শান্তি বিরাজিত, পুরোভাগে উদ্যান-সুলভ লতাগুল্ম ও বল্লরী-পরিশোভিত নানাবর্ণের নেত্রবিনোদন সুরভি-কুসুম সৌরভচ্ছলে নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া প্রাণে যেন পবিত্র সুধারাশি বর্ষণ করিতেছে। এমন শান্তির আগারে আসিয়া আমি আমার আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ না করিয়া পারিলাম না। পাণ্ডাকে অনেক বুঝাইয়া মন্দিরের নির্জ্জনপ্রায় প্রকোষ্ঠে উপবেশন করিলাম। কিছুক্ষণ ভগবৎ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে এই সঙ্গীতটী আসিয়া আমার হৃদয়-ফলকে প্রতিফলিত হইল– আমি নীরবে এই সঙ্গীতটী গান করিতে লাগিলাম—

কবে হৃদি-বৃন্দাবনে, হৃদয় রমণে, পরম গোপনে হেরিব ?
দূরে যাবে যত পাপের দাহন,
চিরশান্তি নীরে হইব মগন,
সুন্দর শোভন, নয়নলোভন লোভনীয় ধনে লভিব ?
অজ্ঞান-ভঞ্জন, হৃদয়-রঞ্জনে হৃদয় মাঝারে পাইব ?

এইটী বৃন্দাবনের অন্যতম সুখ-স্মৃতি। রাত্রি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পাণ্ডা উত্যক্ত হইয়া উঠিল। অগত্যা উঠিতে বাধ্য হইলাম। সামান্য কিছু খাবার কিনিয়া লইয়া বাসায় ফিরিলাম। পথে ব্রজবালকের মুখে অপূর্ব্ব ব্রজ বুলিতে উচ্চারিত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলাম—সন্তুষ্টচিত্তে দুই জনকে দুটী তাম্রখণ্ড অর্পণ করিলাম,—বালকদ্বয় গাইল –

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন,
মধুর মধুর বংশীবাজে এই ত বৃন্দাবন,
বাচ্চা হরি বল।

হরি বলিব কি, তখন ব্রজবালকদ্বয়ের অপূর্ব্ব স্বর আমার কর্ণরন্ধ্রে যেন বীণার মত বাজিতেছিল। কি সুমিষ্ট স্বর, অত্যল্পকাল পরেই বাসায় যাইয়া পৌঁছিলাম।

পাণ্ডাজিও আমার সঙ্গে ছিল। এবারে বাসার ভাব দেখিয়া আমি ভীত ও স্তম্ভিত হইলাম। অতি কষ্টে ভয়টা চাপিয়া পাণ্ডাকে বিদায় দিলাম। এতবড় বাড়ীটায় পুরুষ মানুষ নাই। পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী পাণ্ডার কথা বলিয়াছি, সেও নাকি সিদ্ধি খাইতে গিয়াছে। এমন একটা বিপদে আর কখনও পড়ি নাই। শুনিলাম, ইহারই নাম কুঞ্জ—ইহার অধিষ্ঠাত্রী একজন কুঞ্জবাসিনী, অবশ্য বাঙ্গালী। বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়া তাহারা বৃন্দাবনে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতেছে! হায় রে ধর্ম্ম! আমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভিতর হইতে দরজায় তালা-কুলুপ লাগাইলাম। যৎসামান্য কিছু ফলাহার করিয়া চাঁদ দেখিতে লাগিলাম. ঠিক করিলাম কিছুতেই ঘুমাইব না, ভগবান আমার সহায় হইলেন; কুঞ্জবাসিনী রাই ললিতা বিশখাদির হাসির উচ্ছ্বাস অতিক্রম করিয়া প্রকোষ্ঠ-সন্নিহিত অপর বাড়ীর ছাতে মার্জ্জার সারমেয়ের রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; সহসা সে ধ্বনি—

ডুবাইয়া হাসিরাশি, মাতাইয়া দশদিশি,
জাগাইয়া ব্রজবাসী,
পশিল পরাণে;
ভাঙ্গিল তন্দ্রার ঘোর আর কিবা ভয় মোর
দুটীকর করি জোড়
বসিনু আসনে।

পৌর্ণমাসী রজনীর স্বচ্ছ ধবল কিরণ-জালে আমার প্রকোষ্ঠ উদ্ভাসিত; নির্জ্জন কুটীরে সঙ্গী খুঁজিতে খুঁজিতে একমনে আমি আরাধ্য দেবতার আশ্রয়-ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। সেদিন রাস-পূর্ণিমা; প্রাণে কত কি ভাবের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল; রাসের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক ব্যাখ্যার কথা স্মরণ

করিয়া প্রাণ যুগবৎ সুখ ও দুঃখে অভিভূত হইল; একটা অভাবের স্পষ্ট অনুভূতি আসিয়া হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল, যিনি সকল অভাব পূরণ করেন,তাহার শরণাপন্ন হইলাম। ক্রমে রণ-দুন্দুভি থামিয়া গেল; মার্জ্জার—সারমেয় ক্ষণস্থায়ী সন্ধি স্থাপন করিল; (যদিও কিছুক্ষণ পরে অনেক দূরে তাহাদের তূর্য্যনাদ আবার শ্রুতিগোচর হইল)। প্রকৃতি হাসিতে হাসিতে জ্যোৎস্না-সখীর অঙ্কশায়িনী হইলেন; নিদ্রাদেবী সুযোগ বুঝিয়া আবার নয়নপ্রান্তে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? বিধির অপার কৃপায় ভীমকায় মশকবৃন্দের অবিরাম অসহ্য দংশনে নিদ্রাদেবী অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলেন না। মৎকুণ-মশক-প্রক্ষ আমিও সেই দংশনের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। বিদেশী কসরৎ-অনভ্যস্ত আমি পর্য্যায়ক্রমে শয়ন উত্থান,দণ্ডায়মান ও পাদচারণ ইত্যাদি স্বদেশী কসরতের অনুশীলন করিতে লাগিলাম। রাত্রি জাগরণে অপটু না হইলেও, দিবসের ইতস্ততঃ পর্য্যটনজনিত ক্লান্তি একটা অবসাদ আনিয়া দিতে লাগিল। অবশেষে জননী নিদ্রাদেবীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া আমি কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম। নৈশ অন্ধকার যখন একটু একটু করিয়া তরল হইতে আরম্ভ করিল, তখন আমি উঠিয়া বসিলাম। ইষ্টদেবতার চরণ বন্দনা করিয়া আমি প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিলাম। প্রাভাতিক স্নিগ্ধ সমীর মৃদুমন্দ সঞ্চারণ-ব্যাপদেশে যেন আমায় ব্যজন করিতে লাগিল। প্রচণ্ড ঝড়ের অবসানে শব্দমুখরিত প্রকৃতি যেমন স্তব্ধ শান্তভাব ধারণ করেন, রজনীর উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম হাস্যলাস্যাবসানে সমস্ত গৃহখানি সেইরূপ শান্তশ্রী ধারণ করিল। নিঃশব্দ পদ সঞ্চারণে আমি ছাদে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। একটু পরেই আমার পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরভাড়া ইত্যাদি পরিশোধ করিয়া শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড-গিরি-গোবর্দ্ধন দেখিবার জন্য বহির্গত হইয়া পড়িলাম।

ষ্টেশনে যাইয়া মথুরার টিকেট কিনিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ী মথুরায় পৌছিল। বর্দ্ধমান-নিবাসী দুইটী ভদ্রলোকের সঙ্গে একত্রে শ্যামকুণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলাম। এখানে একটী কথা বলিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৃন্দাবন-দর্শনেপ্সু যাত্রীবৃন্দের মথুরাই কেন্দ্রস্থল। বৃন্দাবন-সংলগ্ন যে কোনও তীর্থস্থল দর্শন করিতে হইলেই মথুরা আসিতে হইবে। মথুরার চৌবেঠাকুর বলিলেন, "সকালে মথুরা হইতে বাহির হইতে হয়, এবং দর্শন করিয়া বিকালে মথুরায়ই আসিয়া আশ্রয় লইতে হয়; কেন না, অন্যত্র আশ্রয়স্থল নিরাপদ নহে। এই সমস্ত তীর্থ-স্থলগুলি মথুরা হইতে তিন ক্রোশ, পাঁচ ক্রোশ, সাত ক্রোশ দূরে বর্ত্তমান। সমস্ত বৃন্দাবনের পরিধি ৮৪ ক্রোশ। জন্মাষ্টমীর সময় ইহা পরিক্রমণ করা হয়। তখন অসংখ্য লোকজন থাকে, রাজা মহারাজাদের সিপাই সন্ত্রী থাকে, তাই ততটা ভয়ের কারণ থাকে না। তথাপিও প্রতি বৎসরই অনেক স্ত্রীপুরুষ নিরুদ্দেশ হইয়া যায়।" পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত ভোজেশ্বর-নিবাসী, সুদীর্ঘ-কাল যাবৎ লক্ষ্ণৌপ্রবাসী এবং বৃন্দাবনে যাজনকার্য্য-নিরত বর্ষীয়ান শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে মথুরার পথে গাড়ীতে আলাপ হয়; শুনিলাম, দোল-

যাত্রার সময় বর্ষাণ গ্রামে (রাধিকার পিতা বৃষভানুরাজার গ্রামে) যুবতীবৃন্দ যুবকদের উপরে বড়ই অত্যাচার করে। বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এমন দুই একটী কথা বলিলেন, যাহা শুনিতেও লজ্জাবোধ হয়। নন্দগ্রামে ঠিক বিপরীত—যুবকবৃন্দ যুবতীদের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করে। ধর্ম্মের বিকৃতি কোথায় যাইয়া ঠেকিয়াছে !

মথুরা হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত দূরত্বটীকে ব্যাস ধরিয়া লইলে অর্দ্ধবৃত্তাকারে নিম্নলিখিত তীর্থ-স্থানগুলি বৃন্দাবনের অঙ্গীভূত। যথা—মথুরা, মধুবন, তালবন, কপিলবন,শান্তনুকুণ্ড, লাঠাবন (গোচারণ ভূমি) কামবন, বর্ষান, নন্দগ্রাম, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ক্ষীরসাগর, কোঠবন, নন্দঘাট, চীরঘাট, খেলানবন, ভূখানবন, নিবারণ বন, দাউজী (বলরাম), মহাবন, বৃন্দাবন। একমাত্র গোকুল মথুরা হইতে অন্যদিকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে সুবিস্তৃত মাঠ পড়িয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্রও নয়ন-গোচর হইতে লাগিল। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ময়ুর ময়ুরী আনন্দে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে, আর থাকিয়া থাকিয়া শ্রুতিকঠোর কেকারবে সেই নির্জ্জন প্রদেশকে মুখরিত করিতেছে। ময়ুর ময়ুরীর নৃত্য ফতেপুরশিক্রিতেও দেখিয়াছিলাম। কিন্তু মৃগযুথের এমন স্বচ্ছন্দ বিচরণ আর কুত্রাপি দেখি নাই। বহু সংখ্যক ছোট ছোট হরিণ-শিশু হরিণীগণের পেছনে আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছে; এই একস্থলে, পলক মধ্যে অন্যত্র ঘুরিতেছে; কি সুন্দর চাহনী, কি সুন্দর নৃত্য—দেখিতে দেখিতে মুনি ঋষিদের তপোবনের কথা স্মরণ-পথে উদিত হইতে লাগিল। খোলা মাঠে হরিণ হরিণীবৃন্দের এবম্বিধ নির্ভয়-বিচরণ স্বচক্ষে দর্শন না করিলে, সেই মনোরম সুখপ্রদ দৃশ্যের আনন্দ উপভোগ করা যায় না। মথুরা হইতে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড ষোল মাইল বা আট ক্রোশ। আমরা প্রায় ১২ টায় সেখানে পৌঁছিলাম। সমস্ত পথে লোকালয় প্রায় দেখিতে পাইলাম না। দুই ক্রোশ পথ থাকিতেই অনেকগুলি সুদীর্ঘ-যষ্টিহস্ত পাণ্ডা আসিয়া আমাদের গাড়ী চড়াও করিতে লাগিল, আর অবিশ্রান্ত প্রশ্ন করিতে লাগিল। গাড়ী যতই গন্তব্য-পথের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, নূতন নূতন পাণ্ডার দল ততই আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া চলিতে লাগিল। গোবর্দ্ধন পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রমে আমরা শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডের সন্নিহিত হইলাম। গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। পাণ্ডার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আমরা নিঃশব্দে পথ ধরিয়া চলিলাম। তখন পাণ্ডাদের ভৈরবনাদ অতিক্রম করিয়া উদর মধ্যে আর একজন কে ভয়ঙ্কর রবে আর্ত্তনাদ করিতেছিল; সুতরাং পাণ্ডাদের সুমিষ্ট বাক্য আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছিল না। এ সময় একটা বেশ মজা হইল। আমাদিগকে লইয়া পাণ্ডাদের ভিতর খুবই ঝগড়া বাঁধিয়া গেল। আমার সঙ্গীদ্বয় মাঝে মাঝে কথার উত্তর দিয়া পাণ্ডাদের সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি বধিরবৎ পথ চলিতে লাগিলাম। একটা বাচ্চা ছেলে, 'বাবু ইংরাজি প'ড়ে লাট সাহেব হয়েছেন' ইত্যাদি বাক্যে আমায় আপ্যায়িত করিতে লাগিল; আমি সর্ব্বত্রই উপেক্ষার তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রমে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের নিকটে উপস্থিত হইলাম। সমস্ত পথে একটা গান আমায়

তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল—আমি সেই গানটী ও তদনুকরণে রচিত আর একটী গান এস্থলে উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। প্রথম গানটী এই—ইহা অনেকেরই সুপরিচিত—রাধাবিরহ-বিধুর কৃষ্ণ গাহিতেছেন— (বিচিত্র-বিলাস)

যদি উপেক্ষিল রাই, নাহি দিলে ঠাঁই,
কোথা যাই তা-ই ভাবি গো অন্তরে।
যদি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে, সখীরে,
আমি পরাণ ত্যজিব, রাধাকুণ্ড নীরে ॥
(রাধা রাধা বলে পরাণ ত্যজিব রাধা-কুণ্ড-নীরে ॥)
যে রাধার লাগি, হলেম বনবাসী,
ধড়া, চূড়া, বাঁশী বড়ই ভালবাসি,
সে রাধা বিহনে, বাঁচিব কেমনে, (পরাণে)
আমি পরাণ ত্যজিব, রাধাকুণ্ড-নীরে ॥

যাহারা এই গানটী জানেন, তাহারাই কেবল ইহার মধ্যে কি কারুণ্য নিহিত, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সুরের অনুকরণ করিয়া আমি গাহিতে লাগিলাম—

যদি আনিলে এ দূরে, এত দয়া করে,
ক্ষণেকের তরে, দেখা দে পরাণে ॥
একবার হৃদয়-মন্দিরে, হেরিগো মা তোরে, (প্রাণ ভরে)
আমি মজে রব তোর অভয় চরণে ॥
শৈশবে মা-ধনে হয়ে গো বঞ্চিত,
কত শত মতে হয়েছি লাঞ্ছিত,
হে চির-বাঞ্ছিত, (আর) করোনা বঞ্চিত,
(আমি বড় লাঞ্ছিত,
আমার যা আছে সঞ্চিত,(কবে) দিব ও চরণে ॥
বিষয়-বাসনা বিষম জঞ্জাল,
বহিব এমনি আর কত কাল,
বয়ে যায় কাল ধেয়ে এল কাল,(সে মহাকাল)
কৈ কালাতীত (তুমি) এলে হে পরাণে ॥

রাধাকুণ্ডের তীরে একটী চিকিৎসালয় স্থাপিত। নবদ্বীপের কোনও বৈষ্ণব ইহা স্থাপন করিয়া অসংখ্য লোকের উপকার সাধন করিয়াছেন। রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দুইটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা—প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী উভয়কে পৃথক করিতেছে। উভয়ের জলই নীলবর্ণ। আমার সঙ্গীগণ প্রথমে অধিক খরচের ভয়ে স্নান করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। পরে আমায় ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"প্রতিজনে দুই পয়সা করিয়া স্থির হইয়াছে—স্নান করিবেন না?" আমি ঐরূপ বিবর্ণ জলে স্নান করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। সুতরাং তাঁহারা স্নান করিয়া লইলেন। এখানে এক পাণ্ডার সঙ্গে আমার বেশ একটুকু ঝগড়া হইয়া যায়। পাণ্ডা আর উপায়ান্তর না পাইয়া শেষে বলিয়া ফেলিল "কৃষ্ণ ননী-চুরি করিত, আরও কত কি করিত, আমরা তার তুলনায় এমন কি বা বেশী অন্যায় করিতেছি।" আমরা কিছু বলিব না—পাঠকবৃন্দ কথাগুলি অনুধাবন করিবেন! ফিরিবার পথে সঙ্গীগণের পাণ্ডার বাড়ীর ফটকে কৃষ্ণবর্ণ একপ্রকার রুটীর টুকরা দিয়া মাধুকরী করা হইল। আমি স্থির করিলাম, এই দুই প্রহরের সময় যখন এখানে একটুকু রুটি ও জল পাইয়াছি, তখন ইহাকে কিছু দেওয়া উচিত। কত দিব ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। সঙ্গীগণ আমার ভাবনার পরিসমাপ্তি করিলেন। তাহারা তিন জনে স্নানদান সর্ব্বশুদ্ধ ৯টী পয়সা দিলেন। সুতরাং আমি আর ২টী পয়সার অধিক দিতে পারিলাম না। এই নয় দশটী

পয়সার জন্য এতক্ষণ ইহারা এত লাঠালাঠি ও ঝগড়া করিতেছিল—ভাবিয়া স্তম্ভিত হইলাম। একটা ছেলে একটা আধলার জন্য প্রায় একমাইল পথ আমার পেছনে পেছনে আসিল। শুনিলাম, ঐ দেশে বিশেষ কোনও শস্য নাকি জন্মায় না। লোকগুলি অত্যন্ত গরীব। একটী পয়সাকে যেন একটা টাকার মত মনে করে। আজকাল আয়ও কমিয়া গিয়াছে। যাত্রী সংখ্যাও যেমন হ্রাস হইয়াছে, যাত্রী-প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ততোঽধিক হ্রাস পাইয়াছে। বেচারীদের অবস্থার কথা ভাবিলে দুঃখ হয়।

এবারে আমরা গোবর্দ্ধন-গিরির নিকট উপস্থিত হইলাম। ইহা ছোট খাট একটী পাহাড়—দেখিলে বেশ একটুকু আনন্দ অনুভব হয়। এই গোবর্দ্ধন-গিরি দেখিবার জন্যই এবার বিশেষ ভাবে আমার বৃন্দাবন-যাত্রা। ভক্তবৃন্দ আমার অপরাধ লইবেন না, একটী কথা বলি—হরিদ্বার যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে "সৎগুরু প্রসঙ্গ" নামক একখানা পুস্তক পড়িয়াছিলাম। ইহা ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের একজন বিশিষ্ট শিষ্য কুলদা ব্রহ্মচারী মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। তিনি পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন—গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক-শিষ্য শ্রীধরের পুটুলীতে গোবর্দ্ধনের কয়েক খণ্ড শিলা বিদ্যমান ছিল। তাহা হইতে বালগোপাল যখন তখন বাহির হইয়া নৃত্য করিত। তিনি গোস্বামী মহাশয়ের মুখ হইতে এই কথাগুলি বাহির করিয়াছেন। সুতরাং একবার গোবর্দ্ধন দর্শন করিয়া তাহার কয়েকখণ্ড শিলা আনিয়া ঘরে রাখিতেই হইবে, এই আমার সঙ্কল্প হইল। আজ কয়মাস যাবত গোবর্দ্ধনের শিলা আমার আলমারীতে রক্ষিত। হায় কৈ একদিনও ত বালগোপালের দর্শন লাভ হইল না। কি জানি, আমাদের কেমন ভাগ্য! সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া বেলা ৪টার সময় মথুরায় ফিরিলাম। সঙ্গীগণ বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন; আমি চৌবেঠাকুরের বাসার দিকে চলিলাম। পথে সেই বৃন্দাবনের পাণ্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে যে কখন আমায় দেখিয়াছে, এরূপ ভাবও প্রকাশ করিল না। এরাই আবার তীর্থগুরু! কিন্তু চৌবেঠাকুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, যদিও তিনি গৃহে ছিলেন না, তবু তাঁহার স্ত্রী এবং কন্যা যথেষ্ট সমাদর করিলেন, ঝির দ্বারা আমার খাবার আনাইয়া দিলেন, আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া খাবার খাইলাম ও তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ষ্টেসনের দিকে চলিলাম। ইহারা এবারে একটী পয়সাও চাহিল না। বলা বাহুল্য, চৌবে পরিবারের ব্যবহারে আমি খুবই প্রীত হইয়াছিলাম। এখন বৃন্দাবন সম্বন্ধে আর ২।১টী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

বৈষ্ণবমতে বৃন্দাবন ভগবানের নিত্যলীলা-নিকেতন। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" এই বাক্যই তাহার প্রমাণ। বৃন্দাবনের প্রাচীন ইতিহাস আমার সুপরিজ্ঞাত নহে। তবে দুই একজন ভক্ত যাত্রীর মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, এস্থলে তাহাই বিবৃত করিলাম,—

"বর্ত্তমান বৃন্দাবন পূর্ব্বে সর্ব্বজন-বিদিত ছিল না। ভক্তাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু মহাভাবের প্রাবল্যে পুরাণ-কথিত ভগবান অধ্যুষিত বৃন্দাবন দর্শনেচ্ছুক হইয়া প্রেমিক নিত্যানন্দের সমভিব্যাহারে যাত্রা করেন। বৃন্দাবনের অনতিদূরে তিনি শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়েন। বৃন্দাবনের দুরত্ব অসহ্য

বোধ হওয়ায় অধৈর্য্য হইয়া প্রেমে বিগলিত গৌরচন্দ্র সকরুণ স্বরে গাইতে লাগিলেন—

"নিতাই, বল্‌রে, আর কতদূরে বৃন্দাবন ?
শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন ॥"

আমার শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড গমনের সহযাত্রী গানটী গাইয়া আমায় শুনাইলেন - কি করুণ সুর! শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর সেই ব্যাকুলতা ও কাতরতার অবস্থা স্মরণ-পথ অতিক্রম করিয়া যেন নয়নপথে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। কি কাতরতা! কি ব্যাকুলতা! স্মরণ করিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, তাই ত তিনি ভক্তরাজ,—মহাপ্রভু।

বর্ত্তমান বৃন্দাবন মহাপ্রভুরই আবিষ্কৃত। যেখানে তাঁহার যেই ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি স্বরূপ সেখানে সেইরূপ বিগ্রহাদি স্থাপিত হইয়াছে। ইত্যাদি।" এই কিম্বদন্তির মূলে কতকটুকু সত্য নিহিত আছে, তাহা ভগবান জানেন।

বর্ত্তমান বৃন্দাবন ভগবানের নিত্যলীলাভূমি কি না, তার বিচার সাধু-মহাত্মাগণ করিবেন। কিন্তু সর্ব্বজনাতঙ্কপ্রদ ষড়রিপু যে সেখানে সশরীরে বিরাজ করিতেছে, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। ভগবৎ-লীলাদর্শন ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর নির্ভর করে, কিন্তু এই ষড়রিপুর প্রকট-লীলাদর্শন যত্ন-সাপেক্ষ নহে। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। (১) কুঞ্জবাসিনী. (২) ব্রজবাসীন্ (৩) মর্কট, (৪) মক্ষিকা, (৫) কচ্ছপ ও (৬) মশক। ইহাদের অত্যাচারে বৃন্দাবন টলটলায়মান। বরং ঋতু বিশেষে শেষোক্ত চতুষ্টয়ের কাহারো কাহারো প্রকোপের উপশম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু কুঞ্জবাসিনী ও ব্রজবাসীন্ কালের মুখে—কূলের মুখেও নয় কি ?—কালী দিয়া কালাতীত হইয়াছেন—সুতরাং তাহাদের প্রকোপের কখনও হ্রাস হয় না। ব্রজবাসী মাত্রেই অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি হইলেও, সকলেই যে দুশ্চরিত্র বা ক্রোধ-পরায়ণ, তা নয়। কিন্তু, মানিনী কুঞ্জবাসিনীগণ ব্যভিচারের স্রোতে গা ঢালিয়া যেরূপ প্রবলবেগে ভাসিয়া চলিয়াছেন, এবং স্ব স্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাই, ললিতা-বিশখা ইত্যাদি নামের উপর ধর্ম্মের নামে যেরূপ অধর্ম্মের গরল উদ্গীরণ করতঃ অবমাননার আরোপ করিতেছেন, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া ধর্ম্মার্থীগণের প্রাণ কি একবারও কাঁদিয়া উঠিবে না! কুঞ্জবাসিনীগণ অধিকাংশই বাঙ্গালী, সুতরাং বাঙ্গালীগণ কি বাঙ্গালীর এই কলঙ্ক-মোচনে বদ্ধপরিকর হইবেন না? কুলকলঙ্কিনীদিগকে ধর্ম্মের অবমাননা করিতে এরূপ প্রশ্রয় দেওয়া হইবে কেন? চিন্তাশীল মহাত্মাগণ কি ইহার কোনও প্রতীকার করিতে পারেন না?

বৃন্দাবনের কথা যাহা বলিবার ছিল, শেষ হইল। কিন্তু, হায়, এখন মনে হয়, বৃন্দাবন না গেলেই হইত ভাল। আমার চিরপোষিত মধুর স্বপ্নটী ভাঙ্গিয়া গেল! ক্ষীণশক্তি আমার লেখার ত্রুটীতে অজ্ঞাতসারে যদি কোনও ভক্তের প্রাণে ব্যথা দিয়া থাকি, সে জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু, আমি ভক্ত না হইলেও, হৃদয়ে যে দারুণ ব্যথা লইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার ব্যথা কোন কোন পাঠকের অন্তরে সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নয়। পূর্ব্বোল্লিখিত সহযাত্রীগণের মধ্যে যিনি বর্ষীয়ান, খুব সম্ভব বৈষ্ণব,—তিনি দুঃখ

করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—'হায়, যেটুকু বা ভক্তি ছিল, তাহাও সব দেখিয়া শুনিয়া নষ্ট হইয়া গেল।" যাহারা অতিরিক্ত ভক্তিপ্রবণ, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু, আমাদের ন্যায় যাহাদের পুঁজিপাটা বড়ই কম, তাহাদের অবস্থা অন্যরূপ বলিয়া ত মনে হইল না। বৃন্দাবনে ধর্ম্মপ্রাণ সাধু-মহাত্মারও অভাব নাই। তাঁহারা কি বৃন্দাবনের এই অভাবগুলির প্রতীকার করিতে যত্নশীল হইবেন না? তাঁহাদের চরণে এই কাতর প্রার্থনা জানাইয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

* * *

ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বাগআঁচাড়ায় প্রচার।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ১২৭০ সালের ১০ই পৌষ তারিখে শিবাদহা হইতে বাষ্পীয় রথে আরোহণ করিয়া, হামিদপুর ষ্টেসনে নামিয়া, তথা হইতে গোশকটে চাপিয়া বেলা ২টার সময় গোপালনগর পৌঁছিলেন। সেখানে সে দিবস অতিবাহিত করিয়া, পরদিন প্রাতে শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ হালদার ও শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ হালদার, হলধর সমাদ্দার ও রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে বাগআঁচাড়ায় দুইটার সময় পৌঁছিলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন, তত্রত্য লোকদিগের অবস্থা বড় শোচনীয়, বিদ্যাহীনতা তাহার প্রধান কারণ। এই অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বাগ্রে সেখানে একটী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে সেখানে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন, ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায় মহাশয় আসিয়া মাষ্টার-পদে বরিত হইলেন। তিনি নব উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন, অল্পদিনের মধ্যে স্কুল-ঘর ছাত্রে পূর্ণ হইয়া গেল। মাগুরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিকুমার ঘোষ মহাশয় আসিয়া উক্ত স্কুলে যোগদান করাতে উক্ত মহাশয়দিগের উৎসাহ ও উদ্যম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ঘোষ মহাশয়ের যত্নে স্কুলের সাতখানা বেঞ্চ হইল। স্কুলের কার্য্য সুন্দর চলিতে লাগিল।

ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয় বাগ-আঁচাড়া গ্রামে গমন করিলে, কয়েক দিবস পরে, কলিকাতার হাটখোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় এবং তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় কলিকাতা হইতে বাগ-আঁচাড়ার আগমন করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে যোগদান করেন। তৎপরে তাঁহাদের এবং বাগ-আঁচাড়ার কয়েকজন উৎসাহী লোকের যত্ন ও চেষ্টায়, সন ১২৭০ সালের পৌষ মাসে বাগ-আঁচাড়া গ্রামে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপর উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইল।

বাগ-আঁচাড়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার কার্য্যভার গোস্বামী মহাশয় নিজেই লইয়াছিলেন। তখন প্রতি শনিবারে বাগ-আঁচাড়া গ্রামে ব্রহ্মোপাসনা হইত। এবং

রবিবারে সঙ্গত সভা হইত, আর মঙ্গলবার বাগুড়ি গ্রামে সকলকে লইয়া তিনি পারিবারিক উপাসনা করিতেন। বুধবারে ফুলবাড়িয়া গ্রামে এবং শুক্রবারে শঙ্করপুর গ্রামে উক্ত প্রণালীতে তিনি পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। আর শনিবারে উক্ত চারিগ্রামের লোকদিগকে লইয়া বাগ-আঁচাড়া গ্রামে অতিভক্তি-যোগে ভাবের সহিত উপাসনা করিতেন।

ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয় যে সময়ে বাগ-আঁচাড়ায় সপরিবারে বাস করিতেছিলেন, সে সময়ের কার্য্যবিবরণ, পরিশ্রম ও উদ্যমের কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া দৈনিক উপাসনা ও ঈশ্বর-চিন্তা ও ধ্যানে অন্ততঃ এক ঘণ্টা নির্জ্জনে যাপন করিয়া, পরে রোগীদিগকে দেখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রদান করিতেন। যে সকল রোগী তাঁহার নিকট আসিতে অক্ষম হইত, নিজে তাহাদের বাড়ীতে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া তাহাদিগকে দেখিতেন ও ব্যবস্থা করিতেন। প্রতি দিন প্রায় ৩০ কি ৩৫ জন রোগীকে দেখিতে হইত। কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কিছুমাত্র গ্রহণ করিতেন না। চিকিৎসা-কার্য্যে তাঁহার এরূপ দক্ষতা ও পারদর্শিতা ছিল যে, প্রায় অধিকাংশ রোগী আরোগ্যলাভ করিত।

এক দিবস ফুলবাড়িয়া গ্রামের একজন কারিকরের ছেলে তালগাছ হইতে পড়িয়া যায়। তাহাতে তাহার হাত ভাঙ্গিয়া যায়। কয়েকজন লোক ধরাধরি করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট তাহাকে আনে। তিনি তাহার হাতে ব্যাণ্ডিজ বাঁধিয়া দেন এবং তাহাকে চিকিৎসা করিয়া এক পক্ষ কালের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া তোলেন। এরূপ কত রোগী যে তাঁহার চিকিৎসা-গুণে সুস্থ হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন।

প্রতি দিবস গোস্বামী মহাশয় পোরিবদিগকে দেখিয়া ১০ টার সময় বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া স্নান ও আহারাদি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার স্থাপিত স্কুলের তত্ত্বাবধান করিতে গমন করিতেন এবং ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলের তত্ত্বাবধান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন।

তৎপরে কিঞ্চিৎ জল যোগ করিয়া, তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে পড়াইতেন। তাহার পরে, পূর্ব্বে বলিয়াছি চারি গ্রামে তিনি যে চারিটী উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই চারিটীর মধ্যে যে দিবস যেটীর পালা, সেই গ্রামে গিয়া ব্রহ্মোপাসনা সম্পন্ন করিতেন। ইহা করিয়াও দিবসের সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হইত না। তৎপরে বাগ-আঁচাড়া গ্রামের বাজারে তাঁহার স্থাপিত যে নৈশবিদ্যালয় ছিল, সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে তিনি স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও বিশ্রামকাল উপস্থিত হইত না। রজনী-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পড়াইয়া বাড়ীতে আগমন করিয়া বন্ধুগণের সহিত মিলিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তৎপরে আহার অন্তে নিদ্রা যাইতেন। ইহা ত গেল তাহার দৈনিক কার্য্য। ইহা ভিন্ন তিনি স্ত্রী-শিক্ষা ও সঙ্গত সভার কার্য্যও করিতেন।

প্রচার।

ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয় একস্থানে বসিয়া প্রচার করিতেন না। তিনি যশোহর, খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা প্রভৃতি বহুদূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন।

প্রচারার্থে শারীরিক শ্রমকে তিনি শ্রম বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। সময় সময় মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের ন্যায় দলবল লইয়া প্রচারে বহির্গত হইতেন। এক্ষণে দূরদেশে গমনাগমন যেমন সহজসাধ্য হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না। প্রচার করিতে যাইয়া তিনি জীবনে বহু কষ্টসহ্য করিয়াছেন। এমন কি, অনেক দিন অনাহার অনিদ্রায় দিন যাপন করিতে হইয়াছে।

লোকে বলে, জীবন না দিলে, জীবন পাওয়া যায় না. তিনি জীবনে তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। একনিষ্ঠতা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এক দিবস গোস্বামী মহাশয় বাগ-আঁচাড়া হইতে বহির্গত হইয়া যশোহর জেলার শ্রীযুক্ত বড় উমেশচন্দ্র বাবুর বাসাতে উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন বাগ-আঁচাড়া হইতে যশোহর যাত্রা করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা ছিল তথায় মাত্র এক দিবস যাপন করিয়া অন্যত্র গমন করিবেন। কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটিল না। যশোহরের উকীল বাবুরা তাঁহাকে পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন। সেখানে সকলে তাঁহার সঙ্গে এক যোগে বিশেষ ভাবে কীর্ত্তন ও উপাসনা আদিতে মহাহর্ষে মত্ত হইয়া তিন দিবস সুখে যাপন করিলেন। এক দিবস সেখানে স্থিতি করিবেন মনে করিয়া গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিন দিবসের পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। এরূপ তিনি যখন যে স্থানে গমন করিতেন, সেই স্থলের ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে পাইয়া আর শীঘ্র ছাড়িতে চাহিতেন না।

গোস্বামী মহাশয়ের
সত্যনিষ্ঠা।

যশোহর হইতে গোস্বামী মহাশয় বরিশাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন; মধ্যাহ্নকালে চেঙ্গুটিয়া গ্রামে কানাইলাল মল্লিক মহাশয়ের বাসাতে স্নানাহার আদি সম্পন্ন করিয়া খুলনাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি প্রায়ই পদব্রজে গমন করিতেন। নৌকা গাড়ী কোন খানে আরোহণ করেন নাই। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে হাটে কি আর কোন স্থানে এক চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন, এই মানসে ফুলতলার একচটিতে এক মুদির দোকানে উপস্থিত হইলেন। মুদি শান্তিপুরের গোঁসাইকে পাইয়া মহা আনন্দিত হইল। সে ভাবিল, আমার আজ বড় সৌভাগ্য; শান্তিপুরের গোস্বামীর প্রসাদ পাইব। শান্তিপুরের গোঁসাই তাহার গৃহে আহার করিবেন, ইহা অপেক্ষা তাহার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?

মুদি তাঁহাকে বসিতে বিছানা দিয়া মনের সুখে তাঁহার আহারের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মুদি অতি মনোযোগ পূর্ব্বক ঘৃত, দুগ্ধ ও মুগের ডাইল আদি আহারের দ্রব্য সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত হইল। মুদির মনের ভাব জানিতে পারিয়া সত্যনিষ্ঠ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "আমার জাত নাই; আমি সকল জাতের অন্ন খাইয়া থাকি।" তখন সেই মুদি অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাহাকে নিজ ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। তাঁহাকে সেই রাত্রি একটী বটবৃক্ষ তলে যাপন করিতে হইয়াছিল। তিনি যদি কোন কথা না বলিয়া, যে ভাবে ছিলেন,সেই অবস্থায় থাকিতেন, তাহা হইলে পরম সুখে থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে সত্য গোপন করা হয়,মনে করিয়া,স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের পরিচয় দিয়া অনাহারে বটবৃক্ষের তলে বাস করিয়া সমস্ত রজনী অতি-

বাহিত করিলেন, তথাচ সত্য গোপন করিলেন না। উক্ত মৃদ জাতি সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কোন প্রশ্ন করে নাই। তিনি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিচয় না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দোষ হইত না; কিন্তু তাহাতে সত্য গোপন করা হইবে, মনে করিয়া, তিনি নিজেই পরিচয় দিয়া শেষে বৃক্ষতলে অনাহারে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তথাচ সত্যের অনাদর করেন নাই। ক্রমশঃ। শ্রীসীতানাথ মল্লিক।

জন্মান্তরীণ-স্মৃতি।

জন্মান্তরবাদের সহিত জন্মান্তরীণ স্মৃতিবাদ ঘনিষ্ঠসূত্রে সম্বদ্ধ। কারণ জন্মান্তরবাদ অঙ্গীকার করিলে তৎসঙ্গে সঙ্গে জন্মান্তরীণ-স্মৃতির প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়। মৃত্যুর পর আমাদের পুনর্জ্জন্ম হয়, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে আমাদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি যে পরজন্মে বর্ত্তমান থাকিবে, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই মনে করিতে হইবে। যেহেতু ইহজন্মে আমাদের জীবনের আদ্যন্তে যেমন স্মৃতির একই শৃঙ্খল অব্যাহত দেখা যায়, পরজন্মেও সেই সংযোগ-শৃঙ্খল অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকাই প্রকৃত নিয়মানুযায়ী হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেই নিয়মের ব্যতিক্রমই ঘটিয়া থাকে এই প্রকারে জন্মান্তর-স্মৃতির অপ্রমাণেও জন্মান্তরবাদও অপ্রমাণ হইয়া পড়ার কথা হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জন্মান্তরবাদের বলবত্তর প্রমাণরূপেই জন্মান্তরীণ-স্মৃতি সম্বন্ধে আলোচনা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব যে, সাধারণ অবস্থায় আমাদের পক্ষে জন্মান্তরীণ-স্মৃতি বর্ত্তমান থাকা সম্ভাবিত নয়। কারণ, মৃত্যুর ন্যায় ঘোর পরিবর্ত্তন আর কিছুই হইতে পারে না। নিদ্রা আমাদের যেরূপ বিস্মৃতির অবস্থা, মৃত্যু তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক বিস্মৃতির অবস্থা। তাহাতেই ইহার একনাম "মহানিদ্রা" হইয়াছে। জীবিতকালে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইলে তৎকালের কোন বিষয় আমাদের স্মৃতিপথারূঢ় হয় না। ইহা হইতে মৃত্যুর সেই মহামোহগ্রস্ত হইলে যে সমস্ত স্মৃতিই বিলুপ্ত হইবে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।

প্রাগুক্ত কারণে জন্মান্তর-স্মৃতি সাধারণতঃ অসম্ভাব্য হইলেও ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে যে জন্মান্তর স্মৃতির স্ফুরণ হইত, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের বামদেব ঋষি নিজের পূর্ব্বজন্মের বিবরণ দিতে যাইয়া বলিতেছেন ঃ—

"অহং মনুরভবম্ সূর্য্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসনার্জ্জুনেয়ং ন্যৃঞ্জেহহং কবিরুশনা পশ্যতমা।১

ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল, ২৬ সূক্ত।

"আমি মনু ছিলাম, সূর্য্য ছিলাম, আমি মেধাবী কক্ষীবান্ ঋষি ছিলাম। আমি অর্জ্জুনীর পুত্র কুৎসঋষিকে অলঙ্কৃত করিয়াছি। আমি কবি উশনা, আমাকে দর্শন কর।"

বামদেবের এই জন্মান্তর-স্মৃতি এরূপই প্রত্যয়ের বিষয় হইয়াছিল যে, উপনিষদ হইতেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় উপনিষদে (২।৪) পুনর্জ্জন্মের প্রসঙ্গে বামদেব ঋষির বাক্যই প্রমাণস্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে।

জন্মান্তর-স্মৃতিতে বিশ্বাস যে ক্রমে কিরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে তাহার অতি উজ্জ্বল নিদর্শনই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। বিপুল বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে স্বয়ং বুদ্ধদেবের জন্মান্তর স্মৃতিরই উপাখ্যানমালা বিরচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ-শাস্ত্রসকলে জন্মান্তর-স্মৃতি সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত আলোচনাই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

জন্মান্তর-স্মৃতি সম্বন্ধে দৃঢ়সংস্কারই যে কেবল বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রচলিত দেখা যায় তাহা নহে, কিন্তু এই স্মৃতির উদ্বোধন জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রে রীতিমত উপদেশ ও অনুশীলনেরই সুব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।

নিম্নোদ্ধৃত স্থল হইতে আমরা বুঝিতে পারিব, স্বয়ং বুদ্ধদেব জন্মান্তর-স্মৃতি উদ্বোধিত করিবার জন্য সূত্রপিটকে কিরূপ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন :—

"If a disciple or disciples, should frame this wish : —Let me call to mind many previous states of existence, to with one birth, two births, three births, four births, five births, ten births, twenty births, thirty births, forty births, fifty births, one hundred births, one thousand births, one hundred thousand births, many destructions of a world cycle, many generations of a world cycle, so as to say : I lived in such a place, had such a name, was of such a family, of such a class, had such maintenance, experienced such happiness and such miseries ; had such a length of life. Then I passed from that existence and was reborn in such a place. There also I had such a name, was of such a family, of such a class, had such maintenance, experienced such happiness and such miseries, had such a length of life. Then I passed from that existence and was reborn in this existence—thus let me call to mind many former states of existence, and let me specifically charaterize them, then must he be perfect in the precepts, bring his thoughts to a state of quietness, practise diligently the trances, attain to insight, and be much alone." The memory of past births by Charles Johnston, M. R. A. S.

"যদি শিষ্য বা শিষ্যেরা এরূপ ইচ্ছা মনে ধারণ করেন—'আমি যেন পূর্ব্বজীবনের বহু অবস্থা যথা একজন্ম, দুইজন্ম তিনজন্ম, চারিজন্ম, পাঁচজন্ম, দশজন্ম, বিশজন্ম, ত্রিশ-জন্ম, চল্লিশজন্ম, পঞ্চাশজন্ম, একশতজন্ম, একসহস্রজন্ম, একলক্ষজন্ম, পৃথিবীর বহুযুগ প্রলয়, বহু যুগান্তর স্মরণ করিতে পারি, যাহাতে আমি বলিতে পারিব যে, আমি এরূপ স্থানে বাস করিতাম, আমার এরূপ নাম ছিল, আমি এরূপ পরিবারে ছিলাম, এরূপ জাতিতে ছিলাম, আমার এরূপ জীবিকা ছিল, আমি এরূপ সুখভোগ করিয়াছিলাম, এরূপ দুঃখ পাইয়াছিলাম, আমার এরূপ আয়ু ছিল, তৎপর আমি ঐ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া এরূপ অবস্থায় পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তথায়ও আমার এরূপ নাম ছিল, আমি এরূপ পরিবারে ছিলাম, আমার এরূপ জীবিকা ছিল, আমি এরূপ সুখসম্ভোগ করিয়াছিলাম, এরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, আমার এরূপ আয়ু ছিল, তৎপর আমি সেই অবস্থা হইতে এই অবস্থায় পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলাম। 'আমি যেন এইপ্রকারে পূর্ব্বজীবনের বহু অবস্থা স্মরণ করিতে পারি এবং তাহাদিগকে

বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি', তাহা হইলে তাহাকে শিক্ষায় পূর্ণতালাভ করিতে হইবে—তাঁহার চিন্তা সকলকে শান্তির ভাবে সমাহিত করিতে হইবে। তাঁহাকে অক্লান্তভাবে যোগাভ্যাস করিতে হইবে, অন্তর্দৃষ্টিলাভ করিতে হইবে এবং নির্জ্জনে অধিক সময় থাকিতে হইবে।"

বুদ্ধদেবের উদ্ধৃত উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, জন্মান্তর-স্মৃতি সহজলভ্য নহে, পরন্তু ইহা বিশেষ সাধনা-সাপেক্ষ। এক্ষণে আমরা এই সাধনার বিষয়ই বিবেচনা করিব। বুদ্ধ উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই যে, জন্মান্তর-স্মৃতি অর্জ্জনের জন্য নিয়ত যোগাভ্যাস একান্ত কর্ত্তব্য। যখন আমরা ভাবিয়া দেখি যে, যোগবলেই ঋষিগণ ত্রিকালদর্শী হইতে পারিয়াছিলেন—তখন সমস্ত অতীতকালের জ্ঞানের সঙ্গে তাঁহাদের অতীত পূর্ব্বতন জীবনের জ্ঞানও যে স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। যোগের ধ্যান প্রক্রিয়ায় (Jhain process) কিরূপে পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি উদ্ভাসিত হয়, তাহা বৌদ্ধমনোবিজ্ঞানের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয় ;—

"He recalls several previous sojournings, namely, one or more rebirths * * * in such a place such was my name * * * family * * term of life * * * * as if a man were to travel and in coming home, should know where he had been and what he had done." "Buddhist Psycology by Rhys Davids p. p 126-7.

"তিনি বহুতর পূর্ব্বজীবন স্মরণ করিতে থাকেন। সেই সমস্ত এই—এক বা ততোঽধিক পুনর্জ্জন্ম, এরূপ স্থলে আমার এরূপ নাম ছিল, পরিবার ছিল—আয়ু ছিল, যেরূপ কোন লোক ভ্রমণ করিতে গেলে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পায় (স্মরণ করিতে পারে) সে কোথায় ছিল ও তথায় কি করিয়াছিল।"

এই প্রকারে বৌদ্ধ দর্শনে জন্মান্তর-স্মৃতির বিশেষ আলোচনা থাকিলেও ইহার প্রকৃত বিজ্ঞান বা তত্ত্ব আমরা উপনিষদেই সূচিত দেখিতে পাই। ছান্দোগ্যোপনিষদের একস্থলে অভ্রান্তস্মৃতি অর্জ্জন সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়—"সত্ত্বগুণৌধ্রুবা স্মৃতিঃ।" ৭ম অধ্যায় ২৬ খণ্ড। "চিত্তশুদ্ধ হইলেই অবিচ্ছিন্না-স্মৃতি স্ফুরিত হইয়া থাকে।" সত্ত্বগুণের প্রভাবেই চিত্তশুদ্ধি সংসাধিত হয়। সুতরাং সত্ত্বগুণেই যে জন্মান্তর-স্মৃতির মূল রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

শাস্ত্রে আমরা সত্ত্বগুণকে "প্রকাশক" বলিয়াই বিশেষিত দেখিতে পাই। যথা

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥"৬
গীতা ১৪শ অধ্যায়।

"হে অপাপ! সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মলত্ব হেতু (জ্ঞানের) প্রকাশক এবং (শান্ত) সত্ত্বগুণ (দেহীকে সুখসঙ্গ দ্বারা (সুখে আসক্তি দ্বারা) এবং জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা (জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা) বদ্ধ করে।"

সত্ত্বগুণের সমুজ্জ্বল প্রভাব দ্বারা আমাদের আত্মা যখন সম্যক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখন সুনির্ম্মল দর্পণে যেমন বস্তুর যথার্থ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, তাহাতেও তেমনই আমাদের সত্তার সমস্ত অতীতরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। গীতায় এই

অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকামিমং
রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথাকৃৎস্না প্রকাশয়তি
ভারত ॥" ৩৩—১৩ অধ্যায়।

"হে ভারত, যেমন একমাত্র সূর্য্য এই সমস্ত লোককে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী অর্থাৎ পরমাত্মা সমুদায় ক্ষেত্র অর্থাৎ মহাভূতাদি প্রকাশিত করিতেছেন।"

এই প্রকারে সত্ত্বগুণের চরমোৎকর্ষ সাধন দ্বারা অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক বল-সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যেই জন্মান্তর "ধ্রুবা-স্মৃতি"র আবির্ভাব হয়। এইজন্যই গীতায় আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও এই শক্তির অনধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ আপনাকেই অধিকারী বলিয়া প্রখ্যাপিত করিতেছেন, যথা—

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি তত্ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥"৫
৪র্থ অধ্যায়।

"শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সমুদায় জানি। কিন্তু তুমি তৎ সমস্ত জান না ॥"

বামদেব ঋষির জন্মান্তর-স্মৃতির কথা যে বেদে পাওয়া যায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি মাতৃগর্ভে থাকিয়াই তদীয় অলৌকিক স্মৃতিশক্তির যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বেদে স্পষ্টাক্ষরেই লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"গর্ভেন্নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং
জনিমানি বিশ্বা।
শতং মাপুর আয়সীররক্ষন্নধ শ্যেনো
জবসা নিরদীয়ম্ ॥
ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল, ২৭ সূক্ত।

"আমি গর্ভ মধ্যে থাকিয়াই এই সকল দেবগণের জন্ম যথাক্রমে জ্ঞাত হইয়াছি। শত লৌহময় শরীর আমাকে ধারণ করিয়াছিল। অধুনা আমি শ্যেন বেগে নির্গত হইয়াছি ॥"

এস্থলে "শতলৌহময় শরীর" শতপূর্ব্ব জন্মেরই রূপক। ডাক্তার ডিউসেন্ (Deussen) তদীয় "The Philosophy fo the Upanishad" "(উপনিষদের দর্শন") নামক গ্রন্থে "শত লৌহময় শরীর" পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

" * We understand by the hawk the soul and by the iron fortreses the bodies through which it wanders." pp 317-18.

উদ্ধৃত বৈদিক ঋকের গর্ভে থাকিয়া পূর্ণ দিব্যজ্ঞান লাভের বর্ণনায় বামদেব ঋষি যে লোকোত্তর অধ্যাত্মবল-সম্পন্ন ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহরূপেই প্রমাণিত হয়।

বামদেব ঋষির মনু, সূর্য্য প্রভৃতি রূপে বর্ত্তমান থাকার বিষয় যে বেদে বর্ণিত হইয়াছে, উপনিষদ্ তৎসম্বন্ধে যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে, তাহাতেও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভরূপ চরমোৎকর্ষের প্রমাণই পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বামদেবের জন্মান্তর-স্মৃতি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছেঃ—"তথর্ষীণাং তথামনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপদেহহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি ॥" ১০—১ম অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

"ঋষিদিগের ও মনুষ্যদিগের মধ্যেও আত্মতত্ত্বজ্ঞের সর্ব্বময়ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব ঐ ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া তদাত্মত্ত-বৃত্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ নিজের নিখিলবৃত্তির তদধীনত্ববশতঃ তাঁহা হইতে অভেদজ্ঞানে বামদেব ঋষি 'আমি মনু হইয়াছিলাম,'

'আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম,' এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন" ॥

উদ্ধৃত উপনিষদ্ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, নিখিলবিশ্বই ব্রহ্মাত্মক (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ")। সুতরাং ব্রহ্মসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া বামদেব ঋষি বিশ্বের সহিত আপনার অভেদ উপলব্ধি করিয়াই এই অভেদভাবের মধ্যদিয়া মনু, সূর্য্য প্রভৃতিকে নিজের সহিত অভিন্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন।

আমরা যে সাত্ত্বিক-ভাবের উৎকর্ষকে জন্মান্তর স্মৃতি প্রকাশিত করিবার উপায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি, বৌদ্ধদর্শনে জন্মান্তর-স্মৃতি প্রবোধিত করিবার যে প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও সেই সাত্ত্বিকভাবের উত্তরোত্তর উৎকর্ষই সাধকরূপে নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে আমরা বৌদ্ধমতের প্রধান ব্যাখ্যাতা বুদ্ধঘোষের "বিশুদ্ধমার্গের" দুইটী অংশের ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"There are six classes of people who can call to mind former states of existence: devotees of other sects, ordinary disciples, great disciples, chief disciples, separate Buddhas, Buddhas."

"The power possessed by the devotees of other sects to perceive former states of existence is like the lamp of the glow-worm, that of the ordinary disciple is like the light of a small lamp. that of the great disciples is like the light of a torch, that of the chief disciples is like the light of the morning star, that of the separate Buddhas is like the light of the moon, that of the Buddhas is like the thousand rayed disk of the summer sun."

The Memory of Past biths by Charles Johnston M. R. A. S. pp 47—8.

"যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারেন—তাঁহারা ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত, অন্য সম্প্রদায়ের সাধক, সাধারণ শিষ্য, মহাশিষ্য, স্বতন্ত্র বুদ্ধ, ও বুদ্ধ।"

"অন্য সম্প্রদায়ের সাধকের জন্মান্তর অনুভবের শক্তি জোনাকী পোকার আলোর ন্যায়, প্রধান শিষ্যের স্মৃতি-শক্তি প্রভাত-নক্ষত্রের আলোর ন্যায়, স্বতন্ত্র বুদ্ধদিগের স্মৃতিশক্তি চন্দ্ররশ্মির ন্যায়; বুদ্ধদিগের স্মৃতিশক্তি গ্রীষ্মকালীন ভাস্করের সহস্র কিরণ-মালী পরিবেশের ন্যায় ॥"

"স্বতন্ত্রবুদ্ধ" আমাদের নিকট জীবন্মুক্ত যোগী ও "বুদ্ধ" মুক্তযোগীর স্থানীয় বলিয়াই বোধ হয়। গীতায় আমরা পরমাত্মাকে যে রবিরূপে বর্ণিত দেখিয়াছি (১০শ অধ্যায় ৩৩ শ্লোক) 'বুদ্ধ' স্মৃতির সহস্র কিরণমালী সূর্য্য-রশ্মির তুলনায় আমরা তাহারই সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। বুদ্ধের অপর একটী পর্য্যায় শব্দ 'বোধিসত্ত্ব।" এই নামের দ্বারা বুদ্ধকে "সত্ত্বগুণাত্মক-তত্ত্ব" বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বুদ্ধাবস্থার পূর্ণ জন্মান্তর-স্মৃতির বর্ণনায় আমরা "সত্ত্বশুদ্ধৌ" ধ্রুবাস্মৃতিঃ এই উপনিষদ্ বাক্যেরই সম্পূর্ণ সমর্থন পাইতেছি

এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বৌদ্ধ-দর্শনে জন্মান্তর-স্মৃতিবাদ বৈশদ্য প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে বেদ উপনিষদেই তাহার প্রথম সূচনা হইয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্যামের বাঁশরী।

"বাজায় বাঁশী আয় পিপাসী—
জয় রাধানাম গান করে"—

সেই বাঁশরীর মনভুলানো প্রাণ-মাতান সুরে আত্মহারা হয়ে শ্রীরাধা সংসারের সব কাজ ফেলে চিরপ্রিয় আরাধ্যের সঙ্গে মহারাসে মিলিতা হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটলেন। এই মিলনই মহারাস—প্রিয়তমের এই আহ্বানই বাঁশরীর সুর।

চতুর্দ্দশ ভুবন যাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে নিজ নিজ পথে ধাবমান এবং নিখিল বিশ্বের একমাত্র চির আকর্ষণ যিনি, তিনিই কৃষ্ণ, আর জীবের আরাধিকা শক্তিই রাধা, অথবা পরমাত্মা-নিঃসৃত সেই পূত মন্দাকিনী ধারা (রাধা=ধারা) যাহা জীব জগৎকে সেই চির শতের সত্ত্বায় জীবিত করিয়াছে তাহাই রাধা অর্থাৎ জীবাত্মা।

জীবাত্মা বা জীবের আরাধিকা শক্তি যখন আপন ভুলিয়া সংসারের কাজে নিজেকে হারাইয়া ফেলে, তখন একদিন শুভমুহূর্ত্তে সংসারের সব কোলাহল ভেদ করে পরমাত্মার অনন্ত আহ্বান-ধ্বনি তাহার মরমে প্রবিষ্ট হয়, সে তখন ব্যাকুল হয়ে তার আরাধ্য দেবতার দিকে ছুটে যায়। জীবাত্মা আর পরমাত্মার তখন মিলন হয়। তখন—

"তোমায় আমায় মিলন হলে,
সকলি যাই ভুলে
বিশ্ব-সাগর ঢেউ মেলায়ে,
উঠে তখন দুলে।—

বিশ্ব-সংসার তখন সব ভুল হয়ে যায়, এক বিপুল ঢেউ উঠে আকাশ পাতাল সমস্ত ইষ্ট জগৎকে ডুবিয়ে দেয়, সব একাকার হয়ে যায়। থাকেন শুধু এক সেই অনন্ত সৎ, এক চিন্ময় বৃন্দাবন, এক ভক্তিময়ী ঊর্দ্ধগামিনী আনন্দে ভরা উজান বহমানা যমুনা।

এই মিলনই মহারাস।

এই মহারাস ধ্যান করে যোগী সমাহিত হন। তখন তাঁর সহস্রদল বৃন্দাবনে এক অনাদি অনাহত ওঁকার ধ্বনি শুনতে পান এবং তাঁর কুণ্ডলিনী শক্তি চক্রের পর চক্র ভেদ করে উজান বেয়ে সহস্রারে উত্থিত হয়,—যোগী তখন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। তখন দ্বৈতভাব চলে যায়, বহুত্বও তিরোহিত হয়, সংসার পরিজন কিছুই থাকে না—থাকে শুধু এক অতুল আনন্দ। এই অতুল আনন্দের অবস্থায় এক অপূর্ব্ব চৈতন্যের দীপ্তি ফুটে উঠে, যার আলোকে সাধক তার প্রাণের দেবতা সেই একমাত্র সৎকে দেখে আত্মহারা হয়ে যান।

ইহাই মহারাস।

"পথিক।"

* * *

জীবন-সংগ্রাম।

ডারুইনের সময় হইতে আমরা বুঝিয়াছি, জীব ক্রমোন্নত হইয়াছে; এবং "জীবন-সংগ্রামের" দ্বারাই ক্রমোন্নত হইয়াছে। জীবন-সংগ্রাম অর্থে বহু ব্যক্তি মারামারি কাটাকাটি বুঝিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হিন্দু জাতিও আর উন্নত হয় নাই, বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের পর খ্রীষ্টান্ জাতিও আর উন্নত হইবে

না; যিনি যাহাই বলুন, মারামারি কাটাকাটি করিয়া কোন জীবকে ধ্বংস করা যায় না কোন জীব উন্নতও হয় না। এক বনেই ব্যাঘ্র এবং হরিণ বাস করিতেছে; বাজ এবং ক্ষুদ্র পক্ষিগণ এক স্থানেই উড়িয়া বেড়ায়; কাত্‌লা মাছ ও পুটি মাছ এক জলাধারেই বাস করে। সবল এপর্য্যন্ত কখনও দুর্ব্বলকে মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে নাই। বরং ব্যাঘ্র, বাজ এবং কাতলা মাছই নির্ব্বংশ হইতে চলিল নির্ব্বংশ অথবা নির্মূল হয় অন্য কারণে। এ প্রবন্ধে তাহা বিবৃত করা প্রাসঙ্গিক হইবে না। তথাপি মানুষের সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে, মানুষ সংগ্রাম করিতে গিয়া এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, আর শীঘ্র তাহার উন্নতির আশা থাকে না। পরাজিতই হউক আর জয়ীই হউক, বলিষ্ঠ, প্রতিভাশালী, উদ্যোগী, সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই যুদ্ধে যান; অধিকাংশই হত হন্; সুতরাং ঐ সকল গুণবর্জ্জিত তাহারাই জীবিত থাকিয়া বংশ বৃদ্ধি করে; তাহা হইতেই পর পর বংশ গঠিত হয়। সুতরাং পরপর বংশ অধঃপতিত হয়। তাহাদিগকে উন্নত করিতে হইলে বুদ্ধিপূর্ব্বক বংশ গঠনের সদুপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। কতকটা এইরূপ করিয়াই ফ্রান্স পুনরায় বল সঞ্চয় করিতেছে, তথাপিও ইংরাজের সাহায্য না পাইলে (বিশেষতঃ ইংরাজের নৈতিক উত্তেজনা না পাইলে) বহু পূর্ব্বেই বর্ত্তমান যুদ্ধে পরাজিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফলতঃ, সংগ্রাম দ্বারা অর্থাৎ মারামারি কাটাকাটি দ্বারা উন্নতি হয় না। এই অর্থে "জীবন-সংগ্রাম" কথাটীকে বুঝিয়া লইলে, তদ্বারা জীব ক্রমোন্নত হওয়ার সম্ভব নাই। স্বজাতি মধ্যে সংগ্রাম বাধিলে সে জাতি অধঃপতিত হয়। সংগ্রাম অর্থে মারামারি কাটাকাটি বুঝিলেও ভিন্ন জাতির সহিত সংগ্রামে, আত্ম প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম না হইলে উন্নতি লাভ করা সম্ভব হয় না।

স্বজাতি নমস্ত। স্বজাতির সহিত মারামারি কাটাকাটি তো দূরের কথা, তাহাদিগের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতাও মারাত্মক। ঐরূপ প্রতিযোগীতা এবং তাহা হইতে জাত বিদ্বেষ ও হিংসা সমাজকে জর্জ্জরিত করে। সুতরাং সমাজে প্রতিযোগিতার ভাব কমাইয়া দিতে হয়।* তাহার স্থলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি এবং মৈত্রী স্থাপিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে সমাজ-সংক্রান্ত কর্ম্মে সাহায্য করিলে, সমাজ অচিরেই উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। স্ব-সমাজে মৈত্রী ও সাহায্য; পরসমাজে প্রতিকূলতা; ইহাই বর্ত্তমান যুগের সামাজিক উন্নতির মূল মন্ত্র।

পর সমাজের প্রতিও প্রীতি আসিবে, নিশ্চয়ই আসিবে। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান

---

* They (the true statesmen) ought to look upon the community as a whole and treat class needs and group-crisis from the stand-point of the efficiency of the herd at large. Their duty is to lesson, if not to suspend, the internal struggle, that the nation may be strong externally. One point only is fundamental in that suspension of the internal struggle; and this holds of man as it holds of every gregarious animal. Karl Pearson's National Life p 56.

যুগে ও বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে। কারণ, সে ভিন্ন কথা।

স্ব-সমাজের মধ্যে প্রতিযোগিতা যথা সম্ভব হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে কেহ বা জাতি-ভেদ অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ বা গিল্ড (Guild) অথবা চেম্বার সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য একই।

যাহা হউক, যুদ্ধ বিগ্রহ অর্থে সংগ্রাম অতি মারাত্মক পদার্থ। জীবন-সংগ্রাম অর্থে ডারুইন যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা প্রধানতঃ প্রতিযোগীতা। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার উপদেশ হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি মৈত্রী এবং পরস্পরের সহায়তাকেও ক্রমোন্নতিবাদের প্রধান উপকরণ বিবেচনা করিতেন। ডারুইন সংগ্রাম শব্দ কেবল যুদ্ধবিগ্রহ অর্থে বুঝিতে বলেন নাই; তিনি ঐ শব্দকে তুলনামূলক অথবা রূপক অর্থে বুঝাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "জীবন-সংগ্রামকে বৃহত্তর এবং রূপক অর্থে বুঝিতে হইবে। এক জীব স্বীয় জীবন ব্যাপারের নিমিত্ত অন্য জীবের উপর নির্ভর করে, বংশবৃদ্ধির ও বংশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ও একজীব অপরের সাহায্যের অপেক্ষা করে; এ সকলও "জীবন-সংগ্রাম" শব্দের অন্তর্গত।" †

তবেই বুঝা যাইতেছে, জীবন-সংগ্রাম আনুগত্য এবং মিত্রতাকেও বোধ করিয়া থাকে।

উদ্ভিদ এবং জন্তু,উভয়শ্রেণীর জীব মধ্যেই আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষা, এতদুভয়ই ক্রমোন্নতির মূল ভিত্তি স্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। ইহারই উপর জৈবিক ও পারিপার্শ্বিক কারণ সকল কর্ম্ম করে। যদ্বারা এতদুভয়ের সহায়তা হয়, তদ্বারাই ক্রমোন্নতিরও সাহায্য হইয়া থাকে, এ কথা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হইবে। পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিলে আত্মরক্ষারও যেমন সুবিধা হয়, বংশরক্ষায়ও তেমনই উপকার হয়, সন্দেহ নাই। সিংহ ব্যাঘ্রাদির ন্যায় অন্যের সহিত পৃথক ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে সে জীব উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। এই নিমিত্ত দলবদ্ধ অথবা সমাজবদ্ধ হওয়া উন্নতির পথে অত্যাবশ্যক। ব্যক্তিকে সমাজের সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে সমাজের কল্যাণই তাহার কল্যাণ বিবেচিত হইবে। ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিকট ব্যক্তিত্ব অগ্রগণ্য নহে, একথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। নচেৎ সমাজের উন্নতি হয় না। ব্যক্তিত্বের অবাধ আধিপত্য সমাজ-ধ্বংসকর। পিপীলিকা, মক্ষিকা, মৎস্য, হংস, সারস ও শৃঙ্গহীন মৃগ ইত্যাদির ন্যায় অসহায় জীবও সমাজবদ্ধ অথবা দলবদ্ধ হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অভ্যস্ত হওয়ায় ধরাতলে যেরূপ বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছে, তদ্রূপ আর কে হইয়াছে? বহু পিপীলিকার দল একত্র থাকিলে পিপীলিকা-ভুক্ প্রাণীগণ তাহাদিগের কিছুই করিতে সমর্থ হয় না। ইহারা যে বৃক্ষে বাস করে, সর্পও তাহাতে উঠিতে পারে না। দলবদ্ধ হইয়া বহুসংখ্যক হংসসারস ইতস্ততঃ বিচরণ করা কালে বাজ, চিল, শকুনি প্রভৃতি ইহাদিগের ভয়ে দূরে থাকিতে বাধ্য হয়; কদাচিৎ আক্রমণ করিলেও দণ্ডিত হইয়া থাকে। শৃঙ্গহীন মৃগও দলবদ্ধ হইলে মহিষ গণ্ডার ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জীবকে পরাস্ত

---

† Origin of species chap, III, p 58.

করিতে সমর্থ হয়। এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, "তৃণও যদি বহুসংখ্যক একত্রিত হইয়া গুণত্ব প্রাপ্ত হয়, তবে মত্ত দন্তীকেও বদ্ধ করিতে পারে।" ধরাতলে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, দলবদ্ধ অথবা সমাজবদ্ধ জীবই বুদ্ধিকৌশলে ও সাহসে উন্নত হইয়া থাকে। আত্মরক্ষায়, অপত্য রক্ষায়, আহার সংগ্রহে, আবাস নির্ম্মাণে ইহারা যেরূপ পটু হইয়া উঠে, তদ্রূপ আর কেহই হইতে পারে না। মানব সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ ; নানা গুণের আধার। কারণ, মানব অসভ্য অবস্থা হইতেই ন্যূনাধিক সমাজবদ্ধ। মানব যে পরিমাণে সমাজবদ্ধ হইয়াছে, যে পরিমাণে পরস্পরে প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত পরস্পরের সহায় স্বরূপ হইয়াছে, সেই পরিমাণেই ধনে, বংশে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণরাশিতে উন্নত ও সুসভ্য হইয়া উঠিয়াছে। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে, পরস্পরের সহায়তাই প্রধান মন্ত্র। বিদ্বেষ, বিরোধ ও প্রতিযোগীতা দ্বারা এ কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

অথচ, প্রতিযোগীতা না থাকিলেও সমাজ জড়বৎ হইয়া যায়। বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় না, উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ হয় না ; সাহস ও অধ্যবসায় শ্লথ হইয়া যায়। এ নিমিত্ত উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক। বহু ব্যক্তি এক প্রকার চেষ্টা ও কর্ম্ম দ্বারা আহার, ধনবৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি, ইত্যাদি করিতে গেলেই প্রতিদ্বন্দ্বীতা, বিদ্বেষ, বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং যত অল্পসংখ্যক ব্যক্তিগণ এক প্রকার কর্ম্ম ও চেষ্টা অবলম্বন করেন, ততই সমাজের কল্যাণ। কিন্তু পর-সমাজের সহিত অথবা অন্য জীবের সহিত প্রকৃত জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, যত বহুসংখ্যক ব্যক্তি বিবিধ প্রকারে সেই সংগ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইতে সমর্থ হন, ততই মঙ্গল। অর্থাৎ ততই জয়ের আশা বৃদ্ধি হয়।

কিন্তু ডারুইন কেবল এই অর্থে যোগ্যতমের "জয়" শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি জীবন-সংগ্রাম এবং যোগ্যতমের জয়, এই দুইটী কথা দ্বারা বহু প্রকার ঘটনাকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেইজন্যই পাঠককে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, "সংগ্রাম" শব্দটী বৃহত্তর অর্থে বুঝিতে হইবে। যে সকল ঘটনা তিনি সংগ্রাম শব্দের অন্তর্গত করিয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

(১) একজাতীয় জীব অন্য জাতীয় জীবকে আহার করিলেও তিনি এই শব্দ ব্যবহার করেন ; বধ করিলেও তাহাই।

২) এক জাতীয় কিম্বা বহুজাতীয় জীব একস্থান হইতে আহার সংগ্রহ করিলে যে অধিক আহার গ্রহণ করিতে পারে, সে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা করিতে সক্ষম হয় ; কিন্তু যে অল্প আহার পায়, অথবা পায় না, সে মরিয়া যায়। একটী ক্ষুদ্র স্থানে বীজ বপন করিলে কতকগুলি চারা বড় হয়, কতকগুলি অঙ্কুরেই মরিয়া যায়। এস্থলেও তিনি সংগ্রাম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

(৩) এক জাতীয় জীব অন্য জাতীয় জীবদেহ হইতে সাক্ষাৎ স্বরূপে আহার গ্রহণ করিলে যদ্যপি শেষোক্ত জীব দুর্ব্বল হইয়া উঠে অথবা মরিয়া যায়, তাহা হইলেও তিনি সংগ্রাম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

(৪) পারিপার্শ্বিক কারণে জীবদেহের ও জীবের জীবন-যাত্রার পরিবর্ত্তন হইয়া যদ্যপি বাঁচিবার ও বংশবৃদ্ধি করিবার সুবিধা হয়,

তাহা হইলেও ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পার্ব্বত্য টিকটিকী যদি পাথুরের বর্ণ ধারণ করে, কিম্বা গোলাপ গাছের পোকা যদি গোলাপের পাতার বর্ণ গ্রহণ করে, তবে শত্রুগণ চিনিতে পারে না, তাহাতেই আত্মরক্ষা হইয়া যায়; সুতরাং বংশবৃদ্ধিও হয়। ইহাকেও তিনি সংগ্রাম বলিয়াছেন।

(৫) জলীয় পদ্মের পাতা, জল শুকাইবার পর কাদার মধ্যে জীবিত থাকিতে সক্ষম হইলে, আয়তনে ছোট, এবং পুরু হইয়া থাকে। এইরূপে সময়োপযোগী পরিবর্ত্তনের দ্বারা পদ্মের আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি হইলেও ডারুইন জীবন-সংগ্রাম বলিয়াছেন।

(৬) ঝড়ে, শীতে, রৌদ্রে, এইরূপ নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপদে দেখা যায় যে, সমজাতীয় জীবের মধ্যেও অনেকে মারা গেল; কতকগুলি কোনরূপে বাঁচিয়া রহিল। এ স্থলেও তিনি জীবন-সংগ্রাম বলিয়াছেন।

এইরূপ নানাপ্রকার ঘটনাকে তিনি এক করিয়া একটী সহজ কথার অন্তর্গত করিয়াছিলেন এবং এইরূপে দেখাইয়াছেন যে, ঐ সকল স্থলে যাহারা বাঁচিয়া বংশরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহারা অন্যান্যের অপেক্ষা কতিপয় গুণে অথবা শক্তিতে অধিকতর যোগ্য। তন্নিমিত্তই তাহারা বাঁচিয়া গেল। ইহাকে তিনি যোগ্যতমের জয় বলিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, উপরের লিখিত দৃষ্টান্ত, মধ্যে প্রথমটী ভিন্ন আর কোনটীতেই মারামারি কাটাকাটি অর্থে সংগ্রাম নাই। প্রথমটী সত্যই সংগ্রাম নামের যোগ্য; দ্বিতীয়টী, অপরের সহিত প্রতিযোগীতা; তা'ও জ্ঞানকৃত না হইতে পারে। তৃতীয়টীতে বোধ হয় তাহাও নাই। চতুর্থটী হইতে বুঝা যায় যে, যে সকল জীব পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূলভাবে স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তিত হইতে সমর্থ হইল, তাহারাই বাঁচিয়া গেল; সুতরাং জীবন-সংগ্রামজয়ী হইল। কিন্তু সংগ্রামের অর্থাৎ লড়াইর লেশমাত্রও নাই; কাহারও সহিত প্রতিযোগীতাও নাই। পঞ্চমও অন্যভাবে কতকটা ঐরূপই। ষষ্ঠকে তুলনার দ্বারা প্রকৃতির সহিত লড়াই বলা যাইতে পারে।

আরও আরও অনেকপ্রকার ঘটনাকেও সংগ্রাম পদবাচ্য করিয়া ডারুইন একটী বৃহত্তর ও তুলনামূলক ভাবের অভিব্যক্তি করিয়াছেন মাত্র। ইহার উপকারিতা চতুর্থ ও পঞ্চম দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বুঝা যায়। ঐ দুইক্ষেত্রে যে দৈহিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহাকেই ডারুইন জীববিবর্ত্তনের মূল বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করিতেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন বংশানুগত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের (variety) টিক্‌টিকী অথবা পদ্মপাতা জাত হইয়াছে। এক হইতে বহু এই প্রকারেই উৎপন্ন হইল। পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টির আবশ্যক হয় নাই।

যাহা হউক, প্রচলিত অর্থে "সংগ্রাম" জীবের উন্নতির হেতু নহে; অথবা অত্যন্ত সামান্য হেতু মাত্র। সেস্থলে অতি সামান্য হেতু বলিয়াও সংগ্রামকে বিবেচনা করা যায়, সেস্থলেও দলবদ্ধ অথবা সমাজবদ্ধ হইলেই আত্মরক্ষা ও বংশ বিস্তার করিবার সুবিধা অধিক হয়; ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

আর, জীবের জীবন ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংগ্রামের কোনই কার্য্যকারিতা নাই; প্রকৃত অর্থে ঐ শব্দ প্রযোজ্যই নহে।

শ্রীশশধর রায়।

বেদান্ত দর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১১। ইতঃপূর্ব্বে আমরা, ব্রহ্মকে জগতের মূলকারণ বলিয়া স্বীকার করিলে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, সেই আপত্তিগুলির কতিপয় সমাধান দেখাইয়াছি। কার্য্যবর্গ, উহার কারণ হইতে একান্ত ভিন্ন হইতে পারে না, এই নিয়মানুসারে, আমরা সমাধানের পক্ষটী প্রদর্শন করিয়াছিলাম। পরমার্থ-দৃষ্টিতে, এ জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রমাণ করিতে পারা যায় না। আমাদের বুদ্ধির দোষেই, এক বস্তু নানাবস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে। বুদ্ধির প্রকৃতিই এই যে, উহা এক সত্তাকে অসংখ্য দেশে ও কালে বিভক্ত করিয়া, উপস্থিত করে। অতএব প্রকৃতপক্ষে, এ জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং ব্রহ্ম বস্তুকে জগতের কারণ বলিলে, কোন প্রকার অসঙ্গতি হইতে পারে না। ইতঃপূর্ব্বে,আমরা এই সিদ্ধান্তটীই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এখন আর একটী প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইতেছে। জগৎকে যেমন ব্রহ্মবস্তু হইতে একান্ত পৃথক্ বা ভিন্ন পদার্থ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় না; তদ্রূপ আবার, জীবাত্মাকেও ত পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহা হইলে, একটী গুরুতর দোষ আসিয়া পড়ে। দোষটী এই:—

শ্রুতিতে ‘তত্ত্বমসি’ বাক্য দ্বারা, জীবত্মাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বস্তু বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার, ‘এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, পরমাত্মা —জীবরূপে জগতে প্রবেশ করিয়াছেন’—এই শ্রুতি বাক্যটীও ব্রহ্মকে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে না। সুতরাং, ব্রহ্ম হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে জীবাত্মাকেই জগতের স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। কেন না, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ত অভিন্ন বস্তুই হইতেছেন। কিন্তু জীব যদি জগতের স্রষ্টা হন, তবে কেন তিনি জন্ম-জরাব্যাধি-মরণাদি নিজেরই অসংখ্য অনিষ্ট ও অহিতকর বস্তু সৃষ্টি করিতে যাইবেন। কে কবে ইচ্ছা করিয়া, আপনার অনিষ্ট আপনিই উৎপাদন করিতে যায়? কর্ত্তা যদি স্বাধীন হন; অপরের দ্বারা চালিত হইয়া যাঁহাকে কার্য্য করিতে হয় না, এরূপ স্বাধীন কর্ত্তা, আপনার ইষ্ট ব্যতীত কদাপি অনিষ্টকর বস্তু উৎপাদিত করিতে যাইবেন কেন? নিজের স্বাধীন ইচ্ছা থাকিলে, কে কবে আপনার বন্ধনাগার আপনি নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যায়? পরমাত্মা স্বভাবতঃই অতীব-স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। তিনি কেন অত্যন্ত মলিন দেহটাকে আপনার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে যাইবেন? এমন একটা কুৎসিৎ, জরাব্যাধি দোষগ্রস্ত, অস্থায়ী দেহের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে যাইবেন? আর যদি তিনি এই জগৎটাকে উৎপাদিত করিয়াই থাকেন, তবে ত ইহাই জীবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক হইবে যে, তিনি যাহা সুখকর, তাহাই গ্রহণ করিতেন, এবং যাহা দুঃখময়, সে বস্তুগুলিকে সর্ব্বদাই পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইতেন। কিন্তু কৈ,

তাহা ত দেখিতে পাওয়া যায় না! কোন ঐন্দ্রজালিক যেমন আপন শক্তিদ্বারা প্রসারিত মায়াকে, পুনরায়, ইচ্ছানুসারে, সংহৃত করিয়া লইতে পারে;—জীবাত্মাও তদ্রূপ আপন শক্তিদ্বারা সৃষ্ট পদার্থ রাশিকে ইচ্ছামত সংহৃত করিয়া লইতেও ত পারিতেন। কিন্তু কৈ, কোন জীবেরই ত সেরূপ কোন শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না!অতএব পরমাত্মাকে জগতের স্রষ্টা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা চলে না।

এখন, এই দোষের সমাধান কি প্রকার, —এই আশঙ্কার উত্তর কিরূপ, তাহাই প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইব।

জীবাত্মা অবশ্যই পরমাত্ম-বস্তু হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু—জীব হইতে স্বতন্ত্র। সেই স্বতন্ত্র পরমাত্মাকেই আমরা জগতের স্রষ্টা বলি। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা, জীব হইতে অবশ্যই স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। সুতরাং জীবের যে সকল দোষ, তাহা পরমাত্মাতে অর্শিতে পারে না। সুতরাং বন্ধনাগার-নির্ম্মাণ, দেহের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধ :পরমাত্মার পক্ষে,—কোন ইষ্টও করণীয় নাই, কোন অনিষ্টও পরিহর্ত্তব্য বা ত্যাজ্য নাই। আমরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কল্পিত ভেদ আছে—ইহা স্বীকার করিয়া থাকি। অতএব একের ধর্ম্ম, অন্যের উপরে আরোপিত হইবে কি প্রকারে? উভয়ের মধ্যে, পরমার্থতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও, ব্যবহারিক ভেদ আছে। সুতরাং আমরা জীবকেই জগতের স্রষ্টা বলিয়া সিদ্ধান্ত করি না। জগৎ-স্রষ্টা পরমেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার শক্তি ও জ্ঞানের কখনই কোন প্রতিবন্ধক জন্মিতে পারে না। জীবাত্মার জ্ঞান ও শক্তি সেরূপ নহে। শ্রুতিতে, জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ব্যবহারিক ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে এবং ধ্যান-যোগে তাঁহার স্বরূপের অনুভূতি হইবে’— শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়। এই উপদেশের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবাত্মার মধ্যে একজন অন্তর্যামী পরম-পুরুষ অবস্থান করিতেছেন। ‘গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে বা সমাধির অবস্থায়, জীব পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, আপনার প্রকৃত স্বরূপকে লাভ করে,’ -শ্রুতির এই কথা দ্বারাও জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে। ইহা কিন্তু স্বরূপগত ভেদ নহে, কেবল ব্যবহারিক ভেদ। প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে যখন স্বরূপ-গত অভেদ ফুটিয়া উঠে ও দৃঢ়তা লাভ করে, তখন জীবের সংসারিত্ব এবং পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব—উভয়ই চলিয়া যায়। কেন না, সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানের খেলামাত্র। আমাদের বুদ্ধির দোষেই এই ভেদ-প্রতীতি! বুদ্ধির যখন মালিন্য দূর হইয়া যায়; বুদ্ধি যখন সত্ত্বপ্রধান হইয়া উঠে; তখন প্রকৃত বোধের উদয় হয়। তখন কোথায় বা জগৎ, আর কোথায় বা জগতের সৃষ্টি? পরমার্থ-দৃষ্টিতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুরই প্রতীতি থাকে না। যতদিন আমাদের এই বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়, ততদিন ইহারা দেশ কাল·কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলায় বাঁধিয়া, খণ্ড খণ্ড রূপে, বিবিধ ভেদ আনিয়া উপস্থিত করে। এক ব্রহ্মসত্তাকে অনন্ত ভেদে ভিন্ন করিয়া দেখাইতে থাকে। যখন বুদ্ধির মালিন্য চলিয়া যায়, তখন বুদ্ধি দেহাদিতে আর অভিমান

স্থাপন করে না, যখন বুদ্ধি পরিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান হইয়া উঠে,—তখন অভেদ-বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়,—এক ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন —আত্মবস্তু ব্যতীত, অন্য কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র সত্তা প্রতীত হয় না। কোন বস্তুকেই আত্মার বহির্ভূত বলিয়া আর প্রতীতি জন্মে না। কিন্তু যতদিন না এই অভেদ প্রতীতি জাগিয়া উঠিতেছে, ততদিন জীবাত্মা হইতে জগৎ স্রষ্টা পরমাত্মাকে ভিন্ন বলিয়া অনুভব করিতেই হইবে। অতএব প্রকৃত জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, জীবাত্মা হইতে পরমাত্মাকে ভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইতেই হইবে এবং এই কল্পিত ভেদ দ্বারাই, পরমাত্মা হইতে জগতের সৃষ্টি সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, চেতন পরমেশ্বরকে, অচেতন জড় জগতের স্রষ্টা বলিয়া সিদ্ধান্ত করায়, কোন দোষ আসিতে পারে না।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

সমাজ-সমস্যা।

স্ত্রী-পুরুষ।

শান্তিপ্রিয় ভারতবাসী সুষুপ্তির ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছে, ইয়োরোপে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আমরা যতই মনে করি সে সকল লোমহর্ষণ চিত্র আলোচনা করিব না, ততই তাহা আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের এমনি যোগবন্ধন স্থাপিত হইয়াছে যে, সে দেশের তরঙ্গদাম এ দেশের বেলাভূমিতে আঘাত করিবেই করিবে। ইয়োরোপের ভাব চিন্তা ও কর্ম্মস্রোত ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতেছে। শাক-হুণ-যবন-যুগে ভারত যতটা আত্মরক্ষা করিতে পারিত, এ যুগে ততটা পারে না। মুসলমান শাসনে ভারতীয় সমাজ যে পরিমাণে বিদেশীয় ভাবের গতিরোধ করিতে পারিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীতে তাহা পারিতেছে না। ইহার কারণ বিশদভাবে আলোচনা করিতে হইলে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতে হয়। একজন আলোচনা করিলেই যে প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইবে, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া, শক্তিশালী, দৃষ্টিপটু লোকেরা যদি সেই দিকে সাবধানে ভূয়োদর্শনের আলোকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে সকলের সিদ্ধান্ত সমন্বয় করিয়া সত্যনির্ণয় হইতে পারে।

ইয়োরোপের সহিত নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ভারতের কি কি লাভ লোকসান হইয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশ করিতে হইলেও নিরপেক্ষ, সুযোগ্য, দক্ষ লোকের প্রয়োজন। ইয়োরোপের শিক্ষা ও সাধনা জগতের নিকট সমাদৃত হইতেছে কিনা, সময় তাহা বিচার করিতেছে। আমাদের মুখের কথায় ইরোরোপ আদৃত বা অনাদৃত হইবে না। মানবজাতির সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তপস্যার ফল বর্ত্তমান সভ্যতা। ইয়োরোপে কেন্দ্র স্থাপনা করিয়া মানবমনীষা ও মানববৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। সেই বিকাশের ফল পাশ্চাত্য সভ্যতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞানের গর্ব্বের মূলে ভারতের ন্যায্যদাবী কিছু আছে কিনা, ঐতিহাসিকগণ তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিবেন। আমেরিকা, জাপান, চীন, তুরস্কে

পাশ্চাত্য সভ্যতার মাল রপ্তানি হইয়াছে; ভারতবর্ষেও শিক্ষা ও শাসনের ভিতর দিয়া, বাণিজ্য ও ঈসাই ধর্ম্মের ভিতর দিয়া, নাচ-গান ও রং তামাসার ভিতর দিয়া, ইংরাজী ভাষা ও বিলাতী বিজ্ঞাপনের ভিতর দিয়া, পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তা ও আদর্শের ঢেউ আমাদের সাধের পল্লী ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। আমাদের বালীর বাঁধ ও বাঁশের বেড়া সে তরঙ্গের আঘাতে কোথায় উড়িয়া যাইতেছে, আমরা তাহার সন্ধান পাইতেছি না। যাঁহারা এযাবৎ কোমর বাঁধিয়া সেই শক্তি-প্রবাহের বিরুদ্ধে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহারাও একে একে তাহার মোহনরূপের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া কথায় প্রতিবাদ করিতে করিতে কাজে ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছেন। অতএব পাশ্চাত্য ভাবে অভিভূত হওয়া আমাদের সকলের পক্ষেই একরূপ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে—আমরা তাহা স্বীকার করি, আর নাই করি। সেই সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়া জাপান ও আমেরিকার ন্যায় আমরা যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে পারি, ইয়োরোপ হইতে মানব সভ্যতা-বিকাশের কেন্দ্র যদি আমরা ভারতে আনিয়া স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে হয়ত আমাদের চিন্তার ধারা ও আলোকরেখা জগতের নিকট পুনরায় আদরনীয় ও অনুকরণীয় হইতে পারে।

বন্যার জলে কেবল সুবর্ণকমলই ভাসিয়া আসে না, সৈবাল এবং আবর্জ্জনাও আসে। পাশ্চাত্য সভ্যতার দান আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা সবই যে সুন্দর, সবই যে অমূল্য, তাহা নহে। ভারতের ভাণ্ডারে যাহা মজুত ছিল, তাহা সবই যে ভাল অথবা সবই হে মন্দ, এমনও নহে। অতএব ইয়োরোপের নিকট হইতে আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা অবিচারে গলাধঃকরণ করিলে আমাদের বিরাট দেহে বিষম ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। ইয়োরোপীয় সভ্যতার নূতন মালের বাহার দেখিলে চক্ষু ঝলসাইয়া যাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যাচাই করিয়া সওদা না করিলে পরিণামে ঠকিতে হয়। একবার প্রতারিত হইলেই আদান-প্রদান বন্ধ করিতে হইবে না। মানব-মস্তিষ্ক মন্থন করিয়া বিলাতী-সাগরে সুধাও উঠিতেছে, হলাহলও উঠিতেছে। সুধাপান করিয়া আমরা চরিতার্থ হইতে পারি, হলাহল যেন আমরা স্পর্শ না করি—উহা শিবের কণ্ঠের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। বিলাতী সমাজের ও বিলাতী প্রকৃতির পক্ষে যাহা ঔষধি, আমাদের প্রকৃতি ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিলে তাহা হয়ত বিষ। অতএব আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—What is sauce for the gander is not sauce for the goose.

ইয়োরোপের প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, শিল্প ও ব্যবহারনীতি আমরা গ্রহণ করিয়া লাভবান হইতে পারি। ইয়োরোপের রাজনৈতিক চিন্তার ধারা আমাদের ধাতুতে সহিবে না। ইয়োরোপের ধর্ম্মতত্ত্ব ও তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শনশাস্ত্র আমাদের চিরাগত, মজ্জাগত সংস্কারের অনুকূল নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বর্জ্জনীয় ইয়োরোপের সমাজ-বিজ্ঞান। আমরা দেবতার সন্তান, আমরা ব্রহ্মের অংশ, আমরা স্বর্গ হইতে কর্ম্মফল ভোগ করিতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া মায়াজালে জড়িত হইয়া অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছি। আমাদের চেতনা উদ্বুদ্ধ

হইলে আবার আমাদের সহিত পরম পুরুষের নিকটযোগ স্থাপিত হইবে। আমাদের সমাজনীতি ও সামাজিক সংস্কার বিধির বিধান—ঐশ শাসন। আমাদের ইহজন্মের পরিচয় ও সম্পর্ক পূর্ব্বজন্মের পরিচয়ের ফল এবং পরজন্মের সম্বন্ধের সোপান। আমাদের স্বর্গীয় ধর্ম্মপত্নী পুষ্পমালা করে লইয়া পতীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন; পরলোকে পুনর্ব্বার মিলন, পুনর্ব্বার উলুধ্বনি, পুনর্ব্বার মঙ্গলনীতি, পুনর্ব্বার বাসর ও কুসুম-শয্যা! সে অনুরাগ, সে বাসনা, সে কল্পনার উন্মত্ততা কি মধুর, কি সুন্দর! আমাদের সমাজে পতির জন্য বৈকুণ্ঠ হইতে বিমান আসিয়া পৌঁছিলে, অঞ্চলে অঞ্চল বাঁধিয়া সীঁথিতে সিন্দুর পরিয়া, তাম্বুলরাগে অধর রঞ্জিত করিয়া, পতির চিরসঙ্গিনী পত্নী তাহাতে আরোহণ করেন; যুগল-দম্পতির মহাপ্রয়াণের বিজয় দুন্দুভি চারিদিকে বাজিয়া উঠে, স্বর্গ হইতে দেবতাগণ কুসুম-বৃষ্টি করেন. দেবকন্যারা বরণডালা মাথায় লইয়া অভ্যর্থনা করিতে আকাশপথে সারি দিয়া দাঁড়ায়, অপ্সরারা নৃত্য করে, গন্ধর্ব্বেরা বাদ্য করে, কিন্নরেরা গান গায়। ভারতীয় হিন্দুর জীবনের ইহাই Romance!

পাশ্চাত্যদেশে এমন রোম্যান্স আছে কি? যে জাতির জীবনে Romance নাই, উচ্ছ্বাস নাই, কল্পনা নাই, হুজুগ নাই, ব্রত উপবাস রোজা নাই, উদ্দীপনা-উত্তেজনা অনুপ্রাণনা নাই,সে জাতি ত জড়—কাঠ-মাটী গাছ-পাথরের সমান। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিদের জীবনেও Romance আছে; প্রণয় প্রণয়িনীর প্রথম শুভদৃষ্টির এক মুহূর্ত্তই তাহাদের জীবনের অনন্তযুগ। সে শুভদৃষ্টির পবিত্রতার স্মৃতির মর্য্যাদায় তাহাদের জাতীয় শক্তির পৃষ্ঠবংশ নির্ম্মিত হইয়াছে। যতদিন সে দেশের সাধনা, প্রকৃতি, প্রয়োজন ও জীবন সেই পুণ্যস্মৃতির গৌরব রক্ষার অনুকূল থাকিবে, ততদিন সেথাকার সমাজ ও আমাদের জন্মজন্মান্তরের সংস্কারের পার্শ্বে সজীবভাবে দাঁড়াইয়া জগতের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিবে। কিন্তু বিলাসিতার লোভে, অভাব বুদ্ধির তাড়নায়, শ্রদ্ধার অভাবে, নাস্তিকাবুদ্ধির প্রভাবে, জড়বাদের প্রতারণায়, সাধনার ত্রুটীতে, চরিত্রের শিথিলতায় তাহারা যদি সেই জীবনের শুভ মুহূর্ত্তের স্মৃতির অবমাননা করিতে অভ্যাস করে, তাহা হইলে তাহাদের আদর্শ ও উক্তি আমাদিগকে সতর্ক হইয়া দূরে রাখিতে হইবে। ইয়োরোপের জড়বাদ, বিলাস-পরতন্ত্রতা,ভোগপরায়ণতা, ইন্দ্রিয়সেবা, শাসন বিধানের সীমা লঙ্ঘন করিয়া নিট্সে, ইবসেন ও ভিক্টোরিয়া কসের লেখনীর মুখে হলাহল উদ্গিরণ করিতেছে। সে সমাজের স্বাধীন জীবনের স্বাধীন প্রেমের পরিণতি নিরঙ্কুশ উচ্ছৃঙ্খলতা। আমরা আমাদের সমাজের ধাতুমজ্জা, মেদমাংস পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, ঐ সকল গামলার গাছ এ দেশের মাটীতে জন্মে না। ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, উহা বিছুটী জাতীয় পাতাবাহার—লজ্জাবতী লতার পেলব পল্লব নহে।

আমাদের দেশেও কি বিদ্রোহী ইব্‌সেন ও নিট্‌শে ছিল না, বা নাই? অথর্ব্ববেদের যজ্ঞশালা হইতে এ যাবৎ দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে,ভারতীয় সমাজেও সামাজিক বিপ্লববাদী অনেক ঋষি মুনি দেবদানব বাক্য ও কার্য্যদ্বারা গোপনে বা প্রকাশ্যে সমাজ-শাসনের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। আমাদের

ধর্ম্মভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ, জাতিভেদ, সম্পর্কভেদ, দেশভেদ, ভাষাভেদ স্বাধীন প্রেমের সীমা সঙ্কুচিত করিয়া সমাজ-শাসনের বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়াছে। আমরা পরদায় ঢাকিয়া, সমালোচনায় ঝলসাইয়া, সংস্কারে জমাইয়া, ধর্ম্মে শাসাইয়া, আচারনিষ্ঠায় বাঁধিয়া আমাদের ইব্‌সেন ও নিট্‌শেকে লোক চক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিয়াছি। তাহাদের শিষ্যাসেবিকাদিগের জন্য আমাদের ব্যবস্থা মস্তকমুণ্ডন। সমাজশিখরচ্যুত হইয়া তাহারা রাজরাণী হইলেও নিম্নতম পঙ্কিলপয়োকুণ্ডে পতিত হয়। এইপ্রকার সংস্কার ও শাসন আমাদিগকে এযাবৎ মোটের উপর রক্ষা করিয়াছে। সেই শাসন ও সংস্কার সিথিল হইলে আমাদের আর থাকিবে কি? ধর্ম্মকর্ম্মহীন, আদর্শচ্যুত, পরাধীন হিন্দু ইহুদী হইতে হেয় হইয়া পড়িবে।

পশুসমাজ হইতে পাশ্চাত্য বিবর্ত্তন মতে মানবসমাজ গঠিত হইয়াছে। আমাদের সেই প্রাচীন পশুত্বের কথা বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কি আমাদের অন্তর্নিহিত পশুপ্রবৃত্তি জাগাইয়া দিতেছেন না? স্বেচ্ছাবরণ যে সমাজের মূল নীতি, সেখানে স্বেচ্ছাচার আসিয়া পড়া অস্বাভাবিক নহে। বিধবা বিবাহের যে সমাজে অবাধ প্রচলন, সে সমাজে নিত্যনূতন প্রেমিকের আশায় প্রাণে চির বসন্ত বিরাজ করিতে পারে। বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ যে সমাজের প্রথা, সেখানে কেবল টাকা কাপড় ও অলঙ্কারের লোভে পুতুলের ঘরে (Doll's House) কেহ আবদ্ধ হইয়া থাকিতে নাও পারে। কিন্তু আমাদের দেশে ঐরূপ করিয়া যে রমণী কুলের বাঁধন কাটিয়া সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, অভিজ্ঞতালাভ করিতে বাহিরে যাইবে, সে কলঙ্কিনী মরিলেও পুরুষ তাহাকে স্পর্শ করিবে না, তাহার উপার্জ্জিত অর্থ দেবসেবার অযোগ্য।

সংযমের নাম শুনিয়া হয়ত প্রতীচ্য জগতের মানব মানবীগণ উপহাস করিয়া বলিবেন, উহা কাপুরুষের কথা; সংযমে জাতীয় জীবনের উন্মেষ হইতে পারে না। বৃত্তিনিচয় পরিস্ফুট ও বিকাশিত হইতে পারে না—স্বাধীনতাই জাতীয়শক্তি প্রকাশের একমাত্র উপায়। তাহা প্রবৃত্তির কথা, নিবৃত্তি আমাদের মহাফল। আমাদের মনের ভিতরে কত দস্যু দানব বাস করে। সমাজশাসন, ধর্ম্মশাসন, বাহুশাসন সত্ত্বেও তাহারা বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া কারাপ্রবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে—কতক জন ন্যায় বিচারের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সমাজের বক্ষে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। তথাপি যদি বল, সংযমের প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে হয় তুমি পুরুষানুক্রমে সংযমের ফলে দেবপ্রকৃতি দুষ্মন্তের ন্যায় বলিতে পার—

সতাংহি সন্দেহ পদেষু বস্তষু প্রমাণমন্তঃকরণ প্রবৃত্তয়ঃ।

অথবা তুমি বলী, বীর; রাহাজানি, চুরি ডাকাতী, প্রবলের অত্যাচার ও নরহত্যার ভয় তোমার কেশস্পর্শ করিতে পারে না। অথবা হয়ত সামাজিক বিপ্লবেও উচ্ছৃঙ্খলতার অত্যাচারে তোমার হারাইবার কিছুই নাই—তোমার জীবন দুর্ব্বহ।

প্রকৃতিদেবীরা হয়ত বলিতেছেন, "কেন পুরুষ উচ্ছৃঙ্খলতা করিয়া, নীতিধর্ম্ম ভুলিয়া, সমাজশাসন অগ্রাহ্য করিয়া, স্বাধীন প্রেমের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, সখের পায়রার মত

গায় ফু দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া বেড়াইবে, আর আমাদের বেলা এত কঠোর শাসন, এত বিধিনিষেধ, এত নীতি উপদেশের বিস্তৃত ব্যবস্থা কেন ? এমন বিষম পক্ষপাতপূর্ণ নীতি স্বার্থপর পুরুষের অনুদারতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা জ্ঞানের আলোক পাইয়াছি, তোমাদের দৌড় বুঝিয়াছি, কনিষ্ঠ আঙ্গুলে করিয়া তোমাদিগকে ঘুরাইতে পারি, তাহা জানিয়াছি ; অতএব আর কূপমণ্ডুক হইয়া, অন্তঃপুরে গৃহের প্রাঙ্গণে জাঁতা পিষিয়া, বাসন মাজিয়া, বাড়া বানিয়া, ঘর নিকাইয়া, বাটনা বাটিয়া, কোটনা কুটিয়া, হাতাবেড়ী নাড়িয়া, তোমাদের মুরব্বিয়ানায় জ্বালাতন হইয়া দাসীবৃত্তি করিব না—আলোকে বাহির হইয়া সংসারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিব ; তোমরা তোমাদের পুত্রকন্যা লইয়া এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।" একবার ভগবতী দশমহাবিদ্যারূপ দেখাইয়া,মহাদেবের প্রাণে আতঙ্ক উৎপাদন করিয়া, স্বাধীনমতে চলিয়া অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; তাহার পরিণাম সতীর বিলোপ ও দক্ষযজ্ঞভঙ্গ। আবারও যদি প্রকৃতি সেই মূর্ত্তিতে দেখা দেন, আমাদের সাধের সমাজযজ্ঞ বীরভদ্রের হস্তে কি দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইবে, বুদ্ধিমান লোকেরা বুঝিতে পারিতেছেন।

নারী আমাদের বাস্তুদেবতা, গৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, সমাজের কেন্দ্র। স্ত্রীলোক ও দুর্ব্বল পুরুষের স্বার্থ রক্ষার জন্যই সমাজগড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের সংসারে প্রয়োজন নাই। আমরা সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, চিরকুমার ব্রহ্মচারী হইতে চাই ; তাঁহারাইত আমাদের সে পথের অন্তরায়। তাঁহারা দাসখতে আমাদিগের নাম লিখাইয়া লইয়া, আমাদিগকে গাধার মত খাটাইয়া, সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পুত্র-কন্যা-বধূ-জামাতা লইয়া রাজত্ব করিবেন ; আমরা কেবল তাঁহাদের কুটিল-কটাক্ষ, আলুলায়িত কুন্তল ও কলকণ্ঠঝঙ্কারের লোভে হাতনাড়া, মুখনাড়া এবং সময় সময় 'খেংড়ানাড়া' দেখিয়া জীবন সার্থক করিব। তাঁহারা যদি সংসার ভাঙ্গিয়া দেন, আমাদের তাতে কি ? তাঁহাদের মাতৃত্বের সাধ ও সন্তান-স্নেহ যত প্রবল, আমাদের পিতৃত্বের কামনা ও পুত্রস্নেহ তত প্রবল নহে। প্রকৃতির মোহে মজিয়া আমরা সংসারে আবদ্ধ—মাতৃত্বের মোহে মজিয়া, পুরুষকে অঞ্চলে বাঁধিয়া তাঁহারা সংসার পাতাইয়াছেন। চরিত্রের পবিত্রতা, ভাবের decency, ব্যবহারের decorum তাঁহাদেরই আইন, আমাদের জন্য করা হইয়াছে। তাঁহারা যদি উহা উল্টাইয়া দিতে চাহেন, আমাদের পক্ষে তাহা সুসংবাদ। তাঁহারা আমাদের দলে আসিয়া অবাধে মিশিতে পারেন না বলিয়া আমাদিগের উপর অবিচার, বৈষম্যনীতি ও অত্যাচারের দোষারোপ করিতেছেন ; কিন্তু আমরাই কি তাঁহাদের সঙ্গে অবাধে মিশিতে পারি ? তাঁহাদের গৃহ-দুর্গে, তাঁহাদের সমাজে, তাঁহাদের কথোপকথনে, তাঁহাদের bedroom, toilette table ও privacyতে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। তাঁহাদের কর্ম্মস্থলে আমাদের অবাধ গতি রোধ করিয়া, তাঁহারা যদি আমাদের কর্ম্মস্থলে প্রবেশের অবাধ অধিকার দাবী করেন, তাহা হইলে বৈষম্যনীতি তাঁহারাই সৃষ্টি করিবেন। তাঁহাদের গৃহকর্ম্মের ও সন্তান প্রতিপালনের সহায়তা করিতে যাইয়া, আমাদের ভাগে পড়িয়াছে লড়াই করা, পাথর ভাঙ্গা, মাটীকাটা, লাঙ্গলচষা, কলমপেশা, সাগর পারে

যাওয়া, বনকাটা, বাঘ ভালুক মারা ও পাহাড় ডিঙ্গান। ইহাতেও তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতেছেন না দেখিয়া আমরা দাড়ী গোপ কামাইয়া, তাঁহাদের সমান হইয়া, হাতাবেড়ী ধরিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়াছি।

সহস্র সহস্র বৎসরের চিন্তা ও বহুদর্শিতার ফলে ভারতীয় ইবসেন্ নিট্‌শেরূপী বিদ্রোহী গয়াসুরের মস্তকে নীতি ও সমাজ-শাসনের পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া আমাদের অপূর্ব্ব সমাজ গঠিত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রকার অনেক ঠেকিয়া, অনেক বুঝিয়া, অনেক সমস্যার সমাধান করিয়া, যুগে যুগে পরিবর্ত্তনের স্তরের মধ্যদিয়া সময়োপযোগী করিয়া, এই সমাজনীতির ভিত্তি বন্ধন করিয়াছিলেন। তাই হিন্দুসমাজ বহু লাঞ্ছনা, বিপ্লব, আক্রমণ, অত্যাচার সহ্য করিয়াও বাঁচিয়া আছে। কেবল বাঁচিয়া নাই—এখানে যাহারা আসিয়াছে, অথবা ভবিষ্যতে যাহারা আসিবে, তাহাদিগকে অনেক নূতন সমাজতত্ত্ব শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের গৃহিণী সমাজের কেন্দ্র ; তাই স্ত্রীর অঙ্গে ফুলের ভর সয় না ; কিন্তু পুরুষ লোহার কলাই ভক্ষণ করিয়াও তাহা হজম করিয়াছে। আমাদের কবি, লেখক, গ্রন্থকার, সকলেই সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া আর্য্যসমাজের আদর্শ-রমণীর চরিত্রে দাম্পত্য প্রেমের সংস্কার অতুলনীয় ভাবে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দশরথের অন্তঃপুরে সপ্তশত রাণী থাকিতে পারে, কিন্তু কৌশল্যার এক দশরথ ভিন্ন জগতে কেহ ছিল না। নন্দের দুলাল বৃন্দাবনে ষোড়শ শত গোপাঙ্গনা সঙ্গে বাসন্তীলীলা করিতে পারেন, কিন্তু বৃষভানু-দুহিতার প্রাণবল্লভ এক নটবর বংশীধর ত্রিভঙ্গমুরারী শ্যামচন্দ্র। স্বর্গের দেবগণ অপ্‌সরা লইয়া পারিজাত কুসুমোদ্যানে লীলাখেলা করিতে পারেন কিন্তু দেবীগণের বেলা তাহা পাপ—তাঁহারা গন্ধর্ব্ব মানবদানব লইয়া রসক্রীড়া করিলে দেবতার দেবত্ব আর থাকিবে না। যে অপরাধের ছায়া লইয়া অহল্যা পাষাণী, তাহার প্রধান 'আসামী' ইন্দ্র দেবগণের রাজা। পুরুষের অপরাধে সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগিনী, কিন্তু রমণীর অপরাধের সন্দেহে বহু উইল্‌কিনসন্[*] আত্মঘাতী। নারীর সমাজ নারী না রাখিলে আর রাখিবে কে ? তাই কুলললনাগণ প্রেমের ঢেউ খাইয়া তিলাঞ্জলি দিয়া কুল ভাসাইয়া দিলে, সমাজ কাহার মুখের প্রত্যাশী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে ? আমাদের গৃহিণীই গৃহ এবং গৃহই সমাজ।

কেহ হয়ত মনে মনে হাসিয়া বলিবেন, আমাদের সংস্কার কু-সংস্কার, অজ্ঞান ও কাপুরুষতার পরিণাম। সংস্কার হইলেই তাহা 'কু' নহে। সমাজের উন্নতির পথে যে সকল সংস্কার কণ্টক স্বরূপ, তোমরা তাহার অনায়াসে মূলোচ্ছেদ করিতে পার ; কিন্তু মনে রাখিও, হঠকারিতায় জগতের কোন মঙ্গল সাধিত হইবে না। সমাজ স্বয়ং নিশ্চেষ্ট নাই ; মানবদেহের ন্যায় মানব-সমাজও প্রতিনিয়ত আত্মরক্ষার উপায় অন্বেষণ করিয়া লইতেছে। আজ যাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছ, কাল হয়ত তাহার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইতে পারে। সমাজবন্ধন শিথিল হইলে, সামাজিক বিধানের প্রতি লোকে শ্রদ্ধাহীন হইলে, প্রবল বিধিনিষেধ পদদলিত করিয়া দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিলে, সময়ের

---

[*] The Statesman, August 8, 1915.

পরিবর্ত্তনে সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে এবং সমাজে মারাত্মক ব্যাধি উপস্থিত হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধন্বন্তরী বৈদ্যরাজও উপস্থিত হইবেন। মহাপুরুষ যাহা সাধন করিতে পারেন, আমরা তাহা পারি না। মহাপুরুষের প্রতিভা আমাদের মধ্যে জন্মিয়া আমাদের সমাজে থাকিয়া, আমাদের শিক্ষাদীক্ষার আলোকে আলোকিত হইয়া, আমাদের আদর্শে আমাদের অভাব বুঝিয়া, অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু আমরা কাঙ্গালের ছাওয়ালের ঘোড়ারোগের মত পরের ঘরের কাচের পুতুল দেখিয়া আমাদের সোণার ধুক্‌ধুকী ও মতির মালা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তাহারই পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে থাকি—অনুচিকীর্ষার প্রতারণা এমনই প্রবল। যে সমাজে সংস্কারের বন্ধন নাই, তাহা হাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া আছে। প্রকৃতির অন্ধ সংস্কার (instinct) আমাদের জননীর প্রাণে অপত্যস্নেহ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল বলিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। পুরুষ রমণীর প্রতি অনুরাগের সংস্কার ছিল বলিয়া, সৃষ্টির ধারা বংশপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। দয়ামায়া, শ্রদ্ধাভক্তি, ভয়-বিশ্বাস-ন্যায়ান্যায়-বোধ, এ সবইত সংস্কার।

শিক্ষা ও সমালোচনা দ্বারা সংস্কার দৃঢ় করিয়া আমরা চিরজীবন সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছি। অবস্থানুসারে সংস্কার আপনা হইতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু কেহ যদি আমাদের সংস্কারে আঘাত করিয়া সমাজের কাচের ঘর পাথর ছুড়িয়া ভাঙ্গিতে যান, তাঁহাকে ইহার পরে জলে ভিজিতে হইবে, বাতাসে উড়িতে হইবে, রৌদ্রে পুড়িতে হইবে, শীতে কাঁপিতে হইবে, তাহা যেন মনে থাকে। বিলাতের রাষ্ট্রবিপ্লব, কাইজারের গায়ের জোরের কথা ও সভ্যতার শোণিত-নদী মূলতঃ ইবসন জাতীয় লোকদিগের চিন্তা, কথা ও চালচলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে কি না, ভাবিবার বিষয়। প্রাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সাগরে পাল তুলিয়া দিয়া জাহাজভরা বাজে জিনিস এদেশে যথেষ্ট আসিয়াছে। তাহার পরেও আমরা কেহ যদি ইব্‌সন ও নিট্‌শে পড়িয়া, আমাদের দেশের ও সমাজের কথা না ভাবিয়া, অবিচারে কতকগুলি আদর্শ বাহির হইতে আমদানী করিয়া আনিয়া, আমাদের সমাজে তালা ভাঙ্গিতে, দেওয়াল ডিঙ্গাইতে, সিঁধ কাটিতে, ধনচুরি-মনচুরি-প্রাণচুরি-দেহচুরি-যৌবনচুরি ও ঘরচুরি করিতে যদি রাস্তায় রাস্তায় ছাড়িয়া দেই, তাহা হইলে আমাদের দেশের গয়াসুর গদাধরের পাদপদ্ম ঠেলিয়া উঠিয়া, সমাজ গ্রাস করিয়া ফেলিবে। তখন এই সকল দুর্ব্বলপ্রাণ, অনুকরণপ্রিয়, অদূরদর্শী, বাবুবৃন্দ বুঝিতে পারিবেন, এ দেশের অনাদি অনন্ত কল্পান্তস্থায়ী আসল ইব্‌সন পাশ্চাত্য দেশের ছায়া রিপুবাদীদিগের অপেক্ষা কত অধিক দুর্দ্দমনীয়, কত অধিক ভয়ঙ্কর। অতএব বিলাতী গোলা (shell) ফেলিয়া ভারতীয় সমাজগুহায় নিদ্রিত নরনারায়ণের প্রাণে যাঁহারা ভীতি ও আতঙ্কের সঞ্চার করিতে উদ্যত, তাঁহাদিগকে বলি—সাধু সাবধান!

শ্রীরসিকলাল রায়।

সঙ্গণিকা।

(২৬)

শ্রীমান্ জ্ঞানাঙ্কুর আতুর্থী একটী অনিন্দিত-চরিত্র যুবক—এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিল। বিগত ২১শে শ্রাবণ, শুক্রবার, তাহার জন্মদিন ছিল। যুবক বিষম সন্নিপাত-ক্ষেত্রের জ্বরে ভুগিতেছিল;—২১শে শ্রাবণ প্রত্যুষে জাগিয়া বলিল, "আজ আমার জন্মদিন"। কথা কয়টী শুনিয়া আমরা সচকিত হইলাম। পিতা মাতা প্রাতে সন্তানকে নূতন কাপড় এবং জামায় ভূষিত করিলেন। প্রাতে এই বিশেষ দিনের বিশেষ উপাসনা হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে অবস্থা আরো খারাপ হইল, চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিলেন,"কেমন আছ ?" সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি সন্তান নির্ভয়ে উত্তর করিল"বেশ আছি।"দারুণ যন্ত্রণার প্রকোপ ১৫।১৬ দিন সহ্য করিতেছিল, কিন্তু কখনও তাহার কষ্টের কথা ব্যক্ত করে নাই,জিজ্ঞাসা করিলেই বলিত "বেশ আছি।" ২১শে শ্রাবণের রাত্রেই, জ্ঞানাঙ্কুর, সহিষ্ণুতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত পরিবারে প্রতিষ্টিত করিয়া, নশ্বর দেহ রাখিয়া মহা-প্রয়াণ করিল। জন্মদিনই তিরোধানের দিন হইল,—অথবা মর্ত্ত্যে আগমনের দিনই স্বর্গারোহণের দিনে পরিণত হইল। নবজীবনের নবপ্রভাতের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা অবাক্ হইলাম।

জ্ঞানাঙ্কুরের জন্মের পূর্ব্বের অবস্থা কেহ জানে না,—দেহত্যাগের পরবর্ত্তী অবস্থাও অপরিজ্ঞাত। কিন্তু সংসার-জীবনে তাহার মহামূল্য ভাবীজীবনের আভাস পাওয়া গিয়াছে। মাধুর্য্য,সরলতা,কমনীয়তা,পবিত্রতা, নীরবতা, নিস্পৃহতা, সহিষ্ণুতা, আড়ম্বরহীনতা তাহার চরিত্রখানিকে দেবোপম সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছিল। সেই অতুল সৌন্দর্য্যের অস্পষ্ট ছায়া জগতে রাখিয়া সন্তান অসময়ে প্রস্থান করিল। এদেশে এরূপ কত অমূল্য জীবন-ফুল যে অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। তাহার দ্বারা বংশের মুখ এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। এইরূপ দেবোপম যুবকবৃন্দের তিরোধানে সেই দেবাদিদেব মহাদেবের চরিত্রাভাসেরই পরিচয় পাওয়া যায়। নানা প্রত্যক্ষ ঘটনায় অপ্রত্যক্ষেরই জীবন্ত অভিব্যক্তি।

(২৭)

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভাদুড়ী মহাশয়ের জন্ম ১২৬৯ সালের ১৪ই, অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ফরিদপুরের অধীন কোঁড়কদি গ্রামে। মৃত্যু—৩২ নং এলগিন রোডে, ২১শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩২২। বয়স ৫২ বৎসর, ৮ মাস। জন্মবারেই তাঁহার তিরোধান—সংসারের জন্মবারই স্বর্গের নব-জন্মের বারে পরিণত হইয়াছে।

২৫ বৎসর বয়সে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফরিদপুর-জেলা-স্কুলের শিক্ষক হন,সেখানে ৬ মাস কাজ করার পর-নোয়াখালি জেলা-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া এক বৎসর কাজ করেন। তৎপর এক বৎসর ছুটী লইয়া ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গবর্ণমেণ্টের কাজ

ছাড়িয়া তৎপর কিছুদিন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে প্রোফেসারি করেন। তৎপর নারায়ণগঞ্জ স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়া ১৩ বৎসর কাজ করেন। তৎপর বরিশাল জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়া ১২ বৎসর বরিশালে থাকেন। এইখানে দারুণ ব্রাইটস্ রোগে আক্রান্ত হন, কিন্তু প্রায় দেড় বৎসর কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণও চিকিৎসা করিয়াও রোগ নির্ণয় করিতে পারেন না। তাঁহারা ব্লড্-প্রেসরের চিকিৎসা করেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে রোগ ধরা পড়ে। বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও আত্মীয় এবং বন্ধুগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। এ দুঃখ কখনও ঘুচিবে না।

নবকৃষ্ণ বাবুর জীবন নানা উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। শিক্ষানুরাগ তাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল। তিনি পিতৃমাতৃদত্ত প্রতিভার অধিকারী হইয়া, স্বীয় অধ্যবসায় গুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা শেষ করিয়াছিলেন। অর্থ-কষ্ট বাল্য হইতে তাঁহার জীবনের সম্বল ছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে দমিয়া যান নাই—জীবনের উৎকর্ষ সাধনে আজীবন বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্বাধীনচিত্ততা এবং সংযম-বলে তিনি যে বিশুদ্ধ চরিত্র-ধন লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে চিরদিনই তিনি সর্ব্বজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। প্রাচীন ও নব্য সমাজের তিনি মধ্যবিন্দু ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সহিত অঙ্গাঙ্গী-ভাব-সাধনায় চিরদিন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি একবার উপবীত পরিত্যাগ করিয়া, প্রাচীন সমাজের মহত্বানুকরণে পুনঃ তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সভ্য ছিলেন। ঈশ্বরে রতি, মতি, ভক্তি, তাঁহার অন্তরকে চিরসৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি আদর্শ পিতা, আদর্শ পতি। কন্যাদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিয়া বয়স্থা করিয়া বিবাহ দিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বাড়ী ঘরের আসবাব দ্রব্যাদি যেন ছবির ন্যায় সাজান থাকিত। কেহ বাড়ীতে অতিথি হইলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইত—পরন্তু অন্দরমহলের বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকায়, পরিবারের মাধুর্য্যে সকলেই মোহিত হইতেন। তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের পরিচ্ছন্ন ছবি সর্ব্বত্র সর্ব্বকাজে ফুটিয়া বাহির হইত। প্রাচীন সমাজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও কখনও জাতিভেদের পোষকতা করেন নাই। তাঁহার পরিবার আদর্শ পরিবার। সর্ব্বশ্রেণীর লোক সেখানে যত্ন ও আদর পাইত। তাঁহার অবস্থা সচ্ছল ছিল না বটে, কিন্তু কোন সৎকাজে তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। অবস্থানুসারে সর্ব্বদা বিপন্নের সহায়তা করিতেন এবং সৎকাজে উৎসাহ দিতেন। তিনি কাহারও দোষ ত্রুটী দেখিলে তাহা মুখের উপর বলিয়া দিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে কেহই তাঁহার শত্রু হইত না। তিনি বহুকাল হেড্মাষ্টারী করিয়া গিয়াছেন ;—তাঁহার নীতি-জ্ঞানে এবং শিক্ষার পারিপাট্য-সাধনে তিনি সময়ে সময়ে কঠোর হইতেও কঠোর হইতেন, কিন্তু তিনি বন্ধুত্বের আদর-আপ্যায়ন কখনও ভুলিতেন না। কাঠিন্যে কোমলতা, কর্কশতায় মাধুর্য্য সর্ব্বদা এমন ভাবে বিমিশ্রিত থাকিত যে, লোকেরা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইত। মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন সেন, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী-প্রমুখ আদর্শ শিক্ষকগণের সদ্গুণে তিনি ভূষিত

ছিলেন। তাঁহার তিক্ত ব্যবহারেও লোকেরা সন্তুষ্ট হইত, তাঁহার সঙ্গ-লাভে লালায়িত হইত।

বন্ধু-বাৎসল্য তদীয় জীবনের বিশেষত্ব ছিল। এরূপ অকৈতব-প্রেম এ সংসারে বড়ই দুর্লভ। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন লাহিড়ী মহাশয় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ একথার জীবন্ত সাক্ষী। তাঁহার সহিত এবং আমাদের সহিত এরূপ অকপটভাবে তিনি মিলিয়াছিলেন যে,যখনই তাঁহার কথা ভাবি, চক্ষের জল সম্বরণ করা কষ্টকর হইয়া উঠে। রাধিকামোহন তাঁহার শেষ পরিচর্য্যা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এরূপ নির্ম্মল নিঃস্বার্থ-সেবা-পরায়ণতা এসংসারে সর্ব্বদা দেখা যায় না। সহধর্ম্মিণী ও কন্যাগণের প্রতি তাঁহার অবিচলিত ভালবাসার পরিচয় পাইয়া আমরা মোহিত হইতাম। তিনি ও তাঁহার পত্নী দুইয়ে যেন এক, একে যেন দুই ছিলেন;—যেন ক্ষীরোদবাসিনী ও অবিনাশচন্দ্র, যেন সৌদামিনী ও প্রতাপচন্দ্র,যেন অন্নদায়িনী ও হরগোপাল। তিনি মাতৃ-প্রেম-সাধনে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন. পত্নী ও সখ্যপ্রেমে জীবনের পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, বহুজনকে ভালবাসিতে বাসিতে জীবন শেষ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন অকৈতব প্রেমের অপূর্ব্ব উদাহরণ। নবকৃষ্ণ ভাদুড়ী ফরিদপুরের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তাঁহার তিরোধানে জন্মভূমি কোঁড়কদি ও ফরিদপুর মহা-আঁধারে পূর্ণ হইল। বিধাতা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারে ও অসংখ্য বন্ধুবান্ধবের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

(২৮)

মিত্রবংশের ন্যায় আর যে কয়েকটী বংশ-সমবায়ে বঙ্গ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, দত্তবংশ তন্মধ্যে অন্যতম। দত্তবংশ প্রতিভার যেন বিনোদ-নিকেতন। স্বাধীনতা এই বংশের চির-উপভোগ্য। এই বংশের অক্ষয়কুমার, মাইকেল মধুসূদন এবং রমেশচন্দ্রের নাম বাঙ্গালা সাহিত্য কখনও ভুলিতে পারিবে না। ইঁহারাই বাঙ্গালা-সাহিত্য-গঠন এবং পরিপোষণের মূলীভূত কারণ।

এই দত্তবংশে রায় কালিদাস দত্ত বাহাদুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের অধীন মেড়াস গ্রামে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই কালিকাদাস জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ৺রমেশচন্দ্র মিত্র ও ৺তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহপাঠী। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই শ্রীরামপুরের মুন্সেফ নিযুক্ত হন। তৎপর কিছুদিন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কোচবিহারের পরলোকগত রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ তখন নাবালক ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে এই নাবালক রাজার অভিভাবক ও রাজ্যের দেওয়ান পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। এই কাজে ৪২ বৎসর তিনি নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার ষ্টেট-কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর দেওয়ানী কার্য্য পরিত্যাগ করেন। বিগত ১৯শে শ্রাবণ, বুধবার, কালিকাদাস স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

কোচবিহারের সর্ব্ববিধ উন্নতির সহিত তদীয় জীবন বিশেষ ভাবে জড়িত। কোচবিহার রাজ্য এক্ষণে মানে গৌরবে সর্ব্বজন-

আদৃত ;—ভিক্টোরিয়া কলেজ তাঁহার গৌরব-তিলক। রাজ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে ৪২ বৎসর কালিকাদাসের প্রতিভা কার্য্য করিয়াছে। কি রাজস্ব বৃদ্ধি, কি রাস্তাঘাট ও রাজধানীর সৌধাবলীর পারিপাট্য সাধন, কি সুবিচার-প্রণালী প্রবর্ত্তন—রাজ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে তাঁহার প্রতিভা পরিস্ফুট রহিয়াছে। সংক্ষেপে সকল কথা বিবৃত হইবার নয়। তিনি যেন কোচবিহারের সর্ব্বঘটে নিত্যলীলা করিতেছেন। তিনি এই রাজ্যের উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন, কোচবিহারের নিরপেক্ষ-ইতিহাস-লেখকগণ তাহা সময়ে বিবৃত করিবেন। আমরা কেবল এই কথা লিখিতেছি,—কোচবিহারের উন্নতির চিন্তা লইয়া তিনি জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন,তাহার চিন্তা লইয়াই যেন জীবনপাত করিয়াছেন। কোচবিহার এহেন মহাত্মার কথা কখনও ভুলিতে পারিবে না। তিনি কোচবিহারে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কালিকাদাস চিরদিনই বাঙ্গালা ভাষার পরিপোষক ছিলেন। গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহ দেওয়া তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ছিল। ভাল বাঙ্গালা পুস্তক বা পত্রিকা পাইলেই সাদরে পড়িতেন। তিনি স্বাধীনচেতা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জাতীয় ভাষায় উন্নতির জন্য সর্ব্বদা বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও তিনি উদাসীন ছিলেন না। কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও তাঁহার নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। তিনি একজন সচ্চরিত্র, ধর্ম্মপ্রাণ আদর্শপুরুষ ছিলেন। মিষ্টভাষী, সংযতচিত্ত, সরল-প্রাণ মহাত্মা তপস্যা ও নিষ্ঠায় অপূর্ব্ব জীবন লাভ করিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব্বত্বে মিশিয়াছিল, কর্ত্তব্যপরায়ণতার গভীর নিষ্ঠা। অশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিতে করিতে তিনি রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অতুল তাঁহার মাধুর্য্য, অতুল তাঁহার বীরত্ব, অতুল তাঁহার সাধুতা। তাঁহার আবির্ভাবে বঙ্গ ধন্য হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" খেতাবে ভূষিত করিয়াছিলেন। জয়পুরে কান্তিচন্দ্র ও সংসারচন্দ্র যাহা করিয়াছেন, কাশ্মীরে নীলাম্বর এবং বরোদায় রমেশচন্দ্র যাহা করিয়াছেন, কালিকাদাস কোচবিহারে তাহাই করিয়াছেন। ইঁহাদের মহত্ত্বে বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। হাতে কলমে কাজ করিয়া এই সব মহাত্মা দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী শুধু বাক্যবীর নয়, কর্ম্মবীরও বটে, বাঙ্গালী শুধু বিলাস-সেবার সহচর নহে, স্বার্থত্যাগেরও উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতবর্ষ এই সব মহাত্মাদের কথা কখনও ভুলিবে না। কালিকাদাসের তিরোধানে বাঙ্গালার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা যে শীঘ্র পরিপূরিত হইবে, আমাদের সে আশা নাই। বিধাতা শোকসন্তপ্ত পরিবারে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। তাঁহার বংশে যেন তাঁহার অনিন্দিত দেব-চরিত্রের মহত্ত্ব চিরদিন অনুস্যূত হয়।

(২৯)

“প্রণব” সম্বন্ধে হাইকোর্টে আর আবেদন করা হয় নাই, ব্যারিষ্টারগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, তাহাতে কোন ফল হইবে না। হাইকোর্টের জজগণ “কমরেডের” রায়ে বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট এই আইনে তাঁহাদের কিছু করিবার ক্ষমতা দেন নাই—যে কোন পুস্তক ঐ আইন-মূলে বাজেয়াপ্ত হইতে পারে। এরূপ স্থলে তাঁহারা আদালতে যাইতে নিষেধ করায় তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে

হইয়াছে। যে সকল সাধু ভক্তের জীবনের অভিব্যক্তি ঐ পুস্তকে ছিল, তাঁহাদের জীবনের অমূল্য কথা এদেশে অক্ষয় হউক।

এই উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। নব্যভারতকে বিপন্ন মনে করিয়া অসংখ্য সহৃদয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি সহানুভূতিপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। কেহ লিখিয়াছেন—"It will be a national calamity if *Nabyabharat* is allowed to die." অন্যান্য অসংখ্য ব্যক্তি নব্যভারতের নানা গুণকাহিনী কীর্ত্তন করিয়া ঐ কথার সমর্থন করিয়াছেন। সকলের চরণে আজ ভক্তিপূর্ণ-নমস্কার জানাইতেছি। বিধাতা সকলের মঙ্গল করুন। শুনিতেছি, নব্যভারত সিবিলিয়ান-সাহেবদিগের পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াছে। অনেক সিবিলিয়ান নব্যভারতের গ্রাহক হইতেছেন। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, আমরা তাহা জানি না। সহৃদয় বন্ধুগণ আশীর্ব্বাদ করিবেন, আমরা যেন অক্লান্ত অন্তরে দেশের জন্য খাটিতে খাটিতে দেহপাত করিতে পারি। বিধাতার কৃপাই আমাদের জীবনের একমাত্র সম্বল, দুঃখ বিপদে সেই কৃপা যেন আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ না করে। সব ছাড়িয়া থাকিতে পারি, তাঁহার কৃপা-বঞ্চিত হইয়া মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারি না। দয়াল প্রভুর চরণে প্রণাম করিতেছি।

(৩০)

বর্দ্ধমান ও কাঁথির প্লাবনের সাহায্যের টাকার অপব্যবহার সম্বন্ধে"নায়ক" যে সকল গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ হয় নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত আছি। টাকাকড়ি সম্বন্ধে এ দেশের লোকেরা যেরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার করেন,তাহা কখনও নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞানের অনুমোদিত হইতে পারে না। অনাহারে মৃত্যুগ্রাসে পতিত নরনারীর মুখের গ্রাস যাঁহারা কাড়িয়া লইয়া আত্মসাৎ করেন, তাঁহাদের নরকেও স্থান হইবে না। বিপন্ন মহিলাদের প্রতি যাঁহারা কু-নজরে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা পশু অপেক্ষাও অধম। আমরা জানি, এরূপ লোকের হাতে কার্য্যভার দিয়া নেতাগণ অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়া কলঙ্কের বোঝা বৃদ্ধি করিতেছেন। দয়াদ্র-চিত্ত ব্যক্তিগণকে ভবিষ্যতে সতর্ক হইতে একান্ত অনুরোধ করিতেছি।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১০। The Twenty-third Annual Report of the Calcutta Orphanage for the year 1914. এই আশ্রমটী ৺প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এবং তাঁহার পত্নী ৺ ক্ষান্তমণি দত্তের শরীরের রক্তে সংরচিত। দিন দিনই এই আশ্রমের উন্নতি হইতেছে। সামান্য লোকের সামান্য কার্য্য এখন অসামান্যে পরিণত হইয়াছে। বৎসর বৎসর আশ্রমের গৃহ-সংখ্যা বাড়িতেছে। গত বৎসর অনাথ এবং অনাথাদের শিক্ষা ও আহারাদির জন্য ১০৪০৭৶৫ ব্যয় হইয়াছে, বাড়ীর জন্য গত বৎসর ১৭০৯১৷৷৶৭ সংগৃহীত হইয়াছে। বাড়ীর জন্য ৪২৩৪৷/ ব্যয় হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে ৫২ বালক ও ৪৮ জন বালিকা মোট ১০০ জন ছিল; পূর্ব্ব বৎসর ৮২ জন ছিল। প্রতি জনের জন্য ৭৷/১৫ মাসে

ব্যয় হইয়াছে। এই আশ্রমটী বাঙ্গালীর অক্ষয় কীর্ত্তি। শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু এবং শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ এবং আরও বহু সহৃদয় ব্যক্তি প্রাণপণে ইহার উন্নতির জন্য খাটিতেছেন। বিধাতার কৃপা ও দাতাগণের আশীর্ব্বাদ এই আশ্রয়হীনদিগের উপর বর্ষিত হউক।

১১। পরাগ। শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত প্রণীত। এই কবির কবিতাও গতবারের সমালোচিত বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার ন্যায় মধুর। ২০৩ পৃষ্ঠার পুস্তক খানিতে অনেক কবিত আছে। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রের অনুবাদ কয়টী খুব সুন্দর হইয়াছে। লেখকের ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

১২। বিবাহ ও তাহার আদর্শ। শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত, বি-এ প্রণীত মূল্য ॥০। বিবাহ বিষয়ক যত পুস্তক এদেশে প্রকাশিত হইয়াছে, এই পুস্তকখানি তাহার পার্শ্বে রাখিবার যোগ্য। গ্রন্থকার, ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়ের ন্যায় সংস্কারপ্রয়াসী। তাঁহার গভীর গবেষণা এবং চিন্তা এই পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ উপকার পাইলাম। এইরূপ গ্রন্থ এদেশে যত অধিক প্রকাশিত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল। সর্ব্বত্র আদৃত হইবার যোগ্য পুস্তক।

১৩। কপিলের তেজ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১৲। পৌরাণিক নাটক। সৎউদ্দেশ্য-প্রণোদিত রচনা। "কপিলের তেজ" পাঠে পাঠকগণ ধৈর্য্যচ্যুত না হইলে উপকৃত হইবেন মূল্য বড় বেশী।

১৪। বল্লাল-চরিত (সমালোচনা)। শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য ।০। গবেষণাপূর্ণ সুচিন্তিত নিবন্ধ।

১৫ সত্যনারায়ণের পাঁচালী। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘটক বিরচিত। রংপুর সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৶০। এই লুপ্তোদ্ধার করিয়া রংপুর সাহিত্য-পরিষদ আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন

১৬। বিজয়াবসান। কাব্য। শ্রীবসন্তকুমার রায়, এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক রচিত, মূল্য ১।০। ঐতিহাসিক বিবৃতি। লেখা ভাল। এরূপ ঐতিহাসিক বিবৃতি ভিন্ন দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে না। গ্রন্থকারকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

১৭। আত্মবোধ। শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র প্রণীত, মূল্য ১৲। মূল্য অল্প হইলে ভাল হইত। ক্ষুদ্র পুস্তক, কিন্তু বেশ চিন্তাপূর্ণ।

১৮। কোচবিহার-অনাথ আশ্রমের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, ১৯১৪। আয় ১১২১।৶১০, ব্যয় ৬৩৭।৴৩। পূর্ব্বের স্থিত ২৪৯০॥১১। ব্যয় বাদে ২৯৭৬॥৶৯ স্থিত আছে। মোট ৮ জন অনাথ আশ্রমে ছিল; সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে ৯ জন ছিল।

বিধাতা এই সৎকাজের সহায় হউন।

১৯। ফুলঝুরি। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ।৶০। ছেলেদের পুস্তক। ছাপা ও ছবি সুন্দর, কবিতাগুলি ভাল। কিন্তু ছবিই বেশী।

২০। মা আমার এমন কেন? শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৴০। গ্রন্থের মীমাংসা "তোমারই তুলনা তুমি।" কথা কয়টী সুমিষ্ট।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

সগুণ ব্রহ্মোপাসনা।

‘ব্রহ্মোপাসনা’ শব্দ সাধারণতঃ সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকেই লক্ষ্য করে। ছান্দোগ্য ভাষ্যের মুখবন্ধে শঙ্কর সগুণ ব্রহ্মোপাসনার এইরূপ উল্লেখ করিতেছেন ঃ—“কৈবল্য-সন্নিকৃষ্টফলানি চাদ্বৈতাদীষদ্বিকৃতব্রহ্মবিষয়াণি মনোময়-প্রাণশরীর-ইত্যাদীনি।” কৈবল্যের সন্নিকৃষ্ট ফলদায়ক, অদ্বৈত ব্রহ্মের তুলনায় ঈষৎ বিকৃত ব্রহ্মবিষয়ক (উপাসনা সকল), —যথা, মনোময় প্রাণশরীর ইত্যাদি।” শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে (২—১—১১) বলিতেছেন ঃ—“ব্রহ্মকে দ্বিরূপযুক্ত জানা যায় ঃ—নাম-রূপাত্মক বিকারভেদদ্বারা উপাধিবিশিষ্ট, এবং তদ্বিপরীত সর্ব্বোপাধি-বর্জ্জিত। বিদ্যা এবং অবিদ্যার বিষয়ভেদ অনুসারে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা।* অবিদ্যাবস্থাতে ব্রহ্মের মধ্যেই উপাস্য-উপাসকাদিলক্ষণ সর্ব্বপ্রকার ভেদের ব্যবহার। এই সকল উপাসনার মধ্যে কোন কোন ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশ্য অভ্যুদয় বা ইহা মুক্ত সম্পদলাভ। কোন কোন ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশ্য ক্রম-মুক্তি কোন কোন ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশ্য কর্ম্মসমৃদ্ধি।” সগুণোপাসনার সম্পর্কেই এই তিনটী শ্রেণী বা স্তরবিভাগ দৃষ্ট হয়,—নিম্নতম স্তর অভ্যুদয়-সাধক, মধ্যম স্তর কর্ম্ম-সমৃদ্ধিকারক, এবং উচ্চতম স্তর ক্রম-মুক্তিসাধক। অধুনা উপাসনা শব্দ ক্রমমুক্তি-সাধক সগুণ ব্রহ্মোপাসনাতেই নিবদ্ধ। পৌরাণিক মহাপ্রলয়কল্পনাদ্বারা বাধ্য হইয়াই, শঙ্কর ব্রহ্মের বিকারবর্ত্তি বা সগুণ (Immanent) স্বরূপ, এবং বিবারাবর্ত্তি বা নির্গুণ (Transcendent , স্বরূপের মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটাইয়া ব্রহ্ম-সাধনার মধ্যেও তদনুরূপ বিচ্ছেদ কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন ঃ—(১) সগুণব্রহ্মসাধনা বা সগুণ-বিদ্যা অথবা অবিদ্যাবীজযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা, যাহার ফল অনেকটা কর্ম্মফলেরই অনুরূপ উৎকর্ষ-নিকর্ষযুক্ত। “সগুণা সু তু বিদ্যাসু “মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ” ইত্যাদ্যাসু গুণাবাপোদ্বাপবশাং ভেদোপপত্তৌ সত্যাং উপপদ্যতে যথাস্বং ফলভেদনিয়মঃ কর্ম্মফলবৎ”—“যথা—যথোপাসতে তদেব ভবতি।” সগুণবিদ্যার ফল পৌরাণিক সারূপ্য-সামীপ্য-সালোক্য—সাযুজ্যাত্মক † চতুর্বিধ ক্রমমুক্তি। কিন্তু কৈবল্য একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যালভ্য !

সগুণোপাসনারই সর্ব্বোন্নত স্তরের নাম ‘সংরাধন’। এই সংরাধন সম্বন্ধে “অপিচ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (ব্রহ্মসূত্র—৩—২—২৪) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন ঃ—“প্রপঞ্চজাত হইতে অন্য “সত্যস্য সত্যরূপ” ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় না

---

* ব্রহ্মের দ্বিরূপতা সম্বন্ধে রামানুজ বলিতেছেন ঃ—“নির্গুণবাক্যানাং সগুণ-বাক্যানাঞ্চ বিষয় মপহতপাপ্মত্বা দ্যপীপাস ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতিরেব বিবিনক্তি ইতি সগুণনির্গুণ-বাক্যয়ো বিরোধাভাবাৎ অন্যতরস্য মিথ্যা-বিষয়তা-শ্রয়ণীয়মপি নাশঙ্কনীয়ং।” শ্রীভাষ্য—৩৫০ ॥

† শিবানন্দলহরী—২৮

কেন ? কারণ তিনি অব্যক্ত বা কারণরূপী, এবং সকল দৃশ্য পদার্থের সাক্ষিত্বহেতু অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভূতি না হয় যে এমনও নয়, কারণ সংরাধনকালে যোগীগণ সেই প্রপঞ্চাতীত “অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য’ (‘সর্ব্বসাক্ষিত্বাৎ’) অব্যক্ত আত্মাকে দর্শন করেন। সংরাধন[*] বলিতে ভক্তি, ধ্যান, এবং প্রণিধান বা স্তুতিনমস্কারাদি বুঝায়। যোগীগণ যে সংরাধনকালে দর্শন করেন, তাহা কিরূপে জানা যায় ? প্রত্যক্ষ[†] এবং অনুমান দ্বারা,—অর্থাৎ শ্রুতি এবং স্মৃতিপ্রমাণদ্বারা তাহা জানা যায়, শ্রুতি, যথা, “কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুর মৃতত্বমিচ্ছন্” (কঠ—৪—১) ইত্যাদি, স্মৃতি যথা “যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ। জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাঃ তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ” ইত্যাদি। কিন্তু সংরাধ্য-সংরাধক সম্বন্ধ স্বীকার করাতে পর আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে যে পরেতর আত্মা বা জীবাত্মার পৃথক্‌ত্ব স্বীকার করা হয়, এরূপ নয়। কেন নয় ? তাহা বলা যাইতেছে।” “প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিত্যাদি” (৩—২—২৫) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর তাহাই বলিতেছেন ঃ—“আলোক যেমন অঙ্গুলিপ্রভৃতির ক্রিয়ারূপ উপাধিযোগে, অথবা সূর্য্য যেমন জলাধারাদির ক্রিয়ারূপ উপাধিযোগে ভিন্নের ন্যায় দেখায়, কিন্তু তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক অবিশেষ ভাব ত্যাগ করে না, স্বপ্রকাশ চিদাত্মার মধ্যে উপাস্য-উপাসকভেদও সেইরূপ ধ্যানাদি ক্রিয়ারূপ উপাধিজনিত, স্বরূপতঃ একাত্মতাই।” পরের “অহিকুণ্ডলবৎ” (৩—২—২৭) সূত্রের ভাষ্যেও শঙ্কর বলিতেছেন ;—“অহি বা সর্পের যেমন অহিত্ব বা সর্পত্বরূপে অভেদ, কিন্তু কুণ্ডলত্ব বা বলয়াকারত্ব, আভোগত্ব বা বক্রাকারত্ব, এবং প্রাংশুত্ব বা দীর্ঘ দণ্ডাকারত্ব ইত্যাদিরূপে ভেদ বুঝায়,—ধ্যাতৃ-ধ্যাতব্য, দ্রষ্টৃ-দ্রষ্টব্য, অথবা নিয়ন্তৃ-নিয়ন্তব্য ইত্যাদিরূপে জীব এবং প্রাজ্ঞের ভেদও সেইরূপ।” “প্রকাশাশ্রয়বদ্বা” (৩—২—২৮)—সূত্রের ভাষ্যেও শঙ্কর বলিতেছেন ;—“সূর্য্যালোক এবং তাহার আশ্রয় যেমন ভিন্ন অথচ অভিন্ন, এস্থলেও সেইরূপ।” “পূর্ব্ববদ্বা” (৩—২—২৯) সূত্রের ভাষ্যেও শঙ্কর আপন মত এইরূপে ব্যক্ত করিতেছেন ;—“বন্ধ যেরূপ

---

[*] রামানুজাচার্য্যের নিম্নলিখিত সগুণব্রহ্মোপাসনার বর্ণনা এই সঙ্গে বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য ! “জ্ঞানং কিং রূপং ? বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রং ? উত তন্মূলং উপাসনাত্মকং জ্ঞানং ? বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেব ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতং। অপবর্গোপায়তয়া বিধিৎসিত বেদনং উপাসনং। বিদ্যুপাস্ত্যোরব্যতিকরেণোপক্রমোপসংহারদর্শনাৎ। তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। ধ্রুবায়াঃ স্মৃতের পবর্গোপায়ত্বশ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনাকারা। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে তেনৈবলভ্যঃ”—প্রিয়তম এবহি বরণীযো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। অতঃ এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে। উপাসনপর্য্যায়ত্বাৎ ভক্তিশব্দস্য। ব্রহ্মবিষয়বেদন মেবাপবর্গায় সর্ব্বাঃ শ্রুতয়োঃ বিদধতি, জ্ঞানং চোপাসনাত্মকং। উপাস্যং চ ব্রহ্ম সগুণং।” সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মর্য্যমানাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়া যস্য স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতি ইতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মা। (শ্রীভাষ্য পৃঃ—৩৫৮)।

[†] শ্রুতিকে ‘প্রত্যক্ষের’ মধ্যে গণ্য করাতে বেদসিদ্ধতত্ত্বকে আধুনিকদিগের “Intuition”এর স্থান দেওয়া হইতেছে “একাত্মপ্রত্যয়সারং”—

অবিদ্যাকৃত, মোক্ষও সেইরূপ বিদ্যাজনিত। ভেদ এবং অভেদ উভয়কে শ্রুতি তুল্যরূপে প্রদর্শন করে না, কিন্তু অভেদকেই শ্রুতি আপনার প্রতিপাদ্যরূপে প্রদর্শন করেন, অতএব অভেদই পারমার্থিক"। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ভট্টভাস্করের ভেদাভেদমতের এবং শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত মতের মধ্যে পার্থক্য কিরূপ সামান্য। শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

কদর্শন।

হিরাক্লাইটাস্।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে হিরাক্লাইটাসের (Heraclitus) নাম উক্ত হইয়াছে। ইনি খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এফিসাস (Ephesus) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার উক্তি সমূহ প্রায়শঃ দ্ব্যর্থ-বোধক ছিল বলিয়া লোকে সহজে তাহার মর্ম্ম-গ্রহণে সমর্থ হইত না।

হিরাক্লাইটাস যাবতীয় বস্তুকে একই উপাদানের বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আনাক্সামিনিস (Anaxamenes) যেমন আদি উপাদানকে বায়ু বলিতেন, হিরাক্লাইটাস তাহা না বলিয়া বায়ু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর, অগ্নি, তেজ, অথবা অম্লজান বাষ্প তুল্য কোন পদার্থ মনে করিতেন। প্রকৃতির আদি-কারণভূত এই উপাদান পৃথিবীর শেষ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যেকোন বস্তু আমাদের নয়নগোচর হয়, সবই এক উপাদান-সম্ভূত এবং সেই উপাদানের সহিত পুনর্মিলনে যত্নবান। বস্তু মাত্রই অগ্নির বিকার, অথবা বিকার-প্রাপ্ত অগ্নি (Transformed fire)। অগ্নির একবার বিকৃতি ঘটিলে পুনরায় তাহার বিশুদ্ধি হয়। বায়ুমণ্ডল এবং সলিলরাশি উভয়ই অগ্নি, তবে সেই অগ্নির তেজ বা দাহিকা শক্তি হয় বিলুপ্ত হইতেছে ; না হয়, বিকৃতাবস্থা হইতে পুনরায় তেজঃসম্পন্ন হইতেছে। যাবতীয় কঠিন বস্তু লুপ্ততেজ অগ্নি ; নিয়তিবশে কখনও কখনও পুনর্ব্বার তাহারা বিশুদ্ধ হুতাশনে মিলিত হইবে। কোন এক শাশ্বত নিয়মের অধীন থাকিয়া জগতের তেজঃপুঞ্জ যথাক্রমে বাষ্প, বাষ্প হইতে সলিল এবং সলিল হইতে মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয় এবং রূপান্তরপ্রাপ্তির পর, ক্রমান্বয় আবার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই অনুলোম ও প্রতিলোম গতি সৃষ্টির বহির্ম্মুখীন ও অন্তর্ম্মুখীন, প্রকট এবং অপ্রকট অবস্থা। বিশ্বসংসার-পরিবর্ত্তনশীল অগ্নি, যাহা অনন্ত কাল ধরিয়া বিদ্যমান এবং যাহার অংশ মাত্র ক্ষণে ক্ষণে প্রজ্জ্বলিত এবং প্রশমিত হইতেছে। অনলের এই প্রকট এবং অপ্রকট অবস্থার কারণ, মানব বা দেবতা নহে। সাধারণতঃ যাহা ধ্বংস বা বিনাশ নামে উক্ত হয়, তাহার অর্থ এই যে, বস্তু সকল অন্তিমে আপনাপন তেজোময় অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং প্রত্যাবর্ত্তন মাত্র তাহাদের পুনর্জন্ম হয়। বিশ্বজনীন (Universal) জীবনের অর্থ এই যে, উহা সৃষ্টি এবং ধ্বংসের অনন্তলীলা। বিরাম,স্থিতি অথবা জীবন-সত্তা (Being) ইন্দ্রিয়সুলভ ভ্রমমাত্র। জগৎ নিত্যচঞ্চল। একস্রোতে দ্বিতীয়বার অবগাহন করা অসম্ভব, এমন কি, একবারও সম্ভব

নয়। কারণ, স্রোতের অংশবিশেষ লক্ষ্য করিয়া তাহা স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই স্থানচ্যুত হয়। সৃষ্টির নিয়মও সেইরূপ, পলকে প্রলয় ঘটিতেছে; দুই মুহূর্ত্তের অবস্থা এক হইতে পারে না। অনন্ত আবর্ত্তনের মধ্যে (Eternal whirl) জীবের চিহ্নিত অস্তিত্ব কিছুই নাই, আপনা হইতেই উহার উদ্ভব এবং তিরোভাব হইতেছে। জীবন ও মৃত্যুতে প্রভেদ নাই. উভয়ই এক, নচেৎ জীবন মৃত্যুতে, অথবা মৃত্যু জীবনে পরিণত হইতে পারিত না।

সৃষ্টির অবিরাম গতিকে নদী-স্রোতের সহিত তুলনা করা হইলেও সেই স্রোত অবাধ গতি নয়। প্রতিকূল স্রোতদ্বয়ের সঙ্ঘাতেই (Struggle between contrary forces) সৃষ্টি; এই দুই স্রোতের একটী নিম্নগামী, যাহাতে স্বর্গীয় অনলরাশি পার্থিব দ্রব্য সমূহে পরিণত হয়. অপরটী ঊর্দ্ধগামী, যাহা পৃথিবীস্থ বস্তুজাতকে অনলে পরিণত করিতেছে। বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত এই দুই স্রোতের নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষ হইতে প্রাণীসমূহ, উদ্ভিদ্-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি এবং মানব জাতির উদ্ভব। স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলনে জীবোৎপত্তি, কড়ি ও কোমলের সংমিশ্রণে সঙ্গীতলয়, পীড়া হইতে স্বাস্থ্যানুভূতি, পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম সুখলাভ, বিপদাশঙ্কা হইতে সাহস এবং পাপজয়ের নিমিত্তই ধর্ম্মের সম্ভব। যেমন জলের পরিণতি মৃত্তিকা, বায়ুর পরিণতি জল অগ্নির পরিণতি বায়ু; সেই রূপ, উদ্ভিদের পরিণতি ইতর প্রাণী, ইতর প্রাণীর পরিণতি মানব এবং মানবের পরিণতি দেবতা। যেমন পাপ হইতে পুণ্য জ্ঞান এবং পুণ্য হইতে পাপ জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ অনিষ্টের অভাব হইতে ইষ্ট জ্ঞান এবং ইষ্টাভাব হইতে অনিষ্টজ্ঞান জন্মে। একের অভাবে যখন অন্যের জ্ঞান হয় না, তখন পাপ পুণ্য, ইষ্টানিষ্ট, সুখ দুঃখ, ইহারা সকলেই আপেক্ষিক জ্ঞান (Relative knowledge)। বিরোধের অভাবে জন্মমৃত্যু অথবা সুখদুঃখাদি অসম্ভব হইত, এক কথায় সৃষ্টি লোপ পাইত।

হিরাক্লাইটাসের মতে সজীব নির্জ্জীব, পদার্থ মাত্রই নিত্যচঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সারবত্তা এবং জগতে প্রকৃত সুখ বা আদর্শ কিছুই নাই, অর্থাৎ জগৎ চিরদুঃখময়। এরূপ ধারণা নাস্তিকতা-মূলক। তাঁহার মত যে ভ্রমাত্মক, তাহার কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মাত্র নিত্যচঞ্চল হইলে, তৎসম্বন্ধে কোন স্থায়ী জ্ঞান জন্মিতে পারে না। তদ্ভিন্ন এমন কতগুলি জ্ঞান আমরা উপলব্ধি করি, যাহা শাশ্বত, যাহার হ্রাসবৃদ্ধি বা উৎপত্তি-বিনাশ নাই; উহা আজও যেমন আছে, কালও তেমনি থাকিবে। 'সত্য' চির কালই একরূপ। ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞান লাভের উপর হইলেও, উহারাই এক মাত্র উপায় নয়। বিচার বুদ্ধি দ্বারা শাশ্বত অস্তিত্বের জ্ঞান জন্মে, সৃষ্টি প্রবাহের আধার, ভিত্তি বা আশ্রয় স্বরূপ ঐশিক নিয়মগুলি প্রকাশ পায়। তবে, বিচারবুদ্ধির বলে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হইলেও মানবের জ্ঞান এবং ঈশ্বরের জ্ঞান স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। বাণর প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও সে যেমন মানুষের সমতুল্য হয় না, মানব প্রভৃতি জ্ঞানের অধিকারী হইয়াও, ঈশ্বর হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করে। হিরাক্লাইটাস্ সৃষ্টির স্থায়ী অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার যুক্তিবলে আইওনিয়ান দর্শনের অজ্ঞতা অনেক কাটিয়া গিয়াছিল। এই সময় হই-

তেই তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ আসিতে লাগিল। বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জানিবার অধিকার আছে কিনা, এবং সৃষ্টি-রহস্যের মীমাংসা সম্ভব কিনা, এই সকল প্রশ্নের উদয় হওয়ায়, কালক্রমে দর্শন শাস্ত্রে তর্কের প্রয়োজন হইয়াছিল।

দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, আত্মা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বা ব্রহ্মতেজ (Celestial Fire) হইতে উৎপন্ন, এবং সর্ব্বক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস ও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দ্বারা নূতনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সরস বীজের শুষ্কাবস্থা প্রাপ্তির নাম জন্ম। পৃথিবীর প্রচ্ছন্ন অগ্নিরাশি তরল-ভাবাপন্ন হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়, তাহা হইতে আত্মার সৃষ্টি। বাষ্প যত শুষ্ক বা নীরস হইবে, আত্মার শক্তিও তত বৃদ্ধি পাইবে। ব্রহ্মতেজের সহিত যাহার যত অধিক সম্বন্ধ, তাহার শারীরিক বল ও উৎসাহও তত অধিক। মৃত্যুতে জীবের প্রাণ বায়ু ক্রমশঃ মৃত্তিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

আধুনিক শারীর বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের যে অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইয়াছে, হিরাক্লাইটাসের দর্শনে তাহার অঙ্কুর দৃষ্ট হয়। তাঁহার দর্শন মত প্রকারান্তরে জড়বাদ, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি কোথায়ও জড় শব্দের ব্যবহার করেন নাই।

সংক্ষেপতঃ তাঁহার মন্তব্য গুলি এই ;— যবতীয় বস্তু উষ্ণ ও শুষ্ক কোন সূক্ষ্ম পদার্থ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জগৎ অবিরাম গতিশীল। অনন্ত সৃষ্টি প্রকরণে কোন বস্তুরই শাশ্বত অস্তিত্ব নাই। কেবল, যে সকল নিয়মের অধীনে সৃষ্টি সাধিত হইতেছে. সেই গুলিই চিরস্থায়ী, তাহাদের পরিবর্ত্তন মানব বা দেবতার সাধ্যাতীত।

পিথাগোরাস্ (Pythago.us)।

সৃষ্টিরহস্য-ব্যাখ্যা।

বহু অতীতের ঘটনা হইলেও পিথাগোরাসের নাম আজও সুপরিচিত। অনেকেই 'পিথাগোরিয়ান স্পেকুলেশনে'র (Pythagorian speculation) উল্লেখ করেন। তাহার কারণ, অন্যান্য গ্রীক পণ্ডিতাপেক্ষা তাঁহার সহিত প্রাচ্য ভূমির সম্বন্ধ অধিক ছিল। অনেকে তাঁহার উক্তিগুলি তাঁহার নিজের নয় বলিয়া সন্দেহ করেন, এবং পিথাগোরিয়ান সম্প্রদায় বলিয়া যে বিশেষ সম্প্রদায় ছিল, সে সম্বন্ধেও দ্বৈতমত আছে। এমন কি, আরিষ্টটল্ (Aristotle) স্বয়ংই এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেন। তিনি পিথাগোরিয়ান দর্শনেরই উল্লেখ করিয়াছেন; পিথাগোরাসের উপদেশ, এরূপ ভাষা প্রয়োগ করেন নাই। যাহা হউক, পিথাগোরিয়ান দর্শন নাম দিয়া গণিত শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যে প্রথম আবেগের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সামোস (Samos) নগরের গণিতশাস্ত্র-বিশারদ সেই মহামতি পিথাগোরাসের প্রতি আরোপিত হইয়া থাকে।

পিথাগোরাস্ থেল্সের ন্যায় আইওনিয়ন বংশোদ্ভব, এবং খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথমাংশে সামোসনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ফেরিসাইডিস্ (Pherecydes) এবং তৎপরে সম্ভবতঃ, বৈজ্ঞানিক আনাক্সিমাণ্ডারের (Anaximander) শিষ্য ছিলেন। প্রবাদ এই, তিনি ফিনিসিয়া (Phœnicia) ইজিপ্ট (Egypt) এবং ব্যাবিলন (Babylon) প্রদেশ পরিভ্রমণ করতঃ তথাকার প্রাচ্য ধর্ম্মশাস্ত্র এবং জ্যামিতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে উক্ত প্রদেশসমূহে জ্যামি-

তির প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৫২০ অব্দে তিনি গ্রীসে ফিরিয়া ক্রোটোনা (Crotona) নামক স্থানে ধর্ম্ম ও সমাজনীতি এবং দর্শনশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে নিজ মত প্রচারার্থ একটী সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন; উক্ত সম্প্রদায়ের মতের সহিত তাঁহার নিজ মতের প্রভেদ ছিল না।

বৌদ্ধমতের সহিত পিথাগোরিয়ান ধর্ম্মমতের ঘনি সম্বন্ধষ্ঠ দেখা যায়। বুদ্ধ এবং পিথাগোরাস্, উভয় নামের শব্দগত অর্থও এক, অর্থাৎ 'জ্ঞানী'। জগতের অসারতা, পুনর্জ্জন্ম, চিরকৌমার্য্য, কঠোর তপস্যা, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, আত্মশুদ্ধি, চিন্তা, সমাধি, অহিংসা, সর্ব্বজীবে দয়া, সত্যানুরাগ এবং ন্যায়, এ সকলই উভয়ের মূলমন্ত্র ছিল। পিথাগোরাসের শেষ জীবনের ইতিহাস পাওয়া যায় না, এমন কি, আরিষ্টটল্ও বিশেষ কিছু বলেন নাই। এই সকল কারণ বশতঃ পিথাগোরিয়ানিজম্ বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই নামান্তর বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। (Professor Thilly ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধের মতাবলী সন্ন্যাস-ধর্ম্মরূপে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে পশ্চিম প্রদেশ সমূহে প্রসার লাভ করে নাই।

পিথাগোরিয়ান অধ্যাত্মবাদ অঙ্ক শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, তজ্জন্য আইওনিয়ান দর্শন হইতে উহা সম্পূর্ণ পৃথক। মাইলেটাসের দার্শনিকগণ জড় উপাদান ও তাহার গতি লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিলেন; পিথাগোরাস্ ও তাঁহার অনুচরগণ উপাদানের জড় ভাগের প্রতি তাদৃশ আস্থা স্থাপন করেন নাই। যে শৃঙ্খলার উপর সৃষ্টি নির্ভর করে; যে ঐক্য, যে পরিমাণ, বিভেদের মধ্যে যে সামঞ্জস্য, বস্তুজগতের মধ্যে গণিতের যে সূক্ষ্ম সম্বন্ধ, তাহাই তাঁহাদিগের চিন্তার বিষয় ছিল। তাঁহাদের মতে জ্যামিতি, জ্যোতিষ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত বিষয়গুলি চরমে (ultimately) সংখ্যায় পরিণত হয় বলিয়া সংখ্যাই জগতের বীজশক্তি, সৃষ্টির গূঢ়তম কারণ, এবং বস্তুজাত সেই সংখ্যার অভিব্যক্তি। পদার্থ মাত্রই সংখ্যার্থ প্রকাশক এবং বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সংখ্যাগুলির ঐক্য সম্পাদন করা। অনন্ত সংখ্যামালা এবং প্রত্যেক স্বতন্ত্র সংখ্যার চিহ্ন বা প্রতিনিধি স্বরূপ জগতের বস্তুজাত একমাত্র মূল সংখ্যা 'এক' হইতে উৎপন্ন। সংখ্যা যেমন বস্তুর সারাংশ, সংখ্যার সারাংশ আবার মূল 'এক' বা ঐক্য (Unity)। পিথাগোরিয়ান সৃষ্টিতত্ত্বে দুই প্রকারের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা,—

(১) মূলসংখ্যা 'এক' (ঐক্য), যাহা হইতে অপর সংখ্যা সমূহ (বস্তুজাত) উৎপন্ন হইয়াছে; উহাকে অপ্রতিরুদ্ধ নিরপেক্ষ 'এক' (Absolute one), সৃষ্টির মূল বীজ কেন্দ্র (The monad of all monads) অথবা সর্ব্ব দেবতার দেবতা (God of all gods) বলা যায়; এবং (২) উৎপন্ন সংখ্যামালার আদি সংখ্যা 'এক', যাহা দুই, তিন বা বা চারি নয়, অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা সীমাবিশিষ্ট (limited)। এই সংখ্যাকে সাপেক্ষ 'এক' (Relative one) বলে, উহা সৃষ্টিবীজ কেন্দ্র (Created monad)। এতদ্ব্যতীত অপর সংখ্যা সমূহের (বস্তুজাতের), 'এক' ও 'বহু'র বিরোধ হইতেই উদ্ভব হয়। উষ্ণ ও শীতল, শুষ্ক ও সরস, পুরুষ ও স্ত্রী, সৎ ও অসৎ, অসীম ও সসীম প্রভৃতি সৃষ্টির যে বৈশাদৃশ্যভাব, তাহা এই 'এক' এবং 'অনেকে'র বিভিন্ন প্রকাশ। বহু,

একের সমষ্টি ; নিরপেক্ষ 'এক' এতদুভয়ের অতীত, উহাতে বহু ও এক, যুগ্ম ও অযুগ্মের বিবাদ নাই, অর্থাৎ উহা সৃষ্টির আদি কারণ রূপে বর্ত্তমান। এক, কারণ ; বহু কর্ম্ম। নিরপেক্ষ এক, যৌন-বিভেদের পূর্ব্বাবস্থা ক্লীবের ন্যায় বিরুদ্ধ শক্তি সমূহের অন্তর্লীন ভাব। গতি ও সৃষ্টি সম্বন্ধে পিথাগোরিয়ানদিগের মন্তব্য অনেকটা ইলিয়াটিক দর্শনের অনুরূপ। বিশ্বরচনা সম্বন্ধে উভয়ের স্বতন্ত্র মত থাকিলেও, বিশ্ব যে কালের অধীন এবং কোন সময়ে যে বিশ্ব ছিল না, একথা কেহই স্বীকার করেন না। জগৎ চিরকালই বিদ্যমান ; কেবল যে নিয়ম ও শৃঙ্খলার বশবর্ত্তী হইয়া বস্তুজাত আবহমান কাল হইতে উৎপন্ন হইতেছে, সেই নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রদর্শন করাই সৃষ্টি-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

পারমিনাইডিসের ন্যায় পিথাগোরিয়ান সম্প্রদায়ও বাহ্য জগতের গঠন ও অবয়বের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর স্থাপিত। যে ধ্রুব ঐক্যের স্ফুরণ বা জাগরণ হইতে জগতের সৃষ্টি, তাহা একটী নিটোল বর্ত্তুলরূপে কল্পিত হইয়াছে। উহা অনন্ত শূন্যে লম্বিত এবং উহার অংশ সকল পরস্পর গাঢ় সন্নিবদ্ধ। পূর্ব্বে যে 'এক' ও 'বহু'র দ্বন্দ্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা এস্থলে পূর্ণ' এবং 'শূন্যে'র দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশিত। সৃষ্টির পূর্ব্বে 'পূর্ণ' অবকাশ-বিহীন ছিল, অন্তত্য আকাশ ভাগ উহার বহির্ভাগে অবস্থিতি করিত। পরে যখন হইতে পূর্ণের উপর শূন্যের ঘাত প্রতিঘাত আরম্ভ হয়, তখন হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ (The formation of the cosmos begins by the void breaking in upon the full.) এই সৃষ্টি প্রকরণ যেন একটী অনন্ত শ্বাস-বায়ুর ক্রিয়া, যাহাতে জগৎ সর্ব্বক্ষণ স্পন্দিত হইতেছে। বীজকেন্দ্র স্বরূপ নিটোল বর্ত্তুলটীর মধ্যে অবকাশ প্রবিষ্ট হওয়ায় উহা শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং অসংখ্য সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক বিভক্ত অংশ বীজকেন্দ্রের এক একটী প্রতিকৃতি। জ্যামিতিক নিয়মানুসারে যেমন গুণ, সংখ্যা ও অবয়বে পরিণত হয়, সেইরূপ, উক্তরূপ বর্ত্তুলের চূর্ণ অংশগুলি, সংখ্যা ও অবয়বে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের কতকগুলি ষড়স্রক্ষেত্রে (cube) কতক পিরামিডক্ষেত্রে (tetrahedron) ও কতকগুলি গুলি অষ্টত্রিভুজাবচ্ছিন্ন ক্ষেত্র (octahedron), কতকগুলি বিংশ্রাস্রঘন-ক্ষেত্রে (icosahedron ও কতকগুলি দ্বাদশাস্রঘনক্ষেত্রের (dodecahedron) ন্যায়। অংশগুলি বিভিন্ন আকারে বিক্ষিপ্ত হইলেও 'একে'র আকর্ষণে ও জ্যামিতিক নিয়মানুসারে পাঁচটী প্রধান উপাদান সৃষ্টি করিয়াছে। এই পঞ্চ উপাদানের নাম মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়ু, জল এবং ঈথার। ইহাদের মধ্যে অগ্নি শ্রেষ্ঠ এবং পিরামিডাকৃতি কণা সমূহ গঠিত। উহাই ঐশিক বিধানের চিহ্নস্বরূপ, বিশ্বের কেন্দ্র স্থানীয়া এবং ঈশ্বরের লীলা-নিকেতন। উহার চতুষ্পার্শ্বে পৃথিবী এবং অপার্থিব বস্তু সমূহের দ্বারা গঠিত 'ঔরেনাস্' নামক বৃত্ত,চন্দ্র সূর্য্যাদি সমন্বিত 'কস্‌মস্' (Cosmos) বা জগৎ এবং নক্ষত্রপুঞ্জ বিশিষ্ট 'অলিম্পাস্' (Olympus) পরিভ্রমণ করিতেছে। পিথাগোরাস স্বয়ং পৃথিবীর কেন্দ্র স্বরূপ একটী অগ্নিময় গোলকের কল্পনা করিয়াছেন,তাহার যে অংশে মানবের বসতি, সেই অংশ উক্ত গোলকের

বিপরীত দিকে থাকায়, উহা দৃষ্টি-গোচর হয় না। পৃথিবী এই গোলকের চতুষ্পার্শে ঘুরিতেছে। কেন্দ্র হইতে বৃত্তিগুলির দূরত্ব ও আকর্ষণের সম্বন্ধ-বোধক সংখ্যা, বীণার তারের সহিত সুরের সম্বন্ধ-বোধক সংখ্যার সমানুপাতিক। বৃত্তি সকল মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে দ্রুত পরিভ্রমণ করে বলিয়া একপ্রকার ঐক্যতান সঙ্গীত উৎপন্ন হয়, তাহা সাধারণ লোকের শ্রুতিগোচর হয় না, কেবল মাত্র সঙ্গীতকলা-বিশারদ অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিই তাহা অনুভব করিতে সমর্থ। এই ঐক্যতানই জগতের প্রাণ। জীব সমূহের যাহার উপর এই বিশ্বসঙ্গীত যতটুকু প্রতিফলিত হয়, জীবনে সে সেই পরিমাণে উৎকর্ষলাভ করে। বিন্দুর ন্যায় অবস্থিত প্রাথমিক জীবশক্তি ক্রমে রেখায় পরিণত হয়, রেখা হইতে ক্রমশঃ জীবস্তরের সৃষ্টি, জীবস্তর হইতে দেহের গঠন এবং দেহ হইতে সুখদুঃখাদি বোধ এবং বুদ্ধিবৃত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে।

উপাদান সমূহের অস্থায়ী সম্মিলন হেতু জীবদেহ নশ্বর। নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রান্ত হইলে, যে যে উপাদানে দেহটী গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের অনুপাতের হ্রাস বৃদ্ধি বশতঃ পীড়া এবং মৃত্যুর সঙ্ঘটন হয় স্থূল দেহের অবস্থা এইরূপ হইলেও, সূক্ষ্ম দেহ বা আত্মার বিনাশ নাই। জীবাত্মা জগতের আত্মার এক একটী অংশ বা সংখ্যা, ব্রহ্মতেজের এক একটী স্ফুলিঙ্গ, ঈশ্বরের অংশ বিশেষ। আধ্যাত্মিক ভাবে জীব অমর। মৃত্যুতে মানবের আত্মা, হয় বর্ত্তমান জীবন অপেক্ষা উৎকর্ষ, না হয় অবকর্ষ লাভ করে; কর্ম্মফল এই অবস্থাভেদের কারণ। ঈশ্বরানুধ্যানে যাহার জীবন অতিবাহিত হয়, তাহার আত্মার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, কেবল মাত্র সংসারাসক্তিতে উহার অবনতি ঘটে, এবং স্বার্থ-পরতায় বর্ত্তমান জীবনের ন্যায় একই ভাব থাকে।

পিথাগোরিয়ানেরা যদিও পারমিনাইডিস্ এবং হিরাক্লাইটাসের ন্যায় সৃষ্টির উপাদানের একটীকেই বড় করিয়াছেন এবং তাহার ফলে, আধ্যাত্মিক আদর্শকে বড় করিতে গিয়া, ব্যক্তিগত অস্তিত্বের অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের দ্বারা যে গ্রীকদিগের চিন্তাস্রোতে একটী অত্যাবশ্যকীয় নূতন ঢেউ উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন হইতে নিত্যচঞ্চল সৃষ্টিপ্রকরণ বা জন্মলাভের অর্থ কি, এবং উহার সহিত ইলিয়াটিক দর্শনোক্ত উপাদানের চিরস্থায়িত্ব বা অপরিবর্ত্তনীয়তার সম্বন্ধ কিরূপ, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। পিথাগোরিয়ানদিগের পরবর্ত্তী দর্শনমত সমূহে এফিসাস্ এবং ইলিয়ার দর্শন মতের ঐক্য সম্পাদনের জন্য একটী চেষ্টা লক্ষিত হয়। চিন্তার ফলে পরমাণুবাদের ভিতর হইতে এমন একটী সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যদ্দ্বারা জন্ম পর্য্যায়ের একপ্রকার সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতে স্থূল ও সূক্ষ্ম, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় অংশই গৃহীত হয়। যথাস্থানে উহার আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

সমাজ-সমস্যা।

সাহিত্য।

কোন দেশের সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্পর্ক কেবল দন্ত্য 'স'এ নহে, ওষ্ঠে-পৃষ্ঠে-ললাটে। সমাজের সুর সাহিত্যের তারে বাজিয়া উঠে, আবার সাহিত্যের তালে তালে সমাজ নাচিতে থাকে। মানুষের চিন্তার ধারা কর্ম্মের রেখা টানিয়া চলিয়া যায়, কর্ম্মের স্পন্দনে ও চিন্তার পরলে পরলে রাগরাগিণীর মূর্চ্ছনা খেলিতে থাকে। এমন যোগবন্ধন তোমার আমার মুখের কথায় ভাঙ্গেও না, গড়েও না। উহা সত্য, যে খুঁজিবে, সেই উহার সন্ধান পাইবে। চিন্তা কার্য্যের জননী ; অতএব চিন্তার ও ভাবের উদ্দীপনা পরোক্ষে কর্ম্মের সূত্রপাত করে মাত্র। সাহিত্য যদি মানুষের মনে উদ্দীপনা ও উত্তেজনা আনে, যদি ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, যদি আশার বাণী শুনায়, যদি নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলে, যদি সুপ্তবৃত্তির উদ্বোধন করে, যদি প্রবৃত্তির তীব্রতা লঘু করিয়া শান্তির কৌমুদী ছটায় হাসে, তাহা হইলে জীবনের চেষ্টা, উদ্যোগ ও ক্রিয়াশীলতার অন্তরালে সাহিত্যের প্রেরণার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

জগতের সাহিত্যের ইতিহাস ধরিয়া বিচার করিলেও আমরা ঐরূপ সিদ্ধান্তই প্রাপ্ত হই। আমার মস্তিষ্কে যে স্থানের যে স্নায়ুগ্রন্থির স্পন্দনে যেরূপ চিন্তাস্রোতের উদ্ভব হইবে, উহা শব্দের আকারে আকাশ কম্পিত করিয়া বহু স্থানে বহু মস্তিষ্কের স্নায়ুগ্রন্থিতে অনুরূপ স্পন্দন সৃষ্টি করিয়া, সেই ভাব সংখ্যার অসংখ্য গুণিতক উৎপাদন করিবে। সে স্পন্দনের গুরুত্বে হস্ত চলিবে, চরণ চলিবে, হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপিবে, রসনা নড়িবে, অশ্রু বহিবে, হাস্যে আস্য উদ্ভাসিত হইবে। অতএব কথা অর্থহীন নহে, চিন্তাও নিষ্ফলা নহে ; সাহিত্য স্বতন্ত্র, ভাবময়, নিরবলম্ব ও নিষ্ফল হইবে কিরূপে ? তাই সাহিত্য অতীতে জাতীয় ইতিহাসে অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে। রাষ্ট্র-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব ভাব ও ভাষার ঝটিকা সম্মুখে করিয়া চিরদিনই জন-সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা কোন দেশের রাষ্ট্রক্রান্তি, ধর্ম্মক্রান্তিও সমাজক্রান্তির কারণ অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সেই দেশের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সাহিত্য আশ্রয় করিয়াছেন।

অতএব মানব মনের বৃত্তি, ভাব, কল্পনা, উচ্ছ্বাস, ইচ্ছা ও বাসনায় শৃঙ্খলা ও সংযমের প্রয়োজন থাকিলে, সাহিত্যেও সংযমের প্রয়োজন আছে। মানুষের গতিবিধি ও চেষ্টার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সমাজ অনুমোদন করিলে, সাহিত্যেও অবাধ স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। স্বাধীনতা আমাদের বৃত্তিনিচয়ের বিকাশের অনুকূল, সংযম-শাসন-দমন-নিরোধ চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে বাধা প্রদান করে, ইহাই আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের মত। যেখানে বাধা, যেখানে সঙ্কোচ, যেখানে ভয়, যেখানে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা, সেখানে আমাদের ভাব পরিস্ফুট হয় না।

ভক্তিশ্রদ্ধা-প্রেম-দয়া-মায়া-স্নেহ-মমতা স্বাভাবিক বৃত্তি। কেহ বলপূর্ব্বক আমার শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে না, আমার হৃদয়ের উপর সৈন্যসামন্ত তোপতিরন্দাজ লইয়া কেহ সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারে না। কামধেনু দোহন করিয়া, অনেক আয়োজন সাধ্যসাধনা করিয়া, খাদ্যজল যোগাইয়া, প্রতিভার নিকট হইতে সৎসাহিত্যের ক্ষীরনবনীত আদায় করিতে হয়। প্রতিতাকে আমরা কঠিন নিগড়ে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিলে, তাহার জন্য সমাজ-বন্ধনের বিধি ব্যবস্থা করিলে, তাহাকে দেশাচার, লোকাচার ও নীতির শাসনের অধীন করিয়া রাখিলে,তাহার শক্তি পরিস্ফুট হইতে পারিবে না, তাহার আগুন নিভিয়া যাইবে সত্য; কিন্তু প্রতিভাকে আমরা নিগ্রহ-নির্য্যাতনে জ্বালাতন করিলেও, তাহাকে চাপিয়া দম বন্ধ করিয়া বধ করিতে চাহিলেও, তাহার শক্তি যখন সাধারণ ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিবে, তখন প্রতিভা সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন আপনার তেজে ভস্মীভূত করিয়া স্বাধীনতার নিশান তুলিয়া দিয়া জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে। এজন্য সমাজশক্তি সংগ্রামে প্রতিভাশক্তির নিকট পরাস্ত হইয়া সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিয়া অনুশাসনের সংশোধনী টীকায় লিখিয়া রাখিয়াছে,—

"তেজীয়সাং ন দোষায়।"

কিন্তু প্রতিভাকে প্রতিভা বলিয়া সহজে কেহ স্বীকার করে না। প্রতিভা জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে তাহার জনকজননী বন্দিশালে কয়েদী। জন্মমাত্র ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া, সাপের ফণা আশ্রয় করিয়া, শিবা সঙ্গী করিয়া নদী সাঁতরাইয়া প্রতিভাকে রক্ষা না করিলে তাহার আপনার জন সমাজকংসের হাতে তাহার অপমৃত্যু নিশ্চয়। গোকুলেও প্রতিভার শান্তি নাই, সেখানে তাহাকে গরুচরাইতে হইবে, যশোদার-বন্ধনে কাঁদিতে হইবে, পূতনা-বকাসুরের সহিত যুঝিতে হইবে, কালীয়দহে ডুবিতে হইবে, গোবর্দ্ধন গিরি ছাতার ন্যায় মাথায় ধরিতে হইবে, তবে সে প্রতিভার পরিচয় ও Recognition. কেবল বাঁশী বাজাইয়া, গোপললনাগণের মন মজাইয়া কদমগাছে বসন চুরি করিয়া, ক্ষীরসরনবনীত অপহরণ করিয়া জগতে প্রতিভার পরিচয় কখনও হয় নাই, হইবেও না। কংসের বিধান তাহাকে বাঁধিতে পারে নাই, যশোদার শাসন তাহাকে দমাইতে পারে নাই, অসুরের শক্তি তাহাকে বধিতে পারে নাই, শিশুপালের অপবাদ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তবে সে প্রতিভা পাঞ্চজন্য বাজাইয়া সমর কোলাহলের শোণিতাসরে গীতার বেদ প্রচার করিতে পারিয়াছিল। প্রতিভা সমাজ-ধর্ম্মনীতির শাসন উপেক্ষা করিয়া সকলের শিখরে দাঁড়াইয়া শক্তির জয় ঘোষণা করিলেও তাহার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ভাষায় ব্যক্ত করিয়া দেয়,—

ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

কেহ দ্রৌপদীর বসনাকর্ষণ করিলে, কেহ কাহারও স্বত্ব ও অধিকার হরণ করিলে, কেহ নিরীহ, নিদ্রিত, শান্তিপ্রিয় সংসারে আগুন জ্বালিয়া দিলে, প্রতিভা কূটনীতি ও রাজনীতি অবলম্বন করিয়া তাহার বক্ষের উপর রথচক্র চালনা করিবে। দেশের সমাজ ও নীতি, সংস্কার ও শাসন প্রতিভাকে আড়ষ্ট করিয়া মুষ্টিমধ্যে না রাখিতে পারিলেও, এই শিক্ষা তাহার প্রকৃতিতে মুদ্রিত করিয়া দেয়। প্রতিভা সসীমের গণ্ডীর মধ্যে

অসীম অনন্ত লীলা দেখাইয়া জগতের মানব-সমাজকে চমৎকৃত করে। অতএব স্কুল-মাষ্টারের হাত হইতে প্রতিভার নিস্তার নাই। দুর্য্যোধন, শিশুপাল, রাবণ, কংস, বৃত্রাসুর শক্তিশালী, সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহারা প্রতিভা নহে। তাহারা স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু প্রতিভার মত স্বাধীন নহে। তাহাদের আদর্শ ও শক্তির ফল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিভার পরিচয় কল্পান্তস্থায়ী। পুরাণে ও ইতিহাসে আমরা জাল গৌতম, জাল রাজা ও জাল প্রতাপ-চাঁদের কথা শুনিয়াছি। প্রতিভারও নকল আছে, তাহারা নটের ন্যায় প্রতিভার অভিনয় করিয়া চন্দ্রের আলোকে খদ্যোত বিকাশের ন্যায় মলিন হইয়া যায়, এবং কেবল অরণ্যের আঁধারেই শোভে ভাল। প্রতিভার স্বাধীনতা তাহার অন্তর্নিহিত দুর্দ্দমনীয় শক্তির ফল স্বরূপ; কিন্তু নটের স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার বিদ্রোহী প্রবৃত্তির তাড়না-সম্ভূত।

প্রতিভার দান সাহিত্য। দেবশক্তি আসুর শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া যখন জয়লাভ করে, তখন ঋষিরা বেদ মন্ত্রের স্তুতিগানে সাহিত্যের ভিত্তি গঠন করেন। দেবদূত আসিয়া তখন ঋষিদিগের বস্তু-নির্দ্দেশ করেন;* বাগ্দেবী বীণাপাণি আসিয়া তখন ঋষিদিগের কণ্ঠে বিরাজ করেন; তখন দয়ায়, প্রেমে, করুণায়, মাধুর্য্যে, পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়া ঋষিরা বেদধ্বনি করেন। সেই বেদগানের কাণ্ড আশ্রয় করিয়া উপনিষদের জ্ঞান, রামায়ণের গান, গীতার উপদেশ, মহাভারতের কথা যুগ যুগ ব্যাপিয়া জনমণ্ডলীর চিত্তরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। গুরুর শাসন, সমাজ বন্ধন, লোকের সমালোচনা, ধর্ম্মের শিক্ষা ঐ সাহিত্যের অস্থি-মজ্জামেদমাংস, দেহের দেহ, প্রাণের প্রাণ বলিয়াই উহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ চতুষ্টয় ব্যাপিয়া অসুরের অত্যাচার সহিয়াও বাঁচিয়া আছে। কৃত্রিম প্রতিভা বিশ্বামিত্রের ন্যায় কৃত্রিম জগৎ সৃষ্টি করিতে যাইয়া চির দিনই জগতে বিফল হইয়াছে। দৈত্য-রাজের গুণ শুক্রাচার্য্যের প্রতিভা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু বৃহস্পতির প্রতিভা জগতে চিরকাল স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া জীবিত থাকিবে। তাহার কারণ দেবগুরু দেবনীতি ও সমাজ শাসন মানিয়া নিবৃত্তি মার্গের সাধনা ব্যখ্যা করিয়াছেন; দৈত্যগুরু তাহা করেন নাই, তাঁহার সাধনা স্বেচ্ছা-চারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে প্রবৃত্তির বিকাশ বা বিকার। সকল দেশে, সকল যুগে প্রতিভার আবির্ভাব হয় না। কিন্তু আমরা শিক্ষকের শাসনের সীমার মধ্যে অকৃত্রিম প্রতিভার উদয়ের জন্য সমাজে আয়োজন করিয়া রাখিতে পারি, গৃহে গৃহে পবিত্রতার হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে উদার শিক্ষার আহুতি প্রদান করিতে পারি, প্রতিভা প্রদর্শিতমার্গানুসরণ করিয়া শক্তি ও সাধনানুযায়ী সাহিত্য-সেবা করিতে পারি, আর সম্মার্জ্জনী করে লইয়া সাহিত্যের দেবমন্দির হইতে ছদ্মবেশী কৃত্রিম প্রতিভা ও অপবিত্রতার আবর্জ্জনা দূর করিতে চেষ্টা করিতে পারি।

আমাদের আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যের ইতর সেবকগণের জন্য বিধিনিষেধ ব্যবস্থা করিয়া স্কুল মাষ্টারের কর্ত্তব্য করিয়াছেন। আমাদের লোকমত ও সামাজিক সংস্কার

---

* "রামস্য চরিতং কৃতস্নং কুরুত্বমৃষিসত্তম।"

রামায়ণম্।

অপ-প্রতিভার অত্যাচার হইতে এতকাল সাহিত্যের প্রাণরক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লব বিধিনিষেধ উল্টাইয়া দিয়াছে, সাহিত্য শাসনসীমা অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার পথে দাঁড়াইয়াছে। এখন সত্য নির্ণয় করা কঠিন; তার্কিক ও ব্যবহারজীবের হস্তে সাহিত্য কূটতর্ক-দুষ্ট ও জটিল যুক্তিজালে আবদ্ধ হইয়া পঙ্কিল সলিলের ন্যায় আবিল হইয়া পড়িতেছে। সাহিত্যের প্রভাবে সমাজও টলিতে আরম্ভ করিয়াছে। লোকমণ্ডলীর প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তির পরিণতি সাহিত্যে; পক্ষান্তরে সাহিত্যে লোকমত গঠন করিয়া মানব চিত্তবৃত্তি নূতন পথে পরিচালিত করে। আমরা স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া পিতা মাতার, শিক্ষক অভিভাবকের, গুরু পুরোহিতের, রাজবিধি ও দণ্ডনীতির, ধর্ম্ম ও সমাজ-শাসনের শিষ্য হইয়া মানব-সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছি। উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে, বলিতে, কহিতে, খাইতে, শুইতে, ভাবিতে, চিন্তিতে, এমন কি স্বপ্ন দেখিতেও আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আজন্ম শিক্ষা, জন্মজন্মান্তরের সংস্কার এবং বংশ পরম্পরাগত বহু পুরুষের শিক্ষা ও সাধনার ধারা লোকমতের পশ্চাতে পশ্চাতে গুরু মহাশয়ের ন্যায় আমাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। তথাপি যদি আমরা স্কুল-মাষ্টারীর ভয়ে স্বাধীন সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার অবাধ প্রকাশ হইতেছে না বলিয়া আপসোস করি, তাহা হইলে, আমরা বুদ্ধিমান, সন্দেহ নাই।

সংস্কৃত সাহিত্যের যুগ অতীত হইলে,

হিত হইল, সমাজে কতক পরিমাণে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার স্রোত প্রবাহিত হইলে, প্রতিভার নিরঙ্কুশ বিকাশের ফলে আমরা বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু ধর্ম্মশাসনে সংযত কবিকঙ্কণের প্রতিভা যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল, ভারতচন্দ্র তাহা অনুসরণ করিয়া বিহ্লণের সংস্কৃত ও হিন্দীর বিকৃত ভাব বাঙ্গালায় আমদানী করিয়া রায়গুণাকরের অমর পদবী ও অনন্ত যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সে কালের সমাজের রুচি তাঁহার লেখনীর আদর করিয়াছিল, সমাজরাশির এক ভগ্নাংশ এখনও তাঁহার অপূর্ব্ব বিপরীত-বিহার-বর্ণনার সমাদর করে। সমাজ তাঁহার লেখনীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাঁহার ভাষাও সমাজের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে শিশুবোধকের সহিত প্রতি বৎসর কত সহস্র 'বিদ্যাসুন্দর' বটতলা হইতে বঙ্গের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইত, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাহা অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবেন। যে প্রতিভা Bride's confession রচনা করে, বিপরীত বিহার প্রসব করে, Don Juan কল্পনা করে, Tom Jonesকে সাজাইয়া বাহির করে, তাহাতে কলা-কৌশল আছে, রুচিও আছে। কিন্তু যে প্রতিভা রামায়ণ গায়, মহাভারত লেখে, শকুন্তলা গড়ে, হ্যাম্লেট রচে, তাহার রুচিও হীন, কলা-কৌশলও হীন! যেহেতু উহা সকল প্রকার বাঁধন ও শাসন মানিয়া চলিয়াছে!! উদ্দেশ্য লইয়া যে প্রতিভা কল্পনা ও রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতাকে উদ্দেশ্যের পদানত করিয়া রাখিতে হয় এবং উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যাবতীয় বহিঃশক্তির শাসন মানিয়া

চলিতে হয়। যাহারা সখের প্রাণ গড়ের মাঠ লইয়া কবিতায় 'lisp' করে, কেন না কবিতা আপনা আপনি আসে, তাহাদের প্রতিভার তুলনা তাহারাই এ জগতে! বাঙ্গালা সাহিত্যে যখন ভাসান গান হইত, ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইত, ভাগবত পাঠ হইত, কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস ভাষার সেবা করিতেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেমের ঢেউ দেশ মাতাইত, তখন উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ স্বাধীনতা মাত্রা ডিঙ্গাইতে পারে নাই। তখন সমাজ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন, নিষ্প্রভ, মলিন হইয়া পড়ে নাই। তখন হরির গানে ও যাত্রার সঙে লোকের রুচি হইত, সঙ্গে সঙ্গে কবি এবং তর্জ্জাও মান পাইয়াছিল। কবি ও ঢপ এখন পাততাড়ী গুটাইয়া পথ দেখিতেছে। কবিতে মিহি মোটা, দুই রকম মশলাই ছিল, কিন্তু ভোরের সময় যখন দলের সর্দ্দার গোষ্ঠগান ধরিত, তখনই আসর মাৎ করিয়া ফেলিত। কবির দলের সরকারের বাহাদুরী ও প্রতিভার বড়াই বুঝা যাইত, তাহার 'জবাবে' ও গোষ্ঠগানে। ইতর শ্রেণীর লোকেরা মোটা ধরিলে গোপে তা দিয়া উঠিয়া বসিত। কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ীতে বারইয়ারীর হাটুরীয়া বাজারী কবির মোটা গান গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত, সেখানে যে বালক বালিকা ও কুললক্ষ্মীরা উপস্থিত। কিন্তু আজকাল আমরা কুললক্ষ্মীদের সে মর্য্যাদা আর রাখিতেছি না। আমরা এখন 'রেনল্ড্‌স্‌' পড়িয়া, 'মিস্‌টরিজ' বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া, ইবসেন্‌, টুর্গিনিফ্‌ ও নিটশে অনুকরণ করিয়া,* রুশের দৃষ্টান্তে সাহস পাইয়া, স্কুল-মাষ্টারী সাহিত্যকে বিদ্রূপ করিয়া, 'বিপরীত বিহার', 'ডনজুয়ান', 'টমজোনস্‌, ও 'ব্রাইডস্‌ কন্‌ফেশন্‌' আদর্শ করিয়া, বৈষ্ণব কবি কীর্ত্তনের দোহাই দিয়া, দাড়িম্ব-নিন্দিত, কদম্ব-লাঞ্ছিত, যুবজন-বাঞ্ছিত পীনপয়োধর, যুগল যষ্টির সাহায্যে অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া পুত্র-কন্যা-জননী-দুহিতার সম্মুখেই সৎ সাহিত্যের রস সম্ভোগ করি এবং তালাভাঙ্গা সিঁধেল চোর আনিয়া বন্ধুর ঘরে বাটপারি দেখাইয়া নিরঙ্কুশ প্রতিভার জয় ঘোষণা করি। আমাদের সমাজের শরীরে অনেক সয়, তাই আমাদের সাহিত্য এখনও পঞ্চত্ব প্রায় নাই। বঙ্গদর্শনের ও বান্ধবের মাষ্টারী আর দেখিতে পাই না। সাধারণীর অক্ষয়চন্দ্র শাসন-দণ্ড ছাড়িয়া ম্যালেরিয়ায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, বিদ্যাবিশারদ বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, বৃদ্ধ নব্যভারত ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে, বিদ্যাবিনোদ বাল-সাহিত্য সমালোচনা-বিব্রত, সঞ্জীবনী এখন দশনবিহীন, বসুমতীর আপন বাচন দায় হইয়াছে, অতএব সাহিত্যে স্কুল-মাষ্টারী আর চলিতেছে না। তাই অপ-প্রতিভার আবির্ভাবে কলাকৌশলের ও-রচনাচাতুর্য্যের প্রভাবে সাহিত্যের ভরা ডুবু ডুবু হইয়াছে। ব্যবহারজীব দণ্ডবিধি জানিয়াও অপরাধীর পক্ষ সমর্থন করিতে পটু। বিচারকের কর্ত্তব্য সত্য নির্ণয় করা, সন্দেহ উৎপাদন করিয়া আসামীকে 'benifit of doubt' দেওয়াই উকীল ব্যারিষ্টারের প্রাপ্ত অর্থের প্রতিদান! সাহিত্যে আজকাল সফিষ্ট্রি আরম্ভ হইয়াছে, সমাজেও যে তাহার ছায়া প্রতিফলিত হইতেছে না, এমন বলিতে পারি না। কিন্তু এই সকল অপ-

---

* Turgenieff, Dostoieffsky, Tolstoy, Byornson, Ibsen.

Nietzche—"a Prophet of wrath, a man-hater at war with his age" The English Review, May, 1915.

প্রতিভার কলাকৌশল কালের বিচারে টিকিবে কি ?

রামায়ণের বীজমন্ত্র গুরু নারদ বাল্মীকির কাণে দিয়াছিলেন; সেই গুরু শাসনের গুণে আজও উহা ভাষান্তরিত হইয়াও কোটি কোটি নরনারীর প্রাণে শান্তি আনয়ন করিতেছে। কেমন করিয়া রাবণ সীতাদেবীর অঙ্গের বসন খুলিয়া ফেলিয়াছিল, কেমন করিয়া দুঃশাসন দ্রৌপদীর লোভনীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লোক-চক্ষুর সম্মুখে উলঙ্গ করিয়াছিল, কেমন করিয়া 'পর্ব্বতের ঝোরে' রম্ভাবতী সতীকে রাবণ-শ্বশুর অপমানিত করিয়াছিল, কেমন করিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সহস্র হস্তে সহস্র রমণী ধারণ করিয়া জলকেলী করিয়াছিল, কেমন করিয়া পরচুলা পরিয়া উপযুক্ত শিষ্য নন্দনবিহারী দেবরাজ গুরুপত্নীর যৌবন লুঠিয়া লইয়াছিল, কেমন করিয়া কামপীড়িত ঋষিকুমার পতিপুত্রের সম্মুখে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত বলপূর্ব্বক বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কেমন করিয়া পরাশর মুনি ধীবর-নন্দিনীর সহিত কোয়েল নদীবক্ষে খেয়া নৌকায় প্রেমনাট্যের অভিনয় করিয়াছিলেন, কেবল তাহাই যদি ব্যাসবাল্মীকি রঙ ফলাইয়া কলাকৌশলের সাহায্যে বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে রামায়ণ মহাভারত বহু পূর্ব্বেই বল্মীকের গর্ভসাৎ হইত। চতুর ভারতচন্দ্র তাহা বুঝিতেন বলিয়াই বিদ্যাসুন্দরকে অন্নদামঙ্গলের গর্ভাঙ্কে স্থান দিয়া গিয়াছিলেন। দেবীভক্তির শৈলশিখরে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর গৃহে আজও বিপরীত-বিহার বিরাজ করিতেছে।

বঙ্কিম ও মধুসূদন নিজের জীবনে যাহাই করুন, সমাজের ও দেশের মঙ্গল সর্ব্বদা অনুধ্যান করিতেন বলিয়া সাহিত্যের আদর্শ মলিন হইতে দেন নাই। তাই তাঁহারা রচনায় প্রতিভার পশ্চাতে দণ্ড হস্তে গুরু মহাশয়ের অবস্থিতি অনুভব করিতেন এবং বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন ও কালীপ্রসন্নের বান্ধব অপরের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়া নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার বেগ রোধ করিতে চেষ্টা করিতেন।

সমাজ হইতে সাহিত্যকমল যেমন আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে, সাহিত্যও তেমনি সমাজকে আপন ভাবে অনুপ্রাণিত করে। ইংরাজী সাহিত্য পড়িয়া আমাদের মনে কি পরিবর্ত্তনতরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহা আমরা জানি। আচার্য্য কারলাইল কুগ্রন্থ অসৎ সঙ্গের ন্যায় পরিহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। প্রতিভার বিকাশ যদি মানুষের অসৎ সঙ্গ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে, সে প্রতিভাকে সূতিকা-গৃহে লবণ প্রয়োগে নিঃশেষ করিয়া পেনালকোড অনুসারে দণ্ডিত হওয়াও বরং শ্রেয়ঃ। মন্ত্রের প্রভাবে দেবতারা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া আমাদের গৃহের কোণে দাঁড়াইতে বাধ্য হন, শব্দের শক্তি তুচ্ছের নহে। একটী কথায়, একটী দৃষ্টান্তে, একটী শব্দে, একখানি ছিন্ন পত্রের একটী কবিতায় মানবের জীবনের স্রোত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। উপনিষদের একখানি ছিন্নপত্র দেবেন্দ্রনাথের মনে ভাবান্তর আনিয়াছিল। লোকমুখে শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কোন একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি আসিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মহাশয় সুখ কিসে ?' তিনি অসাবধানতার সহিত হঠাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, 'সুখ মরণে !' সেইদিন সেই উন্মত্ত যুবক গুরুবাক্য শিরো-

ধার্য্য করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিল অতএব সমাজের উপর সাহিত্যের ছায়া কি পরিমাণে পড়িয়াছে, তাহা যাঁহারা সমাজের ও মানব-মনের গতি বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন।

রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাণে সাহিত্যের যে নূতন সুখের রস সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাতে কি আর তাহাদের রুচিতে 'পাষাণী','চোখেরবালী' ও 'ঘরে বাইরের' সুর সহজে জমিতে পারে? কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই; ক্রমে মার্জ্জিত-কুশাগ্র-তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অহঙ্কার-শিখরও শিক্ষার অভিমানমঞ্চ হইতে সমাজের মস্তকে পুনঃ পুনঃ অপপ্রতিভার বিকৃতসাহিত্য-রসের অজস্র ধারা বর্ষিত হইতে থাকিলে আশা আছে, নবীনযুবক সম্প্রদায় ও কুলবধূরা অনতিবিলম্বে আদর্শ প্রৌঢ়প্রৌঢ়াদিগের সহিত নূতন রসের রসিক হইয়া সাহিত্যকলার মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারিবে! যাঁহারা কবি গোবিন্দদাসের 'উলঙ্গ রমণী' ও 'আমারি কি দোষ' পড়িয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনায়াসে তদপেক্ষা ভীষণতর সাহিত্য-রস রচনাচাতুর্য্যের লোভে গলাধঃকরণ করিতেছেন দেখিয়া একদেশদর্শিতার অথবা রুচি-বিকারের সন্দেহ সহসা মনে জাগিয়া উঠে। আমিষ ও নিরামিষ রন্ধন পারিপাট্যে মুগ্ধ হইয়া মার্জ্জিত-রুচি শিক্ষিত মহোদয়েরা ক্ষীরসরছানা ফেলিয়াও ষাঁড়ের গোবর উদরস্থ করিতে লালায়িত! গ্রীস ও ইটালীর নগ্ন-সৌন্দর্য্য আরও অধিকতর নগ্ন হইয়া আমাদের প্রাচীন চিত্রে ও তরুণী-শিল্পে, উড়িষ্যার মন্দিরে ও ধনীর সৌধে আজও বিরাজ করিতেছে। আমরা যদি লক্ষ্যহীন আদিরসাত্মক রচনাচাতুর্য্য সমাজকে উপহার দিয়া সাহিত্যসাধনা সফল হইতেছে, মনে করি, তাহা হইলে আমরা নিজেও প্রতারিত হইব এবং পাঠকদিগকেও প্রতারিত করিব।

সাহিত্য সত্য, শিব, সুন্দর, আনন্দময়। যে সাহিত্যে সত্যান্বেষণ নাই, যে সাহিত্য আত্মার কল্যাণ, দেশের মঙ্গল ও দশের উপকার সাধন করে না, যে সাহিত্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে না, সে সাহিত্য অপকৃষ্ট। সত্য লইয়া বিবাদ চলিতে পারে, মঙ্গল লইয়া বিতর্ক হইতে পারে, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে; কিন্তু সাধনাপূত, ঋষিকল্প, দূরদর্শী, সিদ্ধ-সাহিত্য-সেবকের নিকট শুদ্ধ সত্য, প্রকৃত মঙ্গল, নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য ও অপ্রতিহত অনাবিল আনন্দধারা স্বতঃই প্রতিভাত হয়। অপরের আবিল মনের মলিন দর্পণে যে প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট ও অদৃশ্য, নৈষ্ঠিক সাধকের স্বার্থশূন্য স্বচ্ছ হৃদয়ফলকে তাহা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। একজন একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া যাহা বুঝিতে পারেন না, দশজন সচ্চরিত্র ব্যক্তির মত লইয়া বিচার করিলে হয়ত কোন কোন সময় তাহার সমীচীন মীমাংসা হইতে পারে। সংযম ও শিক্ষার দ্বারা, চিত্তশুদ্ধি ও বিকারশূন্যতার দ্বারা, স্বাস্থ্য-পরিশ্রম-একাগ্রতা-দ্বারাও পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদে মন প্রস্তুত হইলে, সত্যের বাণী আমাদের অন্তরে আসে। প্রতিভার নিকট ঐ বাণী অতি স্পষ্ট, উহাই প্রতিভার আদেশ বা inspiration. যাহা সত্য তাহাই সুন্দর, মঙ্গলময় ও আনন্দজনক। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রের সুখ আনন্দ নহে; ভোগের তৃপ্তি, কামের বিষয়, বিলাসের বস্তু আনন্দ আনিতে পারে, কিন্তু

তাহা ক্ষণিক ও পরিণাম-বিরস। সমাজের ও ব্যক্তির জীবনে তাহার ফল আনন্দজনক নহে। চার্ব্বাক যাহা প্রচার করিয়াছেন, জগত তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই। সাহিত্যে যদি আমরা নিন্দিত সুখের, ইন্দ্রিয়ের চপলতার ও বাসনার উদ্দীপনার বীজ বপন করি, তাহা হইলে আনন্দের পরিবর্ত্তে অশান্তি ও নিরানন্দ আসিয়া মানব-সমাজ অভিভূত করিবে। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, যাহা কল্যাণকর, যাহা স্ত্রীপুরুষ, বালবৃদ্ধ, পিতাপুত্র একত্র এক সঙ্গে উপভোগ করিতে পারেন, যাহা অবসাদ আনে না, যাহাতে বিকার জন্মে না, যাহা ঊর্দ্ধমুখে ধাবিত হয়, যাহা আত্মাকে, জীবনকে ও সমাজকে উন্নত ও পবিত্র করে, সেই 'sumnum bonum'ই সত্য, সুন্দর ও আনন্দস্বরূপ। সাহিত্যে সেই মঙ্গলময় আনন্দঘন আনয়ন করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। লক্ষ্যহীন, সাধনা-ভ্রষ্ট, স্বেচ্ছা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দ্বারা তাহা কখনও সম্ভব হইবে না। এইজন্য রিভুঋষিগণ, ব্যাসবাল্মীকি, শঙ্করবুদ্ধ, নানকচৈতন্য তুকা-কবীর, মীরা-নরসিংহ, সুর-' মুকুন্দ-বিদ্যাপতি প্রভৃতি ভক্তভাবুকগণ যে অক্ষয় আনন্দ-ভাণ্ডার মানব-সমাজের জন্য সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন জগতের কল্যাণ সাধন করিবে। আমরা প্রেত-লীলার অবতারণা না করিয়া, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদের আদর্শ সাহিত্য-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যতদিন প্রতিভার আবির্ভাব না হয়, সংযম-শুদ্ধি দ্বারা সাহিত্য-পূজায় প্রবৃত্ত হইলে সমাজের, জগতের এবং আমাদের নিজেরও কল্যাণ সাধিত হইবে; অন্যথা সমাজের ভবিষ্যৎ শঙ্কটাপন্ন।

শ্রীরসিকলাল রায়।

বেদান্ত-দর্শন।

১২। চেতন আত্মাকে এই জড় জগতের স্রষ্টা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইলে যে দোষ আইসে, তন্মধ্যে আমার কতকগুলির উল্লেখ ও তৎসম্বন্ধে মীমাংসাই বা কি, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি। এখন, অন্য প্রকারের কয়েকটী দোষ প্রদর্শিত হইবে।

আত্ম-চৈতন্যে কোন ভেদ নাই। চৈতন্য নিয়ত একরূপ, অবস্থান্তর-শূন্য। জগতে ত আমরা অসংখ্য ভেদ ও বিবিধ বৈচিত্র্য ও বিবিধ রূপ দেখিতে পাই। কারণে যদি বৈচিত্র্য না থাকে, তবে কার্য্যবর্গের মধ্যে এত বৈচিত্র্য আসিল কি প্রকারে? অতএব অদ্বিতীয়, একরস, একরূপ আত্ম-চৈতন্যকে কি প্রকারে এই বিবিধ বৈচিত্র্য-বহুল জগতের মূলকারণ বা স্রষ্টা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে? জগতের কারণ আত্ম-চৈতন্য যদি একরূপ হন, তাহা হইলে কার্য্যবর্গে বৈচিত্র্য হইতে পারে না।

আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। হীরক, মুক্তা, বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি গুলির মধ্যে কোনটী বহুমূল্য, কোনটী স্বল্পমূল্য, কোনটী বা নিতান্তই হেয়। কিন্তু এ সকলই ত এক পার্থিব-পরমাণুরই বিকার বা বিবিধ ভেদ বা অবস্থান্তর মাত্র। একটী জাতি (Species), হীরকাদি বহু ব্যক্তিতে (Individual) পরিণত হইয়াছে। একই বীজে, পত্র-পুষ্প-ফল-রস-গন্ধাদি বিবিধ

বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়। একই অন্ন-রস হইতে, কেশ-লোম-শোণিতাদি বিবিধ বিকার উৎপন্ন হইতেছে। কারণ-শক্তির অন্তর্নিহিত বিচিত্রতা হইতেই কার্য্যবর্গে বিবিধ বৈচিত্র্য দেখা দেয়। কেননা, কার্য্যগত সংস্কার গুলি (Ideas) সূক্ষ্মরূপে কারণ-শক্তিতে লীন থাকে। সূক্ষ্ম কারণশক্তি হইতেই পরে, ক্রমে ক্রমে কার্য্য-বৈচিত্র্য জন্মিতে থাকে। অতএব, এক আত্মসত্তা হইতে, কার্য্যবর্গের বিবিধ বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইবে. ইহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে? আর এক কথা। নাম-রূপাদি বিকার ত প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা। বিকারগুলি নাম-মাত্র, শব্দমাত্র। শব্দের উপরেই বিকারগুলি সত্তা। উহাদের প্রকৃত পারমার্থিক সত্তা নাই। স্বপ্নে যে আত্মাতে কত বিচিত্র বস্তু সংস্কাররূপে (Ideas) দৃষ্ট হইতে থাকে। কার্য্য-বৈচিত্র্যও তদ্রূপ আত্মাতে প্রতিভাত সংস্কার-রাশি মাত্র। আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়, বস্তু গুলিকে যেমন দেখায়, আত্মা তেমনি তাহাদিগকে অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং বস্তুর যাহা আকার, তাহা বুদ্ধি-কল্পিত মাত্র। তাহা শব্দ-কল্পিত মাত্র। অতএব, এক আত্মায় কার্য্য-বৈচিত্র্য উৎপন্ন হইবে, ইহাতে অসঙ্গতি কোথায়?

১৩। এখন, অপর একটী দোষের উল্লেখ করা যাইতেছে। কতকগুলি উপকরণের মিলন ব্যতীত কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহাই সর্ব্বত্র দেখা যায়। জগৎ-সৃষ্টির প্রাক্কালে, এক ব্রহ্মব্যতীত অপর কোন উপকরণ ত ছিল না। সুতরাং কেমন করিয়া এক অদ্বিতীয়, উপকরণবিহীন ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্ট হইল? অতএব ব্রহ্ম-চৈতন্যকে এজগতের উপাদান কারণ বা নিমিত্ত কারণ বলা যাইতে পারিতেছে না। কুম্ভকার যে ঘট নির্ম্মাণ করে, তাহাতে আমরা দণ্ড-চক্রাদি বিবিধ উপকরণের সংগ্রহ বা সাহায্য দেখিতে পাই। আবার, মৃত্তিকা হইতে যে ঘট নির্ম্মিত হয়, তখনও, মৃত্তিকাব্যতীত, কুম্ভকারাদির সাহায্যের প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্মের ত তাহা তাদৃশ কোন সাধন বা উপকরণের সাহায্য ছিল না। তবে কেমন করিয়া এব অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগৎ-সৃষ্টি সম্ভাবিত হইতে পারে?

আমরা এ প্রশ্নের ও উত্তর দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিব। দুগ্ধ যখন দধির আকারে পরিণত হয় তখন বাহ্য কোন সাধনের ত প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না। আপন স্বভাববশতঃই দুগ্ধ, দধিরূপে বিকৃত হয়। যদি বল যে, উষ্ণতা প্রভৃতির সাহায্যেই দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতি জন্মে। তাহা হইলেও, কোন হানি হইতেছে না। দুগ্ধের প্রকৃতিই এই যে, উহা দধির আকারে পরিণতঃ হইতে পারে। দুগ্ধের যদি ইহাই স্বভাব বা বস্তুগত ধর্ম্ম না হইত, তবে হাজারবার উষ্ণতার প্রয়োগেও, উহাকে দধির আকারে পরিণত করাইতে পারিতে না। অতএব. বস্তুর স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারেই উহার সেই সেই রূপে পরিণাম উৎপন্ন হয়; উষ্ণতাদি দ্বারা কেবল সেই বস্তু স্বভাবের শীঘ্র শীঘ্র প্রবণতা উপস্থিত হয়, এই মাত্র। বায়ু বা আকাশকে কোন কিছু দ্বারা বলপূর্ব্বক দধিরূপে পরিণত বা বিকৃত হইবার স্বাভাবিক প্রবণতা না থাকে, তাহাকে সে প্রকারে পরিণত করান যায় না। সুতরাং, বাহ্য সাধন ব্যতীতও, আপন প্রকৃতিবশতঃই, ব্রহ্ম জগদাকারে বিকাশিত হইবেন, ইহাতে

আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? ঈশ্বর, পরিপূর্ণ-শক্তি-সম্পন্ন। এই শক্তির পূর্ণতা সম্পাদনের নিমিত্ত, অপর কোন কিছুরই কোন সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। অতএব, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় হইলেও, তাঁহার শক্তির স্বাভাবিক বৈচিত্র্য-বশতঃ, তাঁহা হইতে জগতে বিবিধ বস্তুরাশি উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মের সংকল্প বশতঃই, ইচ্ছামাত্রে, এই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে অন্য কোন বস্তুর বা উপকরণের সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। তাঁহার ইচ্ছাশক্তিই, জগতের মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বিচিত্র জগৎ সেই ইচ্ছাশক্তি বা সংকল্প-শক্তিরই বিকাশ। অতএব, অন্য কোন উপকরণের সাহায্য না থাকিলেও, ব্রহ্মচৈতন্য জগতের স্রষ্টা হইতে পারিতেছেন।

আর একটা কথাও এস্থলে বিবেচ্য। কুম্ভকার অবশ্যই ঘটনির্ম্মাণ কালে, মৃত্তিকাদি উপাদান এবং দণ্ড-চক্রাদির সাহায্য ব্যতীত, ঘট নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু এমন আবার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে অন্য কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীতও, আপনা আপনি, বস্তু স্বভাব বশতঃই নানারূপ বস্তু উৎপন্ন হয়। তন্তুনাভের দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। তন্তুনাভ, আপন শরীর হইতেই তন্তুর সৃষ্টি করিয়া লয়। পদ্মিনী, অন্যকাহারও সাহায্য না লইয়া, আপন দেহ দ্বারাই, এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বক-পক্ষী, কেবল মেঘ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়াই, উদরে গর্ভ-সঞ্চারের অনুভব করিয়া থাকে। দেবতারা কেবল ধ্যানবলে অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতীত, বিচিত্র রথ ও প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিতে পারেন, একথা আমরা পুরাণাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত দেখিতে পাই। তবেই, এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়িতেছে যে, সকল বস্তুই যে একই নিয়মে কার্য্য করিয়া থাকে। এরূপ কোন কথা নাই। যে বস্তুর যে প্রকার স্বভাব, সে বস্তু সেই প্রকারই আপন কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব, আত্মচৈতন্য, আপন ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে, এই বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করিবেন, ইহাতে আর অসঙ্গতি কি? (ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, এম-এ।

* * *

প্রতিবাদের সাহিত্য কি অসুন্দর?

কথক ঠাকুরদের মৌখিক রামায়ণের গল্পে আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসীদিগকে কাপড় পরিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। দেশের অধিবাসীরা তাহাতে বলিয়াছিল যে, ঠাকুর, আমরা তোমার সকল আদেশ পালন করিব, কিন্তু এই উপদেশ মানিয়া আমাদের সনাতন প্রথা লঙ্ঘন করিতে পারিব না। রক্ষণশীলের এই প্রকার যুক্তিসূত্রকে কৈষ্কিন্ধ-ন্যায় বলা যাইতে পারে। ওড়িষ্যার কেঁউঝর রাজ্যের জুয়াঙ্গ জাতির লোকেরা বহুপরিমাণে আদি-মানবের সনাতন প্রথা মানিয়া, কোনপ্রকারে গাছের পাতার মালা কোমরে বাঁধিয়া লজ্জা রক্ষা করে। আমি ইহাদের সহিত কথা কহিয়া

দেখিয়াছি যে, ইহারা আপনাদের বস্ত্রহীনতা গৌরবের বিষয় মনে করে; এবং পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা সকল আচার ব্যবহারে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবে।

অবৈদিক হইলেও পৌরাণিক গল্পে আছে যে, বিশ্বামিত্র ঋষি একেবারে ব্রহ্মার সৃষ্টি উড়াইয়া দিয়া নূতন সৃষ্টি ফাঁদিতে চাহিয়াছিলেন। অদ্ভুতকর্ম্মা উন্নতিশীলের এই শ্রেণীর যুক্তিসূত্রকে বৈশ্বামিত্র-ন্যায় বলা ফলে। কৈষ্কিন্ধ-ন্যায় এবং বিশ্বামিত্র-ন্যায় যে তুল্যরূপে উন্নতির বিরোধী, এবং সমাজক্ষয়ের সহায়, তাহা বহু দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে হইবে না। একথাও বলিতে পারি যে, লম্ফপ্রদানের হিসাবে বিশ্বামিত্র ন্যায়টী কিষ্কিন্ধ্যা-দেশজাত।

যাহাকে বিকাশ, বিবর্ত্তন এবং উন্নতি বলে, তাহা প্রাচীনের পরিবর্ত্তনেই ঘটিয়া থাকে; অন্যথা সিদ্ধ হয় না। কাজেই সকল উন্নতির মূলেই প্রাচীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থাকিকেই থাকিবে। প্রোটেষ্টাণ্ট ডিসেণ্টারদিগের প্রতিবাদী একজন ইংরেজ সমালোচক এক সময়ে লিখিয়াছিলেন যে, প্রাচীনতার বিরুদ্ধবাদীরা কদাচ সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে না এবং সুকবি বা সুলেখক হইতে পারে না। এই কথার ধূয়া লইয়া নাকি কেহ কেহ প্রাচীনতা সমর্থন করিয়া থাকেন। আমরা এযুগে বেদ পুরাণের দোহাই না মানিলেও বিলাত আপিল মানি; এবং কোন ইংরাজ কিছু বলিয়াছেন বলিয়া সকল মতবাদের মুখ বন্ধ করিতে চাই। শেলি বায়রণ প্রভৃতির অন্য দোষ থাকে থাকুক, তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-বোধ ছিল না, একথা কোন লোকই বলিবেন না। ঐ সকল কবিদিগের মত সমকালীন সামাজিক প্রথার বিরোধী ব্যক্তি সহজে খুঁজিয়া পাওয়া না। যে কেহ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়িয়া দেখিতে পারেন যে, সে দেশের সকল বড় কবিই প্রাচীনতার পরিবর্ত্তে নূতনত্ব আনিয়া সাহিত্যের উন্নতিবিধান করিয়াছেন। নূতনকে স্থান দিয়া প্রাচীন অপসারিত হয়, এই কথাই সেদিনকার কবি টেনিসনের লেখায় পড়িয়া থাকি। এইরূপ খণ্ডভাবে বিচার করিলে প্রতিপাদ্য বিষয়টী সুবদ্ধ হইবে না। তবে ইংরেজী ধূয়ার দোহাই চলে বলিয়াই গোড়ায় দু একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ মাত্র করিলাম। সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশ হইতেই যে অংশতঃ বহু শ্রেণীর প্রাচীন প্রথা পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উপস্থিত হয়, এবং "হায়রে সে কাল" চিৎকারের মূলে যে অনেক স্থলেই মূঢ়তা এবং সৌন্দর্য্যবোধের অভাব রহিয়াছে; তাহা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছি।

ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল সমাজেই বর্ব্বরতা অথবা অপরিমার্জ্জিত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবিকা উপার্জ্জনের কঠোরতার অভাবে, অথবা বহুসংখ্যক অমার্জ্জিত-রুচি প্রতিবেশী কর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকার ফলে অনেকের রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি অনুভব করিবার স্নায়বিক ক্ষমতা কতকটা মোটা এবং ঘুমন্ত; অর্থাৎ একটু বেশী পরিমাণে স্নায়ুর উত্তেজনা ঘটাইতে না পারিলে অনুভূতি স্পষ্ট হয় না। সাধারণ লোকেরা অতিরিক্ত রং না ঢালিলে ছবির সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে না,—অতিরিক্ত লঙ্কার ঝাল না হইলে ব্যঞ্জনের স্বাদ অনুভব করিতে পারে না, অতিশয় কোলাহল না করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারে না, মারামারি এবং কাদা মাখামাখি না করিলে ঠাট্টা

তামাসা জমাইতে পারে না। চাঁপাফুলের অতি উৎকট তীব্রগন্ধে মাথা ধরে শুনিয়া কোন এক স্থানের ভদ্রলোকেরা পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া হাসিয়াছিলেন। প্রেমিকের বর্ব্বর আদরে নখের আঁচড়ে এবং দাঁতের ধারে যে রক্তপাত পর্য্যন্ত হয়, একথা বহু কাব্যে পড়িয়া লজ্জিত হইতে হয়। শোক প্রকাশের সময় যাহারা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করে, তাহারা বিশ্বাস পর্য্যন্ত করিতে পারে না যে, যাহারা শোকের সময় চুপ করিয়া থাকে, তাহাদের মনে কি ভীষণ অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয়। ঢাক ঢোল পিটিয়া, ভীষণ কোলাহল তুলিয়া এবং সেই কোলাহলের সঙ্গে “মা, মা” বলিয়া চেঁচাইয়া যাহারা ভক্তিরস অনুভব করে, তাহারা নিস্তব্ধতাপ্রিয় লোকদিগকে অধার্ম্মিক বলিয়াই ভাবে। যাহাদের স্নায়বিক অনুভূতি সূক্ষ্ম এবং সজাগ, তাহারা আপনাদের অনুভূত সৌন্দর্য্যে অন্যকে মুগ্ধ করিতে পারে না ঘটে; কিন্তু তাহাদের পক্ষে সাধারণের কার্য্যে যাহা সুন্দর, তাহাকে সুন্দর বলিয়া লওয়া অসম্ভব। এরূপ স্থলে মার্জ্জিত রুচির লোককে লোকগ্রাহ্য প্রাচীনের প্রতি অনাস্থাপরায়ণ দেখিলে যদি কেহ তাহাকে সৌন্দর্য্যবোধ-শূন্য বলিয়া বর্ণনা করে; তবে তাহাকেই আমরা ধৃষ্ট এবং বর্ব্বর মনে করিব। যাঁহারা উন্নত, তাঁহারা অনুন্নতকে শিক্ষা দিতে পারেন, অনুভূতি যাহাতে উন্নতর হয়, তাহার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু অনুন্নতের গৃহীত পদার্থকে আপনার আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতে পারেন না।

স্নায়বিক ক্ষমতায় যেমন রূপ রসাদির অনুভূতিতে গোলযোগ ঘটে, তেমনি আবার জ্ঞানের ও চিন্তার অভাবে ভাবরাজ্যের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে বাধা জন্মে। যাহাদের বিশ্বাস আছে যে, আমরা হীন কলিকালে জন্মিয়াছি এবং সত্যযুগ বহু পশ্চাতে, তাহাদের পক্ষে “হায়রে সে কাল” বলিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া ছাড়া উপায় নাই। এ যুগের নিগূঢ় মন্ত্রদ্রষ্টা বৈজ্ঞানিক মহর্ষিগণের জীব-বিবর্ত্তন বিষয়ক তথ্যের সহিত যখন যথার্থ পরিচয় ঘটিবে, তখন জানিতে পারিবেন যে, বৃক্ষশাখাবাসী আদিপুরুষের যুগ সত্যযুগ নহে; উন্নতি আমাদের পশ্চাতে নহে, সম্মুখে; সত্যযুগ আসিতেছে, সে যায় নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনুন্নত মানবের প্রথম বংশধরেরা যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আদর্শ বা চরম জ্ঞান হইতে পারে না। প্রাচীনের নামে এমন একটা ভাবের মোহ সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছি যে, যাহা নিতান্ত অর্থশূন্য, তাহাকেও পূজ্য প্রহেলিকা করিয়া তুলিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি :—অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে একজন বন্ধু, এক কৃতী লেখকের প্রবন্ধ বা ধর্ম্ম উপদেশ পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। ঐ রচনায় লক্ষ্য করিলাম, যে কৃতী-লেখক এক স্থানে ভাব জমাইবার জন্য লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বর্ণিত মাহাত্ম্য নাকি কেবল ওঙ্কার দিয়া বুঝান যায়। এই প্রহেলিকা পড়িয়া না জানি কত লোকে “আহা-হা” বলিয়া মাথা নাড়িয়াছে। গান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, সুর জমাইবার জন্য যে “উঁ উঁ” করিয়া সুর ভাঁজতে হয়, সোজাসোজি তাহাই বৈদিক গাঁথার প্রণব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পূজ্য মন্ত্রের প্রত্যেক অংশই যখন পূজিত হইতেছিল, তখন প্রণব বা ওঁ প্রহেলি হইয়াই অধিক পূজ্য হইয়াছিল। প্রাচীন উপ-

নিষদের ঐ প্রণবকে 'অ—অম্' রূপে বিভক্ত করিয়া উহার মহিমায় হাজার হাজার কথা লিখিত হইয়াছিল। এই ব্যাখ্যার সহিত যাঁহারা অপরিচিত ছিলেন, তাঁহারা ওঁ অক্ষরটীকে অ, উ এবং ম অক্ষরে বিভক্ত করিয়া অনেক তত্ত্বকথা লিখিয়াছিলেন। আমার উপলক্ষিত কৃতী-লেখক উল্লিখিত কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু প্রহেলিটীর উপহাসাস্পদ সমাবেশ করিতে ছাড়েন নাই। গুরু গম্ভীর স্বরে একটা ওঁ উচ্চারণ করিলে বেশ আসর জমিতে পারে বটে, কিন্তু কাজটী নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। নিমচাঁদের ভাষায়, উহাতে মানে হয় না বটে, কিন্তু মজা হয়। যে কোন প্রাচীনতাকেই আঁকড়িয়া ধরিলে নিজের কিম্বা প্রাচীনতার গৌরব বাড়ে না।

মানুষ যখন সভ্যতার পথে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, তখন জল জঙ্গল পাহাড় প্রভৃতি তাহার নিত্য বিচরণের স্থান হইলেও, উহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার ক্ষমতা তাহাদের মনে জন্মে নাই। এখনকার অরণ্যচারী বর্ব্বরের দৃষ্টান্তেই তাহা বুঝিতে পারি। বর্ব্বর যুগের বহু পরে সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে পরিপূর্ণ বৈদিক যুগের উৎপত্তি ও বিকাশ। সভ্যতার প্রসার বেশী বাড়িয়া উঠিলে আবার মানুষ আপনার ঘরের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের চিন্তায় এত বিব্রত হইয়া পড়ে যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিস্মৃত হইয়া বহুপরিমাণে জড়ভাবাপন্ন হয়। ইংরেজ কবি, মানুষের জড়বুদ্ধি দেখিয়া ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন যে, তিনি বরং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃশ্যে বহুদেব-বাদীদের মত নূতন নূতন দেবতার উদয় মনে করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তিনি সভ্যতার খাতিরে প্রকৃতিকে ভুলিতে পারিবেন না। মানুষ বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে পরিমাণে ভুলিয়া যায়, সেই পরিমাণে যে তাহার মানসিক স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায়, মেটে বুদ্ধি প্রবল হয়, এবং কর্ম্মে আলস্য ও জড়তা উপস্থিত হয়, তাহা হয়ত কাহাকেও মনস্তত্ত্বের গ্রন্থ খুলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

হইতে পারে যে, মোক্ষ নামক পদার্থ লাভের পক্ষে অদ্বৈতবাদ অতি চমৎকার। কিন্তু আমার সমালোচনা যখন এই নশ্বর স্থিতির গৌরব লইয়া, মনুষ্যের কর্ম্মক্ষমতার মাহাত্ম্য লইয়া, তখন পরবর্ত্তী সমালোচনায় ধর্ম্মের হিসাবে ত্রুটি থাকিলে ধার্ম্মিকেরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। এমন আমাকে "অন্ধ" বলিয়া গালি দিলে ক্ষতি হইবে না, কারণ এখন আমি যথার্থই পদ্মলোচন নামের অধিকারী। কথাটী এই যে, সাহিত্য এবং বিজ্ঞাপনের স্বাধীন এবং অসঙ্কোচ সমালোচনা প্রকাশের জন্য সম্পাদককে কেহ দায়ী না করিয়া, আমাকে যাহা বলিতে হয় বলিবেন।

অদ্বৈতবাদ বুঝাইলেন যে, আমিই যে ব্রহ্ম, মায়া কাটাইয়া এইটুকু ধরিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইল। কাজেই তাঁহারা বলিলেন যে, ব্রহ্ম বাহিরে নাই, এবং তাঁহাকে আকাশে, চন্দ্রে, সূর্য্যে খুঁজিয়া কোন ফল নাই, আপনার আত্মাকেই ধ্যান করিয়া নিজেই যে ব্রহ্ম, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। মানুষের স্নেহ-প্রীতি, হিংসা দ্বেষ, সুখ দুঃখ, প্রভৃতিও মায়ার খেলা বলিয়া বহিস্থঃপ্রকৃতির মত পরিত্যাজ্য। যাঁহারা এই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা হয়ত বা ব্রহ্মত্বলাভ করিয়াছেন, কিন্তু এই অসার-সংসারের সাহিত্য ও শিল্পাদিতে কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন

নাই। আমাদের প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ-কাব্যে এবং উন্নত শিল্পে বাহিরের প্রকৃতি এবং স্নেহ-প্রীতি প্রভৃতি অত্যন্ত পরিস্ফুট; কাজেই তাহার উপর নিগুর্ণ ব্রহ্ম অপেক্ষা মায়া প্রপঞ্চের প্রভাবই অধিক। একালে মূর্ত্তি গড়িয়া আমরা যে প্রকার ঠাকুর পূজা করি, উহা যে অদ্বৈতবাদের নিগূঢ় তত্ত্বের সহিত সম্বদ্ধ, তাহা পূর্ব্বে ঠাকুর পূজার ইতিহাস নামক একটী প্রবন্ধে অন্যত্র লিখিয়াছি। ঠাকুরদেবতাগুলি একদিকে বাহিরের প্রকৃতির সঙ্কেতে সৃষ্ট নহেন বলিয়া, উষার উদয়ে সূর্য্যের অস্তে জ্যোৎস্নার বিকাশ প্রভৃতিতে উহাদের কথা মনে পড়ে না। যে ধ্যান আওড়াইয়া ঠাকুরদিগকে চিন্তা করিতে হয়, তাহাতে অনেক কীর্ত্তি এবং মহিমার কথা আছে বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক সহজ সৌন্দর্য্যের সহিত সম্পর্ক নাই।

অন্যদিকে আবার বাহিরের প্রকৃতি হইতে যখন শিল্পের উপাদান সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া চিত্র শিল্পাদির অবনতি হইতেছিল, লতাপাতার ছবি ছাড়িয়া নানা রকম মন গড়া আদর্শের কারিগরি শিল্পকার্য্যে জড়তা আনিয়াছিল, সেই সময় পৌরাণিক ঠাকুরদের মূর্ত্তি গড়িতে গিয়াও বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। মুখের ভাবে এবং অঙ্গ আকার ইঙ্গিতে যখন মানসিক একটা ভাব ফুটাইয়া তোলা সহজ হয় নাই, তখন শিল্পীগণ অসীম শক্তি বুঝাইবার জন্য দেবতার মাথা অথবা হাতের সংখ্যা বাড়াইয়াছিল, জ্ঞানের আধিক্য বুঝাইবার জন্য চক্ষুর সংখ্যা বাড়াইয়াছিল। এই সকল দেব-মূর্ত্তিতে দেবতা আসিয়া আবির্ভাব হইতে পারেন, এবং মন্ত্রবলে তাঁহাদিগকে বশ করিয়া সাধকেরা মুক্তিলাভ করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের লৌকিক মায়ার জগতে তাঁহাদিগকে পরিহার করিলে সৌন্দর্য্য বুঝিবার ক্ষমতার অভাব সূচিত হইবে না। যেখানে প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সহিত দেবতার সম্পর্ক নাই, উষার আলোকে বা সন্ধ্যার ছায়ায় যাঁহাদের কথা মনে পড়ে না, পর্ব্বত এবং বনের সৌন্দর্য্যে যাঁহাদের ধ্যান উদ্ভাসিত হয় না, জলধারার অপার সৌন্দর্য্য যেখানে মনে ভাবের অনন্ত তরঙ্গ না তুলিয়া মনটীকে একটী কমণ্ডলুর কারাগারে কিম্বা জটার জালে জড়াইয়া ফেলে, সেখানে সৌন্দর্য্যবুদ্ধিতে প্রফুল্লতা এবং সরসতা থাকিতে পারে না।

মানুষ কখন দেবতার পূর্ণ অধিকারে আসে নাই বলিয়া, দেবতারা পুত্তলিরূপে আবির্ভূত হইয়াও মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবোধ এবং মায়া প্রপঞ্চের প্রতি অনুরাগ ধ্বংস করিতে পারেন নাই। অতি প্রাচীন কালের সৌন্দর্য্যবুদ্ধির প্রখরতা সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করে নাই। কিন্তু এই শেষ সময়ের পরবর্ত্তী যুগে বৃন্দাবন-লীলার বৈষ্ণব সাহিত্য ব্যতীত অন্য কোন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতির বড় দেখা পাওয়া যায় না। এ যুগের সকল সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাই যে, প্রকৃতি যেখানে আসিয়াছেন, সেখানে তিনি ইন্দ্রিয়লালসার বিলাস পরায়ণা সখী মাত্র! মনুষ্যের প্রাণের চিত্র নাই, স্নেহ প্রেমাদির প্রাণময় বিকাশ নাই; কেবল আছে লালসা সম্ভোগের কথায় কয়েকটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক বর্ণনা। অঙ্গের সে বর্ণনায় নারীর প্রাকৃতিক প্রতিকৃতির সুদূর আভাসও পাওয়া যায় না, বিরহ বর্ণনা করিতে হইলে কোকিল সমীরণ প্রভৃতি চাই বলিয়া উহাদের

নামে দীর্ঘ বর্ণনা আছে ; কিন্তু সে বর্ণনার কোকিল যে মৃতপাখী, এবং সমীরণ যে অন্ধকূপে নিমগ্ন ; তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিবার প্রাচীন প্রথা বজায় রাখিবার জন্য নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্যে যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে বর্ণনাটা উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া অযথা শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে ; অত্যধিক অলঙ্কারের চাপে প্রকৃতিঠাকুরাণী প্রাণ হারাইয়াছেন। প্রাণের খেলা এবং সৌন্দর্য্যের পবিত্র লীলা অর্ব্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে একেবারে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জাতিটা যে পরাধীন হইবার প্রাক্কালে যে সৌন্দর্য্যবোধ হারাইয়াছিল, জড়বুদ্ধি লইয়া ইন্দ্রিয়-লালসায় মত্ত হইয়াছিল, আমাদের সাহিত্য তাহার সাক্ষী। এই জড়তায় উপনীত হইবার বহু কারণের মধ্যে প্রকৃতির সহিত সম্পর্কশূন্য জড়মূর্ত্তির অবলম্বন একটা কারণ। আমাদের এ হানি, এ ক্ষতি সংসার প্রপঞ্চের দিক্ হইতেই হইয়াছে ; হয়ত মোক্ষ নামক সূক্ষ্ম বস্তু লাভের হিসাবে হয় নাই। কিন্তু আমাদের বিচার ইহসংসারের কথা লইয়া।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেলে, সৌন্দর্য্যবোধ নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি-বিরহিত সাধনায় ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের জড়তা উপস্থিত হইবে কেন ? একথার উত্তর দিতেছি। বাহিরের প্রকৃতি এবং মায়া প্রপঞ্চবাদ দিয়া যে মোক্ষসাধনা হয়, মনুষ্যত্ব সাধনার সহিত তাহার বিরোধ আছে। যে সকল প্রবৃত্তির কর্ষণের মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়, ঠিক সেই সকল প্রবৃত্তি ধ্বংস করিয়া অদ্বৈত-মোক্ষের সাধনা করিতে হয়। সংসারচক্রটাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া, এবং সংসারকে গড়িয়া তোলা নিশ্চয়ই পরস্পর-বিরোধী। পরিবার রচনা করা, পরিবারে পরিবারে সমাজবন্ধন দৃঢ় করা, এবং বিশ্বময় সামাজিক প্রসার পরিবর্দ্ধিত করা হইল, মনুষ্যত্ব লাভের আদর্শ কর্ম্ম। একা বাঁচিয়া থাকা যায় না বলিয়া সমাজের সহিত আপনাকে যুক্ত করিতে হয়, এবং কাজেই পরের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া এবং পরের স্থিতি-রক্ষা করিবার জন্য, নরসেবার অনুষ্ঠান করিতে হয়। মনুষ্যত্বের ধর্ম্মের হিসাবে সংসারত্যাগী অরণ্যচারী অতি পাপী ব্যক্তি। যে ব্যক্তি লোক বিশেষকে অপবিত্র বলিয়া স্পর্শ না করিয়া, স্নানপূত শরীরটীকে বিশুদ্ধ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া নির্জনে বসিয়া আপনার চরম সুখের মোক্ষলাভ করিবার জন্য এবং দুঃখনিবৃত্তি করিবার জন্য ধ্যান করে ; সে ব্যক্তি মায়ার জগতের লোকের ভাষায় অতি নীচ স্বার্থপর। মনুষ্যত্বের ধর্ম্মে যখন কোন কর্ম্মই সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া হইতে পারে না, জীবনে যখন দুঃখ না থাকার অবস্থা কল্পিতই হইতে পারে না এবং দুঃখ দ্বারাই যখন মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে, তখন দুঃখ নিবৃত্তির কথাটাই উঠিতে পারে না। দুঃখের দৃষ্টান্ত হইতে সংসারকে মায়াপ্রপঞ্চ বলিয়া ভাবা দূরে থাকুক, গভীর দুঃখ (Deep distress) বরং আমাদিগকে মনুষ্যত্বে উন্নীত (Humanise) করে বলিয়া, একজন প্রকৃতিসাধক কবি গাহিয়াছেন।

মানুষ যখন মোক্ষসাধনার ধর্ম্মে ব্রতী হয়, তখন সে আপনার মোক্ষ নামক স্বার্থ লইয়া একঘরে হইয়া দাঁড়ায় ; এবং নিজের অন্তরে মানুষ-সুলভ গুণলাভ করিতে না চাহিয়া দেবতার গুণ, দেবত্ব এবং ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে

চায়। খাঁটি দেবতা হইয়া উঠিবার পূর্ব্বাহ্নে যোগবল প্রভৃতির দ্বারা অস্বাভাবিক ক্ষমতা বা ঐশীশক্তি লাভ করিতে চায়। অমুক ব্যক্তি দৃষ্টি নিক্ষেপের বলে পশুপক্ষী ভস্ম করিয়া দিতে পারে, শূন্যে উড়িতে পারে, কিম্বা বিনা রেলের সাহায্যে পাঁচ মিনিটে পাঁচশত মাইল যাইতে পারে, অতএব বুঝিতে পারা গেল সে একজন বড় ধার্ম্মিক। কোন লোক ঐ সকল কার্য্য করিতে পারুক আর নাই পারুক, যেখানে স্নেহ প্রীতি এবং সেবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান ধর্ম্মের কার্য্য নহে এবং ভেল্কিবাজি আদর্শ অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়ায়, যেখানে সমাজ-বন্ধনজাত নীতির প্রতি উপেক্ষা জন্মে। এসংসারে মোক্ষলাভ করে দুচারিজন, এবং মোক্ষনীতির আদর্শ সমাজ রক্ষার নীতির বন্ধন হারায় হাজার ২ ব্যক্তি। দুদিনের পথ দুদণ্ডে যাইতে পারিলে যে পরসেবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠেনা, এদিকে দৃষ্টিই পড়ে না। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সুধীশিষ্য বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথ পবিত্র সেবা-ধর্ম্মের যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাকে যেন কেহ আমার বর্ণিত খাঁটি প্রাচীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভুল না করেন।

চরিত্র-নিষ্ঠার দিক্ হইতে উভয় সাধনার তুলনায় আর একটী কথা বলিবার আছে। মনুষ্যত্ব জন্মে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কে, অর্থাৎ সমাজ বন্ধন। কাজেই মনুষ্যত্ব লাভের জন্য যখন কেহ সর্ব্বকর্ম্ম নিয়ন্তার নিকট প্রার্থনা করে, তখন সমাজ-বন্ধনের উপযোগী নৈতিক শক্তিই প্রার্থিত হয়। কিন্তু মোক্ষ সাধনার প্রার্থনা অন্যবিধ। এই সংসার বড় তিক্ত, উহার সুখ বড় পরিমিত; কাজেই সাধক চাহেন, অচ্যুত ব্রহ্মানন্দ। সংসারের ভোগ যদি তিক্ত না লাগিত এবং ভোগজনিত সুখ যদি দীর্ঘস্থায়ী হইত, তাহা হইলে এই তর্কের ন্যায়ে ব্রহ্মানন্দের প্রয়োজন হইত না। আমি ভোগই চাই, লালসার পরিতৃপ্তিই আমার কামনা; তবে ক্ষুদ্র সে আশা মেটেনা বলিয়াই বৃহৎকে খুঁজি। ঠাকুর, তোমাকে আমি কোলে পিঠে করিব, তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়িব, তোমাকে আমার নিধিরত্ন বলিয়া জড়াইয়া ধরিব, প্রভৃতি অতি গভীর ভক্তির উচ্ছ্বাস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ঝগড়া না করিয়া যদি কেহ বিচার করিয়া দেখেন, তবে স্বীকার করিবেন যে, সংসারের ভোগ-বিলাসের সামগ্রীর প্রতি লালসাও যাহা,ইহাও তাহাই। যে ভক্তি লাভ করিয়া মানুষ দুঃখ ক্লেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, পদাঘাত সহ্য করিয়াও নর-সেবার জন্য উৎসাহিত হইতে পারে, সে ভক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, প্রাচীন অনেক ভক্তের পদাবলী কেবল মাত্র দেব সম্ভোগ লালসায় পরিপূর্ণ; তাহাতে এমন কিছু নাই, যাহাতে এই শিক্ষা মনে মুদ্রিত হইতে পারে যে, "যতবার পড়ে, উঠে ততবার, বীরমন্ত্রে দীক্ষা তবে বলি তার।* অথবা "যার খরতর শরে জর জর, তাহারই কল্যাণ অন্তরের ধ্যান।"

এরূপ অবস্থায় যদি কৈষ্কিন্ধ-ন্যায় অবলম্বন করিয়া প্রাচীন বলিয়াই প্রাচীনকে রক্ষা করিতে চাহেন, এবং মনুষ্যত্বের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও প্রাচীনতার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ থাকিতে চাহেন, তবে তাঁহার সৌন্দর্য্য অনুভূতির ক্ষমতা প্রশংসালাভ করিতে পারিবে না। যাঁহারা প্রাচীন লইয়া পড়িয়া আছেন, যাঁহাদের চক্ষে নব সৌদর্য্য প্রতিভাত হয়

নাই, তাঁহাদের সহিত দৈবাৎ বিরোধ ঘটিবে ভয়ে যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে নব সৌন্দর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহারা সুচতুর হইলেও কাপুরুষ এবং সমাজদ্রোহী। ক্ষয়ের পথ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে যাহা সমাজের পুষ্টির কারণ, তাহাকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টায় যে সাহিত্য জন্মিবে, তাহা প্রতিবাদের অসুন্দর সাহিত্য নহে, বরং উহাই যথার্থ প্রাণপ্রদ সুন্দর সাহিত্য।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

জ্ঞানেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুই একটী কথা

নব্যভারত পত্রের ১৩২২ সালের শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের "ছেলেরা খাইবে কিরূপে?" প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে, "উচ্চ চাকুরী করিবার বা জীবিকানির্ব্বাহ বিষয়ে ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহারা (গোপ, মোদক, স্বর্ণকার প্রভৃতি) হৃদয়ে পোষণ করিত না," ইত্যাদি। এই লেখাটীর দ্বারা এবং প্রবন্ধের অন্যান্য অংশের লেখার ভঙ্গিতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, "ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যেরই" কেবল উচ্চ চাকুরী, ওকালতী প্রভৃতি ব্যবসা একচেটিয়া ছিল, এবং অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণের সেবা শুশ্রূষাই করিত। আবার উক্ত এম্-এ, বি-এল, বাবু শাস্ত্রের দোহাই দিয়াও তাঁহার উক্ত মতের পোষকতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যদি কোন শাস্ত্র হইতে দেখাইতে পারিতেন যে, "ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যের" (?) চাকুরী ও ওকালতী ব্যবসায় শাস্ত্রসিদ্ধ, তবে আমাদের কোন কথা বলিবার থাকিত না। যখন তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না, তখন তাঁহার উক্তি যে ভিত্তিহীন, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে।

সকলেই জানেন যে, মহামান্য ব্রাহ্মণের ব্যবসা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ইত্যাদি, এবং আধুনিক বৈদ্যজাতির ব্যবসা রোগীর সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করা। আবার বৈদ্যজাতিটী যদি মনূক্ত অম্বষ্ঠ জাতির অন্তর্গত বলিয়া রায় মহাশয় বলেন, তবে মনুর দশম অধ্যায়োক্ত দ্বিজগণের অপসদ বা অপধ্বংসজ জাতির ব্যবসা দৃষ্টে দেখা যায়, তাহাদের ব্যবসা "সূতানাং অশ্বসারথ্যং অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং" ইত্যাদি। অর্থাৎ সহিশ, খোজা, খানসামা, ব্যাধ, চর্ম্মকার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব্যবসার সঙ্গে অম্বষ্ঠজাতির ব্যবসাও রোগীর সেবা বা চিকিৎসাই উক্ত আছে। সুতরাং রায় মহাশয় যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৈদ্যের শাস্ত্রোক্ত ব্যবসা, উচ্চ চাকুরী প্রভৃতি বলিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন; রায় মহাশয়ের সহিত আমরাও বলিতেছি, যেখানে নদীগর্ভ ছিল, সেখানে এখন যেমন সৌধমালা বিরাজ করিতেছে, তেমনই যে জাতির চাকুরী ওকালতী কখনও ছিল না, তাঁহারাই এখন তাহাই ধরিয়াছেন। ইহা কি অতল গর্ভ হইতে কূলে উঠিয়া গাছে লাফ্ দেওয়া নয়? পরন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের ত চাকুরী, ওকালতী বা জমিদারী

ব্যবসা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। শেষোক্ত ব্যবসাগুলিন যে জাতির ব্যবসা, রায় মহাশয় জানিয়াও বোধ হয় তাহা গোপন করিতেছেন, গোপন না করিলে তাঁহার মতলব যে হাসিল হয় না।

বি-এ, এম্-এ, বি-এল্, প্রভৃতি পাশ করিয়াও এবং অপরের ব্যবসায় বেমালুম হজম করিয়াও "ছেলেরা খাইবে কিরূপে ?" চিন্তা করিতেছেন, তখন রায় মহাশয়-প্রমুখ ব্যক্তিরা স্বীয় স্বীয় কার্য্যে অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বা কবিরাজি প্রভৃতি পুনর্ব্বার ধরুন না কেন? তাহা হইলেই তাঁহার উদ্ধৃত শাস্ত্রমতে অপরের শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। নতুবা অপরের ব্যবসায় হস্তক্ষেপ দরুণ নিজের মতাবলম্বীগণের শিরশ্ছেদের ব্যবস্থাই করাইতে হইবে।

তিনি যে মধ্যবিত্ত লোকের ছেলেকে জমি চাষ আবাদ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত কাহারা? শুধু "ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যের" ছেলেকেই কেবল মধ্যবিত্তের ছেলে বুঝাইবার জন্য তিনি কত শাস্ত্রের ও শাস্ত্রোক্ত অনুশাসনের দোহাই দিয়াছেন এবং ইংরেজ-রাজের সাম্যনীতির দোষ প্রভৃতি কত রকম বেরকম কথাই বলিয়াছেন। এই সমস্ত যুক্তি কখনই নিরপেক্ষ সুধীগণ মান্য করিবেন না। রায় মহাশয়কে আমরা অনুরোধ করি, তিনি যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্বে অর্থাৎ রাজা রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদের নবাবের Steward বা ভাণ্ডারীগিরি করার পূর্ব্বে * রাজত্ব, সেনাপতিত্ব, সন্ধি বিগ্রাহকের পদ, জমিদারী বড় বড় চাকুরী প্রভৃতি কোন্ জাতির একচেটীয়া ছিল, তাহা ইতিহাস, তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতি পাঠ করিয়া অবগত হয়েন, তারপর যেন এই সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করেন। নতুবা, সকলের নিকট হাস্যাস্পদই হইতে হইবে। তথাকথিত "ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যেরা" অপরের ব্যবসা যে অনুপাতে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহার শত অংশের এক অংশও কি অপর জাতির লোকেরা তাঁহাদের ব্যবসা ধরিয়াছেন? আগে আত্মছিদ্র না শোধরাইয়া অপরকে শাস্ত্রের অনুশাসনের উক্তি শুনান উচিত নহে।

আমরা ধর্ম্মনিষ্ঠ শাস্ত্র ব্যবসায়ী প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণকে অন্তরের সহিতই মান্য ও ভক্তি করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণেরা চিরদিনই তেজীয়ান্। কিন্তু কতকগুলিন বাজে লোক (যাহারা ব্রাহ্মণ হইতে তেজ প্রাপ্ত হইয়াছেন) সময়ে অসময়ে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে অপর জাতিকে আক্রমণ করেন, তাহাদিগকে কষ্টদায়ক জ্ঞান করিয়া থাকি। মাথার উপর সূর্য্যের তাপ বরং সহ্য হয়, কিন্তু বালির তাপে পদতল দগ্ধ হইলে সহ্য হয় না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী।

---

* Raj Ballav, a person of the Baidya class, Steward to the Nawab of Mursidabad, about 200 years ago, first procured for the Baidyas the honour of wearing the Paita.

Vol. I. Page 48 (1891).

Risley's Tribes and castes of Bengal.

ক্ষোভে।

তাজা শোকের চেয়ে কাল
ঘন দুঃখ হ'তে গভীর,
একি আঁধার তুমি ঢাল
ওগো জরায় বাড়া স্থবির ?

এযে কঠিন-তম বেড়া
অতি নিবিড় হ'তে নিবিড় ;
সারা পাতালপুরী ঘেরা
এযে যমের জয়-শিবির।

হেথা রোদনব্যথা-ভীতির
নহে আর্ত্তনাদে অধীর ;
দূরে কর্ণ দুটী বিধির
দৃঢ় পাষাণ সম বধির।

লোভী আশার মত তরল
নব প্রেমের মত রাঙ্গা
বহে রুধির-ধারে গরল
ছেয়ে বুকের নীচু ডাঙ্গা।

কেন তুষার-বাঁধা নদীর
তলে স্রোতের খর-গতি ?
মৃত জড়ের মাঝে অধীর
কেন ব্যথার জ্বালা অতি ?

যাক তৃণের মত পুড়ে
যত শুষ্ক ব্যথা আমার ;
থাক ভস্মরাশি জুড়ে
এই বিশ্বগ্রাসী-আঁধার।

ওগো শবের বাড়া শীতল !
ওগো জীর্ণ, ওগো কাল !
গাঢ় পাতাল হ'তে অতল
ঘন আঁধাররাশি ঢাল !

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বাগআঁচাড়ায় প্রচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পরদিন প্রাতে তিনি বাগেরহাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং সেখানে একখানা গহনার নৌকায় আরোহণ করিয়া বরিশাল অভিমুখে গমন করিলেন। তথায় কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধুর সহবাসে পরমানন্দে কয়েক দিন যাপন করিয়া লাকুটীয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া পরম যত্নে ও সমাদরে কিছু দিন যাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় উক্ত রাখাল বাবুর কর্ম্মচারী বৈকুণ্ঠনাথ বাবুর সঙ্গে ফুলবাড়িয়া গ্রামের একটী বিধবার বিবাহের কথা উত্থাপন করেন। এবং কিছুদিন পরে উক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বাবুর সহিত সেই কন্যার বিবাহ-কার্য্য সমাপন করেন। এবং বাঙ্গালা সন ১২৭১ সালের ফাল্গুন মাসে শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল মৈত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ মৈত্রের সহিত ফুলবাড়িয়া-নিবাসী সাতকড়ি সমাদ্দারের

কন্যা কুমারী বসন্তকুমারীর শুভ-বিবাহ গোস্বামী মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয়। এই বিবাহে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র, সাধু অঘোরনাথ, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহাশয়গণ বাগআঁচাড়ায় গমন করিয়াছিলেন।

ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয় বাগআঁচাড়া প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা এবং স্কুল স্থাপন আদি করিয়া ঐ সকল গ্রামবাসীদের যে কত মঙ্গল ও উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বাক্যে বর্ণনা হয় না। তাঁহার কার্য্যের দরুণ ঐ সকল স্থানের লোকেরা তাঁহার নিকট চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ হইয়াছেন।

বাগআঁচাড়া ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক ব্রহ্মোৎসব ১৬ই পৌষ হইত। একবার উৎসবের সময়ে, উৎসব-মন্দিরের পশ্চিম দিকের প্রাঙ্গনের পশ্চিমে, কিছু দূরে, ১৬ই পৌষ প্রাতে নহবত বাজিতেছে, সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে উপাসনা-গৃহে যাইতেছেন; সেই সময় নীচের লিখিত কীর্ত্তনটী সকলে মিলিত হইয়া গাইতেছিলেন;—"চল ভাই সবে মিলে যাই সেই পিতার ভবনে; শুনেছি নাকি তাঁর বড় দয়া দুঃখীতাপী কাঙ্গাল জনে। কাঙ্গাল বলে দয়া করে কেহ নাই মোদের ত্রিসংসারে; আর কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা সেই দয়ারসাগর পিতা বিনে।" এই কীর্ত্তন শুনিয়া তখন মনে যে কি ভাব ও আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

উপাসনা-মন্দিরে সকলে প্রবেশ করিলে ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয় বেদিতে উপবেশন করিয়া উপাসনা করিলেন। আর এই গানটী তিনি নিজে গাইলেন,—"আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে, মিলে বন্ধুগণে, প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভক্তি-কমল ল'য়ে, করেন অঞ্জলি দান বিভুচরণে। স্নেহময়ী মাতা হ'য়ে, পুত্র কন্যাগণে লয়ে, বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে। নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন এই মহোৎসবে, বিতরিতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধিত জনে।' এইভাবে উদ্বোধন উপাসনা প্রার্থনাদি হইয়া প্রায় ৯টা কি ৯॥টার সময় পূর্ব্বাহ্ণের উপাসনা শেষ হইল। পরে রাজচন্দ্র বাদ্যকর নহবতের উপর হইতে সানাই যোগে গাইতে আরম্ভ করিল, "দয়াময় কি মধুর নাম; আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াইল কি মধুর নাম।"

তৎপরে কাঙ্গালী বিদায় আরম্ভ হইল; কাঙ্গালীদিগকে চাউল ও পয়সা দেওয়া হইল। এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অন্ধ, খঞ্জ, প্রাচীন প্রাচীনা ও পীড়িত, তাহাদিগকে চাউল ও বস্ত্র দান করা হইল। পরে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের প্রীতি-ভোজন হইল। আহারের ব্যয় রূপচাঁদ হালদার মহাশয় নিজে নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপে উৎসব সম্পন্ন হইত।

আর একদিনের ঘটনা বর্ণনা করি, একদিন সাপ্তাহিক উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় বাগআঁচড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মন্দিরের বহির্ভাগে উৎকণ্ঠিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। এবং কখন উপাসনা শেষ হইবে, কেবল তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন।

এদিকে গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনাতে মন স্থির হইতেছে না। এইহেতু তিনি সংক্ষেপে ব্রহ্মোপাসনা শেষ করিয়া গৃহের

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, উক্ত বাবু দণ্ডায়মান আছেন। ক্ষেত্রনাথ বাবু গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, "আমার দাদা তারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী গত রাত্রিতে প্রসব বেদনা আরম্ভ হওয়ায় যন্ত্রণাতে ছট্‌ফট করিতেছেন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার আমাদের বাড়ীতে চলুন।" এই কথা শুনিবা মাত্র তিনি তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ীতে গমন করিলেন। এবং সেই বাড়ীতে যাইয়াই প্রথমে জল গরম করিতে বলিলেন। তৎপরে একটী বড় মাটীর গামলাতে গরম জল রাখিয়া ঐ রোগীকে তাহার মধ্যে বসিতে বলিলেন। এবং পরে অল্প উষ্ণ জলের ধারাণী করিতে লাগিলেন। কিছু সময় পরে উক্ত গর্ভিণী বলিলেন, 'আমাকে উঠাও।' জলের গামলা হইতে যেমন তাঁহাকে উঠান হইল, অমনি একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। পরদিন অপরাহ্ণে উক্ত গঙ্গোপাধ্যায় বাবু, ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয়কে একথালা সন্দেশ পাঠাইয়া দিলেন। গোস্বামী মহাশয় ঐ সন্দেশ স্কুলের ছাত্রদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেন। তাঁহার গুণ ও দয়া সম্বন্ধে এইরূপ অনেক ঘটনা আছে, সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইবার নয়।

আর এক দিবসের ঘটনা বর্ণনা করি। ফাল্গুন মাসের একদিন রবিবার স্কুল বন্ধ; গোস্বামী মহাশয় কুলবাড়ীয়া গ্রামে এক বাড়ীতে ১০টার মধ্যে আহার করিয়া বসিয়া অনেকের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন; এমন সময় শুনিতে পাইলেন, ঐ গ্রামে এক কারিকর মুসলমানের গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে। যেই শুনা, অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে কোমরে বস্ত্র জড়াইতে জড়াইতে ছুটিলেন। তিনি যে বাড়ীতে বসিয়াছিলেন, সেই বাড়ী হইতে ঐ অগ্নি-লাগা বাড়ীটী প্রায় ২০।২৫ রসি দূর হইবে। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে ২০ কি ২৫ জন লোক গমন করিলেন। তাঁহারা যখন উক্ত গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন গৃহের অল্পাংশ মাত্র দগ্ধ হইয়াছিল, সকলে মিলিত হইয়া তাহার ঘরখানা রক্ষা করিলেন। তাহাতে তিনি নিজে এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পার্শ্বের এক বাড়ীর উঠানে সামান্য একটী নোংড়া কলসির জল লইয়া হাতে মুখে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্য কুবের জোলার অন্ন খাইয়া জগৎময় প্রেম বিলাইয়াছিলেন; এই ভক্ত মহাত্মাও তাহাই করিয়া গিয়াছেন।

তিনি যে সময়ে বাগআঁচাড়ায় বাস করিতেন, সেই সময় এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ দূর হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও খ্রীষ্টীয় পাদরিরা তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতে আসিতেন এবং সকলে তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন। বাগআঁচাড়ায় ও তাহার পার্শ্বস্থ গ্রাম সকলের অনেকেই তাঁহার নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। গোস্বামী মহাশয় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক নামে বিখ্যাত ছিলেন।

এক সময়ে বাগআঁচাড়ার কোন কোন ব্রাহ্মের কার্য্যে ও ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তিনি বাগআঁচাড়া হইতে চলিয়া গিয়া যাদবপুর গ্রামে প্রাণনাথ হালদারের বাসাতে উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ গোস্বামী মহাশয় যে সময় বিরক্ত হইয়া বাগআঁচড়া হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, তখন অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। পরে জানিতে পারিয়া ৪।৫ জন লোক তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত যাদবপুর অভিমুখে গমন করিয়া তথা হইতে তাঁহাকে

ফিরাইয়া বাগআঁচড়াতে আনায়ন করেন। এখানে আসিয়া সায়াহ্নে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিয়া এই গানটী করিতেছিলেন ;—"পিতা গো দেখা দাও ; আমাকে দেখা দিয়া প্রাণে বাঁচাও। আমি আর যাবনা তোমায় ছেড়ে ; আমায় ক্ষম এবার দয়া করে।" এই গানটী গাইতে গাইতে তাঁহার চক্ষু হইতে জলধারা দরদর ধারে নির্গত হইতে লাগিল। সেই স্থানে আর আর যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। পরে উপাসনা প্রার্থনা আদি হইয়া সে দিনের কার্য্য শেষ হইল।

নাম-সাধন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ এক বৎসরকালের জন্য ব্রতগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক বৎসর অন্য কাহারও হাতের রান্না অন্ন আহার করিবেন না। নিজে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া এক যোড়া করতাল হস্তে লইয়া নাম গান করিতে করিতে কোন ব্রাহ্মের বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার মুখে এই গানটী অনেকবার শুনিয়াছি,—"সদাই হরিবল, হরিবল, হরি নামের নাই তুলনা, সদাই হরিবল। যদি বিষয়েতে সুখ হতোরে, তবে লালজী ফকির হত না। অজামিল পাপী ছিল, হরিনামে তরে গেল, তারে যমদূতে ছুঁতে পারিল না।" এই গানটী যখন শেষ হইত, তখন বলিতেন—"ভিক্ষা"। গৃহকর্ত্তা অথবা গৃহকর্ত্রী একজন মনুষ্যের আহারের উপযুক্ত চাউলাদি দিতেন, তাহা লইয়া নিজে হাতে রান্না করিয়া আহার করিতেন।

যোগ-সাধন।

ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয়, ভক্তিভাজন মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হইয়া যোগসাধন করেন। ঐ সময় সাধু অঘোরনাথও দীক্ষিত হন। বিজয়কৃষ্ণ যখন যোগসাধন করেন, তখন তাঁহার প্রথম পুত্রের জন্ম হয় ; এইহেতু সেই পুত্রের নাম যোগজীবন রাখিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয় যোগবলে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সময় বাগআঁচাড়ায় বাস করিতেন, সেই সময় একদিন রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে জানিলেন, শঙ্করপুরের ৺কালীবর মল্লিক মহাশয় তাঁহার নিষ্কর জমী ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন, কিন্তু সে জমী ব্রাহ্মসমাজ পান নাই এবং তাঁহার গতি হয় নাই। এই স্বপ্ন দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় উক্ত মল্লিক মহাশয়ের শ্রাদ্ধ করেন। আর গোস্বামী মহাশয় যখন ঢাকাতে ছিলেন, সেই সময় একদিন যোগে বসিয়া জানিতে পারিলেন, বাগআঁচাড়ায় ৺পীতাম্বর হালদার মহাশয় গলায় বস্ত্র দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিতেছেন ; "মহাশয়! আমার কি গতি হবে না?"

যোগবলে গোস্বামী মহাশয় অনেক বিষয় জানিতে পারিতেন। তিনি যোগবলে যে সকল ভবিষ্যৎ বাণী বলিয়া গিয়াছেন, তাহার সত্যতার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ভগবান্ যাঁকে ধরেন, তাঁকে আর অল্পে ছাড়েন না। ইহা অতি সত্য কথা। ধনকুবের দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষিদেবেন্দ্র ঠাকুরকে কি করিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। বিজয়কৃষ্ণও ইহার দৃষ্টান্ত স্থল বলিলেও অত্যুক্তি হবে না। গোস্বামী মহাশয় পাকা বাড়ী,

মান সম্ভ্রম, শিষ্য সেবক সমস্তই ত্যাগ করিয়া পথের ফকির হইয়াছিলেন। একটী প্রবাদ আছে, যে করে তাঁর আশ, তার করেন সর্ব্বনাশ, তবু যদি না ছাড়ে আশ, তখন করেন দাসের দাস। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ কয়জন আছেন? অনাসক্ত হইয়া ধর্ম্মপালন করা বড় কঠিন। কিন্তু এই মহাত্মা তাহা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে আছে, ধর্ম্মের উৎপত্তি সত্যে; দয়ায় সেটা প্রবর্দ্ধিত হয়। ইনি দুইটীই জীবনে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় সত্য বলিয়া যাহা বুঝিতেন, তাহার এক চুলও এদিক ওদিক করিতেন না। তৎপরে তাঁহার দয়াও কম ছিল না। তাঁহার নিকট যিনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, যথাসাধ্য তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। ক্ষুধিত জনকে অন্ন দেওয়া তাঁহার জীবনের নিত্যব্রত ছিল। তাঁহার মত এই—দীনভাবাপন্ন ও স্বার্থত্যাগী লোক যদি কেহ থাকেন, তিনিই ধন্য;—তাঁহার জীবনই ধন্য।

ত্যাগ।

অনেকেই বলেন, ত্যাগ ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না; কিন্তু এই ত্যাগ জীবনে কয়জন লোক দেখাইতে পারিয়াছেন? যদি ত্যাগের প্রমাণ দেখিতে চান, তাহা হইলে মহাত্মা গোস্বামী মহাশয়ের জীবন দেখুন। তিনি কিরূপ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রথমে যখন তাঁহার ধর্ম্মভাব আসিয়াছিল, তখন ১০০।১২৫ ঘর ব্রাহ্মণ-শিষ্য ত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। একদিন একজন লোক তাঁহার পদোদক পান করিতে আসিয়াছিল। সেইদিন তাহার মনে মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। মন যন্ত্রণায় অস্থির হইল। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ইহাকে পা-ধোয়া জল দিয়া উদ্ধার করিব, কিন্তু আমাকে উদ্ধার করবে কে? এই চিন্তা তাঁহার মনকে অস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। পরে আদিসমাজে আসিয়া কতকটা শান্তি প্রাপ্ত হন।

ইহার পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবনে যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা ত অনেকের অবিদিত নাই। তাঁহার ন্যায় সত্যনিষ্ঠ লোক অল্পই দেখা যায়। তিনি সত্য পালন করিতে গিয়া অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু একদিনের জন্যও সত্য লঙ্ঘন করেন নাই। অনাসক্ত হইয়া তিনি সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র কন্যা ছিল, অথচ অনাসক্ত, এক দিনের জন্যও অন্ন বস্ত্রের ভাবনা চিন্তা করেন নাই, অথচ সংসারের ব্যয় কোথা হইতে সংগ্রহ হইয়া যাইত। ভগবান্ তাঁহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এক দিনের ঘটনার কথা বলি; তাঁহার শিশু সন্তানের দুগ্ধ নাই; তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী জানাইলেন, কিন্তু তাঁহার সে কথা শুনিয়া তিনি স্থির হইয়া রহিলেন। কোন রকম চিন্তা কি উদ্বেগের চিহ্ন দেখা গেল না। স্থির ভাবে থাকিয়া বলিলেন, "ভাতের মাড় খাওয়াইয়া দিন।"

ঐশী শক্তি।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ যে একজন সাধু পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই। বাগআঁচাড়ার নিকটবর্ত্তী বাগুড়ি নামক গ্রামের এক মুসলমানের ৬০ কি ৬৫ বৎসরের একটী মেয়ে, পেটের

বেদনায় সমস্ত রাত্রি ছটফট করিতেছে, এমন সময় স্বপ্নে একজন কে তাঁহাকে বলিলেন, "তোর রোগ মুক্তি হইবে; বাগআঁচাড়া গ্রামে বিজয় গোঁসাই আছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া বল,সে তোর বেয়ারাম ভাল করে দিবে।" রাত্রির শেষভাগে এই স্বপ্নটী দেখিয়া সেই বৃদ্ধা আর নিদ্রা যাইতে পারিল না, রাত্রি প্রভাত হইলে সে বাগআঁচাড়া অভিমুখে গমন করিল। পথের মধ্যে বিজয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রতিদিন প্রত্যুষে বায়ু সেবন জন্য বাহির হইতেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সেই বৃদ্ধা উক্ত বাবুর পা জড়াইয়া ধরিল এবং বলিতে লাগিল, "বাবা, আমাকে ঔষধ দেও, আমার আর কষ্ট সহ্য হইতেছে না। সমস্ত রাত্রি কি ভাবে গিয়াছে, তাহা উপর আল্লা হাকিম জানেন। তিনি আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। যাহা দেবে দেও, নইলে আমি তোমার নিকট আত্মহত্যা করিব। তিনি বলিলেন, আমার নিকট ঔষধ নাই। কিন্তু সেই বৃদ্ধা তাহা শুনে না; পরে তাহার কাতর উক্তি শুনিয়া হঠাৎ গোস্বামী মহাশয় আছটি গাছের কতকগুলা পত্র ও আর ঐ গাছের কতগুলা ফুল (মঞ্জরী) আনিয়া দিয়া বলিলেন, লবণ দিয়া বাটিয়া সেবন করিও। সেবন করার অল্প সময় মধ্যে তাহার বেদনা উপশম হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে সেই বৃদ্ধ আসিয়া বলিল, বাবা, তুই আমার জান দিয়াছিস; খোদা তোর কাচ্ছাবাচ্ছা ভাল রাখুন। আমার বেদনা আরোগ্য হইয়াছে।

উপসংহার—ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের বাণী।

"আমি ১২৭০ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত একাদিক্রমে ১৯ বৎসর কাল বাগআঁচাড়ায় অবস্থিতি করিয়া, তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা যাহা অবগত হইয়াছি, তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ লিখিতেছি। তাঁহারা শিক্ষা বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে যে সকল গুণ দেখিয়াছি, তাহা অনেক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে নাই। তাঁহারা সরল, তাঁহাদের হৃদয় গুরুভক্তিপূর্ণ, ও তাঁহারা সেবাপরায়ণ। এই সকল গুণ ছিল বলিয়া এত দীর্ঘকাল তথায় তাঁহাদের সহবাসে অবস্থিতি করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গুরুগিরি করেন। পূর্ব্বের গুরু মহাশয়দিগের যে বিদ্যা, তাহা অনেকেই জানেন, বাঙ্গালা হস্তলিপি ও শুভঙ্করী,শিশুবোধ পড়াইতে পারিলে,একরকম পাঠশালার কার্য্য সম্পন্ন হইত। তৎপরে কেহ কেহ বাটীতে রামায়ণ, মহাভারত পড়িলে বড়ই শিক্ষা হইয়া গেল। আমি তাঁহাদের মধ্যে যে সকল গুণ দেখিয়াছি, তাহা কিঞ্চিৎ বর্ণন করি,—তাঁহারা মৌখিক অঙ্ক যেরূপ বলিতে পারিতেন, এখনকার এম-এ, বি-এ ছেলেরাও তাহা বলিতে পারে না. তাঁহারা এমন অনেক কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, এখনকার অনেকে তাহা পারেন না। কোন ব্যক্তি আসিয়া জানাইল, আমার পিতার শ্রাদ্ধে আমি দুইশত লোকের আয়োজন করিব। তাঁহারা তাহার কত কি লাগিবে,তাহা এমনভাবে ঠিক করিয়া দিতেন, অনেকে তাহা পারে না। আর একটী বিশেষ গুণ, তাঁহারা সকলের উপর প্রাধান্য করিতেন। বিষয় বুদ্ধি কম ছিল না,গ্রাম্য সালিশি মধ্যস্থ পর্য্যন্ত করিতে তাঁহাদিগকে দেখিয়াছি আদালত হইতে ইহাদের উপর সালিশ-নামা আসিত। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহারা যে উচ্চবংশ-সম্ভূত, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাইয়াছি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইঁহারা গুরু-গাঙ্গী কিন্তু আমি যখন সেখানে ছিলাম, ইঁহাদের উপর আমার গুরুগিরি করিতে হইত। অনেক ৫০।৬০ বৎসরের বুড়াদের উপর আমার ধর্ম্মশিক্ষার ভার পড়িয়াছিল, আমি আদিসমাজের একখানা উপাসনা-প্রণালীর পুস্তক তাঁহাদিগকে দিয়াছিলাম। তদ্দৃষ্টে তাঁহারা উপাসনা করিতেন। প্রত্যেকে উপাসনা করেন কি না, তাহা দেখিবার ভার আমার প্রতি অর্পিত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কোন অন্যায় হইলে, আমার বিচার করিতে হইত, সঙ্গত-সভায় সমস্ত কার্য্যের মীমাংসা হইত। আমি গোপন-অনুসন্ধান দ্বারা বিচার করিতাম। একদিনকার ঘটনার কথা বলি। বাগআঁচাড়া-নিবাসী জগচ্চন্দ্র মল্লিক উপাসনা করিতেছেন, আমি গোপন ভাবে এক স্থানে দাঁড়াইয়া শুনিতেছি,—"ওদিন গেল দয়াল বলনা, মন-রসনা, দয়াল নামটী সাধন হলে শমন-ভয় আর রবে না"—এই গানটী এমন ভাবে গাইতেছেন, যাঁহাদের তাল লয় বোধ আছে, তাঁহারা শুনিলে বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা যদি সেই সময় উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভগবানকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। ৭০।৭৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের মুখে গানটী কি মধুর লাগিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। আর এক দিনকার ঘটনার কথা বলি, প্রাতে বুধবারে কুলবাড়িয়া গ্রামে পারিবারিক উপাসনা হয়। যে বাটীতে উপাসনা হয়, সে বাটীতে চন্দ্রনাথ মল্লিক ও আমি গিয়া দেখি, একটী স্ত্রীলোক গান করিতেছেন, তাঁহার নাম উমাসুন্দরী, বেলা তখন ৪৷৷৹টা। গানটী এই,—"একবার ডাকরে দিন যায় বয়ে, ডাক তাঁরে পিতা বলি চরণ ধরিয়ে, ডাক তাঁরে হৃদয়ের কপাট খুলিয়ে, একবার ডাক ডাকরে, দুরন্ত কৃতান্ত আছে শিওরে বসিয়ে, কখন কি হবেরে। ভাই বন্ধু দারা সুতা যাইবে ফেলিয়া, কেহ তোর সঙ্গে যাবে নারে"—এই গানটী করিতেছেন,আর চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে,আমি আড়ালে থাকিয়া সকল শুনিলাম। তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, তুমি ধন্য,এই অশিক্ষিতা নারীর হৃদয়ে এমন ভাব উদ্দীপন করিয়া দিবে, ইহা কখন ভাবি নাই, অনেক সুকণ্ঠ সুগায়ক আছেন, কিন্তু এরূপ ভাবপূর্ণ গান আমি আর কখনও শুনি নাই। তাহার পর সকলে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া, আমাকে বসিবার আয়োজন করিয়া দিলেন আমি একটী সঙ্গীত করিয়া, উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম, ভগবানের কৃপায় সে দিনকার উপাসনা কি মধুর লাগিয়াছিল, তাহা বাক্য দ্বারায় প্রকাশ করা যায় না।" শ্রীসীতানাথ মল্লিক।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নামবাদ ও স্বরূপবাদ।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর আমরা নামের দ্বারাই পরিচয় পাইয়া থাকি।* কিন্তু নামের প্রকৃত অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, নাম বস্তু মাত্রের বিশেষ সংজ্ঞা নহে, ইহা বস্তুনিচয়ের সাধারণ সংজ্ঞা। নাম বস্তুজাতির সামান্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করে, কিন্তু প্রতি বস্তুর বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশ করে না। নাম সামান্য লক্ষণবিশিষ্ট বস্তুর যে

---

* "তেন নাম্না নিরূপ্যত্বাৎ ব্যক্তং তদ্রূপমুচ্যতে"। ৪২—পঞ্চদশী ১৩শ পরিচ্ছেদ।

'ব্যক্ত পদার্থ নামমাত্র দ্বারা নিরূপণীয় বলিয়া তাহা নামস্বরূপই কথিত হয়।" বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

চিত্র আমাদের নিকট উপস্থিত করে, বিশ্বে তাহার প্রকৃত সংজ্ঞা আছে কি না, ইহা লইয়া পাশ্চাত্যদর্শনে বহু বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। এক পক্ষ নামাতিরিক্ত কোন বাহ্যসত্তা স্বীকার করেন না, অপর পক্ষ নামাতিরিক্ত প্রকৃত বাহ্যসত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রথম পক্ষ "নামমাত্রবাদী" (Nominalist) ও দ্বিতীয় পক্ষ "স্বরূপবাদী" (Realist) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত বিতণ্ডার ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে ;—

"Hand in hand with the development of scholasticism in general, proceeded that of the antithesis between nominalism and realism, an antithesis the origin of which is to be found in the relation of scholasticism to the philosophy of Plato and Aristotle. The nominalists were those who held universal notions (unisersalia) to be mere names, flatus vocis—empty conceptions without reality. With nominalism, there are in general notions, no genera, no species ; all that is, exists only as a singular in its pure individuality and there is no such thing as pure thought, but only natural conception and sensuous perception. The realists again, by example of Plato, held firm by the objective reality of the universals The antithesis of these opinions took from first as between Roscelinus and Anselm, the former as nominalist, the latter as realist, and it continues henceforth throughout the whole course of scholasticism. Handbook of the History of Philosophy by Dr. Albert Schwegler.

"পাণ্ডিত্যযুগের সাধারণভাবে আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই নামবাদ ও স্বরূপবাদের প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন হয়। এই প্রতিযোগিতার প্রথম উৎপত্তি পাণ্ডিত্যদর্শনের সহিত প্লেটো ও এরিষ্টটলের দর্শনের সম্বন্ধের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা সাধারণ জ্ঞানকে নামমাত্র বলিয়া সত্তারহিত নিরবচ্ছিন্ন সংস্কার বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাই নামবাদী ছিলেন। নামবাদে সাধারণ জ্ঞান নাই, সামান্য জ্ঞান নাই, জাতি নাই, সমস্ত সত্তাশীল বস্তুই একত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিস্বরূপে বর্ত্তমান। এই মতে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা বলিয়া কোন বস্তু নাই, কেবল স্বাভাবিক সংস্কার ও ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিই বর্ত্তমান আছে। স্বরূপবাদীরা অপর পক্ষে প্লেটোর দৃষ্টান্তে সাধারণ জ্ঞানের বাহ্যসত্তা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। এই দুই মতের প্রতিযোগিতা প্রথম রস্কেলিনাস্ ও এন্‌সেল্‌মের মধ্যেই প্রকাশ পায়, ইঁহাদের প্রথম জন নামবাদী ও দ্বিতীয় জন স্বরূপবাদী ছিলেন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এই প্রতিযোগিতা সমস্ত পাণ্ডিত্য যুগ ব্যাপিয়াই চলিয়াছিল।"

এবিলার্ড্ নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক এই বিরোধের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উভয়ের মধ্যবর্ত্তী মত আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সাধারণ জ্ঞান কেবল চিন্তা ও অনুভূতির বিষয় হইলেও কেবল মনেই যে ইহার উৎপত্তি, তাহা নহে. বাহ্য সত্তায়ও ইহার অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা না হইলে বাহ্যসত্ত্বা হইতে ইহাকে লাভ করা সম্ভবপর হইত না দর্শনের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—

"There began, however, as early as Abelard (B. 1079) an intermediate theory as well nominalistic as realistic, which after him with unimportant modifications, remained in the whole, the dominant one. In this view the universal is only conceived, only thought, but even so it is no were product of consciousness ; no, it possesses also objective reality in the things themselves, nor could it be abstracted from them, unless it were virtually contained in them. This identity of being and thought is the presupposition and foundation on which the entire dialectic industry of the scholastics rests". Ibid.

"যাহা হউক, এবিলার্ডের সমকালীন প্রাচীন সময় হইতেই একটী মধ্যবর্ত্তী মত প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। ইহা যেমনই এক দিকে নামবাদ, তেমনই অপর দিকে স্বরূপবাদ। এই মত তাঁহার পরে নগণ্য সংস্কারসহকারে মোটের উপর প্রবল মতরূপে প্রচলিত ছিল। এই মতে সাধারণ জ্ঞানই কেবল অনুভূত হয়—চিন্তিত হয়—কিন্তু এরূপ হইলেও ইহা কেবল মনের ভাবেরই ফল নহে। না, তাহা নহে, বাহ্য বস্তুর মধ্যেও ইহার বাস্তবস্বরূপ বিদ্যমান আছে। যদি ইহা বাহ্যবস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান না থাকিবে, তবে বাহ্য বস্তু হইতে ইহা সঙ্কলিত হইতে পারিত না। এই চিন্তা ও সত্বার অভেদভাব, ইহাই মূল কল্পনা ও মূলভিত্তি, যাহার উপর পাণ্ডিত্যদর্শনের যুক্তি-শাস্ত্রীয়শ্রম স্থিতি লাভ করিয়াছে।"

পাশ্চাত্যদর্শনে আমরা যে নামবাদ ও স্বরূপবাদের উৎপত্তি মধ্য যুগে দেখিতে পাই, আমাদের ভারতীয় দর্শনে উপনিষদের সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগেই এতদুভয় মতবাদ সম্বন্ধে ঋষিদিগের চিন্তা বিশেষরূপেই ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদেই আমরা সেই চিন্তার প্রথম সূচনা লক্ষ্য করিতে পারি। আমরা ছান্দোগ্য হইতে নিম্নে সেই প্রথম চিন্তার বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানীতি। ২

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবানীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রোদেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।"

৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৩য় খণ্ড।

ঐ তেজ, জল ও অন্নের উৎপাদক ব্রহ্ম পুনশ্চ আলোচনা করিলেন, "আমি এই তিন সূক্ষ্ম তেজ, জল ও অন্ননামক দেবতাতে অত্রিবৃৎকৃত ভূতত্রয় রচিত লিঙ্গ দেহাভিমানী এই জীবের সহিত স্বাংশভূত অনিরুদ্ধাখ্য পরমাত্মা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাঁদিগের নাম ও রূপ সকল অভিব্যক্ত করিব" ॥ ২

অনন্তর তিনি ঐ তেজ, জল ও অন্ননামক তিন দেবতার এক একটীকে ত্রিগুণিত করিব, এই প্রকার মনে করিয়া এবং কার্য্যতঃ তাহাই করিয়া ঐ ত্রিগুণিত অর্থাৎ স্থূলীকৃত তেজ, জল ও অন্ননামক তিন দেবতাতে পূর্ব্বোক্ত অত্রিগুণিত অর্থাৎ সূক্ষ্মত্রয় দ্বারা রচিত লিঙ্গ অভিমান-বিশিষ্ট জীবের সহিত স্বাংশভূত অনিরুদ্ধাখ্য পরমাত্মা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ সকল অভিব্যক্ত করিলেন" ॥ ৩

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, নাম ও রূপের অভিব্যক্তিই সৃষ্টি। সুতরাং নাম ও রূপ যে ঈশ্বরকৃত, তাহারই প্রমাণ আমরা এখানে পাইতেছি। উপনিষদের প্রকৃত মর্ম্ম "পঞ্চদশী"কার যেরূপভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বক্তব্যের সম্পূর্ণ সমর্থনই পাওয়া যায়। যথা ;—

"বিচিন্ত্য সর্ব্বরূপাণি কৃত্বা নামানি তিষ্ঠতি।
অহং ব্যাকরবাণীমে নামরূপে ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৬৪
অব্যাকৃতং পুরা সৃষ্টেরূর্দ্ধং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা।
অচিন্ত্য শক্তির্ম্মায়ৈষা ব্রহ্মণ্যাব্যাকৃতভিধা ॥

৬৫।১৩শ পরিচ্ছেদ।

"পরমেশ্বর সমুদয় জগতের রূপ চিন্তা করিয়া ও তাহাদিগের প্রত্যেকের নামে নির্দ্ধারিত করিয়া থাকিলেন, শ্রুতিতে আছে,

"এই জগতের নামরূপ আমি (ঈশ্বর— প্রপাঞ্চিত করি)।" সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত যে ঈশ্বরশক্তি,তাহাই সৃষ্টিকালে প্রকাশিত হইয়া নাম ও রূপ,এই দুই প্রকার হয়,বিজ্ঞ ঈশ্বরের সেই মায়ারূপ অচিন্ত্য শক্তির নাম অব্যাকৃত।" বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

পাশ্চাত্যদর্শন যেখানে কেবল নামেরই কথা বলিয়াছে,তৎস্থলে ভারতীয় দর্শন নাম ও রূপ, এই দুইটীর কথাই বলিতেছে। কারণ নামে বস্তুর মানসিক সত্তা,কিন্তু রূপেই প্রকৃত বাহ্যসত্তা। বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে. পরমেশ্বর প্রথমে মনেতে বস্তুর নাম লইয়াই পরে বস্তুর সৃষ্টি করিতেছেন এবং সেই মনের পরিকল্পনা যখন বাহ্যসত্তাতে সম্পুণ প্রতিফলিত ও পরিণত দেখিতে পাইতেছেন, তখনই তাহা "উত্তম" হইয়াছে বলিয়া সন্তোষ লাভ করিতেছেন। নিম্নে আমরা বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণের একটু স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহাতেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে ;—

3. "And God said" Let there be light; and there was light.

4. "And God saw the light, that it was good." Genesis, Chap. I

৩। "ঈশ্বর বলিলেন, আলোকের আবির্ভাব হউক—তখনই আলোকের আবির্ভাব হইল।

৪। তখন ঈশ্বর আলোক দেখিলেন— দেখিলেন ইহা উত্তম হইয়াছে।"

উপনিষদের 'নামরূপের' আভাসই বাইবেলে পাওয়া যায়, তাহা নহে, কিন্তু বাইবেলে আলোক, জল ও পৃথিবী প্রথম সৃষ্ট হওয়ার বর্ণনায় উপনিষদের প্রথম সৃষ্ট তেজ, জল ও অন্নের আভাসও পাওয়া যায়।

নাম ও রূপের প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে উপনিষদে বিশদ বিবৃতিই আছে। আমরা এস্থলে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকা-মকরোৎ যথাতুখলু সোমোমাস্তিস্রোদেবতাস্ত্রিবৎত্রিবৃদেকৈকাভবতি তন্মেবিজানীহিতি ॥ ৪ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদ্—৬ষ্ঠ অধ্যায়—৩য় খণ্ড।

"যদগ্নে রোহিতংরূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণিরূপাণীত্যেবসত্যম্ ॥ ১ ॥

"যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য অপাগাদাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণিরূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥২

"এতদ্ধস্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্ব্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া নসোঽদ্যকশ্চনাশ্রুত মমতমবিজ্ঞাত মুদাহরিষ্যতীতিহ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ ॥ ৫ ॥"

"যদু রোহিত মিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি বিদাঞ্চক্রুর্যদু কৃষ্ণমিবাভূদিত্যন্নস্যরূপমিতি বিদাঞ্চক্রুঃ ॥ ৬ ॥

"যদ্ববিজ্ঞাত মিবাভূদিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস ইতি তদ্বিদাংচক্রুঃ ॥ ৭ ॥"

ছান্দোগ্যোপনিষদ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড।

"যদিও তিনি ঐ তেজ, জল ও অন্ন নামক তিন দেবতার এক একটীকে ত্রিগুণিত করিলেন, অর্থাৎ তিনটীকে পরস্পর মিশ্রিত করিলেন, তথাপি যেরূপে ঐ তিন দেবতার প্রত্যেকের ত্রিগুণিত এক একটীকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায়—তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

"অগ্নি একটী ত্রিগুণিত মিশ্র ভূত। ঐ ত্রিবৃৎকৃত অগ্নির যে লোহিতরূপ, তাহাই অত্রিবৃৎকৃত অগ্নির রূপ। উহার যে শুক্ল-

রূপ, তাহাই জলের রূপ। আর উহার যে কৃষ্ণরূপ, তাহাই অন্নের রূপ। এই প্রকার রূপত্রয় মিশ্রণে এখন যেটাকে অগ্নির রূপ বলিয়া মনে করা হয়, তাহার অগ্নিত্ব অপগত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহা প্রকৃত পক্ষে অগ্নির রূপ নহে। ইদানীন্তন অগ্নি নাম রূপাত্মক বাগ্‌ব্যবহার মাত্র। প্রকৃতরূপ লোহিতাদি তিনটী, ঐ তিনটী রূপই সত্য, প্রকৃত নাম তেজঃ প্রভৃতি তিনটী, ঐ তিনটী নামই সত্য ॥ ১ ॥

"আদিত্যের যে লোহিত রূপ, তাহাই তেজের রূপ। উহার যে শুক্লরূপ, তাহাই জলের রূপ। আর উহার যে কৃষ্ণরূপ, তাহাই অন্নের রূপ। এই প্রকার রূপত্রিতয়ের মিশ্রণোৎপন্ন আদিত্যের আদিত্যত্ব নাই। ইদানীন্তন নাম ও রূপ বাগ্‌ব্যবহার মাত্র। রূপ তিনটী ইহাই সত্য।"

এই অগ্ন্যাদি দৃষ্টান্ত হইতে নিখিল জগতের পরম কারণরূপ সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে বিদিত হইয়া মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয় আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সকল বলিয়াছিলেন, ইদানীং আমাদের কুলে কেহই কোন অশ্রুত মত ও অবিজ্ঞাত বস্তু বলিবে না, কারণ, তাঁহারা এই তিন লোহিতাদি রূপ হইতে পরম কারণকে বিদিত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥"

"যাহা কিছু লোহিতের ন্যায়, তৎসমস্তই তেজোরূপ, যাহা কিছু শুক্লের ন্যায়, তৎসমস্তই জলের রূপ এবং যাহা কিছু কৃষ্ণের ন্যায়, তৎসমস্তই অন্নের রূপ বলিয়া তাঁহারা বিদিত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥"

"আর যাহা কিছু অবিজ্ঞাতের ন্যায়, তৎসমস্তই এই তিন দেবতার সমষ্টিরূপ বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥"

উদ্ধৃত যুক্তিপ্রণালী হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, নাম ও রূপের স্থূলভাবে শব্দমাত্রে সত্তা হইলেও সূক্ষ্মভাবে সত্যে বা বস্তুর নিত্যউপাদানেই ইহাদের সত্য অর্থাৎ স্থূল দৃষ্টিতে সমস্ত বস্তু জগতের নাম ও রূপের, ভাষাতে ব্যতীত অন্যত্র সত্তা অনুভূত না হইলেও, তত্ত্বদৃষ্টিতে ইহাদের বাস্তব সত্তাই বিদ্যমান দেখা যায়। এই প্রকার পাশ্চাত্য দর্শনে এবিলার্ডে নামবাদ ও স্বরূপবাদের যে সমন্বয় দেখিতে পাইয়াছি—উপনিষদে স্মরণাতীতকাল হইতেই সেই সমন্বয় সাধিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইলাম।

উপনিষদ ব্রহ্মেই নাম রূপের শেষ আধার আবিষ্কার করিয়াছ। পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটো পরমেশ্বরের মনে প্রত্যেক বস্তুর প্রথম দর্শন (Arch type) থাকার যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা উপনিষদের উল্লিখিত সিদ্ধান্তেরই ছায়া দেখিতে পাই। প্লেটোর স্বরূপ রাজ্যের প্রকৃত মর্ম্ম নিম্নোদ্ধৃত স্থল হইতে বুঝিতে পারা যাইবে ঃ—

"Thus Plato is led to a supra-sensible world, more real than the common world of sense, the unchangeable world of ideas, which alone gives to the world of sense whatever pale reflection of reality may belong to it. The truly real world, for Plato, is the world of ideas; for whatever we may attempt to say about things in the world of sense, we can only succeed in saying that they participate in such and such ideas, which, therefore constitute all their character. The Problems of Philosophy (Home University Library p. 144).

"এই প্রকারে প্লেটো অতীন্দ্রিয় জগতে উপস্থিত হইয়াছেন। এই জগৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ অপেক্ষা অধিক সত্য,

ইহা জ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয় জগৎ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যে কিছু অস্পষ্ট সত্যের প্রতিভাস, তাহা ইহা হইতেই আসিয়া থাকে। প্লেটোর পক্ষে জ্ঞানের জগৎই প্রকৃত সত্য জগৎ। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বস্তু সকল সম্বন্ধে আমরা যাহাই কেন বলিতে চেষ্টা করি না—ইহারা এই এইভাব ধারণ করে এই বলিয়াই আমরা তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকি। সুতরাং ঐ সমস্ত ভাবই ইহাদের প্রকৃতিকে গঠন দিয়া থাকে।"

"স্বরূপ" কথাটীতে "রূপের" মূলতত্ত্বটী অতি সুন্দর ভাবেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত ব্রহ্মস্বরূপেও যে বিশ্বরূপের আদি সত্যের উপলব্ধি হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদে "রূপ" শব্দকে যে আমরা ভক্ত রূপ ও স্বরূপ উভয়ার্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি—তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, রূপটী একেবারে মিথ্যা বস্তু নহে, ইহার একটী সত্য সত্তাই বিদ্যমান আছে। উপনিষদের ন্যায় প্লেটোর দর্শনেও স্বরূপার্থে 'রূপ' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়, যথা—"This pure essence is what Plato calls idea or "form." The Problems of Philosophy. (Home University Library p. 143).

এই শুদ্ধসত্তাকেই প্লেটো "মনোভাব" বা "রূপ" বলিয়াছেন।"

নাম শব্দের প্রকৃতার্থের আলোচনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের আরও দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। 'নাম'কে আমরা বস্তুর সংজ্ঞা বলিয়াই জানি। কিন্তু ইহা শব্দ মাত্রেরও বাচক। "শব্দ" আবার মনোভাবেরই বাহ্যরূপ, কারণ শব্দযোগেই ভাবের প্রকৃত অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দশরীর ধারণ না করিয়া ভাবের বাহ্যবিকাশ কখনও সম্ভবপর হয় না। অথচ ঈশ্বরের সঙ্কল্প বা ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাতে সৃষ্টির প্রবর্ত্তনের সহিত যে নাম বা শব্দের অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা পরিষ্কারই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এইরূপে নাম বা শব্দ হইতেই সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় স্রষ্টা বা ব্রহ্ম নাম বা শব্দেরই সহিত অভিন্নতত্ত্বরূপে পরিগণিত হইয়া—"শব্দ ব্রহ্ম" এই আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে এই তত্ত্বই Logos বা "শব্দ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

নামতত্ত্বকে এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত অভিন্ন বলিয়া বুঝিলেই প্রত্যেক নামে যে আমাদের একটী সাধারণ জ্ঞানের অনুভূতি হয়, তাহার প্রকৃততত্ত্ব আমরা সহজেই পরিস্ফুট করিতে পারি। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সর্ব্ববিষয়ক ব্যাকরণ জ্ঞান তাঁহার সহজ সংস্করণে পরিণত। সেই সহজ সংস্কারের সঙ্কেতরূপে নাম বা শব্দের যোগে তাহা আমাদেরও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে পরিণত হইয়া থাকে।

এই প্রকারে ভারতীয় দর্শনের নামবাদ ও স্বরূপবাদে যেমন আমরা বিশ্ববিকাশরহস্যের সন্ধান পাইতেছি—তেমনই বিশ্বের মূল রহস্যেরও সন্ধান পাইতেছি

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

* * *

জীবন-সংগ্রাম।

জীবন-সংগ্রাম কথাটী এদেশের নিজস্ব না হইলেও, কালমাহাত্ম্যে অনেকের মুখে ইহার প্রয়োগ শুনিতে পাওয়া যায়। অন্ন-চিন্তা যতই ভয়ঙ্করী হইতেছে, জীবন-সংগ্রামের অর্থ ততই লোকের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে। সাধারণতঃ অন্নকষ্ট জীবন-সংগ্রামের কারণ বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু উহা ছাড়া আরও এত অধিক সংখ্যক শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া মানবগণকে অহরহঃ আত্ম-রক্ষা করিতে হইতেছে যে, তাহার শেষ নাই। আমাদের চতুষ্পার্শে, চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালে কালরূপী শত্রুসমূহ প্রতিক্ষণ শিকার-চেষ্টায় ফিরিতেছে। এক পক্ষে শত্রু সকলের দুর্দ্দমনীয় আক্রমণ, অপর পক্ষে আত্মরক্ষার্থ প্রাণপণ যত্ন; এই উভয় শক্তির (Forces of preservation and destruction) সঙ্ঘর্ষই জীবন-সংগ্রাম।

কথাটী সংক্ষেপে বলা হইল, কিন্তু উহার প্রকৃত তথ্য বুঝিতে হইলে আরও একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। প্রাণীতত্ত্ববিৎ মহাত্মা ডারউইন (Charles Darwin) জীবন-সংগ্রামকে সৃষ্টির সমতা রক্ষার উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মৃত্যু অপেক্ষা সৃষ্টির পরিমাণ এত অধিক যে, জীবসমূহের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবের স্থান সঙ্কুলান হইত না। প্রফেসার ওয়ালেস্ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, একটী মাত্র পুরুষ ও স্ত্রী মক্ষিকার বিংশতি সহস্র সদ্যঃপ্রসূত মাংসভুক শাবক জন্মিতে পারে এবং ঐ সকল মক্ষিকা-শাবক হইতে যে নূতন মক্ষিকার জন্ম হয়, তদ্দ্বারা একপক্ষ বা পোনর দিনে বিংশতি কোটি বুভুক্ষ-শাবকের উৎপত্তি সম্ভব। প্রফেসার লিনিয়াসের (Prof. Linnæus) মতে একটী মৃত অশ্বদেহ উদরস্থ করিতে একটী সিংহ অপেক্ষা মক্ষিকাগণের অধিক সময় লাগে না। কীটের উৎপাদনী শক্তি যে চিরপ্রসিদ্ধ, তাহা ক্রিমি-কীট এবং দেহাভ্যন্তরীণ অন্যান্য কীটাণুর সংখ্যা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। মেরুদণ্ড (শিরদাড়া) বিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে মৎস্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তানোৎপাদন-পটু। একটী মাত্র কড মৎস্যের নব্বই লক্ষ ডিম হইতে পারে, তবে সব ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয় না। পরীক্ষার দ্বারা ইহাও স্থির হইয়াছে যে, কলেরা রোগের একটী কীটাণু সুযোগ পাইলে একদিনে ১৬০০০০০০০০০০০০ কীটাণুর উৎপাদন করে। এই সকল সংখ্যা অঙ্ক দ্বারা স্থির হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে জীব-সৃষ্টির এমন অবাধগতি না থাকিলেও, জীবের ধর্ম্ম এই যে, সুযোগমাত্র উহা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং জন্মগ্রহণান্তর সকলেই স্থানলাভার্থ চেষ্টা করে। পৃথিবীর যেখানে যে স্থানটুকু আছে, পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জীব-গণে পরিপূর্ণ। জীবের সংখ্যা এত অধিক যে, স্থানাভাব বশতঃ সঙ্ঘর্ষণ ব্যতীত তাহাদের থাকিবার উপায় নাই। কোন এক শ্রেণীর জীব যদি দৈবকারণে অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে

যে, অপর কোন জীবশ্রেণীর অভাব বা অল্পতা ঘটিয়াছে। প্রাণীগণের ঈদৃশী স্থানাধিকার-চেষ্টা হইতে জীবন-সংগ্রামের উৎপত্তি। সংগ্রামের বিরাম নাই, তবে হ্রাস বৃদ্ধি আছে। মানুষে মানুষে সংগ্রাম বাধিলে, একপক্ষ যদি সুবিধাজনক স্থানলাভে সমর্থ হয়, তবে সেই পক্ষ অপরের প্রতি অধিকতর শক্তি প্রকাশ করে; জীবন-সংগ্রামে ইতর প্রাণী এবং উদ্ভিদসমূহের মধ্যেও সেই নিয়ম। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উহা কখনও ভীষণ, কখনও বা শান্তভাব ধারণ করিতেছে। জল বায়ু, আলোক এবং স্থানাহারের নিমিত্ত প্রতিযোগিতা ব্যতীত সাক্ষাৎ শত্রু, কীটাণুর আক্রমণ এবং পীড়ার বিপক্ষেও অবিরাম যুদ্ধ চলিতেছে ?

জীবের বংশবৃদ্ধি-সম্ভাবনা কত অধিক এবং স্বাভাবিক নিয়মাধীনে, উহা কিরূপ সঙ্কুচিত রহিয়াছে, নৈসর্গিক কারণ বশতঃ কিয়ৎকালের জন্য যখন সেই নিয়মগুলির ব্যতিক্রম ঘটে, তখনই আমরা এ বিষয়ের প্রমাণ পাই। সময়ে সময়ে অসংখ্য পঙ্গপাল, প্রজাপতি এবং অন্যান্য পতঙ্গ দৃষ্ট হয়; কখনও বা ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে দেশ উৎসন্ন যাইতে থাকে। জীবোৎপত্তির অন্তরায় সকলের ক্ষণিক অপসারণই উহার হেতু। শুধু কীট পতঙ্গ কেন, অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের জীব এবং স্বল্প পরিবর্ত্তনশীল উদ্ভিদ্ সমূহেরও এইরূপ আত্মপ্রসারণ ও আত্মসংকোচ ঘটিতেছে। একশ্রেণীস্থ জীবের আত্মসংকোচ ঘটিলে অপর একশ্রেণীর আত্মপ্রসাবণ অবশ্যম্ভাবী। প্রফেসার গুডরিচ্ এসম্বন্ধে তাঁহার Evolution নামক পুস্তকে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। দক্ষিণামেরিকা প্রদেশে স্পেনীয়েরা যখন সর্ব্ব প্রথম অশ্ব, গো, মহিষাদির আমদানী করেন, তখন অল্প দিনের মধ্যেই ঐ সকল পশুর বহুল পরিমাণে বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার খরগোসজাতি, ফিলক্সিরা (Phylloxera) নামক ইউরোপের দ্রাক্ষাকীট, উত্তরামেরিকার অরণ্যধ্বংসকারী ইউরোপজাত জিপ্সী মথ (Gipsy moth), নিউজিলণ্ডের নদীপ্রবাহরোধকারী শৈবালবিশেষ এবং আমেরিকাজাত যে সকল জলজ তৃণ ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী নদীসমূহ ভরাট করিয়া দেয়, ইহারা সকলেই জীবের অপেক্ষাকৃত বাধাবিহীন আত্ম প্রসারণের দৃষ্টান্ত।

সংগ্রামের গুরুত্ব অনুমান করিতে হইলে মৃত্যু সংখ্যা নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। যে প্রদেশের প্রাণীসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তথায় প্রত্যেক শ্রেণী বা বংশস্থ জীবেরও তারতম্য হয় না, বুঝিতে হইবে। এরূপ স্থলে এক বংশে একেবারে যে কয়েকটী সন্তানোৎপন্ন হয়, গড়ে তাহার একটী করিয়া জীবিত থাকে। সেইটী ভাগ্যবান জীব, কেন না সে সমর-বিজয়ী। তদ্দ্বারা বংশটী রক্ষা পায়, এবং ভাবী সন্তানগণ জীবনের সফলতা লাভ করে।

জীবন-সংগ্রাম প্রসঙ্গে আরও দুইটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন, যথা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection) এবং দৈহিক যোগ্যতা (adaptation)। সংগ্রামে যে জয়ী হয়, অর্থাৎ শৈশব হইতে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত আত্মপ্রসারের বাধাগুলি অতিক্রম করিতে পারে সেইটী প্রকৃতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত জীব। প্রকৃতি যেন সহস্র প্রাণীর ভিতর হইতে সেই জীবটী বাঁচিবার উপযোগী বলিয়া বাছিয়া লইতেছেন! আর

এই নির্ব্বাচনের ফলস্বরূপ জীবসমূহ তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থিত অনুকূল অবস্থার সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার অথবা প্রতিকূল অবস্থার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভের উপযোগী যে শারীরিক গঠনের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে দৈহিক যোগ্যতা বলে (adaptation)। প্রকৃতির নির্ব্বাচন-প্রণালীকে সোজা কথায় একখানি 'চালনী' বলা যায়। প্রকৃতিদেবী যেন প্রতিক্ষণ চালনী দ্বারা আবর্জ্জনাস্বরূপ অক্ষম ও অপটু জীবদিগকে ছাটিয়া ফেলিয়া, যাহারা কেবল জীবন ধারণে সমর্থ, তাহাদিগকেই গ্রহণ করিতেছেন। বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকে যোগ্যের উত্থান (Survival of the fit) এবং অযোগ্যের পতন (Elimination of the unfit) কহে।

প্রকৃতির বাছনির ফলে যে সকল জীবের জীবন-ধারণ-যোগ্যতা কম, তাহাদের সন্তান সন্ততিও তদনুরূপ কম শক্তিসম্পন্ন হয়। যোগ্য ও অযোগ্যের পার্থক্য এই যে, জন্মপরম্পরালব্ধ সামর্থ্য একের জীবনে যত সফলতা প্রদান করে, অন্যের জীবনে তত করে না। এই দুই প্রকার জীবের একটী সুপথগামী, অপরটী বিপথগামী। যাহারা পুরুষানুক্রমে অনুকূল পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য্য হয়, অর্থাৎ অধিকদিন জীবিত থাকে এবং দীর্ঘায়ু সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হয়। কে কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা জীবন-সাফল্য না দেখিয়া অনুমান করা যায় না। জীব মাত্রেই জন্মের সহিত পিতৃপুরুষদত্ত যে সকল বিশেষত্ব লাভ করে, ও বর্ত্তমান জীবনের অর্জ্জিতগুণ সমূহ, উভয়ের উপরে নির্ব্বাচন-ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত। উহাদের সহিত ঘটনা সমূহের ঘাতপ্রতিঘাতে জীবনরক্ষণোপযোগী যোগ্যতার উদ্ভব না হইলে, জীবের অকাল মৃত্যু ত অবশ্যম্ভাবী; পরন্তু এক বংশোদ্ভব সকল জীবেরই এইরূপ অধোগতি হইতে থাকায়, কালক্রমে সেই বংশটাই লোপ পায়।

নির্ব্বাচনের ফলে জগতের কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে ডারউইন-প্রদত্ত মার্জার ও ক্লোভার (Clover) নামক ত্রিপত্র উদ্ভিদের উদাহরণটী কৌতুহলোদ্দীপক; কেননা, ইহাদের আকার প্রকারগত বৈষম্য অত্যন্ত অধিক। মৌমাছির দ্বারা রক্ত ত্রিপত্র (Red clover) সারবিশিষ্ট হয় বলিয়া, যে স্থানে ক্লোভার জন্মে, তথায় মৌচাকের অবস্থিতি বশতঃ ইন্দুরের দৌরাত্ম্য অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু, মূষিক-ভক্ষণকারী মার্জ্জারের সংখ্যাও তথায় অধিক হওয়ায়, ইন্দুরের বংশ বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং তাহাতে ক্লোভারগুলি রক্ষা পায়। এখানে ক্লোভার উৎপাদনের সহিত মার্জ্জারের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রতিপন্ন হইল। সেণ্টহেলেনা দ্বীপে যখন সর্ব্বপ্রথম ছাগজাতির আমদানি হইয়াছিল, তখন তাহাদের দ্বারা যে উদ্ভিদেরই পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা নহে; আবহাওয়ারও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার কারণ, ছাগসমূহ বংশবৃদ্ধি সহকারে আরণ্যবৃক্ষের অঙ্কুরগুলি সমূল ভক্ষণ করায় অরণ্য সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল এবং অরণ্যের অভাব বশতঃ ধাতুরও পরিবর্ত্তন ঘটে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক প্রকার মক্ষিকা দ্বারা বিষাক্ত পীড়ার বীজ সংক্রামিত হওয়ায় তথাকার গো মেষাদি পশুর জীবনরক্ষা কষ্টসাধ্য হইয়াছে। পক্ষান্তরে, অ্যানোফিলিস্ (Anopheles) জাতীয়

মশক দ্বারা ম্যালেরিয়া-বীজ নীত হইয়া স্থানীয় মনুষ্য সমাজেরও যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছে। এই সকল ঘটনা বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর মধ্যে বৈরীভাবের প্রমাণ। জীবন-সংগ্রাম স্বজাতীয় এবং স্ববংশস্থ জীবের যে বিরাট পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে, পার্ব্বত্য প্রদেশ, মরুভূমি এবং উষ্ণ প্রধান দেশের জলাভূমিতে উৎপন্ন তরুগুল্মের মধ্যে তাহার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। শীতাতপ প্রভৃতি ঋতু পরিবর্ত্তনের ফলে কখনও বা এক জাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি, অপরের হ্রাস; একের ধ্বংস, অপরের উদ্ভব ইত্যাদি ঘটনা নূতন নহে।

মানবজাতির জীবন-সংগ্রাম সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ বলিয়া তথা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের চিহ্ন সকলও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে সকল ঘোরতর সংগ্রামে সমাজ বিধ্বস্ত হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকেই যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের এক একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। নির্ব্বাচন সমাজের অঙ্গে যত অধিক চিহ্ন রাখিতে পারে, ব্যক্তিগত হিসাবে তত পারে না। আমেরিকার প্রাণীতত্ত্ববিৎ বম্পাস্ সাহেব এক সময়ে একজাতীয় কয়েকটী প্রাণীর মধ্যে নির্ব্বাচন লক্ষণ প্রমাণ মানসে ঝটিকা-বিতাড়িত ১৩৬টী চড়ুই পক্ষী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঝড়ের বেগে সকল পক্ষীগুলিই আহত হইয়াছিল, কিন্তু উহাদের ৭২টী আরোগ্যলাভ করিল, বাঁকী ৬৪টীর মৃত্যু হইল। নিঃ বম্পাস্ জীবিত ও মৃত চড়ুইর দৈহিক পরিমাণ গ্রহণ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ৬৪টীমৃত পক্ষীর দেহ জীবিতদিগের অপেক্ষা অধিক ভারী ও লম্বা, অথচ আকারে ক্ষুদ্র। তিনি আরও দেখিলেন যে, জীবিত পক্ষীগুলির দৈহিক গঠন সুদৃশ্য, ও পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য নাই বলিলেই হয়। উক্ত পরীক্ষা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যতগুলি চড়ুই দৈহিক উৎকর্ষে আদর্শস্থান লাভ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ঝড়ের আঘাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

বর্ত্তমানে ব্যাধিই মনুষ্যের প্রবল শত্রু বলিয়া পরিগণিত। সরকারি রিপোর্ট সমূহ হইতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ প্রদেশে মোটের উপর ৫,১৮০০০ লোকের মৃত্যু হয়; তন্মধ্যে দৈব দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা-১৮০০০ এবং বাঁকী পাঁচলক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ পীড়া। পাঁচ লক্ষের মধ্যে ক্ষয়রোগে ৫৫,০০০, নিউমোনিয়ায় ৩৬০০০, ক্যান্সার রোগে ৩২,০০০, হামে ১২,০০০, উদরাময়ে ১০,০০০, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৯০০০, ঘুংরিকাশিতে ৭০০০, ডিপ্থিরিয়ায় ৫০০০, জ্বরে ৫০০০ এবং অবশিষ্ট লোক অন্যান্য রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উক্ত পাঁচ লক্ষের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ১০০০০০ একলক্ষ বা সমগ্র মৃতের এক পঞ্চমাংশ ছিল।* ভারতবর্ষে প্লেগে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইতেছে। কলেরা, ম্যালেরিয়া ও বসন্ত-রোগের মৃত্যু সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। মৃত্যুর সংখ্যা দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, মানব জাতি যেন অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা হইতে পারে না। লৌকিক কারণ বশতঃ স্থল বিশেষে সংখ্যার কিছু ইতর বিশেষ হইলেও, সমগ্র মানব

---

* এই তালিকাটী প্রফেসার গুড্রিচের Evolution নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।

জাতির যে হ্রাস বৃদ্ধি নাই, তাহা পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সমূহ হইতে অনুমান হইতেছে।

একদেশদর্শী জ্ঞানের ফলে আমরা যে অকাল মৃত্যুকে সমাজের অনিষ্ট-সাধক মনে করি, বিবর্ত্তবাদীগণের মতে তদ্দ্বারা অপটু, রুগ্ন অথবা রোগপ্রবণ জীবের উচ্ছেদ সাধন হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সবল, কার্য্যক্ষম ও সুস্থদেহ জীবের সৃষ্টি ও কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ত হইতেছে। সংসারে অকর্ম্মণ্য বা অপটু জীবের অধিকার নাই, পদে পদে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। দুদিন আগে বা পরে তাহাদের উচ্ছেদ হইবেই এবং অপেক্ষাকৃত সমর্থ সুতরাং দীর্ঘায়ু জীব তাহাদের পরিত্যক্ত স্থানগুলি আশ্রয় করিবে। জগৎব্যাপী জীবন-সংগ্রাম যেন জগতের হিতার্থ কল্পিত এবং জীবের ক্রমোন্নতি তাহার ফল। পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সৃষ্টিতে অপূর্ণের স্থান নাই, জীবন-সংগ্রামের আলোচনা হইতে যেন তাহারই আভাস পাওয়া যায়!

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

মাহিষ্য জাতির প্রাচীন কীর্ত্তি।

মেদিনীপুর, পূর্ব্ববঙ্গ, ২৪-পরগণা, নদীয়া, হুগলী, হাবড়া প্রভৃতি মাহিষ্য-প্রধান স্থানে ভ্রমণ করিলে মাহিষ্যের প্রাধান্য ও ইঁহাদের দেবকীর্ত্তির ভুরি ভুরি চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়। খুর্দা, ময়না, তুর্কা, সুজামুঠা, নান্নার, ভাকুর্ত্তা, বংশীকুণ্ডা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও তালুকদারী মহাল ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমাদের পশ্চিম বঙ্গে ৺রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালী, ৺রাণী জগদম্বা দেবীর চানকের কীর্ত্তি, তাজপুরের রায়গণের প্রাচীন দেবালয় সমূহ, গড় ভবানীপুরের কেরাণী মহাশয়গণের প্রাচীন দেবালয় সমূহ, বাওয়ালীর মণ্ডল ভূস্বামী বাবুদের দেবক্রিয়া-কলাপ ও দেবকীর্ত্তির সুব্যবস্থা, তাঁহাদিগের অতীত গৌরবের জ্বলন্ত ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত ঘোষিত হইতেছে। বাওয়ালীর মণ্ডল ও গড় ভবানীপুরের কেরাণীগণের দেবালয়াদি দর্শন করিলে বোধ হয় যে স্থপতি তাহার কার্য্য সমাধা করিয়া এই ক্ষণ মাত্র নামিয়া আসিয়াছে। এইরূপ গৃহ-নির্ম্মাণ-বৈচিত্র্য আজ কাল অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। আবু-শৈল-শিখর-শোভিত জৈনদের মন্দিরের, সাহাবাদের রুহিতাস্ব দুর্গের প্রাচীন তাম্রফলক-শোভিত সৌধাবলী, দিল্লীর দেওয়ানী খাসের, তুঙ্গাভদ্রানদী-তীরস্থিত বহু পুরাতন কালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু দেবালয় সমূহের নির্ম্মাণ পারিপাট্য এইরূপ। বাওয়ালীর মণ্ডল-বাবুদের, কেরাণীবাবুদের, রঙ্গপুর জেলার ব্রাহ্মণডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জমিদার এবং বলিহারের বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রাজা মাহিষ্য-যাজী দ্রাবিত্য গৌড় বৈদিক ব্রাহ্মণের দ্বারাই শ্রীশ্রী৺দেবী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণের নামে সংকল্প করিয়া মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ দেবীর দেব সেবার কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত সন্তোষপুর মঠের মোহান্তগণ অস্মরণীয় কাল হইতে মাহিষ্য-যাজী সেবক দ্বিজ দ্বারাই দেবীর পূজা ও ভোগাদি সেবা কার্য্য সম্পাদন করাইয়া আসিতেছেন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কুতুবপুর

রাজ্য আর একটী প্রধান প্রাচীন রাজ্য বলিয়া ইতিহাস-পৃষ্ঠে কথিত। ৺গদাধরের কুলজীর ১৬০ শ্লোকে এই রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ বীর ভূপাল রাজা দলজীৎ সিংহ ও ভিখারী সিংহ বাহাদুর বিগত পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে অত্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করিয়া পশ্চিমে ও উত্তরে গয়া জিলা পর্য্যন্ত শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। এই রাজাদের বেহার প্রদেশের রাজধানী বেহার গ্রামের নিকটবর্ত্তী নালন্দা গ্রামে ছিল। ইহাদের দুর্গের ভগ্নাবশেষ গ্রাম্য লোকে অদ্যাবধি দেখাইয়া থাকে। এই ভূপাল বংশের বংশধরগণ এখনও বঙ্গ ও বিহার প্রদেশের স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছেন। গয়া জিলার অন্তর্গত মোগলসরাই রেল লাইনের মোহরর পঞ্চানে নদীর পুলের পর পারে যে ভগ্নাবশেষ দুর্গ দৃষ্ট হয়, তাহা এই রাজ-বংশধরগণের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। গয়া অঞ্চলে এই দুর্গ "কাম্‌দার খানি গড়" নামে বিখ্যাত হইয়া থাকে। মাহিষ্য প্রকাশ প্রথম ভাগে প্রকাশিত তমলুকের প্রাচীন ইতিহাস ও ৺গদাধরের কুলজীপাঠ করিলে এই জাতির প্রাচীন কীর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক সত্য বিশ্বজগত জ্ঞাত হইবেন। কুতুবপুর রাজ্যের পর তুর্খা রাজ্যের কথা বলা প্রয়োজন। তুর্খারাজ ও খুর্দা-রাজ গজেন্দ্র ও গজপতি-বংশ-সম্ভূত। ইঁহারা উভয়েই মাহিষ্য ক্ষত্রিয়। খুর্দ্দার গজপতি এবং তুর্কার গজেন্দ্র মহাপাত্র বংশের জ্ঞাতিবর্গ, যাঁহারা পুরীধামের সমীপে বাস করিতেছেন বলিয়া জানা যাইতেছে, তাঁহাদের সমস্ত কোর্ষীনামা এবং বংশধারার বিদ্যমান সন্তানগণের দলিলাদি পরীক্ষিত হইয়া গেলে, উৎকলের মাহিষ্য গজপতি ও তুর্খার গজেন্দ্র মহাপাত্র বংশ-বিবরণে বঙ্গীয় মাহিষ্য জাতির ইতিহাস সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া অকারণ শত্রু ও ঈর্ষান্বিত দুষ্ট ব্যক্তিগণের মুখে কালিমা নিক্ষেপ করিয়া, মাহিষ্য জাতির ইতিহাস আলোচনায় যে সকল মহাত্মা প্রীতি লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অসীম আনন্দ বৃদ্ধি করিবে, সন্দেহ নাই। এই গজেন্দ্র মহাপাত্র-বংশ তুর্খার বহু শতাব্দী যাবৎ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছেন, অধুনা কালের কাঠোর শাসনে জমীদার রূপে বাস করিতেছেন। মেদিনীপুর জেলার পাঁচটী স্বাধীন রাজ্যের কথা কাহার অবিদিত আছে? (মাহিষ্য প্রকাশ ৩৫৭-৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মোহনলাল মাহিষ্য ক্ষত্রিয় জাতীয় লোক ছিলেন। বাদসাহ আকবরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিমু (হেমন্ত সিংহ বা হেমচন্দ্র সিংহ) মাহিষ্য ক্ষত্রিয় ছিলেন। (২৪-পরগণা বার্ত্তাবহে প্রকাশিত মণ্ডল বংশের ইতিহাস দেখ)। নাথার ও ভাকুর্ত্তার রায় বংশীয়গণ পূর্ব্ব বঙ্গে বিশেষ সম্মানিত। নবাব সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি ঢাকার ডেপুটী গভর্ণর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যশোবন্ত রায় ভাকুর্ত্তার রায় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কালীপাড়ার হাজরা বংশ, জয়মণ্ডপের বিশ্বাসগণ এবং সাভারের রায় জমীদারগণ পূর্ব্ব-বঙ্গে প্রবল ভূম্যধিকারী।

বঙ্গের কত অপরিজ্ঞাত নিভৃত্যস্থানে মহামূল্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? বিস্মৃতির অন্ধ তমসাচ্ছন্ন গুহায় পতিত হইয়া ঐতিহাসিক পরিচ্ছদ হারাইয়া কঙ্কালাবশেষ হইয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে অক্ষম হইয়া পড়ি-

তেছে। কালে কঙ্কালাবশেষ টুকু বিলুপ্ত হইয়া গেলে স্মরণের আর কিছুই থাকিবে না।

মেদিনীপুর প্রদেশে মাহিষ্য জাতীয় পঞ্চ রাজ্যের বিবরণ ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের ডিষ্ট্রীক্ট্ সেনসাস রিপোর্টে সবিস্তার লিখিত আছে। তন্মতে তমলুক, সুজামুঠা, ময়না, তুর্কা ও কুতুবপুরের আদি পাঁচজন রাজা অযোধ্যার সরযূতটে বাস করিতেন এবং তাঁহাদের বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাদের নেতৃত্বে ৮২২ শকে বা ৮৯৬ খ্রীঃঅব্দে অযোধ্যা প্রদেশ পরিত্যাগ করত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নিমাড়ের নিকট মধ্যভারতাভিমুখে ও ক্ষার-দ্বীপে আসন্ন প্রদেশে গিয়া প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা উক্ত পঞ্চবীরের অধীনে মধ্য-ভারতের পূর্ব্ব পার্শ্ব ভেদ করিয়া নানা জনপদ আক্রমণ ও অধিকার করিয়া সমুদ্র-তটে উপনীত হন এবং সমুদ্রের তট ধরিয়া উৎকল দেশে প্রবেশ করেন এবং উহা ভেদ করিয়া মেদিনীপুর প্রদেশে অবশেষে শেষ-উপনিবেশ স্থাপন করিয়া অবস্থিত হন। ইঁহাদের অনেক জ্ঞাতি ও পুরোহিত-বর্গ, যাঁহারা কিছুকাল পূর্ব্বে দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশে বসবাস করিয়াছিলেন, এইসময় ইঁহাদিগের সহিত কতক কতক মিলিত হইয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জনসমূহের নেতা পঞ্চবীর পঞ্চমাহিষ্য ক্ষত্রিয় রাজ্য স্থাপন করেন। এই পঞ্চ রাজ্যের নাম—১। তমলুক, ২। বালিসীতা, ৩। তুর্কা, ৪। সুজামুঠা, ও ৫। কুতুবপুর। বালিসীতার রাজবংশ হইতে ময়নার রাজবংশ উদ্ভূত হইয়াছে। ময়না ও কুতুবপুরের সামান্য ইতিহাস পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। তমলুক, সুজামুঠা ও বালিসীতার ইতিবৃত্ত যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে, পরে লিখিত হইতেছে। বহু সহস্র বিজয়ী বীর অযোধ্যা হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত গমন করিলে, তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি পথিমধ্যে কোন দেশ অধিকার করিয়া অবস্থান করেন নাই, ইহা বলা যায় না। যে জাতি এইরূপে ঠিক রাজপুত (ক্ষত্রিয়) জাতির স্বভাব অনুসারে বিজয় ব্যাপারে নির্গত হইতে পারেন, তাঁহারা কদাচ প্রকৃত শূদ্র শ্রেণীর লোক হইতে পারেন না।

যে জাতি মহাত্মা রিজলীর মতে "একদিন সকলের প্রতি প্রভুর ন্যায় আদেশ করিবার পদারূঢ় ছিল" সে জাতি কি কখন শূদ্র হইতে পারে? শূদ্রের রাজ্যের কথা ভারত-ইতিহাস ত কোন খানে দেখা যায় না, এই প্রভুশক্তিসম্পন্ন জাতির রাজবংশ ও সমস্ত বংশ হইতে নির্গত হইয়া বহুল বীর সমষ্টি উৎকল জয় করিয়া প্রলয়-পর্য্যন্ত-স্থায়িনী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে গঙ্গা রাঢ়ীয়গণ উৎকল রাজ্য অধিকার করেন এবং তাহারা তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশ হইতে গমন করেন, ইহাই প্রামাণিক প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের মত। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে মেদিনীপুর ও তমলুক দেশ মাহিষ্য জাতীয় কয়েকটী প্রবল দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী স্বাধীন ভূপালের শাসনাধিকার-ভুক্ত ছিল।

"কায়স্থ-মেসেঞ্জার" পত্রিকায় প্রকাশিত সুললিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীর মতে মাহিষ্যজাতি অতিপ্রাচীন কালে বৈদিক যুগে মধ্যভারত হইতে কাবুলনদের তীরে মহিষক প্রদেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই কাবুলনদ প্রাচীন কুরুবর্ষের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং মহিষক দেশ কাবুল ও সোমীনদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী উর্ব্বর

প্রদেশ বলিয়া প্রাচীন ইতিহাস-পৃষ্ঠে পরিচিত। (যোশী মঠে রক্ষিত প্রাচীন ভারতের মানচিত্র, যাহা পরাশর ঋষির কৃত, তাহা দেখ।) এইখান হইতে ইঁহারা মধ্যভারতে মহিষিক প্রদেশে অর্থৎ মাহিষ্য মণ্ডল ওঙ্কারদ্বীপের প্রদেশে (মাহিষ্য সমাজ-দ্বিতীয়ভাগ ১৮৩২৩৮ পৃষ্ঠা দেখ) দ্বিতীয়বার উপনিবেশ স্থাপন করেন। অনেকেই জাঠগণের সহিত মিশিত হইয়া যান। যাঁহারা বিশুদ্ধ থাকিলেন, তাঁহারা কালে মাহেশ্রী বৈশ্য জাতিতে পরিণত হইয়া পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে এই সত্যের অদ্যাবধি প্রমাণ দিতেছেন। কোন হীনবর্ণ জাতিকে সমাজ হইতে বাছিয়া লইতে হইলে মনুর ("সঙ্করে জাতয়স্তেতাঃ পিতৃ মাতৃ প্রদর্শিতাঃ। প্রচ্ছন্না বা প্রকাশ বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥") শ্লোকটীর সত্য প্রয়োগ করিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়। উপরোক্ত শ্লোকের কুল্লুকের টীকা মূলের অর্থ অধিকতর বিশদ করিয়া দিয়াছে। এই প্রদেশ প্রাচীন মাহিষ্যমণ্ডলী হইতেছে। এবিষয়ে বিলাতের খ্যাতনামা পণ্ডিত ডাং ফ্লীট্ এক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রয়েল এসিয়াটিক-সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া সভ্যজগৎকে প্রাচীন মাহিষ্য জাতির সৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় দিয়া মহীয়সী জাতীয় ঐতিহাসিক সত্য প্রচার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের যুক্তি, ন্যায় ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের সত্য আমরা সহজে উপেক্ষা করিতে পারি না।

মাহিষ্যজাতি দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া এক শাখা ওঙ্কারদ্বীপ ও "মাহিষ্যমণ্ডল" প্রদেশ হইতে দক্ষিণে প্রয়াণ করিয়া দ্রাবিড়দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইঁহারাই দ্রাবিড় দেশ হইতে উত্তরে প্রয়াণ করিলে কালে গাঞ্জাম, সম্বলপুর, বেরার, মেদিনীপুর, গড়বেতা, তমলুক প্রভৃতি প্রদেশ হইয়া কলিঙ্গদেশ ভেদ করিয়া রাঢ়ে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহাঁরাই উত্তর এবং দক্ষিণ বা বাঁকা মেদিনীপুর বাসন্দরী ও ধর্ম্মসাগর সমাজের মাহিষ্যে পারিণত হইয়া সমাজে অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। মাহিষ্যের বা মাহেশ্রী জাতির আর এক শাখা উত্তর দেশে প্রয়াণ করিয়া লাহোর, দিল্লী, অযোধ্যাদি প্রদেশে বাস করেন এবং ইঁহারা ক্রমশঃ কর্ণাট প্রভৃতি দেশ হইতে আগত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এক উপশাখা মাহেশ্রী জাতির সহিত মিলিত হইয়া কাশী, গোরক্ষপুর, ফয়েজাবাদ, গাজীপুর অর্থাৎ প্রাচীন সুরসেনীদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এইখান হইতে ক্রমশঃ তাঁহারা গয়া, পাটনা, মুঙ্গের প্রভৃতি দেশ অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশে বাস স্থাপন করিয়া গঙ্গানদের উভয় পার্শ্বের উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্রে বাস স্থাপন করিয়া মাহিষ্য নামে খ্যাত হইলেন। ক্রমশঃ এই শাখার সৈনিকগণ পূর্ব্ববঙ্গে নবরঙ্গ, শ্রীহট্ট, বরান্তর, বারাখিয়া, তেলিচেরা, ভোগবেতাল প্রভৃতির রাজবংশরূপে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই ঘটনা পালরাজগণের রাজত্বকালে সংঘটিত হয়। স্বয়ং পালরাজগণ যে মাহিষ্য জাতীয় বীরপুরুষ ছিলেন, তাহা বর্ত্তমান ঐতিহাসিক গবেষণা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যা ঢাকা-রিভিউ এবং ১৩২০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা "মাহিষ্য-সমাজ" পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব।

অতি প্রাচীন অস্মরণীয় কাল হইতে যে পূর্ব্ববঙ্গে মাহিষ্য-প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণভাবে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহা কোন ঐতিহাসিক পাঠক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ভোগবেতালের নবরঙ্গরায় (২৯ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা নব্য-ভারত পত্রিকা এবং মাহিষ্য সমাজ ১ম ভাগ ২১৮ পৃষ্ঠা দেখ); বংশীকুণ্ডা ও বারাক্ষীয়া (The Mahishyas, Pages 70—'1). সর্ব্বেশ্বর নগর (১৩১৯ সালেব কার্ত্তিক সংখ্যা "প্রতিভা" পত্রিকা, ১৩১৯ সালের আষাঢ়ের "প্রবাসী" অথবা মাহিষ্য সমাজ ১ম ভাগ ২৯৬ পৃষ্ঠা এবং ২ ভাগ ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ) বরান্তর (বিগত ১৩১৯ সালের ২১শে ও ২৮শে তারিখের এডুকেশন গেজেট দেখুন), বঙ্গের পালরাজ-বংশের ইতিহাস (Vide Ramcharita by Sandhyakar Nandi Edited and published by Mahamahapadhya Haraprasad Shastri of the F.R.A.S. (Beng) এবং গৌড় রাজমালা দ্রষ্টব্য) এই জাতির প্রাচীন গুণগরিমা এবং সৌর্য্য ও বীর্য্যের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস বক্ষে লিখিত আছে। পালরাজগণ বৌদ্ধ হইলেও মাহিষ্য সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, তাহা রামচরিতের পাঠক একটু অবধান পূর্ব্বক ঐ পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। বিগত ১৩১৮ সালের ২৭শে বৈশাখ বুধবার তারিখের শিক্ষা-সমাচার পত্রিকা নবরঙ্গ রায় ও ভোগবেতালের ৺গোপীনাথ জীউ সম্বন্ধে যে ইতিহাস শ্রীভুবনেশ্বর চৌধুরী ও মল্লেখনী-সম্ভূত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অত্রস্থলে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"নবরঙ্গ রায় ও ভোগবেতালের ৺গোপীনাথজীর কথা এইবার বলিব। ময়মনসিংহ গড়ে কিছুকাল হইল একটী সাহিত্য-সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, ঐ প্রসঙ্গে তথায় একটী ঐতিহাসিক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, এবং তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (১) নবরঙ্গ রায়ের দীর্ঘিকা ও (২) ভোগবেতালের ৺গোপীনাথজী মন্দিরের আলোক-চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং ঐ ঐ বিষয়ের কিছু কিছু বিবরণও নাকি সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ কার্য্যদ্বারা সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সংক্ষেপে (১) নবরঙ্গ রায় ও (২) ভোগবেতালের ৺গোপীনাথজী সম্বন্ধে কতক বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইল। প্রদর্শনীর সংগ্রাহক কর্ত্তৃক সংগৃহীত বিবরণের সঙ্গে এই বিবরণের কোন অংশে কোন অসামঞ্জস্য থাকিলে তাহা প্রদর্শনীর সংগ্রহকারক মহাশয় এই পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। আমরা সত্য নির্দ্ধারণের জন্য যথাশক্তি সেই অংশের আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি।

জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত হাজরাদি পরগণা মধ্যে চারিপাড়া নামক একটী সমৃদ্ধ গ্রাম আছে। এই গ্রামে নবরঙ্গ রায়ের রাজধানী ছিল। এই স্থান ও তাহার চতুর্দ্দিকে রাজার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, দেবালয় প্রভৃতি এখনও বর্ত্তমান আছে। ঐসকল দর্শন করিলে তাঁহার সমৃদ্ধি, পরাক্রম এবং ধর্ম্মভাবের ছায়া হৃদয়ে কতক প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি প্রথমতঃ পশ্চিম রাঢ় দেশস্থ কোন এক স্থানের রাজা ছিলেন এবং বিপ্লব বশতঃ স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া

উক্ত গ্রামে সানুচর ও সসৈন্য উপনীত হইয়া ঐ প্রদেশ অধিকার করেন, এবং চারিপাড়া গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন।

রাজা নবরঙ্গ রায়ের সঙ্গে তাঁহার দুই সহোদর আগমন করেন। তাঁহাদেরও নাম রক্ষিত আছে। তাঁহার সেনা পরিচালনার্থে চারিজন ভূঁঞ্যা তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন। প্রথমতঃ রাজধানীর চতুর্দ্দিকেই ভূঁঞ্যাগণ স্থাপিত হন। এই চারিভূঁঞ্যার বংশধরগণ (১) কমলাবাড়ী, (২) উলুকান্দি, (৩) তেলিচারা ও (৪) ভোগপাড়ার ভূঞ্যা নামে পরিচিত। ভূঁঞ্যাগণ ঐ ঐ স্থানে পরিশেষে স্থাপিত হন। এই চারি ভূঁঞার বসতি চতুষ্টয়ের সংশ্রবে চারিপাড়া নাম হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ বলেন। সাধারণতঃ ঐ স্থানকে লোকে ভোগবেতাল বলিয়াও নির্দ্দেশ করে। এই জন্যই ৺গোপীনাথজী ভোগবেতালের গোপীনাথ এবং নবরঙ্গ রায় বংশীয়গণ ভোগবেতালের রায় ও চৌধুরী বলিয়া পরিচিত।

চারিপাড়া গ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানের প্রাচীন চিহ্নগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়, নবরঙ্গ রায়ের রাজধানী কিরূপ সমৃদ্ধিপূর্ণ এবং তাঁহার রাজ্য কত বৃহৎ ছিল। বোধ হয়, নবরঙ্গ রায়ের রাজধানী ২।৩ মাইল ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল। তাঁহার খনিত বহুসংখ্যক জলাশয় মধ্যে দুইটী দীর্ঘিকা অতি বৃহৎ। যে দীর্ঘিকার পশ্চিম তীর ভরিয়া নবরঙ্গ রায়ের বাসভবন ছিল, এবং যে স্থানে তদীয় বংশধর পুরুষ পরম্পরায় বাস করিতেছেন, তাহার দৈর্ঘ্য ১৫৬৩ হাত। উহার কতক দূরে দলদাম ও জঙ্গল পরিপূর্ণ অপর একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা অব্যবহার্য্য হইয়া রহিয়াছে। উহার উপরিস্থ জঙ্গলের মধ্য দিয়া এখন গবাদি পশু বিচরণ করিতে সমর্থ। এই সরোবরের একতীরে বনাবৃত উচ্চভূমি। উহা একটী প্রকাণ্ড দুর্গের বিকীর্ণ ভগ্নাবশেষ বলিয়া অনুমান হয়। প্রদর্শনী এই দুই সরোবরের মধ্যে কোন্‌টী আলোক চিত্রে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। ঐ দুই বৃহৎ দীর্ঘিকা ছাড়া রাজা নবরঙ্গ রায়ের খনিত আরো শতাধিক জলাশয়ের চিহ্ন আছে। তাহার কতকগুলি ব্যবহার্য্য, কতকগুলি অব্যবহার্য্য, কতকগুলি শুষ্ক এবং কতকগুলি চিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত। বলিতে কি, রাজার খনিত জলাশয় ও সরোবর সমূহদ্বারা রাজধানীর চতুর্দ্দিক এক সময়ে সমাকীর্ণ ছিল। রাজার বাটীতে নবরঙ্গ রায়ের যে সন্ততিধারা বাস করেন, তাঁহারা ঐস্থানে এখনও একটী সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশ বলিয়া গণ্য, যদিও ইঁহাদের অবস্থা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

রাজবাড়ীর চতুর্দ্দিকে কতকগুলি লোক আছে, তাহাদের মধ্যে নবরঙ্গ রায়ের চতুর্দ্দোলবাহক, বৈঠাদার গলুহাবংশ বিদ্যমান। রায়দের ভৃত্যসংখ্যাও বহুতর।

যে দীর্ঘিকার পশ্চিমতটে রাজা নবরঙ্গ রায়ের বাটী, ঐ দীর্ঘিকা দৈর্ঘ্যে ১৫৬৩ হাত এবং তদনুরূপ বিস্তারবিশিষ্ট। উহার উত্তর তট হইতে উত্তরাভিমুখে প্রায় তিন পোয়া মাইল দূরেই সুপ্রসিদ্ধ “ভোগবেতালের ৺গোপীনাথের” মন্দির। ৺গোপীনাথজী প্রসিদ্ধ ও জাগ্রত দেবতা, এবং রাজা নবরঙ্গ রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। যে দীর্ঘিকার পশ্চিম তটে রাজভবন বিদ্যমান,

ঐ দীর্ঘিকার দক্ষিণপাড় ভেদ করিয়া একটী খাল ঐ দীর্ঘিকা হইতে বাহির হইয়া প্রায় তিন পোয়া মাইল দূরবর্ত্তী উত্তরদিকস্থিত ৺গোপীনাথজীর মন্দিরের লগ্ন পূর্ব্ব পুষ্করিণীতে প্রবেশ করিয়াছে। নবরঙ্গ রায় প্রতিদিন ঐ দীর্ঘিকার ঘাটে নৌকায় উঠিয়া ঐ খালদ্বারা ৺গোপীনাথজীর দর্শনে যাইতেন। এই জন্যই ঐ খালের সৃষ্টি। ৺গোপীনাথজীর মেলা এখনও দোল উপলক্ষে হইয়া থাকে। তাহাতে নানাস্থানীয় বহুলোকের সমাগম হয়। রাজা নবরঙ্গ রায়ের প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি দ্বারা ৺গোপীনাথজীর সেবা নির্ব্বাহ হয়। ৺গিরিশচন্দ্র রায়ের কর্ত্তৃত্ব সময় পর্য্যন্ত রাজপ্রদত্ত তাম্রফলক সেবাইতগণের হস্তে দৃষ্টিগোচর হইত।

রাজা নবরঙ্গ রায় একজন সমৃদ্ধ নরপতি ছিলেন। প্রবাদ আছে, তাঁহার রাজ্যের আয় ৫২ লক্ষ টাকা ছিল। এই কথা নিতান্ত অলীক বলিয়া বোধ হয় না। রাজ্যের বিস্তৃতি রাজবাটী হইতে উত্তরপূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত দুই দিবসের পথেরও অধিক ছিল। এই প্রান্তভাগেই বরান্তর গ্রাম। ববান্তরের ভূঁঞ্যাদিগের আদিপুরুষ মহামাণিক্য ভূঁঞ্যা রাজা নবরঙ্গ রায়ের এক কন্যা বিবহ করিয়া ঐ সকল স্থান যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। সে সময়ে ভূঁঞ্যাগণ বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজধানী হইতে পূর্ব্ব-উত্তর কোণাভিমুখে নবরঙ্গ রায়ের রাজ্যের সীমা দুই দিবসের পথেরও অধিক। অন্যান্য দিকে রাজ্যের সীমা যতদূর অবধাবিত হয়, তাহাতে রাজার রাজকোষে বার্ষিক ৫২ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হওয়া বিচিত্র নহে। প্রবাদ আছে, তাঁহার কতিপয় পরাক্রান্ত স্বজন ও অনুচর মধুপুরের গড় নামক স্থানের উচ্চ ভূমিতে পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। নবরঙ্গ রায়ের রাজ্যলোপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত এবং তাড়িত হন। মুসলমান অধিকারকালে রায়বংশের ও বরান্তরের ভূঁঞ্যাদের সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন পরগণা বন্দোবস্তকারী জমিদারগণের হস্তগত হয়। তৎকালীন করিপয় করুণ গাথাত্মক উপাখ্যান প্রচলিত আছে; এই প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করিবার স্থান নাই।

কোন্ সময়ে নবরঙ্গ রায় ভোগবেতাল অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, তাহার সন তারিখ লিখিত না থাকিলেও তাঁহার সময় নিরূপণের কতকটা উপায় আছে। তদীয় জামাতা বীর মহামাণিক্য হইতে বরান্তরের বর্ত্তমান ভূঁঞ্যাগণ ১৬।১৭ পুরুষ অধস্তন। নবরঙ্গ রায় হইতে তদ্‌বংশীয়গণ ২।১ পুরুষ মাত্র অধিক অধস্তন। গড়ে ৪ পুরুষে একশত বৎসর ধরিবার প্রথা অনুসারে রাজা নবরঙ্গ রায় অন্যূন ৪১০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের সন্নিহিত কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। আরো দুই প্রকারে আমরা এই মীমাংসায় পৌঁছিতে পারি। হিজলীর বিবরণে দেখিতে পাই, ঈশা খাঁ নামক একজন মুসলমান আক্রমণকারী ১১০৫ খ্রীঃ হিজলির শেষ হিন্দুনরপতি গোবর্দ্ধন দাস রণঝাপকে পরাজিত করিয়া হিজ্‌লী রাজ্য হস্তগত করেন, এবং সমগ্র ভাটি প্রদেশের অধিকারী হন। হিজ্‌লী হইতে বঙ্গোপসাগরের তীর দিয়া ময়মন্‌সিংহ শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যে যে স্থান জোয়ার ভাটার অধীন, সেই সকল নাওরা প্রদেশ ভাটি রাজ্য বলিয়া কথিত হইত। প্রবাদ এই, হিজ্‌লীর রাজা ঈশা খাঁই ঐ ভাটিরাজ্য শাসন উপলক্ষে জঙ্গলবাড়ী অঞ্চলে একটী রাজধানী স্থাপন করত ২২ পরগণা

হস্তগত করেন। রাজা নবরঙ্গ রায় ঈশা খাঁর সৈন্যহস্তে নিহত হন বলিয়া প্রবাদ আছে। গোস্বামী জয়নাথ কবিরত্ন-কৃত বিবরণে, নবরঙ্গ রায়ের পুত্র কি পৌত্র ঈশা খাঁর সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হন, ও নবরঙ্গ রায়ের রাজ্য লোপ হয়, এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, নবরঙ্গ রায় ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দেরই নিকটবর্ত্তী লোক। ধর্ম্মমঙ্গল বাক্য আলোচনা দ্বারাও প্রায় ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। ঐ কাব্যের বিষয়গুলি খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর ঘটনাবিষয়ক, সন্দেহ নাই। উক্ত কাব্যে লিখিত আছে, যখন গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী পাত্র মহামোদ রাজা লাউসেনের ময়নাগড় আক্রমণ করিতে যান, তখন তাঁহার সৈন্য মধ্যে রণরঙ্গ রায় বিদ্যমান ছিলেন। এই নবরঙ্গই রণরঙ্গ রূপে বর্ণিত হইয়া থাকিবেন। নবরঙ্গ রায় প্রথম জীবনে পশ্চিম রাঢ় দেশের কোন স্থানের রাজা ছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

বিদ্যান্ত রায় বলিয়া নবরঙ্গ রায়ের একজন আত্মীয় এক সময়ে ঢাকা অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেন। বিদ্যান্ত রায়ের সন্তানগণও ভূঁঞ্যা উপাধিবিশিষ্ট। ঐ জেলার সঙ্গে নবরঙ্গ রায় বংশ নানারূপে সংসৃষ্ট। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বাবু তদীয় বিশ্বকোষে নবরঙ্গ রায় বংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "এই জাতিতে (মাহিষ্য জাতিতে) পূর্ব্বাঞ্চলে ভোগবেতালের রাজবংশ প্রসিদ্ধ।" কি নবরঙ্গ রায় বংশ, কি মহামাণিক্য বংশ, কি নবরঙ্গ রায়ের ভূঁঞ্যাবর্গের বংশ সমূহ, সকলেই মাহিষ্য দাস সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সেই সেই স্থানে এই সকল বংশের প্রভাব এখনও বিদ্যমান। ময়মনসিংহ জিলার এই সম্প্রদায়ের বড় বড় নায়ক বংশগুলি মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া গেলেও ঐ প্রদেশে এই জাতীয় লোকসংখ্যা এখনও দেড় লক্ষের ন্যূন নহে।"

যে জাতি মহাত্মা রিজলীর মতে "একদিন সকলের প্রতি প্রভুর ন্যায় আদেশ করিবার পদারূঢ় ছিল" সে জাতি কি কখন শূদ্র হইতে পারে? শূদ্রের রাজ্যের কথা ভারত-ইতিহাসেত কখন কোনখানে দেখা যায় না এই প্রভুশক্তি-সম্পন্ন জাতির স্থাপিত রাজবংশ ও সামন্তবংশ-সম্ভূত বীরচূড়ামণি-কুল বিজয়-প্রয়াণে নির্গত হইয়া উৎকল এবং ভাটিয়া দেশ জয় করিয়া প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়িনী কীর্ত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এইখানে ভাটী রাজ্যের অন্তর্গত বরান্তরের ইতিহাস কিছু বিবৃত করা আবশ্যক।

কান্তপুর রাজবংশের বিষয় একবার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ইহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। এডুকেশন গেজেট এই প্রবল পরাক্রান্ত প্রাচীন মাহিষ্যগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "দাস মাহিষ্যগণ পালরাজগণের পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালার রাজদণ্ড পরিচালক ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বাবধিই বৃষল ভাবাপন্ন সচ্ছুদ্র অর্থাৎ অনুপনীত মাহিষ্য। মাহিষ্যগণ বৃষলত্ব হেতু কেহই উপবীত গ্রহণে অধিকারী নহে।" ইহা সম্পূর্ণই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। মাহিষ্য অনুলোমজাত সন্তান বিধায় তাহার বৃষলত্ব কোন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না (মাহিষ্য প্রকাশ প্রথম ভাগে "মাহিষ্য সঞ্জীবনী ও "মাহিষ্যদিধিতি" পর্য্যায় দেখ)।

হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের খ্যাতনামা প্রধান পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক লেখক শ্রীযুক্ত লাল মোহন বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গালী দাস মাহিষ্য বা পরাশর দাসগণকে অনুপনীত

বৃষলীভূত মাহিষ্য বলিয়া স্বীকার করতঃ উৎকলে তাঁহাদের আধিপত্য সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন। ৺জগন্নাথ-সেবক গজপতিগণ মাহিষ্য জাতির সন্তান ভিন্ন অপর কেহ নহেন, তাহা ঐতিহাসিক গবেষণা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

বাবু লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয়-পুস্তকে বলেন—"মাহিষ্য জাতিরা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উড়িষ্যায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন; মাহিষ্য জাতি অশ্বপতি, গজপতি, ছত্রপতি ও নরপতি, এই চারিভাগে বিভক্ত। মাহিষ্যের জনক ক্ষত্রিয় ও জননী বৈশ্যা হইলেও, মাহিষ্যেরা পিতৃকুল স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পণ্ডিতগণ দ্বারা বর্ণনা করাইয়াছেন; কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিতে সমর্থ হন নাই। এই বংশীয় রাজা অনঙ্গভীম দেব ৺জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ৺জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান সেবাকারী ক্ষুর্দরাজ গজপতি বংশীয় মাহিষ্য (সম্বন্ধ-নির্ণয়) যৎকালে সম্বন্ধ নির্ণয়কার এই কথাগুলি স্বীয় গ্রন্থে উপনিবদ্ধ করেন, তৎকালে বাঙ্গালার দাস যে মাহিষ্য, কি তাহাদের মধ্যে "গজেন্দ্র মহাপাত্র" প্রভৃতি উচ্চতম রাজন্য-সমুচিত উপাধি আছে, তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না; কিন্তু ফরিদপুরের অন্তর্গত হারাসপুর-গ্রাম-নিবাসী খ্যাতনামা শিক্ষক বাবু সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস এবং এই লেখক তদীয় গ্রন্থস্থিত কারিকা ব্যাখ্যা করিয়া যখন অকাট্য ইতিহাসের সাহায্যে তাহার চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দিলেন, তখন তিনি তাঁহার ভ্রম উপলব্ধি করিয়া তাহা সংশোধন করিতে বাধ্য হইলেন।

সার ডাব্লু ডাব্লু হাণ্টার মহোদয় বলেন যে, গঙ্গাবংশীয় উৎকলের সার্ব্বভৌম রাজগণ তমলুক হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। রাজকৃষ্ণ বাবু তদীয় বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, ১১৩১ খ্রীঃ উৎকলে গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য আরম্ভ হয়। ইহারা গঙ্গা রাঢ়ী, অর্থাৎ তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশ হইতে যাইয়া উৎকল জয় করেন, গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গভীম দেব ৺জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মাতা। তাঁহারা বঙ্গের মাহিষ্যবংশ-সম্ভূত ছিলেন। ঐতিহাসিক ৺রজনীকান্ত গুপ্তও ঐ মতের সম্পূর্ণ সমর্থক। সুতরাং গজপতি বংশীয়গণ যে তাম্রলিপ্ত ও মেদিনীপুর হইতে উৎকলে প্রবেশ করতঃ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে তম্লুক, সুজামুঠা, কান্তপুর, ময়না প্রভৃতি হইতে কোন্ জাতীয় লোক উৎকলে যাইয়া সাম্রাজ্য স্থাপনের যোগ্য ছিল? ইহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের ইহাও দেখা কর্ত্তব্য যে, দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মেদিনীপুর ও তত্রত্য স্থানে কোন্ জাতীয় লোক প্রভুত্ব ও রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছে? ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, ঐ কালের মধ্যে দাস মাহিষ্য বা অনুপনীত হালিকগণ স্বাধীনভাবে উপবেশন করিয়া অত্রদেশে স্বাধীন রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন এবং গড়বেতা, সুজামুঠা, তুর্খা, কুতুবপুর প্রভৃতির ভূপালগণ অস্মরণীয় কাল হইতে সেই সেই প্রদেশে রাজত্ব করিতেছেন। বল্লালের রাজত্বের বাহিরে অর্থাৎ কালসেনা, চকদ্বীপ বা বগ্ড়ী পরগণায় মাহিষ্য ভূপালগণের স্বাধীন রাজ্যের অভাব ছিল না।-।

রায় কালুভূঁঞ্যার বংশধর বিজয় সেন মেদিনীপুরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া বংশানুক্রমে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত মেদিনীপুরে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ওঁঙ্কার দ্বীপ বা মাহিষ্মতীপুরীতেও মাহিষ্য-রাজ্য যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অতএব যদি মেদিনীপুর হইতে কোন বীর জাতির সম্প্রদায় উড়িষ্যা জয় করিয়া থাকেন, তবে তাহা ঐ "অনুপনীত" মাহিষ্য-বর্গ এবং সেই যুগান্ত কালস্থায়ী মহাপ্রবল তমলুক, সুজামুঠা, গড়বেতা প্রভৃতির ভূপালগণের জ্ঞাতি বান্ধব বই আর কে হইতে পারে? উত্তর ভারতের পাল রাজগণ এই বংশ-সম্ভূত ছিলেন। (রামচরিত দেখ)। চতুর্থ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কেবল মেদিনীপুর নহে, বরং সমগ্র রাঢ়দেশ ও উত্তর ভারতে ঐ সকল হিন্দু এবং স্থানে স্থানে ঐ বংশীয় বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন রাজবংশের পরাক্রান্ত পুরুষ সিংহগণের সিংহনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অপর সকল জাতি তাঁহাদিগেরই বাহুবলাশ্রয়ে সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়াছেন। অতএব বেশ বোধ হইতেছে যে, যদি দ্বাদশ শতাব্দীতে মেদিনীপুর হইতে কোন হিন্দুবীর উৎকল অধিকার করিয়া থাকেন, তিনি ঐ সকল স্বাধীন রাজবংশের শাখা ভিন্ন অন্য কেহই হইতে পারেন না। কারণ, স্বদেশে পদলেহন করিয়া ভিন্ন দেশে স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপন করা অসম্ভব। ইংরাজগণ বৃটিশ-দ্বীপে অপর কাহারও অধীন থাকিয়া ভারতে প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন, এরূপ কল্পনা মূর্খের ধারণাতেই শোভা পায়।

যে অনঙ্গভীমদেবের জ্ঞাতিবর্গ উড়িষ্যায় তদীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রধান সহায়, তাঁহারাও মাহিষ্য নামে পরিচয় দিয়াছেন। উৎকল-বিজেতা মাহিষ্যগণের চলন,আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি পরীক্ষা করিলে, অদ্ভুত ঐক্য দর্শনে আরও বিস্মিত হইতে হয়। উৎকলের খাণ্ডাইতগণ মাহিষ্য জাতির অন্তর্গত বা শাখাভুক্ত। উৎকলের খাণ্ডাইত এবং কৃষাণ, এই উভয়ই একজাতীয় লোক। উৎকলের স্বাধীনতা যতকাল রক্ষিত হইয়াছে, তাহা কেবল এই খাণ্ডাইত বা কৃষাণের বাহুবলে। সার জন শোর গভর্ণরের শাসনকালে উদ্দামভেলোরের সিপাহী-বিদ্রোহ এই মাহিষ্যবীরগণের অজেয় বাহুবলে দমিত হইয়াছিল। সেদিন বঙ্গবাসী পত্রিকা এই সত্য সভ্য-জগতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে ক্রুটী করেন নাই। ভবানীপুর সরকার বংশের পূর্ব্বপুরুষ ৺অনন্তরাম চৌধুরী সরকার সেনানী কর্নেল পাওয়েলের অধীনে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অকুতোভয়ে হৃদ্শোণিত যুদ্ধক্ষেত্রে আহুতি দিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে ভঙ্গপ্রবণ তমলুকবাহিনীকে রণমদে মাতাইয়া বিদ্রোহী দলকে দলন করিয়া প্রধান সেনানী সার আয়ারকূটের হস্ত হইতে সিরোপা লইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। এই সরকারগণ এখন ক্ষীণ দীপ-শিখাবৎ দীনভাবে ভবানীপুরে বিরাজমান!

উৎকল দেশে সন্তক্ প্রচলিত আছে। কেবল মাহিষ্য জাতি নহে, উড়িষ্যা দেশে যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে; প্রত্যেকের এক একটী বিশেষ ও নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন আছে। সেই সেই জাতীয় লোক নিজ নাম বর্ণ দ্বারা লিখিতে না পারিলে, ঐ চিহ্ন স্বাক্ষর স্বরূপে

ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের দেশে কলম স্পর্শের নিয়ম আছে। কিন্তু উৎকলে যাহারা লেখা জানে না, তাহারা জাতীয় সন্তক্ চিহ্ন আঁকিয়া দেয়। এক জাতির চিহ্ন অপর জাতি কখনও ব্যবহার করে না। উৎকলে ব্রাহ্মণের "কুশাকাটা সন্তক্", জালিয়ার "ঝুমকা" (অর্থাৎ জালের দড়ি গুচ্ছের) সন্তক্, করণের "লেখনী ও শেঠী খান্দাইতের "বল্লমাগ্রফলক", কৃষাণের "মই" সন্তক্ যুগযুগান্তর হইতে প্রচলিত আছে। মেদিনীপুরের মাহিষ্য সমাজ মধ্যে অদ্যাবধি "মই" সন্তক্ প্রচলিত আছে। সুতরাং উৎকলের সন্তকরূপ অভ্রান্ত চিহ্ন দ্বারাও উৎকলের খাণ্ডাইত (খড়গধারী মাহিষ্য) ও বঙ্গীয় কৃষাণ বা মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতির একত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। এই জাতির অনেক লোক কৃত্রিম রাজপুত হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে মহাত্মা রিজলীও তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। (Many of them (Halik kaibartas) have become pseudo Rajpoots.")

যে জাতীয় লোকে "ভদ্রলোক" সঙ্গে না মিশিয়া অস্ত্রধারী ও নিষ্ঠুর রাজপুত বীর সাজিয়া রাজপুত যোদ্ধাগণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া রাজপুত সহ মেশামেশি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে রাজপুতের স্বভাব কতকটা ছিল, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙ্গালায় মাহিষ্যগণ স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করিয়া যে আত্মসম্মান ও গরিমার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের অনেকে যে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিবে, ইহা বিচিত্র নহে।

নদীয়ার খ্যাতনামা স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় বাবু যোগেন্দ্রনাথ স্মার্ত্তশিরোমণি তাঁহার হিন্দু কাষ্ট এণ্ড সেক্‌টস্ নামক পুস্তকের ২৭০ এবং ২৭৯ পৃষ্ঠায় বলেন যে, "খাণ্ডাইৎগণ রাজপুত জাতির তুল্য মর্য্যাদাবিশিষ্ট। মাহিষ্য চাষি দাসগণ বিশুদ্ধ জলাচারণীয় জাতি। ইহারা কৃষিজীবী, গ্রামবাসী লোকদিগের মধ্যে একটী গরিষ্ঠ সম্প্রদায়। মেদিনীপুর জেলায় ইহারা স্থানীয় উচ্চতম স্তরের সমাজ-নেতা সম্ভ্রান্ত বুনিয়াদি বড় লোক সম্প্রদায় ভুক্ত। তমলুক এবং কণ্টাই অঞ্চলের গ্রাম্য সমাজে ইহারা উচ্চতম স্তরের ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য। অপরাপর জেলায় যে যে স্থানে ইহাদিগকে দেখা যায়, তত্তৎ স্থানে ইহাদের পদমর্য্যাদা কেবল কায়স্থ জাতিরই অব্যবহিত নিম্নে অবস্থিত। মহাত্মা হাণ্টারও অবিকল ঐ মতেরই সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "হিন্দুজাতীয় কৃষক বলিলে কৃষি কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য, সদ্গোপ ও আগুরিকে বুঝায়। হিন্দু কৃষি কৈবর্ত্তগণ যে শাস্ত্রমতে বৈশ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার শূদ্রবৎ ব্যবহার করতঃ শূদ্ররূপে গণ্য হইয়াছে। ইহারা অর্দ্ধ ক্ষত্রিয়. অর্দ্ধ বৈশ্য।"

বাবু নগেন্দ্রনাথ বসুর "বিশ্বকোষ" প্রণয়নের উদ্দেশ্য মাহিষ্য বা চাষি কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়কে সমাজে নিপীড়িত করা এবং কায়স্থ জাতিকে শূদ্রের পর্য্যায় হইতে উত্তোলিত করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করা। ইহা ব্যতীত আর অপর কোন গূঢ় কারণ দৃষ্ট হয় না। তিনি এই জাতি সম্বন্ধে স্বীয় অভিধানে অনেক অশাস্ত্রীয় কথা বলিলেও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, "হালিক কৈবর্ত্ত অপর শূদ্রজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জল-আচরণীয় জাতি। তাহারা সমাজে

চিরকাল অত্যুচ্চ সামাজিক মর্য্যাদা দাবী করিয়া আসিতেছে।" (Hunter).

এই জাতি সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন শিক্ষিত শাস্ত্রাভিজ্ঞ সম্প্রদায় ঐতিহাসিক তথ্য পর্য্যালোচনা করিয়া এই জাতি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করুন যে, এই বিশাল জাতি মহাভারতের যুগে কি ছিল এবং কালের কঠোর শাসনে আজইবা কি হীন পদবীতে উপনীত হইয়াছে? বঙ্গের মধ্যে প্রখ্যাত মহিলা-জমিদারগণের মধ্যে ৺রাণী রাসমণি ও নদীয়া জেলার শ্রীমতী রাসমোহিনী দাসীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাণী রাসমণি অত্র জাতীয়, কলিকাতা সমাজের মধ্যে অগ্রণী এবং শীর্ষস্থানীয়া আমাদের বিশাল মাহিষ্য সমাজের মধ্যে অনেকের ভুল ও অন্ধ ভিত্তিহীন বিশ্বাস আছে যে, ৺রাণী রাসমণি জালিয়া-কন্যা ছিলেন। ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। তাঁহার শ্বশুর ৺প্রীতিরাম বাবু পূর্ব্বাঞ্চলের লোক বিধায় কলিকাতার স্থিতিশীল সমাজের মধ্যে পূর্ব্বকালে, অল্পদিনের জন্য অচল হইলেও,পূর্ব্ব বঙ্গের অন্তর্গত টাকী সমাজের মধ্যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীপতি লোক ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি নিজে কমলার বরপুত্র হইয়া কিসের প্রলোভনে ভিন্ন জাতীয় দরিদ্রের কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিবেন? আরও সেকালে সমাজ-বন্ধন এত শ্লথ ছিল না। হালিসহরের নিকট তাঁহাদের বাটী আজও জীর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। নিঃস্বতা ও দারিদ্র্য এবং জালিয়াত্ব, দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ। দরিদ্র-কন্যা রাসমণির উত্তর কালে ও প্রতাপের সময়ে অপরাপর জাতিগণ তাঁহার বিশেষ দ্বেষী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এই কুৎসা রটনা করিয়াছিল। তাঁহার দয়া, উদারতা ও উচিতভাষিতায় সেকালের বর্দ্ধমানাধিপতিকেও হারি মানিতে হইয়াছিল। তাঁহার বহুসংখ্যক জালিয়া প্রজা ছিল। তাহাদের প্রতি কোম্পানি বাহাদুর কঠোর আদেশ প্রচারিত করিলে তিনি তাঁহাদিগকে কৃপা-পরবশ হইয়া রক্ষা করেন বলিয়া, তাঁহার প্রতিভা-দ্বেষী জাতিগণ এই মহাপ্রাণ মহিলার সমবেদনার বিশাল ভাব হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইয়া, তাঁহাকে জালিয়া-কন্যা বলিয়া প্রচারিত করিয়া সমাজে তাঁহার উচ্চ সম্ভ্রম নষ্ট করিবার বৃথা চেষ্টা করেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ সাঁতরা-কৃত ৺রাণী রাসমণির জীবনচরিত পাঠে আমরা অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা জানিতে পারি। হিন্দুসমাজে রাণী রাসমণি যে এক আদর্শ-রমণী ছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহার কীর্ত্তি কলাপ ভারতের বহু স্থানে বিশেষতঃ প্রধান প্রধান তীর্থ স্থানে চিরস্মরণীয়া ৺রাণী ভবানী বা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাইর কীর্ত্তিকলাপের সহিত সমকক্ষতা করিয়া অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে সভ্যজগতের সমক্ষে রাণী রাসমণির নাম ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের সহিত জড়িত থাকায় অমরত্ব লাভ করিয়াছে। রাণী রাসমণির প্রিয় জামাতা ৺মথুর বাবু. তাঁহার কন্যা জগদম্বা দাসী ৺রামকৃষ্ণ দেবকে অত্র দক্ষিণেশ্বরের কালী বাটীতে বহু যত্নে স্থাপন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

পরম আরাধ্য ৺রামকৃষ্ণ দেবের শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ বর্ত্তমান সভ্য জগৎকে নবভাবে প্রবুদ্ধ করিয়াছে এবং হিন্দু সমাকে

বুদ্ধ, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন আদির সময়ে যে যে ধর্ম্ম-বিপ্লব ঘটিয়াছে, সেই সেই অবস্থা হইতে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছে। ঠাকুরের সিদ্ধির স্থান মাহিষ্যের ঠাকুর-বাটীতে, উপদেশের স্থান মাহিষ্যের বাগানের সেই চিরস্মরণীয় পঞ্চবটী, পোষণ ও রক্ষণ সেই মাহিষ্যের তত্ত্বাবধারণে, বিবেকানন্দও পরমহংস ঠাকুরের শিক্ষার ভাষ্য করেন সেই মাহিষ্যের ঘাটে বসিয়া, নিজেও শিক্ষা ও সাধনা করেন সেই মাহিষ্যের উদ্যানে। কাজেই এক পরমহংস দেবকে পাইয়া এই মাহিষ্য বংশ ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব লাভ করিয়াছে। এই মহিয়সী দেবী বহু পুণ্যবতী না হইলে কি ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ স্বীকার করিতেন?

অশৌচ-বৈষম্য লইয়া মধ্যে এই বৃহৎ মাহিষ্য সমাজ আপোষে মামলা মকর্দ্দমা করিয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া, অযাচিত দলাদলির অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগ করিয়া সমাজের বলক্ষয় করিয়াছে।

তামলুকআদি পঞ্চরাজ্য, লাট কঙ্করাজ্য অপিচ পূর্ব্ববর্ব্বের নবরঙ্গ, কমলা বাড়ী, তেলিচেরা, উলুকান্দি, বারাঙ্গিয়া, বংশীকুণ্ডা প্রভৃতি বিশাল রাজ্যে মাহিষ্যের রাজত্ব বাঙ্গালীর সামান্য গৌরবের কথা নহে। এ সম্বন্ধে পরেও যৎসামান্য আলোচনা করিবার বাসনা থাকিল। যব বালী দ্বীপে এই জাতিরই বাণিজ্য-পোত 'সদর্পে ভ্রমিত এক কালে বঙ্গ সাগরময়।" এখন কালের স্রোতে সবই গিয়াছে। আমরা হতশ্রী হইয়াছি, সমাজের তাড়নায়, দ্বেষী লোকগণের অত্যাচারে, অন্ধ চালকের দোষে এই বিশাল জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। এই জাতির মধ্যে একতা নাই, সমাজ দ্বেষ ঈর্ষা দলাদলিতে পূর্ণ, অশৌচ লইয়া সমাজ বিচ্ছিন্ন, বিদ্যা বিস্তারের লেশমাত্র নাই !! সেনসাসের সময় কয়েকটী সভাসমিতি করিয়া খুব হৈ চৈ হয়, তার পর যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, সেই নিদ্রা, আর পাশ মোড়া নাই, জাতির জীবনের উন্মেষ মাত্র নাই !!! অহো ! সবই এই জাতির নেতৃবর্গের শিথিলতা এবং দোষ।

সাধনায় জগতেও এই জাতি কম প্রতিভা প্রদর্শন করেন নাই। ইঁহারা অধিকাংশই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। শিখিমাইতি, মহান্ত রাম, কৃষ্ণ দাস, ভক্ত রাজনারায়ণ সরকার, যোগীশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ বারা প্রভৃতি বহুতর সাধক এই জাতিকে সমলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। মহান্ত রামকৃষ্ণের কথা আমরা সেইদিন সুনামগঞ্জের খ্যাতনামা ব্যবহারবিদ্ বাবু বসন্তকুমার রায়ের অমিয় লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধে নব্যভারত পত্রিকায় অবগত হইয়াছি (নব্যভারত ২৯ ভাগ, ১২ সংখ্যা) অতএব দেখা যাইতেছে এবং ইতিহাস ইহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতে ক্রটী করে না যে, দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গের রাজদণ্ড-পরিচালনকারী সেই কৃষ্ণকেশ সাহসী পশ্চিম হইতে আগত যোদ্ধাপুরুষগণ বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজ্য বিস্তার করিয়া বঙ্গের ইতিহাসে পাল রাজবংশ রূপে উপগীত হইলেও, তাঁহারা আর্য্য মাহিষ্য ক্ষত্রিয় বই অপর কেহই নহে। ইঁহারাই ২।১ পুরুষ পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মী ছিলেন, কিন্তু বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমিক হ্রাস হইলে ইঁহারাই পুনঃ শৈব এবং তান্ত্রিকধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পুরা হিন্দু বলিয়া বঙ্গীয় সমাজ মধ্যে জেতাগণের অত্যাচারে, উচ্চ হইলেও, নিম্নস্তরে দলিত হইয়া মাহিষ্য কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচিত হইতে-

ছেন। অহো! কালের কি মাহাত্ম্য! যে জাতি শল্য যুযুৎসুর সম জাতি ছিল, যে জাতি এক কালে সমগ্র বঙ্গ বিহার উড়িষ্যায় স্বাধীন রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া আসিয়াছে, যাহাদের বঙ্গে বিক্ষিপ্ত কীর্ত্তি-মেখলা দেখিলে তাহাদের প্রাচীন অতীত গুণ গরিমার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না, তাহাদের বংশধরগণ আজ সহৃদয় ইংরাজ রাজ-সদনে মাহিষ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছে, এবং উপর্য্যুপরি সেনসাস রিপোর্টে "হীন জাতি' "বলিয়া উল্লিখিত হইতে লজ্জা বোধ করিতেছে না।

আমি একে একে প্রাচীন মাহিষ্য রাজ্য সমূহের উল্লেখ করিয়াছি। ভোগবেতালের নবরঙ্গ রায় (২৯ভাগ নব্যভারত,৪র্থ সংখ্যা ; বংশীকুণ্ডা ও বরাঙ্গীয়া (মাহিষ্য সমাজ ১ম ভাগ ২৮১৮পৃ, The Mahishyas P. 70—71) ; বরান্তর রাজবংশ (এডুকেশন গেজেট ২১ ও ২৮শে আষাঢ় ১৩১৯) ; সর্ব্বেশ্বর নগরের রাজ পরিবার (কার্ত্তিক সংখ্যা ১৩১৯ সালের প্রতিভা, ১৩১৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসী, মাহিষ্য সমাজ পত্রিকা প্রথম ভাগ ২৯৬, ঐ দ্বিতীয় ভাগ ৮৯ পৃঃ;) তমলুক, ময়নাদির রাজবংশ (মাহিষ্য প্রকাশ মাহিষ্য-বিবৃতি) ভীম,দিবেবাক, আদি বীরগণের অমর কাহিনী ' রামচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দ্বারায় বঙ্গীয় এসেসিয়াটিক্ সোসাইটির তত্বাবধানে প্রকাশিত) ; বালিসীতা, তুর্কা, সুজামুঠা, কুতুবপুর, হিজলী, মহিষাদল ও উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশের মাহিষ্য রাজবংশের ইতিহাস (মাহিষ্য প্রকাশ, মাহিষ্য ভ্রান্তি-বিজয়-তত্ব-বারিধি, মাহিষ্য-বিবৃতি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) কোন্ ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত আছে? এই সকল কীর্ত্তির কথা আমি পূর্ব্বেও উল্লিখিত করিতে ক্রটী করি নাই।

বিজিতের উপর জেতার অত্যাচার কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা, বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ মহাভারতের কাল অতিক্রম করিয়া আজও আমরা উপলব্ধি করিতেছি। প্রতাপশালী জাতি অপরের বশ্যতা সহজে স্বীকার করে না। মাহিষ্যগণকে বশে আনিতে স্বয়ং ইংরাজ কোম্পানিকেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কম বেগ পাইতে হয় নাই। এই দেশের মাহিষ্য রাজন্যবর্গ পূর্ব্বে জন কোম্পানির বড় শান্ত প্রজা ছিলেন না। যখনই তাঁহাকে বন্দোবস্তের জন্য আহ্বন করা যাইত, তখনই তিনি স্বকীয় দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া থাকিতেন ও কোন রূপ বন্দোবস্ত করিতে চাহিতেন না। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাদের জমীদারি ও স্বাধীন রাজ্য ৩০০৲ বৃত্তি দিয়া অপরের সহিত বিলি বন্দোবস্ত করিলেও, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ৩।৪ পুরুষের মধ্যেই এই বৃত্তি সহৃদয় ইংরাজ-রাজ রহিত করিয়া দিয়াছেন। এহেন ক্ষত্রিয় সমজাতি কি তাহাদের লুপ্ত-গৌরব সহজে ভুলিতে পারে? কাজেই তাহাদের বশে আনিতে হইলে তীব্র পেষণ যন্ত্রের আবশ্যক। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সমাজের পীড়নে ইহাঁরা হত-গৌরব এবং হীন-বল, "চাষা কৈবর্ত্ত" বলিয়া পদদলিত, নিষ্পেষিত ; তাহা হইলেও ইঁহাদের জাতীয় মর্য্যাদা ইহাদের স্বরূপত্বের পরিচয় স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস পৃষ্ঠায় দেখিতে থাকিবে।

ধর্ম্মজগতে শিখিমাইতি, রায় রামানন্দ, মহান্ত রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই সম্প্রদায় মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া ইহাদিগকে অমরত্ব প্রদান করিয়া গিয়াছেন। (নব্যভারত

২৯ ভাগ, দ্বাদশ সংখ্যা দেখ) বৈষয়িক রাজ্যে নান্নার, কাজরু, ভূস্বামীবংশ, বাওয়ালির মণ্ডল ভূস্বামিগণ, এবং ভবানীপুরের সরকার, গড়ভবানীপুর ও তাজপুরের রায়, তাজপুরের (মেদিনীপুর) জানা, খেসীদীয়াড়ের চৌধুরী, নান্নারের রায়, গড়ভবানীপুরের কেরাণী, শিকারপুরের বিশ্বাস, দ্বারিবেড়ের মাইতি, জুজুৎসার মান্না, জানবাজারের মান্না, হেড়ের জানা প্রভৃতি স্থানের প্রখ্যাত মাহিষ্যবংশের ভূস্বামী জমীদার তালুকদার গৃহগুলি ইহাদের প্রাচীন জাতীয় হত-গৌরবের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে।

এই জাতি সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক সত্য আজ পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহা পাঠে কি আমাদের বিস্ময় হয় না? তাহা দর্শনে কি আমাদের মনে হয় না, "Oh how fallen, how degraded.") তাহা আলোচনা করিলে কি আমাদের মনে হয় না যে, এই জাতি নিষ্পেষিত, অপমানিত ও পদদলিত হইলেও আজও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং সমাজ ইহাদের সম্বন্ধে যাহা মনে করে, ইহারা প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে? এখন পাঠক এই জাতি সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করুন। সত্য যাহা, তাহা প্রকাশ করিলাম।

মাহিষ্য শক্তি দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহা এই সমাজের পক্ষে কম শুভ লক্ষণ নহে। এই জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার-কল্পে মাননীয় বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়, সি-আই-ই, উকীল হাইকোর্ট, প্রমুখ নেতাগণ মাহিষ্য-শিক্ষা-বিস্তার-সমিতি স্থাপিত করিয়া নিঃস্ব মাহিষ্য ও তয্যাজী ব্রাহ্মণ বালকগণের পথ উন্মুক্ত করিয়া মাহিষ্য সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বঙ্গের বিশাল মাহিষ্য সমাজের নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা সমাজ মধ্যে অকাতরে বিদ্যা বিস্তারে যত্নবান হইয়া, আত্ম-সম্মান জ্ঞান সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া, স্বসমাজের উন্নতি বিধানে পরাঙ্মুখ না হন। আত্মসম্মান জ্ঞানের সদর্থ ইহা নয় যে, লেখাপড়া শিখিয়া জাতীয় কৃষ্যাদি ব্যবসা ত্যাগ করা। পাশ্চাত্য প্রদেশে আমি অনেক স্থলেই দেখিয়াছি যে, কৃষকগণ লেখাপড়া শিখিয়া স্বজাতীয় ব্যবসা কদাচ ত্যাগ করে না, বরং ঐ জ্ঞানে বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতির উন্নতি ও অনুশীলনে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। আমাদের দেশে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত মত দৃষ্ট হয়। আমাদিগের দেশের অভিমানী কৃষক-সন্তানগণ সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া পিতা পিতামহের জাতীয় ব্যবসাকে উপেক্ষা করে এবং ঘৃণার সহিত তাহার দ্বারায় জীবিকানির্ব্বাহ করা বিশেষ লজ্জাস্কর মনে করিয়া পরিহার করে। প্রকৃত কৃষক-সন্তানদের মধ্যে এই অনুযোগ আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। এমন কলাবিদ্যা অনেক আছে, যাহা আমাদের দেশের কৃষকগণ অনুসরণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার দিকে তাহাদের আদৌ দৃষ্টি নাই।

আমাদের দেশের কৃষকগণ প্রাচীন আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়াছে কেন? ইহার মূলে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি নিহিত। আমাদের দেশের লোকের ব্রহ্মচর্য্য-চ্যুতি এবং জ্ঞান-ভক্তির-অধঃপতন এই অবনতির কারণ, আমার মনে হয়।

জ্ঞান অরণ্যকে অন্বেষণ করে ভক্তি সংসারকে ভালবাসিতে চায়—জ্ঞান নির্জ্জনতার পক্ষপাতী—ভক্তি জনতায় আপনাকে বিলাইতে চায়। জ্ঞান স্বধর্ম্ম সাধন করিতে

তৎপর, ভক্তি জীবসেবায় আপনাকে ঢালিয়া দেয়। ইহাই হইতেছে জ্ঞান ভক্তির নিগূঢ় রহস্য। ব্যক্তিত্বের পুষ্টিই জ্ঞানের লক্ষ্য, সমষ্টির পুষ্টি ভক্তির লক্ষ্য। প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করাই জ্ঞানবাদিদিগের একমাত্র প্রয়াস, ইহারা নিজের মুক্তিলাভের অনুসন্ধানেই ব্যস্ত, পরের দিকে তাকাইবার ইহাদের অবসর নাই। জ্ঞানী সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী, ভক্ত অরণ্যে বাস করিয়াও সংসারী।

জ্ঞান চায় স্বধর্ম্ম, ভক্তি চায় সেবা। জ্ঞান চায় বিশ্লেষণ, ভক্তি চায় একীকরণ। জ্ঞান চায় ব্যতিরেকী প্রণালী, ভক্তি চায় সমন্বয়। ভারতবর্ষের সভ্যতার আদিম উষালোক ক্রমশঃ ক্রমশঃ জ্ঞানরাজ্যের দ্বারসমূহ উদ্ঘাটন করিয়াই পরিতৃপ্ত ছিল। ইহজগৎ কিছু নয়, পরজগতই যাহা কিছু, এসংসার কিছু নয়, জ্ঞানের গহনারণ্য তাহাদিগের একমাত্র আশ্রয়। যোগী সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনে পলাইয়া গেলেন। সংসার পরিত্যাগই সে সময়কারি ধর্ম্ম হইল।

এবম্বিধ ব্যতিরেকী প্রণালীতে যোগসমাহিত ভারতবর্ষ চিরকাল থাকিতে পারিল না। তাহাকে আবার সংসারের দিকে ফিরিতে হইল। জ্ঞানের নিভৃত নিবাসে সেই আত্মা চিরদিন আপনাকে অন্তরালে রাখিতে পারিল না—তাহার জ্ঞান-গ্রন্থ সংসারে প্রকাশ করিতে হইল। কবি ততক্ষণই নির্জ্জনতা চায়, যতক্ষণ সে আপনাকে দান করিতে বসে. গ্রহণের সময়, আহরণের সময় তাহাকে আবার জনতার নিকট ঋণী হইতে হয়। তেমনি, মানব জীবনে জনতা এবং নির্জ্জনতা দুইই আবশ্যক হইয়া পড়ে। জনতারই জন্য মানব নির্জ্জনতাকে চায়, নির্জ্জনতায় সে যে জ্ঞানাহরণ করে, জীবন-গ্রন্থ রচনা করে, সেই অভিজ্ঞতা সে জগতের হিতের জন্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না।

যাদুকর চির গোপন-প্রিয় ভারতবর্ষ নিজ বিদ্যা, নিজ মন্ত্র, নিজ ঔষধিসমূহ সংগোপনে রাখিয়াছিল বলিয়াই ভারতের সর্ব্বসাধারণের কোন উপকার ঘটে নাই। ভারতবর্ষ প্রচার কাহাকে বলে, তাহা জানিত না। সে বদ্ধমূলভাব ভারতবাসীর মন হইতে এখনও যায় নাই। সংগোপনের দিকেই যেন তাহার চিরন্তন প্রবৃত্তি, বিকাশের দিকে তাহার এখনও নজর নাই। এই জন্যই এই জ্ঞান-বিজ্ঞানময়ী, চির রহস্যময়ী ভারতভূমি হইতে যে কত বিদ্যা কালগর্ভে লীন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভারতবর্ষে কোন দিনই শান্তির অবস্থা ছিল না—অনন্ত সংগ্রামে, অনন্ত দ্বন্দ্বে—অনন্ত তর্কে এই ভারত-সভ্যতা চির-নিপীড়িত—চির মুখরিত! এত ভুক্তভোগী হইয়াছিল বলিয়াই বুঝি এই মহাভূমির এত অভিজ্ঞতা—এত মতপার্থক্য। আধ্যাত্মিক সংগ্রামও ত এদেশে কম হয় নাই, এক ভক্তিবাদ এবং জ্ঞানবাদ লইয়াই এদেশে উপর্য্যুপরি কত সংগ্রাম, কত মতভেদ হইয়া আসিতেছে! একের দিকে একত্বের উপরে এই ভূমি কোন কালেই স্থির থাকিতে পারে নাই। তর্ক এবং ভেদ বুদ্ধি লইয়াই ইহার কত অমূল্য সময় অপব্যয়িত হইয়া গিয়াছে, সেই অপব্যয় এবং অপব্যবহারের ফলে, ভারতবাসী কর্ত্তব্য ভুলিয়া অনন্ত দুর্দ্দশা এবং পরাধীনতাকেই বরণ করিয়া লইয়াছে।

আমার মনে হয়, এই একদেশদর্শী জ্ঞানচর্চ্চাই, এই নির্জ্জনকামী প্রচ্ছন্নতা-প্রয়াসী

সন্ন্যাস-বৃত্তিই, এই আত্মতৃপ্তিই ভারতের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। ইহাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়াছিল বটে, ব্রাহ্মণের প্রাধান্যলাভ ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু এই ব্রহ্মাবর্ত্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি লাভ ঘটে নাই। ভারতীয় দার্শনিকগণ প্রকৃতিকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছিল বলিয়াই, প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইতে চাহিয়াছিল বলিয়াই ভারতের স্বাস্থ্য-হানি ঘটিয়াছিল। সেই অজ্ঞানতা ও উদাসীনতার ফলে ভারতের আজ এতাদৃশ অধঃপতন। এই জন্যই বুঝি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানহীন শঙ্করকে আবার অমর রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

সমষ্টিকে লক্ষ্য না করিলে কোন জাতি বা কোন ধর্ম্ম মাথা তুলিতে পারে না। ব্যক্তির কঠোর তপস্যা যদি জগতের হিতে নিযুক্ত না হয়, সমষ্টির কল্যাণে ব্যয়িত না হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিত্ব, মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে আত্মা নিজ মুক্তিতেই আত্মহারা, সে আত্মার কোন মূল্য নাই। সে আত্মা দ্বারা জীবনের কোন উপকার নাই—সম্পূর্ণ পরার্থপরতাই আত্মার সার্থকতা।

এই পরার্থপরতা হইতেই উদার-স্বভাব সর্ব্বলোক-হিতকর ভাগবৎ ধর্ম্মের সৃষ্টি। ভাগবৎধর্ম্ম ভারতের শেষ বিকাশ, শেষ মীমাংসা, এই ভাগবতধর্ম্মই জগতের শেষধর্ম্ম—সভ্যতার শেষ অভিব্যক্তি।

এই ভাগবৎ ধর্ম্মে কোন বাদ বিচার নাই। এই অক্ষয় বট সকলকেই ছায়া প্রদান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। ইহাতে নীচ নাই, হিন্দু মুসলমান নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, কৃষ্ণ গৌর নাই। সকলকে সম্মান করিতে, সকলকে আলিঙ্গন করিতে, সকলকে বুকে টানিতে ইহার তুল্য দ্বিতীয় ধর্ম্ম নাই। জীব এবং জগতের হিতই ইহার আদর্শ, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ই ইহার উদ্দেশ্য। এই ধর্ম্ম উপদেশ দেয়, "সকল ভূতের মধ্যে আমার বাস। আমি ভূতাত্মা। এই জন্য অভেদ দৃষ্টিতে দান, মান ও মৈত্রীর দ্বারা সকল জীবের সৎকার করিবে।"

ভগবান বলেন, "নিজের ও পরের মধ্যে যে বিন্দুমাত্র ভেদ করে, সেই ভিন্নদর্শীর আমি মৃত্যু রূপে নানাবিধ ভয় উৎপাদন করি।"

বাস্তবিকই যাহার অভেদ-ভাব, তাহার মৃত্যু কোথায়? সে জানে, অমৃত কেবল স্বর্গের সামগ্রী নহে, অমৃত সর্ব্বজীবের হৃদয়ে চির বিরাজিত। আত্মাই সেই অমৃত। মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া সেই অমৃত লাভ করা যায় না। সর্ব্ব জীবে সমভাব, সেই অমৃত লাভের একমাত্র উপায়। আবার একমাত্র ভক্তিই এই সমভাবের জননী। অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তিই বহুকে এক করিয়া দেয়। এই ভক্তি ধর্ম্মের যাহা কিছু করণীয়, সকলই জীব সেবায়, পরার্থপরতায় এবং জগতের হিতে উৎসর্গীকৃত করিতে হয়। এখানে নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিয়া সকল চেষ্টা এবং সকল সাধনা জীব-সেবায় ব্যয়িত এবং নিয়োজিত করিতে হয়। এখানে ভক্ত মুক্তি চাহে না,চাহে জন-সেবা,বিশ্ব সৎকার। জীবসেবাই তাঁহার ভগবানের সেবা। ভক্ত নরের ভিতর নারায়ণকে দেখিতে পান। তখন তাহার আর প্রতিমা উপাসনার আবশ্যক হয় না। জীবই ভক্তের চক্ষে ভগবানের প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। তাই ভাগবতের ভগবান্ বলিতেছেন, "আমি ঈশ্বর সকল ভূতে আত্মারূপে অবস্থিত। ভূতান্তঃস্থিত আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া যে মূর্খতা বশতঃ

প্রতিমার পূজা করে, সে ভস্মে ঘৃতার্পণ করে।"

আবার বলিতেছেন—"সেই পর্য্যন্ত প্রতিমাদিতে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিবে, যে পর্য্যন্ত আপনার হৃদয় মধ্যে এবং সকল প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরকে মনে অবস্থিত না জানিবে।"

দেখুন এ স্থলে তথাকথিত পৌত্তলিক ভারতবর্ষের আদর্শ কত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবার একমাত্র সাধন কি? তাই বলিতেছেন,—"বন্ধুবর্গের উপহাস, স্বীয় উত্তমত্ব দৃষ্টি ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বর সর্ব্বভূতেই আছেন, এই বুদ্ধিতে কুক্কুর, চণ্ডাল, গো ও গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সমুদায় জীবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।"

ইহাই ভাগবতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম ধর্ম্ম—এই নিষ্কম ধর্ম্মের বিনাশ নাই—নিষ্কামের বিনাশ —কখনই ঘটে না।

এই নিষ্কাম সমদর্শিতার সকল দিকে বিচার করিয়া ভাগবতের ভগবান শেষকালে বলিতেছেন,—অয়ং হি সর্ব্ব কল্পানাং
সধ্রীচীনো মতো মম।
সদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্ কায় বৃত্তিভিঃ।

"এই যে মন বাক্য ও কায় ব্যাপার দ্বারা সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্ব দর্শন, ইহাকেই সকল উপায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি স্বীকার করি।"

ভারতবাসীর এবং জগতবাসীর ভবিষ্যৎ ভাগবতের এই সুমহান্ আদর্শের উপর নির্ভর করিতেছে।

আমাদের দেশের কৃষককুলের পূর্ব্বলুপ্ত গৌরব উদ্ধারার্থ "শ্রমের সম্মান" ("dignity of labour) সম্যক্ উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য। ইহার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৃষি গোরক্ষাদির দিকে মনঃসংযোগ করিতে হইবে। এসম্বন্ধে আমি ইতঃপূর্ব্বে নব্যভারতে বহুকথা বলিয়াছি। তাহার দিকে আমাদের কৃষক কুলের বিশেষ মনোযোগ প্রদাণ করা কর্ত্তব্য। কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করা সমীচীন বলিয়া সাধারণ শিক্ষার পথ অনুসরণ করা উচিত নহে, একথা আমি বলিনা। সভ্যসমাজে মিশিবার জন্য সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞান লাভ আমি খুবই একাঙ্গীভূত মনে করি। আমাদের দেশের কৃষকগণের সঙ্কীর্ণতা পরিহার করার শিক্ষা লাভের জন্য সামান্য সাধারণ বিদ্যানুশীলন প্রয়োজন। পাশ্চাত্য কৃষককুল প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া হৃদয়টী পরিসর হইলে কৃষিকার্য্যে অভিনব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লইয়া প্রবেশ লাভ করে, কাজেই বসুন্ধরা তাঁহাদের শ্রমের ও অধ্যবসায়ের পারিতোষিক স্বরূপ বহুগুণ শস্য উৎপন্ন করিয়া লাভবান করেন, কিন্তু আমাদের দেশের কৃষককুলের কৃষিবিদ্যানুশীলন নাই, উন্নতির চেষ্টা নাই, নামেমাত্র একটী কৃষি-বিভাগ আছে, তাহাতে অবাধে দেশের আবশ্যক উপযোগিতা বা লাভ না দেখিয়া সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় হইতেছে। ভারতীয় কৃষিবিভাগের টাকা অযথা যে ব্যয় হইতেছে, তাহার সংবাদ লয় কে? ভারতীয় করদাতার এই প্রভূত ধন-ব্যয়ের দায়ী কে? কৃষক কুলের পক্ষ হইতে একথা একবার জিজ্ঞাসা করিবার, একথা, এবিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করিবার কি কোন পথ উন্মুক্ত আছে? ভারতীয় কৃষককুলের মতামত গভর্ণমেণ্ট কি কখন গ্রহণ করিয়া থাকেন? ইহাদের সভায় বা সমিতিতে বা অপর কোন উচ্চ শাসন-বিভাগে প্রতিনিধিত্ব আছে কি? এক মাহিষ্য

ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাক্রমে ২২ লক্ষ এবং ২৫ লক্ষ বঙ্গের কৃষককুল আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত আছে। কিন্তু তাহাদের অভাব অভিযোগ শুনিবার বা বলিবার কি কোন উপায় আছে ? কৃষি বিভাগে কতকগুলি শোভাবর্দ্ধনকারী নয়ন-মুগ্ধকর রিপোর্ট বৎসর বৎসর প্রকাশিত হয়, দেশের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হয় না, কৃষকগণের উন্নতিমূলক, গবেষণাপূর্ণ শিক্ষাপ্রদ বিষয়গুলি কদাচ আলোচিত হয় না ; ইহার কারণ কি ? আমার বিবেচনা হয় যে, কৃষিবিভাগের কর্ত্তা স্থায়ী রূপে কৃষি-বিদ্যা-পারদর্শী ব্যক্তিরই হওয়া উচিত। আমাদের দেশের কৃষি-বিভাগকে পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত করিলে রাজা প্রজা উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল হয়। রাজার আয় বাড়ে, প্রজাও দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাবে এককালে শত শত প্রাণী অকালে মরে না ! ! ! তাই ঋষি বলিয়া গিয়াছেন "কৃষির্ধন্যা কৃষি র্মেধ্যা জন্তুনাং জীবনং কৃষিঃ।" কৃষির উন্নতির জন্য আমরা কি করিয়াছি ও করিতেছি ? দেশের যাবতীয় গোকুলের হীনবীর্য্য হইবার সহায় হইয়াছি, গোবংশ ধ্বংসের পথপ্রদর্শক হইয়াছি মাত্র ! ! অথচ আমরা নিজেদের বলি "হিন্দু", "পরম ভাগবত", পরম বৈষ্ণব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের প্রদর্শিত, আচরিত ও আরব্ধ গোপালন, গোরক্ষা, গোসেবা, গো-উৎপাদন, দুগ্ধ, ননী মাখম ব্যবসাদি সবই ভুলিয়া গিয়াছি এবং সেই সকল বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করি। "গোধন" এখন গো-হননে পর্য্যবসিত হইয়াছে !! ভারতীয় কৃষি গোবলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমাদের কৃষির অবনতির কারণ গোকুলের অবনতি। এই অবনতির কারণ কি, তাহা অনুসন্ধানের সময় আসিয়াছে। আমরা গোরক্ষার জন্য কি করিতেছি ? তাহা একবার দেখা কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষি-সমিতিতে রায় বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ গোজাতির উন্নতির কল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। হরিদ্বার, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মধ্যভারত, বম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানেও স্বদেশহিতৈষীগণ গোজাতির উন্নতি ও রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দেশের সংবাদ-পত্রিকা-সমূহের সম্পাদকগণের এবিষয়ে আশু মনঃসংযোগ করার সময় আসিয়াছে। তাঁহারা উপর্য্যুপরি এই সম্বন্ধে ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখিয়া গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে দেশের মহা উপকার সাধিত হয়। আমিও বঙ্গীয় কৃষি-সমিতিতে এবিষয়ে বিশেষ আন্দোলন করিতে ক্রটী করিতেছি না ; কিন্তু আমাকে দেশের লোকের সহয়তা ও সাহায্য দান করা কর্ত্তব্য। অনেক বিষয় আমার জানা নাই। বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গোজাতির অবস্থা, চিকিৎসা-প্রণালী, রোগ ইত্যাদির বিষয় আমার আদৌ জানা নাই। এসম্বন্ধে সমগ্র বঙ্গবাসীর নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা এবিষয়ে আমাকে সবিশেষ তথ্য জানাইয়া বাধিত করেন। আমি বহু সংবাদ পত্রাদিতে এইরূপ আবেদন পত্র প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু নভেলী সমুদ্রে নিমজ্জিত আমার দেশের লোক তাহার দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই। অর্থাভাবে গোচিকিৎসা বিষয়ক এক খানি সম্পূর্ণ পুস্তক ছাপাইতে পারিতেছি না, সেদিকে হিন্দু নামাভিমানী বঙ্গদেশে আমায় সাহায্য করিবার কেহই নাই, ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

এদেশে এত ধনী রাজা মহারাজা আছেন, কিন্তু এরূপ "ইকনমিক" বিষয়ে আমার মত দীনকে কেহই সাহায্য প্রদানে অগ্রসর নহেন, তাহা চিন্তা করিলে দুঃখে স্তম্ভিত হইয়া যাই। এক মাননীয় মহারাজা সার নন্দী বাহাদুর, ও সাহিত্য-সেবক নাড়াজোলাধিপতি রাজা নরেন্দ্রনাথ খাঁ ও আর ২।১টী স্বদেশেহিতৈষী ব্যক্তি আমাকে আর্থিক সাহায্যে দানে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন; কিন্তু অর্থাভাবে আমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। আশা করি, গোমাতার হিতকল্পে আমার এই করুণ আবেদন গোবৎসল-স্বদেশহিতৈষী বঙ্গবাসীর মর্ম্ম স্পর্শ করিবে। আমার অধিকন্তু নিবেদন যে, ভেড়, মনুমস্ত. নকুল. মতঙ্গ, প্রভৃতি প্রাচীন ঋষির পুস্তক যদি কেহ দেখিবার জন্য দেন, তাহা হইলে আমার ৩১ বৎসরের লব্ধ অভিজ্ঞতার সহিত ঋষিদত্ত জ্ঞান সংযোগ করিয়া পুস্তক খানি সম্পূর্ণ করিতে পারি। পশুচিকিৎসা-মূলক কোন সহজ সম্পূর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না!

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার

কি লিখিব এবং কি উপায়ে লিখিব?

আমাকে কিছু লিখিতেই হইবে,—কিন্তু কি লিখিব এবং কি উপায়ে লিখিব, তাহাই ভাবিতেছি। একজন বিজ্ঞব্যক্তি বলেন যে, আমার মনের ভাবগুলি বাঙ্গালায় লিখিয়া গেলেই সাহিত্য হইয়া উঠিবে। হাটের গন্ধ, মাছের পন্থ যখন সাহিত্য হইয়া উঠিতেছে না, তখন এই সহজ উপদেশে আমার উপকারের সম্ভাবনা দেখিলাম না। মনের আকাশে যত ভাব উড়িয়া বেড়ায়, তাহারা অক্ষরের জালে ধরা পড়িলেই যে সাহিত্যের খাঁচাখানি কলনাদ মুখর করিয়া তুলিবে, বিজ্ঞ ব্যক্তির কথাটী ঠিক তাহা নহে। তিনি বলেন যে, মনে যদি আনন্দ হয়, এবং সেই আনন্দ হইতে যদি ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলেই সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে; কারণ বড় রকমের শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে যে, আনন্দ হইতেই যাবতীয় ভূতের জন্ম। ভাবের এই শ্রেণী বিভাগে বুঝিতে পারা গেল যে, দুঃখীর উক্তি, আতুরের রোদন, মুমূর্ষুর নিশ্বাস, হাস্যোদীপ্ত সাহিত্যশালায় স্থান পায় না। দুঃখের বিদায়ে কাহারও দুঃখ নাই, কিন্তু কথা এই যে, আনন্দ হইতে ভূতের জন্ম শাস্ত্রসম্মত বলিয়া, আমাদের আনন্দ-সৃষ্ট সকল ভূত, পিশাচই সাহিত্যের ঘর জুড়িয়া বসিবে কি?

শাস্ত্রের কথা নিশ্চয়ই অটল রকমের সত্য, অর্থাৎ একথাটী ঠিক নহে যে, মানুষেরা জীব সঞ্চার বিষয়ে কোন প্রকার আত্ম অভিজ্ঞতার উপমায়, মনগড়া করিয়া ভাবিয়াছে যে, নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি আনন্দে। তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, বিশ্বের জন্মের পূর্ব্বে ভগবানের মনের অবস্থা কি ছিল, সেটা আমরা অতি সহজে কেমন করিয়া বুঝিয়া ফেলি? অজ্ঞাত অথবা অজ্ঞেয় কথার তুলনা দিয়া বিশেষ পরিচিত স্থূল কথা বুঝাইবার একটা প্রথা আছে, তাহা স্বীকার করি; কারণ সর্ব্বদাই শুনিতে পাই এবং বলিয়া থাকি যে, অমুক যুবা কার্ত্তিকের মত সুন্দর এবং অমুক নারী ঠিক লক্ষ্মীর মত দেখিতে। বড় রকমের উদ্ভাবন থেকে অতি ক্ষুদ্র রক-

মের ফন্দী বাহির করা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর এবং সকল প্রকারের সৃষ্টিতেই উদ্ভাবনকারী মানুষের মনে আনন্দ হয় ; তাই বলিয়া যে সকল উদ্ভাবন এবং সকল সৃষ্টিই তৃপ্তি কর, গ্রহণীয় অথবা রক্ষণীয় হইবে, তাহাওত বুঝিতে পারা যায় না। রামের আনন্দ হইলে সে নিজের ঘরে চেঁচাইতে পারে. নাচিতে পারে, অথবা যাহা খুসী করিতে পারে,, কিন্তু তাহার পাড়া মাথায় করিবার অধিকার কোথায় ? রাম যদি মনে করে যে, তাহার অনুভূত আনন্দ সকলকেই তৃপ্ত করিতে পারিবে, তবেই সে পরের কাছে আনন্দ টুকু লইয়া যাইতে পারে। সাহিত্যের জন্ম আনন্দেই হউক. দুঃখেই হউক, তাহা তৃপ্তিকর না হইলেই পাঠকদিগের কিছু বলিবাব অধিকার আছে। এরূপ স্থলে লেখক বলিতেই পারেনা যে,আমার লেখার জন্ম যখন আনন্দে. তখন তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। পরের সংস্পর্শে না আসিলে আনন্দ হয় না, ভাবেরও জন্ম হয় না এবং পরকে খাঁটি রকমে লক্ষ্য না করিলে কেহ কেবল নিজের আত্মায় ক্রীড়া করিতে করিতে সাহিত্য প্রচার করিতে পারেন না। আনন্দই যদি সাহিত্যের উৎপত্তি-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে রাম, শ্যাম, হরি, যদু প্রভৃতি সকলের সাহিত্যেরই সেই উৎপত্তি স্থান ; কেবল নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির সাহিত্যই ঐ তীর্থক্ষেত্র-যোগ হইতে পারে না। এ অবস্থায় সমালোচনার বেলায় সকলেরই এক বাঁধা কৈফিয়ৎ কিম্বা আপত্তি উঠিতে পারে, এবং সমালোচনা নামক সাহিত্যটী আনন্দ-সম্ভূত নয় বলিয়া নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিতে হয়।

শিক্ষাদির প্রভেদে মানুষকে ভিন্নরুচি হইতে হয়, এবং একজন যাহাতে আনন্দ পায়, অন্যে তাহাতে পায় না। যিনি ইন্দ্রিয়লালসায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ উপভোগ করেন, তাঁহার আনন্দজ সাহিত্য কাহারও ভাল লাগিবে এবং কাহারও নিকট নারকীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। রুচির এইরূপ ভিন্নতা আছে বলিয়া, অবাধে সকল শ্রেণীর সাহিত্যই বাঁচিয়া থাকিবার দাবী করিয়া সমাজ জুড়িয়া বসিতে পারে কিনা ? ভাল মন্দের বিচারে কোন কোন সাহিত্য নির্ব্বাসন-দণ্ডযোগ্য কিনা ? আনন্দের বংশধরেরা সামাজিক উপকার বিষয়ক আইনের বিধানে বিচারিত হইতে পারে কিনা ? যে কল্পনায় ইন্দ্রিয়লালসা বাড়াইয়া তোলে, সে কল্পনা মানুষের শরীরকে ক্ষয় করে এবং মনকে চপল করে। যদি খাঁটি জীবন-বিজ্ঞান বা Biology এবং সমাজ-বিজ্ঞান লইয়া বিচার করি, তাহা হইলে অনায়াসেই স্থির করিতে পারি যে, অমুক শ্রেণীর ভাব, জীবন এবং সমাজ ক্ষয়ের মূল, অতএব তাহা ঘৃণ্য এবং পরিত্যজ্য। এই বিচার অনুসরণ করিয়াই বড় বড় সমালোচকেরা বলিয়াছেন যে, যে প্রকার কল্পনার বাতাসে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিয়া উঠে, যে বর্ণনায় মনে সম্ভোগলালসা জাগিয়া উঠে, সেই লালসা-বর্দ্ধক বা Sensual সামগ্রী, কবিতা হইলেও অতি অধম শ্রেণীর ; এবং যে কবিতায় স্থূলতা না থাকিলেও কোমল সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়া উঠিয়া মনকে ভোগ্য সুখের আলস্যে জড়াইয়া ফেলে, সে কবিতা প্রকৃতি-সম্ভোগ-মূলক হউক অথবা দেব-সম্ভোগমূলক হউক, তাহাও ভোগাত্মিক বা Sensuous বলিয়া নিম্নশ্রেণীর কবিতা। যদি তুমি আমি প্রমাণ করিতে না পারিব যে, তোমার

আমার প্রচারিত ভাব সমাজের উপকারে লাগিবার সম্ভাবনা আছে, এবং অন্যপক্ষে যদি দেখাইতে পারা যায় যে, ঐ ভাব সমাজক্ষয়ের সহায়, তখন ঐ ভাবটী আনন্দের পুত্র বলিয়া এ সংসারে রেহাই পাইবে না। প্রায় সকলেই আত্মম্ভরিতায় আপনার গণ্ডা বেশী করিয়া দেখে। আমি উন্মুক্ত স্বাধীন ভাবে চলিতেছি, আর বাদবাকী লোক পায়ে শিকল বাঁধিয়া ধূলায় গড়াইতেছে বলিলেই নিজের কথার প্রাধান্য স্থাপিত হয় না। আমি যে ধাঁধায় পড়ি নাই এবং আমার কথা যে যুক্তিযুক্ত, তাহা যুক্তির বলে বুঝাইতে হইবে এবং উপকার অপকারের বিচারেই সকল মতকেই সমর্থিত করিতে হইবে।

পাঠকেরা যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি কোন অতিবড় ক্ষমার অযোগ্য অপরাধীকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধ ফাঁদিয়াছি। আমি নিজে, যে শ্রেণীর রচনা উপকারী এবং সমর্থন-যোগ্য মনে করিয়াছি, ঠিক তাহারই পোষকতায় কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির যে যুক্তিমার্গ লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারই সমালোচনা করিলাম; অর্থাৎ আমি সমালোচনা করিলাম আনন্দ বনাম উপকারের। আনন্দন্যায়ে যে শর্ত্তে পড়িতে হয়, তাহাই বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তগুলি দিয়াছি, কিন্তু কোন ব্যক্তি অসাধুভাব পোষণ করেন মনে করিয়া কিছু লিখি নাই।

(২)

কি লিখিব, তাহা একরূপ স্থির হইয়া গেল; এখন কেবল আনন্দের অপেক্ষা করিতেছি। আনন্দ উথলিয়া উঠিলে আমার ভাষার রীতি কি হইবে, তাহাও ভাবিয়া রাখি। সহজ কথায় মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বৈদর্ভী রীতি অনুসরণ করিতে পারি, কথার ঝঙ্কার দিয়া পাঞ্চালী রীতি অনুসরণ করিতে পারি কিংবা শব্দাড়ম্বর করিয়া গৌড়ী রীতির গৌরব বাড়াইতে পারি, কিন্তু তাহাতেও নাকি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব না। লেখায় একটা Art বা কৌশল বা কারচুপি না রাখিলে নাকি সাহিত্য হইবে না; সহজ কথা যতই জটিল হইয়া উঠুক, সাহিত্যিক কারচুপির আশ্রয় লইতেই হইবে। সৃষ্টি-কৌশলের এই ধাঁচাটীর একটু পরিচয় দিতেছি।

যাঁহারা সাহিত্যিক শিল্পচাতুরী জানেন না, তাঁহারা হয়ত মূর্খের মত আপনার বক্তব্যটীকে সুবোধ্য করিবার জন্য দৃষ্টান্ত বা উপমা প্রয়োগ করেন; কিন্তু খাঁটি সাহিত্য-শিল্পীর প্রথা অন্যবিধ। হয়ত একটা বড়ই সহজবোধ্য বিন্তু তবুও লেখকের মাথায় যখন একটা উপমা জুটিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে সেটা জুড়িতেই হইবে। তুমি সহজ কথাটা স্বতন্ত্রভাবে পড়, এবং তাহার পর উপমার বাহারটা স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্য করিতে থাক; উপমা এবং কবিত্বের আতিশয্যে মূলের সহজ কথাটী বরং জটিল কুটিল হইয়া উঠুক, তবুও উপমা চালাইতেই হইবে। যেরূপ তর্কের শৃঙ্খলায় কোন বিষয়ের মীমাংসা এবং সিদ্ধান্ত সহজ হইয়া পড়ে, সাহিত্যে তাহা বর্জ্জনীয়; Analogy বা উপমার যুক্তি অতি কুযুক্তি হইলেও উহাই অবলম্বনীয়, কারণ উহাতে ভ্রান্তি এবং ধাঁধার কুয়াশায় সাহিত্যিক Artএর গৌরব বাড়ে। উর্ব্বর মস্তিষ্কে যখন ভড়কাল উপমা, কিম্বা চকচকে কথা গজাইয়া উঠে, তখন রচনার সরলতার খাতিরে ঐ একজন শিল্প-চতুর সাহিত্যিককে জিজ্ঞাসা করিলে

যে, তিনি ভাল আছেন কি না; তিনি তখন কথার উত্তরে হাঁ বা না, না বলিয়া যদি একটী খঞ্জনী বাজাইয়া দু এক পাক নাচিয়া একটা গানের সুরের শেষভাগে দশ মিনিট পরে অস্পষ্ট ভাবে হাঁ কিম্বা না জুড়িয়া দেন, তবে শিল্পচাতুরীর একশেষ হইবে। ইহাতে তুমি সুরের পেঁচে উত্তরটা বুঝিতে আর নাই পার, কিন্তু সাহিত্যিকের কথায় যে বেশ খানিকটা উপভোগ্য ঝঙ্কার এবং Artএর সৃষ্টি হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার ক্ষমতা থাকে ত ভাব খুঁজিয়া বাহির কর, কিন্তু কদাচ সাহিত্য শিল্পে বাধা দিও না; কারণ পেঁচের সংখ্যায় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারিত হয়। আনন্দ এবং পেঁচালো ভাষা সাহিত্যের জনক জননী; আনন্দ পুরুষ, এবং পেঁচালো ভাষা প্রকৃতি,—এই পুরুষ প্রকৃতির যোগেই সাহিত্যের সৃষ্টি। আমার রচনার শেষ ছত্রটীতে খাসা সাহিত্যিক Art জন্মিয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বাংলার কথা। (৩)

দিল্লীর মোগল বাদসাহ আকবর বাংলা জয় করিলেও কখন সম্পূর্ণ রূপে বাংলায় আধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই। গৌড়ের মহামারীতে তাঁহার সুবেদার মুনেম খাঁর মৃত্যু হইলে, পাঠানেরা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বাংলায় উৎপাত আরম্ভ করিল। তাহারা দিনকতক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, একটু সুবিধা কি সুযোগ পাইলেই পঙ্গপালের ন্যায় উড়িষ্যা হইতে বাংলার শ্যামল-ক্ষেত্রে পড়িত আর পশ্চিম বাংলার প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

মুনেম খাঁর পর আকবর হোসেনকুলী খাঁকে বাংলার সুবেদার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। হোসেন গৌড়ের নিকটে তান্‌ডা নগরে রাজধানী করিয়াছিলেন। হোসেনের পর মুজাফর, আজিম ও সাবাজ খাঁ যথাক্রমে বাংলার সুবেদার হইয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলকেই পাঠানদের হাতে নাস্তানাবুদ হইতে হইয়াছিল। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর রাজপুতানার বিভীষণ মাড়োয়ারি রাজা মানসিংহকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মানসিংহ ১৮ বৎসর কাল সুবেদারী করিয়াও পাঠানদিগকে টিট করিতে পারেন নাই।

আকবরের রাজত্বকালে কেবল যে পাঠানেরাই বাংলায় যুদ্ধের আগুন জ্বালাইয়াছিল তাহা নহে। এক সময়ে মোগল সর্দ্দারেরা বিদ্রোহী হইয়া দুই বৎসর ধরিয়া বাংলার সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং কেদার রায় প্রতাপাদিত্য-প্রমুখ বাঙ্গালী ভূঁইয়ারা বহুদিন ধরিয়া মোগলদের ক্ষমতায় বাধা দিয়াছিল।

পাঠান মোগলের নিয়ত বিবাদে, মোগল সর্দ্দারদের বিদ্রোহে এবং ভূঁইয়াদের উপদ্রবে বাংলার প্রজা সাধারণ আকবরের সময়ে নিতান্ত অশান্তিতে দিন কাটাইত।

রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঠান শাসনকর্ত্তারা বাংলা দেশকে চাকলা, পরগণা ও মৌজায় বিভক্ত করিয়াছিল। তখন বাংলার জমী খাসমহল ও জায়গীর এই দুই শ্রেণীর

ছিল। কর্ম্মচারীদিগের বেতনের পরিবর্ত্তে ও সৈন্যরক্ষার জন্য জায়গীর প্রদত্ত হইত, জায়গীরের জন্য রাজস্ব দিতে হইত না। খাসমহল জমীদার ও ভূঁইয়াদের মধ্যে খাজনায় বিলি হইত। যে সকল মোগল সর্দ্দারেরা মুনেমের সহিত বাংলা জয় করিতে আসিয়াছিল তাহারা, পাঠানেরা যুদ্ধে পরাজিত হইলে, পাঠান সর্দ্দারদের জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, পাঠান সর্দ্দারেরা যেমন সৈন্য যোগাইয়া বিনা করে জায়গীর ভোগ দখল করিত, তাহারাও সেইরূপ করিবে। কিন্তু আকবর বাদসাহ বাংলা জয় করিয়াছিলেন, বাংলার রাজস্বে দিল্লীর কদর বাড়াইবার জন্য। তিনি বাংলা জয় করিয়া তোডরমল্ নামে এক মাড়োয়ারী রাজাকে বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য নূতন বন্দোবস্ত করিতে হুকুম করিলেন। রাজা তোডরমল পাঠানা আমলের জমী বিভাগকে ভিত্তি করিয়া বাংলাকে প্রায় ২০ সরকারে এবং ২০ সরকারকে ৭০০ মহাল বা পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। কতকগুলিন মৌজা বা গ্রাম লইয়া ও কতক গুলি পরগণা লইয়া সরকার গঠিত হইত। তোডরমল বাংলার রাজস্বের যে ফর্দ্দ তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাহার নাম ওয়াশীল তুমার জমা। ওয়াশীল তুমার জমায় বাংলার খাস মহাল ও জায়গীরের খাজনা প্রায় ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে জায়গীর নিষ্কর ছিল। নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে মোগল সর্দ্দারদের নিকট হইতে জায়গীর সমূহের আয় ব্যয়ের হিসাব চাওয়াতে সর্দ্দারেরা বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হইল। যখন মুজাফের সা বাংলার নায়েব বা সুবেদার তখন এই বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। মোগল সর্দ্দারেরা মুজেফার খাঁকে লাঞ্ছিত করিয়া রাজধানা তানডা নগর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ যোদ্ধা আজিম খাঁকে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য আকবর সুবেদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ছলে বলে কৌশলে আজিম খাঁ বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন কিন্তু বিদ্রোহ দমন করিতে তাঁহার দুই বৎসর লাগিয়াছিল।

পাঠানা আমলে জমীদারদিগের অবস্থা করদ মিত্র রাজাদিগের ন্যায় ছিল। সাধারণ প্রজা কিম্বা দেশ রক্ষণের ভার জমীদারদিগের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত। সেইজন্য প্রত্যেক জমীদারের অধীনে বিস্তর সৈন্য ও সৈন্যদিগের গমনোপযোগী যান থাকিত। নির্দ্দিষ্ট রাজকর দিলেই তাহারা স্বাধীন রাজার ন্যায় নিজেদের এলাকায় চলিতে পারিত। যখন বাদসাহ আকবরের সেনা ও কর্ম্মচারীরা মোগল সর্দ্দার ও পাঠানদিগের বিদ্রোহ দমন করিতে ব্যতিব্যস্ত, তখন বাংলার জমীদারেরা কখন বা বাদসাহের লোকজনকে, কখন বা বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিতে লাগিল। আবার জন কতক ভূঁইয়া সুযোগ বুঝিয়া এই হাঙ্গামায় আপনাদিগকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। আকবরী আমলের ক্ষমতাশালী বাঙ্গালী জমীদারেরা ইতিহাসে বারো ভূঁইয়া বলিয়া পরিচিত। বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে মুসলমান বাঙ্গালীও ছিল।

বাদশাহ আকবর বাংলাকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ৪।৫ পরগণার উপর এক একজন ফৌজদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরগণার আয়তন বর্ত্তমান মহকুমার মতন ছিল। রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি ফি পরগণায় আমীরগুজার নামে কর্ম্মচারী

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কোন জমীদার রাজকর দিতে অবহেলা করিলে, আমীরগুজার সে কথা ফৌজদারকে জানাইত। ফৌজদার অধীনে সৈন্য থাকিত। ফৌজদারের সৈন্য জমীদারের নিকট খাজানা আদায় করিত।

প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি উদ্ধত জমীদারেরা প্রথমতঃ রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিল। আমীরগুজার ফৌজদারকে এই সংবাদ দিলে, ফৌজদারেরা জমীদারদিগকে দমন করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইল। এই সকল সৈন্যদের সংখ্যা বেশী ছিল না। ফৌজদারের সৈন্যেরা পরাজিত হইলে এই সকল উদ্ধত জমীদারের আস্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা যেখানে সেখানে যা তা আরম্ভ করিল। বাদসাহের সুবেদারেরা পাঠান দমনে ব্যস্ত থাকায়, তাঁহারা প্রথমে এই সকল জমীদারের কারখানায় নজর করেন নাই। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে পাঠানেরা একটু নরম হইলে রাজা মানসিংহের দৃষ্টি দুষ্ট জমীদারদিগের উপর পড়িল।

আকবরের সময় যে সকল ভূঁইয়া প্রবল ও উদ্ধত হইয়াছিল, তাহাদের নাম বিক্রমপুরের কেদার রায়, ভাওয়ালের ফজলগাজী, খিজিপুরের ঈষা খাঁ, সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, তাহেরপুরের ভাদুড়ী রাজা। ইঁহাদের অধীনে বিস্তর অশ্ব, হস্তী, নৌকা সৈন্য ও কামান ছিল। ইহাদের এক একজন স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতার অবতার ছিল। ইহারা যথেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, কোন পাপ কাজে ইহারা ডরাইত না। ইহারা দুষ্ট ছিল, অথচ যে ভূঁইয়া মুসলমান ছিল, সে ওয়াকফ দর্গা দিত, যে ভূঁইয়া হিন্দু ছিল, যে মন্দির গড়িত, নিজের স্বজাতকে বিনা করে জমী দিত, টোলের জন্য ব্রহ্মত্র দান করিত। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একতা ছিল না, ইহাদের কর্ম্মচারীরা বিশ্বাসঘাতক ছিল। এই সকল কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য দস্যু দলপতির অনেকেই মানসিংহের বশে আসিয়াছিল। যাহারা বশে আসে নাই, মানসিংহ তাহাদিগকে আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের বাদসাহীকালে শ্রীমন্ত ভবানন্দ প্রভৃতি ঘর সন্ধানী বিভীষণের সাহায্যে নাস্তানাবুদ, নষ্ট ও সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল।

পাঠান ও মোগল শাসনের তফাৎ এই যে পাঠান শাসনে বাংলার জমীদারদিগের যথেষ্ট ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ছিল। বাংলার টাকা বাংলায় ব্যয় হইত। আকবরের শাসন প্রণালীতে বাংলার জমীদারদের ক্ষমতা কমিয়া যাইতে লাগিল, বাংলার টাকা দিল্লীর শোভা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল। পাঠান শাসনকালে শাসন কর্ত্তারা সমস্ত বিষয়েই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন,—তাঁহারা বাংলাতেই জন্মগ্রহণ করিয়া বাংলার জমীতেই দেহত্যাগ করিতেন। বাংলার প্রতি তাঁহাদের মায়া মমতা ছিল। আকবরের প্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালীতে বাংলায় সুবেদার, রাজস্ব সচীব, বক্সী প্রভৃতি বিভিন্ন স্ব স্ব প্রধান উচ্চ কর্ম্মচারী বাংলা শাসনের জন্য নিযুক্ত হইত। সুবেদার রাজ প্রতিনিধিও সৈন্যাধ্যক্ষ। দেশের অশান্তি ও বাহিরের শত্রুর আক্রমণ নিবারণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। সুবেদারের অধীনে ফৌজদার, কোতোয়াল, কাজী দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শান্তি স্থাপন ও বিচারের জন্য নিযুক্ত হইত। ইহারা

সকলেই দুই দিনের চাকর ছিল, আজিকে মানসিংহ বাংলার সুবেদার, হয় তো কল্যই তাঁহাকে সম্রাটের আদেশে মুলতানে সুবেদার হইয়া যাইতে হইত। পাঠান শাসনেও ফৌজদার কোতোয়াল ও কাজী ছিল। কিন্তু তাহারা বাংলা ছাড়িয়া অন্য কোথায় বদলী হইত না। কি মোগল শাসন, কি পাঠান শাসন উভয় শাসনকালেই জনসাধারণ সহজে ঐ সকল খামখেয়ালী ঘুসখোর নৃশংস কর্ম্মচারীদের কাছে যাইতে চাহিত না। গ্রামের পঞ্চায়েতে তাহারা নিজদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিত। প্রতি গ্রাম এক একটী সাধারণ তন্ত্রের ন্যায় ছিল। রাজস্বসচীব আমীরগুজারদের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার উপর রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল। কোন জমীদার খাজানা না দিলে, আমীরগুজার ফৌজদারের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। মীর আমীর গুজারের নিকট রাজস্ব আসিত। বক্সী কর্ম্মচারী ও সৈন্যদিগের বেতন ও অন্যান্য রাজ্য সংক্রান্ত ব্যয় তাঁহার হাত দিয়া হইত। যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা দিল্লীর রাজভাণ্ডারে যাইত।

আজ ইংরাজী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ আগষ্ট মাস। বাংলা ১৩২২ সন, শ্রাবণ মাস আকবরের আমলে এই বাংলা সন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বাংলায় মাড়োয়ারী বসানো আকবরের আরেক কীর্ত্তি।

আকবরের রাজত্ব কালে কোচবেহারের রাজা স্বেচ্ছায় মোগল দিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। আকবর নামায় সেই সময়কার বাংলার বর্ণনায় দেখা যায় যে—বাংলার সমস্ত নদীর তীরেই নানা জাতীয় ধান্যের চাষ হয় স্থানে স্থানে ভূমি এরূপ উর্ব্বরা যে একটি ধান্য বপন করিলে ২।৩ সের ধান্য উৎপন্ন হয় অনেক জমীতে বৎসরে তিনটি করিয়া ফসল হয়। বাঙালীরা রাজ শাসনে বিশেষ বাধ্য। এই সুবায় খাজনা টাকাতে আদায় হয়। এদেশের লোকের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ। এখানকার লোক যব গম স্বাস্থ্যকর খাদ্য বলিয়া মনে করে না। ইহারা অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় থাকে। পরিধানে কেবল একখানি মাত্র ধুতি থাকে। এ দেশের স্ত্রী লোকেরা হাটে বাজারে বাহির হয়। এ দেশের লোকেরা বাঁশের ঘরে বাস করে। এক এক খানি ঘর করিতে অনেক সময় ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হয়। যুদ্ধ বিগ্রহ, গমনাগমন এবং মাল পত্র স্থানান্তরে লইবার জন্য ইহারা নৌকা ব্যবহার করে। স্থলপথে গমনাগমনের জন্য ডুলী ও পালকী ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ হস্তী আরোহণেও স্থানান্তরে যাতায়াত করে। অশ্ব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না এই সুবার কোন কোন স্থানে পাটের দ্বারা এমন কার্পেট নির্ম্মিত হয় যে তাহা দেখিলে রেশমের নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। এখানকার লোক অত্যন্ত লবণ প্রিয়। এ দেশে প্রচুর পরিমাণে ফল ও পুষ্প জন্মে। এ দেশের লোক অধিক পরিমাণে তাম্বুল ব্যবহার করে। অন্যান্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায় পাঠান রাজত্বের শেষ অবস্থার এবং মোগল আমলে প্রজাগণের ধন প্রাণ নির্ব্বিঘ্নে ছিল না বেদেরা ছেলে চুরী করিত, পথ বিপদ সঙ্কুল ছিল প্রজাদিগকে নানাবিধ কর দিতে হইত। দেশে খাদ্য সামগ্রী সস্তা হইলেও অনেক দরিদ্র ছিল। ধুতি মহার্ঘ ছিল। দেশের অধিকাংশ ছোট মোটা কাপড় পরিত। জাতিভেদ প্রথা দৃঢ় রূপে প্রতি-

ষ্ঠিত হইয়াছিল। কথকেরা জন সাধারণকে পুরাণের কাহিনী শুনাইত। মেয়েরা নানা রকমের ব্রত করিত। হাটে বাজারে মদ বিক্রয় হইত ও বেশ্যা থাকিত। মূর্খ ব্রাহ্মণগণেরা পুরোহিত গিরি করিত। বাঙালীরা তখন মাথায় বাব্‌রীচুল রাখিত। পাঠান শাসনে বাঙালী লুচী কচুরী খাইতে শিখে নাই। তখন বাংলার বাগানে গোলাপ ফুল ফুটিত না। মোগল শাসন কালে বাংলায় লুচী কচুরী ও গোলাপ আমদানী হইয়াছিল। আকবরের পূর্ব্ব হইতেই অনেক উচ্চ বর্ণের হিন্দু ইজের পরিয়া পার্শীবুলি বলিতে শিখিয়াছিল। মোগল শাসনে ইহাদের দল বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মুসলমান শাসন কালে বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে দাসত্ব প্রথা ছিল তখন গরীব হিন্দুরা স্ত্রীপুত্র কন্যা বিক্রয় করিত।

১৬০৫ খৃষ্টাদের আকবরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর নাম ধরিয়া মোগল সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। মানসিংহ জাহাংগীরের রাজত্বের প্রথম বৎসরে পদত্যাগ করিলে কুতুব নামে একজন বাংলার সুবেদার হইয়া আসিল। কুতুব যখন বাংলার সুবেদার, তখন বর্দ্ধমানে সের আফ্‌গান নামে এক কর্ম্মচারী ছিল। সেরের স্ত্রী মেহেরের উপর জাহাংগীরের অনেক দিন হইতে নজর ছিল। কুতুবের অনুচরেরা সেকের হত্যা করিয়া মেহেরেকে দিল্লীতে চালান দিয়াছিল। এই মেহেরই ইতিহাসের নূরজাহান। সেরকে হত্যা করিবার সময় ছোট খাটো দাঙ্গা হয় তাহাতে কুতুব নিহত হইয়াছিল। কুতুবের পরে জাহাংগীর কুলী ও তৎপরে ইসলাম খাঁ বাংলার সুবেদারী করিয়াছিলেন। বাদসাহ জাহাংগীরের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম বাংলায় আসেন। ইসলাম বাংলায় আসিয়া দেখিলেন, বাঙালী জমীদারেরা শান্ত হইয়াছে কিন্তু পাঠানেরা আবার বিদ্রোহী হইয়াছে, আর পূর্ব্ব বাংলায় মগ ও ফিরিঙ্গিদের নূতন উৎপাত দেখা দিয়াছে। পাঠান দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইসলাম মগ ও ফিরিঙ্গিদের দমন করিতে মনোনিবেশ করিলেন। মানসিংহ তান্‌ডা হইতে রাজধানী তুলিয়া রাজমহলে রাজধানী করিয়াছিল। পূর্ব্ব বাংলার নূতন অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য ইসলাম খাঁ ঢাকা নগরে রাজধানী করিলেন। ঢাকার নাম বাদসাহের নামানুসারে জাহাঙ্গীরাবাদ হইল।

ইউরোপে পর্ত্তুগাল নামে এক দেশ আছে। সে দেশের লোককে পর্ত্তুগীজ বলে। পর্ত্তুগীজেরা ১৫ শতাব্দীতে যখন ভারত বর্ষে আসে তখন তাহারা ভারত বর্ষে ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত ছিল। ফিরিঙ্গিরা ইউরোপবাসীদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে এদেশে আসিয়াছিল। ফিরিঙ্গিরা খুব সাহসী ও নৌকা চালাইতে বিশেষ দক্ষ ছিল। তাহারা কামান ও বন্দুকের ব্যবহার খুব ভাল করিয়া জানিত এই জন্য তাহাদিগকে সকলেই ভয় করিত। ফিরিঙ্গিরা বানিজ্যে অন্যান্য ইউরোপীয়দের সহিত না পারিয়া বানিজ্য ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিল। অনেকেই নদী ও সমুদ্র পথে দস্যু বৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। বাঙ্গালার জমীদারে জমীদারে লড়াই কিম্বা সুবেদার জমীদারের যুদ্ধে ফিরিঙ্গিরা জমীদারের অধীনে গোলন্দাজী করিত। দিন দিন ফিরিঙ্গিদের

পসার বাড়িতে লাগিল। থারাকাণ দেশের লোকদিগের সাধারণ নাম মগ। মগদের রাজা অনেক বদমায়েস ফিরিঙ্গিকে আশ্রয় দিয়াছিল। ফিরিঙ্গিরা বাংলার বড় বড় নদীতে ডাকাতি করিত; বাংলার লোককে জোর করিয়া অন্য দেশে দাস রূপে বিক্রয় করিত, জোর করিয়া বাংলার লোককে খৃষ্টান করিত। ঘর জ্বালানো নরহত্যা সতীত্বনাশ প্রভৃতি মহাপাপে কি ফিরিঙ্গি কি মগ একটুকু মাত্র ইতস্ততঃ করিত না। মগ ও ফিরিঙ্গিতে মিলিয়া প্রায়ই পূর্ব্ব ও নিম্ন বাংলায় লুট পাট অত্যাচার করিত। ইহাদের অত্যাচারে ফিরিঙ্গি ও মগের মুল্লুক বাংলা ভাষায় ঘৃণনীয় শব্দ হইয়াছে। জাহাঙ্গীর বাদসাহ ১৬০৬ হইতে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ২২ বৎসর প্রজারা নিয়মমত খাজানা দিত বটে, কিন্তু কোন প্রজার ঘরে শান্তি ছিল না। রাজত্বের প্রথমাবস্থায় বাঙ্গালী জমিদারদের মধ্যে কাটাকাটি, তার পর পাঠান দিগের দেশব্যাপী বিদ্রোহ, তার পর মগ ও ফিরিঙ্গি ও আসাম দেশের অহম জাতির উৎপাত। জাহাংগীরের রাজত্বের শেষ ভাগে যদিও জমীদারের মধ্যে কাটাকাটি ছিল না, পাঠানেরা যদিও শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল ও মগেরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাংলায় লুট পাট স্থগিত রাখিয়াছিল কিন্তু ফিরিঙ্গির অত্যাচার সমান ছিল। এতদ্ব্যতীত জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহান বৎসর বৎসর বাংলায় থাকিয়া পিতার সহিত ঝগড়া চালাইয়াছিলেন। এত অত্যাচার, এত লুঠ পাট, যুদ্ধ বিদ্রোহ এর মধ্যে যে বলে আকবর ও জাহঙ্গীরের সময় বাংলায় সুখ ছিল, সে বাঙ্গালী জাতিকে মানুষ ভাবেনা সেভাবে বাঙ্গালী গরু ভেড়া না হোক তাহাদের অপেক্ষা কিছু উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। অনেকে বলেন এখন যে অঞ্চলে সুন্দরবন সে অঞ্চলে লোক জনের বাস ছিল, সে অঞ্চলে বিজন বন ছিলনা। মগ ও ফিরিঙ্গিদের দৌরাত্ম্যে লোকপূর্ণ স্থান লোকশূন্য হইয়া বিজন বনে পরিণত হইয়াছে।

বিলাসী তামাক খোর জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে কাব্যপ্রিয়, শিল্পপ্রিয়, উন্নতমনা সাহাজান- তাজমহলের সাজাহান মোগল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসিলেন। সাজাহান যখন পিতা জাহাঙ্গীরের সহিত ঝগড়া করিয়া বাংলায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারের অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি বাদসাহ হইয়া ফিরিঙ্গির অত্যাচার দমন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। ফিরিঙ্গি বদমায়েস গুণ্ডাদের আড্ডা সন্দ্বীপ ও চাটিগাঁর কাছে ছিল। ফিরিঙ্গি ব্যবসায়ীদের আড্ডা ছিল সপ্তগ্রামের নিকট হুগলীতে। তাঁহার সুবেদার বৎসরাবধি যুদ্ধ ও অবরোধের পর ফিরিঙ্গিদের সমুদয় আড্ডা দখল করিল, তাহাদের যুদ্ধ পারগ সমস্ত পুরুষ নিহত হইল। ফিরিঙ্গি বালক বালিকারা ক্রীতদাস হইল, আর ফিরিঙ্গি যুবতীরা বাদসাহের ওমরওদের অন্তঃপুরে বেগম মহলে প্রবেশ করিল।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গিদের ক্ষমতা বাংলা হইতে একেবারে মুছিয়া গেল। হুগলী হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে দূরীভূত করিয়া তথায় মোগলেরা প্রধান প্রধান কার্য্যালয় সপ্তগ্রাম হইতে তুলিয়া আনিল। হুগলী অনতিবিলম্বে বাংলার প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠিল। সপ্তগ্রামের ধীরে ধীরে

অবনতি হইতে লাগিল। এখন সপ্তগ্রাম সামান্য গ্রাম মাত্র।

সাজাহান বাদসাহের আমলে যখন তাঁহার পুত্র সুজা বাংলার সুবেদার, তখন ইংরাজেরা বাংলায় বাণিজ্য করিতে ও কুঠী নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুজার পূর্ব্বে ইসলাম খাঁ, আজিম খাঁ ও কাশিম খাঁ সাজাহান কর্ত্তৃক বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহাদের কাহারও সময় বাংলায় সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বাদশাহজাদা সা সুজার সময় বাংলার অশান্তি ছিল না। সুলতান সুজা প্রায় ২০ বৎসর বাংলায় সুবেদারী করিয়াছিলেন। সুজার সুবেদারী কালে আসামের অহম জাতি, আরকাণের মগ, চট্টগ্রামের ও সনদ্বীপের ফিরিঙ্গিরা কেহই বাংলায় উৎপাত করিতে সাহস পায় নাই। পাঠানেরাও ঢিট্ হইয়াছিল। সঙ্গীত-প্রিয় উদার হৃদয় সাহসী সুজার শাসনে বাংলায় কিছু দিনের জন্য সম্পদ ও আমোদ দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সুখের দিন বেশী দিন ছিল না। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ সাজাহান পীড়িত হইলে তাঁহার দুই পুত্র দারাও আরাংজেবে দাঙ্গা বাধিয়া গেল, সুজাও কলহ-স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। সাজাহান বন্দী হইয়া কারাগারে গেলেন, কূট বুদ্ধি আরাংজেব বাদসাহ হইলেন। সুজা বৎসর দুই লড়াই করিয়া আরাকাণে পলায়ন করিলেন। বিশ্বাসঘাতক মগ রাজার হস্তে বন্ধুহীন, ভাগ্যহীন সুজা সবংশে নিহত হইলেন। সুজার সর্ব্বনাশের প্রতিশোধ লইতে তাঁহার কেহই রহিল না। কিন্তু তিনি যে মহান্ জাতিকে বাংলায় আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহার নূন্যাধিক এক শত বৎসর পরে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী-ক্ষেত্রে মোগলদিগকে সুজার মৃত্যুর প্রতিশোধের পরিবর্ত্তে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছিলেন। আরংজীব নিজ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মিরজুমলা নামক এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধাকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করিলেন। সা সুজা যখন বাংলার সুবেদার ছিলেন, তখন তিনি ঢাকা ত্যাগ করিয়া রাজমহলে রাজধানী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মীরজুমলা বাংলার সুবেদার হইয়া ঢাকায় আবার রাজধানী তুলিয়া লইয়া গেলেন। মীরজুমলা ৪ বৎসর বাংলায় ছিলেন। তিনি তাঁহার সুবেদারী কালে অহম ও কোচ জাতিকে দমন করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। মীরজুমলার পরে নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র সায়েস্থা খাঁ সুবেদার হইয়া বাংলায় আসেন। সায়েস্থা খাঁ প্রায় এক যুগ সুবেদারী করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া যান। সায়েস্তা খাঁর সময়েও আসামীরা সুযোগ পাইলেই বাংলায় উৎপাত করিত। সায়েস্তা খাঁর সময় ফরাসী ও দিনেমান নামক ইয়ুরোপের দুই জাতি বাংলায় আড্ডা গাড়িয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ সুবেদারী ত্যাগ করিলে, ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁ বাংলার সুবেদার হইয়াছিলেন, ইহার সুবেদারীর সময় শোভাসিংহ নামক একজন বর্দ্ধমানের জমীদার, বর্দ্ধমানের রাজার প্রতি বিরক্ত হইয়া উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁকে বর্দ্ধমানের রাজাকে জব্দ করিবার জন্য আহ্বান করে। তাহারা উভয়ে বর্দ্ধমান অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। এই বিদ্রোহের সময় সুবেদারের অনুমতি লইয়া চুঁচুড়ার ওলেন্দাজেরা, চন্দননগরে ফরাসীরা, এবং সুতানটীতে ইংরাজেরা দুর্গ

নির্ম্মাণ করিয়াছিল। শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর সৈন্যেরা পশ্চিম বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। ইব্রাহিম খাঁ, শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহ দমন করিতে পারিল না। বিদ্রোহের কথা সম্রাট আরংজীবের কাণে উঠিলে তিনি বিরক্ত হইয়া ইব্রাহিমকে পদচ্যুত করিলেন, এবং স্বীয় পৌত্র আজিম ওসমানকে বাংলার সুবেদার করিয়া পাঠাইলেন। আজিম বাংলায় আসিয়া শুনিলেন যে শোভাসিংহ বর্দ্ধমান রাজকুমারীকে অপমান করিতে গিয়া কুমারীর হস্তে নিহত হইয়াছে, আর রহিম খাঁর সহিত ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্তের যুদ্ধ চলিতেছে। বিদ্রোহ দমনের নাম নিজে সমস্ত লইবার জন্য আজীম প্রথমে জবরদস্তকে দিল্লীতে সরাইলেন, পরে নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ রহিম নিহত হওয়ায় পাঠানেরা ভীত হইয়া আজীমের আনুগত্য স্বীকার করিল। ১৬৯৮ খৃঃ বাংলার বিষম বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল। এই ঘটনার দুই বৎসরপরে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা সুতানটি গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনটী গ্রাম মোগলদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মোগল সম্রাটদের আমলে বাংলার ভার একজনের হাতে না রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারীর হাতে রাখা হইত। এই সকল কর্ম্মচারীদের মধ্যে নিজাম বা সুবেদার শাসন সম্বন্ধে, এবং দেওয়ান রাজস্ব আদায় ও খরচে সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। সুবেদার দেওয়ানের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিত না। গুরুতর বিষয়ে সুবেদার ও দেওয়ান মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করিত। আজীম ওসমানের সুবেদারী সময় বাদসাহ আরংজীব মুরশীদ কুলী খাঁ নামক এক বুদ্ধিমান কর্ম্মচারীকে বাংলার দেওয়ানীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মুরশীদকুলী ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

বাংলা অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া ইহার অনেক জমী অল্প হারে জায়গীর দারদের মধ্যে বিলি করা হইয়াছিল। মুরশীদ কুলী খাঁ বাংলায় আসিয়া সমস্ত জমী জমার তদন্ত আরম্ভ করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন ভাল বন্দোবস্ত হইলে বাংলার রাজস্ব অনেক বৃদ্ধি হইতে পারে। তিনি খাজানা তহশীল জায়গীর দারদের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের লোক দ্বারা করাইতে লাগিলেন। জায়গীর দারেরা নিজের নিজের জমী জমীদারদের মধ্যে খাজনার বিলি করিত। মুরশীদ কুলী খাঁর নূতন বন্দোবস্তে জমীদারেরা অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার মুঠার আসিয়া পড়িল। মুরশীদ তখন জমীদারদিগের খাজনা বাড়াইয়া বাংলার রাজস্ব এক কোটী টাকা করিলেন মুরশীদ কুলী খাঁর কার্য্যে সম্রাট আরংজীব অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

আজীম ওসমানের সময় ঢাকা বাংলার রাজধানী ছিল। প্রথম হইতেই ব্যয় সম্বন্ধে দেওয়ান ও সুবেদারের মধ্যে বিবাদ ঘটে। আজিম ওসমান শেষে মুরশীদ কুলী খাঁকে গুপ্ত হত্যা করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ মনোরথ হইলেন। অনন্তর মুরশীদ কুলী খাঁ ঢাকায় থাকা সুবিধার নয় বুঝিয়া মুকসিদাবাদনগরে আপনার কাছারী ও দপ্তরখানা তুলিয়া লইয়া গেলেন। মুরশীদ নিজের নামানুসারে

মুকশীদাবাদের নাম মুর্শীদাবাদ রাখিলেন। আপন পৌত্র ও মুরশীদ কুলী খাঁর মনোমালিন্য ও বিবাদের কথা সম্রাট আরংজীবের কানে উঠিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। আরংজীব গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি পৌত্র আজীমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, মুরশীদ কুলী খাঁ মুরশীদাবাদে রাজধানী করিয়া দেওয়ানী ও সুবেদারী কাজ করিতে লাগিলেন। আরংজীরের ১৭১৭ খৃষ্টব্দে এবং মুরশীদ কুলী খাঁর ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। ১৭০৭ হইতে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লির সিংহাসনে কখন বা আরংজেবের পুত্র কখন বা পৌত্রেরা উপবেশন করিয়াছিল। আজি কে অমুক, বাদসাহ. সপ্তাহ শেষে গুপ্ত হত্যা, সিংহাসনে দিনকতকের জন্য আবার নূতন বাদসাহ এই ভাবে দিল্লার সিংহাসন পূর্ণ হইতেছিল। দিল্লীর বাদসাহের ক্ষমতা লোপ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু যিনিই যখন বাদসাহ হইয়াছিলেন, মুরশীদ কুলিখাঁ তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়া নিজের ক্ষমতা ও পদ বজায় রাখিয়াছিলেন।

হিন্দুর ছেলে হইলেও মুরশীদ কুলীখাঁ গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি অনেক দেবমন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই সময়ে অনেক উচ্চকুলের হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল। যে জমীদার খাজানা দিতে দেরী করিত, সে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, মুরশীদ তাহাকে খাজানার জন্য তত পীড়াপীড়ি করিত না। মুরশীদের খাজানা আদায় প্রধান লক্ষ্য ছিল, এবং তজ্জন্য তিনি নানাবিধ অত্যাচার করিতেন। রেজা খাঁ, নাটোর রাজবংশের স্থাপনকর্ত্তা রাজা রামজীবন প্রভৃতি খাজানা আদায়ের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিল।

মুরশীদ কুলীখাঁ যখন নবাব, তখন যশোহর অঞ্চলের সীতারাম নামে এক জমীদার ভূষণার ফৌজদারকে নিহত করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। মুরশীদ কুলীখাঁ রামজীবনকে দিয়া সমস্ত জমীদারদের বলিয়া পাঠাইলেন, যে জমীদার সীতারামের সাহায্য করিবে, সে দণ্ড পাইবে। মুরশীদ কুলীখাঁর ভয়ে জমীদারেরা সীতারামের বিপক্ষে দাঁড়াইল। অবশেষে সীতারাম রামজীবনের হাতে পড়িয়া মুরশীদাবাদে আসিলেন। সীতারাম শূলে প্রাণত্যাগ করিলে, তাহার ভূসম্পত্তির অধিকাংশ রামজীবনের জমীদারীভুক্ত হইল।

সীতারাম ব্যতীত আরও দুইজন মুসলমান সর্দ্দার, মুরশীদ কুলীখাঁর সময়ে বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের বিদ্রোহ শীঘ্রই থামিয়া গিয়াছিল।

মুরশীদ কুলীখাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার দামাদ সুজাউদ্দিন বাংলার সুবেদারীর আসন অধিকার করিয়াছিল। সুজাউদ্দিন মুরশীদের জীবনকালে উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন। মুরশীদের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার দৌহিত্র সরফরাজ বাংলার গদিতে বসে। কিন্তু সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দিন দিল্লীর আমীর ওমরাওদের উপঢৌকনে তুষ্ট করিয়া বাংলার সুবেদারী সনন্দ লাভ করিলেন।

সুজা যখন উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন, তখন তাঁহার দুইজন আত্মীয় উড়িষ্যায় আসিয়া, তাঁহার অধীনে কর্ম্মচারী হইয়াছিল। ইহাদের নাম হাজী আহম্মদ ও মীর্জ্জা মহম্মদ আলী। মীর্জ্জার অপর নাম আলীবর্দ্দী খাঁ। আলীবর্দ্দী ও আহম্মদ বিচক্ষণ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাদের সুপরামর্শে সুজা উড়িষ্যায় সুখ্যাতি লাভ করিয়া-

ছিলেন। সুজা যখন মুরশীদাবাদে আসিলেন, ঐ দুই ভাইও সুজার সঙ্গে আসিল। সুজা ঐ দুই ভ্রাতা, আলমচাঁদ রায়, ও জগৎ শেঠ নামক এক ধনীকে লইয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া তাঁহাদের পরামর্শে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সুজা রাজ্যভার মন্ত্রী সভার উপর নিক্ষেপ করিয়া, এবং দেশের বড় বড় পদ আপনার আত্মীয় স্বজনকে দিয়া আমোদে গা ভাসাইয়া দিলেন। উচ্চ কর্ম্মচারীরা নির্ভয়ে প্রজার রক্ত শোষণ করিতে লাগিলেন। সুজার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সরফরাজ বাংলার সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু তিনি বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। জগৎ শেঠ ও হাজী আহম্মদ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছিল। জগৎ শেঠ, হাজী ও তাহার ভ্রাতা আলীবর্দ্দী খাঁ, সরফরাজকে রাজ্যচ্যুত করিতে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে একদিন বিশ্বাসঘাতক আলীবর্দ্দী বন্ধুতার ছল করিয়া সরফরাজকে আক্রমণ ও নিহত করিয়া আপনাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করিল। আলীবর্দ্দী মুরশীদাবাদে ঢুকিয়া সরফরাজের রত্ন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিল এবং লুণ্ঠিত ধনের কিয়দংশ দিল্লীতে উপঢৌকন পাঠাইয়া বাদসাহের নিকট হইতে নবাবী সনন্দ প্রাপ্ত হইল।

আলীবর্দ্দী নবাব হইল বটে, কিন্তু উড়িষ্যার মুসলমান কর্ম্মচারীরা তাহাকে নবাব বলিয়া মানিল না। আলীবর্দ্দী ও উড়িষ্যার কর্ম্মচারীদের মধ্যে লড়াই বাধিয়া গেল। অনেক রক্তারক্তি কাটাকাটির পর উড়িষ্যা আলীবর্দ্দীর পদানত হইল।

আলীবর্দ্দীর আমলে পশ্চিম বাংলায় আদবেই শান্তি ছিল না। উড়িষ্যার যুদ্ধ থামিতে না থামিতে, নাগপুর অঞ্চল হইতে মারহাট্টারা আসিয়া বাংলার লোকের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। একে রাজার অত্যাচার, তারপরে বর্গী বা মারহাট্টা অশ্বসৈন্যের উৎপাত। এই সব অত্যাচার উৎপাতের স্মৃতি, এখন পর্য্যন্তও ছেলে ভুলানো ছড়ায় জাগিয়া রহিয়াছে। এখনও বাঙ্গালীর ঘরে শুনিতে পাওয়া যায় —

ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো
বর্গী এল দেশে ;
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজানা দিব কিসে।

বর্গীদের আক্রমণ নিবারণের জন্য, ইংরেজদের, কলিকাতায় মারহাট্টা খাত নামে গড় কাটিতে হইয়াছিল। বর্গীদের জ্বালায় অস্থির হইয়া, অবশেষে আলীবর্দ্দী, উড়িষ্যা প্রদেশ ও রাজস্বের চৌথ বর্গীকে দিয়া, শান্তি কিনিয়াছিল। বাংলায় বহুদিন ধরিয়া বর্গীর অত্যাচার ছিল।

আলীবর্দ্দীর সময়, রাজপথ জলপথ নিরাপদ ছিল না। প্রত্যেক নদীর বাঁকে ডাকাতের থানা ছিল। এই সকল দস্যু সর্দ্দারেরা সচরাচর চৌধুরী নামে উক্ত হইত। পদ্মা ও তাহার শাখা নদীর তীরবর্ত্তী অনেক বনিয়াদী ঘরের ভিত্তি, জল দস্যুতা ও গামছা মোড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দ্দীর মৃত্যু ঘটে। আলীবর্দ্দীর মৃত্যুর পরে এক বৎসর মাত্র বাংলা প্রকৃত মুসলমানী শাসনের অধীন ছিল। মোগল শাসন কালে বাংলায় স্বস্তি ছিল না। পাঠান দিগের উৎপাত, মগ ফিরিঙ্গির অত্যাচার, আসামীদের আক্রমন, সর্দ্দার ও জমীদারদিগের বিদ্রোহ,

শেষে বর্গীর হাঙ্গামা এইরূপ কিছু না কিছু বাংলার প্রজাকে বরাবর যন্ত্রণা দিয়াছিল। মোগলী আমলের কেবল মাত্র দুইটী জিনিষ এখনও সাধারণ বাঙ্গালীর চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে—কাশীরাম দাসের মহাভারত, আর ভারত চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল। ছন্দ, যতি, মিল ও ভাষার পারিপাট্যে ভারত চন্দ্র অতুলনীয়। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় নায়ক নায়িকার গল্প রচনা করিয়াছেন।

আলীবর্দ্দীর মৃত্যু হইলে তাহার সপ্তদশবর্ষীয় প্রিয় দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে। সিরাজ অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিল। নবাব হইবার পূর্ব্বেই তিনি অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অব্যবস্থিতচিত্ত সিরাজ নবাব হওয়াতে রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা ভীত হইলেন। সিরাজের পাত্র মিত্র সভাসদ কর্ম্মচারী সকলেই স্বার্থপর ও লোভী ছিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক ও কর্ম্মচারীরা সিরাজের পতনের জন্য ষড় যন্ত্র আরম্ভ করিল। ইংরাজদের উপর সিরাজ অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তিনি নবাবী পাইবার কিছুদিন পরেই ইংরাজদের কলিকাতার দুর্গ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া অনেক ইংরাজ বধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতার দুর্গে অতি সামান্য সৈন্য ছিল। এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব মান্দ্রাজ ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক সৈন্য লইয়া বাংলায় উপস্থিত হইলেন। নবাবের বিলাসী অশিক্ষিত সৈন্য দল ক্লাইবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইল। ইংরেজদের সহিত নবাবের সন্ধি হইল। ক্লাইব বাংলায় আসিয়া বাংলার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন সিরাজের মতি স্থির নহে। রাজ্যের বড় বড় লোক সিরাজের উপর বিরক্ত। ইংরাজদের উপর সিরাজের আদবেই প্রসন্ন দৃষ্টি ছিল না। আত্মরক্ষার্থ ক্লাইব সিরাজের বিপক্ষ দলকে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব ইংরেজ দিগকে নষ্ট করিবার জন্য কলিকাতার দিকে অনেক সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। ক্লাইব ও মুরশিদাবাদের দিকে আসিতে লাগিলেন। পথে পলাসীর মাঠে উভয়ে দেখা হইল। নবাব যুদ্ধ ক্ষেত্রে আপনাকে বন্ধুহীন দেখিয়া পলায়ন করিলেন। যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইল। ইহার অল্প দিন পরেই সিরাজ ধরা পড়িয়া কারাগারে নিহত হইলেন। বিজয়ী ক্লাইব মুরশীদাবাদে আসিয়া সিরাজের বিশ্বাস ঘাতক সেনাপতি আফিং খোর মীর জাফরকে বাংলার গদিতে বসাইলেন। ক্লাইব জানিতেন তখনকার মুসলমানেরা বিশ্বাসঘাতক ছিল। তিনি মীরজাফরকে সমস্ত ক্ষমতা দিলেন না, নিজের হাতে অনেক ক্ষমতা রাখিলেন। মীরজাফর নামে নবাব হইলেন। পুরাতন মুসলমানী ইমারত খসিতে ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল, ন্যায়পরায়ণ ইংরেজের অভ্যুদয়ের সঙ্গে বাংলায় নূতন যুগ দেখা দিল।

শ্রীসুরেন রায়।

স্বর্গীয় হরনাথ দাসের সংক্ষিপ্ত জীবন

ঢাকা জেলার অন্তর্গত, বিক্রমপুর পরগণার মুন্সীগঞ্জ থানার অধীন বড়াইল গ্রামে, আমাদের পিতৃদেব, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে, সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বড়াইল গ্রামে জন্ম হইলেও, ইনি উত্তর কালে নয়না গ্রামবাসী বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। পিতামহ, স্বর্গীয় ভৈরবচন্দ্র দাস গুপ্ত, ধনে, মানে, বংশমর্য্যাদায় ও খ্যাতিতে বিক্রমপুর মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা হয়, পিতৃদেব ইঁহার তৃতীয় পুত্র ও চতুর্থ সন্তান। পিতামহ গোঁড়া শাক্ত হিন্দু এবং অত্যন্ত ধর্ম্ম ভীরু ছিলেন, স্বীয় ধর্ম্ম ও দেব দেবার প্রতি তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল যে, ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বন তিনি যথারীতি নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতেন। বেন্নার বিখ্যাত সর্ব্ববিদ্যার বংশ তাঁহার কুল গুরু ছিলেন। শক্তি উপাসক বলিয়া এই গুরু বংশে মদ্যাদির ব্যবহার বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল এবং শিষ্য কুলেও তাহা সংক্রামিত হইয়াছিল। শুনিতে পাই এই সংক্রমন এতদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়া ছিল যে, মদ্য ক্রয় করিয়া কুলান অসাধ্য বিবেচনায়, বাড়ীতেই ভাটী বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই দাস পরিবার বল্লুরের ঘটক বিশারদের সন্তান বলিয়া পরিচিত এবং জাতীয় ব্যবসায় কবিরাজি ব্যতীত বিবাহের ঘটকালী করাও ইহাদের কুলগত কার্য্য ছিল, এবং তদ্দ্বারা লভ্যও যথেষ্ট হইত।

পিতামহ শ্রেষ্ঠ কুলীন বৈদ্য বলিয়া পিতার ১১ বৎসর বয়সেই ফরিদপুর নিবাসী খ্যাতনামা স্বর্গীয় তারিণীচরণ গুপ্তের এক মাত্র কন্যা ষোড়শী বালার সহিত প্রথম বিবাহ দেন। তৎকালীন রীতি অনুসারে কুলীন জামাতার ভার শ্বশুরকেই বহন করিতে হইত এবং পিতৃদেব ও সেই কারণে বিবাহের পর ফরিদপুর থাকিয়া তত্রত্য ইংরাজী স্কুলে পাঠাভ্যাসে রত হন। কিন্তু তাঁহার অভিভাবকগণ পরে উচ্চশিক্ষা পাইলে জাতি কুল নষ্ট হইবে ভাবিয়া তাঁহার উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ করিয়া দেন এবং তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াই চাকরীর চেষ্টা করিতে বাধ্য হন।

ফরিদপুরে যখন প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন, পিতৃদেব মাত্র স্কুলের নবীন ছাত্র হইলেও, প্রায় প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম পিপাসার বলে তাহাতে আকৃষ্ট হন ও নিয়মিত ভাবে সেই আন্দোলনে যোগ দিতে থাকেন। এই বৃদ্ধ বয়সে ও যখনই তিনি সেই সময়ের সামাজিক অত্যাচার ও তাঁহাদের ধর্ম্ম পিপাসার কথা গল্প করিতেন, তখনই তাঁহার মুখমণ্ডল কেমন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত! আমরাও শুনিতে শুনিতে মোহিত হইয়া যাইতাম।

পিতৃদেব আজন্ম কালই যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তেমনই তেজী ও সাহসী ছিলেন। নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন; এমন কাহারও সাধ্য ছিল না যে তাহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন, বা এমন

কোন বাধা বিপত্তি মনে স্থান দিতেন না যাহাতে, তাঁহাকে, তাঁহার সঙ্কল্প হইতে এক চুল প্রতিনিবৃত্ত করে। এই সাহস ও তেজের বলে, তিনি, তৎকালীন ফরিদপুর সংস্কারক দলের মধ্যে, শীঘ্র বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিলেন এবং অগ্রণী দিগের উৎসাহে তাঁহারও ধর্ম্ম পিপাসা অতি দ্রুতবেগে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে এই সময় তিনটী বিশেষ ভাব তাঁহার মনে উদিত হয় (১) স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন (২) বিধবা বিবাহ প্রচলন, (৩) জাতি ভেদ পরিত্যাগ। এইগুলি জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি বদ্ধ পরিকর হন। শুনিয়াছি, একদিন পরামর্শের দ্বারা স্থির হয় যে, মুসলমানের খাদ্য গ্রহণ করিয়া জাতি ভেদের মূল উচ্ছেদ করিতে হইবে। সকলে প্রকাশ্য বাজারের মুসলমান দোকানে সমবেত; কিন্তু রুটী ক্রয় করা কাহারও সাহসে কুলাইল না। শেষে আমাদের পিতৃদেবই সেই রুটী ক্রয় করিয়া রাস্তার মধ্যেই ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, ও লোককে ডাকিয়া ডাকিয়া দেখাইতে লাগিলেন। হিন্দুরা ক্রোধবশে কত গালি দিতে আরম্ভ করিল, কেহ মুখে থুতু দিল, কেহবা জুতা ছুড়িয়া মারিল, তাহাতে তাঁহার সঙ্গীরা পলাইলেন, কিন্তু পিতৃদেবের তাহাতে দৃক্‌পাত নাই. নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া প্রসন্ন মুখে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথম জীবনে এইরূপ নির্য্যাতন প্রায় প্রত্যহই তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে, কিন্তু কি ধন যে তিনি পাইয়াছিলেন তাহাতেই সদা মগ্ন ও প্রফুল্ল থাকিতেন, লোকের কুৎসা গ্লানি তাঁহাকে স্পর্শমাত্র করিত না।

মাতামহ স্বর্গীয় তারিনী চরণ গুপ্তের নিকট এসমস্ত অনাচারের কথা প্রায়ই উঠিত, কিন্তু বিমাতা অতবড় বৃহৎ পরিবারের মধ্যে এক মাত্র কন্যা বলিয়া সকলেরই এত অধিক আদরের ধন ছিলেন যে, পাছে তিনি মনে ব্যথা পান এই আশঙ্কায় সকলেই পিতৃদেবের এই অনাচার নীরবে সহ্য করিতেন। কিন্তু ক্রমে যখন পিতামহের কর্ণে এই শেষ বার্ত্তা যাইয়া পৌঁছিল তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতেই পিতৃদেবকে নাম কাটাইয়া গৃহে লইয়া গেল।

পিতামহ নিজে খুব নিরীহ ও ধর্ম্ম ভীরু ছিলেন, পিতৃদেবের উপর রূঢ় ব্যবহার না করিয়া বরং মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেন কিন্তু, তাঁহার ছোট ভাই অত্যন্ত রাগী ছিলেন। পিতৃদেব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর হইতেই যত প্রকার অত্যাচার অবিচার সম্ভব তাহা করিতে ত্রুটী করিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া পিতৃদেব দিবসে উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া সঙ্গীত ও আরাধনায় ব্যাপৃত হইতেন। তাহাতে যখন বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন তখন তাহাও পরিত্যাগ করিয়া দূর দূরান্তরে, কখনও বা মাঠের মধ্যে, কখনও বা উচ্চ বৃক্ষের ডালে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, তবু নিজের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলেন না। খুল্লপিতামহের ইহাতে নিবৃত্তি না হইয়া বরং ক্রোধ আরও বাড়িয়া যায়, এবং পিতৃদেবের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রূপে হরণ করিয়া, বল পূর্ব্বক হিন্দুমতে দীক্ষা দিতে প্রয়াস পান এবং ময়মনসিংহ কালিপুরে পিতামহের নিকট পাঠাইয়া দেন। ময়মনসিংহ বাস কালে পিতৃদেবের মনে এই ভাব জাগ্রত হয়

যে যখন তিনি কুসংস্কার বোধে বিমাতাকে ব্রত নিয়মাদি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন তখন নিজেও হিন্দু মতে সন্ধ্যা পূজাদি করিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে এইরূপ করা অসঙ্গত হইতেছে বোধ হওয়ায়, তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন এবং তাহাতে সকলের অতিশয় বিরাগভাজন হন। পিতামহ যদিও প্রকাশ্যে শাসন ও অত্যাচার করিতেন, তথাপি তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্ম পিপাসায় মুগ্ধ হইয়া, গোপনে তাঁহার আচরণ যে শাস্ত্র-সম্মত তাহা স্বীকার পাইতেন এবং সমাজে অপ্রচলিত বলিয়া যে প্রতিবাদ করেন তাহাও বলিতেন। নিজ পিতার মুখে এইরূপ আশার বাণী শুনিয়া পিতৃদেবের ধর্ম্ম পিপাসা আরও বাড়িয়া যায় এবং বিশেষ ভাবে নিজের মনের যথার্থতা অনুভব করেন। নববিধান প্রচারক স্বর্গীয় গিরীশ চন্দ্রসেন এইসময় ময়মনসিংহ গভর্ণমেণ্ট স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। প্রচার উপলক্ষে তিনি কালিপুরে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সংসর্গে আসিয়া পিতৃদেব উপাসনার বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহ বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন। প্রথম প্রথম, কেমন করিয়া উপাসনা করিতে হয়, যদিও তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিতেন না. তথাপি উপাসনার জন্য নির্বিষ্ট চিত্তে একস্থানে উপবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে ডাকিতেন ও হৃদয়ে নববলের আবির্ভাব অনুভব করিতেন। ক্রমশ এইভাব স্থায়ী হইয়া অন্তরে এক নূতন জ্যোতির প্রকাশ অনুভব করিয়া.আত্ম হারা হইতে লাগিলেন।

গৃহে বাস পিতৃদেবের পক্ষে অসম্ভব হইলে, তিনি তাঁহার জ্যেঠতাত ভ্রাতা, স্বর্গীয় হরিমোহন দাসের নিকট রংপুর চলিয়া আসিলেন, এবং কিছুদিন চেষ্টার পর পোষ্টাবিভাগে ১৫৲ বেতনে একটী কর্ম্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে কালীপুর অবস্থান কালে, তিনি তত্রত্য গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলে কিছু দিন ৮৲ বেতনে শিক্ষকতার কার্য্য করেন ও পরে নর্দ্দারন সার্কেলের শিক্ষা বিভাগের ইনস্পেক্টরের আফিসে ১০৲ বেতনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

এদিকে মাতৃদেবী পিতৃদেবের আর ফরিদপুরে আগমনের আর কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া. এক বৎসরের কন্যা বড় দিদিকে লইয়া পিতৃদেবের সাক্ষাৎ পাইবার মানসে ফরিদপুর হইতে কান্নাকাটী করিয়া নয়নাতে আসিলেন। ফরিদপুর থাকাতেই পিতৃদেবের মস্তিচ্ছন্ন হয়, মাতৃদেবী অথবা তাঁহার পিতা এসম্বন্ধে তাহাকে শাসন বা নিবারণের চেষ্টা পান নাই ইত্যাদি কারণে বাড়ীর সকলের তাঁহার উপর ভাল ভাব ছিল না। মাতৃদেবী গৃহে আসিলে আক্রোশ বশতঃ তাঁহার উপরেও অত্যাচার আরম্ভ হইল। সকলের পাতের উচ্ছিষ্ট যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইত এবং বাসগৃহের পরিবর্ত্তে ঢেকী ঘরেই তাঁহাকে শুইতে দেওয়া হইত। মাতাঠাকুরাণী নীরবে এসমস্ত অত্যাচারই সহ্য করিয়াছিলেন। একমাত্র আশা কোন দিন যদি পিতৃদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন, কিন্তু ক্রমে যখন সে আশা শিথিল হইয়া আসিল তখন বাড়াতে আর তাঁহার মন টিকিলনা, ফরিদপুরে লইয়া যাইবার জন্য নৌকা পাঠাইতে তাঁহার মাতাকে লিখিলেন, এবং নৌকা আসিলে সকলের অজ্ঞাতসারে, ফরিদপুর না যাইয়া. রংপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পিতৃদেব মাতৃদেবীর এবম্প্রকার দুঃসাহসিকতার সংবাদ পূর্ব্বে অবগত ছিলেননা। ঘাটে নৌকা লাগাইয়া সংবাদ দিলে, তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। মুদীর দোকান তখন তাঁহার বাসস্থান, আর ১০টী মুদ্রা মাত্র তখন আয়। কি করিয়া কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় চাপ্‌রাশী আসিয়া সংবাদ দিল সাহেব সেলাম দিয়াছেন। ডাক শুনা মাত্র ভাবনা চিন্তা সমস্ত থামিয়া গেল, স্ত্রীকে ঘাট হইতে আনা পড়িয়া রহিল, প্রথমতঃ সাহেবের নিকট হাজীর হইলেন, সাহেব পূর্ব্ব হইতেই পিতৃদেবের কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। উপস্থিত হওয়া মাত্র হাস্য মুখে ১৫৲ স্থলে ৩০৲ টাকা বেতনে একটী নূতন কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহার উপরওয়ালাকে যে তিনি লিখিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে যে তাহা মঞ্জুর তাহা আসিয়াছে সেই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। শুনিবা মাত্র পিতৃদেব ভগবানের এই রূপ অযাচিত কৃপা দেখিয়া সেই খানেই ঈশ্বর চরণে প্রণত হইলেন। দর দর ধারে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, প্রকৃতিস্থ হইয়া সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন ও অনুমতি লইয়া নৌকা হইতে স্ত্রীকে সেই মুদীর দোকানের এক অংশেই উঠাইয়া আনিলেন, এবং তাহাই কোন প্রকারে ঘেড়া দিয়া তাঁহাদের তিন জনের বাসোপযোগী করিয়া লইলেন। জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় হরি মোহন দাস পিতৃদেবকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। স্ত্রীকে লইয়া তাঁহার আশ্রয়ে যাইলে তিনি অবশ্যই আশ্রয় দিতেন, কিন্তু পিতৃদেবের স্বাধীনতা স্পৃহা দুর্দ্দমনীয়। প্রথম সময়ে তাঁহার বিশ্বাস অনুযায়ী প্রাণের প্রিয় জিনিষ ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও পালন করিতে যাইয়া বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় যে মুদীর দোকানে আশ্রয় লইয়া ছিলেন, মাতৃদেবীর আবির্ভাবের দিনেও ভগবৎ প্রসাদে কিয়ৎ পরিমাণে সচ্ছল অবস্থা উন্নীত হইলেও সে পুণ্যতীর্থ মুদীর আশ্রয় ত্যাগ করিলেন না। স্বাধীন ভাবে সেই খানেই সস্ত্রীক প্রকাশ্য উপাসনা ও কীর্ত্তনাদিতে মত্ত থাকিলেন। নববিধানের স্বর্গীয় গৌর গোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় একবার সেই সময়ে রংপুর গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিকট তিনি ধর্ম্মের অনেক গূঢ় রহস্য বিশেষতঃ প্রার্থনার উপকারিতা সম্বন্ধে অবগত হয়েন।

মাতৃদেবী বড় ঘরের কন্যা। আজন্ম সুখে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। শ্বশুর গৃহে যে কয়েক মাস অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়া ছিলেন, তাহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহার উপর রংপুর আসিয়া ঐ অল্প আয়ে ভাঙ্গা ঘরে যদিও প্রায় বৎসরাধিককাল মনের সুখে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভগ্নদেহ, আর সে আর্থিক কষ্ট অধিক দিন সহ্য করিতে পারিল না। রক্ত আমাসায় তিনি মরণাপন্ন কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং মৃত্যু আসন্ন জানিয়া, তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়ায় পিতৃদেব সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে লইয়া নৌকা যোগে ফরিদপুর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মাতৃদেবী তখন পূর্ণ গর্ভবতী। নৌকা অল্প দূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছে। এমন সময়ে মাতৃদেবীর বেদনা আরম্ভ হইল। নৌকার মাঝিরা নৌকা নষ্ট হইবে আশঙ্কায় সম্মুখের চড়াতেই নৌকা লাগাইয়া পিতৃদেবকে এক প্রকার জোর করিয়াই নামিয়া

যাইতে বাধ্য করিল। অনন্যোপায় হইয়া পিতা মাতাকে লইয়া, এক ঝোপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জগদীশ্বরের শরণ লইতে থাকিলেন; মাতৃদেবীও কয়েক ঘণ্টা অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া একটী মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। প্রসবান্তে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে পিতৃদেব নিকটস্থ গ্রাম হইতে একখানি শকট আনিয়া তাহাতে মাতৃ দেবীকে তুলিয়া রংপুর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, মাতৃদেবীর শরীর রক্ত আমাশাতেই অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছিল, তাহার উপর প্রসব-জনিত ক্লেশ এবং ততোধিক গাড়ীর ঝাঁকুনী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রসবের পর, ২ ঘণ্টার মধ্যেই, পথিমধ্যেই দেহত্যাগ করিয়া অনন্তধামের যাত্রী হইলেন। পিতৃদেব কি করিবেন, নিজে শোকে অধীর, তাঁহার উপর লোকজনের অভাব, উপায়ান্তর না দেখিয়া, মাতৃদেবীর দেহ সৎকার না করিয়া, সেই অবস্থাতেই নদীতে ভাসাইয়া দিয়া রংপুরে রওনা হইলেন। সঙ্গে আশার স্থল, শোকে সান্ত্বনা, এক মাত্র বড় দিদি -- তখন দুই বৎসরের শিশু মাত্র। সমস্ত দিন গেল আহার নাই, ক্ষুধায় শিশু কাঁদিয়া ব্যাকুল, সন্ধ্যার সময় এক গ্রামের কৃষক কুটীরে উপস্থিত হইয়া, পিতৃদেব এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করিয়া সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিলেন, কিন্তু নিজে অভুক্ত থাকিয়া রংপুর ফিরিয়া আসিলেন।

শোকে, দুঃখে, অনাহারে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া এবার পিতৃদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহেই বড় দিদিকে লইয়া আশ্রয় লইলেন, নাহলে ঐ ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণ রক্ষার উপায় হয়না। কিন্তু বিধির বিধানে এবম্প্রকার ব্যবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হইলনা। মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। এপর্য্যন্ত ব্রাহ্মমতাবলম্বী ও তন্মতানুসারে কার্য্যশীল হইলেও পিতৃদেব হিন্দুসমাজ ভুক্তই ছিলেন, এবার অবস্থারও মীমাংসা হইয়া গেল, হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ সম্পাদন না করিয়া চিরকালের নিমিত্ত ঐ সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনাতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন যে, যেখানে ছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। বিধর্ম্মী আচার ভ্রষ্ট বলিয়া ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া দিলেন। ভয় পাইয়া ব্রাহ্ম নামধারীগণ ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পত্নী বিয়োগে পিতৃদেবের মনের ভাব যে একটু নিস্তেজ ভাব ধারণ করিয়াছিল, সমমতালম্বী দিগের বিরুদ্ধ ভাব দর্শনে তাহা পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ তাতের রংপুরে খুব প্রতিপত্তি ছিল, তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া ভাড়া লইয়াও কেহ পিতৃদেবকে থাকিবার স্থান দিলনা। অনন্যোপায় হইয়া তিনি কন্যাসহ এক কাঁটাল গাছ তলায় শিকা ও হাঁড়ি সম্বল করিলেন। পিতৃদেব বড় লোকের পুত্র, বড় ঘরের জামাতা, কখনও রান্না করিতে জানিতেন না। কোন প্রকারে দুটো চাল সিদ্ধ করিয়া তাহাই বড় দিদিকে খাওয়াইতেন ও নিজে খাইতেন, এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা শিকায় তোলা থাকিত, অন্য সময় খাইতেন। হাঁড়িতে যাহা ধরিত, একত্র তাহাই রান্না করিতেন, এবং যে কয়েক বেলা উহাতে চলিত, সে কয়েক বেলা আর রন্ধনের হাঙ্গামা করিতেননা।

এই ভাবে পিতৃদেবর আপন ধর্ম্ম বিশ্বাসের বলে অম্লান বদনে সমস্ত দুঃখই সহ্য করিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত এত দুঃখ দিয়াও

ক্ষান্ত হইলেননা. দুখের শান্তি, নয়নের মান কন্যাকে কে হরণ করিলেন। পিতৃদেব একজন চাপরাশীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহার নিকট শিশুকে রাখিয়া আফিস করিতেন ও ফিরিবার সময় সঙ্গে আনিতেন। একদিন ফিরিবার সময়, শিশুকে আর পাইলেন না, শুনিলেন জ্যেষ্ঠতাত জোর করিয়া লইয়া গিয়াছেন। শুনা মাত্র পিতৃদেব পাগলের ন্যায় জ্যেষ্ঠতাতর পায় ধরিয়া পড়িলেন। কত কাঁদিলেন, কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু. কন্যাকে আর ফিরিয়া পাইলেন না। শুনিলেন সেই দিনই তাহাকে দেশে পাঠান হইয়া গিয়াছে। প্রাণের পুতুল কন্যাকে এই ভাবে হারাইয়া রংপুর বাস করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। চাকুরী ত্যাগ করিয়া ঢাকা রওয়ানা হইলেন।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে এই সময় ভগবৎ প্রেমের ঢেউ প্রবল বেগে বহিতেছিল। পিতৃদেব সেই সমস্ত ধর্ম্ম বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া মধুর নামগানে আপনি তৃপ্ত হইতে লাগিলেন ও দেশ দেশান্তরের নরনারী দিগকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহার সমসাময়িক ভক্ত দিগের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। ভক্তের মুখে ভক্তির বার্ত্তা বড় মধুর শুনায়। ইচ্ছা রহিল, পরে পিতৃদেবের এই ভক্তি-তত্ত্বের কথা ভক্ত সাধুদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিব। অল্পদিন পূর্ব্বে পিতৃদেব গল্পচ্ছলে আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, ঢাকা অবস্থান কালে তাঁহারা ভক্তের দল প্রাতে করতাল লইয়া নাম কীর্ত্তন গাহিয়া গাহিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে গমন করিতেন। তাঁহাদের সহিত ঝুলি থাকিত, লোকে মুগ্ধ হইয়া যে যাহা দিত হৃষ্টচিত্তে তাহাই লইয়া আশ্রমে ফিরিতেন। ও একত্র ভোজন শেষ করিয়া পুনরায় ধ্যানে বসিতেন। কত কত রাত্রি যে তাঁহাদের এইভাবে কাটিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, কত দিন যে গ্রামে প্রবেশ করিবার মুখেই তিরস্কৃত ও তাড়িত হইয়া শূন্য হস্তে গৃহে ফিরিয়া অনশনে দিন যাপন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের ক্লান্তি ছিল না, নামামৃত পানেই সর্ব্বদা আত্মতৃপ্ত থাকিতেন।

ঢাকা অবস্থান কালে, পিতৃদেব বড় দিদিকে উদ্ধার করিবার মানসে, একবার গ্রামে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাড়িত হইয়া ফিরিয়া আসেন ও বন্ধুবর্গের পরামর্শে, পুলিশের সাহায্যে, কন্যাকে জোর করিয়া আনিবার জন্য, দ্বিতীয়বার গৃহে যাত্রা করেন। নদীর ঘাটে তাঁহাদিগকে দেখিয়াই, জ্যেষ্ঠতাত, তাঁহাদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, পিতৃদেবকে ভুলাইয়া গৃহে পাঠাইয়াছিলেন, এবং পুলিশকে বশীভূত করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। পিতৃদেব, কন্যাকে চক্ষের দেখাও দেখিতে পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া, কন্যাপ্রাপ্তির জন্য রাজদ্বারে সাহায্য প্রার্থী হইলেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট রীতিমত মোকর্দ্দমা রুজু হইল। বিবাদিগণের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইলে জ্যেষ্ঠ সহোদর যখন পরীক্ষা-গৃহে গার্ডের কার্য্য করিতেছিলেন, সেই অবসরে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। ইহাতে হিন্দুসমাজে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয় ও হাকিম বাবুকে মোকর্দ্দমা খারিজ করিয়া দিবার জন্য প্রথমতঃ অনুরোধ ও পরে নানাপ্রকার সামাজিক ভয় প্রদর্শন করা হয়। তাহাতে

তিনি ভীত হইয়া মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দেন। পিতৃদেব এবম্প্রকার অন্যায় বিচারের বিপক্ষে আপীল করিতে প্রস্তুত হইতেছেন, এরূপ সময়ে পিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাত, কন্যাকে হিন্দুমতে বিবাহ দেওয়াতে, আর অগ্রসর হইলে, কন্যার অশুভ হইতে পারে আশঙ্কায়, নিরস্ত হইলেন। এই ঘটনার পর পিতৃদেব আর একবার দেশে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে কয়েদীর ন্যায়, গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। জাতিচ্যুত বলিয়া, নিজের উচ্ছিষ্ঠ, নিজকেই পরিস্কার করিতে হইত। এবার অত্যাচারের মাত্রা এতদূর গড়াইয়াছিল যে, তাঁহার দাড়িতে আগুণ ধরাইয়া দেওয়া হয়। গলায় জুতার মালাদিয়া, মুখে গোবর তুলিয়া দেওয়া হয়। পিতামহ মুগুর হস্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলেন, যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পিতৃদেব হিন্দুসমাজের সহিত পুনর্মিলিত না হয়েন, তাহা হইলে, তিনি সেই লগুড়াঘাতে আত্মঘাতী হইবেন। এবং সত্য সত্যই, স্বীয় মস্তকে এমন ভাবে আঘাত করেন যে, মস্তক ফাটিয়া রক্তপাত হইতে থাকে। এই দৃশ্য দেখিয়া, পিতৃদেব আর সহ্য করিতে পারিলেন না, নিজের উত্তরীয় দ্বারা গ্রীবাদেশ বন্ধন করিয়া, উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইলেন ও হতচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। এই অবস্থায় একটী প্রার্থনা উত্থিত হইল, তাহাতে তিনি, ঈশ্বরের নিকট, আঘাত প্রাপ্ত পিতার ও অন্যান্য অত্যাচারী আত্মীয়গণের কল্যাণ ভিক্ষা করিলেন। ইহা শুনিয়া, পিতামহ নিজের আঘাতের কথা ভুলিয়া গিয়া, সন্তানের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন, এবং যাহাতে, তাঁহার উপর আর কোন অত্যাচার না হয়, সকলকে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন। সকলে শান্ত হইলে, পিতামহ তাহাকে তিনটী প্রতিজ্ঞা করিবার জন্য অনুরোধ করেন, (১ম) বৎসরে তাঁহাকে একবার দেখা দেওয়া, (২য়) বিধবা বিবাহ না করা, (৩য়) মুসলমানের সহিত আহার না করা। ইহার পর, হইতে পিতৃদেব অবসর পাইলেই পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। কিন্তু অপর দুইটী অনুরোধ পালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন না, তবে যখন যাহা করিতেন, পিতাকে জানাইয়া করিতেন।

এদিকে এই সময় ঢাকা আশ্রমের সাধকদিগের মনে ধর্ম্মসাধন ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার প্রতিপালনের নির্দ্দিষ্ট উপায় থাকা প্রয়োজন বিবেচিত হওয়ায় পিতৃদেব পুনরায় রংপুর ফিরিয়া আসিলেন ও চেষ্টা করিয়া কালেক্টরীর মধ্যে কর্ম্মগ্রহণ করিলেন। এখানে, আফিসের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও, তিনি একদিনের জন্যও আপন ধর্ম্মসাধন ও প্রচার কার্য্যে যোগ দিতে ত্রুটী করেন নাই। পথে, ঘাটে, হাটে বাজারে, যেখানে যত উৎপীড়িত হইতেন, সেইখানেই তাঁহার প্রচার কার্য্য বাড়িয়া যাইত।

রংপুরের নিকট শ্যামপুকুর (সপ্ত পুষ্করিণী) গ্রামে তখন পূজ্যপাদ নববিধান প্রচারক স্বর্গীয় কালীশঙ্কর দাস মহাশয় বাস করিতেন, এবং সেখানেও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের আর এক কেন্দ্র ছিল। কালীশঙ্কর দাস মহাশয় নিজ বাড়ীতে, সঙ্গীত সভা, সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত ও নিজ কন্যার নামকরণ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করায়, তিনিও হিন্দুসমাজ চ্যুত হওয়ায়, পিতৃদেব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, উভয়ে সমাজের উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা

করিতে লাগিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পূজ্যপাদ নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় সেই সময় গাইবাঁধা স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মেরটানে সে কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যপুষ্করিণীর স্কুলে, পণ্ডিতি গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া রংপুর, মাহিগঞ্জ, সন্ন্যপুষ্করিণী কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার তেজের সহিত আরম্ভ করিলেন। স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় এই সময়ে দিনাজপুর গমন করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে রংপুর লইয়া যান, এবং তাঁহার আগমনে তথায় যুগান্তর উপস্থিত হয়। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল। যে সমস্ত ব্রাহ্ম মতালম্বীগণ পূর্ব্বে পিতৃদেবকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারাও প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যোগ স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল।

রংপুরে থাকিতে থাকিতে পিতৃদেব কয়েকটী অল্প বয়স্কা বিধবা নারীকে উদ্ধার করেন, এবং নিজে স্বর্গীয় কালীশঙ্কর দাস মহাশয়ের বিধবা ভগ্নিকে বিবাহ করিয়া, বিধবা বিবাহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। এই বিবাহ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পন্ন হয় এবং তিন আইন মতে রেজিষ্টারী হয়। এই মাতৃদেবীর গর্ভে জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুলোচনা সিংহ, তাহার দুই বৎসর পর জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বদেশ প্রিয়ের জন্ম। ইহার দুই বৎসর পর আমার জন্ম, আমার পর সুবালার (জ্ঞান), তাহার পর শান্তিপ্রিয় ও শেষ ভগ্নী সুরমা (বুড়ী) জন্মগ্রহণ করে। ইহার মধ্যে এই বোন ও আর এক ভাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই মারা যায়। বর্ত্তমানে আমরা তিন ভগ্নী ও একমাত্র ভাই বর্ত্তমানে আছি; বিবাহের পর, পিতৃদেব রংপুর হইতে কুড়িগ্রাম বদ্‌লী হইয়া আসেন ও তথায় একাদিক্রমে বার বৎসরকাল থাকিয়া, গবর্ণমেণ্টের নানা বিভাগে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করেন ও আপনার মত ও বিশ্বাস প্রচার করিয়া আদর্শ পরিবার গঠনে ব্রতী হয়েন। এই সময় আমার যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে বেশ মনে আছে যে, পিতৃদেব যেমন সাহেব মহলে তেমনই হিন্দু ও মুসলমানদিগের নিকট, সমানভাবে আদৃত ছিলেন। কখন কখন তাঁহাকে কৃষকদিগের সহিত মাঠে মাঠে বেড়াইতে দেখিতাম। কখনও বা সাহেবদিগের সহিত তাঁহাদেরই মত খেলায় মত্ত দেখিতাম। কখনও দেখিতাম, হিন্দু মুসলমান সকলকে লইয়াই একাসনে ভোজন করিতেছেন। কখনও বা দেখিতাম দীন দরিদ্র পথের কাঙ্গাল বালক বালিকা লইয়াই আমোদে উন্মত্ত হইয়াছেন। তাহাদিগকে খাওয়াইয়া পড়াইয়া তৃপ্ত হইতেছেন। পরিবারের মধ্যে যদিও আমরা তখন সামান্য কয়েকজন মাত্র ছিলাম, তথাপি পিতৃদেব ও মাতৃদেবী উভয়েই বাহিরের লোকের সহিত এমনই একাত্মা ছিলেন, নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগের জন্য এমনই চিন্তিত ছিলেন যে, পিতৃদেবের সামান্য আয়ে তাঁহাদের কিছুই কুলাইত না। এইবার মাতৃদেবীর সাহায্য আরম্ভ হইল। তিনি মুদী দোকান দিয়া, ফল ও তরকারীর বাগান করিয়া, গরু বাছুর রাখিয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে সংসারের আয় বৃদ্ধির উপায় করিলেন, কিন্তু তাহাতেও যখন পিপাসা মিটিল না, তখন মেমদিগের নিকট নানাপ্রকার শিল্প ও নিজ চে

ফটোগ্রাফি শিক্ষা করিয়া তাহা দ্বারা আয়ের পথ আরও প্রশস্ত করিলেন। মায়ের হাতের কাজ খুব পরিষ্কার ছিল, তৈয়ারী হইতে না হইতেই উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া যাইত। ধাত্রিবিদ্যা ও শিশু চিকিৎসা, মাতাঠাকুরাণী এই সময়েই শিক্ষা করেন, এবং তাহা দ্বারা দেশের গরীব দুঃখীর যে কত উপকার হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আয় যতই বাড়িয়া যাইতে লাগিল, আমাদিগের গৃহের দ্বারও ততই উন্মুক্ত হইতে লাগিল। সকলের মধ্যে ব্যবহার এমন মধুর হইয়া যে, কে আপন, কে পর তাহার আর বিভিন্নতা থাকিল না। এত দীর্ঘকাল পরেও সেই সময়ের যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদের ব্যবহারে বাহিরের লোকে এখনও জানিতে পারেন না যে আমরা পর। ইঁহারা সকলেই মাতাঠাকুরাণীর নিকট নিজের লোকের ন্যায় আব্দার করিতেন মাতৃদেবীও সর্ব্বদা তাঁহাদের আব্দার পূরণ করিবার চেষ্টা পাইতেন। শুধু ভদ্র পরিবার কেন, গরীব পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের সহিতও তিনি সমানভাবে মিশিতেন তাহাদের সহিত কত গল্প করিতেন, ও গল্পচ্ছলে কত শিক্ষা দিতেন।

হিন্দু পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার মাতৃদেবীর অন্যতম কীর্ত্তি। ধাত্রীবিদ্যা, শেলাই প্রভৃতি শিক্ষা দ্বারা, মহিলাগণকে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইবার উপলক্ষে তিনি হিন্দু পরিবারের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন, এবং তাঁহার কৃতকার্য্যতায় ও অমায়িক ব্যবহারে ক্রমে ক্রমে সকলে এমন মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদিগের মধ্যে যে আচারগত পার্থক্য ছিল, তাহা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসে। পিতামহের পরলোক গমনের পর জ্যেষ্ঠতাত পিতৃদেবকে বাড়ীর অংশ লইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তদুত্তরে লিখিয়া পাঠান "আমি যে ধনের অধিকারী হইয়াছি, তাহার নিকট আর অন্য ধনের আবশ্যক করে না, উহা আপনারাই ভোগ করুন"। ইহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর পূর্ব্বকৃত অসদ্ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইয়া পিতৃদেবের কার্য্যস্থলে উপস্থিত হয়েন, এবং মাতৃদেবীর নিকট প্রাণের কথা সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে দেশে যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, ইহার ফলে পিতৃদেব আমাদিগকে লইয়া একবার দেশে গিয়াছিলেন, এবং তথায় সকলের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েন।

ঈশ্বরের অপার করুণা ও অযাচিত আশীর্ব্বাদের ফলে পিতৃদেব ও মাতাঠাকুরাণী এপর্য্যন্ত সত্যের জ্যোতি বুকে লইয়া যাবতীয় নির্য্যাতনের পর, মহা আনন্দেই বাস করিতেছিলেন, কিন্তু এসুখ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অল্প কয়েক বৎসর পরেই তাঁহাদের সর্ব্বাধিক স্নেহের, অশেষ গুণ সম্পন্ন, সেই সময়ের এক মাত্র পুত্র, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর "স্বদেশপ্রিয়" দারুণ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় উভয়েই নিতান্ত মুহ্যমান হইয়া পরিলেন। মনে পড়ে, পরে পিতৃদেব এক দিন অধৈর্য্য হইয়া দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন "বাবা তুমিত যাইতেছ, আমাদের কি করিয়া গেলে?" দাদা অমনি উত্তর করিলেন, "কেন বাবা, তুমিই তো সেদিন বলিয়াছিলে, কোন ভয় নাই, ঈশ্বর আছেন, এখন কি সে কথা ভুলিয়া যাইতেছ? আমাকে আমার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেও।" পিতৃদেব

ধৈর্য্য ধরিয়া সন্তানের শেষ কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিলেন। দাদা ও সঙ্গে সঙ্গে সকল সেবাকারী ও আত্মীয়স্বজনদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন। মাতৃদেবীর গলা ধরিয়া কত আশ্বাস দিলেন, পরে পিতৃদেবের সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে "দয়াময়" নাম জপ করিতে লাগিলেন। আদর্শ পুত্র, আমার দাদা ৮বৎসর বয়সে সংসার হইতে চির বিদায় লয়েন।

প্রিয়তম পুত্রের অভাব পিতা দৃঢ়চিত্তে বহন করিলেন বটে, কিন্তু মাতাঠাকুরাণী বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং ২০ দিন পরে এক পুত্র প্রসব করিলেন। পিতৃদেব মাতৃদেবীর ভাব বুঝিয়া তাহার নাম "শান্তিপ্রিয়" রাখিলেন। কিন্তু মাতৃদেবী স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেননা। ভাঙ্গিয়াছে তো ভাঙ্গিয়াই যাইতে লাগিল। অবশেষে কুড়িগ্রাম ত্যাগ করাই স্থির হওয়ায়, পিতৃদেব চেষ্টা করিয়া নিলফামারী বদলী হইলেন। এখানেও মাতৃদেবীর রোগ কিছুতেই উপসম হইল না, কতবার মরণাপন্ন হইলেন। শেষে এক বৎসরের ছুটী লইয়া, কিছুদিন নৌকায় ভ্রমণ করিয়া পরে ঢাকা অবস্থান করিয়া মাতৃদেবীর চিকিৎসা চালাইতে লাগিলেন। শান্তির সংসারে দাদা প্রথম অশান্তি ঢালিয়া গেলেন, সে অশান্তি আর ঘুচিলনা, উপর্য্যুপরি রোগের তাড়নায় চিকিৎসায় চিকিৎসায় আর্থিক অভাবে পিতৃদেব বড়ই ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। ছুটী শেষে নিলফামারী আসিলে মাতৃদেবীও কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া চির জীবনের সেবাব্রত আবার উদযাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। পিতৃদেব ও কাহার ঘরে সতীনের কলহ, কাহার ঘরে মদের অত্যাচার কাহার ঘরে শাস্তের প্রতি উৎপীড়ন খুঁজিয়া খুঁজিয়া দূর করিতে লাগিলেন। কাছারী হইতে গৃহে ফিরিলে পাড়ার স্ত্রী লোকেরা কত নালিশ লইয়া উপস্থিত হইতেন। পিতৃদেব ও প্রত্যেকের নালিশ শুনিয়া তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইতেন। আশ্চর্য্য যে অপরাধীরা পিতৃদেবের এইরূপ শাসনে বিরক্ত না হইয়া পরিবর্ত্তিত হইতেই চেষ্টা করিতেন। সদ্দৃষ্টান্ত ও সাধুচরিত্রের প্রভাব এইরূপেই সংসারে জয়যুক্ত হইয়া আসিতেছে।

নিলফামারী অবস্থান কালে, একটী বদ্ধিষ্ঠ হিন্দু ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা দান, পিতৃদেবের জীবনে একটী স্মরণীয় দিন। তাঁর পারিবারিক উপাসনায় যোগদান করিতে করিতে তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং কুসংসর্গের কুঅভ্যাস গুলি ক্রমে ক্রমে ত্যাগকরিতে থাকেন, শেষে একদিন মাতৃদেবীর প্রার্থনায় গলিয়া, যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া, পিতৃদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। সহরময় একথা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইলনা। হিন্দু দলপতিগণ ও তাঁহার পুরাতন বন্ধুবর্গ তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে এই রূপ তাহাদের দলের একজন পথভ্রষ্ট হইবেন, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া যত প্রকারে পারেন নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু প্রাণে যাঁহার সাড়া আসিয়াছে, তাঁহার নিকট বাহিরের চেষ্টা যে বৃথা হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! দীক্ষার দিন উপস্থিত হইলে দলপতি ও পুরাতন বন্ধুগণ মন্ত্রণা করিয়া দীক্ষা গ্রহণ পণ্ড করিবার শেষ সঙ্কল্প দৃঢ় করিলেন। এবং কেহ কাগজের তালপাকাইয়া, কেহ ছোট ছোট ইট, কেহবা লাঠি

ইত্যাদি গোপন ভাবে রাখিয়া, দলে দলে দীক্ষা মণ্ডপে সমবেত হইতে লাগিলেন। নির্দ্ধারিত সময়, পিতৃদেব উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন ও পরে প্রার্থনা ও উপদেশ আরম্ভ করিয়া শেষ করিলেন। সমাগত দলপতিগণ নির্ব্বাক নিষ্পন্দ। যাইবার সময় যে সমস্ত ইট, কাট্ নিক্ষেপ করিয়া এই যজ্ঞ পণ্ড করিবার অভিলাষী হইয়াছিলেন, দীক্ষা অন্তে তাহাই তাঁহার চরণে ডালি দিয়া সাশ্রুনয়নে কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রস্থান করিলেন। এবং মহিলা দিগের মধ্যহইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া এই বৃহৎ যজ্ঞের আহুতি সম্পাদন করিলেন। সত্যের জয় চারিদিকে ঘোষিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নিশান মানব অন্তরে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত হইল। পিতৃদেবের আসন লোক সমাজের অনেক উর্দ্ধে স্থাপিত হইল।

এই দীক্ষা ছাড়া পিতৃদেব সেই সময়ে দুইটী পতিত মহিলাকে উদ্ধার করেন, ও একটী ব্রাহ্ম বন্ধুর বিবাহ অনুষ্ঠান নিলফামারিতেই সম্পাদন করেন।

মাতৃদেবীর আবার অসুখ বাড়িতে লাগিল। তাহাতে পিতৃদেব, চেষ্টা করিয়া পুনরায় রংপুর বদলী হইয়া আসিলেন। বদলী হইবার অব্যবহিত পরেই, নিলফামারীতে এক হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে। পিতৃদেবের স্মৃতিতে তাহা চির দিন সমান ভাবে জাগরূক ছিল। এবং যখনই তাহা স্মরণ করিতেন, অমনি চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিত। একজনের জীবন যে তাঁহার জন্য নষ্ট হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া কত দুঃখিত হইতেন। ঘটনাটী এইরূপ; পিতৃদেব উৎকোচ গ্রহণের দারুণ বিরোধী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার এক উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী একদা লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এই পাপে কলঙ্কিত হন। এবং আমার পিতৃদেবের কর্ণে তাহা আসিয়াছে, এই সংবাদে এত ভীত ও সাধারণে প্রকাশ হইবে আশঙ্কায় এত বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন যে, ক্রমে ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মস্তিস্কবিকার উপস্থিত হওয়ায়, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অন্যের অগোচরে, মফস্বলে যাইবার ছল করিয়া, স্থানান্তরে যাইয়া জলে ডুবিয়া, আত্মহত্যা দ্বারা সকল জ্বালার শান্তি বিধান করিলেন।

এই ঘটনা বিবৃত করিতে করিতে পিতৃদেবের জীবনের আর এক ঘটনা স্মরণ হইতেছে, তাহাও এইস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। পিতৃদেব, যতদিন মাতৃদেবী জীবিত ছিলেন, বরাবর বেতনের টাকা পাইলেই তাহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতেন। একবার এই বেতনের টাকা লইতে যাইয়া দেখিলেন নির্দ্দিষ্ট টাকা হইতে এক টাকা বেশী রহিয়াছে। তাহাতে পিতৃদেব উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, এই আশঙ্কা করিয়া মাতৃদেবী সেই সমস্ত টাকার কিছুই গ্রহণ করিলেন না। মনে মনে যথেষ্ট ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। পিতা অনেক প্রকার বুঝাইয়া পরে ঐ টাকা উৎকোচের টাকা নহে, বহুদিন পূর্ব্বে এক ব্যক্তি যে ধার লইয়াছিলেন, তাহাই শোধ করায় সে এক টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রমাণ সহ প্রতিপন্ন করিলে, তবে হৃষ্ট চিত্তে সেই টাকা গ্রহণ করেন।

মাতৃদেবী, পিতৃদেবের যথার্থ অনুরূপ ও যোগ্য ছিলেন। এইরূপ আত্মহারা সন্তান বৎসল অথচ সত্যে অটল; অচল ও স্থির আমাদের মাতৃদেবী রোগমুক্তা হইবেন, এই আশা লইয়া আমরা নীলফামারী হইতে আবার রংপুর আসিলাম। রীতিমত চিকিৎসা

চলিতে লাগিল। মানুষের চেষ্টা ও যত্নে যাহা সম্ভব, তাহার কিছুই ত্রুটী হইল না। কিন্তু মাতৃদেবী আর রোগমুক্তা হইলেন না। ক্রমাগত দুই বৎসর ভুগিয়া ১৮৯১ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর, শুক্রবার, রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় তিনি সকল যাতনার হস্ত হইতে মুক্তি পাইলেন, আমরাও জন্মেরমত মাতৃহারা হইলাম।

নীলফামারী অবস্থান কালেও, আমাদের গৃহ, পূর্ব্বের ন্যায় অতিথি অভ্যাগতে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত। ব্রাহ্মসমাজের এমন লোক খুব কমই আছেন, যিনি আমাদের পিতৃদেবকে না জানিতেন বা আমাদের সেই সংসার না দেখিয়াছেন। রোগ শোকের যন্ত্রণার মধ্যেও এখানে নিত্যানন্দ.নিত্যোৎসব চলিয়াছিল। পিতৃদেব অনেক সময়ে আমাদের দুই মাতাকেই স্মরণ করিতেন। শুনিয়াছি তিনি নাকি বলিতেন যে, তাঁহার প্রথম পত্নী, আমাদের বিমাতা তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে আসিবার পথ এবং আমাদের মাতা তাঁহাকে সেই ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পথ উন্মুক্ত ও দৃঢ় করিয়া দেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। নীলফামারীতে যখন ব্রাহ্মসমাজ গৃহ প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, তখন একটীও প্রাণী উপাসনায় যোগ দিতে আসিতেন না, বরং তাহার প্রতিবন্ধক ঘটাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে লোকের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং তাঁহারা সমাজ-গৃহে প্রতি রবিবার তাঁহার উপদেশ ও প্রার্থনা শুনিতে আগ্রহের সহিত আসিতেন। সৈদপুর ও জলপাইগুড়ী হইতেও অনেক যুবক তাঁহার উপাসনায় যোগ দিতে আসিতেন, এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের অনেকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিতও হইয়াছিলেন।

মাতৃদেবীর অভাবে পিতৃদেব মহাশঙ্কটে পড়িলেন, একে আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া ঝি চাকর পাইতাম না, তাহার উপর ম্যালেরিয়াতে আমরা সকলেই জরজর। আমাদের দেখে শুনে, পথ্য দেয় এমন লোক ছিল না। নিজেরা যাহা পারিতাম, তাহাই কোন প্রকারে কায়ক্লেশে সমাধা করিতাম। দিদির বয়স তখন ১৬ বৎসর মাত্র, আমার ১২, মেজ বোনের ১০, ভাইটীর ৭, ও ছোট বোনের ১॥ বৎসর। বড়দিদি বড় হইয়াছে, চারিদিকে হিন্দুরা সময় পাইয়া আবার অত্যাচার আরম্ভ করিল, কিন্তু আমাদের সেই বৈমাত্রেয় হিন্দু ভগ্নীপতি, তিনি নিজে অনেক পূর্ব্ব হইতে পিতার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, এখানে বড় দিদিকেও লইয়া আসিলেন, এবং তিনি আমাদের ভার লওয়াতে কিছুদিনের জন্য সকল কষ্টের অবসান হইল।

শীঘ্রই দিদির বিবাহ হওয়ায় তিনি রেঙ্গুন চলিয়া গেলেন। আমাকে বোর্ডিংএ দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু মাতৃদেবী যাইবার পূর্ব্বে বাবার কাছ ছাড়া হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া বোর্ডিংএ যাইতে অস্বীকৃত হইলাম। অতএব আমরা ছোট ভাই ভগ্নীগুলি পিতার নিকটেই থাকিয়া গেলাম। পিতৃদেবের আমাদের সেই সময়ের লালনপালনের প্রণালী এইরূপ:—প্রতিদিন শেষরাত্রে উঠিয়া পিতা ষ্টোভে জল গরম বসাইয়া দিয়া, গান ধরিতেন। তাহার পর উপাসনা শেষ করিয়া বিছানাতেই আমাদের মুখ ধোয়াইয়া দিতেন, এবং "চা" ও রুটী খাওয়াইয়া পড়া বলিয়া দিতেন। এইরূপ প্রত্যেক কাজের ভিতরেই আমরা স্নেহময় পিতাকে পাইয়া মায়ের

অভাব অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু ম্যালেরিয়া আমাদিগকে ছাড়িল না। রোগের শান্তির জন্য পিতা আমাদিগকে নলহাটী রাখিয়া গেলেন আমরা সেখানে থাকিতেই পিতা দিনাজপুর বদলী হইলেন। পিতার মনে কষ্ট হইবে জানিয়া আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের শত দুঃখ চাপিয়া যাইতাম, কিন্তু পিতা আমাদিগকে দূরে রাখিয়া মন স্থির রাখিতে পারিলেন না। আমাদিগকেও দিনাজপুর আনাইলেন। এখানে একটী বিধবার বিবাহ, একটী পতিত পরিবারের উদ্ধার সাধন ও একটী স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার উদ্ধারকল্পে তাহাকে পুনা "সারদা-সদনে" প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। পিতৃদেবের জীবনের ইহা বিশেষ ঘটনা। দিনাজপুর থাকিতেই আমাদের দুই ভগ্নীর পর পর বিবাহ হইয়া গেল। আমাদের বিবাহের পর ছোট ভাই বোনকে লইয়া থাকা অসম্ভব হওয়ায় পিতৃদেব পেন্‌সন্ লইয়া নিলফামারী লোন আফিসের কার্য্য লইয়া সেইখানেই থাকিলেন। ছোট ভাই মেজ বোনের এবং ছোট বোন্ আমার নিকট মানুষ হইতে লাগিল। পিতৃদেব ১০৲ টাকা বেতনে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে জেলা কোর্টের সেরেস্তাদারের পদে ১২০৲ টাকা বেতনে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে কোন দিন বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন নাই। বিবেকের নির্দ্দেশে কার্য্য করিয়া সর্ব্বদাই জয় লাভ করিয়াছেন, এবং সাহেবগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহার উন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। একবার তাঁহার স্বাধীন চিত্ততার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে জনৈক উপরিস্থ কর্ম্মচারী মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন, সেজন্য তিনি তিনবার নিজ বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারিবেন না জানাইয়া চাকুরী পরিত্যাগ করেন। কিন্তু উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণের তাঁহার চরিত্রের প্রতি এরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁহার বিরুদ্ধের মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লওয়া হয় এবং তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ পত্র গৃহীত হয় না।

আমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেওয়ায় পিতৃদেবের মনে আর শান্তি থাকিল না। যখন যাহার অসুখ শুনিতেন, যখন যাহার সামান্য অসুবিধা বুঝিতে পারিতেন, তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া তাহার কাছে যাইতেন ও তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। পুত্র ও কন্যাকে ছাড়িয়া থাকিতে কষ্ট হইতেছে দেখিয়া, তাহাদিগকে তাঁহার নিকটেই রাখা হইল। এক বৎসর লোন আফিসের কার্য্য করিয়া তাহাও ছাড়িয়া দিয়া ঢাকা আসিলেন; কিন্তু সেখানে সুবিধা না হওয়ায় বোন্‌টীকে কলিকাতা বোর্ডিংএ রাখা হইল, ছোট ভাই আমার নিকট থাকিল। ঢাকা অবস্থানকালীন, পিতৃদেব পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রচারকের পদে নিযুক্ত হন, এবং সেই উপলক্ষে কিছুদিন ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মাণিকগঞ্জ, মাণিকদহ, কাঁকিনা, কুমারখালী প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অধিক দিন সে কার্য্যে থাকিতে পারিলেন না।

এদিকে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতির মৃত্যুতে পিতা, প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলেন। এ আঘাত সামলাইতে না সামলাইতে আমাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভগ্নি বসন্ত রোগে কলিকাতাতেই আমাদের সকলকে কাঁদাইয়া মৃত্যু ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শান্তি এই সময়

কলিকাতায় পড়িতে আসিল, এবং আমাদের ভগ্নিদিগের মধ্যে, যখন যাহার, তাঁহাকে আবশ্যক হইত তাহার নিকটেই তিনি ছুটিয়া আসিতেন এবং তাহার দুঃখের লাঘব করিতে সচেষ্ট থাকিতেন।

চারিবৎসর শান্তির বিবাহ হইয়াছে, সেই হইতে পিতৃদেব আবার সংসারে আবদ্ধ হইলেন, এবং তাহার কার্য্যস্থল আসানসোলেই অধিকাংশ সময় থাকিতেন, এবং এইখানেই ১৩ই নভেম্বর, ১৯১২ খৃঃ, বুধবার প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকা ২০ মিনিটের সময়ে ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার পবিত্র দেহের অবসান হইল।

ইদানিং পিতৃদেবের শরীর এত ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে, একটা না একটা অসুখ প্রায়ই থাকিত। নিজে এত দুর্ব্বল বোধ করিতেন যে, একা একা চলা ফিরা করিতে ভীত হইতেন। ২৪শে অক্টোবর তাঁহার সামান্য জ্বর হইল। এইরূপ জ্বর প্রায়ই হইত,ততটা গ্রাহ্য কেহই করিল না। ডাক্তার বাবু কিন্তু, এক দিনের সামান্য জ্বরে এত দুর্ব্বল হইতে দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইলেন কিন্তু ভীত হইলেন না। ৩ দিনের দিন ইহার উপর হিক্কা আরম্ভ হইল। সেই হিক্কা, ডাক্তারী কবিরাজী, টোট্‌কা কোনও ঔষধে আর নিবারণ হইল না। এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে ডাক্তারবাবু অবস্থা আশঙ্কাজনক বুঝিতে পারিলেন। সাহেব ডাক্তার, বাঙ্গালী ডাক্তার, কেহই বাদ রহিলেন না। সাধ্যমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। আমরা দুই ভগ্নী সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে আসানসোলে উপস্থিত হইলাম। ছোট ভগ্নী গয়া হইতে দেখিতে আসিল, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভগ্নীর পুত্র সৈদপুর হইতে ছুটিয়া আসিল, শান্তির শ্বশুর মহাশয় গিরিডী হইতে,আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, কলিকাতা হইতে, নববিধান প্রচারক শ্রীযুক্ত বেহারিলাল সেন ও রজনী নাথ সোমদ্দার সকলে মিলিয়া মুমূর্ষু পিতাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসার কিছুই ক্রটী হইল না। প্রাতঃ সন্ধ্যা ভগবানের নাম হইতে লাগিল। প্রথম হইতেই পিতৃদেব অসম্ভবরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার উপর সব সময় জ্ঞান থাকিতনা দেখিয়া, ডাক্তার বাবুরা কলিকাতা লইয়া আসা মত করিলেন না। পিতৃদেব অত্যাশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া, ২৪ ঘণ্টা অনবরত হিক্কায় কষ্ট সহ্য করিলেন। তাঁহার মুখে কাতরোক্তি একদিনও শুনি নাই। ১০দিন পর হিক্কার প্রকোপ কতকটা কমিয়া আসিল বটে কিন্তু প্যারালিসিসের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ঠোঁট বাঁকিয়া আসিল, জিভ উল্‌টাইয়া গেল, খাইবার শক্তি লোপ পায় দেখিয়া ডাক্তার সাহেব নলদিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। মাথায় বরফ দিতেই সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ ও গন্ধহীন প্রস্রাব আরম্ভ হইল। এপ্রস্রাব আর নিবারণ হইলনা, দুই দিনেই শোলার ন্যায় হাল্‌কা হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইল। ৩৬ঘণ্টা শ্বাস কষ্ট থাকে, তাহার মধ্যে ৩বার ফিট হইয়া প্রাতে ৭টা ২০মিনিটে সেই প্রবল শ্বাস কমিতে কমিতে একেবারে নিভিয়া গেল।

প্রথম প্রথম শ্মশান-যাত্রির অভাব হইবে আশঙ্কা করিয়া আমরা কলিকাতা সমাজে জানাইয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সময়ে আবশ্যক না হওয়ায় আর জানান হইল না। স্থানীয় হিন্দু বন্ধুবর্গ আশ্বাস দিলেন।

সুন্দর করিয়া সাজাইয়া ফটো লওয়া হইল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সকলে মিলিয়া শ্রদ্ধা সহকারে দেহ শ্মশান ক্ষেত্রে বহন করিলেন। পিতৃদেব জীবন ভোর সকল কষ্ট নিজেই বহন করিলেন। পীড়ার মধ্যেও দৃঢ়তা ছাড়া কাতরতার চিহ্ন ছিল না; মরণান্তেও শ্মশান যাত্রীদিগকে কোন কষ্ট দিলেন না। দুই ঘণ্টার মধ্যেই মাখনের মত সমস্ত গলিয়া কোথায় অনন্তে মিশিয়া গেল।

গুণাবলী।

দৃঢ়তা :—যে বিষয় ঠিক বুঝিতেন, সমস্ত পৃথিবী বিরুদ্ধ হইলেও, পিতৃদেব তাহা সম্পাদন করিতেনই। ঝি চাকর অভাবে জীবন ভোর কষ্ট গিয়াছে। কত লোক তাঁহাকে আহারে গোপন, বিচারে সাবধান হইতে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সে কথায় একদিনের তরেও কর্ণপাত করেন নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে এই দৃঢ়তা ও সততার বলে চিরদিন জয়ী ও উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বিশ্বাসভাজন হইয়া আসিয়াছেন।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম :—কুসংস্কারের মধ্যে জাতিভেদকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। হিন্দু মুসলমান সমান ভাবে তাঁহার নিকটে আদৃত হইত। ব্রাহ্মবিবাহে কেহ স্বজাতি খুঁজিলে তিনি রাগে অন্ধকার দেখিতেন।

ধনী দরিদ্রের সমান অধিকার :—পিতৃদেব যখন খাওয়াইতে ইচ্ছা করিতেন, তখন ধনীকে যে ভাবে, পথের ফকিরকেও সেই ভাবেই খাওয়াইতেন। ধনী তাঁহার ডান দিকে, দরিদ্র তাঁহার বাম দিকে সর্ব্বদাই স্থান পাইত। ধনী, নির্ধন সকল গৃহেই তিনি সমান ভাবে সেবা করিতেন।

শিশুর আদর :—শিশু, পিতার বড়ই আদরের সামগ্রী ছিল। আহারে বসিলে শিশুর মুখে কিছু দিতে না পারিলে তাঁহার আহারে তৃপ্তি হইতনা। শিশু দেখিলেই তাঁহার শিশুকাল ফিরিয়া আসিত এতদিন দৌহিত্র, দৌহিত্রীদিগের সহিত সমবয়সীর ন্যায় মিশিতেন। কত ঝগড়া বিবাদ হইত, হাসি ঠাট্টা হইত। সংপ্রতি পৌত্রী লাভ করিয়া বাবা আর সে বাবাই থাকিলেননা। আমাদিগকে যখন লালন পালন করিয়াছিলেন, তখন সৌন্দর্য্যের দিকে কোনই দৃষ্টি ছিলনা। পৌত্রী পাইয়া, তাঁহার, কত সৌন্দর্য্যের দিকে চক্ষু ফুটিল। কেমন করিয়া সাজাইবেন, স্থির করিতে পারিতেননা। আহারে বসিয়া তিন মাসের শিশুকে লইয়াই কত খেলা করিতেন খাইতেন, একটু কাঁদিতে দেখিলেই অস্থির হইয়া পড়িতেন। একদিন পুত্রবধু খুকী শুধুই দুষ্টামি করিয়া কাঁদে বলিয়াছিল, তাহাতে পিতা দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "না না ওকি দুষ্টামি বুঝে! অমন কথা বলিও না"। শেষ সময়, হিক্কায় প্রাণ যায় যায় তখনও খুকিকে দেখিলেই দু-হাত বাড়াইতেন। কাহাকেও যখন চিনিতে পারেন নাই তখনও খুকীকে চিনিয়াছেন।

সন্তান স্নেহ :—সন্তানের সুখ শান্তি পিতার যেন দেহের প্রাণ ছিল। কন্যাদের তো কথাই নাই। যে যত দুরে, যত দুর্গম পথেই থাকুক না কেন, অসুবিধার কথা শুনিলেই সেখানে ছুটিতেন। পুত্রের বিবাহ, জগতে কে না দেয়। কিন্তু তিনি পুত্রবধূকে একদিন চক্ষের আড়ালে রাখিতে কষ্ট বোধ করিতেন। কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেন। কি আছে, কি

নাই, সর্ব্বদা খবর রাখিতেন। ব্রাহ্ম হইয়া কি ভাবে গৃহস্থালী করিতে হয় সর্ব্বদা তাহার শিক্ষা দিতেন।

ধৈর্য্য :—পিতার কি অদম্য ধৈর্য্য আমরা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেখিলাম! তিনি শোকে দুঃখে যেমন অটল ছিলেন, নির্য্যাতনে ও রোগ শয্যায় পড়িয়াও তাহাই। কোন দিন কষ্টের কথা বলিতেন না, পাছে আমরা কষ্ট পাই। এবার কত কষ্ট পাইলেন, মুখে অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্ন, তবু একটী শব্দ শুনিলাম না। ৩৬ঘণ্টা শ্বাস কষ্টের মধ্যেও,যখনই প্রস্রাব হইত তখনই উঠিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।

ভক্তিঃ—কি ভগবদ্ভক্তিই আমরা তাঁহাতে দেখিয়াছি! উপাসনায় অনেক সময় ভক্তিতে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিত। ভক্ত দেখিলেই গদ গদ হইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিতেন।

শাসন ও প্রেম :—পিতা যখন যেখানে থাকিতেন, সেইখানেই প্রথম প্রথম কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিত বটে, কিন্তু শেষে সকলেই গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতে বাধ্য হইত। হিন্দু মহিলারা, কনে বউরা পর্য্যন্ত বাবার সহিত অবাধে কথা বলিতেন। রোগ-শয্যায়ও কত মহিলারা তাঁহাকে নিত্য দেখিয়া গিয়াছেন। মনে পড়ে একবার আমি পিতার সহিত আসাম যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে কুড়িগ্রাম পৌঁছিলে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ষ্টেসনে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। আর একবার ষ্টীমারে যাইতে যাইতে, পথিমধ্যে কয়েকজন খালাসীকে পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া ঝগড়া করিতে দেখিয়াছিলাম। শেষে তাহারা আমার নিকট নাম জিজ্ঞাসা করায়, যেমন নাম বলা, অমনি তাহারা পিতার পায়ে পড়িয়া গদ গদ ভাবে প্রণিপাত করিল। তিনি কে, তাহাই লইয়া তাহাদের মধ্যে বচসা হইতেছিল, এমন তাঁহাকে পাইয়া সকল গণ্ডগোলের মীমাংসা হইয়া গেল। পিতা যেমন আমাদের স্নেহ করিতেন, সেইরূপ শাসনও করিতেন। আমরা পুত্র কন্যারা তো দূরের কথা, জামাতাদিগকেও অন্যায় দেখিলে শাসন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কাহারও অপরাধ দেখিলে যেমন চটিতেন, আবার উদ্ধারের জন্য সেইরূপ লালায়িত হইতেন। যিনি আসিবনা দশবার বলিয়া, সহস্রবার আসিতেন, রোগে সংবাদ পাইলে, যিনি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া বসিতেন, যিনি আমাদিগের অসুখে অন্যের হাতে সেবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না, সেই স্নেহময় পিতাকে সংসারে আমরা জন্মের মত হারাইলাম।

প্রার্থনা।

বাবা! তুমি তো জন্মের মত সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেলে, জগৎ পিতার স্নেহময় কোলে কত স্নেহের ধনদিগকে পাইলে, কিন্তু তোমার এই সন্তানদিগকে, যাহাদের তুমি চক্ষের পলকে হারাইতে, অসাধ্য হইলেও সহস্রবার যাহাদের তত্ত্ব লইয়াও তৃপ্ত হইতে না, আজ তাহাদিগকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া গেলে? সত্য সত্যই যদি সংসারে আর তেমন করিয়া তোমাকে নাও পাই, তবু তুমি প্রাণে প্রাণে নিকটে নিকটে তোমার সেই মূর্ত্তিখানা ধরিয়া রাখিও, যাহা দেখিয়া এতদিন আমরা অপরাধ করিতে ভীত হইতাম, অপরাধ করিয়া গোপন করিতে সঙ্কুচিত হইতাম! তোমার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রতি ভক্তি

হারাইয়া, তোমার অবাধ্য হইয়া, তোমার প্রাণে যেন ব্যথা না দেই। তোমার দূরত্ব যেন আমাদের নিকটে চিরদিনের ন্যায় অসহ্য হইয়া থাকে। হে দয়াল! তুমি পার তোমার মধ্য দিয়া এই দুই প্রান্তবর্ত্তী দেশকে এক করিতে। তুমিই জান কেমন করিয়া আমরা এই অভাব ভুলিতে পারিব। আমাদের ভাবনা, তুমি নিজেই সমস্ত ভাবিবে আমাদের এই পিতৃদায়িত্ব তুমিই সব বহন করিবে। আমাদের হস্ত হইতে পিতার উপর সমস্ত কর্ত্তব্য সমস্ত আবদার তুমি তুলিয়া লইলে, কিন্তু অনন্ত কালের সম্বন্ধ আরও গাঢ় এবং দৃঢ় কর, ভক্তি আমাদের আরও প্রবল হউক, তাঁহার সমস্ত গুণগুলি আয়ত্ত করিতে, তাঁহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে তুমি আমাদিগকে সক্ষম কর। বাবার দুঃখ কষ্ট যেমন তুমি মুছিয়া ফেলিলে, ভুল ভ্রান্তি যদি কিছু থাকে তাহাও তোমার স্নেহের অঞ্চল দিয়া মুছিয়া তোমার আনন্দ লোকে, শান্তি ক্রোড়ে মুক্তি দেও, আমাদিগের আশ্রয় ও সহায় হও।

শ্রীসুপ্রভা সরকার।

শাস্ত্র সমালোচনায় ।।

গত শ্রাবণ মাসের "নব্যভারতের" "শাস্ত্র ব্যাখ্যায় চপলতা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠে আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছিলাম। প্রবন্ধ লেখক, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক উচ্চ উপাধিধারী সুশিক্ষিত ব্যক্তি। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত এবং উহার সমুজ্জ্বল আলোকে প্রাচ্য শাস্ত্রগ্রন্থের অনেক কূটতত্ত্ব ভেদ করিতে সক্ষম। ক্ষমতাশালী লেখক, উক্ত প্রবন্ধে কোন শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি যেরূপ সুতীব্র ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য শিক্ষার সমুজ্জ্বল আলোকলব্ধ বিনয়, নম্রতা ও ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া অযথা বিদ্বেষ ঈর্ষাও অবজ্ঞার পরিচয় দানে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছেন। আমাদের বিস্ময়ের কারণ এই যে, "নব্যভারতের" ন্যায় একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সকল সম্প্রদায়ের প্রিয় ও নিরপেক্ষ মাসিক পত্রিকার বক্ষে উল্লিখিত ব্যক্তিগত আক্রমণপূর্ণ প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। এই প্রবন্ধ লেখকের জীবনের প্রভাতকালে "নব্যভারত" যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাহিত্য-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, উহার সুবিজ্ঞ, সহৃদয় ও স্বদেশপ্রেমিক সম্পাদকের একাগ্রতাপূর্ণ যত্ন ও দক্ষতার সহিত পরিচালনে তাহার অধিকাংশ সুসম্পন্ন হইয়াছে। এক সময় দীর্ঘকালের জন্য আমাদের সহিত উক্ত মাসিক পত্রিকার পরিচয় ও ঘনিষ্টতা ছিল। সেই সময় ইহাতে আমরা উহার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সম্পাদকের হৃদয়ের উদারতা, স্বভাবের মধুরতা ও স্বদেশানুরাগের গভীরতা, পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি। তিনি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুস্থানীয়। ইতঃপূর্ব্বে আমরা আর কখনও তাঁহার "নব্যভারতে" কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে এরূপ কুৎসিত আক্রমণের পরিচয় পাই নাই। আমাদের ব্যথিত ও

দুঃখিত হইবার কারণ এই যে, ধীরেন্দ্রবাবুর ন্যায় একজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি বিনয়, সুরুচি ও ভদ্রতার সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক নিতান্ত উত্তেজিত ও অসংযত ভাবে একজন বহুসম্মানাস্পদ শাস্ত্রাধ্যাপকের প্রতি নিষ্ঠুর আক্রমণ করিয়াছেন। উক্ত অধ্যাপক মহাশয় আমাদের বিস্তর বন্ধুবর্গের পরম শ্রদ্ধাস্পদ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের “হল-মার্কে” চিহ্নিত না হইলেও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এবং প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্য ঋষিগণের প্রণীত বিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ও অধিকার আছে, তাহা ধীরেন্দ্র বাবু স্বীকার না করিতে পারেন. কিন্তু যাঁহারা বঙ্গদেশে প্রকৃত নিরপেক্ষ সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ও পরিগণ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে যাঁহাদের যথেষ্ট অধিকার ও প্রতিপত্তি আছে, তাঁহারা তাহা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন যাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও সাহিত্য-সভা প্রভৃতির প্রকৃত স্তম্ভ স্বরূপ ও পৃষ্ঠপোষক. সেই সকল সুশিক্ষিত ও ক্ষমতাশালী গুণ-গ্রাহী ব্যক্তিগণও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও বিবিধ সদ্গুণের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

আমরা শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে দীর্ঘকাল হইতে বিশেষ রূপে জানি। বঙ্গ-জননীর পরলোকগত সুসন্তান স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যখন তাঁহার প্রবীন বয়সে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও বেদান্তদর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তৎকালে উক্ত বেদান্ততীর্থ মহাশয়, দীর্ঘকাল তাঁহার শাস্ত্রাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা তৎকালে তাঁহার গভীর শাস্ত্র জ্ঞান ও শাস্ত্র ব্যাখ্যায় অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইবার যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর পাইয়াছিলাম। আমার প্রতি স্বর্গীয় মহাত্মা পুত্রবৎ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন এবং আমার প্রতি অনেক সাধারণ হিতকর কার্য্যের ভার প্রদান পূর্ব্বক, স্বয়ং ঐ সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার শাস্ত্র পাঠকালে অনেক সময় আমরা এক সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার অবসর পাইতাম। বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের ন্যায় স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, ও তাঁহার সহতীর্থ স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ ও সুপণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ (যিনি এক্ষণে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কাশীধামে শাস্ত্রালোচনায় জীবনের অবশিষ্টকাল উৎসর্গ করিয়াছেন) প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতগণ কিছুকাল মহাত্মা সার রমেশচন্দ্রের শাস্ত্রাধ্যয়নের সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সকল দেশ-পূজ্য অধ্যাপকগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “হল-মার্ক” বিভূষিত না হইলেও নবযুগের অভিনব ভাব ও নবীন আলোকের সহিত তাঁহাদের কোন বিরোধ ছিল না। সমালোচক মহাশয়ের নিকট এই সকল স্বনাম-ধন্য অধ্যাপকগণ অন্ধকার ও কুসংস্কারসমাচ্ছন্ন জ্ঞানে উপেক্ষিত হইতে পারেন। এই সকল সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতগণের সহিত শ্রদ্ধাস্পদ বেদান্ত-তীর্থ মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার অনুদারতা (গোঁড়ামি) বিবর্জ্জিত পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রালোচনায় বিপুল ব্যুৎপত্তি ও অধিকার নিমিত্ত তিনি ঐ সকল অধ্যাপকগণের একান্ত প্রীতি ও স্যার রমেশচন্দ্র ও তাঁহার সুশিক্ষিত বন্ধুবর্গের গভীর শ্রদ্ধা সমান ভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন।

আমরাও উল্লিখিত সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যাপনার মধুর রসাস্বাদনে বঞ্চিত হই নাই। ইঁহাদের চরণ তলে উপবিষ্ট হইয়া আমরাও কিছুকাল কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, এজন্য ইঁহাদের সকলেরই ক্ষমতার সম্যক্ পরিচয় লাভে আমরা একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই আমরা সুপণ্ডিত দুর্গাচরণের গুণের ও ক্ষমতার একান্ত পক্ষপাতী। স্বর্গীয় স্যার রমেশচন্দ্র তাঁহার পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, অধ্যাপনা ও বিচারশক্তির প্রকৃষ্টতার পরিচয়ে তাঁহাকে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভাগবত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পদে বরণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইল মহাত্মা রমেশচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি যেমন বঙ্গদেশের সমুচ্চ বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়া, তাঁহার অসাধারণ বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেচনা ও ন্যায়ানুরাগ প্রভাবে একান্ত দক্ষতার সহিত, নিরপেক্ষভাবে সুবিচার বিতরণে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকলের নিকট সমান ভাবে বিপুল যশঃ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাও তেমনই তাঁহাকে লোকচরিত্র-বিশ্লেষণ, প্রকৃত গুণের আদর ও সম্মান এবং যথার্থ জ্ঞানী ও গুণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা দান করিয়াছিল। তিনি জীবনের পরপারে গমন করিলে পরও, একাল পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনেকগুলি যুবক অধ্যাপক দুর্গাচরণের নিকট উক্ত চতুষ্পাঠীতে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা লাভে পরম উপকৃত ও একান্ত প্রীত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই সকল যুবক ছাত্রের মধ্যে অনেকেই, অন্ধকারকে পশ্চাতে রাখিয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষার নবীন সমুজ্জ্বল আলোকের সহায়তা লইয়া, উদার ভাবে উক্ত অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন ও শাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন। যিনি এত লোকের শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রীতিভাজন তিনি কুগ্রহবশতঃ পাশ্চাত্য জ্ঞানের সমুজ্জ্বল আলোকে কুসংস্কার-বিবর্জ্জিত নবভাবের ভাবুক সুপণ্ডিত ধীরেন্দ্রনাথের নিষ্ঠুর আক্রমণে বিড়ম্বিত! মতভেদজনিত কোন বিষয়ের সমালোচনা ধীরভাবে, নম্রভাবে উদার ও সুসংযত ভাবে সম্পাদিত হওয়া কি এতই কঠিন? মতভেদ উপলক্ষে কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে অধীর, অসংযত, কুৎসিত ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবে আক্রমণ করিতে না পারিলে কি সমালোচনার গৌরব বর্দ্ধিত হয় না? সুবিজ্ঞ সমালোচক ধীরেন্দ্র বাবু বিশেষরূপে জানেন, "বিদ্যা দদাতি-বিনয়ম্।" তাঁহার সমালোচনার ভঙ্গিমা দেখিয়া মনে হয়, যে তাঁহার বহুবিদ্যা-লব্ধ বিনয়, তাঁহার বিদ্বেষ-ভাব-পরিচালিত লেখনীর ভয়ে ভীত হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। অন্যথা তিনি ওরূপ অবিনীত ও অসংযত ভাবে সুবিখ্যাত পণ্ডিত দুর্গাচরণের প্রতি সুতীব্র সমালোচনার বাণ বর্ষণে উদার 'নব্যভারতের' বক্ষ কলঙ্কিত করিতে সাহসী হইতেন না।

সুবিজ্ঞ সমালোচক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের সূচনা হইতে সুপণ্ডিত দুর্গাচরণের প্রতি যেরূপ তীব্র উপেক্ষা ও অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নমুনা স্বরূপ এ স্থলে কিঞ্চিৎ পরিচয় দান আবশ্যক। তিনি সর্ব্ব প্রথমেই এই বলিয়া প্রবন্ধের সূচনা করিয়াছেন;—"গ্রন্থ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে 'পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ-কর্ত্তৃক অনূদিত

ও সম্পাদিত একখানা ছান্দোগ্যোপনিষদের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। গ্রন্থখানি আকস্মিক ভাবেই হাতে আসিয়াছে, এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই শ্রেণীস্থ পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যে কোনই আস্থা নাই। এই পুস্তকের সঙ্গে সম্বন্ধ একটা দৈব ঘটনা বলিলেও চলে, ইত্যাদি"। উহার কিঞ্চিৎ পরেই সমালোচক এক নিঃশ্বাসে বলিয়াছেন,—"এই সকল পণ্ডিতের সময়োপযোগী বিদ্যা, বুদ্ধি নিতান্তই কম; কাজেই তর্জ্জন গর্জ্জন ও লম্ফ ঝম্ফ দ্বারা আসল বস্তুর অভাব পূরণ করিয়া লইবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা নূতন শিক্ষা দীক্ষার বিরোধী। বিরোধের কারণ, তাঁহাদের অজ্ঞতা; নূতন ভাব গ্রহণের সামর্থ্যই তাঁহাদের নাই। তিনি স্থানে অস্থানে নব্য মতাবলম্বীদিগকে অনর্থক আক্রমণ করিয়াছেন, নব্য বলিতে যাহারা ভারতের অন্ধকার যুগকে অতিক্রম করিয়াছেন, তাহাদিগকেই বুঝিতে হইবে। এই পণ্ডিতেরা সেই অন্ধকারকেই ধরিয়া রাখিতে চাহেন বলিয়াই বিরোধ।" যাহা হউক, এতক্ষণে সমালোচক মহাশয়ের, বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সহিত বিরোধের কারণ, কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারা গেল। সমালোচক মহাশয় না জানি কত বড় পণ্ডিত না জানি "নূতন শিক্ষা দীক্ষার" সমুজ্জ্বল আলোকে তাঁহার হৃদয় কি গভীর পরিমাণে আলোকিত! তিনি কাহাকে অন্ধকার যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না। পুণ্যভূমি ভারতের যে যুগে মহাপ্রাণ মহা মনীষী আর্য্য-ঋষিগণ যোগ-রত তপস্বীর ন্যায়, কঠোর সাধনা প্রভাবে বহুবিধ দর্শনশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির গভীর তত্ত্ব প্রণয়ণ ও জগতের অমূল্য রত্ন উপনিষদাদির আলোচনা ও ব্যাখ্যা প্রচারে এবং বহুবিধ তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণ ও তাহার মীমাংসায় স্ব স্ব জ্ঞান-গরিমার প্রভাব বিস্তারে পবিত্র জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় পরমারাধ্য ঋষি ও আচার্য্যদিগের যুগকে কি অন্ধকারের অথবা কুসংস্কারের যুগ বলিতে চাহেন? অথবা বৈদিক ও উপনিষদ্ যুগের পরবর্ত্তী যুগকে অন্ধকার যুগ নামে নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন? বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য মহাপণ্ডিতগণের চিন্তাশক্তির প্রভাব এ দেশে বহুল পরিমাণে বিস্তৃত এবং বর্ত্তমান সময়ের বিস্তর সুশিক্ষিত লোক ঐ সকল পণ্ডিতের স্বাধীন চিন্তা ও ভাবে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হইলেও প্রাচীনকালের ভারতীয় মহাযোগী ও মহাজ্ঞানী ঋষি, আচার্য্য ও পণ্ডিতদিগের প্রচারিত বিবিধ বিষয়ক জ্ঞান কোন্ অংশে পরিম্লান হইয়াছে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। বেন্থাম্ হউন, মিল্ হউন, হাক্সলি অথবা স্পেন্সার হউন, উইল্‌সন্ মণিয়ার্ উইলিয়ম্, মোক্ষমুলর, হেগেল, কম্‌টি বা সোপেন্‌হর ইঁহাদের মধ্যে যে কেহ পাশ্চাত্য জগতের এক একটী গৌরব-রবি বলিয়া বিখ্যাত ও সমাদৃত। সুবিজ্ঞ সমালোচক মহাশয় কি প্রতিপন্ন করিতে পারেন যে, প্রাচীন ভারতের গভীর প্রতিভাশালী ঋষি ও আচার্য্যকুলের শাস্ত্রজ্ঞানমূলক সিদ্ধান্ত উল্লিখিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রতিভার নিকট পরাভূত ও পরিম্লান হইয়াছে! নবযুগের যে সকল সুপণ্ডিতগণ এক বাক্যে সুবিখ্যাত জর্ম্মানদার্শনিক পণ্ডিত শোপেনহরের বহুল প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন উক্ত মহাপণ্ডিত গভীর ভক্তির উচ্ছ্বাসে কিরূপ জ্বলন্ত ভাষায় ভারতীয় উপনিষদের

মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহার দুইটী ছত্র উদ্ধৃত করিলাম ;—

"In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life and will be the solace of my death." শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য এবং আনন্দগিরি প্রভৃতির টীকা ও ব্যাখ্যার প্রসাদে, ইনি দুরূহ উপনিষদ শাস্ত্র মন্থনে আকণ্ঠ সুধাপানে বিভোর হইয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে। অধ্যাপক উইলসন, প্রাণের ভাষায় প্রাচীন যুগের কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহাপণ্ডিত ম্যাক্স্মুলার, যিনি এদেশে ভট্ট অথবা আচার্য্য মোক্ষমুলার নামে সুপরিচিত, তিনিও ভারতের প্রাচীনযুগ সম্বন্ধে প্রাণ খুলিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার পরিচয় তৎপ্রণীত "what India can teach us" নামক গ্রন্থে সম্যক্‌রূপে পাওয়া যাইবে। তাই বলিয়াছি সুবিজ্ঞ সমালোচক মহাশয়ের বিবেচনায় ভারতের কোন যুগটা 'অন্ধকারযুগ' তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে প্রাচীনযুগে ধর্ম্মপ্রাণ সুশিক্ষিত ও সমদর্শী আচার্য্য ও পণ্ডিতগণ জন-নায়ক বলিয়া সম্পূজ্য ছিলেন, যাঁহারা—

"পাপেপ্যপাপাঃ পরুষেহপ্যুদ্দারন্তি শুভাংগিরং
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণানেতারো লোকধারকাঃ"

অর্থাৎ যাঁহারা অনিষ্টকারীর প্রতিও নিষ্পাপ, কঠোর ভাষীর প্রতিও কল্যাণভাষী, যাঁহাদের অন্তরাত্মা বিশ্বজনীন সদ্ভাবে দ্রবীভূত হইয়া সমস্ত জগতে সঞ্চরিত,তাঁহারাই সমাজ ধারক নেতা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, সেই যুগটা যদি সুবিজ্ঞ সমালোচক মহাশয়ের বিবেচনায় অন্ধকার যুগ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং সেই যুগের অন্ধকারটাকে বেদান্ততীর্থ মহাশয় যদি আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উপযুক্ত লাঞ্ছনাই ভোগ করিয়াছেন। সহৃদয় সমালোচক মহাশয় বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে সাধারণের নিকট লাঞ্ছিত ও উপহাসাস্পদ করিবার জন্য, কিঞ্চিৎদুর অগ্রসর হইয়াই বলিয়াছেন,—"সাধারণতঃ যাহাদের পশ্চাতে একটা উপসর্গ আছে, আস্ফালন ও লম্ফঝম্ফ তাঁহাদেরই একচেটিয়া ব্যবসায় বলিয়া তাঁহারা জানেন ; পণ্ডিত মহাশয়ের পশ্চাতে দুইটা উপসর্গ—সাংখ্য ও বেদান্ত, সুতরাং আস্ফালনের আধিক্য একটু বেশী হইবে তাহা সহজেই স্বীকার করা যায়।......" ইত্যাদি উল্লিখিত অংশে সমালোচক মহাশয়ের গভীর পাণ্ডিত্যসুলভ "নবশিক্ষা দীক্ষা"নুমোদিত সহৃদয়তা ও সুরুচির কিরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, নব্যভারতের সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ তাহার বিচার করিবেন। আমরা উহার পরিচয়ে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি।

পণ্ডিত দুর্গাচরণ তদনূদিত ও সম্পাদিত ছান্দোগ্যাপনিষদের ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন লেখক সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—"ইদানীন্তন স্বাধীনচেতা কোন কোন লোক সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধি বলে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ইহাকে একটী কল্পনা-কুশল কবির উদ্দাম লেখনী প্রসূত উপন্যাসরূপে পরিচিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহা যে দেশের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই...ইত্যাদি।" তাঁহার মন্তব্যের সমর্থন জন্য তিনি উক্ত উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের সত্যকাম-জাবালের উপা-

খ্যান হইতে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমালোচ্য প্রবন্ধেই উদ্ধৃত হইয়াছে ; এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। উপাখ্যানের মূল অংশটুকু এই :—"সত্যকামোহ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্বামি, কিং গোত্রোন্বহমস্মীতি। সা হৈন মুবাচ নাহমেতদ্ বেদ তাত যদ্ গোত্রস্তমসি, বহ্বহং-চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাহমেতন্ন বেদ যদ্ গোত্রস্তমসি, জবালাতু নামাহমস্মি, সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি।"

বেদান্ততীর্থ মহাশয় উপাখ্যান শ্রুতির "বহ্বহং চরন্তী" এই কথার 'বহু' পদটী চরন্তী ক্রিয়ার বিশেষণ করিয়াছেন—"আমি বহুল অর্থাৎ প্রভূত পরিমাণে পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন,—অবশ্য গৃহস্থাশ্রমস্থ ব্রাহ্মণ-পত্নীর পক্ষে অভ্যাগত সাধুজনের সেবা করা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যই বটে, কিন্তু আমাদের স্বাধীনচেতা বিজ্ঞন্মন্য পণ্ডিতগণ ব্যাকরণের বেশী ধার ধারেন না ; আচার্য্যগণের কথায়ও বড় একটা কর্ণপাত করেন না ; তাই তাঁহারা একবারে সোজাসুজিভাবে "বহু" শব্দটীকে "চরন্তী" ক্রিয়ার গায়ে মিশাইয়া সত্য-নিষ্ঠা সতী জবালাকে "বহুচারিণী বেশ্যা" রূপে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।" উল্লিখিত বাক্যের অবতারণায় বেদান্ততীর্থ মহাশয় যে কি বিষম অপরাধ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। যাঁহারা সত্যকামজননী জবালাকে বহুজন-ভোগ্যা যথেচ্ছবিহারিণী অসতীরূপে প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান, অধ্যাপক বেদান্ততীর্থ তাঁহাদের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাতে সমালোচক মহাশয় এত চটিয়াছেন কেন ? মতবিভিন্নতার জন্য তিনি আক্ষেপ করিয়া সাধারণভাবে কোন কথা বলিয়া থাকিলেও তিনিত কোন ব্যক্তি বিশেষের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাকে শিক্ষিতসমাজে উপহাসাস্পদ করিবার উদ্দেশে কিছুই বলেন নাই ; এরূপস্থলে সমালোচক মহাশয়ের সহসা ধৈর্য্যচ্যুতি ও ক্রোধানল উদ্গীরণের কারণ কি ? বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের প্রতি এরূপ উষ্মা, উপেক্ষা ও অবজ্ঞার প্রকৃত কারণ কি, তাহা জানিবার উপায় নাই।

আমরা শুনিয়াছি, কিছুকাল পূর্ব্বে দুই একজন ক্ষমতাশালী লেখক জবালাকে বেশ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রে তাঁহাদের প্রভূত অধিকার না থাকায় তাঁহারা শ্রুতিবাক্যের কু-অর্থ করিয়া ভাষ্য ও টীকাকারগণের সুসঙ্গত ও সমুদার মতের প্রতিকূলে স্ব স্ব অনুদার মত প্রচলনে কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহাদের অসার চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। বর্ত্তমান সমালোচক মহাশয় যদি স্বীয় কল্পনার সহায়তায় তাঁহাদের পথাবলম্বনে জবালাকে বহুজনভোগ্যা বেশ্যারূপে প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান্ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রুতির বচন মান্য করিয়া, তাঁহাকে অকাট্য যুক্তির সহিত প্রমাণ করিতে হইবে যে তাঁহার ও তাঁহার পথগামী সমালোচকদিগের মত অভ্রান্ত। "বহু" শব্দকে তাঁহারা যতক্ষণ উপসর্গে পরিণত করিতে না পারিবেন, ততক্ষণ উহা ক্রিয়ার বিশেষণই থাকিবে। উপসর্গ না হইলে উহা "চরন্তী" এই পদের সহিত মিশ্রিত হইয়া যুক্তপদ (Compound word) হইবে না। পক্ষান্তরে "চরন্তী" ক্রিয়ার অর্থ নিঃসন্দেহ ও সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে উপভোগ্যা-

রূপে বহু পুরুষের সেবায় জবালা যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়াছিল, তাহা অতিপন্ন না করিতে পারিলে শাস্ত্র-শ্রুতিতে যাহাদের প্রকৃত আস্থা আছে, তাহারা কখনই উক্ত কল্পিত মত গ্রাহ্য করিবে না। এতৎসম্বন্ধে শঙ্করকল্প শঙ্করাচার্য্য ও সুবিজ্ঞ টীকাকারগণ যে ব্যাখ্যা ও ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া তাঁহাদের কূট অর্থ ও কাল্পনিক মত গ্রহণ সুশোভন হইবে না।

সমালোচক মহাশয় বোধ হয় কিছু অধিক পরিমাণে স্বাধীনতাপ্রিয়; এই জন্যই হয়ত তিনি অধ্যাপক বেদান্ততীর্থের প্রতি অসঙ্কুচিত ভাবে মনের সাধ মিটাইয়া অযথা বিদ্রূপ, উপহাস ও অবজ্ঞা বর্ষণে স্বীয় উদারতা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। ওরূপ সমালোচনার কি উদ্দেশ্য এবং তাহার সার্থকতাই বা কিরূপ, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। উক্ত সমালোচনার বিচার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ নিম্নলিখিত মহাশয়গণকে অনুরোধ করিতেছি;—অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অধ্যাপক রাজেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী. শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইঁহাদের মধ্যে কেহই টোলের "উপসর্গধারী" কুসংস্কারাপন্ন পণ্ডিত নহেন; পরন্তু ইঁহারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত. উচ্চ উপাধিধারী, পাশ্চাত্য চিন্তা ও পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত। পক্ষান্তরে প্রাচ্য শাস্ত্রগ্রন্থে ইঁহাদের সম্যক্ অধিকার থাকায় প্রাচ্যভাবে ইঁহাদের গভীর সহানুভূতি আছে। ইঁহারা বিচার পূর্ব্বক বলুন, কাহার ব্যাখ্যা ও অভিমত বিশদ ও পরিগ্রহণীয় এবং কে সামান্য কারণে নিতান্ত বিচলিত হইয়া গভীর বিদ্বেষ-বহ্নি উদ্গীরণে আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন?

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক, সমালোচক মহাশয়ের সুতীব্র সমালোচনা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে। সত্যকাম যে দাসীর ন্যায় বহু পুরুষের সেবাপরায়ণা বেশ্যার পুত্র, সমালোচক মহাশয় সে প্রমাণ কোথায় পাইয়াছেন? বালক সত্যকাম উপনীত হইবার ইচ্ছায় মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় গোত্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহার মাতা তাহাকে তৎসম্বন্ধে কোন পরিচয় দিতে পারে নাই। বলা বাহুল্য যে, সত্যকামের পিতৃ নাম বা পিতৃ-পরিচয় জিজ্ঞাসার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। শৈশবে পিতৃহীন সত্যকাম পিতৃ-গোত্র জানিত না, তাহার ধারণা ছিল যে তাহার মাতার নিকট গোত্রের পরিচয় পাইবে। অশিক্ষিতা মাতা স্বামীর গোত্র জানিত না, সুতরাং তাহার নিকট হইতে সত্যকাম সে পরিচয় পায় নাই। সকল সময়ে সকল দেশেই কেবল অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকেই স্বামীর গোত্র, প্রবর ও শাখা ইত্যাদি জানে নাই, এরূপ নহে. অনেক পুরুষও জানিত না। বর্ত্তমান সময়েও তাহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত মিলে। এমনও হইতে যে, সত্যকামের পিতার জ্ঞাতি, বন্ধু বা আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, সত্যকামের পিতা কোন দূর দেশ হইতে আসিয়া তথায় বাস করিয়াছিল। যে সময় সত্যকাম উপনীত হইবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছিল, তৎকালে তাহার বয়ঃক্রম ৮ বৎসরের অধিক ছিল না। এই অল্পবয়স্ক পিতৃহীন বালক উহার পূর্ব্বে পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি কি ভাবে

ও কি প্রণালীতে সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। এ সম্বন্ধে উপনিষদের মূল শ্রুতিতে যখন কোন পরিচয় নাই এবং মহাপণ্ডিত ভাষ্যকার ও টীকাকারগণও যখন এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব, তখন প্রাচীনকালের শাস্ত্রোল্লিখিত একজন পতিহীনা অসহায়া রমণীকে শ্রুতির অসম্পূর্ণ বাক্যের এবং অসংলগ্ন ও অনুমান-প্রতিপাদ্য অর্থের উপর নির্ভর করিয়া বহুভোগ্যা বেশ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা কিরূপ সহৃদয়তার কার্য্য, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত।

শাস্ত্রীয় অনেক বিষয় অতি প্রাচীনকাল হইতে গুরু পরাম্পরা ক্রমে ধারাবাহিক রূপে জন-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। সময়ে সময়ে আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রসঙ্গ ক্রমে তদ্বিষয় স্বীকৃত ও প্রতিপন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে এ পর্য্যন্ত কোন স্থলে তাহার কোন প্রতিবাদ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এরূপ বিষয়কে জনশ্রুতি প্রবাদ বা কিম্বদন্তী রূপে গ্রহণ না করিয়া দৃঢ় ভিত্তির উপর চিরপ্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় মত বলিয়া গ্রহণ ও মান্য করা সর্ব্বথা সুসঙ্গত। জবালা যে ব্রাহ্মণ-পত্নী ছিল না, তাহা প্রতিপন্ন করিবার অকাট্য প্রমাণ কোথায়? পক্ষান্তরে সত্যকাম যদি না জানিত যে, সে প্রকৃত ব্রাহ্মণের তনয়, তাহা হইলে তাহার অন্তরে উপনীত ও সংস্কার-সম্পন্ন হইবার বাসনা জাগিয়া উঠিবে কেন? সত্যকাম যদি ব্রাহ্মণ-সন্তান না হইবে, তাহা হইলে, তাহার জননী জবালাই বা তাহার অসঙ্গত বাসনার অনুমোদন করিবে কেন? তৎকালে মনুষ্য-সমাজে যথেচ্ছাচার প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখনকার সমাজ ধর্ম্মভাব-বিবর্জ্জিত ও ধর্ম্মের অনুশাসন-বিরহিত প্রেতের সমাজে পরিণত হয় নাই যে, একজন অসহায়া রমণী চরিত্রহীনা হইলেও স্বীয় পুত্রের অসঙ্গত আবদার পূর্ণ করিবার জন্য ধর্ম্ম-বিগর্হিত ও সমাজের নিয়ম-বহির্ভূত অন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে যথেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে সাহস করিবে। যদি Law of Heridity অর্থাৎ বংশ পরম্পরার নিয়ম মানিতে হয়, তাহা হইলে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শৃগাল-শাবক কখনও সিংহ-শিশু হইতে পারে না। তর্কের অনুরোধেও এ কথা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত যে, সত্যকাম ব্রাহ্মণেতর বর্ণের সন্তান হইলে তাহার অন্তরে উপনয়ন গ্রহণের প্রবৃত্তি কখনই জন্মিতে পারিত না। এবং তাহার জননী বিকৃত-মস্তিষ্ক অথবা পিশাচী না হইলে উক্ত সমাজ-বহির্ভূত অসঙ্গত প্রবৃত্তির অনুমোদন ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে পারিত না।

"নাসৌমুনির্যস্য মতম্ ন ভিন্নম্।" একথা সর্ব্ববাদীসম্মত হইলেও উপনিষদ্ গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের বহুমানাস্পদ আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের মতই প্রধান এবং তাঁহারই সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত সকল দেশের পণ্ডিতগণ অবনত মস্তকে মানিয়া চলিতেছেন। তিনি ভিন্ন অন্যান্য বিস্তর আচার্য্য উপনিষদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই সমালোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন নাই। এসম্বন্ধে সকল ভাষ্যকার ও টীকাকার এক মতাবলম্বী। যখন সর্ব্বপ্রধান ভাষ্যকার মহাপণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য এসম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—"তদৈব তে পিতা উপরতঃ" তখন মানিতে হইবে যে, আচার্য্য শঙ্কর ও

গুরু পরম্পরাক্রমে উক্ত ধ্রুব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। অন্যথা তিনি ওরূপ কথা লিখিতেন না। এ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত টীকাকার আনন্দগিরি যে প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য টীকা করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর কোন কল্পনা-উদ্ভূত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশ্ব-বিখ্যাত মহা পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য এবং অন্যান্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভাষ্য ও টীকাকারগণের মত অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা কল্পনা-সুলভ অসার যুক্তিবলে প্রাচীনকালের একজন পতিহীনা অসহায়া ব্রাহ্মণ-রমণীকে নিম্নজাতীয়া বেশ্যারূপে প্রতিপন্ন করিতে উৎসুক, তাঁহাদের সৎসাহস, সুরুচি ও সহৃদয়তা ধন্য ও শ্লাঘনীয়!

বেদান্ততীর্থ মহাশয় একস্থলে "দৈর্ঘ্যং ছান্দসং" এই ভাষ্যাংশের অনুবাদে লিখিয়াছেন, "ছন্দের অনুরোধে দীর্ঘ হইয়াছে।" কিন্তু বিজ্ঞ সমালোচক মহাশয় একথাটাকে একটা বিষম ভুল মনে করিয়া লিখিয়াছেন, "এখানে দীর্ঘ হইয়াছে ছন্দের অনুরোধ নয়, বেদের অনুরোধে।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ছন্দঃ শব্দের অর্থ যে শ্লোকের 'ছন্দঃ' ভিন্ন "বেদ"ও অপর একটা অর্থ হয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। বেদান্ততীর্থ মহাশয় "ছন্দঃ" শব্দ কি অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সমালোচক মহাশয় ঠিক বুঝিয়াছেন কি?

সুবিজ্ঞ সমালোচক মহাশয়, বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে অন্যায় রূপে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা, উপহাস ও অবজ্ঞার মাত্রা কিছু অধিক পরিমাণে বাড়াইয়া কতকগুলি অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছেন। সমস্ত কথার প্রতিবাদ করিতে হইলে বর্ত্তমান প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। তজ্জন্য আমরা তদ্বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় ক্ষান্ত হইলাম। তিনি যখন জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা ও মতের বিপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিতে কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত নহেন, তখন বেদান্ততীর্থ মহাশয় ও তাহা সমশ্রেণীর পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট নিতান্ত নগণ্য না হইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি তাঁহার সমালোচনার কোন কোন স্থানে তাঁহার উচ্চ নীতিজ্ঞান ও সুরুচির পরিচয় দানে স্বীয় গভীর পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্যের গৌরব করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি একস্থানে সুস্পষ্ট রূপে বলিয়াছেন,—"এই সব উক্তিতে তদানীন্তন সময়ের কোন কোন ক্ষেত্রে যে বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় নীতিজ্ঞানের অল্পতা ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। "ঘুরে শোও, ফিরে শোও, পৈতানেতে পা।" ইত্যাদি। যাঁহারা প্রাচীন কালের নীতিজ্ঞান অসম্পূর্ণ বা কদর্য্য বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী ও উদ্যত, বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী তাঁহাদের নীতিজ্ঞান যে সমধিক উন্নত ও উৎকৃষ্ট, তাহার পরিচয় পাইলে আমরা একান্ত সুখী হইতাম। সমালোচক মহাশয় সমালোচ্য প্রবন্ধের উপসংহার-কলে একটী অপ্রাসঙ্গিক বিষয়োপলক্ষে "আটিকী" এই শব্দটা লইয়া শঙ্করের ভুল প্রদর্শনে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন, "অট" ধাতু হইতে "আটিকী" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অট" ধাতুর অর্থ ভ্রমণ করা। কেমন স্ত্রী? না, যিনি ভ্রমণপটু। আটিকীর এই অর্থই কি সুসঙ্গত নহে? "আটিকী" শব্দ "অট" ধাতু অথবা "টিক" ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে, সে বিচার কে করিবে? "অট"

ধাতু হইল উক্ত শব্দটী "আটিকা" হইবে অথবা "আটিকী" হইতে বাধ্য, তাহা কি তিনি বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন ?

উপসংহার কালে আমরা আর একটী মাত্র কথার উল্লেখ আবশ্যক বিবেচনা করি। আমরা কিছুকাল হইতে বিস্তর বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ ও তদুপলক্ষে কবির লড়াইর ঘনঘটার পরিচয় পাইয়া বড়ই দুঃখ অনুভব করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, উহা সংক্রামক রোগের ন্যায় প্রধান প্রধান মাসিক পত্রেও বিস্তৃত হইতে চলিল। সুকুমার সাহিত্যই জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি এবং জাতীয় উন্নতির প্রধানতম সহায়। সমুদার ও নিরপেক্ষ সাহিত্য-ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার প্রদর্শন প্রশ্রয় পাইবে কি না, তাহার বিচার করিবার সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিনীত ভাবে প্রবীণ "নব্য-ভারত" সম্পাদক মহাশয় এবং তাঁহার সমকক্ষ অন্যান্য মাসিক পত্রিকার সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক সম্পাদক মহাশয়গণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ত্তব্য অবধারণে প্রবৃত্ত হউন।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

বিবাহের উপদেশ।

১৫ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩২২।

মা লীলা, বাবা সুধাংশু, এই সংসার-লীলা-ধামে এতদিন বিভিন্ন পথে চলিয়া ফিরিয়া, তোমরা দুজন, মহামায়ার মহাইচ্ছা-তাড়নে পবিত্র উদ্বাহ-বন্ধনে অনন্তকালের জন্য আজ আবদ্ধ হইলে,—ভক্তি-গঙ্গাজলে স্নাত হইয়া প্রেম-মন্ত্র সাধন-ব্রত গ্রহণ করিলে। এই মধুময় সম্বন্ধ তোমাদের জীবনে অক্ষয় হউক, তোমরা অনন্তকাল অঙ্গাঙ্গী-ভাবে একত্ব সাধন করিতে থাক। তোমাদের জীবন সুন্দর হইতে সুন্দরতম হউক,—মধুর হইতে মধুরতম হউক।

সুদীর্ঘকাল প্রহেলিকাময় জীবন-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে ইহাই সার বুঝিয়াছি, মর্ত্ত্যধামে গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় আর মধুময় আশ্রম এ সংসারে নাই। মনু কীর্ত্তন করিয়াছেন, এই আশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম। সকল আশ্রমের লোক এই আশ্রমে আশ্রয় পায় বলিয়া ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাধুর্য্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুখ বা দুঃখ, সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য, সম্ভোগ বা বর্জ্জন, কিছুই জীবের লক্ষ্য নয়,—লক্ষ্য কেবল অনিন্দিত চরিত্র-লাভ করা—দেবতাদের শ্রেয়ত্বে আত্ম-নিমজ্জন করা—অথবা খাটিয়া খাটিয়া কেবল জীব-সেবার অহেতুকী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া নাম-রুচির চির অক্ষয় ও অত্যুচ্চ পুণ্যধামে প্রতিষ্ঠিত হওয়া,—এই জীবন যাঁহার, তাঁহাকে চেনা, এই সংসার যাঁহার, তাঁহাতে আত্মত্ব বিলীন করা। মন্ত্রশুদ্ধি বা মন্ত্রসিদ্ধি শুধু কৈবল্যে উপনীত হইবার জন্য। এ সকল নিগূঢ় কথা তোমরা বুঝিতে চেষ্টা করিবে,—বুঝিয়া নির্ভয়ে, দুইয়ে একাত্মক হইয়া লক্ষ্য-পথে চলিতে থাকিবে।

তোমরা বালিকা এবং বালক বলিয়া কেহ হয় ত তোমাদিগকে এ সকল উপদেশের অনুপযুক্ত মনে করিতে পারেন, কিন্তু স্মরণ রাখিবে, তোমরা মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব সাধনের ব্রত আজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ

করিয়াছ যখন, তখন তোমাদিগকে ধীর এবং স্থির ভাবে বিশ্বনিন্দার রাজ্য হইতে পলায়ন করিতে হইবে। পরনিন্দা এবং পরশ্রীকাতরতা সাধনার পথের বড় দুর্জ্জয় রিপু। অন্যের মহত্ব স্মরণ ও চিন্তন ভিন্ন মহেশের অনন্ত সত্তার ধারণা হইতে পারে না, কেন না তিনি সর্ব্বঘটে প্রকট। আর দুর্জ্জয় রিপু অহঙ্কার বা আত্মাভিমান। ইহাতে মানুষকে অন্ধ করে। কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতিকে জয় করা সোজা, কিন্তু নিন্দা প্রশংসার অতীত আত্মত্যাগ মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করা বড়ই কঠিন। আত্মত্যাগ সাধনার ব্রতই প্রেমের নিয়ামক। আপনাকে ভুলিতে হইবে, স্বার্থকে ভুলিতে হইবে, সুখেচ্ছাকে বর্জ্জন বা সংহত করিতে হইবে, তবে পরস্পরের মহত্ব বা বিশেষত্ব এবং এইরূপে অনন্তদেবতার অনন্তত্ব বুঝিতে পারিবে। তোমরা দেবলীলার প্রকট লীলারূপে, পরস্পরকে, এবং বিশ্বমানবকে আদর করিতে শিখিবে। দুই জনই মনে করিবে, ইনি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এমারসনের ন্যায় আরো মনে করিবে, জগতের সকলেই মহত্বপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ, সকলেই গুরু। বিশেষত্বময় জগতে পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব আত্মস্থ করিতে অভ্যস্ত না হইলে অহেতুকী প্রেম স্বর্গ হইতে অবতরণ করে না। "তৃণাদপি সুনীচেন" মন্ত্র তোমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হউক। আমরা ব্যবহারিক জীবনে তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি নাই। তোমাদের জীবনে তাহা সহজ-সিদ্ধ রূপে দেখিতে চাই। আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কি ?

একাধারে আসক্তি এবং বৈরাগ্য,প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মানব-জীবনে সাধনের চিরন্তন কঠোর সমস্যা। এই সমস্যা-পরিপূরণে যাঁহারা সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মহাদেব, শ্রীরামচন্দ্র,জনক প্রভৃতিই অগ্রণী। ভালবাসিতে যাইয়া যাঁহারা কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান, জীবনের লক্ষ্য বিস্মৃত হন, প্রেম তাঁহাদের মরণের পথ। চাঞ্চল্য এবং তারল্যকে, বিলাস এবং সুখেচ্ছাকে তাঁহারা প্রেমের ইন্ধন মনে করেন। ইন্দ্রিয়জ সুখ-স্পৃহাকে তাঁহারা আশ্রয়-তরুরূপে গ্রহণ করেন। সেই সুখস্পৃহা তাঁহাদিগকে আসক্তি হইতে আরো আসক্তিতে অবনমিত করে, কামনা এবং বাসনার আগুনে শেষে তাঁহারা পুড়িয়া মরেন। হরগৌরীর মধুময় চিত্র, রামসীতার জীবনাদর্শ তোমরা কখনও বিস্মৃত হইও না। প্রেমের পথে তাঁহারা অনিন্দিত সৌরভময় পুষ্প, বৈরাগ্যের পথে তাঁহারা কঠোর হইতেও কঠোর বজ্র। স্বর্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেও বৈরাগ্য-সাধক কর্ত্তব্য অবহেলা করেন না, এবং প্রেমের রাজ্যের আসক্ত জীব কখনও মাতৃত্ব এবং পিতৃত্ব ভুলিয়া যান না। উপরোক্ত পৌরাণিক মহাত্মাদিগের জীবনাদর্শ ও কার্ত্তিকেয় এবং গণপতি, লব এবং কুশের উদাহরণ তোমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারিলে সকল সাধনা তোমাদের পক্ষে সোজা হইবে।

জ্ঞান এবং ভক্তিকে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন;—আমরা তাহা কখনও স্বীকার করি নাই। জ্ঞানই ভক্তি, ভক্তিই জ্ঞান। এক অবস্থায় জনক জ্ঞানী, অন্য অবস্থায় জনক ভক্ত ঋষি। এক অবস্থায় ধ্রুব প্রহ্লাদ চরম জ্ঞানী, অন্য অবস্থায় ভক্ত। গীতার শ্রীকৃষ্ণ পরম জ্ঞানী, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ পরম ভক্ত। মহাপণ্ডিত নিমাই সময়ান্তরে পরম ভক্ত গৌরচন্দ্র।

জ্ঞান ও ভক্তির অঙ্গাঙ্গীভাব সাধনে আমাদের দেশের রামকৃষ্ণ পরমহংস, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সিদ্ধিলাভ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। থিয়োডোর পার্কার যাহাকে সমঞ্জসীভূত উন্নতি বলিয়াছেন, তাহা আর কিছুই নয়, তাহা জ্ঞান-ভক্তির চরম মিলন। শুধু মিলন নয়, চন্দ্র সূর্য্য যেমন প্রকৃতির দুই মহীয়সী শক্তি, প্রকৃতি পুরুষ তেমনই অমোঘ দেবকীর্ত্তি। পুরুষ প্রকৃতিই নামান্তরে জ্ঞান-ভক্তি। সংসার-রচনার দুরবগাহ্ বিধান-চক্র এই দুই বিরোধী শক্তিতে কাজ করিতেছি;—মূলে দুইই এক,—অথবা একের দুই রূপ।

এক এক এক, প্রকৃতির পরিপন্থী;—বহু বহু বহু, পুরুষের চিরশত্রু। এক এক এক মিলিতেছেন বহু বহু বহুর সহিত। অণুপরমাণুর সমষ্টিগত মিলনে এই ধরা সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা। যিনি তাহা বুঝিয়াছেন, কৈবল্য বুঝিতে তাঁহার আর বাকী কিছু নাই। সকল সাধনার সার সাধনা কৈবল্য-সাধনা।

এতকাল একত্ব সাধন করিয়া এখন বহুত্ব সাধনার পথে তোমরা দুজনে দাঁড়াইলে। এই মিলনের পথ ধরিয়া অযুত মানববংশ কৈবল্যের পথে এক দিন তোমাদের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে। প্রকৃতি এবং পুরুষের মিলন ভিন্ন সৃষ্টি রক্ষা হয় কি? সৃষ্টি আর কি? সৃষ্টি এক পূর্ণাঙ্গেরই বিকাশ মাত্র। লীলা, তুমি আজ মহামায়ার মহালীলা-প্রকৃতির একাঙ্গ। সুধাংশু, তুমি জ্ঞান-পুরুষের মহা চক্র বিশেষ। উভয়ে মিলিয়া পূর্ণাঙ্গ হইলে যদি, আজ একবার উভয়ের মুখের দিকে উভয়ে তাকাইয়া দেখ, উভয়ের অত্যুজ্জ্বল শোভায় কাহার অতুল শোভা আজ ফুটিয়াছে। আহা, আমি যে তোমাদের মধ্যে মহা-সৃষ্টি-তত্ত্বের নিগূঢ়ত্ব প্রকটিত দেখিতেছি। তোমাদের উভয়ের বদন-শোভায় আজ কোটীচন্দ্র, কোটী সূর্য্য, কোটী বংশ, কোটী পরিবার মিলিত হইয়াছে—ইহকাল পরকাল, জীবন মরণ আজ সম্মিলিত। কি অপরূপ শোভা আজ দেখিতেছি। মনে হয় যেন পুরুষোত্তমের মহাসমুদ্রের অতুল সৌন্দর্য্য তোমাদের বদন-শোভায় ফুটিয়াছে। মা জগজ্জননীর সৃষ্টিলীলা-তত্ত্ব আজ সাত্ত্বিকভাবে সংসারে অবতীর্ণ। তোমরা ধন্য, তোমাদের পিতৃমাতৃ বংশ ধন্য। সকলে আজ সৃষ্টতত্ত্বের মূল বিধান-চক্র দেখিয়া সম্মোহিত। মর্ত্ত্যবাসী এবং স্বর্গবাসী দেবদেবীরা আজ তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তবে বিধাতার বিধানের জয় আজ, সানন্দে, তোমরা গাও এবং ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে প্রণাম কর।

গাও, প্রাণ ভরিয়া আজ জগন্ময়ের বিধানের জয় গাও। উভয়ে যে জ্ঞান পাইয়াছ,সেই জ্ঞান তাহার চরণে অর্পণ কর, উভয়ে উভয়ের বংশ-লব্ধ ভক্তি আজ তাঁহার চরণে উৎসর্গ কর। সব উৎসর্গ করিয়া শুধু নিত্য-প্রত্যক্ষ লীলা-রসময়ের গুণানুকীর্ত্তনে রত হও। তোমরা উভয়ে সুকণ্ঠ পাইয়াছ কেন, তাহা জান কি? শুধু লীলাময়ের গুণানুকীর্ত্তনের জন্য। আজ দুই হৃদয় এক হউক, দুই মধুর কণ্ঠ মিলিত হইয়া যাক্, দুইরূপ মিলিয়া চিদানন্দময় হইয়া নিত্য-নিরঞ্জনের গুণানুকীর্ত্তনে নিযুক্ত হউক। কুল পবিত্র হইয়া যাক্, দেশ ধন্য হইয়া যাক্, পরিবার মধুময় হইয়া যাক্, ব্রাহ্মসমাজ গৌরবময় হইয়া যাক্। তোমরা আজীবন-অর্জ্জিত দুই সুবিখ্যাত বংশগত যে চরিত্রধনের অধিকারী হইয়াছ—

সেই চরিত্রে পরমদেবতাকে বসাইয়া তাঁহাকে রাজত্ব ছাড়িয়া দাও। জ্ঞান ভক্তিতে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাক্, তোমাদের পুণ্যময় জীবনে শুধু তাঁহারই লীলার জয় ঘোষিত হউক,—তোমাদের পুণ্যময় সংসারে তাঁহারই সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক। কণ্টকময় সংসার তাঁহার আবির্ভাবে পুণ্যময় হইয়া যাক্। ব্রাহ্ম-সমাজের মুখ জগতে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হউক। এই কঠোর ব্রত পালনে একমাত্র ব্রহ্মকৃপাই সম্বল কর। দুর্জ্জয় বিরোধী শক্তি ব্রহ্মকৃপায় পরাজিত হইয়া যাইবে, নিশ্চয় জানিবে।

লীলা, একদিন তোমাকে আমি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার সদুত্তর পাইয়া আমি বুঝিয়াছি, তুমি বালিকা নও, তুমি বংশানুক্রমিক সাধনা এবং সদ্গুণরাশির প্রকট মূর্ত্তি। তোমার পিতা বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপনীত হইয়া আপন নির্ম্মল বিশ্বাস ঘোষণা করিয়া যে মহত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন, আমি বুঝিয়াছি, তাঁহার অঙ্কুর তোমাতে বদ্ধমূল। তোমার মাতা আদর্শ মাতৃমূর্ত্তি, আমি বুঝিয়াছি, সেই মাতৃভাবে অনুপ্রাণিতা তুমি ভক্তিমূর্ত্তি। পিতামাতার এবং পিতৃপুরুষ ও মাতৃপুরুষ-সাধনা-অর্জ্জিত বিশেষত্বে ভূষিতা হইয়া তুমি অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়াছ। তোমার পক্ষে সংসারের সাজসজ্জা কোন গণনার বস্তু নয়; তোমার স্বরূপ এবং শুকণ্ঠে জগন্ময়ীর অপরূপ কৃপা ফুটিয়াছে। আমি বুঝিতেছি, আমার উপদেশ তোমার নিকট ব্যর্থ হইবার নয়। তুমি আদর্শ মাতৃরূপে আজ জগৎ সমক্ষে তবে দাঁড়াও। আমরা তোমাকে বহুদিন অন্বেষণ করিতেছিলাম, অবশেষে চন্দ্রনাথের বংশের নিভৃত অন্তঃপুরে তোমাকে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। তুমি নিভৃত-গহনের আবর্জ্জনা-রাশি পরিত্যাগ করিয়া আজ বংশগত সদ্গুণরাশি লইয়া পতির অনুসরণ কর। পতিকুলে তুমি অনন্তকালের জন্য ধ্রুব হও। তোমার পতি ভাব-ভোলা মহেশাদর্শ গঠিত অনুচর। মন্দটুক পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুণরাশি লইয়া তুমি ছায়ার ন্যায় পতি-কায়ার অনুসরণ কর। গৌরীর অপরূপ মূর্ত্তি তোমাতে প্রকটিত কর। মা, তোমার জীবনে আমার উপদেশ যেন কখনও উপেক্ষিত না হয়। বিশ্বজননীর চরণে আজ ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া নির্ভয়ে পতির অনুসরণ করে। সঙ্গে করিয়া ভগবদ্ভক্তি, পতিভক্তি, গুরুজনের ভক্তি, জনসেবা, তিতিক্ষা, প্রসন্নতা, সরলতা, বৈরাগ্য, অনাসক্তি ও বীর্য আনিও। তোমার ললাটের সিন্দূর বিন্দুতে এই সকল সদ্গুণ ফুটিয়া উঠুক। তোমার চরিত্র-শোভায় যেন আমাদের পরিবার ধন্য হয় এবং ব্রাহ্মসমাজ গৌরবান্বিত হয়। আমরা আর কিছুই চাই না।

সুধাংশু, তোমার পিতামহ বিশ্বাসের এবং তোমার পিতামহী ভক্তির প্রকটমূর্ত্তি। তোমার পিতা এবং তোমার মাতা সরল বিশ্বাসী এবং ভক্তির চির-সেবক ও চির-সেবিকা;—তুমি উপযুক্তবংশের উপযুক্ত সন্তান, তুমি সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র, তুমি আমার ইঙ্গিত নিশ্চয় বুঝিয়াছ, অধিক আর তোমাকে কি বলিব? বাবা দেখিও, নিমাইচরণ এবং মথুরামোহনের অক্ষয় বিশ্বাস ভক্তি এবং চরিত্রের অনিন্দিত প্রভাব যেন তোমাদের যুগল-জীবনে পরিম্লান না হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশের অতি পবিত্র একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া দিতেছে—দেশে

আত্ম-বিসর্জ্জনের শিক্ষা কমিয়া যাইতেছে—স্বার্থ দেশের ঘরে ঘরে জাগিয়া উঠিতেছে। আমার একজন বিশেষ বন্ধু বলেন, তাঁহার একমাত্র পুত্রকে বিবাহিত করিয়াই তিনি পৃথক হইবেন। মান বাঁচাইবার কত কি আশঙ্কা তিনি করেন! আশঙ্কা যে নাই, তাহা কে বলিবে? পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষা দীক্ষা আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে যে। বাবা, তুমি মথুরামোহনের বংশের একমাত্র গুণধর পুত্র, দেখিও, পিতৃমাতৃ সেবা কখনও পরিত্যাগ করিবে না। আমরা তোমাকে স্বর্গের পথ দেখাইবার জন্য বিবাহ দিলাম, সাবধান, আত্মত্যাগ-মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থ-সুখের নরকের পথে কদাপি বিচরণ করিও না। আজ আদর্শ দৃষ্টান্ত সাধ্বী কমলকামিনীর জীবনের কথা স্মরণ কর। তাঁহার ন্যায় নামে রুচি এবং জীবে দয়া তোমার জীবনের মূল মন্ত্র। এ সাধনা তুমি কখনও পরিত্যাগ করিবে না। সরলতা এবং সাধুতা তোমার জীবনের অতুল ভূষণ, তাহা তুমি কখনও ভুলিবে না। ভুলিবে না, তুমি আমাদের নিত্যাদর্শ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, পিতৃমাতৃ কুলকে উজ্জ্বল করিবার জন্য। সাবধান, সে ব্রত কখনও পরিত্যাগ করিবে না। আমার অদ্যকার সকল উপদেশকে জীবনে প্রতিপালন করিয়া, আদর্শ ব্রাহ্ম-পরিবার সংস্থাপন করিয়া, আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবে। সাধনার আরম্ভ সীমায়, পরিব্যাপ্তি অসীমে—এ কথা কখনও বিস্মৃত হইবে না। অসীম তোমার লক্ষ্য হউক, অনন্ত তোমার কাম্য হউক। তোমার জীবনে অসীম ও অনন্তের সিংহাসন নিত্য-প্রতিষ্ঠিত হউক। আজ অসারের অসারত্ব পরিবর্জ্জন করিয়া সারাৎসার চিন্ময়ে আত্মসমর্পণ কর। তোমাদের যুগল-জীবনে মায়ের অশেষ করুণা বর্ষিত হউক।

আজ দুটী নদী মিলিয়া মহা-সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতেছে, ইহকাল এবং পরকালের সাধু ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ-পুষ্প চতুর্দ্দিক হইতে তোমাদের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। আজ তোমরা নবজীবন লাভ করিয়া, কোটী নরনারীর আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া বিশ্বপতির চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম কর। আবার বলি, স্মরণ রাখিও, আমাদের সকল অবস্থার সহায় কেবল ব্রহ্ম-কৃপা। তোমাদের নয়নে ঝরুক ব্রহ্ম-কৃপা, মাথার মণি হউক ব্রহ্ম-কৃপা। সর্ব্বাঙ্গের আভরণ হউক ব্রহ্ম-কৃপা। জীবনে মরণে ব্রহ্মকৃপাকে সম্বল করিয়া সাধনার পথে নির্ভয়ে পদনিক্ষেপ কর। সপ্ত-পদ-নিক্ষেপে সপ্তশক্তি তোমাদের নবজীবনে ফুটিয়া উঠুক,—সপ্তসিন্ধু উথলিত হউক। জয় মা আনন্দময়ীর জয়। ।

জগজ্জীবন মহারাজ প্রজাপতি, তোমার অযাচিত কৃপায় আজ নবদম্পতির মিলন হইল, তোমাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, এই দম্পতি যেন তোমার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারে। তুমি ইঁহাদের সকল সাধনার সহায় হও। তোমার মহা ইচ্ছা ইহাদের নবজীবনে পূর্ণ হউক।

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

একাদশ অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়ের নাম বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ। ভগবান অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিয়া আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। অর্জ্জুন যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানতঃ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে এই অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন।

অর্জ্জুন, ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। অর্জ্জুন কেন এ বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলেন, এবং ভগবানই বা কেন ও কিরূপে তাহাকে এ বিশ্বরূপ দেখাইলেন, তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। প্রথমে অর্জ্জুন মোহযুক্ত-ধর্ম্ম-সংমূঢ়চিত্ত হইয়া, যাহাতে তাঁহার শ্রেয় হইবে ও মোহ দূর হইবে, তাহা জানিবার জন্য শিষ্যরূপে শিক্ষার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—

"কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

ভগবান কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগুরুর গুরু—গুরুর্গরীয়ান্। শিষ্যরূপে অর্জ্জুন, ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, ভগবান প্রথমে তাহাকে আত্মতত্ত্ব বা সাংখ্যজ্ঞান ও সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় বা সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা গীতার প্রথম ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে। তাহার পরে এই দ্বিতীয় ষট্‌কে পরম অধ্যাত্ম তত্ত্ব বা বেদান্ত জ্ঞান উপদেশ প্রসঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব ও বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভের উপায় ভক্তিযোগ উপদেশ দিতেছিলেন। এইরূপে যাহাতে অর্জ্জুনের মোহ দূর হয় ও শ্রেয় লাভ হয়, ভগবান তাঁহার প্রপন্ন প্রিয় শিষ্যকে তাহারই উপদেশ দিতেছিলেন। আমরা এস্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিতে পারি যে, ভক্ত সাধক অর্জ্জুনের ন্যায় এইভাবে পরমাত্মা পরমেশ্বরের শিষ্যরূপে শিক্ষার জন্য শরণ লন ও এই গীতার শ্লোক মন্ত্ররূপে অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন করেন, তিনিও সেই পরম গুরু পরমেশ্বরের কৃপায়, অর্জ্জুনের ন্যায় এই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন,—ভগবান তাহার আত্মভাবস্থ হইয়া তাহার জ্ঞান-দীপ জ্বালিয়া দিয়া, তাহার নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন,—সেও অর্জ্জুনের ন্যায় ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে দেখিতে পায়।

সে যাহা হউক, অর্জ্জুন ভগবানের নিকট আত্মতত্ত্ব ও পরমেশ্বর তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, ভগবানকে বলিলেন,—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশোময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥
গীতা ১১—১—২।

অর্থাৎ আমায় অনুগ্রহার্থ আমার অজ্ঞানজ মোহ দূর করিবার জন্য হে ভগবান্, তুমি

যে পরম গূঢ় আধ্যাত্মসংজ্ঞিত বচন বলিলে, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূর হইয়াছে। তোমার নিকট বিস্তারিত ভাবে ভূতগণের উৎপত্তি, লয়-তত্ত্ব ও তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। তাহার পর অর্জ্জুন বলিলেন,—

এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টু মিচ্ছামিতে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম্॥
গীতা, ১১।৩।

অর্থাৎ হে পরমেশ্বর, তুমি যে আপনার পরমাত্ম স্বরূপ বলিলে, তাহাই সত্য। এক্ষণে হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশ্বররূপ, তোমার অব্যয় আত্মস্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি।

ইহা হইতে বুঝিতে পরা যায় যে, অর্জ্জুন প্রথমে পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন। এবং শ্রবণান্তর পুনঃ প্রশ্ন করিয়া 'পরিপ্রশ্নেন'— ইতি গীতা, ৪।:৪) যে জ্ঞান উপদেশ পুনঃপুন চিন্তা বা মনন পূর্ব্বক, তাহা যে সত্য, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত করেন। তিনি তাই কলেন,—

"এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।

অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।"
গীতা, ১০।১৪।

এইরূপে পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রবণ ও মননান্তর তাঁহার পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইলে পর, বিজ্ঞান সহিত সেই তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য বা সেই পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব দর্শন করিবার জন্য ও তাহা নিদিধ্যাসন জন্য অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য অর্জ্জুন সেই পরমাত্মার অব্যয় স্বরূপ, তাঁহার ঐশ্বর্য্যরূপ দেখিতে চাহিলেন।

অর্জ্জুন বলিলেন,—

"দ্রষ্টু মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।"

অর্জ্জুন পুরুষোত্তমের এই ঐশ্বর্য্যরূপ দেখিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে হইল যে, তিনি সে ঐশ্বর রূপ দেখিবার যোগ্য নহেন। এইজন্য অর্জ্জুন সঙ্কোচের সহিত বলিলেন,—

"মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টু মিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততোমে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥"

অর্থাৎ যদি তোমার ঐশ্বররূপ দেখিতে আমাকে যোগ্য বা সক্ষম অর্থাৎ অধিকারী মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর, আমাকে তুমি অব্যয় আত্মাকে দর্শন করাও।

অর্জ্জুন ভগবানের নিকট অধ্যাত্ম সংজ্ঞিত গূঢ় পরম বচন শ্রবণ করিয়া এবং তাহা যে সত্য, তাহা মননপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই অব্যয় পরমাত্মার স্বরূপ তাঁহার ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন। এই পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব কি, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করিতে হইবে।

পরম অধ্যাত্ম-তত্ত্ব।—ভগবান্ গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে প্রথম অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত আপনার এই পরম অধ্যাত্মস্বরূপ তাঁহার ঐশ্বররূপ বিবৃত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ষট্‌কের প্রথমে সপ্তম অধ্যায়ে সাধারণভাবে পরম আত্মার ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। অর্থাৎ যে তত্ত্ব সহজে বোধগম্য, তাহা বিবৃত হইয়াছে। পরমাত্মা পরমেশ্বরের পরা ও অপরা, দুই রূপ প্রকৃতি, তাহাই সর্ব্বভূতের যোনি, পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের প্রভব ও প্রলয় সর্ব্বভূতের বীজ, তাহাদের জীবন, তিনি সকলের সার, তিনি যোগমায়া-সমাবৃত, ত্রিবিধ গুণময়ী ভাবরূপ, সেই দৈবী মায়া তাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত,

তিনিই বাসুদেবরূপে সর্ব্ব—ইত্যাদি তত্ত্ব সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পরে অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষর-ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ তত্ত্ব উল্লেখপূর্ব্বক যে অব্যক্ত হইতে কল্পারম্ভে সর্ব্বভূতের উদ্ভব ও কল্পান্তে যাহাতে তাহাদের লয় হয়, সেই অব্যক্তের অতীত অব্যক্ত সনাতনভাব, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই ভাব অব্যক্ত অক্ষর—তাহা পরমগতি, ভগবানের পরম ধাম। সেই অব্যক্তের অতীত সনাতন ভাব—পরমপুরুষ ভাব। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভাবেরই অন্তঃস্থ সর্ব্বভূত, তাঁহার দ্বারাই সমুদায় ব্যাপ্ত,—‘যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম।”

ইহাই গুহ্যতম পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব। নবম অধ্যায়ে ইহাই বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ সেস্থলে বলিয়াছে,—

“ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মাভূতভাবন ॥”

(গীতা ৯।৪—৫)।

এই বিশ্বাতীত (‘Transcendent ও বিশ্বানুগ (Immanent) পরমাত্মতত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, এই পরমাত্মার যে অক্ষর অব্যক্ত (Transcendent) বিশ্বাতীত ভাব, এবং তাঁহার যে বিশ্বানুগ (Immanent) পরমপুরুষ বা সর্ব্বভূতাত্মভূত—সর্ব্বনিয়ন্তারূপ ও ‘সর্ব্ব’ রূপ ভাব, তাহা ‘অব্যক্ত’ ভাবের অতীত। এই অব্যক্ত ভাবই সাংখ্যের মূল প্রকৃতি। পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, কল্পারম্ভে এই অব্যক্ত হইতে ভূতগণের উদ্ভব হয় ও কল্পান্তে তাহাতেই লয় হয়। নবম অধ্যায়ে ইহাই আবার উক্ত হইয়াছে। এ অধ্যায়ে আছে যে, সর্ব্বভূত কলাক্ষয়ে তাঁহারই প্রকৃতিতে লীন হয়, এবং কলারম্ভে পুনর্ব্বার সেই প্রকৃতি হইতে তাহাদের বিসৃষ্টি বা বিশেষভাবে সৃষ্টি হয়। এস্থলে আরও উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় তাঁহারই প্রকৃতি হইতে এইরূপ সৃষ্টি লয় হয়, তিনিই কল্পারম্ভে স্বীয় প্রকৃতিকে ‘অবষ্টম্ভন’ পূর্ব্বক চরাচর জগৎ বিসর্জ্জন করেন। অথচ তাঁহার পরম ভাব এই অব্যক্ত বা প্রকৃতির অতীত হেতু তিনি এই সৃষ্টি লয় কর্ম্মে নিবদ্ধ হন না। তাঁহার এই প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে যে চরাচর ব্যক্ত হয়, তাহার অতীত তাঁহার যে এই ভাব, তাহা অজ্ঞানীরা জানিতে পারে না। এই যে পরম ভাব, তাহা ভূতাদি অব্যয়ভূত মহেশ্বর ভাব।

এইরূপে স্বপ্রকৃতি দ্বারে তিনি ‘বহুধা’ বিশ্বতোমুখ হন, এবং এই জগৎ অভিব্যক্ত করিয়া তাহার পিতা মাতা ধাতা স্বরূপ হন। তিনিই বিশ্বরূপ, তিনিই বিশ্বের পিতা (বীজপ্রদ পিতা) প্রকৃতিদ্বয়ে বিশ্বমাতা, তিনিই বিশ্বের ধাতা, পিতামহ, বিশ্বের গতি ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, প্রভব, প্রলয়স্থান, নিবাস ও অব্যয়বীজ। তিনিই শব্দরূপ পবিত্র ওঙ্কাররূপে বেদ্য।

ভগবান্ এই প্রকৃতিকে “আমার” বলিয়াছেন, এবং অস্বতন্ত্র বলিয়াছেন। তিনিই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা নিয়ন্তা। অতএব এক অর্থে প্রকৃতিও ভগবান্ হইতে অভিন্ন। তাহা বাস্তব। গীতা অনুসারে এই প্রকৃতি ও মায়া ভিন্ন। মায়া—গীতা অনুসারে দৈবী-

মায়া—তাঁহার আত্মমায়া। তাঁহারই ত্রিগুণময়ী ভাবের দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা বদ্ধ হয়। আমরা পূর্ব্বে এই মায়া তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহা ভগবানের আত্মশক্তি, তাহা তাঁহার এই প্রকৃতি বা প্রকৃতিজাত ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন। মায়া দ্বারা ক্ষেত্র সৃষ্ট হয় না। মায়া ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্রবদ্ধ করে মাত্র। গীতা অনুসারে মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মভাব বা ঈশ্বরভাব সিদ্ধ হইলে জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদ থাকে না, জীবাত্মা ক্ষেত্রমুক্ত হইয়া স্বরূপপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ক্ষেত্রসংযুক্ত অবস্থায় ক্ষেত্রবদ্ধ হইয়া ভেদ হয়। সে ভেদ দূর করিবার জন্য সে ক্ষেত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ত্রিগুণাতীত হইবার জন্য গীতোক্ত সাধনার প্রয়োজন। এইরূপে গীতায় ভেদাভেদবাদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এসম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। পরে এই গীতোক্ত ভেদাভেদবাদ বিবৃত হইবে। *

দশম অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান বলিয়াছেন যে, তাঁহার এ প্রপঞ্চাতীত পরম ভাব হইতে যে প্রপঞ্চরূপে ও প্রপঞ্চের নিয়ন্তা রূপে বিশেষ অভিব্যক্ত বা প্রভব, তাহার তত্ত্ব কেহই জানিতে পারে না। তিনি দেবগণেরও আদি, অধিদৈবত ভাব তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত। তাহা হইতে বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের পৃথক্‌বিধ ভাবের অভিব্যক্তি হয়। তাঁহা হইতে মহর্ষি ও মন ভাবের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপ অভিব্যক্তিই পরমেশ্বরের বিভূতি ও যোগ। ভগবান্ হইতেই সমুদয়ের উদ্ভব ও প্রবর্ত্তন হয়। ভগবান বলিতেছেন,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।"

অর্জ্জুন এই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, ও পরে মনন বা বিচার করিয়া বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বমেতৎ ঋতং মন্যে"। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভগবানের 'ব্যক্তি' অভিব্যক্তি বা প্রভব—দেব দানব কেহই জানিতে পারে না। ভগবানই পুরুষোত্তম, ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবতাদেব সর্ব্ব জগৎপতি। তিনিই কেবল আত্ম দ্বারা আত্মস্বরূপ জানেন। তাহার পর অর্জ্জুন, ভগবানের পরমাত্ম স্বরূপের যে এই অপর ব্যক্ত ভাব, যে দিব্য আত্মবিভূতি সকল, তাহা অবলম্বনে পরমেশ্বরকে চিন্তা বা ধ্যান করিবার প্রণালী বিশেষ ভাবে জানিতে চাহিলেন। ভগবানও তাহা উদ্দেশে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন যে,—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।"

এইরূপে পূর্ব্বে অধ্যাত্ম সংজ্ঞিত পরম বচন, ভগবান অনুগ্রহ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বলিলে, তাহাতে অর্জ্জুনের মোহ দূর হইল।

এস্থলে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ এ উভয়ের জ্ঞানই জ্ঞান। ইহা ব্যতীত জ্ঞানের বিষয় আর কিছুই নাই, জ্ঞান যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় রূপে ভিন্ন হয়, সেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলেই জ্ঞানের চরিতার্থতা হয়। যাহা জ্ঞেয় 'ইদং' সে সমুদায়ই সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে এস্থলে ক্ষেত্র নামে অভিহিত। আর যাহা জ্ঞাতা, তাহা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত। ক্ষেত্রজ্ঞকে প্রতি ব্যষ্টি ক্ষেত্রস্থিত আত্মারূপে—দেহী পুরুষরূপে

---

* গীতা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির সম্বন্ধে ৫।২৪,৬.২৭, ১৪।২৬,১৮।৫৪ শ্লোক ও 'মদ্ভাব' বা ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ৪।১০,৮.৫,১৩।১৮,১৪।১৯ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ও সমষ্টি ক্ষেত্রে অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা ঈশ্বর পরমাত্মারূপে জানিতে হয়। তাহাকে প্রতি ক্ষেত্রে পরিচ্ছিন্ন "অহং ও সর্ব্ব অহং, রূপে জানিতে হয়।

এই ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র মধ্যে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ ভাবিয়া জানিতে হয়, এবং সেই জ্ঞান হইতে সর্ব্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হয়। যাহাকে জানিতে হয়, তাহা 'জ্ঞেয়' তাহার সম্বন্ধে 'জিজ্ঞাসা' হয়। ক্ষেত্র অবশ্য এইরূপে 'জ্ঞেয়'। কিন্তু জ্ঞাতেয় যিনি—তিনি জ্ঞেয় হন কি? শঙ্কর বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতা কখন জ্ঞেয় হন না। কিন্তু জ্ঞাতা ভাব জ্ঞেয় সম্বন্ধে অপরোক্ষ ভাবে জ্ঞানের মধ্যেই অনুভূত হয়। এই অর্থে 'জ্ঞাতা' জ্ঞেয় হন। এই অর্থে ব্রহ্ম জ্ঞেয়, ঈশ্বরতত্ত্বও জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং তাহা জানিবার উপদেশ সার্থক হয়। কিন্তু তাহা বাহ্য বিষয় জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞেয় নহে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই জ্ঞানের অন্তর্ভূত। তাই ভগবান বলিতেছেন যে, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই জ্ঞান। ত্রয়োদশ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গীতায় এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। বলিয়াছি, ক্ষেত্রই প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সাংখ্যোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব। পরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে ইহা বিবৃত হইয়াছে। তাহাই সমষ্টি ভাবে ও ব্যষ্টি ভাবে শরীর। এই প্রকৃতিতত্ত্ব প্রকৃতিজ ত্রিগুণ তত্ত্ব— সমুদায়ই এই তৃতীয় ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে। আর ক্ষেত্রজ্ঞ ত্রিবিধ পুরুষতত্ত্ব—ঈশ্বরতত্ত্ব সমুদায়ও এই ষট্‌কে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহাই সমষ্টি ভাবে সমগ্র জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব।

সুতরাং এই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে যাহা সূত্ররূপে উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই তৃতীয় ষট্‌কে বিস্তারিত হইয়াছে। এই ষট্‌কে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই অই দুই শ্লোকের অর্থ প্রতিভাত, পরিস্ফুট হইবে, ততই আমাদের ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞে জ্ঞান লাভ হইবে, এস্থলে তাহার আভাস মাত্র পাইলেই যথেষ্ট হইবে। সে আভাস আমরা যথাসাধ্য দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই দুই শ্লোক হইতে আমাদের এইমাত্র জানিতে হইবে যে, প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের "ক্ষেত্র" কি, তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন এবং সেই ক্ষেত্রের বেত্তা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' ও সর্ব্বক্ষেত্র বেত্তা। ক্ষেত্রজ্ঞ কে, তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। সংক্ষেপতঃ এই শরীরই ক্ষেত্র, এই শরীরের বেত্তা যিনি, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, আর সর্ব্বক্ষেত্রে বা সমষ্টিভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি, তিনি পরমাত্মা পরমেশ্বর। জ্ঞানযোগে এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান সিদ্ধ এই জ্ঞান পরমার্থ জ্ঞান—মুক্তি হেতু।

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

স্ত্রীশিক্ষা।

এই বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করি নাই। যাহা চক্ষে দেখিতেছি, যাহার অত্যন্ত অভাব অনুভব করিতেছি, তাহাই কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

আমাদিগের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যদিও স্ত্রীশিক্ষার প্রচার দেখা যাইতেছে, তথাপি দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। কালেজীয় স্ত্রীশিক্ষার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া মহাকালী পাঠশালার অবতারণা হইয়াছিল। তাহাও সময়োপযোগী না হওয়ায় মৃতপ্রায় হইয়াছে। আমি শুধু কলিকাতার কথা বলিতেছি না। মফঃস্বলেও ঐরূপ। সহরে সহরে স্ত্রীবিদ্যালয় যথেষ্ট নাই, পল্লীগ্রামে তাহা অপেক্ষাও কম। আমি উচ্চ নীচ সকল সমাজেই মিশি, স্ত্রী-গ্রাজুয়েট হইতে নিরক্ষরা পর্য্যন্ত অনেকেই আমার বন্ধু আছেন; সুতরাং আমি বলিতে পারি, স্ত্রীশিক্ষা দেশকাল-পাত্রোপযোগী হইতেছে না।

সমাজের অধিক সংখ্যক লোকই অশিক্ষিত। অথচ ইহাদের দ্বারাই শিক্ষিত সভ্য সমাজের অধিকাংশ অভাব মোচন করিতে হয়। এদেশের শ্রমজীবিগণ অশিক্ষিত, রুগ্ন, দুর্ব্বল; শুধু এক পাই মাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এদেশের যে দরিদ্র কৃষক রমণীর সন্তান অন্য সকলের ক্ষুধার অন্ন, ভোগের উপকরণ, সভ্যতার চাকচিক্য যোগাইতেছে, সেই নিরক্ষরা নারীর শিক্ষায় যত্নবান হওয়া, তাহাদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা, তাহাদিগের কুসংস্কারের আতঙ্ক দূরীভূত করা, আমাদের শিক্ষিতা মহিলাগণের কর্ত্তব্য না হইয়া ভিন্ন দেশগত আর এক জাতির কর্ত্তব্য হইবে নাকি? সুশিক্ষার অভাবে. (আমি কালেজীয় শিক্ষাকে লক্ষ্য করিতেছি না) আমাদের পল্লী-জননীগণ সন্তানপালনে অসমর্থা, এবং নানা বিষয়ে অনভিজ্ঞা, ইহা সকলেই জানেন। এদেশের সূত্রধর, তন্তুবায়, কুম্ভকার, মালাকর, কর্ম্মকার, শাঁখারী প্রভৃতি জাতির রমণীগণ বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার কোন ধারই ধারেন না; উচ্চ শ্রেণীর দুই এক বর্ণ কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হন; কিন্তু আমি দেখিতেছি, তাহাতে জড়তার ও বিলাসিতার এবং পরানুকরণ-বৃত্তির বৃদ্ধি হওয়া ভিন্ন সমাজের বিশেষ কোনও উপকার হইতেছে না। সহরে অথবা পল্লীগ্রামে উপরের লিখিত নারীগণের কোন চেষ্টা বা উদ্যমই দেখিতেছি না। শিক্ষা যদি পরোপকার-বৃত্তি না জাগাইল, নিজের বিস্তারের চেষ্টা উৎপন্ন করিতে না পারিল, তবে তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। এদেশে ইহাই হইতেছে না কি? আমি দেখিয়াছি, কোনও সুশিক্ষিতা মহিলা অশিক্ষিতা পল্লীবাসিনীকে দেখিয়া, "পাড়াগেঁয়ে" বলিয়া, তুচ্ছ মনে করিয়াছেন; অন্য কোনও সুশিক্ষিতা মহিলা দরিদ্রা পল্লী-রমণীকে কৌতুকের বিষয় মনে করিয়াছেন। আমার জাতি * একটু রূপের

---

* ভুলিবেন না, আমি স্ত্রীজাতি

বড়াই করিয়া থাকে; শিক্ষিতা রূপসীর মুখে রূপহীনার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়াছি। এ সকল স্থলে শিক্ষা কি চরিত্রকে উন্নত করিয়াছে? উচ্চ শিক্ষিতাগণের অভিমান বর্জ্জন করা আবশ্যক, শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করা আবশ্যক; নচেৎ শিক্ষার ফল কি? নীতি-শিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা তো বড় কথা; বালক বালিকাগণের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, চিন্তাশক্তি, উচ্চাশা, সৎসাহস, বিনয়, একাগ্রতা, ভক্তি, এসকলকে জাগ্রত অথবা প্রবুদ্ধ করা, তাহাদিগকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ করা; এক কথায় পর বংশকে সুগঠিত করা শিক্ষিতা রমণীগণের গুরুতর দায়িত্ব এবং প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি দেখিতেছি কি? এ সকলের কিছুই দেখিতেছি না। পরানুকরণ, বিলাস, পাণ্ডিত্যাভিমান, এই গুলিরই নানারূপ সংস্করণ দেখিতেছি; সঙ্গে সঙ্গে কুরুচির বহুবিধ সংস্করণ দেখিয়া চক্ষু দগ্ধ করিতেছি।

আমাদের দেশের বালিকারা প্রায়ই সাত হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিতে অবসর পায়। ইহাতে বিবাহের পর চিঠিপত্র লেখা, অসার নাটক নভেল পাঠ করা, এবং চটুল তরল ভাবের ও ভাষার রঙ্গচ্ছটা বিস্তার করা ভিন্ন আর বড় বেশী কিছু দেখা যায় না। দুই একজন "উচ্চদরের" সাহিত্যিক হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতেই বা ফল কি? আমি দেখিতেছি, তাঁহারা অধিকতর জড়ভাবাপন্ন। "বিদুষী"-গণের সামাজিক ও সাংসারিক শিক্ষার, শিষ্টাচার, সৌজন্য ও লৌকিক আচার ব্যবহারে অনেক ত্রুটী দেখিয়াছি। সে সকলের হেতু অনুসন্ধান করিয়াছি. আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, অনুকরণ, অভিমান, বিলাসিতা ও জড়তা ভিন্ন অন্য কোনও বিশেষ কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। শিক্ষিতা ভগিনীগণ ক্ষমা করিবেন, তাঁহাদিগের কাহারও নিকট হইতে উঠিয়া আসিবার সময় নিজের কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি যে, "ইহাপেক্ষা নিরক্ষরা পল্লীলক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্ত্তিটী যেন অধিকতর রমণীয়।" পল্লীবাসিনীগণের যেটুকু জানিতে পারিয়াছি, সৎশিক্ষার দ্বারা তাহা মার্জ্জিত হইলে, তাঁহারাই একদিন সমাজের বিশেষ মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ ভাব অনেক সময় মনে উদয় হইয়াছে। সে যাহা হউক, স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাবে রমণীগণ সন্তানের শারীরিক, মানসিক প্রয়োজন বুঝিবেন; স্বামীর সংসারের উপকার বুঝিবেন; আশ্রিত, অনুগত এবং আত্মীয় স্বজনের অভাব বুঝিবেন; এবং সে সকল প্রচার করিবেন; তবে স্ত্রী-শিক্ষা কল্যাণকর হইবে। আমাদিগের দেশের রমণীগণ যেন এখনও বুঝেন নাই যে, তাঁহাদিগের উপরেই সমাজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নতি অনেক অংশে নির্ভর করিতেছে; তাঁহাদিগের সন্তানগণই জাতির ও সমাজের মুখ্য অবলম্বন। হিন্দু ও মুসলমানজাতির এক একটা বিশেষত্ব আছে। তাহা হারাইলেই জাতীয় ধ্বংস আসিয়া উপস্থিত হয়। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বেষ্টনীর মধ্যে ঐ বিশেষত্বটুকু স্থির রাখা এবং সমাজকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা একই কথা। আমি নারী, আমি গর্ব্ব করিতে পারি, এই মঙ্গলময় কার্য্য আমরাই চিরদিন করিয়াছি, আজিও করিতেছি। কিন্তু বর্ত্তমানকালে এতদ্দেশীয় স্ত্রী-শিক্ষা সেই বিশেষত্বটুকু হারাইতে বসিয়াছে। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়।

কিন্তু সমাজকে শুধু স্থির রাখিলেই যথেষ্ট হইল না; ইহাকে নবজীবন দিতে হইবে। ভাব ও কর্ম্ম নবীন উৎসাহে প্রবর্ত্তিত হইবে। বাল্যকাল হইতে অনুষ্ঠিত না হইলে তাহা হয় না। আমরা নারীগণই ত বাল্যের শিক্ষক। আমাদিগের স্ত্রী-শিক্ষা বঙ্গমহিলাগণকে এই শিক্ষক পদের যোগ্য করিতেছে কি? ইহার উত্তর সকলেই জানিতেছেন।

এ সকল ত অনেক বড় কথা। দুই একটী ক্ষুদ্র কথাও এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।—এবিষয়ে গৃহিণীগণ দৃষ্টি রাখিলে বাটীর সকলেরই দৃষ্টি থাকে। তাহাও কোনও কোনও শিক্ষিতার সংসারে দেখি নাই। সোফা দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে চূণের দাগও দেখিয়াছি। এস্থলে বিলাসিতা দেখিলাম, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা দেখিলাম না। আমার একটী আত্মীয়া অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন; কিন্তু তাঁহার মধ্যে বিলাসিতার লেশমাত্রও ছিল না। তাঁহার দাস দাসীগণও পরিচ্ছন্নতার মর্ম্ম বুঝিয়াছিল। কোন কোন বাটীতে পরিচ্ছন্নতা বলিতে পুরাতন শুষ্ক গোময়ের ব্যবহার ভিন্ন আর কিছু দেখি নাই। গোময় উত্তম বস্তু, কিন্তু বহুদিনের সঞ্চিত, শুষ্ক অথবা কর্দ্দমে পরিণত, বহুবিধ পীড়ার মূলীভূত কীটাণুপূর্ণ গোময় সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। দাস দাসীগণ ঈদৃশ গোময় ব্যবহার করিতেছে, শিক্ষিতা রমণীগণ তাকাইয়া দেখিতেছেন। শিক্ষা কি এ জ্ঞানটুকুও দিতে সক্ষম হইল না? পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কল্যাণজনক ভিত্তি, অনেকেই বিস্মৃত হইয়া যান। আমাদিগের সমাজে শুচি বলিয়াও একটী গুরুতর কথা আছে। শিক্ষিতাগণের অধিকাংশস্থলেই শুচি-জ্ঞান থাকা দেখি নাই।

আমার অপর একটী আত্মীয়ার সুশিক্ষায় ও সুশাসনে বালক বালিকাগণ, দাস দাসীগণ এবং স্বয়ং কর্ত্তা মহাশয়ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে বাধ্য হন। তাঁহার বাটীর উঠান হইতে আরম্ভ করিয়া গোয়াল ঘর, ঠাকুর ঘর, রন্ধনশালা, ভাণ্ডার, শয়নগৃহ, এমন কি, পাইখানা পর্য্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গৃহ-সজ্জার সামান্য উপকরণগুলিও সুন্দর ঝক্‌ঝকে এবং সুশৃঙ্খলায় সজ্জিত। কার্য্যোপলক্ষে লোক-সমারোহ হইলেও তাঁহার বাটীতে বিশৃঙ্খলা দেখি নাই। শিশুদিগের মৃণ্ময় সন্তান-সন্ততি এবং গৃহস্থালীও পরিষ্কার ও সুরক্ষিত। গৃহিণী পরিশ্রমী, বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্না ধীরা; তাঁহার বাটীও তেমনি শান্তিময়। তাঁহার প্রফুল্লতায় বাটীস্থ সকলেই প্রফুল্ল ছিল; কাহাকেও বড় ম্রিয়মাণ থাকিতে দেখি নাই, তিনি স্বয়ং সুস্থ ছিলেন, শিশুদিগের স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মহিলা-গ্র্যাজুয়েটদিগের কয়জনের সম্বন্ধে একথা বলা যায়?

কার্য্যতৎপরতা। যে বাটীর গৃহিণী কার্য্যকুশলা, সে বাটীর প্রায় সকলেই কর্ম্মিষ্ঠ। আমি দেখিয়াছি, কর্ম্মকুশলতার গুণে সুশৃঙ্খলা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়।

কোন বস্তু বা বিষয়ের জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কাহাকেও অধিক মাত্রায় শ্রমকাতর হইতে হয় না। সুনিয়মে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন হয় বলিয়া, অবসরও যথেষ্ট থাকে, সেই অবসর সময়ে গল্পগুজব প্রফুল্লতা আসে। তাহা ব্যতীতও অবসর সময়ে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

মিষ্টান্ন, আচার, বড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া আত্মীয় বন্ধুগণের বাটীতে প্রেরিত হইলে প্রীতি বিস্তার করে। কিন্তু কর্ম্মকুশলতার প্রধান উপকারিতাই জড়ত্ব নাশ। আমি দেখিয়াছি, শিক্ষিতা গৃহিণীরা অনেকেই দাস দাসী, খান্‌সামা * সর্দ্দারবেয়ারাদিগের উপর ভাণ্ডার এবং রন্ধনগৃহের অথবা বাবুর্চ্চিখানার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। খাদ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধান নিম্নশ্রেণী লোকের উপর থাকিলে যে কিরকম উপাদেয় পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর আহার উদর গর্ত্তে প্রবেশ লাভ করে, তাহা অনেকেই জানেন। অনেক স্থানে খাদ্যদ্রব্য অনাবৃত পড়িয়া থাকিতে, কাক, ইন্দুর বিড়ালের উচ্ছিষ্টে পরিণত হইতে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দাস দাসীরা তিরস্কৃত হইবার ভয়ে এ সকল গোপন করে; তাহাতে নানাপ্রকার অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। স্ত্রী-শিক্ষা যদি এ সকল অনিষ্টের উৎপাদক অথবা পোষক হয়, তবে সে কেমন স্ত্রী-শিক্ষা? মহিলা গ্রাজুয়েটগণের খাদ্যবস্তুর রাসায়নিক উপকারিতা, শারীরিক মানসিক ক্রিয়া বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। উল, প্যাটার্ণ, কার্পেট অথবা সুতা ক্রুশকে নিন্দা করিবার সাহস আমার নাই; কিন্তু স্বামী পুত্রের অথবা নিজের কাপড়, জামা, মোজা প্রভৃতি প্রস্তুত বা মেরামত করিলে গৃহস্থালীর একটু বেশী উপকারে আসে না? ঐ সকলে উপকার হয় না, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু ঝোঁকটা যেন কিছু প্যাটার্ণ প্রভৃতির দিকেই বেশী। বাহারের সূচিশিল্প, সৌখিন প্যাটার্ণ, চকমকে লেশের চোখ-ঝলসান শোভা থাকে থাকুক, যদিও আমি তাতে একটু আপত্তি করি; কিন্তু সংসারের প্রয়োজনীয় সূচিশিল্প কি অপরাধ করিল?

মিতব্যয়িতা। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের অশীতি সংখ্যক শ্লোকে, দেখা যায়, "অর্থঘ্না" স্ত্রী বর্ত্তমানে স্বামী অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পারেন। আমি নারী, এতদূর কখনও স্বীকার করিব না; কিন্তু এ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মিতব্যয়িতা গৃহধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ সংসারেই তাহা দেখি নাই। অমিতব্যয়িতা অধিকাংশ স্থলেই ভ্রমশীলতার এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অভাব হইতে জাত হয়। গৃহিণী মিতব্যয়ী হইলে কর্ত্তাটীও মিতব্যয়ী হন। এবং অন্যান্য সকলেই এই উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী হইয়া থাকেন। আর্থিক সচ্ছলতা অনেক সদ্‌গুণের আধার; "অভাবে স্বভাব নষ্ট" এ প্রবাদটী নিরর্থক নহে। স্বামী পুত্রগণের সুখ বিধান করা যদি প্রধান নারীধর্ম্ম হয়, তবে যে আর্থিক অভাব তাঁহাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রধান শত্রু, তাহা দূর করাও নারীগণের বিশেষতঃ শিক্ষিতা নারীগণের প্রধান ধর্ম্ম, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গৃহিণীর সুশীলতা ও শিষ্টাচার। গৃহিণীর এই গুণ থাকিলে বালক বালিকাগণ এবং বাটীস্থ সকলেই শান্ত সুশীল হইয়া থাকেন। দাস দাসীগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বশীভূত থাকে। সুমিষ্ট সরল ভাষা, সরল ব্যবহার দ্বারা যেমন লোকরঞ্জন হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। লৌকিক আচার ব্যবহার শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া মহিলা-গ্রাজুয়েটগণেরও কর্ত্তব্য। সখী কুটুম্বিনী, আহূত অনাহূত অতিথি অভ্যাগত-

---

* এস্থলে বক্তাগণ প্রকৃত উচ্চারণ করিবেন।

দিগের সহিত শিষ্টাচার করা অত্যাবশ্যক। এশিক্ষা অন্তঃপুর হইতেই সমাজে বিস্তৃত হয়। আমি দেখিয়াছি, অনেক ভদ্র বাটীতেও শীলতা-বর্জ্জিত কর্কশ বাক্য বহু সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বধূগণ শাশুড়ী ননদ প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনঃপীড়াদায়ক বাক্য প্রয়োগ করেন। দাস দাসীগণ অশিষ্ট ব্যবহার করে। এসকলের মুখ্য কারণ যাহাই হউক, গৌণ কারণ যে গৃহিণী, তাহা সাহস করিয়া বলা যায়।

গৃহিণীকে গৃহ বলে। তাঁহার অভাব হইলে গৃহ শূন্য হওয়া বলে। ইহার কারণ এই যে, বাটীস্থ সকলেরই দোষ গুণের গৌণ কারণ তিনি। তিনি ভাল হলে সব ভাল, মন্দ হইলে সব মন্দ। চাবির গোছা আঁচলে বাঁধিয়াই গৃহিণীপনার শেষ পরিচয় দেওয়া হয় না।

আমি দেখিতেছি, শিক্ষিতা গৃহিণীগণের বহুবিধ কার্য্যে, আচার ব্যবহারে সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল হইয়াছে, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ হইতেছে। ইহা মারাত্মক লক্ষণ।

আমি প্রাচীনা হইতে চলিলাম। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যদি কোনও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকি, তবে তাহা এই :— কেবল পুস্তক পাঠ বা বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষার এক সামান্য অংশ মাত্র সংসারের সদ্দৃষ্টান্ত হইতে যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহা নারীগণের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়, বোধহয় পুরুষের পক্ষেও তত নহে। সমাজের স্বাস্থ্য সম্পদ, সচ্ছন্দতা, শান্তি, ধর্ম্ম ও নীতি— এসকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নারী। পান ভোজন, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি ইহলৌকিক বিষয় এবং প্রেম, করুণা, সমদর্শিতা, শ্রদ্ধা ভক্তি ও সত্য প্রভৃতি পারলৌকিক উপকরণ প্রধানতঃ নারীগণের উপর নির্ভর করে। সংসারে অন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রের অনন্ত কর্ম্ম-প্রবাহ অবিরাম গতিতে ছুটিতেছে। সে সকলের মূল গৃহেই সুরক্ষিত। সমাজ আমাদের, আমরা সমাজের; ইহাই মনে রাখিয়া শিক্ষিতা রমণীগণ যত্ন সহকারে পরবংশ গঠিত করিবেন; ইহা অপেক্ষা আর গুরুতর কর্ম্ম তাঁহাদিগের কিছুই নাই। আমরা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্ম আমাদিগের ধারক; ইহাই মনে রাখিয়া শিক্ষিতা রমণীগণ পরবংশ গঠিত করিবেন। এতদপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য তাঁহাদিগের আর নাই। আমার একটী বন্ধু একদিন বলিয়াছিলেন, মেয়ে ছেলেকে "মেয়ে ছেলে না মনে করিয়া সমাজের মূল সম্পত্তি মনে করা উচিত।" যে দিন মানব-সমাজ এই কথা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে, সেদিন মানবও কৃতার্থ হইবে, সমাজও কৃতার্থ হইবে।

শ্রীপ্রীতিবালা সরকার।

আকাশের বাস্তবিকতা।

আকাশ আছে কি না? বাস্তবিক ইহা একটা বিবাদের বিষয়। যাঁহারা আকাশ মানেন না, তাঁহাদের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের এ বিবাদ চিরন্তন। এক্ষণে দেখা যা'ক কি উপায়ে আকাশের অস্তিত্ব বা বাস্তবিকতা সিদ্ধ হইয়া—বিরোধের নিষ্পত্তি অবশ্যম্ভাবী হয়।

যদি বল,—আকাশ নিরূপ, নির্ধর্ম্ম বস্তু; নিশ্চীয়মান বস্তু নহে। পরন্তু উহা শশ-শৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র, আকাশ-কুসুম ইত্যাদিবৎ অলীক

সুতরাং উহার বাস্তবিকতা কদাচ সিদ্ধ নহে,—সর্ব্বদাই অসিদ্ধ।

ভাল কথা। তদুত্তরে বলা যায়, এই যে "অলীকত্ব" অনুমান, এটী কি পদার্থ, অগ্রে নির্ণয় করিতে হইবে;—অর্থৎ ইহা ভাবরূপ পদার্থ, কি অভাব রূপ পদার্থ—কি ভাবাভাব রূপ পদার্থ, অথবা ভাবাভাবের অতিরিক্ত, কোন কিছু পদার্থ, তাহা স্থির করিতে হইবে। এইটী স্থির হইলেই, অনুমানের বিষয়ীভূত যে আকাশ, তাহাও সহজে প্রতিপন্ন হইয়া পড়িবে।

প্রথমতঃ ধর,—ঐ "অলীকত্ব" অনুমান অভাবরূপ পদার্থ হইতে পারে না। কারণ,—কেবল অভাব কখন অনুভবে আসে না। বর্ত্তমানে যখন আকাশকে অলীক, নগণ্য পদার্থ বলিয়া প্রতীতিগোচর করা হইতেছে, তখন প্রতীতি-গোচর বস্তুকে অভাব রূপ পদার্থ বলা যায় না। অতএব ঐ অনুমান অভাবরূপ পদার্থ হইল না। দ্বিতীয়ত,—ভাবাভাব রূপ পদার্থও হইতে পারে না। কারণ,—ভাব আর অভাব একাধারে অসম্ভব;—যেমন গমন আর অবস্থিতি, আতপ আর ছায়া একাধারে কস্মিন্ কালেও সম্ভবপর নহে। অতএব ঐ অনুমান ভাবাভাব রূপ পদার্থ গণ্য হইল না। তৃতীয়ত,—ভাবাভাবের অতিরিক্ত বা অতীত কোন কিছু পদার্থও হইতে পারে না। কারণ,—ভাবাভাবের অতীত, বিদিত—অবিদিতের অতীত, সত্য মিথ্যার অতীত যে বস্তু, সেখানে মন, বাক্য, কর্ম্ম কিছুই যাইতে পারে না। তাহা বাক্য মনের অতীত বাগিন্দ্রিয়-বর্জ্জিত, ইন্দ্রিয়ের অনুপলভ্যমান। সুতরাং আলোচ্য অনুমান কদাচ সে রূপ পদার্থ হইতে পারে না। তবেই দেখা গেল, ঐ অনুমানটী অভাবরূপ পদার্থ হইল না, ভাবাভাব-রূপ পদার্থ হইল না, বর্ত্তমানে ভাবাভাবের অতিরিক্ত বা অতীত কোন কিছু পদার্থও হইল না। অতঃপর "ভাবরূপ" আর একটী মাত্র পদার্থ আছে। অতএব ঐ অনুমানটী ভাবরূপ পদার্থ না হইয়া নূতন রূপ আর কি পদার্থ হইতে পারে?

যদি বল,—ঐ অনুমানটী চতুষ্কোটী বিনির্ম্মুক্ত;—অর্থাৎ উহা ভাব পদার্থও নহে, অভাব পদার্থও নহে, ভাবাভাব পদার্থও নহে। ভাবাভাবের অতিরিক্ত কোন কিছু পদার্থও নহে। তদুত্তরে বলা যায়, এরূপ কোন পদার্থই হইতে পারে না। যদ্যপি এরূপ কোন পদার্থের বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী হয়,—তাহা হইলে জলের উপর পাষাণও ভাসে, বলা যায়। সুতরাং বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ অনুমানটী "ভাব রূপ" পদার্থ।

অনুমানটী ভাবরূপ পদার্থ গণ্য হইলে,—অর্থাৎ অনুমানের অবয়ব ভাবরূপ পদার্থ হইলে, অনুমানের বিষয়ীভূত যে আকাশ,—অর্থাৎ অবয়বের যে অবয়বী, তাহাও ভাবরূপ পদার্থ মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। কেননা অবয়বের গুণ অবয়বীতে, আর অবয়বীর গুণ অবয়বে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন লাল সূতায় নির্ম্মিত কাপড় লালবর্ণ,—কাল লোমে নির্ম্মিত কম্বল কালবর্ণ,—অর্থাৎ সূতার গুণ (অবয়বের গুণ) কাপড়ে (অবয়বীতে) কাপড়ের গুণ (অবয়বীর গুণ) সূতায় (অবয়বে);—লোমের গুণ কম্বলে, আর কম্বলের গুণ লোমে ইত্যাদি। তবেই দেখা গেল, আকাশকে শশশৃঙ্গ ইত্যাদির ন্যায় অলীক সাব্যস্ত করিলেও ঐ "অলীকত্ব" অনুমান বিচার দ্বারা ভাবরূপ পদার্থ গণ্য

হইয়া,—অনুমানের বিষয়ীভূত আকাশকেও ভাবরূপে প্রতিপন্ন করায়। সুতরাং এমতেও আকাশের অস্তিত্ব বা বাস্তবিকতা সিদ্ধ হইয়া পড়ে; অবস্তু কদাচ হয় না।

পক্ষান্তরে যদ্যপি স্বীকার করা যায় যে,—আকাশ অভাব রূপ পদার্থ,—অবস্তু বিশেষ; তাহা হইলে দেখিতে হইবে, ঐ অভাব পদার্থটী আবার কিরূপ? অভাব সাধারণতঃ দ্বিবিধ,—যথা সংসর্গাভাব ও ইতরেতরা বা অন্যোন্যা ভাব। সংসর্গাভাব আবার ত্রিবিধ, যথা,—প্রাগ্‌ভাব, প্রধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। তবেই দাঁড়াইল যে, অভাব চারি প্রকার, যথা,—(১) প্রাগ্‌ভাব, (২) প্রধ্বংসাভাব, (৩) অত্যন্তাভাব, (৪) ইতরেতরা বা অন্যোন্যা ভাব। এক্ষণে দেখা যা'ক্‌, আলোচ্য আকাশটী এই চতুর্ব্বিধ অভাবের মধ্যে কোন্‌ অভাবের অন্তর্ভূত।

প্রথম প্রাগ্‌ভাব। অনিত্য ও অনাদিতম যে অভাব, তাহার নাম প্রাগ্‌ভাব, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন যে অভাব, উৎপন্ন হইলে যাহা থাকে না, তাহার নাম প্রাগ্‌ভাব। যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাকে প্রাগভাব প্রতিযোগী বলা যায়;—অর্থাৎ যাহার অভাব, সেই বস্তুই অভাবের প্রতিযোগী। পৃথিব্যাদি ভূত পদার্থ সমূহ এখন বর্ত্তমান আছে, সকলেই দেখিতেছে। পৃথিবী, জল, অগ্নি ইত্যাদি পদার্থ জানি না, এ কথা কেহ বলে না। অতএব বর্ত্তমান সমস্ত জগতের লোক, —আকাশে ঘুড়ি উড়িতেছে,—এরোপ্লেন, মনোপ্লেন, জেপোলিন উড়িতেছে,—কাক, চিল, বক, পাখী উড়িতেছে, ইত্যাদিতে যাহার প্রতীতি রক্ষা করিতেছে; সেই আকাশ পৃথিব্যাদি ভূত পদার্থের প্রাগ্‌ভাব নহে। কারণ,—প্রতীতি-গোচর বস্তুকে অভাব পদার্থ বলা যায় না। পরন্তু সে বস্তু প্রাগভাব প্রতিযোগীও হয় না। অতএব বর্ত্তমান প্রতীতিগোচর আকাশ পৃথিবী ইত্যাদির প্রাগ্‌ভাব নহে।

দ্বিতীয় প্রধ্বংসাভাব। উৎপত্তিমান বস্তুর বিনাশের পর যে অভাব, তাহার নাম প্রধ্বংসাভাব। বর্ত্তমানে পৃথিব্যাদি পদার্থ সকল উত্তম আকার লইয়া—"অর্থাৎ সশরীরে" বর্ত্তমান। অতএব বর্ত্তমান প্রতীতিগোচর আকাশ পৃথিবী ইত্যাদির ধ্বংসাভাব নহে।

তৃতীয় অত্যন্তাভাব। প্রতিযোগী বস্তুর বা উৎপত্তিমান বস্তুর আশ্রয়ের যে অভাব,—অর্থাৎ যাহা সর্ব্বকালীনাভাব, তাহার নাম অত্যন্তাভাব। অভিপ্রায় এই যে, প্রাগভাব এবং প্রধ্বংসাভাব সাময়িক মাত্র। ভিন্ন বা ভেদ রূপান্তরের অভাব, প্রতিযোগী সত্ত্বেও সেই অভাব থাকে। এই সকল হইতে বিভিন্ন যে অভাব,—তাহার নাম ত্রৈকালিক অভাব। অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে যাহা ছিল না, থাকিতেও পারে না, সম্ভাবনাও নাই, এবম্বিধ যে অভাব, তাহাই ত্রৈকালিক অভাব। এই ত্রৈকালিক অভাবকেই অত্যন্তাভাব বলা যায়। বর্ত্তমান আকাশ সকলেরই প্রতীতি-গোচর হইতেছে। সুতরাং ইহাকে অত্যন্তাভাব বলা যায় না।

চতুর্থ—ইতরেতরা বা অন্যোন্যাভাব। যাহা তাদাত্ম্য-সম্পন্ন, যাহা দ্বারা তাহার প্রতিষেধ হয় তাহার নাম ইতরেতরা বা অন্যোন্যাভাব। অভিপ্রায় এই যে, ঘট পটাত্মা নহে, এই স্থলে ঘট ও পটের যে ভেদ প্রতীত হয়, ইহারই নাম ইতরেতরা বা অন্যোন্যাভাব। কিন্তু ইহা অভাব পদার্থ নহে; ভাব পদার্থ বিশেষ। মতান্তরে

আমার সখের ফটোগ্রাফে আমি নাই,—আমাতে ফটোগ্রাফ নাই, এইরূপ যে ভাব, তাহার নাম ইতরেতরা বা অন্যোন্যাভাব। আকাশ সর্ব্বব্যাপক বস্তু। ভিতর, বাহির, ঊর্দ্ধ, অধঃ, সর্ব্বত্রই আকাশ আছে ;—কেহ বলিতে পারে না যে, এখানে আকাশ আছে,—সেখানে নাই। অতএব আকাশ সকল স্থানে থাকায়, ইতরেতরা বা অন্যোন্যাভাব নহে।

অতএব দেখা গেল যে, চারি প্রকার অভাবের মধ্যে, আকাশ কোন অভাবেরই অন্তর্ভূত হইল না ; —অর্থাৎ প্রাগভাব নহে প্রধ্বংসাভাব নহে,—অত্যন্তাভাব নহে, বর্ত্তমানে ইতরেতরা বা অন্যোন্যাভাবও হইল না। এরূপাবস্থায় আকাশকে অভাবরূপ পদার্থ স্বীকার করা যায় না। পরন্তু ভাবরূপ পদার্থই গণ্য হইয়া যায়। সুতরাং বর্ত্তমান, আকাশ ভূতকালে কোথাও ছিল, আবার ভবিষ্যতে থাকাও অবশ্যম্ভাবী; হয়তঃ—অতীতের অনন্ত গর্ভে অতীতাতীতের অত্যন্ত কোন কিছুর আভাষ হইলেও হইতে পারে ; এরূপ ধারণা অসম্ভব নহে। অতএব এমতেও আকাশের অস্তিত্ব বা বাস্তবিকতা সিদ্ধ হইয়া পড়ে। অবস্তু বা অভাব পদার্থ কদাচ হয় না।

এইরূপে উভয় মতের আলোচনায় দেখা যে,—আকাশ নিশ্চীয়মান পদার্থ। উহার নিশ্চয়ত্ব অযথা নহে। কাজেই বাধ্য হইয়া আকাশকে মানিতে হয়। পরন্তু এরূপ হইলে কোন প্রকার মতভেদ বা বিরোধের আশঙ্কাও থাকে না।

যদি বল “নহি বচনস্যাতি ভারো নাম”—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বচনের অসাধ্য কিছুই নাই। বচন-বাহুল্যে সমস্তই সাধ্য হইয়া বায়। কিন্তু আকাশ যে “নির্ধর্ম্ম”—ধর্ম্মশূন্য বস্তু, প্রথমেই আপত্তি করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিচার বলে আকাশের বাস্তবিকতা প্রতিপাদিত হইলেও, আকাশ যে অভাব-ধর্ম্মিত্ব নহে,—ধর্ম্মবান্ বস্তু, তাহা কোন্ গুণের দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, দেখা উচিত। কারণ, ভাবরূপ পদার্থ—গুণহীন হয় না। ভাব ও গুণ অখণ্ডাকারে নিত্য সংশ্লিষ্ট। অতএব "ভাব পদার্থ" আকাশের অনুমাপক কেহ না থাকিলে,—তাহার অস্তিত্ব বা বাস্তবিকতা—বাস্তবিকই অটুট হয় না।

ভাল কথা। মহর্ষি সাংখ্যকার মানুষের প্রবেশ-নির্গম, এদিক ওদিক গমনাগমন ইত্যাদিতে “অবকাশ বা আকাশ” দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার সারভাব এইরূপ যথা—

বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীরের ব্যবধান থাকিলে বা কোন এক খানা ঘর “‘অন্ধকূপ হত্যার মত” একবারে রুদ্ধ হইলে, তাহা ভেদ করিয়া কাহার প্রবেশ নির্গম বা ভিতর-বাহির করা চলে না ;—বাহিরের বাতাসও খেলে না। কিন্তু প্রাচীরের ব্যবধান না থাকিলে বা ঘরের একদিকের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িলে, অনায়াসে সকলেই তাহা দ্বারা প্রবেশ-নির্গম, ভিতর বাহির ইত্যাদি করিতে পারে ; বাহিরের বাতাসও পাওয়া যায়। অতএব আমাদের ভিতর-বাহির বা প্রবেশ-নির্গমের এই যে অনুমান, ইহার প্রকাশক হইতেছে প্রাচীর বা দেওয়াল। কিন্তু এই প্রাচীর বা দেওয়াল না থাকিলে যে “অবকাশ বা আকাশ” থাকে (চলিত কথায় যাহাকে ফাক বলে) তাহাতেও আমাদের প্রবেশ-নির্গম বা কোনটা ভিতর, কোনটা বাহির নির্ণয়ের কোনরূপ ব্যাঘাত

ঘটে না। এখানে প্রাচীর নাই,—অথচ ভিতর-বাহির নির্ণয় হইতেছে এই জন্য অবকাশ বা আকাশকে (চলিত কথায় ফাক-কে)—এখানের ভিতর-বাহির বা প্রবেশ নির্গম অনুমানের প্রকাশক বলা যায়। সুতরাং প্রবেশ নির্গমাদি দেখিয়া অনুমান প্রকাশের যে কর্ত্তা, "অবকাশ বা আকাশ" তাহার অস্তিত্ব বা বাস্তবিকতা স্বীকার করিতে হয়,—অর্থাৎ কর্ত্তার ক্রিয়া প্রবেশ-নির্গম ইত্যাদি। অতএব প্রবেশ নির্গমাদি আকাশের অনুমাপক।

কিন্তু ইহাতে দুইটী আপত্তি হইতে পারে। প্রথম আকাশকে প্রবেশ নির্গমাদির নিমিত্ত কারণ হইতে হয়। দ্বিতীয় অবকাশ ও আকাশ এক বস্তু হইয়া পড়ে। আকাশ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই আছে। শ্রুতি,—ব্রহ্ম বস্তুকে সর্ব্বগতং বর্ণনা করিয়া, অনেক স্থলেই "বলিয়াছেন"—"ব্যাপকমাকাশবৎ" —অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক বস্তু। এই শ্রুতির প্রমাণেও আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব ধর্ম্ম বজায় থাকে। অতএব প্রাচীর-ঘেরা বেড়া বাড়ীর মধ্যে বা ঘরের ভিতরে আকাশ আছে, স্বীকার করিতে হয়। আকাশ যদ্যপি প্রবেশ নির্গমাদির নিমিত্ত কারণ হয়, তবে আমাকে ঘরের ভিতর আবদ্ধ করতঃ তালা বদ্ধ করিলে,—ঘরের দেওয়াল থাকা সত্বেও আমার প্রবেশ-নির্গম বা ভিতর-বাহির গমনাগমন চলে নাই কেন? এখানে আর "অবরুদ্ধ" ঘরের ভিতর বা দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে আকাশ নাই বলিতে পার না। এরূপাবস্থায় বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, দেওয়াল বেগের প্রতিবন্ধক। আবার প্রতিবন্ধক বলিলে, বেগের অভাবে কর্ম্মনাশ, —অর্থাৎ প্রবেশ নির্গম অসম্ভব। অতএব আকাশ থাকিলেই প্রবেশ-নির্গমাদি কর্ম্ম হইবে, বলা যায় না। সুতরাং আকাশকে প্রবেশ-নির্গম, ভিতর-বাহির ইত্যাদির নিমিত্ত কারণ স্বীকার করা যায় না।

পক্ষান্তরে প্রবেশ-নির্গমাদি কর্ম্ম এক এক দ্রব্যে অবস্থিত;—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভিতরে আসে, সেই বাহিরে যায়,—যেমন আমি ভিতরে আসি, আবার আমিই বাহিরে যাই। অতএব প্রবেশ-নির্গমাদি কর্ম্ম 'আমি' এক ব্যক্তিতেই থাকে। আমার এই কর্ম্মের সহিত আকাশের "ব্যাপ্তি-নির্ব্বাহক" কোন সম্বন্ধ নাই। অতএব প্রবেশ-নির্গম কর্ম্ম যাহাতে থাকে, তাহাই ঐ সকল কর্ম্মের সমবায়ী কারণ। আকাশ কর্ম্মের সমবায়ী কারণ নহে। আবার অসমবায়ী কারণও হইতে পারে না। কারণ, সমবায় সম্বন্ধ সাহায্যে একাশ্রয়ে যে বস্তু অবস্থিত, সে যদ্যপি কারণ হয়, তবেই তাহাকে সেই কার্য্যের অসমবায়ী কারণ বলা যায়। যেমন কাল লোমের রূপ,—কাল কম্বলরূপের অসমবায়ী কারণ;—আর কম্বলরূপের সমবায়ী কারণ হইতেছে,—কম্বল। যেহেতু কাল কম্বলের কালরূপ এবং কাললোমের কালরূপ,—উভয়ে সমবায় সম্বন্ধ সাহায্যে "একাশ্রয়" লোমে অবস্থিত। কিন্তু আকাশ সেরূপ নহে। কারণ, আকাশ দ্রব্যাশ্রয়ী নহে,—অর্থাৎ অদ্রব্যত্বেন। অতএব আকাশ কর্ম্মের বা প্রবেশ-নির্গমের অসমবায়ী কারণ হইতে পারে না। তবেই দেখা গেল, আকাশ নিমিত্ত কারণ হইল না, সমবায়ী কারণ নহে, আবার বর্ত্তমানে অসমবায়ী কারণও হইল না। অতএব আকাশ থাকিলেই প্রবেশ-নির্গম হইবে, ভিতর-

বাহির করা চলিবে, এই বাক্যের প্রতীতি ভঙ্গদোষ অবশ্যম্ভাবী হয়। এরূপাবস্থায় প্রবেশ-নির্গম প্রভৃতি. আকাশের প্রমাণসিদ্ধ অনুমাপক, বলা যায় না। এরূপ হইলে অবকাশ ও আকাশ এক বস্তু হইতে পারে না। অতএব আকাশের বাস্তবিকতা প্রতিপাদন করিতে হইলে, অতঃপর অকাট্য যুক্তির আশ্রয় লইতে হইবে। যথা –

শব্দ আকাশের অনুমাপক। অন্যথায় দেখিতে হইবে. শব্দ কোথায় থাকিতে পারে। শব্দ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের গুণ নহে। যেহেতু পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুতে যে যে বিশেষ গুণ আছে, তাহা তদীয় সমবায়ি-কারণের গুণ হইতে সম্ভূত। যেমন শাদা কাপড়ের শাদারূপ, শাদা সূতা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু শব্দ তদ্রূপ নহে;—অর্থাৎ কোন অবয়ব অবয়বীতে নাই। যেমন ঢাকের শব্দ ঢাকের অবয়বে নাই,—তানপুরার শব্দ তানপুরার অবয়বে নাই। অতএব শব্দ পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ের গুণ নহে।

শব্দ, কাল বা দিকের গুণ বলা যায় না। যেহেতু কাল ও দিকের গুণ প্রত্যক্ষগম্য নহে। শব্দ,—আমার গুণ নহে; যেহেতু আমার গুণ হইলে যেমন আমি সুখী,– আমি দুঃখী ইত্যাদি অনুভব হয়,—তদ্রূপ "আমি শব্দবান" এইরূপ অনুভব হইত। শব্দ,—মনের গুণ নহে; যেহেতু মনের গুণ প্রত্যক্ষ হয় না। তবেই দেখা গেল, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, কাল, দিক, আমি ও মন, এই আটটী স্থান শব্দের নহে। ইহা ছাড়া মাত্র আকাশ নামক আর একটী পদার্থ আছে। অতএব শব্দ আকাশের গুণ না হইয়া আর কোন্ পদার্থের গুণ হইবে? শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, উপলভ্যমান বস্তু; অভাবাদি স্বরূপ নহে। সুতরাং এই শব্দ কোন না কোন স্থানে আছে নিশ্চয় করিতে হয়। কিন্তু সেই স্থানটী কোথায়? বিচার দ্বারা দেখা গেল, সে স্থান "আকাশ"। অতএব আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধি শব্দ হইতেই হইয়া থাকে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং শব্দ আকাশের প্রমাণ-সিদ্ধ অনুমাপক।

অতএব পূর্ব্বাপর আলোচনা দ্বারা দেখা গেল যে, বিচার ও যুক্তি অনুকূল তর্কের সহিত সম্মিলিত হইলে, তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম প্রামাণ্য-নিশ্চয় সার্থক করে। বর্ত্তমানে "আকাশের বাস্তবিকতা নির্ণয়োপলক্ষে" তাহাই হইল; অর্থাৎ প্রথমাবধি বিচার ও যুক্তি একার্থ প্রতিপাদন করতঃ আকাশের অস্তিত্ব বা বাস্তবিকতা সমর্থন করিল। সুতরাং আকাশ আছে কিনা—নির্ণয়োপলক্ষে আর বিরোধের আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী নহে। আকাশ বাস্তবিকই বস্তু বিশেষ; অবস্তু বা অভাবাদি স্বরূপ কদাচ নহে। উল্লিখিত বিচারই তাহার প্রামাণ্য-নিশ্চয় সার্থক করিবার মূলীভূত কারণ। অতএব বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, আকাশ "প্রমিত" বস্তু বিশেষ বা শব্দ গুণ দ্বারাই "আকাশের বাস্তবিকতা!"

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বিশ্ব-প্রেম।

আজি শান্ত শরতের প্রথম প্রভাতে
প্রভাকর ঢালিতেছে ধরণীর গায়
স্নিগ্ধ কিরণের ধারা। নিশি না পোহাতে
বিহগ মঙ্গল গান গাহিছে শাখায়।
হাসে পঞ্চভূত হের উল্লাসে মগন,
খেলিছে প্রেমের খেলা শরৎ পরশে ;—
তাণ্ডব নর্ত্তন ছাড়ি দেব প্রভঞ্জন
শ্যামল শস্তের রাশি দোলায় হরষে।
মৃদুল মধুর গাহি চলেছে তটিনী
ছাড়ি তার বরষার ভৈরব গর্জ্জন,
সোহাগে দুদিকে আজি চুমিছে মেদিনী
ভুলে গিয়ে তটধ্বংসী ক্রূর উৎপীড়ন।
ভীষণ কালাগ্নি বজ্র অশনির রোল
নাহি আর, হের আজি হাসে দিগঙ্গনা,
গগনে উঠেছে কিবা সুমধুর বোল,
গুরু গরজনে বাজে মঙ্গল বাজনা।
কুসুম পাদপগুলি এ উহার গায়
পড়িছে ঢলিয়া, হের সেফালি বকুল
প্রেম অশ্রুরূপে ঝরি পড়িছে ধরায়,
সৌরভে প্রেমিক প্রাণ করিছে আকুল।
শ্রান্ত আজি বরষার অবিশ্রান্ত ধারা,
চপলার মুহুর্মুহু ভ্রূভঙ্গি কুটিল,
পথিক প্রান্তর মাঝে নহে দিশাহারা
আজি হ'তে, হাসে হের পঙ্কিল সলিল।
হাসে সৌধ, হাসে গৃহ, হাসে জীবগণ,
হাসে বৃক্ষ, হাসে লতা, হাসে সমীরণ,
হাসিছে নিখিল-বিশ্ব আনন্দে মগন—
থামিয়াছে প্রকৃতির সে মহা ক্রন্দন।
স্বর্গের দুয়ার খুলি তরুণ তপন
আসিয়াছে হাতে লয়ে অমৃতের থালা,
পুলকে ধরিত্রী দেহে করে বরিষণ
চমকিয়া ঊর্দ্ধপানে চাহে বিশ্ববালা।
মুছিয়াছে বিরহিণী আজিকে নয়ন,
আশায় অধর প্রান্তে মিলনের হাসি
উঠেছে ফুটিয়া, হের কি স্নিগ্ধ বরণ
লাবণ্য উঠেছে তার পত্রপুষ্পে ভাসি।
স্বর্গ, সে বিশ্বেরে চাহে করিতে আপন,
আপন প্রভাবে তাই ঢেকেছে ধরায়,
ধরা শুধু স্বর্গসনে চাহিছে মিলন—
পারে যদি সে চরণে বিকাইতে কায়।
খেলিতে প্রেমের খেলা হের দেবগণ
এ বিশ্বে স্বর্গের ছবি খুলেছে নূতন,
লভি দেবতার সেই প্রেম আকর্ষণ
স্বর্গবক্ষে মর্ত্ত্য করে আত্ম সমর্পণ।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

পুরীর সমুদ্র।

ধূ ধূ ধূ ধূ কূলে শুধু বালু রাশ রাশ
ফুলে ফুলে সিন্ধু তথা খেতেছে আছাড়,
কি আক্ষেপ কি বিক্ষেপ চূর্ণ হয়ে হাড়
ধবল ফেনায় এসে বেলায় প্রকাশ।
কিসের বিলাপ এত, কেন এ উচ্ছ্বাস ?
যত ভাবি তত দেখি শোকের কি বাড়,
তটে সারি সারি মৌন বাড়ীর পাহাড়
তোমার ও হাহাকার শোনে বার মাস।
অদূরে নিঝুম দীর্ঘ যত ঝাউবন
জর জর তব শোকে কঠে শোঁ শোঁ শ্বাস।
ফণী মনসার ঝাড়, ও ভীম মূরতি
বালু হ'তে ফণা তুলি করি দরশন
কণ্টকিত হয়ে উঠে পাইয়া তরাস !
গণিছে আকাশ একা তোমার নিয়তি।
এ পারে দাঁড়ায়ে ভাবি কোথায় ওপার ?
সীমাবদ্ধ মানবের দৃষ্টি, হে সমুদ্র,
আকাশের চেয়ে তুমি কতই না ক্ষুদ্র !
তথাপি আকাশ সনে মিশে একাকার।

দিগ্বলয়ে কি মহান্ বর্ণের সঞ্চার,
সেথায় হেরি না তব মূর্ত্তি হেন রুদ্র,
হেথা ক্ষাত্র তেজঃ স্ফীত সেথা যেন শূদ্র ;
নীলে নীলে কি মিলন অনন্ত অপার।
কি শান্ত আকাশ তল ! তুমি কি দুরন্ত,
গ্রাসিয়া ফেলিতে যেন চাও চরাচর।
কোন্ যুগে হয়ে গেছে সমুদ্র মন্থন
আজো কি তাহার বেগ হয় নাই অন্ত ?
সার রত্ন হারা হয়ে তাই রত্নাকর
মণিহারা ফণী সম কর আস্ফালন ?
কেন এত আস্ফালন তর্জ্জন গর্জ্জন
কার প্রতি সিন্ধু তুমি হইয়াছ ক্রুদ্ধ ?
অসীমে সসীম মাঝে কে করিল রুদ্ধ ?
তুলিয়া অজস্র ফণা করিছ দংশন ?
দিগ্বিজয়ী লভিলা কি কারার বন্ধন ?
চলেছে অনাদি কাল এ জীবন যুদ্ধ ?
তোমাকে নির্ব্বাণ দিতে আসেনি কি বুদ্ধ ?
জুড়াতে অহিংসা ধর্ম্মে হিংসার দহন।
নদীয়ার গোরাচাদ পতিতপাবন,
প্রেমে ডগ মগ তনু দু'নয়নে ধারা,
তোমারে সান্ত্বনা দিতে দিয়েছিলা কোল,
পুলীনে সে পূর্ণচন্দ্র করি বিলোকন।
পুত্র ভ্রমে তাঁহারে কি তুমি আত্মহারা
লইলে অতল পুরে তুলিয়া কল্লোল ?
লবণাক্ত সিন্ধু তুমি কার অশ্রুজল ?
কে কাঁদিল পাতকীরে হেরি পরিত্যক্ত ?
অথবা সলিল হয়ে বল কার রক্ত
পাপে তাপে শোকে তোলে প্রবাহ প্রবল ?
ভাবের তরঙ্গাঘাতে, হে চির চঞ্চল
হতেছে আমার চিত্ত তোমাতে আসক্ত,
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তব, তুমি কার ভক্ত ?
লভিতে ধাইছ নিত্য চতুর্ব্বর্গ ফল।
করেছে অমিয়হীন তোমারে সাগর
দেবাসুর ; সেই ক্ষোভে জরিয়া লবণে
নরের অপেয় হয়ে বহ কি জীবন ?
অমৃতের গুণে বুঝি হইয়া অমর
লভিতে শকতি নাই বাঞ্ছিত মরণে !
হৃদে বাড়বাগ্নি-মেঘে বিদ্যুৎ যেমন।
শ্বনে ভীম প্রভঞ্জন ; ভৌতিক উৎসবে
প্রমত্ত প্রচণ্ড সিন্ধু, ওঠে অট্ট হাস্য ;
গর্জ্জে বজ্র ; ক্ষিপ্রাশম্পা, কি উদ্দাম লাস্য
সবর্ষণ মন্দ্রে মেঘ, প্রলয় সম্ভবে।
উরসে নৃমুণ্ড মাল্য নাশিতে দানবে
এল কি শ্মশানকালী ? কি করাল আস্য !
শব সাধনায় হেরি দেবতা উপাস্য
লভিতে অভীষ্ট কেবা মত্ত মোর স্তবে ?
রে পিশাচ, সে দুর্দ্দিন ছিল কি এমন
যে অতীত স্মৃতি স্মরি হৃদয় বিদরে !
যাত্রীপূর্ণ পোত তোর লইল শরণ
বলি দিলি কার কাছে সে সহস্র নরে ?
যে সহস্র মর্ম্মোত্থিত আর্ত্ত নিবেদন
না আসিতে জগবন্ধু শ্রবণ গোচরে !
অথবা এ বিশ্বসৃষ্টি রহস্য অপার
কি তালে জগত চলে বুঝে কে সে ছন্দ ?
ওতপ্রোত হর্ষ শোক, কি যে ভাল মন্দ
কি বুঝিবে ক্ষুদ্রবুদ্ধি, লীলা এ স্রষ্টার।
ধ্যানস্থ হিমাদ্রি-ঋষি, শান্তি অবতার,
করুণার উৎস হৃদে, ধারা প্রেমানন্দ ;
একই স্রষ্টা উভয়ের, লয়ে হিংসাদ্বন্দ্ব
অধৈর্য্য, হৃদয়হীন দৈত্য পারাবার।
পাকায়ে উঠিছে সিন্ধু আক্রোশে ফুলিয়া,
শুষিয়া সকল বর্ণ হয় কৃষ্ণ কায় ;
অনুতাপে বর্ণরাজি ফেলি' উদ্গারিয়া,
শুভ্র ফেন স্রোতে পুনঃ লুটিছে বেলায়।
দু'দিনে মার্ত্তণ্ড উঠে দুর্দ্দিন নাশিয়া
সিন্ধুর এ চির হাহা বল কে ঘুচায় ?
এ কি আর্ত্তনাদ সিন্ধু ? তব অভ্যন্তরে
পশি যেন হানে বজ্র দেবরাজ শক্র ;
গর্ভে হিংস্র পরিজন লয়ে গ্রাহ নক্র
যুঝিছ জীবন, স্রোতে, যুগ যুগান্তরে,
দৈব ও পুরুষকারে দ্বন্দ্ব পরস্পরে
চলিয়াছে কি ভীষণ-একাহার চক্র ?

মানবের ভাগ্যগতি হয়ে আসে বক্র
বিবর্ত্তে আবর্ত্তে যথা সংসার সাগরে।
কি দীর্ঘ জীবন তব ; আমরা কি ক্ষুদ্র !
জন্ম মৃত্যু মাঝে মোরা যুঝি' কতক্ষণ ?
আত্মশোক দুঃখে ভাবি কি মোর যাতনা।
হের হের বহিতেছে কি কালসমুদ্র,
একেকটী ঢেউ তার মানব-জীবন,
উঠিছে পড়িছে নিত্য কে করে গণনা ?
তরঙ্গে তরঙ্গে যেন দানবের সেনা
উর্দ্ধে ধায় ব্যোম-পথে মহাপরাক্রান্ত ;
বাজিছে সমর-বাদ্য গর্জ্জন অশ্রান্ত,
ধরেছে উষ্ণীষ-শোভা তব শুক্ল ফেনা।
কি নিশ্চিন্ত সুরপুর-দৃক্‌পাতে আনে না,
কালান্তক অসুরের এ ক্রূর চক্রান্ত।
নিমেষে চূর্ণিত উর্ম্মি,—আত্মদ্রোহী ভ্রান্ত
মত্ত যদুকুল যথা—আর ফিরিবে না।
মানবের অভিযান ? বিজয় ভেরীর
অন্তস্তলে চেপে রাখে কি বিষাদরাশি ;
রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে যত ভক্ত বীর
রাখি স্বাধীনতা যান বীরত্ব প্রকাশি
উর্ম্মিসম লুপ্ত হয়ে ; দেশ-জননীর
বক্ষে ভাসে কি করুণ স্মৃতি অবিনাশী
বহিছ অনন্ত কাল কি সুখে বারিধি ?
আত্মসুখ-সুরা, তার, অবসাঙ্গ ধর্ম্ম,
পরদুঃখে অনুভূতি—তৃপ্ত তাহে মর্ম্ম,
স্বার্থ-বদ্ধ বারি ; নাই ত্যাগের পরিধি।
চিরস্মরণীয় তিনি যেই গুণনিধি
সর্ব্বত্যাগী হয়ে সাধে লোকহিত কর্ম্ম ;
তাঁহারে পরায় পুণ্য দিব্যোজ্জ্বল বর্ম্ম ;
মানবে অমর করে সুকৃতির বিধি।
স্থাপিয়া এ দেবপুরী হইলা অমর
রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন—তুমি তীর্থ যার বলে ;
ক'দিন এ ধরাধামে ছিলেন শঙ্কর ?
শোভে যার পুণ্যমঠ তব অঙ্কতলে ;
কাঙ্গাল নিমাই আর ? প্রেমের লহর
আসিন্ধু ভাসা'লে যার এই নীলাচলে।
অসীম নীলম্বু, তুমি কাহার মুকুর ?
বিম্বিত মহিমা কার স্বচ্ছ তব বক্ষে ?
শান্ত, ক্ষুব্ধ, তরঙ্গিত—হেরি যেন চক্ষে
সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণ বিভাসে বিস্তুর।
ব্যাপিয়া ত্রিদিব, মর্ত্ত্য, কি পাতাল পুর
বিরাজে বিরাট মূর্ত্তি—হের কি সমক্ষে ?
তুমি যে অনন্ত শয্যা ও বিশাল কক্ষে
সৃষ্টিলোপে নারায়ণ রন নিদ্রাতুর।
নিবিড় নিশীথে আজি কি গম্ভীর রব
তোল সিন্ধু, সে কি তব মহাবেদ গান ?
অথবা ব্রহ্মাণ্ড ভেদী তুলিয়া প্রণব
সাধ' কি সাগ্নিক, মহাপুরুষের ধ্যান ?
তোমার সাধনে তুষ্ট জগতবল্লভ
ও মহামন্দিরে রাজে লভি অধিষ্ঠান।

শ্রীরসময় লাহা।

অগ্নি।

(ঋগ্বেদ। ১ মণ্ডল ৬৫ সূক্ত)।

হে হিরণ্যরেতা বহ্নি, হে হব্যবাহন,
স্নিগ্ধ মধু তীব্র জ্যোতি কর বিকিরণ।
যেমন নিরাশ-প্রাণে আশা-কুহকিনী,
সিঞ্চে শান্তি, সেইরূপ তব মধুবাণী।
পৃথিবীর মত তুমি বিস্তীর্ণ ধূমল,
পর্ব্বতের মত তুমি স্থির অবিচল ;
জলের মতন তুমি জীবের জীবন.
অনন্ত সিন্ধুর মত তোমার গর্জ্জন ;
যুদ্ধ-গামী অশ্ব প্রায় গতি তব দ্রুত,
মথিয়া বিশ্বের শক্তি হও সমুত্থিত।
স্নেহশীলা ভগিনীর স্নেহের মতন,
তোমার বর্দ্ধিত স্নেহে সিন্ধু নিমগন।
সকল জঞ্জাল মুক্ত কর হুতাশন,
দাবানলে দগ্ধ হয় অরণ্য যেমন।

দরবেশ।

নদীতীরে সূর্য্যাস্তে।

পুলকি' উঠিল তনু হেরি' সন্ধ্যাকাশে
হাস্যোজ্জ্বল স্নিগ্ধ সূর্য্য ; মৌনী সন্ধ্যা আসে
লজ্জানম্র বধূ মত নামি' ধরা'পরে !
—আধ আলো আধ ছায়া ; মৃদুকলস্বরে
বিহঙ্গেরা উড়ে যায় ; সুমন্দ পবন
মাদকতা মাখি' গায় সুপ্তি নিমগন
করিয়া দিতেছে মোরে ; জল কলতান
শ্রবণে ঢালিছে মোর কি অপূর্ব্ব গান !
রক্তবর্ণ সন্ধ্যাকাশে সন্ধ্যার মাধুরী
উঠিয়াছে ফুটি' চির নবীনতা ধরি' !
সন্ধ্যার মদিরময় অলস স্বপন
বিরাজিছে চারিদিকে ; প্রশান্ত তপন
শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ মেলি' হাসির ছটায়
সজীবতা, নবীনতা দিয়াছে ফুটা'য়ে
আকাশের ভালে ; তখন ভাবিনি' মনে
আসিছে রজনী ঘোর অন্ধকার সনে !

শ্রীগণেশচন্দ্র রায়।

আগমনী।

(১)

পুরাতে ভক্তের আশ সবংশে সংহারি,
ত্রেতায় সে রক্ষোরাজে প্রবল দেবারি,
কাতরে করুণা দানি, কালাকাল নাহি মানি,
উপেক্ষি সুরথ-প্রথা শঙ্কিত সর্ব্বাণি !
উদ্বোধনে জাগিলেন হরের ঘরণী !!

(২)

বিগত জলদজাল শরৎ আইল,
আগমনী গুণগানে মেদিনী মাতিল,
তারা-পতি স্বর্ণা করি, তারা-গাঁথা হার পরি,
ঢালিল সুধার হাসি সুনীল আকাশে !
প্রবাসী স্বদেশবাসী পূজা অবকাশে !!

(৩)

উদ্ধারিতে ভবদারা ভবভীত জনে,
আগামী শারদ-শুক্ল-সপ্তমী সুক্ষণে,
ষড়ানন করী-মুখে, বাণী-রমা লয়ে সুখে,
সিংহ পৃষ্ঠে আসি দেবী দশভুজা বেশে !
উদিবেন মহামায়া ভারত প্রদেশে !!

(৪)

গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ ভ্রমের সোপান,
অন্তরে পার্ব্বতী পূজা বিশুদ্ধ বিধান,
মানস-কমল লয়ে, ভক্তির চন্দন দিয়ে,
প্রীতি-বিল্বদল তায় অর্পিবে চরণে !
ছাগরূপে রিপু বলি দিবে সুবিধানে!!!

(৫)

মহাদেবী মহোৎসবে মাতাইবে মন,
পুষ্পাঞ্জলী প্রদানিবে সহিত স্বজন,
সপ্তম্যাদি দিনত্রয়ে, পুরাণ প্রসঙ্গ লয়ে,
তৈর্য্যত্রিকে তুষিবেন গুণগ্রাহী জনে !
জননীর আগমনে উল্লাসিত মনে !!

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

যোগাসনে।

নয়ন মুদিয়া, অন্ধ সাজিয়া,
এখানে রয়েছি বসিয়া।
না পারে দংশিতে, কামনা-ভুজঙ্গ,
নয়নের পথে পশিয়া॥
শূন্য মনে রই, ছয় দস্যু এলে,
(যেন) না পায় কিছু লুঠিতে।
মৌনভাবে রই, রসনা আমার,
(যেন) পারে নিরর্থক বকিতে।
এসেছি নির্জ্জনে, ভব কোলাহল,
(যেন) না পারে শ্রবণে পশিতে।
দারা পুত্র আদি, জীবনের ব্যাধি,
(যেন) না পায় আমায় ছুঁইতে॥
করিয়াছি দেহ, সংবদ্ধ মুদ্রায়,
(যেন) আলস্যে না পড়ে এলায়ে।
রেচক পূরকে, এ পঙ্কিল চিত্ত,
লয়েছি ক্রমে শোধিয়ে॥
হয়েছে সময়, ওহে দয়াময়,
এস শূন্য হৃদি পুরে।
মিশাব আমাকে, কুম্ভকে তোমাতে,
(যেন) জন্ম, মৃত্যু, যায় দূরে॥

শ্রীশ্যামাচরণ চৌধুরী।

সঙ্কলিকা।

(৩১)

এবার বঙ্গের বড়ই দুর্দ্দিন, চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ, চতুর্দ্দিকে হাহাকার—সুখ শান্তিতে কাহারও থাকিবার উপায় নাই। কুমিল্লা, নোয়াখালী, শিলচর, বাঁকুড়া, কাঁথি, পুরী—সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠিয়াছে। এই দুর্দ্দিনের সহায় গবর্ণমেণ্ট এবং সহৃদয় নরনারীগণ। তাঁহারা কেহই নীরব ও নিশ্চেষ্ট নহেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। চতুর্দ্দিক হইতে সাহায্য বর্ষিত হইতেছে, মহানুভব ব্যক্তিগণ অক্লান্ত অন্তরে পরিশ্রম করিয়া অনাহার-ক্লিষ্টদিগের অভাব দুর করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া বড়ই আশ্বাসিত হইতেছি। বিধাতার কৃপা অজস্রধারে বর্ষিত হউক।

যতস্থলে যত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশ সুচারুরূপে হইলেই সুখের বিষয় হইবে। “অমুক ভাণ্ডারে” এত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে,—এইরূপ হিসাবে আমরা সন্তুষ্ট নহি। কিরূপে কোন স্থলে কত টাকা ব্যয় হইল, তাহার নিদর্শনপত্র সহ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব প্রদত্ত হওয়া উচিত। আমরা শুনিতেছি, কোন কোন স্থলে একাধিক বার সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে, অন্যত্র একবারও সাহায্য প্রদত্ত হয় নাই। দূরে দূরে, অতি দূরে লোক পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। সেবার বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা বহুবার সাহায্য পাইয়াছিল, কিন্তু দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা কিছুই সাহায্য পায় নাই। এবার যেন তাহা না হয়। কর্ম্মীদিগের মধ্যে দেবভাব প্রতিষ্ঠিত হউক।

(৩২)

বিগত ৭ই ভাদ্র, (১৩২২) মঙ্গলবার, পূর্ব্বাহ্ণ ৯—৭৫ মিনিটের সময়, মাহাত্মা গোলাপচন্দ্র সরকার দেহত্যাগ করিয়াছেন। দায়ভাগ মিতাক্ষরার অনুবাদক, হিন্দু আইনেন মীমাংসক, প্রতিভাশালী গোপালচন্দ্রের তিরোধানে আমরা যারপর নাই মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার অভাবে বঙ্গের বিশেষ ক্ষতি হইবে।

তিনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাসগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শম্ভুনাথ সরকার। গোপালচন্দ্র সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়া “শাস্ত্রী” উপাধি পাইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেনেট সভার সদস্য মনোনীত হন। পূর্ব্বে তিনি মেট্রোপলিটান কলেজের আইনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজের অধ্যাপক হন। তাঁহার ৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার এক পুত্র হাইকোর্টের উকীল। চিফজষ্টিস মহাত্মা জেঙ্কিস তাঁহার তিরোধানে বিশেষ শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গোলাপচন্দ্রের সহিত আমরা পরিচিত ছিলাম না। কিন্তু তাঁহার গুণগ্রামের কথা সর্ব্বদাই শুনিতাম। তাঁহার অমায়িকতায় সকলেই মুগ্ধ হইত। তিনি অনন্য-সাধারণ

প্রতিভায় আইনের জটিল প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা করিতেন। তিনি বঙ্গের অমর সন্তান। বিধাতা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

(৩৩)

মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র "সাম্যে" লিখিয়াছিলেন, "যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক। রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড়লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্য বঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন, মুনিবের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়াছিলেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র,সুতরাং সে বড়লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—সুতরাং সে ছোট লোক। অথবা রাম কোন বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি কর।"

টাকায় যে জগতের লোক বড় হয়, আজকালকার দিনে সকলেই এ কথা স্বীকার করেন। জ্ঞান, ধর্ম্ম, চরিত্র, এখন আর মানুষকে বড় করে না। ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ সর্ব্বত্র। নবোত্থিত ব্রাহ্মসমাজেও এই সমস্যার মীমাংসা হইতেছে না,—এখানেও টাকাই এখন "বড়ত্বের" তিলক ধারণ করিয়া বেড়াইতেছে। অসদুপায়ে প্রণয়িনীকে হস্তগত করিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া, নানারূপে চরিত্রহীন হইয়াও,শুধু টাকার খাতিরে কোন কোন লোক সর্ব্বজনপূজ্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। আমাদের আশা ছিল, ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ-প্রশ্নের সমস্যা ব্রাহ্মসমাজ পূরণ করিতে পারিবেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাহা পারেন নাই। চক্ষের সম্মুখে নানা দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে, টাকার খাতিরে সব গুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের এহেন দুর্দ্দশা দেখিয়া আমরা মর্ম্মে মরিয়া রহিয়াছি। বিধাতা দেশকে ও ব্রাহ্মসমাজকে দুর্নীতির হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

(৩৪)

এবার বড় দিনের সময়ে যশোহরে "সাহিত্য-সম্মিলনের" অধিবেশন হইবে। কাহার আদেশে সময় পরিবর্ত্তিত হইল, আমরা জানি না। জাতীয় মহাসম্মিলনের সময়ে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইলে অনেকের পক্ষে বিশেষ কষ্টের কারণ হইবে। সকল বিষয়ে সকলের সুবিধা অসুবিধা দেখা উদ্যোগীগণের কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? একবার ইতিহাস বিভাগের সভাপতি হইলেন বাবু নগেন্দ্র নাথ বসু, আবার শুনিতেছি, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে সভাপতি করা হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের গোঁড়ামি এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এখন এতই বিরক্তিকর হইয়া উঠিতেছে যে, সে সকল সংশোধিত না হইলে,অচিরে ইহার দুর্গতির একশেষ হইবে। যে সব কারণে ইহা অপযশের পথে চলিয়াছে, রামেন্দ্রসুন্দর, যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাত্মাগণ তাহা দেখিতেছেন না কি? কর্ত্তাভজাদের ভণ্ডামি চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছে। বন্ধু, সাবধান, সাবধান।

(৩৫)

ডাকাতি এদেশে সংক্রামক ব্যাধিতে

পরিণত হইতে চলিয়াছে; ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। দেশের এই দুর্দ্দিন যাহাতে দূর হয়, তজ্জন্য প্রতিনিয়ত বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। দেশের শিক্ষিত লোকেরা ডাকাতি করিতেছে,ইহা আর সহ্য হয় না। সকল লোকের কায়মনোবাক্যে ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিধাতা সকলের সুমতি দিন।

(৩৬)

বিগত ১৩ই ভাদ্র, বুধবার, জন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে, চাণক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনাথ-ভাণ্ডারের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নব্যভারতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। রায়সাহেব যোগেন্দ্রনাথের সুরম্য বৈঠকখানায় এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। চাণকের ধনী, মানী, জ্ঞানী, সর্ব্ব শ্রেণীর লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সর্ব্ব শ্রেণীর এরূপ উৎসাহ সর্ব্ব সময়ে দেখা যায় না। রায়সাহেবগণের একনিষ্ঠ যত্নে ও চেষ্টায় সভার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। মন্ত্রমুগ্ধবৎ সকলে স্থিরভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার কথা অবলম্বনে একটী প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা আছে বলিয়া সে সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিলাম না। বারাকপুরের কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৌরব স্মরণে সকলেই মুগ্ধ। তিনি গবর্ণমেণ্টের উপাধির যোগ্য। রায়সাহেব-যুগলের যত্ন সকলের আদর্শ। উপেন্দ্র বাবু, অমল বাবু, পণ্ডিত যদুনাথ প্রভৃতির উৎসাহ ও তদ্গত ভাব দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। বিধাতা এই ভাণ্ডারটীকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করুন এবং ইহার দ্বারা অনাথদিগের জীবন-রক্ষার কারণ হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

(৩৭)

"ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে"—এদেশের একটী প্রাচীন প্রবাদ। বর্ত্তমান সময়ে এ কথাটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। একের বিপদে অন্যের হাস্য পরিহাস সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। আবার তাঁহারাই সময়ান্তরে যখন বিপদে পড়িতেছেন, তখন আবার অন্যেরা হাসিতেছে! "প্রেসের জামিন তলব" সম্বন্ধে এ কথাটী সর্ব্বত্র প্রমাণীত হইতেছে। সমবেত-শক্তি বা জাতীয় একতা এদেশে জাগরিত থাকিলে একটা তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইত এবং হয়ত এতদিনে একটা প্রতিকার হইয়া যাইত। শুনিতেছি, আগামী কংগ্রেসের সময় এসম্বন্ধে সম্পাদকগণকে লইয়া বিশেষ আলোচনা হইবে। আমরা এ সংবাদ শুনিয়া আনন্দিত হইলাম।

(৩৮)

নববিধান সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষীর "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে একজন অপরিচিত ব্যক্তি একটী প্রতিবাদ প্রেরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম অপ্রকাশিত রাখিয়া তাহা ছাপাইতে হইবে। আমরা তাহাতে সম্মত হই নাই। নাম না দিলে অপরিচিত লোকের প্রতিবাদ ছাপাইবার নিয়ম নাই। তাঁহার প্রবন্ধ প্রত্যাহৃত হইলে অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি কুচবেহারের একজন নগণ্য ব্যক্তি। পরন্তু নববিধান সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী একজন বিশিষ্ট সম্মানী,—জ্ঞান ধর্ম্ম চরিত্রে সমুন্নত

সাহিত্যসেবী। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি এই অপ্রিয়কর কার্য্যে হাত দিয়া অনেকের অপ্রিয় হইয়া থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু সত্যপিপাসুগণ চিরদিন এহেন ব্যক্তিকে সম্মান অর্পণ করিবেন। তাঁহার অমূল্য জীবন সত্য-ঘোষণায় উৎসৃষ্ট।

(৩৯)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পার্শ্বের গলির "দেবালয়" এখন বার-ইয়ারীর আড্ডায় পরিণত হইতেছে দেখিয়া আমরা দুঃখি পূর্ব্বে সেখানে সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের বক্তৃতা হইত, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা হইত, এক সময়ে কীর্ত্তন উপলক্ষে হরিরলুটও হইয়াছিল। তৎপর কথকতা, স্বেচ্ছা কথা আরম্ভ হইয়াছিল। এতদিন পর কন্সার্ট-পার্টি ও কায়োলাতি গান আরম্ভ হইয়াছে। বাকী আছে, থিয়েটার এবং বাই-খেমটা নাচ। রাত্রির শেষে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙ্গাইয়া বীকট স্বরে গান ও শ্লোক পাঠ আমরা সহ্য করিতেছিলাম, কিন্তু ধর্ম্মশূন্য কন্সার্ট ও কায়োলাতি গান সহ্য হয় না। এ কি লীলার অভিনয়?

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

২১। পঞ্চব্যঞ্জনের আত্মকথা। রঙ্গরসপূর্ণ রচনা। শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রণীত, মূল্য ॥০। পুস্তকখানি সুন্দর কাগজে সুন্দররূপে অরুণকুমারের সাহায্যে মুদ্রিত। এই পুস্তকের কতকাংশ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতেই পাঠকগণ লেখকের অসাধারণ ভাষা-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার লিপিচাতুর্য্যের পরিচয়ে আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি। এরূপ লেখার যোগ্য ব্যক্তি শুধু শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখকের যত্ন আছে, সাহিত্য-সেবায় অনুরাগ আছে। তাঁহার সকল কামনা সফল হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা।

২২। টীয়ানাকী। উপকথা। শ্রীআশুতোষ দাশগুপ্ত মহালনবীশ প্রণীত, মূল্য ৵০। ষোড়শবর্ষীয় একটী বালকের কথা। সুলিখিত গল্প।

২৩। চাণক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনাথ-ভাণ্ডারের কার্য্যবিবরণ। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহার সভাপতি, তাহার কার্য্য যে ভালভাবে চলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। চাণকের ইহা একটী গৌরব—দরিদ্রগণের আরাম স্থান। গত বৎসর মোট আয় ৬৭০।৵৭॥, স্থিত ৩৯৩৮৵২॥. ব্যয় ২[illegible]০৵৫। সাহায্যপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ৫২। চাণকের ধনী মানী, সম্মানী অসম্মানী সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই ভাণ্ডারের পক্ষপাতী। কাহাকে ছাড়িয়া কাহার প্রশংসা অধিক করিব, বুঝি না। বারাকপুরের মুখোপাধ্যায় পরিবার ধনে মানে গৌরবান্বিত, এই ভাণ্ডারের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন। বিধাতার কৃপা অজস্র ধারে এই আশ্রমের উপর বর্ষিত হউক।

২৪। শ্রীভগবৎ-কথা। তত্ত্বনিধি ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মূল্য ॥০। ধর্ম্মবিষয়ক অপূর্ব্ব গ্রন্থ, যিনি পড়িবেন, তিনিই আনন্দিত হইবেন। গভীর চিন্তা, গভীর গবেষণা, গভীর ধৃতি একাধারে সম্মিলিত। তত্ত্বনিধি "ভক্তিনিধি" উপাধির যোগ্য ব্যক্তি।

২৫। প্রাণের কথা। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি প্রণীত, মূল্য ।৵০। ভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাস। প্রার্থনাগুলি হৃদয়স্পর্শী, এবং ভাবপূর্ণ। ভক্তিপিপাসুদিগের নিত্যসেব্য।

২৬। ওঁ পিতা নোঽসি। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি। মূল্য ॥০। ঈশ্বরের পিতৃভাব বিশেষভাবে বিবৃত। সুন্দর ভাষায় ধর্ম্মের কথা অভিব্যক্ত। সকলের পাঠের যোগ্য।

/ ২৭। স্ত্রীশিক্ষা। শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল-এম-এস প্রণীত, তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ॥০। স্ত্রীশিক্ষার যাবতীয় কথা সুন্দরভাবে, সরল ভাষায় বিবৃত। মহিলাগণের বিশেষ উপকারে আসিবে।

সমাজ-সমস্যা

বিধবার ব্রহ্মচর্য্য।

হিন্দু বিধবার নিমিত্ত আমাদের সমাজ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। কত যুগযুগান্তরের ভিতর দিয়া কত অবস্থা রূপান্তরিত হইয়া, কখন কি প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে এই রীতি সমাজ-ভূমিতে বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে। এই রীতির ভিত্তিতে কোন্ নীতি ক্রিয়া করিতেছে, ইহা কোন্ সমাজ-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, বা ধর্ম্মতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া প্রসূত হইয়াছিল, ইহার প্রচলনে সমাজের কোনও অংশ বিশেষের স্বার্থ বা সুবিধার বিবেচনা ছিল কিনা, তাহারও বিশদ আলোচনার অবসর এখানে নাই। দেশকাল পাত্র বিচার করিয়া বর্ত্তমান সময়ে পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থাতে অমাদের দেশে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পূর্ব্বের ন্যায় কঠোর ভাবে পালন করা সম্ভব কিনা, পক্ষপাতহীন যুক্তি, অনুভূতি, সমবেদনা ও স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে, নিজের শক্তি ও দুর্ব্বলতার তুলনায় তাহা যথাসাধ্য বিবেচনা করা যাইতেছে। সরাসরি বিচারদ্বারা এই প্রকার জটিল প্রশ্নের সমাধান করিবার দুরাশা আমরা করি না, হঠকারিতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া চিরাগত প্রথার মূলে নির্ম্মম ভাবে কুঠারাঘাত করিতেও আমরা ইচ্ছা করি না, অথবা অন্ধ সংস্কারের দাসত্ব-চিহ্ন ললাটে ধারণ করিয়া পিতৃপুরুষের সম্মানিত সমাজপ্রথা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতেও আমরা প্রয়াসী নহি। কিন্তু অন্ধসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, স্বাধীন চিন্তার প্রবাহে, যুক্তির বিচারে, ভয়ে ভয়ে প্রাণের গুপ্ত প্রদেশে সময় সময় যে শঙ্কার ছায়া পতিত হয়, যে প্রতিবাদের অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, ভাষায় তাহার মূর্ত্তি গড়িয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতেছে মাত্র। হয়ত বা পাঠকের মনেও উহা কোন সুপ্ত ভাবনা জাগাইয়া তুলিতে পারে। একমাত্র নিরপেক্ষ সাধু চিন্তার সমষ্টিই সমাজকে সংস্কৃত, বিশুদ্ধ, সুস্থ, সজীব ও সবল করিয়া তুলিতে পারে।

আমরা যখনই কোন আইন বা নিয়ম অপরের পক্ষে বিধি বলিয়া মত প্রকাশ করি, আমাদের বুঝিয়া দেখা উচিত, তুল্য কারণেও তুল্য অবস্থাতে সেই নিয়মপালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর কি না? যাহার জন্য বিধিনিষেধ ব্যবস্থা করা হইল, সেও আমাদের মত ইন্দ্রিয়, প্রবৃত্তি ও রক্ত মাংসে গঠিত শরীরধারী জীব কিনা এবং তাহার চারিদিকের জল, বাতাস, মাটী, আলো, শব্দ ও গন্ধ, শিক্ষা ও আচরণ, আহার ও বিহার, চিন্তা ও কথা, দৃষ্টান্ত ও আদর্শ সেই ব্যবস্থা পালনের পক্ষে অনুকূল কি না। দুরদৃষ্টি, সহানুভূতি ও সুবিবেচনা বাদ দিয়া যদি আমরা কোন নিয়মজারি করিতে যাই, তাহা হইলে হয় আমাদের শাসন যথেচ্ছাচার, অত্যাচারী দস্যুর শাসন, নয় ত আমাদের নিয়ম, "More honoured in the breech than the observance"—

উহা যে কেহ মানিবে না, তাহা আমরা জানিয়াই ব্যবস্থা করিতেছি।

সে কালের আদর্শ ছিল তপস্যা, সাধনা, সংযম ও ত্যাগের ভিতর দিয়া মানব জীবনের মহৎ বৃত্তি নিচয়ের বিকাশ সাধন করা। শরীরকে ক্লেশ দিয়া, প্রবৃত্তির উত্তেজনা নীরব ও নিশ্চেষ্ট করিয়া দিয়া, নির্ব্বিবাদে স্বর্গের ও ধর্ম্মাচরণের পথে অগ্রসর হওয়াই আমাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। কেবল যে ভারতবর্ষেই ঐরূপ আদর্শ ছিল, তাহা নহে, য়ুরোপে এবং এশিয়ার অন্যত্রও ঐ প্রকার আদর্শ লইয়াই সাধারণ লোকেরা জীবনের মহত্ত্ব বিচার করিত। কিন্তু এখন জগতের জীবনের উদ্দেশ্য বৃত্তিনিচয়ের, সকল শক্তির বিকাশ ও অনুশীলন – সর্ব্বতোভাবে সম্যক্ পরিস্ফুটন। তপস্যা ও সংযম যদি সেই বিকাশ ও অনুশীলনের পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আমরা জগতের মঙ্গলের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য, ভবিষ্যতে লোকোত্তর মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবের আশায়, ব্রহ্মচর্য্যের, তপস্যার ও সংযমের কঠোরতা শিথিল করিতে বাধ্য হইব। কিন্তু যদি স্বেচ্ছাচারিতা, ভোগবিলাস ও ইন্দ্রিয়-সেবা আমাদের শক্তি হরণ করে, জীবনশক্তি দুর্ব্বল করে, জাতীয় জীবনের উন্নতির মূল শিথিল করে, প্রাণপ্রবাহের নিরবচ্ছিন্ন ঊর্দ্ধগতির সম্ভাবনা কমাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সে ভোগবিলাসও আমাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ, পূর্ণ মানবের প্রকাশ, মহাজাতি গঠনের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, ভোগের ভিতরে ত্যাগ, কামনার ভিতরে সংযম, কোমলতার ভিতরে কঠোরতা আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে গৃহস্থজীবন তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। শাস্ত্রে আশ্রম চতুষ্টয়ের কথা আছে, আমরা মোটামুটি তিন ভাগেরই নাম করিলাম। প্রথমে শিক্ষা; অভ্যাসের ছাঁচে ঢালিয়া, সংযমের ইন্ধন-প্রধূমিত ব্রহ্মচর্য্যের দুঃসহ উত্তাপে দগ্ধ করিয়া জীবনের গতি ও নীতিমার্গ স্থির করিয়া দেওয়া হইত। তার পর ভোগ; সে ভোগ ত্যাগের নামান্তর মাত্র – গৃহস্থ জীবন ত্যাগ ও ভোগের ছায়াতপে অধিকতর সুন্দর, অধিকতর মনোজ্ঞ ছিল। শেষ জীবন ভোগেরও অতীত, ত্যাগেরও অতীত। তখন প্রাণে ত্যাগের স্মৃতি শক্তি ও পবিত্রতা যোগাইত, ভোগের স্মৃতি পরকালে অনন্ত-অক্ষয় ভোগের চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রাণ সরস ও মধুর করিত। তখন জগতে ভোগ বিলাসের এত উপায় ও উপাদান মানুষের জ্ঞানগোচর হয় নাই, তখন প্রকৃতিবিজ্ঞান এক বৎসরের সমগ্র বাহ্যসুখের অনুভূতি এক ঘণ্টায় মানবের আয়ত্ত করিয়া দেয় নাই। তখন শারীরিক সুখ—বিলাস-বাসনার চরিতার্থতা-মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যশালী প্রবলদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তখন হিন্দুর রাজশক্তি হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মসমাজশাসন বুঝিয়া, ইহলোকের এবং পরলোকের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন। তখন হিন্দু অতীত, মৃত, বৃদ্ধ শাস্ত্রকারের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিতেন না—যুগে যুগে নূতন নূতন ব্যবস্থাকার প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় করিয়া পরিবর্ত্তনের তালে তালে পা ফেলিয়া, পরিবর্ত্তিত শাস্ত্রের পথ দেখাইয়া দিতেন। তখন হিন্দু সমাজ প্রাচীনের গৌরব করিয়া জয়ধ্বনি করিত বটে, কিন্তু নূতনের পতাকার নিম্নে দাঁড়াইয়া বীরবিক্রমে যুঝিয়া প্রাণত্যাগ

করিত। তখন হিন্দু প্রজাশক্তিকে বিধর্ম্মী রাজশক্তির আশ্রিত ধর্ম্মপ্রচারকগণের বাক্যবাণে ও ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু তখনও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য হিন্দুর আদর্শ মাত্র ছিল—ক্বচিৎ কেহ সে আদর্শ জীবনে ধারণা বা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। যাঁহারা সমাজে নিষ্ঠা ও সদাচারের আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তাঁহারা সকলের নমস্য, বরেণ্য, ব্রাহ্মণ হইতেন। সেই হিন্দুর দেশে, হিন্দুযুগে সমাজ এক শ্রেণীর আদর্শ পরিবার শীর্ষে ধারণ করিয়া রক্ষা করিত; তাঁহাদের কর্ম্ম ছিল ধর্ম্ম, তাঁহাদের চিন্তা ছিল পরব্রহ্ম ও জনসমাজের কল্যাণ। তাঁহাদের বালকেরা ব্রহ্মচারী, তাঁহাদের যুবকেরা সংযমী ও ত্যাগী, তাঁহাদের বৃদ্ধেরা যোগী, বুদ্ধ। তাঁহাদের সংযমের আদর্শ নরপতিদিগের জীবনে সংযমের পথ দেখাইয়া দিত। তাঁহাদের প্রৌঢ়া বিধবারা কুমারী জীবনে, গৃহস্থজীবনে সংযম ও ত্যাগ শিখিয়া বৈধব্য সহজে, স্বেচ্ছায় সামান্য ভোগের আয়ত্তবস্তু হইতে দূরে সরিয়া, সাধন করিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ পতিবিরহে অধীর হইয়া স্বাভাবিকভাবে অনুমৃতা হইতেন; তাঁহাদের কেহ কেহ বিরহবেদনা অসহ্য ভাবিয়া মৃতপতির চিতানলে ঝাঁপ দিয়া নশ্বর দেহ ভস্মসাৎ করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে, তাঁহাদের ন্যায্যপ্রাপ্য ও অর্জ্জিত সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষায় বৈধব্যজীবনে অনেক অনধিকারীও তাঁহাদের কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও প্রদর্শিত পন্থা সমাজের পক্ষে শ্লাঘ্য মানিয়া শাস্ত্রে তাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবন শাস্ত্রের প্রাণ, শাস্ত্রের উক্তি ও উপদেশ তাঁহাদের পরবর্ত্তী ললনাগণের জীবন পরিচালনে বিধি। এখন সে সমাজ নাই, সে যুগধর্ম্ম নাই, সে শাস্ত্রের প্রাণ নাই, সে তপস্বিনী ব্রহ্মচারিণী নাই—আছে কেবল অন্ধ কঠোর বিধি ব্যবস্থা।

কবে কোন স্বপ্ন দেখিয়া, কোন দেবদূতের মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া শাস্ত্রকার বলিলেন, হিন্দুপত্নী মৃতভর্ত্তার চিতানলে প্রাণবিসর্জ্জন করিবে; তাহাই হিন্দু নারীজীবনের চরম আদর্শ। হিন্দু-ললনা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিল স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, প্রাণের টানে বা লোক গঞ্জনার ভয়ে, পরকালের সুখের আশায় বা ইহকালের যশের লালসায় হিন্দুরমণী পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কত লোকের প্রাণে সে দৃশ্য শেলসম বাজিল, কত লোক পাষাণ হইয়া তাহা বুক পাতিয়া সহিয়া গেল। বাদশাহ বলিলেন, কেন এই কোমল কুসুম এমন করিয়া শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে? আমি দয়াদণ্ডে তাহা রোধ করিব। কিন্তু তাঁহার হিমাচলের ন্যায় প্রতাপ উড়িয়া গেল, হিন্দু বিধবা পতঙ্গের মত আগুনে উড়িয়া পড়িতে লাগিল। রাজা বলিলেন, কেন আমার ভবিষ্যৎ প্রজামণ্ডলীর জননী এমন করিয়া সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবে? প্রজাশক্তির প্রতিনিধিরাজশক্তি উৎকৃষ্টতর, শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া তাহা অকাতরে সহিতে পারিবে না। রাজার প্রাণে ব্যথা লাগিল, নবজীবনে উদ্বুদ্ধ সুপ্তজাতির প্রতিনিধি মহাপুরুষের প্রাণ কান্দিল, সমাজ নারীহত্যাপরাধ হইতে মুক্ত হইল। আইন নারীহত্যা অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিল; কিন্তু নারীর উপর সমাজের যথেচ্ছ, অনুচিত

শাসন, অত্যাচার, অবিচার ও পীড়ন রোধ করিতে পারিল না। নারীহত্যা যদি অপরাধ, নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিধিনিষেধের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা কি সমাজের পক্ষে অপরাধ নহে? যিনি যুক্তি মানেন, যিনি বিচার মানেন, যিনি চক্ষুষ্মান্, যিনি শাস্ত্র মানেন, যাঁহার প্রাণ আছে, করুণা আছে, মমতা আছে, তিনি অযুত হস্তীর বল ধারণ করিয়া সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু সমাজের মৃতদেহে প্রেতাশ্রয় হইয়াছিল, তাঁহার অদ্ভুত শক্তিও তাহার নিকট পরাভূত হইল। কিন্তু তবুও তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না, কর্ম্ম কখনও বিফল হয় না। সমাজের অবসন্ন দেহ আবার সচেষ্ট হইতেছে, সমাজের মগ্নচৈতন্য ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে, সমাজের প্রতিবাদের ও সুবিবেচনার ধ্বনি মহাপুরুষের মুখে উচ্চারিত হইয়াছে, সমাজ তাহার নিজের মর্ম্মব্যথায় কাতর হইয়া নিজেই চঞ্চল হইয়াছে।

নারী-সমাজের কেন্দ্র, পরিবারের স্তম্ভ, গৃহের বাস্তুদেবতা, চণ্ডীমণ্ডপের প্রতিমা। সেই দেবতার প্রতি অবিচার করিয়া নির্ম্মম-কঠোর ভাবে অত্যাচার করিলে আমাদের সমাজ অভিশপ্ত হইবে—সোণার দেশ শ্মশান হইবে। ব্রহ্মচর্য্য ও বৈধব্যের ব্যবস্থাই কঠোরতা নহে, অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখাই নির্দ্দয়তা নহে, গৃহকার্য্যের সেবায় নিযুক্ত করাই অত্যাচার নহে। অবরোধের অধীনতার মধ্যেও যদি স্বাধীনতার ব্যবস্থা থাকে, গৃহকার্য্যের সেবার ভিতরেও যদি কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা থাকে, ব্রহ্মচর্য্য ও বৈধব্যের মধ্যেও যদি সমুচিত শিক্ষা, মানসিক বিকাশের ও চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষার সুযোগ থাকে, তাহা হইলে সমাজের নীতি সমালোচনা করিতে পারিলেও তাহার ব্যবহারে দোষারোপ করা যায় না।

আমাদের ব্যবহার নিষ্ঠুর, কেন না আমরা অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না। আমরা উদাসীন, আমাদের সহানুভূতি নাই, আমরা আপনাকে লইয়া এত বিব্রত যে পরের কথা ভাবিবার অবসর নাই। আমাদের মাথার ভিতর রাশি রাশি নূতন নূতন চিন্তা আসিয়া বিষম বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে, আমরা আপনাকেই সামলাইতে পারিতেছি না, পরের জন্য ভাবিবার অবসর কই? সুতরাং নয়ন থাকিতেও আমরা অন্ধ, বিচারশক্তি থাকিতেও আমরা যুক্তিহীন, দয়ামায়া থাকিতেও আমরা নির্ম্মম, নিষ্ঠুর। তাই আমরা নিজের জন্য পূর্ব্বের ব্যবস্থা সুবিধাজনকভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতেছি; কিন্তু আমাদের গৃহে আমাদেরই মত মানুষের দুর্ব্বলতা, সুখদুঃখের অনুভূতি ও বাসনা লইয়া যে আমাদের জননী, আমাদের ভগিনী ও আমাদের দুহিতা আমাদের হাসি অশ্রুর অংশী হইয়া আমাদেরই জীবনের ঢেউয়ে ধাক্কা খাইয়া শেওলার মত ভাসিয়া যাইতেছে, আমরা ভুল করিয়া তাহাদের জন্য গড়িয়া রাখিয়াছি দেবতার আসন বা কাঠের পুতুলের কলঙ্গী।

সেকালে সত্য যুগে, ত্রেতায় বা দ্বাপরে সেকালের পুরুষ ছিল, সেকালের মতন নারীও ছিল। পুরুষেরও ব্রহ্মচর্য্য-ত্যাগ-সংযম ছিল, নারীর জীবনেও উপবাসের, সংযমের, সেবার ও ত্যাগের ভিতর দিয়া শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু এখন সে

সকল ওলট পালট হইয়া গিয়াছে, আছে কেবল বৈধব্যের কঠোর ব্যবস্থার খোলস। পূর্ব্বে বালিকা ব্রত করিত, উপবাস করিত, ব্রহ্মচর্য্য করিত, সংযম ও সেবা শিক্ষা করিত। পূর্ব্বে যুবতী বধূ হইয়া শ্বশ্রূর শাসনে ও তত্ত্বাবধানে থাকিত, সংসারে সেবা শিক্ষা করিত, বিধিনিষেধ মানিয়া কালে ভদ্রে স্বামীর চরণদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিত এবং তিথি নক্ষত্র বিচার করিয়া সংযমের জীবন গঠন করিত। পূর্ব্বে বিধবার আর্থিক স্বাধীনতা না থাকিলেও যুক্ত পরিবারে জীবন বীমা করা ছিল। পরিবারে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান তিনি কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া আদায় করিয়া লইতেন; সেবার প্রতিদানে তিনি কর্ত্তৃত্ব, ক্ষমতা ও মতের স্বাধীনতা পাইতেন; ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য তাঁহাকে প্রলোভনের অগণ্য সেনার সহিত লড়াই করিতে হইত না; অবস্থা বিশেষে পুত্রহীনা বিধবা বংশ রক্ষার নিমিত্ত এবং সেবা ও শান্তির কেন্দ্র সৃষ্টি করিতে সমাজের ব্যবস্থানুসারে পত্যন্তর গ্রহণ না করিলেও পুত্রবর লাভ করিতে পারিতেন। তখন বিধবাদের প্রথম ও দ্বিতীয় জীবনে অবাধ অসংযত যথেচ্ছ ভোগ ছিল না। তখন বিধবারা কুমারীজীবনে বালকগণের সহিত অবাধ-মিলিয়া মিশিয়া রঙ্গতামাসা নাটক ও ছায়াবাজী দেখিয়া প্রাণে ভোগের বাসনা জাগাইতেন না। তখন রমণীরা বিবাহিত জীবনে সীমা লঙ্ঘন করিয়া, শাস্ত্রের বিধি নিষেধ অবজ্ঞা করিয়া, গুরুজনের শাসন-সম্মানের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া মেমসাহেবদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণে পতির সাহচর্য্য ও সহবাস ভোগ করিতে পারিতেন না। তখন বিধবার বিবাহিত জীবনে স্বাধীনতার আস্বাদ, স্বেচ্ছাচারের অধিকার, নাটক-নবেল-গল্প-উপন্যাসের আদর্শ, পতিবন্ধুদিগের আদরযত্ন ও ননদ শাশুড়ীদিগের সসম্ভ্রম ব্যবহার তাহাদের মস্তিষ্কবিকার ঘটাইত না। তখন বিধবাদের ধর্ম্মে আস্থা ছিল, পরকালে বিশ্বাস ছিল, সমাজের ভয় ছিল, পরিজনবর্গের মানমর্য্যাদার খেয়াল ছিল, সময় কাটাইবার উপায় ছিল। তখন বিধবারা 'চোখের বালী' পড়িতেন না,' কুন্দনন্দিনী' ও 'হীরার' আখ্যান পড়িবার সুযোগ পাইতেন না, মাসিকপত্রে অবৈধ প্রণয়-কাহিনী বা রচনা পাঠ করিতেন না এবং সংবাদপত্রে স্বদেশের ও বিদেশের পতিত্যাগ ও পত্নীত্যাগের মোকর্দ্দমার বিস্তৃত বিবরণে গুপ্ত প্রেমের রুচিকর রহস্য জানিতে পারিতেন না। তখন অর্দ্ধ আনার মজুরী পাইয়া ডাকদূত যক্ষের মেঘ ও দময়ন্তীর হংসের ন্যায় গুপ্তপ্রেমের বার্ত্তা বহন করিয়া প্রণয়-প্রণয়িনীর মনের মিল করিয়া দিত না। তখন সহরে ও পল্লীগ্রামে নিষ্কর্ম্মা যুবকের দল অভিভাবক ও প্রতিবেশীদিগের ভয় সত্ত্বেও ঘাটে পথে ও জানালার সম্মুখে শিস্ দিয়া গান করিয়া আঁখি ঠারিয়া মুচকি হাসিয়া ঈষৎ কাশিয়া বিধবার মন চঞ্চল করিতে সাহস করিত না। তখন অবরোধ ও অবগুণ্ঠনের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া প্রতিবেশী সুরসিক যুবক সম্প্রদায় দেবর সাজিয়া নভেল যোগাইয়া সধবা-বিধবা যুবতীর মন ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিত না। তখন পল্লীগ্রামের মাঠে মাঠে রাখাল বালকেরা গাহিত না—

'ভারত-শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবা বালা'।

তখন কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া বিদ্যালয়ের বালকেরা উৎসাহভরে আবৃত্তি করিত না --

ওরে দুরাচার, হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া সদাচার,
হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার,
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?

সুতরাং তখন বৈধব্যে ব্রহ্মচর্য্য যত সুগম, সহজ, অনায়াস-সাধ্য ছিল, এখন সেরূপ নাই।

আজকাল পিতামাতার কাছে শৈশবে ভাইবোনের মধ্যে আদরযত্নের, বেশ-ভূষার ও আহার বিহারের কোন পার্থক্য নাই। সবাই এক সঙ্গে খেলা করে, পড়া শুনা করে, বেড়ায়, নাচে, গায়। তারপর বেশী বয়সে যখন কন্যা নাটক নভেল গল্প উপন্যাস পড়িয়া, মাথায় একরাশি কল্পনা লইয়া, পথে ঘাটে বিলাতী ও দেশী মেম সাহেবদিগের ভোগ সুখের চিত্র দেখিয়া, নূতন ধরণের আশা, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া, কলেজের পাশ-দেওয়া বরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তখন তাহার জীবনে আর এক নূতন ভোগের অভিজ্ঞতা আরম্ভ হয়। প্রোষিতভর্ত্তৃকা কিশোরী-নায়িকা তখন প্রেম-লিপির মাদকতায় বিভোর হইয়া দিবা-স্বপ্নের গভীরতায় আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তাহার মিলনে ও তাহার বিরহে কত পিক, কত পাপিয়া, কত শ্যামা-তুতী-দোয়েল ঝঙ্কার দিয়া উঠে। তাহার জীবনের পরলে পরলে তখন শত শত বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস নানা রাগ রাগিণীতে পদাবলী রচনা করিতে থাকে। সে তখন রাই উন্মাদিনী—সংসারের জ্বালা, সংযম, শাসন, ব্রত ও বিধিনিষেধের ঝঞ্ঝাট তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জনক তাঁহার শেষ কপর্দ্দক ব্যয় করিয়া জামাতার পিতার মনস্তুষ্টির জন্য তাহাকে হীরামতিসোণারূপায় জড়াইয়া দেন। তত্ত্বের নিয়মে ভারে ভারে বস্ত্র মাল্য গন্ধ-দ্রব্য তাহার বিলাসের রুচিতে অরুচি জন্মাইয়া দেয়। গোপনে তাহার 'সখার' দান এসেন্স, ডিটেক্‌টিভ গল্প, লণ্ডন-রহস্য ও সুগন্ধি তৈল তাহার প্রবৃত্তিতে নূতন জোয়ার খেলাইতে থাকে। বিধবারা সংসারে খাটিয়া দেহপাত করেন, জননী ও শ্বশ্রূর আদরে তাহাকে একগাছি কুটা ভাঙ্গিয়া দুইগাছি করিতে হয় না। বিংশ শতাব্দীর শক্তি ও ভাণ্ডার শূন্য করিয়া বিলাসের বাগান সাজাইয়া তাহাতে ফুলরাণী হইয়া যুবতী যখন স্বপ্নের এবং কল্পনারও আয়ত্তের অতীত সুখ সম্ভোগে আপনহারা, তখন যদি হঠাৎ সেই বিলাসের কাচের ঘরে বজ্রাঘাত হয়, তাহা হইলে সেই চির সুখে লালিতা, বিলাতী সভ্যতার ক্রোড়ে পালিতা, নব্য-সুখতন্ত্রে শিক্ষিতা, সংযম শিক্ষাহীনা অবলা কিশোরীর ললাটে এক শতাব্দী পূর্ব্বকার বঙ্গীয় অথবা আর্য্যাবর্ত্তীয় শাস্ত্র-লিখিত সমাজবিধি ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। আলাদীনের প্রদীপের শক্তিবলে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলাসিনী ব্রহ্মচারিণীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার তাহাকে পরজন্মে স্বামীর সহবাস সুখের আশায় কঠোর তপস্যায় দৃঢ় করিয়া রাখে এবং ইহজন্মের স্মৃতি তাহার স্নায়ু, শিরা, রক্ত, মাংস, মস্তিষ্ক, মন, প্রাণ ও হৃদয় হইতে জলের দাগের মত একেবারে মুছিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যায়! সেই বালিকা তখন ভোগের আস্বাদ পাইয়াছে, বিলাসে শক্তি হারাইয়াছে, বাসনার হোমকুণ্ড জ্বালিয়া বসিয়াছে, কল্পনার ক্রীড়নক হইয়াছে, আলস্যে বিকল হইয়াছে, শিক্ষা দোষে চঞ্চল হইয়াছে, তবুও তাহাকে

আদর্শসংযম সেখাইতে হইবে, নিরামিষ ভোজন করিতে হইবে, একাহারী হইতে হইবে, সাদা থান পরিতে হইবে, আকর্ষণে ও প্রলোভনে উদাসীন হইতে হইবে, নিরম্বু একাদশী করিতে হইবে এবং অনুকল্প করিলে মহাপাতক ভাগী হইতে হইবে! তাহার প্রতি তাহার মৃতস্বামীর অনুরাগ না থাকিলেও, তাহার স্বামীর প্রতি তাহার নিজের ভক্তি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না থাকিলেও, তাহার বৈকুণ্ঠবাসী স্বামী জীবিতকালে লম্পট, সুরাপায়ী, পরদাররত, বহুপত্নীক, দুরাচার হইলেও, পরজন্মে তাহার সঙ্গসুখ লাভের আশায় তাহার বিধবাপত্নীকে আমরণ ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে! তাহা সে অবশ্যই পারিবে, কেন না শরীরের নাম মহাশয়। কিন্তু সেই বয়সে তাহার স্বামী যদি বিপত্নীক হন, তাহা হইলে—

'অভাগার ঘোড়া মরে,
ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে।'

সেত কচি দুধের ছেলে, দুঃখ তাহার গায় সহিবে কেন? তাহার মুখের দিকে তাকাইলে সকল বালিকা-সধবা-বিধবারই প্রাণ সহানুভূতিতে কান্দিয়া উঠে। বিপত্নীকের পত্নীর স্মৃতি মুছিতে না মুছিতে তাহার শূন্যহৃদয় পূর্ণ করিয়া প্রণয়গগনে নূতন চাঁদের উদয় হয়। পঞ্চাশোর্দ্ধে পুরুষ হৃদ্যা, দ্বাদশবার্ষিকী কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যাকে অযাচিত অনুচিত আদর, প্রশ্রয় ও ভোগবিলাসের আস্বাদ দিয়া, তাহার পরকাল নষ্ট করিয়া জীবনের মধ্যাহ্নে চপল যৌবনের খরস্রোতে হয়ত তাহার জন্য বৈধব্যের ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া, ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করে। প্রকৃতির প্রতিশোধে বিধবারাও ব্যবহারে ব্রহ্মচর্য্যের বিংশতিশতাব্দীয় সহজ ও সুলভ সংস্করণ আবিষ্কার করিতেছেন। বিধবা শুভকার্য্যে যাইতে পারিবে না—পরিবারের অমঙ্গল হইবে, প্রাণের দুঃখ কাহাকেও কহিতে পারিবে না, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিবে না, কোন আত্মীয় স্বজনের কাছে পত্র লিখিতে পারিবে না এবং কাহারও সহিত হাসিয়া আলাপও করিতে পারিবে না। সে কেবল পূর্ব্বে যাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিত, তাহাদেরই অবজ্ঞা-ঘৃণা-বাক্যবাণ সহিয়া, বুকে নরকাগ্নির ন্যায় লালসার আগুন পাষাণে চাপিয়া রাখিয়া, দাসীর ন্যায় খাটিয়া নীরবে শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িবে। তাহার রোগে ঔষধ নাই, ক্ষুধায় অন্ন নাই, পিপাসায় বারি নাই, শোকে সান্ত্বনা নাই, বেদনায় সহানুভূতি নাই। তাহার চতুর্দ্দিকে হাসি, রাসলীলা, বিলাতী ভোগ, অবাধ অসংযত বিলাস, গল্প, উপন্যাস, গরল, সুধা, নাচ, গান; কিন্তু সে মধ্যস্থলে ভোগের আগুনে বেষ্টিতা হইয়া অবরুদ্ধ পরিবারে দাহ্য পদার্থময়ী বর্ত্তিকার ন্যায় আত্মরক্ষা করিয়া শক্তির পরিচয় প্রদান করিবে। পুরুষ যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছে না, চারিদিক কত প্রাচীর ও পরিখায় সুদৃঢ় করিয়া সন্তানবতী প্রৌঢ়াও যাহা পারিতেছেন না, নিঃসন্তান কিশোরী-যুবতী-প্রৌঢ়া অথবা সন্তানবতী যুবতী ভোগবিলাসের স্মৃতি বক্ষে করিয়া, বিলাতী আদর্শের শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া, বিকৃত কল্পনা চিরসঙ্গিনী করিয়া, সেই অনভ্যস্ত কঠোর সংযমব্রত পালন করিতে সমাজের ন্যায় বিচারে বাধ্য। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান যুগের হিন্দুধর্ম্মে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য।

শ্রীরসিকলাল রায়।

ব্রাহ্মসমাজ-সম্বন্ধে আমার য় বিষয়।

যে বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলাম, ইহা অতি কঠিন বিষয়। ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে যাহা বলিব, তাহা কোন বিশেষ দলকে মনে করিয়া লিখিব না। ব্রাহ্মসমাজ এখন আমার নিকট এক পদার্থ, এক দল, এক সম্প্রদায়। তিন দল দেখি না। আমার নিকট এক দল। তিনটী সমাজ হইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক এক সমাজ। আমি যাঁহাকে মিডিয়ম করিয়া এ প্রবন্ধ লিখিতেছি, তিনি সাধারণ সমাজের। অথচ তিনি একজন আদিসমাজের আচার্য্য। তাঁহার যে ভাব দেখিতে পাই, তাহাতে দেখি যে, তিন সমাজই তাঁহার নিকট এক। দলাদলি তিনি ভালবাসেন না, আমিও ভালবাসি না। আমি কখনই দলাদলি ভালবাসি না। সেইজন্য এই তিন সমাজকে এক সমাজরূপে দেখিয়া, ইহার আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা লিখিব।

আমি এখন পরলোকে। আমার নাম শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার। আমি চিরদিন একজন ব্রাহ্মসমাজের সেবক। কখনই দল বিদল বুঝি নাই। সেই জন্য অনেক সময় নিজের দলে অপ্রিয় হইয়াছি। যখন সাধারণ সমাজ আমাকে বেদীর কার্য্য করিতে আহ্বান করিলেন, আমি আহ্লাদের সহিত গিয়া উহা করিয়া আসিলাম, দল বিদল বুঝিলাম না। আমি জানি, এক ব্রাহ্মসমাজ। ভিন্ন ভিন্ন ভাগ হইতে পারে, কিন্তু একই সমাজ। এক ব্রহ্ম, এক ব্রাহ্মসমাজ। দলাদলি বুঝি না।

পরলোকে আসিয়াও তাহাই দেখিতেছি। এখানে এক ব্রাহ্মসমাজ। এখানে মহর্ষি, কেশব, এক সঙ্গে উপাসনা করেন। তিন দল, এখানে এক দল। যিনি আমাদের মূলপ্রবর্ত্তক, রাজা রামমোহন রায়, তিনি সকলকে সমভাবে ভালবাসেন। তাঁহার নিকট মহর্ষি, কেশব সমান। তিন দলের লোক সমান। তিনি সাধারণ সমাজের নগেন্দ্রকে মিডিয়ম করিয়া কত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তিনি বলেন, আমার নিকট সব সমান। ব্রাহ্ম হইলেই হইল। যে ব্রাহ্ম, সে-ই আমার ভাই। রাজার উদারতা দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁহার নিকট আমি অনেক শিখিয়াছি। এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি জীবনে কখন দেখি নাই। পূর্ব্বে ভাবিতাম যে, রাজা একজন Theologian, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ। এখন দেখিতেছি, তিনি যেমন ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, সেইরূপ বিশ্বাসী ও ভক্ত। তাঁহার সঙ্গ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। নগেন্দ্রকে মিডিয়ম করিয়া তিনি যাহা লিখিতেছেন, তাহাতে দেশের বিশেষ মঙ্গল হইবে। তিনি শঙ্কর দর্শনের যে সমালোচনা করিতেছেন, তাহার সার মর্ম্ম আমাকে বলিলেন। তাহাতে বোধ হইল, ঠিক আমাদের মত। আমি ভাবিতাম, তিনি ঘোরতর অদ্বৈতবাদী। কিন্তু তাঁহার মত শুনিয়া আমি অবাক্ হইলাম। আমরা সব যে এক বিধানের অন্তর্গত, ইহাই বুঝিলাম।

আমার বর্ত্তমান বিশ্বাস এই যে, নগেন্দ্রকে লইয়া একটী নূতন বিধান হই-

তেছে। পরমেশ্বরের ইহা এক নূতন লীলা। নগেন্দ্র বলেন, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি। কিন্তু পরমেশ্বর একটা তৃণকণা দ্বারা পর্ব্বত বিচলিত করিতে পারেন। আমার দ্বারা যদি কিছু কাজ হয়. তবে তাহা ঈশ্বরেরই কাজ, আমার কাজ নহে। যীশু বলিয়াছেন, "I, of my own self can do nothing",—আমি নিজে কিছুই করিতে পারি না। নগেন্দ্রের কথায় আমার অনেক উপকার হইল। ব্রাহ্মসমাজে এখন দলাদলি যত ভাঙ্গিয়া যায়, ততই মঙ্গল।

এখন আসল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করি। ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতা। আমি এই আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করি। আমি যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করি, তখন ব্রাহ্মসমাজে কিছুই ছিল না। তখন মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের রাজা। তিনি যা করেন, তাই হয়। কেশব যোগ দিবার কিছু পরেই আমি যোগ দিয়াছিলাম। মহর্ষি তখন হিমালয় হইতে নূতন আসিয়াছেন। কেশবের সঙ্গে তাঁহার যোগে সমাজের একটা নূতন ভাব হইল। মহর্ষি হিমালয়ে নির্জ্জন সাধনে যে নূতন আধ্যাত্মিকতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই সমাজে বিতরণ করিতে লাগিলেন। আমরা কৃতার্থ হইয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি বেদী হইতে যে সকল ব্যাখ্যান দিতেন, তাহা শুনিয়া আমরা কৃতার্থ হইতাম। এক ব্যাখ্যানের ফল আমাদের জীবনে সমস্ত সপ্তাহ থাকিত। আবার নূতন ব্যাখ্যান হইয়া আমাদের জীবন পূর্ণ করিয়া দিত। ক্রমে এমন হইল যে, মহর্ষি আর বেদীর কার্য্য করিতে আপনাকে সক্ষম বোধ করিলেন না। কেশবকে আচার্য্য পদে নিযুক্ত করিলেন। কেশবের বোধ ছিল যে,তিনি এ কাজের অনুপযুক্ত। কিন্তু কি করেন, মহর্ষির অনুরোধে সম্মত হইলেন। তাহা দ্বারাও বেদীর কার্য্য সুন্দর চলিতে লাগিল। সমাজের উন্নতি অব্যাহত রহিল।

কেশবের দ্বারা বেদীর কার্য্য যেরূপ চলিতে লাগিল, তাহাতে লোকের মনের ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে লোকে মনে করিত যে, কেবল উপাসনা করিলেই হইল। কিন্তু কেশব বুঝাইয়া দিলেন যে, কেবল উপাসনা করিলেই হইবে না। যেমন উপাসনা করিতে হইবে, সেইরূপ, বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। যেমন বিশ্বাস, সেইরূপ কার্য্য না হইলে, প্রকৃত ধর্ম্মজীবন হয় না। এই উপদেশ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে নূতন। একটী নূতন ভাব সমাজে প্রবিষ্ট হইল। পূর্ব্বে লোকে জানিত যে, উপাসনা করিলেই হইল। উপাসনাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহার যে আর কিছু আছে, তাহা জানিত না। এখন কেশব একটী নূতন ভাব সমাজে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। এভাব পূর্ব্বে ছিল না। এখন কেশব যে নূতন কথা বলিলেন, তাহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। কেহ স্বপক্ষে, কেহ বিপক্ষে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, উপাসনা দ্বারা যদি জীবের পরিত্রাণ না হয়, তবে আর কিসে হইবে? উপাসনাই সার। ব্রহ্মোপাসনা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে আর কি আছে, যাহাতে জীবের পরিত্রাণ হইতে পারে? একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। দুই দল হইল। আমি অবশ্য, কেশবের দলে। ঠাকুর বাড়ীর লোকেরা, এবং আরও কেহ কেহ বিপক্ষে। নানা কথা উঠিতে

লাগিল। এই আন্দোলনের সময় শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী সমাজে যোগ দিলেন। তিনি কেশবের পক্ষে বলিতে লাগিলেন। তিনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কেশব তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তিনি কেশবের পক্ষ হওয়াতে কেশবের দলের বল বৃদ্ধি হইল। আমরা বলিতে লাগিলাম যে, যদি একরূপ বিশ্বাস এবং অন্যরূপ কার্য্য হইলে পরিত্রাণ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজে আসিবার প্রয়োজন কি, ঘরে বসিয়া উপাসনা করিলেই হয়। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিতেন যে, উপাসনার জন্যই তো ব্রাহ্মসমাজে আসি। অন্য কিছুর জন্য আসি নাই। আমরা বলিতাম যে, ঘরে ঠাকুর পূজা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলেই কি পরিত্রাণ হইবে? দিনে হিন্দুর আচার, রাত্রে কাজির বিচার, ইহাই কি প্রকৃত ব্যবস্থা? এইরূপে, দুই পক্ষে, তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। শেষে কেশবের পক্ষই জয়ী হইলেন।

মহর্ষি এখন কলিকাতা ছাড়িয়া বোলপুরে গিয়া বাস করিলেন। তাঁহার সহিত এই সব আন্দোলনের কোন সংস্রব ছিল না। তিনি তথায় ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন। এখানে কি হইতেছে, না হইতেছে, তাহার তিনি সংবাদ লইতেন না। আমি কখন কখন বোলপুরে গিয়া তাঁহাকে এই সব কথা বলিতাম। তিনি বলিতেন যে, ভাল উপাসনা হইলে, অনুষ্ঠানের দিকে সহজেই মন অগ্রসর হয়। লোকে ভাল করিয়া উপাসনা করুন, তাহা হইলে, সময়ে অনুষ্ঠান আসিবে। এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। কেননা লোকে মান্ধাতার আমল হইতে উপাসনা করিতেছে, অনুষ্ঠান তো আসিল না। তিনি বলিলেন, যথার্থ উপাসনা হইলে, আসিত। ইহা লইয়া তাঁহার সহিত তর্ক করা ভাল দেখায় না। সুতরাং আমি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম।

কলিকাতায় এইরূপ আন্দোলন চলিতে লাগিল। মফঃস্বলে ইহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। যেখানে যেখানে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, সর্ব্বত্র এই আন্দোলন উঠিল। ক্রমে একটা দেশব্যাপী আন্দোলন হইয়া উঠিল। এই আন্দোলনের ফলে ব্রাহ্মসমাজ অনেক অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু ইহার মূল কেশব। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কেশবকে অনেক সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহাদ্বারা ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ উপকৃত। গোস্বামী মহাশয় কেশবের দক্ষিণ হস্ত। কেশব বিজয় বাবুকে বড় ভাল বাসিতেন। এক দিন কেশব বলিলেন,—দেখ গোঁসাই, তোমার মত যদি আর গুটিকতক লোক পাই, তাহা হইলে, আমি ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারি। এ কথায় গোঁসাই বলিলেন, আমি অতি অসার মানুষ, আমাদ্বারা কি হইতে পারে? আপনি লোক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করুন। এ কথায় কেশব বলিলেন, লোক কি আর গাছে ফলে? এই সব লোক হইতেই লোক প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাতে গোঁসাই বলিলেন, আপনি প্রতিদিন কয়েকটী লোককে রীতিমত উপদেশ দিয়া এমন করিয়া প্রস্তুত করুন, যাহাতে তাহারা আপনার উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য করিতে পারে। এ কথায় কেশব বলিলেন, উপদেশ তো অনেক হইয়াছে। এখন কাজ চাই। তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর তাহা হইলে আমি অনেক কাজ করিতে পারি। গোঁসাই

বলিলেন, আমি যাহা পারি করিব। আপনার অনুগত হইয়া যাহা পারি করিতে চেষ্টা করিব। তখন কেশব বলিলেন, আমি এমন একজন লোক চাই যে, আমার একান্ত অনুগত হইয়া চলিবে। তখন গোঁসাই বলিলেন, আমি সব পারি, কিন্তু নিজের স্বাধীনতা ছাড়িতে পারি না। কেশব বলিলেন, আমি কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি স্বাধীন ভাবেই কার্য্য করিবে, তবে এক সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিতে হইবে। গোঁসাই এ কথায় সম্মত হইলেন। তখন কেশব বলিলেন যে, আপনি যদি আমার সকল মতে সায় দিতে না পারেন, তাহা হইলে, কি করিবেন? গোসাই বলিলেন, আমি তাহা হইলে, যত দুর সম্ভব আপনার সহিত কার্য্য করিব। আমি আমার স্বাধীনতার লাঘব করিতে পারিব না এ কথায় কেশব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তবে আমাদের মধ্যে এই নিয়ম স্থির হউক যে, আমরা যতদুর সম্ভব পরস্পরকে সাহায্য করিব। এই পর্য্যন্ত কথা হইয়া তাঁহারা আপনাদের কার্য্য স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কেশব বলিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ইহাই আমাদের প্রধান কার্য্য। এখন সমাজের প্রচারক নাই বলিলেই হয়। এ অবস্থায় আমরা দুইজন যতদুর পারি, এ ধর্ম্ম প্রচার করিব। এ কথায় গোঁসাই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন উভয়েই ভাবিতে লাগিলেন, প্রথমেই কি কার্য্য করিবেন। কেশব বলিলেন, দু জনেই যে এক কাজ করিতে হইবে, এমন নহে। আপনি নিজে স্বাধীন ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, আমিও আমার কার্য্য করিতে থাকি; সময়ে সময়ে একত্র হইয়া উভয়ের কার্য্যের সমালোচনা করিব। গোঁসাই এ কথায় সন্তুষ্ট হইলেন।

তারপর, একটি বিশেষ ঘটনায় কেশবের সহিত আদি সমাজের বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। সে ঘটনা কি সকলেই জানেন। কেশবের সহিত একদল ব্রাহ্ম, আদি সমাজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। এই সময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কলিকাতায় ছিলেন। এ বিষয়ে তিনিই প্রধান উদ্যোগী; মহর্ষির সহিত কেশবের এই কথা স্থির হইয়াছিল যে, উপবীতধারী আচার্য্য আর বেদীতে বসিবেন না। সমাজ যখন কিছু দিনের জন্য মহর্ষির বাটীতে উঠিয়া গেল, তখন মহর্ষি এ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া উক্তরূপ আচার্য্যদিগকে বেদীতে বসান। ইহাতে গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া একদল ব্রাহ্মকে সঙ্গে লইয়া কোন একটা বাসায় গিয়া উপাসনা করিলেন। এই যে আদি সমাজের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইল, আর মিলনের সম্ভাবনা রহিল না। আদি সমাজের সঙ্গে যে ছাড়াছাড়ি তাহার মূল কেশব নহে; বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়। উপবীতধারী আচার্য্যকে বেদীতে বসানই ইহার কারণ।

এই প্রকারে কিছুদিন চলিল। অন্য স্থানে আমাদের উপাসনা চলিতে লাগিল। কেশব প্রথম দিন মহর্ষির বাটীতে যে সমাজ হইয়াছিল, যাহাতে উপবীতধারী আচার্য্য বেদীতে বসিয়াছিলেন, তাহাতেই যোগ দিয়াছিলেন। তার পর দ্বিতীয় দিনে আমাদের সঙ্গে অন্য স্থানে যোগ দিলেন। তিনি যোগ দেওয়াতে আমাদের আনন্দ হইল।

কেশব মনে করিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম

প্রচারের জন্য একটা বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। তখন কিন্তু বিজয় বাবুই একমাত্র প্রচারক। ক্রমে অন্যান্য অনেকে প্রচারক হইলেন। তন্মধ্যে আমিও একজন হইলাম। কেহ কেহ এত দূর কষ্টের অবস্থায় চাকুরি ছাড়িয়া আসিলেন যে, আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ক্রমে একটা দল হইয়া উঠিল। এই দল এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় বাস্তবিক অনেক প্রচার হইয়াছিল। অনেক নূতন লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের উৎসাহ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই সময় মনে হইল যে, একটী স্বতন্ত্র সমাজ হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ হইল। নানা স্থানে চাঁদা সংগ্রহ হইতে লাগিল। ক্রমে অনেক গুলি টাকা সংগৃহীত হইল। তখন কেশব বলিলেন যে, এখন একটী স্বতন্ত্র ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে পারে। মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে ভূমি লওয়া হইল। অমৃতলাল বসু মন্দির নির্ম্মাণের ভার লইলেন। তিনি এই কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম।

এইসময় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বাগ আঁচড়ায় ছিলেন; তিনি তথা হইতে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমাদের উৎসাহের সীমা নাই। এইসময় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ দান করেন। তাহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই সকল লোক যোগ দেওয়াতে আমরা অতিশয় উৎসাহিত হইতে লাগিলাম। যে দুই জনের নাম করিলাম তাঁহারা এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা চিরজীবন স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। অনেক লোক আসিল, গেল। কিন্তু এই দুই জন চিরজীবন ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যোগ দিয়া কার্য্য করিয়াছেন।

আমার বিষয় 'ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিকতা' এখন সেই কথাই বলি। আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস যাহা লিখিলাম, ইহা যথেষ্ট নহে তবে যতদূর স্মরণ হইল লিখিলাম। এখন যাহা অবশিষ্ট আছে, লিখিব। কিন্তু একটি কথা আছে। আমার নিজের যে আধ্যাত্মিক জীবন, তাহাতে যে যে মহাপুরুষের প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবশ্য বলিব।

আমার প্রথম গুরু মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর। তিনি আমাকে ভালবাসিয়া উপদেশ দিয়া, সর্ব্বদা যত্ন করিয়া এত মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহাকে আমার জীবনের নেতা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কেশব তাঁহার নিকট যখন যাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমিও যাইতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া, আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ঠিক যেন তিনি আমার পিতা। পিতা বলিলেও হয়না। পিতার অপেক্ষাও অনেক অধিক। তিনি যখন আমাকে উপদেশ দিতেন, আমি অত্যন্ত ভক্তির সহিত তাহা শুনিতাম। এইরূপে আমার ধর্ম্মজীবন গঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে আমি দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলাম। কেশব যখন মহর্ষির নিকট প্রথম গেলেন, আমাকে বলিলেন, প্রতাপ, আমি এমন একজন সাধু পুরুষ পাইয়াছি যাহার সংসর্গে অমি পরমানন্দ লাভ করি।

আমি যখন তাহার নিকট থাকি, কি সুখে থাকি তা ঈশ্বরই জানেন। তুমি তার নিকট যাবে? আমি বলিলাম যে, তুমি যেখানে গিয়া আনন্দ পাইতেছ, আমি সেইখানে যাইব তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? আমি কেশবের সঙ্গে মহর্ষির নিকট গেলাম। মহর্ষি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, ইনি আমার ভাই। তার পর বুঝাইয়া দিলেন, বাস্তবিক সম্বন্ধটা কি? মহর্ষি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আমার পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন যে, তুমি কেশবের সঙ্গে সর্ব্বদা আমার নিকট আসিও। আমার বড় আনন্দ হইল। এমন একজন গুরু লাভ হইল, ইহাতে আমার আনন্দ ধরিল না। কেশবকে বলিলাম, কেশব, তুমি যখন আসিবে, আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিবে। কেশব সম্মত হইলেন। তার পর যত যাওয়া আসা হইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনিও আমাকে অতিশয় ভালবাসিতে লাগিলেন। আমরা দুজনেই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইলাম। আমার অপেক্ষা কেশবকে অধিক ভালবাসিতেন, তাহা আমি জানিতাম, তাহাতে আমার কোন দুঃখ হইত না। আমি জানিতাম, কেশব আমাঅপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ লোক, কেশব আমার গুরুতুল্য ব্যক্তি। সেইজন্য কেশবকে অধিক ভালবাসায় আমার কিছুমাত্র দুঃখ হইত না। ভাল বাসা স্বর্গীয় পদার্থ। মহর্ষির ভালবাসা পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। কেশবকে অধিক ভালবাসেন বলিয়া আমার কোন দুঃখ হইল না। যাহা পাইয়াছি তাহাতেই কৃতার্থ।

ব্রাহ্ম সমাজ এইরূপে চলিতে লাগিল। এরূপ সময়ে একটী বিশেষ ঘটনায় আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সে ঘটনা এই যে, একদিন কেশব বলিলেন ব্রাহ্মমতে অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক। আমরা ব্রাহ্ম; আমরা কেন পৌত্তলিক মতে অনুষ্ঠান করিব? তখন মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের সময় উপস্থিত। তখন মহর্ষি তাহার বিবাহ দিবেন বলিয়া একটী পাত্র স্থির করিয়াছেন। কেশব বলিলেন কি প্রকারে বিবাহ হইবে? মহর্ষি বলিলেন, বিবাহ আর কি প্রকারে হয়? যেমন হইয়া থাকে সেইরূপই হইবে। কেশব বলিলেন, ব্রাহ্ম হইয়া কেমন করিয়া পৌত্তলিক মতে বিবাহ দিবেন? এই কথায় মহর্ষি একটু অন্যমনস্ক হইলেন। কেশব সুবিধা পাইয়া আরও কিছু বলিলেন। তাহাতে মহর্ষি বলিলেন—দেখি, চেষ্টা করিয়া দেখি, কি হয়। এই কথা বলিয়া তিনি বিবাহের যিনি বর, তাঁহাকে ডাকাইলেন। তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বর বলিলেন, আমি কি করিব? আমার পিতার মতের উপর নির্ভর করে। তখন মহর্ষি তাঁহার পিতাকে ডাকাইয়া সকল কথা বলিলেন। তাঁহার মত হইল ইহাতে আমাদের অতিশয় আনন্দ হইল।

এখন আমরা বিবাহের সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলাম। কেশবের উৎসাহের সীমা রহিল না। মহর্ষি দেখিয়া বলিলেন, কেশব ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিলেন; তাঁহার উৎসাহ হইবে না তো কার হইবে? কেশব অত্যন্ত উৎসাহে কাজ করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। কন্যার বয়স এগার বৎসর; এই এক আপত্তি।

তাহাতে আমরা বলিলাম, যে প্রথমেই কি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়? ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। চারি দিক্ হইতে মহর্ষিকে আক্রমণ করা হইল। সোম প্রকাশ, হিন্দু পেট্রিয়ট, প্রভৃতি পত্রে মহর্ষিকে অতিশয় আক্রমণ করা হইয়াছিল। আমরা সেই সকল আক্রমণের উত্তর দিতে লাগিলাম। সোম-প্রকাশ যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সত্যেন্দ্র তাহার উত্তর দিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনগর হইতে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। এই বিবাহ সম্বন্ধে দুইটি আপত্তি ছিল। প্রথম যে ইহা আইন অনুসারে সিদ্ধ নহে। দ্বিতীয় যে, কন্যার অল্প বয়স, এগার বৎসর মাত্র। গোঁড়া হিন্দুরা প্রথম আপত্তিটি করিতেন। উন্নতিশীল দল দ্বিতীয় আপত্তি করিতেন। রামতনু বাবু ও সত্যেন্দ্র এক ভাবেই উত্তর দেন। তাঁহারা দোষ স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন যে, ক্রমে দোষ সংশোধিত হইবে। এই প্রথম অনুষ্ঠান; ক্রমে নির্দ্দোষ হইবে। রামতনু বাবু হিন্দু পেট্রিয়টে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন, "It is a move in the right direction".

তার পর দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, কেশবের পুত্রের নামকরণ। তাহাতে বিশেষ আন্দোলন হয় নাই। কিন্তু অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে কতকগুলি লোক আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। সোম-প্রকাশ তার মধ্যে প্রধান। আমি আমাদের কাগজে তাহার উত্তর দিলাম। সোম-প্রকাশের সঙ্গে খুব লড়াই চলিল। শেষে সকলেই পরাস্ত।

এখন আর একটি ঘটনা উপস্থিত হইল। কেশবের কন্যার বিবাহ। এই ঘটনা লইয়া তুমুল আন্দোলন। আমি প্রথমে এবিবাহের বিরোধী ছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, বিবাহে না গিয়া বম্বে যাইব। কেশব এই কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "পিতৃ, বড়পুঁটি রাণী হইবে, তাহাতে কি তোমার আনন্দ নাই?" এই কথা শুনিয়া আমার প্রাণটা গলিয়া গেল। আমি বলিলাম, আমি বম্বে যাইব, স্থির করিয়াছি। তাহাতে কেশব বলিলেন, আর দুদিন পরে বম্বে গেলে কি হয় না? আমি বলিলাম, এবিবাহেই যে, আমার মত নাই। কেশব কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। তাহাতে কেশব বলিলেন, কিছু দোষ আছে, আমি স্বীকার করি। কিন্তু সেই জন্য একেবারে বিবাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত মনে হয় না। এই সকল কথায় আমার মন নরম হইল। কেশবের অনুরোধে বিবাহে যাইতে স্বীকার করিলাম।

তার পর এই বিবাহ লইয়া যে তুমুল কাণ্ড হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। যাহাকে মিডিয়ম করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, তিনি একজন প্রধান। তিনি টাউন হলে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা আমি শুনিতে গিয়াছিলাম। শুনিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। সে সব কথায় আর কাজ নাই। এই কুচবিহার বিবাহের আন্দোলনের ফল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মসমাজে একটি মহা ঘটনা।

এই সাধারণ সমাজ এ দেশের জন্য কি করিয়াছেন? আমি এ সমাজের সঙ্গে মিশি নাই। সুতরাং ইহার বিষয়ে মতামত দিতে

সম্পূর্ণ অধিকারী বলিয়া মনে করি না। তবে যাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, তাহা বলিতে পারি। প্রথম, এই সমাজের সভ্যগণ অত্যন্ত কার্য্যশীল। দ্বিতীয়, ইহাদের দ্বারা এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচার হইয়াছে। যাঁহার এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী। এই দুইজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি। ইহাদের দ্বারাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু সাধারণ সমাজের এক জন প্রধান। কিন্তু আমার বোধ হয়, তাঁহার দ্বারা সমাজের বৈষয়িক দিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। সমাজের নিয়মতন্ত্র প্রণালী তাঁহার দ্বারাই সংগঠিত হইয়াছিল। নগেন্দ্র বলিতেছেন যে, পরলোকগত শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এই নিয়ম তন্ত্র প্রণালী রচনা বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

সাধারণ সমাজের আধ্যাত্মিক ভাব কত দূর উন্নত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট অজ্ঞাত। আমি সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না। নগেন্দ্র বলেন, গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা সাধারণ সমাজে ভক্তি ভাব বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয়। একটি ব্রাহ্মিকা বলিতেছেন "গোস্বামী মহাশয় না থাকিলে সমাজ শুষ্ক হইয়া যাইত। তিনি ছাড়িয়া যাওয়ার পর সেই অবস্থা হইয়াছিল। অনেকটা নগেন্দ্র ও শিবনাথ বাবু দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে। শিবনাথ বাবুর ভাব অধিক। নগেন্দ্রের বক্তৃতা শক্তি এবং ভাব ও চিন্তাশীলতা দ্বারা সমাজ বাঁচিয়া আছে।

আমি যাহা লিখিলাম, তাহার অধিকাংশ আমার নিজের কথা। কোন কোন স্থলে নগেন্দ্র যাহা বলিলেন, তাহাই লিখিয়াছি। সে জন্য তিনি দায়ী। যদিও জানি সমুদয়ের জন্যই লোকে তাঁহাকেই দায়ী করিবে। এই স্থলেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

পরলোকবাসী শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
মিডিয়ম শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

* * *

বেদান্ত-দর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দুগ্ধের যেমন স্বভাবই এইরূপ যে, উহা কোন বাহ্যসাধন বা সহায় ব্যতিরেকেও, দধির আকারে পরিণত হইয়া পড়ে; এক অদ্বিতীয় চেতন ব্রহ্মও তদ্রূপ, অপর কোন সহায়ের অপেক্ষা না করিয়াই, জগতের আকারে বিকাশিত হইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে এ কথার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ব্রহ্মে এই দুগ্ধের দৃষ্টান্তটী খাটে না। দুগ্ধ, জড় বস্তু। সুতরাং দুগ্ধ সাবয়ব। দুগ্ধের অংশ-সমষ্টি আছে। ব্রহ্ম ত নিরবয়ব। ব্রহ্মের কোন অংশ নাই, অবয়ব নাই! সুতরাং নিরবয়ব বস্তু কিরূপে জগতের আকারে পরিণত হইবে? সাবয়ব বস্তুর কতকটা অংশ একটা বিশেষ আকারে পরিণত হইলেও, উহার অপর অংশগুলি

পূর্ব্ববৎ অবিকৃত থাকে। কিন্তু নিরবয়ব চেতনের কোন অংশ বিশেষ পরিণত হইতে পারে না। কেন না উহার কোন অংশই নাই। যদি ব্রহ্মের অংশ-বিশেষ পরিণত হইতে না পারিল, তবে ত বলিতেই হইবে যে, সমগ্র ব্রহ্ম বস্তুই এই জগৎরূপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ত ব্রহ্মের আর জগদ্ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকিতেছে না। যদি ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে জগতের আকারে পরিণত হইলেন, তবে ত ব্রহ্ম নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই হারাইয়া ফেলিলেন! তবে আর,--'ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে, মনন করিতে হইবে'—এই সকল শ্রুতিবাক্যও নিষ্ফল হইয়া যায়! এই একটী গুরুতর দোষ উপস্থিত হইতেছে।

আবার যদি এই দোষের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিতে যাও, তাহা হইলেও, শ্রুতিতে ব্রহ্মের নিরবয়বতা প্রতিপাদক যে সকল বাক্য আছে, সেই বাক্যগুলি নিরর্থক হইয়া যায়। আবার ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিতে গেলে, তাঁহাকে অনিত্যও বলিতে হয়,—তাঁহার ধ্বংস আছে, নাশ আছে—ইহাও স্বীকার করিতে হয়।

তাহা হইলেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, নিরবয়ব চেতন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না।

এখন এই আশঙ্কার সমাধান আছে কিনা, আমরা তাহাই দেখিতে অগ্রসর হইব।

বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিলে, নিরবয়ব ব্রহ্মকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কোন দোষেরই সম্ভাবনা থাকে না। নিরবয়ব ব্রহ্মের সম্পূর্ণটাই যে জগতের আকারে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, শ্রুতিতে আমরা এ প্রকার সিদ্ধান্ত কোথাও দেখিতে পাই না। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে, ব্রহ্ম যে জগৎ সৃষ্টির আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই আলোচ্য জগৎ হইতে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে যেমন জগতের উৎপত্তির কথা শ্রুতিতে আছে, আবার বিকারবর্গ হইতে ব্রহ্মের পৃথক্ অবস্থিতির কথাও শ্রুতিতে আছে। কেন না, কার্য্য হইতে কারণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। 'জগৎ সৃষ্টি করিয়া, ব্রহ্ম তাহাতে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইলেন'—এই কথাটী ব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষিত করিতেছে। আবার দেখ—ব্রহ্ম অপরিমিত, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক। আর এই জগৎটা পরিমিত এবং জগৎটা ব্রহ্মের ব্যাপ্য। ব্রহ্ম এই জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান আছেন 'ব্রহ্মের একটী মাত্র পাদ এই বিশ্বাকারে বর্ত্তমান ; তাঁহার অপর তিনটী স্বতন্ত্র পাদ আছে এবং উহা অমৃত'। 'এই বিশ্ব তাঁহার মহিমা ; কিন্তু পুরুষ ইহা অপেক্ষাও মহত্তর'। এই সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের পৃথক্ সত্তা ঘোষিত করিতেছে। আবার দেখ—পরমাত্মা দ্রষ্টা ; এ জগৎ তাঁহার দৃশ্য। দৃশ্যবর্গ হইতে দ্রষ্টা অবশ্যই স্বতন্ত্র। শব্দ-স্পর্শ-সুখ-দুঃখাদি যাবতীয় বস্তুকে আত্মা অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং এ সকলই আত্মার দৃশ্য বা অনুভবের বস্তু হইতেছে। 'গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে জীব, পরমাত্ম বস্তুকে লাভ করে,—আপনার প্রকৃত স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়'। শ্রুতির এই কথাটীও যাবতীয় দৃশ্যবর্গ হইতে আত্মার স্বতন্ত্রতাই প্রমাণিত করিতেছে। আবার দেখ—বিকার মাত্রই, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা

গ্রাহ্য এবং মনের বিষয়ীভূত (Subjective)। আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের স্বভাবই এই যে, উহারা বিকারবর্গের উপরে যাইতে পারে না; উহারা বিকারবর্গকে লইয়াই খেলা করে। উহারা বিকারাতীত বস্তুর কোন সন্ধান পায় না। ব্রহ্মবস্তু—আত্মবস্তু—ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং বুদ্ধির অতীত। সুতরাং, যিনি ইন্দ্রিয়বর্গের মূলে অবস্থিত, ইন্দ্রিয়বর্গের প্রেরক, তিনি অবশ্যই স্বতন্ত্র। জগৎটা শব্দ-স্পর্শ রূপাদির আকারে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচরে উপস্থিত হইয়াছে। জগতের মূলে যাহা, তাহা ইন্দ্রিয়ের গোচরে আইসে না। অতএব, আমাদের ইন্দ্রিয় যাহা দেখাইতেছে, তদপেক্ষাও অধিক কিছু আছে—যাহাকে ইন্দ্রিয় দেখাইতে পারিতেছেনা। উহাই ব্রহ্ম। অতএব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ছাড়াও, ব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।* যাহা বিকৃত, তাহাই ইন্দ্রিয়গোচরে আসিয়াছে; কিন্তু যাহা অবিকৃত ব্রহ্ম, তাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত। আর এক কথা—আত্মা—এক, নিরবয়ব। এই এক আত্মাই,—দেশ, কাল ও কার্য্য-কারণের বৈচিত্র্য বশতঃ, বিবিধ আকারে, বিবিধ বিরুদ্ধ কার্য্যবর্গরূপে, নানাভাবে,—পরিদৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং নিরবয়ব ব্রহ্ম, জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন,—এই সিদ্ধান্তে কোনই দোষ দাঁড়াইতেছে না। ইহা শ্রুতিরই সিদ্ধান্ত। অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে, কেবল তর্কের বলে তাহা সিদ্ধ হয় না। এক্ষেত্রে শ্রুতির সিদ্ধান্তই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়।

জগতের যে আকার দৃষ্ট হয়, উহা অজ্ঞানতা দ্বারা কল্পিত। অজ্ঞানতার প্রভাব বশতঃ, আত্মাতে জগতের রূপ কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং যাহা কল্পিত আকার, তদ্দারা নিরবয়ব আত্মা প্রকৃতপক্ষে সাবয়ব হইয়া উঠে না। নাম-রূপাদি ভেদ, কেবল অবিদ্যার কল্পনা বলে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই নাম-রূপাদি ভেদ, ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত রূপে—সূক্ষ্ম ও স্থূলাকারে দ্বিবিধ। ইহা অনির্ব্বচনীয়। এই নামরূপ-ভেদকে ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভিন্নও বলা যায় না; আবার অভিন্নও বলা যায় না। ইহা দ্বারাই সংসারে যাবতীয় ব্যবহার সম্পাদিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার বিকার ও পরিণামাদি ব্যবহার ইহারই প্রভাবে কল্পিত। কিন্তু পরমার্থতঃ কোন পরিণাম বা ভেদ নাই। ব্রহ্ম পরমার্থতঃ সকল বিকারের অতীত। অবিদ্যা কল্পিত এই নামরূপ-ভেদ, কেবল শব্দের উপরে—কেবল বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সুতরাং ইহাদ্বারা ব্রহ্মের নিরবয়বতার হানি হইবে কি প্রকারে? শ্রুতিতে এই যে পরিণামবাদ দৃষ্ট হয়, পরিণাম প্রতিপাদন করাই যে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা নহে। কেন না, পরিণাম প্রতিপাদন করিয়া ফল কি? এই পরিণাম বা বিকার দ্বারা একমাত্র সর্ব্ব বিকারাতীত ব্রহ্মবস্তুকে প্রতিপাদন করাই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই কার্য্যবর্গ, পরম মূলকারণে লইয়া যাইবে। এই বিবিধ ভেদগুলি, ইহাদের মূলগত এক অভিন্ন সত্তাতে লইয়া যাইবে। পরিণামবাদের ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়। জগৎ সৃষ্টির কথা যে শ্রুতিতে রহিয়াছে,

---

* শঙ্করের এই যুক্তির সহিত Kantএর যুক্তির কেমন সুন্দর মিল আছে, পাঠক তাহা লক্ষ্য করিবেন।

তাহার উদ্দেশ্য সেই প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মবস্তুর প্রতিপাদন মাত্র। নতুবা, পরমার্থতঃ সৃষ্টি বলিয়া কোন ঘটনা নাই।

অতএব নিরবয়ব ব্রহ্মবস্তুকে জগতের স্রষ্টা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে কোনই দোষ হয় না। শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন।

সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা

প্রথমে সভ্যতা কাহাকে বলে, তাহার একটা ধারণা করা প্রয়োজন। সভ্যতার কি একটা সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব? কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি জাতীয় জীবনে—জীবনের বিস্তৃতি ও গভীরতার গুণফল লইয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে হয়। সভ্যতার মাপকাঠীও কি তাই—যেখানে জীবনের মূল্য যত অধিক, সে দেশকে কি তত সভ্য বলা যায়? তাহা হইলে জীবনের সম্প্রসারণতা, গভীরতা এবং সেই সঙ্গে জীবনের আত্ম-প্রতিষ্ঠা, এই তিনটীকেই কি সভ্যতার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যায়? সভ্যতার বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। সভ্যতার এই তিনটী লক্ষণ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য বিশদরূপে বিষয়টীর আলোচনা প্রয়োজন। প্রথম, জীবনের সম্প্রসারণ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি শারীরিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া জীবনরক্ষা যদি আমার জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমার জীবন আমাতেই নিবদ্ধ। অন্যের সহিত আমার প্রতিযোগিতা – বিরোধ—নখরদন্তী সংগ্রাম। এই জীবনসংগ্রামে অধিক শক্তিশালীর উদ্বর্ত্তন। এই জীবনসংগ্রামে অধিকতর উপযোগিতা লাভের জন্য দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু তাহাতে জীবন সম্প্রসারিত হয় না। পারিবারিক জীবনে প্রথম সম্প্রসারণ আরম্ভ হয়। নিজের জন্য শুধু নয়, কিন্তু পরিবারের জন্য ভাবিতে হইবে, কাজ করিতে হইবে। পারিবারিক জীবন রক্ষার জন্য সমাজের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ক্রমেই উচ্চতর জীবন ফুটিয়া উঠে। মানুষ সমাজের জন্য আপনাকে ও পরিবারের স্বার্থকে বিসর্জ্জন করে। ক্রমে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবন বিকাশ লাভ করে। প্রত্যেক উচ্চতর জীবন নিম্নতর জীবনের বিসর্জ্জন বা ত্যাগ হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমে পরিণত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিম্নতর জীবনকেও আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লয়; ও তাহাকে আপনার অঙ্গরূপে সংরক্ষিত করে। দ্বিতীয়,—জীবনের গভীরতাবৃদ্ধি। জীবনের সম্প্রসারণের সঙ্গে জীবন সমস্যা জটিল হইয়া উঠে—স্বার্থসমন্বয় কঠিনতর হইয়া উঠে। এই কঠিন জীবনসমস্যা জীবনকে জটিল করে; তার সমুদয় অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করে। মানুষ সমগ্র অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানকে গ্রথিত দেখে, অতীতের আলোকে সুদূর ভবিষ্যতের চিত্র কল্পনা করিয়া বর্ত্তমানকে নিয়মিত করে। উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ—সীমাপ্রান্তে অস্ফুটালোকে দেখা যায়। ক্রমে তাহা স্ফুটতর হইয়া মানুষের হৃদয় মনকে অধিকার করে ও নূতন সৌন্দর্য্যের, সঙ্গীতের, সাহিত্যের সৃষ্টি করে, নূতন সমাজ গঠন করে, ইতিহাসে নূতন অধ্যায় খুলিয়া দেয়,

নূতন জীবনের নূতন সংগ্রামের জন্য সমুদয় শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে। ইহাতে মানুষের হৃদয়ের বুদ্ধিবৃত্তি, কার্য্যকরীশক্তি সৃষ্টিশক্তি, সমুদয়ই নূতন বিকাশ লাভ করে, ইহাতে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ জটিল হয় এবং মানবপ্রকৃতি নূতন সোপানে আরোহণ করে। মানবপ্রকৃতির বিকাশ দেখিয়া সভ্যতার মূল্য নিরূপণ করা যায়। তৃতীয়—জীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠা। আমাদের সম্মুখে কোন উজ্জ্বল আদর্শ ফুটিয়া উঠে, আর যখন আমরা সেই আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাই, তখনি আমরা আত্মজ্ঞানে জাগিয়া উঠি, আমাদের নিজের পরিচয় লাভ করি, প্রাণের ভিতরে নূতন মন্ত্র, নূতন সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে শুনিতে পাই, এবং আপনার শক্তির পরিচয় লাভ করিয়া, সকল প্রতিকূলতার মধ্যে, নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। এই আদর্শকে জীবনে বরণ করিয়া লই, এই আদর্শ যে আমাদের চিরন্তন যুগ যুগান্তের তপস্যালব্ধ ধন, আমাদের শাশ্বত জীবন, আমাদের হইতেও আমাদের—আমাদের অনন্তশায়ী সুষুপ্ত আত্মার জাগরণ, আত্মার আত্মা, তখন তাহাকে চিনিয়া লই। এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করাই আত্মপ্রতিষ্ঠা। স্বার্থের তৃপ্তি, আত্মবিনাশ; আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়। মানুষ আপনার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আপনার শক্তির পরিচয় লাভ করিয়া প্রকৃতির বিরোধ ঘুচাইতে অগ্রসর হয়, এবং ইহা হইতেই বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়। মানুষ প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির ক্রীড়নক ছিল। প্রকৃতি যখন বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিত, মানব ভীতি-বিহ্বল চিত্তে তাহার ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করিত; যখন সহাস্য প্রসন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দিত, তখন সাহস ভরে, জীবনের সংগ্রামে তাহার সহায়তা ভিক্ষা করিত। প্রকৃতি আপনার নির্ম্মম নিয়মে কাহাকেও দলিত করিয়া, কাহাকেও উচ্চশিখরে উত্থিত করিয়া অনবরত নিজের গতিতে চলিয়াছে। প্রকৃতি যাহা সহজে প্রদান করে, কেবল তাহাই প্রকৃতির হাত হইতে গ্রহণ করিলে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা, সমাজ গঠন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, বিনিময় ক্রিয়া কিছুই চলেনা। প্রকৃতির অগ্নিকে ইন্ধন যোগাইয়া স্থায়ী করিয়া রন্ধন কার্য্য ও অপরাপর কার্য্য চালাইতে হয়, নদীর স্রোতের উপর কাষ্ঠখণ্ড ভাসাইয়া তাহার উপর ভর করিয়া নদীপার হওয়া চলে, ফুল আহরণ করিয়া বল্কল জড়াইয়া শোভা সম্বর্দ্ধন করা যায়, মৃত্তিকা দ্বারা মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করা যায়, পাথরকে তীক্ষ্ণ করিয়া শত্রু বিনাশ করা যায়। এরূপে প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ করিবার চেষ্টা হয়। প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ করিতে হইলে প্রকৃতির পরিচয় লাভ করা চাই। প্রকৃতির যত নিগূঢ়তত্ত্ব লাভ করা যায়, ততই প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ করা হয়, প্রকৃতির শক্তি সাহায্যে জীবন-সংগ্রামে ততই অধিকতর উপযোগিতা অর্জ্জন করা যায়। ক্রমে প্রকৃতির নিয়ম, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করা তপস্যার বিষয় হইয়া পড়িল। গ্রহের গতি, নক্ষত্রাদির স্থিতি, শরীরের নিয়ম প্রথমে প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে অধীত হয়, ক্রমে অধ্যয়ন তপস্যায় পরিণত হইল। প্রকৃতির নিগূঢ়তত্ত্ব জানিয়া তাহার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা, এবং এইরূপে প্রকৃতির বিরোধের উপর জয়

ঘোষণা করিয়া আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা সভ্যতার একটা সুমহৎ স্তর। কিন্তু আদর্শ চিরদিন সজীব থাকে না, তাহার নূতনত্ব চলিয়া যায়; উচ্চতর আদর্শের জন্য মন পূর্ব্বদিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, নূতন ঊষা, নূতন আলোকের জন্য আশানন্দে মন অপেক্ষা করিতে থাকে। নূতন আদর্শ লাভের সাধনা বৈজ্ঞানিকদের সাধনার অনুরূপ নহে। ইহাতে অন্তর্দৃষ্টি, ইহাতে ভাষার পরপারের ভাষাতীত নিস্তব্ধতা, কর্ম্মের পরপারের কর্ম্মের অতীত একটা নিশ্চেষ্টতা, একটা অনুপ্রাণনা, ইহাতে আশানন্দের উল্লাস, ইহাতে কল্পনার চরম উৎকর্ষ, ইহাতে পূর্ণতার আভাস, সৌন্দর্য্যানুভূতি—এই সকলই জাগিয়া উঠে। এই আদর্শের উচ্চতর প্রতিষ্ঠা, প্রকৃতির শক্তি সাহায্যে কোন নূতন অবস্থাসৃষ্টিতে নয়—যদিও অবস্থাসৃষ্টি অপরিহার্য্য—কিন্তু প্রকৃতির সাহায্যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে, সাহিত্যসৃষ্টিতে, চরিত্রসৃষ্টিতেও নূতন সমাজ—জীবনের অভ্যুদয়ে। এই উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শলাভ ও নূতন নূতন সৃষ্টিতে আদর্শপ্রতিষ্ঠা সভ্যতার মূল্য নিরূপণ করে।

সভ্যতার উপাদান লইয়া যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, এই সভ্যতাবিকাশে বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার স্থান কোথায়। জীবনের সম্প্রসারণতা ও গভীরতা—আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তর্ভূত। জীবনকে সম্প্রসারিত করিয়া ও ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর, জটিল হইতে জটিলতর করিয়া, জীবন উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে; এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া জীবন ক্রমে আপনাকে বহুধা বিস্তৃত ও গভীর করিয়া তুলে। ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ।

বিজ্ঞান প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বিজ্ঞান প্রকৃতি-রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার নূতন নিয়ম আবিষ্কার করে; প্রকৃতির গভীর রহস্যে প্রবেশ করিয়া, তাহার শক্তিসমূহকে মানবের নানা প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাতে মানুষ আত্মশক্তির পরিচয় লাভ করিয়াছে। এই আত্মশক্তির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান, নানা প্রকার সংস্কার বন্ধন ও বহিঃশক্তির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের প্রয়াস এবং স্বাধীনতা যে মানুষের জন্মাধিকার, এই ভাব জাগিয়া উঠে। মানুষ যখন এইরূপে বন্ধনমুক্ত হয়, তখন তার প্রাণে আদর্শ ফুটিয়া উঠে। বিজ্ঞান মানবজীবনের আদর্শ ফুটাইবার সহায়তা করে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানালোচনার প্রণালীতে আদর্শ ফুটে না। বিজ্ঞান—পর্য্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, সমীকরণ প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন অনুমিতির জন্য সমবায়-প্রাণ কল্পনার প্রয়োজন হয় সত্য; কিন্তু আদর্শ প্রকাশের জন্য এই সমবায়-প্রাণ-কল্পনার বিশেষ প্রয়োজন এবং তদ্ব্যতীত অন্তর্দৃষ্টি এবং একটা বাক্যাতীত ও কর্ম্মাতীত ভাব, সৌন্দর্য্যানুভূতি ও অনুপ্রাণনার প্রয়োজন। আদর্শ, আনন্দ হইতে উৎপন্ন এবং আনন্দেই তাহার স্থিতি—ইহা ভগবানের সৃষ্টিকলার প্রতিকৃতি।

আদর্শ—কলাবিদ্যার প্রাণ। প্রয়োজনীয় শিল্প বিজ্ঞানের সহচর ও বিজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত। বিজ্ঞানের নিয়ম প্রয়োজন সাধনে নিয়োজিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিল্পের সৃষ্টি হয়। এই প্রয়োজনীয় শিল্পেরও একটা উদ্দেশ্য আছে; উদ্দেশ্যই উহার প্রাণ; এবং

এই উদ্দেশ্য বিজ্ঞান হইতে লাভ করা হয় না—উহা জীবনের আদর্শ হইতে উদ্ভূত। কিন্তু আদর্শই কলা-বিদ্যা বা সুকুমার বিদ্যার প্রাণ। এই আদর্শ প্রস্তরে, বর্ণে, আলোক-সম্পাতে, শব্দে, ছন্দে, সঙ্গীতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে,—অমূর্ত্ত ইন্দ্রিয়াতীত 'পূর্ণতা' মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মানবপ্রাণে পূর্ণতার ছবি আঁকিয়া দেয় এবং তাহার আনন্দমূর্ত্তিতে হৃদয়কে আনন্দরসে সিক্ত করে, অমরজীবনে সঞ্জীবিত করে। এই পূর্ণতা আনন্দের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

বিজ্ঞান মানুষকে মুক্ত করিয়াছে, স্বাধীন করিয়াছে ও আদর্শ সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু আদর্শ প্রকাশের নিয়ম ও প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র, এবং এই আদর্শই নানা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া মানব-মনকে উচ্চতর জীবনে, সমাজকে উচ্চতর সোপানে উন্নীত করে। মানুষ আনন্দে আনন্দে, সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্যে, ভক্তিতে ভক্তিতে আদর্শের পর উচ্চতর আদর্শ লাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই আদর্শ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মধ্য দিয়া মানব-মনকে অধিকার করে ও আপনার ভাবে রূপান্তরিত করে। এই আদর্শ আবার মানবচরিত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আমাদের ভক্তি উদ্দীপিত করে এবং ভক্তিই আমাদিগকে ঊর্দ্ধে লইয়া যায়। এইখানে টেনিসনের সেই অমর কবিতার এই কয়েকটী কথা স্বতঃই মনে হয়।

Let Knowledge grow from more to more
But more of reverence in us dwell
That mind and soul may one music swell
But vaster than before.

জ্ঞানের মহিমা হৃদে বাড়ুক সতত,
ভক্তি যেন করে মোর প্রাণ অধিকার,
আত্মা-মন এক সুর তুলুক নিয়ত
পূর্ণতর বৃহত্তর,—জীবনে আমার।

সভ্যতা বিকাশে বিজ্ঞান ও সুকুমার বিদ্যার স্থান কোথায়? আদর্শই মানব-জীবনকে উচ্চতর করে, মানবের সমুদয় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, সকল মানবের সঙ্গে তাহাকে সর্ব্বজনীন জীবনে একীভূত করে; এই আদর্শই আত্মপ্রতিষ্ঠাকে পূর্ণতা প্রদান করে। এই আদর্শই যদি সমুদয় কলা-বিদ্যার প্রাণ হয়, এই আদর্শই যদি কাব্যে, চিত্রে সৌন্দর্য্যের আনন্দময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সকল হৃদয়কে অধিকার করে, তবে কি বলিতে পারি না, এই কলাবিদ্যাই সভ্যতার জননী ও সভ্যতার ধাত্রী? জীবনের আদর্শ, পরিবারের আদর্শ, সমাজের আদর্শ, জাতীয় আদর্শ, স্বর্গের আদর্শ, পৃথিবীর আদর্শ কবি-হৃদয়ে ঋষি-প্রাণে পরিস্ফুট হইয়া কাব্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে আনন্দের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সকল হৃদয়ে আপনার সিংহাসন স্থাপন করেন। বিজ্ঞান ও কলা-বিদ্যার মধ্যে যে নিগূঢ় সম্পর্ক,তাহা সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধের কথা মনে করাইয়া দেয়। পুরুষ প্রকৃতিতে সৃষ্টি সঞ্চারিত করে, প্রকৃতি পুরুষকে গতিশীল করে। বিজ্ঞান আদর্শ ফুটাইবার সহায়তা করে এবং প্রকৃতির রাজ্য হইতে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার উপকরণ আনিয়া দেয়। বিজ্ঞানানুশীলন কোন আদর্শমুখ হইলেই তাহা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়; আদর্শ বিজ্ঞানানুশীলনের লক্ষ্য স্থির করিয়া দেয়। বিজ্ঞানানুশীলন স্বার্থ দ্বারা কিম্বা জাতীয় স্বার্থ দ্বারাও প্রণোদিত হইতে পারে; আবার ঐ বিজ্ঞান এক সার্ব্ব-

জনীন জীবনের ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করিয়া উপহারও প্রদান করিতে পারে। এই বিজ্ঞান মানুষকে দানবও করিতে পারে, দেবতাও করিতে পারে। জীবনের আদর্শই বিজ্ঞানানুশীলনের মূল্যের মাপকাঠি। আদর্শও যদি মানবজাতিকে উন্নত করে, এবং এই আদর্শ যদি কলাবিদ্যার সৃষ্টি করে, তবে কলাবিদ্যাই মানব-প্রাণে নূতন আদর্শ জাগাইয়া তুলিয়া তাহাকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীকে বিজ্ঞানের যুগ বলা হইয়াছে। এমন দিন ছিল, যখন বড় বড় মনস্বিগণ কাব্যের মৃত্যু-সঙ্গীত গাহিয়া কাব্যকেই মুখরিত করিয়াছিলেন। কাব্যদেবীর এই অযাচিত স্তুতিগানে হয়ত তিনিই কিছু আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বিজ্ঞানের বিশ্বগ্রাসীপ্রবাহ কাব্যকে মানবহৃদয় হইতে বিদূরিত করিতে পারিল না। বরং কাব্য এই বিজ্ঞান হইতে নিজের নূতন উপকরণ লাভ করিয়া আরও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলেন। ঊনবিংশ ও বর্ত্তমান শতাব্দীর সাহিত্যে বিজ্ঞান যে কত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ অনুধাবন করিবার প্রয়োজন হইবে না।

আর, বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় মহা কুরুক্ষেত্র-সমর জেপেলিন্, এরোপ্লেন, টরপিডোর বিদ্যুত গতিতে মানুষের চমক ভাঙ্গিয়া দিয়া, হাইটজারের বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছে, বিজ্ঞান উচ্চ আদর্শের পশ্চাতে থাকিলে কত স্বর্গীয়! আর, নিম্ন আদর্শ লইয়া, কিম্বা আদর্শ-বিহীন হইয়া চলিলে উহা কত মনুষ্যঘাতী সভ্যতার মন্দির ধ্বংসকারী! বিজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণের ভিত্তির উপর কেবল বহির্জগৎব্যাপী সৌধ নির্ম্মাণ করে, তাহাতে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির স্থান কোথায় এবং এই আত্মা-বিহীন বিজ্ঞান বিশ্বে কোন আত্মার সন্ধান পায় না, দেহের ক্রিয়ার মধ্যে আত্মার সন্ধান পায় না। কাজেই বিজ্ঞান যে রাজ্য আমাদের নিকট খুলিয়া দেয়, সে রাজ্য সমুদয় লাভ করিয়া ও মানব প্রাণ গভীর অতৃপ্তির মর্ম্মভেদী সুরে বলিয়া উঠে "যদি আমি এসকল লইয়া অমর হইতে না পারি, এসকল লইয়া আমি কি করিব?" আর আত্মা-বিহীন সভ্যতা যাহা আদর্শ-বিহীন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করে, যাহা মানুষকে পশুর সহধর্ম্মী করিয়া স্বার্থ-প্রণোদিত নির্ম্মল জীবন-সংগ্রামের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে, এই অনাত্ম সভ্যতা পৃথিবীর সকল বিরোধকে তীব্রতর করিয়া তাহাকে এক প্রধূমিত শ্মশানে কিম্বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গাপেক্ষী বারুদাগারে পরিণত করিয়াছে। ভারত আবার তাহার সনাতন অমরত্বের শান্তিমন্ত্র প্রভাবে এই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাকে নবজীবনে অভিষিক্ত করুক। তখন এই কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গন হইতে এই নব-সভ্যতা প্রাচ্য প্রতীচ্যের সকল সম্পদঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া এক নূতন বাণী শুনাইবে, যাহাতে স্বার্থ পরার্থে আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, জাতীয়তা সর্ব্বজনীনতায় কৃতার্থতা লাভ করিবে, যাহা পূর্ণতর ধর্ম্মের উষালোকের আবাহনীয় সঙ্গীত গাহিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে, নূতন ঋষিবংশ, নবযুগের নূতন কালিদাস-সেক্সপিয়রকে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিবে। এই উচ্চ আদর্শ সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের সার্থকতা সম্পাদন করিবে, এবং এই বিজ্ঞান আদর্শকে সম্মুখে

রাখিয়া ভাণ্ডার হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, মানব জীবনে ও সমাজে এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায়তা করিবে।

শ্রীবেণীমাধব দাস।

-দর্শন।

এম্পিডক্লিস্

এম্পিডক্লিস্ খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে সিসিলি দ্বীপের এগ্রিজেণ্টাম্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসা দ্বারা তিনি পীড়া আরোগ্য করিতে পারিতেন এবং আপনাকে সর্ব্বদা জটীল রহস্য সমূহে ব্যাপৃত রাখিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে কখনও বা যাদুকর, কখনও বা দেবতা জ্ঞান করিত। তিনি দর্শন সম্বন্ধে একটী উচ্চভাবময়ী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত কবিতার খণ্ডাংশ হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এম্পিডক্লিস্কে ইলিয়াটিক এবং আইওনিয়ান দার্শনিকদিগের মধ্যবর্ত্তী আসন দেওয়া যাইতে পারে।

হিরাক্লাইটাস্-কথিত জন্মপরিগ্রহ ব্যাপার (Becoming) অস্বীকার করিয়া তিনি ইলিয়াটিক মতের সমর্থন করিয়াছেন; পক্ষান্তরে, গতির অস্তিত্ব স্বীকার করায় তাঁহাকে আইওনিয়ান-দর্শন-মতাবলম্বীও বলিতে হইবে। উপাদান স্বয়ং পরিবর্ত্তনরহিত, পরিবর্ত্তনশীলতা সৃষ্টির ধর্ম্ম। উপাদানস্থানীয় পদার্থ (constituent elements) সকলের পরস্পর মিলন ও বিচ্ছেদই সৃষ্টি। অগ্নি কিরূপে বায়ুতে, বায়ু কিরূপে জলে, এবং জল কিরূপে মৃত্তিকায় পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বুদ্ধির অগোচর; পরন্তু, এই সকল উপাদানের সংমিশ্রণে যে অসংখ্য বস্তুর উদ্ভব হইতেছে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যে ধারণার মূলে বাস্তব জ্ঞানের অভাব, তাহার পরিহার বাঞ্ছনীয়। অতএব, ঈথার হইতে বায়ু, বায়ু হইতে সলিল, সলিল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি, এরূপ ধারণার পরিবর্ত্তে চারিটী উপাদানকেই মূল এবং স্বতন্ত্র জ্ঞান করা উচিত।

এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, উপাদান চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই কি স্বাধীনভাবে গতিশক্তি-বিশিষ্ট, না উহারা উহাদের অতীত অপর কোন পদার্থ হইতে শক্তিলাভ করিতেছে? এম্পিডক্লিসের কবিত্বময়ী ভাষা হইতে দর্শনের যুক্তিগুলি বাছিয়া লওয়া কঠিন হইলেও এটুকু বুঝা যায় যে, তিনি সৃষ্টি মাত্রেরই সজীবত্ব, গতির চিরবিদ্যমানতা, এবং উপাদানের স্বাভাবিক অনুপ্রাণতা সম্বন্ধে আইওনিয়ান দার্শনিকদিগের সহিত ঠিক একমত ছিলেন না। তাঁহার মতে, গতি উপাদান সমূহের অতীত কোন আধ্যাত্মিক মূলশক্তির ক্রিয়া। খুব সম্ভবতঃ, এই ক্রিয়া দুইটী পৃথক শক্তির ফল। কবির ভাষায় তিনি উহাদের একটীকে মিলন বা প্রণয় (Love), অপরটীকে বিরহ বা বিচ্ছেদ (Discord) আখ্যা দিয়াছেন; কখনও বা উহাদিগকে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দুইটী দেবতা বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। প্রণয়ের কার্য্য উপাদান সকলের সমন্বয় সাধন; বিরহের কার্য্য, উহাদের বিশ্লেষণ। প্রণয় দ্বারা উপাদানগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমতঃ একটী বর্ত্তুলের আকার ধারণ করে; পরে, বিরহের কার্য্য আরম্ভ হইলে, বর্ত্তুলটী আপনাআপনি বিভক্ত হইয়া যায়। পৃথিবী, সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল,

ঈথাররাশি এবং নক্ষত্রপুঞ্জ, এইরূপে বিচ্ছেদের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানে সৃষ্টির মূলে যদিও দুইটী শক্তির কার্য্য লক্ষিত হইতেছে, পরিণামে কিন্তু প্রণয়েরই জয় হইবে, এবং যে চারিটী প্রধান অংশে জগৎ বিভক্ত, একদিন তাহারা প্রণয়ের শক্তি বলে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া এক অভিনব সৃষ্টিবিপর্য্যয় (chaos) সংঘটন করিবে। সৃষ্টি ও ধ্বংসের এই পর্য্যায়ক্রমিক আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন নিয়তি-প্রতিষ্ঠিত। কোন কালেই ইহাদের বিরাম নাই।

এম্পিডক্লিস আনাক্সিমাণ্ডার ও হিরাক্লাইটাসের ন্যায় জীব-সৃষ্টিকে বিবর্ত্তনের কার্য্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তবে বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার মতে জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সর্ব্ব-প্রথম গঠন বিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল, তৎপরে তাহারা সৃষ্টি গণ্ডীর মধ্যে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন ও সংযোগ বিয়োগের ফলে, ক্রমশঃ অবয়ব-বিশিষ্ট এবং কার্য্য সাধকত্ব-গুণ প্রাপ্ত হইয়া, পরিশেষে যথাস্থানে স্থায়ী ভাবে দৃঢ় সম্বদ্ধ হইয়াছে। প্রথম জীব-সৃষ্টি দৈবনির্ব্বন্ধের ফল। আত্মসংরক্ষণ (Self-preservation), কার্য্যক্ষমতা Proficieney) এবং পুষ্টিলাভ (Development) প্রভৃতি গুণ পরবর্ত্তী কালের ঘটনা। উহারা প্রধানতঃ দৈহিক উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সমাজের পক্ষে কতদূর হিতকর, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এখানে এম্পিডক্লিস সর্পেনহর-ডারউইন্ প্রচারিত মতেরই পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়াছেন।

হিরাক্লাইটাসের ন্যায়, এম্পিডক্লিসও আত্মাকে অনলশিখা মনে করিতেন। বিরোধ শক্তি বশতঃ আত্মা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ জীব-শরীরে সংক্রমিত হইয়াছে। আত্মার জীবদেহ ধারণরূপ বিকাশ ঘটিলেও উহা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। উদ্ভিদ্, ইতর-প্রাণী ও মানব, এই তিন পৃথক জীব স্তরের ভিতর দিয়া গমন কালে আত্মার উন্নতি হয় বটে, কিন্তু অনশন, অনাসক্তি এবং সন্তোষ ব্যতীত উহা ঈশ্বরে পুনর্ম্মিলিত হইতে পারে না। জীব-সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ মানব, এজন্য মানব জাতির সৃষ্টি হইতে সৃষ্টি ক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং আত্মার পক্ষে এই স্তরটী মুক্তি লাভের অন্তরায় স্বরূপ; আত্মা সহজে ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। মানব বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিবিম্ব, এখানে চারিটী মূল ও স্বতন্ত্র উপাদান একাধারে মিলিত হইয়াছে। দেহের কঠিন অংশগুলিকে মৃত্তিকা, তরল ভাগকে সলিল, প্রাণবায়ুকে বায়ু এবং তেজকে অগ্নি বলা যায়। ভালবাসা বা প্রণয় (Love) এবং ঘৃণা (Hate)ও মানব প্রকৃতির দুইটী প্রধান লক্ষণ। মানব যে বুদ্ধি বৃত্তিতে সকল জীবের শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ জগতের সমস্ত গুণ মানব প্রকৃতিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সকল গুণ এই সঙ্গে বিদ্যমান থাকায় বস্তু মাত্রই তাহার অনুভব-যোগ্য। বহির্জগতের সহিত মানব প্রকৃতির এই সম্বন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর অনুরূপ; ইহাকে সদৃশ দ্বারা সদৃশ জ্ঞান লাভ কহে। আনাক্সাগোরাস্ ঠিক ইহার বিপরীত, অর্থাৎ অ্যালোপ্যাথিক মতের পরিপোষক ছিলেন। তিনি বিপরীতের সংস্পর্শকেই অনুভব সিদ্ধির কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শোণিত, আত্মা এবং অনুভব শক্তির আশ্রয়; কেন না, সৃষ্টির উপাদানগুলি শোণিতে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত রহিয়াছে। শরীর হইতে যদি সমস্ত রক্ত শোষিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অনুভব, সংজ্ঞা এবং জীবন, এক কথায় আত্মার ক্রিয়া লোপ পাইবে। মানবের স্বাস্থ্য এবং রক্ত সঞ্চারের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ; রক্তের স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা সুস্থ এবং কার্য্যক্ষম থাকি, বিকৃত অবস্থায় স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। শোণিত পবিত্র, এজন্য ভোগলিপ্সা পরিতৃপ্তির উপায় রূপে শোণিতপাত করা অনুচিত। শোণিত সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা হইতে মিশর, মোজেস্, বুদ্ধ এবং জোরোষ্টারের কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় এম্পিডক্লিস্ তাঁহার জড়ত্ব প্রতিপাদক উপাদান গুলিকে নামে মাত্র জাতীয় দেবতার আবরণ দান করিয়াছেন। সাধারণ লোকের ন্যায় তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। এখানে আমরা অগ্নি, বায়ু, জল ও মৃত্তিকাকে জীয়াস্ (Zeus) হীরা (Hera) অর্কাস্ (Orcus) ও নেষ্টিস্ (Nestis) রূপে দেখিতে পাই। সর্ব্বোপরি, প্রেম ও বিচ্ছেদ নামে আরো দুইটী দেবতা। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের মূলে পরমাণুবাদ, দ্বৈতবাদ এবং (ইলিয়াটিক) অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি সকল মতেরই কিঞ্চিৎ আভাস আছে, তবে সকলেরই যেন উদ্দেশ্য এক; একেশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা। প্রেমকে তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। চারিটী উপাদানের সকলেই প্রেমের আজ্ঞাবহ, বিচ্ছেদ প্রেমের সহচর। প্রেমকেই অনির্ব্বচনীয়, অদৃশ্য এবং অশরীরী ঈশ্বর বলিতে পারা যায়। বৈদ্যুতিক প্রভার ন্যায় উহার চেতনা শক্তিতে জগৎ ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইতেছে।

অনাক্সাগোরাস্।

অনাক্সাগোরাস আইওনিয়ার অন্তর্গত ক্লাজোমিনে (Clazomenæ নগরের কোন প্রসিদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ৪৬০ অব্দে রাজধানী এথেন্স-নগরে গমন করতঃ তথায় ত্রিশ বৎসর কাল গ্রীসের নূতন জ্ঞানালোকের কেন্দ্রস্বরূপ অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎপরে, পেরিক্লিস্, ইউরিপিডিস্ ও প্রোটাগোরাসের সহিত বন্ধুত্ব বশতঃ এবং প্রচলিত রাজধর্ম্মের সহিত স্বীয় মতের অনৈক্য ঘটায় তাঁহাকে নির্ব্বাসিত অবস্থায় জীবনের শেষভাগ ল্যাম্পসেকাস্ নগরে অতিবাহিত করিতে হয়। সেকালের অধিকাংশ দার্শনিকের ন্যায় আনাক্সাগোরাসও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, উহার কয়েকটী অংশমাত্র অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

হিরাক্লাইটাসের সহিত অনাক্সাগোরাসের দুইটী প্রধান বিষয়ে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, তাঁহার মতে বস্তু মাত্রই গতিশীল নহে, পরন্তু উহারা জড়-ভাবাপন্ন। দ্বিতীয়তঃ, জড় জগতের উপর শক্তির মূলাধার এক চিন্ময় সত্তা সর্ব্বক্ষণ আধিপত্য করিতেছে।

সৃষ্টির উপাদান সমূহ।—জড় কখনও জল, বায়ু বা অগ্নির ন্যায় কোন সমধর্ম্মবিশিষ্ট উপাদান (homogeneous substance) বিশেষে পরিণত হইতে পারে না। এক বস্তু অপর এক বস্তুতে কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা আমাদের ধারণার অতীত। এম্পিডক্লিস্ কেবল চারিটী মাত্র উপাদানের

উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে উহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, গণনাই হয় না। উহারা যেমন অগণ্য, তেমনি এত ক্ষুদ্র যে প্রত্যেকের পরিমাণ নির্ণয় করাও অসম্ভব (infinitely small)। উপাদান বা বীজোপকরণগুলির কখনও সৃষ্ট হয় নাই ; উহারা আদ্যন্ত রহিত, অবিনশ্বর এবং অপরিবর্ত্তনীয়। উপাদান সমূহের পরিমাণ চিরকালই একভাবে আছে, অর্থাৎ হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সুতরাং যে বস্তু কখনও ছিল না, তাহার উৎভব এবং যাহা আছে, তাহার লোপ, এতদুভয়ের কল্পনা ভ্রান্তিমূলক। জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে যে সাধারণ সংস্কার আছে, তাহাও ভ্রমাত্মক। 'কিছু না' হইতে কিছুর উৎপত্তিও নাই এবং কিছুর একেবারে ধ্বংসও নাই। সৃষ্ট বস্তুজাত চির বিদ্যমান বীজাণুসমূহের সমন্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের অংশগুলি বিশ্লিষ্ট হইলে বস্তু সকল আপাততঃ অদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু বীজাণুর পরিমাণ ও সংখ্যা যেমন তেমনি থাকে। এই হেতু, বীজাণুর সমন্বয়ই জন্ম এবং বিশ্লেষণই মৃত্যু। স্থানবিচ্যুতি, সংমিশ্রণ, দৈহিক পরিবর্ত্তন ও গতি ভিন্ন অপর কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। বস্তুর প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন বা পদার্থান্তরত্ব প্রাপ্তি (transubstantiation) ঘটিতে পারে না।

সৃষ্টির নিমিত্ত ও উদ্দেশ্যসাধক কারণ সমূহ।—যে গতি দ্বারা বস্তু সকল আপাততঃ উৎপন্ন বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, আনাক্সাগোরাস আর তাহাকে উপাদানসমূহের অন্তর্নিহিত, আদি এবং বাস্তব কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। উপাদান স্বয়ং জড়, নিশ্চেষ্ট ও অচল। যে শক্তিতে জগতের পরিবর্ত্তন সাধিত হয় বা যদ্দারা জড়ের কার্য্য প্রকাশ পায়, তাহা কখনও জড়স্থানীয় হইতে পারে না। শৃঙ্খলার কলাকৌশলময় বিশ্বরচনা ব্যাখ্যা করিতে হইলে জড়, অচল, বোধহীন উপকরণ ব্যতীত অপর এমন একটী পদার্থ বা উপাদানের কল্পনা আবশ্যক, যাহা স্বয়ংই শক্তি এবং চৈতন্য। এই উপাদানের উপাদান বা চরম উপাদান একান্তই মৌলিক, সমধর্ম্মবিশিষ্ট, অকৃত্রিম এবং জড় হইতে স্বতন্ত্র। জড় স্বয়ং কার্য্যবিমুখ (passive); শক্তি, মন বা বুদ্ধি (Nous) স্বয়ং কর্ম্মশীল। শেষোক্তটী সম্পূর্ণ স্বাধীন, উহাই জগতের গতি এবং প্রাণ। নিকৃষ্ট উপাদানগুলি অপ্রবুদ্ধ, উৎকৃষ্ট উপাদান বা মন প্রবুদ্ধ, অর্থাৎ উহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে সমস্তই অবগত আছে এবং স্বীয় কল্পনা ও উদ্দেশ্যমূলক যোগ্যতা (teleological fitness) দ্বারা বস্তুজাতকে সজ্জিত ও নিয়মাধীন রাখিয়াছে। মনই জগতের শাসকরূপে অনন্তকাল বিদ্যমান, বিশ্বের সমস্ত উপাদান একত্র মিলিত হইলেও শক্তিতে উহার সমকক্ষ হইতে পারে না।

সৃষ্টি।—সৃষ্টির পূর্ব্বে জড়-উপাদানগুলির আকার অবয়ব ছিল না, সব এক সঙ্গে পুঞ্জীভূত ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, বায়ু ঈথার প্রভৃতি যাহা এখন পৃথক্ পৃথক্ বস্তুরূপে নয়নগোচর হয়, তৎকালে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য না থাকায়, সকলে এক সঙ্গে তালগোল পাকাইয়া অবস্থিতি করিত। পরে, নিত্য চৈতন্যস্বরূপ বুদ্ধি (Nous) যখন সেই আকার-অবয়বহীন তমসাবৃত বীজাণুপিণ্ডের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অংশগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল, তখন হইতেই সৃষ্টিরচনার সূত্রপাত হইয়াছে। মূল চিচ্ছক্তি দ্বারা বীজাণুগুলি পৃথক্ হইয়া

পুনরায় তাহারা পরস্পরের আকর্ষাণুসারে পরস্পরের সহিত মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে ও তাহার ফলে, ক্রমান্বয় সৃষ্টির উদ্ভব হয়। যে মুহূর্ত্তে বীজাণুপিণ্ড প্রথম গতিসম্পন্ন হইয়াছিল, সেই হইতেই গতির স্বাভাবিক সম্প্রসারণ ধর্ম্মপ্রভাবে উহা জগতের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। সৌরজগতের অক্ষি পরিভ্রমণ গতির ব্যাপকত্ব গুণের দৃষ্টান্ত। যতদিন না সমস্ত বীজাণু সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইবে, ততদিন গতির কার্য্য অপ্রতিহত থাকিবে। পৃথিবীর আকার চোঙ্গার ন্যায় গোল অথচ লম্বা। উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভারবিশিষ্ট বীজাণুগঠিত, এজন্য গতির প্রথম আঘাতেই জগতের কেন্দ্রাভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত স্বল্প ভার বীজকোষ হইতে উৎপন্ন সলিলরাশি পৃথিবীর কঠিন পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হয়। আরও উর্দ্ধে, বায়ুকোষগঠিত বায়ুস্তর এবং সর্ব্বোপরি, সর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা ঈথারস্তর আকাশভাগ অধিকার করে। মোটামুটি একবার এইরূপে সৃষ্টিবিভাগের পর, যখন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, তখন পূর্ব্বলব্ধ গতির বলে, ভিন্ন ভিন্ন কঠিন ধাতব এবং অন্যান্য যে সকল বস্তু দ্বারা পৃথিবীর কঠিন অংশ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা, এবং কাল হইতে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন তরল বস্তু সমূহ, স্ব স্ব আকার ধারণ করে। অপরাপর উপাদানসমূহের বেলায়ও এই নিয়ম। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থানীয় সৌরজগতের এইরূপে উদ্ভব হইয়াছে। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক প্রথম লব্ধ শক্তির বলে পৃথিবী হইতে বহুদূরে নীত এবং গতির প্রাবল্যহেতু, ঈথারের সহিত সংঘর্ষণে প্রজ্বলিত হইয়াছে। সূর্য্য একটী অগ্নিপিণ্ড। চন্দ্র পাহাড় পর্ব্বত ও উপত্যকাসমন্বিত এবং সূর্য্যালোকে বিভাসিত।

সৃষ্টিবিষয়ক উপরোক্ত মতটী বাফন (Buffon), ক্যাণ্ট (Kant) এবং লাপলাস্ (Laplace)এর মতানুরূপ। প্রাণীজগতে প্রাণীসমূহের মধ্যে অবকাশ নাই এবং কি উদ্ভিদ্,কি প্রাণী, সকলের ভিতরেই একমাত্র সাধারণ মুখ্য উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, এইরূপ তথ্যের প্রচার করায় আনাক্সাগোরাস হইতে আপেক্ষিক শারীর বিদ্যা (Comparative Physiology)র সূত্রপাত হইয়াছিল। তিনি জীবনির্ব্বিশেষে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উদ্ভিদই হউক, আর ইতর-প্রাণীই হউক, সকলেরই মন বা আত্মা আছে, তবে প্রভেদ এই যে, একের অপেক্ষা অল্প বা অধিক সংখ্যক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে সক্ষম।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাণী মাত্রেই যদি মন বা বুদ্ধির অধিকারী হয়, তবে তাহারা এই মন বা বুদ্ধি কিরূপে লাভ করিল? আনাক্সাগোরাসের কল্পিত বুদ্ধি শক্তি কি প্রাণী জগতের বহিস্থ কোন বস্তু, না উহা পরিণত অপরিণত, জগতের সকল প্রকার বুদ্ধি, সকল উদ্দেশ্য এবং যাবতীয় ইচ্ছা শক্তির সমষ্টি, যাহা হইতে গতি উৎপন্ন হইতেছে? মন বা বুদ্ধি (Nous) জড়োপাদানের অতীত ও ত্রিকালজ্ঞ। সৃষ্টি পূর্ব্ব সমস্ত ঘটনা অবগত থাকায় উহা দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza)র নিশ্চেষ্ট জীবনসত্তা এবং হেগেলের (Hegel) ক্রিয়াশীল ধারণা শক্তির (Active Idea) সহিত একার্থ বোধক নহে। যেহেতু, ইহারা কেহই মানব-মস্তিষ্কের সাহায্যে এবং পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বিধান ব্যতীত দ্রব্য-জ্ঞান লাভে সমর্থ হয় না। এবিষয়ে আনাক্সাগোরাস স্বীয় মত এত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহাতে দৈব-নির্ব্বন্ধের কোন সার্থকতাই আসিতে পারে না। তিনি যে 'নুস' শব্দ

প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থ বিচার-বুদ্ধি এবং উদ্দেশ্য। হঠাৎ মনে হয়, মন বা আত্মা স্থানীয় এই 'নুস' অতীন্দ্রিয় এবং অলৌকিক কোন পদার্থ, প্রাণী সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকিয়া দূর হইতে তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করিতেছে, প্রাণীগণ বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইলেও বুদ্ধি যেন তাহাদের নিজস্ব নহে। আবার এরূপও মনে হয় যে, 'নুস' প্রত্যেক জীবের অন্তরেই বিদ্যমান থাকিয়া তাহাকে স্বীয়কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছে। 'নুসের' কার্য্য যেরূপ ভাবেই সম্পন্ন হউক, উহার সহিত দৈব-নির্ব্বন্ধের কোন সম্পর্ক নাই। আনাক্সাগোরাস, মন বা আত্মা সৃষ্টির বহির্ভূত, কি অন্তর্ভূত, এবিষয়ে একটী নির্দ্দিষ্ট পথাবলম্বন না করিয়া যে উভয় মতেরই পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কারণ, সে কালের পণ্ডিতগণ লৌকিকত্ব বা অলৌকিকত্ব immanency and transcendency), ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষত্ব (Personality and impersonality) প্রবুদ্ধ জ্ঞান এবং অপ্রবুদ্ধ জ্ঞান এবং (Conscious and unconscious intelligence), এ সকলের পার্থক্য বড় বিচার করিতেন না। হিরাক্লাইটাস্ যেমন একটী মাত্র উপাদানকে সৃষ্টির মূলকারণ এবং অপর সকলকে পরিবর্ত্তন জ্ঞান করা দূষণীয় মনে করেন নাই, সেইরূপ, আনাক্সাগোরাস্‌ও 'নুস্' শব্দকে লৌকিক এবং অলৌকিক উভয় অর্থই দান করিয়াছেন। ইহাতে যে বিসংবাদিত্ব দোষ ঘটিতে পারে, এরূপ ধারণা তাঁহার ছিল না।

বুদ্ধি সগুণ কি নির্গুণ, এ সম্বন্ধেও আনাক্সাগোরাস কিছু বিশেষ করিয়া বলেন নাই। একপক্ষে, মনের ক্রিয়াগুলিকে শক্তিবাদের শক্তির অনুরূপ, অর্থাৎ কেবল মাত্র সত্তা ছাড়া উহার সহিত জড়ের কোন সম্বন্ধ নাই, এইরূপ মনে হয়। পক্ষান্তরে, মন যেন জড়েরই এক অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতম অবস্থা। এই প্রকার এক অস্পষ্ট দ্বৈতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করার কারণ এই যে, তিনি বৈজ্ঞানিকদিগের জড়বাদের হাত হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারেন নাই।

উল্লিখিত বিষম্বাদিত্ব দোষ থাকিলেও অনাক্সাগোরাস্ শক্তিবাদের যতটুকু আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আইওনিয়ান দর্শনের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

এই বিশ্ব সুবিশাল কার্য্যক্ষেত্র। ইহাতে কার্য্য না করিয়া কাহারও থাকিবার সাধ্য নাই। তাহাতেই গীতা বলিতেছে :—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥" ৫—৩য় অধ্যায়।

কেহ ক্ষণকালও কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণের দ্বারা অজ্ঞাতে বাধ্য হইয়া সকলকেই কার্য্য করিতে হয়।"

এই কর্ম্মকে যথার্থ রূপে নিয়মিত করাকেই "কর্ত্তব্য" বলিয়া অভিহিত করা হইয়া

থাকে। গীতায় এই "কর্ত্তব্য" যেরূপ দার্শনিক ভাবে নিরূপিত হইয়াছে, সেরূপ আর কোথায়ও হয় নাই। এখানে আমরা গীতার "কর্ত্তব্যবাদ" সম্বন্ধেই বিশদ ভাবে আলোচনা করিব।

ইন্দ্রিয়সংযম ও আসক্তির অভাব, এই দুইটীই কর্ত্তব্য সম্পাদনের মূলমন্ত্র। গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে এ সম্বন্ধে বিশেষ আভাসই পাওয়া যায় :—

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বি-
শিষ্যতে ॥" ৭—৩য় অধ্যায়।

"হে অর্জ্জুন! যিনি কিন্তু মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, আসক্তি রহিত তিনি বিশিষ্ঠ অর্থাৎ প্রশংসাযোগ্য হন।"

সংযমের দ্বারা বাহ্যান্তর উভয়েন্দ্রিয়েরই সংযম বুঝিতে হইবে। সুতরাং কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় সকলকে নিরোধ করিয়া অন্তরিন্দ্রিয়কে অসংযত হইতে দিলে, তাহাতে প্রকৃত কর্ত্তব্য সম্পাদন হয় না, পরন্তু কেবল মিথ্যাচরণই করা হয়। তাহাতেই গীতা বলিয়াছে :—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স
উচ্যতে ॥" ৬—৩য় অধ্যায়।

"যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করিয়া থাকেন, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচার বলা যায়।"

আসক্তি দ্বারা আমরা বিশেষ ভাবে কোন কার্য্যেতে বদ্ধ হইয়া পড়িতে পারি। তাহাতে আমাদের নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করিবার শক্তি ক্রমে লোপ পাইতে পারে। কিন্তু আসক্তি-বিরহিত হইয়া কার্য্য করিলে তাহাতে কোন কার্য্যে বিশেষ ভাবে আবদ্ধ হওয়া কারণ না হওয়ায় আমাদের নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে আমরা বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য বুদ্ধি বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। গীতায় আসক্তি রহিত হইয়া কার্য্য করা সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥"১৯
৩য় অধ্যায়।

"অতএব তুমি আসক্তি শূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ পরম গতি প্রাপ্ত হয়।"

অনাসক্তি অভ্যাস দ্বারা প্রকৃত কর্ত্তব্য বুদ্ধি জাগ্রত হইলে আমরা সকল কার্য্যই যে তুল্যরূপে করণীয়, তাহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। তাহাতে সকল কার্য্যেই আমরা সমান রূপ অভিনিবেশ প্রদর্শন করিয়া থাকি। ইহাতে, যে কোন কার্য্যই হউক না কেন, যথোচিত ভাবে সম্পাদিত হইতে কোন বাধাই থাকে না।

কর্ম্মে অনাসক্তি অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মফলেও অনাসক্তি অভ্যস্ত হয়। কর্ম্ম আমাদের কৃত হইলেও কর্ম্মফল আমাদের আয়ত্ত নহে। ইহা ঈশ্বরেরই আয়ত্ত। সুতরাং যাহা আমাদের অনায়ত্ত, তাহার আকাঙ্ক্ষা না করাই সমীচীন, তাই গীতা বলিয়াছে :—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন।
মাকর্ম্মফল হেতুর্ভূর্ম্মাতে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মাণি ॥"৪৭
২য় অধ্যায়।

"কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে তোমার অধিকার যেন না হয়। তুমি কর্ম্মফলার্থী হইও না। অকর্ম্মে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।"

কর্ম্মে অনাসক্তি ও কর্ম্মফলে অনাকাঙ্ক্ষা দ্বারা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে কর্ম্ম নিষ্কাম সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়। গীতায় এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং কুরুতেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব সত্যাগঃ সাত্ত্বিকো-
মতঃ ॥"৯—১৮শ অধ্যায়।

"হে অর্জ্জুন! আসক্তি এবং ফল ত্যাগ করিয়া "কর্ত্তব্য" মনে করিয়া যে নিত্য কর্ম্ম করা যায়, সেই ত্যাগ (কর্ম্মফল ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়।

কর্ম্মফল ঈশ্বরায়ত্ত বলিয়াই সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিবার জন্য গীতা উপদেশ করিতেছে :—

"যজ্জুহোষি যদশ্নাসি যৎকরোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্বমদর্পণম্॥" ২৭
৯ম অধ্যায়।

"হে অর্জ্জুন! যাহা যজ্ঞ কর, যাহা ভোজন কর, যে কার্য্য কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে সমর্পণ করিও।"

এই প্রকারে সমস্ত কর্ম্মেরই বিশ্রান্তি ঈশ্বরে হওয়াতে আমাদের সর্ব্ব কার্য্যই ঈশ্বরার্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং আমাদের সর্ব্ব কার্য্যেই আমরা ঈশ্বরের অধিষ্ঠান অনুভব করতঃ একেবারে ঈশ্বরেই তন্ময় হইয়া যাই। গীতা ইহাই বর্ণনা করিয়া লিখিতেছে :—

"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়িসংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধি যোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং
ভব ॥"৫৭—১৮শ অধ্যায়।

"তুমি চিত্ত দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, মৎ পরায়ণ হইয়া বুদ্ধি যোগ আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও।"

এইরূপে সম্যক্ প্রকারে নিষ্কাম ভাবের অনুশীলন করিতে করিতে আমাদের আধ্যাত্মিক ভাব ক্রমে ক্রমে পরিমার্জ্জিত হইতে হইতে পরিশেষে আমাদের আত্মা পরব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয় অর্থাৎ পরব্রহ্মের সারূপ্য লাভ করিয়া পরব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হয়। তখন পবিত্রতার চিরদিব্য শান্তি তাহাতে আবির্ভূত হয়। গীতার উজ্জ্বল ভাষায় হইার বর্ণনা এইরূপ :—

"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গংত্যক্ত্বাত্ম শুদ্ধয়ে॥১১
যুক্ত কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি
নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলেসক্তো নিবধ্যতে॥"
১২—৫ম অধ্যায়।

"শরীর দ্বারা, মন দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা এবং কর্ম্মাভিনিবেশ শূন্য ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যোগীগণ কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে।

"ব্রহ্মে যুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা হইতে উৎপন্না শান্তি প্রাপ্ত হন। অযুক্ত ব্যক্তি কামনা প্রবৃত্তি হেতু ফলে আসক্ত হইয়া নিয়ত বন্ধন প্রাপ্ত হয়।"

গীতার "কর্ত্তব্যবাদ" এখানেই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা হইতে, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদনেই যে জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। প্রাচ্য দর্শনে যেস্থলে এই প্রকার কর্ত্তব্যবাদের পূর্ণবিকাশ আমরা প্রাপ্ত হই, তৎস্থলে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে আমরা আভাসে মাত্র ইহার কথা

শুনিতে পাই। "দার্শনিক প্রশ্নের ইতিহাস" নামক সুপরিচিত আধুনিক গ্রন্থে কর্ত্তব্যের ধারণা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"Still, in the interval that lies between us and this ideal state, in our present life in fact, it is through the idea of duty that each step is won, it is this not in alone that prompts the effort without which there can be no progress. A History of the Problems of Philosophy by Paul Janct and Gabriel Seailles Vol II. p 90.

"তথাপি আদর্শ অবস্থাও আমাদের মধ্যে যে ব্যবধান বর্ত্তমান তাহাতে অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে আমাদের বর্ত্তমান জীবনে কর্ত্তব্যের ধারণার মধ্য দিয়াই উন্নতির পথে আমাদের প্রতি পদক্ষেপ হইতেছে। এই ধারণাতেই মাত্র আমাদের উদ্যম উদ্রিক্ত হইতেছে। এই উদ্যম ব্যতীত কোন উন্নতিই হইতে পারে না।"

কর্ত্তব্যের সাধনায় নৈতিক উন্নতির যে আদর্শ পরিস্ফুট দেখিবার জন্য পাশ্চাত্য দর্শন এখনও প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে—স্মরণাতীত কালেই যে ভারতীয় দর্শনে সেই আদর্শের কিরূপ পূর্ণতা সাধিত হইয়াছিল, তাহা আমরা উপরে দেখিয়াছি। পাশ্চাত্য কর্ত্তব্যাদর্শ যে কখনও ভারতীয় কর্ত্তব্যাদর্শকে অতিক্রম করিতে পারিবে, তাহা কোন মতেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ভারতীয় আদর্শের পূর্ণতা অপেক্ষা অধিক পূর্ণতা কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারা যায় না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অর্জ্জুন বলিলেন,"ভগবন্! তোমার নিকট পরম গূঢ় অধ্যাত্ম সংজ্ঞিত বচন শ্রবণ করিলাম,—তোমার নিকট ভূতগণের 'স্তব' এবং তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। 'হে পুরুষোত্তম,তোমার ঐশ্বররূপ দেখিতে ইচ্ছা করি, তুমি তোমার অব্যয় আত্মাকে দেখাও।"

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা। অর্জ্জুন যে পরমাত্মা পরমেশ্বরের অব্যয় আত্মাকে দেখিতে চাহিলেন, তাহা সেই পরমাত্মার ঐশ্বররূপ। তাহা পরব্রহ্মের সগুণ সোপাধিক স্বপ্রপঞ্চ রূপ। তাহা পরম ব্রহ্মের নির্গুণ নিরূপাধিক প্রপঞ্চাতীত অক্ষয় রূপ নহে। যাহা পরমব্রহ্মের পরম (Trancendental) স্বরূপ, তাহার দর্শন হয় না. কেন না. তাহা কখন দর্শন হইলে আর দ্রষ্টা-দৃষ্ট ভাব, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভাব থাকে না। অর্জ্জুন তাহা দেখিতে চান নাই। পরমেশ্বরের যে প্রভব দেব মানবাদির জ্ঞানের অতীত—তাহা অর্জ্জুন দর্শন করিতে চান নাই। পরমেশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বে ও নিয়ন্তৃত্বে যে তাঁহার প্রকৃতি হইতে ভূতগণের উদ্ভব হয় ও সেই প্রকৃতিতে যেরূপে ভূতগণের কল্পান্তে লয় হয়, অর্জ্জুন সে সৃষ্টি লয় তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াও তাহা দেখিতে চান নাই। এই বিশ্বের স্থিতি অবস্থায় পরমাত্মা পরমেশ্বররূপে সেই বিশ্বের সহিত যেরূপে সংসৃষ্ট, এই সৃষ্টির তিনি যে নিয়ন্তা, তিনি যে সর্ব্বভূতের আত্মারূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সর্ব্বভূতই যে তাঁহার আত্মার অভিব্যক্ত রূপ, তাহাই অর্জ্জুন

দেখিতে চাহিলেন। তাহা পরমাত্মা পরমেশ্বরের বিশ্বরূপে অর্থাৎ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়ন্তারূপে অভিব্যক্ত (Immanent) ভাব। তিনি যে অংশে এ বিশ্বজগতে অনুপ্রবিষ্ট, ইহা পরমেশ্বরের সেই বিশ্বানুগ ভাব ইহা সেই পরম বিশ্বাতীত ভাবেরই অন্তর্ভূত। ভগবান দশম অধ্যায়ের শেষে তাঁহার বিভূতি বর্ণনা প্রসঙ্গে যে বলিয়াছেন, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।' ইহা এক অর্থে পরমেশ্বরের সেই অংশ।—ইহা ভগবানের ঐশ্বররূপ। অর্জ্জুন ইহাই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাই ভগবানের পরম বিভূতি—তাঁহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্ত রূপ। ইহাই যোগ দৃষ্টিতে দর্শন সম্ভব। যাহা এই বিশ্বরূপের অতীত—ভগবানের পরম (Transcendent) স্বরূপ, তাহার দর্শন সম্ভব নহে। তাই অর্জ্জুন কেবল পরমাত্মা পরমেশ্বরের ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন।

এইরূপে অর্জ্জুন প্রথমে পরম গূঢ় অধ্যাত্ম তত্ত্ব শ্রবণ করিলেন, তাহার পর তাহা যে সত্য, তাহা মনন পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিলেন, এবং তাহার পর সেই পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব মধ্যে যে অংশ দর্শনযোগ্য, তাহা অর্জ্জুন দেখিতে চাহিলেন।

পরমাত্মস্বরূপ দর্শনের উপায় ও অধিকার। ইহা হইতে জানা যায় যে, পরম তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভের উপায়, —প্রথম শ্রবণ, তাহার পর মনন, তাহার পর দর্শন ও নিদিধ্যাসন। উপনিষদে এই উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয় সংবাদে আছে,—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো, মৈত্রেয় আত্মা বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

(বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫)

এই আত্মা যাহা দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান বা নিদিধ্যাসন দ্বারা লাভ হয়, তাহা পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মা বা সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন।

যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন,—

যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তর স ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ......এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ।"

(বৃহদারণ্যক, ৩।৪।১)।

অতএব গীতায় এই যে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় বা সাধন (method) দর্শিত হইয়াছে, তাহা শ্রুতিসম্মত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে গীতায় দ্বিতীয় ষট্‌কে যে পরম অধ্যাত্ম তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের আত্মস্বরূপ তত্ত্ব। দেহী জীব,—সেই দেহীর বা জীবাত্মার তত্ত্ব প্রথমে এই শ্রবণ, মনন, দর্শন ও নিদিধ্যাসন রূপ উপায় দ্বারা লাভ করিতে পারে। তাহা গীতায় প্রথম ষট্‌কে উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু, এই তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য যে নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক অধিকারী হইতে হয়, ও বিজ্ঞান সহিত আত্মজ্ঞান লাভ জন্য যে ধ্যান যোগসাধন করিতে হয়, তাহাও উক্ত হইয়াছে। তাহার পরে দ্বিতীয় ষট্‌কে পরমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা পরমেশ্বরতত্ত্ব, যে ঈশ্বরে অনন্য ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয়ে এই শ্রবণ, মনন, দর্শন ও নিদিধ্যাসন রূপ উপায় দ্বারা সাধন করিলে তবে বিজ্ঞান সহিত জানা যায়, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথম ষট্‌কে অধ্যাত্মতত্ত্ব বা প্রতিক্ষেত্রে তাহার বেত্তা

ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মতত্ত্ব ভগবান অর্জ্জুনকে শ্রবণ করাইয়াছেন, সেস্থলে এই অনন্য ভক্তি-যোগের কোন কথা নাই। সাংখ্য জ্ঞান বা প্রকৃতিবিবিক্ত পুরুষতত্ত্ব বা প্রতিক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রবিবিক্ত ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব জানিবার জন্য এবং বিজ্ঞান সহিত সে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ভক্তিযোগে সাধনারও কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহা পরমাত্মা পরমেশ তত্ত্ব, যাহা সর্ব্বক্ষেত্রে একই ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব (গীতা, ১৩।২), তাহা বিজ্ঞান সহিত জানিতে হইলে এই ভক্তি-সাধনের প্রয়োজন হয়। ইহা এই দ্বিতীয় ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে। আমরা ইহা সপ্তম ও নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা দেখিয়াছি যে, পরমাত্মা-তত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য সাধনার মূলভিত্তি ভক্তি, ও ভক্তিপূর্ব্বক সাধন শ্রুতি সম্মত।

শ্রুতিতে আছে,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।
যথেহকৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তথৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥”
(কঠ, ২।২৩ ; মুণ্ডক, ৩।২।৩)।

অর্থাৎ এই আত্মা (যাহা সর্ব্বান্তর পরমাত্মা তাহা) প্রবচন বা বেদাধ্যাপনাদি দ্বারা লভ্য নহে, মেধা বা গ্রন্থার্থধারণ শক্তি দ্বারা লভ্য নহে, শ্রুতি বা বহু শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহে, যে সাধককে এই আত্মা বরণ করেন, সেই সাধকের দ্বারাই ইনি লভ্য হন, তাঁহারই নিকট ইনি স্বকীয় তনু অর্থাৎ স্ব স্বরূপ প্রকাশ করেন।

ইহা হইতে জানা যায় যে, যে সাধক ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের শরণ লয়, তাঁহার আশ্রয়ে যোগযুক্ত হইয়া সাধনা করে, তাহাকেই সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর বরণ করেন, সে সাধক তাঁহার প্রিয় হয়, এবং সে সাধকের নিকট পরমাত্মা পরমেশ্বর আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।

শ্রুতিতে অন্যত্র আছে,—

যস্যদেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কবিতা হ্‌র্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥”
(শ্বেতাশ্বতর, ৬।২৩)।

অতএব পরাভক্তি যোগে ভগবানে আসক্ত-মন হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে যোগে যুক্ত হইলে, ভগবানের স্ব স্বরূপ সমগ্রভাবে ভগবদনুগ্রহে সে সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়। গীতায় ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, যে জ্ঞানী ভক্তকে ভগবান বরণ করেন, তিনি ভগবানের প্রিয় হন। সুতরাং ভগবানকে যে জানিয়া তাঁহার ভক্ত হয়, ভগবান সে প্রিয় ভক্তের নিকট স্ব স্বরূপ প্রকাশ করেন। জ্ঞানী ভক্তই ভগবানের প্রিয়। ভগবান বলিতেছেন,—

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম
প্রিয়ঃ। (গীতা, ৭।১৭)।

ভগবান আরও বলিয়াছেন,—

“যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
(গীতা, ১২।১৪।২০)।

এইরূপে ভক্তি সাধন দ্বারা যোগ্য বা অধিকারী হইলে, তবে সে জিজ্ঞাসু প্রিয় ভক্তের নিকট ভগবান তাঁহার সমগ্র স্বরূপ প্রকাশ করেন, তবে বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়। এইজন্য ঈশ্বরভক্ত যোগীই শ্রেষ্ঠ। ইহা গীতায় বার বার উক্ত হইয়াছে। প্রথমে ষষ্ঠ অধ্যায় শেষে

ধ্যান যোগী সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন,—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
গীতা, ৬।২৯।

এই সর্ব্বভূতস্থ আত্মা যে সর্ব্বাত্মা সর্ব্বান্তর পরমাত্মা পুরুষোত্তম এবং ঈশ্বর-যোগী যোগযুক্তাত্মা হইয়া যে সর্ব্বাত্মা রূপে তাঁহাকে এবং তাঁহাতে স্থিত সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, এবং তাঁহার সহিত একত্ব ভাবে স্থিত হইয়া তাঁহাকেই ভজনা করেন, তাহাও সে স্থলে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বভূত স্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥"
গীতা, ৬।৩১।

ভগবান আবার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে কলিয়াছেন—এই ঈশ্বর ভক্ত যোগীই শ্রেষ্ঠ —

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো
মতঃ॥" (গীতা, ৬।৪৭)।

সেই যোগী যে 'যুক্ততম' তাহার কারণ এই যে, সে সমগ্র পরমাত্ম-তত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিবার অধিকারী হয় এবং বিহিত উপায়ে বিজ্ঞান সহিত সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। তাই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমে বলিয়াছেন,—

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসিতচ্ছৃণু॥

তাহার পর ভগবান, সপ্তম অধ্যায় হইতে এই দ্বিতীয় ষট্‌কে সেই সমগ্র পরমাত্ম-তত্ত্ব এবং যে ভক্তিযোগে যে তত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারা যায়, তাহা বিবৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ যেরূপ ভক্তি সাধনা দ্বারা যোগী পরমাত্মাতে আসক্ত মন হইয়া পরমাত্মাগত অন্তরাত্মা হইয়া তাহার আশ্রয়ে যোগে যুক্ত হয়, সে যুক্তযোগী ভগবৎ কৃপায় যেরূপে সমগ্র পরমাত্ম-তত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারে, তাহা ভগবান বলিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি সে উপায় শ্রবণ, তাহার পর মনন, তাহার পর দর্শন ও নিদিধ্যাসন।

যাহা হউক, পরমেশ্বরে ভক্তিই যে পরমাত্ম তত্ত্ব জ্ঞান লাভের মূল ভিত্তি, তাহার পুনর্ব্বার দশম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন,—

"তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেনভাস্বতা॥"
(গীতা, ১০।১০-১১)।

ইহার অর্থ আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের অধিকার। ইহা হইতে জানা যায় যে, পরম ঐশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে হইলে—তাহা শ্রবণ, মনন, দর্শন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা, সমগ্র ভাবে জানিতে হইলে, ঈশ্বরের অনন্ত একান্ত ভক্তিযোগে সাধনার প্রয়োজন। ভক্তি সাধনার দ্বারাই ঐশ্বরতত্ত্ব সমভাবে বিজ্ঞান সহিত জানা যায়। অর্জ্জুন ভগবানের প্রিয় ছিলেন। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, 'প্রিয়োঽসি মে' (গীতা, ১৮।৬৫)। পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ভক্ত তিনিই ভগবানের প্রিয় হইতে পারেন। সুতরাং অর্জ্জুন যে ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে। তাই ভগবান শরণাগত অর্জ্জুনকে বুদ্ধিযোগ দিয়া, তাহাকে অনুকম্পার্থ তাহার আত্মভাবস্থ হইয়া, তাহার জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া দিয়া, তাহার অজ্ঞানজ তমঃ দূর করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে অর্জ্জুন পরম অধ্যাত্ম-

তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায়, ভগবান অর্জ্জুনকে সমগ্র পরমাত্ম-তত্ত্ব—অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিত পরম বচন শ্রবণ করাইয়াছেন, এবং অর্জ্জুন যেরূপে বা যেরূপ সাধনা করিলে সেই পরমাত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ করিতে পারিবেন, তাহার উপদেশ দিয়াছেন। অর্জ্জুনও ভগবৎ প্রসাদে বুদ্ধি যোগ লাভ করতঃ প্রকৃত মননের দ্বারা সেই শ্রুত-তত্ত্ব সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। এইরূপে পরোক্ষ ভাবে এই পরমাধ্যাত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া, তাহা সমগ্র ভাবে বিজ্ঞান সহিত জানিবার জন্য অর্জ্জুন ভগবানের পরমাত্মস্বরূপ—তাঁহার ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন। তিনি নিজে সাধনার ফলে তাহা দেখিতে পারিলেন না। তিনি ভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহার কৃপায় এ ঐশ্বর রূপ দেখিতে চাহিলেন। ভগবান পূর্ব্বেই অর্জ্জুনের আত্মভাবস্থ হইয়া, তাহার অন্তরে ভাস্বত জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া দিয়া, তাহার অজ্ঞানজ তমঃ দুর করিয়া দিয়াছিলেন, তাই অর্জ্জুন পরমাত্মার এ ঐশ্বররূপ দেখিবার জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করিলেন। সে পরমাত্মস্বরূপ উক্তরূপে শ্রবণ ও মনন দ্বারা অর্জ্জুনের অজ্ঞানজ তমঃ দুর হইয়াছিল, তাহার জ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাই অর্জ্জুন আপনাকে সে ঐশ্বররূপ দর্শনের যোগ্য বা অধিকারী মনে করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥"
(গীতা, ১১।৪)।

আমরা বলিয়াছি যে, অর্জ্জুন আপনাকে বিশ্বরূপ দর্শনে অধিকারী মনে করিলেও, সে অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ ছিল, তাই তিনি সম্ভ্রম ও সঙ্কোচের সহিত ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

অর্জ্জুনের যে এ বিশ্বরূপ দর্শনে যোগ্যতা বা অধিকার ছিল, তাহা ভগবান মনে করেন নাই। তিনি কৃপা করিয়াই প্রিয় অর্জ্জুনকে তাঁহার ঐশ্বর রূপ দেখাইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ দর্শনে যে অর্জ্জুনের প্রকৃত অধিকার ছিল না, তাহা এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পরাভক্তি দ্বারাই পরম ঐশ্বররূপ দর্শনের অধিকারী হওয়া যায়। "যে সাধকের সেই পরম দেবে পরাভক্তি থাকে ও পরম গুরুতে যে পরম ভক্তিযুক্ত হয়, সেই মহাত্মার নিকট সেই পরম তত্ত্বজ্ঞানার্থ প্রকাশিত হয়—সেই পরম গুরুর নিকট ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণান্তর মননের দ্বারা সেই তত্ত্বজ্ঞানার্থ প্রকাশিত হয়। যে প্রিয় ভক্তকে পরমাত্মা বরণ করেন, তাঁহার আত্মভাবস্থ হইয়া তাহার নিকট তিনি তাঁহার 'স্বীয় তনু' বা স্ব স্বরূপ প্রকাশ করেন।

অর্জ্জুনের নিকট ভগবান স্বীয় তনু বা তাঁহার ঐশ্বর রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, অর্জ্জুনের প্রার্থনায় তাঁহাকে ভগবান আত্মযোগে তাঁহার পরম তেজোময় বিশ্ব অনন্ত আদ্যরূপ দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অর্জ্জুন তাহা অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন নাই। কারণ যে অনন্যভক্তি দ্বারা এ ঐশ্বর রূপ দর্শনের যোগ্যতা হয়, অর্জ্জুন সেরূপ অনন্যভক্ত ছিলেন না। এ কথা আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বিশ্বরূপ দর্শনে যোগ্যতা না থাকিলেও, ভক্ত অর্জ্জুনের প্রার্থনায় ভগবান কৃপা করিয়া তাহাকে এ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।

অর্জ্জুন যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। ভগবান বলিয়াছেন,—

“ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বং ॥”
(গীতা, ১১।৪৭)।

এই বিশ্বরূপ পূর্ব্বে কেহ কেন দেখে নাই, তাহার কারণ ভগবান স্বয়ং ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভগবান বলিয়াছেন,—

“ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন
চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্যোঽহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।”
(গীতা, ১১।৪৮)।

ভগবান আবার বলিয়াছেন,—

“নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন
চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥”
(গীতা, ১১।৫৩)।

যদি বেদযজ্ঞ অধ্যয়ন তথা দান যজ্ঞ ক্রিয়া দ্বারা এ বিশ্বরূপ দর্শনের যোগ্য না হওয়া যায়, তবে এ বিশ্বরূপ দর্শনের উপায় কি? আমরা দেখিয়াছি, যে উপায়ে পরাভক্তি যোগে সাধনা, তাহাই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান তাহা বিশেষ ভাবে এস্থলে বলিয়াছেন,—

“ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোং অহমেবং
বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুংঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥”
(গীতা, ১১।৫৪)।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

বিক্রমপুরের সাহিত্য-চর্চ্চা

বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের “বিক্রমপুর” অখন সূতিকাগার হইতে বহির্গত হইয়া দ্বিতীয় সংখ্যায় মাত্র পদার্পণ করিয়াছে, যখন “বিক্রমপুর” প্রসঙ্গে বিক্রমপুরের অভাব অভিযোগ বলিতে যাইয়া জনৈক লেখক লিখিয়াছেন, “* * * * * * * * বিক্রমপুরে একজন কবিও অদ্য পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। * * বিক্রমপুরে কোন বড় সাহিত্যিক নাই। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্নঘোষ একমাত্র সাহিত্যিক ছিলেন, তাহার লেখায় ভাষার যত আড়ম্বর ভাবের তত সুক্ষ্মতা বা প্রগাঢ়তা নাই। * * * * *।” বিক্রমপুর সম্বন্ধে এইরূপ অভিযোগ-জ্ঞাপক প্রবন্ধ যখন বন্ধু-জন-সমক্ষে আমরা পাঠ করিতেছিলাম, তখন জানি না কে যেন আমার হৃদয় হইতেই বলিয়া দিতেছিল “এই অভিযোগ শুনিওনা— বিক্রমপুর এত কৃপার পাত্র নয়।” বোধ হয়, আমি বিক্রমপুরবাসী বলিয়াই এই আশ্বাস বাণী পাইয়াছিলাম; ইহারই ফলে আমি বিক্রমপুরের অতীত ও বর্ত্তমান সাহিত্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হইয়াছি, আজি তাহারই কিয়দংশ প্রবন্ধাকারে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইব।

আমি যদিও এই বিষয়ে আলোচনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তথাপি একমাত্র

বিক্রমপুরবাসী বলিয়াই এইরূপ অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের ন্যায়,মূকের বাগ্মিতা লাভ করিবার ন্যায়, আমার এ উদ্যোগও উপহাসাস্পদ, সন্দেহ নাই, কিন্তু যেই বিক্রমপুরকে স্বর্গ হইতেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, তাহাকে ঈদৃশ অন্যায় অভিযোগ-কলঙ্ক-কালিমায় নিষ্প্রভ দেখিব কেমন করিয়া ? তাই আজ আমার অভিজ্ঞতানুসারে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত দেখাইব যে. বিক্রমপুরবাসী সাহিত্যাচার্য্যগণ অতি দক্ষতার সহিতই সাহিত্যসেবা করিয়া আসিতেছেন, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহাদের অবিশ্রান্ত সাহিত্য চর্চ্চায় বঙ্গভাষা সম্পদশালিনীই হইয়াছে। এমন কি ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই একএক সময় বঙ্গসাহিত্যের স্তম্ভরূপে বিরাজিত ছিলেন। এখন আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের বক্তব্য বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

এখানে পাঠকের নিকট বলিয়া রাখি যে, আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকাতে যেমন অন্যান্য বিষয়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি, সাহিত্য সম্বন্ধেও সেইরূপই বলিতে হইবে। বিশেষতঃ আমাদের অতীত গগন যখন তমসাচ্ছন্ন, তখন অতীত সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে কোন কথা বলিবার অধিকার সকলের নাই। তবে এই অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া কোন কোন মহাত্মা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। এতদ্ব্যতীত আমরা যাহা চেষ্টা করিলে রক্ষা করিতে পারিতাম, তাহারও সুযোগ শৈথিল্য বশে হারাইয়া ফেলিতেছি। কাজেই এই প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহা পর্য্যাপ্ত হইবে না। কারণ প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অন্যের যেরূপ সীমাবদ্ধ, আমাদেরও তদ্রূপই।

তবে ইহা নিশ্চিত যে, বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কাল হইতেই বিক্রমপুরের অনেক শিক্ষিত সন্তানই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া "মুট কলমে ইতিহাসপুরাণ অবলম্বনে পুঁথি" লিখিতেন এবং বৈকালে কোন প্রকাশ্য স্থানে গ্রামস্থ সমস্ত অবসর-প্রাপ্ত ভদ্র অভদ্র লোক একত্র হইয়া রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদি শ্রবণ করতঃঅপূর্ব্ব সাহিত্যানন্দ উপভোগ করিতেন।

প্রায় ২৫০ আড়াইশত বৎসরের পূর্ব্বের লিখিত দ্বিজ রামকৃষ্ণের "সত্যনারায়ণের পাঁচালী" প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রামকৃষ্ণ বিক্রমপুর বাসী ছিলেন। তাহার পাঁচালি বর্ণনা প্রাচীন কবিগণের বর্ণনা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। ভাষাও সর্ব্ব-জন বোধ্য। ইঁহার গ্রন্থের অনেক স্থলে স্বাভাবিক বর্ণনা অবলোকন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

কবি রাজেন্দ্রদাসও বোধ হয় ইঁহারই সমসাময়িক হইবেন। অনেক ঐতিহাসিকই কবি রাজেন্দ্রদাসের নিবাস বিক্রমপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত মহাভারত প্রাচীন সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ বলিয়া কথিত। তিনি শকুন্তলার উপাখ্যান হইতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে মহাভারত আরম্ভ করিয়াছেন। শকুন্তলার উপাখ্যান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন "শকুন্তলা উপাখ্যানটী বেশ হইয়াছে—ইহা কালিদাসের প্রতিচ্ছায়া ও মধ্যে মধ্যে মাঘ প্রভৃতি কবির উৎপ্রেক্ষা-মণ্ডিত।"

বিক্রমপুরে এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের সংবাদ আর বেশী প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহারই ১০০ শত বৎসর পরে জপসা-নিবাসী এক পরিবারভুক্ত লালা রামগতি, লালা জয়নারায়ণ, আনন্দময়ী ও গঙ্গা দেবী প্রভৃতির সাহিত্য অর্চ্চনার পরিচয় পাওয়া যায়।

যেই সময়ে ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" ও আলওয়াল কবির পদ্মাবতীর "রসতরঙ্গ" বঙ্গের পল্লী সমূহ ভাসাইতেছিল, যেই সময় তাঁহাদের গ্রাম্যতা-দোষ-দুষ্ট কবিতা পাঠ করিয়া পাঠকগণের হৃদয় কলুষিত হইতেছিল, সেই সময় লালা রামগতি সেন সাময়িক স্রোতের বিপরীতে লেখনী ধারণ করিয়া বঙ্গ ভাষায় "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" ও সংস্কৃত ভাষায় "যোগ কল্পলতিকা" প্রণয়ন করেন।

"মায়াতিমির-চন্দ্রিকা" প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের পন্থা অবলম্বন করিয়া লিখিত। এই কাব্য খানার অধিকাংশই রূপকচ্ছলে ধর্ম্মোপাসনাপূর্ণ। এই কাব্য খানা যে বঙ্গ ভাষার উজ্জ্বল কীর্ত্তি, তাহা বলাই বাহুল্য।

ইহারই পরে ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে "হরি লীলা" নামক একখানা কাব্য লালা জয়নারায়ণ ও তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী দেবী উভয়ে মিলিয়া রচনা করেন। আনন্দময়ী রামগতি সেনের কন্যা। উক্ত গ্রন্থ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ২০ বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল।

আনন্দময়ী বঙ্গীয় মহিলা-কবিদের মধ্যে অত্যুচ্চ স্থান পাইবার যোগ্যা। হরিলীলার যে যে অংশে তাঁহার লেখা রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই প্রতীতি জন্মিবে যে, তিনি কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে অসাধারণ ছিলেন।

'হরিলীলা' সত্যনারায়নের ব্রতকথা হইলেও ইঁহাদের হাতে পড়িয়া সুন্দর ও বৃহৎ কাব্যে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আনন্দময়ী সঙ্গীত রচনায় পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতমালা আজিও বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যে গীত হইয়া থাকে। যে সকল শ্রোতা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা আনন্দময়ীর কবিত্বে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

কবি জয়নারায়ণ যদিও কবি রামগতি সেনের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তথাপি ইঁহার রুচি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রুচির ন্যায় ছিল না। তিনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। ভারতচন্দ্রের পন্থাবলম্বনে কবিতা লিখিতেন। কিন্তু শিষ্যের রচনা গুরুর ন্যায় গ্রাম্যতা-দোষ-দুষ্ট নহে। অনেক সময় কবিত্বে গুরুর সহিতও তিনি প্রতিযোগীতা করিতে পশ্চাৎপদ্ হইতেন না। তিনি যেমন হরিলীলায় অনেকাংশে প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি "চণ্ডীকাব্য" প্রণয়ন করিয়াও অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি অতিশয় সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার কাব্যে কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্যের ছায়া পড়িয়াছে। এমন কি, কালিদাসের অনেক শ্লোক ভাঙ্গিয়া তিনি কবিতা প্রস্তুত করিয়াছেন।

গঙ্গাদেবী লালা জয়নারায়ণ সেনেরই ভগিনী ছিলেন। বিদুষী গঙ্গাদেবীর রচিত সঙ্গীতগুলি পূর্ব্ববঙ্গবাসীর মন-প্রাণ-হরণ করিয়া আসিতেছে। বিবাহ অন্নারম্ভ প্রভৃতি মঙ্গলানুষ্ঠানে তাঁহার গান গীত হয়।

কিন্তু আজকাল বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলানুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে গান করা আধুনিক সভ্যতানুমোদিত নয় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, মহিলাগণের নিকট ক্রমশঃই এই

সকল সঙ্গীত অনাদৃত হইতেছে। অনেক স্থানে লোপও হইয়াছে। কিন্তু যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আধুনিক বিলাসী ব্যক্তিগণের অনুমোদিত না হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করতঃ হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান, তাঁহাদিগকে মোহিত করিবেই করিবে।

অতঃপর কবি শিবচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি "সারদামঙ্গল" ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছেন সারদা-মঙ্গল কাব্য খানি রামায়ণেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। এই কবির বর্ণনা ও ভাষা বড়ই উপাদেয়। তিনি জনসাধারণের কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতা চপলমতি বালকগণও বুঝিতে সক্ষম।

এতদ্ব্যতীত নিরক্ষর কবিগণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও তাহারা নিরক্ষর, কিন্তু তাহাদের কবিত্ব লিখিত ভাষার অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের কথিত ভাষা অবলম্বনে সঙ্গীতে ও ছড়ায় অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন বঙ্গ ভাষায় বিক্রমপুরবাসীর কৃতিত্ব কিরূপ ছিল, তাহা এখানে দেখাইলাম। ইহাকে আমরা প্রাচীন যুগ বলিয়াই অভিহিত করিব। অতঃপর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্য বিক্রমপুরবাসীর নিকট কিরূপ ঋণী, তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাইব। এই সময়কে সাহিত্যালোচনার মধ্যযুগ বলিয়াই আমরা উল্লেখ করিলাম। আধুনিক সাহিত্যও বিক্রমপুরবাসী কর্ত্তৃক কিরূপ উন্নত হইতেছে, তাহাও ক্রমান্বয়ে দেখাইব।

যে সময়কে আমরা মধ্যযুগ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, সেই সময় হইতেই বঙ্গ সাহিত্য ভাবুকতার যুগ হইতে বাস্তব সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। এই সময় হইতেই ভাবুকতার সহিত বাস্তব জীবনের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্য যে বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে নিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে, তাহার সূচনা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে বঙ্কিম ও কালীপ্রসন্ন তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের সময় হইতেই প্রকৃত প্রভাবে বঙ্গ সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে নামিবার যোগ্যতা লাভ করে। এই যুগেই সাহিত্যের সকল বিভাগেই একটা যুগান্তর দৃষ্ট হয়। সুখের বিষয়, বিক্রমপুরবাসী সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই যেরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা সাহিত্য-সংসারে চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।

কি গদ্য সাহিত্যে, কি কাব্যে, কি সঙ্গীত সাহিত্যে, কি ভাষাতত্ত্বালোচনায়, কি উপন্যাস-প্রণয়নে, কি সংবাদপত্র পরিচালনে, যে কোন বিভাগেই অবলোকন করনা কেন, দেখিবে, বঙ্গ-সাহিত্য বিক্রমপুরবাসী কর্ত্তৃক অপূর্ব্ব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে।

এই সময়ের সাহিত্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল সর্ব্বাগ্রে মুন্সী কাশীনাথ দাশগুপ্তের নাম উল্লেখ্য। তিনি ক্রমান্বয়ে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে (১) শব্দদীপিকা (২) পঞ্চবটী তত্ত্ব (৩) অবলা-জ্ঞান দীপিকা প্রধান।

শব্দার্থ-দীপিকা একখানি আশ্চর্য্য অভিধান। ইহাতে আদি ও অন্ত্যবর্ণের পর্য্যায়ক্রমে শৃঙ্খলা করিয়া শব্দার্থ লিখিত হইয়াছে। ৭০৪ পৃষ্ঠা পূর্ণ। এই বৃহৎ অভি-

ধান প্রণয়ন করিয়া তাৎকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের নিকট হইতে অজস্র সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পঞ্চবটীতত্ত্বে পরলোক, আত্মা, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে এবং অবলা-জ্ঞান-দীপিকা নামক গ্রন্থে পদ্যে নারীগণের প্রতি নানাবিধ উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কন্যা-পণের দারুণ অত্যাচারে ব্রাহ্মণকুলের সর্ব্বনাশ হইতেছে দেখিতে পাইয়া, তিনি "কন্যাপণ-বিনাশিকা" নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি এরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহা সাদরে গৃহীত হইয়া ইংলণ্ডস্থ পার্লিয়ামেণ্ট ও এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীতেও উহা রক্ষিত হইয়াছে।

ইহার পর গিরীশচন্দ্র বসুর নাম বলা যাইতে পারে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশের "হিন্দুইণ্টেলিজেন্সার" নামক একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করেন। ইহারই কতিপয় বৎসর পরে "হিন্দু পেট্রিয়টের "জন্ম হয়। এই পত্রের সহিতও তিনি বিশেষরূপে সংসৃষ্ট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বঙ্গভাষার আলোচনায়ও কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন প্রকাশিত 'প্রভাকর' "রসরাজ" প্রভৃতি পত্রের শ্রেষ্ঠ নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরে 'নবদীবন' ও "জন্মভূমি" প্রভৃতি পত্রিকায় অতি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী লিখেন। তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে "সেকালের দারোগার কাহিনী" মাত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবি দ্বারকা নাথ গুপ্তের সাহিত্য-সেবা সাহিত্য-সমাজে কখনও অপরিচিত নহে। যে সময়ে বিদ্যাসাগর "বেতাল পঞ্চবিংশতি" রচনা করিতে যাইয়া ভাষার আড়ম্বরতায় তাহা দুর্ব্বোধ্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই সময় দ্বারকানাথ তাহার মৌলিক গ্রন্থ "হেম-প্রভা" অতি সহজ ও সরল ভাষায় রচনা করেন। উহা কাদম্বরীর পন্থাবলোকনে লিখিত। এই হেমপ্রভাই একদিন সাহিত্য-সমাজে গদ্য-সাহিত্যের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বারকানাথের কৃতিত্ব এখানেই শেষ হয় নাই।

মাইকেল মধুসূদনের "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য" রচিত হইলে ইহার কিঞ্চিৎ পরে দ্বারকানাথের "ত্রিসন্ধ্যা" নামক ঈশ্বর বিষয়ক কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উহা মধুসূদনের অভিনব বিরচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে মধুসূদন দ্বারকানাথের সহিত সাহিত্যিক ভাবে সৌহৃদ্য স্থাপন করেন এবং তাঁহাকে কবিতা রচনা করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। দ্বারকানাথ নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কবিত্ব ভাণ্ডার স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন। দ্বারকানাথের অনেকগুলি অপ্রকাশিত গ্রন্থ আজিও কীট-দষ্ট হইতেছে।

অতঃপর বঙ্গসাহিত্যে সাহিত্যাচার্য্য কালীপ্রসন্ন ঘোষের সম্রাটত্বই মনে হয়। যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন কালীপ্রসন্নের "বান্ধব", তথা তৎকৃত গ্রন্থাবলী বঙ্গ-ভাষা-সরস্বতীর কণ্ঠদেশে অভিনব মণি-মুক্তা-খচিত মাল্য-রূপে পরিশোভিত থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনের" নিকট বঙ্গভাষা যেরূপ ঋণী, কালীপ্রসন্ন ঘোষের "বান্ধবের" নিকট সেইরূপই ঋণী। ইহা যদি কেহ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া অস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহাকে

বাতুল এই আর কি বলিতে হইবে, জানি না। কেননা প্রচণ্ড রবিকর-রশ্মির প্রতিরোধ করিতে কেহ চেষ্টা পাইলে, তাহার প্রতি ভাষা প্রয়োগ করিতে হইলে যেমন উন্মত্ত বই আর ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেইরূপ, যে ব্যক্তি এই প্রকার প্রাকৃত জনের ন্যায় প্রলাপ বকিতে প্রয়াস পায়, তাহাকেও উন্মত্ত বলিয়াই সম্বোধন করিব।

"বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-মালায় যেমন তাঁহার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ ও সারগ্রহণের শক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয়, তেমনি, কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধাবলীতে ভাবের গভীরতা ও অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া পাঠককে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়।"*

পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় † বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্নের বিষয় বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন "ইঁহারা (কালীপ্রসন্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র) দুইজনে দুই প্রকার বাঙ্গালার প্রবর্ত্তক এবং আধুনিক বাঙ্গালার সংস্কারক। একজন (কালীপ্রসন্ন) বাঙ্গালায় মেকলে বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত ও আর একজন (বঙ্কিম) ওয়াল্টারস্কট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত। 'কালীপ্রসন্নের ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার যাহা অভিমত, তাহা এই— "কালীপ্রসন্নের বাঙ্গালা উদ্দীপনার তরঙ্গে তরঙ্গময়ী ও তাড়িত স্রোতের প্রমত্ত স্রোতস্বিনী, সৌভাগ্য বশতঃ তাঁহার লেখা যেমন সুন্দর, তেমনিই শুদ্ধ এবং এইজন্য উহা শুদ্ধ ও সুন্দর রচনার আদর্শ।

কালীপ্রসন্নের প্রভাত-চিন্তা প্রকাশিত হইলে স্বর্গগত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

"দরিদ্র বাঙ্গালা ভাষা বলে কোন জন
যেখানে এ রত্ন আছে কোথা লাগে তার কাছে
কুবেরের ধনাগার অতুল ধরায়।"

এতদ্ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন তিনি মনে করিতেন "বঙ্গদর্শন যাহা করে নাই, বান্ধব তাহা করিবে।"

এখন আমরা কাব্য ও সঙ্গীত সাহিত্যের আলোচনা করিব। এই সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ আমাদিগকে শ্রেণী বিভাগ করিয়া লইতে হইবে। যাঁহারা প্রাচীন পন্থাবলম্বনে সঙ্গীত রচনায় ও কাব্য প্রণয়নে অভ্যস্ত ছিলেন, যাঁহারা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষালোক প্রাপ্ত হন নাই, অথচ তাঁহাদের কবিত্বে জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহাদিগকে পল্লী কবি বলিয়া অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা একশ্রেণীর পাঠকের মনপ্রাণ মুগ্ধ করিতেছে। তাঁহাদিগকে কি করিয়া অবহেলা করিব? এই শ্রেণীর সাধক কবিদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত পাঠক, রাজমোহন আম্বলী, প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বিজ মধুসূদনের নাম উল্লেখযোগ্য। উঁহাদের মধ্যে এক দ্বিজ মধুসূদন ব্যতীত প্রত্যেকেই সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আজিও পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইঁহাদের সঙ্গীত প্রাণের সাহিত্য ভালবাসেন। বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যে দুই চারিজন একত্রিত হইলে তথায় "জানি কার রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে শ্যাম গৌর হয়েছে" প্রভৃতি

---

* প্রবাসী, ১৩১৭, ভাদ্র।

† এই প্রবন্ধ রচনার সময় লেখক জীবিত ছিলেন।

প্রাণারাম সঙ্গীতগুলি প্রাণে বিমল আনন্দের প্রবাহ আনিয়া দেয়।

রামপ্রসাদ সেনের বিরচিত গানের সুর যেমন রামপ্রসাদীসুর নামে কথিত হইয়া আসিতেছে, তেমনি কৃষ্ণকান্ত পাঠক যে অভিনব গানের সুর রচনা করিয়াছেন, তাহা "কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। উহা যেমন নূতন, তেমনি শ্রুতিমধুর।

দ্বিজ মধুসূদন (১) একরূপ লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যেরূপ মনোজ্ঞ কবিতা-মালা রচনা করিয়া বীণাপাণির কণ্ঠদেশে প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক কবিগণের নিকট যে শ্লাঘ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মধুসূদনের গন্তব্য-পথ স্বাধীন ও মনোরম। তিনি "মনসা-মঙ্গল", "সত্য নারায়ণের পাঁচালী," "শনির পাঁচালী" প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মনসা-মঙ্গল কাব্যে আমরা যেরূপ কবিত্বের পরিচয় পাইয়াছি. তাহাতে তাঁহার নাম বিজয় গুপ্ত, কাণা হরিদত্ত ও নারায়ণ দেবের নামের সঙ্গে একত্র গ্রথিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করি।

এই সঙ্গে মুন্সী শম্ভুনাথ দাশগুপ্তের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি "মাধব মালতী" যাত্রার পালা বা গীতিকাব্য রচনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার রচিত শ্যামা বিষয়ক অনেক সঙ্গীতও পাওয়া যায়, "মন কালী কালী বল মুখে" প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটী তাঁহারই লেখনী-প্রসূত।

যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কবিত্ব শক্তিকে এক অভিনব সৃষ্টিচাতুর্য্যে শিক্ষিত সমাজের উপযোগী করিয়া চালনা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা শিক্ষিত সমাজের কবি বলিয়াই অভিহিত করিব। এইরূপ পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত কবিদিগের মধ্যে আনন্দচন্দ্র মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র রায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সাহিত্যাচার্য্য কালীপ্রসন্ন ঘোষের নাম উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহাদের কথাই এখন আমাদিগকে বলিতে হইবে।

আনন্দচন্দ্র মিত্রের "হেলেনা কাব্য," "ভারত-মঙ্গল" "মিত্রকাব্য" "মাতৃমঙ্গল" প্রভৃতি শিক্ষিত সমাজে কিরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। যিনি সহৃদয়তার সহিত বঙ্গভাষা অধ্যয়ন করিতে বসিবেন, তিনি মিত্র কবির কাব্যাবলী উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। পাশ্চাত্য ভাবাধিক্যের জন্য আমরা বঙ্গীয় কবিদিগকে অবজ্ঞার সহিত দেখি সত্য, কিন্তু যে সকল কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সমন্বয় করিয়া আধুনিক কালোপযোগী কাব্য লিখিয়াছেন, আনন্দচন্দ্র মিত্র তাঁহাদের মধ্যেই একজন, সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। মিত্র কবির কাব্য যে ভাবেই আলোচিত হউক না কেন, কোন রসজ্ঞ পাঠকই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। মিত্র কবির কাব্যাবলী ব্যতীত তাঁহার "পথিক" ভণিতা যুক্ত সঙ্গীত মালাও বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিতেছে।

যাঁহাদের ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত কবি গ্রের কবিত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, কবি গোবিন্দ চন্দ্র রায়ের কবিত্ব-মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে

---

(১) দ্বিজ মধুসূদনের অপ্রকাশিত কাব্য সম্বন্ধে বিক্রমপুরের উন্নতিকামী ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

তাঁহাদের আর বেগ পাইতে হইবে না। ইংলণ্ডীয় কবি গ্রে গাড়ী গাড়ী কাব্য লিখিয়া সাহিত্যের বাজারে পাঠান নাই। আমাদের রায় কবিও বস্তা বস্তা কাব্য লিখিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু গ্রে যেমন "এলিজি" নামক কবিতা লিখিয়া সাহিত্য-সমাজে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনেও" এবং "কতকাল পরে বল ভারতরে" শীর্ষক দুইটী সঙ্গীতের জন্য কি রায় কবি অমর হইবেন না? উক্ত সঙ্গীত দুইটী কি দেশের ঘরে ঘরে প্রবাদের মত বিরাজ করিতেছে না? তবে কেমন করিয়া বলিব, রায় কবি প্রকৃত কবিত্বের অধিকারী নন্?

এই প্রসঙ্গে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম করিতে আমরা বিরত হইব না। যদিও তিনি "অবলা-বান্ধব" প্রণয়ন করিয়া থাকুন এবং অপরাপর বিভাগে অশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়া থাকুন,তথাপি তাঁহার বিরচিত সুমধুর সঙ্গীতের কথা মনে হইলে তাঁহাকে অন্য কিছু বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় তিনিও একজন প্রকৃত কবি ছিলেন। তাঁহারই "রচিত" সঙ্গীতটী আজও আমাদিগকে একটী অভাব জাগাইয়া দিতেছে—"না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" দ্বারকানাথের মতের সহিত যদিও সকল বিষয়ে আমরা একমত হইতে পারিব না, তথাপি তাঁহার যোগ্যতা কে অস্বীকার করিবে?

অতঃপর সাহিত্যাচার্য্য কালীপ্রসন্নের সঙ্গীত-মালার কথা মনে হইলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, আমাদের মনে হয়, কালীপ্রসন্ন যদি তাঁহার সঙ্গীতগুলিই মাত্র বঙ্গভাষাকে উপহার দিয়া যাইতেন, তথাপি বঙ্গবাসী তাঁহার নাম কখনও ভুলিতে পারিত না। তাঁহার রচিত "প্রাতঃ সময়ে জাগরে হৃদয়, স্মররে ভরতারণে" এবং "উর গো বাণী বীণাপাণি" প্রভৃতি প্রত্যেক সঙ্গীত গুলিই যেন এক একটী কবিত্বের আধার। এইরূপ শক্তিধর পুরুষগণ সঙ্গীত-সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই এত অল্প কালের মধ্যে বাঙ্গালী বলিতে সমর্থ হইয়াছে—

"বাঙ্গালী আজি গানের রাজা, বাঙ্গালী নহে খর্ব্ব।"

যে ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের মত অসামান্য প্রতিভা, কি চরিত্র-বিশ্লেষণে, কি সৃষ্টি-চাতুর্য্যের অভিনব-কল্পনায়, কি ভাষা-মাধুর্য্যে উপন্যাস সাহিত্যকে উন্নতির চরম স্থানে স্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই ভাষাতে "রায় পরিবারের" মত উপন্যাস এক হিসাবে নগণ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখের কথা, বাঙ্গালীর আশা-ভরসার কথা এবং সর্ব্ব প্রকারে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র দেখিতে ইচ্ছা করেন. তাঁহাদের নিকট "রায় পরিবার" সততই আদর পাইতেছে। এই কার্য্যে রায় পরিবার গ্রন্থকার ৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিরূপ কৃতকার্য্য লাভ করিয়াছেন. তাহা সুধীজনেরই বিবেচ্য। তাঁহার রচিত "ললনা-সুহৃদ", "দাম্পত্য-সুহৃদ্" প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ইহারই পরে বরদাকান্ত সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনিও "অতুলচন্দ্র" "প্রতিভা" "হেমপ্রভা" প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে সুলেখক বলিয়া

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত "ভারত-ভ্রমণ", "চাঁদের বিয়ে", "আমার গান ও কবিতা" প্রভৃতি গ্রন্থের যশোরাশিও সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছে।

বঙ্গ ভাষা-তত্ত্ব আলোচনা করিতে বিক্রমপুরের ভাষা-তত্ত্ব-বিৎ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় কিরূপ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার রচিত "ভাষা-তত্ত্ব" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল তাহা জ্ঞাত আছেন। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি যে বঙ্গীয় লেখকগণকে এক অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

এতদ্ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় (১) শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন "মহাশয়ের সাহিত্য-প্রবেশ ব্যাকরণ" বাঙ্গালা ব্যাকরণের মধ্যে অত্যুচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। তিনি যেমন অগাধ-পাণ্ডিত্যের অধিকারী, তেমনি তাঁহার রচিত গ্রন্থ তাঁহারই যোগ্যতা ঘোষণা করিতেছে। অধিকন্তু তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি বলিয়াও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি অতি প্রাঞ্জল রস মধুর ভাষায় সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারেন। অনেক সংস্কৃত কবিতা রচনার প্রতিযোগীতায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বহুবার পুরস্কৃত হইয়াছেন। তাঁহার কবিত্বখ্যাতি অতি সুদূর কাশী, কাঞ্চী এবং দ্রাবিড় দেশেও বিঘোষিত হইয়াছে।

সংবাদ-পত্রাদি পরিচালনে বিক্রমপুরবাসী দুইজন তেজস্বী বাঙ্গালী বিভিন্ন প্রদেশে থাকিয়াও যে অসাধারণ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই। পঞ্জাবে "ট্রাইবিউন" পত্রিকার সম্পাদক শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং বিহারে Behar Herald সম্পাদক গুরুপ্রসাদ সেন যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা চিরদিন স্বদেশে ও বিদেশে বিঘোষিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত বিক্রমপুরবাসীর মধ্যে সাহিত্যচর্চ্চার কিরূপ অদম্য স্পৃহা ছিল, তাহা বিক্রমপুর হইতে পরিচালিত "পল্লী-বিজ্ঞান" নামক মাসিক পত্র খানা এবং "বিক্রমপুর" নামক সাপ্তাহিক পত্র খানাই প্রকাশ করিতেছে।

জৈনসার-নিবাসী 'জজবাবু' অভয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে এবং জৈনসার স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনে ১২৭৩ সালের মাঘ মাসে সর্ব্ব প্রথম "পল্লী-বিজ্ঞান" প্রকাশিত হইয়াছিল। যদিও কতিপয় বৎসর মধ্যেই এই পত্র খানার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল, তথাপি যে কয় বৎসর উহা পরিচালিত হইয়াছিল তাহা বহু সার-গর্ভ সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধাদি-ভূষিত হইয়াই প্রকাশিত হইত।

এতদ্ব্যতীত "বিক্রমপুর" নামক সাপ্তাহিক পত্রখানা লৌহজঙ্গের পাল বাবুদের অধিনায়কত্বে প্রকাশিত হইত। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহার পরিচালন কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়।

সুখের বিষয়, লুপ্ত শ্রীর পুনরুদ্ধার করিবার মানসে বিক্রমপুরের ইতিহাস-রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক বিক্রমপুর নামক ত্রৈমাসিক পত্র ১৩২০ সনের বৈশাখ হইতে সম্পাদিত হইতেছিল।

---

(১) প্রবন্ধ রচনার সময় পণ্ডিতপ্রবর জীবিত ছিলেন।

কিন্তু গুপ্ত মহাশয়ের নবোৎসাহ-তরঙ্গ এ স্থানেই প্রতিহত না হওয়াতে, বর্ত্তমান বর্ষ হইতে বিক্রমপুর মাসিক পত্র রূপে পরিচালিত হইতেছে।*

মধ্যযুগ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা শেষ করিলাম। বর্ত্তমানে যাঁহারা সাহিত্যালোচনা দ্বারা বঙ্গ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এখন কোন মতামত প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি. যেহেতু, তাঁহারা সাহিত্য-সরস্বতীকে আরও অভিনব অলঙ্কারে সজ্জিত করিতে যে পারিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে ?

বর্ত্তমান লেখকগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে আমরা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

(১) কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস।
(২) কবি চিত্তরঞ্জন দাশ, বি-এ, বার-এট-ল।
(৩) "বারভুঞা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়।
(৪) শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(৫) „ জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল।
(৬) "শিক্ষা-সমাচার"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ,বি-এল।
(৭) শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র শাস্ত্রী।
(৮) " নগেন্দ্রনাথ সোম, বি-এ।
(৯) "শিক্ষা-বিজ্ঞান"-প্রণেতা, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, এম-এ। †
(১০) "ঢাকার ইতিহাস"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়।
(১১) "বিক্রমপুর"-সম্পাদক ও "বিক্রমপুর ইতিহাস"-প্রণেতা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
(১২) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখক নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ।
(১৩) "কবীর" প্রণেতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনগুপ্ত, এম-এ।
(১৪) "সুকণ্ঠ" প্রণেতা শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাশগুপ্ত, এম-এ, বি-ল।
(১৫) কবি পরিমলকুমার ঘোষ, বি-এ।
(১৬) শ্রীযুক্ত হরকুমার মুখোপাধ্যায়. বি-এল।
(১৭) " নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী, বি-এল।
(১৮) " উমাচরণ সেন, বি-এল।
(১৯) " কামিনীকুমার ঘটক।
(২০) বার্ত্তাবহের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন, সাহিত্য-বিশারদ।
(২১) "পল্লী" প্রণেতা কবি দুর্গামোহন কুশারী।

বিক্রমপুরবাসিনী যে সকল রমণী সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যশস্বিনী হইতেছেন, তাঁহাদের নামও নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—(১) শ্রীযুক্তা অবলা বসু, (২) শতদলবাসিনী বিশ্বাস, (৩) শ্রীযুক্তা সুশীলাসুন্দরী সেনগুপ্তা, (৪) শ্রীযুক্তা জগৎলক্ষ্মী দেবী, (৫) শ্রীযুক্তা বিমলা দাশগুপ্তা, (৬) শ্রীযুক্তা সরযূবালা দাশগুপ্তা, (৭) শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী।

---

* বর্ত্তমান বর্ষে বিক্রমপুর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

† ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না যে 'গৃহস্থ' পত্রের 'নবসংস্করণ' শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সাকার মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনেই হইয়াছে। বাস্তবিকই 'গৃহস্থ' বঙ্গীয় মাসিক সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নব যুগ আনয়ন করিয়াছে। ইহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে অনেক খ্যাতিশীল পত্রিকার সম্পাদককেই দেখিয়াছি ; ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন ?

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর * নামও এই সঙ্গে করা যাইতে পারে। এই বিদুষী রমণীর বিদ্যাবত্তার জন্য বিক্রমপুর-বাসীর গৌরব অনুভব করা উচিত।

বর্ত্তমান লেখকগণের মধ্যে কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের লেখনী যদি এখনও অবসর গ্রহণ করে, তথাপি তাঁহার নাম বঙ্গ-ভাষায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। তাঁহার "প্রেম ও ফুল" "কঙ্কুম", "চন্দন" "ফুলরেণু" প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থই তাঁহাকে জীবিত রাখিবে।

অধুনা-প্রকাশিত উদ্দীপনাপূর্ণ "বাবা থাকুক আমার বিয়ে" এবং "স্নেহলতা" শীর্ষক সামাজিক চিত্রময় কবিতাগুলি দাস কবির আসন বঙ্গীয় কবি-সমাজে আরও দৃঢ়তর করিতেছে।

বস্তুতঃ বঙ্গীয় কবি সমাজে দাস কবির আসন কোন্ স্থানে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার সময় এখনও আসে নাই। কারণ তিনি এখনও জীবিত আছেন, জীবিত কবির সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উজ্জ্বল।

অতঃপর কবি চিত্তরঞ্জন দাশের কবিত্ব-মাধুর্য্যও বঙ্গীয় পাঠককে মুগ্ধ করিতেছে। তদীয় "মালঞ্চ" নামক কাব্য প্রকাশিত হইলে, একদিন যেমন তাহার কবিত্ব-মধু নাষে পাঠকগণ তৃপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সদ্য "প্রকাশিত তাঁহার "সাগর সঙ্গীত"ও ভাব মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্য-গৌরবে সকলকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। (১)

বর্ত্তমান লেখকগণের পরিচয় প্রদান করিতে বাহুল্য ভয়ে এখানেই ক্ষান্ত রহিলাম। কিন্তু পাঠকগণের নিকট এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি কিনা ?

বিক্রমপুরের শ্যামল শোভার সম্পদ মধ্যে কলকণ্ঠবিহগগণের সুমধুর স্বরলহরী যেমন সকলকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, তেমনি বিক্রমপুরের বাসন্তী-কুসুম-সুশোভিত পদ্য সাহিত্য-কাননে পাপিয়া কোকিলের ঝঙ্কারে সৌন্দর্য্য-সম্ভার অশেষরূপে বর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছে। সেইরূপ গদ্য সাহিত্যেও ভাবের গঙ্গা প্রবাহিত করিয়া বঙ্গ ভাষাকে উদ্দীপনার পূর্ণোৎস, ভাব-গাম্ভীর্য্যের অনন্ত খনি করিয়াছে। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, বিক্রমপুরে কবি নাই ?—সাহিত্যিক নাই ? তবে কি করিয়া বলিব যে, বিক্রমপুরে সাহিত্য-রসে বঞ্চিত ?

আমরা স্বীকার করি, কালিদাসের মত, সেক্সপিয়রের মত, মিলটনের মত মহাকবি বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন নাই। স্বীকার করি, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথও বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ

---

* শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু মহাশয়া ইংলণ্ডের "রয়াল সোসাইটীর অব্ লিটারে চার" এর সভ্য হইয়াছেন। অনেক উচ্চ শিক্ষিতা শ্বেতাঙ্গিনী রমণীও এই পদ পাইলে আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা মনে করেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী এই পদ লাভ করিয়া বাস্তবিকই বঙ্গমহিলা-কুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

(১) ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ হইতে কবি চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পাদনে 'নারায়ণ' নামক এক প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত পত্রে দাস পরিবারের অনেকেই সাহিত্য চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কবিবর নিজেও অতি সুমধুর কবিতা রাশি দ্বারা বঙ্গীয় পাঠকের মনোরঞ্জন করিতেছেন।

করেন নাই। কিন্তু কবি রাজেন্দ্র দাস, লালা রামগতি, লালা জয়নারায়ণ, আনন্দময়ী, গঙ্গামণি, শিবচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দ্বারকানাথ, কালীপ্রসন্ন, আনন্দচন্দ্র, গোবিন্দ রায়, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, শীতলাকান্ত এবং গুরুপ্রসাদ ত বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? বিক্রমপুরই ত চিত্তরঞ্জন, বিনয়কুমার, যোগেন্দ্রনাথ, আনন্দনাথ, নলিনীকান্ত ও সরোজিনী নাইডুকে প্রসব করিয়াছেন? কবিবর গোবিন্দচন্দ্র বিক্রমপুরেই ত স্বীয় আবাস-মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন? তবে কেন বিক্রমপুর সাহিত্য রস-শূন্য মরুভূ সদৃশ বলিয়া অভিযুক্ত হইবে? মাহাকবির জন্ম কি সকল দেশেই সম্ভবপর? তবে বঙ্গের প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক পরগণায় এক একজন মহাকবির আবির্ভাব দেখি না কেন?

আজ আমাদের কালীপ্রসন্ন নাই; তাই এই অসহ্য অভিযোগ বিক্রমপুরবাসী নীরবে সহ্য করিতেছে। কিন্তু যদি কালীপ্রসন্ন থাকিতেন,তবে তিনি ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার উদ্দীপনায় এবং অশেষ যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া দেখাইয়া দিতেন যে, তাঁহার প্রিয়তম জন্মভূমি যথার্থই বিক্রমে বিক্রমপুর।

তিনিও গিয়াছেন. তাঁহার জন্মভূমির সাহিত্য-গৌরবও যাইতে বসিয়াছে। কেন না, অধুনা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সাহিত্যানন্দ উপভোগ করিবার জন্য যেরূপ উদ্যোগ, চেষ্টা ও যত্ন দেখিতেছি, বহু সাহিত্যিকের জন্মভূমি হইয়াও সমগ্র বিক্রমপুরে সেইরূপ কোন সাহিত্য-সেবার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার উদ্যোগ দেখিতেছি না কেন।*

কাজেই আজি স্বর্গবাসী কালীপ্রসন্নের আত্মার শরণার্থী হইয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে, এস এস বিক্রমপুরের বরেণ্য সন্তান! তুমি ছায়া রূপে তোমার স্বদেশীয় ভ্রাতাদিগকে তোমার সে উদ্বোধন সঙ্গীতটী শুনাইয়া যাও, যেই সঙ্গীতে একদিন বঙ্গসরস্বতীকে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে, আজি তাহাই বিক্রপুরবাসীদিগকে শুনাইয়া যাও! তাঁহারা তোমার ছায়া দর্শন করিয়া নবীন জীবন প্রাপ্ত হউক! গাও, গাও বাণীর বর-পুত্র! তোমার সেই ভক্তি-বিগলিত কণ্ঠে প্রাণারাম সঙ্গীত গাও ঃ—

উর গো বাণি বীণাপাণি
উর গো কল্প-কাননে,
উর গো বঙ্গ-বিনোদি' আজি
বীণা-মধুর-নিস্বনে,
আছে দেহ, তাহে নাহি প্রাণ
না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান,
প্রাণময়ী কর প্রাণ দান
পীযূষ-শক্তি সিঞ্চনে।

আর আশীর্ব্বাদ কর, তোমারই একজন স্বদেশীয় কবি ভ্রাতা যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা যেন সার্থক হয় ঃ—

"জ্বালাময়ী মহাভাষা জাগাবে জাতীয় আশা,
ইন্দিরা খুলিবে রত্ন মন্দির-তোরণ,
উদ্যম জ্বালিবে আগে কর্ম্মের সে অনুরাগে
বিনাশি বিঘন বাধা, বজ্র-দৃঢ়পণ।*

(গোবিন্দচন্দ্র দাস)

শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তী।

---

* "দক্ষিণ বিক্রমপুরের সাহিত্য-সম্মিলনীর" কাজ কয়েক বৎসর যাবত সুচারুরূপে চলিতেছে, সত্য, কিন্তু সমগ্র মিক্রমপুর লইয়া এই সম্মিলনীর কাজ পরিচালিত হইলে কি ভাল হয় না?

* এই প্রবন্ধ রচার সময়ে যে সকল গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, সে সকল গ্রন্থকার ও সম্পাদকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি; বিশেষতঃ বিক্রমপুরান্তর্গত আউটসাই-বান্ধবসমিতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ না হইলে এই প্রবন্ধ রচিত হইত কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। কাজেই উক্ত সমিতির নিকটও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। লেখক—

মাদামব্লাভাস্কির জীবন-কথা।

আর্য্যসমাজ ও পরাবিদ্যাসমিতি।

আর্য্যসমাজ ও পরাবিদ্যা-সমিতি সমসময়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিল। উভয়েরই জন্ম ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। একের জন্মভূমি ভারতবর্ষ, কর্ম্মক্ষেত্রও ভারতবর্ষ, উদ্দেশ্য বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার, লক্ষ্য আর্য্যজাতি। অপরের জন্মভূমি মার্কিনদেশ, কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী, উদ্দেশ্য সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব জ্ঞানপ্রচার, লক্ষ্য বিশ্বমানব। সমিতির জন্মভূমি মার্কিন দেশ হইলেও কিন্তু উহা ভারতের জলবায়ুতে লালিত, পালিত, পরিপুষ্ট। ভারতীয় উপকরণেই যে উহার সপ্তধাতু গঠিত, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। অতএব 'স পিতা পিতরস্তানাং কেবলং জন্মহেতবঃ' মহাকবির এই উক্তি পরাবিদ্যা সমিতি সম্পর্কে ভারতের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। মার্কিনভূমি কেবল উহার জন্ম হেতুই মাতৃস্থানীয়া, কিন্তু উহার প্রকৃত জননী ভারতভূমি। বস্তুতঃ ভারতভূমি ব্যতীত ব্রহ্মবিদ্যার জননী আর কে? তাই যেন উহা প্রয়োজন হেতু পাশ্চাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বাভাবিক সংস্কারবশে উহার জন্মজন্মান্তরীয় সনাতনী মাতা ভারতভূম্রির ক্রোড়ে আসিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল। অতএব 'সমাজ' ও 'সমিতি' উভয়ই ভারতমাতার সন্তান। কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতিতে, আশা-আকাজ্ক্ষায়, গতি-পরিণতিতে উভয়ে প্রভেদ ছিল ও আছে। ইহা কিছু অসম্ভব নহে। এক পিতা মাতার সন্তানের মধ্যে কি আর এ সকল বিষয়ে প্রভেদ দৃষ্ট হয় না? ভারতমাতা সাময়িক প্রয়োজনানুসারে বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীর ন্যায় আত্মরক্ষার জন্য নানা প্রকৃতির সন্তান প্রসব করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রভেদ সত্বেও এক অবিজ্ঞেয় বিধি নিয়তিবশে, বুঝিবা ভারতমাতার সম্পর্কে পরস্পর নিজ জনবোধে, বাল্যেই উভয়ের মিলন হইয়াছিল। আবার এই মিলনের অব্যবহিত পরে সেই বিধি-নিয়তিবশেই, বুঝিবা পরস্পরের প্রকৃতি পরিচয়ে, বাল্য উত্তীর্ণ না হইতেই, উভয়ে বিচ্ছেদ ঘটিল। এক পরিবারভুক্ত হইয়াও প্রকৃতির বিভিন্নতায় উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া একমুখী হইয়া চলিতে পারিল না। এই বিভিন্নতা হইতেই মতান্তর। মতান্তর হইতেই ক্রমে মনান্তরের সৃষ্টি। পাঠক ইহার একটু আধটু আভাস পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

বিচ্ছেদের মুখে উভয় পক্ষে বিস্তর বাদানুবাদ ও তর্ক-বিচার হইয়াছিল। এই বাদানুবাদেও দুই জনের চরিত্রগত বিশেষত্ব অর্থাৎ একের আক্রমণ-নীতি ও অপরের সংরক্ষণ-নীতি, চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। এই বাদানুবাদে পরাবিদ্যাসমিতির পক্ষীয়েরা যেরূপ বিনয়, সহিষ্ণুতা, সংযম ও গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, আর্য্যসমাজপক্ষীয়েরা সেরূপ পারেন নাই। উভয়ের লিখিত বিবরণ হইতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পরাবিদ্যা-সমিতির পরিচালকগণ মহাত্মা দয়ানন্দ স্বামীর প্রতি পূর্ব্বাপর যেরূপ সম্মানের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, আর্য্যসমাজের পরিচালকগণ মহামতি অলকট ও মাদামব্লাভাস্কির প্রতি তদ্রূপ ত নয়ই, বরং

উহার বিপরীত ভাবেই আচরণ করিয়াছেন। এই দুই ভারত-হিতৈষীর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ কোন ভারতবাসীর পক্ষেই শোভনীয় কার্য্য নহে, এবং বোধ হয়, ইহা কাহারও অনুমোদনীয় নহে। কিন্তু আর্য্যসমাজের কোন লেখক তাহাতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এ সম্বন্ধে আর্য্যসমাজের প্রকাশিত পুস্তক পুস্তিকায় সর্ব্বত্র ক্রোধ, অধীরতা ও অসূয়ার চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা আর্য্যসমাজ ও উহার নীতি প্রকৃতি কি, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া কিরূপে এই মতভেদের উৎপত্তি হইল, তাহাই দেখাইব।

আর্য্যসমাজ স্বর্গীয় দয়ানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক স্থাপিত। দয়ানন্দ কে? বোধ হয় অনেক বঙ্গীয় পাঠক ইহা জানেন না। দাক্ষিণাত্যের কাঠিয়াবার প্রদেশান্তর্গত মোর্ব্বি রাজ্যের কোন গ্রামে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে ১৮২৪ খ্রীঃ দয়ানন্দের জন্ম। তাঁহার পিতা অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। দয়ানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম মূলশঙ্কর। মূলশঙ্কর পিতার একমাত্র পুত্র। বাল্যকাল হইতেই মূলশঙ্কর অসাধারণ মেধাবী ও অধ্যবসায়শীল ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন চৌদ্দবৎসর মাত্র, তখন তিনি ব্যাকরণ ও সমগ্র যজুর্ব্বেদ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা কুল-পরম্পরায় শিব-উপাসক ছিলেন। শিবভক্ত পিতা পুত্র মূলশঙ্করকে বাল্যেই কৌলিক উপাসনায় দীক্ষিত করিলেন। মূলশঙ্কর বিধিমত—কিন্তু বোধ হয় সে বয়সে যতটা পিতৃ-শাসনে ততটা স্বেচ্ছায় নহে—শিবপূজা করিতেন। মূলশঙ্করের মাতা শাসনের বিরোধী ছিলেন। মাতা তাঁহার একমাত্র পুত্র বালক মূলশঙ্কর তখনও বিধিনিষেধের কঠোরতা সহ্য করিবার উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সেইজন্য তিনি শাসনের প্রতিবাদ করিতেন। পিতা মূলশঙ্করকে উপবাসের আদেশ করিলেন, কিন্তু স্নেহময়ী মাতা ব্রতভঙ্গ অগ্রাহ্য করিয়া ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকে আহার্য্য দানে কুণ্ঠিত হইলেন না। মূলশঙ্করও পিতার শাসন অপেক্ষা মাতার স্নেহেরই বেশী অধীন ছিলেন। জানি না, অধিক শাসন-কঠোরতাই অসাধারণ-চরিত্র মূলশঙ্করকে বাহ্য পূজাঙ্গ ব্যাপারে দোষানুসন্ধান করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল কিনা। কিন্তু দেখিতে পাই, শাসন-কঠোরতা কোন কোন মহাপুরুষের জীবনে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে। আমরা ব্লাভাস্কির বাল্য জীবনে দেখিয়াছি. শাসন কঠোরতা কেবল নিষ্ফল হয় নাই,কিন্তু বিপরীত ফলোৎপাদন করিয়াছে। পরন্তু শাসন যে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হইয়াছে, স্নেহ-কোমলতা তাহা সহজে সুসিদ্ধ করিয়াছে। একদা শিবরাত্রি উপলক্ষে মূলশঙ্কর পিতৃ আদেশে রাত্রি জাগরণ করিয়া শিবপূজা করিতে করিতে দেখিলেন, একটী মূষিক লিঙ্গ বিগ্রহোপরি আরোহণ করিয়া উৎসৃষ্ট দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিতেছে। মূলশঙ্করের মনে সন্দেহ জন্মিল, 'আমি যে মহাদেবের কথা শুনিয়াছি, ইনি কি সেই'? তৎক্ষণাৎ পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন। পিতা বালকের এই সন্দেহে একটু বিরক্ত হইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'ইনিই সেই' বালক উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন,—'তাহা হইলে একটা সামান্য মূষিক উহার মাথায় চড়িয়া এত উপদ্রব করিল,আর ইনি আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না,—ইনি কেমন ঈশ্বর? পিতা শাসন-

কঠোরতার পরিবর্ত্তে যদি বালককে যুক্তিসহ শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝাইতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে ফল যে অন্যরূপ হইত না, ইহা বলা যায় না। কিন্তু পিতার বিশ্বাস জ্ঞান-দীপ্তিতে আলোকিত ছিল না। উহা একরূপ অন্ধ বিশ্বাস। কাজেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মূলশঙ্করের চিত্ত তাঁহার উত্তরে সায় দিল না। বাল্যকালে যাহা একবার চিত্তে অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা উন্মূলন করা কঠিন। বিশেষতঃ যাহাদের বাল্য-কোমলতার সঙ্গে একটা স্বাভাবিক দৃঢ়চিত্ততা মিশ্রিত থাকে, তাহাদের ভালমন্দ কোন একটা সংস্কার চিত্তে লাগিয়া গেলে, উহা পাষাণ রেখাবৎ দুরপনেয় হইয়া পড়ে। যাহারা কোন বিশেষ শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, বাল্যে তাহাদের বালসুলভ তরলতা থাকিলেও উহা জলবৎ নহে, কিন্তু দ্রবীভূত লৌহবৎ। তরল লৌহ একবার আদর্শের আকারে বসিয়া গেলে, উহাকে আর রূপান্তরিত করা সহজসাধ্য নহে। মূলশঙ্করের চিত্তে যে ভ্রমাত্মক একদেশদর্শিতা দৃঢ়বদ্ধ হইল, তাঁহার পরবর্ত্তী সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন উহারই দৃঢ়তা কল্পে প্রযুক্ত হইল। একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রসব করে। নরলীলায় শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধনদশাগ্রস্ত দেখিয়া কোন ভক্ত ভাবিলেন, ভগবানের কোমল অঙ্গে কতই ব্যথা লাগিতেছে। কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি ভাবিল, শ্রীকৃষ্ণ যদি এত অসহায়, তবে উহার ঈশিত্ব কোথায়? যখন বালক মার্কণ্ডেয় উপস্থিত মৃত্যুর করালমূর্ত্তি দর্শনে সন্ত্রস্ত হইয়া পরমাত্মা বোধে একটী শিব বিগ্রহকে বাহুপাশে আবেষ্টন করিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বান্তর্য্যামী মৃত্যুঞ্জয়রূপে সেই অকপট শরণাপন্নের যমপাশ ছেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যাত্মতারতম্য বশতঃ আবার কাহারও কাহারও চিত্ত দেবমূর্ত্তিতে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি অনুভব না করিয়া কেবল উহার জড়ত্ব অংশেই অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহারা অবশ্য উহার পূজাপেক্ষা ধ্বংসসাধনই উচিত মনে করে। "দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥" এ কথাটা যে একেবারে মূল্যহীন নহে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

উপরোক্ত ঘটনার কিছু পূর্ব্বে একটী সহোদরার মৃত্যুতে মূলশঙ্করের চিত্তে সংসারবিরাগ উৎপন্ন হয়। তিনি এই দুঃখময় সংসার হইতে মুক্তিলাভের জন্য অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। পিতা মাতা ইহা লক্ষ্য করিয়া পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মূলশঙ্কর ইহা বিপজ্জনক ভাবিয়া পলায়ন করিবেন,স্থির করিলেন। যখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা সকলের অজ্ঞাতসারে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন পিতার প্রেরিত কয়েকটী অশ্বারোহী ভৃত্য তাঁহার সন্ধানে বহির্গত হইল, কিন্তু তাহারা বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। অতঃপর পরিচিত একটী লোক বালককে ধরিয়া ফেলিল, এবং পিতাকে সংবাদ দেওয়া মাত্র তিনি সদলবলে আসিয়া পুত্রকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন। মূলশঙ্কর পিতার ক্রোধ দেখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রাত্রিশেষে যখন সকলে নিদ্রিত, তখন তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিলেন। প্রভাতে আর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি নর্ম্মদাতীরস্থ চানোড় কন্নালিতে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক দয়ানন্দ সরস্বতী নাম প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর

এগার বৎসরকাল ভারতের দুর্গম তীর্থ ইত্যাদি নানা স্থান পর্যটন করিয়া শেষে মথুরাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মথুরাতে তখন স্বামী বিরজানন্দ নামে একজন মহাপণ্ডিত বাস করিতেন। বিরজানন্দ অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে ও বাক্‌কুশলতায় মুগ্ধ হইয়া লোকে তাঁহাকে প্রজ্ঞা-চক্ষু বলিত। দয়ানন্দ ১৮৬০ খ্রীঃ এই বিরজানন্দের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া প্রায় ৬।৭ বৎসর কাল নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। বিরজানন্দ মূর্ত্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। তিনি বেদ অপৌরুষেয় স্বীকার করিতেন, কিন্তু স্মৃতি পুরাণাদিকে আর্য্যগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। দয়ানন্দ ইঁহারই নিকট শিক্ষিত হইলেন। অনল ইন্ধনপ্রাপ্ত হইল, অথবা সোণায় সোহাগা যোগ হইল। দয়ানন্দের বাল্যসংস্কার পুনরুদ্দীপিত হইয়া বলবদাকার ধারণ করিল। বিরজানন্দও এতকাল পরে জীবনের শেষভাগে তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তী একজন উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া উৎফুল্ল হইলেন। পাঠ সমাপ্তির পর শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বিরজানন্দ বলিলেন,—"দয়ানন্দ! তুমি এক্ষণে যাহাতে হিন্দুস্থান হইতে মূর্ত্তি-পূজাদি ভ্রান্তমত তিরোহিত হয়, তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।" দয়ানন্দ হৃষ্টান্তঃকরণে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩১ বৎসর। তদবধি ৪ বৎসর মূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধে বাক্‌যুদ্ধ করিয়া দয়ানন্দ নিজের চিত্ত ও চরিত্রের সম্পূর্ণতা সাধনোদ্দেশ্যে ধ্যানার্থ গাঙ্গেয় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। (১) আড়াই বৎসর পর পুনরায় প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ কাণপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলধর ঝা, কাশীধামের স্বনামখ্যাত স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচারপূর্ব্বক মূর্ত্তি-পূজা বেদানুমোদিত নয়,—ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। কাশীর শাস্ত্রসংগ্রামে কোন পক্ষ জয়ী হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী তিন বৎসর প্রয়াগের কুম্ভমেলায় ও অপরাপর স্থানে স্বমত প্রচারপূর্ব্বক ভ্রমণ করিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয়ের (১) আমন্ত্রণে বঙ্গে পদার্পণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন। এই সময়ে বঙ্গের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিতও দয়ানন্দের মূর্ত্তি-পূজা সম্বন্ধে শাস্ত্র বিচার হইয়াছিল। অতঃপর দয়ানন্দ বোম্বাই গমন করেন, এবং এই নগরেই ১৮৭৫ খ্রীঃ ১০ই এপ্রেল "আর্য্যসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর উত্তর পশ্চিম খণ্ড এবং পঞ্জাব, রাজপুতনা, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে স্বমত খ্যাপনপূর্ব্বক ১৮৮১ খ্রীঃ হরিদ্বারের কুম্ভে প্রচারার্থ গমন করেন। কয়েক মাস পরে তিনি ১৮৮২ খ্রীঃ রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যে উপস্থিত হইয়া কিয়দ্দিবস তথায় বাস করেন। তৎপর সাপুরা ও যোধপুর রাজ্যে আগমন করিলেন। এইরূপ প্রকাশ যে যোধপুরে অবস্থানকালীন ১৮৮৭ খ্রীঃ তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয়

---

(১) He retired iuto the Jungles of the Ganges in the month of Baisakh for the contemplation and perfection of Character—"Dayannda Saraswati" by Bawa Arjim Singh, page 22.

(১) সুপরিচিত 'ভূপ্রদক্ষিণ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন (C. Shanne, Bar-at-law)। ইনি এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। অধুনা ইনি পরাবিদ্যা-সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য, অকপট অনুরাগী সেবক এবং ধর্ম্মোৎসাহী বক্তা।

লোকের প্ররোচনায় মহারাজের অনুগৃহীতা কোন দুষ্ট-চরিত্রা রমণী কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগের ফলস্বরূপ তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। ঐ বৎসর ৩০শে অক্টোবর দীপান্বিতার সন্ধ্যায় আজমীর নগরে দয়ানন্দ ইহলোক ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

এক্ষণে আমরা আর্য্য-সমাজের সহিত পরাবিদ্যা সমিতির কিরূপে সম্বন্ধ হইল, এবং কিরূপে উহা বিচ্ছিন্ন হইল, তাহা বলিতেছি।

১৮৭৫ খ্রীঃ পরাবিদ্যা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রায় তিন বৎসর গত হইলে কর্ণেল অলকট বোম্বাইবাসী মূলজি থ্যাকারসেকে উক্ত সমিতি স্থাপন সংবাদ সহ একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাদের ভারতবর্ষে আসিবার একান্ত বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। মূলজি ইহাতে আহ্লাদ প্রকাশপূর্ব্বক অলকটকে জানাইলেন যে, ভারতবর্ষেও সেই সময়ে দয়ানন্দসরস্বতী নামক এক মহাত্মার উদয় হইয়াছে এবং তিনি 'আর্য্য-সমাজ' স্থাপন করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। পত্রে বোম্বাই নগরস্থ আর্য্য-সমাজের সভাপতি হরিচন্দ্র সম্বন্ধে প্রশংসাবাদ ছিল। অলকট এই পত্র পাইয়া অতীব আশান্বিত হইলেন, এবং অতঃপর হরিচন্দ্রের সহিত পত্র-বিনিময় চলিতে লাগিল। পরস্পরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে অজ্ঞানতা ও ভ্রম হইতে উভয় সমিতি মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার জন্য এই হরিচন্দ্রকেই কর্ণেল অলকট প্রধানতঃ দায়ী মনে করেন। অলকট পরাবিদ্যা-সমিতির উদ্দেশ্য কি, তাহা স্পষ্টরূপে হরিচন্দ্রকে জানাইয়াছিলেন। হরিচন্দ্র উত্তরে লিখিলেন যে, আর্য্যসমাজের উদ্দেশ্যও তাহাই, অতএব উভয় সমিতি, ভিন্ন না থাকিলে একাঙ্গীভূত হওয়া উচিত। হরিচন্দ্র আর্য্য-সমাজের উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্টাকারে অলকটকে জ্ঞাপন করেন নাই, এবং পরাবিদ্যা-সমিতির উদ্দেশ্যগুলিও দয়ানন্দ স্বামীর নিকট সঠিক প্রকাশ করেন নাই। ফলে এই হইল যে, স্বভাব-সরল অলকট না বুঝিয়া আর্য্য-সমাজের সহিত পরাবিদ্যা-সমিতির মিলন প্রস্তাব করিয়া শিষ্যোচিত বিনয় সহকারে স্বামী দয়ানন্দকে পত্র লিখিলেন এবং স্বামীজিও না বুঝিয়া আহ্লাদ সহকারে উক্ত প্রস্তাব অঙ্গীকার করিলেন। পরস্পর পরস্পরের ভাষায় অজ্ঞ থাকায় দ্বিভাষীদ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইত। ইহাও উক্ত ভ্রমের অন্যতম কারণ। দুর্ভাগ্য বশতঃ হরিচন্দ্র চিন্তামন এই দ্বিভাষীর কার্য্যভার লইয়াছিলেন। হরিচন্দ্রের চেষ্টায় বোম্বাইয়ের কতিপয় ভদ্রলোক পরাবিদ্যা-সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন। পরাবিদ্যা সমিতির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "ভারতীয় আর্য্য-সমাজভুক্ত পরাবিদ্যা-সমিতি" Theosophical Society of the Arya Somaj of India) এই নামকরণ হইল। সভ্য-নিয়োগ পত্র (Diploma) সমাজপতিস্বরূপ দয়ানন্দের নামাঙ্কিত হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ স্বামী দয়ানন্দকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া কর্ণেল অলকটের এতদূর উচ্চ ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি লিখিয়াছেন,—

> "To make such a connection (amalgamation of the T. S. with the Arya Samaj) I should have been ready, if required, to be his servant, and to have rendered him glad service for years to come without hope of reward" (O. D. L. first series, page 397).

অর্থাৎ,—"উভয় সমিতির সম্মিলনের জন্য আমি ভৃত্যের ন্যায় সানন্দে ইঁহার আজ্ঞাধীন থাকিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তত ছিলাম।"

পরাবিদ্যা সমিতিকে আর্য্য সমাজভুক্ত করিয়া যে তিনি অতীব আশান্বিত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ হরিচন্দ্র চিন্তামনের পত্রানুসারে তাঁহার স্থির নিশ্চয় হইয়াছিল যে, পরাবিদ্যা সমিতি ও আর্য্য সমাজের উদ্দেশ্যে কোন ভেদ নাই এবং উভয়েই সেই প্রাচীন বেদসম্মত বা উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার পুনরুজ্জীবন কালে এক পন্থাবলম্বী। কিন্তু হায়! শীঘ্রই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অলকট ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত স্বামীজির একজন প্রধান ভক্ত পূর্ব্বোক্ত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা-কৃত আর্য্যসমাজের উদ্দেশ্য ও ধর্ম্ম মতের এক খণ্ড ইংরাজি অনুবাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই অনুবাদ পড়িয়া অলকট স্তম্ভিত হইলেন। কেবল স্তম্ভিত নয়, তিনি চিত্তে বড়ই আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন, উভয় সমিতির উদ্দেশ্যে ও মতে এবং সেই বৈদিক ধর্ম্মের অর্থ পরিগ্রহে ও ব্যাখ্যায় অনেক প্রভেদ, অতএব কখনই উভয়ের সংযোগ হইতে পারে না। তিনি তদ্দণ্ডেই সমিতির ভারতীয় সভ্যগণকে একথা জ্ঞাপন করিলেন। মূল পরাবিদ্যা-সমিতির নিজ উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উহাকে আর্য্যসমাজের কুক্ষিমুক্ত করিয়া পূর্ব্বাকারে পুনঃ স্থাপিত করা হইল, কিন্তু "ভারতীয় আর্য্যসমাজভুক্ত পরাবিদ্যা সমিতি" নামক বস্তুটীর অস্তিত্ব-বিলোপ না করিয়া উহাকে কেবল পৃথক্ করিয়া উভয় সমাজের মধ্যে একটা সেতু স্বরূপ রক্ষা করা হইল। তৎপর অলকট উভয় সমিতির উদ্দেশ্য ও ধর্ম্মমত স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দেশীয় ও বিদেশীয় সভ্যবৃন্দের নিকট স্থাপন পূর্ব্বক জানাইলেন যে, সমিতিদ্বয় পৃথককৃত হইল বটে, কিন্তু পরাবিদ্যা সমিতির কোন সভ্য যদি সেতু-সমিতিতে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কোন আপত্তি বা বাধা নাই। সুতরাং উভয় সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে বা থাকিতে কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইল না। কিন্তু পরাবিদ্যা-সমিতি নিজের উদ্দেশ্য স্থিরতর রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য হইল, কারণ আর্য্যসমাজের সহিত মিলিত হইয়া থাকা উহার পক্ষে অসম্ভব। মিলন কেন অসম্ভব, তাহা বলিতেছি।

পরাবিদ্যা সমিতির উদ্দেশ্যে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা মানবের আত্মবোধ জাগ্রত করা,এবং তদুদ্দেশ্যে সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের, বিশেষতঃ অধিকতর সমুন্নত বলিয়া প্রাচ্য অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বিশেষরূপে অনুশীলন করা, এবং জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বিশ্বমানবের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করা। ইহা পূর্ব্বেই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মোট কথা, এই সমিতি কোন জাতি, কোন ধর্ম্ম, বা কোন শাস্ত্রকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক ত্যাগ না করিয়া সকলের ভিতরেই এক পরম সত্য যে ব্রহ্ম জ্ঞান, তাহারই আবিষ্কারপূর্ব্বক সমস্ত বিরোধের সমন্বয় করিতে প্রয়াসী। কিন্তু আর্য্যসমাজের সিদ্ধান্ত এক মাত্র স্বামী দয়ানন্দ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত বেদার্থ ও বৈদিক ধর্ম্ম ব্যতীত জগতের অপর সমস্ত শাস্ত্র ও ধর্ম্ম মিথ্যা। স্বামী দয়ানন্দ তাঁহার "সত্যার্থ প্রকাশ" নামক গ্রন্থে গ্রাহ্য ও পরিত্যাজ্য শাস্ত্র নির্ণয় করিয়া লিখিয়াছেন :—

"পূর্ব্ব মীমাংসার উপর ব্যাস মুনিকৃত ব্যাখ্যা, বৈশিষিকের সহিত গৌতম মুনিকৃত ব্যাখ্যা, ন্যায় সূত্রের সহিত বাৎস্যায়ন মুনিকৃতভাষ্য,পতঞ্জলি মুনিকৃত সূত্রের সহিত ব্যাস মুনিকৃত ভাষ্য, কপিল মুনিকৃত সাংখ্য সূত্রের সহিত ভাগুরি মুনিকৃত তাষ্য, এবং ব্যাস মুনিকৃত বেদান্তসূত্রের সহিত বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, অথবা বৌধায়ন মুনিকৃত ভাষ্যবৃত্তি সহিত পড়িবে, এবং পড়াইবে। এই সকল সূত্রের কল্প ও অঙ্গ সম্বন্ধেও গণনা করিতে হইবে। যেরূপ ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব, এই চারি বেদ ঈশ্বরকৃত, তদ্রূপ ঐতরেয়, শতপথ, সাম ও গোপথ, এই চারি ব্রাহ্মণ, শিক্ষা, কল্প,ব্যাকরণ,নির্ঘণ্টু, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ, এই ছয় শাস্ত্র বেদের উপাঙ্গ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থবেদ, এই চারি বেদের উপবেদ ইত্যাদি সমস্ত ঋষি প্রণীত গ্রন্থ। ইহাতেও যাহা বেদ-বিরুদ্ধ বোধ হইবে, তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ বেদ ঈশ্বরকৃত বলিয়া উহা অভ্রান্ত 'স্বতঃ প্রমাণ'; অর্থাৎ বেদের প্রমাণ বেদই জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণাদি সমস্ত গ্রন্থ 'পরতঃ প্রমাণ' অর্থাৎ উহার প্রমাণ বেদাধীন। বেদের বিশেষ ব্যাখ্যা 'ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকাতে (স্বামী দয়ানন্দ লিখিত) দেখিয়া লইতে হইবে।"

"পরিত্যাজ্য গ্রন্থেরও সংক্ষেপতঃ পরিগণনা করা যাইতেছে, অর্থাৎ নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়া লইবে। ব্যাকরণ সম্বন্ধে কাতন্ত্র, সারস্বত, চন্দ্রিকা, মুগ্ধবোধ, কৌমুদী শেখর, এবং মনোরমাদি। কোশ সম্বন্ধে অমরকোশাদি। ছন্দোগ্রন্থ সম্বন্ধে বৃত্তরত্নাকরাদি। শিক্ষা সম্বন্ধে 'অথ শিক্ষাৎ প্রচক্ষ্যামি পাণিকীয় মতং যথা' ইত্যাদি। জ্যোতিষ সম্বন্ধে শীঘ্রবোধ, মুহূর্ত্ত চিন্তামণি প্রভৃতি। কাব্য মধ্যে নরকাভেদ, কুবলয়ানন্দ, রঘুবংশ মাঘ ও কিরাতার্জ্জুনীয়াদি। মীমাংসা সম্বন্ধে ধর্ম্মসিন্ধু ও ব্রতার্কাদি। বৈশেষিক সম্বন্ধে তর্ক সংগ্রহাদি। ন্যায় সম্বন্ধে জাগদীশী প্রভৃতি। যোগ বিষয়ে হঠ প্রদীপিকাদি। সাংখ্য বিষয়ে সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী প্রভৃতি। বেদান্ত বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ ও পঞ্চাদশ্যাদি। বৈদ্যক বিষয়ে শার্ঙ্গধরাদি। স্মৃতিগ্রন্থ মধ্যে মনুস্মৃতিই উত্তম, কিন্তু উহাতেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পরিত্যাজ্য। অন্য সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থ, সমস্ত তন্ত্র, সমস্ত পুরাণ, ও উপপুরাণ...এবং সমস্ত ভাষাগ্রন্থ (হিন্দি বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ) কেবল কপোল-কল্পিত এবং মিথ্যা জানিবে।"

"কাশ্যাদি তীর্থ, রামকৃষ্ণ,নারায়ণ, শিব, ভগবতী, গণেশাদির নাম স্মরণে পাপনাশ হইবে, এরূপ বিশ্বাস;··বিদ্যা, ধর্ম্ম, যোগ, এবং পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেকে মিথ্যা পুরাণ নামক ভাগবতাদি কথা হইতে মুক্তি কামনা..." ইত্যাদি বিদ্যালাভের বিঘ্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব নির্দ্দিষ্ট কয়েক খানি গ্রন্থ ব্যতিরেকে আর্য্য প্রতিভার ভাণ্ডার স্বরূপ-বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশশেষই অগ্নি সংকার করিতে স্বামীজি উদ্যত!

মূর্ত্তি পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্নোত্তর-মালায় গ্রথিত :—

"(প্রশ্ন) মূর্ত্তিপূজা কোথা হইতে আসিল? (উত্তর) জৈনদিগের হইতে। (প্রশ্ন) জৈনগণ কোথা হইতে চালাইল? (উত্তর) আপনাদের মূর্খতা হইতে। (প্রশ্ন) জৈনগণ কহেন যে শান্ত ধ্যানাবস্থিত ও

উপবিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে আপনার জীবের তদ্রূপ শুভ পরিণাম হইয়া থাকে। (উত্তর) জীব চেতন এবং মূর্ত্তি জড়। তবে জড়ের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবও জড় হইয়া যাইবে? এই মূর্ত্তিপূজা কেবল পাষণ্ড মত মাত্র এবং জৈনদিগের কর্তৃক প্রচলিত। এইজন্য ১২ সমুল্লাসে ইহার খণ্ডন করা যাইবে। [উত্তর] শাক্তাদি লোকে মূর্ত্তি সম্বন্ধে জৈনদিগের অনুকরণ করে নাই, কারণ বৈষ্ণবাদির মূর্ত্তি জৈনদিগের মূর্ত্তির সদৃশ নহে. (উত্তর) ইহা সত্য। জৈনদিগের তুল্য নির্ম্মাণ করিলে জৈন মতের সহিত ঐক্য হইত. এইজন্য উহাদের মূর্ত্তির বিরুদ্ধ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কারণ জৈনদিগের সহিত বিরোধ করা, ইহাদের, এবং ইহাদের সহিত বিরোধ করা জৈনদিগের মুখ্য কার্য্য ছিল জৈনগণ যেরূপ বিবস্ত্র, ধ্যানাবস্থিত, এব বিরক্ত মনুষ্যের সদৃশ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত, বৈষ্ণবাদি তাহার বিরুদ্ধভাবে যথেষ্ট সজ্জিত, স্ত্রী সহিত অঙ্গরাগযুক্ত, ভীমাকার, বিষয়াসক্তি সহিতাকার বিশিষ্ট বা দণ্ডায়মান মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। জৈনগণ অনেক শঙ্খ, ঘণ্টা এবং ঘড়ি প্রভৃতি বাজাইত না। উহারা অত্যন্ত কোলাহল করিত। এইরূপে এইরূপ লীলা করাতেই 'পোপের' * শিষ্য বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ী জৈনগণের জাল হইতে রক্ষা পাইয়া ইহাদের লীলায় মুগ্ধ হইয়া উহাতেই আসক্ত হয়। ইহারা ব্যাসাদি মহর্ষিদিগের নামে আপনাদিগের মনের মত অসম্ভব গাথাযুক্ত অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল। উহাদের নাম 'পুরাণ' রাখিয়া কথাও শুনাইতে আরম্ভ করিল। পরে এতাদৃশ বিচিত্র মায়া রচনা করিতে লাগিল যে প্রস্তরাদি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ গুপ্তভাবে পর্ব্বতে অথবা বনে রাখিয়া অথবা ভূমি মধ্যে নিহিত রাখিয়া পরে আপনাদিগের শিষ্যদিগের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল যে, রাত্রিতে মহাদেব, পার্ব্বতী, রাধা, কৃষ্ণ, সীতা, রাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরব অথবা হনুমানাদি স্বপ্নে আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি অমুক স্থানে আছি, আমাকে সে স্থল হইতে লইয়া আইস, মন্দিরে স্থাপন কর, এবং তুমি যদি আমার পূজক হও, তাহা হইলে তোমাকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিব ইত্যাদি। বিচারহীন ধনাঢ্য লোক 'পোপের' এই লীলা শ্রবণ করতঃ সত্য মনে করিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল যে এরূপ মূর্ত্তি কোথায় আছে? তখন পোপ মহাশয় বসিলেন অমুক পাহাড়ে বা জঙ্গলে আছেন, আমর. সঙ্গে চল, দেখাইয়া দিব। পরে উক্ত নির্ব্বুদ্ধি উক্ত ধূর্ত্তের সহিত গমন করতঃ তাদৃশ স্থানে উপস্থিত হইয়া দর্শন করতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এবং 'পোপের' চরণে পতিত হইয়া বলিল যে আপনার উপর এই দেবতার অতিশয় কৃপা, এক্ষণ আপনি ইহাকে লইয়া চলুন, আমি ইহার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিব, এবং উহাতে ইহার স্থাপনা করতঃ আপনিই পূজা করিতে থাকিবেন; আমরাও এই প্রতাপান্বিত দেবতার দর্শন স্পর্শন করিয়া মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইব। একজন যখন এইরূপ লীলা প্রকাশ করিল, তখন উহা দেখিয়া সকল 'পোপই'

---

* পোপ (Pope) রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য। দয়ানন্দ সরস্বতী এখানে পোপ অর্থে হিন্দুদিগের গুরু পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। কারণ বোধ হয়, উভয়েই তাঁহার মতে প্রতারণার প্রতিমূর্ত্তি।

আপনাদিগের জীবিকার্থ ছল ও কপটতা দ্বারা মূর্ত্তি স্থাপন করিল।”

কি কি প্রমাণ বলে আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দেব মূর্ত্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থে খুঁজিয়া পাইলাম না। অতএব পাঠকগণ এ সম্বন্ধে নিজ নিজ মত গঠন করিয়া লইবেন। তবে পুরাণ যদি সমস্ত মিথ্যা কল্পনা মাত্র হয়, তবে পৌরাণিকগণ উদ্ধৃত উক্তিকে প্রমাণাভাবে অধিকতর কাল্পনিক বলিতে পারেন কিনা, তাহা বিবেচ্য। পুরাণ সকল নিরবচ্ছিন্ন ছল কপটতার লীলা খেলা, আর প্রতারণা পূর্ব্বক মৃত্তিকা-প্রোথিত মূর্ত্তি দ্বারা ভারতে সাকারোপাসোনার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যে অজ্ঞাত পূর্ব্ব ভূগর্ভনিহিত ঐতিহাসিক রত্ন খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার মূল্য কত, তাহা, যাঁহারা হিন্দুজাতির বিশ্বস্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, এবং প্রত্ন-তত্ত্বের গবেষণা করিতে ভালবাসেন, তাঁহারাই নির্দ্ধারণ করিবেন।

ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

* * *

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

উদ্বোধন।*

শুনিয়াছি—বালকে ডাকিলে
ছুটিয়া আসেন ভগবান,
শিশু-কণ্ঠ-আকুলতা শুনিয়া জননী যথা,
ফেলিয়া সকল কাজ
হন আগুয়ান।

২

শুনিয়াছি—মহা নির্য্যাতনে
দৈত্যদেশে, বালক প্রহ্লাদ
কাঁদিল তাঁহারে স্মরি, অমনি আসিয়া হরি,
শত মৃত্যু নিবারিয়া
দিলা আশীর্ব্বাদ।

৩

শুনিয়াছি—বিমাতার রোষে
রাজপুত্র হয়ে বনবাসী,
ধ্রুব ডেকেছিল তাঁরে, আর কি থাকিতে পারে,
বালকে, করুণাময়
কোলে নিলা আসি।

শুনেছি—বালক কুশধ্বজে
সবে দিল মরণের মুখে,
সে যে পিতৃ মাতৃত্যক্ত!—বিভুরে স্মরিল ভক্ত,
অমনি অনাথনাথ
তুলি নিলা বুকে।

তোমরাও বালক সকল
তাই মনে হয় বড় আশা,
তোমাদের আর্ত্তস্বর, পশিবে স্বরগ প'র,
দেবতা করুণা ঢালি,
মিটাবে পিপাসা।

যাঁরা জ্ঞানী, সাধু সদাশয়,
নত হও তাঁদের চরণে;
প্রীতি-মন্ত্রে পেয়ে দীক্ষা, করিবে মহত্ত্ব শিক্ষা
একতা সংযম, ত্যাগ
শিখিবে সংসারে।

---

* শাপর্কীড়ি “বালক-সম্মিলনী”তে পঠিত

হিংসা দ্বেষ কিম্বা অহঙ্কার,
না রহিবে মরমের কোণে,
পরাপর বোধ নাই, সব সহোদর ভাই
সবাই সবার তরে,
তাই দেখ মনে।

৮

অনাদর, ঘৃণা, অপমান,
পায় যেন যেতে অবহেলি—
তোমরা যে দেব-অংশে, জন্মিয়াছ আর্য্য-বংশে,
হীনতা নীচতা যত
যাও পায়ে ঠেলি।

৯

শুনেছ তো শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ভবে,
লোকহিত—পর উপকার,
সেই কাজ প্রতিক্ষণে, কর যেন কায় মনে,
দেবতা সহায় হোন
তোমা সবাকার।

১০

নমো নমো সর্ব্বসিদ্ধিদাতা!
তব পদে করি কৃতাঞ্জলি,
বালক অকৃতী দীন, শক্তি ভক্তি জ্ঞানহীন
তবু ডাকে—বালকের
কথা রা'খ বলি।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

কূপ ও ধূপ।

ওগো কূপ,—অপরূপ
বিশ্বে যখন পিয়াসে পোড়ায়
আগুনের মত ধূপ;
মিটাতে সবার কাতর তৃষায়
ভরিয়া রেখেছ সলিল সুধায়
জননীর মত পীযূষ ধারায়
আপন বক্ষটীকে;
নাহি অবসর মুখ হেরিবার
গোপনে নিয়ত দানটী তোমার
দানের খাতায় নাম আপনার
দাও নাক কভু লিখে।
আকাশ ভরিয়া ধূপের জ্বালায়
পড়ি যবে ভূঁয়ে ক্লান্ত পাখায়
ভরিয়া রেখেছো প্রাণের কুলায়
জুড়াতে মোদের দেহ।
সরসী তটিনী পারে শুকাইতে,
অক্ষয় তব উৎস নিভৃতে,
যেতে পারে প্রেম মৈত্রী করুণা
ক্ষয়হীন মার স্নেহ।
ওগো কূপ, অপরূপ
গোপনে বাঁচাও, যবে দুখ দেয়
বক্ষ পীড়িয়া ধূপ।

শ্রীকালিদাস রায়।

তোমারি।

(গান)

আজি এ পরাণ তোমারে চায়,
তোমারি রবি, তোমারি শশী,
তোমারি বিশ্বে হাসি ছড়ায়!
তোমারি তরু তোমারি লতা
তোমারি ফুল তোমারি পাতা
তোমারি নীল অম্বর হেরি—
মোহন দৃশ্যে আঁখি জুড়ায়!
আজি এ পরাণ তোমারে চায়!

২

তোমারি কুঞ্জে তোমারি পাখী,
ললিত ছন্দে অমিয় মাখি,—
তোমারি প্রেম, বন্দনা-গীতি—
তোমারি গুণ গরিমা গায়!
আজি এ পরাণ তোমারে চায়!

৩

তোমারি নদ, তোমারি নদী,
তোমারি প্রেম, বহে নিরবধি,
কল্লোলিনী কুলু কুলু তানে
দুকূলে তোমার প্রেম বিলায়!
আজি এ পরাণ তোমারে চায়!

৪

বিশ্ব প্রকৃতি তোমারি মাঝে,
তোমারি বীণা হৃদয়ে বাজে,
আমিও তোমারি তোমারি ফুলে—
অঞ্জলী দিব তোমারি পায়!
আজি এ পরাণ তোমারে চায়!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

সঙ্গণিকা।

(৪০)

শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,—
জন্ম, ৩রা আশ্বিন, ১২৯৪,
মৃত্যু ৭ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩২২,

অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বাঙ্গালার অনেকেই জ্ঞাত আছেন। তাঁহার অন্যতর পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, বহু আত্মীয় মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইতেছেন। মহাত্মা জেনারেল বুথ যখন কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন, আমরা একদিন ধর্ম্মতলা-ষ্ট্রীটের থোবরণ গির্জ্জায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। জেনারেল বুথ বলিয়াছিলেন, "আমার সমস্ত শাস্ত্র ৪টী অক্ষরে নিবদ্ধ—Love." আমরা তদীয় আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, তিনি যেন মানুষ নহেন, মনে হইয়াছিল যেন স্বর্গ হইতে উৎসাহের একটী প্রদীপ্ত অগ্নিকণা ভূতলে পতিত হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখিয়াও আমাদিগের অনেক সময় মনে হইত, যেন উৎসাহের বিদ্যুৎ-কণা ধরায় পতিত হইয়াছে। মনে হইত যেন, প্রেমের যেমন প্রকটলীলা ছিল সুধাময়, তেমনি ছিল প্রফুল্লচন্দ্র, দুইজন অকৃত্রিম বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিল, একজন যখন স্বর্গ গিয়াছে,তখন প্রফুল্লচন্দ্র থাকিবে কেন? দুই বৎসরের মধ্যেই সেও পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া পিতা এবং বন্ধুর সহিত মিলিত হইল। দ্বারকানাথের স্বদেশ-প্রেম, কর্ত্তব্য-জ্ঞান, লোক-সেবা, কর্ম্ম-পটুতা প্রফুল্লচন্দ্রে সংক্রামিত হইয়াছিল। লোকের উপকার করাই তাহার জীবনের ব্রত ছিল। অনেক সময় অর্থের জন্য তাহাকে চাকুরী করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু লোকের সেবার দিন উপস্থিত হইলে সে অর্থের খাতিরে কাজ করিতে পারিত না। অবসর অনবসর, শীত গ্রীষ্ম, তুষার বর্ষা, কিছুই সে গণনা করিত না, চাকুরী ত দূরের কথা, লোকের উপকার করিবার সময় মৃত্যুকেও সে গ্রাহ্য করিত না। সে যেন পরিবারের ছেলে ছিল না, সে যেন সমাজ এবং দেশের সন্তান ছিল। এরূপ অদম্য সেবা-পিপাসা আমরা আর কোথাও দেখি নাই। যেমন নির্ম্মল চরিত্র, তেমনি ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-পিপাসা। সেবা-পরায়ণতা প্রফুল্লচন্দ্রকে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সাজে ও শোভায় ভূষিত করিয়াছিল। এরূপ সন্তানের দেহত্যাগে কেবল পরিবারের নয়, সমাজের এবং দেশের মহা অনিষ্ট হইয়াছে। তাহার সুচিহ্নিত স্থান আর পূর্ণ হইবে না। সে আমাদের শয়নে স্বপনে নিয়ত জাগিতেছে! তাহার তিরোধানে পাড়া শূন্য হইয়াছে, কর্ম্মক্ষেত্র সহায়হীন হইয়াছে,—যুবক-দল অঙ্গহীন হইয়াছে, আর আমরা নিয়ত ভাবিতেছি—কি হইল, কি হইল!—এমন ছেলেও মরে! আমরা অকর্ম্মণ্য জীব সকল জীবিত রহিলাম, আর সোণার চাঁদ অস্তমিত হইল! আর লিখিব কি, বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

(৪১)

মহাত্মা স্যর হেনরি কটন—জন্ম—১৮৪৫—সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ২৪শে অক্টোবর, ১৯১৫। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

কটন, নিউ-ইণ্ডিয়ার কটন, বিলাতের না আমাদের? ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ ঋষিপ্রবর রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনেকেই জানেন। তিনি এক সময় কটনের তীব্র-

দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে এক বৎসরের মধ্যে চারিবার স্থানান্তরিত হইতে হইয়াছিল। তিনি তখন দারুণ বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি একদিন মহাত্মা কটনের নিকট আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার প্রতি এত কঠোর ব্যবহার কেন?" কটন তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "চাকুরী ছাড়িয়া দেও।" রাধাকান্ত বলিয়াছিলেন, খাইব কি, জমিদারী নাই, আর কোন উপায় নাই। তদুত্তরে কটন বলিয়াছিলেন—"Then die of starvation, or of diabetes." এইরূপ নির্ম্মম কথা বলিবার সময় যে রাধাকান্ত একদিন অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, তিনি সময়ান্তরে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "এরূপ অকৃত্রিম ভারতহিতৈষী আর দেখি নাই—তিনি ইচ্ছা করেন না যে চাকুরীতে এদেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা ডুবিয়া যায়, তাই আমাকে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন।" চাকুরী সম্বন্ধে এক সময়ে পোষ্টাফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ৺হেমচন্দ্র বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, "চাকুরী! হাইকোর্টের জজিয়তি ও মেথরগিরি, সবই সমান।" ভূতপূর্ব্ব জজ স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই কথা শুনিয়া হেমচন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনি ঠিক বলিয়াছেন।" হেমচন্দ্র পরে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চাকুরীর প্রতি কটন এমনই বিতৃষ্ণ ছিলেন যে, শেষে তিনিও চাকুরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চাকুরী মনুষ্যত্ব হীন করে, স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে, অহঙ্কারে ভূষিত করিয়া মানুষকে পশুত্বে নমিত করে। রাধাকান্ত কটনের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে একদিন অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

আমাদের সময়ে সময়ে মনে হয়, কি গুণে ইংলণ্ড আজ জগতের শ্রেষ্ঠ? গ্লাডোষ্টোন্, ব্রাইট, রিপন প্রভৃতির নিরপেক্ষতা, প্রেম এবং পবিত্রতাই যেন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। হিউম এবং কটনও ঐ শ্রেণীর লোক। নব্যভারতের উত্থানের কারণ হিউম, কটন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নয় কি?

আমরা যখন ভারতকে নব্যভারত নামে অভিহিত করিয়াছিলাম, তখন, অনেক ব্যক্তি তীব্র উপহাস করিয়াছিলেন। অনেক পরে কটন যখন "New India" লিখিলেন, তখন সকলের চক্ষু স্থির হইল। একদিন ৺ত্রিগুণাচরণ সেন মহাশয় আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া, ঐ সময়ে, বলিয়াছিলেন—"আপনার কি সূক্ষ্ম দৃষ্টি, এক সময়ে কত লোক আপনাকে ঠাট্টা করিয়াছে, আজ কটনের New India নামকরণে সকলেই আনন্দিত!" কটনের নিউ-ইণ্ডিয়া পুস্তকে তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানি ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষকে এরূপ ভালবাসিতে আর কোন ইংরাজ পারিয়াছেন কি না, জানি না। তিনি ইংলণ্ডের ছিলেন না, তিনি যেন ভারতের ছিলেন। এই ভারত তাঁহার স্নেহঋণ কখনও ভুলিতে পারিবে না। ভারতে কটন ঘরে ঘরে অনুপ্রাণিত, অনুস্যূত এবং অনুস্মৃত। ভারত ও কটন, একাত্মক। কটনের কথা ভারত যে দিন ভুলিবে, সেই দিন ভারতের মৃত্যু হইবে।

এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা এই—"১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৮৬৭ খ্রীঃ চাকুরী লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের

অণ্ডারসেক্রেটারী হন ও ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার হন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে একযোগে কলিকাতার পুলিস কমিশনার ও করপোরেসনের চেয়ারম্যানের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি অত্যল্পকালের জন্য ঐ বিভাগের কমিশনারের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হন ও ছয় বৎসর ঐ কার্য্য করেন। অতঃপর তিনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ হইতে ১ ৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ফাইন্যান্স বিভাগের সেক্রেটারী ও পরে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরীর পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি ভারত-গবর্ণমেণ্টের হোম সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আসামের চীফ কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ঐপদে ছিলেন। ঐ বৎসরই তিনি রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। চারি বৎসর পরে তিনি পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "সি-এস-আই" ও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে "নাইট" উপাধি লাভ করেন।"

(৪২)

স্যর ফিরোকসা মেটা। জন্ম—বোম্বে আগষ্ট ১৮৪৫ খ্রীঃ, মৃত্যু বোম্বে, শুক্রবার, ৫ই নবেম্বর, ১৯১৫।

ত্রিভলি বাগানে যেবার (১৮৯০ খ্রীঃ) জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, মেটা সেবার সভাপতি হইয়াছিলেন। আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। মেটা যখন অভিভাষণ পাঠ করিতেছিলেন, তখন মন্ত্রমুগ্ধবৎ পঞ্চ সহস্রাধিক লোক তাহা শুনিয়াছিল। মেটার স্বরলহরী যেন সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া জনমণ্ডলীর উপর খেলিতেছিল। আমরা এরূপ কণ্ঠস্বর আর কোথাও শুনি নাই। কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, কালীচরণ, সুরেন্দ্রনাথ, জেনেরেল বুথ, এনি বেশান্ত, কাহারও কণ্ঠস্বর মেটার বজ্রগম্ভীর স্বরলহরীর সহিত তুলিত হইতে পারে না। তিনি কেবল তাঁহারই যোগ্য ছিলেন। অনভিষিক্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট অতুল কীর্ত্তিরাশি রাখিয়া নির্ব্বাণ-দুর্গে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভারতের চতুর্দ্দিকে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়াছে।

দেশহিতৈষণার বাজারে, কালীচরণ বড় না আনন্দমোহন বড়; সুরেন্দ্রনাথ বড় না অযোধ্যানাথ বড়; মেটা বড় না তিলক বড়, গোখলে বড় বা তিলাঙ্গ বড়, মনোমোহন না উমেশচন্দ্র বড়, সে বিচারের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কে কাহার অভ্যুত্থানের কারণ, সে বিচারের সময়ও উপস্থিত হয় নাই। যাঁহাদের সমবেত শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারত আজ নব-জাগরণের দ্বারে উপনীত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য, সকলেই দেশের অমর সন্তান।

রামমোহনের তপস্যার ফলে রামগোপাল ও হরিশ্চন্দ্র, ডিরোজিও ও রসিককৃষ্ণ, কৃষ্ণদাস ও রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির এদেশে অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের তপস্যার ফলে দাদাভাই নারোজি, আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণমোহন ও কালীচরণ, তিলক ও মেটা, নরেন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমার, অযোধ্যানাথ ও গোখলে প্রভৃতির অভ্যুদয়। তাঁহাদের মধ্যে

অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় হিউম, রিপণ ও কটন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সকল কথা ভাঙ্গিয়া লেখার ইহা সময় নয়—তাহা প্রীতিকরও নয়। জেতা ও জিতের অপূর্ব্ব সম্মিলনে জাতীয় মহাসমিতির আবির্ভাব। আজ স্বর্গ হইতে জাতীয় মহাসমিতির উপর অজস্রধারে পুষ্প বর্ষিত হইতেছে।

মেটা আজীবন স্বদেশ-সেবী। বিদেশী হইয়াও ভারতকে স্বদেশ রূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আজীবন ভারতের উন্নতির জন্য খাটিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ কথনও তাঁহাকে ভুলিবে না। মেটা এবং গোখলে ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এই—তিনি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ৬ মাস পরে এম-এ উত্তীর্ণ হন। পার্সীজাতির মধ্যে তিনিই প্রথমে জিজিভয়ঃ বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে দাদাভাই নারোজির সহবাসে তাঁহার নবজীবন লাভ হয়। নবজীবন লাভ করিয়া বারিষ্টার হইয়া বোম্বে উপস্থিত হন। ১৮৭৩ খ্রীঃ টাউয়ার-অব-সাইলেন্স-বিদ্রোহের সময় তিনি বিখ্যাত হন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে করপোরেসনে প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ করপোরেসনের সভাপতি পদে বরিত হন এবং ১৮৮৫ ও ১৯০৫ খ্রীঃ পুনঃ সভাপতি হন। ১৮৮৬ খ্রীঃ লর্ড বিয়ে তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ কলিকাতার জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি হন। ইহার ৩।৪ বৎসর পর বোম্বে করপোরেসন হইতে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি হন। ক্যাণ্টনমেণ্ট এবং পুলিস আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময়, ১৮৯৫—৯৬ খ্রীঃ তাঁহার যশোরাশি ভারতব্যাপী হইয়া ইংলণ্ডে পৌঁছে। কলিকাতা আগমন করিলে টাউন হলে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়; তৎপর বোম্বে নগরেও এইরূপে তিনি অভিনন্দিত হন। ১৮৯৫ খ্রীঃ সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-লাট-ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ পরিত্যাগ করেন। ১৯০৪ খ্রীঃ কে-সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন।"

মেটার প্রতি কার্য্যে স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন যে সভায় যে কাজ করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া ভারতের হিতসাধনে বদ্ধপরিকর থাকিতেন। মতানৈক্য প্রযুক্ত তিনি আপন ব্রত কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। শেষ জীবনে তিলকের সহিত সব বিষয়ে তাঁহার মতের ঐক্য হইত না বলিয়া বড়ই দুঃখিত ছিলেন। তিনি চরমপন্থী দলের ঘোর বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতের উন্নতিকামীদিগকে সর্ব্বদা সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। জেতা ও জিতের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সমতুল্য বক্তা, তার্কিক এবং ভারতের অবস্থাজ্ঞ ব্যক্তি ভারতে দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ভারতের প্রকট মহাশক্তি বিশেষ ছিলেন। লাটসভায় তাঁহার ভয়ে বড় বড় পণ্ডিত তার্কিকগণও সন্ত্রস্ত হইত। তিনি যখন যে কাজে হাত দিতেন, অজেয় শক্তিতে তাহা সিদ্ধ করিতেন। তাঁহাকে হারাইয়া ভারত যে অভাবগ্রস্ত হইল, তাহা যে শীঘ্র ঘুচিবে, তাহা মনে হয় না। ভারতের মহা দুর্দ্দিন যেন ঘনাইয়া আসিতেছে। বিধাতা ভারতের সহায় হউন।

(৪৩)

ফরিদপুরের "মধুমতী-কুমার" বিলরুট

গবর্ণমেণ্টের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা উহার প্রস্তাবক এবং গবর্ণমেণ্ট খনক। এই খালের কুতে গবর্ণমেণ্টের প্রভূত আয় হইতেছে। ব্যয়ও যথেষ্ট হইতেছে। কর্ম্মচারীগণের খেয়ালে অনেক টাকা জলে যাইতেছে। কর্ম্মচারীগণের খেয়ালে পুরীর অণ্ডারগ্রাউণ্ড ড্রেনে লক্ষ লক্ষ টাকা জলে গিয়াছে, এই খালের উন্নতি-সাধনেও যাইতেছে। খালের মুখ বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া প্রতি বৎসরই ড্রেজার দ্বারা তাহা খনিত হয়। খালের স্রোত বৃদ্ধি করার জন্য গত বৎসর হরিদাসপুর হইতে ফতেপুর পর্য্যন্ত খালের দক্ষিণ পাড় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, দক্ষিণ দিকে যত খাল গিয়াছে, তাহার মুখও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে দেশের প্রভূত অনিষ্ট হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিকারের জন্য অবেদন করিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই। দক্ষিণ পাড় বাঁধা হইয়াছে, কিন্তু উত্তর পাড় বাঁধা হয় নাই। উত্তর পাড়ে নিম্নভূমি—জল খালের স্রোত বৃদ্ধি না করিয়া উত্তর পাড়ের নিম্নভূমিতে জমিয়া রহিয়াছে—খালে এই কার্ত্তিকমাসেও একটুও স্রোত নাই। জল জমিয়া ধানের অনিষ্ট করিতেছে, দক্ষিণের খালসমূহ বন্ধ হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছে, পরন্তু জল স্থির হইয়া যাওয়ায় পচিয়া যাইতেছে, অসংখ্য মৎস্য মরিয়া যাইতেছে, দুর্গন্ধে খাল বহিয়া যাওয়া যায় না। মাদারিপুরের সকল ব্যক্তিই ইহা অবগত আছেন। কর্ম্মচারীগণের এতটুক জ্ঞান হইল না যে, এক পাড় যখন নিম্ন, তখন জল সেখানে না বসিয়া খাল দিয়া যাইবে কেন? মূর্খেও এই বৈজ্ঞানিক সত্যটুক জানে। সমুদ্রে ড্রেন দিলে তরঙ্গাবিঘাতে বালী আসিয়া ড্রেনের মুখ বন্ধ করিবে, মূর্খেও তাহা জানে। অথচ বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ এই অপকার্য্য করিয়া বহু টাকা নষ্ট করিলেন। এই খালেও সেইরূপ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ও সরকারী টাকা কিরূপ অপকর্ম্মে ব্যয় হয়, এই দুটী কার্য্য তাহার আশ্চর্য্য উদাহরণ। এই ক্ষতির জন্য দায়ী কে? গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া প্রতিবিধান করিবেন কি?

(৪৪)

কার্ত্তিক (১৩২২) মাসের তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির অন্তরায় সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী পাঠ করিতে আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি। এই প্রবন্ধের মধ্যে যে সকল গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে, শীঘ্রই তাহার প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক। আমরা এইরূপ অভিযোগ বহুবার করিয়াছি বলিয়া বহু ব্যক্তি আমাদের প্রতি বিরক্ত, নানারূপে বহু ব্যক্তি আমাদিগের অনিষ্টও করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এখনও বহু বন্ধু ঘোষণা করিতেছেন যে, "নব্যভারত উঠিয়া গিয়াছে!" তত্ত্ব-বোধিনীর প্রবন্ধ-লেখকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হয়, দেখিবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত রহিলাম। কঠোর নীতি-জ্ঞান যে সমাজে ছিন্নমূল হইতে চলিয়াছে,—যে সমাজের উপরকার দশ জনের মতের সামঞ্জস্য ও বাঁধুনী নাই এবং ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানে আস্থা নাই, সে সমাজের লোকেরা বাগে পাইলে মিথ্যা নিন্দা প্রচার করা ত দূরের কথা, এহেন লেখককে প্রহার করিতেও পারেন। এরূপ চেষ্টাও বহুবার হইয়াছে। "যৌবন বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ"

প্রবন্ধ লেখার পর যষ্টী হস্তে লইয়া আমাদিগকে প্রহার করিতেও কতজন উপস্থিত হইয়াছিলেন! এখন বহু বন্ধু সে পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতেছেন। পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, প্রেস বন্ধ হইয়াছে, এখন বাকী আছে অনাহার এবং ফক্কিকার! অনাহারে প্রপীড়িত করিবার জন্য কম চেষ্টা হয় নাই! তত্ত্ববোধিনীর তীব্র মন্তব্য পাঠ করিয়া সকলে যে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রবন্ধের এক স্থলে আছে—“মদ্যপানের ন্যায় স্ত্রীসংগ্রহ বা স্ত্রীলোকের সহিত অসংযত ব্যবহারও অল্পসংখ্যক নেতৃপরিবারে প্রবেশ করিয়া সমগ্র ব্রাহ্মসমাজেরই যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা রক্ষা যদি ব্রাহ্মদিগের অভিলষিত হয়, জনসাধারণের সম্মুখে ব্রাহ্মসমাজের উন্নত আদর্শ ধারণ করা যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীসংগ্রহের ন্যায় ভীষণ শত্রুকেও ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রীসংগ্রহের পথ অত্যন্ত শিথিল, সেটা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। আমরা স্ত্রীপুরুষের সংযত ও সরল ভাবে মেলামেশা ও কথাবার্ত্তার বিরোধী নহি—অসংযত ভাবে মেলামেশারই বিরোধী। অসংযত মেলামেশাতে মহিলাগণ আত্মসম্মান বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়েন এবং পুরুষেরা স্বীয় পুরুষত্বের মর্য্যাদা হারাইয়া বসেন।

ব্রাহ্ম-নেতাগণ এই সকল ভীষণ রোগের প্রতিকারের অক্ষমতা স্বীকার করিলে অবিলম্বে ব্রাহ্মসমাজ উঠাইয়া দিউন। তাঁহারা কেবল অর্থ চেষ্টা প্রভৃতি সাংসারিক সুখ সাধন কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে চলিবে না। তাঁহারা দেশের মুখ চাহিয়া, সমাজের মুখ চাহিয়া, পরিবারের মুখ চাহিয়া এই সকল রোগের প্রতীকার সাধনে অগ্রসর হউন।” (তত্ত্ব-বোধিনী-পত্রিকা, কার্ত্তিক, ১৩২২)

প্রবন্ধের প্রতি কথায় তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সমাজের মঙ্গল কামনা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সকলের প্রণিধানের যোগ্য। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে কাহারও কথা কেহ শুনে কি? এযে স্বেচ্ছাচারের বিলাস-ধাম? ট্রামগাড়ী সমাজের উপাসনার সময় ধীরে ধীরে যায়, পাড়ার কাঁসারীদিগের ঠনঠনানি থামে, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রেস থামে না! ভাটদিগের স্তুতিবাদে দেবালয়ের ব্রহ্মর্ষির এমন বুদ্ধি হইয়াছে যে, কন্সার্ট ও কায়োয়াতি গান থামাইতে চাহেন না, পরন্তু দেবালয়কে তাস খেলার ও ইয়ারকির আড্‌ডায় পরিণত হইতে দিতেছেন! যশ যখন পূর্ণমাত্রায় ঘটে, তখন লোকে আর কাহারও প্রতিবাদের কথা শুনিতে চাহে না, পরন্তু যে তাহা বলে, তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হয়। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা তত্ত্ববোধিনীর বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ শিরোধার্য্য করিবেন কি? আমাদের সে আশা মোটেই নাই—ইহা অরণ্যে রোদন! নচেৎ ব্রাহ্মসমাজ এত হীনাবস্থায় উপস্থিত হইত না।

(৪৫)

যশোহরের সাহিত্য-সম্মিলন, শুনিতেছি, বড় দিনের সময় হইবে না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গুডফ্রাইডের সময়েই হইবে। যশো-

বর্ষে এই সময়ে যেরূপ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইয়াছে, আন্দোলনে সুফল ফলিয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইতিহাস-বিভাগে নগেন্দ্রবাবুর সভাপতিত্বও অটুট আছে, শুনিলাম। যশোহর পত্রিকার অনুসৃতি-ক্রমে আমরা ইতিহাস-বিভাগে নগেন্দ্রনাথের স্থলে হেমেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বের কথা লিখিয়াছিলাম। তাহা ভুল। এই ভুলের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন মূল সভাপতির পদ প্রত্যাহার করিলে, তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ মহোদয়কে সভাপতি মনোনয়ন করা হইয়াছে এবং তিনি পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। ইহাতেও আমরা যারপর নাই আনন্দিত। তিনি অশেষ গুণের আধার,জ্ঞানে, প্রেমে, চরিত্রে সর্ব্বজন-পূজ্য। তাঁহার বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও, তিনি প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা রাখি। তিনি অন্যান্য অধিকাংশ সভাপতির ন্যায় বাঙ্গালা-সাহিত্য-জগতে অপরিচিত নহেন। তাঁহার পুস্তক সকল অধ্যয়নের যোগ্য। নানা ভাষা জ্ঞানে তিনি অনন্ত-সাধারণ। পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষের দ্বারা পরিচালিত না হইলে সকলেই স্বীকার করিবেন, সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত সভাপতি হইয়াছেন।

(৪৬)

ভাই প্রসন্নকুমার সেন, জন্ম,—৬ই জানুয়ারী, ১৮৩৮খ্রীঃ মৃত্যু,—৯ই নবেম্বর, ১৯১৫।

বিগত ২৩শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ৭৮ বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্রের অন্যতর সহচর,ভাই প্রসন্নকুমার সেন দেহরক্ষা করিয়া অনন্তধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের সহিত ইংলণ্ডে গমন করিয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিপদে উদ্ধার ও রুগ্ন হইলে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। এজন্য কেশব-পরিবারের সকলেই তাঁহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। জনষ্টুয়ার্ট মিল যে দিন কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে মিলনের অপূর্ব্ব কাহিনী তাঁহার নিকট শুনিয়া আমরা যে কত উপকৃত হইয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যেমন তাঁহার সুবিশাল দেহ ছিল, তেমনি তাঁহার হৃদয়খানি প্রশস্ত। ছিল তিনি সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। বিশুদ্ধ চরিত্রের জন্য তাঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিত। তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন,এই জন্য কেশবচন্দ্র তাঁহাকে "কার্য্যোদ্ধার"উপাধি দিয়াছিলেন তিনি। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা ভারত-আশ্রম, এলবার্ট হল, ভিক্টোরিয়া কলেজ ও কেশব একাডেমির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি ই-আই-রেলে বড় চাকুরী করিতেন-তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের অমায়িক সস্নেহ ব্যবহার আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না। বিধাতা তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন এবং একমাত্র উপযুক্ত পুত্র প্রশান্তকুমারকে পিতার পুণ্যকীর্ত্তিতে ভূষিত করুন।

"কংগ্রেস"।

কংগ্রেস কথাটী অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহার বাঙ্গালা নাম সমিতি। যাঁহারা ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারা ইহাকে ইংরাজীতে "ইণ্ডিয়ান্ ন্যাসানেল্ কংগ্রেস্" বলেন; সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে "ভারতের জাতীয় মহাসমিতি" বলা যায়। এই সমিতিতে হিমাচল হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায় এবং সকল শ্রেণীর লোক যোগদান করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহা বাস্তবিকই ভারতের জাতীয় মহাসমিতি।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের উৎসব সময়ে বোম্বাই নগরে ইহার প্রথম উৎপত্তি। কিরূপে ও কাহার চেষ্টায় ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। সৃষ্টির উপলক্ষ যাহাই হউক, উদারচরিত পরদুঃখকাতর ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন বাহাদুরের সর্ব্বশুভ ফলপ্রদ "আত্মশাসন" প্রথাই ইহার ভিত্তি। মহামতি স্বর্গীয় আলাম্ অক্টেভিয়ান্ হিউম্ বাহাদুর এই মহাবৃক্ষের মূল বা জন্মদাতা। স্কন্ধ—জর্জ্জ ইউল্ ও উইলিয়ম্ ওয়েডারবর্ণ্। শাখা—নৌরজী, ৺উমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, ৺আনন্দমোহন, ৺জানকীনাথ, ৺কটন্ সাহেব প্রভৃতি। প্রশাখা—৺গোখলে, ৺মেটা, নায়ের, ওয়াচা, ৺চার্লু প্রভৃতি। পত্র—রাসবিহারী, ৺রমেশচন্দ্র, ৺লালমোহন, চন্দ্রভারকার, মিঃ ওয়েব প্রভৃতি। বল্কল—৺মনোমোহন, অশ্বিনীকুমার, কৃষ্ণকুমার, ৺রানাডে, মুধোলকার প্রভৃতি। জীবনীশক্তি—মিঃ ব্রাড্লা। পুষ্প—ইংরাজী শিক্ষা। পুষ্টিকর রস—ভারতের অর্থ। ফল—স্বায়ত্বশাসন।*

ইহার ফলাফল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন,—কংগ্রেস না হইলে ভারতের নিস্তার ছিল না। আবার কেহ বলেন,—যখন কংগ্রেস হইয়াছে, তখন ভারতের আর নিস্তার নাই। ফল যাহাই হউক, তবে জাতীয় ভাষার বিলোপে আমরা পর হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন বিজাতীয় ইংরাজীভাষা শিক্ষা দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইয়াছে। অধুনা মুসলমান, ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, বাঙ্গালী, পার্শী, শিক, জৈন, বিহারী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, বোম্বাইবাসী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি সকল ভ্রাতৃবৃন্দ বৎসরান্তে একবার একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর নিজের ও ভারতের দুঃখকাহিনী বলিতে পারিতেছেন। কংগ্রেসের জন্মগ্রহণের পর হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী শিক্ষিত জননায়কগণের মধ্যে ক্রমেই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইতেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ একসূত্রে বদ্ধ ও একই মহান উদ্দেশ্য পথে অগ্রসর হইতেছেন। কংগ্রেসের ফলে ক্রমশঃ আমরা পরস্পরকে চিনিতে পারিতেছি। জাতীয় মহাসমিতির জন্মাবধি আমাদিগের সমক্ষে স্বায়ত্তসাশনের

---

* প্রবন্ধের বাহুল্যভার জন্য বহু কংগ্রেসসেবীর নামোল্লেখ হইল না—ক্ষমা প্রার্থনীয়। লেখক।

আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের সর্ব্বব্যাপিকা শক্তি কংগ্রেসেরই ফল!

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। প্রতিবৎসর ভারতের সুশিক্ষিত স্বদেশহিতৈষী মনীষিগণ কংগ্রেসে সম্মিলিত হইতেছেন। ভারতের মঙ্গলার্থ কিরূপ বিধি ব্যবস্থা আবশ্যক, তদ্বিষয় স্থির করিয়া ইহার সভ্যগণ ভারতের ঊর্দ্ধতন রাজপুরুষ অথবা প্রয়োজনানুসারে সুদূর বিলাতবাসী ভারত-সচিব সমীপে কিম্বা বিলাতের মহাসভায় প্রার্থনা প্রেরণ করিতেছেন। এই কংগ্রেসের দ্বারা ভারতের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইয়াছে ও হইবে। গৌরবজনক কার্য্য সাধন ব্যতীত জাতীয় মহাসমিতির অন্য কোন লক্ষ্য নাই। হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালে দেশ শাসন প্রণালী ও রাজনৈতিক মত সমূহে যে সকল অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হইত, বর্ত্তমানে ইংরাজ-শাসনে তাহা বিদূরিত হইয়াছে। ভারতে স্বায়ত্ত শাসন প্রার্থনা করিয়া ভারতবাসী কোন অসম্ভব দাবি করে নাই এবং তাঁহারা আপনাদিগের দায়িত্ব রক্ষা করিতে পারিলে একদিন ভারতবর্ষে পার্লিয়ামেণ্টের শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র বিধিবদ্ধ ভাবে কার্য্য করা প্রয়োজন। মহাসমিতির পতাকাতলে যাহাতে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যায় ভারতবাসী সমবেত হইতে পারেন, তজ্জন্য ইহাকে প্রকৃত কর্ম্মশক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। জাতীয় মঙ্গল সাধনের জন্য কংগ্রেসই একমাত্র সমবেত শক্তিপ্রয়োগ করিবার স্থান। নানা বিষয়ে মতদ্বৈধ সত্ত্বেও জাতীয় মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি করিয়া সকলের ইহাতে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। শরীরের শক্তি, হৃদয়ের প্রীতি, মস্তিষ্কের জ্ঞানদ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধনে সকলের তৎপর হওয়া আবশ্যক।

কংগ্রেসের আদর্শে সামাজিক সমিতি, শিল্প-সমিতি, প্রাদেশিক-সমিতি প্রভৃতি অভিনব সমিতি সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, কায়স্থ, জৈন, বৈশ্য, ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায় আপনাদিগের সামাজিক উন্নতি সাধনকল্পে সভা সমিতি স্থাপন করিতেছেন। মাতৃযজ্ঞের পার্শ্বে ইহারা যেন উপযজ্ঞ। এই কংগ্রেসের প্রভাবে সমগ্র ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে নূতন কর্ম্মস্রোতের প্রবাহ উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের আকর্ষণীশক্তির প্রভাবে ভারতবাসীর জাতীয় জীবন বহু-পরিমাণে গঠিত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র জাতীয় সমিতির অধিবেশন হইতেছে। কংগ্রেস আজি কয়েক বৎসরকাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে মিলিত হইয়া ভারতবাসীর হিতকর ও প্রয়োজনীয় বিষয় মীমাংসা এবং তাহার প্রতিকার বাসনায় রাজদ্বারে আবেদন করিতেছেন। অধুনা অনেকের ধারণা, কংগ্রেস রাজদ্রোহী; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ইহা রাজপ্রসাদ-ভিখারী মাত্র। তবে কংগ্রেসের আদি কল্পনায় ইহাকে প্রজার প্রতিনিধি করিবার উদ্দেশ্য ছিল; ক্রমে ইহা উদ্দেশ্যচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। আমাদিগের দুরদৃষ্ট দাবানলদগ্ধ জাতীয় জীবনে যাহা হয়, এক্ষণে তাহাই ঘটিয়াছে।

কংগ্রেসের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইল। যে প্রণালী অবলম্বনে এই সভাসমিতির অধিবেশন হইতেছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই বিদিত আছেন। প্রত্যেক অধিবেসনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রায় লক্ষাধিক রজত-

খণ্ডের প্রয়োজন হয়। প্রতি বৎসর যেরূপ অপরিমিত অর্থব্যয় হইতেছে ও সমারোহের সহিত কার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কংগ্রেসের দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। ইহার জাঁকজমক ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে ;—এখন আর কংগ্রেসে তেমন প্রতিনিধির ছড়াছড়ি হয় না, এখন কংগ্রেসটা যেন দায়ে পড়িয়া পিত্তরক্ষা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আবার দুইটা বিশেষ রাজনৈতিক দল দাঁড়াইয়াছে। এই দুই দলের মতানৈক্য বশতঃ কংগ্রেসের অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে ; কিন্তু ইহা ভারতের বিশাল ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামগ্রী —কোন দলের নহে।

জাতি-বিদ্বেষই ভারতের উন্নতির প্রধান পরিপন্থী। যাহাতে বিদ্বেষ বিলুপ্ত হইয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রীতি সঞ্চারিত হয়, যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকল দল এক হইতে পারে, যাহাতে দেশের কৃষিকার্য্যের ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন হয়, যাহাতে ভারতের সনাতন শিল্পকলার সমাদর বৃদ্ধি হয়, যাহাতে লোকের অন্নমুষ্টি সংগ্রহের সুব্যবস্থা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য,—স্বাবলম্বনের পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে। কংগ্রেস ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশ ও জাতির প্রতি মমত্বের ভাব উদ্রেক করিয়া দিয়াছে, এখন সেই ভাবকে পোষণ ও পালন করিবার জন্য ভক্তিজল সিঞ্চন প্রয়োজন ; তবে পুরাতন কংগ্রেসে নবজীবন সঞ্চারিত হইবে। কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের অন্নাভাব ও বিলাসস্পৃহা দূর করিতে চেষ্টা করিলে, ইহার জন্ম সার্থক হইবে।

অধিবেশন।	খ্রীষ্টাব্দ।	স্থান।	প্রতিনিধি।	সভাপতি।
১	১৮৮৫	বোম্বাই	৭২	৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Bt.
২	১৮৮৬	কলিকাতা	৪৩৬	দাদাভাই নৌরজী
৩	১৮৮৭	মাদ্রাজ	৬০৭	৺বদরুদ্দীন তায়াবজী
৪	১৮৮৮	এলাহাবাদ	১,২৪৮	মিঃ জর্জ্জ ইউল্
৫	১৮৮৯	বোম্বাই	১,৮৮৯	স্যার উইলিয়ম্ ওয়েডারবর্ণ
৬	১৮৯০	কলিকাতা	৬৭৭	৺স্যর ফেরোকসা মেটা K. C. I. E.
৭	১৮৯১	নাগপুর	৮১২	৺রায় আনন্দ চার্লু বাহাদুর C. I. E.
৮	১৮৯২	এলাহাবাদ	৬২৫	৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Bt.
৯	১৮৯৩	লাহোর	৮৬৭	দাদা ভাই নৌরজী
১০	১৮৯৪	মাদ্রাজ	১,১৬৩	মিঃ আল্‌ফ্রেড্ ওয়েব, M. P.
১১	১৮৯৫	পুনা	১,৫৮৪	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২	১৮৯৬	কলিকাতা	৭৮৪	৺রহিমতুল্যা মহম্মদ সায়েনী
১৩	১৮৯৭	অমরাবতী	৬৯২	স্যর, সি, শঙ্করণ নায়ের K. C. I. E.
১৪	১৮৯৮	মাদ্রাজ	৬১৪	৺আনন্দমোহন বসু
১৫	১৮৯৯	লক্ষ্ণৌ	৭৩৯	৺রমেশচন্দ্র দত্ত C. I. E.
১৬	১৯০০	লাহোর	৫৬৭	নারায়ণ গণেশ চন্দ্রভারকার

অধিবেশন।	খ্রীষ্টাব্দ।	স্থান	প্রতিনিধি।	সভাপতি।
১৭	১৯০১	কলিকাতা	৮৯৬	দিন্‌স ইড়ুল্‌জী ওয়াচা
১৮	১৯০২	আহামাদাবাদ	৪৭১	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯	১৯০৩	মাদ্রাজ	৫৩৮	৺লালমোহন ঘোষ Bt.
২০	১৯০৪	বোম্বাই	১,০১০	স্যর হেনেরী কটন্ K. C. S. I.
২১	১৯০৫	বারাণসী	৭৫৬	৺গোপাল কৃষ্ণ গোখলে C. I. E.
২২	১৯০৬	কলিকাতা	১,৬৬৩	দাদা ভাই নৌরজী M. P.
২৩	১৯০৭	সুরাট	১,০০০	ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ C. I. E.
২৪	১৯০৮	মাদ্রাজ	৬১৭	স্যর রাসবিহারী ঘোষ C. S. I.
২৫	১৯০৯	লাহোর	২৪৩	পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর
২৬	১৯১০	এলাহাবাদ	৬৩৬	স্যর উইলিয়ম্ ওয়েডারবর্ণ
২৭	১৯১১	কলিকাতা	৪৪৬	বিষ্ণু নারায়ণ দার Bt.
২৮	১৯১২	বাকীপুর	২১১	রাওরঙ্গনাথ নরসিংহ মুধোলকার বাহাদুর
২৯	১৯১৩	করাচী	৫৫০	আহম্মদ সৈয়দ মামুদ Bt.
৩০	১৯১৪	মাদ্রাজ	৮৪৮	ভূপেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

সমাজ-সমস্যা।

একান্নবর্ত্তী পরিবার।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে, পাশ্চাত্য পারিবারিক জীবনের আদর্শে আমাদিগের যে সকল সাধের সমাজচিত্র অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, তাহাদের মধুর স্মৃতি মধুরতর, সুন্দরতর ও উজ্জ্বলতর হইয়া আমাদের প্রাণে এখনও আনন্দের লহরী তুলিতেছ। কাছে হইতে দূরে গেলে নিসর্গের শোভা শত গুণ বর্দ্ধিত হয়—It's distance lends enchantment to the view. যাহা আমরা পাইয়াছি, তাহার মূল্য আমরা এখন বুঝিতেছি না; যাহা আমরা হারাইয়াছি, তাহার মূল্য আমরা চক্রবৃদ্ধি হারে কুসীদ যোগ করিয়া বাড়াইয়া তুলিতেছি; ইহাই মানুষের প্রকৃতি। কিন্তু মন্দের সঙ্গে ভালও গিয়াছে, ভালর সঙ্গে মন্দও আসিয়াছে। যাহা এক সময় মন্দ বলিয়া মনে হইয়াছিল, কালের পরিবর্ত্তনে তাহাই আবার ভাল বলিয়া আদৃত হইতে পারে। এখন যাহা ভাল বলিয়া আদর করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি, তাহা যে চিরদিনই দেশকালপাত্র বিচার করিয়া ভালই থাকিবে, তাহারই বা স্থিরতা কি? যে সকল লুপ্ত প্রথা দূর হইতে রক্তিম আভায় মনোহর সাজে সাজিয়া, আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে, একান্নবর্ত্তী পরিবার তাহাদের অন্যতম।

যুক্ত পরিবার বা একান্নবর্ত্তীপরিবার

বলিলে আমরা বিভিন্ন, স্বতন্ত্র পরিবারের সমষ্টি বুঝি। সুতরাং ঐপ্রকার নাম প্রয়োগ করিতে হইলে একত্বের ভিতরে বহুত্বের দ্যোতনা থাকিয়া যায়। যাহা বহু, তাহা বহু হইয়া গেলে দুঃখের কথা বা বিস্ময়ের কারণ কি হইতে পারে? আমাদের দেশে পূর্ব্বে যে হিন্দুপরিবারের আদর্শ ছিল, তাহাকে, অপরে যাহাই বলুক না কেন, আমরা একান্নবর্ত্তী বা যুক্ত পরিবার না বলিয়া কেবল 'পরিবার' আখ্যায় আখ্যাত করিতে ইচ্ছা করি। সেই এক পরিবার ভাঙ্গিয়া পুরুভুজের ন্যায় বহু অংশে বিভক্ত হইতে পারিত; কিন্তু ভগ্ন ও বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা এক অখিল পূর্ণসংখ্যা থাকিত। Joint family, যুক্ত বা একান্নবর্ত্তী পরিবার নাম আমরা বোধহয় পরে আবিষ্কার করিয়াছি।

পূর্ব্বে হিন্দুপরিবারের প্রকৃতি ও অধিকার কিরূপ ও কতদূর ছিল, তাহা আমরা এখন ভালরূপ বুঝিতে পারি না। পুত্র পৌত্র লইয়া একত্র বাস করাকে, শাশুড়ী-ননদ-ঝি-বউ একত্র থাকাকে আগে 'যুক্তপরিবার' বলা অসঙ্গত হইত। কারণ তখন তাহাই প্রত্যেক পরিবারের উপাদান ছিল। অসহায় বিধবাদিগকে আশ্রয় দিলে, দুস্থ, নিরাশ্রয়, দরিদ্র আত্মীয় স্বজনকে পরিবারে স্থান দিলে, তাহারা সঙ্গে সম্পত্তি বা মূলধন লইয়া আসিতে না পারিলেও, পরিশ্রম দ্বারা সাধারণ সম্পত্তির অংশী হইতে পারিত। পূর্ব্বে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র এক একটী পরিবারের কর্ত্তার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া এক একটী গোত্রের ও বংশের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এরূপ একান্নবর্ত্তী প্রথা অসীম ও অনন্তকাল-যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে পারে না। তাহা সম্ভব হইলে আজ আমরা জগৎজোড়া মনুর বংশধরদিগের এত অপূর্ব্ব পরিবার দেখিতে পাইতাম! এক জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, যুদ্ধবিগ্রহ, রেষারেষি হইবার কারণ থাকিত না। বিলাতী ব্যবস্থায় প্রত্যেক দম্পত্তিই এক একটী স্বতন্ত্র পরিবার। পুত্রবধূ ঘরে আনিলে, এবং কন্যা জামাতার করে সমর্পিত হইলেই, তাহারা পৃথক পরিবার হইয়া যায়। ভ্রাতা বিবাহিত হইলেই পৃথক পরিবারের কর্ত্তা, অবিবাহিত থাকিলে পিতার পোষ্য। পিতার অবর্ত্তমানে মাতা, এবং মাতার অভাবে পিতা, পুত্রদিগের পরিবারের আশ্রয়ে অংশমত বাস করিতেন। অন্যথা তিনি স্বতন্ত্র ভগ্নপরিবারের ধ্বংসাবশেষের ন্যায় সমাজে শিক্ষার স্থল ও গবেষণার বিষয় হইয়া অবস্থান করিতেন। জনক বা জননী বিরাট পরিবারের গ্রন্থি স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা একত্বের মিলনে সন্ধিস্থলে পরিবার-তরুর কাণ্ড হইয়া অবস্থান করিতেন। সে মূল কাণ্ডের বিনাশ হইলেই শাখা-প্রশাখা স্বতন্ত্রতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করিত। যাহা হউক, আমরা পুত্রপৌত্রের সহিত একত্রবাসকে যুক্ত পরিবার আখ্যা না দিয়া সহোদর, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত, ভ্রাতুষ্পুত্র বা অপর কোন বিবাহিত আত্মীয়ের সহিত একত্র, একান্নভুক্ত হইয়া থাকাকে যুক্ত-পরিবার নামে অভিহিত করিতে পারি। উহাও প্রাচীনকালের পরিবারের প্রকৃতিগত ধর্ম্মই ছিল। তথাপি এখন বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত, সেকালের ঐ শ্রেণীর পরিবারকে একালের যুক্তপরিবার নাম দিয়া স্বতন্ত্র-শ্রেণীতে ফেলিয়া দেওয়া কিছু অন্যায় হইবে না।

পুরাণেতিহাস অন্বেষণ করিলে আমরা

একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুস্পষ্টচিত্র দেখিতে পাই না। রামলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্ন চারি ভাইএর মধ্যে এত মিল যে, তাহা প্রবাদের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের বিবাহের পর যে চারি বধূর অন্ন এক হাঁড়িতে সিদ্ধ হইত, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কি, রাজা দশরথের মহিষীদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক অন্দর মহল ছিল, কেহ কাহারও ছায়া মাড়াইতেন না। কৌশল্যা ও সুমিত্রার সঙ্গে যে এতভাব, তাঁহারাও দশরথের স্বর্গারোহণের পর একত্র হবিষ্য করিতেন কি না, জানি না। সুয়োরাণী ও দুয়োরাণীরা চিরকালই দূরে দূরে থাকিতেন। কৃষ্ণ-বলরাম রাজনৈতিকক্ষেত্রে ও ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে অভেদাত্মা ছিলেন। কিন্তু রুক্মিণী ও রোহিণীর অন্ন পৃথক্ ঘরে রান্না হইত বলিয়াই মনে হয়। দ্রৌপদী ও সুভদ্রা একত্র চুল ছাড়িয়া দিয়া পাথরে পান্তভাত লইয়া গল্প করিতে করিতে বেলা তৃতীয়প্রহরে আহারে বসিতেন না। বরং রাজা রাবণের যুক্ত-পরিবারের বাঁধন আর্য্যরাজাদিগের অপেক্ষা একটু বেশী আঁটাআঁটি বলিয়া মনে হয়। কুম্ভকর্ণের ছয়মাস নিদ্রা একদিন জাগরণ; কাজেই তাহার জ্যেষ্ঠের গলগ্রহ হওয়া ভিন্ন আর উপায় কি? রাবণও কুম্ভকর্ণকে বসাইয়া খাওয়াইতেন না, প্রয়োজন হইলে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে যমের মুখে ঠেলিয়া দিতেন। দুর্য্যোধনদিগের শতভ্রাতার অন্ন একত্র রান্না হওয়া অসম্ভব নহে। বিরাট রাজার বাড়ীতে ভীমের ন্যায় সুপকারের প্রয়োজন হইয়াছিল। দিল্লীর মসজিদে সিন্নীর কথা শুনিয়াছি যে, ডেগ্‌চীতে খিচুরী রান্না হইত এবং সিড়ী দিয়া ডেগ্‌চীর ভিতর নামিয়া ক্রমে ঝুরিতে করিয়া খিচুরী তুলিয়া আনিতে হইত। দুর্য্যোধনের একান্নবর্ত্তী পরিবারের সেই বিপুলকায়া স্থালীটী কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

মোট কথা সুবিধা ও প্রয়োজনের উপর পূর্ব্বে যুক্তপরিবার নির্ভর করিত, এখনও তাই। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশ; কৃষকের দেশে শ্রমবিভাগের জন্য, স্ত্রী পুরুষের সমবেত শক্তির জন্য যুক্ত পরিবার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইত। সেই সংযুক্ত পরিবারের এককসমূহ (unit) নিকটাত্মীয়ও হইতে পারিতেন, দূরের জ্ঞাতি স্বজনও হইতে পারিতেন। যখন মানবসমাজ পরস্পর ভাবের আদান প্রদান করিয়া পরের সহিত সৌখ্য ও সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারে নাই, যখন ভাষাও সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়া মানব মিলনমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তখন এক পরিবারই 'আপনার জন' ছিল। কৃষিকার্য্যে ও সমবেত চেষ্টাসাধ্য শ্রমশিল্পের প্রয়োজনে আপনার জনেরা একত্র বাস করিতে বাধ্য হইত। এখন ধর্ম্মঘট, যৌথসমিতি, শ্রমসমবায়, কলকারখানা যাহা বৃহৎ আকারে সাধন করিতেছে, সেকালে মানব-সভ্যতার শৈশবযুগে তাহা পরিবার-ভুক্ত আপনারজনেরা ক্ষুদ্রাকারে নিষ্পন্ন করিত। অতএব তখন সভ্যতার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য, অন্নোপার্জ্জনের জন্য, আততায়ীর সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিবার জন্য, প্রতিকূল-প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য, মানবকে বাধ্য হইয়া, বহুজন একত্র বাস করিয়া, সমবেত শক্তি সঞ্চয় করিতে হইত। সেই বহুজন একগোত্রের, একবংশের, একরক্তের একপরিবারের, 'আপনার-

জন' ছিল। পরকে একলক্ষ্যের ও সমস্বার্থের বন্ধনে বাঁধিয়া আপনার করা তখন সম্ভব হইত না। পর যখনই কোন পরিবারে প্রবেশ করিত, সে বিজিত, ক্রীত, পদানত, দাস, শূদ্র হইয়া আসিত। শিক্ষার ও জ্ঞানের আলোক তখন চতুর্দ্দিকে অজস্রধারে বিকীর্ণ হয় নাই। মানব তখন বৈজ্ঞানিক শক্তিবলে বলীয়ান হয় নাই। সমাজে তখন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয় নাই, কাজেই তখন শুক্রশোণিতের সম্পর্কসূত্রে মানুষকে গাঁথিয়া রাখা কঠিন হইত না। এখন পরের ঝি সহজে আপনার হয় না; প্রত্যেক পুরুষ ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত; প্রত্যেকের যুক্তিতর্ক বিচার-বুদ্ধির স্বতন্ত্র ধারা ও স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য আছে। এখন পূর্ণবয়স্ক দুর্ব্বল হইলেও আইনের আশ্রয়ে বলবান্। এখন কোন যুবক-পুত্র বা যুবতী পুত্রবধূ পিতা বা শ্বশ্রূর শাসনে থাকিতে আইনত বাধ্য নহে। সেকালে একপরিবারে আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত কর্ত্তা যে কঠোর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, যে সকল বিধি নিষেধ ব্যবস্থা করিতেন, এখন তাহা অগ্রাহ্য ও বাতিল হইয়াছে। বিজাতীয়, বিদেশীয় সংস্পর্শের ও শিক্ষার দোষেই হউক আর গুণেই হউক, এখন পূর্ব্বের সমাজবিধি শিথিল হইয়াছে। আদর্শের অভাবে বৃহৎ জনবহুল পরিবারে বাস করার আকাঙ্ক্ষার অভাব হইয়াছে। সুলভ বিলাসিতার আবির্ভাবে প্রত্যেকের অভাব ও প্রয়োজন অধিক হইয়াছে। ধর্ম্মের শাসন বিলুপ্ত হওয়াতে সুখভোগের বাসনা বলবতী হইয়াছে। আলস্যপরায়ণতা ও শ্রমবিমুখতা পুরুষরমণী উভয়ের মধ্যেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃতী, শক্তিমান্, যোগ্যব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অযোগ্যদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিলে যতটুকু ত্যাগস্বীকার করা প্রয়োজন হয়, তাহাতে অনেকেই রাজি হইতেছেন না। কেবল যে সংযম ও তিতিক্ষার অভাবই মিলনের পথে বাধা দেয়, তাহা নহে, অর্থলিপ্সা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা, কপটতা, পক্ষপাতিত্ব, অবিশ্বাস, সন্দেহ, রাগদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা, মুখরতা, কলহপরায়ণতা, সেবা ও সমবেদনার অভাব মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলে। এই সকল কীট বৃহৎ পরিবারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া উহা অন্তঃসার-শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল। কৌরব ও পাণ্ডবেরা এক পরিবারে বাস করাতে, তাহাদের শত্রুতা আরও অধিকতর তীব্র হইয়াছিল। কৈকেয়ী কৌশল্যার সহিত একত্র বাস করিয়াও তাঁহার সর্ব্বনাশের বীজ বপন করিতে ছাড়েন নাই। যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল আত্মকলহে। বালী ও সুগ্রীব সহোদর হইলেও চিরশত্রু। ভক্ত বিভীষণ লঙ্কার ইতিহাসে দেশবৈরী। সত্যভামা তাঁহার সপত্নীদিগের সহিত একপরিবারে বাস করিলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাজানি কি সুখ-শান্তির পরিবারই গঠিত হইত! মহাজনদিগের পন্থা অনুসরণ করিয়া সাধারণ লোকের গরিবারেও সেইরূপ অবস্থাই হইয়াছিল। আমরা শৈশবে পরিবারের কঠিন, জটিল সমস্যাগুলি বুঝিতে পারিতাম না বলিয়া, তখন যুক্তপরিবার এত মিষ্ট বোধ হইত। দুঃখের স্মৃতি কালে মুছিয়া যায় এবং বিষাদের আঁধারের ভিতর দূরবর্ত্তীকালে সুখের ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু গগনে উজ্জ্বল তারকার জ্যোতিবিন্দুর ন্যায় সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে।

তাই আমরা গত শতাব্দীতে আমাদের পল্লীতে যে যুক্তপরিবার বা বৃহৎ পরিবার দেখিয়াছি, এখনও তাহার স্মৃতির মাদকতায় বিভোর হইয়া আছি। স্বর্ণলতায় যে অক্ষয় অতুলনীয় বাস্তব চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহার পাশে প্রাচীন পরিবারের সকল প্রকার কাল্পনিক চিত্রই মলিন ও ক্ষণভঙ্গুর। গৃহস্বামী যেখানে অনুপযুক্ত, গৃহিণী যেখানে অযোগ্য, পারিবারিক শিক্ষা যেখানে অসম্পূর্ণ বা বিকৃত, বাহির হইতে আগত পারিবারিক উপাদান বধূরা যেখানে অশিষ্ট বা প্রতিকূল, সংসর্গদোষে গৃহের যুবকগণ যেখানে নষ্ট, ভ্রষ্ট বা বিকৃত, সেখানে বৃহৎ পরিবার ছিন্নভিন্ন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্ব্বে যুক্তপরিবারে সুখসুবিধা ছিল বলিয়াই উহার এত বহুল প্রচার হইয়াছিল; পরে কালচক্রে অবস্থার পরিবর্ত্তনে সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধার ভাগ বেশী হইয়া পড়িলে, উহা নৈসর্গিক কারণে ধীরে ধীরে কালকবলে লয়প্রাপ্ত হইতেছে—অপমৃত্যু হইয়াছে এমন বলিতে পারি না এখনও যে যুক্তপরিবারের অস্তোন্মুখ গৌরবচ্ছটার দুই একটী কিরণ সমাজশিখর হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের কাছে না আসিতেছে এমন নহে। কিন্তু উহার সে দীপ্তি নাই, সে কান্তি নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে প্রাণ নাই—আছে কেবল স্মৃতির শোভা ও আঁধারের আবরণ।

আমরা এমন অনেক পরিবারের ইতিহাস জানি, পিতামাতার আশ্রয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কষ্টলব্ধ অর্থে যাহার মহিমা ও প্রতিষ্ঠা গড়িয়া উঠিয়াছিল; পরে ভ্রাতৃগণ কৃতী ও উপার্জ্জনক্ষম হইলে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক অর্থভাণ্ডার ও ব্যক্তিগত ব্যয়ের খাস তহবিল স্থাপিত হইল এবং একত্র আহার কেবল 'মেসের' রূপান্তর মাত্র হইয়া পড়িল। এমন অনেক পরিবার দেখিয়াছি যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জনক্ষম জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহার অর্জ্জিত অর্থে স্ত্রীরনামে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ভ্রাতাদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আবার এমনও অনেক [illegible]স্ত দেখিয়াছি যে,নামে মাত্র একান্নভুক্ত হইলেও প্রত্যেকেই শ্বশুরালয়ের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, স্ত্রীর গহনা ও স্ত্রীধন বৃদ্ধিকরিতে ব্যস্ত, পরস্পর পরস্পরকে আইন বাঁচাইয়া বঞ্চনা করিতে সচেষ্ট। পক্ষান্তরে কোন পরিবারের একজন উপার্জ্জনক্ষম হইলে আর সকলে পায়ের উপর পা তুলিয়া বাবুগিরি করিয়া কেবল যে অলসভাবে ভ্রাতার বা জ্যেষ্ঠতাতের শ্রমলব্ধ অর্থ ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত হইবে, এমন নহে, কর্ত্তার স্ত্রীপুত্রদিগকে নানাপ্রকার বাক্যবাণে দগ্ধ করিয়া অন্নবস্ত্রের ক্লেশ দিয়া, রোগে ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া কঠিন শ্রমজনক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, জ্বালাতনের একশেষ করিবে। সে সকল কথা ন্যূনাধিক পরিমাণে আমরা সকলেই জানি, আরও অনেক জানি। অনেক সময় নিষ্কর্ম্মা পরান্নজীবীদিগের ষড়যন্ত্রে, জননীর অবিবেচনার দোষে, নিঃস্বার্থ প্রতি বশীদিগের প্ররোচনায় কত সোণার সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া, স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষার অভাবে সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া সর্ব্বদা কলহের সৃষ্টি করিয়া, অনেক পরিবারের ঐক্য নষ্ট করিয়াছে। কর্ত্তব্যে উদাসীনতা, দৈনিক কর্ম্মে অবহেলা, অসুখের ভান করিয়া পরকে খাটাইয়া নিজে চতুরতা করিয়া আরাম ভোগ করিবার চেষ্টা, গত্যন্তরহীন বিধবাদিগের স্কন্ধে খাটুনির

ভার চাপাইয়া বধূদিগকে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া প্রভৃতি আভ্যন্তরিক ত্রুটী ধীরে ধীরে অলক্ষিতভাবে যুক্ত পরিবারের ভিত্তি ক্ষয় করিয়াছিলে। বধূদিগের স্কন্ধে সকল দোষ চাপা হইলেও শ্বশ্রূঠাকুরাণীরা সর্ব্বত্র নিরপরাধ নহেন। পুত্রবতী বড়বধূর স্বামী মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া রোজগার করিয়া সংসার বাঁধিয়া দিলেও, কনিষ্ঠপুত্র ও তাহার নববধূর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগবশতঃ বৃদ্ধা গৃহিণী অনেক সময় অবিচার ও পক্ষপাত করিয়া সংসারে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করেন। প্রতিযোগিনী ও ভাবী গৃহিণী জ্যেষ্ঠা বধূর পুত্রকন্যা ও আত্মীয়স্বজন অপেক্ষা কন্যা-জামাতা ও কনিষ্ঠ বধূর আত্মীয় স্বজনকে অধিকতর অনুরাগ ও স্নেহের চক্ষে দেখা অনেক গৃহিণীর ব্যবহারে বিষম ত্রুটী। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে এবং অনাবশ্যক কঠোর শাসনে ও অত্যাচারে এদেশে প্রতি বৃহৎ পরিবারে নিয়ত কলহ ও অশান্তি বিরাজ করে। বিলাতফেরতা কালা সাহেবদিগের শিক্ষা,আদর্শও বিলাসপ্রিয়তা যুক্ত পরিবারের বিরোধী। শিক্ষিতদিগের দরিদ্রের প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর, এবং বৃথা অভিমান তাঁহাদিগকে অক্ষম আত্মীয়স্বজনের সহিত একত্র বাস করিতে দেয় না।

বিদেশে সপরিবারে চাকরী করিতে যাওয়া যুক্ত পরিবারের বন্ধন শিথিল হইবার অন্যতম কারণ,—চাকুরীর আল্‌গা টাকা সংসারে ব্যয় করিতে চাকুরীয়ার এবং তাঁহার পত্নীর ও পত্নীর জননী, ভাগিনী ও ভ্রাতাদিগের প্রাণে কেমন মায়া লাগে। পরিবারের অন্যান্য পুরুষেরা শরীর খাটাইয়া সংসার রক্ষা করে বটে, কিন্তু তাহারা চক্‌চকে টাকা ঝন ঝন করিয়া বাজাইয়া বাক্সে আনিয়া ফেলিতে পারে না। অতএব তাহারা অক্ষম এবং চাকুরে কেরাণীবাবু 'সক্ষম'। সে টাকার প্রতি অতিরিক্ত মমতা জন্মিলে ক্রমে তাহা গহনায় ও কোম্পানীর কাগজে সঞ্চিত হয় 'শেয়ার' কেনা হয়। পোষ্টাফিসে জমে। প্রভিডেণ্টফণ্ডে যায় এবং "for the benefit of his wife and children" জীবনবীমার প্রিমিয়ামে খরচ হয়। তখন কর্ত্তার হাতে এক পয়সাও বাঁচে না, সুতরাং পরিবারের আনুকূল্য করা অসম্ভব। পৈতৃক সম্পত্তিতে সকলেরই তুল্য অধিকার। জমালি মালে সকলেরই হক আছে; রোজগারী ভাইয়ের টাকায় বাসা খরচই কুলায় না, সংসারের সাহায্য হইবে কিরূপে? স্বামীর পক্ষে সহোদর অপেক্ষা পুত্রের গর্ভধারিণীর সহোদরদিগের প্রতি অধিকতর অনুরাগ এবং স্ত্রীর পক্ষে দেবর-শ্বশুর অপেক্ষা জনক-সোদরের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ যুক্ত পরিবারে বিপ্রকর্ষণ-শক্তি আনয়ন করে। অনেক বধূ শ্বশ্রূর শাসনে অধীর হইয়া গৃহিণীপনার অকাল-বোধন করিয়া স্বহস্তে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পরিবারক্রান্তি ও civil warএর অবতারণা করেন।

এইরূপ নানা নৈসর্গিক কারণে সাধের যুক্তপরিবার বিযুক্ত হইয়া পড়িলেও,প্রয়োজন আমাদিগকে পর লইয়া নূতন পরিবার গঠন করিতে বাধ্য করিয়াছে। যেখানে আইন আমাদের শ্রমলব্ধ অর্থ বলপূর্ব্বক যুক্ত পরিবারের অলস পুরুষদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে বাধ্য করে না, সেইখানে নির্ভয়ে আমরা নূতন প্রণালীতে যুক্ত পরিবার গঠন করিতেছি। কিন্তু নূতন সভ্যতার নূতন প্রণালীও দোষশূন্য নহে। আমরা মেস

করিয়াছি, হোটেল করিয়াছি, বোর্ডিং করিয়াছি, যৌথ কারবার করিয়াছি, এসবই যুক্তপরিবারের কৃত্রিম অনুকরণ মাত্র। প্রকৃতি যেখানে পরাস্ত হয়, সেখানে অভাব পূরণ করিতে অনুকরণের শিল্পই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। যুক্ত পরিবারে যে সামাজিক শিক্ষা হইত, মিলিতভাবে কাজ করিবার জন্য যে সকল ত্যাগ ও সংযম শিক্ষা দেওয়া হইত, পরার্থের নিকট স্বার্থ বলিদান করিবার জন্য, সহানুভূতি ও সমবেদনাবৃত্তি বিকশিত কারবার জন্য যে আয়োজন ও ব্যবস্থা ছিল, তাহার তুলনা জগতে আর কোন শিক্ষালয়েই নাই। যুক্ত পরিবারে আমাদের সাধারণ মূলধন খাটিত, প্রকারান্তরে আমাদের জীবন-বীমা করা ছিল, আমাদের অকালমৃত্যু হইলে যুক্তপরিবারের সাধারণ সম্পত্তি, দয়া, স্নেহ, সেবা ও তত্ত্বাবধানের ভরসায় ভাণ্ডারে আমাদের পুত্র-কলত্রের নিমিত্ত প্রভিডেণ্টফণ্ড জমা হইত। কিন্তু সে আশা পরিবারভুক্ত আত্মীয়স্বজনের দয়ামায়া ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির মুখের দিকে চাহিয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকিত। পরিবারের রন্ধনশালা পৃথক হইয়া গেলেও সে দয়ামায়া ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রত্যাশা করা এখন অসঙ্গত নহে। অকারণ স্বার্থের সংঘর্ষ বাড়াইয়া বিবাদকলহ, মনোমালিন্য সৃষ্টি করিয়া, শান্তি ও সুখে আহুতি দিয়া, একান্নবর্ত্তী পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষা করা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। পরিবারের ইজ্জত রক্ষা পরের কাছে যেরূপ কঠিন, আত্মীয়-স্বজনের কাছেও আজকাল প্রায় তদ্রূপই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে চরিত্রহীনতা যুক্তপরিবারের ভীষণ শত্রু তাহার কুফলে নৈসর্গিক ও কৃত্রিম উভয়বিধ যুক্ত পরিবারই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। পাশ্চাত্য সামাজিক আদর্শ স্ত্রীলোকের সম্পর্কের সম্মান পুরুষের চক্ষে অনেক পরিমাণে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। যৌন সম্বন্ধের বিধিনিষেধ এখন নূতন আলোকে কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইতেছে। মামাশ্বশুর, ভ্রাতৃবধূ, গুরুজনের সমীহ করিয়া চলা প্রভৃতি বাধা ও সঙ্কোচ এখন শঙ্কিত হইয়া অপসৃত হইয়াছে। অতএব পরের বা আপনার জনের একক পরিবারের সমষ্টি যুক্তপরিবার গঠন করা আজকাল কঠিন সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। এই বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন যুগের ভীমাবর্ত্তে একান্নবর্ত্তী নৈসর্গিক পরিবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া অতল সলিলে নিমগ্ন হইবেই। আমরা তাহা ধরিয়া রাখিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া বিরাট বিদায়ের আয়োজন করিলে, প্রকৃতির ও সময়ের অনুবর্ত্তন করা হইবে! বাম হস্তে অশ্রুজল মুছিয়া দক্ষিণ হস্তে নিরুপায় হইয়া আমাদিগকে সাধের পুরাতন যুক্তপরিবারের বিদায় শঙ্খ বাদ্য করিতে হইতেছে। শক্তি ও সামর্থ্য থাকিলে আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করা বা বিপন্নকে নিজের ঘরে আশ্রয় দেওয়া পৃথক পরিবারে বাস করিয়াও চলে। অতীতের মোহে আকুল হইয়া হা হুতাশ করা সদ্বিবেচকের কাজ নহে। খণ্ড পরিবারে প্রীতি সখ্য অক্ষুণ্ণ থাকিয়া আত্মনির্ভর ও আত্মোন্নতির চেষ্টা আসিবে, আলস্য ও আরামপ্রিয়তা ও তমোভাব দূরীভূত হইয়া রজোগুণের কর্ম্মশীলতা আসিবে। নূতন প্রাণের নূতন সতেজ স্পন্দনে সকল দেহের হৃদ্‌পিণ্ডে জাগরণের ক্রিয়া ও চেতনা সূচিত হইবে, আশা করা যায়।

শ্রীরসিকলাল রায়

নিরাশা

হরষের আবরণে বিষাদ বিদগ্ধ প্রাণ,
নিয়তির খর তাপে ফেটে হয় শতখান ।
নবীন বৈশাখী মেঘ কভু যদি ঢাকে তায়,
অমনি উড়ায়ে দেয় সংসারের ঝঞ্ঝাবায় ।
ভীষণ অশনি পড়ে না ঝরিতে বারি বিন্দু,
হৃদয়ে উছলি চলে অশান্তির সপ্ত সিন্ধু ।
এইতো জীবনে শুধু বাহিরের হাসি খেলা,
নীরবের অশ্রুভারে সাজায়ে শান্তির মেলা ।
জীবনের আশাতরু ফুটায় দুঃখের ফুল,
তাহে গুঞ্জরিয়া ধায় নিরাশায় অলিকুল ।
শোকের শারদাকাশে পাপিয়ার কলতান,
নিরানন্দ নন্দনেতে কোকিলের কুহু গান ।
বিশুষ্ক জীবন কুঞ্জে জ্বালিয়া অনল বক্ষে—
শিরে বাহু উপাধান নিদ্রাহীন সিক্ত চক্ষে,
ভূমি কিম্বা তৃণ শয্যা শত চিন্তা ভরা চিত্ত ;
সুখের রজনী যার এমনি পোহায় নিত্য ।
দুঃখ যার চিরসাথী তারে সাজে চিরহাসি
চির মধু ঋতুভরা করমেতে বাজে বাঁশী
চির সহচরী চিন্তা ছায়া সম ঘোরে পাছে
এমন ব্যথার ব্যথী বল কেবা কোথা আছে ।
জরাময় জলতলে ব্যাধি মীন খেলা করে
সদা পরিপূর্ণ যাহে নানাজাতি জলচরে
অনন্ত লহরীমালা শুনায়ে কল্লোল গীতি,
প্রফুল্লতা সজীবতা সরলতা ঢালে নিতি,
বিষণ্ণতা দৈন্যরাশি অনন্ত শৈবালে চুমি,
তাপ ক্লেশ বলাকায় শোভিছে সৈকত ভূমি ।
মাস বর্ষ যুগ যুগ এমনই সুখে যদি—
হৃদয়ের প্রতি স্তরে বহে পরিপূর্ণ নদী,
তার দুঃখ কেবা শোনে কে মুছাবে অশ্রুজল ?
কেবা তার ম্লান মুখ দেখিবারে চায় বল ?
তাই তার প্রফুল্লতা তাই তারি হাসি গান,
তাই করে খেলা তার সরল তরল প্রাণ ।

শ্রীপ্রীতিবালা সরকার ।

আর্য্য, অনার্য্য, অসুর, দৈত্য ও দানব ।

আজকাল অনেকেই অসুর দৈত্য দানব মাত্রকেই অনার্য্য মধ্যে গণ্য করিতেছেন। অসুরগণের সহিত আর্য্যগণের বিবাদ মাত্রকেই আর্য্য ও অনার্য্যের বিবাদ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। আর্য্যগণের সহিত অসুর দৈত্য বা দানব বংশের কাহারও বিবাহের প্রমাণ পাইলেই তাহা আর্য্যজাতির সহিত অনার্য্য জাতির মিশ্রণ বলিয়া বর্ণন করিতেছেন। হিরণ্যকশিপু, বৃষপর্ব্ব প্রভৃতি এইরূপে অনার্য্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়াছেন।

আমরা দেখিব, হিরণ্যকশিপু, বৃষপর্ব্বা প্রভৃতি আর্য্য কি অনার্য্য। প্রাচেতস (প্রচেতার পুত্র) দক্ষের কন্যা অদিতি, দিতি ও দনুর সহিত কশ্যপ ঋষির বিবাহ হইয়াছিল, একথা সকল পুরাণেই লিখিত আছে। কশ্যপ ঋষির ঔরসে অদিতির গর্ভে ১২ টী পুত্র জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের নাম ইন্দ্র, অর্য্যমা, দক্ষ, ত্বষ্টা, পুষা, বিবস্বান্ সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ এবং বিষ্ণু। অদিতির গর্ভে জন্ম বলিয়া ইঁহারা আদিত্য নামে কথিত হইতেন।

আর্য্যগণ বার মাসের অবস্থানুসারে

সূর্য্যের ১২ টী নাম রাখিয়াছিলেন। অদিতির ১২ টী পুত্রের ও ঐ দ্বাদশ আদিত্যের নামেই নাম রাখা হইয়াছিল। এখনও হিন্দুগণ সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদির নামে পুত্রের নামকরণ করাইয়া থাকেন। অদিতি পুত্রের জন্মের পূর্ব্বে কেবল সূর্য্যেরই অবস্থা বিশেষের নাম ইন্দ্র ছিল, অদিতির পুত্রের ইন্দ্র নাম হইবার পরে দুইটী ইন্দ্র বিবেচনার বিষয় হইয়াছিল। এখনও এইরূপ ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতির নামের অভাব নাই। কিন্তু প্রকৃত সূর্য্য দেবতা আর অদিতি পুত্র মানুষ। দিব্য অর্থ দীপ্তি পাওয়া,—অৎ গমন করা অর্থাৎ যিনি দীপ্তি বিশিষ্ট হইয়া গমন করেন, তিনিই দেবতা নামে কথিত হইতেন। বেদ অনেক স্থানেই সূর্য্যের দ্বাদশরূপের দ্বাদশ নামের সহিত অদিতি পুত্রের দ্বাদশ নামের অনেক গোলযোগ দেখা যায়।

বেদে ইন্দ্র অসুর নামে কথিত হইয়াছেন। এই ইন্দ্র কে? খগ্বেদে লিখিত আছে -

“যিনি শত্রুবিজয়ী ও নিজ বলে দৃঢ়মনা, সেই দীপ্তিমান ও মহৎ ইন্দ্রের উদ্দেশে সুখকর স্তুতিবাক্য উচ্চারণ কর। কেন না তিনি প্রভূত যশশালী ও অসুর এবং শত্রুদিগকে দূর করেন। তিনি অশ্বদ্বয়-সেবিত, অভীষ্টবর্ষী এবং বেগবান।” ঋগ্বেদ ১।৫৪।৩ ঋক।

এই ঋকের ইন্দ্র যে সূর্য্যের একটী নাম, তাহা “দীপ্তিমান ও মহৎ ইন্দ্র” শব্দ দ্বারাই বুঝা যাইতেছে। অন্যত্র লিখিত আছে—

“হে ইন্দ্র! যে সকল দেবতা আছেন, তুমি তাহাদিগের রাজা। তুমি মনুষ্যদিগকে রক্ষা কর; হে অসুর! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সাধুদিগের পালক, ধনবান ও আমাদিগের উদ্ধারকর্ত্তা।” ঋগ্বেদ ১।১৭৪।১ ঋক।

এই ঋকে যে অদিতিপুত্র দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এইরূপ অনেক ঋক আছে, যাহার একটীতে হয়ত সূর্য্যের দ্বাদশরূপের কোনরূপকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, আবার অপরটীতে অদিতি পুত্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

অদিতির দ্বাদশপুত্র মধ্যে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াই অনেক ঋক রচিত হইয়াছে, অন্য একাদশটীর প্রতি তত লক্ষ্য নাই। সূর্য্যের দ্বাদশরূপকেই অসুর বলিয়া অনেক ঋক রচিত হইয়াছে। কয়েকটী এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

“হে ক্রোধরহিত ঋত্বিকগণ! তোমরা কর্ম্মফলদাতা রুদ্রকে পালনশীল ও যজ্ঞসম্পাদক অন্ন অর্পণ কর। আমিও সেই দ্যুলোকের অংসরকে এবং তাঁহার অনুচর স্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলবাসী মরুদগণকে স্তব করি।” ঋগ্বেদ ১।১২২।১ ঋক।

“হে অগ্নি! তুমি মহৎ আকাশের রুদ্র, তুমি মরুদগণের বলস্বরূপ, তুমি অন্নের ঈশ্বর।” ২।১।৬ ঋক্।

“যজ্ঞের পিতা স্তোতৃগণের অসুর ঋত্বিকগণের জ্ঞানহেতু ও যজ্ঞাদি কর্ম্মের সাধনভূত অগ্নি পার্থিব ও বৈদ্যুতাদি রূপ দ্বারা দ্যাবা পৃথিবীতে প্রবেশ করেন।’ ৩।৩।৪ ঋক্।

“এ স্থান নির্জ্জন নহে, যেহেতু সেই মহান্ অসুরের স্বর্গ ধারণকারী বীর পুত্রগণ পৃথিবীর সর্ব্বভাগ দেখিতেছেন।” ১০।১০। ৩ ঋক্।

অস্ ধাতু ক্ষেপণ অর্থ ধরিয়া সায়ণ অসুর অর্থ “অনিষ্ট ক্ষেপণশীল করিয়াছেন। অসুর

অর্থ ক্ষেপণশীল" বটে, কিন্তু এ স্থানে অনিষ্ট ক্ষেপণশীল নহে। আকাশস্থ দীপ্ত দেবতাগণ কি নিক্ষেপ করিতে পারেন? তাঁহারা তেজ নিক্ষেপ করিতে পারেন। কোথায়? পৃথিবী বক্ষে। অতএব আকাশে গমন করিতে করিতে যে দীপ্ত পদার্থ পৃথিবীর উরসে অর্থাৎ বক্ষে অস্ অর্থাৎ তেজ বা দীপ্তি নিক্ষেপ করেন, তিনিই অসুর (অস্-উরস্) এই অর্থে অতি প্রাচীনকালে, বৈদিককালেরও পূর্ব্বে আকাশের দীপ্ত গ্রহ অর্থাৎ সূর্য্য অসুর নামে কথিত হইতেন। সূর্য্য আকাশের দেবতা। অতএব দেবতা শব্দে এখন আমরা যাহা বুঝি, তখনকার আর্য্যগণ তাহা বুঝিতেন না। তখন যাঁহারা দীপ্তি-সম্পন্ন, তাঁহারাই দেবতা নামে কথিত হইতেন। আকাশস্থ সূর্য্যাদি গ্রহগণকেই দেবতা বলা হইত। সূর্য্যের দ্বাদশনাম যুক্ত দ্বাদশরূপই দেবতা বলিয়া কথিত হইত। সুতরাং দেবতা ও অসুর শব্দ তখন এক অর্থেই ব্যবহৃত হইত।

ক্রমে দেবতা ও অসুরশব্দ পৃথক হইয়া গেল। সূর্য্যাদি দ্বাদশ আদিত্য এবং দীপ্ত গ্রহাদি দেবতা নামে এবং ইন্দ্রআদি অদিতি পুত্রগণ অসুর নামে কথিত হইতে লাগিল। তখন অসুর অর্থ অন্যরূপ হইল। সু উত্তমরূপে— রাজ্‌ দীপ্তি পাওয়া অর্থে অসুর অর্থ "দীপ্তিশূন্য" হইল। অদিতির পুত্রগণ এইরূপে দীপ্তিশূন্য অসুর হইলেন। (ঋগ্বেদ ১।১৭৪।১ ঋক)।

অদিতি পুত্রগণ যেমন আদিত্য নামে কথিত হইতেন, দিতির পুত্রগণও তদ্রূপ দৈত্য নামে এবং দনুর পুত্রগণ দানব নামে কথিত হইতেন। তাই দিতিপুত্র হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ দৈত্য নামে এবং দনুরপুত্র পুলোমা ও বৃষপর্ব্বাদি দানব নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

কশ্যপ ঋষি আর্য্য, দক্ষ ও আর্য্য প্রজাপতি অর্থাৎ রাজা। সুতরাং এই উভয়ের সন্তান সন্ততি যে আর্য্যমধ্যে গণ্য, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বায়ু পুরাণে দেখিতে পাই, ভৃগুর সদ্বংশীয়া দুইটী ভার্য্যা ছিলেন, তন্মধ্যে দিব্যা নাম্নী ভার্য্যা হিরণ্যকশিপু দৈত্যের কন্যা ছিলেন এবং দ্বিতীয়া ভার্য্যা পুলোমী দনুরপুত্র পুলোমা দানবের কন্যা ছিলেন। এই পুলোমা দানবের অপর কন্যা শচী ইন্দ্রের মহিষী ছিলেন (৬৫ অধ্যায়)।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে—কশ্যপ ঋষি পুরাকালে পুষ্কর ক্ষেত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে ঋষি, দেবতা এ গন্ধর্ব্বগণ উপস্থিত ছিলেন। তখন বিধানানুসারে আখ্যানাদি নিমিত্ত পাঁচখানি উত্তম সুবর্ণাসন স্থাপিত হইয়াছিল। দিতি গর্ভজাত কশ্যপ ঋষির পুত্র হোতার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হিরণ্ময় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বেদ এবং আখ্যানাত্মক পঞ্চম বেদ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মুনিগণ তাহা দেখিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন "হিরণ্যকশিপু" (৬৭ অধ্যায়)। কশ্যপের সকল পুত্রমধ্যে হিরণ্যকশিপুই জ্যেষ্ঠ ছিলেন (৬৭ অধ্যায়, ৫০ শ্লোক)।

এই হিরণ্য কশিপু ব্রহ্মার বরে ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন (৬৭ অধ্যায়)। শুক্র তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। হিরণ্যকশিপু যে যে দিকে যাইতেন, দেবগণ মহর্ষিগণ সহ সেই সেই দিকের উদ্দেশে নমস্কার করিতেন। হিরণ্যকশিপুর এতই প্রভাব ছিল।

দক্ষ অপুত্রক ছিলেন, তাই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ

হিরণ্যকশিপু তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। একদিন দেবগণও হিরণ্যকশিপুর জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—"দেবগণ ইন্দ্রের জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নাই। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বলিলেন, আপনি আমাকে দ্বাদশাহ যজ্ঞ দ্বারা যাজন করুন। বৃহস্পতি তাঁহাকে যাজন করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন।" এই দেবগণই ইন্দ্রকে সাহায্য করিয়া সুমেরু সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। কিন্তু দেবগণ এই কার্য্য সহজে করিতে পারেন নাই। সময় সময় সুমেরু সিংহাসন হিরণ্যকশিপু ও তদ্‌বংশধরগণ কাড়িয়া লইতেন, আবার অপরের সাহায্য লইয়া দেবগণ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন উদ্ধার করিতেন। এইরূপে বৈমাত্র ভ্রাতাগণ পরস্পর সুমেরু সিংহাসন লইয়া বিবাদ করিতেন। এইসময় হইতেই ইন্দ্রাদি আদিত্যগণ সুর নামে কথিত হইয়াছিলেন এবং হিরণ্যকশিপু আদি দৈত্যগণ অসুর নামে কথিত হইয়াছিলেন। সুর ও অসুর শব্দের অর্থও এই সময় অন্যরূপ হইয়াছিল। সুর অর্থ প্রভু হওয়া অর্থাৎ আধিপত্য পাওয়া অর্থে যাহারা সুমেরু প্রদেশে আধিপত্য পাইলেন, তাঁহারা সুর নামে কথিত হইলেন। যাঁহারা আধিপত্য পাইলেন না, বিতাড়িত হইলেন, তাঁহারা অসুর (আধিপত্য-চ্যুত অর্থে) নামে কথিত হইলেন। সুতরাং সুরাসুর যুদ্ধ আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধ নহে, আর্য্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ।

অতএব অসুর মাত্রেই অনার্য্য নহে, দৈত্য ও দানব মাত্রেই অনার্য্য নহে। ইন্দ্রাদি যেমন কশ্যপ ঋষির ঔরসে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা অদিতির পুত্র দ্বাদশ আদিত্য ছিলেন—হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষও তেমনি দক্ষ কন্যা দিতি-গর্ভজাত দৈত্য এবং পুলোমা ও বৃষ পর্ব্বাদি তেমনি দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভজাত দানব ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই কশ্যপ পুত্র, সুতরাং সকলেই আর্য্য। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ বুঝিয়া দেখেন না বা পরিশ্রম করিয়া অনুসন্ধান করেন না, তাঁহারাই কেবল অসুর, দৈত্য ও দানব শব্দ দেখিয়াই ইহাদিগকে অনার্য্য বলিয়া থাকেন। সমুদ্র মন্থন করিলে যেমন অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা হইতেই আবার মন্থন গুণে বিষও উঠিয়াছিল। শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

উপেক্ষিত।

(১)

প্রাণে ছিল নবীন যৌবন,
প্রেম ছিল নন্দন কানন,
পরিমলে ভোরপুর—
হাস্য ছিল সুধাচুর—
অন্তহীন রহস্য ভুবন
কোথা আমি কোথা সে স্বপন?

(২)

দূরে নিরাশার গান,
বায়ুভ'রে ব্যেপমান;
মর্ম্মে উঠে প্রতিধ্বনি,
মুহূর্ত্তে প্রমাদ গণি.
অশ্রুসিক্ত যুগল নয়ান,
চক্রবালে কি করে সন্ধান।

(৩)
নাই—নাই! আমার সে নাই!
খুজেছি, খুজেছি, সব ঠাঁই।
অনন্তে গিয়াছে ভাসি,
সেই কুন্দরূপ রাশি,
এ আশায় পড়িয়াছে ছাই
নাই, নাই, সে, আমার নাই।

(৪)
কাব্যে নাই তাও খুঁজিয়াছি,
গানে নাই, তাও শুনিয়াছি।
নহি আমি উদাসীন,
স্বপনে হইয়া লীন,
অনন্তের মাঝে ডুবিয়াছি;
কতদিন তা'রে খুজিয়াছি।

(৫)
আয় প্রাণ বা'র হয়ে আয়
ভেঙে চুরে কি হলিরে হায়—
"বড় একা" এই ভবে,
আপনার হাহা রবে,
কেন কাঁদি পেতে সুষমায়
ল'য়েছে সে সুদীর্ঘ বিদায়।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

গ্রীকদর্শন

ডাইওজিনিস্ (Diogenes)।

আপোলোনিয়া-বাসী ডাইওজিনিস্ উপাদানের বহুত্ব এবং চেতনাবিহীন-জড়-ও-চৈতন্যমূলক দ্বৈতবাদ, উভয়ই পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আনাক্সিমিনিসের শিষ্য. এজন্য তাঁহার মতে বায়ুই জগতের একমাত্র আদি উপাদান, প্রকৃতির জীবন এবং বস্তু সমূহের অন্তর্নিহিত সত্ত্বা। আনাক্সাগোরাস যে মনকে জড় জগতের অতীত পৃথক সত্ত্বা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে বায়ুরই অধীন। তাহার প্রমাণ, শ্বাসরোধ ঘটিলেই জীবদেহ হইতে শক্তি অন্তর্হিত হয়। বায়ু, মন বা চিন্তা-প্রসূত নহে, মনই বায়ু হইতে উৎপন্ন। বায়ুর অভাবে জীবন, সংজ্ঞা ও বুদ্ধি, সমস্তই লোপ পায়। বুদ্ধি পৃথক পদার্থ না হইয়া বায়ুরই গুণবিশেষ। ডাইওজিনিস বলেন, এই উপাদানটী (বায়ু) যে অসীম শক্তিসম্পন্ন, অনন্ত, অবিনশ্বর এবং অশেষ জ্ঞানের আকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাবতীয় দ্রব্য একটীমাত্র পদার্থের বিভিন্ন প্রকাশ এবং মূলতঃ এক। তাহাই যদি না হইবে, তবে মৃত্তিকা, সলিল, বায়ু প্রভৃতি উপাদান পরস্পরের সহিত মিলিত হয় কিরূপে? পরস্পরের অনুকূল ও প্রতিকূল আচরণ করে কিরূপে? কিরূপেই বা মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদ্ এবং উদ্ভিদ হইতে জীবসৃষ্টি সম্ভব? অতএব. প্রাচীন জড়বাদীগণের সহিত একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তুসকলের মূল উপাদান এক এবং তাহারা সেই একই পদার্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য।"

আর্কেলস্ (Archelaus)।

আর্কেলস্ তাঁহার উপদেষ্টা আনাক্সাগোরাসের পরমাণুবাদ সমর্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎপ্রচারিত মতটীকে দ্বৈতবাদরূপে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করিয়াছেন। স্বর্ণ রৌপ্য, লৌহ বা জলের ন্যায় 'নুস' বা বুদ্ধিও একটী স্বতন্ত্র দ্রব্য। এই সকল দ্রব্যের পরস্পরের মধ্যে যেমন আকারগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়, উহাদের সহিত 'নুসে'র পার্থক্যও সেইরূপ। স্বর্ণ যেমন রৌপ্য নয়, অথচ স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ই জড়,

মনও সেই প্রকার স্বর্ণরৌপ্যাদির ন্যায় না হইয়াও জড়তাবিশিষ্ট। উহা সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, সূক্ষ্মতম এবং অতীন্দ্রিয় কোন পদার্থবিশেষ, তাই বলিয়া উহাকে মূলপদার্থ বলা যায় না। যে বস্তু অপর কোন বস্তুর সংযোগ বা সাহায্য ব্যতীত অবস্থিতি করে, তাহাকেই মূল পদার্থ বলিতে হইবে। এরূপ বস্তুর অস্তিত্বই অসম্ভব! অতএব জড় ও সত্বা বলিয়া দুইটী পৃথক বস্তু নাই, উভয় শব্দই একার্থ বোধক।

ডিমক্রিটাস (Democritus)।

পরমাণুবাদ।

ডিমক্রিটাস (খ্রীঃ পূঃ ৪২০)। লিউসিপাসের শিষ্য এবং থ্রেসের অন্তর্গত আবডেরাবাসী ডিমোক্রিটাস, তাঁহার সমসাময়িক আইওনিয়ান বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং অদ্যাপি তাঁহাকে প্রাচীন ও আধুনিক জড়বাদীগণের নেতা স্বরূপ গণ্য করা হয়। তাঁহার লিখিত বিস্তর গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গেলেও অনেকগুলি প্রয়োজনীয় অংশ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে; তদ্ব্যতীত লুক্রেশিয়াসের কবিতায় পরমাণুবাদের যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইলেও তাঁহার মতের অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়।

আনাক্সিমিনিস, ডাইওজিনিস এবং আনাক্সাগোরাস জড়ের প্রকৃতি এবং জড়োপাদানুভূত সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সকল অস্পষ্ট মন্তব্য প্রচার করিয়াছিলেন, ডিমক্রিটাস সেগুলির যথাযথ সমালোচনা করেন। তিনি আনাক্সিমিনিস ও ডাইওজিনিসের সহিত দ্রব্যজাতের সমধর্ম্মত্ব গুণ (Homogeniety) স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু আনাক্সাগোরাসের ন্যায় তাঁহার মতেও সৃষ্টির উপকরণগুলি অসংখ্য, এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত। এই অংশ বা অণুসকলের পরস্পর মিলন এবং বিচ্ছেদই সৃষ্টি এবং ধ্বংস। অণুগুলি* অসংখ্য ও অবিভাজ্য, অথচ তাহারা গণিতশাস্ত্রোক্ত কল্পিত বিন্দু নহে; কেননা, গণিত বিন্দুর বিস্তার (extension) না থাকায় অস্তিত্বও নাই। অণু সমূহের রাসায়নিক সম্বন্ধ এক হইলেও পরস্পরের আকার অবয়বের বৈষম্য আছে। উহারা স্বভাবতঃ গতিশীল, কিন্তু গতি তাহারা লোকাতীত কোন বস্তু হইতে লাভ করে নাই, উহা তাহাদের মজ্জাগত গুণ। অণুগুলি নিয়তিবশে একবার শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল, সেই শক্তির ক্রিয়া আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। উহাতে আনাক্সাগোরাসোক্ত বুদ্ধি বা উদ্দেশ্যের কোন সম্পর্ক নাই। ডিমক্রিটাস উদ্দেশ্য-মূলক সকল সংস্কারই পরিহার করিয়াছেন, অথচ দৈবের (chance) সাহায্যও বিশেষভাবে গ্রহণ করেন নাই। দৈবের পরিবর্ত্তে অবশ্যম্ভাবিতা শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। কেন না, অবশ্যম্ভাবিতা (Necessity) হইতে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আসে, দৈব কারণানুসন্ধানের বিরোধী। কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি অসম্ভব।

ইলিয়াটিক সম্প্রদায়, শূন্য ও গতির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। গতি স্বীকার করিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে অবকাশও স্বীকার করিতে হয়। অবকাশ বা শূন্য না থাকিলে পরমাণুগণ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য হারাইত, অর্থাৎ তাহাদের অবস্থিতিই অসম্ভব হইত। শূন্যই পরমাণুস্থিতির একমাত্র

---

* ডিমক্রিটাস 'অণু' শব্দ আধুনিক পরমাণু অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

কারণ, এবং শূন্য আছে বলিয়া গতিও সম্ভব হইতেছে। সুতরাং পূর্ণতার ন্যায় শূন্যও সৃষ্টির কারণস্থানীয়, ইহাকে দ্বিতীয় কারণ বলা যায়। জড়বাদোক্ত জড়োপকরণের সহিত শূন্যের সংযোগ হেতু, ডিমক্রিটাসের সৃষ্টিতত্ত্ব এক প্রকার দ্বৈতভাব-বিশিষ্ট হইয়াছে। এই দ্বৈতভাবটী এতই সমীচীন যে, যে কোন অদ্বৈতবাদ যতই যুক্তিযুক্ত হউক না, উহার হাত হইতে একেবারে মুক্তি লাভের উপায় নাই। ডিমক্রিটাস যে শূন্যকে গতি ও জড়ের আধার বলিয়াছেন, শক্তিবাদীগণ তাহাকেই মনোভাব প্রকাশক শব্দগতির (dialectical movement of thought) আধাররূপে নির্ণয় করেন।

অবিরাম গতির ফলে পরমাণুগণ সর্ব্বক্ষণ আন্দোলিত হইতে থাকায়, তাহারা পরস্পরের সংসক্তি, অর্থাৎ পরস্পরের গঠনানুসারে মিলিত হয়। মিলনের কারণ এই যে, তাহাদের রাসায়নিক গুণ এক বলিয়া কেহ কাহাকেও আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিতেছে না। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভার-বিশিষ্ট পরমাণুগুলি অনন্ত আকাশের নিম্নাভিমুখে প্রেরিত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পরমাণুগুলি বায়ুস্তরে পরিণত হইয়াছে। কতকগুলি অসমান, কর্কশ, ধারাল কিম্বা কুঞ্চিত বলিয়া পরস্পর আঁকড়িয়া ধরায় তদ্দ্বারা অ্যাসিড (Acid) বা তিক্তাস্বাদ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কতকগুলি সুগোল এবং মসৃণ বলিয়া ইন্দ্রিয়-প্রীতিকর দ্রব্য সৃষ্টি করে। জীবাত্মা সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, মসৃণ ও সূক্ষ্ম পরমাণুগঠিত। আত্মার পরমাণুগুলি যখন পৃথকভাবে অবস্থিতি করে, অথবা অল্পসংখ্যক মাত্র একত্র মিলিত হয়, তখন তাহাদের অনুভবশক্তি থাকে না; যথোপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত হইলে, তাহারা অনুভব শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই শ্রেণীর পরমাণু দেহের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিলেও, ইন্দ্রিয় সমূহে অধিক পরিমাণে মিলিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ এই জন্যই বিষয়ভাবগ্রহণে সমর্থ। অধিক পরমাণুর একত্র সমাবেশ বশতঃ মস্তিষ্কে চিন্তা বা ধারণাশক্তি, অন্তঃকরণে স্নেহমমতা এবং যকৃতে বাসনার উৎপত্তি স্থান নিরূপিত হইয়াছে। বস্তুসকল হইতে স্ব স্ব গঠনানুকূল জ্যোতিঃ নিঃসৃত হওয়ায় উহা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইয়া চেতনাসঞ্চার করে; মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে তাহাদের প্রতিবিম্বগঠিত হয়, ইহাই বিষয়োপলব্ধির কারণ।

ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। যে সকল দ্রব্য কখনও ইন্দ্রিয় সংস্পর্শে আসে নাই, তাহাদের সম্বন্ধে কোন ধারণা জন্মিতে পারে না। ধারণা-সমূহ দ্রব্যজাতের প্রতিবিম্ব, তবে ঠিক প্রতিকৃতি নহে। কেন না, বস্তুর স্বরূপত্ব অগোচর থাকায় তাহার অবিকল প্রতিরূপ (Direct reproduction) হওয়া অসম্ভব। আত্মার উপাদান স্থানীয় পরমাণুগুলি যতদিন না স্থানচ্যুত হয়, ততদিনই আমরা আত্মাবধারণে সমর্থ। নিদ্রাকর্ষণে সংজ্ঞালোপ পায়, তাহার কারণ, তৎকালে আত্মার কতকগুলি পরমাণু স্থানভ্রষ্ট হয়; অধিকাংশ পরমাণু স্থানভ্রষ্ট হইয়া যখন অল্পসংখ্যক কার্য্য করিতে থাকে, তখন আমাদের মৃতকল্প অবস্থা ঘটে; সমস্ত পরমাণুর কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যুতে পরমাণর বিনাশ নাই; যে হেতু, পরমাণু অবিভাজ্য বলিয়া অবি-

নাশ্য। মৃত্যুর অর্থ এই যে, পরমাণ সমূহের সংসক্তিজনিত আত্মার স্বাতন্ত্র্য ভাবটী কিছুকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। সুখদুঃখাদি বোধশক্তি মস্তিষ্ক এবং ইন্দ্রিয়গণসন্নিহিত পরমাণুপুঞ্জের উপর নির্ভর করে, এজন্য মৃত্যুতে বোধশক্তি এবং ব্যক্তিত্বজ্ঞান, কিছুই থাকে না।

দেবতাগণ মনুষ্যাপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী, তাই বলিয়া তাঁহারা অমর নহেন। তাঁহারাও নশ্বর জীবের ন্যায় পরমাণুগঠিত ; এজন্য মনুষ্যাপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকিলেও, যথাকালে তাহাদেরই মত মৃত্যুমুখে পতিত হন। জগতে অপ্রতিহত প্রাধান্য কাহারও চিরভোগ্য নহে। দেবতাগণ আমাদের অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবান ও বিচক্ষণ, তাই তাঁহারা ভক্তির পাত্র ; কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, এ সকল দেবতা যিনি যত বড়ই হউন, সকলের উপর এমন একটী বস্তু আছে, যাহা অসীমশক্তিশালী এবং অনতিক্রম্য, উহা সেই মহান নিরপেক্ষ বিধি (necessity, the supreme, impartial law),— সমস্ত বিশ্ব যদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্থাবর জঙ্গম, সৃষ্টিমাত্রের উপর সমভাবে প্রতিষ্ঠিত সেই বিধির নিকট আমরা যেন প্রফুল্ল চিত্তে মস্তক অবনত করি! উহাই প্রকৃত শান্তিলাভের উপায়।

পরমাণু সংক্রান্ত উপরোক্ত জড়বাদ আবডেরাবাসী প্রোটাগোরাস কর্তৃক সন্দেহবাদে (Scepticismএ) পরিণত হইয়াছিল। হিরাক্লাইটাসের দর্শন এবং ইলিয়াটিক মতও যথাক্রমে ক্রেটাইলাস (Cratylus) ও গর্জিয়াস (Gorgias) কর্তৃক একই দশা প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ, এইসময়টা গ্রীকদর্শনের পক্ষে আপাততঃ অমঙ্গলকর হইলেও, এখন হইতে অন্ধ বিশ্বাসগুলি দূরীভূত হওয়ায়, উহা ক্রমশঃ যুক্তি ও নিয়মের পথে পরিচালিত হইতে থাকে, এবং নবাবিষ্কৃত শাস্ত্র সমূহ হইতে বল ও পুষ্টি লাভ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মনস্তত্ত্ব বা তর্ক-যুগ।

প্রোটাগোরাস (Protagoras)।

আর্টেমনের (মতভেদে, মিয়াণ্ড্রিসের) পুত্র প্রোটাগোরাস আবডেরা নগরে জন্মগ্রহণ করায় লোকে তাঁহাকে ডিমক্রিটাসের শিষ্য বলিত ; ডিমক্রিটাস কিন্তু বয়সে প্রোটাগোরাস অপেক্ষা প্রায় বিশবৎসরের ছোট ছিলেন। প্রোটাগোরাসের সহিত হিরাক্লাইটাসের মতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও, প্রথমে তিনি ডিমক্রিটাস ও আনাক্সাগোরাস, উভয়ের পরমাণুবাদ হইতে স্বীয় মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সিসিলিদ্বীপে, পরে ত্রিশবৎসর বয়ঃক্রম হইতে এথেন্স নগরে অর্থনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তিনি যশস্বী হন। সম্পত্তিরক্ষণ ও মালিমোকর্দ্দমায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং তৎসম্বন্ধে বাগ্মিতা ও কূটতর্কের জন্য তিনি আপনাকে তার্কিক (Sophist)* বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহার মতে, শিষ্টতা ও সচ্চরিত্রতা সমাজে উৎকর্ষলাভের প্রধান অবলম্বন, এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতি অবশ্যপালনীয়। প্রোটাগোরাস অনেকগুলি বিভিন্ন শাস্ত্রের আলো-

---

* প্রোটোগোরাসের সময়েই গ্রীসদেশে Sophist নামে দর্শন ও ভাষা শিক্ষকের একটী সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছিল। Sophistryর বর্ত্তমান অর্থ ভুলতর্ক।

চনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতামত সমূহ যে সকল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের নাম আজও বিদ্যমান আছে। জাতীয় দেবতার বিরুদ্ধে একখানি গ্রন্থপ্রণয়ন করার ফলে, তাঁহাকে নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হয় এবং নির্ব্বাসিতাবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। যেসকল দ্রব্য প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইন্দ্রিয়গণ তাহাদেরই জ্ঞানলাভে সহায়তা করে। ইন্দ্রিয়দ্বারা অপরিবর্ত্তনীয়, অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্বভৌমিক সত্য উপলব্ধি হয় না। কোন বিষয়ের সত্যাবধারণ করিতে হইলে ইন্দ্রিয় সাহচর্য্য ব্যতীত তদপেক্ষা বিশ্বস্ততর, জ্ঞানলাভের দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন আবশ্যক। কেন না, ইন্দ্রিয়গণ প্রতারণাপরায়ণ। সত্যানুসন্ধানার্থ চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন হয়। ডিমাক্রিটাসের মতে চিন্তা (Reflection) বিষয়ানুভূতির মানসিক-বিকার, সুতরাং বিষয়ানুভূতির (Sensation) এবং চিন্তা (Reflection) উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই। বিষয়ানুভূতি অস্থির, অনিশ্চিত এবং ভ্রমাত্মক, অথচ জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় হইলে, তজ্জাত জ্ঞানও অনিশ্চিত হইবে। মানব স্ব স্ব অনুভবের অতিরিক্ত কেহই কিছু অবগত নহে। ডিমক্রিটাসের পরমাণু যখন ইন্দ্রিয়াধিগম্য নয়, তখন তাহাকে অর্থহীন কল্পনাই বলিতে হইবে এবং তাহাকে তিনি যতই প্রয়োজনীয় মনে করুন, তাহার অস্তিত্ব তাঁহার মতেরই প্রতিকূল। আনাক্সাগোরাসের বীজাণু, এম্পিডক্লিসের উপাদান এবং মাইলেটাস সম্প্রদায়ের মূল চিৎ-শক্তি, সকলেরই এক অবস্থা। অর্থাৎ তাহারা সকলেই কল্পনাসিদ্ধ, তাহাদের সত্যতা বা বাস্তব সত্তা সপ্রমাণ করিবার উপায় নাই। ব্যক্তি মাত্রই যাহা কিছু বুঝিতে, বোধকরিতে বা উপলব্ধি করিতে পারে, ততটুকু তাহারা সত্য বলিয়া জানে। বিষয়ানুভব যখন বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন, একই দ্রব্য যখন একজনের নিকট সবুজ, অপরের নিকট নীল, একজনের নিকট বৃহৎ, অপরের নিকট ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হয়, তখন যতগুলি অনুভবকর্ত্তা দ্রব্যসকলের সত্যসংখ্যাও ততগুলি। আবার, কোন অনুষ্ঠানবিশেষ যখন একজনের পক্ষে উপকারী, অপরের পক্ষে অনিষ্টজনক, তখন উহা একের পক্ষে শুভ, অপরের পক্ষে অশুভ বলিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট যখন একই কার্য্য শুভাশুভ প্রতীয়মান হয়, তখন বিশ্বজনীন শুভ (Universal Good) বলিয়া কোন জিনিষ নাই। অতএব, সত্য এবং সৎ, ইহাদের সত্তা ব্যক্তিসাপেক্ষ, অর্থাৎ ব্যক্তিমাত্রেই সদসৎ এবং সত্যমিথ্যার মানদণ্ড। অনুভবসিদ্ধির অতীত যখন কিছুই প্রামাণ্য নয় এবং বাস্তব সত্তা যখন ইন্দ্রিয়াগোচর, তখন তাহার কারণ বা উদ্দেশ্য নিরূপণ একান্তই অসাধ্য।

তাহাই যদি হয়, তবে অসম্ভবব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া মানুষের পক্ষে যাহা আয়ত্তাধীন, তাহারই বিচার করা উচিত। আত্মতত্ত্ব বা দেহতত্ত্বই মানুষের প্রকৃত আলোচ্য বিষয়। জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব কি বা চরম উদ্দেশ্য কি, ইত্যাকার জটীল বিষয়ের মীমাংসার জন্য বিফল প্রয়াস পরিত্যাগ করতঃ আমাদের একমাত্র আবশ্যকীয় প্রশ্ন সন্তোষ বা আত্মপ্রসাদ কাহাকে বলে, এবং কিরূপে মানব সুখলাভের অধিকারী হইতে পারে, তাহারই বিচার ও উপায়

নির্দ্ধারণ আবশ্যক। জগতে আপনার এবং পরের উপর কর্ত্তৃত্ব করার নামই সুখ। কর্ত্তৃত্বের অর্থ, প্রবৃত্তিদমন, ধর্ম্ম-পথগ্রহণ এবং দর্শনের উদ্দেশ্য, মানুষকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাওয়া। মানবের প্রকৃতি এই যে, তাহারা সাধারণতঃ ভাষার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হয়, অতএব মানবমনের উপর আধিপত্য করিতে হইলে বাগ্মিতা অর্থাৎ নির্ভুল ধারণা ও নির্ভুল বাক্যব্যবহার প্রয়োজন হয়। দর্শন নির্ভুল ধ্যানধারণা ও বাঙ্ নিষ্পত্তির উপায় বলিয়া উহার তিনটী শাখা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা (১) প্রত্যক্ষ নীতিবিজ্ঞান (Practical Ethics), (২) ভাষাবিজ্ঞান (Dialectics) এবং (৩) বাগ্মিতা (Rhetoric)।

ব্যক্তি এবং বস্তুর বিরোধভাব প্রোটাগোরাস কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম প্রকটিত হইলেও, তাঁহার দ্বারা একটী সত্য অতিরঞ্জিত হইয়াছে। সত্যটী এই যে, বাস্তব সত্বা অনুভবকারীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেনা। অর্থাৎ, অনুভবকারীকে আশ্রয় করিয়াই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যজাত বা পরিবর্ত্তনসমূহ সমুৎপন্ন হইতেছে; এককথায়, চিন্তা (Thought) ইন্দ্রিয়ানুভূতির মানসিক বিকার হউক বা আর যাহাই হউক, উহাই দ্রব্যকালের অবস্থিতি বা অস্তিত্বের কারণ। দর্শন যে বাস্তব সত্বা রূপ সৃষ্টির গূঢ় রহস্যোদ্ভেদে নিযুক্ত, হিরাক্লাইটাস যাহাকে নিত্যচাঞ্চল্যের কারণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং যাহা পিথাগোরিয়ানদিগের মুখ্য 'এক' ও আনাক্সাগোরাসের 'নুস্' শব্দে বুঝা যায়, চিন্তার দ্বারা তাহারই অস্তিত্ব সূচিত হয়। চিন্তা যে দ্রব্যসমূহের আকারগত বৈষম্য নষ্ট করিয়া শুধু তাহাদের ঐক্যসম্পাদনের চেষ্টা করে, তাহা নহে; নিজেই ঐক্যসংস্থাপন করে। চিন্তা-সংক্রান্ত এই নূতন তথ্যের আবিষ্কার হওয়ায় প্রাচীন দর্শনের যুগান্তর ঘটিয়াছিল। এখন হইতে দর্শন আত্মজ্ঞানরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ইহাই তর্কযুগের প্রারম্ভ।

প্রোটাগোরাস ও তার্কিক (Sophist)দিগের আলোচনা হইতে অনেক সুফললাভ হইয়াছিল, কেননা উহার দ্বারা বহুদেবত্ব বিষয়ক মানসিক সংস্কার সমূহ দূরীভূত এবং সক্রেটিস, প্লেটো ও ষ্টোয়িক (Stoic) সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসিদ্ধান্তের পথ সুগম হয়। যে সকল অন্ধবিশ্বাস এতকাল গ্রীকদিগের নিকট অকাট্য সত্য বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাদেরও অধিকাংশ হৃদয়পট হইতে অপসৃত হইল। এতদিন দর্শনশাস্ত্রে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছিল, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতি ছিল না এবং যুক্তিসমূহের প্রকৃতি কি, ও তদবলম্বনে কোন সঙ্গত মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় কিনা, তাহারও বিচার করা হইত না। লক্ষ লক্ষ লোক যেমন দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের গঠনকৌশল অবগত না হইয়াও অনায়াসে দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণও চিন্তা পদ্ধতি অবগত না থাকিয়াও দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন। তর্কশাস্ত্র অসংযত চিন্তাস্রোতকে বাধা দিয়া, মনের সহিত সাধারণ মানসিক নিয়মগুলির পরিচয় করিয়া দিলে, মন সেই নিয়মগুলি বিশেষণ করিতে থাকে এবং তাহার ফলে, চিন্তার অসংলগ্নতা বা প্রগল্ভতা দোষ কাটিয়া যায়। ইহাই ন্যায়শাস্ত্রের উৎপত্তি, যাহার পুষ্টিসাধন করিয়া অ্যারিষ্টটল্ ভুবনবিখ্যাত হইয়াছিলেন। মনোবিজ্ঞানের (Science of thought) সঙ্গে

সঙ্গে উহার অত্যাবশ্যকীয় বহিরাবরণ স্বরূপ ভাষাবিজ্ঞানেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। তার্কিকগণ ভাষার পারিপাট্য ও বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগের প্রতি অত্যধিক মনোনিবেশ করায়, গ্রীকভাষা এত মার্জ্জিত ও ভাবপ্রকাশের উপযোগী হয় যে, আজও আমরা প্লেটোর 'ডায়ালোগ' বা কথোপকথনচ্ছলে উপদেশগুলির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেছি।

অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে প্রোটাগোরাস ও তার্কিকগণ একটী বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ব্যক্তিগত হিসাবে মনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন, সমগ্র মানব মনের সাধারণ প্রকৃতি বিচার করেন নাই; এই জন্য তাঁহাদিগের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক বৈষম্য এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় জ্ঞানের ভ্রান্তিদোষ অতিমাত্রায় লক্ষিত হইত। তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর পক্ষে ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞান বা ধারণা ভ্রমাত্মক হইলেও উহা যে বিজ্ঞানসাহায্যে সংশোধিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে প্রোটাগোরাস অল্পই চিন্তা করিয়াছিলেন। মানবের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি যে সমগ্র মানব জাতির সাধারণ বিচারবুদ্ধির (Human reason এর) অন্তর্গত, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। এই মারাত্মক ভ্রম সক্রেটিস কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী

সমাজ-জয়

যেরূপ কোন ব্যক্তিকে আপনার সম্পূর্ণ অধীনে আনিতে হইলে তাহাকে জয় করিতে হয়, সেইরূপ, যে কোন জাতিকে আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখিতে হইলে, তাহাদেরও জয় করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অধীন করা আর অধীন রাখা স্বতন্ত্র বস্তু। দেশ জয় হইলে জাতিকে আপাততঃ জয় করা হইল, মনে হয়, কিন্তু তাহাদের সমাজ জয় ব্যতিরেকে প্রকৃত জয় হইল, বলা যায় না। শারীরিক বলদ্বারা কোন লোককে অধীন করিলেই যে তাহার উপর ষোল আনা আধিপত্য চলিবে, এমত নহে, মনোবিজয় আবশ্যক। জাতিকেও সম্পূর্ণ অধীনে রাখিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য ষোল আনা চালাইতে হইলে পরাজিত জাতির সমাজের উপর আধিপত্য প্রয়োজন। জয় করা সহজ, কিন্তু জয় রক্ষা করা ধৈর্য্য ও সাধনা-সাপেক্ষ। দেশ ও সমাজ জয় সম্পূর্ণ সাধিত হইলেই প্রকৃত জাতিকে জয় করা হয়, দেশের উপর আধিপত্য রাখা যায়। কোন জাতি প্রবল ও বুদ্ধিমান্, তাহার নিকট দুর্ব্বল অল্পবুদ্ধি জাতি সহজেই পরাজিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ পরাজয়ে যদি কিছুমাত্র সমাজ বিজিত না হয়, তাহা হইলে অনতিকালমধ্যে ঐ পরাজিত জাতি ভিতরে ভিতরে প্রবল হইয়া মাথা খাড়া দিয়া উঠে, বুদ্ধিমান জাতির সংসর্গে ও দৃষ্টান্তে আপনাদিগের জাতীয় বুদ্ধিহীনতার প্রতিকার করিয়া লয়। সাধারণতঃ বিজয়ীরা শান্তি ও বিলাস, গর্ব্ব ও অহঙ্কারের যুগপৎ সেবার ফলে ক্রমেই নিস্তেজ, অলস, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। তখন আর বিজিত জাতির প্রখর উদ্যম দ্রুত উত্থানের গতিরোধে সামর্থ্য থাকে না। দেশ ও সমাজ জয়েই জাতির সম্পূর্ণ জয়; ব্যক্তি আর চিত্ত জয়েই ব্যক্তির সম্পূর্ণ জয়।

শক্তির সাহায্যে প্রথমতঃ দমন, পরে হৃদয়ের গুণে আকর্ষণ। দমন দেশ জয়; আকর্ষণ সমাজ জয়। দমন—অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য সামন্ত, বুদ্ধিকৌশল সাধ্য; আকর্ষণ—সুপালন-নীতি ও সহানুভূতি সম্পাদ্য। অস্ত্র শস্ত্র সৈন্য সামন্তকেই যদি বিজয়রক্ষার প্রধান অবলম্বন স্বরূপ করিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে সে রক্ষা বহুদিন স্থায়ী হয় না। রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষার সর্ব্বপ্রধান অস্ত্রই সমাজ-জয়।

প্রথমতঃ কোন জাতি যখন পরাধীন হইয়া পড়ে, তখন যদি সেই জাতিকে বলের সহিত চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয়, উন্নতি পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে বিজিতের উত্থানের পথ নিরঙ্কুশ হইয়া থাকে। আর যদি সেই চাপের ফলে চিরদিনের মত সেই জাতির উত্থানের আশা পর্য্যন্ত নষ্ট হয়, তাহা হইলে বিজয়ী জাতির ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। উভয়তঃ জয়ীর জয়টী হিতকর থাকে না। বিজিত যাহাতে বিজয় জাতিকে দেবতার মত স্পৃহনীয় চক্ষুতে দর্শন করে, তাহাদের ধর্ম্ম,আচার ব্যবহার,পোষাক পরিচ্ছদের অনুকরণ করে, ভাষায়, ভাবে, কার্য্যে সকল প্রকারেই বিজয়ী মত হইতে চাহে, তাহার ব্যবস্থা করা বিজয়ীর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে বিজিত জাতি যাহাতে স্বজাতির উপর বিশ্বাসহীন আস্থাশূন্য হয়, স্বপদ-প্রতিষ্ঠ থাকে না, পুর্ব্বপুরুষগৌরব ভুলিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা বিজয়ীর অবশ্য উচিৎ।

সমাজ বিজয় ব্যতীত এ সকলের সম্ভাবনা নাই। যখন দেখা যাইবে যে, পরাধীন জাতি আপনাদের নিজত্ব ভুলিয়াছে, স্বাতন্ত্র্য বিশেষত্ব, স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে, বিজয়ীর অনুকরণে মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছে, বিজয়ীর মত হইতে পারিলে জাতীয় সার্থকতা—এই ধারণা পোষণ করিয়াছে; তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের সমাজ বিজিত হইয়াছে। কূট রাজনীতি-কৌশলের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা হইলেও সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বত্তা ও পরাজিতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনও প্রয়োজনীয়। জয়লক্ষ্মীর স্থায়িত্ব সামাজিক আধিপত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন, মোগল-কুলরবি আকবর সাহ। ইহার মূলচ্ছেদ করিয়াছিলেন মোগলকলঙ্ক আওরঙ্গজীব। বলের সাহায্যে ভয় দেখাইয়া উহা সাধিত হয় না, অথচ ঐ বল ও ভয় প্রদর্শন যে সর্ব্বথা অপ্রয়োজনীয়, তাহাও নহে। গোলাগুলি সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া সমাজে আধিপত্য করিবার চেষ্টা করিলে জয়ফল স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিজয়ীর স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব নষ্ট হইয়া যায়। নেপোলিয়ান বোনোপার্টি সমাজ-জয়নীতির আদর্শ দেখাইতে পারেন নাই বলিয়াই যে তাঁহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা আকাশকুসুমবৎ মিলাইয়া যায় নাই, ইহা নিশ্চয় করিয়া কে বলিবে?

প্রখর বল সাহায্যে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সাহসী বীর জাতি সাম্রাজ্য অধিকার করে, কিন্তু উহার স্থায়িত্বও তদ্রূপ মৃদু সহনক্ষম প্রতাপ অসীম বৈর্য্য, প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে। সমাজ বিজয় বহুকাল-সাধ্য, শনৈঃ শনৈঃ ইহার বিস্তার করিতে হয়।

সমাজবিজয়ের শেষ ফল, কখন কখন বিজয়ী ও বিজিত জাতির পরস্পর মিশ্রণ। এই মিশ্রণে বিজিতজাতির স্বতন্ত্র সত্ত্বা লুপ্ত হয়, বিজয়ীজাতির বিশেষত্ব ও নিজত্ব থাকে না, ইহা কাহারও কাঙ্ক্ষণীয় নহে। ঐ মিশ্রণ

ব্যাপক হইলে পরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ঐ উভয় জাতির পার্থক্য লিপিবদ্ধ থাকে মাত্র।

সামাজিক আধিপত্য যাহাতে বিজয়ী জাতি করিতে না পারে, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা বিজিতের কর্ত্তব্য। সাম্রাজ্য জয় করুক, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু সমাজ-জয় সাধিত হইলে যে ক্ষতি, তাহার পূরণ আর হইবে না।

যত সহজে সবলজাতি দৈহিক শক্তিগুণে দুর্ব্বলকে দমিত করিতে পারে, তত সহজে হৃদয় আধিপত্য করিতে পারে না। সাধারণতঃ মহাবৃক্ষের নিম্নস্থ চারাবৃক্ষের মত পরাজিত জাতি মাথা তুলিতে না পারিয়া স্তম্ভিত রোষে অন্তর্দাহে জ্বলিতে থাকে। তজ্জন্য সহজে তাহাদের হৃদয় বিজিতের গুণে আকৃষ্ট হয় না। তজ্জন্যই সমাজ বিজিত হইতে বহুদিন লাগে। দুর্ব্বলের আশা, উৎসাহ যতই নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা হইবে, ততই সমাজ অধিকার কঠিন হইতে থাকিবে। সাম্য, মৈত্রী, স্নেহ, সুপালন, স্বায়ত্তশাসন-প্রদান, সমাজ জয়ের উপকরণ। রাজ্যজয়ে তীক্ষ্ণাস্ত্র; সমাজ জয়ে মৃদু অস্ত্র।

যাঁহারা দুর্ব্বল জাতির উপর সর্ব্বতোভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করেন, আধিপত্যের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে, তাঁহারা শক্তিমান্ জাতি, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা বিজিত জাতির হৃদয় অধিকার করিতে পারেন, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, জয়লক্ষ্মীকে অচঞ্চলা করিয়া তুলিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান্ রাজনীতিজ্ঞ জাতি।

কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যে দুর্য্যোধন সমাজবিজয়ের সূক্ষ্ম নীতি-কৌশলের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই সমাজ জয় করিবার কৌশল দ্যূতক্রীড়ায় কৌশল অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তবে তাহা কাপট্যের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত সংঘর্ষ হইয়াছিল বলিয়া স্থায়ী হইল না।

প্রবল জাতি যখন বিজিত দুর্ব্বল জাতির সমাজ করতলগত করিয়াছে, তখনই জানিতে হইবে, সে অভ্যুদয় নির্ব্বাধ, সে আধিপত্য অটুট। সমাজ বিজিত হইলেই কাপট্য, বিলাসিতা, আলস্য, জড়তা, পরমুখাপেক্ষিতা, অনুদারতা, স্বধর্ম্মে অনাস্থা, পিতৃপুরুষাগত আচারত্যাগ, নৈতিক সাহসাভাব, মিথ্যাবাদিতা প্রভৃতি দোষ পরাজিত জাতির অস্থিমজ্জা আচ্ছন্ন করিয়াছে। তখন আত্মমর্য্যাদা থাকে না, কীর্ত্তি-সংরক্ষণে যত্ন থাকে না, উদ্যম উৎসাহ লোপ পায়, স্বজাতি-প্রেম দৃষ্ট হয় না। ক্রমেই জেতার প্রভাব বিজিতের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, অন্তঃপুরলক্ষ্মীরা তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে।

সাম্রাজ্য বিজিত হইলে যে অধীনতা, তদপেক্ষা সমাজবিজিত হইলে অধীনতা শতগুণ অধিক, এবং মারাত্মক। সামাজিক অধীনতার মত জাতীয় শত্রু আর নাই। জাতীয় ধ্বংসের এমন কারণ আর নাই। অমিতাচারী যেমন কুপথ্য প্রভৃতি দোষে সত্বরই নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে, পরিশেষে সেই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তদ্রূপ, হৃতসমাজ দুর্ব্বলপ্রকৃতি জাতি সামাজিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক সকল বল হারাইয়া নিজত্বকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে, পরিশেষে নানা ক্ষতের ঘায়ে, যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে

কালগর্ভে মিলাইয়া যায়। এইরূপে কত জাতি বিলীন হইয়াছে, কত জাতি বিজেতার সমাজে মিশিয়া নিজেদের নাম পর্য্যন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। নানাবিধ বিজেতার সংস্পর্শে আসিয়া, অধীনতা পাশে বদ্ধ থাকিয়াও অদ্যাপি যে জাতি জীবিত আছে, বুঝিতে হইবে, তাহার একমাত্র কারণ, দেশ পরাজয়ের সহিত সামাজের সম্পূর্ণ পরাজয়ের অভাব। ভারতীয় সমাজ বেদোপনিষৎ-পুরাণ-তন্ত্র-শাসিত, ঋষি-ব্রাহ্মণ-পরিপোষিত, ধর্ম্মভাবে জ্বলন্ত জ্যোতির্ম্ময়, কাজেই আগন্তুক-আঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়াও স্বরূপ ত্যাগ করে নাই। সনাতন ধর্ম্ম যে সমাজের মূল, তাহার উৎপাটন অসম্ভব।

সমাজ অধিকার রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের প্রধান অঙ্গ। কারণ জাতির পরাধীনতা ততদূর জাতীয় সদ্‌গুণ নষ্ট করে না, যত সমাজাধিকারে নষ্ট করে। সমাজ বিজিত হইলেই অধীনতা প্রকৃত লৌহ-শৃঙ্খল হয়। ভারত কোনদিনই অধীনতাকে সেরূপ ভয়াবহ মনে করে নাই ; কারণ কোন দিনই ভারতের সমাজ অধিকৃত হইবার আশঙ্কা ঘটে নাই! আকবার সাহ ঐ চেষ্টা করেন, মহারাণা প্রতাপ তাহা বুঝিয়াই মানসিংহকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়েন। মানসিংহের সহিত প্রতাপের মিলন সাধারণ চক্ষুতে দেশমঙ্গলকর মনে করা হইলেও বাস্তবিক তাহা মহতী ক্ষতির কারণ হইল। ইহাই পরিবর্জ্জন-নীতির আদর্শ। পরিবর্জ্জন নীতির কথা পরে বলিব।

সমাজপরাজয়ের পর বিজিতের যে জ্ঞানালোক, তাহা চন্দ্রের কিরণের মত নিজস্ব নহে ; সমাজ-দেহের যে পুষ্টি, তাহা রোগজাত মেদবৃদ্ধি। যেদিন তপন জগৎসংসার হইতে লুপ্ত হইবে, তখন চন্দ্রকরও আর থাকিবে না! বিজয়ী জাতির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত জাতির সম্মুখে মহা অন্ধকার দেখা দিবে। দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত পরাশ্রয়ে বিজিত জাতি কাঁদিয়া উঠিবে, নাবিকহীন পোত অগাধ সমুদ্র জলে ভাসিয়া চলিবে।

পরাজিত ও বিজয়ীর পরস্পর মিশ্রণ কেহ কেহ ভাল মনে করেন, ইহা অতীব ভ্রান্তি। এই মিশ্রণে বিজয়ী লাভবান্ হয়েন না, পরাজিতের ত মহা সর্ব্বনাশ। বিজয়ী পরাজিত সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীস্রোতোবৎ নিশ্চিহ্নই হইবে ; পিতৃপিতামহ-পবিত্রিত দেশের নাম, পূর্ব্বতন পুরুষগণের স্মৃতি, সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি জ্ঞানভাণ্ডার, এ সমস্ত লইয়া আর গৌরব করা চলিবে না। ইহাই জাতীয় মৃত্যু। জাতীয় মানব থাকিলেও যে জাতীয় মৃত্যু ঘটে না, তাহা নহে।

বিজয়ীর দিক দিয়া দেখিলে যেমন বলিতে হয় যে, বিজিতের সমাজ সম্পূর্ণ জয় করিলেই তাঁহাদের রাজনৈতিক অধিকার সাব্যস্ত হইবে, আবার বিজিতের হইয়া বলিতে গেলে বলিব যে, ঐ অধিকারের বিরুদ্ধে পরাজিত জাতির পক্ষে প্রাণপনে নিজ শক্তির পরিচালনা আবশ্যকীয়। বিজয়ী কর্ত্তৃক সামাজিক আধিপত্যের প্রবলস্রোতোমুখে বৃহৎ শিলা চাপা দেওয়া ব্যতীত অন্য কিছু নাই।

জাতীয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার রক্ষা, পুরুষ-পরম্পরা-নির্দ্দিষ্ট-পথানুসরণ, পরিবর্জ্জন নীতির যথাযথ অনুসরণ। পরিবর্জ্জন নীতির অনুসরণে আপাততঃ কথঞ্চিৎ

ক্ষতি দৃষ্ট হইতে পারে, উন্নতির দুই একটী পথ রুদ্ধ হইল, মনে হইতে পারে, কিন্তু ঐ ক্ষতি ও উন্নতি প্রতিবন্ধকতা অপেক্ষা জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধ্বংস কি অধিক ক্ষতিকর নহে ? ভবিষ্যের সহিত বর্ত্তমান তুলনা করিতে হইবে। পরিণামে মহতী ক্ষতি, অত্যন্ত সর্ব্বনাশের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া বর্ত্তমানে কিঞ্চিৎ ক্ষতির জন্য চীৎকার করা চপলস্বভাব বালকেরই সাজে। ধীর বিবেচক ব্যক্তি ব্যতীত সমাজের স্বাস্থ্য ও বলের দিক্‌ দেখিয়া কেহই পথ্য নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়গত সসীম ক্ষতি আর সমস্ত জাতিগত অসীম কি তুল্য ? বিজয়ীর প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় না করাই পরিবর্জ্জন নীতির উদ্দেশ্য নহে, তাহাদের সংশ্রব-শূন্য হওয়াও নহে। সমাজ অধিকৃত হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া, জাতীয় ধর্ম্ম, বিশেষত্ব, বৈশিষ্য প্রভৃতি ক্রমেই রসাতলে যাইতেছে, না ভাবিয়া, যে সংরক্ষণ যাঁহারা পরিবর্জ্জন-নীতির সেবা করেন, তাঁহারা কখনই সফলকাম হইতে পারেন না। পরিবর্জ্জন-নীতি রাজনৈতিক কৌশলের দ্বারা হয় না, উহার সেবা ও চালনা করা সাধনা-সাপেক্ষ। ক্ষতি স্বীকার, স্বার্থত্যাগ, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি না থাকিলে ঐ নীতির চালনা অসম্ভব। বিলাস স্রোতে ভাসিব, রাজদ্বারে সম্মান পাইতে চেষ্টা পাইব, স্বধর্ম্ম প্রভৃতির পালনে কষ্ট-স্বীকার, তাহাতে উদাসীন রহিব, বিন্দুমাত্র ক্ষতি স্বার্থত্যাগে অনভ্যস্ত থাকিব, অথচ পরিবর্জ্জন-নীতির সেবা করিব, তাহা সম্ভব নহে।

বিজিত জাতির সমাজ-সংস্করণ কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, অতীতের উপর শ্রদ্ধা, ভবিষ্যের উপর আশা, বর্ত্তমানের উপর আশ্বাস। অতীতের উপর শ্রদ্ধা—পূর্ব্বপুরুষ-গৌরব ; শাস্ত্রে বিশ্বাস, স্বধর্ম্ম আচার ব্যবহার পালন প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। অতীতের উপর গৌরব কেবল কথায় বা সাহিত্যে না রাখিয়া জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে।

বলিয়াছি, সমাজ অধিকৃত না হইলে বিজিতের আশা ভরসা থাকে, বহুকালের পরাধীনতার অত্যাচারেও আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে। কিন্তু সমাজ অধিকৃত হইলে কোন আশা থাকে না। আলস্য, জড়তা, অনুকরণপ্রিয়তা, স্বধর্ম্ম আচার-ব্যবহারে অনুকরণবারিতা, বিজয়ীর সর্ব্বথা অনুসরণ—এ সকল জাতির মৃত্যুর কারণ। প্রকৃতির এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে ঐ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারা রক্ষা করিতে হইলে, স্বার্থত্যাগ বিসর্জ্জন দিতে হইবে, দারিদ্র্যকে আংশিক বরণ করিতে হইবে, বিলাস-বন্যায় ভাসিলে চলিবে না, কেবল আত্মোন্নতি, আপনার ধনসম্পত্তির পানে তাকাইলে চলিবে না।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অপেক্ষা আমরা বুদ্ধিমান্‌, সভ্য, বিদ্বান্‌, এইরূপ ধারণা জন্মিলে কেহই আর পূর্ব্বপুরুষদের উপর তাদৃশ শ্রদ্ধাপূর্ণ ও ভক্তিমান্‌ থাকিতে পারেন না। তাঁহারা সঙ্কীর্ণ, অনুদার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এইরূপ ধারণা থাকিলে প্রাচীন ইতিহাস আর অতীত গৌরবের প্রতি কেহই আর সেরূপ স্পৃহনীয় ভাবে দৃষ্ট করিবেন না।

আপনাদের সমাজ অধিকার করিতে দিবনা, বিজয়ীর নিকট হৃদয় বিক্রয় করিবনা -এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হইলে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য কুট রাজনীতির আবশ্যক নাই। এইরূপ সমাজ-রক্ষা-কল্পে কিছুই চেষ্টা না করিয়া উপরিভাসমান পরিবর্জ্জননীতির সেবা করিয়াছিলাম বলিয়াই, আমরা স্বদেশীয় ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে পারিলাম না।

শ্রীরামসহায় ভট্টাচার্য্য।

* * *

জন্মান্তরীণ্ স্মৃতির বেদ প্রমাণের সমালোচনা

বিগত ভাদ্রমাসের নব্যভারতে "জন্মান্তরীণ্ স্মৃতি" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক তাহার প্রমাণ জন্য বেদ ও গীতার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ সকল প্রমাণ সমালোচনা করিয়া আমি তদ্রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না। আর্য্যশাস্ত্র বহুরূপকে পরিপূর্ণ থাকায় তাহা হইতে প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ভাবন করা সুকঠিন। কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ দয়া পরবশ হইয়া ঐ সকল রূপকের প্রকৃত অর্থ নানা গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহা সমালোচনা করিলে প্রকৃত মীমাংসা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। উক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে "জন্মান্তরীণ্ স্মৃতি অসম্ভব হইলেও ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে যে জন্মান্তরীণ্ স্মৃতি স্ফুরণ হইত, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়," তজ্জন্য প্রবন্ধ-লেখক বামদেব ঋষি প্রণীত বেদের নিম্নলিখিত প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

অহং মনুরভবম্ সূর্য্যশ্চাহং ইত্যাদি।

উক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রবন্ধ-লেখক ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বামদেব ঋষি পূর্ব্ব জন্মে মনু, সূর্য্য প্রভৃতি যে ছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল, ইহাই উপরোক্ত বামদেব শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বামদেব-শ্রুতির প্রকৃত মীমাংসা বেদান্ত-দর্শনে উদ্ভাসিত রহিয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেই বোধগম্য হইবে যে, অধ্যাত্ম বিদ্যার উপদেশ কালে বক্তারা আত্মতত্ত্ব ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মা স্বরূপ আপনাকে বর্ণন করিয়া থাকেন। যেমন বামদেব ঋষি দেবতা নহেন, অথচ ব্রহ্মাভিমানী হইয়া আপনাকে দেবতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

শাস্ত্র দৃষ্টাতুপদেশো বামদেব বৎ।

১ অঃ ১ পাদ ৩০। বেদান্ত।

সুতরাং প্রবন্ধ-লেখক এইরূপ শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা জন্মান্তরীণ্ স্মৃতি প্রতিপন্ন করিতে যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সমীচিন বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না। হিন্দু গ্রন্থে এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্যস্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। কৌষিতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে ইন্দ্র আপনাকে পরমব্রহ্ম স্বরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মমায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব।

জ্ঞানস্বরূপ জীবনদাতা ও মরণশূন্য যে ব্রহ্ম, তাহা আমি হই। আমার উপাসনা কর। কেবল আমাকেই জান। ইন্দ্র ইহার বক্তা, অতএব ইন্দ্রের ব্রহ্মত্ব এসকল শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ইন্দ্র ব্রহ্ম নহেন। উক্ত প্রবন্ধে গীতার ১৪শ ও ১৩শ অধ্যায়ের যে সকল প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত জন্মান্তরীণ্ স্মৃতির কি সংশ্রব আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। প্রবন্ধ-লেখক গীতার নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মান্তরীণ্ স্মৃতির স্ফুরণ হইয়াছিল।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি ত বচার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫।

৪র্থ অধ্যায়

অনুবাদ। হে পরন্তপ অর্জ্জুন, আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সে সমুদায় জানি। কিন্তু তুমি তৎসমস্ত জান না।

শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়া গীতা শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানে জন্মান্তরীণ স্মৃতি স্ফূর্ত্তি পায় নাই এবং ইহাকে জাতিস্মরও বলা যায় না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে অর্জ্জুন যখন যুদ্ধ সময়ের গীতা উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাহা বলিতে বলিলেন, তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে আমি তৎকালে যোগ অবলম্বনে তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা আর এইক্ষণে আমার বলিবার সাধ্য নাই।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন

যত্তদ্ভগবতা প্রোক্তং পুরা কেশব সৌহাদাৎ ।
তৎ সর্ব্বং পুরুষ ব্যাঘ্র নষ্টং মে ভ্রষ্ট চেতসঃ ॥

বাসুদেব উবাচ।

শ্রাবিতস্ত্বং ময়াগুহ্যং জ্ঞাপিতশ্চ সনাতনম্ ।
ধর্ম্মং স্বরূপিণং পার্থ সর্ব্ব লোকাংশ্চ শাশ্বতান্ ।
অবুদ্ধ্যা না গ্রহীযস্তং তন্মে সুমহদপ্রিয়ম ।
নচ সাম্ভ পুনর্ভূয়ঃ স্মৃতিমে সং ভবিষ্যতি ।
নূনম শ্রদ্ধ ধানোহসি দুর্ম্মে ধাহসিপাণ্ডব ।
নচ শক্যং তন্ময়া ভূয় স্তথা বক্তুমশেষতঃ ॥
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগ যুক্তেন তন্ময়া ।

মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্ব।
অনুগীতা পর্ব্ব। ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মান্তরীণ স্মৃতি স্ফুরণ হইলে তাহা হইলে তিনি গীতোক্ত উপদেশ পুনরায় বলিতে পারিতেন। হিন্দুগ্রন্থ অনুসন্ধানে যত দূর জানিতে পারা যায়, তাহালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ ধ্যানস্থ হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ করিতেন। মহাত্মা বাল্মীকি রামায়ণ রচনা কালে যোগযুক্ত হইয়া অতীত ও অনাগত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

ততঃ পশ্যতি ধর্ম্মাত্মা তৎসর্ব্বং যোগমাস্থিতঃ।
পুরাযৎ তত্র নির্ব্বৃত্তং পানাবামলকং যথা ॥
অনাগতঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ রামস্য বসুধাতলে।
তচ্ছকারাত্তরে কাব্যে বাল্মীকি ভগবান্ ঋষিঃ

রামায়ণ বালকাণ্ডম্।

জন্মান্তরীণ স্মৃতি বলিলে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহা যোগযুক্ত হইয়া জানা, বলা যায়না। তাহা স্বাভাবিক জ্ঞানে উদয় হয়। সুতরাং বেদ ও শ্রুতির প্রমাণ দ্বারা জন্মান্তরীণ স্মৃতি প্রতিপন্ন হইতেছে না।

শ্রীউমেশনারায়ণ চৌধুরী।

স্বদেশ।

(১)

এই কি তোমার দেশ, যাহার নাহিক শেষ
চারিদিকে চুম্বিছে আকাশ ?
রবি শশী তারা ভালে তড়িৎ চিকুরে খেলে
নানাবর্ণ অম্বরে প্রকাশ ?

(২)

বিবিধ বর্ণের ফুল কত গিরি নদীকুল
আর কার অঞ্চলে অঙ্কিত ?
বারমাস ফুলবাস যাহার মধুর শ্বাস
কোথা করে এত আনন্দিত ?

(৩)

কলকণ্ঠে বিহগের গুঞ্জরণে ভ্রমরের
শুনি সদা যাহার সুস্বর,
নিশির শিশির স্নাত শীত গ্রীষ্ম বিরহিত
আশুতোষ আর কার নয়?

(৪)

আছে আর কোন্ স্থান যথা এত বলবান
এত শূর সাহসে অতুল?
পেলে শিক্ষা জ্ঞান ধন হবে তারা অতুলন
আজ তারা দীন ক্ষয়াকুল।

(৫)

যে দিকে নয়ন চায় শস্যক্ষেত্র শোভা পায়
বার মাস শস্যে রহে ভরা,
কত বন উপবন ফল বৃক্ষ অগণন
বার মাস ফল দেয় তারা।

(৬)

আছে আর কোন্ স্থান শুধু ফল ধরে প্রাণ,
এত মধু ফলের উদ্যান?
নানা নদী পরে পরে মৃত্তিকা উর্ব্বর করে,
মধুর সলিল করে দান?

(৭)

বাণিজ্য-ঐশ্বর্য্য তরে নদী শোভা বৃদ্ধি করে
অসংখ্য তরণী ছুটে যায়,
শুভ্র বর্ণ পাল দিয়ে মরালের শোভা নিয়ে
মাঝিরা সঙ্গীত গেয়ে যায়।

(৮)

কতই নগরী তটে কতই সুন্দরী ঘাটে
কোন্ স্থান এত শোভাময়?
আছে আর কোন্ দেশ রিপু জয় করি শেষ
গৃহ ছাড়ি বনে চলি যায়?

(৯)

কোথা আর এত মণি গোলকণ্ডা, স্বর্ণ খনি,
কোথা এত কুবের নিবাস?
গৌতম গৌরাঙ্গ যথা বিরচিল নব পন্থা,
পরহিত সাধনে উল্লাস?

(১০)

কিন্তু প্রাণ ফেটে যায় বলিব কিরূপে হায়,
এই সব তব সহোদর?
সারা দিন যারা খাটে আতপে বর্ষায় মাঠে
তথাপিও অপূর্ণ উদর?

(১১)

উলঙ্গ শরীর যার তেলহীন দেহ আর
চির রোগে যৌবনেই জরা,
এমন কঙ্কালসার কোথা আছে নর আর,
দীন হীন তেজহীন যারা?

(১২)

হিতাহিত জ্ঞান নাই কুসংস্কারময় ভাই,
দৈন্য দুঃখে কাটিছে জীবন,
তারি পাশে তোরা সবে মত্ত আনন্দ উৎসবে,
কোন্ জাতি ইহার তুলন?

(১৩)

অই সব ভগ্নী তোর পিঞ্জরে আবদ্ধ ঘোর
স্বীয় গৃহে চির-পরাধীনা,
বালিকা বয়সে যারা জননী হয়েছে তারা
রুগ্ন দেহম্লান মুখ দীনা।

(১৪)

অগণ্য বিধবা অই দুঃখের অবধি নাই
নিজ গৃহে দাসীরূপে রয়,
তথাপি কর্কশ ভাষা শুনিতেছে দিবা নিশা,
তার দুঃখে দুঃখী কেহ নয়।

(১৫)

অজ্ঞানতা অন্ধকারে সকলেই বাস করে
দিন রাত খেটে খেটে মরে,
আছে আর কোন্ দেশ যথায় হয়েছে শেষ
হায় ভ্রাতৃস্নেহ একবারে?

(১৬)

চারিদিকে হাহাকার   অত্যাচার অবিচার,
অনাহার অনাচারময়,
তথাপি তোমরা হায়   উদাস উল্লাসময়,
হেন জাতি আছে কি ধরায় ?

১৭)

তোমরা পেয়েছ জ্ঞান   উন্নতির অধিষ্ঠান
অর্থ-বল তোমাদের আছে ।
সবে মিলে একতায়   দেশহিতে দেহ কায়,
ধন যার ঘরে যাহা আছে ।

(১৮)

কিছুই অসাধ্য নয়   সঙ্কল্প যদিরে হয়,
দেশহিত করিতে সাধন,
কর মন্ত্রের সাধন   কিম্বা শরীর পাতন
আছে কোন্ কাজ ইহার মতন ?
কোন্ দেশ ইহার সমান ?

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী ।

রামানন্দ স্বামীর খাতা ।

[দুই বৎসর হইল নবদ্বীপের গঙ্গাতটে একটী কুটীরে একজন বৃদ্ধ বাস করিতেন। তাঁহাকে লোকে রামানন্দ স্বামী বলিত। গত বৎসর তিনি সেই স্থান হইতে কোথায় গিয়াছেন, নবদ্বীপবাসী কেহ তাহা জানেনা। বৃদ্ধ চলিয়া গেলে, সেই কুটীরে একখানি খাতা পাওয়া গিয়াছিল। তাহার কোন কোন স্থান ভাল পড়া যায় না। যাহা হউক, তাহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা আমি প্রকাশ করিলাম।]

ভক্তি-সুধা ।

প্রথম অধ্যায় ।

ঘাটে নৌকা লাগিয়াছে। ইহলোক হইতে শীঘ্র যাইতে হইবে। প্রভু ডাকিতেছেন। কিন্তু এই পাপের বোঝা লইয়া কেমন করিয়া যাইব ? সেই বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপ শিবস্বরূপ পরব্রহ্মের নিকট এই পাপভরা হৃদয়,এই মলমালিন্যপূর্ণ আত্মা, এই জ্বালাময়ী স্মৃতি, এই অধমাধম জীবন লইয়া কেমন করিয়া যাইব ? বলি মন, যে অল্প সময় আছে, পরলোকের কাজ করিয়া লও, পাপের বোঝা নামাও, চিত্ত বিশুদ্ধ কর। পাপের বোঝা যে নামে না। কম্বলি ছোড়্তা নেহি ।

কি করি ? পাপ যে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, অনেক দূর শিকড় নামাইয়াছে ; তাহাকে যে কোনমতেই উন্মূলিত করিতে পারিতেছি না। এত টানাটানি করি, অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায়, সে হৃদয়-ভূমি হইতে কোন মতেই বাহির হইতে চাহে না। কি করি ? ডাক হরিকে। ডাক ভক্তিভরে। ডাক, ভগবান্‌কে ডাক। যুক্ত করে, অন্তরের সহিত, বল, “হরি, এই ঘোর পাপীর প্রতি দয়া কর। হরি ! তুমি দীনদয়াল, পতিতপাবন, তুমি আমাকে রক্ষা না করিলে, তুমি আমাকে পাপমুক্ত না করিলে, আর কে করিবে ?” আমি ডাকিতেছি, কিন্তু হরি যে আমাকে দেখা দেন না ; হরি যে আমার কথা কাণে তুলেন না। “কোথায় হরি হে ! তোমাকে যে দেখিতে পাইতেছি না। জ্ঞানিগণ বলেন, হরি ঐ বৃক্ষের মধ্যে, ঐ আকাশে, ঐ জলে, ঐ স্থলে, সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজ করিতেছেন। তবে হরি, তুমি কেন আমাকে দেখা দিতেছ না। কেন পরদার অন্তরালে লুকাইয়া রহিলে ? কেন আমার

কান্না শুনিতেছ না? ঐ ত দোষ। পোড়া হিয়াতে তেমন কান্না আইসে না। হরিনামে অশ্রু ধারা বহে না।

ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞানমেকমগ্রতঃ
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয় স্তব নাথ
দুর্ল্লভঃ ॥(১)

হে নাথ, সর্ব্বাগ্রে তোমাকে আমার এক বিজ্ঞাপন শুনিতে হইবে; এ কথা মিথ্যা নহে, বাস্তবিকই সত্য যে, তুমি যদি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ না কর, তাহা হইলে তোমার দয়ার পাত্রই দুর্ল্লভ হইয়া পড়িবে। আমি যে বড়ই পাপী। আমার অপেক্ষা অধম আর কে আছে? আমি তোমার নিতান্তই দয়ার পাত্র। আমার হৃদয়ের ভিতরে বিষয়-বাসনা, দেহ-সম্ভোগ-সুখ, কুপ্রবৃত্তি সকল, পাপপুঞ্জ ঘর বাঁধিয়া পল্লী বসাইয়াছে। তাহাদিগকে আমি যে কোন মতেই উচ্ছেদ করিতে পারিতেছি না। উচ্ছেদ করিতে গেলে, তাহারা বলে, আমার হৃদয় দীর্ঘকাল দখল করিয়া আমার হৃদয়ে তাহাদিগের দখলি স্বত্ব জন্মিয়াছে। অন্যায় পূর্ব্বক যদি বলবান প্রজা দীর্ঘকাল জমি ভোগ দখল করে, জমিদার যদি দুর্ব্বল হন, তবে রাজপুরুষদিগের সাহায্য লইয়া দুষ্ট প্রজাকে আইন অনুসারে উচ্ছেদ করেন। হে নাথ! হে রাজরাজেশ্বর! আমি অতি দুর্ব্বল। আমি কাতর হইয়া তোমার সাহায্য-কৃপা প্রার্থনা করিতেছি, তোমার নিকট আর্জি করিতেছি, তুমি আমার হৃদয়ের দুষ্ট প্রজাকে, বদ্ধমূল পাপরাশিকে, হৃদয় হইতে উচ্ছেদ কর, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আমার হৃদয়েতে আমার দখল দেও। আমি তোমার আদালতে এই আর্জি পেশ করিতেছি। হে বিচারপতি! হে ধর্ম্মরাজ! আমার আর্জির উপর হুকুম দেও; দুষ্ট পাপীগণের উচ্ছেদ জন্য আমাকে ডিক্রী দেও; আর সেই ডিক্রী জারি করিবার জন্য তোমার ভক্তিরূপ নজিরকে আমার সঙ্গে দেও। আমি গললগ্নীকৃতবাসে, কৃতাঞ্জলিপুটে, তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। একবার তোমার পদাশ্রিত দাসানুদাসের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহ হে।

ভবন্ত মেবানুচরন্নিরন্তর,
প্রয়ান্ত নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাইমেকান্তিক-নিত্যনিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িস্যামি স নাথ জীবিতম্ ॥(২)

আমি তোমার নিতান্ত অনুগত নিত্য কিঙ্কর তোমার একান্ত শরণাগত চাকর। আমার এমন দিন কবে হইবে, যে দিন নিরন্তর তোমারই পরিচর্য্যা, তোমারই সেবা করিতে করিতে আমার মনের সমান সকল বৃত্তি তোমাতে উন্মুখ হইয়া উঠিবে, আমার হৃদয়ের সমুদয় কামনা তোমাতেই অনুরক্ত হইবে এবং এইরূপে জীবনকে পরমানন্দিত করিব, কবে আমার আত্মা এইরূপে পরম হর্ষ লাভ করিবে?

তোমার শরণাগত হইলে তুমি তাহাকে রক্ষা করিয়া থাক, চিরকাল এই কথা সাধু মুখে শুনিতেছি, শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি। যে অতি পাপী, অতি সুদরাচার, সেও যদি তোমাকে অনন্যমনে ভজনা করে, সে সাধু হয়, সে শীঘ্র তোমাকে লাভ করে, তুমি বলিয়াছ—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতি জানীহি ন মে ভক্তঃ
প্রণশ্যতি ॥ ৩

( ) ও (২) গোস্বামী পদোক্ত শ্লোক (৩) গীতা ৯। ৩০ ৩১।

অতি দুরাচার ব্যক্তি যদি অনন্যভজনশীল হইয়া আমার ভজনা করেন, তবে তিনিও সাধু বলিয়া গণ্য হন; কারণ তিনি উত্তম অধ্যবসায়-বিশিষ্ট। হে কৌন্তেয়! অতি পাপাত্মাও যদি আমার শরণ লয়, তবে সে ব্যক্তিও শীঘ্র ধার্ম্মিক হয়, নিত্য শান্তি লাভ করে। তুমি নির্ভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে, আমার ভক্ত প্রণষ্ট হয় না। আমার উপাসনা করিয়া নিতান্ত পাপীও অচিরাৎ ধর্ম্মচিত্ত হইয়া চিত্তোপপ্লবোপরম রূপ পরমেশ্বর-নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। হে অর্জ্জুন! তুমি যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, কুতার্কিক কর্কশভাষী লোকে এ কথা না জানিতে পারে, তবে তোমাকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তুমি পটাহাদি মহাঘোষ পূর্ব্বক, বিবদমানদিগের সভায় গমন করিয়া বাহু তুলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিও যে, আমার পরমেশ্বরের ভক্ত মহাপাপী হইলেও বিনষ্ট হন না, অপিচ ভগবান্‌কে ভজনা করিতে করিতে তাহার চিত্ত পাপমুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে পাইয়া শান্তি স্বরূপ পরমানন্দ লাভ করেন।

হে ভগবন্! তুমি এ কথা নিজ মুখে বলিয়াছ। অন্যত্রও দেখি—তুমি বলিয়াছিলে যে—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম ॥৪

“আমি তোমারই” এই বলিয়া একবার মাত্র আমার নিকট যাচঞা করিলে, আমি নিরন্তর তাহাকে অভয় প্রদান করি, ইহাই আমার ব্রত।

তবে নাথ, আমার প্রতি কেন দয়া করিবে না, আমাকে কেন উদ্ধার করিবে না, আমাকে কেন অভয় প্রদান করিবে না?

হে ভগবন্, একি করিলে? সংসারের তাবৎ সুখ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিলে, অথচ তুমিও দেখা দিতেছ না। ধন জন মান শক্তি এক কালে সব ছিল। এখন পথের কাঙ্গাল করিলে। কল্য কি খাইব, কল্য স্ত্রীপুত্রে কি খাইবে, তাহার সংস্থান মাঝে মাঝে থাকেনা। আর কত হীনতাই সহ্য করিতেছি। হে নাথ, আমাকে এত যাতনা দিতেছ কেন? আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া আমার চিত্ত বিশুদ্ধ করিতেছ? তুমি যাহা ভাল মনে কর, তাহাই কর। আমাকে যন্ত্রণা সহ্য করিবার বল দেও। —আমার যখন সময় ভাল ছিল, তখনত আমি অর্থ অপব্যয় করি নাই, নেশাতে বা বাবুগিরিতে, বা বদ্‌খেয়ালিতে টাকা উড়াই নাই। তবে কেন এমন হইল? কেন নিঃসম্বল হইলাম?—কে আমাকে এখন রক্ষা করিবে? তুমি ভিন্ন আমাকে রক্ষা করিবার আর কেহ নাই। বৃদ্ধ, স্বাস্থ্যহীন, বাতে পঙ্গু, অর্দ্ধানশনে, চিন্তায়, উদ্বেগে, হীনতায়, হৃদয় অবসন্ন হইতেছে, কিছু বিদ্যা আছে, কিছু ক্ষমতা, কিছু কার্য্যপটুতা আছে। কিন্তু আমার এখন এমনি দুর্ভাগ্য, কোন দিকেই কিছু সুবিধা হইতেছে না। যাঁহারা আমার উপকার করিবেন, এই সম্ভব, তাঁহারাও এখন অন্যায় পূর্ব্বক, বা ভ্রমে, আমার অপকার করিতেছেন। কিন্তু আমি যে এত পাপী, তথাপি আমার প্রতি তোমার দয়া দেখিতে পাইতেছি; অপ্রত্যাশিত রূপে আমার ও পরিবারের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া দিতেছ। কোন কোন আত্মীয় আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার মস্তকে স্নেহবর্ষণ করিতেছেন, এবং যথাসাধ্য আমার সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের

---

(৪) হরিভক্তিবিলাস।

শক্তি ক্ষুদ্র। তোমারই কৃপায় তাঁহাদিগের হৃদয় এই অসুস্থ বৃদ্ধের জন্য ব্যাকুল। এই দৈবদুর্ব্বিপাকে দুর্নিবার দুরন্ত দারিদ্র্য দুঃখে পতিত হতভাগ্যের দুঃখ দূর করিবার তাঁহাদিগের এত যত্ন। নাথ, তুমি আমার ধন্যবাদ লও. আমি যেন তোমার প্রতি কখন কৃতঘ্ন না হই; আমি যেন আমার উপকারীদিগের প্রতি অকৃতজ্ঞ না হই। কিন্তু হে দীনবন্ধু, এমন করিয়া কত দিন চলিবে! আমি আর অধিকদিন অসুস্থ থাকিলে, অর্থ উপার্জ্জনের কোন উপায় না হইলে, আমাকে স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া বৃক্ষতলে দাঁড়াইতে হইবে। চতুর্দ্দিকে সব অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার, আশালোকের ক্ষীণ রশ্মিও দেখিতে পাইতেছি না। ভরসা নাই, সম্বল নাই। দীননাথ! একমাত্র ভরসা তুমি।

এক একবার মনে করি, যখন উপার্জ্জন করিবার আমার আর ক্ষমতা নাই, আমার দ্বারা যখন আমার পরিবার পালনের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন চোখের উপর তাহাদিগের অন্নবস্ত্রের কষ্ট দেখিয়া লাভ কি? সুতরাং এখন আমার ইহলোক পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। গঙ্গাতটে ধর্ম্মকথা শুনিতে শুনিতে, তোমাকে স্মরণ করিতে করিতে, প্রায়োবেশনে তনুত্যাগ করাই বিধেয়। কিন্তু প্রভু, ইহাতে যদি পাপের বৃদ্ধি হয়? ইহা যদি তোমার অভিমত না হয়? তাহা হইলে পাপের বোঝা আরও ভারি হইবে। সেই অতিবর্দ্ধিত পাপের বোঝা লইয়া কেমন করিয়া তোমার নিকট দাঁড়াইব? পরলোকে কেমন করিয়া তোমার করুণা চাহিব, কিরূপে তোমার মুখ পানে চাহিব? সময় সময় যেন দৈববাণী শুনি,—"জীবনসংগ্রামে ভঙ্গ দিয়া যে এইলোক হইতে পলায়ন করে, অথবা হতাশ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকে, সে কাপুরুষ। যতদিন বাঁচিয়া থাক, কায়মনোবাক্যে, কর্ত্তব্য পালন কর। তোমার নাড়ীর শেষ স্পন্দন পর্য্যন্ত, তোমার শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত, সর্ব্বভূতভাবন পতিতপাবন নারায়ণকে স্মরণ করিয়া যথাশক্তি বিহিত কার্য্য কর। দুর্ভাগ্যে অবসন্ন হইও না।" —তখন আবার আশ্বস্ত হই। তখন শয্যা হইতে উঠিয়া বসি, একটু বল পাই।

ভাল। এখন আমার বোঝা নামিয়ে দেও। আমার হৃদয়ে এমন তীব্র অগ্নি পাঠিয়ে দেও যে, সেই অগ্নিতে পাপরাশি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া সমুদায় ভস্ম হইয়া যায়। হৃদয়ে অনুতাপের অনল জ্বালিয়ে দেয়, প্রভু।

ধনীর উপাসনা করিতে শিখি নাই; চাটুবাদে পারদর্শিতা লাভ করিবার চেষ্টা করি নাই। তবুত দাসত্বের বিড়ম্বনা সহ্য করিয়াছি। ধনীর সংসার প্রায়ই তস্করে আর চাটুকারে পূর্ণ। সেখানে যে চাটুকারগণের মনোরঞ্জন করিয়া, ধনী প্রভুকে ও তাঁহার তোষামোদপটু পার্শ্বচরদিগকে খোষামোদ করিয়া, তাহাদিগের সহিত দলবদ্ধ হইয়া, কার্য্য করিতে পারে, সে নীচ, অজ্ঞ, অক্ষম হইলেও প্রায়ই শ্রেষ্ঠত্বলাভ করে। আর যিনি সৎ, দক্ষ, চাটুবাদ-বিমুখ, এবং নিঃস্বার্থ ভাবে প্রভুর উপকার করেন, তস্করদিগের কর্ত্তৃক অপহরণ হইতে প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করেন, প্রায়ই তিনি সমাদর বা পুরস্কার পান না, লাঞ্ছনা ভোগ করেন এবং অবশেষে দূরে সরিয়া যান। সে ধনী প্রভুর সদাশয় ও উন্নতমনা, চক্রী চাটুকারগণ অষ্টপ্রহর তাঁহার কর্ণকুহরে মিথ্যাকথারূপ বিষ ঢালিয়া দিয়া, তাঁহাকে ভ্রান্ত করে, তাঁহাকে সত্যকথা

জানিতে দেয় না। সুতরাং তিনি অনেকস্থলেই যে মন্দ, তাহাকে ভাল বিবেচনা করেন,যিনি ভাল তাঁহাকে মন্দ মনে করেন। এই জন্য কবি বলিয়াছেন—"অসুখের শেষ চাকরি করা"।—এই জন্য রামচন্দ্র মহাতাপ বশিষ্ঠকে দুঃখে বলিয়াছিলেন—"ঐ দেখুন কতশত ব্যক্তি ঘৃণা লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া আত্মাদর ও আত্মগৌরব বিসর্জ্জন করিয়া, ইহলোক ও পরলোক উভয়ই পরিহার করিয়া,অনবরত মোক্ষদারের ন্যায় প্রভুর সেবা করিতেছে—এবং প্রভু কদাচিৎ অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহা দিতেছেন, কাক ও কুকুর প্রভৃতি উচ্ছিষ্টভোজী প্রাণীর ন্যায়, তাহাই দেবদুর্ল্লভ অমৃতবৎ অতীব সন্তুষ্টচিত্তে উপভোগ করিয়া, আত্মাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছে। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা কি আছে ! [৫] তাই শাস্ত্রে আছে—

চীরাণি কিং পথিনসন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং,
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোপ্যশুষ্যন।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতেঽবতি-নোপসন্নান,—
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মাদান্ধান ॥ (৬)

সাধুগণ ধনমদান্ধ লোকের উপাসনা করিবেন কেন ? জীর্ণবস্ত্রখণ্ডও কি পথে পতিত থাকে না ? বৃক্ষেরা কি ফলকুসুমাদি দ্বারা অন্যের পোষণ করে না ? তাহাদিগের সকাশে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে কি প্রাপ্ত হওয়া যায় না ? সমস্ত নদীই কি শুষ্ক হইয়াছে ? পর্ব্বতকন্দর কি অবরুদ্ধ হইয়াছে ? ভগবান্ কৃষ্ণ-আশ্রিত ব্যক্তিগণকে কি রক্ষা করেন না ?

এ যে সাধুদের সম্বন্ধে কথা ; এ কথাত সত্যই বটে। সাধুগণ কেন দুর্ম্মদান্ধগণকে ভজনা করিবেন ? হে ভগবান ! তুমি আরও স্পষ্ট ভাবে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলে—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহম্ ॥ (৭)

অন্য কামনা পরিত্যাগ-পুরঃসর যাঁহারা আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, আমি সর্ব্বতোভাবে মৎপরায়ণ সেই সকল যোগক্ষেম, অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং তৎসংরক্ষণ বহন করি। তাঁহারা প্রার্থনা না করিলেও ধনাদিলাভ এবং তৎপালন আমি তাহাদিগের জন্য সাযাধ্য করিয়া দেই।

আমি মূঢ়, তাই এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া একটী উচ্চবেতনের পদ ত্যাগ করিয়া চিদ্ঘনানন্দ স্বামীর অতি বিস্তৃত ও টীকা সমেত গীতা অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন বুঝিলাম না, ভগবান্ আমার মত লোকের যোগক্ষেম বহন করেন না, সংসারের ভার লন না। যাঁহারা তাঁহাতে সমুদয় কার্য্য অর্পণ করেন, যাঁহারা অনন্যমনে তাঁহাকে ভজনা করেন, ধ্যান করেন, যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন, সেই সকল অবিরাম ভগবান-পরায়ণ যোগিগণের সংসারের ভার তিনি লয়েন ; তাঁহারা নিজে অর্থ উপার্জ্জন না করিলেও, ভগবান্ স্বয়ং অর্থ আনিয়া তাঁহাদের হস্তে দেন। তাহা অনেক ঋষিকল্প ধ্যাননিরত সাধুগণের জীবনে দেখা গিয়াছে। কিন্তু আমি যে ভক্ত হইতে পারি নাই। আমি যে ঘোরপাপী। শাস্ত্রের এই কথা মাদৃশ জনের সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে। নির্ব্বোধ আমি তাহা না বুঝিয়া দুই কুলই হারাইলাম ; বিষয়ও

---

(৫) যোগবাশিষ্ঠ।

(৬) শ্রীমদ্ভাগবত—২।২।৫

(৭) গীতা—৯।২২

হারাইলাম, ভগবান্‌কেও লাভ করিতে পারিলাম না; এক ছিন্ন অভ্রখণ্ডের ন্যায় দুই মেঘখণ্ডের মধ্যে বিনষ্ট হইলাম। হে পিতঃ, আমি যে নিতান্ত বুদ্ধিহীন, আমাকে একটু বুদ্ধি দেও। তোমার চরণে আমাকে স্থান দেও; অথবা আমি বড় পাপী বলিয়া আমাকে যদি স্পর্শ না কর, তবে তোমার চরণরেণুর এককণা আমার মস্তকে নিক্ষেপ কর। আমাকে ভক্তি দেও, আমার চক্ষুতে একবিন্দু অশ্রু দেও।

এক ব্যক্তি ঘোর নাস্তিক ছিলেন। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম লইয়া পরিহাস করিতেন। কিন্তু তোমার কৃপায় তাঁহার এমনি ভক্তি হইয়াছে যে, এখন তোমার ভজনা করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রু দেখা যায়। অধম আমি তাঁহার বাসভবনে একদা তাঁহার সঙ্গে উপাসনাতে বসিয়াছিলাম। সেই সাধুসঙ্গ পাইয়াও আমার মন ভক্তিতে একটুও ভিজিল না, মন ও নয়ন যেমন শুষ্ক ছিল, তেমনি শুষ্ক থাকিল, এক বিন্দু অশ্রু নির্গত হইলনা। তাই বলি—

নয়নং গলদশ্রু ধারয়া,
বদনং গদ্‌গদ রুদ্ধ গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বাপুঃ কদা,
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি। (৮)

প্রভো! করে তোমার নাম লইতে লইতে আমার নেত্র দিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইবে, মুখে বচন রুদ্ধ হইয়া আসিবে এবং কবে পুলকোদ্‌গমে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইবে? হৃদয় অতি কঠিন, অতি শুষ্ক। তুমি উহাকে কোমল করিয়া দেও, রসসিক্ত করিয়া দেও। শুনিয়াছি—

বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত—
স্তন্বা নমস্তোহপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্র জলাঃ সমগ্র—
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥ (৯)

ভক্তবৃন্দ অহর্নিশ বচন দ্বারা স্তুতিবাদ করিয়া, মন দ্বারা স্মরণ করিয়া এবং দেহ দ্বারা প্রণতি করিয়াও তৃপ্ত হন না, তাঁহারা অশ্রু-বারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে সমস্ত পরমায়ু ভগবানের জন্যই অর্পণ করেন।

হে পিতঃ, আমার প্রেমোদয় কিরূপে হইবে, কিরূপে তোমাকে পাইব, বলিয়া দেও। কষ্টে আমার চিত্ত অবসন্ন হইতেছে। ঘোর নৈরাশ্য আমাকে আক্রমণ করে। আমার উপায় কি হইবে, বলিয়া দেও। আমার প্রতি দয়া কর। আমি নিতান্ত কৃপার পাত্র। নানাবিধ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত—তোমার কৃপার ভিখারী আমি শুনিতেছি, অন্ধকারের মধ্য হইতে কে আমাকে বলিতেছেন, পুত্র! দারুণ কষ্টে পড়িয়াছ, তাহাতে অবসন্ন হইত না, হতাশ হইও না। তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমার চৈতন্যোদয়ের জন্য, তোমাকে এত কষ্টের মধ্যে ফেলিয়াছি। আমার শরণ লও, সকল জ্বালা দূরে যাইবে, শান্তি পাইবে, আমাকে পাইবে।

পিতঃ! এত দুঃখ আমি যে সহ্য করিতে পারি না।

পুত্র! এই কষ্ট অগ্নির ন্যায় তোমার চিত্তের মল মালিন্য দগ্ধ করিতেছে। এই কষ্টের পূর্ব্বে কি আমাকে এমন করিয়া কাতর ভাবে ডাকিয়াছিলে? এখন প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায়, দিবসে ও নিশীথে,—"হরিহে, হরিহে আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া ডাকিয়া থাক। পূর্ব্বে কি এমন করিয়া কখন ডাকিয়াছিলে?

পিতঃ! মোহে মুগ্ধ ছিলাম, তাই

---

(৮) পদাবলী।

(৯ ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু

তোমাকে এমন করিয়া ডাকি নাই। এখন দয়া কর। সাধনার উপায় বলিয়া দেও।

পুত্র! এখন কেবল বলিলাম—

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ॥ (১০)

সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই সমস্ত নিষ্পন্ন হয়, এই দৃঢ় বিশ্বাসে একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, আমিই তোমাকে সর্ব্বনাশ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না—।

রামানন্দ স্বামী-বিরচিত "ভক্তি সুধার"
সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

পত্রাবলী।

(১)

ভবের লীলা সাঙ্গ হইয়া আসিতেছে। এখন সামনের দিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে; কাজেই দৃষ্টি পিছনের দিকে। অতীতের পানে ছুটিয়া যায়। চক্ষু থাকিতে কেহ সাধ করিয়া অন্ধ হইয়া বসিতে পারে না, একদিকে ত তাকাইতে হইবে, কাজেই ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া অতীতের দিকে চাহিয়া সুখ পাই।

একদিন বঙ্গবাসীর সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, আজ সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। "বঙ্গবাসীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সহিত আমার প্রথম আলাপ কটকে ১৮৭৬।৭৭ সালে। যোগীর দেহটী চিরকালই স্থূল; স্বভাবটী বড় মিষ্ট এবং লোক-চরিত্র বুঝিতে অদ্বিতীয়। কটকে তখন আমি চাকরী করি। যোগীর সেজ দাদা গিরীশের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা হইয়াছিল। গিরীশ তখন কটক কলেজে উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। যোগী তাঁহার বাসায় কিছুদিনের জন্য আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় যোগীর মধুর প্রকৃতিতে গিরীশের সকল বন্ধু বান্ধব আকৃষ্ট হন। গিরীশ এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু যোগী নাই। যোগীর বঙ্গবাসী এখনও জীবিত, কিন্তু যোগী নাই। গিরীশ এখন বঙ্গবাসী কলেজের সত্বাধিকারী। কলিকাতায় বাড়ী ঘর করিয়া বাস করিতেছেন এবং কলিকাতা সমাজে আদৃত হইয়াছেন। এখন গিরীশের সন্তান সন্ততি অনেকগুলি, তখন গিরীশের সন্তান হয় নাই।

এই চল্লিশ বৎসরে কটকের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! ফিরিয়া ঘুরিয়া আবার আমি কটকে বাস করিতেছি। কটকের সে প্রাচীন বন্ধুগণ একে একে পলাইয়াছেন, কেহ স্থানান্তরে, কেহ লোকান্তরে। কটকে তখন বাঙ্গালীর সংখ্যা অতি অল্প ছিল। তখন রেল ছিল না, জাহাজে চড়িয়া কালাপাণি পার হইয়া চাঁদবালীতে পৌঁছাইতে হইত। চাঁদবলী হইতে গরুরগাড়ী করিয়া ৪ দিনে কটক পৌঁছান যাইত। সুতরাং বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুতা ও সহানুভূতি ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। আপদে বিপদে একের ঘরে সকলেই গমন করিতেন।

---

(১০) গীতা।

সকলে একপ্রাণ হইয়া দূর বিদেশেও সুখে বাস করিতাম। এখন কটকে একজনে মরিলেও অপরে সংবাদ লয় না, সে মধুচক্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

গিরীশের ভাই বলিয়া আমরা সকলেই যোগীকে ভায়ের মতন দেখিতাম। কার্য্যোপলক্ষে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আমি কৃষ্ণনগর কলেজে বদ্‌লী হইলাম। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত হয়। উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু "বঙ্গবাসী" বাহির করেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমতঃ বঙ্গবাসী"কে স্নেহের চক্ষে দেখেন নাই। অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণেরও সহানুভূতি বঙ্গবাসী প্রথম বয়সে পায় নাই। তিন বৎসর পর্য্যন্ত আমার পরামর্শ মত বঙ্গবাসী বাহির হইত। কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে আমি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, বঙ্গবাসীতে উহাই আমার শেষ প্রবন্ধ। ইতিমধ্যে বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট লেখক বঙ্গবাসীর দলে জুটিয়াছিল। শেষে গাঙ্গুলী মহাশয় বঙ্গবাসী ছাড়িয়া অন্যান্য বন্ধুর সাহায্যে সঞ্জীবনী বাহির করেন। আমাকেও তাঁহাদের দলে টানিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের হাতের জন্মানো গাছ নিজেই কাটিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি আমার হয় নাই। আমি "বঙ্গবাসী" ও "সঞ্জীবনী" উভয়েতেই প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম! অন্য সকল লেখক বঙ্গবাসীতে লিখিবার জন্য বেতন বা পারিশ্রমিক লইতেন, আমি কখনও পারিশ্রমিক লই নাই।

লোক চরিত্র-জ্ঞান যোগীর বিশেষ বিকশিত হইয়াছিল। ২।১টী গল্প মনে পড়ে। আমার অনুমতি ভিন্ন কাহারও লেখা "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত হইত না। যোগী নিজের লেখা প্রবন্ধও আমার অনুমতি লইয়া প্রকাশিত করিত। একদিন "পদী-ময়রাণী" নামে এক প্রবন্ধ পড়িতে যোগী আমাকে দেয়। আমি পড়িয়া বলিলাম, এ প্রবন্ধ বাহির হইবে না। যোগী নিতান্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। শেষে আমি রাজী হইলাম। তখনকার দিনে "বঙ্গবাসী"র নগত বিক্রী যত অধিক ছিল, গ্রাহক-বিক্রী তত অধিক ছিল না। আমি যখন "বঙ্গবাসী" ত্যাগ করি, তখন তাহার বিক্রয় সংখ্যা সাপ্তাহিক ১০,০০০ হইয়াছিল। অনেক লোক আসিয়া "বঙ্গবাসী" নগদ কিনিয়া লইয়া যাইত। সেই সময়ে যে "বঙ্গবাসী" কিনিতে আসিত, সে-ই "পদী-ময়রাণী"র সংখ্যা চাহিত। যোগী আমার দিকে মিটি মিটি চাহিত ও মনে মনে হাসিত। জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে আমি "বঙ্গবাসী"র সম্পাদক করিয়া দেই। তিনি "নৈসর্গিক ভূগোল" নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমি সে প্রবন্ধের কোন অর্থই বুঝিতে পারিলাম না। জ্ঞানু আমাকে বুঝাইলেন, তাহার কোন অর্থই নাই। কিন্তু লোকের প্রকৃতি এই যে, নিজের অজ্ঞতা কেহ স্বীকার করিতে চাহে না। নিজের বিজ্ঞতা দেখাইবার জন্য সকলেই সকলকে বলিবে, প্রবন্ধটী অতি সুন্দর এবং তাহাতে ঐ সংখ্যা খুব বিক্রয় হইবে। কাজেও তাহাই হইয়াছিল। অনেক লোক ঐ সংখ্যা কিনিয়াছিল ও জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, প্রবন্ধটী অতি সুন্দর ও উপাদেয় হইয়াছে। একবার, তখন আমি বহরমপুরে, মধ্য-আশিয়ার অধিকার লইয়া ইংরাজ ও রুশিয়ানের মধ্যে যুদ্ধ

বাঁধিবার উপক্রম হয়। শেষে সে সঙ্কট কাটিয়া যায়। কিন্তু যোগী সে হুজুগ সহজে ছাড়িতে পারে নাই। অবশেষে বাধ্য হইয়া আমি তাহাকে লিখিলাম, ইহা কি হইতেছে ? যোগী লিখিল যে "বাঙ্গালী হুজুগ চায়, আর একটী হুজুগ না পাওয়া পর্য্যন্ত সে এ হুজুগ ছাড়িবে না।"

অল্পদিনের মধ্যেই সে শশধর তর্কচূড়ামণিকে আবিষ্কার করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের যে হুজুগ তুলিয়াছিল, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মহারথীগণও পতঙ্গের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে "কৃষ্ণতত্ত্ব-প্রচার," "ত্রিধারা" প্রভৃতি পুস্তকের উল্লেখ আছে। সে সময়ের লেখক এখনও অনেকে জীবিত আছেন। চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর ও বঙ্কিমচন্দ্রও এক সময় "বঙ্গবাসী"তে লিখিয়াছিলেন। মে

যোগী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মন্ত্র-শিষ্য। "সাধারণী"তে মক্স করিয়া লিখিতে শিখেন। হুগলীতে তাঁহার পিতা চাকরী করিতেন। গিরীশ ও যোগীর শিক্ষা হুগলীতেই হইয়াছিল। যোগীর লেখা কেমন সরস, তাহা তাৎকালিক পাঠকগণ জানেন, কিন্তু সমাজ বা রাজনীতি সম্বন্ধে যোগীর কোন একটী স্থিরমত প্রথমতঃ ছিল না। সে বলিত, "বিলাতী Timesএর ন্যায় আমি ময়রার দোকান খুলিয়াছি, যে রকমের মিঠাই বেশী বিক্রী হইবে, তাহাই প্রস্তুত করিব।" আমি বঙ্গবাসীতে থাকিবার সময় যোগী স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে বেশ উদার মত প্রকাশ করিত। ইন্দ্রনাথ ও শশধর মিলিয়া তাঁহার মত-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন। প্রতি শনিবার বঙ্গবাসী আফিসে আমাদের ভোজ হইত। তাহাতে মদ ছিলনা সত্য, কিন্তু মুর্গী জবাই যথেষ্ট হইত। অভিনেতা গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই সেখানে মহাপ্রসাদ পাইতেন। শশধরী শক্তিতে তাহার মধ্যে কেহ কেহ নিরামিষাশী হইয়াছিলেন, এবং অনেকের মাথায় টিকি দেখা গিয়াছিল। কেহ কেহ বা টিকির জায়গা টাকে অধিকার করিয়া থাকিবার হেতু ঘাড়ের একটু উপরে টিকি রাখিয়াছিলেন। দীননাথ সন্ন্যাল 'বঙ্গবাসীর একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন এবং Port Blairয়ে ডাক্তার হইয়া যাইবার পর "বঙ্গবাসী"র সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। যোগী প্রকাশক হইয়া তাঁহার লিখিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দীনু এখনও বাঁচিয়া আছেন, যোগীর জীবনী সম্বন্ধে আমি কোন কথা ছাড়িয়া যাইলে বা অজানা থাকিলে তিনি পূর্ণ করিয়া দিতে পারিবেন। যোগীর অনেকগুলি পত্র আমার নিকটে আছে। সে গুলি আপনার পত্রিকায় ধারবাহিক রূপে প্রকাশ করিব। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়, এম-এ।

(২)

পত্র নং ১

২৪ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।

সবিনয় নিবেদন,

বহুদিন হইল আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই; যদি কলিকাতায় আইসেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার বাসায় আসিলে বিশেষ উপকৃত বিবেচনা করিব।

আমরা একখানি স্বল্প মূল্যের সংবাদ পত্র শীঘ্রই প্রকাশ করিব। (অনুষ্ঠান পত্র পাঠাই; দৃষ্ট করিবেন।) সেই জন্য আমি কলিকাতায় আসিয়াছি, বলা বাহুল্য আমি

সাধারনার কার্য্য আজ চারিমাস হইল ত্যাগ করিয়াছি।

অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, বিষয়টী কিরূপ গুরুতর ও কিরূপ দায়িত্ব আমরা স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছি। এ সময় বন্ধু বান্ধবের সাহায্য আবশ্যক। আমার আশা আছে, আপনি আমাদের এ কাজে সহায়তা করিবেন। না করিলে পার পান কই? আপনাকে কখন ছাড়িব না।

অনুষ্ঠান পত্রগুলি আপনার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ও ছাত্রগণের মধ্যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিতরণ করিয়া দিবেন।

আমি ৮।১০ দিনের মধ্যে একবার কৃষ্ণনগর যাইব। যাইবার প্রধান কারণ একটী উপযুক্ত মনোমত কাগজ বিক্রয়ের জন্য পাইকের নিযুক্ত করা। ৩০০ শত Prospectus লইয়া যাইব। তাহাও জনসাধারণ মধ্যে বিতরণ করিয়া দিব। যে লোকটীকে রাখিব, তাহাকে কিছু মাহিনাও দিব, কিন্তু কাগজ বিক্রয় করিয়া কমিশন লইয়া তাহাকে তাহার পূরা মজুরী পুষাইয়া লইতে হইবে। এই ধরণের লোক একটা আমার জন্য অনুসন্ধান করিতে পারেন? ভাল লোক হইলে আমরা ৪।৫ টাকা অথবা ৬ টাকা পর্য্যন্ত তাহাকে মাসিক মাহিয়ানা দিতে পারিব; বাকী মজুরী কমিশনে পুষাইতে হইবে। যাহা হউক, আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া পরামর্শ মত সকল স্থির করা যাইবে।

সেজদাদা কটক হইতে এখানে আসিয়াছেন। বিলাত যাইবার একপ্রকার স্থির হইয়াছে। সেজদাদা ও সেজবধূ ভাল আছেন। আপনিও আপনার পুত্রেরা কেমন আছেন লিখিবেন।—ভরসা করি, আপনার স্ত্রী সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দ মনে আছেন। তিনি সাধারণী পড়েনত? নিবেদন ইতি—৭ নভেম্বর-১২৮৮। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

My dear Khirad,

I shall go to Krishnagar shortly to see you and sister Aloka as well as to pay my respectful compliments to Dr. Watts, whom principally I owe scholarship. All right here with me hoping the same with you.

Yours sincerely
GIRIS.

পত্রনং ২

১৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, ২৭ নভেম্বর, ৮১।

প্রিয় ক্ষীরোদবাবু।

“বঙ্গবাসি’ ২৬ শে অগ্রহায়ণ, অর্থাৎ ১০ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হইবে, সে তারিখে আপনি কোথায় থাকিবেন? কৃষ্ণনগর ত্যাগ করাই সম্ভব। কারণ ৮।৯ ডিসেম্বর এ-লে ও এণ্ট্রান্‌স পরীক্ষা সকলই শেষ হইবে। সেজদাদার নিকট শুনিয়াছি, প্রসন্ন বাবুকে বঙ্গবাসীর ভার একমাস কাল আপনি বন্দবস্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, আপনি ছুটিতে এখানে আসিলে কৃষ্ণনগরে আমদের দশা কি হইবে লিখিবেন। প্রথম রোখের সময় আপনি যদি কৃষ্ণনগরে না থাকেন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে খারাপই হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু উপায়ান্তর নাই।

কিন্তু আপনি যদি ১০ই ডিসেম্বর কৃষ্ণনগরে থাকিয়া আসেন, তাহা হইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। ঐ তারিখে কার্য্য নূতন আরম্ভ হইবে; যে লোক কাগজ বিলি ও

বিক্রী করিবে, সে যদি কিছুদিন আপনার বিচক্ষণ বুদ্ধির সাহায্য পায়, তাহা হইলে সে অনেক শিখিতে পারিবে। আমি আর আপনাকে অধিক কি লিখিব? আপনার উপর আমার অনেক আশা ভরসা আছে; আর আপনি যেরূপ সুদক্ষ লোক, তাহাতে একার্য্যে যদি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ দেন, তাহা হইলে কৃষ্ণনগরে আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব।

লোক যদি বহাল করিয়া না থাকেন, তবে নাগাইদ ২৩।২৪শে অগ্রহায়ণ বাহাল করিবেন। তাহার নাম কি ও কত মাহিনা দিতে হইবে, লিখিবেন। সে লোক প্রথম দিন কৃষ্ণনগরে কার্য্য করিবে, তাহার পরে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ এই চারিদিন কোন নিকটস্থ গ্রামে যাইয়া কাগজ বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে, লিখিবেন। পল্লীগ্রামে কাগজ ৫।৬ দিনে পুরাণ হয় না। কোন্ কোন্ গ্রামে যাওয়া উচিত, আপনি তাহা স্থির করিবেন; যদি, আমাদিগকে সেই সেই গ্রামের নাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

কাগজ, কত পাঠাইব? কাহার নামে পাঠাইব? যাঁহার নামে পাঠাইতে হইবে, তাঁহাকে এজেন্ট বা পাইকের উপাধি লইতে হইবে;—কারণ ঐ উপাধি না লইলে হাপ্-রেটে কাগজ যাইবে না।

আর ৪০।৫০ জন ভদ্রলোকের নাম লিখিয়া স্থির করিবেন,—সেই দিন তাঁহাদের নিকট কাগজ পাঠাইবেন (গ্রাহক হউন বা না হউন)—Experiment করিয়া দেখিবেন। ভরসা করি, আপনি ও আপনার স্ত্রীপুত্র সকলে ভাল আছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র।

পত্র নং ৩

২৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, ১৬ই অগ্রহায়ণ।

প্রিয় ক্ষীরোদ বাবু,

আপনার উপদেশপূর্ণ পত্র পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। সে পত্রের দুএকটা উত্তর ২৭ নভেম্বর তারিখের পত্রে আছে, যাহা নাই অনুগ্রহ করিয়া তাহা লিখিবেন।

আপনারা সকলে জ্বরে ভুগিতেছেন শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। ছুটী হইলেই যত শীঘ্র পারেন কলিকাতায় আসিবেন। আমি যে একটী দিন কৃষ্ণনগরে থাকিতে লিখিয়াছিলাম, তাহা আর (আমার জন্য) থাকিয়া কাজ নাই। আমাদের বাসায় আসিবেন। প্রথমদিন আমাদের বাসায় থাকিয়া বাটী যাইবেন। উপর তালার ঢের ঘর আছে, থাকিবার কষ্ট হইবে না।

দুইশত কাগজ পাঠাইব, জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে পত্র লিখিয়াছি। যে লোকটী বাহাল করিয়াছেন, তাহার নাম কি? কোন তারিখ হইতে বাহাল হইয়াছে, লিখিবেন। কাগজ যাহাতে ভাল হয়, তৎবিষয়ে ত্রুটী হইবে না। এমন বাঙ্গালার অদৃষ্ট ও আমাদের হাত-যশ। আপনি বোধ হয় এক্ষণে বড় ঝন্‌ঝাটে আছেন,—এক্ষণে শরীর দুর্ব্বল, সে জন্য জেদ করিয়া প্রথম সংখ্যায় লিখিতে বলিতে পারিলাম না।

ছাপান বিল শীঘ্র পাঠাইব।

মধ্যে আপনার [illegible] and grade লেখকের দ্বারা বঙ্গবাসীকে প্রধান কাগজ করিবে, বঙ্গদেশের অবস্থা ভাল হইলে আর্য্যদর্শনাদির এত কম গ্রাহক হইত না, ওরূপ তালপাতার আগুন একবার জ্বলিয়াই নিভিবে। এটী দারুণ হিংসার কথা। ইংলিসম্যান আপনার

সমাজ সম্বন্ধে অবশ্যই Tone Radical হইবে; তবে বেজায় রেডিকেল নহে, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের (Editor Arjyadarsan) মত Radical নহে, হিন্দুয়ানির সহিত Radical views মিশ্রিত। বলা বাহুল্য, বঙ্গবাসী জন-সাধারণের—প্রজার উকিল স্বরূপ হইবে, People's Paper' হইবে। এমত স্থানে আপনার সহানুভূতি কেন না পাইব?

সমালোচনা করিবার জন্য আপনার নিকট পুস্তক পাঠাইব। সমালোচনে কোনরূপ Party feeling প্রকাশ পাইবে না। পুস্তক ভাল হইলে, অতি বড় শত্রুর পুস্তক ভাল বলিতে হইবে। পুস্তক খারাপ হইলে বড় মিত্রের পুস্তক মন্দ বলিতে হইবে। চক্ষু লজ্জার নামটী মাত্র থাকিবে না। "Times Weekly-Edition" subscribe করিয়াছি। জানুয়ারী মাস হইতে পাইব। Daily Paperএর মধ্যে Indian Mirror ও Statesman লই। Bi-weekly Paperএর মধ্যে Englishman, Evening Mail লই। ইহা ব্যতীত Hindoo Patriot, Bengalee প্রভৃতি লই। এক্ষণে আর বেশী কাগজ লইতে পারিব না।

২০০ কাগজ একত্রে ডাকে পাঠাইতে হইবে, তাহা পত্রের সহিত এক সঙ্গে পঁহুছিবে ত? না Book Post হিসাবে সুবিধা অনুসারে অর্থাৎ দেরীতে পঁহুছিবে? এক আধ দিন দেরিতে কাগজ পঁহুছিলেও কাজ চলিবে না। Post Office হইতে খবর লইব।

যাঁহার সব্‌স্ক্রিপসন্ লইয়াছি, তাঁহার নামে জমা হইয়াছে, জানিবেন।

নিবেদন ইতি—শ্রীযোগেন্দ্র।

Excuse haste.

পত্র নং ৪

কলিকাতা, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
রবিবার রাত্রে—

ক্ষীরোদ বাবু,

বহুদিন হইল আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই, আপনি কি মনে করিতেছেন, জানি না।

প্রথম কথা, "বঙ্গবাসী" কেমন হইতেছে? অনেকে বলেন, "বঙ্গবাসী"র ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। ২।৪ জন নিন্দুক অবশ্যই আছে। কার লেখা কোন্‌টী, ঠাওরাইতে পারেন কি? আজকাল রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি কি উপযুক্ত হইতেছে না? দ্বারিক বাবু বেশ পরিশ্রম করিয়া লেখেন। "জাল বক্তৃতা" জ্ঞানেন্দ্র বাবুর লেখা।—"সামাজিক জ্যোতিষ"কার লেখা বলিতে জ্ঞানেন্দ্র বাবু মানা করিয়াছেন। বুদ্ধি করিয়া বুঝিয়া লইবেন। "সামাজিক জ্যোতিষ" কেমন হইয়াছে, তিনি জানিতে চাহেন। কণারক কেমন লাগিতেছে? আশা কিছু কিছু ভয়ে লিখিতেছি। আপনার স্বাধীন মত দিবেন। তারপর রমণীরত্ন, পুরুষরত্ন, মেমসাহেব প্রভৃতি কেমন হইতেছে? বহুসংখ্যক লোকের মতে ভাল;—কিন্তু ২।৪ জনের মতে অতি খারাপ। জ্ঞানেন্দ্র বাবু বলেন, মেম সাহেব ভালই হইয়াছে। আমি কিছুই ঠাওরাইতে পারি নাই। এগুলি কার খেলা, অবশ্যই জানেন। বিলাতের পত্র অনেকেই আগ্রহের সহিত পড়েন। সংবাদ এবং Paragraph ভাল হইতেছে না। ইহা আমার বিশ্বাস; কিন্তু নানা গোলযোগে পড়িয়া ওদিকে মন দিতে পারি নাই। আমার শরীর তাদৃশ ভাল নাই। তার উপর সেরাস্তার কাজ ১৬ আনা দেখিতে

হয়, তার উপর প্রতিবারে ২টী প্রবন্ধ লিখিতে হয়, তাহার উপরে আবার প্রত্যহ ৮।১০ জনের আহারাদি ব্যবস্থা করিতে হয়। কাজেই News এবং Paragraphয়ে তত মন দিতে পারি নাই। আপনি রাগ করিবেন না। এবার হইতে ভাল করিয়া লিখিব। আমার একদিন ফুরসৎ নাই। আজ রবিবার, কিন্তু সমস্ত দিনই কার্য্য করিতেছি —বৈকালে বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইয়া রাত্রি ৮টার সময় বাসায় আসিলাম। তারপর আপনাকে পত্র লিখিতেছি। এইরূপ ৪।৫ খানি পত্র লিখিতে হইবে। ১ খানি সেজদাদাকে, ১ খানি বাড়ীতে, ১ খানি পুরীর বড় দাদাকে, ১ খানি স্ত্রীকে ও ১খানি ভগিনীকে। দেখুন, কতকাজ—রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত লিখিলে পত্র লেখা শেষ হইবে না। মনে করিবেন না যে, পরিশ্রম করিতে আমার কষ্ট বোধ হয়। তবে সকলকার্য্য ভালরূপে সম্পাদন করিতে পারি না বলিয়া মনে একটু কষ্ট হয়।

চা মন্দ হয় নাই। ভাত অতি সুদীর্ঘ, সুতরাং অনেক বাদ না দিলে "বঙ্গবাসী"র উপযোগী হইবে না। Education সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞানেন্দ্র বাবুর কাছে আছে, কিন্তু এখন তাহা ছাপা too late. Nihilist সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ full of facts হইবে। Education হইবে। Egypt সম্বন্ধে একটী ও Ireland সম্বন্ধে দুটী প্রবন্ধ চাই। এ ভার কাহাকে দিব? আপনি কি পারিবেন না? Nature পাইতেছেন ত?

কৃষ্ণনগরে বঙ্গবাসীর গ্রাহক কমিল কেন? ২২৫ খানা পাঠাইতেছিলাম, ক্ষেত্রবাবু ১৮০ খানা পাঠাইতে লিখিয়াছেন? ক্ষুদিরাম বাবুর নামে ১৮০ খানা পাঠাইতেছি। গ্রামবার্ত্তা দেখিলাম, প্রতি সংখ্যার মূল্য /১০; বঙ্গবাসীর কিছু অপকার করিতে পারিবে, এমন বোধ হয় না। হুগলীতে সাধারণী ও এডুকেসন গেজেট আছে, সেখানেও ২৪৫ খানি বঙ্গবাসী কাটিতেছে। বর্দ্ধমানে বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী আছে, লেখানেও ১৬০ খানি নগদ বিক্রী হয়। সুতরাং গ্রামবার্ত্তার জন্য কিছু আশঙ্কার কারণ আছে কি? গ্রামবার্ত্তা আমাদের সহিত Compete করিতে কৈ পারিল? গ্রামবার্ত্তার কে কে লেখক? উপযুক্ত লোক মনে হয় না।

শুনিতেছি, আপনি বদ্‌লী হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। গুজব, আপনাকে চট্টগ্রামে বদ্‌লী করিবে। বদ্‌লী হইবার পূর্ব্বে কি আপনি কলিকাতায় আসিবেন না? যদি আসেন, অবশ্যই সাক্ষাৎ হইবে। আর কৃষ্ণনগরে আমাদের দশা কি হইবে? ক্ষুদিরাম বাবু কিরূপ কার্য্যদক্ষ লোক? তাঁহার দ্বারা কি সকল কার্য্য সমাধা হইবার সম্ভাবনা আছে? আপনার নিকট শুনিয়াছিলাম, ক্ষেত্রবাবু আমার জন্য যৎপরোনাস্তি মেহনত করিয়াছিলেন; ক্ষেত্র বাবুকে আজ একটী পত্র লিখিব।

এক্ষণে কথা হইতেছে, আপনি ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না, কোন মতেই চলিবে না। টিটকিরীর ভয় বড় হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মধ্যে মধ্যে ঠাট্টা করেন। ঠাট্টার ভাব এই, "আমরা বড় কৃতকার্য্য হইলাম, তা যোগীন আবার জনকতক 2nd grade লেখকের দ্বারা বঙ্গবাসীকে প্রধান কাগজ করিবে, বঙ্গদেশের অবস্থা ভাল হইলে আর্য্যদর্শনাদির এত কম গ্রাহক হইত না, ওরূপ তালপাতার আগুন একবার জ্বলিয়াই নিভিবে। এটী দারুণ হিংসার কথা। ইংলিসম্যান আপনার

নিকটেই যাইবে। অপনাকে সেরূপ বিশেষ লিখিতে হইবে না। সপ্তাহে ২।৩টী Paragraph ও ৭।৮টী news লিখিয়া পত্র মধ্যে সঙ্গোপনে দিবেন। আপনি এবার আসাতে কোন বিশেষ কথা বলিতে পারি নাই; আপনাদিগকে দেখিয়া যে আহ্লাদ হইয়াছিল, তাহাতে কাজের কথা সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আপনিও বড় তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছিলেন।

অক্ষয় বাবুর নিতান্ত ইচ্ছা, বঙ্গবাসী ও সাধারণী এক হয় ও তিনি editor হন। আমি তাঁহাকে এই উত্তর দিয়াছি, আমার সাহায্যকারী যাঁহারা, যাঁহাদের সাহায্যে কাগজ এতদূর উঠিয়াছে. তাঁহাদের মত না পাইলে আমি শেষ উত্তর দিতে পারি না। দ্বিতীয় কথা, অম্বিক,কৃষ্ণনাথ প্রভৃতি অনেকে অংশীদার হইতে চাহেন,তৃতীয় কথা, বৈশাখ মাসের মধ্যে কার কত অংশ হওয়া উচিত, তাহা স্থির করা। চতুর্থ কথা ছাপাখানা।

১ম বিষয় সাধারণীর সহিত বঙ্গবাসী কখন এক হইতে পারে না, আমার প্রথম প্রথম ইচ্ছা হইয়াছিল এক হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না. কিন্তু অনেক ভাবিয়া এখন দেখিতেছি, একান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে।

২য় কথা, বঙ্গবাসীতে উপেনবাবু ও আমার কেবল অংশ থাকিলে চলিবে না। ইহা নিশ্চয় জানিবেন, আমরা দুজন ছাড়া আর তিনটী ভদ্র সহৃদয় সরল লোকের অংশ থাকা চাই। সে তিনটী লোক কে? আপনার উপর ভার দিলাম, কোন তিনটী লোককে লওয়া উচিত, লিখিবেন।

৩য় কথা এই বৈশাখ মাস মধ্যে সকল বিষয়ের শেষ হওয়া চাই।

৪র্থ কথা, এই বঙ্গবাসীতে যাহাদের অংশ থাকিবে, তাঁহাদের ছাপাখানাতেও অংশ থাকা চাই। এসকল বিষয়ে আপনার মত দিবেন।

আপনার গ্রীষ্মের ছুটীর আর বড় দেরী নাই, মধ্যে ১॥ মাস মাত্র। আপনাকে গ্রীষ্মের ছুটীতে ১ মাস বঙ্গবাসীতে থাকিতে হইবে। ঐ সময় ছাপাখানা করিব।

ঢের রাত হইয়াছে, আর লিখিতে পারিলাম না। শ্রীমতী অলকাকে আমার সভক্তি সম্ভাষণ দিবেন। তাঁর বঙ্গবাসী ভাল লাগেত?

বিজ্ঞাপন দিয়া আপনি লিখিয়াছেন, বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ করিলে, “বাধিত” হইব। “বাধিত” কথাটীতে দুঃখিত হইলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।”

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বিক্রমপুরের-সাহিত্য-চর্চ্চা সম্বন্ধে মন্তব্য।

গত অগ্রহায়ণ মাসের নব্যভারতে“বিক্রমপুরের সাহিত্য-চর্চ্চা” প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রকার প্রবন্ধ লিখিতে যেরূপ অনুসন্ধান ও গবেষণার আবশ্যক,দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী বোধ হয় তদ্রূপ কিছুই করেন নাই। তিনি নিতান্ত

অসাবধানতার সহিত এই প্রবন্ধ সম্পাদন করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম।

সঙ্গীত-সাহিত্যে, কৃষ্ণকান্ত পাঠক, রাজমোহন আম্বুলী, প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজ মধুসূদনের নামই প্রবন্ধলেখকমাত্র উল্লেখযোগ্য বলিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার নিকট পরলোকগত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নামটী উল্লেখের অযোগ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। রাসবিহারী সমাজ-সংস্কারক রূপে সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেও, তাঁহার "কুলীন কীর্ত্তন" বাঙ্গালার সকল স্থানেই সমভাবে সমাদৃত। বলিতে কি, এই কুলীন কীর্ত্তন সঙ্গীতগুলী, সমাজসংস্কার কার্য্যে তঁহার সম্পূর্ণ সহায় ছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত শ্যামা বিষয়ক মনোরম বহু সঙ্গীত, "বিবিধ সঙ্গীত-গ্রন্থে" প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক, কৃষ্ণকান্ত পাঠকের 'জানি কার রূপ-সাগরে ঝাপ দিয়ে শ্যাম গৌর হয়েছে" এই গানটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কি বিক্রমপুরের আবাল বৃদ্ধবনিতার জানিত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের "দিদিলো কাজ কি বিয়ার সাজ করিতে বৃদ্ধকালে", "কোন পথে যাইবে মাগো বিশ্বনাথ বাড়রীর বাড়ী" প্রভৃতি গান শোনেন নাই?

গদ্য সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধলেখক—"বর্ত্তমান লেখকগণের মধ্যে যাহাদিগকে আমরা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল" — এই বলিয়া মাত্র তিনি ২১ জন লেখকের নাম দিয়াছেন। তাহাতেও অনেক সাহিত্যসেবীর নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত সরস্বতীর তুল্য পণ্ডিত শুধু বিক্রমপুরে কেন, সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যেই অতি বিরল। বিগত ১৪।১৫ বৎসর যাবত নব্যভারতে এই মহাত্মার প্রাচীন বৈষ্ণব কবি ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কি গবেষণায় কি ভাবগাম্ভীর্য্যে সর্ব্বপ্রকারেই অতুলনীয় নহে? বর্ত্তমানে এই সমস্ত উপাদেয় প্রবন্ধ আনন্দবাজারে প্রকাশিত হইতেছে। এই লেখক কিন্তু তাঁহার নামটীও জানেন না।

প্রবন্ধলেখক—"বিক্রমপুরবাসিনী যে সকল রমণী সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, তাঁহাদের নামও নিম্নে প্রদত্ত হইল" — বলিয়া মাত্র ৮ জন লেখিলাম প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাহার মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষরূপে সুপরিচিতা শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। লেখক বিক্রমপুরবাসী হইয়া, সমগ্রবঙ্গের সুপরিচিতা আমোদিনী ঘোষের নামটী যে জানেন না, ইহা একান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়।

কবি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘটক, কবি শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়, কবি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা-প্রকাশ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী, কৃষি-সম্পদ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ প্রভৃতি আরও কত কত সাহিত্য-সেবীর নাম যে এই প্রবন্ধে পরিত্যক্ত হইয়াছে, লেখক একটুকু অনুসন্ধান করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন।

লেখকের ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, বিক্রমপুর-রত্ন-প্রসূ। সাহিত্য-সম্পদেও বিক্রমপুর কোন দেশ হইতে ন্যূন নহে।

তাঁহার পরিচিত নাম কয়টী প্রকাশ করিয়া, তিনি যে তাহা যথেষ্ট মনে করিয়াছেন, তাহাতে বিক্রমপুরের গৌরব বর্দ্ধন করা হয় নাই, বরং খর্ব্বই করা হইয়াছে।

শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী।

ফ্রান্সের নব অভ্যুত্থান।

কোন জাতির উন্নতি বা অবনতি তাহার সাহিত্যের উন্নতি বা অবনতির উপরেই নির্ভর করে। একমাত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়াই জাতীয় আদর্শ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার স্বাধীন চিন্তাশীলতা ভিন্ন সাহিত্য বা দর্শন কোন জাতির মধ্যে মাথা তুলিতে পারে না।

আজ নব্য ফরাসীর ভাব সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত। বিংশ শতাব্দীর ফরাসী এবং উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী এক নহে। উনবিংশ শতাব্দীটাই বিজ্ঞানের পদতলে দলিত হইতেছিল, বৈজ্ঞানিকগণই যে এই বিশ্বরহস্য ভেদ করিবে, ইহাই সকলের বদ্ধমূল ধারণা হইয়া পড়িয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীকে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষবাদ বা বাস্তবতার যুগ বলিলেও চলে। কোম্‌ত, টেন, রেনান, ক্লড বার্ণাড তখন ফরাসীর দর্শনশাস্ত্রের গুরু ছিলেন এবং ফ্লবার্ট, জোলা, ডুমাস জুনিয়র ও সর্ব্বাপেক্ষা ব্যালজ্যাকই সমাজ চিকিৎসক (docteur es sciences sociales) পদে বিরাজ করিতেছিলেন। আজ ফ্রান্সের চিন্তার ধারা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় উক্ত মহাত্মাগণের পূর্ব্বপ্রদর্শিত আদর্শগুলিকে নব্য ফরাসীগণ আর গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহে। ব্যালজাক তাঁহার উর্ব্বর কল্পনার সাহায্যে ফরাসীদিগকে এক অভিনব স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসী করিয়া তুলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার একখানি মাত্র পুস্তক "Peau de chagrin"এর নৈরাশ্যবাদ যে ফরাসীর জাতীয় জীবনকে এক যুগ ধরিয়া উন্নতির কত পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এক্ষণে ফ্রান্সের নবীন ভাবুকগণ সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন। আজ ব্যালজাকের গ্রন্থাবলী তাহাদের উপভোগের সামগ্রী হইতে পারে, কিন্তু প্রাণের সামগ্রী নহে। এমন কি, নৈরাশ্যবাদের প্রচারক বলিয়া আনাটোল ফ্রান্স, পেরলোটী এবং মৈতরলিঙ্কও ফরাসীর নবজীবনে আর আধিপত্য করিতে পারিতেছিল না। আর আমরা এখান হইতে কেবল মৈতরলিঙ্কের নাম শুনিয়াই তাঁহাকে অনুকরণ করিবার জন্য পাগল। এমনি আমাদের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা ! আমাদিগের জাতীয় উন্নতির পথ প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ত্তমান উদীয়মান জাতিগুলির চিন্তার ধারাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। কেবল না পড়িয়া শুনিয়া অন্ধের ন্যায় অনুকরণপ্রিয়তার প্লাবনে ভাসিয়া গেলে চলিবে না। আমাদিগের রবীন্দ্রনাথ যে আজ পাশ্চাত্য জগতের নিকট অভাবনীয় সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহার কারণ তিনি ইউরোপের শুষ্ককণ্ঠে শান্তির বারি সেচন করিয়া আসিয়াছেন, নৈরাশ্য-দগ্ধ অশান্ত জীবনে সময়োচিত আশা ও বিশ্বাসের বাণী শুনাইয়া আসিয়াছেন। নৈরাশ্যবাদীর স্থান ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ হইতে উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে।

বর্ত্তমান ফরাসী বংশধরগণ নিত্য সত্য বস্তুতেই মুক্তি অন্বেষণ করিতেছেন। কর্ম্মানুরাগই বর্ত্তমান যুগের ফরাসীগণের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরাতন যুগের নৈরাশ্যবাদ সমগ্র ফ্রান্স হইতে আজ একাবারে বিতাড়িত হইয়াছে। নিরাশার কথা কেহ শুনিতে চাহে না। আজ যে ফরাসীরা অকাতরে প্রাণ দিতে সমর্থ হইতেছে, তাহার মূলে তাহাদিগের পাঁচ জন বিশিষ্ট ভাবুকের চিন্তা ও দর্শন প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করিতেছে। ক্রনেতিয়ে, বুর্জে, বারি, বোঁডো ও বার্গসোঁই এক্ষণে ফরাসী জীবনের গঠনকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ফরাসীর জাতীয়তার ক্ষেত্রের ইঁহারাই ভিত্তি, ইঁহারাই স্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান। উনবিংশ শতাব্দীর নৈরাশ্যবাদকে মূল করিয়া ফরাসী দেশে Anarchism, socialism, Pacificism, Humanitarianism, Individualism প্রভৃতি কতকগুলি আগাছা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই পাঁচ জন নবীন ফরাসী ভাবুক নৈরাশ্যবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া উক্ত আগাছা গুলির প্রভাব নষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

M. Paul Bourget (বুর্জে) তাঁহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত আয়োজন, সমস্ত সাধনা যাহা কিছু "আদর্শ" তাহারই অনুকল্পে উৎসর্গ করিয়াছেন। আদর্শরক্ষাই তাঁহার সাধনার মূল মন্ত্র। M. Henri Bergson (বার্গসোঁ) তাঁহার Levolution creatrice" নামক পুস্তক দ্বারা ফ্রান্সের পূর্ব্ব সাহিত্যাচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত নৈরাশ্যবাদের (Pessimism) মূলের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ফরাসীর আলস্যপ্রধান জীবনে নব জাগরণের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। ইচ্ছাশক্তির উন্মেষই বার্গসোঁর দর্শনের মূলমন্ত্র। আমি এক্ষেত্রে Dr. Henri Bergsonএর কতকগুলি ভাবুকতার পরিচয় দিয়া সুধী পাঠকবর্গকে বিরক্ত করিতে চাই। তিনি বলেন যে, দার্শনিকগণ কল্পনা-জীবী নহেন। তাঁহার মতে মনন করাই সৃজন করা—To will is to create (অহং প্রজায়াং বহু স্যাম) সৃজনী শক্তির মূলে সর্ব্বাগ্রে ইচ্ছা শক্তিই বিদ্যমান,—ইহা আমাদের আর্য্যদর্শনের গোড়ার কথা। এত কাল পরে বার্গসোঁ এই মূল শক্তিকে বিশেষ ভাবে ধরিয়া ফ্রান্সের নবজীবন সঞ্চার করিতেছেন। আর এই মূল শক্তির উত্তরাধিকারী হইয়াও মৃত্তিকার গুণে আমরা ঘুমাইয়া আছি। তিনি আরও বলিতেছেন, দৃঢ়তাই (determinism) জীবনের উন্নতির এক মাত্র উপায়। দৃঢ়তা হইতে জগতের যত অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনার সৃষ্টি। বার্গসোঁ অদৃষ্ট-বিশ্বাস করেন না, তাঁহার মতে চিন্তার দৃঢ়তাই মানবের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের নিয়ামক। অদৃষ্ট বিশ্বাসই মানবের কর্ম্মের স্বাধীনতাকে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। ভয়, দুর্ভাবনা এবং অনুতাপই মানবকে অদৃষ্ট-বিশ্বাসী করিয়া তোলে। অদৃষ্ট-বিশ্বাসই মানবের অপারকতার একটা প্রবোধ মাত্র। "অকৃতকার্য্য হইয়াছি, কি করিব, আমার দোষ নাই, অদৃষ্ট করিয়াছে"—এই বলিয়া মানব একটা বিফলতার নৈরাশ্যের মধ্যেও সান্ত্বনা অনুভব করে। এবং অদৃষ্ট বিশ্বাস করে বলিয়াই তাহার মাথার উপর অলক্ষ্যে যে একজন নিয়ন্তা আছে,ইহাও মানুষকে বিশ্বাস করিতে হয়। ইহাই হইতেছে বার্গসোঁর দর্শনের মর্ম্ম।

১৮৮৯ খ্রীঃ হইতেই M. Paul Bourgetএর Disciple নামক গ্রন্থই ফরাসী চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তিত করিতে আরম্ভ করে। সময় পাইলে ভবিষ্যতে এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

তাহার পর M. Barre দেশ ভক্তির মহামন্ত্র লইয়া ফরাসীর জীবনকে নবভাবে গঠিত করিবার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে সন্তান যেমন জন্মিয়াই মাতার প্রতি অনুরক্ত হয়, জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের টানও তেমনই একটী নাড়ীর টানের অনুরূপ। জননী এবং জন্মভূমি দেখিতে পৃথক সামগ্রী হইলেও কার্য্যতঃ একই পদার্থ। তাই আমাদের শাস্ত্র 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলিয়া কোন্ কালে গাহিয়া গিয়াছেন। কত যুগ যুগান্তরে সাধনা ও সিদ্ধির সঙ্গে, কত পূর্ব্বপুরুষের জীবন-পাতের সঙ্গে, কত বিগত ইতিহাসের সঙ্গে যে জন্মভূমি বিজড়িত, যাহার উৎপন্ন পদার্থে আমার আমিত্ব আজ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, এমন জন্মভূমিকে যে মানব না ভালবাসে, তাহার জন্মই বৃথা। Barreর কথা গুলি এত সুন্দর ও মর্ম্মগ্রাহী যে, তাহা আমি কোন মতেই উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

"Patriotism means the instinctive love of a man for his native soil, for the soil that has nurtured him to which he is attached by all the roots that have in the course of successive generation attached his forefathers to the same soil, that patriotism is not artificial sentiment, the more historical category but is an 'organic' sentiment having its roots in the deepest depths of human nature, that it is an instinct as natural to man as the instinct which causes the child to love its mother."

ফরাসীরা Barreর এই মর্ম্মবাণীগুলি কেবল এক কর্ণে শুনিয়া অন্য কর্ণ দিয়া বাহির করিয়া দেয় নাই। আজ যে ফরাসীজাতি জীবনমরণ পণ করিয়াছে. তাহার মূলে Barreর এই কথা গুলি প্রত্যেক ফরাসীর বক্ষে রক্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর মৌখিক দেশভক্তি নহে। সূচ্যগ্র পরিমাণ ফ্রান্সের মাটীর মূল্য আজ তাহার আত্মত্যাগপরায়ণ নির্ভীক ভক্ত সন্তানগণ প্রাণের রক্ত দিয়া ক্রয় করিতেছে। ফরাসীর ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা আজ জর্ম্মানীর জড় শক্তিকে ও তাণ্ডব নৃত্যকেও একপদ অগ্রসর হইতে দিতেছে না।

M. Paul Adam R একজন আদর্শ-প্রধান সাহিত্যিক। ইনি ফরাসীর বর্ত্তমান সমাজ-চিকিৎসক রূপে বিরাজ করিতেছেন। ইনি প্রেমাভিনয়কেই বিবাহের যথার্থ ভিত্তি বলিয়া বিবেচনা করেন না। তিনি উদ্বাহ বন্ধনকে একটা জাতি ও সমাজের ভাবী কল্যাণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি নরনারীর ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের দিকে আদৌ আস্থা স্থাপন না করিয়া, যাহাতে বিবাহ দ্বারা ভবিষ্যতে একটা জাতির সুবিধা হয়,তাহার দিকেই আপনার চিন্তাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। এক কথায়—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই সহজ সরল স্পষ্ট কথার,তিনি সমর্থন করিয়াছেন। তিনি কর্ত্তব্যের কাছে ব্যক্তিগত প্রেম জিনিষটাকে একেবারে নিম্নে ফেলিয়া দিয়াছেন। সামাজিক কর্ত্তব্যের কাছে ব্যক্তিগত আত্মতৃপ্তিকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন।

তিনি বলিতেছেন যে, স্ত্রীলোকের কখনই

প্রেমে পড়িয়া এক অকর্ম্মণ্য কপর্দ্দকশূন্য যুবককে বিবাহ করা উচিত নহে। কারণ তদ্দ্বারা তাহাদের যে সন্তান সন্ততি জন্মিবে, পিতার দারিদ্র্য বশতঃ তাহারা উত্তম শিক্ষা লাভ করিবার সুবিধা পাইবে না। প্রত্যেক নর নারীকে বিবাহের অগ্রে ভাবী সন্তানের শিক্ষা দীক্ষার কথা ভাবিতে হইবে। কেবল হঠকারিতার সহিত বিবাহ করিয়া জীবনের ভার বৃদ্ধি করিলে চলিবে না। বিবাহ সম্বন্ধীয় অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতার ফলে যে কত নরনারী-জীবন বিষময়, বিষাদময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই Paul Adamএর চিন্তাগুলি বড়ই হৃদয়-গ্রাহী বলিয়া বোধ হয়। তিনি আরও বলিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসরের অবিবাহিত ব্যক্তির কখনই বিবাহ করা উচিত নহে, কারণ যদি তাঁহার কোন ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়ী বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবে। (The bachelor of fifty must not marry and thereby frustrate the legitimate hopes of his nephews and nieces.) সৎসাহিত্যিকগণের সৎ চিন্তার দ্বারা যে জাতির এতটা দায়িত্ব বোধ জন্মিয়াছে, সে জাতির ভিত্তিটা যে কিরূপ দৃঢ়, তাহার আজ মহা অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া যাইতেছে। এই অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া ফ্রান্সের যে নূতন সন্তানগণের উদ্ভব হইবে, তাহাদের জীবনের দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

Paul Adamএর Stephani নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে—"Our responsibility towards the future by means of which we pay our debt to the past, obliges us to place our immediate descendants in an economic position that will enable them to develop their moral patrimony without let or hindrance." ফরাসীরা অতীতের ঋণ ভবিষ্যতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পরিশোধ করিতে আজ কৃতসঙ্কল্প। আজ ফরাসী কেবল আত্মতৃপ্তির মোহ মদিরায় ডুবিয়া নাই। ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের জন্য আজ তাহারা অসীম দায়ীত্ব ভার গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর। আমাদিগের শাস্ত্রের নিকট ফরাসীর এই নব চিন্তাগুলি যে কতদূর ঋণী, তাহা সূক্ষ্মবুদ্ধি পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। কর্ত্তব্য-বুদ্ধিটা যেন নব্য ফরাসী সম্প্রদায়ের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। ফরাসী আজ কেবল বর্ত্তমান লইয়াই তৃপ্ত নহে, অতীতের প্রতি যথোচিত সম্মান ও ভবিষ্যতের প্রতি অসীম দায়িত্ব-জ্ঞান তাহার জীবনকে এক নব প্রণালীতে গঠিত করিতেছে।

Catholicism ফ্রান্সের অতীতের সম্পত্তি ছিল। ভবিষ্যতে যাহাতে ফ্রান্সের এই রক্ষা-কবচ বজায় থাকে, তৎজন্য সমগ্র ফরাসী জগৎ আজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কারণ উহাতেই ফরাসী জাতির বিশেষত্ব। নব্য ফরাসীগণ উনবিংশ শতাব্দীর গ্লানিগুলিকে দূরীভূত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পুরাতন ভিত্তি catholic patrimony—তাহার জাতীয় বিশেষত্বকে বাঁচাইবার জন্য তাহার অনুরাগ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। "Retour aux croyances ancestrales' ও "Retournons a la nature" এই দুইটী বাক্য আজ ফরাসীর জপমালা হইয়াছে। পিতৃধর্ম্মে আস্থা এবং স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ফিরিয়া যাও-

য়াই ফরাসীরা আজ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেছে। কেন ফরাসী আজ স্বরূপ সম্প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুল, আর আমরা অপরূপ, বহুরূপ বা বিরূপ হইবার জন্য অপর জাতির পদলেহন-প্রত্যাশী? কারণ প্রকৃত প্রাণ বহুদিন হইতে আমাদের মনুষ্যত্বকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তবে যে আমরা চলিতেছি, ফিরিতেছি, সে কেবল existing not living! অনুকরণ জিনিষটাকে আমি বন্ধ্যা নারীর মত মনে করি, অনুকরণ কিছুই প্রসব করিতে পারে না। ব্যর্থ অনুকরণের দ্বারা জাতীয় জীবন গঠনের প্রয়াস বোবার স্বপ্ন দর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেটাকে আজ নূতন বলিয়া আমরা ধরিতে ছুটিয়াছি, তাহা ইউরোপে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। ইউরোপ আবার নূতন পরিবর্ত্তন খুঁজিতেছে, কিছুতেই তাহার চঞ্চল বুদ্ধি জীবনের সম্পূর্ণতাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না। ইউরোপ অস্থিরচিত্ত, কারণ তাহার সভ্যতা এখনও মানব জীবনের যথার্থ স্বরূপকে খুঁজিয়া পায় নাই। আর আমরা সেই অন্ধের পিছনে অন্ধ হইয়া ছুটিয়াছি। মৃত্যু আর কাহাকে বলে? ফ্রান্সের নব জাগরণের মূলমন্ত্রগুলি দেখিয়া আমাদের চৈতন্য হইবে কি? না আমরা অনুকরণের মোহমদিরায় চিরকালের জন্য ঘুমাইয়া থাকিব? "Return to the ancestral beliefs"—বিংশ শতাব্দীর ফরাসী জাতি এক্ষণে এই কথাই বলিতেছে—জাতীয় বিশিষ্টতার মধ্যে ফিরিয়া চল—পূর্ব্ব পুরুষ-প্রদর্শিত বিশ্বাসের পথে ফিরিয়া চল—প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ফিরিয়া চল—ইহাই হইতেছে ফরাসীর নব যুগের সিদ্ধান্ত। আর আত্মবিস্মৃত, পরমুখাপেক্ষী, অনুকরণকারী আমরা আমাদিগের মাটীর সম্বন্ধ ভুলিয়া স্বদেশে প্রবাসী সাজিয়া পূর্ব্বপুরুষের মস্তকে পদাঘাত ও জাতীয় সাধনার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছি।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অতএব অর্জ্জুন ব্যতীত পূর্ব্বে আর কেহ এ বিরাট সুদর্শন বিশ্বরূপ দেখেন নাই, তাহার কারণ অনন্যভাব ব্যতীত এ রূপ দর্শনীয় নহে এবং গীতোপদিষ্ট অনন্য ভক্তিযোগে পূর্ব্বে কেহ সাধনা করেন নাই। ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ "তদন্যেন ন দৃষ্ট পূর্ব্বম্।' ইহার এই অর্থ করেন, যে অর্জ্জুনের ন্যায় ভক্ত ব্যতীত আর কেহ পূর্ব্বে এ বিশ্বরূপ দেখেন নাই। যখন কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই এরূপ দর্শন সম্ভব, তখন অবশ্য এই অর্থ সঙ্গত। কিন্তু ইহার আরও এক অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে, বাস্তবিক অর্জ্জুনের পূর্ব্বে কেহ এ বিশ্বরূপ এরূপ ভাবে এমন করিয়া দর্শন করেন নাই। তাহার কারণ, ভগবান স্বয়ং ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহা বলিয়াছি। ভগবান বলিয়াছেন যে, বেদযজ্ঞ, অধ্যয়ন, দানযজ্ঞ ক্রিয়া, উগ্র তপস্যা দ্বারা এ বিশ্বরূপ দর্শনীয় নহে। অর্থাৎ বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বিহিত রূপ সাধন দ্বারা তাহার ফলে এ বিশ্বরূপ দর্শন করা যায় না।

এই গীতোপদিষ্ট ভক্তিমার্গে সাধন—

এই যথোক্ত ধর্ম্মামৃত পর্য্যুপাসন (গীতা, ১২।২০), বেদের সংহিতায় বা ব্রাহ্মণে অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। এই অনন্যএকনিষ্ঠ ঈশ্বরে ভক্তিযোগ গীতার নিজস্ব। উপনিষদে ইহার যে ইঙ্গিত মাত্র আছে, তাহা সামান্য—তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, গীতার পূর্ব্বে যে বেদোক্ত সাধনা প্রচলিত ছিল, সে সাধনা দ্বারা কেহ এ বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হয় নাই। আমরা অনুমান করিতে পারি যে, অর্জ্জুনের সময়ে এই বেদোক্ত বেদযজ্ঞ অধ্যয়ন দান, যজ্ঞক্রিয়া, তপ এই সাধনমাত্র প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া অর্জ্জুনেরও সে সাধনা যথাসম্ভব ছিল। সে ধর্ম্ম কর্ম্ম বা সে সাধনার দ্বারা অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের যোগ্য হন নাই। কিন্তু অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও সখা ছিলেন বলিয়া ভগবৎ কৃপায় তাহার এ বিশ্বরূপ দর্শন হইয়াছিল। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া শরণাগত অর্জ্জুনের প্রার্থনায় তাঁহাকে এ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি প্রসন্ন হইয়া আত্মযোগে যে বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই, অর্জ্জুন বিনা পূর্ব্বে কেহ বেদযজ্ঞ অধ্যয়নাদি দ্বারা কখন এরূপ দেখিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ যে অনন্য-ভক্তিযোগে সাধনা করিলে এ বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকারী হওয়া যায়, পূর্ব্বে সে ভক্তিযোগ-সাধনা প্রবর্ত্তিত ছিল না।

অর্জ্জুন ভগবানকে সখারূপে পাইয়া তাঁহার প্রিয় ভক্ত হইয়াছিলেন, ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—'প্রিয়োঽসি মে' (ইতি ১৮।৬৫) তাই ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়া অর্জ্জুন তাঁহার নিকট পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এবং তাহা মননপূর্ব্বক সত্যসিদ্ধান্ত করিয়া বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। পূর্ব্বে অন্য কাহারও এ সৌভাগ্য হয় নাই। সে যাহা হউক, ভগবান এস্থলে অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, একের অনন্যভক্তি দ্বারাই এই বিশ্বরূপতত্ত্ব জানিতে, দেখিতে ও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারা সম্ভব হয়। প্রথম অনন্যভক্তি দ্বারা পরমাত্মা পরমেশ্বরের পরমতত্ত্ব পরম অধ্যাত্মস্বরূপ জানিতে হয়। সে জানার উপায় পরম গুরুর নিকট শ্রবণ ও শ্রবণান্তর মনন। তাহা বলিয়াছি। অর্জ্জুন কিরূপে ভগবানের শরণ লইয়াছেন এবং পরমগুরু পরমাত্মা ভগবান, তাহাকে এ পরম অধ্যাত্ম বচন শ্রবণ করাইয়াছেন, এবং অর্জ্জুনও তাহা কিরূপে মনন পূর্ব্বক সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু যে একান্ত অনন্যভক্তি দ্বারা সেই পরমাত্মা স্বরূপ, এই শ্রবণ মননপূর্ব্বক পরোক্ষ জ্ঞানলাভের পর দর্শন করিতে পারা যায় বা অপরোক্ষ জ্ঞান সিদ্ধি হয় ও এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া সেই ভাবযুক্ত হওয়া যায়, সেই ভাবে নিদিধ্যাসন দ্বারা ভাবিত হওয়া যায় ও শেষে সেই পরম ঐশ্বর ভাবে তত্ত্বতঃ প্রবেশ করা যায়,—সে অনন্যভক্তি অর্জ্জুনের ছিল না। ইহাই যে গীতার গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ, তাহা গীতাশেষে উপসংহারে আবার পুনরুক্ত হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন যে, নিষ্কাম, নিস্পৃহ ও অনুতবুদ্ধি হইয়া কর্ত্তব্য বোধে স্বধর্ম্ম পালন করিলে নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি লাভ হয়। তখন ধ্যানযোগে যুক্ত হইলে চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয় ও ব্রহ্মভূত হওয়া যায়।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥"
(গীতা ১৮।৫৪)

এইরূপ সাধনা দ্বারা যে পরাভক্তি লাভ হয়, তাহাই বিজ্ঞান সহিত পরম অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের মূল উপায়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা মামভি জানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"
(গীতা ১ ।৫৫)

অতএব এই পরা বা অনন্যভক্তি দ্বারাই পরমাত্মার স্বরূপ জানা যায়,·বা শ্রবণ ও মনন দ্বারা প্রথম পরোক্ষ ভাবে জানা যায়, তাহার পর অপরোক্ষ ভাবে তাহার দর্শন করা যায় বা তাহার 'অভিজ্ঞান' লাভ হয়। এইরূপে তত্ত্বতঃ পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিলে, তাঁহাতে প্রবেশ করা যায়। ইহাই গীতার সঙ্কলিতার্থ। সে যাহা হউক, অর্জ্জুন পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণ ও মননের অধিকারী হইলেও ভগবানের ঐশ্বররূপ দর্শনের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন না। ইহা আমরা আরও বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। অর্জ্জুন অবশ্য ভগবানের ভক্ত, ভগবানের প্রিয়, অর্জ্জুন মানুষের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ—আদর্শ মানুষ। তিনি নর ঋষির অবতার, বিশেষ সাধনসম্পত্তি-সম্পন্ন। তথাপি তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি মোহযুক্ত হইয়া সেই মোহ দূর করিবার জন্য যাহা শ্রেয়, তাহা শ্রবণের জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এইরূপে জিজ্ঞাসু হওয়ায় ভগবান অর্জ্জুনকে পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করাইয়াছেন, এবং অর্জ্জুনও, তাহা যে সত্য, তাহা মননপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছেন। এপর্য্যন্ত অর্জ্জুনের অধিকার আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু ভগবানের সেই ঐশ্বররূপ দর্শনে তাঁহার যে পূর্ণ অধিকার হইয়াছিল, ইহা বলিতে পারা যায় না। এবং তিনি যে সে পরম ঐশ্বররূপ জ্ঞাত হইয়াও তাহা দর্শন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তাহাতে তত্ত্বতঃ প্রবেশের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না।

ভগবান অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলে অর্জ্জুন তাঁহাকে বার বার প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন, সসম্ভ্রমে নিজ ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সে ভয়ঙ্কর বিরাটরূপ—সে প্রবৃদ্ধ কালরূপ অধিক দেখিতে পারিলেন না। সে রূপ সংবরণ পূর্ব্বক চতুর্ভুজরূপ দেখাইবার জন্য তিনি ভগবানকে প্রার্থনা করিলেন। তিনি ভগবানকে বলিলেন,—

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥"
(গীতা, ১১।৪৫—৪৬)

ভগবান্ তখন অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিলেন এবং সে বিশ্বমূর্ত্তি সংবরণপূর্ব্বক চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ ও পরে "মানুষীতনু আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহরূপ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান বলিলেন,—

"মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদং।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥"
(গীতা ১১।৪৯)

ভগবান্ আরও বলিলেন যে,—

"সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥"
(গীতা, ১১।৫২)

অতএব এই সুদুর্দ্দর্শরূপ দেখিবার প্রকৃত অধিকার অর্জ্জুনের ছিল না। যে পরাভক্তি লাভ করিলে এই পরম ঐশ্বররূপের অভিজ্ঞান হয় ও তাহার দর্শন যোগ্যতা লাভ হয়, সে পরাভক্তি তখনও অর্জ্জুনের লাভ হয় নাই, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। এজন্য ভগবান এই অধ্যায় শেষে অর্জ্জুনকে প্রকৃত অধিকারী হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান বলিয়াছেন,—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈর সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥"
(গীতা ১১।৫৫)

এবং অর্জ্জুনকে এই ভক্তিযোগ বার বার উপদেশ দিয়াছেন এবং গীতা শেষে সর্ব্ব গুহ্যতম পরম বচন বলিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামে বৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহস্মি মে ॥ (গীতা, ১৮।৬৫)

ইহা হইলে জানা যায় যে, অর্জ্জুন পরাভক্তি বা অনন্যভক্তি তখনও লাভ করিতে পারেন নাই. যে গীতোক্ত উপায়ে সাধনা করিয়া পরম ঐশ্বররূপ দর্শনের উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারা যায়, সে সাধনা অর্জ্জুনের তখনও ছিল না। এজন্য তিনি সঙ্কোচের সহিত ভগবানের নিকট এই বিশ্বরূপ দেখিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—

"মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥"
(গীতা, ১১।৪)

অর্জ্জুন ভগবান্‌কে আপনার সখা—বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপেই জানিতেন। তাঁহার পরমস্বরূপ. তাহার পরমাত্মা পরমেশ্বর স্বরূপ জানিতেন না। এজন্য অর্জ্জুনের এ সখ্যভাবে সাধনায় পরমেশ্বরের পরাভক্তি লাভ হয় নাই। তিনি ভগবানকে পরমেশ্বর পুরুষোত্তমরূপে পূর্ব্বে জানিতেন না। তাহা যে গীতা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজ সখাকে পরমজ্ঞানী জানিয়া তাঁহার নিকট যাহা কর্ত্তব্য, যাহা শ্রেয়, তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র। তাই ভগবান তাঁহাকে শ্রেয় লাভের জন্য, কর্ম্মপথ দেখাইবার জন্য প্রথমে আত্মজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার পর অর্জ্জুনের প্রতি অনুকম্পা করিয়া তাঁহাকে পরম অধ্যাত্ম বচন, তাঁহার পরমাত্মস্বরূপ বলিয়াছিলেন। সেই পরম অধ্যাত্ম বচন শ্রবণ ও মনন করিয়া অর্জ্জুনের মোহ দূর হইয়াছিল, তাঁহার পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তিনি তাঁহার সখা শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন।

যে অনন্যভক্তিযোগে পরমেশ্বরকে সাধনা করিলে এই পরমেশ্বর তত্ত্ব-জ্ঞান অন্তরে স্ফূর্ত্তি হয়, সে অনন্য একান্ত পরমেশ্বর-ভক্তি তখনও অর্জ্জুনের লাভ হয় নাই। এজন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশেষ ভাবে এই ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন এবং এই ভক্তিযোগে সাধনায় যেরূপ পরম

অধ্যাত্ম তত্ত্ব-জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ হয়, তাহা বিবৃত করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন শিষ্যরূপে শ্রেয় লাভের জন্য ভগবানের প্রপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া অর্জ্জুন এই পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু যে পরাভক্তি দ্বারা তত্ত্বতঃ পরমেশ্বরের ভক্তিজ্ঞান লাভ হয়, তাঁহার ঐশ্বররূপ দর্শন হয় ও তাহাতে প্রবেশ করা যায়, সে পরাভক্তি অর্জ্জুনের তখনও লাভ হয় নাই। তখনও অর্জ্জুনের যোগদৃষ্টি উন্মুক্ত হয় নাই। এজন্য তিনি বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকারী ছিলেন না। ভগবানের অনুকম্পায় যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করিলেও অর্জ্জুন অনেকক্ষণ তাহা দেখিতে পারেন নাই, এবং সে রূপ সংবরণ করিবার জন্য ভগবানকে ভীত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

যে ভক্তি সহকারে যোগ সাধনায় দিব্যদৃষ্টি বা যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া এ বিশ্বরূপ দর্শনের সামর্থ্য হয়, সে দিব্যদৃষ্টি অর্জ্জুনের ছিল না। এইজন্য অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে ভগবান বলিলেন,—

ন তু মাং শক্য সে দ্রষ্টুং অনেনৈব স্বচক্ষুষাং।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥
(গীতা ১১।৮)

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

সঙ্কলিকা।

(৪৭)

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বি-এ।

জন্ম—মসূয়া, ময়মনসিংহ, ২৮শে বৈশাখ, ১২৬৯ সাল।

মৃত্যু—গড়পার রোড, ৪ঠা পৌষ, সোমবার, প্রত্যুষে।

রাজসাহী ও ময়মনসিংহ ধনগৌরবে সর্ব্বজন-সম্মানিত। ময়মনসিহের ধন-গৌরবের উপরে বিদ্যা, হৃদয় এবং প্রতিভা গৌরবে বঙ্গ গৌরবান্বিত। যে দেশে ঋষিকল্প চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের এবং আনন্দমোহন বসুর অভ্যুত্থান হইয়াছিল, সে দেশ তুচ্ছ দেশ নহে, সে দেশ সর্ব্বজন-পূজ্য। ময়মনসিংহের উদ্দেশে প্রবন্ধারম্ভে কোটী কোটী প্রণাম করিতেছি।

এই ময়মনসিংহের অধীন মসূয়া গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ রায় বংশে কামদারঞ্জন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে তাঁহার খুল্লতাত ময়মনসিংহের সেই সময়ের প্রসিদ্ধ উকীল হরিকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের দত্তকরূপে গৃহীত হইয়া কামদারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নাম গ্রহণ করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী তাঁহার গুণধর পুত্র নিম্নলিখিত সুমধুর কথায় নিবদ্ধ করিয়াছেন—

“ময়মনসিংহ-জেলা-স্কুলে থাকিতেই তাহার আর্টের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং স্কুলপাঠ্য বিষয়ে উদাসীন হন। ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন।

প্রায় ২৯ বৎসর পর্য্যন্ত নিজে নিজেই চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে Art school-এর Principal Jobbins সাহেবের কাছে কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন। শিল্প-সাহিত্য ও

শিশুদিগের আনন্দবিধান বিষয়ে তাঁহার বহুকালের উৎসাহ ছিল। Halftone শিক্ষারম্ভ। ছেলেদের রামায়ণ লিখিবার সময় ছবির উড্‌কাট্‌ করাইতে গিয়া বিশেষ অসুবিধা হয়। ফলে নিজেই ফটোএন্‌গ্রেভিং শিখিতে সঙ্কল্প করেন। এই বিষয়ে কেবল যে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নয়। তাঁহার মৌলিক গবেষণা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ইউরোপে ও আমেরিকায় খ্যাতিলাভ করিয়াছে। হাফ্‌টোনের মূল তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তসকল বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসারে এখনও ইউরোপ ও আমেরিকায় কাজ চলিয়া থাকে। তাঁহার লেখনীপ্রসূত অনেক প্রবন্ধ আমেরিকা ও বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প পত্রিকাদিতে স্থানপ্রাপ্ত ও প্রশংসিত হইয়াছে। তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রাদি বিলাতে টেক্‌নিকাল স্কুলে স্থান পাইয়াছে এবং শিক্ষার্থীগণ তাঁহার লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে উপদিষ্ট হয়। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি প্রবন্ধাকারে (তাঁহার অগ্রজ অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় মহাশয়ের উপদেশানুসারে) ইলিয়ট প্রাইজের জন্য প্রেরিত হয়। পরীক্ষক মহাশয় কাগজখানা সরাসরি ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে পেড্‌লার সাহেব কর্ত্তৃক সার্ভে আফিসের বড় সাহেবের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হওয়ায়, তিনি পাঠ করিয়া এতদূর আনন্দিত হ'ন যে, তিনি রচয়িতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সন্তোষ জ্ঞাপন করেন ও এই প্রবন্ধ বিলাতের রয়াল ফটোগ্রাফীক্‌ সোসাইটিতে পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। পরে সেই প্রবন্ধই ক্রমে ক্রমে বিলাতের শ্রেষ্ঠ পত্রিকাদিতে সমাদরের আসন লাভ করিয়া গৌরব অর্জ্জন করে। হতভাগার দেশে তাহা বিবেচনার যোগ্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই।"

উপেন্দ্রকিশোর শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম এবং ৺শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়দিগের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরক্ত হন। কলিকাতায় আসার পর ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্য রূপে যোগদান করেন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ভাল পরিবারের কোন সুশিক্ষিত মহিলার সহিত বিবাহিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্বপক্ষের কন্যা শ্রীমতী বিধুমুখীকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। বিবাহের সময় হইতে তাঁহার জীবন অপূর্ব্বসাজে সজ্জিত হইয়া সংসার-রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইল। এই সময় হইতে তাঁহার প্রতিভা যেন ষোলকলা বিস্তার করিয়া সকলকে চমকিত করিল। যে ক্ষণকালও তাঁহাকে দেখিয়াছে, সে-ই মোহিত হইয়াছে।

কলাবিদ্যা যেন তদীয় জীবনের সহজাত, সেই বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি আজীবন কঠোর সাধনা করিয়া গিয়াছেন। অর্থ, শরীর, মন পূর্ণভাবে ইহার জন্য উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য গান বাজনা শিক্ষা করেন নাই। দেশে আবহমানকাল-প্রচলিত সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা দেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি শিখিতেন, এবং আজীবন শিখাইতেন। শিক্ষার অনুরাগে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, চিরদিন তাহাতে তিনি জগতে অমর হইয়া থাকিবেন। এখন প্রোসেস-ব্লক যে চতুর্দ্দিকে প্রচলিত

হইয়াছে, উহার প্রবর্ত্তক উপেন্দ্রকিশোর। উপেন্দ্রকিশোরের নাম এদেশে এবং বঙ্গদেশে অক্ষয় হইবে।

চিরদিনই তাঁহার প্রকৃতি শিশুর ন্যায় সরল ও পবিত্র ছিল। শিশুদিগের উন্নতির জন্যই যেন তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। ৺প্রমদাচরণের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার "ছোট্ট রামায়ণ", "ছেলেদের রামায়ণ"."ছেলেদের মহাভারত", "টুনটুনির গল্প" প্রভৃতি পুস্তক এবং মাসিক পত্র "সন্দেশ" ছেলেদের সুশিক্ষার জন্যই রচিত ও সম্পাদিত। ছেলেদের উপযোগী গল্প রচনা করিতে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার ভূতের গল্প এবং রামায়ণ মহাভারতের কাল্পনিক ছবির আমরা কখনও পক্ষপাতী ছিলাম না, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ ভাষা-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সর্ব্বদাই আমরা মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার পরিবারের ছেলে-মেয়েদিগকে তিনি এমন ভাবে সুশিক্ষিত করিয়া গিয়াছেন যে, উপেন্দ্রকিশোরের পরিবার যে আদর্শ পরিবার, একথা বলিতে আমাদের সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। শিশুদিগের শিক্ষার জন্যই যেন তিনি জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাদের গান শিক্ষার জন্য বহুদিন ক্লাস করিয়াছিলেন, তাহাদের শিক্ষার জন্যই ছবির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের শিক্ষার জন্য সুমধুর সরল মৌলিক সাহিত্য প্রচার করিয়াছিলেন। সে সব গ্রন্থ শিক্ষাবিভাগের নিকটও আদৃত হইয়াছে এবং প্রাইজ-তালিকা-ভুক্ত হইয়াছে। যে মাধুর্য্য তাঁহার স্বভাবসুলভ ছিল, তাহা তাঁহার সাহিত্যে অনুস্যূত হইয়াছিল। তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানি তিনি যেন ছেলেদের উন্নতির জন্য ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফলও প্রচুরপরিমাণে ফলিয়াছে। তাহার প্রমাণ তাঁহার পরিবার, তাহার তুলনা তাঁহার পরিবার ও তাঁহার যোগ্য পুত্র কন্যাগণ। সব যেন প্রকৃতির নির্ম্মল ছবি। মনে হয় যেন স্বর্গ হইতে নির্ম্মল চিত্র জগতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। শিশুশিক্ষার দ্বারা তিনি অমরত্ব লাভের যোগ্য হইয়াছেন।

তাঁহার আচার ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায়, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনে, লেখা পড়ায় যেন অমিয়া ঝরিত! তিনি যেন অজাত শত্রু ছিলেন। কখনও তাঁহাকে পরনিন্দা করিতে শুনি নাই অন্যের উন্নতিতে কাতর হইতে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। তাঁহার কথায় যেন মধু ঝরিত ব্যবহারে যেন বিনয় খেলিত, ভ্রমণে যেন চতুর্দ্দিকে সুধা বর্ষিত হইত। এরূপ নিষ্কাম জীবন আমাদের আদর্শ না হইয়া পারে না। তিনি প্রকট জীবনে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, আহা আমাদের নিত্য স্মারক হইয়া রহিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য

তিনি যোগী নন্, কিন্তু তিনি ভোগী হইয়াও নির্লিপ্তের অচ্যুতপদ লাভ করিয়াছিলেন; তিনি সন্ন্যাসী নহেন, কিন্তু তিনি গৃহী হইয়াও নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন; তিনি আচার্য্য নহেন, কিন্তু তিনি শিষ্য হইয়াও কত হৃদয়ে গুরুর ন্যায় ভক্তিতে সম্পূজিত হইতেছেন; তিনি বক্তা বা উপদেষ্টা নহেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি-সুলভ মহত্ত্বে তিনি সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন; তিনি ধনী নহেন, কিন্তু অভাব-পীড়িতকে সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁহার মতের দৃঢ়তা ছিল, কিন্তু তিনি দলাদলি মোটেই ভালবাসিতেন না।

তিনি নিষ্পাপ, নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত, নিষ্কাম, পর উপকারী কৃতীপুরুষ ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে শুধু ময়মনসিংহ নহে, সমগ্র বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। এরূপ আদর্শ-জীবন যাপনে সুখ, স্মরণে আনন্দ, মননে তৃপ্তি, সম্ভোগে বৈকুণ্ঠলাভ। বলিব কি? এরূপ জীবনের সংস্পর্শ লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

(৯৮)

নববিধান-বিশ্বাসি-সমিতির দশম অধিঅধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় মহাশয় গভীর চিন্তাপূর্ণ "আত্ম-নিবেদন" করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে সকলের চৈতন্যোদয় হইবে। ব্রাহ্মসমাজের বদ্ধমূল অহঙ্কার এবং একদেশদর্শিতার উহা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উহা পাঠ করিয়া আমরা বক্তার উদ্দেশে বারম্বার প্রণাম করিয়াছি। বহু সার কথার বিবৃতির পর এই কয়েকটী কথাও তাহাতে বিবৃত হইয়াছে। আত্মনিবেদন ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৩২২) ধর্ম্মতত্ত্বে মুদ্রিত হইয়াছে। কয়েকটী স্থলের একটু একটু তুলিয়া দিলাম,—

"যদি বলি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে গিয়াছিলাম, অনেকের কাছে বিরাগভাজন হই। তাঁদের কাছে আমি কাফের।"

"কিন্তু যখন দেখি, আমাদের নিজেদের লোকেরাও তাঁকে (কেশবচন্দ্রকে) অপমান করতে ছাড়েন না, তখন নিতান্তই ক্ষুব্ধ হই। তিনি বন্ধু, তিনি নেতা, তিনি আচার্য্য। তিনি কি, কি নহেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে গিয়াছেন। তিনি আমাদের শিক্ষক (leader) নন্, তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক (guide) নন্, একথা বারবার বলে গেলেন। যে সব তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, তিনি আজ উপস্থিত থাক্‌লে সে সব কথা কখনই বল্‌তে দিতেন না, তাহাই আমরা বল্‌ছি। পরলোকে বিশ্বাস কি চলে গেছে? কেশবচন্দ্র কি আর উপস্থিত নাই? যদি থাকেন, তবে কেমন করে আমরা এমন গান গাই, এমন প্রার্থনা করি, যাহা তাঁকে নিশ্চয়ই মর্ম্মবেদনা দেয়? * * কেহ কেহ বলেন যে, প্রার্থনা পাঠে উপাসনার সাহায্য হয়। কেহ কেহ বলেন, তাহা না হলে উপাসনা পূর্ণ হয় না। কিন্তু কই, একদিন ত সাধু অঘোরনাথের, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের, কি ভক্ত প্রতাপচন্দ্রের-প্রার্থনা পাঠ শুনি না?"

"ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়াদের কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারি না। যখন আরাধনায় ঈশ্বরকে উপলক্ষ রেখে শুধু বক্তৃতা হয়, তখন মনে মনে তীব্র আলোচনা উপস্থিত হয়। উপদেশের সময় অনেক সময় অতি পুরাতন কথা যখন অতি পুরাতন ভাবে বলা হয়, তখন মন অস্থির হয়।" * * আমাদের সামাজিক জীবনেরও দু একটী কথা বলি। ইহাও বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়াছে। ছোটরা বড়দের ভক্তি সম্মান ভুলে যাচ্ছে। আমরা কেহ কেহ মদ খাই অনেকে চুরুট খাই। ব্রাহ্ম যে সত্যবাদী, সে কথা আর কেহ বলে না।"

গতবারে তত্ত্ববোধিনীর কথা তুলিয়াছি, এবার ধর্ম্মতত্ত্বের কথা তুলিলাম সেদিন আমাদের একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মবন্ধু, (যিনি এক সময়ে লাট সভার সদস্য ছিলেন,) বলিতেছিলেন, "ব্রাহ্মসমাজ দ্বার বন্ধ করিয়াছেন, আর কাহাকেও সেখানে প্রবেশ করিতে দিবেন না। "প্রেম প্রেম" করিয়া বক্তা

চক্ষের জল ফেলেন, আচার্য্য উপদেশ দেন, কিন্তু যে উপায়ে প্রেম সাধন হয়, তাহা কেহই অবলম্বন করেন না সকলকে দূর করিয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে কদর্য্য ছবি প্রকটিত করিতেছেন, তাহা আর লেখা যায় না ।”

আরাধনা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের সকল পত্রিকাতেই আলোচনা হইতেছে। ১লা অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদীতেও আলোচনা হইয়াছে। তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক যে সব কথা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা পড়িলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। তিনি কখনও আরাধনা সাধন করিয়াছেন, উহা পাঠ করিলে তাহা মনে হয় না। অথচ এই শ্রেণীর লোকই "আচার্য্য" শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন। ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর অনেক যুবক এখন আচার্য্য হইতেছেন, তাঁহারা যে সাধনার কোন ধার ধারেন, তাহা মনে হয় না। অথচ তাঁহারাই নানা উপদেশ দেন। সে সব উপদেশ আধ্যাত্মিক ব্যাপার সম্বন্ধে সংসার সম্বন্ধে কোন কথাই থাকে না। সে উপদেশ না শুনিলে তাঁহারা তিরস্কার করিতেও ছাড়েন না। দলের গণ্ডীর বাহিরে গেলেই তিরস্কার পাইতে হয়। অথচ দলে থাকিলে অহঙ্কারের তাপ সহ্য করিয়া দলে তিষ্ঠিতে পারা সহজ নয়। যার যা ইচ্ছা তাহা করিবে, প্রতিবাদ করিলেই চটিয়া লাল হন। এই অবস্থা দিন দিনই জাগিয়া উঠিতেছে। সুবোধচন্দ্রের প্রতি নববিধানের সম্মিলনের-সভাপতি মহাশয় যে মিষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বরিশাল সম্মিলনের সভাপতি দোষ উল্লেখকারীর প্রতি সে সম্মান দেখাইতে পারেন নাই। সম্মিলনগুলি কি শেষে আত্মপ্রশংসার জয় গানের স্থান হইবে? সেরূপ সম্মিলনের কোন প্রয়োজন নাই। এখনও সংশোধনের সময় আছে, আত্মদোষ স্মরণ ভিন্ন জীবাত্মার উন্নতির অন্য উপায় নাই। এই ত মাঘোৎসব আসিতেছে, এই সময়ে আত্মদোষ স্মরণের জন্য একদিনও কি নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না?

থাকা সম্ভব নয়। বরিশাল কনফারেন্সে কোন বন্ধু দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া সভাপতির আক্রমণ সহ্য করিয়াছিলেন। তিনিও "প্রেম প্রেম" করিয়া অশ্রু ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেম-সাধনের মূলে, ব্যবহারিক জীবনে, তাঁহার যে অর্গল বদ্ধ করিয়াছেন, এরূপ বাহিরের লোক কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। তাঁহার জ্ঞানে মানে সম্পূজিত, কিন্তু প্রেমের কথা, ধর্ম্মের কথা, নিষ্কাম ব্রতের কথা না বলিলেই ভাল হয়। ব্রাহ্মসমাজে আর লোক না থাকে সভাপতিত্ব বন্ধ করিয়া দিলেও মন্দ হয় না। ধর্ম্ম, চরিত্র, ভক্তি, বিশ্বাস, নিষ্ঠা-সাধন ভজন-অপটু লোকদিগকে এক কোণে স্থান দেওয়াই ভাল। তাহা দিতেছেন না বলিয়া এমন যে সব কলঙ্ক প্রবেশ করিতেছে, তাহা সহস্রবার অশ্রুপতনেও বিধৌত হইবে না!

তাঁহারা বলেন, আমরা কত বড় হইয়াছি, তাহা কি বুঝিতেছ না? আমাদের সত্যপ্রসন্ন, আমাদের জগদীশচন্দ্র, আমাদের ব্রজেন্দ্রকুমার, আমাদের এস, আর, দাস, আমাদের সি, আর দাস, কত কত রথী মহারথী আছেন? আছেন ত বটেই,—তাহা ত জানিই; কিন্তু তাঁহারা কি কখনও সমাজমন্দিরে আসেন? ধনে মানে জ্ঞানে গৌরবান্বিত অনেক ব্যক্তি আছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত রিপুজয়ী স্বার্থত্যাগী ধার্ম্মিক

কতজন আছেন, তোমরা ভাবিয়া থাক কি ? প্রকৃত ধার্ম্মিক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই গিয়াছেন, এখন ভাঙ্গা হাটে পেচকের নৃত্য হইতেছে. তাহা তোমরা দেখিতেছ না কি ? কোন্ অপরাধে শাস্ত্রী মহাশয়কে ৫ বৎসরের জন্য সভাপতিত্ব দিলে না ? কোন্ অপরাধে নগেন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রকুমার, ধর্ম্মদাস, ভুবনমোহন, শশীপদ. পরেশনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, কালীনারায়ণ, আদিনাথ প্রভৃতি সভাপতিত্ব পান নাই ? আদিনাথ ইংরাজী জানেন না, কিন্তু নবদ্বীপচন্দ্র ও মহলানবীশ মহাশয়ও ত ইংরাজী জানিতেন না ? দলাদলি-প্রিয় সিদ্ধিহীন লোকের নেতৃত্বে সমাজের কলঙ্ক দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। তাঁহারা গণ্ডীর বাহিরের লোক নিতে চাহেন না। কেবল গণ্ডী, কেবল গণ্ডী চতুর্দ্দিকে ! তাঁহারা অহঙ্কারে দিগ্বিদিক দেখেন না ! একে একে মফঃস্বলের সমাজ সকলের যে চরম হীনা উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারা তাহা দেখিয়াও দেখেন না। সব যায় যে, এখনও সতর্ক হইবে না ?

(৪৮)

নানা বিভাগের বহু বাঙ্গালীর কৃতিত্বে বঙ্গের গৌরব চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়াছে; তাঁহাদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৩১ বৎসরের অদম্য সাধনার পর গবর্ণমেণ্ট জগদীশচন্দ্রের প্রতি দয়াপরবশ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। উভয়ই ঋষি-প্রতিম চরিত্রের অধিকারী,—মহা সন্ন্যাসীর ন্যায় সাধনা-নিরত হইয়া আছেন। প্রফুল্লচন্দ্র আজও উপেক্ষিত হইতেছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত। তাঁহার ন্যায় পরোপকারী ব্যক্তি এদেশে অল্প অধিক নাই। তাঁহারা তৃণের ন্যায় দীন ও বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া দিবারাত্রি খাটিতেছেন। গৌরব বাড়িয়াছে ত আরো বাড়ুক, তাঁহাদের সাধনা-পূত কীর্ত্তিরাশি অক্ষয় হউক।

(৪৯)

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে মহারাণী সুনীতি দেবীর "কথকতা" সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজের নব-প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত মহিলা-নিবাসে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে আমরা তাহা শুনিতে অধিকার পাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে, "কথকতা" শুনিয়া আমরা যার-পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। সুললিত সরলভাষা ও সুমিষ্ট বিবৃতি বলে বুদ্ধদেব যেন আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উপখ্যান-অংশে মহারাণীর স্বামী-বিয়োগের কথা যেন হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল; তাঁহার জীবনাভিব্যক্তি ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল,—মনে হইতেছিল, তাঁহার নিজের কাহিনীই বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার প্রশান্ত, স্থির ও গম্ভীর মূর্ত্তি তাঁহার পিতৃদেবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল; দুই ঘণ্টাধিককাল অক্লান্তভাবে অনর্গল বলিয়া যাইতেছিলেন। সে ত "কথকতা" নয়, তাহা যেন বক্তৃতা,—মধুর হইতেও মধুর; অতি সুমধুর। উহার নাম "কথকতা" না রাখিলেই ভাল হয়, আরো ভাল হয়, মধ্যে মধ্যে অভাবুক জনের সঙ্গীত না হইলে। সুনীতিদেবী পিতার কীর্ত্তি বাড়াইতে পারিবেন, আমাদের আশা হইয়াছে। তাঁহার জীবন আমাদের আদর্শ হউক। মায়ের আশীর্ব্বাদ তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হউক।

(৫০)

সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্গের হিতসাধন-

মণ্ডলী, নার্সিং ব্রাদারহুড় এবং রামকৃষ্ণ-মিশন এবার দুর্ভিক্ষের সাহায্য করিয়া অসাধ্য সাধন করিতেছেন। নার্সিং ব্রাদার হুড় বাঙ্গালী নাম পরিত্যাগ করিলেন কেন, বুঝি না। ব্রাহ্মওয়ার্কাস সেলটার নাম কালে "সাধনাশ্রমে" পরিণত হইয়াছে, "নার্সিং ব্রাদারহুড়" কি বাঙ্গালা নাম গ্রহণ করিবেন না? বাঙ্গালার প্রতি এত ঘৃণা ভাল নয়। প্রথমতঃ ত্রিপুরায়, শেষে বাঁকুড়ায় ইঁহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সেবা দ্বারা বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। ইহার ন্যায় পবিত্র কাজ আর নাই। রামকৃষ্ণ-মিশন যেরূপ হিসাব প্রকাশ করিতেছেন, অন্যান্য সকলেরও সেইরূপ হিসাব দেওয়া কর্ত্তব্য। কেহ যেন কোন কথা বলিতে না পারে। গবর্ণমেণ্টও এবার যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা সকলের চরণে অর্পণ করিতেছি।

(৫১)

৺যতীন্দ্রনারায়ণ রায়—জন্ম—১৮১০ শকাব্দ ২৩শে আষাঢ়, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

মৃত্যু—১৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩২২।

বহু পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, এদেশে যখন ধর্ম্মের বিশেষ আন্দোলন উঠিয়াছিল, তখন জয়নগর-মজিলপুরের চারিটী যুবকের মধ্যে সেই আন্দোলনের ফল বিশেষভাবে ফলিয়াছিল। চারিজন যেন একহৃদয়, এক-প্রাণ, এক-আত্মা। ডিরোজিওর পুণ্যকীর্ত্তি যখন রামতনুকে জাগাইয়াছে, রিচার্ডসনের শিক্ষা যখন রাজনারায়ণকে উত্থিত করিয়াছে, মহর্ষি যখন রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুপ্রাণনে দেবোপম মূর্ত্তিতে প্রকাশমান, তখন কেশব-প্রতাপের মহীয়সী শক্তির প্রতাপে নববঙ্গ মাতোয়ারা। অন্যদিকে দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ তখন তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তখন হরিনাভিতে শিবনাথ ও উমেশচন্দ্র, মজিলপুরে কালীনাথ ও হরনাথ সাধনার পুণ্যপথে অগ্রসর। সকল কথা বিবৃত করিবার স্থান ইহা নয়। এই চারি জনের সাধনী-বলে এক সময়ে বঙ্গ যেন প্রকম্পিত হইয়াছিল। কালে এই চারি জনের সহিত দুর্গামোহন, দ্বারকানাথ এবং শিবচন্দ্র যুক্ত হইয়াছিল। এই সপ্তরথী কেশব-অভিমন্যুর তিরোধানের যে কারণ নন্, তাহা কে বলিবে? ঐ চারি জনের তপস্যার-বলে এদেশে একটী দেবদ্যুতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাহার নাম হেমলতা। পুণ্য-পূত হেমলতার রূপে গুণে সকলে মোহিত। তিনি আজিও জীবিতা, সুতরাং তাঁহার কথা অধিক লিখিতে চাই না। কালে চারি বন্ধু মিলিয়া কালীনারায়ণের সহিত হেমলতার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই বিবাহের ফলে সে সকল রত্নের অভ্যুদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে যতীন্দ্রনারায়ণ অন্যতম। যতীন্দ্রনারায়ণের নির্ম্মল চরিত্র সর্ব্বদাই স্মরণ করাইয়া দিত, চারি বন্ধুর তপস্যার ফলে এই রত্ন উদ্ভূত হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। আমরা আশা করিতেছিলাম, পুণ্যপূত যতীন্দ্রনারায়ণের জীবন আমাদের আদর্শ হইবে। কিন্তু চরিত্র-ফুল ফুটিতে না ফুটিতে যতীন্দ্রনারায়ণ হঠাৎ সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে মহা হাহাকার উঠিয়াছে।

স্বামীর শবের পার্শ্বে সতীর আর্ত্তনাদ আমরা পূর্ণ তিন ঘণ্টা শুনিয়াছিলাম। সে ত আর্ত্তনাদ নয়, যেন অলিখিত একখানি কাব্য। এমন পাষাণ-হৃদয় লোক সেখানে ছিল না, যাহার হৃদয় বিগলিত হয় নাই।

যতীন্দ্রনারায়ণের একটী শিশুপুত্র আছে। যতীন্দ্রনারায়ণের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র শিশু ও পত্নীতে সংক্রামিত হউক। এইরূপে বন্ধু-চতুষ্টয়ের মহা তপস্যার ফল ফলুক। এই অকস্মাৎ বিপদে দুটী পরিবারের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এমন নিষ্কলঙ্ক যুবকের তিরোধানে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। বিধাতা শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন কথা।

আর্য্যসমাজ ও পরাবিদ্যা-সমিতি—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাহা হউক, ইহা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, 'আর্য্যসমাজ' ভারতবর্ষীয় শত শত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় একটী সম্প্রদায় মাত্র। সম্প্রদায়গত মতের পোষণ ও প্রচারই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পর্য্যন্ত থাকিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু উহার প্রচার-প্রণালী সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি আছে। আপত্তি হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ দয়ানন্দ স্বামীকৃত পূর্ব্বোক্ত 'সত্যার্থ-প্রকাশ' গ্রন্থে অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের উপর স্থানে স্থানে অযথা আক্রমণ আছে। আর্য্যসমাজ-স্থাপয়িতার বেদার্থ প্রচাররূপ উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। নানা সম্প্রদায়ভুক্ত সনাতন ধর্ম্মপন্থীগণ চিরদিনই বেদকে অভ্রান্ত, অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। তিনিও বেদকে তদ্রূপ মান্য করেন। কিন্তু তিনি সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পন্থা মিথ্যা জ্ঞানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকৃত ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বমান্য সায়নাদি পূর্ব্বতন আচার্য্যগণকেও তাঁহার হস্তে লাঞ্ছিত ও বিকৃতাঙ্গ হইতে হইয়াছে, আধুনিক দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যাখ্যাতাগণের ত কথাই নাই। ইঁহাদের সকলকেই তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।* কাজেই কলহ অনিবার্য্য, সমাজ-বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার অভিনব বেদ-ব্যাখ্যার প্রণালী ও প্রচারই তজ্জন্য দায়ী। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে যাহা সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাই নির্ভীক ও অকপট চিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অসংযত আক্রমণ প্রণালীর অনুসরণে পর-মতের প্রতি সহিষ্ণুতার অভাব প্রযুক্ত তিনি সময়ে সময়ে অনেক পূজনীয় মহাত্মার প্রতিও কপটতা ও অজ্ঞানতার আরোপ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তিনি মহাত্মা গুরু নানক সম্বন্ধে তাঁহার 'আশায় উত্তম ছিল' স্বীকার করিয়াও লিখিয়াছেন,—

"সমস্ত কিছুই নিত্য ছিল না।...বেদাদি

---

* "ন চাত্র কিঞ্চিৎপ্রমাণং নবীনং খণ্ডনীয়া ইতি (প্রশ্নঃ) কিমনেন ফলং ভবিষ্যতীতি। (উঃ) যানি রাবণ-উবট-সায়ণ-মহিধরাদিভির্বেদার্থ বিরুদ্ধানি ভাষ্যানি কৃতানি, যানি চৈতদনুসারেণ ইংলণ্ড-জারমণ্য দেশোৎপন্নৈর্য়ুরোপ দেশ নিবাসিভিঃ স্বদেশ ভাষায়া স্বল্পানি ব্যাখ্যানানি কৃতানি, তথৈবার্য্যাবর্ত্তদেশস্থৈ কৈশ্চিত্তদনুসারেণ প্রাকৃত ভাষায়া ব্যাখ্যানানি কৃতানি বা ক্রিয়ন্তে চ সর্ব্বাণি অনর্থ গর্ভাণি সন্তি ইতি।" স্বামী দয়ানন্দকৃত 'বেদভাষ্য ভূমিকা পৃঃ ৩৪১

শাস্ত্র ও সংস্কৃত কিছুই জানিতেন না। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, সংস্কৃততেও আমি ক্ষমতা দেখাইব। পরন্তু সংস্কৃত অধ্যয়ন ব্যতিরেকে উহা কিরূপে হইতে পারিবে? তবে উক্ত গ্রামবাসীদিগের যাহারা কখনও সংস্কৃত শুনে নাই, তাহাদের নিকট সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়া সংস্কৃতেও পণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনার মান, প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি-ইচ্ছা ব্যতিরেকে এরূপ কখন হইতে পারে না। অবশ্যই তাঁহার স্বীয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল। যখন কিছু অভিমান ছিল, তখন মান ও প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু দম্ভও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার গ্রন্থে যে সে স্থলে বেদের নিন্দা এবং স্তুতিও আছে। পরন্তু যে চারি বেদকে অলীক গল্প বলে, তাহার সকল কথাই মিথ্যা।" ইত্যাদি।

গুরু নানক এক স্থানে বেদের উপরেও সাধুকে স্থান দিয়াছেন,—'সাধু কি মহিমা বেদ না জানে।' ইহাতে স্বামী দয়ানন্দ বলিতেছেন,—"মূর্খের নাম যখন সাধু, তখন সেই হতভাগ্য বেদের মহিমা কিছুই জানিতে পারে না।" কিন্তু আক্ষরিক বেদ পাঠ না করিলেই কেহ জ্ঞানী, ধর্ম্মাত্মা বা সাধুপদবাচ্য হইতে পারে না, এই ব্রহ্মানুভূতির দেশেও এ কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন, ইহাই আশ্চর্য্য। বস্তুতঃ তাহা হইলে ভারতভূমি যাহাদের পদরজে পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের অনেককেই মূর্খ ও অসাধুদলভুক্ত করিতে হয়। বৈদিক ক্রিয়া ভিন্ন মুক্তি নাই, এই মতাবলম্বী এক শ্রেণীর বেদবাদরত পণ্ডিতদিগকে ভগবান গীতাতে [illegible] 'অবিপশ্চিত'—অর্থাৎ মূঢ় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবং ব্রহ্মজ্ঞের নিকট বেদের প্রয়োজন নাই;—ইহাও ভগবৎ সিদ্ধান্ত বলিয়া অবধারিত।* আর কেবল বেদাধ্যয়ন করিলেই যে জ্ঞানী হয় না তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। নীতি-শাস্ত্রকারের একথা অনেকেই জানেন, —'নচাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।' অর্থাৎ স্বাভাবিক দুরাত্মাদিগের বেদাধ্যয়নেও কোন ফল হয় না, সর্প দুগ্ধ পান করিয়াও বিষোদ্গার করিয়া থাকে।

এইরূপ অনেক মহাত্মাকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা এবং তাঁহাদের প্রতি শ্লেষ ও ব্যক্তিগত আক্রমণ দৃষ্ট হয়। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাজনিত ঈদৃশ অসহানুভূতি ও অসহিষ্ণুতা পরাবিদ্যা-সমিতি অনুমোদন করেন না। বোধ হয়, ইহা শিষ্টানুমোদিতও নহে। এতদবস্থায় উভয় সমিতির সংযোগ সম্ভবপর নহে, পরাবিদ্যা-সমিতির পরিচালকগণ ইহা বুঝিবা মাত্র প্রতিবিধানে যত্নবান হইলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে সাহারানপুরে স্বামী দয়ানন্দের সহিত ইঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎকালে কথোপকথন প্রসঙ্গে (অবশ্য দ্বিভাষীর সাহায্যে) নির্ব্বাণ, মোক্ষ ও ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে উভয় পক্ষের ঐকমত্যের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইঁহারা ব্যক্তিগত ঈশ্বর (Personal God) স্বীকার করেন না, কিন্তু বৈদান্তিক পরব্রহ্মে বিশ্বাসবান, ইহা স্বামীজিকে বলা হইলে তিনিও এই মতাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করেন। তৎপর পরাবিদ্যা-সমিতির নূতন নিয়মাবলী

---

* যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ গীতা।

তবে কৃষ্ণোক্তি স্বামী দয়ানন্দের নিকট আদরণীয় ছিল কি না, নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। কারণ তাঁহার "গ্রাহ্য" শাস্ত্র-তালিকার মধ্যে গীতার নাম নাই।

তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হইল। তিনি ঐ সমিতি সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রতিনিধি স্বরূপে অলকটাকে লিখিত পত্র দ্বারা অর্পণ করিলেন, এবং হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, পারসিক প্রভৃতি জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। অলকট বলেন, স্বামীজি শেষে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইহা সত্য, কিন্তু তিনি প্রথমে উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ। বস্তুতঃ তিনি এতদূর অগ্রসর হইয়া শেষে কিরূপে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। বোধ হয়, ইহা বিশেষ একটা সম্প্রদায় গঠনের আবশ্যকতার ফল। এক জন বিদ্বান সন্ন্যাসীও সাম্প্রদায়িক সংক্রামকতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না! তারপর ইহার যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহাও দৃষ্টিগোচর হইল, অর্থাৎ স্বামীজি ইহাঁদের প্রতি নানা দুর্ব্বাক্য ও বিষাক্ত নিন্দাবাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।(১) স্বামীজি স্বয়ং যে পথ দেখাইলেন, তাঁহার কোন কোন শিষ্য এ সম্বন্ধে কৃতিত্বে তাঁহাকেও ছাড়াইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, ঈদৃশ আচরণে ব্লাভাস্কি ও অলকট যারপর নাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। অতঃপর ইহাঁরা যখন বৌদ্ধ ও পারসিক সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং 'থিয়সফিষ্ট' পত্রিকায় উহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন স্বামীজি বিচলিত হইয়া অলকটকে বিরক্তিসূচক পত্র লিখিতে লাগিলেন। (২) ইহার কিয়ৎকাল পরে ১৮৮১ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে মিরাট সহরে অলকটের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। অলকট লিখিয়াছেন,—

"That day the Swami and I, as Presidents of our respective societies, had a long and serious private talk, result being that we agreed that neither should be responsible for the views of the other, the two societies to be allies, yet independent" (৩)

অর্থাৎ, ঐ দিবস সুদীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হইল যে, উভয় সমিতি কেহ কাহারও বিরোধী না হইয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবে, এবং একের মতামতের জন্য অপরে দায়ী হইবে না।

পাঠক ইহা পূর্ব্বেই জানেন, এবং মনে করিতে পারেন যে, এ ব্যাপারের এইখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু .৮৮২ খ্রীঃ অকারণে স্বামীজি উক্ত ব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া বা বিস্মৃত হইয়া ব্লাভাস্কি ও অলকটের প্রতি নিন্দা, অভিশাপ ও গ্লানিপূর্ণ একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। ইহা কতদূর যুক্তিযুক্ত কার্য্য, তাহা অভিজ্ঞগণ বিচার করিবেন। ব্লাভাস্কির যোগ-বিভূতি তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু যখন সাধুজনো-

---

(১) "My diary notes having been made at the time, there can he no mistake about this, and those who have followed these narratives from the beginning will appreciate our feelings when later his altruistic eclecticism changed into sectarian exclusiveness, and his gracious kindness into bitter abuse. O. D. L. Vol II, page 80.

(২) "His vexations expressed to me in very strong terms that I should be helping the Ceylon Budhists and the Bombay Parsis to know and love their religions better than heretofore, which as he said, both were false religions &c. &c." O. D. L. Vol. I, P. 406.

(৩) Do Do. Vol. II, page 224.

চিত গুণগ্রাহিতার পরিবর্ত্তে নিন্দাবাদ ও অহেতুবাদকেই বরণ করিয়া লওয়া হইল, তখন ঔচিত্যানুচিত্যবোধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে,ইহা আশা করা যায় না। সুতরাং ব্লাভাস্কির উপর অনেক অযথা উক্তি ঐ গ্লানিকর বিজ্ঞাপনিতে প্রচারিত হইল। অবশ্য শিক্ষিত সাধারণের পক্ষে ইহার অসারতা বুঝিতে দেরী হইল না, এবং ইহার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বেই, ইহাঁদের কলিকাতা আগমনের পর যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহাতে দেখিতে পাইয়াছি।

কিন্তু এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য যে, অলকট ও ব্লাভাস্কির বিশেষরূপে না জানিয়া আমেরিকা হইতেই আর্য্যসমাজের সহিত যোগদান, —কেবল হরিচন্দ্র চিন্তামনের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া,—উচিত কার্য্য হয় নাই। কেন তাঁহারা যোগ দিয়া পরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন? কেন তাঁহারা যথোচিত অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই স্বামী দয়ানন্দের বৈদিক ধর্ম্মে সম্মতি জানাইয়াছিলেন? অবশ্যই ভ্রমবশতঃ। তবেই ইহার উত্তরে ত্রুটী স্বীকার ভিন্ন আর কি আছে? ইঁহারা আর্য্যসমাজের সহিত যোগ দিতে গিয়া যেরূপ আশান্বিত হইয়াছিলেন, ইঁহাদের যোগদানে আর্য্যসমাজের অন্তরেও একটা আশার উদ্রেক হইয়াছিল। তাহা ভঙ্গ হওয়ায় উহার নেতা ও সভ্যগণের যে বিশেষ ক্ষোভ ও রোষের কারণ হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। আজ ত্রিশ বৎসর পরেও আর্য্য সমাজের সাহিত্যে সময়ে সময়ে এই বিদ্বেষ-মূলক ভাবোদগার দৃষ্ট হয়

যাহা হউক, এইরূপে তিন বৎসরব্যাপী শিথিল সম্বন্ধের পর সমিতিদ্বয় পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ১৮৮২ খ্রীঃ জুলাই মাসের 'থিয়সফিষ্ট' পত্রিকার পরিশিষ্টে ইহার আমূল বিবরণ দ্রষ্টব্য। সে সকল বাদানুবাদের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু আমরা আর্য্যসমাজের জনৈক লেখকের একটী উক্তির প্রতিবাদ এখানে আবশ্যক মনে করি। ইনি লিখিয়াছেন,—

"পরাবিদ্যা সমিতির সভ্যগণের আদর্শ স্বরূপ মাদাম ব্লাভাস্কি এক জন নাস্তিক।* কর্ণেল অলকট ও তাঁহার ছায়া স্বরূপ, অতএব তিনিও তাহাই।" (১) ক্রমশঃ।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

---

* এই লেখক তাঁহার পুস্তিকার এক স্থানে লিখিয়াছেন, ব্লাভাস্কি নাকি মিরাটে কোন কোন ব্যক্তির সম্মুখে নিজেই আপনাকে নাস্তিক বলিয়াছিলেন! আমরা মাদামের বা কর্ণেলের নিজের লিখিত ও প্রকাশিত মতে ইহার সমর্থন পাই নাই। বিশেষতঃ লেখক এই কথার সাক্ষীরূপে যে দুই ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা নিজে এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতেছেন না। অধিকন্তু অপর এক ঘটনা সম্বন্ধে লেখক নিজে এবং স্বামীজি ঐ দুই ব্যক্তিকে অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব 'ব্লাভাস্কি একজন আত্ম-সম্মত নাস্তিক' লেখকের এই উক্তির কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল না। তবে আর্য্য সমাজে যখন অপর ধর্ম্ম সমূহকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, সেই সময় কর্ণেল অলকট এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, আর্য্য সমাজের সাম্প্রদায়িক ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করেন না। ব্লাভাস্কিও এইরূপ কিছু বলিয়াছিলেন কিনা, জানি না। যদি বলিয়া থাকেন, তবে সম্ভবত, এই ক্ষীণ ভিত্তির উপরই লেখকের উক্তি স্থাপিত। তার পর লেখক বলিতেছেন যে, মিরাটে সেই সময়েই স্বামীজির আহ্বান সত্ত্বেও ব্লাভাস্কি তাঁহার সহিত ঈশ্বর-তত্ত্ব লইয়া বিচার বিতর্ক, এমন কি কথোপকথন করিতেও অস্বীকৃত হইয়া-

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২৮। প্রাচীন সভ্যতা। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। মূল্য ৸০। মিশরের প্রাচীন সভ্যতা, বাবিলন ও আসীরিয়া, ইউরোপে সারাসেন, তুরস্করাজ্যের উৎপত্তি, চীনজাতীয় সভ্যতা, আর্য্যসভ্যতার প্রাচীনতা ও বহির্ভারত, এই কয়েকটী বিষয় এই পুস্তকে আছে।

মৌলিক গবেষণাপূর্ণ এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম। বিজয় বাবুর ভাষার পরিচয় অল্লাধিক পরিমাণে সকলেই পাইয়াছেন। বিশুদ্ধ ভাষায় উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক করিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

২৯। জলচল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার। শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ॥০। গ্রন্থকার একজন হৃদয়বান্ ব্যক্তি, তিনি নিম্ন জাতির উন্নতি-পিপাসু। তিনি অকাট্য প্রমাণ সহ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, প্রকারান্তরে সকল জাতির মধ্যেই জলচল আছে, অথচ বাহিরে আঁটাআঁটী বন্ধন। "জলচল" না হইলে এদেশের উন্নতি সুদূরপরাহত, তাঁহার বিশ্বাস শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের ন্যায় দিগিন্দ্র বাবু এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে দেশের চেহারা ফিরিবে।

৩০। শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার। উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত, মূল্য ॥০। শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন, শূদ্রের বেদাধিকার আছে। বিংশ শতাব্দীর উন্নতি-যুগে সকলের শিক্ষার জন্য সকল শাস্ত্রের দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়া উচিত। হইতেছেও তাহাই। যাঁহারা কূপমণ্ডূক, তাঁহারাই কেবল আপত্তি করে। পুস্তকখানি সকলের পাঠের যোগ্য।

৩১। ধর্ম্মতত্ত্ব। বিবেক ও বুদ্ধির কথোপকথন। প্রথম খণ্ড, মূল্য ॥৵০। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত। ধর্ম্মতত্ত্ব নামক পাক্ষিক পত্রিকায় ১৮২০ শকের ১লা মাঘ হইতে ১৮৩১ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বিবেক বুদ্ধির যে কথোপকথনে ধর্ম্মের গুরুতর তত্ত্ব সকল নিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা একত্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। পুস্তকের প্রতি সিদ্ধান্তে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বহু

ছিলেন। ইহাতেও বিষয়টী সন্দেহের ছায়ামুক্ত না হইয়া অস্পষ্টই থাকিয়া গেল। আবার দয়ানন্দের এক খানা জীবনচরিতে আছে যে, ব্লাভাস্কি কোন বক্তৃতায় আপনাকে নাস্তিক বলিয়াছিলেন। আমরা ব্লাভাস্কির এরূপ কোন বক্তৃতার কথা শুনি নাই। তিনি কোথায় কোন্ সময়ে এই বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ জীবনচরিতে নাই। এই দুই লেখকের উক্তিও পরস্পর-বিরুদ্ধ দৃষ্ট হয়।

(১) The general prototype of the members of the society is Madame Blavatsky, ackowledged atheist, and Col. Olcott claims himself to be her shadow (Arya-Samajist Pandit Umrao Sing's 'Reply'.)

জটীল বিষয়ের সদুত্তর রহিয়াছে। এই পুস্তক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের জীবন সঙ্গী হওয়ার যোগ্য।

৩২। শ্রীশ্রীহরিলীলা-রসামৃত-সিন্ধু, দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীশশিভূষণ তালুকদার কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ১৲। অবিভেদে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সাধু ভক্তগণের জীবনের কথা পদ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চৈতন্য-ভাগবতের ন্যায় সরল বাঙ্গালায় ভক্তদিগের কথা বিবৃত। পুস্তকখানি সম্প্রদায়ের পূতিগন্ধে পূর্ণ নয়, উদার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিতে উদার ভাষায় লিপিবদ্ধ। গ্রন্থকারের বিনয়-মাখা তত্ত্ব-কথা হৃদয়ে বিদ্ধ হইল।

৩৩। বিবুদ্ধ বিনোদন। পণ্ডিত রজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য প্রণীত। সংস্কৃত ভাষায় নাটকাকারে পুস্তক লিখিত। ছাত্রগণের পাঠের বিশেষ উপযোগী।

৩৪। অপূর্ব্ব কৌতুক। শ্রীগঙ্গাচরণ নাগ প্রণীত, মূল্য ।/০। ক্ষুদ্র গল্প। ভাষার মাধুর্য্য ও লালিত্য আছে, কিন্তু বিশুদ্ধতা নাই। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

৩৫। Annual Report; The Bengal Buddhist Association, 914-15। সুন্দর বিবৃতি। বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার দিন দিন উন্নতি হউক।

৩৬। অঞ্জলি। শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, অধ্যাপক সিটি কলেজ, মূল্য ৸০। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশংসা-সম্বলিত। গ্রন্থকারের মহৎ হৃদয়ের অভিব্যক্তি এই সব প্রার্থনায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু একজনের প্রার্থনা পাঠে যে অপরের উপকার হইতে পারে, আমাদের সে বিশ্বাস নাই। সকলের অভাব একপ্রকার নয়, সকলের সাধনার ক্রম এক অবস্থাপন্ন নয়, সুতরাং অভিজ্ঞতালাভের সম্ভাবনা নাই। অন্যের নিগূঢ় কথার অন্তরালে অন্যের প্রবেশ করাও কঠিন। পাশ্চাত্যদেশে এরূপ প্রার্থনা অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। এদেশে কেশবচন্দ্রও তদীয় প্রার্থনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে মানুষকে চেনা যায় বটে, কিন্তু নিজের উপকার হয় বলিয়া বিশ্বাস নাই। নিভৃতের কথা নিভৃতে থাকে, তাহাই ভাল। আমি এবং তিনি,—মধ্যে অন্য ব্যবধান নাই,—স্বামী স্ত্রীর কথোপকথন যেমন প্রকাশ্য নয়, মা ও ছেলের কথাও তেমনি, বুঝিবা, প্রকাশ্য নয়। আমার কথা শুধু তিনি জানুন, অন্যের জানিয়া কাজ কি?—একথার উত্তর কেহ দিতে পারেন কি? জগতের মঙ্গলের কথা?—প্রার্থনাবাদীরা তাহা স্বীকার করেন না,—তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া মজিয়া থাকিতে চাহেন। আর কিছুই নয়। তাঁহার জগৎকে তিনিই রাখিবেন, আমি পাপী, আমার তাহা ভাবিয়া প্রয়োজন কি? আমি চাই শুধু তাঁহাকে লইয়া ঘরকন্না করিতে, তন্ময় লইয়া যাইতে। স্বতন্ত্র কামনা ও বাসনা নির্ব্বাণ হইয়া যাক্।

৩৭। পাগল রাধামাধব। প্রথম খণ্ড। ইহাতে অনেক সার কথা আছে। বিক্রয়-লব্ধ আয় সোণামুখী রাধামাধব আশ্রমে অর্পিত হইবে। সাধু কার্য্য।

।কদর্শন।

সক্রেটিস।

সক্রেটিস খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯ অব্দে এথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সফ্রনিস্কাস্ (Sophroniscus) ভাস্কর ও মাতা ফিনারিটি (Phænarite) ধাত্রী ছিলেন। কথিত আছে, প্রথমে তিনি পিতৃব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ; পরে, দর্শন শাস্ত্রের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত দর্শনালোচনায় প্রবৃত্ত হন। দর্শন সম্বন্ধে স্বীয় মৌলিকত্ব রক্ষার জন্য তিনি যাহাই কিছু বলিয়া থাকুন, ড্যামন (Damon) তাঁহার বন্ধু ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন এবং নিজে থিবিসে (Thebes) ফাইলোলাস ভবনের নিকট বাস করিতেন বলিয়া, তাঁহার সহিত পিথাগোরিয়ান দর্শন মতের পরিচয় ঘটিয়াছিল। অধিকন্তু, যৌবনে তিনি ইলিয়াটিক সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেন, ইউরিপিডিসের (Euripides) উপদেশ মত হিরাক্লাইটাসের গ্রন্থপাঠে আনন্দানুভব করিতেন ও আর্কেলস্ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আনাক্সাগোরাসের গ্রন্থপাঠেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তার্কিক সম্প্রদায়ের (Sophists) সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এবং প্রোডিকাস (Prodicus) নামে এক ব্যক্তিকে বক্তৃতার পারিশ্রমিক স্বরূপ একবার তিনি অর্থপ্রদানও করিয়াছিলেন।

এথেন্সের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সত্ত্বেও স্বদেশরক্ষার্থ যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহূত হইলেন, তখন জন্মভূমি পরিত্যাগে তিনি বিন্দুমাত্র কাতর হন নাই। সমর-ক্ষেত্রে তাঁহার অসীম ধৈর্য্য, সাহস, ইতিকর্ত্তব্যতা, বিপন্নের রক্ষা এবং গুণের সমাদরে, সকলেই যারপর নাই মুগ্ধ হইয়াছিল। অস্থিরচিত্ত লোক সাধারণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা না থাকায় তিনি প্রজাতন্ত্র শাসনের পক্ষপাতী হইতে পারেন নাই এবং এথেন্স-প্রচলিত প্রজাগণের সমানাধিকার নীতির সহিতও তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। তৎকালে 'লটারি দ্বারা রাজ কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। তিনি সময়ে সময়ে উক্ত প্রথার প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে রাজ্য সংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সক্রেটিস গৃহস্থালীর প্রতি এতই উদাসীন থাকিতেন যে, তাঁহার স্ত্রী জান্থিপী এক এক সময়ে তজ্জন্য ক্রোধ প্রকাশ করিতেন।

সক্রেটিস জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দিবাভাগে রাজপথে পরিভ্রমণ করতঃ তিনি যে সকল সুশ্রী ও সুচতুর যুবক দেখিতে পাইতেন, তাহাদের সহিত দর্শন বিষয়ক প্রশ্নোত্থাপন করিতেন। যুবকদিগের সহিত অযাচিত ও অসঙ্কোচ আলাপ স্থলবিশেষে আপত্তিকর হইলেও, তাঁহার যুক্তিকৌশলে যুবকগণের অভিভাবকেরা কোনক্রমে তাহা সহ্য করিয়া যাইতেন। কয়েকজন যুবক তাঁহার ভাষা ও তর্কের বলে তাঁহার প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, প্রায়ই তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেন না। এজন্য, মতদ্বৈধ হেতু যাঁহারা পরস্পরের সহিত কখনও সাক্ষাৎ করিতেন

না, তাঁহাদেরও একত্র সমাবেশ হইত। এই জন্যই অসংযত-প্রতিভ আলসিবিয়াডিসের (Alcibiades) পার্শ্বে গর্ব্বিত ক্রিটিয়াসকে, (Critias) ভোগবিলাসী আরিষ্টিপাসের (Aristippus) পার্শ্বে ধার্ম্মিক আণ্টিষ্থিনিস্ (Antisthenes)কে, প্রগল্‌ভচিত্ত হারমোজিনিস (Hermogenes) ও স্থূলবুদ্ধি অথচ বিজ্ঞ জেনেফেনের (Xenophon) পার্শ্বে কঠোর ন্যায়পরায়ণ ইউক্লিডিস (Euclides) ও সূক্ষ্মবুদ্ধি ভাবুক প্লেটো (Plato)কে, এবং অল্পবয়স্ক অথচ ধীর-প্রকৃতি কারমাইডিসের (Charmides) পার্শ্বে অস্থিরচিত্ত কিরেফেন (Chærephon) ও চিন্তাশীল বৃদ্ধ ইউরিপিডিস (Euripides)কে অবস্থিত দেখা যাইত; এবং এই সকল ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে লইয়াই সক্রেটিস-সম্প্রদায় নামে একটী সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল কেন যে এই সকল লোক তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইতেন, তাহার কারণ, সক্রেটিস দেখিতে কুৎসিত হইলেও, তাঁহার জ্ঞানালোক এবং চরিত্র-সৌন্দর্য্য এত অধিক ছিল যে, গ্রীক মাত্রই তদ্দর্শনে আশ্চর্য্য বোধ করিত। তিনি দরিদ্র হইয়াও অভাবশূন্য, শিক্ষিতদিগের শীর্ষস্থানীয় এবং প্রাচীন সভ্যতা-সম্মত অশেষগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে, কেবল মাত্র মনোমুগ্ধকর স্বভাব ও চরিত্র বলেই তিনি এত বড় হইয়াছিলেন। চরিত্র গঠনের জন্য লোক-চক্ষুর অন্তরালে, প্রলোভনের সহিত সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতে হইত বলিয়া সংসারে তাঁহার ভয়ের কোন কারণ ছিল না এবং ভোগ-সুখে আত্মহারা হওয়ার আশঙ্কা না থাকায়, কঠোর তপশ্চর্য্যারও প্রয়োজন হয় নাই।

সক্রেটিসের সহিত তার্কিকদিগের সাদৃশ্য বশতঃ তাঁহাকেও একজন তার্কিক (Sophist) বলিয়া মনে হয়। তিনি তার্কিকদিগের মতই অধ্যাত্মবিদ্যা (Metaphysics)কে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার মতে জড়বিজ্ঞান দ্বারা নাস্তিকতা বৃদ্ধি পায় এবং অঙ্কশাস্ত্র কতকগুলি নিষ্ফল জল্পনামাত্র। তার্কিকদিগের ন্যায় এবং খাঁটি এথেনীয়ের মতই, তিনি চরিত্র এবং নাগরিকের কর্ত্তব্য, এই দুই বিষয়কে যাবতীয় শিক্ষার কেন্দ্র স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাহারা যেমন ধর্ম্ম ও রাজ্যসংগঠনের উপরে স্বাধীন চিন্তার প্রভাব স্বীকার করিত না, তিনিও তদ্রূপ মনের স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবর্ত্তে, মনকে বিধিনিবদ্ধ করারই অধিক পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে সক্রেটিসকে 'সফিষ্ট' বলিয়াই গণ্য করা হইত। প্রথমতঃ অরিষ্টফ্যান (Aristophanes) তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হন। তিনিই 'ক্লাউড্‌স্' (Clouds) অর্থাৎ 'নবদেবতা', সম্বন্ধে সক্রেটিসকে বিদ্রূপ ও তাঁহার ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিক মতে সন্দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরে, কবি মিলেটস্ (Meletus), বাগ্মী লিকন (Lycon) এবং চর্ম্ম-ব্যবসায়ী আনিটস্ (Anytus) জাতীয় দেবতায় অবিশ্বাস ও নবদেবতার সৃষ্টি এবং যুবকদিগকে উন্মার্গগামী করার অপরাধে, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। বিপক্ষগণের অভিযোগ যে একেবারে মিথ্যা, তাহা বলা যায় না; কেন না, তৎকালে সাধারণের বিশ্বাস এবং সামাজিক প্রথাকে, আক্রমণ করা সক্রেটিসের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। তাঁহার 'বিবেকবাণী'কে যে তিনি ডেলফির দৈববাণীর সমকক্ষ বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাহা সত্য; এবং যুবকগণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে,

তিনি তাহাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য তাহাদের পিতামাতা অপেক্ষা অধিক বুঝিতেন, ও সেই জন্যই তাহাদিগকে নিজের মতলব মত উপদেশ দিতেন। যাহা হউক, শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রে খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯ অব্দে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং আদেশ প্রাপ্তির একমাস পরে, একদা তিনি সহচরদিগের সহিত কথোপকথন করিতে 'হেমলক' বিষপান করিয়া দেহ ত্যাগ করেন।

সক্রেটিস্ স্বয়ং কোন লিপি বা গ্রন্থ না রাখিলেও, তাঁহার শিষ্য জেনোফন এবং প্লেটোর লেখনী হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অপরাপর দার্শনিক অপেক্ষা অধিক বৃত্তান্ত জানা গিয়াছে। এই দুই মহাত্মার বিস্তৃত বিবরণে অনৈক্য থাকিলেও, আরিষ্টলের নিরপেক্ষ সমালোচনায় কোন ভুল ধারণা আসিতে পারে নাই

প্রোটাগোরাস এবং সফিষ্টদিগের সন্দেহবাদ (Scepticism) হইতে সক্রেটিস্-দর্শনের সৃষ্টি। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, তিনি কিছুই জানিতেন না, (All that he knows is that he knows nothing)। তিনি ইহাও বলিতেন যে, প্রাকৃত বিজ্ঞান হইতে স্থায়ী জ্ঞান লাভ হয় না। তাঁহার 'বিশ্বাস' ছিল যে জগতে এমন কোন বস্তু নিশ্চয়ই আছে, যাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞেয়। এই বস্তুটী কি? উহা আর কিছুই নহে; 'ডেলফি'র মন্দিরে লিখিত, 'আত্মাকে অবগত হও', (know thyself) এই উপদেশ বাক্যে যাহা প্রকাশ পায়। মানবই মানবের একমাত্র জ্ঞেয়। আমরা জগতের প্রকৃতি, উৎপত্তি এবং পরিণাম কিছুই জানি না; জানি, কেবল আমাদের কি হওয়া উচিত, জীবনের আদর্শ কি এবং কিরূপেই বা আত্মার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। এই জ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই প্রকৃত, শ্রেয়ঃ এবং একমাত্র সম্ভবপর জ্ঞান।

সক্রেটিস একমাত্র মানবকেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিলেও, তদ্দ্বারা বিজ্ঞান-সম্মত মানবদেহতত্ত্ব (Scientific anthropology) অথবা খাঁটী মনোবিজ্ঞান, (Psychology) উভয়ের কোনটীই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহার নিকট নীতি-জ্ঞানের আধার স্বরূপ আত্মাই মানব এবং নীতি-বিজ্ঞানের বহির্ভূত কোন বিজ্ঞানই স্বীকার্য্য নয়। আরিষ্টটলের মতে সক্রেটিসই নীতি-বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক। সার্ব্বভৌমিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহাই প্রকৃত বিজ্ঞান পদবাচ্য এবং নিঃসংশয়রূপে গ্রহণ-যোগ্য আপাততঃ মনে হয়, সক্রেটিস প্রোটাগোরাসের ন্যায় মানুষমাত্রেই সদসৎ ও সত্যমিথ্যার মানদণ্ড, এই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রোটাগোরাসের নীতিশাস্ত্র বিজ্ঞান-সম্মত ছিল না; যে হেতু, উহাতে বিজ্ঞানের সার্ব্বভৌমিকত্ব রক্ষা পায় নাই। তিনি মানব অর্থে সমস্ত মানবজাতি না বুঝিয়া, পৃথক পৃথক ব্যক্তি বুঝিতেন; সুতরাং উহা নৈমিত্তিক এবং পরিবর্ত্তনশীল মানব। সর্ব্বসাধারণ মানবের অন্তর্নিহিত অপরিবর্ত্তনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী মানব-চরিত্র নহে। প্রোটাগোরাস এরূপ কোন মানব প্রকৃতির মৌলিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, নৈতিক ধারণা সমূহের কোন বাস্তব সত্তা বা স্বাতন্ত্র্যভাব নাই। সততা, ন্যায়পরতা এবং সত্য, ব্যক্তি বিশেষের রুচির (Individual taste) উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, ব্যক্তি সংখ্যানুসারে নীতিশাস্ত্রেরও সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

যতগুলি মানুষ ততগুলি নীতি-প্রণালী হওয়া, আর নীতিশাস্ত্র না থাকা, উভয়ই এক। সফিষ্টগণ ভিন্নরীতি মানবগণের ভিন্ন ভিন্ন মত, বোধশক্তি ও বিচারশক্তি দেখিয়া প্রতারিত হইয়াছিলেন। সর্ব্ববাদীসম্মত নীতিজ্ঞান, ব্যক্তিগত সংস্কারের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে; পরে, শিক্ষাপ্রভাবে সংস্কারের বহিরাবরণ উন্মুক্ত হইলে, সততা সৌন্দর্য্য, ন্যায়পরতা এবং সত্য সম্বন্ধে সকলের একই ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। সক্রেটিসের বিশেষত্ব এই যে, তিনি নীতি-শাস্ত্রে বিশেষ (particular) হইতে সাধারণের (universal) নিষ্কাষণ, বিশেষ বিধি হইতে সাধারণ বিধির সঙ্কলন এবং ভিন্ন প্রকৃতি মানব-চরিত্রের পার্থক্য হইতে মানব অর্থে প্রকাশিত একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় মানব চরিত্রের বিশ্লেষণ জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে হীনচরিত্র সাধারণ লোকের ভিতর যে বহুবর্ষব্যাপী ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কার সমূহ অস্পষ্টভাবে প্রচলিত ছিল, সেই সকল ধারণা ও সংস্কারের সমালোচনা করিয়া তন্মধ্যে তিনি এক অখণ্ড সত্যস্বরূপ ধারণায় উপনীত হন; উহা সেই সমগ্র মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি বিবেক, মানব মনের অবশ্য পালনীয় একমাত্র বিধি। এই আবিষ্কারের ফলে কেবল যে নীতি-শাস্ত্রেরই উন্নতি হইয়াছিল, তাহা নহে, উহার দ্বারা অধ্যাত্মবিদ্যাও বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করে। বুদ্ধি বৃত্তির অভাবজনিত ঘোর অরাজকতার দিনে, লোক সাধারণকে চিন্তা সাহায্যে বিষয় সমূহের যথার্থ মীমাংসায় উপনীত হইতে এবং ভাষার অপব্যবহার না করিয়া, শব্দ ও অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সক্রেটিস অমানুষিক পরিশ্রম করিতেন। তিনি বলিতেন, ঈশ্বর সম্বন্ধে যতদিন না কোন নির্ভুল ধারণা এবং সংজ্ঞার সৃষ্টি হইতেছে, ততদিন লোকে আস্তিক কিম্বা নাস্তিক, যে কোন মত গ্রহণ করিতে পারে? ঈশ্বর নামে যখন তাহারা একমাত্র পরিণামদর্শী বিরাটের কল্পনা করিবে, তখন তাহারা আস্তিক; আর, যখন ঈশ্বর বলিতে গ্রীকগণ কল্পিত দেহধারী অলিম্পাসের অধিবাসীবর্গ বুঝিবে, তখন তাহারা নাস্তিক। এরূপ অবস্থায় একমাত্র কর্ত্তব্য এই, যাহাতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় উক্তিগুলির সামঞ্জস্য সাধন হয়, তাহার চেষ্টা করা। জেনোফনের মতে সক্রেটিস, সৎ ও অসৎ, ন্যায় ও অন্যায়, জ্ঞান ও অজ্ঞতা, সাহস ও ভীরুতা, রাজ্য ও রাজ্যস্থ ব্যক্তি, এই সকল শব্দের যথাযথ সংজ্ঞা নিরূপণকল্পে কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। নীতিজ্ঞান যে মানব জাতির মজ্জাগত সংস্কার, মানব মন যে স্বভাবতঃ সত্যপরায়ণ (Big with truth) এবং শিক্ষা দ্বারা যে নূতন বিষয়ের জ্ঞান লাভ না হইয়া সুপ্তজ্ঞানাঙ্কুরগুলিই প্রস্ফুটিত হয়, এই সকল স্থলে তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষবাদী প্রোটাগোরাসের অনৈক্য ঘটিয়াছে।

সক্রেটিস, মাতার ধাত্রীবিদ্যার সহিত স্বীয় উপদেশ প্রণালীর তুলনা করিয়া, আপনাকে পরমার্থ জ্ঞানের ধাত্রী (Spiritual midwife) বলিয়া গর্ব্বানুভব করিতেন। এই উপমাটী যে কি সুন্দর, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি পথপার্শ্বে, দোকানে এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানসমূহে, কিরূপে আপনাআপনি সংজ্ঞা নিরূপণ করতঃ সকল বিষয়ের সঠিক মীমাংসা করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে

সমবেত জনমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন, কোন প্রতিভাসম্পন্ন লোক দেখিতে পাইলে, তাহার জন্য তর্কের ফাঁদ পাতিতেন এবং যুক্তিতে হারিয়া গিয়া যতক্ষণ না লোকটী আপনার ভ্রম স্বীকার করে, ততক্ষণ তাহাকে প্রশ্ন করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। সক্রেটিস যে তর্ক সাহায্যে পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্য খণ্ডন করিতেন এবং যাহা উত্তরকালে সক্রেটিসের শ্লেষ (Socratic irony) বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্লেটোর 'ডায়ালোগে' বা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কথোপকথনে দেখিতে পাওয়া যায়।

অজ্ঞানতিমির দূর হইলে, লোকে যাহাতে নির্ভুল ধারণা সাহায্যে সামাজিক হিতসাধন করিয়া সুখে বাস করিতে পারে, তাহাই সক্রেটিসের উদ্দেশ্য ছিল তিনি শিক্ষা দ্বারা কাহাকেও পণ্ডিত করিবার অভিলাষ করেন নাই। তাঁহার সময় হইতে ধর্ম্ম, নীতি ও স্থির বিশ্বাস দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ইহাই পরবর্ত্তী দর্শন মত সমূহের বিশেষত্ব। তিনি একজন খাঁটী এথেনীয়, এবং কল্পনাপেক্ষা কর্ম্মের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া জ্ঞানকে জীবনের লক্ষ্য স্বরূপ গণ্য করেন নাই; বস্তুতঃ উহাকে রাষ্ট্রকুশল উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, নাগরিক এবং জনসাধারণের ধর্ম্ম পথে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞান ও ইচ্ছা লইয়াই সক্রেটিস-দর্শন। ইহার অর্থ এই যে, লোকে যতই চিন্তা করিতে ও জানিতে শিখিবে, ততই তাহারা কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হইবে। জ্ঞানালোকের সহিত নৈতিক উৎকর্ষ সমানুপাতিক। এই মূল সত্য হইতে অন্যান্য মন্তব্য যথা, নীতি ধর্ম্ম শিক্ষণীয়, পুণ্য এক অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে পুণ্যবান বা পাপী না হইলে কোন এক বিষয়ে পুণ্যবান্ বা পাপী হওয়া যায় না, কেঁহই জ্ঞানতঃ পাপ করে না, কেননা পাপ অজ্ঞতারই ফল; ইত্যাদি সিদ্ধান্ত আপনিই আসিয়া পড়ে।

সক্রেটিসের নীতিশাস্ত্র পিথাগোরিয়ান অধ্যাত্মবাদ এবং আইওনিয়ান দর্শনের বাস্তববাদ, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। বাহ্য মতভেদের ভিতর, লোক-চরিত্রের সাধারণ ঐক্য যাহাতে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে প্রতিভাত হয় এবং দৈহিক সৌন্দর্য্যের সহিত আন্তরিক বা নৈতিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, ইহাই তাঁহার নীতির মূলমন্ত্র। সক্রেটিস ধর্ম্মের জন্য কঠোর তপস্যার অনুমোদন করেন নাই। প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া বুদ্ধির অধীন করাই তাঁহার মত, প্রবৃত্তি লোপ তাঁহার নিকট স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

ধর্ম্মক্ষেত্রে সক্রেটিস পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদিগের ন্যায় জাতীয় দেবতা ও তাহাদের উপাখ্যানে ঘৃণা প্রকাশ করিলেও, কুসংস্কারের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পান নাই। মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মহাপুরুষগণ মানবজাতির কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষের পক্ষাবলম্বন করেন, ইহাও তাঁহার ধারণা ছিল। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপীত্বে ও পরিণামদর্শিতায় বিশ্বাস স্থাপনের জন্যও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে মানবের দলাদলি শিথিল হইয়া আসিয়াছিল এবং ক্রমে ষ্টোয়িক ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বপ্রেমনীতি প্রচারের পথ সুগম হইয়া-

কল্পনারাজ্যে সক্রেটিস ইম্যানুয়েল ক্যাণ্ট অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহার

পূর্ব্বেও অনেক উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। সক্রেটিসের নাম যে শুধু তাঁহার দর্শনের জন্য, তাহা নহে; বীরের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করায়, তাঁহার মাহাত্ম্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। পক্ষান্তরে. দর্শনে তাঁহার মৌলিকতা কিছু থাকুক, আর না থাকুক, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, যে সকল মহাত্মার আবির্ভাবে সংসারে স্থায়ী এবং অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার সমূহ সাধিত হইয়াছে, তিনি তাঁহাদিগেরই একজন। বিবেককে উচ্চাসন প্রদান করা এবং সার্ব্বজনীন অক্ষয় সত্যের আবিষ্কার করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। যে সময়ে লোকে সদসৎ গুণ গুলিকে আপেক্ষিক (Relative) গুণ বলিত, এবং যখন অনুষ্ঠান মাত্রের ভাল মন্দ বিচার বিবেকবাণীর অনুসরণ না করিয়া কৃতকার্য্যতার অনুসরণ করে বলিয়া বিশ্বাস ছিল, সেই সময়েই সক্রেটিস বিবেকের প্রভুত্ব এবং ব্যক্তিগত খামখেয়ালির উপর নৈতিক শাসনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন; তাহার ফলে, দর্শন ও নীতিশাস্ত্র উভয়েরই সংস্কার সাধিত হইয়াছে। কেননা, মানব মনের স্বভাবই এই যে, উহা কর্ম্মক্ষেত্রে নিরপেক্ষ সত্যস্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, কল্পনা রাজ্যেও তাহা না করিয়া থাকিতে পারে না।

নব সম্প্রদায়ভুক্ত বহুশিষ্যের মধ্যে আরিষ্টিপাস (Aristippus) এবং আণ্টিস্থিনিস (Antisthenes) প্রভৃতি কয়েক জন, প্রাচীন সম্প্রদায়োক্ত অধ্যাত্মবাদের বিপক্ষেই সক্রেটিসের নীতি বচনগুলির পুষ্টিসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; আবার, ইউক্লিডিস ও প্লেটো. সক্রেটিস-কল্পিত সর্ব্বোচ্চ আদর্শের সহিত ইলিয়াটিকদিগের নিরপেক্ষ জীবন সত্বার সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে নীতিশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অধ্যাত্মবাদের মূল কারণ, উভয়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, সন্দেহবাদ (Scepticism) হইতে সৃষ্টিতত্ত্ব বিচারের যে অন্তরায় ঘটিয়াছিল, তাহা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়, এবং নৈতিক দর্শনের সহিত অধ্যাত্ম দর্শনের মিলন ঘটে।*

* 'সফিষ্ট' (Sophist) শব্দের অর্থ লইয়া পণ্ডিতদিগের একটু মতভেদ ঘটিয়াছিল। সফিষ্টগণ প্রথমতঃ অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। ইঁহারা অধীতশাস্ত্র ছিলেন, অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংবাদ রাখিতেন এবং স্ব স্ব অভিজ্ঞতার বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করিতেন। ধর্ম্মাধিকরণেও ইঁহাদের প্রভুত্ব ছিল এবং ইঁহাদের দ্বারা সাহিত্য, দর্শন, সমাজনীতি ও রাজনীতির অনেক উন্নতি হইয়াছিল। ক্রমে অর্থগৃধ্নুতা বৃদ্ধি পাইলে সমাজে ইঁহাদের প্রতিপত্তি কমিয়া যায়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসার বেরি (Prof. Bury) সফিষ্ট সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—"The power of clearly expressing ideas in such a way as to persuade an audience, was an art to be learned and taught. The demand was met by teachers who travelled about and gave general instruction in the art of speaking and in the art of reasoning, and, out of their encyclopædic knowledge, lectured on all possible subjects. They received fees for their courses, and were called sophists, of which name perhaps our best equivalent is "professors." The name acquired a slightly unfavourable colour—partly owing to the distrust felt by the masses towards men who know too much."—History of Greece.

আরিষ্টিপাস (Aristippus)

ধনী সওদাগর-পুত্র আরিষ্টিপাস সমৃদ্ধিশালী সিরিণ সগরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এথেন্সে আগমন করেন। তিনি পূর্ব্বেই সক্রেটিসের যশঃ-সৌরভে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, পরে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সক্রেটিসের মৃত্যুর পরেও, যখন তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেন, তখনও আপনাকে সক্রেটিসের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং সফিষ্ট বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক খানিও রক্ষিত হয় নাই।

আনাক্সাগোরাসের সময় হইতে অন্যান্য দার্শনিকদিগের ন্যায় আরিষ্টিপাসও বস্তু মাত্রের কারণ বা উদ্দেশ্য নির্ণয়ে মনোযোগ দেন এবং সক্রেটিস মানব প্রকৃতি বিচারে আনন্দবোধ করিতেন বলিয়া তিনিও মানুষের সর্ব্বপ্রধান শ্রেয়ঃ কি, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রোটাগোরাসের ন্যায় তিনিও বলিতেন যে, জ্ঞান মাত্রই ব্যক্তিগত এবং বস্তুর স্বরূপ অজ্ঞেয়। জ্ঞানগম্য বস্তু এবং বস্তুর স্বরূপত্ব (Thing in-itself), জ্ঞানের প্রকাশ্য কারণ এবং অপ্রকাশ্য গূঢ় কারণ,উভয়ের অনেক প্রভেদ। তৎপ্রণীত নীতি শাস্ত্রেরও মূলে সক্রেটিস অপেক্ষা প্রোটাগোরাসের সহিত অধিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তাঁহার মতে সুখই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই মতকে সুখতত্ত্ববাদ (Hedonism) নাম দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উহার অর্থ ইন্দ্রিয়-সেবা নহে। সর্ব্ব বিষয়ে মিতাচার, ভোগবিলাসে আত্ম সংযম এবং পাশবিক বৃত্তির দমন একান্ত আবশ্যক। যে কোন অবস্থায় হউক, মানব সর্ব্বদা আত্মসংযম করিতে শিখিবে। তারতম্যানুসারে সুখের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। মানসিক সুখ সমূহ, বন্ধুত্ব, পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, সাহিত্য-সেবা এবং কলাবিদ্যার চর্চ্চা, ইহারা ইন্দ্রিয়জ ক্ষণিক সুখাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের সুখ প্রদাম করে। জ্ঞানীগণ ইন্দ্রিয়জনিত ক্ষণিক সুখের পরিবর্ত্তে সচ্চরিত্রলব্ধ স্থায়ী সন্তোষ ও আনন্দ কামনা করেন। আরিষ্টিপাস এবং তাঁহার অনুচরগণ সুখস্পৃহাই যে অনুষ্ঠানের মূল কারণ এবং অনুষ্ঠান মাত্রেরই যে উদ্দেশ্য সুখলাভ, এসম্বন্ধে তার্কিক সম্প্রদায়ের সহিত একমত ছিলেন। সুখতত্ত্ববাদীগণ স্বাধীনচিত্ত ভাবুক ছিলেন বলিয়া, তখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুদেবত্ব বিষয়ক যে বিশ্বাস ছিল, তাহার অপনোদনে কৃতসঙ্কল্প হন। সিরিণবাসী থিওডোরাস (Tneodorus of Cyrene) কৃত 'দেবতা' (The gods) নামক পুস্তকে নাস্তিকতারই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইউহিমিরাস (Eahemerus) নামে অপর এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন যে, বীরপুরুষগণ, রাজগণ এবং অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণই মৃত্যুর পরে দেবতা আখ্যালাভ করেন। তাঁহার এই মতটী রোমক এবং খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল,কেন না, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁহারা ইহাকে একটী অমোঘ অস্ত্ররূপ ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। ইউহিমিরাসের মত যতই সঙ্কীর্ণ হউক, উহাই বর্ত্তমান যুগের প্রধান আলোচ্য বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম্মতত্ত্ববিচারের প্রথম উদ্যোগ।

এই প্রবন্ধে সফিষ্টকে 'তার্কিক' বলার কারণ, ভাল বা মন্দ যে কোন অর্থে হউক, তর্কই তাঁহাদের প্রধান ব্যবসা ছিল।—লেখক।

আরিষ্টিপাসের সুখতত্ত্ববাদ হিজেসিয়াস্ (Hegesias) কর্ত্তৃক নৈরাশ্যবাদে (Pessimism) পরিণত হয়। যে ভিত্তির উপর উহা প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। সিরিণায়িক সম্প্রদায়ের মতে সুখলাভই জীবনের উদ্দেশ্য, তবে কেহবা সুখ ইন্দ্রিয়জ ও ক্ষণিক, আর কেহবা উহাকে স্থায়ী বলিয়াছেন। জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের ভাগই বেশী এবং অবিমিশ্র সুখ স্বপ্নাতীত। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা অবিমিশ্র সুখলাভ মানুষের পক্ষে দুর্ঘট বলিয়া জীবনের কোন মূল্য নাই। অতএব জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ, কেননা, মৃত্যুতে দুঃখের অবসান হেতু প্রকারান্তরে সুখলাভের সম্ভাবনা। হিজেসিয়াস এবং যাঁহারা সুখকে চরম উদ্দেশ্য বলিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ। পক্ষান্তরে, নৈতিক উৎকর্ষ, কর্ত্তব্য পালন এবং ধর্ম্মার্থে ধর্ম্ম সঞ্চয় যখন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে, তখনই জীবনের প্রকৃত মূল্য দর্শিবে, অর্থাৎ জীবনকে যখন এইরূপ মত উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় বলা যায়, তখনই উহা মূল্যবান। যিনি এরূপ মত পোষণ করেন, তিনি আদর্শবাদী (Idealist)। তাঁহার নিকট ধর্ম্মই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। মানবই ধর্ম্মের অধিকারী বলিয়া ধর্ম্মরূপ আদর্শ লাভের জন্য জীবন ধারণ একান্ত প্রয়োজন। জীবন এইজন্য হিতকর, আদর্শ লাভের একমাত্র উপায়, কিন্তু একমাত্র আকাঙ্ক্ষনীয় নহে। এখানে আদর্শবাদ হইতে নৈরাশ্যবাদ (Pessimism) দূরীভূত হইতেছে। সিরিণবাসী আনিসিরিসের (Anniceris) হাতে নৈরাশ্যবাদে পুনরায় আশার সঞ্চার হইয়াছিল এবং এপিকিউরাস (Epicurus) ডিমক্রিটাসের বিজ্ঞান সাহায্যে উক্ত মতের পোষকতা করিয়াছিলেন।

আণ্টিস্থিনিস (Antisthenes.)

সক্রেটিসের আদর্শমূলক উপদেশসমূহ উদাসীন* (Cynic) সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা এথেন্সবাসী আণ্টিস্থিনিস কর্ত্তৃক পুনরুদ্ধৃত ও অতিরঞ্জিত হইয়াছিল। উক্ত সম্প্রদায়ের মতগুলি সংক্ষেপে এইরূপ :—ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মোপার্জ্জন ; অনুষ্ঠান মাত্রেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্ম ; ধর্ম্মই সর্ব্বোচ্চ শ্রেয়ঃ। উদাসীনগণ সুখমাত্রই অমঙ্গলজনক বলিয়া প্রচার করেন। মানবগণ সমস্ত পার্থিব, এমন কি, মানসিক সুখও বর্জ্জন না করিলে ধার্ম্মিক হইতে পারে না। দর্শনালোচনা ও মানসিক উন্নতি সাধনও অনিষ্টকর। সামাজিক আচার ব্যবহারকে অবজ্ঞা করিতে করিতে তাঁহারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, সভ্যতার সাধারণ নিয়মগুলি এবং অবশেষে ন্যায়ানুমোদিত রীতিনীতিরও বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন। সভ্যতা ও সুরুচির পরিবর্ত্তে প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা, এবং স্বদেশহিতৈষণার স্থলে বিশ্বহিতৈষণার (Cosmopolitanism) প্রতিষ্ঠাই যেন এই গোঁড়া প্রাচীনসংস্কারক দলের সঙ্কল্পছিল। 'সফিষ্ট'গণের ব্যক্তিগত স্বাধীনভাব এইবার কল্পনা হইতে কার্য্যে প্রকাশ পায়। সাইনোপবাসী ডাইওজিনিস (Diogenes of Sinope) সাধারণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ঔদ্ধত্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

---

* Cynic শব্দের যতই অর্থাবনতি হউক, এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ভোগবাসনায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন এবং সম্প্রদায়ের মতও ঔদাসিন্য। এই জন্য cynicএর প্রতিশব্দ উদাসীন দেওয়া হইয়াছে। —লেখক।

উদাসীনদিগের মতের সহিত সন্ন্যাস মতের (Stoicism) মিলনকর্ত্তা ক্রেটিস (Crates) সম্বন্ধেও এইরূপ নিন্দাবাদ আছে। আণ্টিস্থিনিসের নৈতিক আদর্শবাদ (Moral idealism) কয়েক জন গোঁড়া 'সিনিক' কর্ত্তৃক বিকৃতি-প্রাপ্ত হইয়াছিল; জেনো ও ষ্টোয়িকদিগের দ্বারা পুনরায় উহার সংস্কার হয়।

ইউক্লিডিস (Euclides.)

মিগারার (Megara) দর্শন-মত-প্রবর্ত্তক ইউক্লিডিস ইলিয়াটিক দর্শনে যে আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার উপরেই তাঁহার গুরু সক্রেটিসের নীতিশাস্ত্র স্থাপন করিতে সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করেন। পারমিনাইডিসের জীবনসত্ত্বা (Being) এবং নীতি জ্ঞানের আধার মানব-আত্মার সংযোগ সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার মতের সার মর্ম্ম এই যে,মন বা আত্মাই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই। ইউক্লিডিস সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা না থাকিলেও, এই একমাত্র মন্তব্যে তিনি তাৎকালিক দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেক উচ্চাসন পাইতে পারেন। এই মত হইতেই সক্রেটিস ও প্লেটোর ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। মিগারার সম্প্রদায় এবং সক্রেটিসের প্রিয় শিষ্য ফিডো (Phædo) তর্কবাদের (Eristic Dialectics) উন্নতিকল্পে যত্নবান হইয়াছিলেন, কিন্তু প্লেটো, আরিষ্টটল, এপিকিউরাস এবং জেনোর অভ্যুত্থানে, সে চেষ্টা বলবতী হয় নাই।

গ্রীকদর্শনের প্রথম বিভাগে সৃষ্টি এবং জন্মতত্ত্ব, এই দুই বিষয়ে আন্দোলন হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিভাগে সক্রেটিস সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মনস্তত্ত্বযুগের সূত্রপাত এবং উহা পর্য্যায়ক্রমে (১) আদর্শবাদ (২) জড়বাদ ও সুখতত্ত্ববাদ এবং (৩) শক্তিবাদে পরিণত হয়। শেষোক্ত মত-বিভাগের কারণ এই যে, ঐ সকল মতে যথাক্রমে চিন্তা (Plato and Aristotle), ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Epicurus) এবং ইচ্ছাশক্তি (Stoicism) মূলমন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

হিন্দুধর্ম্ম।

হিন্দুনাম।

যে নাম লইয়া এত মারামারি, বেদ বেদান্ত স্মৃতি দর্শন রামায়ণাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থেই সে হিন্দুনাম নাই। অমরকোষে কোন অর্থ পাওয়া যাইবে না, মৌলবী সাহেবের অভিধানে ইহার অর্থ "গোলাম।" মুসলমানগণ অনুগ্রহ করিয়া পরাজিত ভারতবর্ষের নামকরণ করিয়াছিল, হিন্দোস্থান বা গোলামের দেশ। আমরা এখন এই ঘৃণার বোঝাটাই মাথায় বহন করা একটা মহা গৌরবের বিষয় মনে করিতেছি, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অজ্ঞতা আর কি হইতে পারে? আর্য্যসমাজ এই জন্যই হিন্দুনাম বর্জ্জন করিয়াছেন। তবে, সরকারী খাতাপত্রে জাতীয়তার হিসাবে যখন ও নাম স্থায়ী হইয়া গিয়াছে এবং সরকারের উপরে যখন কোন হাত নাই, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বড় বড় অনুষ্ঠানে নামটী গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা গোলমাল হইবার সম্ভাবনা। আদম সুমারীতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি শ্রেণী

বিভাগ হয়। হিন্দু না বলিলে খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতির অন্তর্গত হইতে হইবে, তাই বাধ্য হইয়া আর্য্যসমাজীদের ন্যায় অনেককে হিন্দু বলিতে হয়। নতুবা ইচ্ছা করিয়া কে গোলামীর বোঝা মাথায় বহন করিতে চায়।

শাস্ত্র।

"শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধঃ যত্র বিদ্যতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥" শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রুতিমান্য, পরে স্মৃতি, তারপর পুরাণ। যাঁহারা ভাবেন. সব শাস্ত্র এক, অথবা এক নিশ্বাসে "বেদ পুরাণ" উচ্চারণ করেন বা উহাদিগকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া উহাদের একতা ও অপরিবর্ত্তনীয়তা ঘোষণা করেন, তাঁহারা যে অজ্ঞ,তাহা না বলিলেও চলে। নূতন সত্য আবিষ্কার করিলেই মানুষ মুনি হয় এবং সেই জন্যই বেদাদি পরস্পর হইতে বিভিন্ন—"বেদাঃ বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নঃ।" যখন ক্রমবিকাশে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, তখন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি যাঁহারা কালের গতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মত রদ করিয়া যুগোপযোগী স্বীয় নূতন মত প্রচার করতঃ মুনি হইয়া গিয়াছেন। একই শাস্ত্র অভ্রান্তরূপে চিরদিন মান্য থাকিবে, এমন ব্যবস্থা উন্নতিবিহীন অধঃপতিত মৃতপ্রায় মানুষ ছাড়া আর কেহ স্বীকার করে নাই। তাই "কৃতেতু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ। দ্বাপরে শাঙ্খ লিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥" (পরাশর সংহিতা) অথবা "অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে। অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহাসানুরূপতঃ॥" (মনু) যুগ পরিবর্ত্তনানুসারে নানা যুগে নানা ধর্ম্ম হইয়াছে। আবার যখন নূতন পরিবর্ত্তন আসিবে, তখন নূতন শাস্ত্র না হইবে কেন? মূর্খতা দূর করা অসম্ভব। শাস্ত্রে শ্রুতির যখন এই স্থান, তখন ইহার মত জানা সকলেরই কর্ত্তব্য। শ্রুতি বলেন, "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদো সামবেদোঽথর্ব্ববেদো শিক্ষা কল্পঃ ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" মুণ্ডকশ্রুতি। ঋগ্বেদাদি সব অপরা বিদ্যা. যে বিদ্যাদ্বারা সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে জানা যায়, কেবল তাহাই শ্রেষ্ঠ; সুতরাং শ্রুতির মতে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনাই একমাত্র সার বস্তু, শাস্ত্র মানিয়া যে ইহার অন্যথা করে, সে ভণ্ড, তাই মহাভারত বলেন, 'যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিংন তেন কৃতং পাপং চৌরেনাত্মাপহারিনা॥" যে এক রকম হইয়া আর এক রকম ভাণ করে, সেই আত্মাপহারী চোরের অকৃত দুষ্কর্ম্ম কিছুই নাই।

শাস্ত্রবাদ।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। অন্যত্তৃণ বদগ্রাহ্যমপক্তিং পদ্ম জন্মনা॥" যুক্তিযুক্ত কথা বালকের নিকট হইতেও গ্রহণীয়, ব্রহ্মাও যুক্তিহীন কথা বলিলে তাহা অগ্রাহ্য। "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া বিচার করিবে না; কেন না, যুক্তিহীন বিচারের দ্বারা ধর্ম্মহানি হয়। কেবল মাত্র শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া চলার অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুসরণ। রাজা রামমোহন রায় বলেন, অন্ধভাবে পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুসরণ করা পশুর ধর্ম্ম, মানুষের নহে।

"অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালঃ বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥" শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্য বিষয় বহু; কাল অল্প, বিঘ্ন অনেক. সুতরাং সার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কোন্‌টা সার কোন্‌টা অসার, তাহা বুঝিব কিরূপে? শাস্ত্রই তাহা বলিয়া দিবেন। "মোক্ষ প্রতিপাদকং শাস্ত্রম্" --যাহাদ্বারা মোক্ষপথ প্রদর্শিত হয়, তাহাই শাস্ত্র। মোক্ষ কাহাকে বলে? "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থাবিদ্যতেঽয়নায়"। শ্রুতি। ব্রহ্মকেই জানিলেই মোক্ষ হয়। মোক্ষলাভের অন্য পথ নাই। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক যাহা, তাহাই শাস্ত্র, আর সব অশাস্ত্র। সত্যজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, তাই "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।"

ব্রহ্মবাদ।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" (শ্রুতি)—পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করা কর্ত্তব্য "উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতম" (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)—আত্মার প্রতিষ্ঠাভূমি একমাত্র পরব্রহ্মই উপাস্য। "তমেবৈকং জানাথ্যানমন্যা বাচঃ বিমুঞ্চথ" (শ্রুতি) —একমাত্র সেই পরমাত্মাকেই জান, আর সকল পরিত্যাগ কর।

এই যে উপাস্য দেবতা, তিনি কিরূপ? ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষ পশ্যতি কশ্চনৈনম্ (শ্রুতি)—তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। যাঁহারা আকার কল্পনা করিয়া ঈশ্বর ভাবনা করিতে চায়, তাঁহাদের চক্ষুদানের জন্য আচার্য্য শঙ্কর বলেন, "নৈব দর্শয়িতুং শক্যঃ গবাদিবৎ"—গরু বাছুরের ন্যায় তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কেন না, "ন তস্য প্রতিমা অস্তি (শ্রুতি)—তাঁহার প্রতিমা হয় না। তিনি "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম" (শ্রুতি)—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়। তাহাকে কিরূপে উপাসনা করিতে হয়? "অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ শোকৌ জহাতি"(শ্রুতি)—অধ্যাত্মযোগের দ্বারা তাঁহাকে মনন করিতে হয়।" "ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরা প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতো ভবতি"(শ্রুতি) অধ্যাত্মযোগের দ্বারা সর্ব্বভূতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে।" য এতদ্বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ" (শ্রুতি)—যিনি তাঁহাকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতির অর্থের ধারণা করিবার চেষ্টা দ্বারা উপাসনা করিবে। এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপের ধারণা হইলে ক্রমে ক্রমে আত্মসাক্ষাৎকারের ভূমি লাভ হইবে। ব্রহ্মস্বরূপ কিরূপে জানা যাইবে? সাধকগণের হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে ব্রহ্ম স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা উপনিষদাদি ব্রহ্মজ্ঞান-মূলক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সকলের শ্রবণ মননের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা সাধিত হয়। সে সব স্বরূপ কি? "সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তৈত্তিরীয় শ্রুতি। "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" মুণ্ডক শ্রুতি। "শান্তং শিবমদ্বৈতম।" মাণ্ডুক্য শ্রুতি। "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম।" ঈশ শ্রুতি। "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশম্।" শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি। "প্রাণস্য প্রাণঃ", কেন শ্রুতি। "অজো নিত্যো শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো", কঠশ্রুতি। "ঈশানো ভূতভব্যস্য।" কঠশ্রুতি। "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" মুণ্ডক শ্রুতি। "রসো বৈ সঃ।" তৈত্তিরীয় শ্রুতি।

দেববাদ।

ব্রহ্মোপাসনা ছাড়িয়া দেবোপাসনা

করিলে কি হয়? "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহম স্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাম্"(বৃহদারণ্যক শ্রুতি) —যিনি আপনার বাহিরস্থ স্বতন্ত্র দেবতার উপাসনা করেন, তিনি অজ্ঞান, তাঁহাকে দেবতাদের পশু বলিলেই হয়। "যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জরেবমেকৈকঃ পুরুষঃ দেবান্ ভুনক্তি একস্মিন্নেব পশাবাদীয় মানে, প্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যৎ এতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ (ঐ যেমন মানুষের বহু পশু থাকে, তেমনই দেবযাজী মানুষেরা দেবতাদের পশু। একটা পশু কমিয়া গেলে মানুষের তাহা ভাল লাগে না, বহুর তো কথাই নাই। সেই জন্য দেবতারা চায় না যে মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। যেহেতু, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে আর মানুষ দেবতার আরাধনা করিবে না, সুতরাং দেবতাদের পশুর সংখ্যা কমিয়া যাইবে। শ্রুতির মতে যাহারা দেবতার আরাধনা করে, তাহারা পশু তুল্য। ঝঞ্ঝাট আরও আছে। "সর্ব্বে দেবা তং বলি মাহরন্তি (শ্রুতি)—দেবতারা ব্রহ্মোপাসকের পূজা করেন।

সাধনাবস্থা ও সিদ্ধি।

আজকাল রাজা রামমোহন রায়ের খুব সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কেন না, যদিও তাঁহার সমসাময়িক প্রতিপক্ষগণ সাধনাবস্থা ও সিদ্ধি তো দূরের কথা, তাঁহার যে ব্রহ্মোপাসনার অধিকার আছে, তাহাই স্বীকার করেন নাই, ইদানীন্তন কেহ কেহ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দ্বেষ ও মৎসরতা বশতঃ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, রাজা "পরমহংস" ব্রতধারী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ব্রহ্মোপাসনার অধিকার ছিল, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের তাহাতে অধিকার নাই। এই সকল লোকের অজ্ঞতা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। সর্ব্বসাধারণের যে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য রাজা প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, এই অতি সামান্য কথাটাও ইঁহারা জানেন না। এই ক্ষুদ্র কথাটাই ইহাদের বোধগম্য হয় না যে, সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অধিকার ও সাধনাবস্থার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। রাজা সর্ব্বদা আপনার সাধনাবস্থার কথাই বলিয়া গিয়াছেন, এবং "সম্যগনুষ্ঠাণাক্ষম তজ্জন্য মনস্তাপ বিশিষ্ট" বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিতেন। তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার আদর্শ উচ্চ ছিল, কাজেই তিনি নিজেকে সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম মনে করিতেন। রাজা প্রতিপক্ষদিগকে বলিয়াছিলেন, কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকলেরই একটা একটা আদর্শ আছে, কিন্তু কয়জন এই আদর্শ আয়ত্ব করিয়াছেন? আদর্শানুসারে সম্যগ চলিতে অসমর্থ হইয়াও ইঁহারা যদি শৈব শাক্ত বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইতে পারেন, তবে ব্রহ্মোপাসকের পক্ষেই তাহা দোষাবহ হইবে কেন? যাঁহারা আজ আবার সেই প্রশ্ন তুলেন, তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের শতবর্ষ পশ্চাৎগামী। যে, যে বিষয়ে সিদ্ধি চায়, তাহাকে সেই পথে চলিতে হয়। কোন কোন অজ্ঞলোক মনে করে, যে আগে পৌত্তলিকতার সাধন, পরে ব্রহ্মোপাসনা। এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, প্রথমে সাকারোপাসক ছিলেন, পরে নিরাকারবাদী হইয়াছেন। তাহাতে সাকারোপাসনা নিরাকারোপাসনার সোপান বলিয়া প্রমাণ হয় না। যাঁহারা এরূপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাকারোপাসনার ভ্রান্তি

বুঝিয়া উহা পরিত্যাগ করতঃ নিরাকার ধরিয়াছিলেন। আম্রফল লাভ করিবার আশায় কেহ যেমন ভেরেণ্ডা গাছ পুতে না, তেমনই, ব্রহ্মলাভ করিবার আশায় কেহ পুতুল পূজা করে না। ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে প্রথম হইতেই ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিতে হইবে। তবে, ব্রহ্মোপাসনার যে নানা স্তর আছে, তাহা রাজা রামমোহন রায়ই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মোপাসনাই যে মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য, আর সব যে পণ্ডশ্রম, তাহা নিঃসন্দেহ। তাই রাজা প্রতিপক্ষের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন,—"হে পরমেশ্বর, কবিতাকারকে আত্মা ও অনাত্মার বিবেচনার প্রবৃত্তি দাও।" কেবল পণ্ডশ্রম তাহা নহে, কিন্তু বিনাশের পক্ষ। "যো অন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎসীতি" [বৃহদাণ্যক শ্রুতি]—পরমাত্মছাড়া আর কিছুকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিলে তাহার বিনাশ হয়। অপরঞ্চ, সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভং। যস্তারয়তিনাত্মানং তস্মাৎ পাপর্ত্তরোঽত্র কঃ॥"মোক্ষের সোপানভূত এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া যে আপনার মোক্ষের চেষ্টা না করিল, তার অপেক্ষা অধিকতর পাপী আর কে? অথচ ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া মোক্ষ হইতেই পারে না। সুতরাং ব্রহ্মোপাসকের যে নিন্দা করে, তার মত পাপিষ্ঠ আর নাই। "যে দ্রুহন্তি খলা পাপা পরব্রহ্মোপদেশিনঃ"— তাহারা নিজেদেরই অনিষ্ট করে—"স্বদ্রোহং তে প্রকুর্ব্বন্তি।" যেহেতু, "তস্য হ ন দেবাশ্চ না ভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি।" [শ্রুতি]—দেবতারাও ব্রহ্মোপাসকের অনিষ্ট করিতে পারে না, কেন না, তিনি দেবতাদেরও পূজ্য।

রাজা বলিতেছেন, "সংসারে আসক্তি, এ অপবাদে দুর্জ্জনের মুখ হইতে নিস্তার নাই, যে হেতু কি ইদানীন্তন কি পূর্ব্বযুগে, গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠদের বিষয়-ব্যাপার দেখিয়া কেহ বিষয়াসক্তির দোষ তাহাদিগকে দিলে ইহার অপ্রমাণ করা লোকের নিকট দুষ্কর হয়।" "শাস্ত্রে সাধন চতুষ্টাকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার কারণ কহিয়াছেন। অতএব যখন কোন ব্যক্তিতে ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা উপলব্ধি হয়, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে, এরূপ ইচ্ছার কারণ যে সাধন চতুষ্টয়, তাহা ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্বজন্মে এ ব্যক্তির হইয়াছে, নতুবা কারণ না থাকিলে কিরূপে কার্য্যের সম্ভাবনা হয়।" "সাধন কালে শমদমাদি অন্তরঙ্গ কারণ হয়েন কিন্তু সে কালে সম্পূর্ণ রূপে শমদমাদি বিশিষ্ট হওনের সম্ভব হয় না, যে হেতু সম্পূর্ণরূপে শমদমাদি বিশিষ্ট হওয়া সিদ্ধাবস্থার স্বাভাবিক লক্ষণ, তাহা সাধনাবস্থায় কিরূপে হইতে পারে?" "অতএব সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থার প্রভেদ এবং সাধনাবস্থাতে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ইত্যাদি ভেদ ভগবদ্গীতাদি তাবৎ মোক্ষশাস্ত্রে করেন, সিদ্ধাবস্থার ধর্ম্ম সাধনাবস্থায় কেন নাই এবং উত্তম সাধকের লক্ষণ মধ্যম ও কনিষ্ঠাদি সাধকেতে কেন নাই, এই ছল গ্রহণ করিয়া নিন্দা করা কেবল দ্বেষ ও পৈশুন্য হেতু ব্যতিরেকে কি হইতে পারে?" (পথ্য প্রদান—১ম ও দ্বিতীয় অধ্যায়।)

অধিকার-ভেদ।

ব্রহ্মজ্ঞানে কি সকলেরই অধিকার? সকলেই কি ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী? যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা মঙ্গল, যাহা লইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব, যাহা না হইলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়, ইহাই শ্রুতির আদেশ,তাহাতে মানুষ

মাত্রেরই অধিকার। উপনয়ন হওয়া মাত্রই সকল বালক "ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গ দেবেস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" (শ্রুতি)—এই গায়ত্রী মন্ত্র যোগে ব্রহ্মোপাসনার জন্য আহূত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রে কোন সাকার দেবদেবীর কথা নাই, পুতুল পূজাও নাই—আছে জগৎপ্রসবিতা পরমেশ্বরের বরণীয় মহিমার মানস ধ্যান। যে তাহা না বুঝিয়া কেবল আওড়ায় আর ভাবে তাহার ব্রহ্মোপাসনার অধিকার নাই, সে অবশ্য মনুষ্য পদবী হইতে নামিয়া গিয়া তোতা পাখীর আসন গ্রহণ করে। কেন না, তোতা পাখীই কেবল না বুঝিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকারী। আর, এরূপ আওড়াইয়া লাভই বা কি? "মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ। শতলক্ষং প্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রঃ ন সিদ্ধ্যতি ॥' মন্ত্রের অর্থ না জানিয়া লক্ষবার জপ করিয়াও কোন ফল হয় না।

অনধিকারে প্রত্যবায়।

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার না দিলে চলিবে কেন? " য এতদবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ (শ্রুতি)—যে ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে অতি কৃপা পাত্র। পাগল ভিন্ন আর কেহই যখন কৃপাপাত্র থাকিতে চায় না, তখন সকলকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

"অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা। ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক্ব মুক্তি ক্বেহ বা সুখম্" ॥ (পঞ্চদশী চিত্রদীপ ২১৭) যাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, তাঁহারা ভ্রান্ত তাঁহাদের মুক্তিইবা কোথায়, সুখই বা কি? 'ইহ চেদাবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ" (শ্রুতি)—ইহলোকেই যদি তাঁহাকে জান, তবেই জীবনের সার্থকতা হইল, যদি ইহজীবনে তাঁহাকে না জানিলে, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

অধিকারীর সুখ।

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" ॥ (গীতা) আরম্ভ করিলে এ ধর্ম্মের নাশ নাই, এ ধর্ম্মে কোন প্রত্যবায় নাই; এ ধর্ম্মের একটু মাত্রও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে। যদি এই উচ্চ ধর্ম্ম আরম্ভ করিয়া কেহ ইহা হইতে ভ্রষ্ট হয়, তবে কি তাহার উভয় কুল নষ্ট হইল না? পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ প্রাপ্য পুণ্যকৃতান লোকান উষিত্বা শাশ্বতী সমা। শুচীনাং শ্রীমতাং গৃহে যোগভ্রষ্টঃ অভিজায়তে ॥ অথবা যোগী নামেব কুলে ভবতি ধীমতাং। এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ তত্র ত বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্ব দৈহিকং। যততে চ ততঃ ভূয়ো সংসিদ্ধৌ কুরু নন্দন ॥ পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশো পি সঃ জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতি-বর্ত্ততে ॥ (গীতা)।

ইহলোকে বা পরলোকে তাহার বিনাশ নাই, কল্যাণকারীর কোন দুর্গতি হয় না। যদি এ পথ ধরিয়া কেহ তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয়, তবে সে বহুকাল পুণ্যফল ভোগ করিয়া পবিত্রাত্মা ধনবানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে, অথবা বুদ্ধিমান যোগীর গৃহে জন্মায়—এরূপ জন্ম অতি দুর্লভ! সে তখন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত, জ্ঞান লাভ করিয়া সেখান হইতেই সাধন আরম্ভ করে। তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার তাঁহাকে জোর করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। এই যে ব্রহ্মযোগ, ইহা জানিবার আকাঙ্ক্ষাও

যাঁহার হৃদয়ে উপস্থিত হয়, সে বেদকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং এই ধর্ম্মের যে প্রতিবাদ করে, সে যে অতি মূর্খ, তাহা বলাই বাহুল্য। সকাম ধর্ম্ম তবে কিরূপ ?

সকামোপাসনা।

"পণ্ডিতেনাপি মূর্খঃ কাম্যে কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ" (রঘুনন্দন)—পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খকেও সকাম কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না। সুতরাং যাঁহারা "ধনং দেহি জনং দেহি শত্রুং জহি"বলিয়া দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা কাজেই মূর্খের মূর্খ। তবে কি পৌত্তলিকতার কোন স্থান নাই ? একটু আছে। রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন, যে যাহারা এতই অবোধ যে উচ্চ কিছুরই ধারণা করিতে পারিবে না, তাহারা যাহাতে ধর্ম্মহীন হইয়া নানা দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়, সেই জন্য এই ব্যবস্থা—তাহারা পুতুলাদি লইয়া আপনাদের মনোরঞ্জন করিবে। ইহা যেন ধর্ম্ম-জগতের রিফর্ম্মেটরী স্কুল। আর যা, তা এই সব পূজা অর্চ্চনাতে যাদের লাভ, তাদেরই প্ররোচনা।

পৌত্তলিকতা। *

কেন না, কিং স্বল্পতপসাং নৃণাং অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাম্ (ভাগবত, ১০।৮৪)—যে সকল ব্যক্তি প্রতিমাতে দেবতা দর্শন করে, তাদের কি অল্পতপস্যা ?

"মনসা কল্পিতা মূর্ত্তিঃ নৃণাং চেৎ মোক্ষ-সাধিনী। স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবস্তদা"। মহানির্ব্বাণ—মূর্ত্তি কল্পনার দ্বারা যদি মানুষের মোক্ষ সাধিত হইত, তবে

---

* বিগত কার্ত্তিক মাসের শারদীয়া সংখ্যার নারায়ণে পৌত্তলিকতার সপিণ্ডকরণ হইয়া গিয়াছে। পুরোহিত, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পাল। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 'দুর্গোৎসবের প্রতিমাটা নিতান্তই অবান্তর। উহা নিতান্ত আধুনিক। শারদীয়া পূজা আদিতঃ গাছ পালা লইয়া আনন্দোৎসব ছিল। বর্ষাপগমে শরতে নবজাত বৃক্ষলতার শোভায় মুগ্ধ মানুষ লতা পাতা লইয়া আমোদ করিত। অহা হইতেই নব পত্রিকার পূজা আসিয়াছিল। বসন্ত কালের পূজা শ্রীরাম অকালে করিয়াছিলেন ; ইহা মিথ্যা কথা—রামায়ণাদিতে তাহা নাই। নবপত্রিকার পূজা বসন্তকালের সৃষ্টি নহে, তৎকালে ঐ সকল লতা পাতা দুষ্প্রাপ্য।" পণ্ডিত পাঁচকড়ি দুর্গা পূজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অকাল বোধনে কুলকুণ্ডলিনী জাগাইয়াছেন, ষটচক্র ভেদ করিয়াছেন। উহাই দুর্গা পূজা। তবে যে পুতুল গড়া,ভোগরাগ দেওয়া—পশুমাংসের ষোড়শোপচার করা, এ সকলই সামাজিক সম্মিলনের জন্য। উহা উৎসব, পূজা নহে। তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, পুতুল পূজার জন্য নহে, তামাসায় জন্য। "প্রতিমা আরাধ্য নহে, উহা ঘর সাজান সামগ্রী"। বিপিন বাবুর মতামত পাঠকবর্গ ইতিপূর্ব্বেই অবগত আছেন। তাঁহার যে সব স্থলে ভ্রান্তি আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় নব্যভারতে খণ্ডিত হইয়াছে। তবে এবারে প্রচলিত পুতুল পূজার বিনাশ সাধনকে পূর্ণতা দিয়াছেন মাত্র। তিনি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে মূর্ত্তিনির্ম্মাণ ব্রহ্মজ্ঞানের পরবর্ত্তী। যাহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় নাই, তাঁহার পুতুলে অধিকার নাই। সুতরাং প্রচলিত পুতুল পূজা উঠাইয়া দিতে হইবে। উহা ধর্ম্মজীবনের পক্ষে অনিষ্টকারী। "ইহা লোকের ধর্ম্মকে প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছে।" ধ্যান যোগে সাধক যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, মূর্ত্তি তাহারই স্মারক চিহ্ন। এই মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি সেই ভাব জাগাইয়া রাখিবেন। ইহাতে বস্তুতঃ কাহারও আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে বিপিনবাবু যে তাঁহার এই উচ্চ অঙ্গের symbolismকে

স্বপ্নবদ্ধ রাজ্যের দ্বারাঃ মানুষ রাজা হইত। যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে, স্বধী কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধী যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলীলে ন কর্হিচিজ্জনেভিজ্ঞেষু স এব গো-খরঃ” (ভাগবত)—দেহে যার আত্মবুদ্ধি, পুত্রাদিতে আপন বুদ্ধি, মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে উপাস্য বুদ্ধি, জলে যার তীর্থবুদ্ধি, যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাগমকেই তীর্থ মনে করে না, সে গরুরও গাধা।

“মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়া পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥” (মহানির্ব্বাণ)—মৃত্তিকা শিলা ধাতু কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে যাহারা ঈশ্বর বুদ্ধি করে, তাহারা তাহাদের চেষ্টা দ্বারা কেবল কষ্ট পায়, কখনও শান্তি পায় না।

“কাষ্ঠ লোষ্ট্রেষু মূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা” (রঘুনন্দন, আহ্নিক তত্ত্ব)—কাষ্ঠ লোষ্ট্রে মূর্খদিগের দেবতা বুদ্ধি হয়।“সাকারং অনৃতং বিদ্ধি নিরাকারশ্চ নিশ্চলম্”(অষ্টাচক্র-সংহিতা, ১ম প্রকরণ)—সাকার মিথ্যা বলিয়া জান। নিরাকারই ধ্রুব সত্য।

বাল ক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদি কল্পনং। বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো য সমুক্তঃ নাত্র সংশয়ঃ॥ (মহানির্ব্বাণ)—যে ব্যক্তি রূপ নামাদি কল্পনাকে বালক্রীড়নবৎ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, সেই মুক্তিলাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই।

“উপেক্ষ্য তৎ তীর্থযাত্রা জপাদীনেব কুর্ব্বতাম্। পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেঢ়ি ইতি ন্যায় আপতেৎ। (পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ) —পরব্রহ্মের উপাসনা পমিত্যাগ করিয়া যাহারা তীর্থযাত্রাদিতে রত, তাহারা হস্তস্থিত খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া হস্তই লেহন করে।

“যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ়াৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ (ভাগবত ৩।২৯)—সকল প্রাণীতে বর্ত্তমান আত্মাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা না করিয়া মূঢ়তা বশতঃ যে প্রতিমা পূজা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়। যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে চিরদিন পুতুল পূজাই করিবেন, তাঁহাদের হাত চাটা আর ছাইতে ঘি ঢালাই সার। বৃথা পরিশ্রম। জীবনটা পণ্ড। তাই মনু প্রতিমা-পূজক ব্রাহ্মণকে দৈবপিত্র্য কার্য্যে বর্জ্জন করিতে আদেশ দিয়াছেন—মনু, ৩।১৫২।

জাতিভেদ।

“ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥” শান্তি ১০৮।১০। বর্ণের ইতর বিশেষ নাই, ব্রহ্মা প্রথমে সব ব্রাহ্মণ করিয়াই সৃজন করিয়াছিলেন, পরে কর্ম্মানুসারে জাতিভেদ ঘটিয়াছে। “চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ। (গীতা)—গুণ ও কর্ম্মভেদে চারি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। কি গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়? সর্ব্ব প্রধান গুণ, ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ—কেন না,“য এতৎ বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ—আর কি বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঠিক করিব? “সত্যং দানং ক্ষমাশীল মানৃশংস্য তপোঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥” বন, ১৮০।২১। দান ইত্যাদি যাহার মধ্যে আছে, সেই ব্রাহ্মণ। এখন কি ব্রাহ্মণের ছেলেকে ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের ছেলেকে শূদ্র ধরিতে হইবে? না, তাহা নহে।

প্রচলিত মূর্ত্তিপূজার ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেইটাই আপত্তিজনক। যাহা হউক, ‘সাম্রাণ’ কার্ত্তিক মাসে পৌত্তলিকতার সংকার করিয়াছেন।

“ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।” (বন,১৮০।২৫) তবে কি? যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ সমৃতঃ। যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥ ২৬। যাহার মধ্যে ঐ সকল গুণ আছে, তিনি ব্রাহ্মণ, যাহার মধ্যে নাই, তিনি শূদ্র। জন্মই কি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদের নিয়ামক? না।

“চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
.হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোপি স্বপচাধমঃ ॥”

ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য যদি ব্রাহ্মণ না করেন?

“যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ মনু ২।১৬৮—বেদপাঠ ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ যদি অন্য কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে ইহজন্মেই সপরিবারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছেলে যদি ব্রাহ্মণ থাকিতে চান, তবে কেবল বেদপাঠ করিবেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন, না করিলে বড় বিপদ।

উপবীত। †

ব্রহ্মতত্বং ম জানাতি ব্রহ্মসূত্রেন গর্ব্বিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥ অত্রি. ৩৭২। ব্রহ্মজ্ঞান নাই, অথচ উপবীতের জোরেই যিনি ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন, তাহাকে অত্রিমুনি পশুর মধ্যে গণ্য করিতে বলিয়াছেন।

ঋষির প্রার্থনা।

“অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতংগময়” (বৃহদারণ্যক শ্রুতি) অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও।

নির্গুণ ও সগুণ।

নির্গুণ ও সগুণ, দুই বস্তু নহে, একই বস্তুর দুই দিক। গুণ—সত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিনের সমাবেশ বিধানে জগতের উৎপত্তি। যিনি ইহার অতীত, তিনি নির্গুণ। তিনি ইহার অতীত হইলেও ইহার সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত হইতে পারেন না; কেন না, জগতের সহিত যাঁহার সম্বন্ধ নাই, তাঁহাতে (transcendent) জগদতীত এই আখ্যা প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে তিনি নির্গুণ কিরূপে? এই সকলের অধীন নহেন, তাই তিনি নির্গুণ। এই জগৎ দেশ ও কালে প্রকাশিত। দেশ ও কালকে ছাড়িয়া জগৎ কল্পনা করিতে পারি না। ‘এখান’ ও ‘সেখানের’ সম্বন্ধই দেশ এবং ‘এখন’ ও ‘তখনের’ সম্বন্ধই কাল। কিন্তু যিনি এই সম্বন্ধের অতীত নহেন, তিনি এই মিথুনকে একত্রিত করিয়া দেশ ও কাল রচনা করিতে পারেন না। যিনি দেশ ও কাল রচনা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত। আমরা আমাদের আত্মায় যে বস্তুর পরিচয় পাই, তাহাকে যে সগুণ রূপেই ধারণা করিতে হইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই। আমরা আমাদের আত্মাতেই ত্রিগুণের অতীত বস্তুরই পরিচয় পাইতেছি। আমরা এখানে যাঁহাদের পরিচয় পাইলাম, তিনি সত্বরজোতমোগুণের সম্মিলনে উৎপন্ন বিচিত্র বিশ্বের আধার এই দেশ কালেরও অতীত—তিনি নির্গুণ। সগুণও আবার তিনিই।

---

† অধিকাংশ গৃহ্য সূত্রেই উপনয়নের সময় উপবীতের উল্লেখ নাই। কোমরে ঘাসের দড়ী জড়াইবার ব্যবস্থা ছিল। তারপর, ধর্ম্মকার্য্যে পৈতা ঝুলাইবার ব্যবস্থা হয়, রাত্রিদিন পরিয়া থাকিবার ব্যবস্থা ছিল না। পরে যখন ব্যবস্থা হয়, স্ত্রীপুরুষ সকলেরই উপবীতে অধিকার ছিল। এখন পার্শীদিগের মধ্যে যেমন প্রথা আছে। নারীকে উপবীতহীন করা, ভারতের নারীজাতির অবনতিমার্গের একটা ধাপ।

সগুণ ও সাকার।

কেহ কেহ বলেন, সগুণ ও সাকার একই। আকার—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ। সুতরাং সগুণ ও সাকারকে এক করিতে হইলে সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ গুলিকে দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি বিশিষ্ট করিতে হইবে। কবির নিকট গুণ গুলির মূর্ত্তি থাকিলেও থাকিতে পারে, দার্শনিকের নিকট নাই। আকার বিশিষ্ট বস্তু সকল গুণের প্রকাশ হইলেও গুণের সকল প্রকাশই সাকার নহে। সগুণের উপাসনা কোন কোন স্থলে সাকার উপাসনা হইলেও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কখনও সাকারোপাসনা নয়। কেন না, সাকার হইলেই এক ভাবেই সীমাবদ্ধ হইতে হয়, কিন্তু ব্রহ্ম অসীম। তিনি গুণ গুলিকে পরিচালিত করেন, তাই তিনি সগুণ। গুণের নিয়ন্তাকে সাকার ভাবিতে হয় না। গুণের প্রকাশ অসীম না হইলেও গুণের নিয়ন্তা অসীম। সগুণ ভাবেই দেখি, আর নির্গুণ ভাবেই দেখি, কোন দিক্ দিয়াই তিনি সাকার নহেন। অনেকে মনে করেন. আকার ছাড়া চিন্তা হয় না, ইহা তাঁহাদের একটা ভ্রান্তি। সাংখ্য মতেই সত্ত্বরজোতমো গুণের বৈষম্যে উৎপন্ন যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, তাহারা অবশ্য সগুণ হইলেও মনবুদ্ধিঅহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি আকারশূন্য—আকার কেবল পঞ্চস্থূলভূতের। ইহার মধ্যে পূর্ণ আকারের স্থান আরও সংকীর্ণ। যে পশুজীবন যাপন করে, সে-ই কেবল সর্ব্বদা আকারের মধ্যে থাকে।

সাকার ও নিরাকার।

সাকারোপাসনা দ্বারা মানব-জীবনের কোনই উচ্চ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। মানবাত্মাকে জ্ঞান প্রেম পুণ্যে উন্নতির দিকে লইয়া যাওয়াই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। জ্ঞান প্রেম পুণ্য আত্মার স্বরূপ। ইহারা সাকার নহে। এমন মূর্খ কে আছে যে বলিবে, জ্ঞানের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ আছে, প্রেম গোলাকার বা চতুষ্কোণ, পুণ্য হরিৎ বা লোহিত বর্ণ। কোন আকার চিন্তনে ইহাদের হ্রাসবৃদ্ধি হইবে না। ভগবান যদি সাকার হইতেনও, তবুও তাঁহার আকারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ থাকিত না। যাঁহার মধ্যে জ্ঞান প্রেম পুণ্য পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, সেই পরব্রহ্মের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন, আত্মার আশ্রয় পরমাত্মারূপে তাঁহার সঙ্গে যোগ অন্তর্যামীরূপে তিনি আত্মায় বর্ত্তমান, এই চিন্তন ও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ, ইহাই ধর্ম্ম। কোনরূপ মূর্ত্তি পূজায় মানবজীবনের সফলতা নাই। যাহারা নিতান্ত মননহীন জীবন যাপন করে, ইন্দ্রিয়-ঘটিত পশুজীবনের উপরে উঠিবার সাধ্য নাই, তাহারাই মাত্র সাকারের পক্ষপাতী হইতে পারে, অন্যেরা নহে। অনেকে কেবল গতানুগতিকতার অনুসরণ করিয়াই ইহার সমর্থন করেন। একটু চিন্তা করিলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে এই ভ্রান্তি অপনোদিত হয়।

নিরাকারের উপাসনায় আকারবাচক শব্দের ব্যবহার।

মানবের শৈশবাবস্থাতেই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তখন জ্ঞান সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ক্রমে জ্ঞান বাড়িয়াছে, কিন্তু স্থূলভাষা দ্বারাই অনেক স্থলে সূক্ষ্ম জ্ঞানকে ধরিয়া মানবজাতিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ভাষার এই হের ফের বুঝা বড় শক্ত। কেবল স্থূল কেন, জানিয়া শুনিয়া ভাষার অনেক মিথ্যাই ব্যবহার করিতে হয়। যখন মানুষ অজ্ঞান ছিল, তখন ভাবিত

যে পৃথিবী স্থির, সূর্য্যই ঘোরে। এখন সে ভ্রান্তি গিয়াছে, কিন্তু "সূর্য্যাস্ত" 'সূর্য্যোদয়" কথাগুলি রহিয়াছে। "সূর্য্যোদয়" কথাটী শুনিয়া মূর্খের মনেই মাত্র পূর্ব্বভাব উদিত হয়, জ্ঞানী ঐ কথাটা ব্যবহার করিয়াও উহার আক্ষরিক অর্থের উপরে থাকেন। "ধরা" কথাটা যখন প্রথম ব্যবহার হইয়াছিল, তখন উহার অর্থ ছিল, হস্ত দ্বারা কোন জড় বস্তু ধরা।' ক্রমে অর্থ সূক্ষ্ম হইয়া উহা আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিয়াছে। "আমি এ কথার অর্থ ধরিতে পারি নাই" বলিলে যদি কেহ হাত দিয়া জড় বস্তু ধরার কথা মনে আনে, তবে সে তাহার জড় বুদ্ধিরই পরিচয় প্রদান করে। "এবার চাউল অগ্নিমূল্য" বলিলে কোন মূর্খও ভাবে না যে আগুন দিয়া চাউল কিনিতে হইবে। "তাহার কথা কর্ণে মধু বর্ষণ করে" শুনিয়া যদি কেহ ভাণ্ড হইতে কাণে মধু ঢালার ছবি মনে আনে, তবে তাহার মূর্খতাই প্রকাশ পায়! "আমার হাতে টাকা নাই', এই বাক্যের হাত কথার অর্থ অভিধানে নাই। অথবা "তাঁহার হাতে অনেক টাকা' শুনিয়া যদি কেহ তাহার হাত টানিয়া দেখিতে যায়, হাতে টাকা আছে কি না, তবে সে নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ হয়। এরূপ ব্যবহার কেবল অপোগণ্ড শিশুরই শোভা পায়। কোন গুরুতর বিষয়ের কথা শ্রবণ করিয়া তৎবিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতার জন্য জিজ্ঞাসিত হইয়া যখন বলি, "সবুর কর, দেখি কি হয়" তখন এই দেখা যে, চক্ষুর দৃষ্টি বিষয়ে প্রযুক্ত নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। যেখানে রূপ আছে, সেখানেই যখন রূপ শব্দ অরূপ অর্থে ব্যবহার হয়, যেখানে আগে হইতেই বলা হইতেছে রূপ নাই, সেখানে উহা রূপক ও উপমা অর্থে সে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বঙ্গসাহিত্যে কলঙ্ক-রেখা।

জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। সমাজে এমন কোনও ভাবের স্রোত থাকিতে পারে না, যাহা জাতীয় সাগিত্যে প্রতিফলিত হইবে না। সাহিত্য-দর্পণে সমাজ প্রতিফলিত হইবেই হইবে। যে জাতীয় সাতিত্যে জাতীয় জীবনী শক্তির প্রাবল্য নাই, জাতীয় জীবনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নাই, সে সাহিত্য অপার্থিব, দেবতার ভোগ্য, মানবের নয়। শৈবাল দামে জড়ীভূত শীর্ণকায়া নদী.এবং দিগন্তবিস্তৃত চরের উদাস-শূন্যতা বিপাকগ্রস্ত প্রেমিকের মোহতার কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের তৃপ্তিকর এবং ভাবোদ্দীপক হইতে পারে না। বর্ষার খরস্রোতে যে উদ্দীপনা এবং বলবীর্য্যের সমাবেশ আছে, তাহাই কর্ম্মপ্রবণ মনুষ্য সমাজের তৃপ্তিসাধক। আমাদিগের প্রবৃত্তির প্রচণ্ড গতিশক্তিই সমাজের নিয়ন্তা। যে সকল প্রবৃত্তির তড়িৎশক্তি সমাজের শিরায় শিরায় উদ্দাম কর্ম্মস্রোতঃ প্রবাহিত করিতেছে, তাহাদিগের প্রতিচ্ছবি জাতীয় সাহিত্যে পাইবার জন্য আমরা লালায়িত হই। সাহিত্যিক সমাজের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আপনার মানস-প্রতিমার অর্চ্চনায় জীবনপাত

করিলে কখনই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবেন না। সাহিত্যে উচ্চ আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থল, কল্পনার পারিজাত কানন এবং উন্নতির সোপান, কিন্তু সামাজিক অবস্থার অনুমত প্রস্তরাবলীতেই তাহার ভিত্তি। আজকাল ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্বের আলোচনায় সাহিত্যিকের কাল্পনিক ভাববিন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। সরস ভাবময় কাব্যে সমাজের ছবি আপনিই পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। সে ছবি অতিরঞ্জিত নহে, সত্যের কঠোর জীমূতমন্দ্র তাহার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে ধ্বনিত হইতেছে। নিনিভা, অসিরিয়া এবং মিসর দেশের প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিবৃন্দের কাহিনী তাহাদিগের কীর্ত্তি কলাপের সহিত রেণু রেণু হইয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। সুধীবৃন্দ অপার গবেষণার ফলে ঐ সকল দেশের সাহিত্যের ভগ্নাংশে জাতীয় ইতিহাসের যে অমর আশ্বাস বাণী পাইয়াছেন, তাহাই যেন কোন উত্তর সাধকের "মাভৈঃ মাভৈঃ"। হোমারের অমর কাব্যে গ্রীকদেশের ইতিহাসের যে প্রচ্ছন্ন আভাস আমাদিগের শ্রুতিবিবর মোহিত করিয়া দিগন্ত প্রসারিত হইয়া পড়ে, তাহার তুলনা গ্রীকদেশীয় ইতিহাসে নাই। রামায়ণ কিম্বা মহাভারতে হিন্দু-সমাজ শৃঙ্খলার যে আভাস পাই, তাহাই বর্ত্তমান গবেষণাপ্রবণ ঐতিহাসিকের অন্ধের যষ্টি। সমাজ এবং সাহিত্যের মধ্যে ব্যবধান যতই বাড়িয়া উঠে, সাহিত্য ততই ক্ষীণপ্রাণ এবং নির্জীব হইয়া পড়ে। যে সাহিত্যের সহিত সমাজের চিরবিচ্ছেদ হইয়াছে,তাহা মুমূর্ষুর ক্ষীণ হাস্যের মত অস্থায়ী এবং মর্ম্মবিদারক। যে সাহিত্যে জাতীয় জীবনের ঝঙ্কার নাই,জাতীয় জীবনের ব্যাকুলতা এবং কলধ্বনি নাই, তাহা শ্রুতিকঠোর বিদেশীয় যন্ত্রের ধ্বনির মত অসার এবং ভাবহীন। জাতীয় জীবনের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গমে করিতে না পারিয়া উদ্বাহ হইলে সাহিত্যিকের অবজ্ঞার কলঙ্কলেখাই স্বাভাবিক। যে সাহিত্যে জাতীয় জীবনের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবির বিকাশ হইয়াছে, তাহাই অমর এবং অক্ষয়।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শে গঠিত হইয়াছে। "ইংলণ্ডের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না ভারত, ভারতের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না ব্রীটন।" বস্তুতঃ আমাদিগের জাতীয় আদর্শ এবং ইংলণ্ডের জাতীয় আদর্শের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদিগের বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে আমাদিগের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখ মানবের দৈনন্দিন জীবনের চিরানন্দময় ইতিহাসের আভাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। বনরাজিচ্ছায়া-সুশীতল গ্রামের অভ্যন্তরে যে মানব জীবন স্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার ছবি আমাদিগের সাহিত্যে আজিও পরিস্ফুট হয় নাই। বাঙ্গালার অন্তর্দ্দেশবাসী নিতান্ত বাঙ্গালীদিগের সুখ দুঃখের কথা এপর্য্যন্ত কোনও উপন্যাস-লেখকের চিত্তাকর্ষণ করে নাই। আমাদিগের চিরপীড়িত ধৈর্য্যশীল স্বজনবৎসল, বাস্তু-ভিটাবলম্বী প্রচণ্ড কর্ম্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙ্গালীর কাহিনী আজিও আমাদিগের সাহিত্যে স্থান পাইল না, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, ম্যালেরিয়া জ্বর বঙ্গের গ্রামে গ্রামে বিরাজ করিতেছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে চন্দনপঙ্ক লেপন করিলে দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে, চন্দ্রমাশালিনী পূর্ণিমা-যামিনী সান্ত্বনার কারণ

হওয়া দূরে থাকুক, যন্ত্রণার কারণ হয়, স্নিগ্ধ সমীরণকে বিভীষিকা জ্ঞান হয়, অথচ বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের আদিকবি মধুসূদন হইতে আমাদিগের প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বাগচী এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কবিতায় ম্যালেরিয়া জ্বরের কথা কোথাও নাই। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের জাতীয় ভাবের সহিত বিচ্ছেদের কথা ভাবিলে কবির কথাই মনে পড়ে ।

নেই বাঁশী, নেই বঁধু,
নেইরে যৌবন মধু,
মুচেছে পথিক বঁধু
সজল নয়ান !
যেনরে সরম টুটে,
কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরে উঠে,
করে না আকুল !
আছে ভাব নাই ভাষা,
নাই শস্য আছে চাষা,
আছে নস্য নেই নাসা
এও যে তেমনি !

উপন্যাসের আদিগুরু বঙ্কিমবাবু ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র ইংরাজি ভাবে পরিপ্লুত বর্ত্তমান বাঙ্গালীর মর্ম্মবাণী অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙ্গালীর কথা আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার হৃদয় যেন দমিয়া গিয়াছে, বাগ্‌দেবী কণ্ঠ পরিত্যাগ না করিলেও যেন তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন নাই। বঙ্কিমবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেক ঔপন্যাসিক যশের আশায় পথ হাঁটিতেছেন। তাহার মধ্যে কেহই আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের গ্রন্থে চিরপরিচিত বাঙ্গালাদেশের একটী সজীবমূর্ত্তি জাগ্রত করিয়া তুলিতে কৃতকার্য্য হন নাই। প্রকৃত বাঙ্গালী আজ পর্য্যন্ত একটীও তাঁহাদের মনোমত কবি পান নাই। ভবিষ্যতে কোনও কবি পাইবেন কি না, সন্দেহ-স্থল।

বঙ্গসাহিত্যের মাথার মণি বঙ্কিমচন্দ্র এদেশের ইংরাজি সভ্যতার মুখপাত্র। কুন্দনন্দিনী কালামুখী। কৃষ্ণকান্তের উইলের ভ্রমর বাঙ্গালী বটে, কিন্তু আমাদিগের মনে হয়, ভ্রমর কোনও কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, জানালা হইতে উঁকি দিয়ে লোক-লোচনের ত্রাসে এককোণে জড়সড় হয়ে বসে আছেন। রোহিণীর পার্শ্বে ভ্রমরকে বসাইলে মনে হয়, বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে একখণ্ড শুভ্রমেঘ আপনমনে ভাসিয়া যাইতেছে। দেবী চৌধুরাণী ও সূর্য্যমুখী বাঙ্গালার আগাছা মাত্র। জলধারা-প্রফুল্ল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে দুই একটী অযত্নরোপিত মোরগজটার গাছ রক্তিম পুষ্পগুচ্ছ লইয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কিম্বা তৃণ-সমাচ্ছন্ন সমতলভূমির গুল্মলতা আভরণে সন্তুষ্ট না হইয়া একটী শাল কিম্বা শাল্মলী বৃক্ষ বহুদূর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইন্দিরা মকরকেতনের সারথী হইবার উপযুক্ত। সমাজের প্রচলিত রীতি-বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য যদি কোন সমাজপতি তাঁহার ফাঁসি কিম্বা শূলের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে আমরা বিশেষ বিস্ময়াবিষ্ট হইব না। সমাজের বন্ধন অনেক শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই, এবং সেই শিথিলতার সুযোগে অনেকে দুষ্কর্ম্ম করিয়াও সমাজ কর্ত্তৃক শাসিত হয় না। কোন কোন বিষয়ে সমাজবন্ধন শিথিল হইয়াছে বলিয়া সকল বিষয়ে যে সমাজবন্ধন শিথিল করিতে হইবে, এ কিরূপ যুক্তি?

ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুন, ইন্দিরার কার্য্যে বাধা দেওয়া সমাজের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত, কি অন্যায়। উদ্দেশ্য সৎ হইলেও উদ্দেশ্য সাধনের পথে কণ্টক রোপণ করা সর্ব্ববিষয়ে অবিধেয় নয়। রজনী চলনসই বাঙ্গালীর মেয়ে। অন্ধ বলিয়া তাহার শতসহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয়। যদি কোন জনপদবধূ জন্মান্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই রজনীর মনের ভাব বুঝিবেন। আমাদিগের পক্ষে রজনীর প্রেমবিকাশ পরিচ্ছেদ প্রহেলিকাময়। গিরিজায়া বোধ হয় কোন তান্ত্রিকের গোপনে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। দুর্গেশনন্দিনীর বিদ্যাদিগ্‌গজ-বুদ্ধি যদি একেবারে হাতীমার্কা না হইয়া কিঞ্চিত মার্জ্জিত হইত, তাহা হইলে গিরিজায়া তাঁহার উপযুক্ত গৃহিণী হইলেও হইতে পারিতেন। বিমলার স্বার্থত্যাগ অপার্থিব। যে জন প্রেমিক, তাঁহার কি আর নশ্বর জগতে সুখের কামনা থাকে? ক্ষমা, দয়া, সরলতা, পরোপকারিতা, নিরহঙ্কারিতা তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করে; কিন্তু বিমলার ইতিবৃত্তেও একটী অস্ফুট কলঙ্কের ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে। পৌরাঙ্গনাগণ বিমলাকে আদর্শ করিবেন কিনা, সন্দেহ স্থল। বিমলা খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে নন। আমাদিগের ধারণা, সুধা-ধবল স্ত্রীচরিত্রে সামান্য কালঙ্ক কালিমাপাত হইলেই পবিত্র গোরসপরিপূরিত ভাণ্ডে গোমূত্র বিন্দুপাতের ন্যায় একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহা যদি ভ্রমপূর্ণ হয়, তাহা হউক, আমরা আমাদিগের এ ভ্রম ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করি না; কারণ আমাদিগের এই বিশ্বাসেই সুখ, আমরা এই চিন্তাতেই সুখী এবং এই আশাতেই চিরকাল থাকিতে বাসনা করি। আর এক কথা, বঙ্কিম বাবুর বিপথগামী নায়কগণ যখন পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া আপনাদিগের পরিত্রাণ বিষয়ে একেবারে হতাশ হইয়াছেন, সেই সময় এক একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া স্বীয় অক্ষুণ্ন প্রভাব-প্রতিভাবলে তাহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। মহাপুরুষের অপ্রমেয় প্রভাব যে নরক কীট পর্য্যন্ত স্বর্গবাস সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ সংসারের জ্বালামালা-সঙ্কুল জীবগণের উদ্ধারের জন্যই এই সসার লীলাময় সংসারে নরনারায়ণ রূপে বাস করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের পথ দিয়া মুক্তির যে সোপান-শৃঙ্খলা বিধিবদ্ধ আছে, তাহার পথিক আমরা বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলীতে বড় একটা দেখিতে পাই না। জড়বাদমোহগ্রস্ত সহস্র সহস্র নরপতঙ্গ পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে। তাহাদিগের উদ্ধার মহাপুরুষসাধ্য। রোগ মজ্জাগত হইলে বড় বড় ভিষকের আবশ্যক। কিন্তু মানব শরীরে রোগ-নিবারক যে শক্তি আছে, যাহার মূলভিত্তির উপর সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সেই রোগ-নিবারক শক্তিরই সংবর্দ্ধন স্বাস্থ্যকামীর প্রয়াসের পরাকাষ্ঠা। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে আমরা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উৎকট রোগের নিদান দেখিতে পাই, কিন্তু যে সকল নিত্য বৈদিক আচার পরম্পরায় আধ্যাত্মিক রোগ-নিবারক শক্তির বিকাশ হয়, তাহার আভাস পাইনা। বঙ্গদেশের শত সহস্র নর নারী ঘূর্ণাবর্ত্তের দ্বারে থাকিয়া নিজ নিজ জীবনে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ পরমার্থের দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন। বঙ্কিমবাবু শেষ বয়সে

একট নিখুঁত বাঙ্গালী-চরিত্র আঁকিয়াছেন সত্য, কিন্তু কমলাকান্ত যদি অহিফেনের মাত্রা কিছু কম করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা একটী নিখুঁত বঙ্গীয় আদর্শ পাইতাম। কলমাকান্ত অহিফেণের ঝোঁকে যে সকল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাই বোধ হয় বাঙ্গালীর হৃদয়-সর্ব্বস্ব। কমলাকান্তের কর্ম্মজীবন অবৈতনিক মোসাহেব-গিরি, তোষামোদ তাঁহার মোসাহেব গিরির অঙ্গ নয়। সে কেলে জমিদারদিগের বৈটকখানায় এইরূপ অনেক মোসাহেব থাকিত। সেক্সপিয়রের টেমপেষ্ট নামক মহাকাব্যে আমরা একজন সভাসদ দেখিতে পাই, তাঁহার নাম গন্‌জেলো। একজন মনিব নির্ব্বাসিত হইলেন, তাঁহার সর্ব্বস্বাপহারী গন্‌জেলোর নিকট সমান ভাবে সমাহৃত হইল। প্রভুভক্ত গন্‌জেলো পুরাতন মনিবের জীবন নাশে প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে এবং তদীয় শিশুকন্যাকে অকূল সমুদ্রে একটী ভেলায় ভাসাইয়া নূতন মনিবের পরিচর্য্যায় স্বচ্ছন্দমনে দিনপাত করিতে লাগিলেন। কমলাকান্ত ননীরাম বাবুর অহিফেন, "নূন" নহে। তবু তাঁহার কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা নাই। তাঁহার সর্ব্বদেবে সমান শ্রদ্ধা; তাঁহার অনাবিল চরিত্রের একটী মসী লেখাও দেখা যায় না।

রমেশবাবুর সমাজ এবং সংসার অতি উপাদেয় গ্রন্থ। জীবনপ্রভাত এবং জীবনসন্ধ্যার ভেরীরবে ভীরু বাঙ্গালার প্রাণ চমকিয়া উঠে। বৈশাখের অপরাহ্নে প্রান্তরের মধ্যে হটাৎ মেঘ গর্জ্জন শুনিলে পথভ্রমণ-পরিক্লিষ্ট পথিকের মনে যেরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হয়, আমাদিগের কোমল প্রাণে যুদ্ধের অস্ত্র ঝঞ্চনা সেইরূপ লোমহর্ষণ উৎপাদন করে। 'সমাজ' এবং 'সংসারে' আমাদিগের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের ছবি দেখিতে পাই। শরৎবাবু একজন বিলাত-ফেরৎ ম্যাজিষ্ট্রেট। হেমবাবু এদেশীয় সাধারণ গৃহস্থের মত না। সুধা বালবিধবা হইয়াও পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছেন। জমীদার মহাশয় সংসার-আশ্রম ত্যাগ করিয়া পুনরায় ঘোর সংসারী হইলেন। কোথায় এক আসনে শয়ন, এবং কদলী পত্রে এক সন্ধ্যা আহার, আর কোথায় বিপুল জমীদারীর চারি আনা অংশীদারের বিলাসবৈভব। অদৃষ্টনেমির পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তন সাধারণ লোকের ঘটিয়া উঠে না। গোবরে শালুক ফুল ফুটিতে পারে, পাষাণে নয়নাসার বহিতেও পারে, কিন্তু এরূপ অন্ধকারের পর ভাগ্য-সূর্য্যের মধ্যাহ্ন সাধারণের অদৃষ্টে অঘটন এবং অসম্ভব। আমাদিগের মনে হয় 'সমাজ' এবং সংসারের মধ্যে রমেশবাবু যদি কোনও নিখুঁত বাঙ্গালীর ছবি আঁকিয়া থাকেন, তবে ঠাকুর মা ও ঠাকুর দাদার ছবিই সেইরূপ। সুধার দ্বিতীয়বার বিবাহের পর সকলেই তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছেন, কিন্তু ঠাকুরমার স্নেহডোর তবুও শিথিল হয় নাই। তাই তিনি চিনিপাতা দই লইয়া শরৎ বাবুকে দেখিতে আখিয়াছিলেন। ঠাকুর মা রসিকতায় সিদ্ধহস্তা, পরদুঃখকাতরা এবং শ্রমদক্ষা। এই ঠাকুর মা নিখুঁত বাঙ্গালীর প্রতিচ্ছবি। ঠাকুর দাদার ভাবটাও সেইরূপ, তবে ঠাকুর মার অপেক্ষা কিছু কড়া। ঠাকুরদাদার মতে সংসারের গৃহিণীরা একান্ত বীর্য্য পক্ষপাতিনী। যে সংসারে শাসন নাই, সে সংসারে ভালবাসা থাকিতে পারে না।। বর্ত্তমান সময়ে

গৃহিণীরা কাজকে যমের মত ভয় করেন। ঠাকুরদাদার মতে অশরীরী ভালবাসা একটা কোনও আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া কখনও থাকিতে পারে না। যেরূপ ভূত প্রেত দক্ষ দানা তাহাদিগের অভীষ্ট সাধনের জন্য, কোনও ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষতঃ দুর্ব্বলা অবলাকুলকে আশ্রয় না করিয়া নিজ নিজ অস্তিত্ব ব্যক্ত করিতে পারে না, সেইরূপ বিশিষ্ট কার্য্য ব্যতিরেকে ভালবাসার অস্তিত্বের বিকাশ অসম্ভব। পারিবারিক কাজ কর্ম্মই ভালবাসার অভিব্যক্তির মেরুদণ্ড। 'সমাজ' এবং 'সংসারে, নিখুঁত বাঙ্গালীর ছবির আর একটী আভাস আমরা পাই। তবে সে ছবিটী সম্যকরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। প্রাসাদশিখরস্থ দর্শক দূরস্থ আম্রকাননের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট ক্ষীণালোকে উষার পূর্ব্বরাগের রেখা দেখিয়াও যেরূপ দেখিতে পান না, সেইরূপ আমরা সেই অপরিস্ফুট চরিত্রের সকল রেখাগুলি চিনিয়াও চিনিতে পারি না। হেমবাবুর এক কৃষক প্রজার পত্নী সুধা প্রভৃতি কলিকাতা যাইবেন শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল। বর্ত্তমান লেখক কৃষক-পত্নীর অযত্নসুলভ এবং অকপট অশ্রুবর্ষণের এইরূপ দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। পাঠক মহাশয় যদি এইরূপ অনাহূত অকপট গৌরবময় দৃশ্য দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, এই চরিত্রটী কতদূর মর্ম্মস্পৃক্।

দীনবন্ধু বাবুর নীলদর্পণে দুই একটী নিখুঁত বাঙ্গালীর ছবি আছে। নীলদর্পণে রাখাল বালকের গানে, বোধ হয়, বাঙ্গালার মাঠে ঘাটে যত রাখাল বালক পাঁচনী হাতে গরু চরাইয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে সকলেরই মর্ম্মোদ্ঘাটন হইয়াছে। পদীময়রাণীও চলনসই। নীলদর্পণে আর একটী নিখুঁত বাঙ্গালীর ছবি আছে। সেটী নবীন বাবুর পলাশীর যুদ্ধের বিষাদিনীর মত উজ্জ্বল এবং নয়নাভিরাম। সেই চরিত্রটীই নীলদর্পণের নায়িকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নীলের ভূত অনেক দিন বাঙ্গালার মাটী ছাড়িয়া বিহারের উষরক্ষেত্রের আশ্রয় লইয়াছে। এখানে আর রাম নামের বাহুল্যের আবশ্যক নাই।

বাঙ্গালীর চরিত্রাঙ্কন করিতে গিয়া কর্ম্মশীল আত্মনির্ভরশীল পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ অবলম্বন করা বাতুলতা মাত্র! বাঙ্গালার পুষ্করিণীর জলরাশি যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা তুলিয়া নাচিয়া বেড়ায়, তাহার অনুরূপ ইংলণ্ডে নাই। যে শুধাংশু বাঙ্গালার ধরণীবক্ষে রজত কিরণধারা অবিরত বর্ষণ করিতেছে, তাহার কণা মাত্র কুহেলিকাময় ধূমান্ধকারে সমাচ্ছন্ন বিলাতে কোথায়? চূত মুকুলের পরিমল-সুরভিত মনঃপ্রাণহারী মৃদুমন্দ বসন্তের দক্ষিণ পবন বিলাতে স্বপ্নের অগোচর। বিলাতী সাহিত্যের আদর্শে আমাদিগের সাহিত্য গঠন করিবার চেষ্টা ফলবতী হইবে না, তবে রাজসিংহাসনে প্রতিভূ দিনকতকের জন্য রাজছত্র আশ্রয় করিয়া বসিতে পারে। বাঙ্গালার সাহিত্যসিংহাসনে ইংরাজীর আদর্শে গড়া সাহিত্য আবুহোসেনের মত হঠাৎ রাজা।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্রের মত প্রতিভাশালী লেখকের হাতে যখন নিখুঁত বাঙ্গালীর ছবি স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই, তখন সামান্য মসীজীবীর কথা উল্লেখ না করিলে চলিতে পারে। আর এক বিশেষ আক্ষেপের

কথা, যুগযুগান্তর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী প্রায় একভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে। ভাল ভাল উচ্চ দরের কবি ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সাধারণ লোকের সুখ দুঃখের কথা কোনও কবি কাব্যে কিম্বা কবিতায় প্রতিফলিত করেন নাই কেন? কবিকঙ্কন চণ্ডীতে খুল্লনার এবং কালকেতুর বিবরণে আমরা যে কবিতার আভাস পাই. পরবর্ত্তী কবিতায় তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাই না। বৈষ্ণব কবিগণের কবিতা পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, কিন্তু সাধারণ লোকের বিবরণ তাঁহাদিগের কবিতায় পাই না। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার মিলন বিচ্ছেদের পদাবলী মন্দাকিনীর কলস্রোত এবং নারদের বীণা-ঝঙ্কার অপেক্ষাও মধুর, কিন্তু অপার্থিব। বাস্তব জগতের শত শত কর্কশ এবং শ্রুতিবিদারক ব্যাকুল কলরব আমাদিগের কর্ণকুহরে আসিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ পদাবলীর অমৃত-নিঃসরিণী মধুরতায় মিলাইয়া যায়, মনে হয়, আমরা কোন স্বপ্নলোকে বাস করিতেছি. পৃথিবীর সুর্য্য চন্দ্রমা আকাশের এক কোণে মিলিয়া যায়, জ্যোতির্ম্ময়যুগলমূর্ত্তি সমগ্র পৃথিবী প্রেমবারি বিতরণ করিয়া স্নিগ্ধ করেন। কিন্তু কালকেতুর সুখ দুঃখ বর্ণনার পর আর কোনও বঙ্গকবি সাধারণের সুখ দুঃখ দিয়া মধুচক্র রচনা করেন নাই, সে কথা চাক্ষুষ প্রমাণ সত্ত্বেও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

যে সকল বঙ্গ কবির কবিতা সঙ্কলিত ও মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের তুলনায় অসংখ্য কবির গ্রন্থাবলী এখনও কীটদষ্ট তালপত্র কিম্বা তুলোট কাগজের অপ্রকাশিত পুঁথিতে নিবদ্ধ আছে। আমাদিগের মনে হয়, ভবিষ্যতে এমন অনেক পুরাতন বঙ্গকবির কবিতা কিম্বা কাব্য প্রকাশিত হইবে, যাহাতে তাঁহাদিগের সমসাময়িক ঘটনাবলী বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রবণ জাতি, ধর্ম্মের অমরকেতনের হিল্লোলে বাঙ্গালার প্রাণে যে প্রকার আনন্দ হয় এবং যে উৎসাহের সঞ্চার হয়, এরূপ আর কাহাতেও হয় না। বোধ হয়, সেই জন্যই বৈষ্ণব কবিগণ বাণীর মন্দিরে সর্ব্বোচ্চ সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধারণ মানবের সুখ দুঃখের কথা লিখিতেন. তাঁহাদিগের কাব্য কিম্বা কবিতা নিশার স্বপনসম কালের কালগ্রাসে লয় প্রাপ্ত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের অভাব নাই। তাঁহারা যদি চেষ্টা ও যত্নের সহিত হস্তলিখিত পুঁথির সমুদ্র মন্থন করিতে বদ্ধপরিকর হ'ন, তাহা হইলে, বঙ্গসাহিত্যের অনেক লুপ্ত নিধির পুনরুদ্ধার হইতে পারিবে। রাজা মহারাজ এবং অর্থবান মাত্রেরই এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। “উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।” অর্থ বল, পাণ্ডিত্য এবং অনুশীলনের সমাবেশ হইলে অসাধ্য সাধন হইতে পারে। “যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোহত্রদোষঃ।”

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙ্গালায় যে ভাবের বন্যা আসিয়াছিল, তাহার প্রবর্ত্তক ইংরাজী সাহিত্য। ইংরাজী সাহিত্যে অনেক অমূল্য নিধি পাওয়া যায়। যে কর্ম্মপ্রবণ জাতি সসাগরা পৃথিবী অঙ্গুলিতাড়নে হেলায় শাসন করিতেছেন, সে জাতির সাহিত্যে যে শত শত লোকহিতকর সত্য নিহিত থাকিবে,

তাহাতে আর সন্দেহ কি! বাঙ্গালী স্বভাবই ভাবপ্রবণ। আমাদিগের সংসার আমাদিগের এক এক বৃহৎ আল্‌সেখানা। সেকালের নবাবগণ সক্‌ করিয়া দেশের মধ্যে বাছা বাছা আল্‌সে আল্‌সেখানায় পুষিয়া রাখিতেন। আমাদের সমাজ ও প্রত্যেক পরিবারে অনেক আল্‌সে পুষিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অদৃষ্টবাদ আমাদিগের আলস্যময় জীবনের একটী আশ্রয়গ্রন্থি। মানুষ ইচ্ছা করিলে চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের বলে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র হইতে পারে, এভাব এদেশের মজ্জাগত নহে। ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি ছত্রে কর্ম্মের উৎকণ্ঠা মাখা রহিয়াছে। ইংরাজী সভ্যতার উন্মেষে এদেশের ভাবময় জীবনে এক বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সাধকের যুগযুগান্তরব্যাপী সাধনা অকালে ভাঙ্গিয়া গেল। ধ্যানস্তিমিত লোচনে বঙ্গসমাজ চাহিয়া দেখিল, এতদিন যে সকল ভাবকে আশ্রয় করিয়া সমাজ পুষ্ট হইতেছিল, সে সকল ভাব জীবন-সংগ্রামে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে ইংরাজী সভ্যতার উন্মেষের সহিত যে সকল ভাব আসিয়া দেশ প্লাবিত করিতেছে, তাহাতে নূতনত্বের আভা আছে এবং দিগ্বিজয়ের শঙ্খরোল আছে। এমন এক সময় গিয়াছে, যে সময়ে ইংরাজী ভাবের বন্যায় ছলছলগতি ভাগীরথীকে উজানে বহিতে এবং হিমাদ্রিকে শির অবনত করিতে বলিলে, দেশের লোক সে আদেশ বাণীকে প্রত্যাদেশ বলিয়া মনে করিত। এখন সে দিন আর নাই। ইংরাজী ভাব এখন অনেকটা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজী সভ্যতার বিশেষত্ব যে সকল সার্ব্বজনীন ভাব সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়াছে, সেই সকলের দুই একটীর প্রতি যুবা বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আস্থাবান্ হইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজী সভ্যতার ছাঁচে সমাজ ঢালাই করিয়া গড়িতে হইবে, এইরূপ আকাশ-কুসুম আর লোকের মনে স্থান পায় না। কলেজে অধ্যয়ন করিতে করিতে মনে হয় ইংরাজী সাহিত্য যে সকল ভাব শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই সর্ব্বজাতির অনুকরণীয় এবং দেশ-কাল পাত্রভেদ সত্ত্বেও সর্ব্বফলপ্রদ। কিন্তু ছাত্র-জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিলে, এ গোলাপী মোহ ঘুচিয়া যায়। তখন মনে হয়, আমাদিগের দেশে আদিমকাল হইতে যে সভ্যতার স্রোত চলিয়া আসিতেছে, সেই স্রোতের একটী বিশেষ গন্তব্য স্থান আছে, তাহাই আমাদিগের জাতীয় পুরুষকারের লক্ষ্যস্থল। সমগ্র জাতির সম্মুখে একটী বিশেষ সুদর্শন-চক্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অন্তরালে মৎস্যবিশেষ আছে। সেই মৎস্যটীর চক্ষু ভেদ করাই জাতীয় সমগ্র চেষ্টা এবং জ্ঞানের চরমফল। আজ পর্য্যন্ত ইংরাজী সভ্যতা জাতীয়-জীবনের উপর একটী স্তর মাত্র বিস্তার করিতে পারিয়াছে। সেই স্তরের গভীরতা অতি অল্প। সেই স্তর এত সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ যে, আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, তাহার অন্তর্নিহিত আদিম সভ্যতার কুণ্ডলীকৃত বিশালদেহ জটিল ভগ্নস্তূপের মত দেশকে কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, আর তিল ধারণ করিবার স্থান নাই। কাষ্ঠময় আসবাবে মসৃণ করিবার জন্য যে পালিশ দেয়, তাহাতে কাষ্ঠের বিশেষত্ব নষ্ট হয় না, বরং ক্ষণভঙ্গুরতা অনেকটা নিরাকৃত হইয়া কাষ্ঠের দৃঢ়তা বৃদ্ধি

পায়। আমাদের দেশেও সেইরূপ ইংরাজী সভ্যতা ক্রমে ক্রমে দেশের নিজস্ব সভ্যতার ভাবগুলিকে দৃঢ় এবং সংবদ্ধ করিয়া আনিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইংরাজী ভাবের প্রথম জুয়ারের মুখে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের সৃজন হইয়াছে। কি ক্ষণেই এই অভিনব শরজন্মার জন্ম হইয়াছিল। বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের জন্মদাতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, "আমি চিন্তায়, জাগরণে এবং স্বপনে ইংরাজী শব্দাবলী ব্যবহার করিয়া থাকি।" বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য একদল অগ্রগামী সংস্কারকের মুখপাত্র। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিক মাত্রেই বাণীর পূজা করিতে করিতে উদ্যৎভাণু সহস্রের আভাযুক্ত পাশ্চাত্য দেশের কবিকুলের আকাশবাণী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। তাঁহাদের সাহিত্যে প্রাচ্য ভাব যে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে আজন্ম সংস্কারের বশে যে সকল প্রাচ্যভাব আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই গুলিই আমরা বঙ্গ-সাহিত্যে পাই। ইষ্টদেবতার পূজায় গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা হইয়া যায়। পাশ্চাত্য বাণীর পূজায় প্রাচ্যদেশীয় পঞ্চ দেবতার পূজা হইতেছে মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় এবং পাশ্চাত্য ভাবের বৈরী ভাব আর নাই। এখন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাব ওতঃপ্রোত ভাবে বসবাস করিতেছে এই দুই ভাবের সমন্বয়ে একটী নূতন ভাবের সৃষ্টি হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের যে সকল স্থান এখন গ্রহ উপগ্রহে পূর্ণ হয় নাই, সেই বাষ্পসঙ্কুল স্থানে সহস্র সহস্র যোজনব্যাপী ভীষণ আবর্ত্তে পঞ্চভূতের সমীকরণ হইয়া জগৎ সৃষ্টি হইতেছে। আমাদের বোধ হয় বঙ্গ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবের মিলন এবং সমন্বয়ের পবিত্র ক্ষেত্র। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক যত শীঘ্র ভাবগ্রহণ করিতে পারে, বোধ হয় ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশের লোক তত শীঘ্র পারে না। বস্তুতঃ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবের সমন্বয়ের এক নূতন ভাবময় রাজ্যের সৃষ্টির আভাষ আমরা বাঙ্গালায় বর্ত্তমান সময়ে পাইতেছি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মেঘগম্ভীর বক্তৃতাবলীতে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতের উদ্ধার এবং সমগ্র মানব জাতির হিতার্থে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবের সমন্বয় অবশ্যম্ভাবী। বঙ্গসমাজের ক্লীবত্ব এবং জড়তা দূরীভূত করিয়া শঠ শুভদ্বেষী এবং মায়াবীগণের উচ্ছেদ সাধনকল্পে স্বামী বিবেকানন্দ যে মহাপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন,—সে পূজা বর্ত্তমান যুগে সম্পন্ন না হইলেও যে অদূর ভবিষ্যতে সম্পন্ন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলীতে বৈরাগ্যের ধূয়া নাই। সংসার-বিরাগী বিবেকানন্দ লোকশিক্ষার নিমিত্ত কর্ম্মবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আপদ্গ্রস্ত, জড়াগ্রস্ত অথবা শত্রুহস্তে পরাজিত ব্যক্তিরই সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান লোকেরা এই নিমিত্তই বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর্কট বৈরাগ্য অবলম্বন করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন। আমরা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে দেখিতে পাই, "যে ব্যক্তি পুত্র পৌত্র দেবতা ঋষি এবং গুরুজনের ভরণপোষণে অসমর্থ, সেই ব্যক্তিই একাকী অরণ্য মধ্যে সুখে কালহরণ করিতে পারে অরণ্যচারী মৃগ, বরাহ ও পক্ষিগণের ন্যায় পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান-বিমুখ বনচারী মনুষ্য-

গণও স্বর্গলাভে অসমর্থ হয়। যদি ত্যাগশীল হইলেই সিদ্ধিলাভ করা যাইত, তাহা হইলে পর্ব্বত ও বৃক্ষগণেরও অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইত। লোকে আপনার ভাগ্যবলেই সিদ্ধ হয়, অন্যের ভাগ্যবলে কদাচ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না; অতএব কর্ম্মানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কর্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধিলাভের উপায়ান্তর নাই; যদি কেবল আপনার ভরণপোষণ করিলেই সিদ্ধিলাভ করা যাইত, তাহা হইলে জলজন্তু ও স্থাবরগণেরও অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইত। জগতের যাবতীয় লোক স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে, অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানই অবশ্য কর্ত্তব্য; কর্ম্মহীন ব্যক্তি কদাচ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।" পাশ্চাত্য দেশের কর্ম্মবাদ আমাদিগের স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতার সহিত মিলিত হইয়া এক নূতন জাতির সৃষ্টি করিতেছে কর্ম্মের ও চেষ্টার দ্বারা যে স্বীয় উন্নতির সাধন হইতে পারে, একথা আমাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ ও পুরাণে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তবে কালের কুটিল গতিতে কর্ম্মবাদ একেবারে দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। ইউরোপে মধ্যযুগে কর্ম্মকাণ্ডের অবমাননায় তদ্দেশীয়গণের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। মধ্যযুগে ইউরোপের সমস্ত লোক অধর্ম্মের ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর করাল-কবলে দলে দলে লোক অকালে প্রাণ হারাইত। ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না। মনুষ্য পশুর অপেক্ষা হীন হইয়াছিল। ধর্ম্মবুদ্ধি উন্মার্গগামী হইয়া বিবেক বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম আশ্রয় পাইত। নিষ্ঠুরতা এবং শঠতা ধর্ম্মের আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। পরে গ্রীক্ দেশীয় সাহিত্য এবং সভ্যতার অভ্যুত্থানের সহিত ইউরোপ নবজীবন লাভ করিল। মানুষ কর্ম্মের দ্বারা যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে. এই ভাবটী গ্রীক্ দেশীয় সভ্যতার একটী বিশেষত্ব। বর্ত্তমান উইরোপীয় সভ্যতার সহিত মধ্য যুগের আকাশ পাতাল প্রভেদ। গ্রীক্ সভ্যতার আদর্শে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা ইউরোপের সীমাবদ্ধ নহে। এই সভ্যতাই পৃথিবীর আদর্শ। পাশ্চাত্য কর্ম্মবাদ অবলম্বন করিয়া জাপান আজ উন্নতির উচ্চাসনে অধিরূঢ়। যতদিন জাপান পাশ্চাত্য ভাব গ্রহণে সমর্থ হয় নাই, ততদিন জাপানের ঘুমঘোর ঘুচে নাই। কর্ম্মশক্তিই বর্ত্তমান যুগশক্তির একটী প্রধান অঙ্গ। এই কর্ম্ম শক্তিকে পরিত্যাগ বা অবমাননা করিলে কোনও জাতির পরিত্রাণ নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ইউরোপীয় সভ্যতা বঙ্গদেশের নিজস্ব সভ্যতার মুলোৎপাটন করিয়া কখনই তাহার স্থান সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারে না, তবে দুই সভ্যতার মিলনে এক নূতন ভাব তরঙ্গ দেশের সর্ব্বত্রে প্রচারিত হইয়া চিরকাল আপামর সাধারণের কল্যাণ সাধন করিবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন লেখা দেখা দিয়াছিল, সে দুইটী খরস্রোতের মিলনদ্বন্দ্বের আভাষমাত্র, দুই ধারার সঙ্গমে একটী নূতন ধারার চিরকল্লোলময় অশ্রান্ত লীলা-ভঙ্গের অভিব্যক্তি নহে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য-ভাবের সমীকরণে বাঙ্গালার এক নূতন জীবনের সৃষ্টি হইলে, পাশ্চাত্যভাবের ছায়াব-

লম্বনে গঠিত বঙ্গ সাহিত্যের আদর অনেক কমিয়া যাইবে।

বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্য পড়িয়া মনে হয়, বঙ্গ সাহিত্য বুঝি কোন মেরুদণ্ডহীন ভাবসর্ব্বস্ব মধুলেহী জাতির প্রেমগুঞ্জন। পাশ্চাত্য দেশের ছায়াবলম্বনে গঠিত হইলেও বঙ্গসাহিত্যে কর্ম্মনিপুণতা, দৃঢ়তা, স্থির-প্রতিজ্ঞতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের আদর্শ আমরা দেখিতে পাই না। নায়িকার প্রেম-বিহ্বল আত্মহারা নায়ক নিজ সুখ দুঃখের আবর্ত্তে ভ্রান্ত। প্রেম কর্ম্মশক্তিতে ঘৃতাহুতি অর্পণ করিয়া কর্ম্মকুশলতা দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেয়! পুষ্প অপেক্ষাও কোমল হইলেও স্থান বিশেষে প্রেম বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরস্পরের ঈপ্সিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেমের সাফল্য। ভবভূতি উত্তররামচরিতে রামচন্দ্রের প্রেমপূর্ণ চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরানাং চেতাংসি কো বা বিজ্ঞাতুমর্হসি।" বাস্তবিক প্রেমের এই কঠোর এবং মৃদুমধুর মূর্ত্তি একান্ত স্বাভাবিক ; কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যে আমরা প্রেমের কঠোর এবং অরিন্দমমূর্ত্তি দেখিতে পাই না। যে উৎকট কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা সমগ্র জাতীয় জীবনের জীবনী স্বরূপ, যাহার ক্ষণিক স্ফুরণে ক্ষণপ্রভার হাস্যের ন্যায় ভূলোক এবং দ্যুলোক চমকিত করিয়া থাকে ; বঙ্গসাহিত্যে তাহার স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই না। ইংরাজী-অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে, এরূপ লোক অতি বিরল। ইংরাজী সাহিত্যের আভাষে গঠিত হইলেও বঙ্গসাহিত্য ইংরাজী সাহিত্য অপেক্ষা অনেক হীন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের নায়ক নায়িকার জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে আমাদিগের মনে হয়, কতকগুলি ক্রীড়া-পুত্তলিকা অলক্ষ্য সূত্রের পরিচালনে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। অসভ্য অনার্য্য জাতির মদিরা-মত্ত তাণ্ডবে আমরা যে বৈচিত্র্য এবং প্রফুল্লতার আস্বাদ পাই, তাহা বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠাবলীতে অতি বিরল। বঙ্গালয়ে কোনও নবীন নায়িকা স্মৃতি শক্তির বলে নিজ উক্তি সমূহ যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করিয়াও প্রাণ তদ্‌ভাবে ভাবিত করিতে পারে না। সেইরূপ বঙ্গসাহিত্য ধর্ম্মজীবন কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা থাকিলেও একমাত্র জাতীয়তার অভাবে হৃদয়তন্ত্রীর মূর্চ্ছনা হয় না। উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ভাষায় যে ভাব এবং উদ্দীপনার বীচি-বিক্ষোভ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইটী ভাষার প্রাণ। সুললিত সমস্ত পদবিন্যাসে কিম্বা বিদ্যাগরিমায় সাহিত্যিক ক্ষণিক যশোলাভ করিতে পারেন, কিন্তু প্রাণের ভাষায় কিম্বা উদ্দীপনার ভাষায় যে অমরত্ব দুগ্ধে নবনীবৎ বিরাজ করিতেছে, তাহা তাঁহার পক্ষে দুর্লভ। জাতীয় জীবনের কণায় কণায় প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়-কন্দরে যে সকল আকাঙ্ক্ষা এবং উৎকণ্ঠা অহরহ স্ফুরিত হইতেছে, সেই সকলের প্রকাশক একটী অকুণ্ঠিতা সঞ্জীবনী ভাষাই প্রকৃত সাহিত্যের ভাষা। কোনও বিষয়ী বুদ্ধিজীবী যেরূপ মনোভাব গোপন করিয়াও লৌকিক সভ্যতার আচরণে নিজের দুরভিসন্ধি গোপন করিয়া রাখিতে পারে, সেইরূপ, ব্যাকরণসম্মত সাধুভাষার অনর্গল উদ্গীরণে হৃদয়ের আবেগ গোপন করা সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য নহে। বস্তুতঃ সাহি-

ত্যের ভাষায় উদারা মুদারাতারা উদ্দীপনা ব্যতীত আর কিছুই নাই। সাধারণ নিরক্ষর লোকের কথাবার্ত্তায়ও উদ্দীপনার বশে ভাবময়ী ভাষাগুচ্ছের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্রশোকাতুরা মাতার আর্ত্তক্রন্দনে আমরা অনেক সময় ছন্দোবদ্ধ বচনাবলী শুনিতে পাই। ক্রোধ এবং দ্বেষের আবেশেও মনুষ্যগণ তৎতৎভাবব্যঞ্জক পশুসুলভ ভাষার উল্লেখ করিয়া থাকেন। যে ভাবকে দেশের সর্ব্বসাধারণে নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে পারে না, সে ভাবে সাহিত্যিকের প্রকৃষ্ট উদ্দীপনা হইতে পারে না। মাতৃস্তন্যের সহিত স্বদেশীয় ভাব আমাদিগের অস্থিমজ্জায় শিরায় শিরায় নিবদ্ধ হইয়া যায়। বাঙ্গালায় একটী কথা আছে, বড় হইতে হইলে ছোট হইতে হয়; ভাব-রাজ্যের সম্রাট সাহিত্যিক মানব-হৃদয় সম্মোহিত করিবার জন্য স্বদেশীয় জনগণের হৃদয়নিহিত মোহকর ভাবকের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক যুগে সমগ্র দেশে একটী অভিনব প্রচ্ছন্ন ভাবস্রোতের আবির্ভাব হয়। সেই ভাব-স্রোতটিকে শব্দনৈপুণ্যবহুল ভাষায় শরীরি করিয়া জগতের সমক্ষে প্রতিভাত করাই সাহিত্যিকের লিপিকুশলতার পরাকাষ্ঠা। সাহিত্যের সর্ব্বসাধারণের অব্যক্ত মনোভাব ব্যক্ত করিয়া লোকরঞ্জন করা যেরূপ সুলভ, সেইরূপ সমাজ-সম্বন্ধরহিত সাহিত্যে ভাষার ছটায় এবং প্রতিভাবলে চিরস্থায়ী যশোলাভ করা সুকঠিন। "বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি, অস্ত্রীকেই বধে।" কৃত্তিবাস সীতা-চরিত্র-গঠনে বঙ্গদেশের গ্রাম উপগ্রামে যে সকল পতিব্রতা ললনা বাঙ্গালার সীমন্তে সিন্দুর বিন্দুর মত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগেরই মহাভূত সমাধি অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কৃত্তিবাসের সীতা-চরিত্র এই নিমিত্তই আমাদিগের এত আদরের পূজার বস্তু। বঙ্গসাহিত্যের এইরূপ সর্ব্বজন-সমাদৃত সামাজিক শ্রেষ্ঠ গুণচয়ে গ্রথিত আদর্শ চরিত্র দুষ্প্রাপ্য। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, সমাজ এবং সাহিত্যের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ। বঙ্গ সাহিত্যের দশা দেখিয়া আমাদিগের মনে হয়, সমাজ এবং সাহিত্য চক্রবাক্ মিথুনের মত সময়-স্রোতের দুইধারে মিলনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিফল আর্ত্তনাদ করিতেছে মাত্র। তবে বর্ত্তমান সময় হইতে ভবিষ্যত যতদূর অনুমান করিতে পারা যায়, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবের সমন্বয়ে বঙ্গে এক নূতন সাহিত্যের অভ্যুদয়ে বোধ হয় বঙ্গ সাহিত্যের দুর্দ্দিন অস্তমিত হইবে।

আবহমান কাল হইতে চিরন্তন সত্য অনির্ব্বচনীয় বলিয়া গ্রথিত হইয়া আসিতেছে। আভাষ ও ইঙ্গিতে সেই সত্যের নির্দ্দেশ করাই বাগদেবীর বরপুত্রের চরমসিদ্ধি। যে সাহিত্যে চিরন্তন সত্যের আভাষ যত বেশী আছে, সেই সাহিত্যই তত বেশী আদরণীয়। ভিন্ন ভিন্ন নর নারীর হৃদয়ে চিরন্তন সত্যের যে আভাষ সতত বিরাজ করিতেছে, তাহা চয়ন করিয়া ভাষা-সূত্রে গ্রথিত করিলে বাগ্‌দেবীর কণ্ঠবিলম্বী পবিত্র মুক্তাহারের মত আভাময় হইয়া থাকে। অতএব সামাজিক আদেশে গঠিত সত্যমূলক সাহিত্যই জগতে চিরপূজ্য।

শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায়।

বগুড়ার বৃদ্ধ চতুষ্টয়।

কালস্রোত অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে, বৃদ্ধ, বালক, যুবা। ইহাদিগের কার্য্যসমষ্টি, বাক্য ও ইতিহাস লইয়া এক এক যুগ এবং তাহাদের অন্তর্দ্ধানে যুগান্তর। কত যুগ যুগান্তর চলিয়া যায়, কত জীবনের ইতিহাসে কার্য্যপরম্পরা, আনন্দ নিরানন্দ তৎসহকারে ভাসিয়া যায়, তাহার সংখ্যা নাই। আমরা ভাবি, আমরা স্থিতিশীল, কিন্তু চলিতেছি। এই জন্য দুনিয়ার নাম জগৎ। সুতরাং যাহারা চলিতেছে, যাহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, যাহা আর আসিবার নয়, তাহাদের ইতিবৃত্ত মানব-ইতিহাস। এই অতীত যুগের এই মানব-ভাগ্য-চক্রের পরিবর্ত্তনের দুই একটী কথা, দুই একটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিব।

নবাব আবদুসশোভান চৌধুরী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় যামে একটী মধ্যবিৎ অবস্থার মুসলমান-যুবক টাঙ্গাইল হইতে বগুড়ায় আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এবং বগুড়ার শেলবর্ষ পরগণার খ্যাতনামা উত্তরাধিকারিণী ৺সৈয়দানী তহুরন্নেশা বিবিকে বিবাহ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ সৈয়দানী যোবেদুন্নেশা বিবিকে বিবাহ করেন। এইরূপে টাঙ্গাইলের সুবিখ্যাত সৈয়দবংশের সহিত বগুড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার গৃহিণীদ্বয়ের নিকা হয়। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত বগুড়ার ইতিহাস এই চৌধুরী সাহেবের সহিত সংযোজিত। আমরা প্রথমে বগুড়া গমন করি, তখন চৌধুরী সাহেবের (নবাব সাহেবের) এক মাত্র কন্যা আনবাদ উন্নেশা বিবির সহিত ময়মনসিংহের অন্যতম জমিদার সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরীর শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইলাম। মহাসমারোহে এই বিবাহ সম্পাদিত হইল।

শেলবর্ষের জমিদারগণ সাবেকী ধরণের ছিলেন, নবাব আবদুসশোভানের আগমনে এই গৃহে নূতন সুখ সমৃদ্ধিতে বিভূষিত হইল। জমিদারী উন্নতি হইল, পূর্ব্বাপেক্ষা নাম কাম বিস্তৃত হইল। এবং নবাব সাহেবের ভদ্রতা, বিচক্ষণতা ও লোকপ্রিয়তায় সকলেই আনন্দিত হইলেন। হাকিমগণের সহিত তাঁহার বন্ধুতা, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সৌজন্য, প্রজাগণের প্রতিও তাঁহার ব্যবহার ভাল ছিল। তদ্ভিন্ন বগুড়ার সকল সাধু কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি যে কোন সাধু কার্য্যের সাহায্য জন্য আহুত হইলে, সম্ভবমত দান করিতেন, সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। সকলের সকলের প্রীতি ভাজন হইতেন। এইরূপে তাহার দ্বারা মাদ্রাসা, লাইব্রেরীর গৃহ, নানাবিধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। একদিন তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট বর্ত্তমান উচ্চপদস্থ মহাত্মা পি, সি লায়নের সহিত আমার কথা হয় যে, চৌধুরী সাহেব নিজ ব্যয়ে এই লাইব্রেরীর গৃহটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তখন মাহাত্মা পি, সি, লায়ন তাঁহার নবাব উপাধির প্রস্তাব করেন, এবং সেরপুরের সুবিখ্যাত কালীকিশোর মুন্সী, যাহার সাধুচরিত্র ও শিক্ষা

ঐ মুন্সী-পরিবার মধ্যে বিখ্যাত ছিল, এবং যাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ৺রাধারমণ মুন্সী মহাশয় বগুড়ায় টাউন-হল নির্ম্মাণ করেন, এই মহাত্মা রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। নবাব উপাধি প্রাপ্তির পরে চৌধুরী সাহেব প্রায়ই কলিকাতা বাস করিবেন। তাঁহার উদ্যোগে ব্রহ্মপুত্র-সুলতানপুর রেলওয়ে লাইন স্থাপিত হয় এবং এই দুর্গম জেলাটীতে গমনাগমনের সুবিধা হয়। নবাব সাহেবের মনে আর একটী ইচ্ছা ছিল যে, বগুড়ায় একটী কলেজ সংস্থাপন করেন। কিন্তু শেষ বয়সে অধিকাংশ সময়ই তিনি পীড়িত থাকিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেন, এজন্য এই মহৎ কার্য্য সমাধা হয় নাই। নবাব সাহেবের শিকার-পারপারদর্শীতার জন্য অনেক শ্বাপদকুল বিনষ্ট হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় উদার-হৃদয় হিন্দুমুসলমান মধ্যে নির্ব্বিশেষ অপক্ষপাত ও এমন শিষ্ঠাচার অতি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। যে সময়ে উত্তরবঙ্গে হিন্দুমুসলমান উদ্বেগজনিত জামালপুর কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়, তখনও নবাব সাহেব হিন্দুদিগের প্রতি ভালবাসা ও তাহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করেন, তজ্জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের ভ্রুভঙ্গির ভয় করেন নাই। আমি নবাব সাহেবের সহিত অনেক সময় ধর্ম্ম বিষয়ে অপেক্ষা করিয়াই দেখিতাম, মুসলমান ধর্ম্ম গভীর আস্থার সহিত গোড়ামিশূন্যতা তাহার হৃদয়ে বর্ত্তমান ছিল। এক সময়ে তিনি গোহত্যার প্রতিকূলেও একটু হস্তোত্তোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু মানবের জীবন কত দিন, সকলই পড়িয়া থাকে, কাল দেহ-পিঞ্জর হইতে আত্মা পক্ষীকে গ্রহণ করিয়া সকল অনুষ্ঠানে উপসংহার করে। পরে ছিন্ন কুসুমের সুবাসের যশোরাশি জগতে বিস্তৃত থাকে। সেই মহানুভব নবাবসাহেব গত জুলাইমাসে প্রায় সপ্ততী বর্ষ বয়সে সকলকে কান্দাইয়া জীবন লীলা সম্বরণ করেন।

৺রায় রজনীকান্ত মজুমদার বাহাদুর

প্রায় সপ্ততী বর্ষ পূর্ব্বে ইহার জন্ম হয়। গত কার্ত্তিক মাসে ইহার দেহত্যাগ হয়। তিনি সুবিখ্যাত উকীল ছিলেন, ও অনেক দিন পর্য্যন্ত বগুড়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন তজ্জন্যই তাঁহার রায় বাহাদুর উপাধি হয়। পূর্ব্বে বগুড়ার বারে সকলেই বাঙ্গালা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উকীল ছিলেন, রজনীবাবু প্রথম ইংরাজী জানা উকীল হইলেন। আর দুই একজন বি-এল তৎপূর্ব্বে তথায় আসিলেও তাঁহারা স্থায়ী হয়েন নাই। এজন্য রজনীবাবু তৎকালবর্ত্তী ৺গিরিশচন্দ্র সেন ও ৺কৈলাসচন্দ্র বক্সী মহাশয়ের পরেই প্রধান উকীল বলিয়া গণ্য হইলেন। যখন বগুড়ার ৺শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভবন হইতে সঙ্কীর্ত্তন যাত্রা ৺ এইচ, জি, শার্প কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন রজনীবাবুই সাহস করিয়া এই মোকদ্দমায় ওকালত নামা গ্রহণ করেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতেন, কিন্তু তিনি তজ্জন্য ভীত হয়েন নাই। পরে যখন বগুড়ায় প্রথম ছোটলাট সার রিভার্স টমসন গমন করেন, তখন একদল যুবক দেশের সকল অভাব লইয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণের অমতে ছোটলাট সাহেবের সহিত পিপস্‌ল এসোসিয়েসন হইতে প্রেরিত হইয়া অভিনন্দন প্রদান করেন, রজনীবাবু তাঁহাদের অন্যতম। ইতিহাসের অনুরোধে লিখিতেছি, ৺উপেন্দ্রনাথ গঙ্গো-

পাধ্যায়, ডাক্তার ৺ নৃত্যগোপাল সান্যাল, ৺ শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়, রায় কালীকিশোর মুন্সী বাহাদুর, ও আমি, এই দল গঠন করিয়াছিলাম। কালে এই দল বগুড়ায় নব্য সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াছিল। পরে যখন দেশপূজ্য বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বগুড়ায় গিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের আন্দোলন করেন, তখন রজনীবাবু তাহাদের সহিত যোগ দেন। প্রথম নির্ব্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারমান ৺ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ভাইস-চেয়ারম্যান বাবু বেণীমাধব বক্সী বি-এল যোগ্যতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন দ্বিতীয় নির্ব্বাচন সময়ে আমি রজনী বাবুকে চেয়ারম্যান হইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "আমার দ্বারা একার্য্য হইতে পারে কি ?" আমি বলিলাম, যখন আপনি এ কার্য্যের দায়িত্বকে এত ভয় করেন, তখন আপনিই উপযুক্ত চেয়ারম্যান হইবেন। আমি হেডমাষ্টার বাবু মোহিনীমোহন বসুকে অনুরোধ করিয়া ভাইসচেয়ারম্যান হইতে স্বীকৃত করাইলাম। এই সময়ের পরে রজনীবাবু প্রায়ই মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান হইয়া সুযোগ্য ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র অতি নিষ্কলঙ্ক ছিল। তখন বগুড়ার সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে চরিত্রবান কয়েকটী মাত্র লোক ছিলেন, রজনী বাবু তন্মধ্যে একজন। তাঁহার অমায়িকতা ও কর্ত্তব্য-অনুরাগ অত্যন্ত ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট তাহার কার্য্যদক্ষতার জন্য তাঁহাকে রায়-বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। চেয়ারম্যান হইবার পূর্ব্বে সমস্ত দেশের কার্য্যেই তিনি মনোযোগ করিবেন। অবশেষে সর্ব্বাপেক্ষা ঐ চেয়ারম্যানের কর্ত্তব্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। তজ্জন্য নিজের ব্যবসায়ে অনেক ক্ষতি হইত। তাহাতে তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। এইরূপ আত্মত্যাগ না থাকিলে লোকে মহত্বপ্রাপ্ত হয় না। সপ্ততী বর্ষ বয়সে রজনীবাবু পুত্রকন্যাগণকে কাঁদাইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহার আত্মাকে শান্তিপ্রদান করুন, এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

ডাক্তার শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়।

যখন কলিকাতায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপুল প্রভাব, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অসীম শক্তি বলে প্রবল হইতেছিল, তখন একটী চিকিৎসা-ব্রতাবলম্বী ছাত্র তাহা হইতে অনুপ্রাণন প্রাপ্ত হয়েন। বিদুষী, উন্নত-হৃদয়া, ধর্ম্মপ্রাণা ৺ অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় সংসহ বিবাহ-সূত্রে মিলিত হওয়াতে পতি পত্নী গভীর অনুরাগের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম আচরণ করেন। অন্নপূর্ণার সৎসাহস ও অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের সহকারিতায় শ্রীমন্তবাবু জাতিভেদ ও কপটতা পরিত্যাগ করিয়া আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইলেন, তখন তাহার পূর্ব্বকার বন্ধুগণ তাঁহার সহিত আর যোগ রাখিতে সাহস করিলেন না। এই সময়ে আমি বগুড়ানগরে গমন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হই এবং অনেক দিন এই পরিবারের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করি। শ্রীমন্ত বাবু অতি উৎসাহী, তেজস্বী ও ধর্ম্মপ্রাণ লোক ছিলেন এবং কোন বিষয়ে সঙ্কোচ তাঁহার চরিত্রে ছিল না, অ[illegible]-দাতা ও উদার-হৃদয় ছিলেন কিন্তু নানাকারণে যৌবনের শেষে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হয়েন।

তাঁহার বাড়ী হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া বগুড়ার সুবিখ্যাত সঙ্কীর্ত্তন-মকদ্দমা রূপে পরিণত হয়। তাহাতে শ্রীমন্তবাবু অনেক ব্যয় ও উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ক্রমে দুর্ভাগ্যের সম্পাতে প্রিয় সহধর্ম্মিণী উন্নত-হৃদয়া অন্নপূর্ণা দেবী পরলোক গমন করেন। জীবনের শেষ ভাগে শ্রীমন্ত বাবু জীবন্মৃতবৎ অবস্থান করিতেন। তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁহার চরিত্রে দৃষ্ট হইত। শেষ জীবনে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ অতি যত্নসহকারে তাঁহার সেবা করিতেন। উপাসনা, প্রার্থনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস শেষদিন পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে বিরাজ করিত। অবশেষে তিনি পৃথিবীর নানা সঙ্কটময় অবস্থা অতিক্রম করিয়া পরম পিতার শান্তিময় রাজ্যে স্থান পাইলেন। যেখানে অন্নপূর্ণাদেবী অনেক বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তথায় গিয়া চিরশান্তি সম্ভোগে সমর্থ হইলেন। দয়াময় এই অকৃত্রিম লোককে তাঁহার শান্তিময় রাজ্যে সুখ শান্তিতে বিভূষিত করুন। ইহাই তাঁহার নিকট বিনীত প্রার্থনা।

৺ গিরিশচন্দ্র সেন, উকীল।

এক্ষণে যাঁহার জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিব, তিনি আমার সহিত অতিশয় আত্মীয় ভাবে সংযুক্ত। কত সময়ে সুখ-দুঃখে একত্র তাঁহার সহিত আলাপে আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি এবং তাঁহার উন্নত উদার হৃদয়ের মহাপ্রাণতা অনুভব করিয়াছি, তাহা বর্ণনীয় নহে। তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথবা নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না থাকিলেও তাঁহার উচ্চ বাসনা, উন্নত ধারণা ও উদার-হৃদয় দেখিয়া আমি সর্ব্বদা মোহিত হইতাম। তিনি প্রখর বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার অন্তরে গভীর ধর্ম্মভাব বিরাজ করিত। তাঁহার নিকট হিন্দু, মুসলমান. খ্রীষ্টান, সকল ধর্ম্মই আদরের জিনিস ছিল। সৌভাগ্য ক্রমে যে গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সে গৃহের ভ্রাতা ও আত্মীয়গণ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে নব্যভাবাপন্ন ছিলেন। এজন্য আমরা অনেক সময়ে প্রাচীন গিরিশ বাবুর মতের উদারতা লক্ষ্য করিতাম, এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কেহ মনে করিতে পারিতেন না যে, তিনি বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। সমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ ছিল। কিন্তু গোঁড়ামি বলিয়া কোন ভাব তাঁহার চরিত্রে ছিল না। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার দানশীলতা অতি উচ্চশ্রেণীর ছিল। বৎসর বৎসর সেনহাটী গ্রামের ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র তাঁহার নিকট জল কষ্টের জন্য সাহায্য চাহিলে তিনি তাহাদের কূপ খনন জন্য সাহায্য করিতেন। কেহ কোন ক্লেশের অবস্থা জানাইলে তাহাদের সাহায্যে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার দান ইউপোপীয় প্রণালীর ছিল। তাঁহার এক কঠিন পীড়ার পরে তিনি অতিশয় অস্থিরচিত্ততা প্রকাশ করিতেন। শুশ্রূষাকারকগণ তাহাকে প্রলাপ মনে করিত। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার চিরজীবনের অভিলাষ যে, আমার উপার্জ্জিত অর্থ কোন সদ্ব্যয়ে নিয়োগ করি। ইহারা তাহা বুঝিতে পারে না। আপনি লিখুন। তখন আমি লিখিতে আরম্ভ করিলাম। তাহার উপার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশমাত্র দুই পুত্রকে প্রদান করিয়া, প্রায় ৪০০০০ হাজার টাকা ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুঃকন্যাদের জন্য, এবং জলাশয় খনন, শিক্ষার

দান, কালীবাড়ীর গৃহ, শ্মশান ঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি সৎকার্য্যের জন্ম উৎসর্গ করিলেন। তৎপরে কাশীধামে গমন করিলেন, তথায়ও নানাবিধ প্রকার দান করিয়া অবশেষে অতি অধিক বয়সে জীবন-লীলা সাঙ্গ করেন। অল্পদিন হইল, তিনি কাশীধামে দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার জন্মস্থান সেনহাটী গ্রামে অনেক পণ্ডিত, উচ্চপদস্থ ও মহাত্মা লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গিরিশবাবু যে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সকলের অনুকরণ-যোগ্য। তাঁহার হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি আমাকে বলিতেন যে, সময় সময় কোন নিঃ-সম্পর্কীয় কি দূর সম্পর্কীয় প্রতিবাসীর দুরবস্থা স্মরণ করিয়া রজনীতে তাঁহার নিদ্রা হইত না। অথচ তাঁহার ন্যায় মিতব্যয়ী লোকও প্রায় ছিল না, অকারণ-বাহুল্য তিনি ভালবাসিতেন না। অথচ সদ্ব্যয় করিতে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। বগুড়ায় ওকালতী ব্যবসা করিয়া অনেকে ধনী হইয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া সন্তানগণকে ধনবান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্য কেবল উন্নতকার্য্য সম্পাদনের জন্যই ব্যস্ত ছিল। করুণাময় পরমেশ্বর এরূপ সহৃদয় মহাত্মার আত্মাকে তাঁহার পবিত্র শান্তিময় ক্রোড়ে স্থানদান করুন। তিনি যেমন অশেষ গুণের আধার ও অকৃত্রিম আড়ম্বর-শূন্য ধর্ম্মভাবপূর্ণ ছিলেন, এমন নির্ম্মল বিশুদ্ধ জীবন নিশ্চয়ই পরলোকে অপার শান্তি সম্ভোগ করিবে। তাঁহার গুণধর পুত্রও তাঁহার দৃষ্টান্তানুকরণ করিতেছেন। দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে, তিনি এই সকল পুণ্যবান জীবনের পুরস্কার প্রদান করুন।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

আত্ম-বিবৃতি।

সংক্ষিপ্ত পূর্ব্বার্দ্ধ।

বহু বৎসর ধরিয়া বহু বন্ধু আমার বাল্য-জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। আমার জীবনে কিছুই উল্লেখযোগ্য নাই বলিয়া আমি সুদীর্ঘকাল তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। এখন জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে,--এখন আর উপেক্ষা রিতেক পারিলাম না। আমি ভ্রাতা ভগ্নী, সাধু সাধ্বীদিগের চরণে প্রণাম করিয়া ২৮ বৎসরের জীবন-কথা বিবৃত করিতেছি। বিধাতার নিকট প্রর্থনা করিতেছি, কোন অসত্য কথা যেন ইহাতে না থাকে এবং কোন কথা যেন অতিরঞ্জিত না হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বহু ব্যক্তি জীবন-কথা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। সাধু মুখে শুনিয়াছি, সাধু সজ্জনদিগের নিকট জীবন-কথা বিবৃত করিলে পুণ্য সঞ্চয় ও বিধাতার কৃপার জয় ঘোষিত হয়। এই বিশ্বাসে গভীর চিন্তার পর এই কার্য্য করিতেছি। সকলে আমাকে ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন।

সকলেরই জীবনের লক্ষ্য থাকে, বিধাতা কৃপা করিয়া আমার জীবনের লক্ষ্য আমার বাল্যকালেই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। ভাল হউক আর মন্দ হউক, বিধাতার দান বলিয়া সকলের জীবনই নিজের নিকট আদৃত। আমি সেজন্য জীবন-বিবৃতি করিতেছি না, বিধাতার কৃপা ঘোষণার জন্য লিখিতেছি, আমার জীবনে কেবল বিধাতার জয়-ঘোষণা হইতেছে।

বাল্যে লক্ষ্য ছিল,"পবিত্রতা ও অর্পণ।"আমি এবার আমার জন্মদিনে প্রর্থনা করিয়াছিলাম, আমার মৃত্যুর পর, আমার সংগৃহীত কমল-কামিনীর ভস্মরাশির সহিত আমার ভস্মরাশি মিশাইয়া তাহাতে যেন লিখিয়া দেওয়া হয়, "পবিত্রতা ও বিশ্বাসের জয়।" মৃত্যুর পর ঋষি গৌরগোবিন্দের ললাটে "যোগ" লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে কথা পাঠ করিয়া আমি একদিন তন্ময় হইয়াছিলাম। ভক্ত কেশবচন্দ্রের জীবনবেদে প্রার্থনা-সম্বলের কথা পাঠ করিয়া একদিন মোহিত হইয়াছিলাম। জেনেরেল বুথের "Love"মূলক বক্তৃতা শুনিয়া একদিন কৃতার্থ হইয়াছিলাম। বিবেকানন্দের "দারিদ্র-নারায়ণ"-বিবৃতিমূলক গাথা পাঠ করিয়া একদিন ধন্য হইয়াছিলাম। শ্রীচৈতন্যের 'নামে রুচি ও জীবে দয়া''র কথা ভক্তি-গ্রন্থে পাঠ করিয়া একদিন সুখী হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু গীতার "কৃষ্ণার্পণ"-তত্ত্ব এবং মহর্ষির পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য সর্ব্বস্ব বর্জ্জনের কথা পাঠ করিয়া যেরূপ তন্ময় হইয়াছিলাম, এরূপ আর জীবনে কিছুতেই হয় নাই। খ্রীষ্ট বলিলেন, "Sell all thy goods and then follow me", এবং রূপ সনাতনের ও হরিদাসের প্রতি কল্যকার চিন্তা পরিহার করিবার কঠোর আদেশে ঐরূপ কথারই পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্ম সাধনের মন্ত্র কি? বর্জ্জনই কি মূল মন্ত্র? বাল্যকাল হইতে এই প্রশ্ন মনে খেলিতেছিল, জাগিতেছিল, কি জানি কি ভাবে আমাকে তোলপাড় করিতেছিল। আমি সংসারে থাকিয়াও যেন আমি-হারা হইয়াছিলাম।

শুনিয়াছি, ১২৬০ সালের ২৩শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমার দিন, বরিশালের অধীন কাশীপুর গ্রামে, মাতুলালয়ে উলপুরের বসুবংশে আমার জন্ম হয়। পিতৃদেব রামচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী ও মাতৃদেবী চন্দ্রকলা। অতি শৈশবে মাতুলালয় হইতে উলপুর আসার সময় মাঠীভাঙ্গা খালে চোরের চক্রান্তে নৌকাডুবি হয়, তাহাতে আমার জীবন-সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, জ্ঞান চলিয়া গিয়াছিল। অতিকষ্টে রক্ষা পাই। উলপুর পূর্ব্বে বরিশালের অধীন ছিল, এখন ফরিদপুর জেলাভুক্ত হইয়াছে। যতদূর স্মরণ হয়, আমি গ্রাম্য পাঠশালায় অত্যাচার হয় বলিয়া সে শিক্ষার বিরোধী ছিলাম, কিছুতেই কাহারও বশে আসি নাই। বাল্যকালে পিতার সহিত একবার কলিকাতা আসিয়াছিলাম। কলিকাতায় যে সকল জিনিস দেখিয়াছিলাম, বাড়ী যাইয়া তাহার অনুকরণ করিতাম। বড় গঙ্গা দিয়া একদিন নৌকা বাদাম দিয়া যাইতেছিল, আমি নৌকার সম্মুখে বসিয়াছিলাম, এক জাহাজের সাহেব আমাকে দেখিয়া একটী দোয়াত উপহার দিয়াছিলেন। একবার মধুমতী নদীতে ঝড়ে নৌকা ডুবিতেছিল,অর্দ্ধেক নৌকা জলে ভরিয়া গিয়াছিল, বিশেষ চেষ্টায় রক্ষা পাই। অতি শৈশবে পিতা মাতার ও পিসিমাতার ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। অন্য খেলা খেলিতাম না, তাঁহাদের দৃষ্টানুকরণে "পূজা পূজা" খেলিতাম। বাল্যে দুর্জ্জয় সাহস ছিল। "পূজা পূজা" খেলিবার সময়, যে বটতলা ভূতের আশ্রয় বলিয়া দেশে প্রসিদ্ধ, সেখানে চড়ক পূজার আখড়া করিয়া একাকী থাকিতেও ভয় পাইতাম না। কখনও কখনও "ক্রয় বিক্রয়" খেলাও খেলিতাম। অতি প্রত্যূষে, যখন উষার কিরণ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইত, তখন শিশির-সিক্ত কুসুম চয়ন

করিতে যাইতাম। ভোরে আসিয়া তাহা পিসিমাতাকে দিতাম। তিনি বড়ই পুলকিতা হইতেন। পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করা আমার নিত্যকর্ম্ম ছিল। আর কাজ ছিল. গরুর সেবা, পিতা মাতার সেবা, গৃহাদির জীর্ণ-সংস্কার করা, নূতন প্রণালীতে ইষ্টকদ্বারা ছোট বাড়ী নির্ম্মাণ করা ইত্যাদি। সংসারের সকল কাজ শিখিব, ইহাই ঐকান্তিক বাসনা ছিল এবং কিছু কিছু শিখিয়াছিলাম। বাল্য হইতে তাহাই করিয়া আসিতেছি। আমি যাহা করিতে পারি না, অন্যের দ্বারা তাহা করাইলেন অধর্ম্ম হয়, ইহাই বাল্য হইতে বদ্ধমূল বিশ্বাস। বিশেষত্বময় সকলেই বিধাতার লীলা, এই বিশ্বাসে সব কাজ শিখিতাম। বাল্যকালে পুষ্পের পবিত্রতা আমাকে যে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা জীবনে ভুলিতে পারি নাই। দেব-সেবার জন্য চয়িত পুষ্পের কীট বাছা যেমন সেবকদিগের নিত্য কার্য্য, আমার চরিত্র-পুষ্পের কীট বাছাও সেইরূপ নিত্য কার্য্য ছিল। পরবর্ত্তী জীবনে, এই পুষ্প উপহারের কথা প্রাণে জাগিতেছিল বলিয়া, এবং মুঙ্গেরে অবস্থানকালীন ৺সাধু দীননাথ চক্রবর্ত্তীর পুষ্প উপহারের উপদেশ-কথা শুনিয়া যে ভাব অর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহার অনুপ্রেরণায়, পুত্রের নাম প্রভাত-কুসুম, পৌত্রের নাম প্রসূন এবং কন্যার নাম অপরাজিতা রাখিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বিধাতার চরণে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। গ্রাম্য পাঠশালার প্রতি অনুরাগ ছিল না বলিয়া বাল্যেই আমাকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী চেত্‌লায় আসিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। চেত্‌লায় প্রথম মতি মাষ্টারের স্কুলে ৺জগদীশ্বর ঘটক* মহাশয়ের সহ একত্রে অধ্যয়ন করি। ৫।৬ মাসে ফাষ্ট, সেকেণ্ড ও থার্ড বুক-অব-রিডিং শেষ করি। কিন্তু সেখানে পাঠশালার ন্যায় অত্যাচার হইত বলিয়া স্বেচ্ছায় স্কুল ছাড়িয়া দেই। তৎপর মহেশ মাষ্টারের ইউনিয়ন একাডেমিতে পড়ি। ৪র্থ শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হই, কিন্তু বাল্য-সুহৃৎ শরচ্চন্দ্র ও চারুচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি লণ্ডন-মিশনারী স্কুলে চলিয়া যাওয়ায় আমিও সেখানে যাইয়া ভর্ত্তি হই। লণ্ডন মিশনারী স্কুলের জনসন. এষ্টন সাহেব, এবং শিক্ষক রেঃ মথুরানাথ বসু এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পিতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস এবং ৺জগচ্চন্দ্র দাস প্রভৃতির সংস্পর্শে এবং আদর্শ ছাত্র মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,† অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়‡, শরচ্চন্দ্র প্রভৃতির পবিত্রতার আদর্শ-প্রভাব আরো বদ্ধমূল হইল।

আমি পিতামাতার আকিঞ্চনে বাল্যেই, নিম্নশ্রেণীতে পড়ার সময়েই, পরিণীত হইয়াছিলাম। ঘোষবংশে বিবাহ হইয়াছিল। আমার শ্বশুর মহাশয় কি দেখিয়া যে আমার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না। তখন আমাদের অবস্থা ভাল ছিল না। খুব কষ্টে দিনপাত হইত। মধ্যম দাদার বিবাহের পর একটু অবস্থা ভাল হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাঁধাইতে প্রায়ই প্রাপ্ত টাকা নিঃশেষ হইয়াছিল। বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই মাতা স্বর্গারোহণ করিলেন; কয়েক দিন

---

* ইনি পরবর্ত্তী জীবনে "হাস্কিং মেসিন" আবিষ্কার করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন।

† এখন কাণপুরের বিখ্যাত ডাক্তার।

‡ এখন এলাহাবাদের বিখ্যাত ডাক্তার।

পর ভাই রমাপ্রসন্নও চলিয়া গেল। কয়েক বৎসরপর পিতাও স্বর্গারোহণ করিলেন। পিতার সেবার জন্য ৬ মাস দেশে ছিলাম। পরে বড়দাদা শেষ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিলে কলিকাতা যাই। পিতার মৃত্যুর সময় সাক্ষাৎ হয় নাই। আমার আকর্ষণের মূর্ত্তি রহিলেন, পিসিমাতা এবং ভগ্নী বিরজা। পিতামাতার তিরোধানের পর হইতে বৈরাগ্যের ছায়া আমার জীবনে পড়িল। মাতার মৃত্যুর পর আমরা ৮ ভাই ও ৩ ভগ্নী ছিলাম, ছোট ভাই গিরিজাপ্রসন্নের বয়স ছিল ৪ মাস। তখন "কুল রাখি কি শ্যাম রাখি" এই প্রশ্ন সদাসর্ব্বদা প্রাণকে ক্ষত-বিক্ষত করিত। শরতের মাতা এবং পিসিমাতা এই সময়ে উপদেশপূর্ণ বড় বড় পত্র লিখিতেন। কিন্তু আমার মন হইতে বৈরাগ্যের ভাব অপসৃত হইল না। এই অবস্থায় বিরজা বিধবা হইল। আমার প্রাণ তখন সংসারের মায়া ছাড়িল। বিরজার জন্য বড় দাদাকে বহু পত্র লিখিলাম। কিন্তু কোনও ফল ফলিল না। আমার প্রাণ দিন দিন উদাসীন হইতে লাগিল। বসন ভূষণে মন নাই, শোভা সৌন্দর্য্যে আকর্ষণ নাই, চেহারার পারিপাট্যে মতি নাই। প্রাণ উদাস, কি করি, কোথায় যাই, সদা এই চিন্তা। ক্লাসে যাইতাম, খেলার ছুটির সময় এক কোণে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। কখন কখন শরৎ যাইয়া চিন্তা-যোগ ভঙ্গ করিত। পিসিমাতা এবং দাদারা সিদ্ধান্ত করিলেন, আমার মনোমত স্ত্রী হয় নাই বলিয়া আমি স্ত্রীকে আদর করিতেছি না। তাঁহারা জানিলেন না যে, সংসার-বৈরাগ্য আমাকে আক্রমণ করিয়াছে তখনকার অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, বহু বন্ধুই মনে করিতেন যে, আমি সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। কোন কোন বন্ধু নানা উপদেশ দিতেন, কিন্তু কোনই ফল হইত না। ম্যাট্‌সিনির বিষাদ-মাখা চিত্রখানি সর্ব্বদা চিত্তে ভাসিত। শরতের উত্তেজনায়, প্রথম যেদিন চন্দ্রমোহনকে লইয়া কালীঘাট-ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলাম, সেদিন ফিরিয়া আসিলে বড় দাদা চন্দ্রমোহনকে প্রহার করিলেন এবং আমাকে তিরস্কার করিলেন। তখন আমার বয়স ১৩ ১৪ বৎসর। আমি সেইদিন দাদাকে নির্ভয়ে বলিয়াছিলাম, "আমি এখন ধর্ম্মসাধন না করিলে, হঠাৎ আমার মৃত্যু হইলে উপায় কি হইবে? আমি ধর্ম্মসাধন করিব, ইহাতে আমাকে সাহায্য করিতে হয় করুন, নচেৎ ছাড়িয়া দিন, আমি একদিকে চলিয়া যাই।" নেপালে যাওয়ার তখন বড় সাধ হইয়াছিল। আতর সিং পঞ্জাবে লইয়া যাইতে চাহিত। বাসায় ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল, মধ্যম দাদা আমার অনুকূলে ছিলেন বলিয়া অবরুদ্ধ হইয়া গোপালনগর প্রেরিত হইলেন। কিন্তু আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল, ধর্ম্মসাধন পরিত্যাগ করিব না।

ছাদের উপর একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলাম। "প্রবল সংসার স্রোত, আমরা দুর্ব্বল অতি" এবং "আমার আর কেহ নাই", এই দুটী গান সম্বল ছিল। একদিন উপাসনান্তে চন্দ্রমোহন উপবীত পরিত্যাগ করিল। তৎপর বাসায় মহা অত্যাচার আরম্ভ হইল। আমাকে সকলেই ভালবাসিতেন বলিয়া প্রকাশ্যে আমার সম্মুখে কেহ কিছুই বলিতেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘোরতর আন্দোলন চলিল। আমি বড় দাদাকে ঐ বাসা পরিত্যাগের কথা

জানাইলাম। বড় দাদা বলিলেন, তোমার সর্ব্বসাধনে কেহ ব্যাঘাত না করিলে থাকিবে ত? আমি স্বীকৃত হইলাম এবং তাহাই হইল। চেতলা স্থানটী বড় ভাল নয়। চতুর্দ্দিকে তখন নানা প্রলোভন, বাসার প্রাচীনগণ ব্যভিচারে নিমগ্ন, চতুর্দ্দিকে রিপুর মত্ততায় লোক ভাসিয়া যাইতেছে, রাস্তায়, হাটে, গঙ্গার ঘাটে যৌবনের প্রমত্ত ক্রীড়া কৌতুক চলিতেছে,—রূপের হাট চতুর্দ্দিক জমিয়া গিয়াছে, আমি তখন লণ্ডন-মিশনারী স্কুলের রেঃ মথুরানাথ বসু, শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস, এষ্টন ও জন্‌সন সাহেবের চরিত্রাদর্শে অনুপ্রাণিত। তখন যৌবন জাগিতেছে, কিন্তু আমি খ্রীষ্টের পবিত্রতার আদর্শে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছি। অবিনাশ এবং মহেন্দ্রনাথ, চারু এবং শরচ্চন্দ্র, রঘুনাথ এবং অশ্বিনীকুমারের নিস্পৃহ জীবনাদর্শ আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া চলিল। এই সময়ে রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর প্রভাস যাত্রা, গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা এবং মহেশ চক্রবর্ত্তীর দক্ষযজ্ঞ যাত্রা শুনিতে শুনিতে ভাবে বিভোর হইয়া যাইতাম। সংযম হইল লেখনী, নিষ্ঠা হইল মসী, আমি চিরকালের সম্বলের কথা প্রাণের নিভৃতে লিখিলাম—“পবিত্রতা।” আমি শোভা সৌন্দর্য্যের রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম, বিলাসিতাকে হৃদয়ের ত্রিসীমায় আসিতে দিতাম না। কখনও তাম্রকূট, চা বা মদ্যাদি গ্রহণ করি নাই। সমস্ত দিবারজনী চেতলার নিভৃত ঘরের দ্বার আবদ্ধ থাকিত, আমি নির্জ্জন সাধন করিতে করিতে অহেতুকী পবিত্রতার রাজ্যে ভাসিয়া চলিলাম। প্রলোভন আসিয়া দ্বারে আঘাত করে, দাদার শ্যালিকারা আমার রূপ দেখিয়া আমাকে বিবাহ করিতে চায়, আরো কত কত আকর্ষণ, কত কত প্রলোভন। আমি সহচরদিগের সহিত মিলিয়া শুধু সাধন করিতে লাগিলাম—“পবিত্রতা।” দিনান্তে নিশান্তে মায়ের নিকট শুধু প্রার্থনা করিতাম—“আমি যেন পবিত্র হই।” কেহ ভাল খাবার দিলে বিলাইয়া দিতাম, কেহ ভাল কাপড় দিলে অন্যকে অর্পণ করিতাম, কেহ অর্থ দিলে অভাবগ্রস্তকে অলক্ষিত ভাবে পরাইয়া দিতাম। যৌবনের প্রথম অবস্থায় আমি মহা বৈরাগী সাজিলাম। কখনও গৈরিকধারী হই নাই বটে, কিন্তু কেহ কখনও শাল বনাত গায়ে দিতে, মোজা পায়ে দিতে আমাকে দেখে নাই। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, এ কিরূপ যুবক? ৫ মাইল পথ হাঁটিয়া প্রতি রবিবারে কলিকাতা ব্রহ্মমন্দিরে যাইতাম, রাত্রে আহার যুটিত না। কালীঘাটের সাধু হরিচরণ রায়, নন্দলাল হালদার, কেশবচন্দ্র, অঘোরনাথ ও প্রতাপ চন্দ্র আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। ১৮৬[illegible] খ্রীঃ হইতে ১৮৭২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের নানা কার্য্যে যোগ দিতে লাগিলাম। নগর-সঙ্কীর্ত্তন একবারও বাদ যায় নাই। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৩ আইনের আন্দোলনের জন্য টাউন-হলে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে যাইয়া কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা প্রথম শুনিয়া মোহিত হইলাম। আমাকে তখন চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ও রসিকনাথ দত্ত, আতর সিং ও বজ্ঞীর সিং মাতাইয়া তুলিল। চেত্‌লার শতাধিক দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া শিক্ষা দিতাম। অপরাহ্ণে ছাত্রগণকে জীমনাষ্টিক শিক্ষা দিতাম, কখনও আমাদের দ্বারা সংস্থাপিত পরিবার-সংস্কার-সভায়

কাজ করিতাম, কখনও বা চেতলা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কাজ করিতাম ;—অন্য সময়ে নিভৃত সাধন, অধ্যয়ন, নির্জ্জন-চিন্তা,—রুটিং মত সব কাজ করিতাম। টবে টবে ফুলের গাছ পুতিয়া বাড়ীখানি সাজাইতাম। দিবারজনীর ১৮ ঘণ্টা এইরূপে ব্যয়িত হইত। এই চেতলায় শরচ্চন্দ্র রচিত হয়। এইরূপ করিতে করিতে ১৮৭২ খ্রীঃ মাইনর-স্কলারসিপ পরীক্ষা ও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ী গেলাম। শূন্য বাড়ী—পিতা মাতা নাই, জ্যেঠতাত মহাশয় পৃথক ছিলেন, তাঁহাকে এক পরিবারভুক্ত করিলাম ; তাঁহার ছেলেটী পাপের পথে ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহাকে উদ্ধার করিলাম। সন্ধ্যার সময় একটী ভিটার গাছতলায় বসিয়া মায়ের নাম করিতাম ; উপাসনার সাথী ছিল ৺হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরী। উলপুর থাকিতে থাকিতে দারুণ ম্যালেরিয়া পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। ঐ পীড়া লইয়া কলিকাতা আসিয়া ১৮৭৪ খ্রীঃ জুন মাসে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। ডাক্তারী পড়িব, সে ইচ্ছা ছিল না, সকল শিক্ষার সার শিক্ষা দেহতত্ত্ব শিক্ষা, দেহতত্ত্ব শিক্ষা ভিন্ন বিজ্ঞান দর্শনে অধিকার জন্মে না, এই বিশ্বাসে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। চন্দ্রমোহন সঙ্গে কলিকাতা আসিল। ৪৩নং বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেনে থাকিতাম। কিন্তু পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে চেতলা যাই, আবার কলিকাতা আসি। ডাক্তার কবিরাজগণ জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন। আতরসিংহ ও বজিরসিংহ স্বাস্থ্যকর স্থানে আমাকে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মধ্যম দাদা সম্মত হন না দেখিয়া তাহারা টাকা দিল। আতরসিংহ সৈন্যগিরি কাজে ইস্তফা দিল। আমাকে লইয়া পঞ্জাবে যাইবে ঠিক করিল। তাহারা পঞ্জাবের বড়লোক ; তাহার কার্য্যত্যাগ-পত্র গৃহীত হইল না। ইতিমধ্যে পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় আমি মুঙ্গের যাত্রা করিলাম। চন্দ্রমোহন আমাকে রেল-ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া পথিমধ্যে চিন্তাজ্বরে আক্রান্ত হইল, এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। আতরসিংহ সন্ন্যাসী হইয়া মুঙ্গেরে যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে লইয়া কি করিব, মহা সমস্যায় পড়িলাম। বজিরসিং যে কোথায় গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া আর পাইলাম না। পিসিমাতা চিন্তায় কাতর হইয়া পরলোক গমন করিলেন। আমার বালিকা স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুর শাশুড়ী কালীঘাটে আসিলেন। কিন্তু আমি তখন মুঙ্গেরে ; সাক্ষাৎ হইল না। রসিকলাল দত্ত পড়া ছাড়িয়া দেশে চলিয়া গেলেন। মুঙ্গেরে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সেনের* সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলাম। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বাগচী মহাশয় ও ৺দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগের নিষ্কাম ধর্ম্মজীবন দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলাম। কি করি, কোথায় যাই, দিবারাত্রি কেবল এই চিন্তা ছিল। কিরূপে পবিত্র থাকিতে পারিব, কিরূপে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিব, কি করিয়া সর্ব্বস্ব দেশের জন্য ঢালিতে পারিব, এই চিন্তায় আমার অন্তরকে তোলপাড় করিতেছিল। আরোগ্য হইয়া ফিরিয়া যখন কলিকাতা আসিলাম, তখন আতরসিংও আসিল, কিন্তু চন্দ্রমোহন নাই, কার সঙ্গে একত্রে থাকিব? ভালবাসার জীবন্তমূর্ত্তি পিসিমাতাও নাই। ২০নং পটুয়াটোলার বাসায় তখন যোগীন্দ্রনাথ ও রাধিকাপ্রসাদ বসু সাথী হইলেন।

---

* তিনি এখন ডিবরুগড়ে আছেন।

তখন অল্পে অল্পে যৌবনের মধ্যসীমায় উপনীত হইয়াছি কিন্তু বৈরাগ্য সাধনই তখনও আমার একমাত্র মন্ত্র ছিল। ভাল জিনিস খাইতে ইচ্ছা হইলে খাইতাম না, ভাল জিনিস পরিতে ইচ্ছা হইলে পরিতাম না, কাহারও অভাব দেখিলেই যাহা পাইতাম, বিলাইয়া দিতাম। সকল কথা বিবৃতির স্থল ইহা নয়, আমার সব কথা লিখিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। এই পটুয়াটোলার বাসায় চেতলার ধর্ম্মস্পৃহা জমাট বাঁধিল। আতর সিংহ সঙ্গে থাকিতে চাহে, কিন্তু রাখি কোথায়? নিরুপায় হইয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। তারপর আর সাক্ষাৎ নাই। চেতলা হইতে হাঁটিয়া ব্রহ্মমন্দিরে আসিতাম যখন, তখন প্রায়ই রাত্রে অনাহারে থাকিতে হইত, উৎসবের সময়ও দুই একদিন অনাহারে চলিয়া যাইত। কিন্তু কলিকাতায় আসার পর সমাজে যাওয়ার আর বাধা নাই;—ত্রৈলোক্যনাথের সুমধুর সঙ্গীত, প্রতাপচন্দ্রের আরাধনা, মহর্ষির স্বার্থত্যাগমন্ত্র, কেশবচন্দ্রের জীবন্ত উপদেশ, ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডীর স্বদেশানুরাগ আমাকে মাতাইয়া তুলিল। কলিকাতার চতুর্দ্দিকে প্রলোভন; পটুয়াটোলার বাসায় ৺পি, সি, মিত্র* থাকিতেন। তিনি তখন বিপথে গিয়াছেন, আমি তখন চতুর্দ্দিকে শুধু পবিত্রতার ছবি অঙ্কিত করিয়া তন্ময় হইয়া থাকিতাম। প্রায়ই গঙ্গাতীরে ও ইডেন গার্ডেনে যাইয়া সাধন করিতাম। মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন আর সাক্ষাৎ নাই, বাল্যসুহৃদ্‌গণ কেহই কাছে নাই, আমি একাকী গঙ্গারতীরে ও বাগানে নিভৃত সাধন করিতেছি। তখন মেডিকেল কলেজ হইল, আমার সাধনার দ্বিতীয় ক্ষেত্র। প্রিন্সিপাল স্মিথ ও কোট্‌সের জীবনাদর্শ, সার্জ্জন পামার, পারট্রিজ ও ম্যাকলিওডের চরিত্রানুপ্রাণন, চন্দ্রসাহেবের প্রতিভা এবং সহপাঠী দ্বারকানাথ সরকার ও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির সহবাসে আমার জীবন আরো ফুটিতে লাগিল। তখন সমস্ত দিন কলেজে থাকিতাম। প্রকাণ্ড লাইব্রেরিতে আমি ও দ্বারকানাথ সরকার ডুবিয়া থাকিতাম। কিন্তু সাধন করিতাম শুধু "পবিত্রতা"। সেখানে কত রকম কত ছেলের সন্দর্শন হইত, আমি কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতাম না। আমি বাল্যকাল হইতে অসামাজিক হইয়া গিয়াছিলাম। কেহ বুঝিতেন না, কি তপস্যায় বিভোর আছি। মেডিকেল কলেজে বসিয়া আমি "ভারতসুহৃদ্‌পত্রিকার অবতরণিকা" লিখিয়াছিলাম। শুধু পবিত্রতার মায়ায় আমি এই সময়ে অসামাজিক হইয়া পড়িয়াছিলাম। কেহ যদি থিয়েটারে যাইতে বলিত, আমি বলিতাম, ভয় পাই। কেহ যদি তামাসা দেখিতে যাইতে বলিত, আমি বলিতাম, মন চলে না। কেহ যদি তাস পাশা খেলিতে আহ্বান করিত, বাল্যকাল হইতে বলিতাম, ঐ সকলে আমার রুচি নাই। আহার করিতে যাইতেছি, ভাত প্রস্তত। এমন সময়ে একদিন যোগীন্দ্রনাথ মেঠাই খাইতে অনুরোধ করিলেন; আমি কিছুতেই রাজি হইলাম না। বালেশ্বরের বিখ্যাত উকীল ত্রৈলোক্যনাথও এই পটুয়াটোলার বাসায় ছিলেন। আমার ব্যবহার দেখিয়া সকলে অবাক্ হইতেন। কিন্তু সকলেই ভালবাসিতেন।

সংস্পর্শ ত সংস্পর্শ,—কলুটোলায় কেশবচন্দ্রকে দেখিয়া আসিয়াছি, একটী কথা বলি নাই, সিন্দুরিয়াপটি ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষির উপ-

---

* তিনি পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন।

দেশ শুনিয়া গলিয়া গিয়াছি, কোন কথা বলি নাই। ঐ স্থানে রামকৃষ্ণের সমাধি-প্রাপ্তি দেখিয়াছি, কিন্তু স্পর্শ করি নাই। অজ্ঞানিত থাকিব, নিভৃতে সাধন করিব, পবিত্র হইতেও পবিত্র হইব, শুধু ইহাই কামনা ছিল। আমি কেন পবিত্রতার সংস্পর্শে পড়িলাম, কে বলিবে? অপবিত্র লোক দেখিলেই তাহাদের সংস্পর্শে যাইতে ভয় হইত। এইরূপে আমি দ্বিতীয় পরীক্ষায় পটুয়াটোলায় এবং মেডিকেল কলেজে পবিত্রতা-সাধনে জয়ী হইলাম। এই সময়ে পরিবারে ধর্ম্ম সাধন ও গৃহস্থাশ্রম-সাধন-মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।

পটুয়াটোলা লেনের পর ৫৩ নং কলেজ ষ্ট্রীটে আসিলাম। পার্শ্বে ব্রাহ্ম-নিকেতনে তখন কালীপ্রসন্ন দত্ত আসিয়াছেন। কি জানি কেন, এই সময়ে তাঁহার সহিত বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিল। শেষে দুই বন্ধু মিলিয়া ১৮নং রতন মিস্ত্রীর লেনে, কালীবাবুর বাড়ী ভাড়া লইয়া একটী মেস্ খুলিলাম। আমি হইলাম মেসের অধ্যক্ষ। নিজে যাহা পাইতাম, তাহা এই সময়ে বহু অসমর্থদিগের জন্য ব্যয় করিতে লাগিলাম। সখ্য-প্রেমের মায়ায় আমি মত্ত হইয়াছিলাম। একদিন উলপুর হইতে সংবাদ পাইলাম যে, আমার প্রাণতুল্য ভাই যজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছে। সংবাদ পাইয়াই গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলে যাইয়া, পদব্রজে ৩ দিন পর উলপুর পৌঁছিলাম। যজ্ঞেশ্বরকে চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য কারতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই বাসায় আসিয়া শশীভূষণ গুহ ও দত্ত মহাশয়ের সহিত মিলিয়া আমরা "বঙ্গহিতৈষী যন্ত্র" স্থাপন করিলাম। "ভারত-সুহৃদ্" পত্রিকা বাহির করিলাম। কাওলীবেড়ার কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় জয়পুরের চাকুরী ছাড়িয়া 'স্বাবলম্বন' মন্ত্র সাধনের জন্য আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। তখনও মেডিকেল কলেজের পড়া শেষ হয় নাই। এই বাসায় থাকিবার সময় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত সেন মহাশয়ের সহিত মিলিয়া দত্ত আমেরিকা যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কোন উপায় না হওয়ায় শেষে আপন বিষয় বিক্রয় করিতে বরিশাল যাত্রা করিলেন। এই সময়ে সংবাদ পাইলাম, আমার ছোট ভগ্নী বিরজা দারুণ পীড়ায় আক্রান্তা হইয়াছে। এই ভগ্নীর প্রতি বাল্যকাল হইতে আমার একটা প্রাণের টান ছিল। তাহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আর ঠিক থাকিতে পারিলাম না। বিরজা বালবিধবা,—১০।১১ বৎসরের সময় বিধবা হইয়াছিল। তাহার শ্বশুর বাড়ীতে অযত্ন হইত বলিয়া আমার শ্বশুর মহাশয় বানরিপাড়ায় আনিয়া তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। এই ভগ্নীর জন্য আমার অগ্রজদিগের নিকট অনেকবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাঁহারা আমার কথা শুনেন নাই। ভগ্নীর পীড়ার কথা শুনিয়া আমি আর ঠিক থাকিতে পারিলাম না। ১২৮৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কোন বন্ধুর নৌকায় উঠিয়া ভগ্নীকে দেখিতে আমার শ্বশুরবাড়ী বানরিপাড়ায় গেলাম। তখন খুলনার রেল হয় নাই, সুন্দরবন দিয়া নৌকায় গিয়াছিলাম। বৈঠাকাটার নিকট মাথাভাঙ্গার নদীতে ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই। ৩ খানি নৌকার প্রায় ২৫।৩০ জন লোক আক্রমণ করিয়াছিল। নৌকায় অন্যের পরিবার ছিল, আমার কথায় রাত্রে ঐ নদীকে জোয়ার দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং আমাকেই জীবনের মায়া পরিত্যাগ

করিয়া রক্ষা করিতে হইয়াছিল। বিধাতা যেন সিংহ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আত্ম-প্রশংসা-পাপের ভয়ে সব কথা লিখিলাম না। এই যাত্রায় ভীষণ ঝড়ে পতিত নৌকাখানিকে দুই প্রহর বালেশ্বর নদীতে আকণ্ঠ ডুবিয়া তটাঘাত হইতে রক্ষা করিতে হইয়াছিল। বিরজার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন বলিয়া তাহাকে কলিকাতায় আনিলাম। অন্য স্থান না পাওয়ায় প্রথমতঃ তাহাকে রতনমিস্ত্রীর লেনে লইয়া আসিলাম। চিকিৎসাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ঘটনা-ক্রমে দাদারা বিমুখ হইলেন বলিয়া, একদিন কালীঘাটের রুক্মিণী চৌধুরাণীর ঘাটে নৌকায় রাখিয়া, শেষে কলিকাতায় আনিতে হইল। এই সময়ে বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। উলপুরের বসুবংশ মহা কুলীন। আমার শ্বশুরবংশও কুলীন। বাসায় আসার পর নানা আন্দোলন আরম্ভ হইল, বড়দাদা তখন নেত্রকোণার মুন্‌সেফ ছিলেন, তিনি সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় আসিলেন। আমার খরচ পত্র বন্ধ করিয়া দিলেন। কখনও বা তিরস্কার করিয়া, কখনও প্রলোভন দেখাইয়া ফিরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিরস্কার করিলেন, তৎপর কত উপদেশ দিলেন, কত প্রলোভন দেখাইলেন, আমার কিন্তু কিছুই ভাল লাগিল না, ভিতর হইতে কে যেন অজানিত পথে যাইতে আদেশ করিতে লাগিলেন.—কে যেন ভিতর হইতে সদা ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। আমি নির্ভয়ে আত্মীয়তার মায়া ছাড়িয়া দুঃখ দারিদ্র্যের পথে চলিতে লাগিলাম। মন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইল সর্ব্বদাই আকাশ-বাণী শুনিতে লাগিলাম। নিভৃতে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ পথে যাইব, মা স্পষ্ট উত্তর দেন, "এই পথে"। ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করি, "কি করিবে, তোমার সব আত্মীয় এক দিকে, আমি তোমার দরিদ্র ভাই একাকী এক দিকে, কি করিবে?" ভগ্নী স্পষ্ট উত্তর দিলেন, "কিছুতেই ফিরিয়া যাইব না।" আত্মীয়গণের অত্যাচারে ভগ্নীকে বাসায় রাখা দায় হইল, কিছুদিন পর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়ের আশ্রয়ে ভগ্নীকে রাখিলাম। তাঁহার স্ত্রীর যত্নের কথা জীবনে ভুলিব না। তৎপর আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের বাড়ীতে ভগ্নী আশ্রয় পাইল। সেখান হইতে মিস্ একরয়েড্ মহোদয়ার স্কুলে বালীগঞ্জে ভর্ত্তি হইল। কিন্তু ভগ্নীর পীড়া আরোগ্য হয় নাই। ৺রাধাকান্ত ঘোষ মহাশয় দয়া করিয়া বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। একদিন প্রাতে ডিসেক্‌শন করিয়া বাসায় আসিবার পর আমার বড় দাদা, মেজ দাদার শ্বশুর দুর্গাদাস সরকার, দিদির শ্বশুর উজানীর রাজা ৺গিরিশচন্দ্র রায় এবং হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক শশীভূষণ বসু মহাশয়ের পিতা কমল-নাজির প্রভৃতি মহাশয়গণ আসিয়া আমাকে ধরিয়া চেতলায় লইয়া গেলেন। সমস্ত দিন ৪ জনের কেহ ২০, কেহ ৪০ হাজার টাকা দিবার প্রলোভন দেখাইলেন, ৺গঙ্গাদাস সরকার মহাশয়ের পত্নী আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, তিনি কত কাঁদিলেন। সন্ধ্যার পর কিছুতেই যখন আমার মন পরিবর্ত্তিত হইল না, তখন দুর্গাদাস সরকার মহাশয় বলিলেন—"তবে এই বাড়ী হইতে দূর হ"। আমি নীরবে চলিয়া আসিলাম। চড়কডাঙ্গার মোড় পর্য্যন্ত গঙ্গাদাস সরকার মহাশয়ের পোষ্যপুত্র রাজকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল, সে বলিল, 'দেখুন, আমা-

দের পক্ষ হইতে কিন্তু আপনাকে তাড়িত করা হইল না ” বালক কেন যে এরূপ কথা বলিল, তাহা তখন বুঝিলাম না।

আমি সেই বিষাদময় রজনীতে নির্ভয়ে হাঁটিয়া কলিকাতায় আসিলাম। কে যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। আজ হইতে একেবারে নিরাশ্রয় হইলাম। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি কত কি কথা বলিলাম,তাহা তিনিই জানেন। বলিয়াছিলাম, ‘‘মা, দেখিও, আমার কৃত কার্য্যের জন্য আমার দুঃখিনী ভগ্নীর যেন অকল্যাণ না হয়, তাহাকে তুমি রক্ষা করিও।” বিধাতার আদেশ পালন করাতে এই রূপে চেতলার সম্বন্ধ শেষ হইল। সরকার পরিবার অচিরাৎ পৃথক হইল, আমি অনুরুদ্ধ হইয়া প্রায়ই রাজকুমারের মাতার সহিত গোপনে দেখা করিতে যাইতাম। এখন তিনি জীবিতা নাই, রাজকুমারও নাই। কিন্তু দুর্গাদাস সরকার মহাশয়ের ঘরে আর কখনও আহার করি নাই মধ্যম দাদার পীড়ার সময় তাঁহার সেবার জন্য কয়েকবার সেখানে যাইতে হইয়াছিল। দাদাকে ৺ করুণাকুমার সেন ডাক্তার মহাশয়ের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য করার পর, দাদাও আমার অনুরোধে পৃথক বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সুতরাং আর দুর্গাদাস সরকারের বাড়ীতে যাইতে হয় নাই। আমি এই রূপে আমার চেতলার রাশি রাশি পুস্তক হইতে বঞ্চিত হইলাম। পিতার সম্পত্তির আয় ও দ্রব্যাদি এ পর্য্যন্ত কিছুই গ্রহণ করি নাই। প্রেসটী বড় দাদা ৺শশীভূষণ দত্ত মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া ভবানীপুর লইয়া গেলেন, “ভারত-সুহৃদ্” বন্ধ হইল, আমার শরচ্চন্দ্র ছাপান হইতেছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। আমি ভগ্নীকে লইয়া অকূলে ঝাঁপ দিলাম। অল্পদিনের মধ্যে বাসার লোক সকল স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে লাগিল, সকল বন্ধু যাওয়া আসা বন্ধ করিলেন। চতুর্দ্দিকে মহা আন্দোলন, আমি একাকিত্বের সিংহাসনে রাজরাজেশ্বরকে বসাইয়া দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। অন্তর বাহির তখন একাকার হইয়া গিয়াছে, চিন্ময়ে মৃণ্ময় যেন মিশিয়া গিয়াছে, আমি সর্ব্বস্ব তাঁহাকে উৎসৃষ্ট করিলাম। আমার জীবনের ব্রত ছিল, গোপনে থাকিব, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের কোন লোকের সহিত পরিচয় নাই। মহা আন্দোলনে পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করি, কোথায় যাই? ভাদ্রোৎসবের দিন বেলা ১ টার সময় বাসায় আসিয়া দেখি—আমার শ্যালক অন্নদাচরণ, ছোট ভগ্নীপতি কুলেশচন্দ্র প্রভৃতি সকলে বাসা শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, বাড়ীওয়ালা কালী বাবু আমার ঘরের দ্রব্যাদি এ টী ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি রাস্তায় বাহির হইয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া প্রার্থনা করিলাম ‘‘মা, তুমি দূরের মৃত্যু নিকট আন, কোন দুঃখ নাই, আমি যেন কর্ত্তব্য পালন করিয়া মরিতে পারি।” তখন দুগণ্ড বহিয়া দরদর ধারে অশ্রুপতন হইতেছিল। সেই অবস্থায় কালীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কালী বাবু জানিতেন না যে,আমার জিনিস তিনি ঘরে বন্ধ করিয়াছেন, তাঁহাকে যখন সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম, তিনি আমার দ্রব্যাদি খুলিয়া দিলেন। আমি সব লইয়া ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের মহা দুর্গ, ভারত-সভার কার্য্যালয়, ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীটের বাসায় রাখিয়া ফকীরী লইলাম।

এই সময়ে দয়াল কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার বিশেষ সহায় হইলেন। শরচ্চন্দ্র খানি ছাপা হইতেছিল, প্রেস লইয়া যাওয়ায় তাহার ছাপা বন্ধ হইয়াছে,বাধ্য হইয়া প্রথম ভাগ বাহির করিতে হইল। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নাই, ছাপা খারাপ, কাগজ খারাপ, বেশী বিক্রয় হইত না; দুই একখানি যাহা বিক্রয় হইত, তাহা ৺ডাক্তার রাধাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের গাড়ীভাড়া দিতে ফুরাইয়া যাইত। সব দিন আহার যুটিত না। অনেক চেষ্টা করিয়া বিরজাকে তখন বালীগঞ্জে মিস একরয়েডের স্কুলে দিয়াছিলাম। এই সময়ে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু লাহা, ৺আনন্দমোহন বসু, ৺দুর্গামোহন দাস ও শ্রীযুক্ত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ভগ্নীর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঋণ এজীবনে পরিশোধ হইবার নয়। রাধাকান্ত বাবু ভিজিট নিতেন না, কিন্তু গাড়ীভাড়া দিতেই আমার সব নিঃশেষ হইত। কোন দিন দুই এক পয়সা বাঁচিলে কিছু খাইতাম, /১০ বাঁচিলে শ্রীনাথ দাসের লেনের সম্মুখস্থ একটী হোটেলে আহার করিতাম। এই ভাবে অনেক দিন চলিল। কাহারও সহিত আলাপ নাই। কাহাকে ও অভাবের কথা বলি না। গোপনে গোপনে থাকিতে লাগিলাম প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় রতন মিস্ত্রীর লেনের বন্ধু, তিনি শরচ্চন্দ্র লইয়া তেজপুর, কুষ্টিয়ায় যাইয়া শরচ্চন্দ্রের গ্রন্থকার বলিয়া পরিচয় দিয়া যশ পাইলেন। এই সময়ে সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে একটী ৫৲ টাকা বেতনের টিউসনি যুটিয়াছিল। একমাস পর ৸৹ আনা দিতে চাহিলে আমি তাহা গ্রহণ করিলাম না। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডাক্তার ভগবানচন্দ্র রুদ্র মহাশয়ের অগ্রজ গিরিশচন্দ্র রুদ্রের মেয়ে লক্ষ্মীমণিকে পড়াইবার জন্য আমায় নিযুক্ত করাইয়া দিলেন। বেতন ধার্য্য হইল, মাসিক ৫৲। ইহাই আমার প্রথম চাকুরী। তাহাও অধিক দিন রাখিতে পারি নাই,কেননা,সেই সময়ের বন্ধু অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভাব বেশী বুঝিয়া, ঐ টিউসনিটী তাঁহাকে দিয়াছিলাম। বহুবাজারের হোটেলে যখন খাইতে বসিতাম, তখন প্রার্থনা করিতাম, 'মা, এইরূপ যদি একটী ছোট বাড়ী পাই,তবে সেইখানে আমার পুস্তক কয়খানি রাখি এবং রাস্তার বালক বালিকা ডাকিয়া আনিয়া সেখানে রাখি এবং আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশের উপকার করিয়া বেড়াই।' আমার দুটী প্রার্থনাই যেন বিধাতার কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। অচিরাৎকাল মধ্যে আমার অবস্থা ফিরিল। শ্রীবাড়ীর ৺পরেশনাথ রায় মহাশয় ৩০৲ টাকা দিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা ৺সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শরচ্চন্দ্র দ্বিতীয় ভাগ ছাপাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় ভাগ বাহির হওয়ার পর কিছু কিছু বিক্রয় আরম্ভ হইল এবং বিধাতা যেন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। এইরূপে এক বৎসর চলিয়া গেল। তখনও মেডিকেল কলেজে পড়ি। কিন্তু অনাহারে এবং দারুণ পরিশ্রমে মস্তিষ্কের পীড়া আরম্ভ হইল। এই সময়ে ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীটে আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সিঁড়ির সম্মুখের একটী নীচের অন্ধকারময় ঘরে থাকিতে হইত। দোতালায় ভারত-সভার কার্য্যালয় ছিল। এই বাড়ীই ঐ সভার প্রথম কার্য্যালয়। এখন সে বাড়ীর জমী মেডিকেল কলেজভুক্ত হইয়াছে।

এই সময়ে এই বাসায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ

শাস্ত্রী, ৺কালীনাথ দত্ত, ৺উমেশচন্দ্র দত্ত ও ৺হরনাথ বসু মহাশয়গণের সহিত পরিচয় হয়। তখন কুচবিহারে বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ৯৩নং কলেজ ষ্ট্রীট ছিল, আন্দোলনের মহাদুর্গ। এই স্থানের পবিত্র সংস্পর্শে আমার জীবনের যে উপকার হইয়াছিল, তাহা ভুলিবার নয়।

আমার মধ্যে কি দেখিয়া যে ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিগণ আমাকে ভালবাসিতে লাগিলেন, তাহা জানি না। ক্রমে ক্রমে আমাকে যিনি দেখেন, তিনিই ভালবাসিতে লাগিলেন। আমি ক্রমে সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজের একজন অগ্রণীর মধ্যে গণ্য হইলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত হইবার সময় এবং পরে সকল প্রকার কার্য্যে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। উপাসনার আয়োজন, মন্দির নির্ম্মাণ, সভা সমিতির সাহায্য, সবই করিতে হইত; কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় সামান্য বলিয়া সে সব উল্লেখ করেন নাই। সেতুবন্ধনে সামান্য কাঠবিড়ালের সাহায্যের কথা রামায়ণে উপেক্ষিত হয় নাই, কিন্তু আমার ন্যায় সামান্য লোকের কার্য্যের কথা উল্লেখ করাকে তিনি আবশ্যকীয় মনে করেন নাই। ইহাতে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে কি না, সত্যসন্ধিৎসু ভাবী বংশ সে বিচার করিবেন।

কুচবিহারের বিবাহের আন্দোলন উপলক্ষে "সমালোচক" নামক যে সাপ্তাহিক পত্র বাহির হইয়াছিল, আমি বহুদিন সেই পত্রের সম্পাদক ছিলাম। তাহাতে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধসমূহ পরে "সোপানে" প্রকাশিত হইয়াছে।

যখন বিরজাকে আনিতে গিয়াছিলাম, তৎপূর্ব্বে কমলকামিনীর সহিত অনেক পত্র লেখালেখি হইতেছিল। সে সকলই ধর্ম্ম-উপদেশ-পূর্ণ। সেই সকল পত্রের দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া কলিকাতায় আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমার অবসর ঘটে নাই। ১২৮৪ সালের ২৭শে মাঘ প্রভাতের জন্ম হয়। এক বৎসরের বালক যখন দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে, আর বাঁচিবার আশা ছিল না, তখন কমলকামিনী ছেলেকে একবার দেখিয়া আসিতে আমাকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার কাতর প্রার্থনায় আমি খোকাকে দেখিতে যাই। এবং অনেক চেষ্টার পর তাহাকে কলিকাতায় আনয়ন করি। এক মাস ভিক্ষুকের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কত অত্যাচার, কত অবিচার যে হইয়াছিল, বিধাতাই জানেন। বহুবার চোর ডাকাতের উপদ্রবে পড়িয়াছিলাম। সে সকল ঘটনা আর বিবৃত করিতে চাহি না। তখনও খুলনা রেল হয় নাই। বিধাতার কৃপায় রক্ষা পাই। কালীপ্রসন্ন দত্ত তখন বরিশালে ছিলেন, তিনি ও বৈকুণ্ঠনাথ সরকার মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া দয়ার সাগর ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় আশ্রয় পাই। তৎপর ৺আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাসায় ২২নং কলেজ ষ্ট্রীট একত্রে থাকি। এই সময়ে অবস্থার পীড়নে এত কষ্ট পাইতেছিলাম যে, ছেলের পাড়ার ঔষধ যোগাইতে পারিতাম না। বন্ধুবর কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কুমারটুলির মদনমোহন কবিরঞ্জন মহাশয়কে আনয়ন করিয়া প্রভাতকে আরোগ্য করেন। সে সময়ের কথা মনে হইলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। ৺দ্বারকানাথের চেষ্টায় বেঙ্গল পবলিক ওপিনিয়নের প্রুফ দেখার কার্য্যে ২০৲ বেতনে নিযুক্ত হই। এই প্রেসে যখন

শশীপদ বাবুকে দেওয়া হয়, তখন সে কার্য্য ছাড়িতে হয়। ইহাই জীবনের শেষ চাকুরী। এই সময়ে সিলিগুড়ীর সাধু শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় এবং দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর আমার রক্ষা-কল্পে ব্রতী হন এবং অনেক পুস্তক বিক্রয় করিয়া দেন। বড় দাদা এ সময় পর্য্যন্ত আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। দেখা করিতে গেল উঠিয়া যাইতেন। এই সময়ে বিরাজমোহন প্রকাশিত হয়। উপকারী বন্ধু ৺বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের নামে বিরাজমোহন উৎসর্গ করি। বিরাজমোহন বাহির হইলে কিছু কিছু বিক্রয় হইতে লাগিল। আমার মাথার পীড়া আরোগ্য না হওয়ায় ও পুস্তক কিনিতে না পারায় ফোর্থইয়ার শ্রেণী হইতে কলেজ ছাড়িতে হইল। কিয়দ্দিন পরে দুই শত টাকা জমা হইলে তদ্বারা স্বাবলম্বনের দূত ভট্টাচার্য্যকে একটী মুদি দোকান করিয়া দিলাম। কিন্তু সে দোকান রাজকুমার নামক কোন যুবকের অকৃতকার্য্যতায় উঠিয়া যায়, সব টাকা নষ্ট হয়। তৎপরে আমেরিকা যাওয়া হইল না বলিয়া, কালীপ্রসন্ন দত্ত মহাশয়কে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া, আর একটী মুদী দোকান করিয়া দেওয়া হইল। এতদ্ভিন্ন আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের একটী মুদী দোকান ছিল। এইরূপে স্বাবলম্বনের হাট বসিয়াছিল। দত্ত জলপাইগুড়ী দরিদ্র-স্কুল করিতে চলিয়া যাওয়ায় দোকান উঠিয়া যায়। সেখান হইতে আসার পর দত্ত মহাশয় বেঙ্গল-ব্যাঙ্কিং করপোরেশনে প্রবেশ করেন। আনন্দবাবুর ইংলণ্ডে যাওয়া না হওয়ায় তিনি মনোক্ষুণ্ণ হন। তৎপর ১০৮ নং কলেজ ষ্ট্রীটে ৺ভুবনমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত এক সঙ্গে থাকি। বিরজার উপলক্ষে এই সময়ে সাধু আনন্দমোহন বসু মহাশয় এবং তদীয় পরিবারেরর সহিত বিশেষে হৃদ্যতা হয়। এই পরিবারে সকলেই বিশেষ স্নেহ করিতেন। সুবিখ্যাত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সর্ব্বদা আমাদের বাসায় আসিতেন। তাঁহার বিলাত গমনের পূর্ব্বে আমাদের বাটীতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া উপাসনা ইত্যাদি করা হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

এই বাসায় থাকার সময় মাণিকদহের জমিদার ৺ বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের সহিত আলাপ হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনার ন্যায় সামান্য লোক ভগ্নীকে আনিয়া দেশকে বিষম আন্দোলিত করিয়াছে, ইহাতে বিস্মিত হইয়াছি।" জগৎলক্ষ্মী ও থাকমণি এই বাসা হইতে সর্ব্ব প্রথমে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধাত্রী হন। জগৎলক্ষ্মী মাণিকদহে গেলে বিপিনবাবু ব্রাহ্মসমাজের অনেক কথা শুনিতে পান। মাণিকদহের পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উপবীত পরিত্যাগ করেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি ৺ সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। তৎপর ২৭নং নিমু খানসামার লেনে উঠিয়া যাই। এ বাড়ীর জমীও কলেজভুক্ত হইয়াছে। এই বাসায় ৺ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৺ রাধাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের পরিবার, সপরিবারে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের পরিবারও থাকিতেন। দ্বারকানাথ তখন বিপত্নীক হইয়াছেন, বিধুমুখী ও তাহার ভ্রাতা তখন ছোট। এই সময় হইতে বালবিধবা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই। এই বাসায় শ্রীমতী

পার্ব্বতী দেবী ও হেমাঙ্গিনী দেবীও থাকিতেন, উভয়েই বাল বিধবা। হেমাঙ্গিনীর পরে ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সহিত বিবাহ হয়। এই সময়ে ভারত-সভার পক্ষ হইতে ৺ দ্বারকানাথ এবং ৺ কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জন্য বাঁওয়ালি ও মেহেরপুরের নানাস্থানে জনসাধারণ সভা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এই বাসায় বন্ধুবর নবদ্বীপচন্দ্র দাসের সহিত আলাপ হয় এবং কুঞ্জকে ভৃত্যরূপে পাই। ৺ রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রচারার্থ উত্তরবঙ্গের বগুড়া, জলপাইগুড়ি, মাটীগড়া, খরসিয়ং ও দারজিলিং গমন করি। তখন দারজিলিং পর্য্যন্ত রেল হয় নাই, জলপাইগুড়ি হইতে সিলিগুড়ি পর্য্যন্ত গরুর গাড়ীতে এবং মাটীগড়া হইতে খরসিয়ং পর্য্যন্ত,পাঙ্খাবাড়ী হইয়া, অশ্বে গমন করি এবং খরসিয়ং হইতে দারজিলিং হাঁটিয়া যাই। পথে আমার অশ্ব ব্যাঘ্রের ভয়ে লম্ফ প্রদান করিলে আমি পাহাড়ের গায়ে পড়িয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার কৃপায় রক্ষা পাই। দারজিলিং ভ্রমণের সময় "সন্ন্যাসীর" উপকরণ সংগ্রহ করি। বগুড়ায় ৺ শ্রীমন্তচট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, জলপাইগুড়িতে ৺ জেলানন্দিন মেঞা, ভুবনমোহন কর, শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র ঘোষ ও ৺ চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের সহিত,মাটীগড়ায় ৺রামচরণ পাল, দারজিলিং শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী,৺রাধানাথ বাবু প্রভৃতির সহিত হৃদ্যতা জন্মে। এই প্রচার যাত্রার ইতিহাস নানা আশ্চর্য্য ঘটনায় পূর্ণ। এখানে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করা সম্ভবপর নয়। ইহার পর ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত মিলিয়া রামপুরহাট প্রচারার্থ যাই। সেখানে চেতলার পূর্ব্বপরিচিত গিরিশচন্দ্র সোম, এবং ৺ যদুনাথ রায়, ৺ অনন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতি সজ্জনগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। রামপুরহাটের প্রচারের বিশেষ বিবরণ এখন লিখিত হইল না। কেননা, পুথি বাড়িয়া যায় এখানে একজন সাধু বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি জীবনের অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব-কথা বলিয়াছিলেন। এই সকল সাধু ভক্তের সহিত মিলনে দিন দিন আমার জীবন আশ্চর্য্যরূপে ফুটিতে লাগিল। এই সময়ে আনন্দ-আশ্রমের বাড়ী প্রস্তুত হইতেছিল। ভিত্তিপ্রোথিত করার সময় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোতলের স্মারকলিপি লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমি বিধাতার কৃপার নানা পরিচয় পাইয়া প্রাথনাবাদী হইয়া পড়িলাম। তদ্গতচিত্ত হইয়া প্রার্থনা করিলেই তাহা পূর্ণ হয়, এই বিশ্বাস প্রাণে বদ্ধমূল হইল। পবিত্রতা সাধন করিয়া প্রার্থনাবাদী হইয়া পড়িলাম। যখন ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট ভুবনবাবুর সহিত এক বাসায় ছিলাম, তখন ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা সংস্থাপিত হয়। ১২৮৮ সালে আনন্দ-আশ্রম স্থাপিত হইলে, খোকাকে লইয়া কমলকামিনীর সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ-আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীর সম্মুখে প্রস্তরে অঙ্কিত করিয়া দিলাম, ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্। দুটী প্রাণী প্রার্থনা-সম্বল করিয়া, প্রেম ও কর্ম্মকে হাতে হইয়া, সেবা-ব্রত পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ভেদাভেদ-বোধ দূর করিতে না পারিলে জীবন গঠিত হয়

না, ইহা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। নব পুণ্যবলে উভয়ের প্রাণ ও মন পূর্ণ, কিছুই ভাবনার ছিল না। আনন্দ আশ্রমের জমী লইয়া শুঁড়ীদিগের সহিত ঘোরতর বিবাদ বাঁধিয়াছিল। কিন্তু বিধাতার কৃপায় সেটা কাটিয়া যায়। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং ৺গোবিন্দচরণ রায়চৌধুরী বিশেষ সহায় ছিলেন। এই আনন্দ-আশ্রম হইতে ১২৯০ সালে, বঙ্গদর্শন ও বান্ধব-যুগের শেষাংশে, নব্যভারত প্রকাশিত হয়। তাহার প্রধান সহায় ছিলেন, সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এবং আরো বহু বন্ধু। কিন্তু সে কাহিনী বিবৃত করিবার স্থান ইহা নহে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগাযোগ,আনন্দ-আশ্রমের ও মাণিকদহের ইতিহাস এবং সুহৃদ্‌সভা ও নব্যভারতের বিবরণ এখন বিবৃত করিলাম না। যদি বিধাতা কৃপা করেন, তবে ভবিষ্যতে তাহা বিবৃত করিব। তাহা বড় জটিল ও নানা ঘটনাপূর্ণ। নানাদেশ-ভ্রমণ ইত্যাদি উহার অঙ্গীভূত। উৎকল-ভ্রমণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আসাম-ভ্রমণ ও অন্যান্য দেশ-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আমি যে সকল বিবৃত করিবার অধিকার পাইব কিনা, জানি না, তাহা বিধাতাই জানেন।

দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ জীবন-সংগ্রামে কমলকামিনী যখন সহায় হইলেন, তখনকার সব কথা প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইবে। শরচ্চন্দ্র, বিরাজমোহন ও সন্ন্যাসী পুস্তকে নাম প্রকাশ করিয়াছিলাম না, শেষে অসদ্ভাব নিবারণের জন্য, অন্যান্য পুস্তকে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হই। তিন খানি পুস্তক প্রকাশের পর হইতে চতুর্দ্দিক হইতে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতে লাগিল;—চতুর্দ্দিক হইতে টাকা আসিতে লাগিল, বহু বন্ধু সহায় হইতে লাগিলেন। বিধাতা যেন ইটের উপর ইট গ্রথিত করিয়া আনন্দ-আশ্রম ১২৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এইরূপে আমার ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। এখানে কত নরনারী আশ্রয় পাইয়াছেন, বিধাতাই তাহা জানেন। আমি তাঁহার দান যাহা পাইয়াছি, অম্লান চিত্তে তাহা বিলাইয়া দিয়াছি। টাকা রাখিলে অনেক টাকা থাকিত, কিন্তু কিছুই রাখি নাই। যখন যাহা পাই, বিলাইয়া দেই বাড়ী ঘর যাহা হইয়াছে, তাহার আয়ও বিলাইয়া দিয়া থাকি। টাকার অভাবে অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারেন না বলিয়া যখন যিনি টাকা চাহিয়াছেন, দিয়াছি; কিন্তু সব টাকা পুনঃ পাই নাই, প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা এইরূপে গিয়াছে। দাতব্য ঔষধালয়ের জন্য এপর্য্যন্ত প্রায় ২৫০০০্ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ছেলে মেয়ের শিক্ষা ও সুহৃদ্ সভা ও নব্যভারত পরিচালনে ও দুর্ভিক্ষের সাহায্য-কল্পে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র ব্যয় হইয়াছে। আর যে সব ছেলে মেয়েকে এখানে আনিয়া বিধাতা মানুষ করিয়াছেন, তাহাদের পরিচর্য্যায় যে কত ব্যয় হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। সে সব কাহিনী জগতে অপ্রকাশিত থাকিবার যোগ্য এবং তাহা অপ্রকাশিতই থাকিবে। আমি যে পবিত্রতা অর্জ্জনে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজীবন তাহাই করিয়া আসিয়াছি। দারিদ্র্যের সেবা আমার চির-ব্রত, তাহা আজীবন প্রতিপালন করিয়াছি, অন্যকে দিবার সময় কখনও কৃপণতা করি নাই। সাধু বিজয়কৃষ্ণ, রামকুমার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, প্রতাপচন্দ্র, রামতনু, গৌরগোবিন্দ, রাজ-

নারায়ণ, শিবনারায়ণ স্বামী, উমেশচন্দ্র, দুর্গামোহন, আনন্দমোহন, জগদীশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি কত সাধু ভক্তের চরণধূলি মাথায় পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। কত সময় নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিয়াছি, তাঁহারা এত স্নেহ করেন কেন? নির্গুণের মধ্যে কি গুণ তাঁহারা দেখিলেন? তাঁহারা অযাচিত ভাবে সহায় না হইলে, জীবনের ব্রত কখনও পালন করিতে পারিতাম না। তদুপরি কমলকামিনীর দয়া না পাইলে আমি রিপুজয়ে পরাস্ত হইতাম। সর্ব্বোপরি বিধাতার কৃপা আমাকে আচ্ছাদিত করিয়া চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আমি ভাল খাই না, ভাল পরি না, আমি কৃপণ, আমার এ নিন্দা খুব আছে! চতুর্দ্দিকের সকলের অভাব যখন স্মরণ করি, তখন ভাল খাইতে পরিতে ইচ্ছা হয় না। বেশ ভূষায় সকলের শ্রেষ্ঠ হইতে কখনও চেষ্টা করি নাই। তাহা করিলে দরিদ্র ব্যক্তিগণ আমাদিগকে আপনার জন বলিয়া মনে করিবে কেন? দুর্ভিক্ষের সেবায় কত সময় যে অনাহারে ও ভিখারীর ন্যায় কাটাইয়াছি, কেহ তাহা জানে না। আমার সুখই "পবিত্রতায়", শান্তিই "অর্পণে", এবং আমার আনন্দই "সেবায়"। আমি আর কিছু জানি না, আর কিছু বুঝি না। বিধাতার নিকট চিরকাল আমার এই প্রার্থনা, আমি যেন পবিত্র থাকিতে পারি, আমি যেন কিছুই নিজের জন্য না রাখি। তাঁহার প্রদত্ত সর্ব্বস্ব তাঁহার জগতের জন্য অর্পণ করিয়া, গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার সার্থকতা যেন আমি সাধন করিতে পারি।

স্কুল কলেজে পড়ার সময় আমি লোকের "চেহারা" দেখিয়াই "স্বভাব" বলিতে পারিতাম। লোকেরা বিরক্ত হইত বলিয়া শেষে আর তাহার অনুশীলন করি নাই। মুঙ্গের থাকার সময় প্রেত-বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছিলাম, শেষে তাহাও আর করি নাই।

আজ ৬ই মাঘ, আনন্দ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠার মহোৎসবের দিন—কত সাধু ভক্তের চরণ-রেণুতে এই বাড়া পবিত্র হইয়াছে;—বিধাতার আশীর্ব্বাদ অজস্রধারে আজ বর্ষিত হউক। আমি বৈরাগ্যে জীবন আরম্ভ করিয়া পবিত্রতা অর্জ্জন করিতে করিতে এখন বিলয়ের সোপানে আরোহণ করিতেছি। এই বংশের সকলে কমলকামিনীর ন্যায় লোকসেবায় রত থাকুন, এবং পবিত্রতার বিজয় নিশান গগনে তুলিয়া নির্ভয়ে গাইতে থাকুন, জয় মা আনন্দময়ীর জয়। অপবিত্রতার প্রতি চির-ঘৃণা আনন্দ-আশ্রমের সকল নরনারীর যেন জীবন-সম্বল হয়। মা জগজ্জননী এই আশীর্ব্বাদ করুন।

জাপানী জাতির বিশেষত্ব।

প্রাচ্য জাপান, সভ্যতার বহু উপাদান পাশ্চাত্য জগতের নিকট গ্রহণ করিলেও, ইহার জাতীয় জীবনের বিশিষ্টতা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করে নাই। আমরা যেমন পাশ্চাত্য স্রোতে ভাসমান্ হইয়া আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলি, দূরদর্শী চতুর জাপানীরা তেমন নহে; তাহারা হংসের ন্যায় জগৎ মথিত করিয়া সার গ্রহণ করিতে পটু, আমাদিগের ন্যায় বিজাতীয় সভ্যতার চরণে ষোল আনা বিক্রয় করিয়া ময়ুর সাজে না, জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিতে ভালবাসে।

আমরা পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতার খাতার দুই চারি পাতা উল্টাইয়াই স্থির

সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, তথা-কথিত ব্যক্তিত্বের (স্বার্থপরতার?) সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশই জাতীয় সভ্যতার চরম পরিণতি, কিন্তু জাপান ইউরোপের এই মীমাংসার পোষকতা ও অনুসরণ করিতে একান্ত নারাজ। উদীয়মান্ জাপান, ইউরোপের বিকৃত আদর্শ ব্যক্তিত্বের বিরোধী—সমষ্টিই জাপানের প্রাণ। এইখানেই জাপানের যাহা কিছু প্রতিষ্ঠা এবং ভাবুকতা! জাপানীরা আমাদিগের ন্যায় বাচাল, কথা-প্রিয় জাতি নহে, জাপানীরা প্রাচ্যভূমির অনন্যকর্ম্মা স্থিরবুদ্ধ নীরব সাধক! তাহারা ইউরোপকে যে ভাবে বুঝিয়াছে, আমরা তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারি নাই। আমাদের জাগিতে উঠিতে, সমকক্ষ হইতে অনেক বাকী। নানারূপ কল্পনার দিকে আমাদিগের লক্ষ্য আছে, প্রকৃত সাধনার ভূমিতে এখনও আমরা আসন গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাই আমাদের সকল সঙ্কল্প বিফল হইয়া যায়, সকল উচ্ছ্বাস তুষের আগুনের মত ক্ষণকাল মধ্যেই নিবিয়া যায়। জাপানের নিকট যদি কিছু আমাদের শিখিবার থাকে, তবে তাহা, তাহার নীরব সাধনা ও সমষ্টিগত প্রাণ!

আমরা দেখিতে পাইতেছি, যেখানে পাশ্চাত্য জগতের বিকৃত ব্যক্তিত্ব (individualism) প্রবেশ করিয়াছে, সেখানেই সর্ব্বনাশের বীজরোপিত হইয়াছে, সেখানেই উচ্ছৃঙ্খলতা পারিবারিক বা সামাজিক জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ইউরোপ যে আজ ছিন্নমস্তা হইয়া আপনার রুধির পানে আপনি ব্যস্ত, তাহার কারণ ওই স্বার্থমূলক ব্যক্তিত্বের একদেশদর্শিতা। বুদ্ধিমান্ জাপান এই মরণের পথ অবলম্বন করে নাই, তাহার প্রাচ্যগত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ধারা জাতীয় জীবনের প্রাণস্বরূপ সমষ্টি-বুদ্ধিতেই রক্ষা করিয়া নিজ উন্নতির পথে ছুটিয়াছে।

এই ব্যভিচার-দূষিত ব্যক্তিত্বের মোহিনী-মায়া যখন জাপানকে আসিয়া প্রথম স্পর্শ করিল ও জাপানের নারী-জীবনকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, তখন বিচক্ষণ-বুদ্ধি কাউণ্ট ওকুমা (Count Okuma) টোকিও স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবেশন-প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন "Nothing is so injurious to the proper regulation of a woman's life as the notion that she should have an ideal of her own to pursue. You should not accept the western view in this matter as the rule of your life. In the west the husband and wife are the social unit; in Japan father and son constitute the family unit, and the family is the unit of society. It is an idle fancy to imagine that a marriage constitutes a family. Under the prevailing custom in Japan this is impossible and the decrees of that custom, whether bad or good, are to be accepted, especially by our woman. A woman should not in marriage pursue any ideal contrary to the will of her parents & of the parents of her husband".

জাপানী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতালাভ ত দূরের কথা, জাপানী পুরুষগণও জাপানী রাজ-সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোনরূপ পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তা অবলম্বন করিতে পারে না। জাতির কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের সম্মুখে ব্যক্তিগত সুখপরায়ণতা জাপানে

কখনই স্থান পাইতে পারে না। জাপানের সব কার্য্যেই রাজ-সরকারকে দরখাস্ত করিতে হয়, রাজসরকারই রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার সুখ, দুঃখ ও অভাব অভিযোগেয় তদন্ত করিয়া থাকেন। যাহা কিছু করিতে হইবে, রাজ-সরকারকে জানাইয়া করিতে হইবে। রাজ্যের যাহা কিছু সবই সরকার দ্বারা পরিচালিত। রাজসরকারই রেলওয়ের পরিচালক; বাণিজ্য-তরী, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রাজ-সরকারের হস্তে পরিচালিত; এমন কি, সরকারী সাহায্যে, তামাক ও লবণের ব্যবসা পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়া থাকে। পাপের দ্বার রাজা রুদ্ধ করেন, ধর্ম্মের পথ রাজা উন্মুক্ত করিয়া দেন। সরকারী খরচে শিক্ষার্থীগণ জগতের নানা-স্থানে প্রেরিত হন, শিক্ষান্তে আবার তাহাদিগকে বিভিন্ন রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। রাজ-সাহায্যেই নব নব শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বার প্রশস্ত করা হয় এবং জগতের বিভিন্ন কেন্দ্রে জাপানীদের ব্যবসায়ের পথ সুগম করিয়া দেওয়া হয়। উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন সমবায়-সমিতির নিকট আবেদন করে, সমবায়-সমিতির স্থানীয় প্রতিনিধিগণকে জ্ঞাপন করে, প্রতিনিধিবর্গ ব্যক্তি বিশেষের জন্য রাজ-সাহায্য প্রার্থনা করে। তথাকার বিদেশীয় অধিবাসীগণ বলেন যে, টোকিওতে ক্যাবিনেটের অনুমতি ব্যতীত, এমন কি, একটা রাস্তার পতিত সামগ্রীও স্থানান্তরিত করা হয় না। সবাই উপর হইতে অনুমতির অপেক্ষা করে, জাপানে ব্যক্তিত্বের দাবী বলিয়া কিছুই নাই। রাজার প্রতি একটা ভক্তি, রাজ্যের প্রতি একটা আস্থা, জাপানে যত পরিলক্ষিত হয়, এমন আর কোন দেশে নহে। জাপানে পারিবারিক বন্ধন এমনি সুদৃঢ় এবং সংমিবদ্ধ যে, ব্যক্তিত্বের কোন খামখেয়ালী সেখানে গ্রাহ্য হয় না। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও সংরক্ষণ-নীতি অনেক উদার-হৃদয় পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন সাম্যবাদী জাপানীগণের মনকেও অবিচলিত করিয়া রাখিয়াছে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটা দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান তেমন পরিপুষ্টিলাভ করিতে পারে না, আত্মসুখ-পরায়ণতায় সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির যোগ কমিয়া যায়। তজ্জন্যই দেখা যায়, যাহারা ব্যক্তিত্বপ্রিয় জাতি, তাহাদের অপেক্ষা জাপানীদিগের ন্যায় সমষ্টিপ্রিয় জাতি সমূহ নেতৃত্বাধীনে অধিকতর তৎপরতা ও পূর্ণতাসহকারে জাতীয় কল্যাণোদ্দেশ্যে অনেক মহৎ ও দুঃসাহসিকতার কাজ করিতে পারে। সমষ্টিপ্রিয় জাতিসমূহ তাহাদিগের স্ব স্ব বিশিষ্ট নেতার কর্তৃত্বাধীনে চালিত হইতে চাহে এবং সেই নেতাকেই তাহারা অভিভাবক, পিতা, এমন কি, ঈশ্বর বলিয়া সম্মান করে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি সকল কাহারও নেতৃত্বের নিম্নে পরিচালিত হইতে চাহে না, সমাজ-ছাড়া হইয়া ব্যক্তিগত জীবন অতিবাহিত করিতে ভালবাসে,—তাহা বর্ত্তমান ব্যক্তিত্বের যথেচ্ছাচারিতার পক্ষে আপাত-মনোরম হইলেও, একটা জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে কখনই ভাল নহে। ব্যক্তিত্ববাদের পক্ষপাতিতায় জাতীয় শিথিলতা আনয়ন করে, সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এবং দূর ভবিষ্যতে জাতীয় ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। মানব সভ্যতার আদিম যুগ হইতেই দলবদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছে, ব্যক্তিত্ব আধুনিক সভ্যতার পরিচায়ক হইলেও, মানব তাহার কাঁধ মিলাইবার এই স্বাভাবিক গতিকে

কখনও অসভ্যতার দোহাই দিয়া প্রচার করিতে পারে না। এই চিরস্বাভাবিক দলবদ্ধতাকে গ্রহণ না করিলে, ব্যক্তিগত জীবনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জাপান এই রহস্যটী বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে বলিয়াই ব্যক্তিত্বের ভূমিতে, ইউরোপের সঙ্গে তাহার কোন রূপ যোগ নাই। তাই জাপানকে কেহ কেহ "a family-nation" বলিয়া থাকেন। জাপানে পারিবারিক জীবনই জাতীয় জীবনের ভিত্তি এবং পিতা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়াই পারিবারিক সংগঠন, স্বামী ও স্ত্রী লইয়া নহে। জ্যেষ্ঠ পুত্র কোন বিশেষ জীবনযাত্রার উপায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত নহে, কিসে সে তাহার পারিবারিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে, ইহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য কনিষ্ঠ পুত্রগণ, নির্ব্বিবাদে পিতার জ্যেষ্ঠপুত্রের অনুশাসনে থাকিতেই সুখী। কন্যাগণ, বর্ত্তমান জাপানী সভ্যতার উদারতাবশত অনেক স্বাধীনতা ও সুবিধালাভ করিয়াও, পিতা ভ্রাতা ও স্বামীর নিকট সতত সন্নত থাকিতে বাধ্য। সর্ব্ব বিষয়ে এইরূপ বাধ্যবাধকতার ভিতরে থাকিয়াও জাপানী জীবন আজ সমধিক সমুন্নত। ইহার নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে ভোগধর্ম্মা আত্মসুখপরায়ণ একদেশ-দর্শী ইউরোপীয় সভ্যতার এখনও অনেক বাকী।

জাপানে দুইটী শক্তি অপ্রতিহত ভাবে এই ব্যক্তিত্বের প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে একটী প্রবল রাজশক্তি, অপরটী বহুদিন-প্রচলিত মজ্জাগত পারিবারিক শক্তি

রাজশক্তি ব্যক্তিত্ববাদীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—তুমি একা কোন কার্য্য করিতে যাইও না, এস, আমি তোমাকে সাহায্য করিব; আমার সহায়তায় তুমি অতি শীঘ্র ও অনায়াসে তোমার অভিলষিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবে—এস, আমার সহিত যোগদান করিয়া কর্ম্মে লিপ্ত হও। অপর দিক হইতে পারিবারিক প্রথা তাহার ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাতন্ত্র্যকে লোপ করিয়া সমষ্টির দিকে বশীভূত করাইতেছে। রাজশক্তি ব্যক্তিগত কল্যাণে এইরূপ সহায়তা প্রদান না করিলে, জাপান আজ কি এতাদৃশ দ্রুতগতিতে পৃথিবীর মধ্যে একটী মহাশক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত?

জাপানীগণের আর একটী বিশেষত্ব হইতেছে, অনাড়ম্বরপ্রিয়তা। বহুদিন হইতে পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়াও তাহারা পাশ্চাত্য জাতির অনুরূপ বিলাসী হইয়া পড়ে নাই। এই অনাড়ম্বরপ্রিয়তা জাপ-জাতির বহুকালের সম্পত্তি ও সংস্কার। জাপানী উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের জীবন আলোচনা করিলে আমরা ইহার সত্যাসত্যতা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারি। মার্কুয়িস ইটো (Marquis Ito) সকল জাগতিক সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিয়া যখন উচ্চ রাজপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন আবার তিনি তাহার অনাড়ম্বর সামান্য জাপানী-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা মানহানি বোধ করিলেন না।

“The future of Japan”গ্রন্থের লেখক W. Petric Watson এক স্থলে জাপজাতির এই অনাড়ম্বর-ভাবকে লক্ষ্য করিয়া কোন জাপানীর সম্বন্ধে লিখিতেছেন--‘A Japanese after years in Europe, sits rather uncomfortably on our padded chairs. He has the higher authority of nature for sitting on his heels”.

ভাই বাবু-বাঙ্গালি, এই কথাটীকে একবার ভাবিয়া দেখিবে কি? জাপানীগণের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার তোমার সাহস আছে কি? গামছা গাড়ু লইয়াই তোমার বাঙ্গালীত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আজ তুমি সে বাঙ্গালী নও, তুমি বাবু!

জাপানীদিগের ন্যায় অল্পে সন্তুষ্ট অথচ পরিচ্ছন্ন স্বভাবপ্রিয় জাতি জগতে খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। অল্প পরিবারের ভিতর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও সরলতার সৃষ্টি জাপান-জাতি যেমন করিতে পারে, এমন আর কেহই নহে। জাপানী-বালার বিশেষত্ব হইতেছে, ক্ষুদ্রের ভিতর সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতাকে ফুটাইয়া তোলা, একটী ফুলের ভিতর কাননভরা কুসুম-পুষ্পের মাধুর্য্য নিরীক্ষণ, একটী বৃক্ষের মধ্যে গহন অরণ্যের গাম্ভীর্য্য দর্শন। জাপানীরা পাশ্চাত্য জাতির অপেক্ষা দরিদ্র হইলেও, ভাব ও ছবি ফুটাইবার সম্পদ তাহাদের হৃদয়ে এবং তুলিকায় যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান জাপান পাশ্চাত্য কুটিলতার মধ্যে পড়িয়াও তাহার জীবনের স্বাভাবিকতা ও সরলতা হারায় নাই। জাপান প্রাচ্যের আনন্দ-নিকেতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জাপানীরা হাসিতে হাসিতে মরিতে পারে। আনন্দ, হাস্য এবং আশা তাহাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চির-সহচর। তাহারা অতি যন্ত্রণাদায়ক পীড়া বা দুঃখকেও হাসিমুখে বরণ করে। কোন বিষয়েই তাহারা নিরাশ হয় না। ভিতরে যত কষ্টই হউক না কেন, যত নিরাশার তীব্রতা লুকাইয়া থাকুক না কেন, জাপানীর মুখে কিন্তু আনন্দ ও উৎফুল্লতার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। তাহারা দুঃখকে অনুভব করিয়াও গ্রাহ্য করিতে চাহে না। দুঃখ, শোক ও রোগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই জাপানী জীবনের স্বভাব। জাপানে ক্রন্দনপরায়ণ শিশু, যন্ত্রণা-কাতর রোগী ও অসন্তুষ্ট বৃদ্ধ প্রায়ই নয়ন-গোচর হয় না। শিশুদিগের রম্য স্থান স্বর্গ বলিয়া জাপান চিরকাল গৌরবান্বিত হইয়া আছে। এমন সন্তোষের রাজ্য পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না, বলা যায় না। আইনের দ্বারা জাপানী স্ত্রীলোকদিগকে নিরানন্দ থাকিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যে জাতির ভিতর স্ত্রীলোক কোন্দল ও ক্রন্দনপরায়ণা, লক্ষ্মী যে সে জাতিকে ছাড়িয়া প্রস্থান করে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? আমাদের দেশ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু জাপানে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত. তথায় নারী জাতি সতত আনন্দময়ী, অথচ গুরুজনের প্রতি চির ভক্তিময়ী! বাধ্যতা এবং মুক্ততা যেন একই ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে! জাপানী পুরুদের সম্বন্ধেও ওই কথা ওই প্রতি পদে পদে বাধ্যতা, ওই প্রতি পদে পদে আবার মুক্ততা। মানব-জীবনের মনোগত স্বভাবই এই, সমষ্টির জন্য মানব বাধ্য, আপনার জন্য মানব মুক্ত। জাপানীরা বলে, "If our worries do not allow of our wearing a constant smile we shall not wear our worries where our smile should be." অবসাদকে তাহারা এমনি ভয় করে। উৎসব এবং আনন্দের মধ্যেই তাহারা সতত বিচরণ করিতে ভালবাসে। জাপানীরা জীবনকে দুর্ব্বহ ও পৃথিবীকে নীরস বলিয়া চিন্তা করে না। "শিগা টাকা নাই" (shigatakanai) অর্থাৎ 'হবে কি?'—ইহাই জাপানীর সদা সর্ব্বদা আশার কথা। প্রত্যেক জাপানীর মুখ হইতে 'শিগা টাকা নাই' দিনের মধ্যে বারম্বার উচ্চারিত

হইয়া থাকে। প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক আরম্ভে, প্রত্যেক চেষ্টায় এই 'শিগাটাকানাই' কথাটী শ্রুত হইতে দেখা যায়। নিমন্ত্রণ পত্রের নিম্নেও বন্ধুবান্ধবকে প্রত্যেক জাপানী 'শিগাটাকানাই' লিখিয়া থাকে।

জাপানকে যাঁহারা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। অনেক বিষয়ে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাপান পাশ্চাত্য উৎকর্ষগুলি অনেক অনুসন্ধানের পর গ্রহণ করে বটে, কিন্তু মূলে তাহারা আপন বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলে। জাপানের সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভেদ এই যে, জাপান সকলকে সাদরে গ্রহণ করে কিন্তু একদেশদর্শী পাশ্চাত্য জাতি নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য অপরকে ঠাঁই দিতে কখনই প্রস্তুত নহে। ফিলিপাইনের ব্যাপার এবং ব্যবহার হয়ত পাঠকের স্মরণ আছে। উদার-হৃদয় সাম্যভাবাপন্ন আমেরিকাও একদেশ-দর্শিতা হইতে আপনাকে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারে নাই। তাই একজন জাপ-চরিত্র-অনুসন্ধিৎসু তুলনায় সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন :—We (Europeans) place it (the fulcrum of life) in the conscience of the individual. Japan goes farther back and deeper down, or she is perhaps universal where we are particular. She almost allows being; we insist upon our personality."—The Japanese Atmosphere. প্রাচ্য জাপান পাশ্চাত্য সংসর্গে পড়িয়াও আজিও ব্যক্তিত্বকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলে নাই।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস

বঙ্কিম বাবুদের কথা।

বঙ্কিম বাবুর কথা অনেকেই লিখিয়াছেন। বহু মাসিক পত্রেই তাঁহার সম্বন্ধীয় নানাতত্ত্ব বাহির হইয়াছে। অবশ্য কেহ সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশাইতেছেন, কেহ বা স্বকপোল-কল্পিত কথা দিয়াও মাসিকের স্থান পূর্ণ করিতেছেন। কেহ বা ঐ সঙ্গে সঙ্গে আপনার পরিচয়টুকু গাঁথিয়া প্রচ্ছন্ন অহমিকা ফুটাইতেছেন। এক্ষণে দেখিতেছি, অনেকেই বঙ্কিম বাবুর স্নেহপাত্র সাজিতেছেন। আমি গ্রামের একজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার মুখে বঙ্কিম বাবুদের সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিয়াছি, বঙ্কিম বাবুর পার্শ্বচর বঙ্গদর্শনের পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রমুখাৎ যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাই আজ পাঠকগণ সমীপে উপস্থাপিত করিতেছি। সৌভাগ্য বশতই যখন বঙ্কিম বাবুর জন্মভূমিতেই আমার জন্ম; তখন তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার বোধ হয় আমার আছে। আমি ঠিক বঙ্কিম বাবুর কথাই যে বলিব, তাহা নহে। আমি বলিব, বঙ্কিমবাবুদের কথা। আর দুই একটী মত সমালোচনা করিব।

সাহিত্য-সম্রাটের সহানুভূতি ও স্নেহ লাভের কাহিনী আমার নিকট কেহ পাইবেন না। কারণ সাহিত্য-সম্রাট যখন কাঁটালপাড়াতে স্বর্ণ-সিংহাসনে সমাসীন, অগণ্য সাহিত্যিক অমাত্যকুল যখন তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বিরাজিত, তখন এই হতভাগ্যের জন্মই হয় নাই। সাহিত্য-গগনের পূর্ণচন্দ্র যখন অস্তাচলে ঢলিয়া পড়েন, তখন লেখকের অতি শৈশব অবস্থা। আমি যাহা লিখিব—সমস্তই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার মুখের শোনা

কথা। এই শোনা কথাই আমাকে এই কার্য্যে উৎসাহ দিয়াছে। আশা করি, আজ প্রাংশুলভ্য ফলের আশায় বামনকে প্রসারিত-হস্ত দেখিয়া কেহ হাসিবেন না। যাঁহাদের হস্তের উজ্জ্বল আলোক-বর্ত্তিকা সাহায্যে আঁধারময় পথ চিনিয়া যাইব, তাঁহাদের পরিচয় দিবার অধিকার আমার নাই; কারণ ঐ পরিচয় দানে তাঁহাদের আপত্তি আছে।

এই বঙ্কিম বাবুদের কথায় যদি কোথায় তাঁহাদের সামাজিক পরাজয়, বাস্তবজীবনের ত্রুটি প্রদর্শিত হয়, আশা করি, তজ্জন্য ক্ষমার্হ হইব। সত্য কথা বলিবার নৈতিক সাহস থাকা প্রত্যেকের উচিত—অতএব আমার ভীত বা কুণ্ঠিত হইবার কোন হেতু নাই। নিরপেক্ষ নির্ভীক সম্পাদকও বোধ হয় ইহার প্রকাশে কুণ্ঠিত বা ভীত হইবেন না।

আকাশের চাঁদ দূর হইতে যত সুন্দর, যত মনোহর, চন্দ্রমণ্ডলস্থিত জীব তত সুন্দর, তত মনোহর রূপে প্রতিভাত হয় না। ভাবজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র দেবতা ও মহাপুরুষ, কবি জীবনে দ্রষ্টা, সরস্বতীর বরপুত্র। তাঁহার কবিত্ব, গভীর পাণ্ডিত্য, দেশহিতৈষণা, সূক্ষ্মদর্শন তাঁহাকে অশরীরী দেবতারূপে দাঁড় করাইতে পারে; কিন্তু বাস্তব জীবনে তিনি পৃথিবীর মানুষ। পৃথিবীর পঙ্কিলতা হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিতে প্রত্যক্ষদর্শী পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য পর্ব্বত-চূড়ার মত উচ্চ, ব্যক্তিত্ব মহাসাগরের মতই অতলস্পর্শ, বিশেষত্ব স্বর্গের মত স্বগৌরবোন্নত। তবে ঐ স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব বিনয়ে নম্র, স্নেহে স্নিগ্ধ, ব্যবহারে কোমল হইলে যেমন মানায়, অভিমানে পূর্ণ, উপেক্ষায় তীব্র হইলে ততদূর মানায় না। জননী জন্মভূমির দুঃখে যাঁর নেত্রে অশ্রু ছুটে, প্রাণ কাঁদে, গর্ভধারিণীর প্রতি তাঁর যেমন কঠোরতা শোভা পায় না; তদ্রূপ, দেশবাসীকে যিনি শ্রদ্ধা ভক্তির স্নেহ প্রীতির কোমল বন্ধনে বাঁধিয়াছেন, নিজের গ্রামের প্রতি ভালবাসার অভাব, গ্রামবাসীর প্রতি উপেক্ষা তাঁর সেরূপ সাজে না।

বাস্তব জীবনে দুই চারিজন সাহিত্যিক বন্ধু ব্যতীত তিনি কাহারও সহিত বড় মিশিতেন না, অনুরাগের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন না, সাধারণের সহিত হাস্যপূর্ণ সরল কথোপকথন করিতে ভালবাসিতেন না। তাঁহার সম্পর্কে যাঁহারা আসিতেন, দুই চারি জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত সকলে আলাপে চরিতার্থ, সদ্ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতেন না; তবে তাঁহারা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করিতেন। বঙ্কিম বাবু দুই একটী কথা কহিলেই লোকে সন্তুষ্ট হইয়া যাইত, আপনাকে কৃতার্থম্মন্য ভাবিত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের আসনে সমাসীন থাকিয়া সাধারণের সহিত এক প্রকার না মিশিয়া যে ভাবে মানব-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার দৃষ্টি অন্তর্ভেদিনী ছিল। যাঁহাকে একবার দেখিতেন, তাঁহার অন্তরের তলদেশ পর্য্যন্ত সমস্তই বুঝিয়া লইতেন। সাধারণ ভাবে না মিশিয়াও তিনি তাঁহাদের গতি, ভাব ভঙ্গী যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেন, ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে পরিচিত ও পরিচিতা বহু ব্যক্তির চরিত-ছায়াপাত অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন আত্মীয়া ও

দাসীর ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তা এমনভাবেই ফুটাইতেন যে, তাহারা তাহা লইয়া অনেক সময়ে রাগারাগি করিত, কেহ কেহ মনে মনে বড় খুসীও হইত। পূজনীয়া বৃদ্ধা আত্মীয়া হইলে বঙ্কিম বাবুকে দুকথা শুনাইয়া দিয়া যাইত, মুখরা হইলে গালি দিতেও ছাড়িত না।

ভাবজীবনে, কবিজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বত্রই জয়ী, কিন্তু সাংসারিক ও সামাজিকজীবনে সর্ব্বস্থলে জয়ী হইতে পারেন নাই। পারিবারিক জয় পরাজয় দেখান নিয়মবিরুদ্ধ, তবে সামাজিক জয় পরাজয় দেখান বোধ হয় দোষের হইবে না।

বঙ্কিম বাবুদের বাটীতে রথ, দোল, দুর্গোৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। গ্রামের ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলেরই পরিতোষপূর্ব্বক ভোজনের ব্যবস্থা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়া গ্রামটী আয়তনে অতি ক্ষুদ্র। গ্রামে বৈদিকশ্রেণী ও রাঢ়ীয় শ্রেণী, সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস হইবে। সামাজিকতা রক্ষার ভার জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ বাবু ও মধ্যম সঞ্জীব বাবুরই উপর ছিল। বঙ্কিমবাবু বড় ইহার ধার ধারিতেন না। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের আদর আপ্যায়ন প্রভৃতি শ্যামাচরণ ও সঞ্জীব বাবুই করিতেন। বঙ্কিমবাবু নিমন্ত্রিতগণের খোঁজ খবর লইতেন না। তবে ভোজন সময়ে একবার আসিয়া দাঁড়াইতেন মাত্র; তাহাতেই সকলেই মহা-আপ্যায়িত হইতেন। বঙ্কিমবাবুর সামাজিকতার ত্রুটি লোকে বড় করিয়া দেখিত না। কারণ বাড়ীর কর্ত্তা শ্যামাচরণ বাবু ও সঞ্জীব বাবু সামাজিকতায় যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্কিমবাবুকে সকলেই সেজবাবু বলিয়া ডাকিত। তিনি ছিলেন বাড়ীর যুবরাজ। মধ্য বয়সে বঙ্কিম বাবুর বড়ই রমণি-মনোমোহনমূর্ত্তি ছিল, চুলের বাগার দেখিবার সামগ্রী ছিল।

বঙ্কিমবাবুদের বাড়ীতে সর্ব্বদা কয়েকজন ব্যক্তি সঞ্জীববাবুর সহিত খেলা করিতেন। সঞ্জীব বড়ই খেলা ভালবাসিতেন। আমোদ আহ্লাদ তামাসা রসিকতা খুবই হইত। বঙ্কিমবাবু সে দলে বড় মিশিতেন না; তবে কদাচিৎ তাঁহাকে ঘটনাসূত্রে বৈঠকখানায় আসিতে হইত। বলা বাহুল্য, দাদার ইয়ার দল বঙ্কিমবাবুকে পাইলে রসিকতা করিতে ছাড়িতেন না। বঙ্কিমবাবু তখন আপনার অসামান্য ব্যক্তিত্ব লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতেন। কার্য্যের ছল করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিতেন। ঐ সমস্ত ইয়ারদল অবশ্য কেহই বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না। বিশিষ্ট ব্যক্তি কি কখন বড় লোকের বাড়ীতে সর্ব্বদা পড়িয়া থাকে?

গ্রামে বঙ্কিমবাবুদের সামাজিক প্রতিপত্তি ভালই ছিল, তবে একচ্ছত্র ছিল না। ভুলুবাবু, তারণ ঠাকুর, চন্দ্রবাবু প্রভৃতি সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত ইঁহাদের বনিবনা ছিল না। দলাদলি অনেক সময়ে বিবাদে পরিণত হইত। তবে সে দলাদলির ভিতর একটী সতেজ জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। তখন ক্ষুদ্র গ্রামে খুব জমজমাট ছিল।

পশ্চিমবাঙ্গালার অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণ পাশ্চাত্যশ্রেণীর বশিষ্ঠবংশীয় ঠাকুরমহাশয়গণের শিষ্য। এইজন্য সামাজিকতায় ঐ বংশীয়ের সম্মান অত্যন্ত অধিক ছিল, এক্ষণেও নাই, তাহা নহে। শিষ্যগণই সামাজিক শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিল। ঠাকুরদের কুটুম্বগণও সেই সম্মানের অনধিকারী ছিলেন না। এ

স্থানের সামাজিক নিয়ম এই যে, রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বৈদিক শ্রেণীর বাটীতে লুচি খাইতেন, কিন্তু বৈদিকশ্রেণীর লোকেরা স্বপাকব্যতীত তাঁহাদের প্রস্তুত লুচি খাইতেন না। সাধারণতঃ ছানা চিনি সন্দেশই খাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। বঙ্কিমবাবুরা এই সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন। বঙ্কিমবাবুরা এই বংশের শিষ্য নহেন; কাজেই এই বৈদিকশ্রেণীর সামাজিক প্রতিপত্তি তাঁহাদের সহ্য হইল না। বঙ্কিমবাবুর ব্যক্তিত্বে বিশেষ করিয়া বা পড়িল। বঙ্কিমবাবু জলদ্‌গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিলেন যে, "বৈদিকশ্রেণীরা যদি আমাদের বাটীতে আমাদের প্রস্তুত লুচি তরকারী না খান, তবে আমরাও তাহাদের বাটীতে খাইব না।" বঙ্কিমবাবুর আহ্বান দেশ শুনিয়াছে, কিন্তু সামাজিক নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া এই কথাটী বড় কেহ শুনিল না। গ্রামের অধিকাংশ রাঢ়ীয়শ্রেণী "তারণ ঠাকুরের" শিষ্য। শিষ্যগণ গুরুর পক্ষ লইলেন। বঙ্কিমবাবু ৫।৭ ঘর লইয়া একটী দুর্ব্বল দল বাঁধিলেন। শক্তিসম্পন্ন সম্মানিত বড় কেহ তাঁহাদের দলে রহিল না।

একদিন শ্যামাচরণবাবুর বাড়ীতে গ্রামের বৈদিকশ্রেণীর কয়েকজন জলযোগ করিতেছেন, এমন সময়ে বঙ্কিমবাবু উপরোক্ত প্রস্তাব করিলেন। তারণ-ঠাকুর-প্রমুখ বৈদিকশ্রেণীর লোকেরা দৃঢ় আপত্তি জানাইলেন, এবং আহার না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে বঙ্কিমবাবুরা সে কোট ছাড়িয়া দিলেন। সামাজিক প্রথা অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গেল।

বঙ্কিমবাবুর পিতা রায়বাহাদুরের আমলে এই কাঁটালপাড়ার মত ক্ষুদ্র গ্রামে তিনটী প্রবল দল ছিল। একটী রায়বাহাদুরের, একটী ভবানীঠাকুরের, আর একটী তারণ ঠাকুরের দল। দুর্গাপ্রতিমা সর্ব্বাগ্রে লইয়া যাইবার জন্য তিনটী দলই সচেষ্ট ছিল। লাঠীর জোরেই ঐ সর্ব্বাগ্রে যাওয়া স্থির হইত। তখন গৃহে অন্ন ছিল, দেহে বল ছিল, লাঠীর জোর ছিল, রাজশাসনেরও তত প্রাবল্য ছিল না। লাঠীর জোরে তারণ ঠাকুরের দলই জয়ী হইত। তারণঠাকুরের শিষ্য সুবর্ণপুরের জমিদার রায়েরা ভাল ভাল খেলোয়াড় লাঠিয়াল পাঠাইয়া দিতেন। তাহাদের জোরে তারণঠাকুরের দুর্গাপ্রতিমা অগ্রে বাহির হইত। সে লাঠীর ঘায়ে কাহারও মাথা ভাঙ্গিত, হাত পা গুড়া হইয়া যাইত, কখন কখন দুর্গাপ্রতিমায় দুই একটী চোট লাগিত। ভবানীঠাকুর একাই লাঠীয়ালদের সহিত বিবাদে অগ্রসর হইতেন। দৈহিকবলে, সাহসে, লাঠিখেলায় তিনি একাই একসহস্র ছিলেন। তবে দল ছিল না বলিয়া পারিয়া উঠিতেন না। তারণঠাকুরের দলে ভুলুবাবু তখন গ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপ ছিলেন, গ্রামের মোকর্দ্দমা আদালতে যাইত না। ইঁহার প্রতাপে গ্রাম থরথরি কাঁপিত; পুলিশ পর্য্যন্ত ভয়ে নতশির ছিল। রায়বাহাদুরদের সহিত একটী বিষম বিবাদজন্য মোকর্দ্দমার দুই চারিজন ভদ্রসন্তানের সাজা হইলে পর তখন বিবাদ বিসংবাদ দুর হইয়া যায়। এক্ষণে ভুলুবাবুর নাম এ অঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি শিষ্টের বন্ধু, দুষ্টের যম ছিলেন। কাঁটালপাড়ার বিখ্যাত রাসমেলা ভুলুবাবুর রাস নামে অদ্যাবধি প্রসিদ্ধ আছে।

মহাকার্য্য সম্পাদনার্থ বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকার ও সাহায্য করার সুযোগ ও অবসর তাঁহার

ছিল না। তজ্জন্যই গ্রামে তাঁহার কলঙ্ক এই যে, তিনি গ্রামের বড় একটা উপকার করিতেন না, উল্লেখযোগ্য কোন গ্রামহিতকর কার্য্য সম্পন্ন করেন নাই। বঙ্গদর্শন পত্রিকার জন্য নৈহাটী পোষ্ট আফিস কাঁটালপাড়ার সীমানায় আইসে, ইহাই যাহা লাভ। কাহাকে অর্থ সাহায্য করা কিম্বা চাকুরী দেওয়া বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সমস্ত দেশজয়ী দিগ্বিজয়ী বীর নিজের ক্ষুদ্র গ্রামটিকে জয় করিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই আপশোষের কথা। চাঁদের কলঙ্ক চন্দ্রমণ্ডলবাসীর কাছে শোভাবৰ্দ্ধক বলিয়া বোধ হয় না।

সাধারণের বড় একটা উপকার করিতেন না—ইহার একটী কারণ, ইনি তোষামোদের বশবর্ত্তী হইয়া অযোগ্যকে উপরে তুলিতেন না, চক্ষুলজ্জা ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের জন্য অনুরোধ উপরোধে টলিতেন না। যোগ্যতা ব্যতীত তাঁহার নিকট আদরের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁহার দুই একটী উপকারের কথা আমরা জানি, যে জন্য তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের জন্য একজন পণ্ডিত থাকিতেন, তাঁহার নাম শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি বঙ্কিমবাবু অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের ছোট। ইনিই বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ বাছিয়া বঙ্কিমবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিতেন; কেননা সমস্ত প্রবন্ধ-স্তূপ হইতে বাছিয়া লইবার মত সময় বঙ্কিমবাবুর ছিল না। প্রুফ সংশোধনের ভার এই পণ্ডিত মহাশয়ের উপর ছিল। ইহাঁকে বঙ্কিমবাবু একটু ভালও বাসিতেন। নারায়ণে শাস্ত্রী-মহাশয়ের উল্লিখিত "রামফক্কর" ইনি নন। ফক্কর মৃত, ইনি জীবিত।

বঙ্কিমবাবুর কলিকাতায় অবস্থিতিকালে রামপণ্ডিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কোনরূপ বিপদাপন্ন হন। লোকমুখে এই বিপদের সংবাদ পাইয়া তিনি সত্বর চুঁচুড়ায় আসেন; কার্য্য শেষ করিয়া, বিপদ কাটাইয়া দিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে সেই শুভসংবাদটুকু দিয়াই পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া যান। পণ্ডিত মহাশয় সেদিন বলিলেন, তিনি বঙ্কিমবাবুকে এ সংবাদ দেন নাই। বঙ্কিমবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই উপকার করেন।

বঙ্কিম বাবুর নিজের হাতে কোন চাকুরী ছিল না, আর অনুরোধপত্র দেওয়া বা কাহাকে উপরোধ করা তাঁহার মত তেজস্বী পুরুষের সম্ভবই নহে। তথাপি বঙ্কিমবাবু একদিন পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "গোপাল কি পড়া ছাড়িয়া দিল? তাঁহার চাকুরীর জন্য কৈ আমাকে বলিলে না?"

পণ্ডিত মহাশয় উত্তরে বলেন, "আপনি আমাকে স্নেহ করেন; কি জানি, যদি গোপাল চাকুরীতে কোন দোষ করে, তখন আমার খাতির থাকিবে কোথা?"

বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "তাহা বলিয়া ঘরের জঞ্জাল ত আপনাদিগকেই ফেলিতে হইবে।"

কাঁটালপাড়া-নিবাসী ৺ দীননাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যার বিবাহে বঙ্কিমবাবু বিশেষরূপে সাহায্য করেন এবং ঐ বিবাহ নিজে উপস্থিত থাকিয়া সম্পন্ন করিয়া দেন। ইঁহারা দুই ভাইয়ে বিবাহের অনেক ভার লইয়া ব্রাহ্মণের মহোপকার সাধন করেন। এই বিবাহ উল্লিখিত তারণ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

একটী হাসির কথা বলি। ভট্টপল্লীর ৺ যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য পুরোহিত মহাশয়

একদিন বঙ্কিম বাবুর নিকট সাহায্য প্রার্থনায় আসিয়াছেন। তিনি অবিশ্রান্ত কয়ঘণ্টাকাল এরূপ বকিয়া যান যে, তজ্জন্য বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে পাঁচটী টাকা দিয়া বলিলেন—"আপনার এই কয়ঘণ্টা বকার পারিশ্রমিক।" বঙ্কিমবাবুর মত গম্ভীর ব্যক্তিকে হাসাইয়া টাকা লওয়া তাঁহার বাহাদুরী বলিতে হইবে। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিজমুখে এই গল্পটী শোনা।

বঙ্কিমবাবু বড় রাসভারী লোক ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে যাইতে অনেকেই ভয় পাইত। পৌরুষগুণের আধিক্য অত্যন্ত অধিক ছিল। রমণীসুলভ মৃদুতা তাঁহার বড় ছিল না। তিনি যখন লেখাপড়া করিতেন, তখন তাঁহার সম্মুখে কেহ যাইলে অসন্তোষভাব প্রকাশ করিতেন, সে সময়ে তাঁহাকে ডাকিতে কেহ ভরসা করিত না। এক একদিন তাঁহার দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসার আবশ্যক হইলে ভট্টপল্লী হইতে মহামহোপাধ্যায় ৺ রাখাল ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কিম্বা শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে আহ্বান করাইয়া আনিতেন। প্রশ্নোত্তর শেষ হইলে অন্য আলাপ তখন আর হইত না।

বঙ্কিমবাবু যাহা লিখিতেন, তাহা অনেক সময়ে দুই তিন বার বদলাইয়া তবে ছাপিতে দিতেন। তবে বঙ্গদর্শনে ছাপার জন্য তাড়াতাড়ি আবশ্যক হইলে লিখিয়াই মাত্র তখনই ছাপিতে দিতেন। কখন তিনি মুখে বলিয়া যাইতেন, কেহ তাহা লিখিয়া লইত। রামপণ্ডিত মহাশয়কে, কোন কোন সময়ে, ঐ কার্য্য করিতে হইত। সেদিন শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভাটপাড়া স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় গল্প করিলেন :—

"একদিন বঙ্কিমবাবুর ওখানে বেড়াইতে গেলাম। অনেকে মধ্যে মধ্যে যাইতেন। বঙ্কিমবাবু তখন কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীর ব্যাপার লিখিতেছিলেন। আমি যাইলে আমাকে লিখিয়া যাইতে বলিলেন, তিনি ঝড়ের মত মুখে মুখে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন সময় গাছ হইতে কোকিল ডাকিল "কু।" বঙ্কিমবাবুও অমনই কোকিলের কথা আরম্ভ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বঙ্গদর্শনে ছাপিবার জন্য গেল।

কলিকাতায় একবৎসর ছাপার পর বঙ্গদর্শন প্রেস কাঁটালপাড়ায় স্থাপিত হয়। বাটীর সম্মুখেই ছাপাখানা। এই বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লেখাতে প্রসিদ্ধ লেখক মাত্রেরই অতীব আগ্রহ ছিল। এক্ষণে সকল পত্রিকাই স্বয়ংসিদ্ধ, কেহও কাহারও প্রাধান্য মানে না। বঙ্গদর্শন পত্রিকাই তখন বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা ছিল—ইহাতে দ্বিমত ছিল না। ৫ হাজার কাপি ছাপা হইত। সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের প্রবন্ধ কত বাতিল হইত, নবীন সেনের কত কবিতাও বঙ্গদর্শনে ছাপা হয় নাই। "যোগেশ"-রচয়িতা ঈশানবাবুর কবিতা দেখিয়া বঙ্কিমবাবু বলেন, "ঈশান বেশ কবিতা লিখিতে শিখিয়াছে, তবে বঙ্গদর্শনে লিখিতে আরও দেরী আছে।" সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতার সময়ে ঈশানবাবুর কবিতা বাহির হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কোন প্রবন্ধ কখন প্রকাশের অযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। উঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলাই থাকিত যে, রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধ আর আমাকে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, একেবারেই ছাপিতে দিবে। পণ্ডিত মহাশয় উহার প্রবন্ধ একেবারেই ছাপিতে দিতেন।

সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্রসরকার

মহাশয়ের লিখিত "চন্দ্রালোকে" প্রবন্ধটী "কমলাকান্ত দপ্তরে" গৃহীত হইয়াছে, সকলেই জানেন। ঐ প্রবন্ধের এক স্থানে চন্দ্র যে পুরুষ, তৎসম্বন্ধে বহু যুক্তির অবতারণা ছিল। বঙ্কিমবাবু সেই কয় ছত্র কাটিয়া সেইস্থানে বসাইয়া দিলেন "বম্ ভোলানাথ, চন্দ্র যে পুরুষ। ডবলমাত্রা চড়াইতে হইল।" এই ঘটনাটী পণ্ডিত মহাশয়ের নিজমুখে শুনিয়াছি।

বঙ্কিমবাবুর সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন চারি বৎসর চলিয়া উঠিযা গেল। বঙ্কিমবাবুই অবশ্য তুলিয়া দিলেন। কারণটা পারিবারিক ঘটনা বলিয়া বলা সঙ্গত নহে। কিছুদিন পরে সঞ্জীববাবুর হাতে ৫ বৎসর চলার পর বঙ্গদর্শন সত্যই উঠিয়া গেল। এই সময়ে দেনার দায়েই বঙ্গদর্শন প্রেস বিক্রয় করিতে সঞ্জীববাবু বাধ্য হন। বঙ্গদর্শনের মত পত্রিকা এত গ্রাহক সত্ত্বেও গঙ্গার জলে ডুবাইতে হইল। সঞ্জীববাবু অত্যন্ত খরচে লোক ছিলেন; আয়ের অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতেন। তিনি দাতা, উদারস্বভাব এবং অমিতব্যয়ী ছিলেন; কাজেই ঋণের জন্য শেষ বয়সে বড়ই কষ্ট পাইয়া যান। অনেকের ঋণ অপরিশোধিত রাখিয়াই তাঁহাকে লোকান্তরে যাইতে হইয়াছিল। এই সঞ্জীববাবুর একমাত্র পুত্র জ্যোতিষবাবুও তেজস্বিতা ও আলস্যের জন্য এই সেদিন বড় চাকুরী ছাড়িয়া দেশে আসিলেন। ইনিও পিতার দোষগুণ সমভাবেই পাইয়াছেন। দুঃখের কথা, সঞ্জীববাবুর বাড়ী ঋণের দায়ে বিক্রীত। পূর্ণবাবুই তাহা ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন। এই কনিষ্ঠ পূর্ব্বে বৎসরান্তে একবার কিম্বা বৎসরে দুইবারও পরিবার্গ সহ কাঁটালপাড়ার বাটীতে আগমন করিতেন। এক্ষণে কয়বৎসর যাবত তিনি বা তাঁহার পুত্রগণ দেশে আসা ছাড়িয়াই দিয়াছেন। রথ দোল দুর্গোৎসবের ভার পরের উপর। সে ঘটার রথদোলের পূর্ব্বের জাঁক নাই। তবে পূর্ণবাবু কোন উপায়ে সেইগুলি রক্ষা করিতেছেন। পূর্ণবাবু অতি অমায়িক সজ্জন ব্যক্তি। তাঁহার মত লোকের গ্রাম ছাড়িয়া দেওয়া বড়ই দুঃখের। অথচ কাঁটালপাড়া গ্রাম নৈহাটী ষ্টেসনের উপরেই। আর নৈহাটী ষ্টেসনে আসিতে কলিকাতা হইতে রেলে একঘণ্টাও লাগে না। পাড়াটী যেন নীরব কেবল রাধাবল্লভের আরতি কিয়ৎক্ষণের জন্য পাড়াটীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। পূর্ণবাবু গ্রামে মধ্যে মধ্যে আসিলে সকলেই বড়ই সন্তুষ্ট হন।

এক্ষণে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ৺শ্যামাচরণবাবুর পৌত্রেরা কাঁটালপাড়া বাস করিতেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রেলওয়ে কোম্পানী তাঁহাদের বাড়ী ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারা পূর্ণবাবুর বাড়ীতেই এক্ষণে বাস করিতেছেন। ৺শ্যামাচরণবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত ঔপন্যাসিক শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ্রামের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধই রাখেন না, রাখা আবশ্যক বিবেচনাও করেন না। আমরা গ্রামের লাইব্রেরী ও সাহিত্য সম্মিলনীর জন্য তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। উত্তর পর্য্যন্ত পাই নাই।

অনুযোগ শুনিতে পাই, বঙ্কিমবাবু সম্প্রদায় বিশেষের উপর মধ্যে মধ্যে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন লেখার মধ্যে এই বিদ্বেষভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহা প্রশংসার কথা নহে। ইহা সাহিত্যিক অপরাধ। বাস্তব জীবনের অপরাধের চেয়ে এই জাতীয় অপরাধ দেশের

অধিক অপকারক। ইংরাজের নিকট অনেকস্থলে ঋণী থাকিয়াও "গোখাদক ইংরেজ গীতার মর্ম্ম কি বুঝিবে"—এইরূপ ভাষাপ্রয়োগ তাঁহার মত ব্যক্তির উপযুক্ত হয় নাই। "ক্ষৌরিত চিকুর * * সেখজীরা সেইখানেই অত্যন্ত কোলাহল করিয়াছিলেন" মুসলমান ঐতিহাসিকগণের উপর এইরূপ মন্তব্য দেওয়ায় মুসলমানেরা অতীব ক্ষুব্ধ আছেন। দুই একজন শিক্ষিত মুসলমানের মুখে এইরূপ দুই একটী কারণে বঙ্কিমবাবুর নিন্দাও শুনিয়াছি।

এইরূপ ভাষাপ্রয়োগের অবশ্য গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গুণ মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াও সময় বিশেষে নিন্দা করিতে বাধ্য হন। গীতা ও বেদের অর্থ ইংরাজকৃত হইলেই তাহা শিরোধার্য্য, ঋষিগণের বাক্য অপেক্ষা একজন ইংরাজের মন্তব্যের মূল্য অধিক এইরূপ মতবাদীর উপর ঝাল ঝালিবার জন্যই, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাহাদের উপাস্য দেবতার বিরুদ্ধে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখি। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক ভাব নহে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের পক্ষপাতিতা ও আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ ইতিহাস দেখিয়া যাহারা হিন্দুগণের বাহুবল স্থির করেন, সপ্তদশ অশ্বারোহী সাহায্যে বক্তিয়ার খিলিজি দ্বারা বাঙ্গলা দেশ জিত হইয়াছিল বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে বঙ্কিমবাবু তাঁহার চাবুকের যোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই দুরপনেয় ঘৃণ্য কলঙ্ক যাহারা বাঙ্গালীর উপর চাপাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী হইয়া তাঁহাদের উপর বাক্যের এই অসংযম কি অধিক দোষের? বঙ্কিমবাবু সঘৃণ অবিশ্বাসের সহিত উহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

দীনবন্ধুর "লীলাবতী" চরিত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে একস্থানে ব্রাহ্মগণের উপর দারুণ উপেক্ষার ভাব দেখিতে পাই। * "এতবড় মেয়ে আইবুড় করিয়া হিন্দুর ঘরে কেহ রাখেনা; আর কোর্টসিপও চলে না। তবে কলিকাতায় নাকি বাবুভায়াদের ঘরে মেয়েকে থুবড়ো করিয়া রাখা হয়, কোর্টসিপও চলে।" এই সর্ব্বজন-বিদিত তথ্যটুকু যে বঙ্কিমবাবুর জানা ছিল না, তাহা নহে, তথাপি ব্রাহ্মদিগকে এতই নগণ্য, এতই উপেক্ষণীয়, যেন পরিবারের অযোগ্য করিয়া দাঁড় করান সমীচান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মমত প্রতিবাদর্হ ও অগ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা "কলিকাতায় নাকি" এইরূপ মর্ম্মান্তিক উপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির প্রবাহ রুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়াছিল বলিয়াই কি এইরূপ করেন? কিম্বা ব্রাহ্মদের উপর তাঁহার ধারণা ঐরূপ ছিল?

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বিদ্বেষ-বহ্নি বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালার সাহিত্য-কাননে ছড়াইয়া দেন। আজিকালি কাব্যে নাটকে প্রহসনে প্রবন্ধে, কবিতায়, এমন কি, চিত্রে পর্য্যন্ত তাহার অনুকরণ চলিতেছে। "ব্রাহ্মণ ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না" এই কথাটী সর্ব্বজন-বিদিত। এই কার্য্যটীর জন্য বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বঙ্কিমবাবুর উপর বীতস্পৃহ। কেন বঙ্কিমবাবু এইরূপ করেন, তাহার কারণটী বলিব; অবশ্য ইহাতে যে তাঁর পক্ষে ওকালতী করিতেছি, তাহা নহে। বঙ্কিমবাবু যখন দেখিলেন, সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের, বিশেষতঃ

---

* ঠিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কিন্তু ভাব ঠিক এইরূপই।

নৈয়ায়িকগণের আধিপত্য অত্যন্ত অধিক, তখন তাহার খর্ব্ব করা বড়ই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কাব্য-রসজ্ঞ, শাস্ত্রমর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা সূক্ষ্ম দার্শনিক বলিয়া নৈয়ায়িকগণের বড়ই খ্যাতি ছিল। যে বঙ্কিমবাবুকে সাহিত্যে নবীন ভাব সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, নবযুগ আনয়ন করাই যাঁহার লক্ষ্য ছিল; তাঁহার পক্ষে পুরাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতীত উপায় ছিল না। নৈয়ায়িকের প্রভাবেরও বড় বাড়াবাড়ি ছিল। বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনই সম্যক্ হয় না, কাজেই অধ্যাত্মতত্ত্ব, শাস্ত্রের সরল যুক্তি-বিজ্ঞান তাঁহাদের কিছুমাত্র আয়ত্ত ছিল না। দুস্প্রধৃষ্য শব্দবিন্যাস ও ভাষার দুষ্প্রবেশ্য জাল বিস্তারদ্বারা প্রকৃত বিষয়টাকে প্রহেলিকাময় রাখিয়া তাঁহারা সাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক সরল সত্য তখন নিষ্কাসিত, প্রাণময় অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-তত্ত্ব তখন সর্ব্বসাধারণে অনাবিষ্কৃত। বিতণ্ডা দ্বারা সভায় বৃথা জয়রূপ বাহবা লওয়াতেই তখন পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা। সে সময়ে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল, কাব্য, দর্শন, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র নৈয়ায়িক ব্যতীত অপরে সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন না। অনেকের বিশেষতঃ নৈয়ায়িকগণের বিশ্বাস, সূক্ষ্ম দার্শনিক-তত্ত্ব নৈয়ায়িকেরই গম্য। তদানীং কাব্য সম্বন্ধেও অনেক লোকেরই এ বিশ্বাস ছিল নৈয়ায়িকগণের খুবই দম্ভ ছিল। এক্ষণে কাব্য সম্বন্ধে লোকের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভূদেববাবু রত্নাবলীর, বঙ্কিমবাবু উত্তররাম চরিতের সমালোচনা প্রকাশ করার পর, যখন চন্দ্রনাথবাবু শকুন্তলা গ্রন্থের সমালোচনা শকুন্তলা-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, তখন লোকে বুঝিল যে, ইহারাই প্রকৃত কাব্যরসজ্ঞ। কাব্য সম্বন্ধে তখনকার ধারণা এক্ষণকার বিপরীত ছিল। "রঘুরপি কাব্য; তদপিচ পাঠ্যং" রঘুবংশ আবার কাব্য তাহাও আবার পড়িতে হইবে, ইত্যাকার প্রবাদ শ্লোকেই কতকটা বোঝা যায় কালিদাস অপেক্ষা শ্রীহর্ষের আদর নৈয়ায়িক সমাজে অধিক ছিল বলিয়া নৈষধচরিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য ছিল। ভবভূতির আদর ছিল না বলিলেই হয়। প্রথম শ্রীহর্ষ তৎপরে মাঘ ও ভারবির নামই শোনা যাইত।

আজিকালি যে লোকে শাস্ত্রমর্ম্ম যুক্তি-সঙ্গতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করে, বৈজ্ঞানিক যুক্তির অনুসরণ করে, জলীয়ভাগ ত্যাগ পূর্ব্বক হংসের ক্ষীরভাগ লওয়ার মত যে লোকে গ্রহণীয় অংশটুকু লইতে শিখিয়াছে, তাহার মূলে বঙ্কিমবাবুর প্রভাব অনেকটা বিদ্যমান। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রামমোহন রায় বর্ত্তমান হিন্দুত্বের দুর্ব্বল দেহের উপর প্রবল আঘাত দিয়াছিলেন বলিয়া, বঙ্কিমবাবু-প্রমুখ হিন্দুগণ আপনাদের ছিদ্র বুঝিয়া যথাযোগ্য প্রলেপের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের চরিত্রগুলির দোষ গুণ সমভাবেই সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু দোষগুলি দেখিয়া অনেকে বঙ্কিমবাবুর উপর অনুযোগ করেন। প্রবন্ধ-বাহুল্য জন্য এই বিবদমান বিষয়ের বিচার এক্ষেত্রে করা হইল না।

সর্ব্বদিক দেখিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহাতে গুণের একচ্ছত্র আধিপত্য দৃষ্ট হয় না; কিন্তু ভাবজীবনে তিনি দেবতা, বন্দেমাতরং মন্ত্রের ঋষি, নবযুগের তিনি প্রবর্ত্তক। এজন্য তিনি আমাদের নিকট চিরদিনই গভীর শ্রদ্ধাপাত্র ও বঙ্গসাহিত্যের তিনি চিরদিনই কর্ণধার স্বরূপে বিবেচিত হইবেন, সন্দেহ নাই। বঙ্কিমবাবুদের সম্বন্ধে যদি কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া থাকি, তজ্জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

দুইটী কবিতা।

কে ছিঁড়িল ?

কে ছিঁড়িল হায় ! পঞ্জাবের ফুল ?
ফুটে ছিল আহা জনীর কোলে,
কে ছিঁড়িল হায় ! ভারত আকুল
কে ছিঁড়িল সেই ফুল্ল শতদলে !

পঞ্জাব-জননি ! কি শোক তোমার !
পরাস্ত কল্পনা, কাবত্ব, বর্ণনা !
কে আছে আঁকিতে এ চিত্র এবার ?
তোমার, আমার সবার ভাবনা !

দুটী ফুল তারা দুটী এক হ’য়ে
যতনের ফুল—ছিল সিন্ধু পারে,
কে ছিঁড়িল মাতঃ নৃশংস হৃদয়ে ?
এ চিত্র জননি ! কে আঁকিতে পারে ?

ফুল্ল শতদল নিরীহ পরাণ,
নৃশংস অষ্ট্রীয় নিঠুর হৃদয়ে
দিল কি ছিঁড়িয়া বিধাতার দান ?
সমস্ত পৃথিবী পড়েছে ভাঙ্গিয়ে !
কত পিতা মাতা ভ্রাতা কি ভগিনী
বালক-বালিকা নিরীহ পরাণ
সাগর-তরঙ্গে তখনি তখনি
ভাসিল ডুবিল তৃণের সমান !

নৃশংস জর্ম্মাণ্ নৃশংস অষ্ট্রিয়া
নৃশংস আচারে নিরীহ পরাণ,
দয়া, মায়া ধর্ম্ম সকলি ভুলিয়া
নাশিল সবারে পশুর সমান !

“পারস্য তরণী” রহস্য এমনি
মিনিট্ কয়েকে অদৃশ্য কোথায়
দুটী ফুল তারা হৃদয়ের মণি
শত ফুল সহ সাগরে মিশায় !

শোকার্ত্ত “মাল্টা” শোকাশ্রু ধারায়,
সাগরের বক্ষ ক’রেছে প্লাবিত.
তোমার ও অশ্রু ভারত-বেলায়
কোটি অশ্রু সহ অশ্রুতে মিশায় !

জ্ঞানের অতীত অভিপ্রায় তাঁর
কি বলিব আজ্ পঞ্জাব-জননি,
কিছু নাই আর তাঁর ইচ্ছা সার,
বীর-মাতা তুমি নারীকুল-মণি।
শিখ্-কন্যা তুমি শিখের জননী,
শিখ্-পিতা স্বামী জ্ঞানী, গুণী, মানী,
শিখের শোণিত বীরত্ব কাহিনী
কর প্রমাণিত পঞ্জাব-জননি !

শ্রীগৌরীপ্রসাদ জুমমদার।

তাজ

দাম্পত্য প্রেমের পবিত্র চিত্র
তুলনা তোমার মিলেনা তাজ,
স্বামী সোহাগে গরবিণী বাণু
সাক্ষী তারো তুমিই আজ।
বাণু-চরিত্রের বিমল আদর্শে
মণ্ডিত তুমি শুভ্র প্রস্তরে,
তোমার মিনার ছুইয়ে আকাশ
গাইছে যশ জগত ভরে।

বিপুলবাহিনী যমুনা-বারি
চুমিয়ে পদ শ্রদ্ধার বশে,
দিতেছে বারতা সাগর পাশে
বহিতে তাহা সকল দেশে।
হিরা জ্যাসপার স্ফটিক স্যাপার
সাচ্চা মাণিকে ভূষিত তুমি।
এ সবার হার সে প্রেমের কাছে
সুষমা যাহার দিগন্ত ভূমি
তোমার সৌন্দর্য্য তোমার গাম্ভীর্য্য
করেছে তোমা মহিমাময়,
কোথায় উরোপ কোথা আমেরিকা,
অক্লান্ত নয়নে চাহিয়ে রয়।
ধন্য তাঁহার রমণী জনম
যাঁহার পতির এমন প্রীতি,
কোন্ বা নারী না চায় মরিতে
উঠিবে জানিলে এমন স্মৃতি।
পতি গড়িলেন প্রেমের স্মৃতি
করিতে অমর তাঁহার প্রিয়ায়,
ইতিহাস বুকে রাখিল বাঁচায়ে
অচ্ছেদ্য বন্ধনে তাঁদের দোহায়।

শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন।

সমাজ-সমস্যা।

আদব কায়দা।

কথায় বলে 'পড়ে ত পো, না পড়ে ত সমাজে নে থো।' আমাদের দেশে যখন সজীব সমাজ ছিল, সমাজশাসন ছিল, সমাজের মালিক ছিল, দশজনের মতামত ছিল, তখন লোকে স্কুলকলেজে না পাঠাইয়া সমাজের হাতে ছেলে 'তালিম' করার ভার ছাড়িয়া দিত। তখন উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল, ব্যবস্থা ছিল, আদবকায়দা ছিল। পূর্ব্বে আশৈশব বালকবালিকাগণকে কেমন করিয়া ডাকিলে উত্তর দিতে হইবে, কেমন করিয়া নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার করিতে হইবে, কেমন করিয়া আহারে বসিয়া কোন দ্রব্য প্রথমে মুখে তুলিয়া দিতে হইবে, ঠাঁই বেঠাঁই কেমন করিয়া বসিতে হইবে, তাহা তোতাপাখীর মত মুখে মুখে সেখান হইত। ব্রাহ্মণ-সন্তান বর্ণভেদে, জাতিভেদে কাহাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, তাহা বর্ণজ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই শিক্ষা করিতেন। চলিতে ফিরিতে, কথা বলিতে, সম্ভাষণ করিতে, হাসিতে কান্দিতে, ভেটমোলাকাত * করিতে ঝি বউকে সমর্থ বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইত। দেশভেদে আদবকায়দা ও তওর তরিবতের পার্থক্য দেখা যাইত বটে, সমাজ-ভেদে চালচলনের ও সভ্যতার বৈষম্য দৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু প্রত্যেক সমাজেরই একটা এটিকেট (Etiquette) বা বাঁধাবাঁধি কায়দা ছিল। যে অঞ্চল যত অধিক সভ্য, যেখানে সমাজ যত অধিক উন্নত, সেখাকার রীতিনীতি ও চালচলনের তত অধিক মর্য্যাদা ও আদর ছিল। তথাকার দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও অসভ্য স্থানের অধিবাসীরা অনুকরণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত।

সেকালের আদবকায়দা বলিতে আমরা এদেশের সত্যকালের রীতিনীতি ও সভ্যতা বুঝিব না। কোন সমাজেই আবহমানকাল যাবৎ কোন সনাতন রীতিনীতি অচল হইয়া থাকে না। যুগেযুগে, দেশেদেশে সামাজিক প্রথা ও ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আমরা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমাজে যে প্রকার আদবকায়দা প্রচলিত ছিল, তাহারই ইঙ্গিত করিতেছিলাম। সে সময়ও সর্ব্বত্র দেশব্যাপী একপ্রকার ব্যবহারবিধি প্রচলিত ছিল না। ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে ও রাজনৈতিক কেন্দ্রে তখন মুসলমানী কায়দা, ফ্যাশন ও এটিকেট্ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সুদূর পার্ব্বত্য-ত্রিপুরা ও পালকোট শুরগুজা প্রভৃতি পার্ব্বত্যারণ্যের অন্তরালে লুক্কায়িত হিন্দুধর্ম্মপ্রধান স্থানেও আমরা মুসলমানী বেশভূষা ও আদবকায়দার প্রাধান্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। দিল্লী

---

* এখনও বিহারপ্রভৃতি দেশে কোন স্ত্রীলোকের সহিত তাহার নাইহরের বা পিতৃকুলের কোন আত্মীয়ের পথেঘাটে হাটেবাজারে ছত্রেমেলায় সাক্ষাৎ হইলে, সে নানাসুরে নানাছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দনের ধ্বনির অনুকরণে 'ভেট' করে। কে কেমন 'ভেট' করিতে পারে, পিতৃদেশে তাহার খ্যাতি প্রচারিত হয়।

প্রভৃতি রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থানে বেশভূষায়, নামে, ব্যবহারে ও আদবকায়দায় হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। সহর ছাড়িয়া আমরা যতই পল্লীপানে অগ্রসর হই, ততই ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার ও হিন্দু ব্যবহার নীতির প্রতিপত্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারি। বিদেশীয় ও বিজাতীয় প্রভাব হইতে দূরে সরিয়া, হিন্দু বহুযত্নে, বহুকষ্টে আচার ব্যবহারে, বেশভূষায়, রীতিনীতিতে ও চালচলনে আপন জাতীয়তা ও অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছিলেন। বিদেশীয় প্রভাবে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াও হিন্দু তখন সামাজিক রীতিনীতি ও আচারব্যবহারে জাতীয় প্রভাবের উৎস খুলিয়া রাখিয়াছিলেন· সেকালের হিন্দু দরবারে ও সমাজে, নগরে ও পল্লীতে, বাহিরে ও গৃহে চালচলন ও ব্যবহারের বহির্মুখীন ও অন্তর্মুখীন দ্বিবিধ নীতি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সকলপ্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যে, রাজ্যক্রান্তি ও ধর্ম্মবিপ্লবের ভিতরে হিন্দুসমাজ ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সামাজিক রীতিনীতিও যে যবনযুগে হিন্দু অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন না, তাহা আমরা সকলেই জানি ও স্বীকার করি। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন বাহিরের তাড়নায় নহে, ভিতরের প্রেরণায়। সে পরিবর্ত্তনে পরাধীনতার নিগড় ছিল না, স্বাধীনতার লীলা ছিল। সে পরিবর্ত্তন রুগ্ন বৃদ্ধসমাজের গঙ্গাযাত্রাস্বরূপ ছিল না, নবীন সুস্থ সমাজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাস্বরূপ ছিল। তাই সেই বিদেশীয় ভাব হিন্দুর দেহে সংক্রান্ত হইলেও হিন্দু তাহা মজ্জাগত করিয়া গ্রহণ করে নাই। সে বিদেশীয় সভ্যতার 'তুফান' হিন্দুর দেহের উপর দিয়া বহিয়া গেলেও হিন্দুর চরণ স্থিরভূমিচ্যুত হয় নাই। তাই হিন্দু সামাজিকসমষ্টিভাবে ব্যক্তিত্বের বন্ধন অটুট রাখিয়া আফগান ও তুর্ক সাম্রাজ্যের অন্তিম শ্মশানে ইন্ধন নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ক্ষমতাগর্ব্বিত মহম্মদীয় সভ্যতা আরক্ত-নেত্রে, অসির সাহায্যে বল প্রয়োগে হিন্দুর সমাজদুর্গ ভেদ করিতে পারে নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, শিক্ষা, আদর্শ, যুক্তিতর্ক, মৈত্র, সাম্য ও প্রেম হিন্দুর সমাজদুর্গের ভিত্তি শিথিল করিয়া শিশিরের সুখস্পর্শ আতপের ন্যায়, কুসুমের সৌরভের ন্যায়, মলয় পবনের মৃদু হিল্লোলের ন্যায়, শারদীয় শশীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্মসমাজবন্ধনের মর্ম্মেমর্ম্মে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখন জগতের সকল দেশের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, সকল বিশেষত্বের বাধা অতিক্রম করিয়া,সকলপ্রকার সঙ্কোচের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া মেদিনীময় সকল দেশের সভ্যতার এককরণ স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং এখন কোন দেশই শিক্ষায় ও সভ্যতায় নিজের ব্যক্তিত্ব, স্বতন্ত্রতা ও বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারিতেছে না। * নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীর, নূতন প্রতিপক্ষের নূতন প্রণালীর যুক্তিতর্কে, নূতন আদর্শের আকর্ষণে, নূতন স্বাধীনতার মোহে হিন্দুর চিন্তাসাগর তর্কতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অবশ্যম্ভাবী

---

* Ideas, ideals, and experiments make the tour of the globe. Civili-ation has become international.—History of Our Time, G. P. Grooch.

পরিণাম হিন্দুর বেশভূষায়,ধর্ম্মেকর্ম্মে, আচার-ব্যবহারে, চালচলনে ও আদবকায়দায় ঘোর পরিবর্ত্তন। হিন্দু এই সভ্যতার সন্ধিতে, সঙ্কটে, বিপরীত চিন্তাপ্রবাহের আবর্ত্তে লক্ষ্যহীন ও কক্ষচ্যুত হইয়া নিজস্ব হারাইয়াছে, কিন্তু পরস্ব আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া মানবের প্রয়োজন যে নূতন বিদ্যা ও নূতন সভ্যতার বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছে, তাহার আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া ভারতবাসী আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত সমাজের পুরাতন সভ্যতার আদর্শে যে শাসনপ্রণালী ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা নূতন প্রয়োজন সাধনের উপযোগী নহে বলিয়া, অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। নূতন বন্যার প্লাবনে যাহা মূল্যবান্, তাহাও ভাসিয়া গিয়াছে, যাহা আবর্জ্জনা, তাহারও অবশেষে হয়ত রহিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের ক্ষমতা, শিল্প ও বাণিজ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেথাকার রীতিনীতি, ভাষা ও আদবকায়দা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সাধারণ মানবের দৃষ্টি ক্ষমতামণ্ডিত অহঙ্কার-শিখর ও ইন্দ্রিয়সুখসাধনোপযোগী সভ্যতার তারকাখচিত নীলনভোমণ্ডলে ন্যস্ত থাকে। পাশ্চাত্য ভাষার ভিতর দিয়া সে দেশের চিন্তাপ্রবাহ ভারতীয় ভাবরাজ্য অধিকার করিয়া বসিতেছে। প্রভুশক্তির ও উন্নত জড়বিজ্ঞান-সম্ভূত সভ্যতার প্রতিকূলে হিন্দুর 'লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্মনসগোচর' তত্ত্বান্বেষিণী পুরাতন সভ্যতা আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেছে না। অতএব হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও চালচলন যেন 'কালবৈশাখীর' ভীম ঝঞ্ঝাবাতে নষ্টভ্রষ্ট ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে। তাহা কালনেমীর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

বহুকালের সঞ্চিত সংস্কার, বহু মনস্বী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও সুবিবেচনার ফল দেশের আদবকায়দায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করে। অবস্থার পরিবর্ত্তনে ব্যবহারনীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু নূতন ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে অনেক সময়ের ও পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। সকল প্রকার ব্যবহার নীতির মূলমন্ত্র অপরের সুখ সুবিধা বিধানের ও চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় আপনাকে বিসর্জ্জন দেওয়া। সমাজের যে অংশ এই মন্ত্রসাধনে অগ্রসর, সেই অংশই উহার শীর্ষ। এই মন্ত্রই সেকালে আমাদের দেশে সভ্যতার মাপকাঠি ছিল। সেকালে আদবকায়দা, চালচলন, কথাবার্ত্তা এই মন্ত্রের বীজ আত্মস্থ করিয়াই গঠিত হইত। আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেয়। সৌজন্য, বিনয় এবং আত্মসুখ বিস্মৃত হইয়া পরসুখবিধানে যত্ন ও আগ্রহ শিষ্টতার অনুমোদিত ব্যবহার। জগৎকে তুচ্ছ ও পদদলিত করিয়া আপনাকে সকলের তুঙ্গে প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করিলে, জগৎসংসারও আমাকে ছাটিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে। আমি যদি সংসারের কাহাকেও গ্রাহ্য না করি, সম্মান না করি, কাহারও কথায় কাণ না দেই, কাহারও ন্যায্য প্রাপ্য ভক্তিশ্রদ্ধার কর দিতে না চাই, কাহারও প্রতি বেদনায় সহানুভূতি, রোগে সেবা, সঙ্কটে সহায়তা না করি, আমাকেও কেহ গ্রাহ্য করিবে না, সম্মান করিবে না, আমার কথাও কেহ শুনিবে না, আমার প্রাপ্য শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি লইয়াও কেহ আমার দ্বারে আসিবে না, আমারও রোগে, শোকে, দুঃখ দারিদ্র্যে

অপরের বুকে ব্যথা আমি বুঝিতে পারিব না। এই জন্যই আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য, জীবনকে সহজ ও সুখময় করিতে, আমরা ত্যাগ ও সংযম শিখিয়া, আপনাকে পশ্চাতে রাখিয়া, পরকে সম্মুখে উর্দ্ধাসনে বসাইয়া সমাজপণ্যশালায় বিপণী সাজাইয়া আনন্দ ও প্রয়োজন পণ্য ক্রয়বিক্রয় করিতেছি। কেহ যদি পদাঘাতে আমার পণ্যের পসরা ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া যাইতে চায়, কেহ যদি বলপূর্ব্বক আমার দ্রব্যসম্ভার আত্মসাৎ করিতে চায়, কেহ যদি অশিষ্টের ন্যায় সকলকে পশ্চাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া ক্রেতার সম্মুখে আপন পণ্য ধরিতে চায়, কেহ যদি আমার পণ্যে বৃথা দোষারোপ করিয়া আমার বাজার মাটী করিতে উদ্যত হয়, আমাকে তাহার প্রতিবিধান করিতেই হইবে। সেই প্রতিবিধানের চেষ্টাই অশান্তি। অশান্তির হস্ত হইতে পণ্যশালা রক্ষা করিবার জন্য সমাজ মিউনিসিপালিটীর এটিকেট বা আইন সকলের উপর চালাইয়া দেওয়া হয়। যেখানে স্বায়ত্তশাসন নাই, সেখানে কথায় কথায় পুলিস পাহাড়াওয়ালার শরণাপন্ন হইতে হয়। অথবা কিল খাইয়া কিল চুরী করিয়া মনের দুঃখে দুর্ব্বলকে বনে যাইতে হয়। আমরা যদি একটু আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া পরের সুখসুবিধার উপর দৃষ্টি করিয়া চলি, তাহা হইলে এই সামাজিক অরাজকতার দিনেও জীবনযাত্রা অনেক পরিমাণে সুগম, সুকর ও সহজ হইতে পারে। সেকালের যে বিনয় ও সৌজন্য ছিল, যে অমায়িকতা ও শিষ্টাচার ছিল, তাহা পূর্ণাকারে একালে সকল সময় চলিতে না পারিলেও, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ অনাদৃত হইবে না! একালে পাশ্চাত্য বাণিজ্য-প্রধান দেশের কর্ম্মময় জীবনের ব্যস্ততাপূর্ণ ভদ্রতা আমাদের ধীর শান্তদেশে সম্পূর্ণ ভাবে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার উদারতা ও আন্তরিকতা আমরা অনায়াসে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারি। স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব, বিদেশীয়ের প্রতি আদর ও যত্ন ভুলিয়া আমরা জগতের দৃষ্টিতে হীন হইব কেন? বৃদ্ধ, বালক ও অসমর্থের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া একটু অসুবিধা মাথা পাতিয়া লইতে যে গৌরব ও আনন্দ, হঠকারিতার ও অসংযমের দোষে তাহা হইতে আমরা বর্জ্জিত হইব কেন? অপরের মন্তব্য, সমালোচনা, উপদেশ, তর্ক, বিচার ও চিন্তা ধীরভাবে শ্রবণ করিলে আমার বিচার বুদ্ধিতে যে নূতন আলোকপাত হইতে পারে, অসহিষ্ণুতা ও ঔদ্ধত্য বশে অধীর হইয়া তাহা হারাইবার মূর্খতা প্রকাশ করিব কেন? পথে ঘাটে, চলিতে ফিরিতে, অপরিচিতের সম্মুখে আমার মনের ব্যাধি ও চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া আমার পণ্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাস করিব কেন?

কিন্তু আমরা বিচার করিয়া চলিতে পারি না, যেহেতু আমাদের দৃষ্টিক্ষীণ, বুদ্ধির গোড়ায় বালি; অথবা যেহেতু আমরা আমাদের প্রভু নই, আমাদের কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্যই আমাদের প্রভু। যাহার নিজের প্রজ্ঞা নাই, বিচার নাই, বহুদর্শিতা নাই, তাহার জন্য সমাজে সংস্কার সঞ্চিত করিয়া রাখিতে হয়। আমাদের সঞ্চিত ভাণ্ডার শূন্য হইয়া রিক্তহস্তে আমরা এখন সভ্যতার হাটে বাহির হইয়াছি, পণ্যের কড়ি আমাদের অঞ্চলে নাই। জগতের লোক যেখানে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য

সভ্যতার বিনিময়ের আশায় পণ্যশালায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমরা সেখানে ফকীর। অপরের মনে ব্যথা দেওয়া, অপরকে উত্যক্ত করা, পূজ্য ভক্তিভাজন সম্মানার্হ ব্যক্তিগণকে অবজ্ঞা করা, দুর্ব্বলের উপর পীড়ন ও অত্যাচার করা, বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করা, অসংযত প্রবৃত্তির বশে সর্ব্বত্র উন্মার্গগামী হওয়াকেই যেন আমরা বীরত্ব, সৎসাহস ও পৌরুষ বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি, তাই শিক্ষক ও গুরুজনের কাছে আমরা disrespectful, ব্রাহ্মণের নিকট আমরা অবিনয়ী, মৌলবীর কাছে আমরা বেতমিজ—বেসবর, বেয়াদব, বন্ধুর গৃহে আমরা bore, নিজের গৃহে আমরা bully, পথে ঘাটে আমরা unruly এবং স্ত্রীলোকের চক্ষুতে আমরা 'ডাঁকরা মিন্‌সে।'

যাহা হউক, আমাদের মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের সূচনা সকল বিভাগে দেখা যাইতেছে, তাহার ফলে কখন কিরূপভাবে কি প্রণালীতে আমাদের নূতন 'আদবকায়দা' গড়িয়া উঠিবে, তাহার প্রতীক্ষায় আমরা উৎসুক হইয়া রহিয়াছি। প্রকৃতির নির্ম্মাণকার্য্যে আমাদের শিক্ষা, প্রবৃত্তি ও বিবেচনা কতদূর সহায়তা করিতেছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। যে ভাবেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের অদৃষ্ট রচনা করি না কেন, আমাদিগের স্মরণরাখা কর্ত্তব্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনে আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিলে, আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়া জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রাচ্য উপাদানে আমরা যদি পাশ্চাত্য আদর্শে সভ্যতার সৌধ গঠন করিতে পারি, তবেই আমাদের সাধনা সফল হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। *

শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গী ।।

(৪৮৪ পৃষ্ঠার পর)

—এই দিব্য দৃষ্টির কথা এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইবে। যে দৃষ্টি দ্বারা পরমাত্মা পরমেশ্বরের অব্যয় ঐশ্বর্য্যরূপ দর্শন হয়; যে উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সাধনা করিলে আমাদের এই দিব্য দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

আমরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই ত্রিবিধ মূল প্রমাণ দ্বারা লৌকিক বিষয় জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। এই প্রমাণ-বৃত্তি আমাদের চিত্তেরই বৃত্তি বা ধর্ম্ম। ইহা দ্বারা অলৌকিক বিষয় জ্ঞান লাভ হয় না। ইহা দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় না। প্রমাণজনিত প্রমা-জ্ঞান এই ব্যবহারিক জগতে আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও, ইহা দ্বারা আমাদের পরমার্থ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা লাভ

---

* "The awakening of the East has been rendered possible by the appropriation of the ideas and methods of the West; but the enduring result is the affirmation of its own personality" p 179, History Of Our time, G. P. Grooch, M. A.

হয় না। বেদান্ত শাস্ত্র অনুসারে এই পরমার্থ জ্ঞান লাভের উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, তাহা বলিয়াছি। এই শ্রবণ—তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকট শ্রুতি বা বেদার্থ শ্রবণ। ইহা কেবল শব্দ প্রমাণ মাত্র নহে। মনন বা চিন্তন দ্বারা এই শ্রুত তত্ত্ব আলোচনা পূর্ব্বক অনুমান প্রমাণ অবলম্বনে হেতু শাস্ত্র নির্দ্ধারিত উপায়ে সেই শ্রুত তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হয়, এবং তাহার পর সেই তত্ত্বের অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্য নিদিধ্যাসন বা বিহিত উপায়ে ধ্যান করিতে হয়। এই ধ্যানের পরিণামে এই দিব্য দৃষ্টি লাভ হইতে পারে। শ্রবণ ও মননের পর অর্জ্জুন পরমেশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া সেই তত্ত্ব নিদিধ্যাসন জন্য—কোন্ কোন্ ভাবে পরমেশ্বর চিন্তনীয়, তাহা জানিবার জন্য ভগবানের বিভূতি—বিভিন্ন ভাবে তাহার অভিব্যক্তি পূর্ব্বে জানিতে চাহিয়াছিলেন। ভগবান তাঁহার যে বিভূতি বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে দশম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পরে নিদিধ্যাসন পরিপাকে যেরূপে সেই অব্যয় আত্মায় ঐশ্বররূপ দর্শন করা যায়, অর্জ্জুন সেই ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। সেই দিব্য অব্যয় বিশ্বরূপ আমাদের এই চক্ষুতে দর্শন করা যায় না, কেবল দিব্যদৃষ্টিতেই তাহার দর্শন হয়, এজন্য ভগবান অর্জ্জুনকে এই দিব্য দৃষ্টি দিয়া সে রূপ দেখাইয়াছিলেন। এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থানে আরও দুই একটী কথা বুঝিতে হইবে।

দিব্য দৃষ্টি দ্বারা পরমার্থ-তত্ত্ব দর্শন করিবার জন্য বেদান্তে যে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে, পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ এই নিদিধ্যাসন বা যোগ-তত্ত্ব পাতঞ্জল দর্শনে বিস্তারিত ও বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে

পাতঞ্জল অনুসারে যে প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ-জনিত প্রমাণ, তাহা চিত্তেরই এক বৃত্তি মাত্র। এই প্রমাণ হইতে যে প্রমাজ্ঞান হয়, তাহাও বৃত্তিজ্ঞান মাত্র। ইহাতে চিত্তে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বা দ্রষ্টা-দৃষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যোগ অর্থে চিত্ত বৃত্তি নিরোধ (পাতঞ্জল সূত্র, ১২)। এই যোগ সিদ্ধ হইলে দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করেন (পাতঞ্জল দর্শন, ১৩)। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলে বৃত্তি-সারূপ্যে—বৃত্তি জ্ঞানের সহিত একীভূত হইয়া সেইরূপে দ্রষ্টা অবস্থান করেন, স্বীয় দ্রষ্টা দৃষ্টে অবস্থান করেন না। দ্রষ্টা রূপে অবস্থান করিতে হইলে—স্বস্বরূপ লাভ করিতে হইলে যোগ রূপ উপায়ে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে হয়, সুতরাং প্রমাণ বৃত্তিরও নিরোধ করিতে হয়। প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ প্রমাণজ প্রমাজ্ঞানে অবস্থান করিলে তাহার স্বীয় দ্রষ্টা স্বরূপ লাভ হয় না।

ব্যাস-ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, সূত্রে যখন 'সর্ব্ব' শব্দ নাই, অর্থাৎ সর্ব্বরূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা নাই তখন যোগ অর্থে কেবল সর্ব্বচিত্ত-বৃত্তির নিরোধ বুঝিতে হইবে না, কতক চিত্ত বৃত্তির নিরোধ বা চিত্তবৃত্তির সংযমও বুঝিতে হইবে। চিত্ত সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মক, তজ্জন্য ইহা প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতিশীল। চিত্তের তামস ও রাজস অবস্থা নিরোধ পূর্ব্বক সাত্ত্বিক অবস্থায় স্থিত হইলেও তাহাকে যোগ বলা যায়। সে যোগকে সমপ্রজ্ঞাত সমাধি বলে। সবিচার ও সবিতর্ক সমাধি তাহার অন্তর্গত। আর

সর্ব্বচিত্ত বৃত্তির নিরোধে যে যোগ, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে যখন সাত্ত্বিক চিত্তের তমোমল একেবারে দূর হয়, কেবল রজোলেস থাকে, তখন তাহার ধর্ম্মজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য ভাব হয়—চিত্ত এই ধর্ম্মাদির অভিমুখী হয়। আর যখন রজোমলও দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়, তখন চিত্ত স্বরূপে অবস্থান করে, তখন তাহা যে জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহাতে সে সত্ত্বের (চিত্তের) ও পুরুষের ভেদ উপলব্ধি করে। এই অবস্থায় ধর্ম্মমেঘ সমাধি হয়। এই অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানরূপ বিবেক-খ্যাতির পরাকাষ্ঠা অবস্থা। কিন্তু ইহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা।

সে যাহা হউক, এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থায়, এই চিত্তের আংশিক নিরুদ্ধ শুদ্ধ সাত্ত্বিক অবস্থায় চিত্তের প্রমাণ বৃত্তি শুদ্ধ নির্ম্মল হয়। সেই অবস্থায় প্রমাণ-জনিত জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলে। তাহা সাধারণ প্রমাজ্ঞান হইতে ভিন্ন। আর সে অবস্থার প্রমাণ-সাধারণ প্রত্যক্ষ অনুমান ও লব্ধ প্রমাণ নহে। তখন সে প্রমাণ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। চিত্তের এই সম্প্রজ্ঞাত বা সবিষয় ও সবিকল্প সমাধি অবস্থার প্রমাণ এই তিন রূপ ও তাহা হইতেই প্রজ্ঞা লাভ হয়। ইহাদের মধ্যে নিদিধ্যাসন দ্বারা যে প্রজ্ঞা লাভ হয়, তাহাকে 'ঋতম্ভরা' প্রজ্ঞা বলে। তাহা 'ঋত' ও সত্য দ্বারা পরিপূর্ণ। অতএব প্রজ্ঞাও দুই রূপ—এক শ্রবণ ও মনন-জনিত প্রজ্ঞা, আর এক নিদিধ্যাসন-জনিত প্রজ্ঞা বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। যিনি এই প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত হন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ (গীতা ২।৫০)। তিনি প্রজ্ঞানেত্র হন—তাঁহারই প্রজ্ঞানেত্রে সমুদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে।

সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানেত্রে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ। (ঐতরেয় উপঃ ৫।৩)

এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-জনিত ত্রিবিধ প্রজ্ঞা দ্বারা উত্তম যোগ লাভ হয়। শাস্ত্রে আছে,—

"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাস রসেন চ।
ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥

এই আগম=শ্রবণ, অনুমান=মনন, এবং ধ্যানাভ্যাস-রস=নিদিধ্যাসন। শ্রবণ ও মনন-জনিত প্রজ্ঞা সাধারণ কিন্তু নিদিধ্যাসন-জনিত প্রজ্ঞা—বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা অসাধারণ। ধ্যানাভ্যাস-রস দ্বারা এই অসাধারণ প্রজ্ঞা হয়। পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে,—

শ্রুত্যনুমান প্রজ্ঞাভ্যাসন্য বিষয় বিশেষার্থত্বাৎ।
(পাতঞ্জল দর্শন, ১।৪।

অর্থাৎ অশুদ্ধি রূপ আবরণ মলাবিহীন প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বের যে রজস্তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত স্বচ্ছরূপে স্থিতি প্রবাহ অবস্থায় যে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়—যাহাতে অধ্যাত্ম-প্রসাদ হয় ও প্রজ্ঞালোক প্রস্ফুটিত হয়, "তখনই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা লাভ হয়" (পাতঞ্জল দর্শন, ১।৪৮ ব্যাসভাষ্য)। সেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা, শ্রুতি ও অনুমানজনিত প্রজ্ঞা হইতে ভিন্ন। তাহাতে বিশেষ অর্থ প্রকাশিত হয়।

ইহার ভাষ্যে ব্যাস বলিয়াছেন যে, যাহা শ্রুত আগম বিজ্ঞান, তাহা সামান্য বিষয়ক। অর্থাৎ তাহাতে সামান্যের জ্ঞান হয় মাত্র। সে জ্ঞান ভাসা ভাসা, বাহ্য, উপর-উপর। অনুমান বা মনন সম্বন্ধেও সেই কথা। অনুমানও সামান্য বিষয়ক। যেখানে প্রাপ্তি আছে, অর্থাৎ দেশান্তর সংযোগ আছে, সেখানে অনুমানের শক্তি আছে, আর যেখানে সে প্রাপ্তি নাই, সেখানে

অনুমান যাইতে পারে না। অনুমান দ্বারা সামান্যরূপেই উপসংহার বা সাধ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। অতএব কোন একটী বিশেষ শ্রুত বা অনুমান জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। আরও সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট বস্তুরও লোক্য প্রত্যক্ষ দ্বারা গ্রাহ্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া যে এই ‘বিশেষ’ অপ্রামাণিক—সুতরাং নাই, ইহাও বলা যায় না। যাহা লোকে প্রত্যক্ষ শব্দপ্রমাণ বা অনুমানের বিষয় হইতে পারে না, এজন্য সেই ‘বিশেষ’ যে নাই, তাহা কখন বলা যায় না। ভূতসূক্ষ্ম বা পুরুষ বা অন্য বস্তুর যাহা বিশেষ, যাহা এই সমাধি প্রজ্ঞা বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। এই ঋতম্ভরা সমাধিই ‘বিশেষার্থ প্রকাশক। শ্রুতি ও অনুমানজ প্রজ্ঞা হইতে এইজন্য এই সমাধিজ প্রজ্ঞার বিশেষত্ব। ইহাই এক মহাযোগজ প্রজ্ঞা। বৌদ্ধদর্শনে ইহাই বোধি।

পাতঞ্জল দর্শনে আরও উক্ত হইয়াছে যে, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি—এই তিনকে একত্র সংযম বলে (পাতঞ্জল সূত্র ৩।৪)। যখন এই সংযম সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়, তখন প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশ হয়।

“তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।” (পাতঞ্জল সূত্র, ৩।৫), ব্যাস ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, “যত্র যত্র সংযমঃ স্থিরপদো ভবতি তথা তথা সমাধিপ্রজ্ঞা বিশারদী ভবতি।” অর্থাৎ যেখানে যেখানে বা যে বস্তুতে সমাধি প্রজ্ঞা স্থির হয়, সেইখানে সমাধিজ প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশ হইয়া, তাহার সূক্ষ্ম ব্যবহিত অর্থ, তাহার বিশেষত্ব প্রকাশিত করে। যে ভূমিতে বা যে বস্তুতে তাহার বিনিয়োগ হয়, সেই সম্বন্ধেই প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয় (তত্র ভূমিষ বিনিয়োগঃ”—পাতঞ্জল-দর্শন, ৩।৬) তাহার বিশেষার্থ তাহার ভিতরের তত্ত্ব তখন প্রকাশিত হয়। *
গীতাতে উক্ত হইয়াছে,—

> “জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মানঃ।
> তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥”
>
> (গীতা ৫।১৬)

---

* আমরা এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি যে, আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে তত্ত্ব দর্শনের এই পন্থা (method) কতকটা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ফরাসি দার্শনিক পণ্ডিত বার্গসোঁ এবং জর্ম্মান্ দার্শনিক পণ্ডিত অয়েকেনই প্রধান। বার্গসোঁ এই তত্ত্ব দর্শনের— বস্তুর বিশেষার্থ জ্ঞান লাভের উপায়কে Intuition বা Direct vision বলিয়াছেন। লি, রয় তাঁহার লিখিত বার্গসোঁর এই নূতন দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

“To return to the direct view of things beyond all figurative symbols to descend into the inmost depth of being, to watch the throbbing life in its pure state, and listen to the secret rhythm of its inmost breath, to measure it at least so far as measurement is possible, has always been the philosopher's ambition =(N. 12)

বার্গসোঁ স্বয়ং তাঁহার Creative Evolution নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,—

‘What we ordinarily call fact is not reality such as it would appear to an immediate intuition, but an adaptation of reality to practical interests and the demands of social life.” (p. 32)

বার্গসোঁর মতে আমরা সাধারণ বুদ্ধি (intellect) দ্বারা (সাধারণ প্রমাণ বৃত্তি দ্বারা) যে বস্তুতত্ত্ব জানিতে পারি, তাহা

প্রকৃত নহে। কেবল অন্তরের আলোক (Intuition) দ্বারাই তাহা বিশেষ ভাবে জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন,—

"Intuition and intellect represent two opposite directions of the work of consciousness. Intuition goes in the very direction of life. Intellect in the opposite direction * * * Intellect is characterised by a nataral inability to know life. Instinct is sympathy, and turned towards life."

বার্গসোঁ এ স্থলে যে Instinctএর কথা বলিয়াছেন—যাহার মধ্যে sympathy নিহিত, তাহাই ইঁহার মতে Intuitionএর মূল।

এই যে Intuition—ইহা এক অর্থে প্রজ্ঞালোক। ইহাই direct vision, বা illumination; ইহার কথা ব্যাখ্যাভূমিকায় উক্ত হইয়াছে। ইহাকে জর্মাণ পণ্ডিত সপেনহর stand point of pure contemplation বলিয়াছেন। লি, রয় বলিয়াছেন—

"The attempt at return to the standpoint of pure contemplation and disinterested experience (অর্থাৎ রজস্তম মলাহীন বৃত্তিজ্ঞান) is a taste very different from the taste of science." (p. 19)

কিরূপে এই বিজ্ঞান—এই standpoint of purer contemplation, এই Immediate knowledge অথবা pure intuition লাভ হইতে পারে? যে যোগ সাধনা দ্বারা, এই চিত্তবৃত্তির সংযম দ্বারা ইহা লাভ হইতে পারে বা এই প্রজ্ঞালোক উৎপন্ন হয়, তাহা পাশ্চাত্য দর্শনে কোথাও বিবৃত হয় নাই। লি, রায় বলিয়াছেন,—

"The act of pure intuition demands so great an inner tension from thought, that it can only be very rare and very fugitive; a few rapid gleams here and there and these dawning glimpses must be sustained, and afterwards united.

Vide Bergson's new philosophy p. 38.)

লি, রয় আরও বলিয়াছেন,—

"Absolute revelation is only given to the man who passes into the object, flings himself upon its stream, and lives within its rhythm. * * The philosopher must listen in a manner to their inward breathing, and above all supply the effort of sympathy by which he establishes himself in the object, becames an intimate terms with it, terms himself to its rhythm and in a manner lives it."

(Ditto p. 41·42)

আমাদের আত্ম ও ঈশ্বরতত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা হইবে।

"Who has the absolute knowledge? Religion, he who analyses it in psychology, sociology, history and metaphysics. Or he who from within by a living experience,

---

অর্থাৎ চিত্তের অজ্ঞান বা রজস্তম মলা নষ্ট হইলে, তবে এই প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়। গীতায় আরও উপদিষ্ট হইয়াছে যে, ধ্যানযোগেই এই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধ্যানযোগে বা পুনঃপুনঃ যত্ন বা অভ্যাস দ্বারা ধ্যান-সিদ্ধিতে যে প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয়, তাহার কারণ, এই ধ্যান, যাহা ধ্যান ধারণা ও সমাধি, ইহার সাধারণ নাম, যাহা সাধারণ ভাবে সংযমেরই নামান্তর, তাহা দ্বারা চিত্তে বিশেষ ভাবের বা রসের অভিব্যক্তি হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক উক্ত হইয়াছে "ধ্যানাভ্যাস রসেন"। এই রসের দ্বারা চিত্ত আপ্লুত হয়, তন্ময়তা লাভ

হয়। তখন সেই ভাবে ভাবিত হইয়া সেই যোগী যেন সেই ধ্যেয় বস্তুর সহিত তন্ময় হইয়া যায়, একীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থায় সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হয়, তাহার সহিত আত্মার ভেদ বা ব্যবধান যেন দূর হইয়া যায়—সর্ব্বত্র সমদর্শন হয়। গীতাতে উক্ত হইয়া'ছ,—

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতি ॥

(গতা ৪।৭)

ক্রমশঃ

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

পত্রাবলী। (২)

পত্র নং ৫

ক্ষীরোদ বাবু,—

আপনার ডাকের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি, অদ্য ডাক্তার বাবু আসিয়াছিলেন, তাঁহার পত্রও পাইয়াছি।

গত দুই সপ্তাহ বঙ্গবাসীর সম্পূর্ণ ভার জ্ঞানেন্দ্র বাবুর উপর ছিল। আমি আফিসের কাজে ব্যস্ত ছিলাম ;—অনেক কাজ বেহুরস্ত হইয়াছিল। বিশেষ গ্রাহকদিগকে তাগাদা করা হয় নাই। সেই জন্য সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ

participates in its essence and holds communion with its duration.

Ditto p. 48.

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই, বার্গসোঁর মতে, "To journey towards living intuition—is the philosopher's taste...metaphysical intuition creates" light and truth on all mental planes" ইহাই এক অর্থে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞালোক। কিরূপে ইহা লাভ হয় তাহা এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনে কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই।

এস্থলে এই পাদটীকায় আমরা আরও একটী কথা উল্লেখ করিব। নিদিধ্যাসন দ্বারা বা ধ্যান ধারণা ও সমাধি রূপ সংযম জয়ে যে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা লোক প্রকাশ হয়, সেই প্রজ্ঞানই প্রকৃত বা অপরোক্ষ জ্ঞান—আন্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এ জন্য তাহা বিশেষার্থ প্রকাশক। বার্গসোঁ তাহাও বলিয়াছেন। তাঁহার theory of perception স্বতন্ত্র, সে সম্বন্ধে লি-রায় বলিয়াছেন,—

"If the act of perceiving realises the living communion of the subject and object and the image, we must admit that even we have the perfect knowledge which we wish to obtain always. We resign ourselves to conception only for want of perception and our idleal is to convert all conception into perception. Doubtless we might define philosophw by this same ideal, as an effort to expand our perceptive power, untre we render it capable of grasping all the wealth and all the depth of reality at a single glance."

New philosoohy. N. 157.

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

Kant has constantlv established that what lies beyond language can-only be attained and by direct vision. not by dialectic progress. His mistake was that he afterwards believed snch a vision for ever impossible. Ditto p. 156.

এই যোগ দৃষ্টির কথা ব্যাখ্যা ভূমিকায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছিল। এজন্য এস্থলে তাহা বিবৃত হইল।

করিয়া আফিসের কাজে মগ্ন ছিলাম। অপরাধ লইবেন না।

এইবার হইতে বঙ্গবাসী আর খারাপ হইবে না। খরচ পত্র বড় অধিক হইতেছে;—ব্যয় সংক্ষেপের কোন উপায় দেখিতেছি না। আপনাকে খরচের হিসাব শীঘ্র পাঠাইব যদি কোন গতিকে আপনি সদুপদেশ দিতে পারেন, তবেই রক্ষা আছে।

যেরূপ চারিদিকে শুনিতেছি, বঙ্গবাসী কিছু যশোলাভ করিয়াছে। কিন্তু অনেকের চক্ষু টাটাইয়াছে। অক্ষয়বাবু বলিয়াছেন, বঙ্গবাসীর “অমৃতবাজারত্ব” দোষ ঘটিয়াছে, অর্থাৎ জাল নামে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইতেছে; এরূপ কথা তিনি কোন লোকের নিকট Confidentially বলিয়াছেন। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন, “বঙ্গবাসী স্থায়ী হইবে না, দুদিন বাড়াবাড়ি হইয়া শেষে লোপ পাইবে। আমার “আর্য্যদর্শন”এরও একদিন তিন হাজার গ্রাহক হইয়াছিল” এরূপ ধরণের কথা আরও ২।১ জন বলিয়াছেন। আমি দেখিতেছি, অনেকে নানারূপে বঙ্গবাসীর নিন্দা করিতেছেন, এবং কিসে বঙ্গবাসীর প্রভুত্ব কমে, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। আপনি আমাকে সাহস দিবেন এবং আশীর্ব্বাদ করিবেন। লোকের মুখে চুণকালী দিতে না পারিলে আর কিছুতেই সুখ নাই। অক্ষয় বাবুর কথায় আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি।

দ্বারিক বাবু লবণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—প্রবন্ধ দুটী বেশ হইয়াছে। রজনী গুপ্ত “প্রাপ্ত” স্তম্ভের প্রবন্ধটী লিখেন। রমণীরত্ন আমি লিখি। আমি দেখিলাম, কাগজটী বড়ই কট্‌কটে হইয়া উঠিয়াছে—বুধবার রাত্রি তিনটার পর তাগাদা পত্র লেখা বন্ধ করিয়া অতিশয় তাড়াতাড়িতে ঐটী লিখি,—আমি সে সময় বড় ক্লান্ত ছিলাম, মন স্থির ছিল না। সুতরাং প্রবন্ধটী ভাল হয় নাই। পূর্ব্বে লিখিতে হইবে জানিলে পূর্ব্বে ভাবিয়া রাখিতাম। রাত্রি ১১টার পর জ্ঞানেন্দ্র বাবু আমাকে বলেন, এবার একটু রসিকতা চাই।

গ্রাহক খুব বাড়িতেছে; এই সপ্তাহে নামের রেজেষ্ট্রিতে ১৯০০ শত নম্বর পড়িবে। এখন সাড়ে তিন হাজার ছাপাইলে বেশ চলে, কিন্তু পাইকারদের উপর বড় কড়াকড় করিয়াছি। প্রায় ২৭০ শত কাগজ বন্ধ করিয়া দিয়াছি। কাগজ বন্ধ করায় পাইকেররা এখন টাকা পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু মার্চ্চ মাস গেলে তিন হাজারের বেশী ছাপাইব না। ২৪শে মার্চ ডাক ঘরে প্রায় ৪০০৲ শত টাকা advance দিতে হইবে, আর ৫০০ শত কাগজ ছাপাইলে প্রায় ৬০০৲ শত টাকা দিতে হইবে তাই একটু হাত কম করিয়াছি। Specimen copies এবার হইতে বন্ধ করিয়াছি। Specimenএর দরুণ প্রায় ৩০টী গ্রাহক হইয়াছে,—বাকী ৭০ জনকে গ্রাহক হইবার জন্য পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু আর কাগজ যোগাইতে পারিলাম না, কারণ কাগজ অকুলান পড়িতেছে।

অংশের বিষয় আপনার সহিত দেখা হইলেই সকল বিষয়ে সমাধা হইবে। অক্ষয় বাবু মাসে ২০০৲ টাকা পাইলে সম্পাদক হইবেন; সাধারণীয় নাম অগ্রে থাকিবে, নচেৎ নহে। আমি জবাব দিয়াছি। আর্য্যদর্শনে বঙ্গবাসীর ভাষার সমালোচনায় লিখিয়াছেন, বঙ্গবাসীর সকল প্রবন্ধ মার্জ্জিত নহে। দারুণ হিংসা।

আমার ও জ্ঞানেন্দ্র বাবুর Grand scheme এই ;—বঙ্গবাসীর ৫০০০ subscriber হইলেই ৫০০০ অংশীদার Call করা যাইবে। মূলধন 50,000 Rupees ; তখন be-weekly হখবে, Tri-weeklyও হইতে পারে। প্রতি অংশের মূল্য ১০৲ টাকা। এক বৎসরে ক্রমে টাকা দিতে হইবে। ৫০,০০০৲ টাকা পাইলে ভাল লেখক, পৃথিবীর স্থানে স্থানে সংবাদদাতা রাখা যাইবে। বড় বড় অফিসিয়ালদিগকে টাকা দিয়া গভর্ণমেণ্টের গুহ্য খবর পাওয়া যাইবে। যুদ্ধ বাধিলে Special correspondent পাঠান যাইবে। এই সকল বিষয়ে কিন্তু আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে পত্রে বিশেষ যুক্তি করিয়া লেখা যায় না, এবং সকল বিষয় খুলিয়াও লেখা যায় না। ফলকথা, বঙ্গবাসীকে thunder and mighty power করিতে হইবে। ইতি - শ্রীযোগেন্দ্র।

পুঃ—আপনার সঙ্গে দেখা কবে হইবে ? তাহার সম্বাদ লিখিবেন।

পত্র নং ৬

ক্ষীরোদ বাবু,—

এবারের বঙ্গবাসীতে আমি সন্তুষ্ট নই। ভাল article নাই। সংবাদও বেশী করিতে পারি নাই। অনেক লেখা সংবাদ স্থানাভাবে পড়িয়া রহিল। তবে paragraph গুলি মন্দ হয় নাই। সপ্লীমেণ্ট কেমন হইয়াছে ? দুই জন বিজ্ঞাপন দিতে আসিয়াছিল, কিন্তু আপনার হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছি, আর তাহাদের নিকট লোক পাঠাইয়া বিজ্ঞাপন আনাইতে অপমান বোধ হইতেছে। ডিক্সনারীর বিজ্ঞাপন দরুণ ১০৷৷০ টাকা পাওয়া যাইবে। সপ্লীমেণ্টে এবার ৬৲ টাকা ঘর হইতে গুণান দিতে হইবে। সংবাদ কম হইয়াছে বলিয়া আপনি রাগ করিতে পারেন ; কিন্তু আমি মঙ্গল বুধবার পর্য্যন্ত অঘোরে ছিলাম ; সেই জন্য সকল বিষয় ঠাওরাইতে পারি নাই। আগামী বারে নিশ্চয় বেশী সংবাদ দিব।

আপনার ৩০৲ টাকা পৌঁছিয়াছে। কাপড় পূর্ণ বাবু কাচিতে দিয়াছেন। কাচিয়া আসিলে পাঠাইব। “বুদ্ধ” সোমবার পাঠাইব ; এসিয়াটিক সোসাইটি যাদুঘরের কাছে নয় ? আপনার ইতিহাসের একটী ফর্ম্মা প্রায় দিয়াছে। আমি কারেক্‌শন করিয়া পাঠাইয়াছি। সোমবারে সেই প্রুফ আপনার নিকটে পুনরায় পাঠাইব।

জ্ঞানেন্দ্র বাবুর কথা—জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে বঙ্গবাসী মাসে ৩০৲ টাকা দিতে পারেন, তবে একটু কষ্ট হয়। ২৫৲ টাকা হইলে ভাল হয়। থাকিবার স্থান ও আহার দিতে পারে। বঙ্গবাসা জ্ঞানেন্দ্রকে এ সম্বন্ধে সকলই দিতে পারে, তবে একটী কথা আছে। বাঙ্গালা কাগজের কাজে খাটিতে হয় ; বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদক বা চালকের বাবুগিরি করিবার সময় এখনও আসে নাই। আমি সম্পাদক—আমি কেবল তিল্যানি সাহেবের মত অপরের লেখা সংশোধন করিব—নিজে একছত্রও লিখিব না—সেরূপ কাল উপস্থিত হয় নাই। অথবা আমি সম্পাদক একটা আর্টিকেল বা দুটী প্যারাগ্রাফ লিখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম; আর কিছুই দেখিব না, এরূপ করিলে বাঙ্গালা কাগজ চলে না। বাঙ্গালা কাগজ এখন শিশু—সম্পাদককে ছেলে মানুষ করার মত কাজ করিতে হইবে। জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে ম্যানেজমেণ্ট সম্বন্ধে কিছুই দেখিতে হইবে না, কেবল

কাগজ সম্বন্ধে সবই দেখিতে হইবে। অর্থাৎ আমি যেরূপ দেখি, সেইরূপ কাজ করিতে হইবে। (বাদ তহবিলরাখা এবং কখন কখন ম্যানেজ করা)। সকল কথা খুলিয়া বলা ভাল বলিয়াই এত লিখিলাম। মনে করুন, একদিন আমি কিছু লিখিতে পারিলাম না। কোন লেখক কিছু পাঠাইবেন না, আপনিও কিছু পাঠাইতে পারিলেন না; তখন জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে সকল কাজই করিতে হইবে। আপনার মত, ঘরের মত সকল কাজ দেখিতে ও করিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা, জ্ঞানেন্দ্র বাবু আমার চেয়ে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বটেন, কিন্তু কোন আর্টিকেল বা প্যারাগ্রাফ যদি আমার পছন্দ না হয়, অথচ জ্ঞানেন্দ্র বাবুর যদি পছন্দ হয়, তবে আমারই মত বজায় থাকা চাই; এ স্বাধীনতাটুকু আমার থাকা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, জ্ঞানেন্দ্র বাবুর সহিত আমার মতের অমিল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তবে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এ কথা লিখিলাম

তৃতীয় কথা, জ্ঞানেন্দ্র বাবু যদি বঙ্গবাসীর কিছু অংশ খরিদ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। না করিলেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি বা আপত্তি নাই।

৪র্থতঃ অন্ততঃ একবৎসর আমাদের কার্য্যে জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে থাকা চাই। ওকালতী করুন, কিছুই তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। যদি আমাদের কোন দোষ ঘটে, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু বিনা দোষে নিজের সুবিধা বা স্বার্থের জন্য একবৎসর ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

৫মতঃ জ্ঞানেন্দ্রবাবু কেমন লোক; দেখিতে হইবে। শ্যামবাবুর নিকট শুনিয়াছি খুব ভাল লোক; আমার সহিত একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাতে ভাল লোক বলিয়াই বোধ হইয়াছে। কিন্তু কাহারও সহিত ব্যবহার না চলিলে কেমন লোক, বুঝা শক্ত। সে বিবেচনার ভার আপনার উপর রহিল। নিতান্ত গরজে, অহঙ্কারী, বা 'সবজান্তা' এবং বাবু-লোক লইয়া ব্যবসা চলে না। আমার বিশ্বাস, জ্ঞানেন্দ্রবাবু লোক ভাল,—আপনি তাহা প্রতিপোষণ করেন কিনা?

শেষ কথা:—জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে আমরা খুব যত্নের সহিত রাখিব। থাকিবার স্থান ভাল দিব; যাহাতে আহারাদির কষ্ট না হয়, এমন করিব। তবে ঘর করিতে গেলে সকল বিষয়েরই ভালমন্দ আছে। আপনার ঘরে যেমন থাকেন, সেইরূপই থাকিবেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয়কে আপনার জিনিষ, নিজের ঘর মনে করিতে হইবে। আমাদিগকে উপদেশ দিবেন; সময় বিশেষে ভর্ৎসনা করিবেন। আমাদিগকে ছোট ভায়ের মত দেখিবেন, আমরা যদি কোন দোষ করি, তবে মার্জ্জনা করিতে হইবে।

এইসব কথাগুলি আপনি বেশ করিয়া বুঝিয়া, যদি জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে বলা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, বলিবেন। আমি জানি, জ্ঞানেন্দ্রবাবুর ন্যায় লোকের সাহায্য পাইলে, বঙ্গবাসীর সমধিক উন্নতির সম্ভাবনা। যাহাতে তাঁহার আসা হয়, চেষ্টা করিবেন।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু থাকিলে আমি প্রেস ম্যানেজ করিতে পারিব। আমি ছাপাখানার কাজ কিছু কিছু জানি, কিন্তু পরিপক্ক নহি।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু আসিলে ব্যয় কমাইব কিরূপে? সেরাস্তার কাজ রোজ রোজ বাড়িতেছে। পূর্ণ এবং উপীন ছাড়া আর একটী পাকা ভাল মুহুরী চাই। দু'জনে

সমস্ত দিনরাত খাটে, তথাচ কাজের শেষ নাই। বাড়ী ভাড়া ২৫।৩০৲ টাকার মধ্যে পড়িবে,—ফেব্রুয়ারী মাসে এ বাসায় থাকিব।

ছাপাখানার বিষয় শশীর সহিত যুক্তি করিয়াছি। শশীবাবু আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন। ফর্দ্দ ধরা গেল। সবশুদ্ধ ১৩২০৲ টাকা। অর্থাৎ প্রায় ১৫০০৲ টাকা খরচ পড়িবে। সুপার-রয়েল প্রেস হইবে। সব রকমে মাসে ৭৫৲ টাকা খরচ পড়িবে। ভাল ম্যানেজার রাখিতে হইলে আরও ২৫৲ টাকা পড়িবে, বলিলেন। কিন্তু প্রেস খুলিতে এখনও তিনমাস বিলম্ব আছে। সুপার-রয়েল প্রেসটীর দাম ৫৫০৲ টাকা পড়িবে। আপাততঃ ৫০৲ টাকা দিয়া আটক রাখিব। অধরের জন্যই ৩ মাস দেরী হইল। ৩ মণ স্মলপাইকা ও ২ মণ বর্জ্জাইসের ফরমাস্ দিব। সোমবারে শশীর আফিসে গিয়া এ সব কথা শেষ করিব। শনিবার বৈকালে তাঁহার আফিসে যাইবার কথা ছিল, বোধ হয় অধরও আসিয়াছিল, কিন্তু যাইতে পারি নাই। যাহা হউক, সোমবারে New mencantile প্রেসে অধরকে আনাইয়া ৫০৲ টাকা বায়না দিব। শশীর কথায় সুপার-রয়েল প্রেস খরিদ করিতেছি। বোধ হয় শশীর দ্বারা ৫০৲ টাকা প্রেসের জন্য দিলে আমাদের ক্ষতি নাই। শশীর জন্য যে 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধ পাঠাইলাম, বলিলেন, তাহা আমি পাই নাই। শীঘ্র পাঠাইবেন। শশীকে দিব। আর বারের ন্যায় এবারে আপনি কিছু বেশী লেখা পাঠাইবেন। Paragraph ও news বুধবার পর্য্যন্ত পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ মঙ্গলবার দশ টার মধ্যে আমার নিকট পৌঁছান চাই। এবারে উপীন এখানে নাই। মকর্দ্দমার জন্য হুগলীতে গিয়াছে। আমাকে management দেখিতে হইবে, এবং ছাপাখানার জন্য সোম, মঙ্গল দুইদিন ঘুরিতে হইবে, তাই বলিতেছি, কিছু বেশী লেখা পাঠাইবেন।

গতকল্য সেজদাদার সায়েজ বন্দর হইতে এক চিঠি পাইয়াছি। সায়েজ কোথায়?

রামতারণ দাদা আবার আমাদের বাসায় জুটিয়াছে; একদিন কান্নাকাটী করিয়া আমাদের বাসায় আসেন. আজকাল কাজকর্ম্ম মন্দ করিতেছে না। কিন্তু উহাকে আমার বাসায় রাখা একেবারেই ইচ্ছা নাই। চক্ষুলজ্জাবশতঃ আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না।—অপরাপর বিষয় লেখার পর আপনি এইভাবে আমাকে একটু লিখিবেন—"রামতারণের বিষয় যাহা লিখিয়াছ, তাহা সকলই সত্য; কিন্তু বাসায় উপীন, পূর্ণ এবং তুমি ছাড়া আর কাহাকেও রাখা হইবে না।—সুতরাং তাহাকে তোমাদের বাসায় রাখিবে না। তিনি মহুরির কাজ করিতেছেন, লিখিয়াছ; যদি তিনি এ কাজে উপযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার মাহিনা বরাদ্দ করিয়া দিবে। বাসায় রাখিবে না। মাহিনা ৬।৭ টাকার বেশী যেন না হয়।"

পুনশ্চ—বঙ্গবাসী এবার ৭৫ খানি মজুদ আছে। কলিকাতায় এবার লোক অভাবে ভাল কাটে নাই, তাই মজুদ আছে। গ্রাহক ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে। শ্রীযো।

সোমবার বেলা ১০টা—

এই মাত্র প্রবন্ধ, Paragraph and news পাইলাম। প্রবন্ধটী ভাল কিন্তু অতিশয় বৃহৎ, একবারে সবটা যাইবে না। সমুদায় প্রায় ৫ কলম হইবে। কাহার লেখা? জ্ঞানেন্দ্র বাবুর কি? একটী Political ছোট

অথচ ভাল আর্টিকেল হইলে ভাল হয়। সাংখ্য পাইলাম। শ্রীযো—

পত্র নং ৭

ক্ষীরোদবাবু।

বাবা ভাল আছেন—আর কোন আশঙ্কা নাই। Nature থ্যাকেরের বাড়ীতে পাওয়া যাইবে না—আমি অগ্রিম মূল্য ১১৲ টাকা দিয়া আসিয়াছি। মার্চমাস হইতে পাইবেন। রসিদখানি আপনার নিকটে পাঠাইতে বলিবেন। আজ আর একটী Proof দিয়াছে। ষ্টেট্‌সম্যান এবং মিরারে বঙ্গবাসীর বিজ্ঞাপন দিয়াছি। এবারে ৩০০০ কাগজে টানাটানি পড়িয়াছে; আরও ১০০ শত হইলে হইত। Education Commission সম্বন্ধে যেন সোমবার একটা প্রবন্ধ পাই। এবারে বঙ্গবাসীকে খুব তেজবান করিতে হইবে। মফস্বলে খুব গ্রাহক বৃদ্ধি হইতেছে। আপনি দেখিবেন। আপনার চেষ্টাই মূল।

উপীন এখনও আসে নাই। পূর্ণ আজ পথ্য করিয়াছে। কৃষ্ণনগরের পত্র আপনার নিকট পাঠাইব। জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে কল্য পত্র একখানি লিখিয়াছি, ষ্টেট্‌সম্যান ইয়ারবুক (৮২ সালের) পাই নাই।

ছাপাখানার জন্য শশীর আজ আসিবার কথা ছিল। এইমাত্র শশীর পত্র পাইলাম; সে আজ আসিতে পারিবে না। সোমবার আমাকে যাইতে বলিয়াছে। অধর উপস্থিত থাকিবে।

রজনীর সহিত কল্য সাক্ষাৎ করিব। ইংরেজ ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা গোপালকৃষ্ণের লেখা। প্রতাপসিংহ শেষ করা উচিত, কিন্তু আর একটী প্রবন্ধে শেষ করিব।

আপনার লেখা কিছুতেই প্রকাশ হইবে না। উপীনও জানে না, কাহার কোন্‌টী লেখা। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে গোল করিয়া সারি। যিনি সাংখ্য "প্রবন্ধ" লিখিয়াছেন, তাঁহাকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছি যে, আমাদের জ্ঞানাঙ্কুর কাগজে উহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার অভিমত আসিলেই শশীকে প্রবন্ধ দিব। শশী প্রবন্ধ দেখিয়া approve করিয়াছেন। আর বেশী লিখিবার সময় নাই, তবে পাইবে না।

শ্রীযোগেন্দ্র।

বিল্ উপীন আসিলেই পাঠাইব। এত দিনের পর আমরা London Times পাইয়াছি।

আর একটী কথা আমাদের অনেকে সাবেক বাসায় (২৪ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট) যাইতে ইচ্ছা করিয়াছে। হরপ্রসাদ, শশী প্রভৃতি ২১৲ টাকা ভাড়া দিবে, এবং আমরা ২১৲ টাকা দিব। নীচে প্রেস হইবে। উপরের একটী কুঠুরী আমরা লইব। কিন্তু আমার এ বন্দোবস্তে মত নাই—বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে কাহারও সঙ্গে (মেসে) থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনার মত কি, সব বুঝিয়া বলিবেন।

বিলাতী প্রবন্ধের ও সংবাদের জন্য অনেকে লিখিতেছে, আপনার নিকট নেচার পৌঁছিলে, সে অভাব পূর্ণ হইবে। কিন্তু আজকালের জন্য অন্য উপায় কি?

আপনার সম্বন্ধে হিঃ উপীন আসিলে পাঠাইব। বোধ হয় আমাদের আর ২।৪৲ টাকা পাওনা আছে। শ্রীযো—

পত্র নং ৮

ক্ষীরোদ বাবু, আপনি সে দিন এখান হইতে রওনা হয়েন, সে দিন রাত্রে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবার আশা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটে নাই। আমি আপনাকে শেষ কথা

বলিতে পারি নাই—"দেখিবেন, বঙ্গবাসী আপনার রহিল, লোকে যেন বঙ্গবাসীর অখ্যাতি না করে।"

অন্য Paragraph, news, Article পাইয়াছি। এবারে কোন দিন কয়খানা বঙ্গবাসী কৃষ্ণনগরে পৌঁছিয়াছিল, লিখিবেন। বিক্রয় কেমন হইতেছে?

এখানে ডাকযোগে অনবরত গ্রাহক বৃদ্ধি হইতেছে। কলিকাতায় ৫৫০ খানা বিক্রি হইয়াছে। দেড়শত কাগজ মজুত থাকিবে, বোধ হইতেছে। প্রেস করা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। বিজ্ঞাপন আসিতেছে। কিন্তু বঙ্গবাসীর ২।৩ কলম বা ৪ কলম বিজ্ঞাপন দিলে গ্রাহকগণ চটিবে। একটি ক্রোড়পত্র বাহির করিতে হইবে। যেরূপ গতিক দেখিতেছি—বিজ্ঞাপনে ক্রোড় পত্রের খরচ উঠিয়া বেশ লাভ থাকিবে।

এক্ষণে ছাপাওয়ালাকে সপ্তাহে ২৪৲ টাকা দিতে হইতেছে। ক্রোড় পত্র ছাপিলে আরও ১০৲ টাকা, এক্ষণে ৩৪৲ টাকা দিতে হইবে। হাজার টাকার প্রেস হইবে। অর্থাৎ ৭।৮ মাসের ছাপাখানার খরচে প্রেস হইবে, সুতরাং প্রেস করা সর্ব্বাগ্রে বিধেয়।

যদি আমরা প্রেস করি, আপনি তাহাতে কিছু টাকা দিবেন কিনা? এবং বঙ্গবাসীতে কিছু টাকা দিবেন কিনা? আমার নিতান্ত মানস সে ছাপাখানায় ও কাগজে আপনার সত্ত্ব থাকে। শ্রীমতী অলকার নামে টাকা জমা দিবেন, অন্যমত করিবেন না।

আমার স্বাস্থ্য বড় ভাল নহে। উপীন এখানে নাই, ৪ দিন হইল মকদ্দমার জন্য বাড়ী গিয়াছেন। পূর্ণ ও আমি আছি। ভয়ানক মেহনত হইতেছে।

ছাপাখানার জন্য এই কারণে এখনও চেষ্টা করিতে সময় পাই নাই। হাজার টাকার মধ্যে প্রায় ৬০০৲ টাকা যোগাড় করিয়াছি। বাকী শীঘ্রই যোগাড় করিব। টাকার জন্য ছাপাখানা বন্ধ থাকিবে না। কিন্তু একটী ভাল ম্যানেজার চাহি, তাহার কি?

G. P. Ray বড় গোল করিতেছে, ৪ দিন হইল আধ ফর্ম্মা প্রুফ দিয়াছিল। আমি তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিয়াছি, তার পর দেয় নাই। অন্য লোক পাঠাইয়া তাহার নিকট হইতে বহুকষ্টে ১ ফর্ম্মা প্রুফ আনিয়াছি আপনি কৃষ্ণনগর হইতে একটু ধমক দিয়া পত্র লিখিবেন।

এবারে আর কিছু লেখা পাঠাইবেন নাকি? অলকা, পুত্র ও আপনি কেমন আছেন, লিখিবেন। শ্রীযো—

পত্র নং ৯।

ক্ষীরোদ বাবু, গত কল্য একখানি পত্র লিখিয়াছি, বোধ হয় পাইয়া থাকিবেন।

এখানকার সংবাদ, উপীন এখনও আইসে নাই। কোন পত্রও পাই নাই। শুনিলাম, মকর্দ্দমা শেষ হয় নাই। সঙ্গীন মকর্দ্দমা, উভয় পক্ষে ৭০।৮০ জন সাক্ষী, পূর্ণর পুনরায় অল্প অল্প জ্বর হইতেছে। মোটেই কাজ করিতে পারে না এবং আমিও কাজ করিতে দিই না। সুবিধার মধ্যে বাবা ভাল আছেন—আজ রুটি খাইয়াছেন, আমার ও শশীর মন ভাল আছে।

আপনি নিরাশ হইবেন না; আমাদের দ্বারাই বাঙ্গালা কাগজের উন্নতি হইবে, দেশে ক্ষমতাস্বরূপ হইবে। আমার শরীর মন ভাল থাকিলে আমি কিছুতেই ডরাই না—একা ম্যানেজ করিতে এবং কাগজ চালাইতে পারি। আপনি আমাকে ভরসা

দিবেন, এবং যেরূপ সাহায্য করিতেছেন, সেরূপ করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, এক বৎসরের মধ্যে বঙ্গবাসী বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় কাগজ হইয়া দাঁড়াইবে।

এবার আপনার সাহায্য না পাইলে বঙ্গবাসী ফেল্ হইত; পিতার ব্যায়ারাম দেখিয়া আমার বুক ধরিয়া গিয়াছিল। শুক্রবার হইতে বাবার রোগ কমিতে আরম্ভ হয়, আমি একটু বল পাইয়া স্বয়ং রাত দিন খাটিয়া কাগজ ডাকে দি;—ব্যারাম বৃদ্ধি হইলে যথানিয়মে কাগজ ডাকে দিতে পারিতাম না। ক্ষীরোদ বাবু, আপনাকে আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করি, আপনাকে বলি, বাবার কোনরূপ ভালমন্দ হইলে বঙ্গবাসী বোধ হয় লোপ হইত। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। তাহাতেই ভরসা হইতেছে, বঙ্গবাসী বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় কাগজ হইবে।

ওসব কথা থাক্, আসল কথা এই, গত দুই সংখ্যা বঙ্গবাসী খারাপ হইয়াছে। এখন সুধরাইবার উপায় কি? "বাঙ্গালী ভাজ" প্রবন্ধটী মন্দ হয় নাই। কিন্তু ভাষা ভাল নহে, ভাষাটী যদি একটু মাজিয়া ঘষিয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রবন্ধটী সুন্দর হইত। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে নূতন কথা বিশেষ কিছুই নাই, তবে অভিজ্ঞ শিক্ষিত লোকের লেখা বলিয়া সাধারণে অনুমিত হইতে পারে। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের শেষ ভাগটী এবারে ছাপাইতে ইচ্ছা করি, আপনি কি বলেন? "কাংরা উপত্যকা" গোপালকৃষ্ণের লেখা—প্রবন্ধটী আমার ভাল লাগে নাই। বর্ণনায় সজীবতা নাই। আমার লিখিবার শক্তি থাকিলে প্রবন্ধটী কখনই অন্ততঃ এবার পত্রস্থ করিতাম না; অথবা যদি আপনার "মিশর তুরস্ক" প্রবন্ধটী অগ্রে আসিত, তাহা হইলে কাংরা উপত্যকা যাইত না। আপনার এ প্রবন্ধটী সুন্দর হইয়াছে, ভাষা সরল লেখার বাঁধুনি আছে। লোকে পড়িয়া বলিবে—বঙ্গবাসী ইউরোপীয় রাজনীতির সংবাদ রাখে। সেঙ্গদাদার পত্র কেমন হইতেছে? লোকে কি বলে? এবারে ৩ কলম সংবাদ দিবেন, ১॥ দেড় কলম সংবাদদাতার পত্র দিব। অনেক সংবাদদাতার পত্র জড় হইয়াছে। ননদ ভাজের একটী প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করি? আপনি কি বলেন? আমি স্বয়ং লিখিব। আপনার পত্রের উত্তর আসিলে লিখিব।

জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে এখনও পত্র লিখি নাই। কি লিখিব বলুন দেখি? গোড়া পাড়িয়া সকল কথা লিখিব কি? আপনি সে পত্র জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে দেখাইয়াছিলেন কি? আপনার এ পত্রের উত্তর না আসা পর্য্যন্তও জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিতে পারিতেছি না।

কোন ছুটি উপলক্ষে আপনি একবার কলিকাতায় আসিতে পারিবেন না কি? দুজনে যুক্তি পরামর্শ করিব। কিন্তু অলকাকে একলা রাখিয়া কিরূপে আসিবেন? বঙ্গবাসী একবৎসর মধ্যে ১০ হাজার কাটান চাই। কিন্তু তাহার যুক্তি সাক্ষাতে করিতে ইচ্ছা করি। যদি দশ হাজার কাটাইতে পারি, তবে আপনাকে পাপ দাসত্ব করিতে আর দিব না। আপনারও পেন্সন পাইতে আর কয় বৎসর বাকী আছে?

অধরের লোক আসিয়াছিল, শশীর আফিসে কল্য ১১টার সময় তাহাকে টাইপের বাইনা ১২৫৲ টাকা দিব। ৩ মণ স্মল পাইকা ও ২ মণ বর্জ্জাইসের অর্ডার

দিব। কোন মতেই বৈশাখ মাসের শেষ ব্যতীত টাইপ দিতে স্বীকার হয় না। কিন্তু কি করি, উপায় ত নাই। একটী সুপারয়েল প্রেস (পুরাতন) শশীর সন্ধানে আছে। শশী ৫০৲ টাকা দিয়া প্রেস আটক রাখিতে বলেন। কোন ক্ষতি আছে কি ?

সমালোচনার জন্য আপনার নিকট কয়েকখানি বই পাঠাইলাম। নভেল গুলির একটু একটু প্লট দিলে হয়। আগামী বারে সমালোচনা পাইলে ভাল হয়। গত দুই সংখ্যা বঙ্গবাসী দেখিয়া কৃষ্ণনগরের লোকে নিন্দা করিতেছে। কলিকাতায় ও বর্দ্ধমানে বঙ্গবাসীর বড় নিন্দা করে নাই। হুগলীতে একটু সুখ্যাতি কমিয়াছে। শ্রীমতী অলকাকে সভক্তি সম্ভাষণ জানাইবেন। তিনি এবং পুত্র কেমন আছে ? শ্রীযো—

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়।

পৃথিবীর উৎপত্তি

মানব প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান। মানবমনে যেদিন জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইয়াছে, সেই দিন হইতে জননীর স্বেচ্ছাদত্ত উপহারে আর তাহার তৃপ্তি নাই। গোপন ধনের আশায়, অনন্ত প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারের অশ্রান্ত মন্থনই হইয়াছে তখন হইতে তাহার প্রধান এবং প্রিয়তম কার্য্য। সেইদিন হইতে দৃঢ়ব্রত জ্ঞান-পিপাসু সন্তানের নিকট, বিশ্বপ্রকৃতি ধীরে ধীরে স্বীয় অবগুণ্ঠন মোচন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে, মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডারও নিত্য নব রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

এই বিপুল জ্ঞানাহরণ-প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া, অতি পুরাকালেই মানব স্বীয় জন্মভূমি এবং আবাসস্থল পৃথিবীর বিশালত্ব ও সমগ্রত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, আর আদি ও পরিণতির প্রশ্ন জিজ্ঞাসু মানব মনে মুদ্রিত হইয়াছিল।

অতি প্রথম শিশু-মানব এ প্রশ্নের শিশুর মতই মীমাংসা করিয়াছিল। পৃথিবীর নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, ইহার বিরাটত্বের আভাসে অভিভূত হইয়া, প্রাচীনকালে মানব পৃথিবীতে দেবত্ব প্রভৃতি সংজ্ঞা আরোপ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু এরূপ তুষ্টি, এরূপ নিশ্চেষ্টতা মানবের স্বভাব নয়। তাই ধীরে ধীরে সন্দেহ ও অনুসন্ধিৎসা আবার মানব-মনকে সত্য উদ্ধারে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারই ফলে, মানবেতিহাসের মধ্যযুগে পৃথিবীর উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে নানা দেশে নানা প্রকার উদ্ভট মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।

ইউরোপে মধ্যযুগেয় মনীষিগণ পৃথিবীর অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে জনে জনে বিভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তাঁহাদের মতের ঐতিহাসিকতা ছাড়া অপর কোনই মূল্য নাই। কারণ, তৎকালে চিন্তার কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ছিল না; উহা সর্ব্বদা যুক্তিমূলক না হইয়া, সুবিধা পাইলেই ভাব-মূলক হইয়া পড়িত।

কাজেই প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ অপেক্ষা স্বাধীন কল্পনার পরিচালনাই তাহাতে অধিক হইত। ঘটনার সমাবেশ অপেক্ষা কল্পিত চিত্র স্ফুটনই অনেক স্থলে প্রশ্রয় পাইত।

ইহাতে প্রাকৃতিক সত্যের উদ্ধার আশা সুদূর-পরাহত। যাহা হউক, বিজ্ঞানের ক্রম-বিকাশ-ইতিহাসের এই ঔপন্যাসিক যুগের কোলাহল ও বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতেই, ধীরে ধীরে নব্য বিজ্ঞানের দিব্য দীপ্তি, ধূমোত্থিত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রকটিত হইয়া, অন্ধ জগতের সম্মুখে জ্ঞানের প্রকৃত পন্থা আলোকিত করিয়া তুলিল। নব্য বৈজ্ঞানিকগণ অদম্য উৎসাহে,নবআলোকোদ্ভাসিত পথে, ধীর অথচ দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া, প্রকৃতির নিত্য নবতিমিরযুক্ত প্রদেশ সমূহ সভ্য জগতের সম্মুখে বিন্যস্ত করিতে লাগিলেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা পৃথিবীর বিকাশ পথে তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাকালীন পণ্ডিতগণের পৃথিবীর আদি সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেকেরই এক একটী স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত ছিল। এই সকল সিদ্ধান্ত কোন যৌক্তিকতা, পর্য্যবেক্ষণ বা সঙ্গতির ধার ধারিত না। অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ এবং কল্পনার বৈচিত্র্যই ইহাদের বিশেষত্ব ছিল। তখনকার ভূ-তত্ত্ব এইরূপে ভক্তগণের কল্পনা-পাশে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃত বিজ্ঞান রাজ্যের বহু নিম্নে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছিল।

অতঃপর জেমস্ হাটন্ (James Hutton) স্বীয় অলৌকিকী সাধনা ও প্রতিভা বলে ভূ-তত্ত্বকে ঔপন্যাসিক কল্পনার পাশ হইতে মুক্ত করিয়া, পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তির বেদীতে স্থাপিত করিলেন।

হাটনের পর হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী কল্পনামূলক প্রচেষ্টাসমূহের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। পৃথিবীর উৎপত্তি ভূ-তত্ত্ববিদ্গণের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হইয়া পড়িল। তৎপরিবর্ত্তে প্রবল উদ্যমে ভূস্তরসমূহ পরীক্ষিত হইয়া নিত্য নব আবিষ্কারসমূহ প্রচারিত হইতে লাগিল। ফলতঃ পৃথিবীর বর্ত্তমান লইয়া তৎকালে বৈজ্ঞানিকগণ এতদূর ব্যাপৃত ছিলেন যে, ইহার অতীত এবং ভবিষ্যৎ চিন্তার অবসর এবং প্রবৃত্তি দুইয়েরই তাঁহাদের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহার ফলে, অনেক দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর পুরাবৃত্ত ভূতত্ত্ববিদ্গণের চক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক বোধে অবজ্ঞাত হইয়াছিল। যাহা হউক, কালের আবর্ত্তনে, বিজ্ঞানসমূহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, ভূতত্ত্বের অধিকার-সীমা, অধুনা স্তর অধ্যয়ন ও শিলা পর্য্যবেক্ষণ ছাড়াইয়া বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। “পৃথিবীর অভিব্যক্তি” এক্ষণে ভূতত্ত্ববিদ্গণের নিকট একান্ত আবশ্যকীয় বিষয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এ প্রশ্নের মীমাংসায় জ্যোতিষ এবং রসায়ন শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। আমরাও এই অবলম্বনগুলির সাহায্যে সন্তর্পণে তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছি।

আমাদের এই পৃথিবী বিশাল সৌর-জগতের অন্তর্ভুক্ত একটী গ্রহ। প্রধানতঃ এইরূপ আরও সাতটী গ্রহ ও তাহাদের উপগ্রহ সমূহ লইয়াই সৌর-জগৎ গঠিত। এই আটটী বৃহৎকায় গ্রহ ছাড়া আরও শত শত ক্ষুদ্র গ্রহ এবং অসংখ্য উল্কা ও ধূমকেতু নিজ নিজ কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহারাও সৌর-জগতের উপাদান। বস্তুতঃ সৌর-জগৎ যেন ব্যোমদেশে একটী সুশৃঙ্খলিত বিপুল মণ্ডলী। অমিত-তেজা সূর্য্যদেব ইহার ধুরন্ধর হইয়া মধ্যদেশে অবস্থিত। আর গ্রহ ও উপগ্রহগণ তাঁহাকে

ঘিরিয়া ঘিরিয়া, তাঁহারই প্রভায় প্রভান্বিত হইয়া নিত্য নিয়মিত কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। এই সৌরমণ্ডলীর গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতির আকৃতি এবং প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য দর্শনে, স্বতঃই মনে হয় যেন ইহারা এক পরিবারভুক্ত, আর সূর্য্যের সহিত ইহাদের বাধ্যবাধকতার ব্যাপার অনুধাবন করিলে, একথাও নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, এই বিশাল জ্যোতিষ্কটীই ইহাদের গোষ্ঠীপতি।

বস্তুতঃ ক্ষুদ্র-বৃহৎ গ্রহ-উপগ্রহ-খচিত, অগণ্য উল্কা-ধূমকেতু প্রভৃতি অধ্যুষিত এই যে সৌর-জগৎ, ধারণাতীত সুদূর অতীত কালে ইহা ব্যোমদেশে ঘূর্ণায়মান, বিপুল বিস্তারশালী এক অখণ্ড মেঘপুঞ্জবৎ পদার্থের অন্তর্নিহিত ছিল। ডিম্বের ভিতর শাবক যেমন ধীরে ধীরে অবয়ব প্রাপ্ত হয়, এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও ঠিক তেমনি ধীরে ধীরে গ্রহ উপগ্রহ-সমন্বিত এই সৌর-জগৎটী অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাই নীহারিকাবাদ।

নীহারিকাবাদ।

নীহারিকাবাদের উদ্ভাবন-কর্ত্তা জর্ম্মণ দার্শনিক-প্রবর কাণ্ট (Kant)। ইনিই সর্ব্ব প্রথমে জ্যোতিষ্ক সৃষ্টিতত্ত্বের এই মীমাংসাটী লোক সমক্ষে প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী-কালে ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ লাপ্লাস্ (Laplace) স্বীয় মহীয়সী প্রতিভা ও গবেষণা বলে, এই পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত অবজ্ঞাত ভিত্তির উপর এক অপূর্ব্ব বিস্ময়কর হর্ম্ম্যের স্থাপনা করেন—তাহাই সভ্য-জগতে লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ (Nebular theory) নামে পরিচিত। বস্তুতঃ লাপ্লাস্, কাণ্ট্ প্রদর্শিত পন্থাকে উন্নত ও প্রশস্ততর করিয়া, দিব্যালোকমালায় বিভূষিত করত সভ্য-জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন মাত্র। তিনি নীহারিকাবাদের জনক নহেন; তবে ঈশ্বর-প্রেরিত শক্তিশালী প্রতিপালক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রহ উপগ্রহগণের গতি প্রকৃতি ও সূর্য্যের সহিত ইহাদের বাধ্যবাধকতার বিষয় অনুশীলন করিলে, স্বতঃই মনে হয়, ইহারা এক পরিবার-ভুক্ত। এই স্থূল উক্তিটীর বিশদ্ ব্যাখ্যাই নীহারিকাবাদ।

সুবিশাল সৌর-জগতের গ্রহ-উপগ্রহগণ সকলেই স্ব স্ব মেরুদণ্ডের (Axis) উপর আবর্ত্তন (Rotation) করিতে করিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ (Revolution) করিতেছে। উপগ্রহগণ তদ্বৎ গ্রহগণকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; আর গ্রহগণ স্ব স্ব উপগ্রহগুলিকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছে। গ্রহ-উপগ্রহগণের এই যে আবর্ত্তন ও প্রদক্ষিণ ব্যাপার, ইহাতে দুইটী বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়াছে। প্রথম, যদিও গ্রহগুলি কোনটী বা সূর্য্যের অতি নিকট, কোনটী বা তাহা হইতে বহু দূরে, তথাপি ইহাদের প্রদক্ষিণ পথ বা কক্ষ (Orbit) সমূহ প্রায় একই সমতলে (Plane) সন্নিবিষ্ট। আর উপগ্রহ সমূহের কক্ষও ঠিক ঐ সমতলেই আবদ্ধ।

দ্বিতীয়,—সকল গ্রহই সূর্য্যকে একই দিক দিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে; আর উপগ্রহগুলিও সেই দিক দিয়াই নিজ নিজ গ্রহগণকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আবার শুধু তাহাই নহে, গ্রহ উপগ্রহগুলির স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর যে দৈনন্দিন আবর্ত্তন, তাহাও ঐ একই মুখীন ঘূর্ণনে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

সৌর-জগতের এই যে শৃঙ্খলা, গ্রহ উপগ্রহগণের এই যে ঐক্য, এই যে এক নিয়মানুবর্ত্তিতা, ইহার মূলে কি কোনও সঙ্গত কারণ নাই? এ সকলই কি বিশ্ব-নিয়ন্তার অজ্ঞেয় খেয়াল-সম্ভূত দৈববিধান? গ্রহ উপগ্রহগণের এই সকল প্রকৃতিগত ঐক্য সম্যক পর্য্যালোচনা করিলে কি মনে হয় না যে, ইহারা সকলেই এক পরিবারভুক্ত, আর এই সমগুণাবলি ইহাদের বংশগত সম্পত্তিরই অংশ-পরম্পরা? বস্তুতঃ ইহা দ্বারাই কাণ্ট্, লাপ্লাস্, হর্শেল (William Herschel)-প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষিগণ নীহারিকা-বাদের প্রবর্ত্তনে ও পরিপোষণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এবং নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পরিশ্রুত হইয়া আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তই সৌর-জগতের আদি ইতিহাসের ভিত্তিস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে।

নীহারিকাবাদের সম্যক পর্য্যালোচনার পূর্ব্বে আমাদিগকে দেখিতে হইবে,—"নীহারিকা" পদার্থটা কি? নগ্নচক্ষে আকাশের গায়ে আমরা চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, উল্কা ধূমকেতু প্রভৃতি দেখিতে পারি। কিন্তু নীহারিকা দর্শন করিতে হইলে, আমাদিগকে দূরবীক্ষণের সাহায্য লইতে হয়। (উত্তর ভাদ্রপদা নীহারিকা যদিও অন্ধকার রাত্রে নগ্ননেত্রে ক্ষীণালোক তারকাগুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথাপি দূরবীক্ষণ ব্যতীত নীহারিকার প্রকৃতি সবিশেষ অবগত হওয়া অসম্ভব।) দূরবীক্ষণ-সাহায্যে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ নক্ষত্রলোকে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য তারকারাজি ব্যতীত স্বতন্ত্র এক প্রকার পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন। ইহারা নক্ষত্র বা নক্ষত্র-পুঞ্জের মত এত উজ্জ্বল নহে, এবং ইহাদের মত সুস্পষ্ট সীমা-রেখা বদ্ধও নয়। যন্ত্র মধ্যদিয়া দেখিতে ইহাদিগকে অনেকটা বিক্ষিপ্ত শুভ্র ধূমরাশির মত মনে হয়। ইহাদের আলোক অতীব মৃদু। সুনীল আকাশে স্বচ্ছ নীহার-কণিকার মত বিস্তৃত বলিয়া ইহাদিগকে 'নীহারিকা' বলে। (নীহারিকা=লাটিন্ Nebula, ইংরাজী—Fog, mist or vapour)।

লাপ্লাসের মতে, সৃষ্টির আদিতে, আমাদের এই সৌর-জগৎ কোটী কোটী যোজন-বিস্তৃত একটা আবর্ত্তনশীল নীহারিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই নীহারিকা সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী গ্রহ হইতেও সুদূরে প্রসারিত ছিল। আর তাহার অণু-পরমাণু সমূহ পরস্পরের আকর্ষণে ক্রমেই কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছিল। নীহারিকার এই আকর্ষণ এবং ঘূর্ণন উভয়ে মিলিয়া ধীরে ধীরে ইহাকে একটী বিশাল বর্ত্তুলে পরিণত করিয়াছিল। বর্ত্তুলটী যতই সঙ্কুচিত হইতেছিল, ইহার আবর্ত্তন বেগও ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। আর এই আবর্ত্তনের ফলে, বর্ত্তুলে আরও একটী শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল—ইহাকে কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি (Centrifugal force) বলে।

একগাছি রজ্জুর এক প্রান্তে ঢিল বাঁধিয়া অপর প্রান্ত ধরিয়া যদি তাহাকে শূন্যে চক্রাকারে ঘুরান যায়, তবে ঢিলে আর ঐ ঘূর্ণন-জনিত একটী শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এবং তাহার ফলে রজ্জু-বদ্ধ লোষ্ট্রটী সর্ব্বদা বহির্ম্মুখীন ছুটিতে চায়। আবার ঘূর্ণন-বেগ যতই বর্দ্ধিত করা যায়, বহির্ম্মুখীন্ শক্তিও ততই অধিক কার্য্য করিতে থাকে। কাজেই রজ্জু ধরিয়া রাখিতে ততই অধিক শক্তির

প্রয়োজন হয়। ঘূর্ণায়মান পদার্থের এই বহির্মুখীন্ শক্তিকে বৈজ্ঞানিকগণ কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি নাম দিয়াছেন।

যাহা হউক, নীহারিকা-বর্ত্তুলে তাহা হইলে আমরা দুইটী শক্তির ক্রিয়া দেখিতেছি। প্রথম, ইহার অণু পরমাণুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ-শক্তি; দ্বিতীয়,আবর্ত্তনজনিত কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি। এই শক্তি দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাব-বিশিষ্ট। আমরা দেখিয়াছি, বর্ত্তুল যতই আকুঞ্চিত হইতেছে, ইহার আবর্ত্তন-বেগ এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিও ততই বর্দ্ধিত হইতেছে। আর বর্ত্তুলের বহিরংশের আবর্ত্তনবেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া তথায় এই শক্তির (Contripetal force) বলে আকুঞ্চিত হইতে হইতে এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল,যখন ইহার বহির্ভাগে উপরোক্ত শক্তি দুইটীর ক্রিয়া সমান হইয়া দাঁড়াইল। এ অবস্থায় ঐ অংশের আর সঙ্কোচ অসম্ভব হওয়ায়, উহা নীহারিকা-বর্ত্তুল হইতে বলয়াকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মূল নীহারিকায় আবার আকুঞ্চন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বহির্ভাগের কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ফলে আবার দ্বিতীয় বলয়ের সৃষ্টি হইল। এইরূপে ব্যোমদেশে বলয় সৃষ্টি করিতে করিতে আমাদের সেই সুবিস্তৃত সৌর নীহারিকা অবশেষে তাহার কেন্দ্রদেশে একটী নক্ষত্রে পর্য্যবসিত হইল। ইহাই আমাদের সূর্য্য। আর নিক্ষিপ্ত বলয়গুলি জমাট বাঁধিয়া গ্রহের সৃষ্টি করিল। গ্রহ নীহারিকা আবার পুনঃ সঙ্কোচের সময় যে বলয়-বিক্ষেপ করিল, তাহাই জমিয়া উপগ্রহ উৎপন্ন হইল।

গ্রহ উপগ্রহগণের উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বিচ্ছিন্ন বলয়গুলি ঘূর্ণায়মান বলয়াকারেই না থাকিয়া কেন আবার একত্রীভূত হইল? ইহার উত্তরে নীহারিকাবাদিগণ বলেন যে, যদি বলয়ের গঠনোপাদান ইহার সর্ব্বত্র সমান হইত, তবেই ইহার জমাট না বাঁধিবার সম্ভাবনা ছিল; নচেৎ, উহা জমাট বাঁধিতে, অর্থাৎ বলয় ভাঙ্গিয়া আবার বিস্তীর্ণ বাষ্প-পুঞ্জে পরিণত হইতে বাধ্য।

ইহাই স্থূলতঃ লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ (Nebular Hypothesis)। এখন দেখা যাক্, পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ প্রণালীতে কিরূপে ইহার সমালোচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

দূরবীক্ষণ ও বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবনার পর হইতে জ্যোতিষালোচনার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। দূরবীক্ষণ সাহায্যে জ্যোতিষ্কগণের গতি প্রকৃতি সম্যক্ নির্দ্ধারিত ও আলোচিত হইতেছে। আর বর্ণবীক্ষণ (spectroscope) দ্বারা, অন্যান্য নানা তত্ত্বের সহিত, তাহাদের গঠনোপাদান অবধারিত হইতেছে। মনীষিগণ অক্লান্ত চেষ্টায় এই যন্ত্রদ্বয় দ্বারা নীহারিকাগণের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দিন দিন নব নব সত্যের উদ্ধার সাধন করিতেছেন।

যে নীহারিকা হইতে আমাদের এই সৌর জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে—তাহার আর অধ্যয়ন এবং অনুশীলন সম্ভবপর নহে। কারণ নীহারিকা আকারে ত' তাহার আর অস্তিত্ব নাই! কিন্তু এখনও আকাশে অগণ্য নীহারিকা বর্ত্তমান। আমাদের এই সৌর জগতের আদি ইতিহাসের পুনরভিনয় আকাশের নানা স্থানে এখনও চলিতেছে। যন্ত্র সাহায্যে সেই গুলি যদি বিশদ্ভাবে অনুশীলন করা যায়, তবে এই সৌরজগতের

অতীত ইতিহাসও আমাদের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

ব্যোমমণ্ডল যেন অগণ্য সৌর জগতের সুবিপুল একটা কারখানা। এ কারখানায় প্রতিনিয়ত জগৎ গঠন চলিতেছে। আর কারখানার নিয়মানুসারে সকল জগৎ একই প্রকার কার্য্যপরম্পরার মধ্য দিয়া গঠিত হইতেছে। তাই, যন্ত্র-সাহায্যে আমরা এই কারখানার বর্ত্তমান কার্য্যপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহার অতীত যুগের কার্য্যাবলিরও পরিচয় পাইতে পারি।

শক্তিশালী দূরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশের গায়ে লক্ষ লক্ষ নীহারিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের আকৃতি এবং গঠন সমান নহে। এই সকল বিভিন্নতা অনুসারে নীহারিকাগণের পর্য্যায়-বিভাগ হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলি বলয়াকৃতি, কতকগুলি ক্ষীণালোক-বেষ্টিত থালার ন্যায়, কতকগুলির আবার কোন বিশেষ আকৃতি নাই বলিলেই চলে। বৈজ্ঞানিকপ্রবর রসের (Lord Rosse) সুবিখ্যাত দূরবীক্ষণ সাহায্যে আর এক প্রকার নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—ইহারা স্তূপের মত, মনে হয় এই সকল নীহারিকার কেন্দ্রভাগ চতুষ্পার্শ্ব অপেক্ষা প্রবলতর বেগে আবর্ত্তিত হইয়াই যেন ইহাদিগকে বর্ত্তমান আকারে পরিণত করিয়াছে।

নীহারিকার গঠনোপাদান সর্ব্বত্র সমভাবে সন্নিবিষ্ট নহে। দূরবীক্ষণ সাহায্যে ইহার মধ্যে ঘন ও উজ্জ্বলতর স্থান সমূহ সহজেই দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ইহারাই কালে গ্রহে পরিণত হইয়া থাকে।

নীহারিকার উপাদান বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ বর্ত্তমান। লাপ্লাসের সিদ্ধান্ত মতে নীহারিকা সমূহ জলন্ত বাষ্পীয় উপাদানে গঠিত। কিন্তু 'রসের' দূরবীক্ষণ সাহায্যে জ্যোতিষিগণ যখন দেখিলেন যে, অনেক নীহারিকাই ঘনসন্নিবিষ্ট তারকা-পুঞ্জ ছাড়া আর কিছুই নহে, তখন সকলের মনেই নীহারিকার বাষ্পীয় প্রকৃতির উপর একটু সন্দেহ জন্মিল। কিন্তু পরে সার উইলিয়ম হাগিন্স (Huggins) বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, কতকগুলি নীহারিকা তারকাগুচ্ছক হইলেও আকাশে বাষ্পীয় নীহারিকারও অভাব নাই। এবং ইহাদের প্রকৃতি লাপ্লাস-বর্ণিত নীহারিকারই অনুরূপ।

দূরবীক্ষণ সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন নীহারিকার আলোক-চিত্র গ্রহণ করত মনীষিগণ জগৎ-অভিব্যক্তির ধারা নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। এ ব্যাপারেও তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, লাপ্লাস নীহারিকাবাদের ব্যাখ্যানে মূল নীহারিকার যে সকল অবস্থা পরম্পরার কথা বলিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানেও ভিন্ন ভিন্ন নীহারিকায় ঐ সকল অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে। এণ্ড্রোমেডা (Andromeda) নীহারিকার আলোক প্রতিকৃতি একখানি থালার মত। উহার মধ্যভাগ অতীব উজ্জ্বল; আর বহির্ভাগে বিচ্ছিন্ন বলয়-মালার সঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘন আলোক-পুঞ্জের মত স্থানসমূহ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ইহারাই ভাবী গ্রহের ভ্রূণাবস্থা।

দূরবীক্ষণের ন্যায় বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও পণ্ডিতগণ জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি-তত্ত্বের অনেক নূতন তথ্য সভ্য জগতের গোচর করিয়াছেন ও করিতেছেন। এ বিষয়ের আলোচনার পূর্ব্বে অবতরণিকা স্বরূপ আমাদিগকে, বর্ণবীক্ষণ সাহায্যে রশ্মি-বিশ্লেষণ ব্যাপারটীর একটু সংক্ষিপ্ত অনুধাবনা করিতে হইবে।

বর্ষাস্নাত শ্রাবণের অপরাহ্নে, পূর্ব্ব গগনে

জলদের গায়ে সপ্তবর্ণ-খচিত বিচিত্র ইন্দ্রধনুর বিকাশ আমরা সকলেই দেখিয়াছি। আমরা সকলেই দেখিয়াছি, দেওয়ালগিরি, ঝাড় প্রভৃতির ত্রিপল-কাচ কলমের (prism) ভিতর দিয়া রৌদ্রালোকিত বৃক্ষ প্রান্তর প্রভৃতি, নীল পীত হরিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত দেখায়। এই রঙ্গের খেলার গুপ্ত তত্ত্বটী নিউটন (Sir Isaac Newton) সর্ব্বপ্রথমে জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করেন। যিনি বৃন্তচ্যুত ফলের ধরণী-চুম্বনে এবং পূর্ণিমার অমাবস্যায় সমুদ্র জলের উত্থান পতনে একই মহাকর্ষণ শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, তিনিই আবার জলদের গায় ও রৌদ্রস্নাত বিটপীলতায় এই রঙ্গের খেলার মধ্যেও একই কারণের ক্রিয়া দেখাইয়াছেন। নিউটন দেখাইয়াছেন—ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ শুভ্র সূর্য্যালোকেরই বিশ্লিষ্টাবস্থা। স্বচ্ছ মেঘ-কণিকার উপর সূর্য্য রশ্মির সম্পাতে উহার শুভ্র আলোকের উপাদান সমূহ বিশ্লিষ্ট হইয়া নীল, পীত, হরিত প্রভৃতির মূল বর্ণে (Primary colours) পরিণত হয়। শুভ্র সূর্য্যালোক ত্রিপল-কাচ-কমলের (Triangular Prism) ভিতর দিয়া গমন কালেও উহার উপাদান পৃথক হইয়া পড়ে। এক্ষণে বিশ্লিষ্ট এবং পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট মূল-বর্ণগুলি উপযুক্ত স্থানে ধরিবার ব্যবস্থা করিলেই সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র (Spectrum) পাওয়া যায়। আলোক-বিকীরণশীল পদার্থের এই রশ্মি-বিশ্লেষণ এবং বিশ্লিষ্ট বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষাই বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের কার্য্য।

পদার্থের প্রকৃতি-ভেদে বর্ণচ্ছদের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। কঠিন, তরল ও গুরুতর চাপগ্রস্ত ঘনীভূত বাষ্পীয় পদার্থ অতিশয় উত্তপ্ত হইলে, উহা হইতে যে রশ্মিমালা বিকীর্ণ হয়, বর্ণ-বীক্ষণ সাহায্যে তাহাদের বিশ্লেষণ করিলে সৌরবর্ণচ্ছত্রের মত তাহাদের বর্ণাচ্ছত্রেও লোহিত, পীত, হরিত প্রভৃতি সমুদয় বর্ণই ক্রমান্বয়ে অঙ্কিত হইতে দেখা যায়। ইন্দ্র ধনুর বর্ণ পর্য্যায়ের যেমন কোথাও ফাঁক থাকে না, বর্ণের লোপের সঙ্গে সঙ্গেই তৎপরবর্ত্তীর বিকাশ হয়, এই শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্রেও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে।

কিন্তু বিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত বাষ্পের রশ্মি বিশ্লেষণ করিলে আমরা অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র (Continous Spectrum) পাই না। তৎপরিবর্ত্তে বর্ণচ্ছত্রে স্থানে স্থানে উজ্জ্বল রেখা সমূহ পরিদৃষ্ট হয়। জ্বলন্তবাষ্পের উপাদান ভেদে এই উজ্জ্বল রেখা সমূহের স্থান এবং বর্ণের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। এবং ইহা হইতেই আলোক বিকীরণশীল বাষ্পীয় পদার্থের উপাদান স্থিরীকৃত হয়।

আবার যদি কোনও ভাস্কর পদার্থ শীতল বাষ্পাবরণে বেষ্টিত থাকে, তবে তাহার আলোক-রশ্মির বিশ্লেষণে প্রাপ্ত বর্ণাচ্ছত্র স্থানে স্থানে কৃষ্ণ রেখা দ্বারা বিভক্ত দৃষ্ট হয়। পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ প্রণালীতে পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, জ্বলন্ত অবস্থায় যে বাষ্প বর্ণচ্ছত্রের ঠিক যে যে স্থানে উজ্জ্বল রেখা-পাত করে, শীতল অবস্থায় সেই বাষ্প-বেষ্টনীই আবার তন্মধ্যস্থ দীপ্যমান্ পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের ঠিক সেই সেই স্থানেই কৃষ্ণরেখার সন্নিবেশ করিয়া থাকে। কাজেই বর্ণাচ্ছত্র সমূহের অবস্থান দেখিয়াই আমরা অনায়াসে দীপ্যমান্ পদার্থের বাষ্পীয় বহিরাবরণের উপাদান স্থির করিতে পারি। অভিনিবেশ সহকারে সৌর বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিলে উহাতে কৃষ্ণরেখার সন্নিবেশ দৃষ্ট হয়।

এই কৃষ্ণ রেখাগুলির সম্যক্ পরীক্ষা দ্বারা পণ্ডিতগণ সূর্য্যের বহির্ম্মণ্ডলের উপাদান নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন।

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা দেখিব, সৌর জগতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে, নীহারিকার রহস্য-ভেদে, বর্ণবীক্ষণ আমাদিগকে কোন্ দিকে কতটুকু সহায়তা করিতেছে।

সার উইলিয়ম হাগিন্স্ সর্ব্বপ্রথমে ১৮৬৪ অব্দে একটী নীহারিকার বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করেন। তাহাতে তিনি উজ্জ্বল রেখা-যুক্ত খণ্ডিত বর্ণ-চ্ছত্র প্রাপ্ত হন। উহা লাপ্লাস্-কল্পিত জ্বলন্ত বিক্ষিপ্ত বাষ্পরাশিরই অনুরূপ।

হাগিন্সের পর হইতে বর্ণবীক্ষণ সহযোগে নীহারিকা তত্ত্বের আলোচনার বিপুল প্রচেষ্টা চলিয়াছে। তাহার ফলে, নীহারিকার দুইটী শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণীর নীহারিকার বর্ণচ্ছত্রে মৃদু এবং ক্ষীণতর অখণ্ড বর্ণ পর্য্যায়ের উপর জ্বলন্ত-বাষ্প-সম্ভব উজ্জ্বল রেখা সমূহ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই শ্রেণীর নীহারিকা সমূহের অন্তরদেশ অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত হইলেও, ইহাদের বহির্ম্মণ্ডল অত্যুজ্জ্বল বাষ্পময়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নীহারিকার বর্ণচ্ছত্র সৌর বর্ণচ্ছত্রের মত কৃষ্ণরেখা দ্বারা খণ্ডিত। অধিকাংশ নীহারিকাই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, ইহাদের গঠন সূর্য্য ও অন্যান্য তারকারাজিরই অনুরূপ—মধ্যদেশ ঘনীভূত এবং উজ্জ্বল, আর বহির্ভাগ অনুজ্জ্বল বাষ্পময়।

প্রথম শ্রেণীর নীহারিকার গঠন সম্বন্ধে প্রভূত মতভেদ বিদ্যমান থাকিলেও, সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, কালক্রমে ইহার উজ্জ্বল বহির্ম্মণ্ডল ক্রমশঃ শীতল হইয়া ধীরে ধীরে ইহাকেও দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ফেলিবে। নীহারিকাবাদের আলোচনায় পণ্ডিতগণের প্রধান সমস্যা এই যে, এত বিস্তৃত বিক্ষিপ্ত বাষ্পরাশি কি প্রকার যুগ যুগান্তর ধরিয়া এত বিপুল উত্তাপ পোষণ করিতে পারে?

গণিত সাহায্যে লর্ড কেলভিন্ (Kelvin) দেখাইয়াছেন যে, নীহারিকার বাষ্পীয় উপাদান, আমরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যে বাতাস ব্যবহার করি, তাহা অপেক্ষা দশ লক্ষ গুণ লঘুতর। খানিকটা বাতাস আমাদের এই পৃথিবীতে যে পরিমাণ স্থান জুড়িয়া থাকে, ঠিক সেই পরিমাণ ওজনে) বাষ্পই নীহারিকায় তাহার দশ লক্ষ গুণ অধিক স্থান ব্যাপিয়া বিদ্যমান। কাজেই, একথা সহজেই মনে হয় যে, এত সুদূর-প্রসারী বাষ্পরাশি কি প্রকার যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া স্বীয় উত্তাপ রক্ষা করিয়া আসিতেছে?

এই সমস্যার নিরাকরণে লকেয়ার (Norman Lockyer)-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ নীহারিকাবাদের স্থানে উল্কাবাদের (Meteoritic-hypothesis) প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে নীহারিকা বাষ্প-পুঞ্জ নহে; উহা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কার সন্নিবেশে উৎপন্ন। ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল উল্কা সমূহ পরস্পরের সংঘর্ষণে আসিয়া উত্তপ্ত হইতেছে; আর সেই সকল ক্ষীয়মান্ উল্কাপিণ্ড হইতে অনবরত জ্বলন্ত বাষ্পরাশি উৎপন্ন হইতেছে। বাষ্পরাশি আবার শীতল হইয়া উল্কা-সৃষ্টি করিতেছে। উল্কা আবার ভাঙ্গিতেছে। যুগযুগান্তর ধরিয়া নীহারিকার শরীরে এই ভাঙ্গাগড়া চলিয়া আসিতেছে; আর তাহারই ফলে

নীহারিকার উত্তাপ যুগযুগান্তর ধরিয়া সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

উল্কাবাদ সম্বন্ধে একটী আপত্তি এই যে, নীহারিকা যদি উল্কাসমষ্টিই হইল, তবে, উল্কার মধ্যে আমরা যে সকল রাসায়নিক উপাদান পাই, বর্ণবীক্ষণে নীহারিকার রশ্মি-বিশ্লেষণে আমরা তাহাদের সাক্ষাৎ পাই না কেন? পণ্ডিতগণ এ সমস্যার অতি সুচারু মীমাংসা করিয়াছেন।

তাঁহারা দেখাইয়াছেন, উল্কা ও ধূমকেতুর উপাদানের সমত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহের কারণ নাই। কখনও কখনও ধূমকেতুকে অসংখ্য উল্কারাজিতে পর্য্যবসিত হইতেও দেখা গিয়াছে।—ব্যালার ধূমকেতু (Biella's comet), টেম্পেলের ধূমকেতু (Temple's comet) প্রভৃতি এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া উল্কা-গুচ্ছে পরিণত হইয়াছে।

হাগিন্স প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ ধূমকেতুর রশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া সোডিয়াম (Sodium) ও হাইড্রোকার্বণ (Hydrocarbon)-জনিত বাষ্প-ছাড়া আর কিছুরই সন্ধান পান নাই। উল্কা-রশ্মির বর্ণচ্ছত্রে সাধারণতঃ লৌহ, নিকেল, ম্যাগ্নিসিয়ম্ (Magnesium) এবং অঙ্গারের উজ্জ্বল বর্ণ-রেখা দৃষ্ট হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উল্কা ও ধূমকেতু বস্তুতঃ এক উপাদান-সম্পন্ন হইলেও উহাদের বর্ণচ্ছত্র সমূহ বিভিন্ন প্রকৃতির।

এই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—নীহারিকার বর্ণচ্ছত্রে উল্কার উপাদান সমূহের রেখাপাত নাও দৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে নীহারিকায় উল্কার অভাব প্রমাণিত হয় না।

উল্কাবাদ সম্বন্ধে প্রধান প্রশ্ন এই যে, ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল উল্কাপিণ্ড সমূহ কিরূপে একত্রীভূত হইয়া গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি করিল? তাহাদের এই সম্মিলনের হেতুই বা কি? বিপুল ব্যোমদেশে যদৃচ্ছা না ভ্রমণ করিয়া তাহারা কেন এইরূপে মিলিত হইয়া, বদ্ধ হইয়া, জমাট বাঁধিয়া জগৎ সৃষ্টি করিল? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় অধ্যাপক চেম্বার্লেন্ (Chamberlin) বলিয়াছেন—উল্কা-গঠিত নীহারিকা শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে আকুঞ্চিত হইতেছিল। নীহারিকার এই আবর্ত্তনের ফলে, তাহার উপাদান স্থানীয় উল্কা সমূহের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কক্ষ হইয়াছিল। উল্কাপিণ্ড সমূহের এই সকল কক্ষ বা ভ্রমণ-বৃত্ত সততই স্থান পরিবর্ত্তন করিত। ইহার ফলে, ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে উল্কায় উল্কায় সাক্ষাৎ ও মিলন হইয়া ক্রমশঃ বৃহত্তর উল্কা গঠিত হইতে হইতেই অবশেষে গ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে। যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণশীল উল্কা সমূহ একত্রীভূত হইয়া কখনই জগৎ সৃষ্টি হয় নাই। যে সকল উল্কা সৌরজগতের শক্তি সমূহে বদ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে সংহত হইয়াছিল, তাহারাই জমাট বাঁধিয়া গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে।

নীহারিকা সম্বন্ধে আধুনিক মত এই যে, গ্রহ উপগ্রহাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ড দ্বারা সংগঠিত ছিল। নীহারিকার আদিম অবস্থা বাষ্পীয় হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই বাষ্পপুঞ্জ কালক্রমে জমাট বাঁধিয়া উল্কারাশিতে পরিণত হইয়াছিল। পরে ঐ উল্কা-সমূহের সমবায়েই গ্রহ-উপগ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে। লাপ্লাস্ বলিয়াছিলেন, বাষ্পীয় নীহারিকা বাষ্প-বলয় বিক্ষেপ করিয়াছিল, আর তাহারাই জমাট বাঁধিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। উল্কাবাদিগণ বলেন—নীহারিকা বাষ্প-বলয়

বিক্ষেপ না করিয়া একেবারেই উল্কা রাশিতে পরিণত হইল, আর এই ঘূর্ণায়মান উল্কার সম্মিলনেই গ্রহ-উপগ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে।

জ্যোতিষ্ক-সৃষ্টিতত্ত্বে ধীরে ধীরে উল্কাবাদ নীহারিকাবাদের স্থান অধিকার করিতেছে। নীহারিকাবাদ দ্বারা অমীমাংসিত অনেক সমস্যা ইহার সাহায্যে ক্রমশঃ মীমাংসিত হইতেছে। জর্জ্জ ডারুইন্-প্রমুখ বৈজ্ঞানিক-গণ বিপুল অধ্যবসায় সহকারে ইহার আলোচনা এবং প্রচার করিতেছেন।

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত।

পৃথ্বীরাজ।*

মহম্মদ ঘোরীর মন্ত্রণা।

কল্পনে! প্রসাদে তব কত কবিজন
হেরেছেন কত দৃশ্য, লোকে অগোচর;
আকাশে, পাতালে তথা স্বরগে, নরকে,
রাজার প্রাসাদ মাঝে, দীনের কুটীরে;
শত ধন্য সেই, তুমি কৃপা কর যারে।
অকৃপা যাহারে তব, ভাগ্যহীন সেই
কবিকুলে, গন্ধহীন কুসুম যেমতি
অনাদৃত। দয়া, তবে, কর, দয়াময়ি!
শুনাও, অতীত স্মৃতি করি সঞ্জীবিত,
ভারতের ভূতকথা। হ'ক জ্বালাময়ী
সে কাহিনী, তবু, দেবি! করিয়া শ্রবণ,
বুঝি নিজে, বুঝাইব স্বদেশীয় জনে
কোন্ দোষে, কোন্ পাপে পতিত আমরা;
কারণবিহনে কার্য্য না ঘটে সংসারে।
শুনাও সে ইতিহাস মহাপতনের,
চূর্ণ যাহে, ভূমিকম্পে অট্টালিকা সম,
শত শত বর্ষব্যাপী সভ্যতা হিন্দুর।
অতীতের রুদ্ধদ্বার উন্মোচিয়া, দেবি!
দেখাও সমরক্ষেত্রে হিন্দুবীরগণ
স্বদেশ স্বধর্ম্মতরে হৃদয়শোণিত
কেমনে করিত দান। হিন্দুকুলনারী,
কেমনে প্রফুল্ল মুখে, পতিপুত্রগণে,
সাজাইয়া বীরসাজে, পাঠাইত রণে;
যুদ্ধান্তে, কেমনে, পুনঃ জয়মাল্য দিয়া,
লইত বরণ করি! নিরাশ, নির্জ্জীব
যদিও এ জাতি, এবে, তবু সে কাহিনী
শুনাবে আশার গীত, উৎসাহ-অনল
জ্বালিবে হৃদয়মাঝে; এস, কৃপাগুণে।
　প্রসারিত গিরিমার যোজন বিস্তৃত;
শিরে তার শোভা পায় গজনী নগরী,
ভুবনবিখ্যাতা পুরী; ভূষিতে যাহারে
কত দেবালয়, কত প্রাসাদ, কুটীর
লুণ্ঠিত করিলা বীর সুলতান মামুদ, *
লাঞ্ছিত, দলিত করি ভারতসন্তানে।

---

* মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরিত-লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু ভারতের শেষ হিন্দুসম্রাট পৃথ্বীরাজের চরিত অবলম্বনে একখানি অষ্টাদশ সর্গব্যাপী মহাকাব্য লিখিয়াছেন। আগামী নববর্ষে তাহা প্রকাশিত হইবে। যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে নব্যভারতের পাঠক পাঠিকাদিগকে তাহাদিগের পূর্ব্বাস্বাদ দিয়া তৃপ্ত করিয়াছেন, এবারও দিতেছেন। কাব্যের মহম্মদ ঘোরীর মন্ত্রণা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। চৈত্র সংখ্যায় তরায়ণের মহাযুদ্ধ প্রকাশিত হইবে। বহুদিন পরে বঙ্গভাষা একখানি মহামূল্যে অলঙ্কার লাভ করিলেন বুঝিয়া আমরা পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি। ন, স।

* গজনীর অধিপতি স্বনামখ্যাত বীর। ইনি,

চারিদিকে সুবেষ্টিত দুর্ভেদ্য প্রাচীর,
পাষাণে নির্ম্মিত কোথা, কোথা বা ইষ্টকে।
সগর্ব্বে প্রহরীস্তম্ভ, উচ্চ করি শির,
দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে। বন্ধ্য, নগ্ন গিরি,
তুষার-ঝটিকাবশে শ্যামশোভাহীন,
নিরন্তর রুদ্রমূর্ত্তি। নিম্নে নগরীর
প্রান্তর, কেদার শোভে শস্যগুচ্ছে ভরা,
হরিৎ সাগর সম। ছুটে গিরিস্রোত
কল কল স্বনে কোথা ; তটদেশে তার
সুরম্য উদ্যান রাজে পূর্ণ ফুলে, ফলে।
সুবিশাল স্তম্ভদ্বয়, ইষ্টকরচিত,
মামুদবংশের কথা করিছে প্রচার
দাঁড়ায়ে অটল ভাবে।* অদূরে পুরীর
বিরাজে রওজাগ্রাম ; যথা মামুদের
সমাধিমন্দির, শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত,
কহিছে দর্শকে, যেন, নীরব ভাষায়
'জেতা, জিত ধূলিশেষ বিধি বিধাতার'।
প্রাচীর মাঝারে দুর্গ, রাজহর্ম্ম্য তায়
উঠেছে গগন ভেদি। সে হর্ম্ম্যের মাঝে
নিভৃত প্রকোষ্ঠ এক, শোভা সজ্জাহীন ;
বসি তাহে বীরবর মহম্মদ ঘোরী.
নিজ পাত্র, মিত্র লয়ে। দক্ষিণে কুতব, †
নবীন যৌবন কান্তি উজলিছে তনু,
উৎসাহে প্রদীপ্ত মুখ, বীর-দর্পে ভরা।
বামে বসি হামজবী, ‡ গম্ভীর মুরতি.
ললাটে চিন্তার রেখা। মধ্যে উভয়ের
সাধু ভক্ত মৈনুদ্দীন * করে জপমালা,

অষ্টাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া, বহু নগর, তীর্থ ও দেবমন্দির লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন স্থলে একাধিকবার বর্ণিত হইয়াছে।

* এই দুইটী স্তম্ভের মধ্যে একটী মামুদের, অপরটী তাঁহার পুত্র মসাউদের নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উভয়ই এখনও বর্ত্তমান আছে।

† ভারতের প্রথম মুসলমান সম্রাট সুপ্রসিদ্ধ কুৎবুদ্দীন আইবক। ক্রীতদাস হইতে, ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া, ইনি সেনাপতি, পরে মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি এবং তৎপরে স্বাধীন সম্রাট হইয়াছিলেন। সাহস ও বীর্য্যের সঙ্গে প্রভুভক্তি, আশ্রিতবাৎসল্য এবং বদান্যতা প্রভৃতি বহুগুণে ইনি অলঙ্কৃত ছিলেন। ঐতিহাসিক ফেরেস্তা তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

Kootbooddeen was a brave and virtuous disposition; open and liberal to his friends, courteous and affable to strangers. In the art of war and good government he was inferior to none, nor was he a mean proficient in literature. Brigg's Ferista Vol. I. P. 190

§ Kowam-ool-moolk Humzvy মহম্মদ ঘোরীর অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। মহম্মদ পরে ইহাঁকেই দূতরূপে আজমীরে পৃথ্বীরাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

Brigg's Ferista Vol. I. P. 174.

তাজুল মাসির প্রণেতা হাসন নিজামী ইহাঁকে Hamza নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহাঁর প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে :—He had obtained distinction by the customs of embassage and the properties of missions and his position in the service of the sublime court had met with approval and in the beauty of his moral character and the excellence of his endowments, the above mentioned person, in whose merits all concurred, and from the flames of whose wisdom and the light of whose penetration abundant delight and perfect good fortune arose. Elliot's History of India, Vol. II, PP. 212-13.

* ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য মুসলমান সাধু। আজমীরে ইঁহার যে সমাধি বর্ত্তমান আছে, তাহা মুসলমানদিগের একটী প্রধান তীর্থে পরিণত হইয়াছে। মুন্তাকবুল তোয়ারিক প্রণেতা বলেন

বিলম্বিত শ্মশ্রুজাল স্পর্শে নাভিদেশ,
প্রশান্ত বদনকান্তি। দাঁড়ায়ে অদূরে,
সম্ভ্রমে বিনত শির, রাজদূত ত্রয়।
সম্বোধিয়া দূতগণে কহিলেন ঘোরী,
মধুর গম্ভীর ভাষে ;
"হিন্দুস্থান মাঝে
ছিলে সবে, এতদিন ; কি দেখিলে সেথা ?
কেমন সে দেশ বল ; সম্পদ, বিভব,
লোকের প্রকৃতি, ধর্ম্ম, যা কিছু দেখেছ,
বল বিস্তারিয়া সবে ; অগ্রে বল, আলি !"
সম্ভ্রমে নোয়ায়ে শির, ভূমিস্পর্শ করি,
আরম্ভিলা আলি ;
"জাঁহাপনা ! কি কহিব,
অদ্ভুত, অপূর্ব্ব দেশ। বিশ্বস্রষ্টা যেন
সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে তারে নিরুপম করি
গড়েছেন ধরামাঝে। সুনীল আকাশ ;
সমুজ্জ্বল দিবাভাগে তপন কিরণে ;
জ্যোতির্ম্ময় নিশাকালে তারকার করে ;
চন্দ্রালোকে দীপ্তিমান। তুষার-ঝটিকা
না জানে সে দেশে লোক। মধুর পবন
বহে সেথা সংবৎসর। স্রোতস্বতী যত
অমৃত সলিলে পূর্ণ। তরু লতাগণ
ফলে, ফুলে শোভাময়। নাহি জানি নাম,
আস্বাদে, সৌরভে কিন্তু চিত্ত বিমোহিত।
বিশাল সে দেশ ; কোথা গিরি সুমহান
গগনে তুলিয়া শির, আছে বিরাজিত।
কোথা বনভূমি, পূর্ণ ভীষণ শ্বাপদে ;
কোথা রম্য উপবন, পুষ্পে সুশোভিত,
মুখরিত বিহগের মধুর সঙ্গীতে।
যোজন যোজন ব্যাপী ক্ষেত্র স্নিগ্ধ শ্যাম
শোভে কোথা ; কোথা নদী বহে কল কলে।
খনি গর্ভে জন্মে মণি ; সাগরে মুকুতা ;
নারী সেথা নিরুপমা। সমৃদ্ধা নগরী ;
ফলে, শস্যে পূর্ণ পল্লী। কি কব অধিক,
স্বর্গ স্বর্গ বলে লোক, স্বর্গ হিন্দুস্থান।"
হাসিয়া কহিলা ঘোরী ;
"হেন স্বর্গ হ'তে
কেন তবে এলে ফিরি ?"
উত্তরিলা দূত ;
"আসিলাম, জাঁহাপনা ! পথ দেখাইতে,
সঙ্গে পুনঃ যাব বলে।"
কহিলেন ঘোরী ;
"কি দূত ! কহ শুনি, কোন্ কোন্ স্থান
দেখিয়া এসেছ তুমি।"
নিবেদিলা দূত ;
"এসেছি হেরিয়া, প্রভো ! যমুনার তীরে
প্রাচীন নগরী দিল্লী, পূর্ণ ধনে জনে ;
জয়স্তম্ভে, দেবালয়ে, সুরম্য প্রাসাদে
অনুপম ধরামাঝে। দেখেছি কনোজ,
অবস্থিত গঙ্গাতটে, নানা দেশজাত
পণ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ। দেখেছি আজমীর,
মরুসিন্ধু মাঝে, প্রভো ! রম্য দ্বীপ সম
শোভাময়। হেরিয়াছি মথুরা নগরী,
বারাণসী, পুণ্যতীর্থ উভয় হিন্দুর।
আরও কত শত স্থান ; হিন্দুস্থানে গিয়া
এসেছি যা' নিরখিয়া বর্ণিবার নয়।"

যে, Khaja Mainuddin chisti came with Sultan Shahabuddin when he invaded India again in 1192 A. D. ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে,—He is said to have passed days together in devotion and meditation. * * He never preached aggression, was a man of peace and good will towards all God's creatures. Ajmer Historical and discriptive PP. 90-91'

স্বধর্ম্মের আদর্শ অনুযায়ী আচারনিষ্ঠ হইলেও ইহাঁর রণদক্ষতার অভাব ছিল না। খান্দেশের অন্তর্গত নন্দুরবার ইনিই জয় করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

. Imperial Gazetteer. Vol. XVIII p. 36২.

"কি তুমি দেখেছ, এবে, বলহ, হানিফ্ !"
সম্বোধি দ্বিতীয় দূতে কহিলেন ঘোরী ;
"কোন বেশে ছিলে সেথা ?"
উত্তরিলা দূত ;
"মৌনী সন্ন্যাসীর বেশে ছিনু আমি সেথা ;
তীর্থে তীর্থে, গ্রামে গ্রামে করেছি ভ্রমণ ;
দেখিয়াছি রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ।
পশি কভু যজ্ঞশালে, কভু দেবালয়ে,
হেরিয়াছি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার হিন্দুর ;
শুনিয়াছি শাস্ত্রপাঠ হ্রীং, ক্লীং, ওঁ।
কিন্তু, জাঁহাপনা ! আমি না পারি বুঝিতে
কেন বিশ্বস্রষ্টা হেন মনোহর দেশে
এ হেন অধম জাতি করিলা সৃজন,
ধর্ম্মহীন, জ্ঞানহীন ! এক, অদ্বিতীয়
ভুলি পরমেশে আছে মূর্ত্তিপূজা লয়ে।
অদ্ভুত তাদের ধর্ম্ম ; কেহ পূজে তরু,
কেহ নদী, কেহ গিরি। বিচিত্র তাদের
মনোভাব, পূজারীতি। কহে কোন জন
"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" ; আবার কেহ বা
নৃত্য করে নরবলি করিয়া প্রদান।
কেহ শাক্ত, কেহ শৈব, বৈষ্ণব কেহ বা ;
কেহ পূজে বুদ্ধে, কেহ পূজে জিনদেবে।
নাহি হিতাহিত জ্ঞান ; মুক্তিলাভ তরে
কেহ ডুবে নদীজলে ; গিরিশৃঙ্গ হ'তে
পড়ে কেহ লম্ফ দিয়া ; রথচক্র-তলে
হয় কেহ নিষ্পেষিত ; বক্ষে বিঁধে শূল ;
বিদারে রসনা বাণে। নির্ম্মম, নিষ্ঠুর
পুত্রে দেয় ভাসাইয়া সাগরের জলে ;
দগ্ধ করে, অবিভেদে, মাতায়, সুতায়,
বাঁধি চিতাকাষ্ঠে, তার মৃত পতি সনে ;
বাজায় দামামা, যদি করে আর্ত্তনাদ।
বলে সবে হিন্দু মোরা, কিন্তু পরস্পর
জাতিধর্ম্মোদ্বেষে নিত্য রত বিসংবাদে ;
নাহি সখ্য, নাহি প্রেম। উচ্চবর্ণ যদি
চামার, চণ্ডাল আদি হীন জাতি নরে
স্পর্শে কভু, স্নান করি শুচি হয় তবে।
নহে বুদ্ধিহীন তারা ; তর্কে সুনিপুণ ;
রচিয়াছে বহু গ্রন্থ। কিন্তু নাহি জানি,
কেন হেন মতিভ্রান্ত ! ব্যথিত অন্তর,
হিন্দুর দুর্দ্দশা হেরি। সুল্‌তান মামুদ,
ভাঙ্গি দেবালয়, অর্থ করিয়া হরণ,
দণ্ডিলা বিধর্ম্মিগণে। কিন্তু, জাঁহাপনা !
ফলে নাই ফল তাহে থামিলে ঝটিকা
দাঁড়ায় যেমন তরু, পুনঃ, তুলি শির,
তেমনি উঠেছে হিন্দু। তীব্র শাস্তি বিনা
না হইবে সচেতন ; মস্‌লিম সমাজে
ধার্ম্মিকের বন্ধু এক জাঁহাপনা বিনা
এ অধর্ম্ম, অনাচার করিতে উচ্ছেদ
না আছে অপর কেহ। কালক্ষেপ আর
না হয় উচিত, প্রভো ! সঙ্কটে, বিপদে
মস্‌লিমের বল যিনি, মহান্ ঈশ্বর,
হ'বেন সহায় তিনি"
নীরবিলা দূত।
ঘোরীর ললাটদেশ হইল কুঞ্চিত।
ত্যজি মালা জপ, ফিরি কুতবের পানে
চাহিলেন মৈমুদ্দীন।
কহিলেন ঘোরী ;
"কি তুমি দেখেছ, সেথা, কহ, জাঁহান্দর !"
কহিলা তৃতীয় দূত ;
সত্য, জাঁহাপনা !
হিন্দুস্থান সমদেশ নাহি এ ধরায়।
কিন্তু যে ফণীর শিরে থাকে মহামণি,
দন্ত তার বিষে ভরা। নিরখি তাদের
বলবীর্য্য, বুঝিয়াছি বীর হিন্দুজাতি ;
দুর্দ্ধর্ষ সমরক্ষেত্রে। বুঝিয়াছি আরও
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ; হ'ক ধর্ম্ম তাহাদের
ভ্রমাত্মক, তবু প্রাণ দিবে তার তরে।
প্রজা সেথা রাজভক্ত ; রাজার আদেশে
অনলে, গরলে, জলে না ডরে মরিতে।

আছে জাতিভেদ সত্য কিন্তু হিন্দুনামে
এক সূত্রে বাঁধা সবে। না বুঝে, না ভেবে,
হিন্দুস্থান আক্রমণ উপযুক্ত নয়।
দেখিয়াছি হিন্দুস্থানে আছে তরু এক
বটনামে; মহা বাহু করিয়া বিস্তার,
পূর্ণ করি রাখে গ্রাম; শাখা হতে তার
সূক্ষ্ম সূত্রসম মূল, পরশিয়া ভূমি,
ক্রমে হয় মহাতরু; আকর্ষিয়া রস,
রহে সঞ্জীবিত, মূল বৃক্ষ ধ্বংস হ'লে।
তেমতি এ হিন্দুজাতি ধরে, জাঁহাপনা।
অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি; হ'ক মূলচ্ছেদ,
উৎপাটন শাখা তবু রহিবে বাচিয়া। *
কি কাজ বিবাদে তবে হেন শত্রু সনে?
কি ফল প্রতিমাভঙ্গে, লুণ্ঠনে, পীড়নে?
"কহ, দূত!" জাঁহান্দরে কহিলেন ঘোরী
"এতদিন আছিলে যে হিন্দুস্থান মাঝে,
পার কি বলিতে তুমি সমরকৌশল
কিরূপ হিন্দুর? অশ্ব, গজ, পদাতিক
শিক্ষিত কেমন? অসি, শূল, ধনুর্ব্বাণ
কোন্ অস্ত্রে পটু তারা?"
উত্তরিলা দূত;
"নহি যোদ্ধা আমি, প্রভো! বর্ণিব তথাপি
দেখিয়াছি যাহা; হিন্দু বলী গজবলে।
সচল পর্ব্বত সম গজযূথ যবে
হয় যুদ্ধে অগ্রসর, নাহি শক্তি কার (ও)
রোধিতে তাদের বেগ; অরাতির সেনা
চূর্ণ হয় দণ্ডমাত্রে। দেখিয়াছি আর (ও)
শরক্ষেপে অদ্বিতীয় হিন্দু পদাতিক,
অব্যর্থ সন্ধানী সবে। বিশ্বাস আমার
না পারিবে মুসলমান আঁটীতে হিন্দুরে
গজে, পদাতিক সৈন্যে। দ্বিতীয় রুস্তম *
জাঁহাপনা! করুন্ তা' উচিৎ যা হয়।"
ইঙ্গিতে বিদায় করি রাজদূতগণে
কহিলেন তবে ঘোরী;
"শুনিলেত সবে
যা কহিলা দূতগণ; কিবা যুক্তি বল।"
কহিলা কুতব;
"প্রভো! বীরভোগ্যা ধরা,
চিরদিন ঘোষে লোক। এ হেন সম্পদ,
এ সৌন্দর্য্য ভোগ যদি, পুরুষ হইয়া,
না করিনু, বৃথা জন্ম অবনীমণ্ডলে।"
"সত্য! কিন্তু শুনিলেত?"
কহিলেন ঘোরী;
'দুর্দ্ধর্ষ সমরে হিন্দু; না করি বিচার,
উচিৎ কি যুদ্ধারম্ভ তাহাদের সনে?
কহিলা কুতব; –
"প্রভো! না করি বিচার,
কখন কর্ত্তব্য নয়; কিন্তু, জাঁহাপনা।
দেখুন বারেক ভাবি, বালক কাসিম? †
করেছিল জয় যবে এই হিন্দুগণে,

---

* হিন্দুদিগের জীবনীশক্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে:--

Even when the overlord of central authority was vanquished the separate groups and units had to be defeated in detail and each state supplied a nucleus for subsequent revolt. The popular notion that India fell an easy prey to the Musalmans is opposed to the historical facts * * At no time was Islam triumphant throughout the whole of India. Hindu dynasties always ruled over large areas. Hunter's Indian Empire. PP. 322-23.

* রুস্তম মুসলমানদিগের ভীম ছিলেন। মহম্মদ ঘোরীর অসাধারণ বল বীর্য্যের জন্য তবকাৎ-ই নাসিরী প্রণেতা তাঁহাকে Haidar (সিংহ) of the time and a second Rustem বলিয়াছেন। Page 460.

† ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে কাসিমের বয়স বিংশতি বর্ষ মাত্র ছিল।

বীরত্ব, শূরত্ব কোথা আছিল তাদের ?
অষ্টাদশ বার বীর সুলতান মামুদ
লুণ্ঠিলা হিন্দুর দেশ, ভাঙ্গিলা মন্দির,
বিচূর্ণিলা সোমনাথ। কোথা ছিল তবে
হিন্দুর বীরত্ব ? হিন্দু নহে বীর্য্যহীন,
সত্য ; কিন্তু অন্ধ প্রায় ভ্রমে, কুসংস্কারে।
কাসিম দেবলপুরী আক্রমিলা যবে,
ঘোষণা করিল হিন্দু ; মন্দির-চূড়ায়
যাবৎ পতাকা এক রহিবে উড্ডীন,
না পারিবে শত্রুসৈন্য প্রবেশিতে পুরে।
কৌশলী কাসিম শুনি, ধ্বজা লক্ষ্য করি,
হানিলা অজস্র অস্ত্র ; ছিঁড়িল পতাকা ;
নিরাশা-পীড়িত হিন্দু হ'ল পরাজিত। †
ব্যবহারে শিশু তারা ; আলোর ভূপতি
দাহির, দৈবজ্ঞে ডাকি জিজ্ঞাসিলা তারে ;
'কোথা শুক্রগ্রহ এবে করিতেছে স্থিতি ?
কি হবে যুদ্ধের ফল ?" দৈবজ্ঞ কহিল ;
"সমুখে তোমার শুক্র পশ্চাতে তাদের
যুদ্ধে তারা হবে জয়ী।" কহিলা ভূপতি,
"কর কিছু প্রতীকার।" ডাকি স্বর্ণকারে
শুক্রের সুবর্ণ মূর্ত্তি গড়ায়ে ত্বরায়
রাজায় পশ্চাতে বাঁধি অশ্বের পর্য্যাণে
দিল পাত্রমিত্রগণ ; কহিল বুঝায়ে ;
"পশ্চাতে যখন শুক্র যুদ্ধে হবে জয়।"
নির্ব্বোধ দাহির, নাহি বুঝি নিজ বল,
পশিল সমরে, যুঝি সিংহের বিক্রমে
মুসলমান-অসিঘাতে প্রাণ দিল শেষে। *
জানে প্রাণ দিতে হিন্দু, কিন্তু নাহি জানে
শৃঙ্খলা, সমরনীতি ; স্বভাবে সরল ;
দেখে দিন, দেখে ক্ষণ, শুভাশুভ যোগ ;
নাহি বুঝে, রোগ-অগ্নি-সমর-সঙ্কটে
ক্ষণমাত্র কালক্ষেপে ঘটে সর্ব্বনাশ।
না জানে পুরুষকার, দৈব, দৈব করি
নয়ন থাকিতে অন্ধ ; হ'ছটে, হাঁচিতে
কাক শৃগালের রবে গণে পরমাদ।
অল্পে হয় বিশৃঙ্খল ; নায়ক অভাবে,
ভাঙ্গি ব্যূহ, মেষ সম করে পলায়ন।
দাহির, অনঙ্গপাল † হস্তী আরোহণে

---

† While Kasim was considering the difficulties opposed to him, he was informed by some of his prisoners that the safety of the place was believed to depend on the flag which was displayed on the tower of the temple. He directed his engines against that sacred standard, and at last succeeded in bringing it to the ground which occasioned so much dismay in the garrison as to cause the speedy fall of the place. The fall of the temple seems to have led to that of the town.]

Elphinstone's History of India. Cowell's Edition. P. 308.

Dahir then said to an astrologer, "I must fight to day ; tell me in what part of the heavens the planet Venus is and calculate which of the two armies shall be successful, and what will be the result." After the computation the astrologer replied. According to the calculation the victory shall be to the Arab army, because Venus is behind him and in front of you. Rai Dahir was angry on hearing this. The astrologer then said, "Be not angered, but order an image of Venus to be prepared of gold." It was made and fastened to his saddle-straps in order that Venus might be behind him, and he might be victorious.

Chachnama Elliot's History of India vol. I. P. 169.

During the heat of the attack which was made on him a fire ball struck the Raja's elephant and the terrified animal bore its master off the

এসেছিল যুদ্ধে দোঁহে, তীক্ষ্ণ শরাঘাতে,
জ্বলন্ত কন্দুকে করী গেল পলাইয়া,
বিধ্বস্ত বিপুল সেনা হইল নিমেষে।
শুনিয়াছি আছে লেখা শাস্ত্রে তাহাদের,
মুসলমান হিন্দুস্থান আক্রমিবে যবে
হ'বে তারা পরাজিত ; সাম্রাজ্য তুর্কের
প্রতিষ্ঠিত হবে সেথা। হিন্দু, শাস্ত্রভীরু,
আছে চিন্তান্বিত হ'য়ে ; প্রবেশিলে মোরা
হিন্দুস্থানে, নিরাশায় হ'বে পদানত। *
নাহি চিন্তামাত্র, প্রভো ; জিনিব নিশ্চিৎ,
জিনিব হিন্দুরে রণে। মামুদনির্ম্মিত
অই জয়স্তম্ভ † হ'তে স্তম্ভ উচ্চতর
স্থাপিব হিন্দুর দেশে ; চূড়া হ'তে তার,
ঘোষিবে মোঝান "আল্লা আকবর বলি ;
বুঝিবে তা' হ'লে হিন্দু বীর মুসলমান
কা'র বলে বলী ; যুদ্ধে অজেয় কি হেতু।"

---

field, and could not be stopped until it had plunged into the neighbouring river. The disappearance of the chief produced its usual effect on Asiatic armies, and although Dahir, already wounded with an arrow, mounted his horse and renewed the battle with unabated courage, he was unable to restore the fortune of the day, and fell fighting gallantly in the midst of the Arabian Cavalry.

Elphinstone's History of India. P. 309.

অনঙ্গপাল লাহোরের অধিপতি জয়পালের পুত্র। মামুদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে ;—The elephant, upon which the prince who commanded the Hindoos rode, becoming unruly from the effects of the naptha-balls, and the fights of arrows turned and fled. This circumstances produced a panic among the Hindoos, who, seeing themselves deserted by their general, gave way, and fled also. Brigg's Ferista Vol. P. 47.

* এই বিশ্বাসে প্রকৃতই কোন কোন ভারতীয় রাজা মুসলমানদিগের নিকট একরূপ বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের বৃত্তান্ত সকলেরই সুপরিচিত। সিন্ধুদেশের অন্যতম শাসনকর্ত্তা কাকা কোটাল কাসেমের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার যুযুৎসু স্বদেশীয়গণের বিরুদ্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—He also said that the Almighty God misled them (his countrymen) in their way, so that they were wandering about the whole night in darkness and chagrin, and that the astrologers and credible persons of his country had found out by their calculations of the stars that this country would be taken by the Mahammadan army. He had already seen this miracle, and he was sure that this was the will of God, and that no device or fraud would enable them to withstand the Muhammadans.

Cachnama Elliot's History of India, Vol. I PP. 161-62.

† এই জয়স্তম্ভ সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—The only remains retaining architectural characters are two remarkable towers rising to the height of 140 fit. They belong, on a smaller and a far less elaborate scale, to the same class as the Kutb Minar at Delhi.

Encyclopædic Britanica, Vol. XI P. 254

গজনীস্থিত স্তম্ভ ১৪০ ফিট, কুতব মিনার ২৮৩ ফিট উচ্চ। কুতব মিনার যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত, তৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে ;—The original purpose of the minaret was doubtless as Muazzin's tower whence the call to morning and evening prayer might be heard throughout the whole city.

Imperial Gazetteer, Vol. XI. P. 231.

সম্বোধিয়া মৈনুদ্দীনে কহিলেন ঘোরী,
"কহ, সাধুবর ! তব কিবা অভিপ্রায়।"
কহিলেন সাধু, ধীর মধুর বচনে ;—
"পরধনে, পরদারে অকর্ত্তব্য লোভ,
কিন্তু প্রাণপণে সত্যধর্ম্ম প্রচারিতে
বলেছেন হজরৎ। কত ধর্ম্মবীর
আরবে, ঈরাণে, রুমে সত্যধর্ম্ম তরে
করেছেন প্রাণদান ; স্বর্গবাসী তাঁরা।
মোহান্ধ, ভ্রমান্ধ হিন্দু, ভুলি পরমেশে,
আছে মূর্ত্তিপূজা লয়ে ; ভ্রম তাহাদের
হ'বে ঘুচাইতে। অগ্রে পাঠাইয়া দূত
কহিতে হইবে, "হিন্দু। ত্যজ মূর্ত্তিপূজা,
লহ সত্যধর্ম্ম, পুজ এক, অদ্বিতীয়ে" ;
সম্মত হইলে যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন।
কিন্তু মোহগর্ব্বে তারা না শুনিলে কথা
হ'বে যোগ্য শিক্ষা দিতে ; শিক্ষক যেমতি
শিক্ষা দেন দণ্ড দিয়া অশিষ্ট বালকে।"
"কহিল যে জাঁহান্দর বীর হিন্দুজাতি ;
চিন্তামাত্র নাহি তাহে ; হ'ক শূর, বীর,
চূর্ণ হ'বে রেণু সম ; সহায় মোদের
নিজে সর্ব্বশক্তিমান্। কে রক্ষিল, বল,
সুলতান মামুদে, যবে, মরুভূমি মাঝে,
প্রতিহিংসাপর হিন্দু ভুলাইয়া তাঁরে
আনিল কুপথে ? বীর, তৃষ্ণায় আকুল,
অবসন্ন, পথশ্রান্ত, কণ্ঠাগত প্রাণ,
ডাকিলা কাতর হ'য়ে "রক্ষ, প্রভো" বলি।*
উপধর্ম্মসেবী হিন্দু না পারিবে কভু
রোধিবারে সত্যধর্ম্মসেবী মুসল্‌মানে।"
"সুসঙ্গত বটে কথা।"
কহিলেন ঘোরী ;
"বল এবে, হামজবী ! অভিপ্রায় তব।"
কহিলেন হামজবী ;
"রাজরাজেশ্বর !
ধর্ম্ম, অর্থ ভূমণ্ডলে প্রিয় মানবের।
প্রশংসিত সেই, এই উভয়ের মাঝে,
একটীও আছে যার। মহা ভাগ্যবান্
সেই নর, দুই যদি পারে অর্জ্জিবারে।
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, বীর্য্যে জাহাপনা সম
আছে কেবা ভাগ্যবান্ ?* দেখুন চিন্তিয়া,

---

* After the army had marched all night and next day and the time had come round for the troops to halt although search was made for water none was nowhere to be found. The Sultan directed that the Hindu guide should be brought before him. This was done, when the Hindu guide replied to the Sultan saying : 'I have devoted my life to the idol Somnath and I have led you and your army to this desert, in any part of which water is not to be found, in order that you may all perish. The Sultan commanded that the Hindu should be despatched to hell, and that the troops should halt and take up their quarters for the night. He then waited until night had set in, after which he left the camp, and proceeded some distance from it aside. Then kneeling down and with his forehead to the ground he prayed devoutly and fervently unto the most High for deliverance. After a watch of the night had passed, a mysterious light appeared in the horizon, and the Sultan gave orders for the troops to be put in motion, and to follow him in the direction of the light. When the day broke, the Almighty God had conducted the army of Islam to a place where there was water, and all the Musalmans were delivered safely out of this impending danger.

The Tabakat-i-Nasiri, P. 83.

* হিন্দুদিগের দৃষ্টিতে যিনি যাহাই হউন, মুসলমানের নিকট মুসলমান কিরূপ লক্ষিত হইতেন, তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

আক্রমিলে হিন্দুস্থান, বিধির কৃপায়,
উভয় হইবে লাভ। অর্থে অগণিত
পূর্ণ হ'বে রাজকোষ; ততোধিক লাভ
হ'বে হিন্দুস্থানে সত্যধর্ম্মের প্রচারে।
কিন্তু এই মহাকার্য্য না হবে সাধিত
সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বিনা; লুণ্ঠনে, পীড়নে
না হইবে স্থায়িফল। সুল্‌তান মামুদ,
রাজা, প্রজা লুণ্ঠি সবে, আনিলা যে ধন,
কোথা গেল? স্বর্ণ, হীরা, মণি, মুক্তা রাশি
অশ্রুবিন্দু সনে তাঁর গিয়াছে মিশিয়া,
জলে জলবিম্বপ্রায়; চিহ্ন নাহি এবে। †
ভাঙ্গিলা যে দেবমূর্ত্তি কি ফলেছে ফল?
ত্যজেছে কি মূর্ত্তিপূজা হিন্দু নর, নারী?
বৃথা সেই অভিযান; বিদ্যুতের জ্যোতি,
ঝলসিয়া আঁখি, মাত্র ডুবায় আঁধারে।
ধর্ম্মে, অর্থে স্থায়ী ফল চাহি যদি মোরা,
পুত্র পৌত্রক্রমে যদি চাহি সুখভোগ,
স্থাপিতে হইবে রাজ্য হিন্দুস্থান মাঝে;
একবার বসি যদি উঠিব না আর।"
    "সুযুক্তি, সুপরামর্শ!
                                        কহিলেন ঘোরী;
"নাহি অভিলাষ মোর মামুদের সম,
ঝটিকার বেগে পড়ি, ঝটিকার প্রায়,
হ'তে পুনঃ অন্তর্হিত; বাঞ্ছা সংস্থাপিতে
স্থায়ী রাজ্য হিন্দুস্থানে। কুতব! তোমারে
দিনু এ কার্য্যের ভার; কর আয়োজন;
দেশ দেশান্তর হ'তে আন সেনাদল।
শুনেছ ত জাঁহাঙ্গীর যা' কহিল এবে,
গজসৈন্যে, পদাতিকে হিন্দু বলবান্;
কিন্তু নাহি চিন্তা তাহে। সুবিদিত তব,
রণক্ষেত্রে মত্তগজ ঘটায় বিপদ,
শত্রুমিত্র উভয়ের; পায় যদি ত্রাস,
না মানে অঙ্কুশ, করে উভে বিদলিত।
পদাতিক শ্রান্ত হয়, রণক্ষেত্র যদি
হয় দীর্ঘ, সুবিস্তৃত; না পারে সহিতে
দূর পর্য্যটন ক্লেশ, লৌহবর্ম্মভার;
চালনায় শ্লথগতি। অশ্ব আমাদের,
পরিশ্রমী, দৃঢ়কায়, তুষ্ট অল্পাহারে,
উল্লম্ফনে, সন্তরণে, গিরি-আরোহণে
শ্রেষ্ঠ প্রতিপক্ষ হতে। অশ্ববলে মোরা
গজ, পদাতিক দুই করিব বিজয়।
কর আয়োজন তুমি; বুঝিলে সময়,
শ্যেন যথা পড়ে গিয়া কপোতমাঝারে
পড়িব হিন্দুর দেশে। প্রকৃতি তাদের
বুঝেছি উত্তম আমি। বীরত্বে, বিক্রমে
যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী তারা; ধরে বহুগুণ।
কিন্তু জাতি-জ্ঞাতি-বৈরে জর্জ্জরিত তারা;
ভ্রষ্ট সত্যধর্ম্ম হ'তে; পতন তাদের
অনিবার্য্য। শিলাখণ্ড বাঁধা পরস্পর
রোধ করে গিরিস্রোত, তরঙ্গ উত্তাল;
কিন্তু অনাবদ্ধ হলে, উলটি পালটি,
হয় ক্রমে রেণুশেষ। হিন্দু বটে দৃঢ়,
বন্ধন না আছে কিন্তু তাহাদের মাঝে।
শত জাতি, শত ধর্ম্ম, শত রাজ্য যেথা
ধ্বংসে রত পরস্পর কেমনে তথায়

মহম্মদ ঘোরীর প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ফেরেস্তা এইরূপ লিখিয়াছেন;—Muhammad Ghoury bore the character of a just monarch, fearing God and ever having the good of his subjects at heart. He paid good attention to learned and devout men and was never deficient in serving them to the utmost of his power. Briggs' Ferista, Vol. I. P. 187.

† It is a well established fact that two days before his death, he commanded all the gold and caskets of precious stones in his possession to be placed before him: when he beheld them he wept with regret, ordering them to be carried to the treasury.

Briggs' Ferista Vol. I. P. 84.

বন্ধন, মিলন হবে? কিন্তু মোরা সবে
এক জাতি, এক ধর্ম্মী, এক ভূপতির *
আজ্ঞাধীন : মোরা যবে হ'ব অগ্রসর,
স্রোত-মুখে বালুসম যাবে ভাসি তারা।
আর (ও) শুন গূঢ় কথা ; মূঢ় হিন্দুজাতি
গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশিতে না হয় বিমুখ।
চিরদিন এই রীতি শুনিতেছি আমি,
যখন(ই) বিদেশী কেহ প্রবেশে ভারতে
স্বদেশ-স্বধর্ম্মদ্রোহী হিন্দু কোন জন
আসি পক্ষ লয় তার। সিকন্দর বীর
পশিলা পঞ্জাবে যবে, তক্ষশিলাপতি
অশ্ব, অর্থ, খাদ্য সনে শিবিরে তাহার
পাঠাইয়া দিল দূত।† সুলতান মামুদে
লয়ে অশ্বসৈন্যহৃষ্ট শিবানন্দ রায় ‡
করিল সাহায্য দান। প্রবেশিলে মোরা
হিন্দুস্থানে, সাহায্যের না হবে অভাব।
জান সবে হিন্দুস্থানে ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে
অগ্রগণ্য দিল্লী। আমি পেয়েছি সংবাদ,
বিবাদের বিষবীজ হয়েছে রোপিত
দিল্লীরাজ্যে ; বৃদ্ধ রাজা গেলে তীর্থবাসে
বাধিবে বিবাদ ঘোর ভ্রাতায় ভ্রাতায় ;
একে করি হস্তগত নাশিব অপরে।
দিল্লী যদি একবার হয় অধিকৃত,
ইসলামপ্রভুত্ব স্থায়ী হবে হিন্দুস্থানে।"
নীরব হইলা বীর।
কহিলা কুতব ;
ধন্য জাঁহাপনা ধন্য ! প্রভুর আদেশে
স্থাপিব বিজয়স্তম্ভ দিল্লীর মাঝারে,
করিনু প্রতিজ্ঞা এই।"* সহসা মসজিদে
উচ্চে মোঝানের † ডাক "আল্লা হু আকবর"
পশিল সবার কর্ণে। শশব্যস্ত হয়ে
উঠিলেন সর্ব্বজন, ভাঙ্গিল মন্ত্রণা। ‡

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

---

* মহম্মদ ঘোরী কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজা এবং আপনাকে তাঁহার অধীন সেনাপতি বলিয়া প্রচার করিতেন

† At Onind Alexander was met by an embassy from Amohi (Omphis), who had then succeeded to the throne of Taxila, the great city three marches beyond the Indus. The lately deceasd king had met the invader in the previous year at Nikaia and tendered the submission of his kingdom. This tender was now renewed on behalf of his son by the embassy, and was supported by a contingent of 700 horse and the gift of valuable supplies comprising thirty elephants, 3000 fat oxen, more than 10000 sheep, and 200 talents of silver. V, Smith's Early History of India, P.60.

‡ এই শিবানন্দ রায় বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সহ মামুদের সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর গজনীর আভ্যন্তরীণ বিরোধে লিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

A numerous body of Hindoo cavalry under Sewand Rai is stated to have taken part in the troubles at Ghazni within two months after the Sultan's death; when it is obvious that he must, during his lifetime, have availed himself of the services of his subjects. Elphinstone's History of India, P. 350

* সুপ্রসিদ্ধ কুতবমিনার হিন্দু অথবা মুসলমান কাহাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। যে মতই প্রকৃত হউক, কুতব তাঁহার নামে পরিচিত স্তম্ভ আমূল নির্ম্মাণ করিয়া থাকুন বা পূর্ব্ব নির্ম্মিত স্তম্ভের যাবনিক আকার প্রদান করিয়া থাকুন, তাঁহার মুখে আরোপিত কথাগুলি, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।

† মোঝান নমাজের জন্য আহ্বানকারী।

‡ এই সর্গে বক্তাদিগের মুখে যে সকল কথার আরোপ করা হইয়াছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের পক্ষে সেই সকল কথা বলা সম্ভবপর কি না, যদি কাহারও তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়, তবে, তাঁহাকে পৃথ্বীরাজের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান লেখক অলবিরুণীর গ্রন্থ পাঠ করিতে বলি। তাহাতে মুসলমানের হিন্দুজাতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

গ্রীক-দর্শন।

১। চিন্তার প্রাধান্য।

প্লেটো।

প্লেটো খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ৪২৭ অব্দে এথেন্সের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ হিরাক্লাইটাসের শিষ্য ক্রেটাইলাসের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া পরে তিনি সক্রেটিস ও মিগারার ইউক্লিডিসের শিষ্যত্বগ্রহণ করতঃ তৎকালে পারমিনাইডিসের দর্শন অধ্যয়ন করেন। পিথাগোরিয়ানদিগের গণিতের গবেষণায় তাঁহার চিন্তাশক্তি বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৩৮৫ হইতে ৩৪৭ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তিনি একটী বিদ্যালয়ে দর্শনশিক্ষা দিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যামন্দিরটী তাঁহার কয়েকজন বন্ধু কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত প্লেটোনিক সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল।

সংসারে প্রবেশলাভের পথ খুঁজিয়া বাহির করা কাহারও ইচ্ছাধীন নয়। সক্রেটিস শিল্পীর সন্তান, নিজেও শিল্পী ছিলেন, তাই তিনি জনসাধারণের সহিত মিশিতে ভালবাসিতেন; তবে তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, তিনি জনসাধারণের ত্রুটী গুলিকে ঘৃণা করিতেন এবং তাহাদিগকে উন্নত করিতে ও সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সোলন (Solon) এবং কোড্রাসের (Codrus) বংশধর প্লেটো যেন দর্শনে যুগান্তর সাধনের জন্যই সংসারে অবতীর্ণ হন। তাঁহার নিকট রূপই সর্ব্বস্ব; উপাদান বিকার, সৃষ্টির অন্তরায়। তিনি কবি ও ভবিষ্যদ্বক্তা, সাধারণের মতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল না; অনন্ত, অদ্বন্দ্ব এবং আদর্শই যেন তাঁহার আলয় ও বিচরণভূমি। তিনি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রিয় উপদেষ্টা, পরাবিদ্যাসাধক (Theosophists) ও দৈবদর্শী (Mystics)দিগের নেতা। সক্রেটিসের চিন্তাস্রোত মন্থর, দায়িত্ববিমুখ, সন্দেহ কিম্বা অজ্ঞাতের আশঙ্কায় সঙ্কুচিত। প্লেটোর দর্শন উদ্দাম তরঙ্গময়, সমস্যাভঞ্জনে সমুৎসুক। কূপমণ্ডূকের ন্যায় তাঁহার চিন্তার সীমা হাটবাজারেই আবদ্ধ নয়, জন্মভূমি বা সহরের চৌহদ্দীর সহিত তাঁহার জগৎ শেষ হয় নাই। সমস্ত বিশ্ব পরিভ্রমণান্তর তিনি যেন সম্রাটের ন্যায় স্বীয় প্রাসাদে বিশ্রাম লইয়াছেন, আর তাঁহার দৃষ্টি অনন্ত শূন্যে নিবদ্ধ। পথের ছোটখাটো কোলাহল উপেক্ষাকরতঃ তিনি সজ্জন ও সুধী সমাজে স্থানলাভ করিয়াছিলেন; স্বয়ং বীণাপাণি সে সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাহার ভাষা অমৃতবর্ষিণী এবং উচ্চভাবময়ী।

প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্লেটোর গ্রন্থই সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থ গুলির কয়েকখান, যথা 'পারমিনাইডিস,' 'সফিষ্ট,' 'ক্রেটাইলাস' এবং ফিলেবাস্' প্রভৃতির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন। 'আপলজি' ও 'ক্রিটো' সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ না থাকিলেও, সমালোচকগণ কর্ত্তৃক এদুখানিও প্লেটোকৃত নয় বলিয়া স্থির হইয়াছে। যে নয়খানি গ্রন্থ সর্ব্ববাদী-সম্মতক্রমে প্লেটো লিখিত বলিয়া গণ্য, তাহাদের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) ফিড্রাস্ (Phœdrus) অর্থাৎ স্বার্থান্ধ তার্কিকদিগের বিচারের প্রতিবাদ. (২) 'প্রোটাগোরাস' বা সক্রেটিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত, (৩) 'সিম্পোসিয়াম (Symposium) অর্থাৎ ইন্দ্রিয় লালসা হইতে আরম্ভ করিয়া সত্য' (Truth). সুন্দর (Beauty) এবং (Goodness) সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার (৪), গর্জ্জিয়াস,' বা প্রকৃতজ্ঞানী, (৫) রিপাবলিক' বা আদর্শ বিচার প্রণালী, (৬) টিমীয়াস (The Timœus) বা সৃষ্টিতত্ত্ব (৭) থীটেটাস বা (The Theœtetus) বা জ্ঞান ও আদর্শ, (৮) 'ফীডো' (The Phœdo) বা আত্মার অবিনাশিত্ব এবং (৯) 'লস্' (The Laws) বা 'রিপাবলিক' সম্বন্ধে স্বীয় মতের আংশিক প্রত্যাহার। গ্রন্থগুলি সমস্তই কথোপকথনে (Dialogueএ) লিখিত হইয়াছে। অনেকের মধ্যে সক্রেটিসকেই প্রধান বক্তারূপে এবং তাঁহার উক্তির সহিত গ্রন্থকর্ত্তার চিন্তাশক্তির বিকাশ দেখা যায়। কথোপকথন প্রণালী অবলম্বন করায় একাধারে তাঁহার নিজের দর্শন মত এবং সক্রেটিক সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত, উভয়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস 'ডায়ালোগ ফরমে' লিখিত হইলে গ্রন্থকর্ত্তার মনোভাব সম্যক্ আয়ত্ত করা যায় না। অপরের পক্ষে যাহা হউক, প্লেটো সম্বন্ধে এমতটী খাটে না; যেহেতু, প্লোটিনাস (Plotinus), স্পিনোজা (Spinoza) এবং হেগেলের (Hegel) ন্যায় তাঁহার দর্শন পূর্ণতা প্রাপ্ত না হওয়ায়, উহা সর্ব্বতোভাবে আয়ত্তাধীন হওয়া অসম্ভব। আর এক কথা, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে বক্তার মনোভাব প্রকাশে যদি বাধা ঘটে, তবেই উহাকে দোষাবহ বলিতে হইবে। প্লেটোর গ্রন্থে এরূপ ত্রুটী লক্ষিত হয় না। বক্তার মনোভাব এখানে এত অবাধগতি যে, বলিবার পদ্ধতি এবং বক্তব্যে পার্থক্য নাই, উভয়ে মিলিয়া যেন এক হইয়াছে।

প্লেটোর গ্রন্থে রূপক ও কাল্পনিক দেবদেবীর কিছু অতিরিক্ত উল্লেখ থাকায়, গ্রন্থখানি স্থল বিশেষে দুর্ব্বোধ মনে হয়। রূপক প্রয়োগের কারণ, হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, উহার সাহায্য ব্যতীত সাধারণ লোকে নিরালম্ব সত্যগুলি বুঝিতে পারিবে না; অথবা হয়ত ইহাও ভাবিয়া থাকিবেন, প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের ভাণ করিলে, সাধারণ তন্ত্রের গোঁড়াদিগের হাতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। সমালোচকদিগের আক্রমণ এড়াইবার জন্য তিনি কবিত্বেরও আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার দেবতাসমূহের অধিকাংশ যে তাঁহারই কল্পনাপ্রসূত, তাহা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন এবং তাহাদের প্রকৃত মূল্য কি, সে বিষয়েও পাঠকগণকে সতর্ক করিয়াছেন. কতকগুলি রূপকে তাঁহার নিজের মতও ব্যক্ত হইয়াছে। মোট কথা, কোন্ রূপক কোন্ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, তাহা নির্ণয় করা সকল স্থলে সহজ নহে। 'টিমীয়াস' এবং 'ফীডো' পাঠকালে কোন্ রূপকে তিনি নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন, আর কোন্টী বিরুদ্ধবাদীগণকে ভুলাইবার জন্য, অর্থাৎ কোন্টী সত্য, কোন্টী মিথ্যা, সে সম্বন্ধে পাঠকের ধাঁধাঁ লাগে। সে যাহা হউক, তাঁহার রচনা যে সরল ও স্বাভাবিক এবং ভাষা যে চিন্তানুবর্ত্তিনী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি 'টিমিয়াসে' সৃষ্টিতত্ত্ব রূপকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল। আবার লৌকিক বিশ্বাসানু-

সারে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তাকে শিল্পীর সহিত তুলনা করিয়াছেন, তখন ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, একেশ্বরবাদে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। 'ফীডোও' কল্পনা এবং রূপকে পূর্ণ, তাই বলিয়া একমাত্র হেগেল ভিন্ন কেহই বলিতে সাহস করেন নাই যে, প্লেটো কেবল জীবাত্মা এবং পরমাত্মা জন্যই জন্মান্তর ও অমরত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ভাব এবং ভাবপ্রকাশের পন্থায় যে কিছু বিরোধ, তাহাই পরিহার্য্য, এজন্য প্লেটো পাঠের পূর্ব্বে পাঠকের স্মরণ রাখা আবশ্যক, যেন তিনি রূপকের ফেরে পড়িয়া গ্রন্থকর্ত্তার মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হন, আর ইহাও যেন স্মরণ রাখেন যে, প্লেটো এমন কোন সিদ্ধ পুরুষ নহেন যে, তিনি একেবারে ভুল ভ্রান্তির অতীত, কিম্বা তাঁহার ধারণাশক্তি কল্পনাদুষ্ট হইতে পারে না। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দৈবদর্শন সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্লেটোর ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে গৃহীত হইয়াছে, এবং ইহাও সত্য যে, হেগেলের দর্শন মতের সহিত প্লেটোর 'ডায়ালেক্‌টিক্সে' মিল আছে; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কালের ব্যবধান অত্যন্ত অধিক। বিংশ শতাব্দী যাবত দর্শনের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে উহার প্রারম্ভ এবং পরিণামে মিল দেখাইতে গেলে, ঐতিহাসিকতায় ব্যাঘাত ঘটে। যাঁহারা বলেন, ভবিষ্যৎ অতীতেরই পরিণতি, তাঁহাদের যুগের উদ্ভব, পরিণতি এবং তিরোভাব ঘটে নাই, তাহাও দেখান আবশ্যক।

হিরাক্লিটিয়ান, সক্রেটিক এবং ইটালিয়ান দর্শন হইতে প্লেটোর উদ্ভব। হিরাক্লাইটাসের ন্যায় তিনি বিশ্বের নিত্য পরিবর্ত্তনশীলতায় বিশ্বাস করিতেন। ইন্দ্রিয়গণ প্রতারণাপরায়ণ, তাহাদের দ্বারা ধ্রুব জ্ঞান লাভ হয় না, অখণ্ড সত্য ইন্দ্রিয়-জগতের অতীত, জ্ঞান জগতের সামগ্রী। সক্রেটিসের নিকট তিনি এই শিক্ষা পান যে, বিশ্বের গূঢ়তত্ত্ব (ultimate principles) আমাদের অজ্ঞেয় থাকিলেও, সকলেই আপনাপন চরিত্র অবগত হইতে পারে, এবং একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীবনের সর্ব্বোচ্চ শ্রেয়ঃ কি, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। সক্রেটিস অধ্যাত্মজ্ঞানে (metaphysics) সন্দিহান ছিলেন, ইতালীয়ান দর্শনের সাহায্যে প্লেটো তাহাতে সন্দেহের কারণ দেখিতে পান নাই; পিথাগোরিয়ান এবং ইটালীয়ান দর্শনে তিনি সক্রেটিস বর্ণিত অন্তরেন্দ্রিয়কে কেবল যে নৈতিক জ্ঞান বা বিবেক বুদ্ধির (Moral conscience) এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের (Practical reason) আধাররূপে দেখিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাহাতে বস্তু সমূহের অনন্ত, অবশ্যম্ভাবী এবং নিরপেক্ষ সত্ত্বাপ্রকাশিকা বিচার (Theoretical Reason) বুদ্ধিরও সন্ধান পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অঙ্কশাস্ত্র এবং জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ মূলক সূক্ষ্ম বিচার প্রণালীতেও তিনি যারপর নাই মুগ্ধ হন। প্লেটো অধ্যাত্মবিদ্যায় জ্যামিতিক বিচার প্রণালীরই অনুসরণ করেন। জ্যামিতিশাস্ত্র স্বাভাবিক সংস্কার-জনিত জ্ঞানে (a priori Intuitions) প্রতিষ্ঠিত। জ্যামিতির রেখা, বৃত্ত, ত্রিভুজ ও বর্ত্তুল, ইহারা আদর্শরূপ এবং জ্ঞেয় সত্য। ইহাদের গুণসমূহ পরিবর্ত্তনের এবং পরিবর্ত্তনশীল বাহ্য জগতের অতীত, পক্ষান্তরে জগৎ ইহাদেরই বহিরাবরণ। জ্যামিতি বিশুদ্ধ জ্ঞানজাত বলিয়া ইন্দ্রিয়ানুভূতির সহিত উহার সম্বন্ধ নাই এবং উহার সত্যগুলি ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ

স্বাধীন (absolutely independent)। প্লেটোর দর্শনও এই জন্য, অঙ্ক ও জ্যামিতি শাস্ত্রের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ এবং অবশ্যম্ভাবী বিজ্ঞান, স্বাভাবিক সংস্কার এবং বিচার বুদ্ধির সামঞ্জস্য হইতে উৎপন্ন। জ্যামিতির সহিত সাদৃশ্য বশতঃ যে সকল স্বাভাবিক সংস্কারের উপর তাঁহার দর্শন প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদিগকে তিনি আদর্শ (Ideas) বা অপরিবর্ত্তনীয় রূপ, অনিত্য দ্রব্য জাতের নিত্য আকার (Types), পারমার্থিক সত্য (Noumena) এবং বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বরূপ বলিয়াছেন। আদর্শগুলি জগৎপ্রপঞ্চ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্লেটোর দর্শন প্রকৃতপক্ষে আদর্শ বিজ্ঞান (Science of Ideas)। নূতন প্রণালীতে, অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর স্থলে লিখিত বলিয়া 'ডায়ালেক্‌টিক্স' (Dialectics) নামে অভিহিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তন জগতের কল্পনা ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও গৌণ স্থানীয় বলিয়া, প্লেটোর মতে প্রকৃত বিজ্ঞান পদবাচ্য নহে। নীতি বিজ্ঞান (Ethics) হইতে শ্রেয়ঃ জ্ঞানলাভ হয়, এজন্য উহাকে ডায়ালেক্‌টিক্সের শেষে স্থান দেওয়া হইয়াছে; নীতিবিজ্ঞান সর্ব্বদর্শনের মুকুটমণি। অতঃপর, প্লেটোর দর্শন যে তিনটী প্রধান বিষয়ে বিভক্ত, তাহার আলোচনা প্রয়োজন। বিষয় তিনটী এই; (১) আদর্শ, ২ জড়প্রপঞ্চের উপর আদর্শের ক্রিয়া, এবং (') শ্রেষ্ঠ আদর্শ বা জগতের চরম উদ্দেশ্য।

আদর্শ।

সন্তানের মঙ্গলের জন্য জননীকে, দেশের মঙ্গলের জন্য যোদ্ধাকে এবং স্থির বিশ্বাসের বিনিময়ে দার্শনিককে যখন জীবন দিতে দেখা যায়, তখন তাহাদের এই সকল কার্য্যে একটী সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তাহাদের সকলের কর্ত্তব্যপ্রণালী একরূপ এবং সকলে একই আদর্শে প্রণোদিত। ইহাকে সাধু আদর্শ কহে। স্থাপত্য বিদ্যার নিখুঁত পরিণতির সহিত যখন সফক্লিসের মৃত্যু এবং ভাস্কর বিদ্যার সহিত যখন কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানব-মূর্ত্তির তুলনা করি, তখনও আমরা দেখিতে পাই যে, এই সকল বিভিন্ন দ্রব্যের ভিতর এমন একটী সাধারণ ঐক্য আছে, তাহাকে সৌন্দর্য্য বা সুন্দরের আদর্শ বলা যায়। যখন কোন জীবশ্রেণী এবং তদন্তগত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবের বিষয় চিন্তা করি, তখনও দেখিতে পাই যে, এক জাতীয় জীবের সকলেরই মধ্যে কতকগুলি গুণ সাধারণভাবে অবস্থিতি করে; সেই গুণগুলি সব যেন এক ছাঁচে ঢালা। সমস্ত মানবের মধ্যে যে সকল গুণ সাধারণভাবে বিদ্যমান, অথবা তাহাদের মধ্যে যে বিশিষ্ট আকার বা রূপ প্রতিফলিত হয়, তাহাকে, মানব বা মানবের আদর্শ (Idea of man) বলে। আবার যখন আমরা কেবলমাত্র প্রাণীর বিষয়ই চিন্তা করি, তখনও তাহাদের মধ্যে একটী সাধারণ সত্য দেখিতে পাই। সেই সত্যটী আর কিছুই নয়, উহা প্রাণীগণের বিদ্যমানতা বা অবিদ্যমানতা, স্থিতি বা গতিশীলতা, পরস্পরের সাদৃশ্য বা অনৈক্য। বস্তুমাত্রের 'থাকা' এবং 'না-থাকা', গতি এবং বিরাম, ঐক্য এবং অনৈক্য প্রভৃতি গুণগুলিকে প্লেটো সত্তার আদর্শ, গতির আদর্শ, ইত্যাদি নাম দিয়াছেন। এইজন্য আধুনিক দর্শনে যাহা (১) রীতি, নীতি ও চিন্তার প্রণালী (laws) আরিষ্টল্ যাহাকে (২) শ্রেণীবিভাগ, রূপ বা বস্তু জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়াছেন এবং (৩) জাতীয় পার্থক্য-

জ্ঞাপক প্রাণীবিজ্ঞানের যে সকল সংজ্ঞা, তাহাই প্লেটোর আদর্শস্থানীয়। সংক্ষেপতঃ নাম বা সাধারণ সংজ্ঞাসমূহ হইতে বস্তু-বিষয়ক যে শাশ্বত জ্ঞান জন্মে, তাহারই কারণ, আদর্শ। সুতরাং যতগুলি সাধারণ সংজ্ঞা, তদ্দ্বারা প্রকাশিত আদর্শ সংখ্যাও ততগুলি। অর্থাৎ প্রত্যেক নামের অর্থে একটী করিয়া আদর্শ প্রকটিত হইতেছে। ইন্দ্রিয়সংস্পর্শে যেমন বাহ্যজগতের জ্ঞান জন্মে, অন্তর্নিধান (abstraction) এবং সামান্যীকরণ (generalisation) দ্বারা সেইরূপ আদর্শের জ্ঞানলাভ হয়।

সংজ্ঞা নিরূপণই সক্রেটসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অপরাপর বিষয়ে তিনি বাস্তববাদের বিপক্ষতা করিলেও, সাধারণ সংজ্ঞাগুলিকে মনেরই ধারণা বা চিন্তাপ্রসূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই খানেই প্লেটোর মৌলিকত্ব। প্রত্যক্ষবাদের মতে ইন্দ্রিয়ানুভূতিই চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব্যজাতের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। প্লেটোর মত এই যে, নাম বা সংজ্ঞা দ্বারা দ্রব্যের বাস্তব সত্তা জ্ঞানগোচর হয়। নামের আশ্রয়ভূত সত্যগুলি (Realities), প্রত্যক্ষবাদীগণ যাহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন, প্লেটো তাহাদিগকেই আদর্শ বলিয়াছেন এবং সেই সত্যগুলিই তাঁহার দর্শনের মূলভিত্তি। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সহিত দ্রব্যজাতের যে সম্বন্ধ, দ্রব্যসমূহের জ্ঞানের সহিত তাহাদের আদর্শেরও সেই সম্বন্ধ। অর্থাৎ, আদর্শ সমূহই দ্রব্যজাতের বাস্তব কারণ (Objective causes)। ইন্দ্রিয়গণ প্রতারক, অথচ তাহারা যে সকল দ্রব্যের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটায়, তাহাদিগকেই আমরা সত্য বলিয়া বিবেচনা করি, আর দ্রব্য সমূহের আদর্শ, যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞান-লব্ধ এবং দেবতাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ, তাহাই আমাদের নিকট ছায়াবাজীর মত চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী মনে হয়, চেতনার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির যেন ক্ষণে ক্ষণে উৎভব ও লয় হইতেছে। এরূপ জ্ঞান ভ্রম-সঙ্কুল। কেননা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যসমূহ যদি সত্য হয়, তবে প্রজ্ঞার (Intellect) দ্বারা অবধারিত বস্তু সমূহের সত্যতা স্বীকার করা যে কত দূর যুক্তিযুক্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। সৎ, সত্তা, স্বরূপ, মানব প্রভৃতি নামের অর্থে যে সকল আদর্শ প্রকটিত হয়, তাহারা প্রত্যেকেই এক একটী সত্য (Reality)। এই হেতু, মধ্যযুগের প্লেটোনিক দর্শনকে প্রত্যক্ষবাদ বলিলে ভাল হইবে, কেন না, প্রত্যক্ষবাদ (Realism) এবং প্লেটোর আদর্শবাদ (Idealism), ইহারা পরস্পর বিরোধাত্মক দর্শন-মত।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আদর্শগুলি কি স্বয়ং সত্তাবান? জীবের আদর্শ কি জীব অপেক্ষা অধিক সত্য? দিকোজ্জ্বলকারী সূর্য্যের আদর্শ কি সূর্য্যাপেক্ষা অধিক আস্থার বিষয়? মানবের আদর্শ কি মানুষের মতই বাস্তব, এবং সক্রেটিস, আণ্টিস্থিনিস ও ইউক্লিডিস অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস-যোগ্য? কথাগুলি যেন হেয়ালী বলিয়া মনে হয়, যেন উহারা স্বাভাবিক জ্ঞানের বিরোধজনক। সক্রেটিসকে দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু মানবের আদর্শ বলিয়া ত কিছু দেখা যায় না! সুন্দর লোক, সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি, সুন্দর চিত্র, সকলই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু 'সুন্দর' ত দেখা যায় না। আমরা গতিশীল দ্রব্য দেখিতে পাই, কিন্তু গতি বা গতির আদর্শকে ত দেখিতে পাই না! সংজ্ঞাগুলি মনের সৃষ্টি, ইহাদের আবার বাস্তব সত্তা কি?

প্লেটো বলেন, প্রত্যক্ষবাদীগণ যখন কোন সুন্দর দ্রব্য দর্শন করেন, অথবা কোন মঙ্গল কাজ করিতে দেখেন, এবং উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল বলিয়া কিছু অনুভব করিতে পারেন না, তখন বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের দ্রব্য ও কাজের অনুভবশক্তি আছে, সৌন্দর্য্য ও ন্যায়ের বা মঙ্গলের অনুভবশক্তি, কিম্বা অনুভবের উপযুক্ত বিচার বুদ্ধি নাই। বিচার-বুদ্ধি বা আদর্শ জ্ঞানলাভের উপযোগী অনুভব শক্তি যথোপযুক্তরূপে পরিণত ও পরিমার্জ্জিত হইলে, তখন আর জড় জগতের কোন দ্রব্যই সত্য বলিয়া প্রতীত হইবে না। উহা তখন সত্যের জন্য ইন্দ্রিয়জগতে অনুসন্ধান না করিয়া, জ্ঞানজগতেই অনুসন্ধান করিবে। ইন্দ্রিয়গোচর দ্রব্য সমূহকে প্রথমেই আমরা সত্য কল্পনা করিয়া লই এবং তাহাদের আদর্শগুলিকে সেই সেই দ্রব্যের মানসিক প্রতিরূপ হিসাবে গণ্য করি। প্রকৃতপক্ষে উহার বিপরীত জ্ঞানই সত্যমূলক। আদর্শ মূল, দ্রব্য বা প্রাণী তাহার প্রতিরূপ। আদর্শ শুধু বস্তুর ধারণা নহে, ধারণার বিষয়ীভূত স্বয়ং নিত্যসত্য বস্তু; উহাকে ঈশ্বরের ধারণা (Thoughts of God) বলিতে পারা যায়; মানববুদ্ধিতে উহার পরিস্ফুট কল্পনা হয় না বলিয়া, উহা কম সত্য নয়; পরন্তু নিরপেক্ষ সত্য সরূপ (absolutety real)।

বিষয়টী দৃষ্টান্ত যোগে বুঝিতে হইবে। সৌন্দর্য্য একটী আদর্শ। প্রত্যক্ষবাদীর পক্ষে সুন্দর, সত্যও মঙ্গলের ন্যায় একটী গুণ; দ্রব্য হইতে উহাকে চিন্তা সাহায্যে পৃথক কল্পনা করা হয়, এবং উহা আধার স্থানীয় দ্রব্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। প্লেটোর পক্ষে, সুন্দর নিজেই বাস্তব সত্তা; ইহা কেবল সত্য নহে, জগতের সমস্ত সুন্দর জিনিষ একত্র মিলিত হইলেও সত্য বিষয়ে উহার সমকক্ষ হইতে পারে না। যেসকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তন কম, তাহারাই অধিক স্থায়ী এবং সেই জন্য, অধিক পরিবর্ত্তনশীল দ্রব্যাপেক্ষা অধিক সত্য। সত্য ও অসত্যের তাৎপর্য্য এই যে, একটী স্থায়ী, অপরটী অস্থায়ী। মানুষই হউক আর মানুষের প্রতিমূর্ত্তিই হউক, কাজই হউক বা কোন জিনিষই হউক, সুন্দর দ্রব্য মাত্রই নাশশীল, কালে তাহার বিস্মৃতি অনিবার্য্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য নিজে কখনও লোপ পায় না। অতএব, প্রত্যক্ষবাদী যে সকল দ্রব্যকে সুন্দর বলেন, তাহাদের সকলের অপেক্ষা বাস্তবাংশে সৌন্দর্য্যই শ্রেষ্ঠ। সুন্দর সম্বন্ধে যে নিয়ম, অন্যান্য বস্তুর সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। ব্যক্তির আদর্শ, ব্যক্তি বিশেষ অপেক্ষা অধিক সত্য; কেন না, বক্তির পরিবর্ত্তন আছে, আদর্শের পরিবর্ত্তন নাই। বৃক্ষ কিম্বা পুষ্পের আদর্শ, বৃক্ষ কিম্বা পুষ্প বিশেষ অপেক্ষা অধিক সত্য; কেননা, আদর্শ স্থায়ী, বৃক্ষ ও পুষ্প অস্থায়ী। আদর্শ স্বপ্রকাশ, কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, উহাকে জড়সুলভ কোন গুণই স্পর্শ করে নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, উহার মূলে এমন কিছু আছে, যাহাকে উহার, অর্থাৎ দ্রব্যটীর, আদর্শরূপে গণ্য করা হয় এবং দ্রব্যগুলি যাহার অংশ মাত্র আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান, কিন্তু আদর্শ স্বয়ং অবিভক্ত।

প্লেটোর প্রিয় আদর্শ সুন্দর; ইহাকে তিনি মঙ্গলের সহিত একাসনে স্থান দিয়াছেন, সুতরাং ইহার বিষয় কিছু বিশেষ করিয়া বর্ণনা আবশ্যক। জড়জগতে সুন্দরের যতরূপ, সকলগুলি আপেক্ষিক হিসাবে সুন্দর (Relatively beautiful)। কোন

জিনিষকে আমরা সুন্দর বলি, যখন কিনা তাহার তুলনায় অপর কোন জিনিষ মলিন প্রতিপন্ন হয়; তাহার সহিত যখন তদপেক্ষা সুন্দরতর জিনিষের তুলনা হয়, তখন আর পূর্ব্বো জিনিষটী সুন্দর থাকে না। অধিকন্তু, আজ যে জিনিষ সুন্দর, কাল তাহা কুৎসিত, অর্থাৎ জিনিষ মাত্রই স্থান কাল পাত্র ভেদে কোন কোন বিষয়ে সুন্দর, স্থানকালপাত্র ভেদে কোন কোন বিষয়ে অসুন্দর; কাহারও বিবেচনায় সুন্দর, কাহারও বিবেচনায় অসুন্দর। ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য্য জগতের যাবতীয় দ্রব্যই এইরূপে তুলনা-সাপেক্ষ, চঞ্চল এবং অনিশ্চিত। আদর্শ সৌন্দর্য্য শাশ্বত, আদ্যন্তরহিত, হ্রাস-বৃদ্ধিবিনাশের অতীত, অটুট এবং নিরপেক্ষ; সর্ব্বাংশে সর্ব্ব বিষয়ে, সর্ব্বথা সুন্দর; নিখাদ, পবিত্র এবং উজ্জ্বল; অতএব, অসম্পূর্ণ চিন্তাশক্তিরও অতীত (transcends) the powers of imag-(nation)। উহার ধারণা কেবল মানসিক প্রতিরূপ বা ব্যক্তিগত সংস্কার নহে, উহা সনাতন সত্য। সুন্দর সম্বন্ধে যাহা প্রযুক্ত হইল, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সম্বন্ধে, এবং যাবতীয় আদর্শ সম্বন্ধেও তাহাই প্রযুজ্য। সক্রেটিসের তুলনায় সিম্মিয়াস বড়, ফাডোর তুলনায় সিম্মিয়াস ছোট। কিন্তু আদর্শের বেলায় ছোট বড় নাই, আদর্শ সর্ব্বাংশে ও সর্ব্বাবস্থায় এক। আদর্শের যে পরিচয় দেওয়া হইল, তাহা হইতে তিনটী তথ্য পাওয়া যাইতেছে; (১) আদর্শ বাস্তব (২) আদর্শ ইন্দ্রিয়জ অপেক্ষা অধিক সত্য এবং (৩) আদর্শই একমাত্র সত্য। ইন্দ্রিয়জের স্বাধীন সত্তা নাই, উহার সত্তা বা অস্তিত্ব আদর্শ হইতে লব্ধ। আদর্শগুলি অনন্ত এবং কালাতীত (Paradeigmata) যাহার দৃষ্টান্ত ইন্দ্রিয়জের উদ্ভব হইতেছে। ইন্দ্রিয়জ প্রতিকৃতি মাত্র (idola), অনুকরণ, অসম্পূর্ণ নকল। সমস্ত ইন্দ্রিয়জগতেই একটী চিহ্ন, রূপক বা শব্দভঙ্গিমা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই চিহ্নের অর্থ, অর্থাৎ দ্রব্য সমূহ দ্বারা প্রকাশিত আদর্শের সহিতই দার্শনিকের সম্বন্ধ। বন্ধুর বিয়োগে আমরা যেমন সেই প্রিয় ব্যক্তির প্রতিকৃতিকে আদর করি; দার্শনিকের পক্ষে, ইন্দ্রিয়জগতের আদরও সেইরূপ। আমরা যেমন ছবি লক্ষ্য করিয়া যাহার ছবি তাহাকেই চিন্তা করি, দার্শনিকও তেমনি প্রতিবিম্বরূপ জগতের ভিতর দিয়া, জগতের আদর্শকেই দেখিতে পান ও তাহার ধ্যানেই মগ্ন থাকেন।

ইন্দ্রিয়-জগৎ আদর্শ জগতের নকল, অতএব আদর্শ-জগৎ তাহার প্রতিকৃতির অনুরূপ। আদর্শ সকলের একতাবদ্ধ একটী সমাজ বা সঙ্ঘ আছে। দৃশ্যমান জগতে যেমন সর্ব্ব নিম্ন স্তরের অসম্পূর্ণাঙ্গ জীব হইতে পূর্ণাঙ্গ জীব লইয়া বিশ্ব রচিত হইয়াছে, সেই রূপ জ্ঞান-রাজ্যেও সর্ব্ব নিম্ন আদর্শগুলি উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ সমূহের সহিত গ্রথিত হইয়া একটী আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে। আদর্শগুলি যতই বিশেষত্ব-বর্জ্জিত হয়, তাহাদের শক্তি ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে; বিশেষত্ব-বোধক গুণগুলি অতিক্রম করিতে করিতে চরম সীমায় পৌঁছিলে, তখন কেবল মাত্র সর্ব্বশক্তিমান বা পরম মঙ্গলময় আদর্শ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। জড়-জগৎ যেমন বিভিন্ন দ্রব্যজাত এবং প্রাণী সমূহের আধাররূপে বিদ্যমান; সর্ব্বোচ্চ, সর্ব্ব শক্তিমান ও পরম মঙ্গলময় আদর্শটীও তেমনি অপর সমস্ত আদর্শ লইয়া এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক স্থূল জগতের বীজ শক্তিরূপে, অবস্থিতি করি-

তেছে। উচ্চতম আদর্শের সহিত অপরাপর আদর্শের যে সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় বিষয়ীভূত দ্রব্যজাতের সহিত তাহাদের আদর্শেরও সেই সম্বন্ধ। দ্রব্য সমূহ যে তদ্দ্বারা প্রকাশিত আদর্শের অংশভাগী, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; তাহাদের নিজের স্বাধীন সত্তা নাই, পরন্তু তাহারা আদর্শের প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশ পায়; আদর্শের নিকট হইতে যে যতটুকু সত্যলাভ করে, তাহাই তাহার এক মাত্র অবলম্বন। পক্ষান্তরে, নিম্ন শ্রেণীর আদর্শগুলি দ্রব্য সমূহের তুলনায় স্বাধীন হইলেও, উচ্চতর আদর্শের নিকট সে স্বাধীনতা রক্ষা পায় না; তখন উহা নিরপেক্ষ, শ্রেষ্ঠ বা চরম আদর্শের রূপ হিসাবে গণ্য হয়। অরুণ প্রকাশে নক্ষত্ররাজী যেমন গগনতল হইতে অদৃশ্য হইতে থাকে, জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে নক্ষত্ররূপ আদর্শগুলিও তেমনি নিষ্প্রভ হইয়া অবশেষে আত্মগোপন করে।

অতএব, দেখা যাইতেছে যে, আদর্শগুলি একাধারে স্বয়ংসিদ্ধ এবং একতা-নিষিদ্ধ সমাজ বিশেষের সভ্যস্বরূপ (Members of a higher unity)। প্লেটো স্বয়ং পৃথক পৃথক আদর্শাপেক্ষা আদর্শ সঙ্ঘের অধিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণ কিন্তু প্রত্যেক আদর্শকেই মূলাধার পরম সত্যস্বরূপ কল্পনা করেন। গুরুর কল্পিত নির্ব্বিরোধে উজ্জ্বল আদর্শগুলি প্লেটোনিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে এবং ল্যুকেয়ামের বিদ্বৎসমাজ প্লেটোর মতের এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা একটী জড় জগতের সহিত আর একটী অনাবশ্যকীয় জড়-জগতের যোজনা হয়। তাঁহাদের এই উক্তি যে সমীচীন নহে, তাহার কারণ, প্লেটোর আদর্শসঙ্ঘ একটী জীবদেহতুল্য; সকলকে লইয়াই তাহাদের প্রাণ এবং অস্তিত্ব, তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক পৃথক জীবে পরিণত করা অসম্ভব। স্থান ও কালই বিচ্ছেদ ও স্বাতন্ত্র্যের মূল কারণ, প্লেটোর আদর্শ স্থান ও কাল, উভয়েরই অতীত। সত্য বটে, প্লেটো আদর্শের স্থিতি নির্দ্দেশের জন্য স্বর্গের কল্পনা করিয়াছেন এবং আদর্শের বিষয় ভাবিতে গেলে, এই স্বর্গের বিষয়ও চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু কথা এই যে, আদর্শের স্বর্গ জড়জগতের অংশ নয়, উহা স্বজাতীয় (Sui generis) আদর্শের অধিষ্ঠান যেখানে সেখানে ঘটিতে পারে না, আধেয়ের উপযুক্ত আধার হওয়া চাই; মনই আদর্শের বাসভূমি, অর্থাৎ আদর্শই আদর্শের স্থান, এখানে আধার-আধেয় এক হইতেছে। আদর্শের বাহিরে আদর্শের অবস্থিতি সম্ভব নহে, ডিমক্রিটাসের পরমাণুর ন্যায় উহাকে শূন্যের সাহায্যে থাকিতে হয় না। জড়বাদের বিপক্ষে ইহাপেক্ষা প্রবলতর যুক্তি আর কি হইতে পারে? 'স্থান, যাহাকে তুমি সত্তারগুণ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা সত্তারই বিরোধী, অসত্তা এবং অক্ষমতা বা অপৌরুষেয়েরই কারণ। আদর্শ সত্য, কেননা উহা এক এবং অব্যাপক, এবং যেহেতু ঐক্যই শক্তি, ক্ষমতাও সত্য। যে শক্তি প্রথমে গণিত বিন্দুর ন্যায় আদর্শে কেন্দ্রীভূত ছিল, তাহাই পরে স্থান ও কালের ভিতর, সহস্র সহস্র ভূম্যংশে এবং সহস্র সহস্র মুহূর্ত্তে পরিব্যাপ্ত এবং সেই বিস্তৃতির ফলে, উহা ক্রমান্বয় স্বল্পতেজ, শক্তিহীন এবং লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আদর্শ, যাহাকে তুমি বাস্তব জগতের সামান্য প্রতিকৃতি বল, তাহা এই প্রকারে তোমার কল্পিত সত্য-জগৎ (জড় জগৎ) ভিন্ন আর কিছুই নয়, তবে

এ আদর্শের মূল্য অতি সামান্য, কেননা, উহা ছায়ামাত্র, উহার সারবত্তা কিছু নাই।

আদর্শ যদি নিরপেক্ষ সত্তা হয়, তাহা হইলে প্লেটোর মতে ঈশ্বর কি? 'ঈশ্বর' শব্দ তিনি বারম্বার বিশেষ বিশেষ অর্থে, কখনও একবচনে কখনও বহুবচনে, প্রয়োগ করিয়াছেন। 'টীমিয়াস' গ্রন্থে সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্ত ঈশ্বররূপে উক্ত হইয়াছে। অনন্ত ঈশ্বরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সৃষ্টি, নক্ষত্ররাজি এবং দেবতা; উহারা স্বর্গের অধিবাসী এবং দেবদেবী, নানাবিধ শব্দে অভিহিত। বিশ্বসংসার একটী নিত্য-প্রকাশমান বস্তু। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, একদিকে সক্রিয় ঈশ্বর এবং সৃষ্ট দেবগণ দ্বারা প্রকাশিত বহু দেবতার বিশ্বাস রক্ষা পাইয়াছে; অপর দিকে, একেশ্বরবাদেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তবে প্লেটোর একেশ্বরের কল্পনাও একেবারে বিরোধশূন্য মনে হয় না; কারণ, বিশ্ব-রচনা-কল্পে তাঁহাকে অনন্তের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখানে প্লেটোর যুক্তি এইরূপ। পরমাদর্শ এবং পরম মঙ্গল স্বয়ং অনন্ত বলিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা আদর্শের অনুবর্ত্তন করিলেও, তদ্দ্বারা তাঁহার নিরপেক্ষতা নষ্ট হয় নাই। তবে যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে একটী ব্যবধানের ভাব আসে, তাহা প্লেটোর আদর্শ এবং জড়ের দ্বৈতভাবোৎপন্ন অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। স্রষ্টাকে তিনি শিল্পীর সহিত তুলনা করায় পৌরাণিকতারও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টির আদর্শ, উভয়ে মিলিয়া এক ক্রিয়াশীল আদর্শ উৎপাদন করিতেছে, এবং ইহাই প্লেটোর কাব্য কল্পিত 'ডেমিয়ার্গ' (Demeurge)। ঈশ্বরের সহিত আদর্শ এমন অভিন্ন ভাবে মিলিত যে, ঈশ্বরকে কখনও সৃষ্ট কারণ স্থানীয় আদর্শের অধীন, কখনও বা ঈশ্বর হইতেই আদর্শের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ মনে হয়। ঈশ্বরকে কখনও চরমাদর্শের উচ্চে, কখনও বা উহার নিম্নে স্থান দেওয়ায়, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাই গ্রহণীয়। অর্থাৎ, ঈশ্বর আদর্শাপেক্ষা শ্রেষ্ঠও নহে, নিকৃষ্টও নহে, পরন্তু ঈশ্বর আদর্শে লীন হওয়ায় একমাত্র আদর্শই অবশিষ্ট থাকিতেছে এবং উহাই সৃষ্টির কারণ-সলিলরূপ স্বয়ংসিদ্ধ উপাদান (Plastic and creative principle)। প্লেটোনিক মতে যে ঈশ্বর নিরপেক্ষ আদর্শের সহিত অভিন্ন, তাহা সর্ব্বমঙ্গলময় সত্তার বর্ণনা হইতে উপলব্ধি হয়। সূর্য্য যেমন জড় জগতের অধীশ্বর, পরমাদর্শ বা নিরপেক্ষ সত্তাও তেমনি শক্তি বা জ্ঞান-জগতের অধীশ্বর। ক্ষমতায় ও মহিমায় উহা জগতের যাবতীয় মঙ্গলকর কার্য্যের ও মনোরম দ্রব্যের কারণ, এবং যাবতীয় আলোকে আধার-স্বরূপ সূর্য্যেরও পিতৃ-স্থানীয়, জ্ঞানমার্গে সত্য ও বিচার বুদ্ধির প্রত্যক্ষ কারণ। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর (God of gods) জগতের মঙ্গল মাত্রেরই অনন্ত কারণ; মানব-জ্ঞানের নিকট পরমজ্ঞান, আদ্যন্ত-রহিত ঘটনাসমূহের নিয়ন্তা, ন্যায় ও দণ্ডের অনন্ত বিধান-কর্ত্তা, জড়-বিবর্জ্জিত, অমঙ্গল-স্পর্শ-শূন্য, পবিত্র জ্ঞানস্বরূপ। অতএব প্লেটোর ঈশ্বর যে একধারে নিরপেক্ষ সত্তারূপ পরমাদর্শ এবং পরম মঙ্গল, তাহা নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আদর্শ; এজন্য তিনি কি কম সত্য? কখনই নহে। আদর্শ বলিয়াই তিনি পরম সত্য; যেহেতু প্লেটোর মতে সত্য বলিতে আদর্শই বুঝায়।

আদর্শের অবস্থিতি স্থানে সম্ভব নহে,

মন উহার স্বাভাবিক এবং কতক পরিমাণে আদি আবাস। সুতরাং আদর্শের জ্ঞান বাহিরের বস্তু নয়। নিরপেক্ষ পরমাদর্শ এবং তৎসহ অপরাপর আদর্শ,মনেরই স্বভাবদত্ত দান (original endowments)। উহারাই মনের ভিত্তি, সারভাগ,মজ্জাস্থানীয়। আদর্শগুলি প্রথমে সুপ্তাবস্থায় থাকে বলিয়া আমরা উহাদের বিষয় কিছুই জানিতে পারি না। ইন্দ্রিয়গণ যখন তাহাদের বাহ্য প্রতিরূপের সম্বন্ধ ঘটায়, তখনই আমাদের অন্তর্নিহিত বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি আদর্শ গুলির উত্তেজনা করে মাত্র, সৃষ্টি করে না। ইন্দ্রিয়গণ আদর্শোৎপাদনে একান্ত অপটু; তাহার প্রমাণ এই যে, উহারা প্রতারণাপরায়ণ, সত্যের সহিত পরিচয় না ঘটাইয়া, বরং সত্যকে আমাদের নিকট হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে। সত্যলাভের একমাত্র উপায় বিচার বুদ্ধি এবং সত্যানুরাগ হইতে বিচার বুদ্ধির উদ্ভব। সত্যানুরাগ আবার বিশ্ব প্রেমের অংশ। বন্ধনক্লিষ্ট আত্মা ইন্দ্রিয়-জগতে নির্ব্বাসিত থাকিয়া জ্ঞান ও সত্যের সহিত মিলিবার জন্য এবং পরমার্থের সাক্ষাৎ লাভের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। উচ্চ শ্রেণীর কতকগুলি ভাব, বন্ধুত্ব এবং সৌন্দর্য্যের ভিতর এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির চেষ্টা পায়, কিন্তু আদর্শ মানবদেহে আবদ্ধ বা জড়ভাবাপন্ন থাকে বলিয়া সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। আত্মার জন্য অবিমিশ্র আদর্শের প্রয়োজন; তাই আত্মা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের উপায়ানুচিন্তনে উৎসুক। প্রেমিক এবং শিল্পী যে প্রচ্ছন্ন সত্য, আদর্শ-সৌন্দর্য্য এবং পরম মঙ্গলের উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করেন, তাহাতে আত্মার পরোক্ষ দর্শনাকাঙ্ক্ষারই কণামাত্র প্রতিফলিত হয়। দার্শনিকের পক্ষে এই জ্ঞান-পিপাসা আংশিক পরিমাণে নিবৃত্ত হইলেও তাহা গৌরবের বিষয় নহে; যেহেতু, নিরপেক্ষ সত্য একমাত্র ভগবানেই সম্ভব, ভগবান স্বয়ং নিরপেক্ষ সত্য। অশিক্ষিত অন্ধ লোকের পক্ষে এই সত্যানুসন্ধান সম্ভব নয়, তাহার কারণ, এরূপ কোন বস্তু আছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস না হওয়ার জন্য জ্ঞান-পিপাসাও উদ্রিক্ত হয় না। যিনি জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই সত্যানুরাগ ঘটিয়া থাকে।

প্লেটোর চিন্তা-প্রণালী রহস্যমূলক হইলেও, অক্ষরে অক্ষরে উহা যুক্তিপথানুগ। পরোক্ষদর্শন (Mysticism) এবং যুক্তিবাদ (Rationalism) উভয়ের বিশেষ প্রভেদ নাই; কেন না, উভয়ের পরিণাম এক; যুক্তিবাদ হইতে পরোক্ষ লাভ ঘটিয়া থাকে। আমরা যাহাকে রহস্য মনে করি, তাহার মূলে যতই সত্য নিহিত থাকুক, তৎসম্বন্ধে তর্ক মীমংসা চলে না। প্লেটোর আদর্শমূলক যুক্তিবাদ এবং ন্যায় শাস্ত্রোক্ত অবরোহ চিন্তাপ্রণালী (Deductive method) উভয়ই স্বাভাবিক সংস্কারজনিত, উহাদের কোন সুচারু মীমাংসা না হইলেও, এই দুই বিষয় যে সত্য-প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। প্লেটোনিক আদর্শবাদ, তজ্জাত প্লোটিনাস,স্পিনোজা এবং শেলিংএর মতের ন্যায় রহস্যে উদ্ভূত হইয়া ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

কবির আশ্রম।

১

কে আস্‌ছ হে ?   রাজনৈতিক
দেশের লোককে গড়ছত ঠিক
সবায় ঠেলে তাই কি এগিয়ে চল ?
এক জনকেও অনুরাগে
ভালবাস্‌তে শেখ আগে
এ আশ্রমে এখন কেন বল ?

আইনজীবি তুমি বটে !
এগিয়োনা ভাই যাও হে হটে
অন্যদিকে দেখ তোমার পথ ;
মিষ্টি কথা মধু ঝরা
চিঠিতে হুল বিষে ভরা
বুঝা শক্ত তোমার মনোরথ।

৩

এই যে তুমি রসিক মানুষ,
দেখ্‌তে ত বেশ নুদুস নাদুস
এগিয়ে এস আস্‌তে পার যদি :
কিন্তু দাদা ভালবেসে
ব'সনাক অত ঘেঁসে
এ পীঠস্থান, বস্‌বার নয় গদি।

৪

এস এস হে বীরপুরুষ,
নও ত তুমি সে যে মানুষ
এস তোমার তরবারি রেখে ;
সসম্মানে স্পর্শি ভূমি
সোজা হ'য়ে দাঁড়াও তুমি
ধন্য হও এ সাধন তীর্থ দেখে।

৫

কে তুমি ভাই ?   স্বদেশ-বক্তা,
এখানে নাই উচ্চ তক্তা
হাততালিতেই খোলে তোমার বাহার ;
ছোটাও তুবড়ি কি চমৎকার
পরক্ষণেই ঘোর অন্ধকার,
দূরে থেকে তোমায় নমস্কার।

কে চিকিৎসক ?   বটে বটে
তোমার চক্ষু সর্ব্ব ঘটে
তোমার শিক্ষা সবার চেয়ে বড় ;
স্পর্শে কাঁপে জীবিতের প্রাণ,
মৃতেরো যে নাই পরিত্রাণ
বন্ধু তুমি শীঘ্র সরে পড়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ না তুমি ?
এ সনাতন তীর্থ ভূমি
হেথায় কেন তোমার কর্ম্মভোগ ?
ভূতল খুঁড়ে ভগ্নমূর্ত্তি
পেলেই তোমার বিশেষ স্ফূর্ত্তি
শ্মশান-রাজ্যেই তোমার শুভযোগ।

৮

ওঃ বৈজ্ঞানিক ?   তোমার জ্ঞান
নিরস করে ভাবের ধ্যান
এ আশ্রমে কি হবে ভাই ঘুরে ?
সৌন্দর্য্য ও সজীবতা
হারায় জীবন পেয়ে ব্যথা
তোমার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষুরে।

৯

বিলাসী যে খাসা পোষাক,
সাবাস্—মণিমুক্তার কি জাঁক
ঝক্‌মকানি চক্ষে লাগায়-ধাঁধা ;
ঢাকেনা তার চিত্ত অসার
মিছে এগিয়ে এসো না আর
চিরশান্তির মাঝে দিতে বাধা।

কে গা, ছড়াগাঁথা কবি ?
চেহারাটা পটের ছবি
ছন্দের ছটায় নাম কিনেছ ভাল !
কুহক-কণ্ঠে স্বরটা সাধা
তাতেই কত স্তাবক বাঁধা
করগে চাঁদ নিজের সভাই আলো।

১১

বিধান-দাতা পণ্ডিত তুমি ?
এ তপোবন—পূত-ভূমি
কি এনেছ দিতে মহামতি ?
নাইক হেথা লোভের কর্ম্ম
নাইক হেথা ক্ষোভের ধর্ম্ম
নাইক হেথা লাভ অথবা ক্ষতি।

১২

রুদ্ধ কর আশ্রম দুয়ার,
বিষয় কীটের নাই অধিকার,
আস্‌ছ কেন ছেড়ে তুমি ভিটে ?
ধূলায় হেঁটে পাবে কষ্ট
হবে তোমার সময় নষ্ট
পয়সা যাতে মিনিটে মিনিটে।

১৩

কে আস্‌ছে ঐ শান্ত নয়ন
পরিধানে গৈরিক বসন
কণ্ঠে উদার গান ;
প্রবাহিণীর কলভাষে
সে সঙ্গীত ঐ মিশে ভাসে
কি সুললিত তান।
লুকিয়ে আছ শিশির সম
তুমি যেন নিরুপম
নিকুঞ্জ নির্ঝর ;
যেন চির পরিচিত
দেখা মাত্র পুলকিত
সর্ব্বাঙ্গ অন্তর।

আকাশ বাতাস আলোক ভুবন,
সাগর ভূধর সরিৎ কানন
ভাস্‌ছে বিশাল চক্ষে ;
গভীর হতে গভীর কত
ভাব-লহরী অনাহত
নিভৃতে বয় কক্ষে।
চরাচরের হেরি সৃষ্টি
খুলে গেছে অন্তর্দৃষ্টি
মগ্ন যেন ধ্যানে ;
কত সত্য, কত তত্ত্ব
মানব মনের কি মহত্ত্ব
জাগ্‌ছে সদাই প্রাণে।
সৌম্য তুমি শিশুর হৃদয়
প্রেমের মানুষ আনন্দময়
পর কি আপন নাই ;
ভোগ সুখেতে নাই আসক্তি
সবার 'পরে অনুরক্তি
সবাই তোমার ভাই।
হে শক্তিমান পুরুষ তুমি,
করিব আশ্রম পুণ্যভূমি
বস হেথা প্রিয়,
এই ত কোমার যোগ্য আসন
এই ত, তোমার সাধন-সদন
তোমার বিরাম-গৃহ।

শ্রীরসময় লাহা।

আকাঙ্ক্ষা।

তেম্‌নি করে, কোন্ কালেতে
বাস্‌ব তোমায় ভালো ?
তোমায় বিনে, আর কাউকে,
লাগ্‌বে না আর ভালো।
তোমার তরে,—প্রেমের প্রদীপ
আমার-হৃদয় ঘরে,
কোন্ নিশাতে, জগত-নাথ,
জাল্‌ব উজল করে ?

সেদিন আমার আস্‌বে কবে,
হে জগতের স্বামি,
স্বামীর চেয়ে অধিক ভালো
বাস্‌ব তোমায় আমি।
ছেলের চেয়ে অধিক স্নেহ
কর্‌ব তোমায় নাথ,
সেদিন আমার আস্‌বে কবে,
ভাবছি দিবারাত।
ধনের চেয়ে, রাখব তোমায়
অধিক যতন করে,
ভবন হতে থাক্‌ব ভালো
তোমার স্নেহের নীড়ে।
নদীর মতন ঢেউ তুলিয়া
শান্তিভরা প্রাণে,
কোন্ কালে বা, হে পারাবার,
মিশ্‌ব তোমার সনে?
তোমার প্রাণে, আমার পরাণ,
যাইবে সুখে মিশি,
জলে জল মিলন হয়ে
থাক্‌ব দিবানিশি।
আমার ভাষায়, আমার কথায়
ঝরবে তোমার মধু,
সেদিন আমার আস্‌বে কবে,
ভাব্‌ছি তাহাই শুধু।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

প্রত্যাবর্ত্তন।

সন্ধ্যার আঁধার আসিছে ঘনা'য়ে
অদূরে মন্দির মাঝে,
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরে তোমার
ঐ যে আরতি বাজে।
শান্ত নীরবতা সে রব শুনিয়া
ঢলিয়া পড়িছে ঘুমে,
ভক্তের হৃদয় তোমার উদ্দেশে
লোটা'য়ে পড়িছে ভূমে।
শ্রবণে পশিয়া ওই শুভধ্বনি
(মোর) আকুল করুক প্রাণ,
এ দেহ যন্ত্রের প্রতি তারে তারে
বাজুক তোমার গান।
কত দিন মাগো আছিনু ভুলিয়া
তোমার চরণ খানি,
আজিকে আবার এসেছি ফিরিয়া
লহ গো বক্ষে টানি।
পথ ভুলে হায় আপনার জন
ফেলি কত দূরে দূরে,
বিদেশে, বিপথে পাগলের প্রায়
মরিলাম ঘুরে ঘুরে।
না বুঝি মঙ্গল, লভি অমঙ্গল
কর্দ্দম মাখিয়া দেহে,
অনুতাপ ল'য়ে হৃদয় ভরিয়া
আসিয়াছি ফিরে গেহে।
অঞ্চলে তোমার মলিনতা মোর
মুছায়ে দেও গো আজ,
আশীষ, উৎসাহ আশার সম্ভারে
আনগো ভরিয়া সাজি।
তব বর লভি নূতন জীবনে
আবার ফিরিগো কাজে,
অই যে অদূরে মন্দিরের মাঝে
আরতি তোমার বাজে।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

নদীর বাঁকে

বৃষ্টি যেথায় থেমে গেছে ঐ যে বাঁকের মাথায়,
ছোট্ট জেলে ডিঙ্গিখানি
মিলিয়ে গেল কোথায়?
আগেই হোথা আঁধার এসে
লুকিয়ে বসে আছে—

বাসা বেঁধে কাণাকাণি করছে গাছে গাছে।
এপার থেকে দিনের আলো ডাকছে ইসারায়
ওপার থেকে ধীরে ধীরে সূর্য্য মাগে বিদায়।
নদীর বুকের গোপন কথা রয়েছে ঐ বাঁকে,
শুধু এপার বসে মোরা বুঝছিনা তাই তাকে।
নৌকা যতই যাচ্ছে বেয়ে
ওদিক্ পানেই মিলায়
ওর পরে আর আছে কি বাঁক ?
থাকে যদি—কোথায় ?
এপারে যে দেখ্‌ছি আলো,
হোথা দেখি আঁধার,
ওপার বসে' কেমন দেখায় ?
উল্টো নাকি ইহার ?

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।

প্রেমের অলকানন্দা।

এসো— প্রেমের অলকানন্দা,
চলবিভঙ্গা কলতরঙ্গা মধুসঙ্গীত-ছন্দা।
মর্ত্ত্যের পথে বর্ত্তীবাহিনী, মূর্ত্তিধারিণী তৃপ্তি
এসো পুণ্যোজ্জ্বলা, অবিচঞ্চলা, আলোকাঞ্চলা দীপ্তি।
এসো—বাসন্তী শোভাপুঞ্জ,
মম—অন্তরে রচ কুঞ্জ,
আমার জীবন-নন্দন বনে তুমি গো যোজনগন্ধা।
এসো, প্রেমের অলকানন্দা।
তরুর বক্ষে এসো জঙ্গমা নবপুষ্পিতা বল্লী,
মরুর বক্ষে শষ্প স্বপন,—ফুটাও চন্দ্রমল্লী।
এস—চিরাকাঙ্ক্ষিত ঋদ্ধি,
এস—চির সাধনার সিদ্ধি,
তব চরণালক্তে ভক্তের প্রাণে জাগাও রক্ত সন্ধ্যা,
এসো—প্রেমের অলকানন্দা।
দেবমন্দিরে সন্ধ্যার দীপ, তব সিন্দূরবিন্দু
তুমি সংসার সিন্ধু-শিররে চির সুন্দর ইন্দু।
এস—লক্ষ্মীহীনের সঙ্গে
তব—করধৃত লীলা-পদ্মে,
বিদূরি' লক্ষ যাতনা দুঃখ এস মোর চিরবন্দ্যা।
এস—প্রেমের অলকানন্দা।

শ্রীকালিদাস রায়।

সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

(চিরঞ্জীব শর্ম্মা।)

[জন্ম—আনুমানিক ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু—২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৩২২ সাল, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ।]

ইংরাজী ভাষায় লিখিত তাঁহার ১৬৫ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সুদীর্ঘ আত্ম-বিবৃতি হইতে সংক্ষেপে জীবন-কথা সঙ্কলিত করিলাম।

"আনুমানিক ১৮৪০ খ্রীঃ নবদ্বীপের অধীন চকপঞ্চানন গ্রামে জন্ম হয়। পিতার নাম রামনিধি সান্ন্যাল। ১৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। এই সময়ে গুরু মহাশয়ের পাঠশালার শিক্ষা শেষ হয়। সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। পাঠশালায় অত্যাচার হইত বলিয়া কিছুই শিক্ষা হয় না। ১৮ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হইলে বড় কষ্টে পড়েন ও মাতার ভার গ্রহণ করিতে হয়। চাকুরীর জন্য গৃহ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু পীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসেন। মোসাফীর হওয়ার বড় সাধ ছিল। একজন লোক লইয়া সাঁইথিয়ার নিকট বরিয়ারপুর পর্য্যন্ত গমন করেন, কিন্তু চোরের হাতে পড়েন। চোর অজ্ঞান করিয়া সব অপহরণ

করিলে দেশে ফিরিয়া আসেন। নিরামিস আহার করিতেন। পিতা প্রভাস-মিলন যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাতে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ জন্মে। বাড়ী ফিরিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদিতে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হাতে পড়ে। কলিকাতায় গেলে আদি ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্পর্শে আসেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গীত বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আদি ব্রাহ্মসমাজে করিতেন, তাহাতে মুগ্ধ হইতেন। শ্বশুর মহাশয় নৈয়ায়িক, পিতা মাতা রামচন্দ্রের উপাসক। এই সময়ে ভাগবত পাঠ হয়। কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতৃ দর্শন করেন। তখন জাতিভেদে সন্দেহ হয়। অনেক দিন পরে চাকুরী স্থানে থাকার সময় মাতার মৃত্যু হয় এবং বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বিদেশে হিন্দুমতে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন। মাতার মৃত্যুর পর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিলে যথারীতি শ্রাদ্ধ করিতে সকলে পীড়াপীড়ি করে। বাড়ীতে প্রার্থনা-সমাজ করিয়াছিলেন। তখন ঘোরতর অত্যাচার হইতে থাকে। পুনরায় শ্রাদ্ধ করিবেন, ঠিক করেন; কিন্তু এই সময়ে সংবাদ পান যে, উপবীত-ত্যাগী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুরে আছেন। ২০ মাইল হাঁটিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং দীক্ষা গ্রহণ ও সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, বিজয় বাবু বলিলে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। উপবীত ত্যাগ করিয়া দীক্ষা গ্রহণের পর বাড়ী আসিলে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। ভগ্নী স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া যান।

এই সময়ে নিজে রন্ধন করিয়া খাইতেন। "আমার আর কেহ নাই" এই গানটী বড়ই ভাল লাগিত। একদিন তাঁহার পণ্ডিত শ্যালক আসিয়া খুব অপমান ও তিরস্কার করেন। মাতুল আসিয়া বলপূর্ব্বক উপবীত দিলেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া পুনঃ শান্তিপুরে গমন করেন। শান্তিপুরে বিজয় বাবু ও সাধু অঘোর নাথের সহিত মিলিত হইয়া প্রচারার্থে ঢাকা গমন করেন। ইহার পর ৯ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন। ঢাকা হইতে কুমিল্লা গেলেন। এই সময়ে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সহিত পরিচয় হয়। পদ্মা পার হইয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাড়ী যান। বিজয়বাবুর গৃহ পরিত্যক্তদের আশ্রয় ছিল। বাড়ী প্রত্যাগত হইলে আবার অত্যাচার হইতে লাগিল। আবার শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন। শান্তিপুর হইতে বাগআঁচড়া যাইয়া স্কুল স্থাপন করেন। কখন নিম্নশ্রেণীতে পড়াইতেন এবং নিজে উচ্চশ্রেণীতে পড়িতেন। একখানি ৷৷০ মূল্যের গ্রামার ক্রয় করেন, ইহাই তাঁহার শিক্ষার ব্যয়। তখন বাঙ্গালাও ভাল জানিতেন না। বাগআঁচড়া হইতে আবার ঢাকা গমন করেন, এবং ব্রাহ্মস্কুলে সাধু অঘোরনাথের সহিত শিক্ষকতা করেন। সাধু অঘোরনাথ বিবাহ করিতে গেলে ব্রজসুন্দর বাবুর সঙ্গে থাকিয়া ইংরাজি শিক্ষা করিতেন এবং উপাসনাদি কার্য্য করিতেন। ঢাকাতেই কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শ হয়। ১৮৬৫ ও ১৮৬৬ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে অঘোর বাবুর সহিত মিলিত হইয়া চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, কাছাড় প্রচার করেন। তৎপরে চিরাপুঞ্জী, ঢাকা হইয়া ফরিদপুর যান। সেখানে বিজয় বাবুর পীড়ার সংবাদ পান। তৎপরে লাখুটীয়ার বিবাহোপক্ষে বরিশালে গমন করেন। সেখানে কেশবচন্দ্র আসেন।

তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া কলিকাতায় যাইয়া কিছুদিন থাকেন। তৎপরে আবার শান্তিপুর, কালনা, বর্দ্ধমানের নানা স্থানে প্রচার করেন। তৎপরে কাটোয়া গমন করেন। সেখানে কালিকাদাস দত্ত মহাশয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখন সম্বল কেবল ১৫। তিনি ১ মাস তাঁহাকে রাখিলেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া পূর্ণভাবে নব-আন্দোলনে যোগদান করেন। পূর্ব্বেও সঙ্গীত লিখিতেন, কিন্তু কোন কাজে আসিবে, মনে করিতেন না। "দেও দেখা পাপীজনে ওহে পতিতপাবন"—ইহা প্রথম সঙ্গীত। ১৮৬১ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হয় ও ১৮৬৮ খ্রীঃ প্রথম নগর কীর্ত্তন হয়। সেই সময় হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত ১০০০ সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন রচনা করেন। প্রথম উৎসবের পর মুঙ্গের, বাঁকিপুর, আরা, এলাহাবাদ হইয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীতে গমন করেন। কারসন দাস ও মধুদাস তাঁহার পাথেয় দিতেন। ইহার পর কাশ্মীর যান। পরে মরে পর্ব্বতে যাইয়া মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই সময়ে লর্ড লরেন্সের কৃপায় কেশবচন্দ্রের সহিত সীমলা গবর্ণমেণ্ট-হাউসে কিছুদিন ছিলেন।

সীমলা হইতে কলিকাতা আসেন। মুঙ্গেরে ভক্তির আন্দোলন উপস্থিত হয়। পূর্ণ ১৫ বৎসর উৎসাহের সহিত সকলের সহিত মিলিয়া কাজ করেন। কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খ্রীঃ বিলাতে গেলে ধর্ম্মতত্ত্বের সম্পাদকতা করেন। কেশবচন্দ্রের বিলাতের যাবার সময় ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লেখেন। ইহাই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। পরে সঙ্গীত সংগ্রহ করেন। তৎপর কুচবিহার বিবাহের পর ১৮৭৮ খ্রীঃ মুঙ্গের হইয়া নবদ্বীপ যান এবং সেখান হইতে শেষবার বাড়ী দর্শনে গমন করেন। নবদ্বীপে ব্রজবিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংসর্গে শ্রীচৈতন্যের-গুণ-কাহিনী শ্রবণ করেন এবং ভক্তিচৈতন্য-চন্দ্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ে চক্ষে ছানি পড়ে। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করার পর কেশবচন্দ্রের অনুপ্রাণনে নববৃন্দাবন নাটক লেখেন। ক্রমে ছানিতে চক্ষু দৃষ্টিহীন হয়। এই অবস্থায় সাধু অঘোরনাথের জীবনী লেখেন। ১৯০২ খ্রীঃ বাল্যসখা দুইভাগ, কলিসংহার, যুগলমিলন, যৌবন সুহৃদ্, গরলে অমৃত, ব্রহ্মগীতা, বিংশ শতাব্দী ও ইহকাল ও পরকাল লেখেন। ছানি কাটা হইলে খ্রীষ্টচরিত লেখেন। কিন্তু আবার চক্ষু খারাপ হওয়ায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সীমলা যান। সীমলায় হিমালয়ান ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টা করেন। ১৬ বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় সেবা করেন এবং লাহোর, রাজপুতনা, অযোধ্যা, ছোটনাগপুর, আসাম ও বাঙ্গালার নানা স্থানে প্রচার করেন। কেশবচন্দ্রের যোগ ভক্তির উপদেশের সময় তিনি ভক্তির শিষ্য হন,—নিজ হস্তে রন্ধন ও ভক্তির নানা ব্রত প্রতিপালন করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ১১ খানি পুস্তক লেখেন এবং সুলভ সমাচার, ধর্ম্মতত্ত্ব ও পরিচারিকায় লেখেন। এই সময়ে মাসিক ১০০৲ আয় হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'নববিধান" পত্রিকা বাহির করেন। সব সময়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গী ছিলেন। ৯ বৎসর পর পত্নী নিজে আগমন করিলে সকলে মহা আনন্দ করিলেন, কিন্তু তিনি লজ্জিত হন। কুচবেহার বিবাহের পর নববিধান ঘোষণায়

পর সব সমাজকে মিলাইতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু ফলে খরচ বন্ধ হয় এবং সকলে বিরক্ত হন। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পুনঃ সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন ও কেশবের জীবনী ও গীতরত্নাবলী প্রকাশ করেন। ইহাতে সকলে আরো বিরক্ত হন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর বেদীর গোল মিটাইতে চেষ্টা করেন এবং তাঁহার মন্তব্য গৃহীত হয়। দলাদলির ভাব জমাট বাঁধিলে ১৮৮৮খ্রীঃ মঙ্গলগঞ্জে যাইয়া এক বৎসর থাকেন। ঐ সময়ে কলিকাতা হইতে প্রেস মঙ্গলগঞ্জে আনা হয় ও সুলভ সমাচার পুনঃ বাহির হয়। দলাদলির সময় মঙ্গলগঞ্জের নিভৃত সাধন মঙ্গলপ্রসূ হয়। এখানে বহু সঙ্গীত রচিত হয়। ১৬ বৎসর মিলনের চেষ্টা করেন, কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৮৯২ খ্রীঃ ব্রহ্মমন্দিরের ভার পান। এই সময়ে ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ হয়। ১২ জন সুশিক্ষিত যুবক তাহাতে যোগদান করেন। এই সময়ে হ্যালুলুজা ব্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয় নববিধান পত্রিকাও চলিতে থাকে। ১৮৯৩-৯৪ খ্রীঃ বিংশ শতাব্দী লিখিত হয়। ১৯০৩ খ্রী তাঁহার চেষ্টায় ময়ুরভঞ্জের মহারাজার সহিত কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ হয় ও তিনি আচার্য্য হন।

তিনি নিজে লিখিয়াছেন, কেশবচন্দ্রের তিরোধানের সহিত তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হয়। ৪।২।০৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার মিলনের চেষ্টা করেন ও কিছু কিছু কাজ করেন। বিধাতার আদেশ পান নাই বলিয়া পূর্ণ ভাবে যোগ দিতে পারেন নাই, কিন্তু কাহারও কোন অনিষ্ট করেন নাই।

ত্রৈলোক্যনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা তাঁহার সুলিখিত বিবৃতি হইতে সঙ্কলিত হইল। এই মহাপুরুষের জীবনাভিব্যক্তির ছায়া উহাতে স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। তিনি আমাদের জ্যেষ্ঠ, কিন্তু সমসাময়িক ব্যক্তি। তাঁহার জীবনের সহিত কোন কোন স্থলে আমাদের জীবনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, পাঠশালার শিক্ষায় আমাদের ন্যায় তাঁহারও অনুরাগ ছিল না। তিনিও মোসাফীর হইতে চাহিয়াছিলেন, আমাদেরও নেপাল চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছিল। দারুণ অত্যাচারের সময় "আমার আর কেহ নাই" কোন অজ্ঞাত লেখকের এই গানটী তাঁহারও সম্বল ছিল, আমাদেরও ছিল। সাহিত্যসেবা তাঁহারও জীবনের ব্রত ছিল, আমাদেরও ব্রত। তিনিও প্রচার করিতে ভালবাসিতেন, আমাদেরও তাহা প্রিয় কার্য্য। তিনি চকপঞ্চানন হইতে শান্তিপুর ধর্ম্মের টানে হাঁটিয়া যাইতেন, আমরা চেৎলা হইতে প্রতি রবিবার কলিকাতায় আসিতাম। শেষ জীবনে তিনিও দলাদলি মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমরাও প্রতাপচন্দ্র এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাহা করিয়াছি। তিনিও শেষে দল ছাড়িয়া একাকী ছিলেন, আমরাও একাকী আছি। প্রতাপচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার সহিত যোগ দিয়া কাজ করিতে তিনি আমাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমরা বলিয়াছিলাম, "আপনি অগ্রগামী, অগ্রে সকলের সহিত মিলিত হইয়া চলুন, আমরা পশ্চাতে চলিব। আমাদের বড় ইচ্ছা হয়, আপনি সকলের সহিত আবার মিলিয়া সেই শক্তি-লীলার অভিনয় করুন, যাহা দেখিয়া একদিন মোহিত হইয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া জীবন সার্থক করি।" তিনি কথা শুনিয়া কিছু নিরাশ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষ জীবন পর্য্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে

আমাদের সহিত যুক্ত ছিলেন। কত সময়ে যে আনন্দ-আশ্রমে উপাসনা ইত্যাদি করিয়াছেন ও নব্যভারতে লিখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। এই সময়ে বহু প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম। দুঃখ বিপদে তিনি আমাদের পরম সহায় ছিলেন। তাঁহার তিরোধানে আমাদের হৃদয় প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার অভাবে এ দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা যে শীঘ্র পূরণ হইবে, তাহা মনে হয় না। তিনি ৪২ বৎসর বয়সের সময় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রচার-ব্রত গ্রহণ করেন। সেই সময়ে আমরাও ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দেই। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির আমাদের মহা শিক্ষার স্থল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা বরাবর শ্রোতা রূপে ব্রহ্মমন্দিরে যাইতাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে যখন আমরা উক্ত সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য ছিলাম, তখনও যাইতাম। ৺নগেন্দ্র বাবু ও নবদ্বীপচন্দ্র-প্রমুখ কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া আমরা এক সঙ্গে সাধন ভজন করিতাম, এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া প্রচারক হইবার জন্য সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজে আবেদন করিয়াছিলাম। সেই দলের একজন বন্ধু ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যাওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করিলেও আমরা যাইতে ক্ষান্ত হই নাই। বন্ধুকে প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলাম, “ব্রাহ্মসমাজে কিছু পাওয়ার জন্য আসিয়াছি, যেখানে কিছু পাইব, সেই খানে যাইব। তাহা করিলে যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য থাকা না যায়, তবে সে সভ্যপদ পরিত্যাগ করিব।” এই কথা শুনিয়া বন্ধুবর নীরব হইয়াছিলেন এবং আর কখনও কোন কথা বলেন নাই, তবে অনেক সময়ে প্রচারক-মণ্ডলীর নিন্দা করিতেন। তাহা আমাদের বড় অপ্রিয় ছিল। ত্রৈলোক্যনাথ নির্ব্বিকার-চিত্ততার দ্বারা সর্ব্বদা অঙ্গাঙ্গীভাবে আমাদের সহিত যুক্ত থাকিয়া মনোমালিন্য দূর করিতেন। যেমন ছিলেন ভক্ত প্রতাপচন্দ্র, তিনিও তেমনি ছিলেন। কিন্তু প্রতাপচন্দ্রের সহিত তিনি মিশিতে পারিতেন না। তাঁহার শান্তিকুটীরে যে পৃথক উপাসনা হইত; তাহাতেও ত্রৈলোক্যনাথ যোগ দিতেন না। এজন্য প্রতাপচন্দ্র কত সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ দলাদলি বিমুখ হইয়া শেষ জীবনে একাকিত্ব-সাধনে মনোপ্রাণ উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮ ১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের স্মরণীয় দিন। ব্রাহ্ম-সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি এই সময়ে হইয়াছিল। ব্রহ্ম-সাধন-যজ্ঞের মহা ইন্ধনরূপে এই সময়ে দলে দলে প্রচারকগণ আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি স্থাপনের পর, প্রথম নগর কীর্ত্তন বাহির হয়। ত্রৈলোক্যনাথ প্রথম নগর কীর্ত্তন রচনা করেন, “তোরা আয় যে ভাই, এত দিনে দুঃখের নিশি হল অবসান, নগরে, উঠিল ব্রহ্ম-নাম।” ইত্যাদি। এই সময়ের পরবর্ত্তী নগর কীর্ত্তনে কলিকাতা সহর তোলপাড় হইয়া যাইত। ১১ই মাঘের উৎসবের পূর্ব্ব দিন নগর কীর্ত্তন বাহির হইত; নববিধান ঘোষণার পর ১১ই মাঘের পর দিন, উৎসব-সম্ভোগের পর, নামপ্রচার জন্য নগর-কীর্ত্তন বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৬১ খ্রীঃ ৪৪ বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র প্রচারক ব্রত গ্রহণ করেন,

১৮৬২ খ্রীঃ ২২ বৎসর বয়সে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ১৮৬৩ খ্রীঃ ৪১ বৎসর বয়সে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ১৮৬৩ খ্রীঃ ৪০ 22 বৎসর বয়সে সাধু অঘোরনাথ, ১৮৬৪ খ্রীঃ ৪২ বৎসর বয়সে অমৃতলাল বসু, ১৮৬৫ খ্রীঃ ৪৩ বৎসর বয়সে উমানাথ গুপ্ত, ১৮৬৫ খ্রীঃ ৪৩ বৎসর বয়সে মহেন্দ্রনাথ বসু, ১৮৬৬ খ্রীঃ ৪২ বৎসর বয়সে গৌরগোবিন্দ রায়, ১৮৬৬ খ্রীঃ ৪৪ বৎসর বয়সে কান্তিচন্দ্র মিত্র, ১৮৬৭ খ্রীঃ ৪২ বৎসর বয়সে ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, ১৮৭০ খ্রীঃ ৩৮ বৎসর বয়সে প্যারীমোহন চৌধুরী, ১৮৭১ খ্রীঃ ৪৫ বৎসর বয়সে প্রসন্নকুমার সেন, ১৮৭২ খ্রীঃ ৪৩ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র সেন, ১৮৭৩ খ্রীঃ ৪৪ বৎসর বয়সে কেদারনাথ দে, ১৮৭৩ খ্রীঃ ৪৩ বৎসর বয়সে দীননাথ মজুমদার, ১৮৭৩ খ্রীঃ ৪২ বৎসর বয়সে বঙ্গচন্দ্র রায়, ১৮৭৫ খ্রীঃ ৪১ বৎসর বয়সে রামচন্দ্র সিংহ, ১৮৭৫ খ্রীঃ ৩২ বৎসর বয়সে দুর্গানাথ রায়, ১৮৭৫ খ্রীঃ ২৮ বৎসর বয়সে বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, ১৮৭৫ খ্রীঃ ৩২ বৎসর বয়সে ঈশানচন্দ্র সেন, ১৮৭৫ খ্রীঃ ৩৪ বৎসর বয়সে কৈলাসচন্দ্র নন্দী, ১৮৭৬ খ্রীঃ ৩১ বৎসর বয়সে চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার, ১৮৭৬ খ্রীঃ ৩৯ বৎসর বয়সে দীননাথ কর্ম্মকার, ১৮৮১ খ্রীঃ ৪৫ বৎসর বয়সে কালীশঙ্কর কবিরাজ প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন। বৈদ্য ১০ জন, কায়স্থ ১০ জন, ব্রাহ্মণ ২ জন, কর্ম্মকার ২ জন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরলোক গমন করিয়াছেন। ভাঙ্গাহাটে গুণী, মানী, দয়ার অবতার, সহৃদয়তার প্রতিমূর্ত্তি, ভক্ত-সেবক কান্তিচন্দ্রের নেতৃত্বে এখনও অদম্য উৎসাহে সমাজ উন্নতির পথে চলিতেছে। কিন্তু বলিতে সঙ্কোচের কোন কারণ নাই, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮১ পর্য্যন্ত যে উৎসাহ ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। স্বার্থ-ত্যাগের যে স্বর্গীয় চিত্র ঐ সময়ে বঙ্গভূমিতে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা তুলনা-রহিত। নব-যুগের নব-অভ্যুদয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং পরে বিবেকানন্দ মহাশয় যোগ দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে এমন যুগ আর আসিবে না। ভক্তির স্রোতে বঙ্গপ্রদেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল,—পবিত্রতার আস্বাদনে নরনারীর দীপ্ত শিরার দাহন প্রশমিত হইয়াছিল। নব নব মত প্রকটনে এদেশে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, কি সঙ্গত-সভা, কি নগর-কীর্ত্তন, কি ভারতাশ্রম কি ব্রাহ্ম-নিকেতন, কি ভারত-সংস্কারক সভা, কি পত্রিকা ও পুস্তক প্রচার, সর্ব্বদিকেই গভীর উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। এমন যুগ এ দেশে আর যে আসিবে, তাহা বোধ হয় না।

যদিও কেশবচন্দ্র প্রচারকগিগের কার্য্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং যদিও অল্পাধিক পরিমাণে আপনাপন কাজে সকলেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, গিরিশচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ এবং কান্তিচন্দ্র যে কাজ করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। কুচবেহার বিবাহের আন্দোলনের পর সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু এ সমাজ এবং নববিধান সমাজ, কোন সমাজই ঐ ৫ জন প্রচারকের সমতুল্য লোক দেশকে উপহার দিতে পারেন নাই। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ এ পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিকতা বা কার্য্যতৎপরতা, বা প্রচার-ব্রত, বা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন, কিছুর দ্বারাই দেশকে উন্নত আদর্শ দেখাইতে পারেন নাই। ইহার প্রধান কারণ,সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্ববঙ্গের

প্রাধান্য বড় বেশী। পূর্ব্ববঙ্গ কোন কোন বিষয়ে আদর্শ হইলেও, ধর্ম্মান্দোলন এবং সাহিত্য-চর্চ্চা দ্বারা পশ্চিম বঙ্গকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্নিগ্ধ বারি ধর্ম্ম প্রচারের যেন অহেতুকী পুণ্য-প্রবাহ। নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত * ১০০ এক শত বৎসরের অধিক কাল কি ধর্ম্মপ্রবাহই চলিয়া আসিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণের গাথা, রামকৃষ্ণের কথামৃত, বিবেকানন্দের বক্তৃতা, কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, মহর্ষির ব্যাখ্যান, চিরঞ্জীবের সঙ্গীত,রামবসু,গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মনোমোহন বসুর গান, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, সর্ব্বোপরি রামমোহনের সঙ্গীত, বিষ্ণুর সঙ্গীত, রামপ্রসাদের সঙ্গীত, দাশরথির পাঁচালী, বদনের তুক্ক, মধু কাইনের গান, গোবিন্দ অধিকারী ও নীলকণ্ঠের গান, নিধুর টপ্পা ইত্যাদি এদেশকে অতি উচ্চ সোপানে তুলিয়া দিয়াছে। তুলনা ভাল নয়, কিন্তু বলিতে ভয় কি যে, কোন আদর্শেই পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিম বঙ্গকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। মনসার ভাসান, স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনী, গোবিন্দ রায় ও কালীনারায়ণের গান,আনন্দচন্দ্র মিত্রের গান, দীনেশচরণের গান, যত বল না কেন, পূর্ব্ববঙ্গ কিছুতেই পশ্চিম বঙ্গের সহিত তুলিত হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত বিদ্যাপতির সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত রচিত প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র সঙ্গীত-সম্বলিত "প্রীতি-গীতি" পাঠ করিলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। সাহিত্য-চর্চ্চার কথা আর কি বলিব ? পশ্চিমবঙ্গ হইতে সাহিত্য-চর্চ্চায় পূর্ব্ববঙ্গ বহুদূরে অবস্থিত, কখনও এদেশের সহিত সে দেশের তুলনা হইতে পারিবে কি না, গভীর সন্দেহের বিষয়। বলিতেছিলাম,নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্ববঙ্গের লোকের প্রাধান্য অধিক বলিয়া এ সমাজের লোকেরা সাহিত্য-চর্চ্চায় উদাসীন। নববিধান সমাজ এবং আদি-ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বাবধি যেরূপ সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তাহার কিছুই হয় নাই। ফাঁকা আওয়াজ করিতেই এ সমাজের লোকেরা মজবুত। পশ্চিমবঙ্গের জগদীশ্বর গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়দিগকে বাদ দিলে এ সমাজের লোকেরা সাহিত্য-চর্চ্চায় যে উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু গুপ্ত, চট্টোপাধ্যায় এবং বন্দ্যোপাধ্যায় উপেক্ষিত। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের তত্ত্ব সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, মুসলমান ধর্ম্ম ও প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মও সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মও সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রচারিত হইয়াছিল এবং হইতেছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রচারিত না হইলে কখনও কোন ধর্ম্ম স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বড় কিছু দিবার নাই বলিয়াই কি এরূপ হইতেছে ? সাধন-ভজন-হীনতাই নূতন কিছু না করার কারণ কি ? রাগ করিও না এবং বিরক্ত হইও না, তোমাদের কোন্ বক্তৃতা এবং কোন 'সার্মন' বা কোন্ সঙ্গীত স্থায়িত্বের দাবি করিতে পারে ? অসার কথা ফাঁকা আওয়াজে বলিয়া গেলে কখনও ধর্ম্মমত

---

* নবদ্বীপচন্দ্র ১৪৮৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৩২ শকে দেহ রক্ষা করেন।

টি‍ঁকিয়া থাকিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না ?

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচারকগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও গৌরগোবিন্দ যেমন পূর্ব্ববঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, এমন আর কেহই পারেন নাই। দুই জনই বঙ্গের অমর সন্তান এবং দুই জনের আদর্শ জীবন দেখিয়াই আমরা ধন্য হইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের মহর্ষি, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ এবং শিবনাথের জীবনও কৃতিত্বে সর্ব্বপূজ্য। এই সকলের কৃতিত্ব যেন ঘনীভূত হইয়াছিল ত্রৈলোক্যনাথে। শুনিয়াছি, খ্রীষ্টের সহচরবৃন্দ অশিক্ষিত লোক ছিল, শুনিয়াছি, নবদ্বীপচন্দ্রের সহচরবৃন্দেরও অধিকাংশ তেমন সুশিক্ষিত ছিলেন না; শুনিয়াছি, মহম্মদের সহচরগণও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু পালেসটাইন, মেক্কা-মদিনা এবং নবদ্বীপের কীর্ত্তি ধরাপৃষ্ঠ হইতে কখনও বিলুপ্ত হইবে না, তাহা চির নূতন। সময়ে সময়ে ভাবি, কিসে এত অসাধ্য সাধিত হইয়াছিল ? মনে হয়, শুধু বিশ্বাস ভক্তিই জীবের মুক্তির একমাত্র সোপান। রামমোহন ও মহর্ষির কথা কতভাবে কতজনে কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু কখনও পুরাতন হইবার নয়। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথাও কত কত ভাবে কতবার শুনিয়াছি, কিন্তু পুরাতন হয় নাই। কেশবচন্দ্রের কথা ত্রৈলোক্যনাথ, প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ কত রূপেই বিবৃত করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের নিকট পুরাতন হয় নাই। রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথের ঘনীভূত শক্তি ;—কেশবচন্দ্র, আধ্যাত্মিকতার গরীয়ান ভূমি কেশবচন্দ্র। সকল কথা বিবৃতির ইহা স্থান নয়। এই কেশবচন্দ্রের দাঁড়াইবার স্থান কোথায় ? প্রতাপচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, কান্তিচন্দ্র এবং ত্রৈলোক্যনাথ প্রভৃতি নয় কি ? তিনি সকলকে উত্থিত করিলেন, সকলে তাঁহাকে উত্থিত করিল। ভক্তদিগের জীবনেতিহাস সাঙ্গপাঙ্গ-বাদে কিছুই নয়। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুরারি, হরিদাস প্রভৃতি বাদে শ্রীচৈতন্য কোথায় ? বিবেকানন্দ, রামচন্দ্র বাদে রামকৃষ্ণ কোথায় ? অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ, বিষ্ণুচন্দ্র বাদেই বা দেবেন্দ্রনাথ কোথায় ? উপরোক্ত সাঙ্গপাঙ্গ বাদেই বা কেশবচন্দ্র কোথায় ? খুঁজিতে যাও, খুঁজিয়া পাইবে না। টাউন-হলে কেশবচন্দ্র বক্তৃতা করিতেছেন, ত্রৈলোক্যনাথ "সহজে মিলিত হই, পাপীর সনে" গান করিতেছেন ; মন্দিরে উপাসনা করিতেছেন, নিত্য সাধা গলায় নূতন গান শুনাইতেছেন, নগর-কীর্ত্তন বাহির হইতেছে, ত্রৈলোক্যনাথ, শ্রীবাসের অঙ্গনের ন্যায়, কলিকাতার অঙ্গন, কলুটোলা এবং কমলকুটীরের অঙ্গনকে মাতাইয়া তুলিতেছেন। কেশবচন্দ্রের তিরোধানের সময় শিয়রে বসিয়া গাইতেছেন—"তোমার রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক্ হয়েছি।" বিলাতে প্রসন্নকুমার কেশবচন্দ্রকে কিরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন, সকলেই জানেন। কেশবচন্দ্রের অলঙ্কার তাঁহার দল, আহার পানীয় তাঁহার দল, তাঁহার সর্ব্বস্বই তাঁহার দল। এই দলও যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু-বলে বলীয়ান হইয়া জগতের সম্মুখে নবোত্থিত শক্তি রূপে আবার দাঁড়াইলেন। তাহার ফলে নববিধান ঘোষিত হইল। এমারসন বলেন, পতনই উত্থানের সোপান। কেশবচন্দ্রের দোষ ত্রুটী, বিবাহের অবমাননা, অবহেলা, বিষম আন্দোলন যেন নবজীবন সঞ্চার করিল ;—ভ্রাতৃ-শোণিত পান করিয়া

রিয়েঞ্জি যেন নবোত্থিত হইলেন। নববিধান ঘোষিত হইল, নববৃন্দাবন রচিত হইল, নবনৃত্য চলিল, নবসংহিতা প্রকাশিত হইল, জীবন-বেদ, ব্রহ্মগীতোপনিষৎ প্রকাশিত হইল, সমন্বয় ভাষ্য রচিত হইল, মহম্মদ-চরিত প্রকাশিত হইল, কোরাণসরিফ বাহির হইল, কত কত অমূল্য রত্ন ফুটিতে লাগিল। প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, গিরিশচন্দ্র প্রমত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ অনুপ্রাণিত, নিত্য নিত্য কত নূতন নূতন সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখন মনে হইত, বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যেন ত্রৈলোক্যনাথে অবতরণ* করিয়াছেন। কলিকাতা নব রসে মাতিয়া উঠিল। আমরা দেখিয়া শুনিয়া সম্মোহিত হইলাম। কেশবচন্দ্রের সকল কীর্ত্তি লোপ হইতে পারে, কিন্তু "নববিধানে" ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিণতির ব্যাখ্যা কখনও কেহ ভুলিবে না। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রকট লীলা-ভূমি "নববিধান"। কি আশ্চর্য্য অভিব্যক্তি, কি আশ্চর্য্য অনুবর্ত্তন, কি সর্ব্বগ্রাসী অনুভূতি, কি সূক্ষ্ম দৃষ্টি। নববিধানের ঘোষণা চিরকাল কেশবচন্দ্রকে অমর করিয়া রাখিবে।

আমরা কেশবচন্দ্রের উত্থানের ইতিহাসের সকল সাঙ্গপাঙ্গের কথা ভুলিতে পারি, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের কথা ভুলিতে পারা অসম্ভব। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার সংস্পর্শ ও অনুপ্রাণনার ফল, কেশবচন্দ্র ও ত্রৈলোক্যনাথের অনুপ্রাণনার ফল। কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইল "অর্গান" আসিল। যে দিন 'অর্গান" সম্বন্ধীয় সভা হইল, আমরা সেদিন উপস্থিত ছিলাম ; কেশবচন্দ্র যখন বলিলেন, "এই যন্ত্রের ভারার্পণ একজনকেই দেওয়া যায়, তাঁহাকে সকলেই চিনিতেছেন" – সে কথায় ত্রৈলোক্যনাথের প্রতি কেশবচন্দ্রের গভীর অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছিলাম। সে যে কি অনুরাগ, ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা হয় না। এরূপ অনুরাগ বিষ্ণুর প্রতিও মহর্ষির ছিল। ত্রৈলোক্যনাথ কখনও নাটক পড়েন নাই। তবু কেশবচন্দ্রের অনুরোধে "নববৃন্দাবন" নাটক লিখিলেন। নিজে সে নাটকের অভিনয় করিয়া ত্রৈলোক্য-অনুরাগ আরো ঘোষণা করিলেন। পুরাণে শুনিয়াছিলাম শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনিতে জগৎ মাতাইতেন,—সকলকে কুলের বাহির করিতেন। ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন যেন কেশবচন্দ্রের দেশ-মাতানের বংশী। বংশী-অধিকারীর আহ্বান-উপদেশ যখন বংশীতে নিনাদিত হইত, তখন কত কত নরনারী তন্ময় হইয়া যাইত। সে ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। উৎসবের সময় জমাট ভাব—১২ দিন, ১৩ দিন একই ভাবের উৎসব চলিতেছে ; ব্রাহ্মসমাজে এরূপ দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় নাই। এবেলা এক ভাব, ওবেলা আর এক ভাব, এক দিনের ভাবের সহিত অন্য দিনের যোগ নাই, এখানকার ন্যায় নানা দলের যাত্রার পালার ন্যায় তখন উৎসব হইত না। কেশবচন্দ্র সকল সাধকের সহিত একাত্মক হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন—একই ভাবের উপাসনার জমাট ভাব চলিতেছে ;—তাহা অভিব্যক্তি পাইতেছে চিরঞ্জীবের সুমধুর সঙ্গীতে। চিরঞ্জীবের সঙ্গীত-রচনার ইতিহাস প্রত্যেক ভক্তের অনুধ্যানের বিষয়। এবার ভবানীপুরে

---

* ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাণাঘাট অঞ্চলের আনুলে কায়েৎপাড়ায় জন্ম, ৮২ বৎসর বয়সে মৃত্যু। বিষ্ণুচন্দ্র ৬৭ বৎসর কোন বাধা বিঘ্নেই আদিব্রাহ্মসমাজে অনুপস্থিত হন নাই। বিষ্ণু মহর্ষির যেন দক্ষিণ হস্ত ছিলেন তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন, ১৮৩৭ শক।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমরা তাহা “সম্মিলনী” পত্রিকায় পড়িয়া বড়ই নিরাশ হইয়াছি। আধ্যাত্মিকতার ইতিবৃত্ত জানেন না, অথচ তাহা বলিতে চাহেন। এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনীয় নয়। রামমোহন, বিষ্ণু ও ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গীতের ইতিহাসই ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতার ইতিবৃত্ত। তাহা যদি কখনও লিখিত হয়, তবে এই দেশ ধন্য হইবে। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ইতিহাস যেমন আদি ব্রাহ্মসমাজের মূল ভিত্তি এবং পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের ইতিহাস যেমন আদি-ব্রাহ্মসমাজের গৌরবস্থল, তেমনি, ত্রৈলোক্যনাথের কাহিনীও নববিধান সমাজের আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসের মূল ভিত্তি। কেশবচন্দ্র যেন তদীয় জীবনে পূর্ণভাবে ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছিলেন। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীতাচার্য্য নাই, নূতন সঙ্গীত-রচক নাই, আচার্য্য এবং গায়কের অঙ্গাঙ্গী-ভাব-সাধন নাই। সুতরাং সেখানে আধ্যাত্মিকতাও নাই। তাহার ইতিবৃত্তও নাই। কালীনাথ,উমেশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথও শেষে পৃথক হইয়া সাধন ভজন করিতেন। কেশবচন্দ্রের তিরোধানের পর যখন ত্রৈলোক্যনাথের হালুলুজা ব্যাণ্ডের সহিত অনুগমন করিতাম, তখন সর্ব্বদাই মনে হইত, কেশবচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বংশীটী যেন ফেলিয়া গিয়াছেন। সুদীর্ঘ দেহের মস্তকে উষ্ণীষ বাঁধিয়া একতন্ত্রী হস্তে লইয়া যখন নাচিতে নাচিতে রাস্তা দিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া যাইতেন, তখন মনে হইত যেন দ্বিতীয় নারদ ঋষি ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। সে বংশীধ্বনি কত মধু বর্ষণ করিত, সকলে শুনিয়া তন্ময় হইয়া যাইত। হায়, এত দিনে সে বংশীও নীরব হইল।

ত্রৈলোক্যনাথের জীবনের অভিব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতায় পরিস্ফুট, আমরা বলিতেছিলাম। প্রথম নগর-কীর্ত্তন হইতে শেষ নগর-কীর্ত্তনে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম নগর-কীর্ত্তন ২৪ জানু, ১৮৬৮ “তোরা আর যে ভাই।” শেষ নগর কীর্ত্তন, ১৩ই মাঘ, ১৯১৫ “লীলাময় হরি, ভক্ত-চিত্তহারী ভকত-জীবনে করেন বিহার, নাম রূপে অবতরি।” প্রথমটী প্রচারের গান, শেষটী জীবন্ত সম্ভোগের গান। ১৮৬৮ খ্রীঃ হইতে ১৯১৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৪৭ বৎসরের মধ্যে ১৮৮৩, ১৮৮৫, ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের জন্য নগর কীর্ত্তন হয় নাই। ১৮৮৯, ৯০ ও ১৮৯১ খ্রীঃ নববিধান সমাজের বিবাদের জন্য নগরকীর্ত্তন হয় নাই। ১৯৮৩ খ্রীঃ অব্দে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার তিরোধানের জন্য নগর-কীর্ত্তন হয় নাই; বাকী ৪০টী গান তাঁহার রচিত। এরূপ সংগীত এদেশে আর রচিত ও প্রকাশিত হয় নাই। ত্রৈলোক্যনাথের গান ভক্তি-ইতিহাসের এক অক্ষয় ভাণ্ডার। এই ৪০টী গানে তদীয় জীবন এবং ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস প্রধানত বদ্ধমূল হইয়াছে। যত পড়া যায়, ততই মোহিত হওয়া যায়। ভ্রাতৃসঙ্ঘ এই কীর্ত্তনগুলি ছাপাইয়া দেশের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। আশা করি, ভ্রাতৃসঙ্ঘ তাঁহার পুস্তক সকল, তাঁহার আত্মবিবৃতি এবং সমস্ত সঙ্গীতগুলি পরে পরে এক সঙ্গে ছাপাইয়া দেশের মহদুপকার করিবেন।

ম্যাট্‌সিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন বলিয়া, জগতে তাঁহারা অমূল্য গ্রন্থেরও তাদৃশ

আদর হয় নাই। অথচ তদীয় "Duties of man" পুস্তক ও আত্ম-বিবৃতি অমূল্য গ্রন্থ। ত্রৈলোক্যনাথ যদি উপবীতত্যাগী একেশ্বরবাদী না হইতেন, তবে হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে তাঁহারা সঙ্গীতের আদর হইত। গানগুলি যেন অমৃতের ভাণ্ডার, কি ভাষা, কি কবিত্ব, কি রচনার পারিপাট্য, কি জমাট ভাব, কি শিল্প-চাতুর্য্য, কি বিশ্বাস ভক্তির অভিব্যক্তি, কি সুর-সংযোগ, সকলেই অপূর্ব্ব সামগ্রীর সমাবেশ। এক সহস্র ধর্ম্ম সঙ্গীত এদেশে আর কেহ রচনা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তিনি গানের জন্য গান লিখিতেন না, অনুপ্রাণনার অবস্থায় লিখিতেন, তাই প্রতি গানেই ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয়। এই গানগুলি তন্ময়তা ও তাগদ ভাবে পূর্ণ। আমরা রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক মহাত্মার গান শুনিয়াছি ও পাঠ করিয়াছি, কিন্তু সব দিক বিচার করিলে, ত্রৈলোক্যনাথের ধর্ম্মসঙ্গীত আমাদের নিকট অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে হয়। আমাদের ইচ্ছা ছিল, গানগুলি রবীন্দ্রনাথ ও রামপ্রসাদ প্রভৃতির গানের পার্শ্বে পার্শ্বে সংস্থাপন করিয়া দেখাইব, কত উচ্চ উচ্চ গান; কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল বলিয়া তাহা করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। যদি জীবনে অবসর পাই, তবে তাহা করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার গানের তুলনা কেবল তিনিই। এরূপ গান এদেশে আর রচিত হয় নাই। তিনি যদি একেশ্বরবাদী না হইতেন, যদি গণ্ডিতে আবদ্ধ না হইতেন, তবে সকলেই একথা স্বীকার করিতেন। কাল যখন দলাদলির কুজ্ঝটিকা দূর করিবে, তখন নিশ্চয় গানগুলি এদেশে অমরত্ব লাভ করিবে।

আর তাঁহার পুস্তকরাশি,—ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা, নববৃন্দাবন (নাটক) কেশবচরিত, ঈশা-চরিত, যৌবন-সখা, বিধান-ভারত দুইভাগ, যুগলমিলন (নাটক) কলিসংহার (নাটক) জগতের বাল্য ইতিহাস, গরলে অমৃত (কাব্য) বিংশ শতাব্দী (কাব্য)। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, বিধান-ভারত, ব্রহ্মগীতা, যৌবন-সখা (পদ্য) বাল্যসখা দুই ভাগ, সাধু অঘোরনাথ, পথের সম্বল প্রভৃতি পুস্তক কি তাঁহাকে অমর করিতে পারিবে না? সকল পুস্তকের উদ্দেশ্যই ধর্ম্মপ্রচার। সকল পুস্তকের রুচিই মার্জ্জিত, সকল পুস্তকই রচনা-পারিপাট্যে মধুর হইতেও মধুর। তাঁহার লেখা নব্যভারতে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছিল, সকলেই তাঁহার পরিচয় পাইয়াছেন। এই সকল পুস্তক, সাম্প্রদায়িকতার গোল না থাকিলে, নিশ্চয় তাঁহাকে অমর করিতে পারিত। তিনি পুত্রহীন, পরে আর কেহ তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাশি ছাপাইবে কিনা, আমরা জানি না। তিনি দলের গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মরস-সুধাপানে বিভোর হইয়াছিলেন, তিনি এই জন্যই কি উপেক্ষিত হইতেন? শুনিয়াছি, পুস্তকগুলি তিনি প্রচারাশ্রমে দান করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র সমাজ যদি গণ্ডীর অন্ধতা পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগুলি গ্রন্থাবলীর আকারে প্রকাশিত করেন, অমূল্য রত্নসকল সুরক্ষিত থাকিয়া তাঁহার এবং তৎসহ ব্রাহ্মসমাজের গৌরব ঘোষণা করিবে। ভগবদ্বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইলে অশিক্ষিত মানুষ কিরূপ ক্ষমতাশালী হয়, ত্রৈলোক্যনাথের জীবন তাঁহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহার গ্রন্থরাশি অক্ষয় হইলে চিরকাল এই কথাই ঘোষণা করিতে থাকিবে। যৌবনকাল হইতে হরিপ্রেমে মাতিয়াছিলেন,

শিক্ষার অবসর পান নাই, অথবা তাঁহার জীবনে গোবিন্দ অধিকারীর গানের উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের রাধাপ্রেমই—'লিখিতে শিখিতে দিলে কই, জন্মাবধি নিরবধি জানি না শ্রীরাধা বই" স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; অথবা প্রহ্লাদের "ক" লিখিতে কৃষ্ণের কথা জাগরিত হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গীতরাশি, এবং তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ সমূহ হরিপ্রেমের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

তিনি ব্রহ্ম-কৃপাতে যে অজেয় শক্তিলাভ করিয়াছিলেন, বংশপরম্পরায় তাহা এদেশে অক্ষয় হইবে। চরিত্রে তিনি অতুল, বিশ্বাস ভক্তিতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, দেহ মনে তিনি অটল, অটুট, অচল, তিনি এদেশের অমূল্য সন্তান। সুদীর্ঘদেহে কি অমানুষী আত্মা বাস করিত। যে নবদ্বীপ ভক্তগোরার জন্মস্থান, সেই নবদ্বীপের অধীনস্থ গ্রামে ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম। যে শান্তিপুর অদ্বৈত গোস্বামীর জন্মস্থান, সেই শান্তিপুরে ত্রৈলোক্যনাথের নবজীবন লাভ, অদ্বৈত বংশের সাধু বিজয়কৃষ্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মাটীই যেন ভক্তির অনুকূল; ত্রৈলোক্যনাথের অমূল্য জীবন জগতে চিরদিন এই কথাই ঘোষণা করিবে।

তিনি আমাদিগের বন্ধু ছিলেন,—অকৃত্রিম বন্ধু; তিনি আমাদিগের সহায় ছিলেন, দুর্দ্ধর্ষ সহায়, তিনি আমাদিগের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, অক্ষয় উদ্বোধন। তাঁহার সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা যদি উদ্বুদ্ধ না হইলাম, এ জীবন কোন্ পথে যাইত, জানি না। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি চিরঞ্জীব। মনে হয়, বিশ্বপতির ভাণ্ডারে যে চিরঞ্জীবিত শক্তি ছিল, তাহাই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল,—এবং তাহা আমাদের ন্যায় কত কত অকিঞ্চনের জীবনে চিরঞ্জীবিত থাকিবে। তাঁহার চরিত্রে, সঙ্গীতে, লেখায়, গাথায়, কবিত্বে, ও ভাবে তিনি চিরঞ্জীব, এ কথায় একটুও ভুল ভ্রান্তি নাই। তিনি আত্ম-বিবৃতিতে লিখিয়াছেন, কেশবের তিরোধানের পরই তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। তাহা অসম্ভব। মৃত্যুতে সাধুভক্তের জীবন শেষ হয় অনন্তকাল তাহার কাজ চলিতে থাকে। ত্রৈলোক্যনাথ এদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

আমরা বড়ই হতভাগ্য যে, দিন দিনই সহায়-হীন হইয়া পড়িতেছি। কত আর বিয়োগ-কাহিনী লিখিতে হইবে, জানি না। আমরা তাঁহাকে হারাইয়া যে মর্ম্ম-বেদনা পাইয়াছি, সেই মর্ম্মবেদনা আমাদিগকে স্বর্গের দিকে উত্থিত করুক। তিনি শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে আমাদের অবিচলিত সহায় হইয়া থাকুন। তাঁহার অসংখ্য অমৃতবর্ষী গানের সহিত এই গানটী আমাদের চিরসম্বল হইয়া থাকুক।—

"জীবন মরণে তুমি নিকটে আছ শঙ্করী।
ওমা শান্তিপ্রদায়িনী, দয়াময়ী ক্ষেমঙ্করী।
বসি মোহ অন্তরালে, ইহকালে পরকালে,
অমর সাধু সকলে রয়েছ মা কোলে করি।
যোগেতে জীবিত হয়ে, সাধু বন্ধু গণে
লয়ে, থাকিব অনন্তকাল তবপদ হৃদে ধরি;
—পাসরিব ভব-তাপ, বিরহ শোক বিলাপ,
হেরিব অমৃত-ধামে প্রিয়জনে প্রাণ ভরি।"

শেষ জীবনে তিনি দলের অঙ্গতা পরিত্যাগ করিয়া এককিত্ব সাধন করিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে জীবন শেষ হইয়া আসিল,—ক্রমে ক্রমে জ্ঞান বিলুপ্ত হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে মহাযোগের জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন।

উইল করিয়া সংসার হইতে যেন "চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন—দাশরথির গানে যেন বলিলেন—"তোরা সব ফিরে যা ভাই তিন্থরে, আমি যাব না, যেতে পারবো না, ভবে আস্‌তে হয়েছে একা, যেতে হবে একারে। * * *

ওরে তোরাও ভাবিস্‌রে একা, আমি কিন্তু নইরে একা, ব'সে আছি মায়ের কোলেতে।" অথবা গিরিশচন্দ্রের ভাষায় যেন বলিলেন—

"মন মজায়ে ওহে হরি রহিলে কোথায় ?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা, পিপাসু জন তোমায় চায়।
আমি ছিলাম গৃহবাসী, কল্লে সন্ন্যাসী, এখন কূল তেজে অকুলে ভাসি।" ইত্যাদি—

এবারও ১০ই মাঘ, আশুতোষের মুখে তন্ময়ভাবে কালীনাথের রচিত নগরকীর্ত্তন শুনিলেন। ক্রমে ক্রমে শরীর নিশ্চল হইয়া আসিল, তিনি নিয়তিতে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। মৃত্যুর পর বদনে অতুল শোভা ফুটিয়া উঠিল, ভাবেভোলা স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছেন ? আবার কখন আসিবেন ?" কোন বন্ধু বলিলেন—"উনি আসিবেন না, আপনাকেই সঙ্গে মিলিত হইতে যাইতে হইবে।" তিনি সে সব কথা বুঝিলেন না। পালঙ্কোপরি শয্যায় শব পুষ্প সজ্জায় সজ্জিত হইল, "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" বলিতে বলিতে বন্ধুগণ তাহা বহন করিয়া নীমতলায় লইয়া গেলেন। সেখানে অল্প সময়ের মধ্যে সেই সৌম্যমূর্ত্তি ভস্মে পরিণত হইল। সংসারে পড়িয়া রহিল, কেবল তাঁহার আদর্শ চরিত্র এবং হরিপ্রেম-পূর্ণ সহস্র সঙ্গীত এবং অমূল্য গ্রন্থরাশি। মহামায়ার মহা ইচ্ছার জয় তদীয় জীবনে ঘোষিত হইল। আমরা তাঁহার ভাষায় গগন কাঁপাইয়া গাই—"জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।"

সঙ্গণিকা।

(৫২)

জাতীয় মহাসমিতির বিংশ অধিবেশন, এবার বোম্বে নগরে, ২৭শে, ২৮শে, ২৯শে ডিসেম্বর মহাসমারোহ হইয়া গিয়াছে। সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বসমেত ২১টী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গোখলে, কেয়ার হার্ডি, হেনরি কটন, ফেরোকসা মেটা প্রভৃতি মহোদয়গণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। তৎপর রাজভক্তি প্রদর্শন, যুদ্ধে জয়লাভ, হার্ডিং মহোদয়ের সময় বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে মন্তব্য গ্রহণের পর মামুলি কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন প্রস্তাব নাই। আগামী বৎসর লক্ষ্নৌ সহরে মহাসমিতির অধিবেশন হইত।

স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে সভাপতি মহোদয়ের মন্তব্য পাঠে ভারতের অনেকেই দুঃখিত এবং বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। বক্তৃতা পাঠে আমাদের মনে হইল, "মজালি কনকলঙ্কা মজিলি আপনি।" জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে এহেন ব্যক্তিকে সভাপতির পদে বরণ করা সঙ্গত হইয়াছে কিনা, গভীর সন্দেহের বিষয়। আমরা জাতীয় মহাসমিতির একনিষ্ঠ সেবক

ও সাধক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়কে সভাপতি-পদে বরণ করা উচিত. লিখিয়াছিলাম। তাহা করিলে আর এরূপ কলঙ্ক হইত না। ভারত একশত বৎসরের মধ্যে স্বায়ত্বশাসনের যোগ্য হইবে না, এই মর্ম্মান্তিক কথা কোন্ হিতৈষীর প্রাণে শেলসম বিদ্ধ হয় নাই ? তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি এদেশে কি আর নাই ? ভবিষ্যতে কর্ত্তাভজাদের চৈতন্যোদয় হইলে ভারতের মঙ্গল হইবে।

(৫৩)

আমাদের হস্তে দুই খানি নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছিল। তাহার ভাষা অপূর্ব্ব—এক খানির শেষে আছে যে—"এই উৎসবে যাঁহারা যোগ দিবেন, তাঁহারা সকলেই নূতন আনন্দ লাভ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইবেন।" অন্য খানির শেষে আছে—"বাবাজীউর শুভ বিবাহে কয়েক দিবস সাদর নিমন্ত্রণ রহিল।"

সাধারণ আপ্যায়নের ভাষাও এদেশ হইতে যেন উঠিয়া যাইতেছে। অহঙ্কারের রাজত্ব বিস্তারের আর বাকী কি আছে ? কি ভাষার মাধুর্য্য !

(৫৪)

দিন দিন দেশের অবস্থা শোচনীয় হইতেও শোচনীয় হইতেছে। ডাকাতি, লুণ্ঠন, অরাজকতা প্রভৃতি লাগিয়াই আছে, তদুপরি আবার কলেজের ছাত্রগণের দুর্ব্বিনীত ব্যবহারের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। যাহারা দেশের আশা ভরসার স্থল, তাহাদের কি শোচনীয় পতন !! গুরুমারা-বিদ্যা বিধাতা এদেশ হইতে দূর করুন।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৮। শ্রীঅদ্বৈতবিলাস। দ্বিতীয় খণ্ড, উত্তরকাণ্ড। শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক কর্ত্তৃক গ্রথিত, মূল্য ১৷৵৹। ভক্তের লেখনীতে ভক্তের কাহিনী অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহা একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভক্তদিগের নিত্য-সম্বল হওয়ার যোগ্য।

৩৯। চন্দন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। মূল্য ৷৷৵০। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের চন্দন নামধেয় একখানি পুস্তক আছে, তাহা কি গ্রন্থকার জানিতেন না ? এক নামের দুই পুস্তক, ইহা বিশদৃশ চিত্র। ভাষা-ভাণ্ডারে কত সুন্দর সুন্দর শব্দ আছে, তাহা সংগ্রহ করিলেই পারিতেন, অন্যের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে স্পৃহা কেন ? কেবল নামে নয়, লেখাতেও এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। গ্রন্থকার সতর্ক হইবেন।

নবদ্বীপচন্দ্র পাল মহাশয় মেডিকেল কলেজে আমাদের সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার আত্মজের এই পুস্তক। পুস্তকের লেখা মন্দ নয়, আশাপ্রদ। উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের স্পৃহা কমিলে গ্রন্থকার ভাল লেখক হইতে পারিবেন।

৪০। ধারা। শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৷৷০। নানা পত্রিকায় যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা তাহার সমষ্টি। দেবকুমার বাঙ্গালা সাহিত্যের অমর লেখক। ভাষা প্রাঞ্জল ও কুহেলিকা-বর্জ্জিত, রুচি মার্জ্জিত, শিল্প-নৈপুণ্য পরিপাটী। এ পুস্তকের আদর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

৪১। ক্ষেপার গান ও কীর্ত্তন। শ্রীচন্দ্রনাথ দাস প্রণীত, মূল্য ৷০। চন্দ্রনাথের প্রেম-

পূর্ণ পবিত্র হৃদয়খানি সমগ্র ভাবে যেন এই পুস্তকে ঢালিয়া দিয়াছেন। বড়ই সুন্দর পুস্তক। পড়িয়া বড়ই উপকৃত হইলাম। ঘরে ঘরে এই পুস্তক আদৃত হউক।

৪২। ধারা। শ্রীঅতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ৷৷০। আবার একই রকমের দুই পুস্তক হাতে পড়িল। গ্রন্থকারগণ একটু সতর্ক হইবেন। লেখা মন্দ নয়।

৪৩। হিন্দু সমাজের বিরাট মূর্ত্তি সন্দর্শন। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় লিখিত। মূল্য /১০। সুচিন্তিত প্রবন্ধ। যিনি পড়িবেন, তিনিই উপকৃত হইবেন।

৪৪। হাসন-হোসেন। শ্রীরামকানাই দত্ত প্রণীত, মূল্য ।০। হাসন হোসেনের কাহিনী এক অপূর্ব্ব জিনিস। শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত সেনের হাসন হোসেনের অপূর্ব্ব গ্রন্থের পর এ গ্রন্থ না লিখিলেও হইত। তবে ভক্ত কথা যত শুনা যায়, ততই ভাল।

৪৫। সেবক সঙ্গীত। শ্রীরামকানাই দত্ত কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।০। ভক্তের ভক্তিগাথা পড়িয়া আমরা বিমল আনন্দ পাইলাম।

৪৬। হামির। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত,মূল্য ১৲। দয়ালচন্দ্র ঘোষের প্রবন্ধ নব্যভারতের পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন। যেমন হইয়া থাকে, ইতিহাসের সহিত এই পুস্তকের কিছু কিছু গরমিল আছে। লেখা ভাল। অনুশীলন করিলে দয়াল বাবু কালে ভাল লেখক হইতে পারিবেন।

৪৭। জ্ঞানাঞ্জন। শ্রীরমণীরঞ্জন সেন গুপ্ত বিরচিত। মূল্য ৷৷০ আট আনা। রমণী লিখিতে "ন" দিলেন কেন? স্কুল-পাঠ্য পুস্তক। স্কুল পাঠ্য পুস্তক লিখিতে যে প্রকার দক্ষতার প্রয়োজন, এ পুস্তকে তাহার পরিচয় নাই। স্কুল-পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে দেশে বড়ই অরাজকতা চলিতেছে। তাহার স্রোত না থামিলে জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে না। এ ক্ষেত্রে শুধু খোসামুদী চলিতে থাকিবে কি?

৪৮। ককারের অহঙ্কার। শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ কর্ত্তৃক প্রকটিত। নিষ্কয় এক শিকি ও এক আনা। গভীর ভাষাজ্ঞানের পরিচয় এই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে রহিয়াছে। সুন্দর লিপিচাতুর্য্য। পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম।

৪৯। প্রমীলা। শ্রীঅবনীকান্ত সেন সাহিত্য-বিশারদ প্রণীত, মূল্য ১৲। ভূমিকা-সম্বলিত। এরূপ ভূমিকা না লিখিলে গ্রন্থ পচিয়া যায় কি? মধুসূদনের প্রমীলা অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থকারের ভাষা মার্জ্জিত। তাঁহার লেখার পারিপাট্য আছে। এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইবার যোগ্য।

৫০। আনন্দাশ্রু। শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত। সুন্দর উপদেশ।

৫১। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্কর দর্শন। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীদ্বিজদাস দত্ত এম-এ প্রণীত। মূল্য ৩৲, ডিমাই ৮ পেজি ফর্ম্মার ৩৭৪ পৃষ্ঠা পুস্তক। ইহাতে শঙ্করের জীবন-চরিত সম্পূর্ণ। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের যে প্রশংসা করিয়াছি, ইহাও তদনুরূপ প্রশংসার যোগ্য। এরূপ পুস্তক এদেশে বড় অধিক নাই। নব্যভারতের পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। সকলে গ্রন্থকারকে উৎসাহ দিন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের আশানুরূপ সফলতা হইতেছে না দেখিয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রথিতনামা অন্যতমরথী, একাধারে কবি ও বৈজ্ঞানিক, পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় গত বৎসর 'নব্যভারতে' এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করতঃ সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্য পরিচালন বিষয়ে নিজে যেমন মন্তব্য করেন, তেমনই উদারভাবে অন্যের মন্তব্যও আহ্বান করেন। সম্প্রতি নবম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সময় সমাগত হইয়াছে দেখিয়া, এই সময়ে আলোচনাই বিশেষ কালোচিত হইবে, মনে করিয়া, আমি এতৎ প্রসঙ্গে আমার নিজের কয়েকটী কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম।

প্রথমতঃ 'সাহিত্য-সম্মিলন' কথা দ্বারা আমরা যাহা বুঝি, কার্য্যতঃ আমরা তাহার কিছুই দেখিতে পাই না। সাহিত্যিকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় হইবে, পরস্পর ভাব-বিনিময় হইবে, সকলের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাবের বন্ধন স্থাপিত হইবে, এই সোৎসুক আশা লইয়াই সাহিত্যসেবিগণ সম্মিলনের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কিন্তু নিমন্ত্রণ-কর্ত্তাগণ সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে পরস্পর মিলনের ব্যবস্থা করিবেন কি, তাঁহাদের নিজেদের সহিত সাহিত্যসেবীদিগের মিলনেরও কোন ব্যবস্থা করেন না। ইহাতে কোন্ কোন্ সাহিত্যসেবী নিমন্ত্রণে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা কেইবা কোথায় রহিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত অনেক সময় জানিবার সুযোগ পাওয়া যায় না। বাসায় যখন এই অবস্থা, সম্মিলনের সভাস্থলের অবস্থা যে আর এতদপেক্ষা বিশেষ হইবে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সেখানে যাইয়া কেবল পরস্পরের মুখাবলোকনই করিতে হয়। এইরূপে সকল সাহিত্যিকের কেবল একত্র উপবেশন, ইহাই সম্মিলনের একমাত্র ফল হয়। সাহিত্যিকগণ পরস্পরের সহিত সম্মিলনের পূর্ব্বেও যেরূপ অপরিচিত ছিলেন, পরেও তদ্রূপ অপরিচিতই রহিয়া যান। ইহাকে যদি সম্মিলন বলিতে হয়, তবে ট্রেইন্ ষ্টীমারের যাত্রীদিগের একত্র উপবেশনকে এতদপেক্ষা অধিক সম্মিলনই বলিতে পারা যায়।

সম্মিলনের কর্ম্মকর্ত্তাগণই কেবল যে সাহিত্যিকদিগের পরস্পর মিলন সম্বন্ধে উদাসীন, তাহা নহে, সম্মিলনের সভাপতিদিগকে পর্য্যন্তও এতদ্বিষয়ে উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া মিলনের কোন ব্যবস্থা ত করেনই না, পরন্তু কোনও সাহিত্যিক উপযাচক হইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য গমন করিলেও তাহাতে কোন আগ্রহের ভাব প্রদর্শন করেন না। গত সাহিত্য-সম্মিলনের সাধারণ সভাপতির সহিত সাক্ষাতের জন্য আমি ও অপর একটী সাহিত্যিক তাঁহার বাসায় গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি একজন delegate ?" ইহার

পর কোথা হইতে গিয়াছি, সাহিত্যের কিরূপ চর্চ্চা করি ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন সংবাদ লওয়া তিনি আবশ্যক মনে করিলেন না। অথচ অপর একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে বৈষয়িক দীর্ঘ আলাপেই প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াই বসিয়া রহিলাম। সম্মিলনে যাইয়া সাক্ষাতের জন্য স্বয়ং উপযাচক হইয়াও যদি এরূপ উপেক্ষাই লাভ করিতে হয়, তবে সম্মিলনে যাওয়ার কি প্রলোভন থাকিতে পারে, তাহা পাঠকবর্গ ই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

সম্মিলনের প্রকৃত উপযোগিতা বর্দ্ধিত করিতে হইলে বর্ত্তমান ফাল্গুনের "ভারতীতে" শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় 'বিজ্ঞান-সম্মিলনে' সম্মিলনের প্রতি অধিবেশনের দিনই সভ্যদিগের সান্ধ্য সমাগমের যে ব্যবস্থার কথা লিখিয়াছেন, আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়াই একান্ত সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

সম্মিলনেয় দ্বিতীয় কথা, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ও প্রবন্ধ পাঠ। সম্মিলনের প্রবন্ধ সকল মৌলিকত্ব ও উৎকর্ষানুসারে নির্ব্বাচিত না হইয়া সর্ব্বসাধারণ প্রবন্ধ-লেখকের সন্তোষ বিধানের জন্যই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে বলিয়া বোধ হয়। সমস্ত প্রবন্ধ সম্মিলনীতে পঠিত হইতে পারিলেই সম্মিলনীর সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা হয়, ইহাই যেন সম্মিলনীর সভাপতিদিগের অভিমত বলিয়া মনে হয়। তাহাতেই গত সম্মিলনের কোন সভাপতি নাকি এই বলিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন—"আমার বিভাগের সকল প্রবন্ধই পঠিত হইয়াছে।" কিন্তু সকল প্রবন্ধই যে প্রণালীতে সম্মিলনীতে পাশ করা হইয়া থাকে, তাহা কাহারই পক্ষে সন্তোষজনক হয় বলিয়া মনে হয় না। প্রবন্ধগুলিকে কাটিয়া ছাটিয়া 'কিম্ভূত কিমাকার' করিয়া তবেই পঠনার্থ দেওয়া হয়। ইহাতে অনেক সময়ই প্রবন্ধের প্রকৃত প্রাণ তিরোহিত হইয়া প্রবন্ধ প্রেতত্বই প্রাপ্ত হয়। এবম্বিধ বিরূপ, বিকলাঙ্গ, নির্জ্জীব-প্রবন্ধ যখন সম্মিলনের সভায় উপস্থিত করা হয়, তখন যেমন প্রবন্ধ-লেখক ইহাকে দেখিয়া সুখী হইতে পারেন না, সভ্যগণও তেমনই সুখী হইতে পারেন না। পক্ষান্তরে সাহিত্যিকগণ বিশেষ প্রবন্ধ শুনিবার আশা করিয়াই সম্মিলনীতে আগত হইয়া থাকেন, কিন্তু যখন তৎপরিবর্ত্তে অবিশেষ প্রবন্ধ সকলই তাঁহাদিগকে এক ক্রমে অনেকক্ষণ শুনিতে হয়, তখন উহা যে তাঁহাদের উপর নিতান্তই উৎপীড়ন বলিয়া বোধ হইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। এই প্রকারে সকল প্রবন্ধ-লেখকেরই মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক প্রবন্ধ পাঠের যে বিধান করা হয়, তাহাও পরিণামে তুষ্টির পরিবর্ত্তে বিরক্তি উৎপাদনেরই কারণ হইয়া থাকে। ইহাতে "He who pleases everybody pleases nobody"—'যিনি সকলকে তুষ্ট করিতে চান, তিনি কাহাকেও তুষ্ট করিতে পারেন না' এই ইংরেজী প্রবাদেরই সম্পূর্ণ সত্যতার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রকৃত প্রতিবিধান করিতে হইলে যাহাতে মৌলিক ও সারবান্ প্রবন্ধ সকলই মাত্র পাঠার্থ নির্ব্বাচিত হয়, যাহাতে কোনও প্রবন্ধের প্রতি কালাপাহাড়ের ব্যবহার না হইতে পারে এবং কোন প্রবন্ধেরই অঙ্গচ্ছেদ না হইয়া সমগ্র

প্রবন্ধই পঠিত হইতে পারে, তাহারই যথোচিত বিধান হওয়া উচিত। এইরূপ করিলে প্রবন্ধ সংখ্যায় কম হইলেও, যাহা পঠিত হয়, তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে মনঃসংযোগ করিতে পারিয়া শ্রোতৃবর্গ যেমন পরিতৃপ্ত ও উপকৃত হইবেন, প্রবন্ধ-লেখকও তেমনই যাহা পাঠ করেন, তাহা সমস্ত প্রাণ দিয়া পাঠ করিয়া উৎসাহিত ও চরিতার্থ হইবেন।

সম্মিলনের তৃতীয় কথা, শাখা-সভা সকলের অধিবেশন। সম্মিলনের চারিটী শাখা সভার যুগপদধিবেশন হওয়াই নিয়ম। শাখা সভার সভাপতিগণ যেমন স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হন, চারি শাখার সভ্যগণও যদি তদ্রূপ স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিতেন, তবে গোলযোগের তেমন কারণ নাও থাকিতে পারিত। কিন্তু শাখা সভার সভাপতিগণ যেস্থলে স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাসীন রহেন, তৎস্থলে সভ্যগণ মধুসন্ধানকারী মক্ষিকাদিগের ন্যায় কেবলই এ শাখা ও শাখা ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। কোন শাখায়ই তাঁহাদের মন বসিতে পারে না, এক শাখায় কিঞ্চিৎ রসাস্বাদন করিয়াই তাঁহারা অন্য শাখার রসাস্বাদনের জন্য ধাবিত হন। মধুমক্ষিকার পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণে মধুর গুঞ্জনগীতিরই সৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু সম্মিলনের সভ্যদিগের শাখা হইতে শাখান্তরে গমনে কেবল বিরক্তিকর পদধ্বনিই উত্থিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির কেবল যে এক বিষয়েই অভিরুচি ঘটিবে, প্রকৃতির এমন কোন নিয়ম নাই। সুতরাং সভ্যগণ যদি সকল বিষয়েরই আস্বাদন পাইতে লোলুপ হন, তবে তাঁহাদিগকে কখনও দোষ দেওয়া যায় না। এইরূপে একাধিক বিষয়ের অভিরুচি বশতঃ একাধিক শাখার আলোচ্য বিষয় জ্ঞাত হইবার স্বাভাবিক ঔৎসুক্য দ্বারা প্রণোদিত হওতঃ সাহিত্যিকগণ যখন এক একশাখাধিবেশন হইতে অন্য শাখাধিবেশনে ছুটাছুটি করিতে থাকেন, তখন কোন শাখার আলোচ্য বিষয়েই মনের একাগ্রতা স্থাপন করিতে সমর্থ না হওয়াতে, তাঁহাদের শরীর ও মন অনর্থকই পরিক্লান্ত হইয়া পড়ে, কোন শাখার আলোচ্য বিষয়ই তাঁহাদের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রবন্ধ-পাঠক যখন দেখিতে পান যে, উপযুক্ত রূপ দোলায়মান-চিত্ত সভ্যগণ তদীয় প্রবন্ধ পাঠে মনোনিবেশ করিতেছেন না এবং শ্রোতার সংখ্যা আশানুরূপ নহে বা উপস্থিত শ্রোতার সংখ্যাও ক্রমে হ্রাস হইতেছে, তখন আপনাকে হতাদর মনে করিয়া তাঁহাকে হতোদ্যম হতোৎসাহই হইতে হয়। এই প্রকার প্রবন্ধ-পাঠক ও শ্রোতা কাহারও পক্ষেই সমস্ত শাখার যুগপদধিবেশন সুবিধাজনক নহে। ইহার প্রতিকার-কল্পে আমাদের বক্তব্য এই যে, একই সাধারণ সভারই যথাক্রমে চারি শাখার অধিবেশন ভিন্ন ভিন্ন শাখা সভাপতির নেতৃত্বে হওয়া উচিত। ইহাতে স্ব স্ব অভিরুচি অনুসারে সকল সাহিত্যিকই সকল বিষয়ের আলোচনায় যোগদান করতঃ তাঁহার সম্পূর্ণ ফললাভেই সমর্থ হইতে পারিবেন। এস্থলে সময়ের সঙ্কীর্ণতার আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তদুত্তরে আমরা প্রবন্ধের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিব। কেবল মৌলিক ও উৎকৃষ্ট সারবান্ প্রবন্ধই যদি পাঠার্থ নির্ব্বাচিত হয়, তবে প্রবন্ধের সংখ্যা যে নিতান্তই কমিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাতে কোনও ক্ষতির কারণ

দেখা যায় না, যেহেতু প্রতি শাখায় ২।৩টী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ হইলেই যে যথেষ্ট হইতে পারে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। যে কয়টী প্রবন্ধ পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা, সম্মিলনের নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণের পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইতে পারিলে ভাল হয়, অন্ততঃ সম্মিলন বসিবার পূর্ব্বে তাহা সর্ব্বসাধারণে বিজ্ঞাপিত হওয়া একান্তই সঙ্গত। তাহাতে সম্মিলনের আকর্ষণ বাড়িবে বই কমিবে না।

সম্মিলনের চতুর্থ কথা সভাপতিদিগের অভিভাষণ। অভিভাষণ অতীত ও ভবিষ্যতের প্রসঙ্গে পূর্ণ না হইয়া যাহাতে অধিক রূপে বর্ত্তমানের প্রসঙ্গেই পূর্ণ হয় এবং বর্ত্তমানের প্রসঙ্গও যাহাতে সাধারণ আলোচনা মাত্র না হইয়া বিশেষ আলোচনা হয়, তাহাই সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। বঙ্গসাহিত্যরাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ কিরূপ প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে? আরও কতদূর প্রসার প্রাপ্ত হইতে পারে? তৎসমস্তে কে কে কর্ম্মী আছেন? তাঁহাদের কাহার উদ্যম কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? আর কতদূরই বা কাহার নিকট প্রত্যাশা করা যায়? পূর্ব্ব সম্মিলনের পরে এক বৎসরের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষ কি পরিমাণে ও কি মাত্রায় হইয়াছে? উপস্থিত অভাব ও অপূরণ কি কি আছে? এই সমস্তের নিবারণ কল্পে কিরূপ প্রচেষ্টারই বা প্রয়োজন? ইত্যাদি বাস্তব সাহিত্য-সংস্কার সকলের অবতারণা অভিভাষণে থাকিলে তাহা অধিক ফলোপধায়ক হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই রূপে সাহিত্যনেতাদিগের দ্বারা আপনাদের কার্য্য আলোচিত দেখিয়া সাহিত্যিকগণ যে তাঁহাদের কার্য্যের আরও পারিপাট্য ও পূর্ণতা সাধনে সবিশেষ যত্নপর হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রকারে সম্মিলনের সভাপতিদিগের অভিভাষণ দ্বারা যেমন সাহিত্যিকগণ একদিকে আপনাদের কার্য্যক্ষেত্রে প্রোৎসাহিত ও পরিচালিত হইবেন—তেমনই তৎসঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাসের একটী সুন্দর শৃঙ্খলও বিরচিত হইতে থাকিবে।

সম্মিলনের পঞ্চম কথা, সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ। সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ যে সম্মিলনের একটী অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অঙ্গটী অনেকস্থলেই অপূর্ণ রহিয়াই যায়। অন্য সম্মিলনের তো কথাই নাই, আজ দুইবৎসর হইল কলিকাতায় যে সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, উহার কার্য্যবিবরণ পর্য্যন্ত এযাবৎ প্রকাশিত হইল না। সভার ইতিবৃত্ত কার্য্যবিবরণের দ্বারাই সংরক্ষিত হয়। কার্য্যবিবরণ ব্যতীত সভা হুজুগের ব্যাপার বিশেষেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সম্মিলনকে এইরূপে হুজুগের ব্যাপার বিশেষে পরিণত হইতে দেখা কাহারও ইচ্ছা হইবার কথা নয়। কার্য্যবিবরণ যথানিয়মে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে কি অন্তরায় আছে, আমরা জানি না। ব্যয়বাহুল্য ও প্রবন্ধের সংখ্যাধিক্যই কারণ হইতে পারে বলিয়া অনুমান হয়। সম্মিলনের প্রথম অনুষ্ঠানকালে অন্যান্য ব্যয়ের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে—তৎসঙ্গে সঙ্গে কার্য্যবিবরণী মুদ্রণ ব্যয়েরও ব্যবস্থা করিলেই এতৎ সম্বন্ধে পরে কোন চিন্তার কারণ থাকে না। প্রবন্ধের সংখ্যাধিক্য বশতঃ কার্য্যবিবরণীর বিপুলায়তনহেতু অতিরিক্ত ব্যয়বহনই যদি সম্মিলনের অনুষ্ঠাতাদিগের পক্ষে ভারবোধ করিবার কারণ হয়, তবে আমরা পূর্ব্বে প্রবন্ধ নির্ব্বাচন

সম্বন্ধে যে বক্তব্য করিয়াছি, তদনুসারে কার্য্য হইলেই ব্যয়ভারের যথেষ্টরূপে লাঘব হইতে পারে। এই নির্ব্বাচনের আরও সুফল এই হইবে যে, সুনির্ব্বাচিত মৌলিক ও উৎকৃষ্ট সারগর্ভ প্রবন্ধ সকল কার্য্যবিবরণে সন্নিবিষ্ট হইবে বলিয়া কার্য্যবিবরণের মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে- মূল্য দিয়া কার্য্যবিবরণী ক্রয় করিতেও অনেকেই আগ্রহান্বিত হইবেন। ইহাতে মুদ্রণব্যয় কুলাইয়া তদুপরি লাভ ও যে না হইতে পারে তাহা নহে। বিশেষতঃ ইহাতে কেবল যে একটী উচ্চ সম্মিলন সাহিত্যের উদ্ভব হইবে, তাহা নহে, কিন্তু ইহা বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধিরূপেও পরিগণিত হইবে। এইরূপে কার্য্যবিবরণ দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের গৌরব যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, তেমনই তৎসঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের গৌরবও চির সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

* * *

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা।

(পৌষ সংখ্যার প্রকাশিতের পর)

অন্যত্র,—"পরাবিদ্যা সমিতি এক্ষণ আর আর্য্যসমাজের শাখা নহে। উহার প্রতিষ্ঠাতারা বেদ-বিশ্বাসী নহেন, কারণ তাঁহারা বৌদ্ধ, নাস্তিক। নাস্তিকের দ্বারা বৈদিক ধর্ম্মের কোন কাজ হয় না, কারণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র।" (২)

সুতরাং এই লেখক কেবল ব্লাভাস্কি ও অলকটকে নহে, কিন্তু প্রকারান্তরে পরাবিদ্যা সমিতির সকল সভ্যকেই নাস্তিকরূপে চিহ্নিত করিতে ইচ্ছুক! কিন্তু ইঁহারা নাস্তিক, বেদ-বিশ্বাসী নহেন, এ তথ্য লেখক কোথায় পাইলেন? ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্যের অপলাপকর। পরাবিদ্যা সমিতির উদ্দেশ্য (mission) কি এবং উহা জগতের কি কার্য্য সাধন করিতেছে, তাহা পাঠক জ্ঞাত আছেন। শুধু বেদ নয়, জগতের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র এই সমিতি-দ্বারা পূজিত ও সম্মানিত হইতেছে, জগতের

---

(2) The Theosophical society is no longer a branch of the Arya-samaj nor do its founders believe in Vedas, in as much as they are followers of Budhism, and it is ridiculous to say that they will serve a vedic mission to the world as long as they are atheists, for Budhism is only another name of atheism (Ibid).

আমরা এই লেখককে আর্য্যসমাজের অপর একজন লেখকের (কলিকাতা আর্য্যসমাজের সম্পাদক পণ্ডিত শঙ্করনাথ) নিম্নলিখিত উক্তি উপহার দিতে ইচ্ছা করি :—

"However Budhadeva himself did not preach any thing against the main doctrines of the sublime Vedas. I have read the whole of Dhammapada, but I could not find out a single passage contradicting the doctrines of the Vedas. * * * It is no wonder therefore that the followers of Budhadeva also misinterpreted the noble doctrines of their spiritual guide. We know that the doctrines of the Southern Budhists differ materially from those of the Northern School. For instance, the southern Budhists though they worship the image of Lord Budhu as

সমস্ত ধর্ম্ম ইহার সংস্পর্শে সজীব ও সতেজ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপে যাঁহারা আজীবন জগৎ হইতে নাস্তিকতা দূর করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাঁহাদিগকেই লেখক নাস্তিক অপবাদ দিতে উদ্যত। একথা সত্য যে, উঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে (স্মরণ রাখা উচিত যে, সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ী কোন সমিতি কাহারও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর স্থাপিত নহে) বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। লেখক বলেন, বৌদ্ধ হইলেই নাস্তিক হইতে হইবে। ইহা তর্ক ও মতের কথা মাত্র। আমাদের বিবেচনায়, এমত বিচারসহ নহে। ইঁহারা কিরূপ বৌদ্ধ ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তাহা হইতে কেহই ইঁহাদিগকে নাস্তিক বলিতে সাহসী হইতে পারে না। ইঁহারা নাস্তিক ছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে উঁহাদের নিজের কথাই অধিকতর গ্রাহ্য। অলকট আর্য্যসমাজের সহিত সম্বন্ধের সূচনায় হরিচন্দ্র চিন্তামনের নিকট ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনাদের মত ব্যক্ত করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তদুল্লেখে বলিতেছেন,—

"Mr. Hurry Chand wrote to me on reading my explanations of our views as to the impersonality of God—an Eternal and Omnipresent Principle, which under many different names, was the same in all religions—that the principle of the Arya Samaj was inentical with our own. &c &c." (*O. D. L.*)

অতএব ইঁহারা যদি নাস্তিক হয়েন, তবে বোম্বাই আর্য্যসমাজের সভাপতি হরিচন্দ্রের উক্তি অনুসারে ত ঐ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা-স্বয়ং স্বামী দয়ানন্দও নাস্তিক হইতেছেন। বস্তুতঃ যাঁহারা এক নিত্য শাশ্বত সর্ব্বব্যাপী সত্তায় বিশ্বাস করেন, এবং যাঁহারা ইহাও বলিতেছেন যে, সেই এক পরতত্ত্বই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত, তাঁহারা কি নাস্তিক? তাঁহারা বৌদ্ধই হউন, আর যাহাই হউন, নাস্তিক নহেন। আর ইঁহাদের অনুসৃত বৌদ্ধধর্ম্ম যে উপনিষদুক্ত অধ্যাত্ম দর্শনের উপর স্থাপিত, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। অথচ পূর্ব্বোক্ত লেখক অনায়াসে বলিতেছেন, ব্লাভাস্কি নাস্তিক ছিলেন!

আর্য্যসমাজের আরও অনেক লেখকের ঈদৃশ অসূয়া-সম্ভূত উক্তিতে ঐ সমাজের সাহিত্য কলঙ্কিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, আর্য্যসমাজের অন্তর হইতে এই বিদ্বেষ-কালিমা দূর করিবার জন্য উদারমতি অলকট স্বতঃপরতঃ সতত চেষ্টান্বিত ছিলেন। তিনি শান্তির পতাকা উত্তোলন করিয়া আর্য্য-সমাজকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিতেছেন—

"The world is wide enough for us all, and it is better that we all should try to live together as brethern."

---

their deliverer) do not believe in the existence either of a Personal or Impersonal God, while the Northern Budhists believe in the existence of a God, though not exactly like the followers of the Vedas. In course of time, the real spirit of Budhism gradually died out & the shell only remained &c &c" (Pundit Shanker nath's 'What is Arya Samaj ?')

পণ্ডিত শঙ্করনাথ পরবর্ত্তী প্রশান্ত সময়ের লেখক, সেই বিবাদের সময়ের নহে। তাই তিনি পরাবিদ্যা সমিতির পরিচালকদিগকে নাস্তিক প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে গোটা বৌদ্ধ ধর্ম্মটাকে নাস্তিকতার নামান্তর আখ্যা দিতে অগ্রসর হয়েন নাই।

অর্থাৎ,—"এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আমাদের উভয়ের যথেষ্ট কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে। অতএব পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করিয়া জীবন ধারণ করাই শ্রেয়ঃ।"

যাহা হউক, আমরা ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় আর্য্যসমাজকেও ভগবৎ-প্রেরিত বিধান বলিয়া মনে করি। ইহা হিন্দুসমাজেরই অঙ্গজাত, এবং শিখধর্ম্ম প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুসমাজেরই যুগোপযোগী ভাব বিকার মাত্র। ইহার প্রয়োজন হিন্দুসমাজেরই অংশবিশেষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সাধন, এবং তদ্দ্বারা বাহ্যিক বা বৈদেশিক আক্রমণ ও প্রলোভন হইতে হিন্দুসমাজের সংরক্ষণ। ইহাও সেই পার্থ-সারথির বিরাট বিশাল 'ধর্ম্ম-সংস্থাপন' রূপ চিরন্তন নীতিচক্রের অন্তর্গত। মুসলমান প্রভাব সময়ে শিখধর্ম্ম হিন্দুসমাজের যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছিল, ভিন্ন প্রকারে হইলেও বর্ত্তমান-যুগে উক্ত উভয় সমাজ ভাগবতী রক্ষানীতির যন্ত্রস্বরূপ সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। শ্রীচৈতন্যদেব মায়াবাদীদিগের অদ্বৈতবাদ স্বীকার না করিয়াও, এমন কি, উহাকে নাস্তিক মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াও, ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, যুগ প্রয়োজনের জন্য উহার প্রচার আবশ্যক হইয়াছিল। দারুণ ব্যভিচারে পরিণত বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের নিরসন তাদৃশ অদ্বৈতবাদ প্রচারের একটী সার্থকতা। তাহার নিকট এ মত দোষযুক্ত হইলেও তিনি উহার ব্যাখ্যাতা শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত করিয়াছেন, কেননা তিনি বলিতেছেন, ইহা ভগবৎ বিধান,—

"আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল। অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥" (চৈতন্যচরিতামৃত)

এ দুষ্প্রবেশ্য নীতিচক্র কে ভেদ করিবে? আর্য্যসমাজের কার্য্যমূলে যে বিশিষ্ট কার্য্যকরী শক্তি বর্ত্তমান, যে শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আর্য্যসমাজ বহুতর হিতকর অনুষ্ঠানে রত, সে শক্তি কি? উত্তর, দয়ানন্দ সরস্বতী। দয়ানন্দ সরস্বতীর ত্যাগ, বৈরাগ্য, নির্ভীকতা, অকপটতা, স্বদেশবাৎসল্য, পাণ্ডিত্য প্রকর্ষ প্রভৃতি গুণসমষ্টিই সেই শক্তি। দৃষ্টান্তযোগ্য এই সকল গুণগ্রামে বিভূষিত স্বামী দয়ানন্দ যে একজন আদর্শ জননায়ক, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। মতভেদ থাকিলেও, তিনি আপন পথে, আপন জ্ঞানে হিন্দুর সর্ব্বস্ব সেই বেদের মহিমাই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আঘাতে, তাঁহার প্রতিবাদে হিন্দুসমাজের অন্তরে বেদতত্ত্ব বুঝিবার ইচ্ছা জাগরিত করিয়াছে, তাহার এ কৃতিত্ব সকলেরই স্বীকার্য্য।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করি। আমরা "সত্যার্থ প্রকাশে" দেখিতে পাই:—'(প্রশ্ন) আপনি সকলেরই খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন, পরন্তু আপনার আপনার ধর্ম্মে সকলেই উত্তম। কাহারও খণ্ডন করা উচিত নহে, এবং যদি করেন, তবে আপনি ইহাদের হইতে কি বিশেষ কহিতেছেন? আপনি যে এত বলিতেছেন, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, আপনা হইতে কেহ অধিক অথবা তুল্য ছিল না এবং নাই? আপনার এরূপ অভিমান করা উচিত নহে। কারণ পরমাত্মার সৃষ্টিতে ব্যক্তি বিশেষ অপেক্ষা অনেকে শ্রেষ্ঠ, তুল্য এবং ন্যূন আছেন।

অতএব এরূপ দর্প করা উচিত নহে। (উত্তর) ধর্ম্ম সকলের পক্ষে এক অথবা

অনেক। যদি বল যে অনেক, তাহা হইলে এক অপরের সহিত বিরুদ্ধ হয়, অথবা অবিরুদ্ধ হয়, যদি বল বিরুদ্ধ হয়, তবে এক ব্যতিরেকে অপর ধর্ম্ম হইতে পারে না। এবং যদি বল যে অবিরুদ্ধ হয়, তবে পৃথক পৃথক হওয়া ব্যর্থ। এই জন্য ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এক হইয়া থাকে, অনেক নহে। আমি এইরূপ বিশেষ করিয়া কহিতেছি, যদি কোন রাজা সকল সম্প্রদায়ের উপদেশককে একত্র করেন, তাহা হইলে এক সহস্রের ন্যূন হয় না। পরন্তু ইহাদের মুখ্যভাব দেখিলে পুরাণী (পৌরাণিক), কিরাণী (খ্রীষ্টয়ান), জৈনী এবং কোরাণী (মুসলমান) এই চারই হইয়া থাকে। কারণ সকল সম্প্রদায়ই এই চারি মতের মধ্যে আসিয়া পড়ে। যদি কোন রাজা উহাদের সভা করিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া প্রথম বামমার্গীয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, মহাশয়, আজ পর্য্যন্ত আমি কোন গুরু অথবা ধর্ম্ম বিশেষ গ্রহণ করি নাই। সকল ধর্ম্ম মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম উত্তম, আপনি বলিয়া দিউন এবং আমি তাহাই গ্রহণ করিব। (বামমার্গী) আমাদিগের। (জিজ্ঞাসু) এই নয় শত নব নবতি (৯৯৯) কিরূপ? (বামমার্গী) সকলেই মিথ্যুক এবং নরকগামী—যদি তুমি মুক্তির ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাদের শিষ্য হইয়া পড়। (জিজ্ঞাসু) আচ্ছা, অন্যান্য মহাত্মাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। এই বলিয়া চলিয়া গিয়া শৈবের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এবং সেও তদ্রূপ উত্তর দিল। এইমাত্র বিশেষ কহিল যে শিব, রুদ্রাক্ষ, ভস্মধারণ এবং লিঙ্গার্চ্চন ব্যতিরেকে কখন মুক্তি হইতে পারে না। সে উহাকে ত্যাগ করিয়া নবীন বেদান্তীর নিকট উপস্থিত হইল। (জিজ্ঞাসু) বলুন, মহাশয় আপনার ধর্ম্ম কি? (বেদান্তী) আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই মানিনা। আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আমাতে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কোথায়? এ সমস্ত জগৎ মিথ্যা। যদি জ্ঞানী, শুদ্ধ চেতন হইতে চাহ, তবে আপনাকে ব্রহ্ম মনে কর, এবং জীব ভাব ত্যাগ কর, তাহা হইলে, নিত্যমুক্ত হইয়া যাইবে। (জিজ্ঞাসু) যদি তুমি ব্রহ্ম এবং নিত্যমুক্ত হইয়া থাক, তবে ব্রহ্মের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব তোমাতে কেন নাই? আর শরীরেই বা কেন বদ্ধ রহিয়াছ? *** পরে সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া খ্রীষ্টিয়ানের নিকট জিজ্ঞাসা করিল। সেও বামমার্গীর তুল্য সমস্ত প্রশ্নোত্তর করিল। পরন্তু এই মাত্র বিশেষ বলিল যে সকল মনুষ্যই পাপী, আপনার সামর্থ্য হইতে পাপ খণ্ডন হয় না। ঈশায় বিশ্বাস ব্যতিরেকে পবিত্র হইয়া মুক্তিলাভ হইতে পারে না। * * * জিজ্ঞাসু শুনিয়া মৌলবী সাহেবের নিকট যাইল। তাহার সহিত উক্তরূপ প্রশ্নোত্তর হইল। সে এই মাত্র বিশেষ কহিল যে, পরমেশ্বর দ্বিতীয় নাই। তাহার ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদ এবং পবিত্র কোরাণে বিশ্বাস ব্যতিরেকে কেহ মুক্তি পাইতে পারে না। যে এই ধর্ম্ম বিশ্বাস করে না, সে নারকী এবং নাস্তিক ও বধযোগ্য হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসু ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবের নিকট গমন করিল এবং তদ্রূপই কথোপকথন হইল। সে এই মাত্র বিশেষ বলিল যে, আমার তিলক ও ছাপ দেখিয়া যমরাজ ভীত হয়। জিজ্ঞাসু মনে মনে বুঝিল যে, যখন মশক, মক্ষিকা, পুলিশের সিপাহী, চোর, দস্যু এবং শত্রু ভীত হয় না, তখন যমরাজের গণ কেন ভীত হইবে? পুনরায় অগ্রে চলি। * * * কেহ

বলিল, আমাদের কবীর, কেহ নানক, কেহ দাদু, কেহ বল্লভ, কেহ সহজানন্দ এবং কেহ মাধ্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সকলেই অবতার। এইরূপে সহস্র লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া উহাদের একের সহিত অপরের বিরোধ দেখিয়া বিশেষরূপে নিশ্চয় করিল যে, ইহাদের মধ্যে কেহও গুরু হইবার যোগ্য নহে। * * * মিথ্যুক, দোকানদার. বেশ্যা এবং ভেড়ুয়াগণ—যেমন আপনাদের বস্তুর গৌরব এবং অপরের নিন্দা করে, ইহাদিগকেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।"

আমরা যথোচিত সম্মান সহকারে বলিতেছি যে, স্বামীজির চিত্ত-বিভ্রম হইবার কারণ উপরোদ্ধৃত উক্তিতে স্পষ্টীকৃত। তিনি এই সকল মতকে বেদ-বিরোধী বলিয়াছেন। কিন্তু সনাতন বেদমার্গীগণ তাঁহার মতকেও ত বেদ-বিরোধী বলিয়া থাকে। বেদের সর্ব্বমান্য ব্যাখ্যাতা সায়নাচার্য্যের মতেও উহা বেদ-বিরোধী। অতএব বিরোধ দ্বারা বিরোধের মীমাংসা হইল না। প্রকৃত পক্ষে যে বিরোধ দেখিয়া তিনি বিভ্রান্ত হইয়াছেন, উহা ধর্ম্মের বাহ্যাংশ মাত্র। উপাসনার প্রণালী, অবলম্বন, প্রকার ভেদ, সত্যে পঁহুছিবার উপায় ভেদ মাত্র। দেশকালপাত্রের ভেদই ইহার কারণ,—একথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এ ভেদ চিরকালই থাকিবে। কিন্তু ভেদের অন্তস্তলে এক শাশ্বত তত্ত্ব বর্ত্তমান,—সেই চিরন্তন অভেদ সূত্রেই সমস্ত ধর্ম্মের মূলাংশ গ্রথিত। ইহাই সকলের অনুসন্ধেয়, সকলের লভ্য, সকলের আস্বাদনীয়, আর সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা উচিত। আশ্চর্য্যের বিষয় যিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন, তিনি আর্য্য শাস্ত্রের একটী অবিসম্বাদিত সত্য যে অধিকার তত্ত্ব, তাহা স্থল বিশেষে অনায়াসে বিস্মৃত হইয়া বলিতেছেন,—ধর্ম্ম পৃথক ২ হওয়া ব্যর্থ, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এক হইয়া থাকে, অনেক নহে।" তিনি যদি ধর্ম্ম অর্থে এক পরতত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, এবং উহার বাহ্যাংশে ভেদ স্বীকার করেন, তবে তাঁহার উপরোদ্ধৃত উক্তিগুলি একেবারেই ব্যর্থ। যদি এক বর্ণের ধর্ম্ম অপরের অননুষ্ঠেয় হয়, যদি এক আশ্রমের ধর্ম্ম অপরের অপালনীয় হয়, এবং এই ধর্ম্মভেদ যদি গুণ ও কর্ম্মের যোগ্যতানুসারে শাসিত হয়, তবে দেশ কাল পাত্রানুসারে ধর্ম্মের বিভিন্নতা এবং এই বিভিন্নতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার হেতু কি? বস্তুতঃ বাহ্যাংশেই ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু উহার অন্তরগত উদ্দিষ্ট পদার্থ যে কতকগুলি সার্ব্বজনীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি নিজেই কিন্তু এ তত্ত্বের আভাস প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত জিজ্ঞাসুকে তিনি নানা স্থানে ঘুরাইয়া শেষে তাহার সম্মত এক 'আপ্ত' অর্থাৎ তত্ত্বদর্শীর নিকট আনয়ন করিয়া বলিতেছেন,

"(আপ্ত বিদ্বান) এই সকল মত (অর্থাৎ শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ইত্যাদি) অবিদ্যাজন্য এবং বেদ-বিরোধী। ইহারা মূর্খ, পামর এবং বন্ধ

---

* ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের প্রতি এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে স্বামীজি কুত্রাপি দ্বিধা বোধ করেন নাই। 'সত্যার্থ প্রকাশ' এর অনেক স্থানে সরস্বতী মুখ হইতে ঈদৃশ অস্বচ্ছ সম্ভাষণ নির্গত হইয়াছে।

* "বর্ণাশ্রম গুণ এবং কর্ম্মের যোগ্যতানুসারে মানিয়া থাকি।" সত্যার্থ প্রকাশ।

জালে আবদ্ধ করিয়া স্বপ্রয়োজন সিদ্ধ করে। এই সকল হতভাগ্য লোক মনুষ্যজন্মের ফল-রহিত হইয়া আপনার মনুষ্য জন্মকে ব্যর্থ করে। দেখ, যে সকল বিষয়ে এই সহস্র মনুষ্যদিগকে প্রলোভন করিয়া আপনাদিগের মতের ঐকমত্য আছে, তাহাই বেদগ্রাহ্য এবং যাহাতে উহাদের পরস্পর বিরোধ আছে, তাহাই কল্পিত মিথ্যা, অধর্ম্ম এবং অগ্রাহ্য। (জিজ্ঞাসু) কিরূপে ইহার পরীক্ষা হইবে? (আপ্ত) তুমি যাইয়া এই সকল জিজ্ঞাসা কর, এবং উহাতে উহাদের একমত হইয়া যাইবে। তখন সে যাইয়া উক্ত সহস্র মতাবলম্বীদিগের সভা মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, 'মহাশয়গণ, শ্রবণ করুন, সত্যভাষণে ধর্ম্ম হয়, অথবা মিথ্যা ভাষণে?' সকলে একস্বর হইয়া বলিল যে, সত্যভাষণে ধর্ম্ম এবং মিথ্যা ভাষণে অধর্ম্ম হয়। এইরূপে বিদ্যাপাঠে, ব্রহ্মচর্য্য-করণে, পূর্ণযুবাবস্থায় বিবাহ করণে, সৎসঙ্গে, পুরুষার্থে এবং সত্য ব্যবহারাদি করণে, ধর্ম্ম এবং অবিদ্যা গ্রহণে, ব্রহ্মচর্য্যের অকরণে ব্যভিচার করণে, কুসঙ্গে, অসত্য ব্যবহারে, ছলে কপটে, হিংসায়, এবং পরের হানি করণাদি কার্য্যে অধর্ম্ম হয় কি না? তখন সকলে একমত হইয়া বলিল যে, বিদ্যাদি গ্রহণে ধর্ম্ম এবং অবিদ্যাদি গ্রহণে অধর্ম্ম হয়। তখন জিজ্ঞাসু সকলকে বলিল যে, আপনারা এইরূপে একমত হইয়া সত্য ধর্ম্মের উন্নতি এবং মিথ্যা ধর্ম্ম মার্গের হানি কেন করেন না?' তাহারা সকলে বলিল যে, যদি আমরা এরূপ করি 'তাহা হইলে আমাদিগকে কে জিজ্ঞাসা করিবে। তদ্ব্যতীত আমাদিগের শিষ্যগণ আমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকে না ও আমাদের জীবিকা নষ্ট হইয়া যায়। তাহা হইলে আমরা যে আনন্দ ভোগ করিতেছি, তাহা হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই জন্য আমরা জানিয়াও আপনার আপনার মতের উপদেশ করি এবং আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি। কারণ 'শর্করা দিয়া রুটি খাও, আর কপটজালে সংসার ঠকাও' এই ব্যাপার হইয়াছে। দেখ, সংসারে সত্যপরায়ণ ও সরল লোককে কেহ কিছু দেয় না, এবং জিজ্ঞাসাও করে না, কিন্তু যে বঞ্চনা ও ধূর্ত্ততা করিয়া বেড়ায়, তাহারই পদার্থ লাভ হয়।"ইত্যাদি।

উদ্ধৃত বাক্যে স্বামী দয়ানন্দ যাহা সর্ব্ববাদীসম্মত ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ধর্ম্মের নীতি অংশেই প্রধানতঃ প্রযুজ্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নীতিঅংশে সকল ধর্ম্মেরই একমত, ইহা তিনি স্বীকার করেন। তিনি যদি আর একটু অগ্রসর হইয়া অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, পরমাত্ম তত্ত্ব সম্বন্ধেও সকল ধর্ম্মেই আশ্চর্য্যরূপ ঐকমত্য বর্ত্তমান। নীতি ধর্ম্মের প্রাণ, ব্রহ্মতত্ত্ব ধর্ম্মের আত্মা। এই আত্মগত অন্তরঙ্গ অংশে কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি মিসর, কি গ্রীস,—সকল দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্র ও মতেই এক অপূর্ব্ব একপ্রাণতা বিদ্যমান। *পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ইহার

---

* স্বামী দয়ানন্দের কোন কোন সুশিক্ষিত শিষ্য, যাঁহারা সকল ধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধানের অবসর পাইয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত "Fountain Head of Religions" গ্রন্থ প্রণেতা লিখিয়াছেন:— "Even those points on which they (the different religions) *seem* so widely to differ, will sometimes be found to be

কারণ এই যে, সকল দেশেই ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মাগণের কোন না কোন সময়ে আবির্ভাব হইয়াছে। তবে আর্য্যাবর্ত্তেই উহা প্রথম প্রচারিত ও বিস্তৃত রূপে আচরিত হইয়াছে, এবং অধুনা যদিও অন্যান্য দেশে উহা এক প্রকার বিলুপ্ত, তথাপি এ দেশে অদ্যাপি নানা উপায়ে—সর্ব্ব সম্প্রদায়ে সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইলেও—সংরক্ষিত আছে। কিন্তু স্বামীজি ধর্ম্ম সমূহের বহিরঙ্গ-ঘটিত আচার অনুষ্ঠানের সমালোচনাতেই নিবিষ্ট ছিলেন, উহাদের অন্তর্নিহিত সার্ব্বজনিক, সার্ব্বকালিক তত্ত্ব সমূহের প্রতি দৃষ্টি প্রদান আবশ্যক মনে করেন নাই। বোধ হয় তিনি যেরূপ সংস্কারের বা সমাজ গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন, তৎপক্ষে সেরূপ দৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না, অথবা তৎপক্ষে ধ্বংসকারী প্রতিভাই (Destructive genius) অধিকতর প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষ ও ভস্মস্তূপের উপর তাঁহার নব ব্যাখ্যাত বেদ-ধর্ম্ম স্থাপন করিতে প্রয়াসী ছিলেন। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, তাঁহার অভিনব ব্যাখ্যা অসাধারণ ধীশক্তির অপূর্ব্ব ক্রীড়া।

যাহা হউক, নীতি বিষয়ে সকল ধর্ম্মের একমত, ইহা স্বামীজি স্বীকার করিয়াও বলিতেছেন যে, উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা ধর্ম্মের ঐকমত্য জানিয়াও আপনার আপনার মতের উপদেশ করে। ইহার অভিপ্রায় কি? তাঁহার মতের সীমা-বহির্ভূত সকল সম্প্রদায়কে পামর, পাষণ্ড, কপট, প্রতারক বলিয়া "ঝাঁটাইয়া" গালি দেওয়া কেবল অন্যায় নহে, উহাতে গোলও মিটে না, বরং বাড়িয়া উঠে। গোল মিটাইবার জন্য দেখিতে হইবে, ইহা কি ধর্ম্মের দোষ, না লোকের দোষ? মিথ্যাভাষণ, চৌর্য্য, হিংসা, ব্যভিচার, প্রভৃতি যদি কোন ধর্ম্মেরই অনুমোদনীয় না হয়, অথচ যদি কোন লোক ঐ সকলের সমর্থন করে, তবে ইহার সহিত ঐ লোকের ব্যক্তিগত চরিত্র লইয়া সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তবে আর্য্যসমাজের ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্ম মিথ্যা ও প্রতারণামূলক, ইহা বলা স্বামী দয়ানন্দের পক্ষেও সাহসিকতার কার্য্য। কিন্তু ধর্ম্মের উপর কালবশে যে কালিমা ও আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়াছে, যদি তাহাই তাঁহার লক্ষ্য হয়, তবে অযথা কোন ধর্ম্মের উপর আক্রমণ না করিয়া যাহাতে সেই আবর্জ্জনারাশি বিদূরিত হয়, তাহার চেষ্টাই যুক্তিযুক্ত। এবং সংহারপন্থী না হইয়া সংগঠনপন্থী হইলে ইহাই সংস্কারকের কার্য্য।

প্রত্যেকেই যাহাতে আপন আপন ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে, তাহারই চেষ্টা বাঞ্ছনীয়। এ চেষ্টা ফলবতী হইবে কিসে,—কোন্ প্রণালীতে? বিরোধে নহে, আক্রমণে নহে, গালিবর্ষণে নহে। বিচ্ছেদে নহে, বিদ্বেষে নহে, সাম্প্রদায়িকতায় নহে, সঙ্কীর্ণতায় নহে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যের উদ্বোধনে, উদ্দীপনে, এবং সেই পরমতত্ত্বের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায়।

the same at the bottom, the apparent difference being due to misconception or misrepresentation of the long-forgotten truth ... on which they are ultimately founded."—অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহের বিভিন্নতা আপাত দৃষ্ট মাত্র। অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বধর্ম্মই যে এক সত্যের উপর স্থাপিত, তাহা জানা যায়।

তাহা হইলে প্রত্যেক মানব, যে তত্ত্ব "নিহিতং গুহায়াং" বলিয়া কথিত, সেই ধর্ম্ম-রহস্য অবগত হইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। এই সামঞ্জস্য বিধানের, এই রহস্য উদ্ঘাটনের এক পরম সহায় 'পরাবিদ্যা-সমিতি'। এবং এক মাত্র উপায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ

সমাজ-সমস্যা।

সাধুতা।

আমাদের মধ্যে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে সাধুতার অভাব অনুভব করিয়া অনেকেই দুঃখিত। বিদেশীয় বীরবিজেতা শাসকগণ এবং স্বদেশীয় প্রদেশান্তরের সঙ্গিসহচরেরা সকলেই আমাদের সমাজ শরীরের সেই দুর্ব্বল প্রত্যঙ্গের ক্ষতচিহ্নে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগের উপর করুণ কৃপাদৃষ্টিপাত করেন। আমরাও যে কখনও কখনও আমাদের ললাটলিপি—'ভূতলে বাঙ্গালী অধমজাতি' বিরলে পাঠ করিয়া বিরক্ত না হই, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের আইনআদালত, আমাদের কলকারখানা, আমাদের কৃষি-বাণিজ্য, আমাদের সমাজনীতি, আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম, আমাদের জাতীয়জীবন ও মান ইজ্জত সমস্তই এক সাধুতার অভাবে মাটী হইয়া যাইতেছে। আমরা তাহা দেখিয়া বুকে ব্যথা পাই; কিন্তু চারিদিক চাহিয়া মনে হয় আমরা নিরুপায়। আশৈশব আমাদের ক্রীড়া আবদার হইতে, দাসদাসী, মাসীপিসীর আদরের ক্রোড় হইতে, ভাই-পাড়াপ্রতিবেশী সমবয়স্কদিগের সাহচর্য্য ও প্রণয়কলহ হইতে, গুরু মহাশয়, মাষ্টার মহাশয় ও দপ্তরী চাপরাশীর কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার হইতে, শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক, জজমাজিষ্ট্রেট ও আমলা মুহুরীর কার্য্যকলাপ হইতে, রেল, ষ্টীমার, উকীল, ডাক্তার, দোকানপসার, গুরুপুরোহিতের সংস্পর্শ হইতে, অধ্যাপক-পরীক্ষক-বক্তা-নেতা ও চিন্তাশীল সাহিত্যসেবকদিগের আচরণ হইতে, আমরা প্রত্যক্ষভাবে ও অপ্রত্যক্ষভাবে যে শিক্ষা লাভ করি, তাহাতে আমাদের রক্তমাংসে, অস্থিমজ্জায়, মনবুদ্ধির স্তরে স্তরে অসাধুতার বীজ উপ্ত হইয়া যায়। সেই সকল তৃণবীজ যখন অঙ্কুরিত, সম্বর্দ্ধিত ও এ দেশের অনুকূল জলবায়ুতে পরিপুষ্ট হইতে থাকে, তখন আমাদের জীবন ও সমাজ অরণ্যে পরিণত হয়। পূষা-সবৌর হইতে কৃষিতত্ত্বে পারদর্শী হইয়া এমন কি কোন বৈজ্ঞানিক আসিয়াছেন, যিনি এই নিবিড় অরণ্য ফল ফুলে সুশোভিত উদ্যানে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন?

প্রত্যেক মানবের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে সাধুতার একটা আদর্শ আছে। সময়ের পরিবর্ত্তনে, সভ্যতার বিকাশে, স্বার্থের সংঘর্ষে ও প্রয়োজনের অনুরোধে সেই আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদ আমরা মানি, জগতের সকল জাতিই, মুখে স্বীকার না করিলেও,

কার্য্যতঃ মানে। অতএব সাধুতার মানদণ্ড স্থির, অচল ও নিরপেক্ষ নহে। আমরা সাধুতা বুঝিতে হইলে, কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র হইবে, তাহার বিচার করিব। (১) আমাদের নিজের কাছে, আত্মবিশ্বাসে, উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধে, অন্তর্জগতের আচরণে সাধুতা। (২) পারিবারিক ব্যবহারে সাধুতা। (৩) সামাজিক ব্যবহারে, স্বদেশে সাধারণের সহিত আচরণে সাধুতা। (৪) ব্যবসায় বাণিজ্যে, ক্রয়বিক্রয়ে সাধুতা। (৫) রাজনৈতিক সম্পর্কে, সরকারী কাজকর্ম্মে সাধুতা। (৬) বিদেশীয় সজ্জনের সহিত ব্যবহারে সাধুতা। (৭) সমাজ-শত্রু, দেশবৈরী, দস্যুতস্কর, স্বদেশীয়-বিদেশীয় বঞ্চকপ্রতারকের সহিত ব্যবহারে সাধুতা।

১। চিন্তায় ও বাক্যে এবং বাক্যে ও কার্য্যে মিল রাখাই সাধুতা। যাহা আমি নিজে অনুমোদন করিতে পারি এবং যাহা নিরপেক্ষ অপর দশজনেও অনুমোদন করে, তাহাই সাধুতা। অতএব নিঃস্বার্থ লোকমতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধুতার আদর্শ ও মাপকাঠি হ্রস্বদীর্ঘ হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য মহাদেশে এবং কতক পরিমাণে আমাদের দেশেও পূর্ব্বে ধর্ম্মাচরণে স্বাধীনতা ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাবে নাস্তিক সন্দেহবাদীকে স্বাধীনমত বিসর্জ্জন দিয়া আত্মগোপন করিয়া চলিতে হইত। বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধিসময়ে স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া অনেকে আত্মমত গোপন করিয়া বাহিরে বিরুদ্ধধর্ম্মের ভাণ করিত। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান-যুগে ভয়ে ভয়ে অনেকে প্রাণের নিভৃত প্রদেশে ধর্ম্মবিশ্বাস লুকাইয়া রাখিয়া বহিরাবরণ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছিল। মুসলমানের বলপ্রয়োগে ও কঠোর নির্য্যাতনে, কার্য্যে ও মনে, আচরণে ও বিশ্বাসে যে পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা তখনকার নগরবাসী রাজকর্ম্মচারীদিগকে সাধুতাহীন করিয়া ফেলিয়াছিল। তৎপর পর্ত্তুগীজ ও খ্রীষ্টান পাদ্রীদিগের বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত হইলে, দুর্ভিক্ষ ও প্রাণের মায়ায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইলে, স্বার্থসিদ্ধির আশার ছলনে প্রাণের বিশ্বাস প্রতারণার আবরণে সঙ্কুচিত করিতে হইলে, চরিত্রের সাধুতার মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছিল। ইউরোপে রোমক ও গ্রীক গীর্জ্জার খ্রীষ্টানদিগের কথা বলিব না, রোম্যান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্টদিগের পরস্পর বিরোধের উৎপীড়নের কথা বলিব না, ডিসেণ্টার ও ইংলিশ চার্চের মতাবলম্বীদিগের বিবাদের কথা উল্লেখ করিব না, ক্যালভিনিষ্ট ও লুথারানদিগের মতপার্থক্যেরও অবতারণা করিব না, যেহেতু তাহা অপ্রাসঙ্গিক। আমাদের দেশে কেমন করিয়া যুগে যুগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মতে ও কার্য্যে অমিল করিয়া, ব্যবহারে বিশ্বাস বিসর্জ্জন দিয়া, সাধুতা হারাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত উপরে উল্লেখ করা হইল। শুক্রশোণিতের প্রবাহ সেই অসাধুতার বীজ উত্তরাধিকারসূত্রে মজ্জাগত হইয়া আমাদিগের প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়াছে। তাই আমরা ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া খেলা করি, প্রাণের পরমপ্রিয় পদার্থ বলিয়া তাহার জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি না। উপনিষদের জ্ঞানপ্রচার হইতে কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রচার পর্য্যন্ত বহু সাধুজীবনের পরিক্ষিত সত্য আমরা হৃদয়স্থ ও জীবনস্থ করিতে অসমর্থ

হইলেও, কণ্ঠস্থ ও মুখস্থ করিয়া কেবল 'ফ্যাসানের' জন্য কৃত্রিমতা ও অসাধুতা শিক্ষা করিয়াছি। সুতরাং আমরাও দার্শনিক তত্ত্বের তর্কজালে জড়ীভূত হইয়া জীবনবৃত্তে সাধুতা কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছি। অতএব "For the ashes of our fathers and the temples of our Gods" প্রয়োজন হইলে আমরা সর্ব্বস্বপণ করিয়া যুঝিতে পারি না, কিন্তু সর্ব্বস্বের জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ধর্ম্মমত অনায়াসে উৎসর্গ করিতে পারি। ধর্ম্মবিশ্বাসে ও মতের স্বাধীনতায় সাধুতা হারাইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের পৃষ্ঠবংশ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আত্ম-কলহে পুনঃ পুনঃ পরপদানত হইয়া আমরা উক্তির স্বাধীনতা ও মতের দৃঢ়তা নৈসর্গিক কারণে পুরুষানুক্রমে হারাইতে বাধ্য হইয়াছি, সে জন্য অপরাধ কেবল বিংশশতাব্দীর যুবক, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদিগেরই নহে।

২। দুর্ব্বলতাই অসাধুতার কারণ, সবলের পক্ষে সাধুতা রক্ষা করা কঠিন নহে। ধর্ম্ম জীবনে যাহা সাক্ষ্য প্রদান করে, পারিবারিক জীবনেও তাহাই পদে পদে পরিস্ফুট। দাম্পত্যপ্রণয়ে ঐ স্বামী স্ত্রীর প্রতি সদাই সন্দিহান, স্ত্রী স্বামীর নিকট একনিষ্ঠা আশা করিলে, তাঁহার সহচরীরা তাঁহাকে অন্ধ,কুসংস্কারাচ্ছন্ন অথবা ঊনপঞ্চাশের অধিকারভুক্ত মনে করিবেন। মাতা ও দুহিতা, পিতা ও পুত্র, ভ্রাতা ও ভগ্নী, সহোদর ও সহোদরা আমাদের পরিবারে কেবল 'চতুরে চতুরে' কে কাহাকে ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারেন, সেই বিষয়ে শক্তি পরীক্ষা করেন। তাহার পরিণামে শান্তি তিরোহিত, গৌরবসূর্য্য অস্তমিত, যুক্তপরিবার ছিন্নভিন্ন এবং জাতীয় প্রকৃতি যৌথকারবারের ও সমবেত শক্তি সাধনার প্রতিকূল হইয়া পড়িয়াছে। সন্দেহ ও অবিশ্বাস লইয়া আমাদের শৈশবলীলা আরম্ভ, শঠতা, প্রতারণা ও চতুরতা লইয়া আমাদের জীবনের শিক্ষার উদ্‌যাপন এবং কৃত্রিম ব্যবহারে, সাধুতার অভিনয়ে, মনেরভাব প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টায় এবং সন্দেহ ও অবিশ্বাসে আমাদের পারিবারিক সুখশান্তির অবসান। পারিবারিক ক্ষুদ্র রাজনৈতিক চক্রে সাধুতার স্থান এ রোগ-জীর্ণ দুর্ব্বল বঙ্গদেশে নাই! যে দেশে সন্তান ও জননীর, পতি ও পত্নীর নিঃশঙ্কোচ ব্যবহারের মধ্যেও সাধুতা ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইতে পারে না, সে দেশের নরনারীর নিকট জগতে কে কিরূপে সরল, পবিত্র, সাধু ব্যবহারের আশা করিতে পারে?

৩। রঘুনন্দনের স্মৃতি, ব্রাহ্মণের বিধি, পঞ্চাইতের শাসন ও রাজদণ্ড আমাদিগকে সামাজিক জীবনে কৃত্রিমতা ও তঞ্চকতা শিক্ষা দিয়াছে। কন্যার বিবাহ যথাসময়ে দিতে না পারিলে সমাজে নিন্দিত হইতে হইবে। কন্যা অবিবাহিতা থাকিলেও সমাজে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে। অতএব ধর্ম্ম, মান, সাধুতা, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ, মূক, সকলপ্রকার অঙ্গহীন, বিবাহের অযোগ্যা কন্যার জন্যই ছলে-বলে-কৌশলে স্বজাতীয় পাত্র সংগ্রহ করিতে আমরা বাধ্য। পিণ্ডের আশায় মূর্খ, অক্ষম, রুগ্ন পুত্রের বিবাহে নানাপ্রকার চতুরতা ও প্রতারণা অবলম্বন করিয়া, বংশে অসাধুতার বীজ বপন করিয়া, দেশের মুখ উজ্জ্বল করি। বংশ-

মর্য্যাদা ও সৌজন্য আমাদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভনের ও দুর্ব্বলতার ভিতরে নিমগ্ন করিতেছে। সমাজে আমার যে পদমর্য্যাদা ন্যায্য-প্রাপ্য, তাহা অপেক্ষা উন্নততর স্থান সমাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াও লাভ করিতে আমরা লালায়িত। ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়, প্রবৃত্তির প্রেরণায়, মানসিক দুর্ব্বলতায় আমরা ক্ষণিকের তরে সমাজ-শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া উন্মার্গগামী হইয়া পড়ি। তাহার সংশোধন, প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ করিতে হইলে অনেক সময় সমাজবিধির সহিত 'লুকোচুরী' খেলিতে হয়। বিবাহবন্ধন ছেদন করিবার উপায় নাই, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য শাস্ত্রবিহিত; অতএব প্রকৃতির ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমরা সাধুতা পুঁথিগত করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। জাতিভেদের সঙ্কটে অনাচরণীয় জাতির জলচল করিতে সমাজ বাঁধা দিলেও, আজকাল সাধুতার ধ্বজা উড্ডীন করিয়া আমরা সমস্তই সমাজের উদরে পরিপাক করিতেছি। সমাজের জাতভাই, জ্ঞাতিবন্ধুগণ ও গুরু পুরোহিত হিতৈষিগণ পিতৃশ্রাদ্ধে, মাতৃশ্রাদ্ধে, প্রায়শ্চিত্তে, দশকর্ম্মে, গয়ার পিণ্ডে, ত্রিবেণীর তীর্থে, মণিকর্ণিকাস্নানে ও পুরুষোত্তমদর্শনে রুধির শোষণ করিয়া কঙ্কাল ও চর্ম্মের আচরণ মাত্র অবশিষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব জীবন রক্ষার জন্য নানাপ্রকার সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া হিতকারীদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ না করিলে চলে না। নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিয়া, সমুদ্রপারে গমন করিয়া অপকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া, শাস্ত্রের শাসন উপেক্ষা করিয়া স্বীকার করিলেই অপরাধ, 'সাধুতা রক্ষা করিয়া' সত্যের অপলাপ করিলে কেহই উচ্চবাচ্য করিবে না। সুতরাং সংযমের অভাব, উৎপীড়নের ভয়, নির্য্যাতনের ভয়, ঝঞ্ঝাট এড়াইবার ইচ্ছা প্রভৃতি চরিত্রগত দুর্ব্বলতা আমাদিগকে সাধুতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। কোন্ মান্ধাতার আমলে সত্যযুগে হিন্দু রাজার অধীনে বা মুসলমান শাসনের প্রাক্কালে যে সমাজবিধি প্রণীত হইয়াছিল, এখনও ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিরে শিখা বন্ধন করিয়া, মৃদুহাস্য করিয়া, স্বয়ং অমান্য করিলেও অপরের জন্য তাহার কঠোর ব্যবস্থা করিয়া, হিন্দু ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। অতএব সমাজে সাধুতার আশা করা দুরাশা মাত্র। সামাজিক দলাদলির শিক্ষাও আমাদের চরিত্রগত সাধুতার উপর কম প্রভাব বিস্তার করে না। ছলেবলেকৌশলে প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করিবার জিদে সাধুতার সমাধি প্রায়ই হইতে দেখা যায়।

পরিবারে ও সমাজে চরিত্র গঠিত হয়। যেখানে সাধুতার শিক্ষা আমাদের মজ্জাগত হইয়া যায়, পুরুষানুক্রমে তাহার ফল ভোগ করিতে বাধ্য। আমাদের দেশের লোকে আমাদিগের নিকট কি আশা করে? পৈতৃক বাস্তভিটার অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে, গ্রামে জলাশয় প্রতিষ্ঠা হইবে, জনকজননীর আদ্যকৃত্যে ষোড়শ-বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান হইবে, পুত্র কন্যার বিবাহে হস্তী, অশ্ব, বাজি, বোম, নৃত্যগীত হইবে, বারমাসে তের পার্ব্বণে অতিথিশালায় লোকে লোকারণ্য হইবে, যাত্রা থিয়েটারের ঘটা দেখিয়া চারিদিকে

ধন্য ধন্য রব উঠিবে, তবেই আমাদের দ্বারা আমাদের পিতৃপুরুষের ও বংশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠান ও উৎসবের মূলে অর্থ। ছলে বলে কৌশলে প্রতারণা জাল জুয়াচুরী করিয়া, চরিত্র ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, স্বদেশের ও স্বজাতির স্বার্থ নিলামে বিক্রয় করিয়াও যদি আমরা অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া স্বদেশে পূজিত হইতে পারি, তবেই আমরা বুদ্ধিমান্, পুরুষশ্রেষ্ঠ, মানুষের মত মানুষ। আর যদি শিক্ষার দোষে, আদর্শ রক্ষা করিতে যাইয়া, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবন পণ করিয়া, চিরকাল দারিদ্র্য, ক্লেশ, উপেক্ষা, অনাদর বরণ করিয়া গৃহে তুলিতে যাই, আমার সমাজের চক্ষে আমার জীবন বিফল। এইরূপ লোকমত লইয়া যে সমাজের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে, সে দেশে ও সে সমাজে সাধুতার আশা করিতে হইলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণ করিতে হইবে। ফলেও তাহাই হইয়াছে। আমরা এখন পরদার, পরস্বার্থ, পরের মান ইজ্জত কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া, নিজের কাম-ক্রোধ-মোহ চরিতার্থ করি। কেহ বিশ্বাস করিয়া ধন-জন-জীবন-যৌবন আমাদের হাতে সমর্পণ করিলে, তাহা নিরাপদ হইতে পারে না। 'বেইমানী' এখন আমাদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে

৪। আমাদের দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য 'সাধু'র হাতে পূর্ব্বে ছিল, এখনও অনেক পরিমাণে আছে। এই সাধুদিগের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম যদি আমাদের দেশের সাধুতা হয়, তাহা হইলে অধিক কিছু বলা আবশ্যক হইবে না। এই সাধু, সাহু ও সাহুকার শব্দ কিরূপে অর্থ প্রকাশ করে, তাহা অনেকেই জানেন। এ দেশের গোয়ালার বিশ্বাস, দুধে জল না মিশাইলে গরুর দুধ শুকাইয়া যায়। এ দেশের সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকার সাহুকার বলিয়াই পতিত। এ দেশের ব্যবসায়ী বৈশ্য সাধু 'সাহু' নামে অচল হইয়া সমাজের উজ্জ্বলকলঙ্ক চিহ্ন। এ দেশে কৃষিজীবীকে বাণিজ্যজীবী বলিলে সে আরক্ত নয়নে বিরক্তি প্রকাশ করে। এদেশের দোকানী ব্যবসায়ী হরিনামের মালা গলায় ঝুলাইয়া, কাণে তুলসীদল গুঁজিয়া, ললাটে হরিনামের ছাপ মারিয়া এক সের ওজন করিতে করিতে ৸৵০ চোদ্দছটাক ক্রেতার হাতে দিয়া হাস্যমুখে বিবেকধর্ম্মের আশীর্ব্বাদ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে। এ দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যে সাধুতার কথা উপহাস। যে দোকান পাট খুলিয়াও পরের মাথায় হাত বুলাইতে পারে না, সে হাসি রহস্যের পাত্র, গল্পের উপমা। আমাদের মিল্ গেল, যৌথ কারবার গেল, ব্যবসায় বাণিজ্য হাতছাড়া হইল, জমীদারের জমীদারী কার্য্য যায় যায় কেবল সাধুতার অভাবে। মালিকের টাকা যেন অত্যাচারীদের লুটের মহাল। কলিকাতার বাজারে খাদ্যসামগ্রীতে, ঘৃত দুগ্ধে, নূতন গুড়ে, আটা চিনিতে, তিল-সর্ষপ-ফুলেল তৈলে আমাদের সাধুতার লীলাখেলা দিবানিশি আমাদের নয়নে প্রতিভাত হইতেছে। বিলাতী ভেজালের অভিনব প্রণালীতে আমাদের সাধুতার বাজারে সোণায় সোহাগা ফলিয়াছে—লটারী ঘোড়দৌড় নকল সোণার লাট বিক্রীতে সাধুতার বাজার বেজায় গরম হইয়াছে। সে সুখের কথা যত কম আলোচনা করা যায়, ততই মঙ্গল

৫। চরিত্রের এই দুর্ব্বলতার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে, আমাদিগকে অনেকদূর যাইতে হইবে। যে দিন ভারতের শাসনশক্তি বিদেশীয় তুর্কি-আফগান বিধর্ম্মী বিজেতার করতলগত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে ভারতবাসীর জীবনে শৃগালনীতি একমাত্র উপায় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল*। যখন প্রজার ন্যায়অন্যায়ের ভাগ্যবিধাতা আইন-কানুনহীন জবরদস্ত শাসনকর্ত্তা ও পারিষদগণের মরজিমাত্র হইয়াছিল, তখন হইতে হিন্দুপ্রজা আত্মরক্ষা ও স্বার্থসাধনের সুবর্ণপন্থা খুজিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রকৃতি প্রয়োজন বুঝিয়া বলবীর্য্য ও প্রকাশ্য প্রতিবাদের স্থানে কূটনীতি, তোষামোদ ও মিথ্যাচরণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। প্রজার উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, শক্তিসামর্থ্যসঞ্চয় ও জাতীয় সাধনা যখন রাজার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের অনুকূল হইতে পারে নাই, তখনই প্রজা বাক্যে, ব্যবহারে ও চিন্তায় অসরল ও অসাধু হইতে শিখিয়াছিল। রাজার ধর্ম্ম ও বিধিব্যবস্থা যখন প্রজার ধর্ম্ম, প্রকৃতি ও আচার ব্যবহারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে নাই, তখনই প্রজার চিত্ত মলিন ও স্বার্থপর হইয়া কুটিল বঞ্চনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বহুকালের পরাধীন জাতি দাসত্বের কলঙ্কের ডালি মস্তকে বহন করিয়া দাসচরিত্রের ও দাসপ্রকৃতির নীচতা বীরের উদারতার পার্শ্বে হীনতর, কদর্য্যতর ও মলিনতর করিয়া লোকচক্ষুর গোচর করিয়া দিয়াছিল। মেকলের উক্তি মিথ্যা নহে, কিন্তু সে অপরাধ হিন্দুর নহে—তাহার ললাটের বহুযুগের বিহিত অধীনতার। ইংরাজরাজত্বে হিন্দু স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া, স্বাধীন চিন্তার, স্বাধীন গতিবিধির, স্বাধীন কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, রাজসেবায় ও সাধারণ কাজকর্ম্মে চরিত্রের দৃঢ়তা ও ব্যবহারের সাধুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ক্ষমতার কাঙ্গাল, হিন্দু-পরাধীন-প্রভু এখনও একটু সামান্য ক্ষমতা হাতে পাইলেই, পাখীর পালকের ন্যায় হাল্‌কা হইয়া গল্পোল্লিখিত ভেকের ন্যায় হস্তীর বিরাট বপুর অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া অকালে ধ্বংসের কবলগত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠশালার কুটীর পর্য্যন্ত, আদালতের প্রাঙ্গণ হইতে কৃষকের উঠান পর্য্যন্ত, এখনও অসাধুতার বীজ বাতাসে উড্ডীয়মান জীবাণু-কীটাণু ধূলিপরমাণুর ন্যায় নিরন্তর 'কিলবিল' করিতেছে। এখনও সাধারণ লোকের বিশ্বাস হয় নাই যে সরকারী ক্ষতি দেশের ক্ষতি, সরকারী কার্য্যে বঞ্চকতা দেশকে বঞ্চনা করা মাত্র; সরকারের সেবায় সাধুতাহীন হইলে দেশের জাতীয় জীবনে পরোক্ষভাবে কুঠারাঘাত করা হয়।

৬। যে সকল জাতির প্রাণে স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতিস্নেহ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহারা স্বদেশের ও স্বজাতির মুখ চাহিয়া আত্মগৌরব ও আত্মমর্য্যাদা স্মরণ করিয়া, বিদেশীয়ের মনে স্বদেশীয়ের গৌরব অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য অভ্যাগতের প্রতি আতিথ্য ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিতে সদাই উদ্যত থাকে। ক্ষতিস্বীকার করিয়াও, নানাপ্রকারে বিদেশীয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ও তাহাদের সহিত ব্যবহারে সাধুতা

---

* যাযাবর জিপ্‌সী-বেদিয়া জাতির অসাধুতা এখন বংশগত হইয়া দাঁড়াইলেও, উহার উৎপত্তির কারণ বোধ হয় তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট স্বদেশের অভাব।

রক্ষা করিতে তাহারা উৎসুক হয়। Max O'rell অষ্ট্রেলিয়াতে যে স্বদেশপ্রীতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, বিদেশীয় ভ্রমণকারীদিগের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শন করিতে জাপানবাসী নরনারীরা যে স্বদেশপ্রীতি দ্বারা প্রণোদিত হয় ফরাসী ও জর্ম্মণদেশের ভদ্রমহিলারা যে জন্মভূমির প্রেমবশতঃ পরদেশবাসী আগন্তুকদিগের সহিত সদ্ব্যবহারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, সে স্বদেশপ্রেম এদেশে সম্ভব নহে। আমাদের দেশের গৌরব নাই, জাতির অভিমান নাই, আত্মবোধ নাই; আমরা কেবল আপনার সুখ ও সেই সুখের মূল্য অর্থ লইয়াই ব্যস্ত। বিদেশীয় অতিথি আমাদের স্বার্থসাধনার উপায় হইলে, তাহাকে নিঙড়াইয়া তাহার সর্ব্বস্ব ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করিতে আমরা চেষ্টা করি, নিঃস্বার্থভাবে অতিথিকে সম্মান, শ্রদ্ধা ও সদ্ব্যবহারের উপঢৌকন প্রদান করিতে আমরা কাতর ও পরাঙ্মুখ। ভারতে আসিয়া যেরূপ ভাবে মেগাস্থিনিস, ফাহিয়ান ও হুয়েনসাঙ্গের হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল; কোন বিদেশীয় আমাদের দেশ হইতে আজকাল সেইরূপ উজ্জ্বল, মধুর, স্নিগ্ধ উচ্চ সম্মানের ভাব লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন না। তখনকার তাঁহারা আর এখনকার আমরা—কত প্রভেদ, কত পরিবর্ত্তন!

৭। সংসারত্যাগী মুক্ত যোগী মহাত্মাদিগের বসুধৈব কুটুম্বকম্। তাঁহাদের নিকট শত্রুমিত্রে কোনই পার্থক্য বোধ নাই। বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ সভ্যজাতিসমূহ পরস্পর পরস্পরের সহিত ব্যবহারে সাধুতামূলক নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য। বন্ধুতার বিরোধ উপস্থিত হইলেও তাহারা কতকগুলি সাধুতামূলক সমরনীতি ও কলহনীতি মানিয়া চলিতে প্রস্তুত হয় কিন্তু অসভ্যের সহিত ব্যবহারে, বিধর্ম্মীর সহিত আচরণে, সভ্যও সভ্যনীতি সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিতে বাধ্য হন না। আফ্রিকার কাফ্রি-নিগ্রো, কৃষ্ণকায়দিগের সহিত ব্যবহারে পূর্ব্বে কোন কোন শ্বেতকায় দাসব্যবসায়ী সভ্যজাতিরা সাধুতাধর্ম্মে অনায়াসে জলাঞ্জলি দিয়া শান্তিলাভ করিতেন। অতি প্রাচীনকালে ইউরোপীয় নাবিক প্রশান্তদ্বীপের অসভ্য অধিবাসীদিগের সহিত বাণিজ্যের আদান প্রদানে সাধুতা রক্ষা করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। পর্তুগীজ বণিকগণ ভারতীয় রাজা ও অধিবাসীদিগের সহিত সাধুব্যবহার করিতে কখনও লালায়িত ছিলেন না। মহম্মদঘোরী রাজপুতগণের সহিত সমরে ও সন্ধিতে সাধুতা রক্ষা করেন নাই। আলিবর্দ্দী ও বিজাপুরের অধিপতি মহারাষ্ট্রীদিগের সহিত ব্যবহারে প্রথম অসাধুতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। পুলীস্ সর্ব্বত্র সাধুব্যবহার অবলম্বন করিলে দস্যু-তস্কর ধরিতে পারে না। জর্ম্মণ গুপ্তচরেরা শত্রুরাজ্যে অসাধুনীতি দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে। দার্শনিক মার্টিনো সাহেবের মতে শঠের সহিত শঠ ব্যবহার করিলে দোষ নাই। আমাদের শাস্ত্রকারও বলিয়া গিয়াছেন 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের সহিত ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণের ও ধূর্ত্তরাজ শৃগালের আচরণ তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। খলের সহিত খলতা, শঠের সহিত শঠতা, প্রতারকের সহিত প্রতারণা ও বঞ্চকের সহিত প্রবঞ্চনা রাজনীতি ও সুবিধাজনক নীতি হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মনীতি কখনই নহে। তেজস্বীর পক্ষে যে পরিমাণে অসাধুতা

পরিপাক করা সম্ভব, দুর্ব্বলের পক্ষে তাহা মারাত্মক। জার্ম্মাণদার্শনিক নীচের মতে প্রভুনীতি ও দাসনীতি সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। এইরূপে ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীশূদ্র ভিন্ন ভিন্ন নীতিমার্গ অনুসরণ করিতে শাস্ত্রকারকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। বিপ্লবকালে প্রবলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত যেরূপ সাধুতার মানদণ্ড প্রচলিত করা হয়, স্থির, শান্ত. কৃষিবাণিজ্যে নিযুক্ত সভ্য জাতির পক্ষে তাহা গ্রাহ্য নহে। আমরা শান্তিপ্রিয় কৃষিপ্রধান জাতি, আমাদের ব্যবহারে সমৃদ্ধ মহানগরীর সুখভোগের ভিতরে যে অসাধুতার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত, তাহা কে বলিতে পারে? অসদুপায়ে পরিশ্রমসাধ্য আরাম, সুখ ও বিলাসভোগ আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অসাধুতার পথে লইয়া যায়।

আমাদের বিশ্বাস সকলপ্রকার চরিত্রগত দুর্ব্বলতাই অসাধুতার কারণ, সে দুর্ব্বলতা ভীতি রোগশোক অস্বাস্থ্যমূলকই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক না কেন, শক্তিসামর্থ্য, ক্ষমতা ও দৃঢ়তা জীবনে সাধুতা রক্ষার একমাত্র সর্ত্ত। আমরা যে পরিমাণে শক্তিসামর্থ্য হইতে দূরে দৌর্ব্বল্যের কবলগত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া থাকিব, সেই পরিমাণে অন্তরে সকল প্রকার অসাধুতার বীজ যত্নে পোষণ করিতে বাধ্য হইব। নৈতিক শক্তি সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে, তেজঃ ও পুণ্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে সাধুতার উদয় হইবে। আমরা যতদিন শিক্ষার অভাবে মলিন, কুবাসনার তাড়নায় ম্রিয়মাণ, উচ্চতর আদর্শের অভাবে লক্ষ্যহীন এবং ক্ষুদ্রতার গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণচেতা ও হীনস্বার্থে নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত থাকিব, ততদিন সাধুতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা আমাদের জাতীয় জীবনে সুদূরপরাহত থাকিবে। জীবনে সাধুতার উদ্বোধন ব্যতিরেকে আমাদের সামাজিক উন্নতি, জাতীয় জীবনের সম্যক্ বিকাশ ও নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার কবিকল্পনা মাত্র।

শ্রীরসিকলাল রায়।

পৃথ্বীরাজ।

তরায়ণের যুদ্ধ। *

না ফুটিতে উষালোক
কড়্ কড়্ কড়্ রব
পূর্ণ করিয়াছে তরায়ণ।
দম্ দম্ দম্ দম্
বাজিছে দামামা ঘন
ধাইতেছে পদাতিকগণ।
ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্
গল-ঘণ্টা দোলাইয়া
যুথে যুথে ধায় গজরব;
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ গঙা গঙা
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ গঙা গঙা
রণ শিঙা তুলে তীব্র স্বর।

---

* সাধারণের নিকট এই যুদ্ধ থানেশ্বরের বা তিরোরীয় যুদ্ধ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু প্রাচীন লেখকগণ যুদ্ধক্ষেত্রকে তরায়ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

টক্ টক্ খটাখট্
তুরগের খুর-ধ্বনি
অবিরাম পশিছে শ্রবণে,
রণ শঙ্খ, তুরী, ভেরী,
বধির করিয়া কর্ণ,
ঘন বাজে, গভীর নিঃস্বনে।
পত্ পত্ পত্ পত্
প্রভাত সমীর ভরে
উড়িছে পতাকা অগণন ;
বালেন্দু তুর্কের ধ্বজে
রহিয়াছে বিরাজিত,
হিন্দুধ্বজে শোভে সুদর্শন।
মধ্যস্থলে পদাতিক,
অবস্থিত দুই পার্শ্বে
তুরঙ্গ, মাতঙ্গ মহাবল ;
সাজাইয়া এইরূপে
প্রান্তরের পূর্ব্বভাগে
দাঁড়ায়েছে হিন্দু সেনাদল।
পশ্চিমে তুরুক্ সেনা,
অশ্বারোহী মধ্যস্থলে,
দুই দিকে দাঁড়ায়ে পদাতি ;
ভাবিছে উভয় দল
এইরূপ সন্নিবেশে
ছিন্ন, চূর্ণ হইবে অরাতি।
সমর্ষি, গোবিন্দ দোঁহে
গজপৃষ্ঠে দুই দিকে,
নায়ক, সেনানী যত আর ;
আদেশ অপেক্ষা করি
উপবিষ্ট অশ্ব 'পরে,
স্থির শিলামূর্ত্তির আকার।
দেখিতে দেখিতে অই
তরুণ-অরুণ-ভাতি
দেখা দিল পূরব আকাশে ;
পথ, ঘাট, জল, স্থল,
তরু লতা, গুল্ম, বন
উজলিল সুবিমল ভাসে।
মহাগজে আরোহিয়া
আসি পৃথ্বীরাজ বীর
দাঁড়ালেন রণক্ষেত্র মাঝ ;
কি সৌন্দর্য্য, কিবা বীর্য্য,
কি সাহস, কি দৃঢ়তা
বক্ত্রে, নেত্রে করিছে বিরাজ
শাল-সমুন্নত দেহ,
পরিঘ-সদৃশ বাহু,
মাংসল, বিশাল বক্ষঃস্থল ;
উৎসাহে প্রদীপ্ত মুখ,
ললাট ভ্রুকুটী-ভীম,
নেত্র হ'তে নিঃসরে অনল।
রাজ-ছত্র শোভে শিরে,
পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ তূণ,
সুদৃঢ় কার্ম্মুক ধৃত করে ;
সগর্ব্বে দুলিছে গজ,
পৃষ্ঠে বহি মহারাজে,
উল্লসিত জয় জয় স্বরে।
নিরখিয়া পৃথ্বীরাজে,
কোষমুক্ত করি অসি
দাঁড়াইল অশ্বারোহিগণ ;
বাড়াইয়া বাম পদ,
দাঁড়াইল পদাতিক
কার্ম্মুক করিয়া আকর্ষণ।
নায়ক, সেনানী যত
নৃপতির মুখপানে
[illegible], রহে সবে স্থির ;
সহস্র সহস্র বক্ষে
স্পন্দন উঠিল বেগে,
শিরা মাঝে ছুটিল রুধির।
বাজিল নৃপের তুরী ;
ধনুর্ম্মুক্ত বাণ সম
অমনি ছুটিল সেনাদল ;

মিলিল তুর্কের সনে
পরস্পর প্রতিঘাতে
উঠিল তুমুল কোলাহল।
বিজলীর ঝলা সম
সঘনে চমকে অসি,
শূল, বাণ ছুটে শন্ শন্ ;
দেখিতে দেখিতে কত
হিন্দু মুসলমান বীর
ধরাপৃষ্ঠে করিল শয়ন।
আরোহী পড়িল রণে,
শরাঘাতে ধৈর্য্যহীন
তুরঙ্গম ছুটে বেগভরে ;
আহত, ব্যথিত গজ
না মানে অঙ্কুশাঘাত,
শত্রু, মিত্র বিদলিত করে।
পৃথ্বীরাজ, মহম্মদ
খুঁজিছেন পরস্পর ;
কিন্তু উভয়ের সেনাগণ ;
না দেয় মিলিতে দোঁহে,
দাঁড়ায় ঘিরিয়া আসি,
করি শত শত প্রসরণ।
ভূপের অব্যর্থ শরে
তুরুক্ সেনানী কত
মরিল যে না হয় গণন ;
"অই আসে হিন্দুরাজ"
শুনিলে চকিত তুর্ক
ব্যূহ ভাঙ্গি করে পলায়ন।
এই গজপৃষ্ঠে বীর,
এই অশ্ব আরোহণে,
এই পুনঃ দাঁড়ায়ে ভূতলে,
যেখানে সঙ্কট, সেথা,
সজল-জলদ-মন্দ্রে
আশ্বস্ত করেন সেনাদলে।
কোথা হিন্দু গজ-যূথ,
ভাঙ্গি তুরুকের চমূ,
নিষ্পেষিত করে সেনাগণ ;
কোথা তুর্ক অশ্বারোহী,
মথি হিন্দু পদাতিক,
রণক্ষেত্রে করে বিচরণ।
কভু হিন্দু অগ্রসর,
তুর্ক যায় পলাইয়া
হিন্দু ব্যূহ কভু ভগ্ন হয় ;
দ্বিপ্রহর ক্রমে গত,
পশ্চিমে নামেন রবি,
অনিশ্চিত জয়, পরাজয়।
শিরে বিকম্পিত জটা
করে ধৃত মহাশূল,
সমর্ষি যথায় অগ্রসর, *
দ্বিগুণ উৎসাহে সেথা
ধায় হিন্দু সেনা যত,
উচ্চারিয়া "হর হর হর।"
হতাহতে পরিপূর্ণ,
আর্ত্তনাদে মুখরিত,
শোণিত-রঞ্জিত রণস্থল ;
তথাপি বিশ্রাম নাই,
উন্মত্ত অসুর সম
মহাযুদ্ধে রত দুই দল।
সমর্ষি, গোবিন্দ দোঁহে,
দুই পার্শ্ব হ'তে, ক্রমে,
বেষ্টন করিলা তুর্কগণে ;
অভিজ্ঞ সেনানী যত
বুঝিল নিস্তার নাই,
তুর্ক আজ ধ্বংস হবে রণে।
তরুণ শার্দ্দূল সম,
সঙ্কটে ভ্রুক্ষেপহীন,
যুঝিছেন ঘোরী বীরবর।

---

* সমর্ষি চিতরাধিপতি সমরসিংহ, পৃথ্বীরাজের সহোদরা পৃথার স্বামী।

ইঙ্গিতে, নিমেষ মাঝে,
সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে
তুরগ হইছে অগ্রসর।
সর্ব্বাঙ্গ আবৃত বর্ম্মে.
শিরে লৌহ শিরস্ত্রাণ,
মহাশূল উত্তোলিত করে ;
নিরখি সে বীরমূর্ত্তি
ত্রস্ত হিন্দু পদাতিক,
ভাঙ্গি শ্রেণী, ধায় বেগভরে।
বিচ্ছিন্ন কৃপাণাঘাতে,
শূলে বিদারিত দেহ.
পড়ে কত হিন্দু বীরবর ;
“দিন্ দিন্” ঘন ঘন
পূর্ণ করি রণস্থল
তুরুকের উঠে জয়স্বর।
অগ্রসর পৃথ্বীরাজ,
নিরখি গোবিন্দ ক’ন, *
“দাদা! তুমি জয়ী শত রণে ;
দাও আজ অনুমতি,
ঘোরী যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ;
আমি আজ যুঝি তার সনে।”
কোষবদ্ধ করি অসি,
অনুমতি দিলা ভূপ,
গোবিন্দের বুঝি অভিপ্রায়,
ঘোরীরে অদূরে হেরি,
গোবিন্দ চালায়ে গজ,
বজ্ররবে কহিলা তাঁহায়। †
”ধর অস্ত্র, বীরবর !
মাগিতেছি রণ আমি ;”
শ্রুতিমাত্র শূল লয়ে করে
নিক্ষেপিলা মহম্মদ,
চর্ম্মে হয়ে প্রতিহত
পশিল তা’ বদন-বিবরে।
ভাঙ্গিল দশনদ্বয়,
মুহূর্ত্তে সম্বরি ব্যথা
নিজ শূল করিয়া গ্রহণ
“যাও এবে যমালয়”
বলিয়া বিদ্যুৎ বেগে
গোবিন্দ করিলা নিক্ষেপণ।
অব্যর্থ সে মহাশূল,
বিদারিয়া বর্ম্ম, কক্ষ,
প্রবেশ করিল মর্ম্মস্থলে ;

---

* গোবিন্দ পৃথ্বীরাজের কনিষ্ঠ সহোদর।

† তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ প্রদত্ত হইয়াছে ;—When the ranks were duly marshelled, the Sultan seized a lance and attacked the elephant on which Gobind Rai of Delhi was mounted and on which elephant he moved about in front of the battle. The Sultan i Ghazi, who was the Haidar of the time, and a second Rustam, charged and struck Gobinda Rai on the mouth with his lance with such effect that, two of the accursed one's teeth fell into his mouth. He launched a javelin at the Sultan of Islam and struck him in the upper part of the arm and inflicted a very severe wound. The Sultan turned his charger's head and receded, and from the agony of the wound he was unable to continue on horseback any longer. Defeat befell the army of Islam so that it was irretrievably routed and the Sultan was very nearly falling from his horse. Seeing which a lion-hearted warrior, a Khalji stripling, recognised the Sultan and sprang up behind him, and supporting him in his arm, urged the horse with his voice and brought him out of the field of battle.

Major Raverty's translation, pp. 459-60.

নিদারুণ বেদনায়
অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে বীর
মূৰ্চ্ছিত পড়িলা ভূমিতলে।
অমনি সহস্র কণ্ঠে
উঠে জয় জয় নাদ;
পৃথ্বীরাজ দাঁড়ান তথায়।
খাল্‌জী সৈনিক এক,
কাছে আসি, করযোড়ে
সম্বোধিয়া কহিল তাঁহায়।
"মূৰ্চ্ছিত, আহত জনে
শুনিয়াছি মহারাজ!
প্রহার ক্ষত্রিয় ধৰ্ম্ম নয়;
বাঁচিবে না তুর্করাজ,
দেহমাত্র আছে পড়ি,
লইব, আদেশ যদি হয়।"
গোবিন্দের অভিপ্রায়
বুঝি, কহিলেন ভূপ;
"লয়ে যাও ঘোরী বীরবরে,
যদিও অরাতি তিনি,
তথাপি বিক্রমে তাঁর
তুষ্ট মোরা হয়েছি অন্তরে।" *

"মরিয়াছে তুর্করাজ"
মুহূর্ত্তে পড়িল রব;
জয়োল্লাসে মত্ত হিন্দুগণ.
দ্বিগুণ উৎসাহ ভরে.
ভগ্নোদ্যম মুসলমানে
সবলে করিলা আক্রমণ।
বিপর্য্যস্ত, বিশৃঙ্খল
ছুটিল তুরুক সেনা,
মত্ত হিন্দু পশ্চাৎ ধাবনে;
বহু ক্রোশ পিছে ছুটি,
ভগ্ন, চূর্ণ, পিষ্ট করি,
শিবিরে ফিরিলা হৃষ্টমনে।
অবতরি গজ হ'তে
পৃথ্বীরাজ মহা হর্ষে
গোবিন্দে দিলেন আলিঙ্গন;
সমর্থি মিলিলা আসি,
আসে সৈন্যাধ্যক্ষ যত,
কোলাকুলি করে সর্ব্বজন

---

* এ সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। চাঁদ বরদাই বলেন, মহম্মদ ঘোরী বন্দীরূপে দিল্লীতে আনীত হইয়াছিলেন এবং পরে উপযুক্ত নিষ্ক্রয় দানে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান লেখকগণ বলেন, তিনি গোবিন্দের প্রহারে মূৰ্চ্ছিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কোন খালজী সৈনিক তাঁহাকে রণক্ষেত্র হইতে লইয়া আসেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদিগের যেরূপ পরাজয় ঘটিয়াছিল, তাহাতে পৃথ্বীরাজের অনুমোদন ব্যতীত মহম্মদ যে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। আমি তাহাই কাব্যোচিতভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। টড্‌সাহেব হিন্দু লেখকদিগের মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন; He (Mahammed Ghoory) had been often defeated and twice taken prisoner by the Hindu sovereign of Delhi who, with a lofty and blind arrogance of the Rajput character, set him at liberty.

Quoted at Page 153, Ajmer Historical and Descriptive.

মুসলমান লেখকদিগেরও মধ্যে এ সম্বন্ধে যে মতভেদ ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীয়মান হইবে:—He had almost fallen when some of his chiefs advanced to his rescue. This effort to save him gave an opportunity to one of his faithful servants to leap up behind Muhomed Ghoory, who faint from loss of blood had nearly fallen from horse but was carried triumphantly off

দিল্লীতে চলিল দূত
বিজয়-বারতা লয়ে,
কোন দূত চলে আজমীরে ;
তুর্কের বিধ্বংস শুনি
প্রাণে শান্তি লভে লোক,
কত নেত্র আর্দ্র হর্ষনীরে।
শুভক্ষণ দেখি সবে
ফিরিলেন দিল্লীপানে ;
সেথা যত নাগরিকজন,
রণজয়ী বীরগণে
অভ্যর্থিতে, মহোৎসাহে,
করিল বিবিধ আয়োজন।
পত্র, পুষ্প মাল্য দিয়া
সাজাইল রাজপথ,
বিরচিল বিজয়-তোরণ।
তুলে ধ্বজ গৃহচুড়ে,
পূর্ণ কুম্ভ সপল্লব
দ্বারদেশে করিল স্থাপন।
নগরের চতুষ্পথে
নির্ম্মাণ করিল মঞ্চ,
বাজে বাদ্য তাহার উপরে ;
পূজা, হোম, বলিদান
হয় প্রতি গৃহে গৃহে,
বৈতালিক জয়গান করে।

রাজ-অন্তঃপুর মাঝে
উথলে আনন্দ-সিন্ধু ;
তুরুকে করিয়া পরাজয়
আসিছেন মহারাজ ;
লইব বরণ করি,
নারীগণ পরস্পর কয়।
বাজায়ে বিজয়শঙ্খ,
আরোহিয়া গজবরে,
পৃথ্বীরাজ পশেন নগরে ;
অগ্রে ধায় পদাতিক,
তুরগ, বারণ পিছে,
রাজপথ কাঁপে পদভরে।
কেশে বাঁধা কঙ্কপুচ্ছ,
কণ্ঠে ত্রিধা গুঞ্জাহার,
কটিদেশে কিঙ্কিণী মুখর,
ঢক্কারবে নৃত্য করি,
বাজাইয়া রণশিঙা,
সাথে সাথে ধায় বাদ্যকর।
ধ্বজবাহী অগণন
চলে যুগ্ম শ্রেণী গাঁথি,
পতাকা কাঁপিছে বায়ুবলে ;
পৃষ্ঠে বহি জয়ভেরী,
তালে তালে ফেলি পদ,
হেলিতে দুলিতে গজ চলে।
খুলিয়া গবাক্ষদ্বার,
পুষ্প বরিষণ করি,
কৌতুকে হেরেন নারীগণ।
কার (ও) পুত্র, কার (ও) পতি,
নৃপতির সাথে সাথে,
কি গৌরবে করিছে গমন।
ছিন্ন যার নাসা, কর্ণ
তুরুকের অস্ত্রাঘাতে ;
চক্ষু যার শোণিতাক্ত শরে,

---

the field though almost wholly deserted by his army which was pursued by the enemy nearly forty miles. * * The author of Huheeb-oos-Seer relates contrary to all my other authorities that when Mahomed was wounded he fell from his horse, and lay upon the field among the slain till night. And that in the dark a party of his own body-guard returned to search for his body, and carried him off to his camp. Briggs' Ferista p 173.

গৌরবে বনিতা তার
কহে, "সখি ! হের অই
রণজয়ী মোর প্রাণেশ্বরে।"
পথপার্শ্ব দেবালয়ে,
দ্বার উন্মোচন করি
দাঁড়াইয়া পূজক ব্রাহ্মণ,
নির্ম্মাল্য, প্রসাদ আনি,
রণজয়ী বীরগণে
আনন্দে করেন বিতরণ।
বিপণি সজ্জিত করি
দাঁড়াইয়া শ্রেষ্ঠী যত,
কার (ও) করে সুবর্ণের থালা ;
তাম্বুল, গুবাক তাহে
রহিয়াছে স্তূপীকৃত,
কার (ও) হাতে কুসুমের মালা।
জনপূর্ণ রাজপথ,
নারীপূর্ণ বাতায়ন,
জয়নাদে পূর্ণিত অম্বর ;
নগরি ভ্রমিয়া, ক্রমে,
রাজপুরী পানে সবে,
ধীরে ধীরে, হন অগ্রসর।
নৃপতির রাজ্ঞী যত,
পরি চারু বেশ, ভূষা,
মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজাইয়া,
বরণ করিতে ভূপে
পুরীর অঙ্গন মাঝে
বসেছেন মিলিত হইয়া।
সংযুক্তা সপত্নীগণে
কহেন ; "কি দিন আজ !
আমাদের সার্থক জীবন ;
মিলেছিত মোরা সবে,
কিন্তু বড় দিদি কোথা ?
কেন তাঁর না পাই দর্শন ?"
ব্যগ্র হয়ে গুণবতী,
পশি সপত্নীর গৃহে,
হেরিলেন সেথা একাকিনী,
আলোলিত কেশজাল,
কাঁদিয়া রেঙেছে আঁখি
ধরাসনে বসিয়া ইচ্ছিনী।
আদরে ধরিয়া কর
সংযুক্তা কহেন, "দিদি !
তুমি কেন বসি হেন আজ ?
অই শুন বাজে ভেরী,
বরণ করিবে চল,
অন্তঃপুর-দ্বারে মহারাজ।"
এত বলি যত্নে তাঁর
কেশগুলি বিনাইয়া
রচিলেন কবরী বন্ধন,
খুলি নিজ কণ্ঠহার
পরায়ে দিলেন গলে,
অঙ্গে দিলা সুচারু বসন।
ইচ্ছিনী সরলা অতি,
আদরে গলিল প্রাণ,
বলে ; 'বোন ! কেন অকারণে
সাজাইছ তুমি হেন ?
আমি প্রৌঢ়া এবে, মোরে
প্রাণেশের আছে কি স্মরণে ?
আমি ভার্য্যা মাত্র তাঁর
আছি পরিতুষ্টা হয়ে
লভি ভোজ্য, বসন ভূষণ ;
নাহি সাধ লোক মাঝে
দেখা'তে এ পোড়া মুখ,
প্রিয়া যারা করুক্ বরণ।"
সংযুক্তা বুঝায়ে ক'ন,
"যদি, দিদি ! রূপমোহে
থাকে অগ্রে আসক্তি তাঁহার,
কি ক্ষোভ তোমার তাহে ?
যজ্ঞে, ব্রতে, পুণ্যকর্ম্মে

জ্যেষ্ঠা তুমি, তব অধিকার।
হ'ক না অপর কেহ,
ক্রীড়ায়, কৌতুকে, রঙ্গে,
ভূপতির ভোগের সঙ্গিনী ;
কিন্তু, দিদি ! ধর্ম্মে, কর্ম্মে
তোমার (ই) প্রথম স্থান"
শুনি হর্ষে উঠিলা ইঙ্গিনী।
বড় রাণী, ছোট রাণী
একত্র চলিল দোঁহে,
হাতে হাতে ধরি পরস্পর ;
সবে ভাবে, এ কি দৃশ্য !
সপত্নীগণের মাঝে
এত প্রেম, লোকে অগোচর।
হেন কালে পৃথ্বীরাজ,
গজ হ'তে অবতরি,
দাঁড়ালেন অন্তঃপুরদ্বারে।
উচ্চে উঠে উলুধ্বনি,
বাজে শঙ্খ মহানাদে,
কি উল্লাস কে বর্ণিতে পারে।
প্রথমে ইঙ্গিনী গিয়া,
করি নৃপে প্রদক্ষিণ,
চন্দনের টিপ দিলা ভালে,
লয়ে পরে ধূপ, দীপ,
আদরে আরতি করি,
কণ্ঠ সুশোভিলা পুষ্পমালে।
এইরূপে ভূপতির
অন্য রাজ্ঞী ছিলা যত
যথাক্রম করিল বরণ,
নৃপতির নেত্র শুধু
খুঁজিছে আকুল হয়ে
ছোট রাণী আসিবে কখন।
ইঙ্গিনী, বুঝিয়া ত্বরা,
সংযুক্তার হাত ধরি
লয়ে গেল নৃপতির বামে,
রাখি সেথা, উলু দিয়া,
কহে সবে, হাসিমুখে,
"রণঞ্জয়ী হের সীতারামে।"
সংযুক্তা, সবার শেষে,
বরণ করিলা ভূপে ;
কি যে হর্ষ সতীর অন্তরে,
সুব্যক্ত করিল তাহা
নয়নের মুক্তাফল,
মৃদু হাস্য ফুটিয়া অধরে।
আসি পৃথা গুণবতী
বরিলেন সমর্ষিরে,
গোবিন্দে বরিল জায়া তাঁর।
এইরূপে নারীগণ
বরণ করিলা, ক্রমে,
আদরের পাত্র যিনি যাঁর।
ঘন ঘন বাজে শঙ্খ,
ঘন উঠে উলুধ্বনি,
রাজভট্ট গাল জয়গান ;
বিশাল নগর ব্যাপি
উঠে শুধু এক সুরে
"জয় জয় জয় জয়" তান।
কিন্তু এ সুখের দিনে
এ কি দৃশ্য মর্ম্মভেদী
আকর্ষিল সবার নয়ন !
করুণ রোদন-ধ্বনি,
উঠি সেথা, অকস্মাৎ,
সবাকার ব্যথিল শ্রবণ।
রাজ-কুটুম্বিনী এক,
অতি দীনা, বিমলিনা,
এক দিকে ছিলা দাঁড়াইয়া,
পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তারে
হেরি "তোরা কোথা গেলি"
বলি উচ্চে উঠিলা কাঁদিয়া।
কাঁপে পদ থর থর,

না পারি দাঁড়াতে নারী,
অবসন্না, পড়িলা অঙ্গনে ;
হেরি, সংযুক্তারে লয়ে,
কাছে গিয়া নরপতি
অভাগীরে তুলিলা যতনে।
কহিলা ; স্বদেশ তরে
বীরপুত্র দেছে প্রাণ ;
কাঁদিস্ না, জননি গো ! মোর।
এই তোর পুত্রবধূ,
ধৈর্য্য ধরি দেখ, চেয়ে,
আজ হ'তে আমি পুত্র তোর।"
স্তব্ধা নারী, রহে চাহি,
গণ্ড বহি পড়ে জল,
পৌরজন সবে সবিস্ময় ;
ভাঙ্গিল চমক, ক্ষণে,
উঠে শত শত কণ্ঠে,
"জয় জয় পৃথ্বীরাজ জয়।"
ক্ষণমাত্রে সে সংবাদ
পশিল নগর মাঝে,
কত নেত্রে বহে হর্ষজল ;
"জন্মে জন্মে আমাদের
রাজা তুমি হও, বীর !"
আশিষিয়া কহে প্রজাদল।
বিষাদে ভাবিছে কবি,
আর কি তেমন দিন
আসিবে এ ভারত ভিতরে ;
বীর পতিপুত্রগণে
মিলি মাতা, জায়া সবে
বরণ করিবে সমাদরে।
চলিয়া গিয়াছে দিন,
স্মৃতিমাত্র ছিল তার,
তা'ও বুঝি, ক্রমে, লুপ্ত হয় ;
ভারতের কবিগণ
গাইছেন অন্য গান,
বীবকীর্ত্তি গেয় কারও নয়।
শয্যা এবে রণক্ষেত্র,
নূপুরে দুন্দুভি-ধ্বনি,
অবিরাম ছুটে ফুলবাণ ;
তার(ই) অনুকূল কথা
শুনি প্রীতি সর্ব্বজন,
কে শুনিবে আমার এ গান ?
নিঃসঙ্গ বিহগ সম,
গাইব আপন মনে,
ডাকিয়া শুনা'ব আপনারে ;
সার্থক হইবে শ্রম,
এক জন (ও) শ্রোতা যদি
পাই এই ভারত মাঝারে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

আগামী নব বর্ষের সঙ্গে পৃথ্বীরাজ প্রকাশিত হইবে। প্রাপ্তি স্থান ৩০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ সংস্কৃত-প্রেস-ডিপজিটরী ; মূল্য দুই টাকা।

বাংলার কথা। (৪)

পলাশী ক্ষেত্রে ইংরেজ ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপিত হইল। ইংরেজ এ দেশের বাসিন্দা নয়। ইয়ুরোপে ইংলণ্ড বা বিলেত ইহাদের দেশ। পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও জর্ম্মণ বণিকেরা যেমন মুসলমান রাজত্বকালে বিভিন্ন সময়ে বাংলায় ধনলোভে আসিয়াছিল, ইংরেজরা সেইরূপ আসিয়াছিল। পলাশী যুদ্ধের বহুপূর্ব্বেই পর্ত্তুগীজ, জর্ম্মণ ও দিনেমার

বণিকদের নাম গন্ধ বাংলা হইতে লুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলেন্দাজদের ব্যবসাবাণিজ্য তোড়ের সহিত চলিতেছিল। ইংরেজ বণিকদের প্রধান আড্ডা ছিল কলিকাতায়, ওলেন্দাজদের চুঁচড়ায় এবং ফরাসীদের চন্দননগরে। ইংরেজ বণিকদের প্রধান কর্ম্মচারীদের কলিকাতায় সভা বসিত, এবং সেই কলিকাতা সভায় কোম্পানীর এদেশের কার্য্যাবলী আলোচিত হইত। পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজদের ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্ষমতা ওলেন্দাজ ও ফরাসীদিগকে একেবারে মাটী করিয়া দিল, তাহাদের যা কিছু ক্ষমতা ক্ষুদ্র চন্দননগর ও চুঁচড়ার গণ্ডীতে আবদ্ধ রহিল।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাম ধরিয়া বাণিজ্যার্থে প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। কোম্পানীর অংশীদারেরা ব্যবসা চালাইবার জন্য বিলেতে ডাইরেক্টর মনোনীত করিতেন। ডাইরেক্টর বা পরিচালকেরা কর্ম্মচারী গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইতেন। কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা প্রথমে বাংলায় আসেন নাই। তাঁহারা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে জিনিস আমদানী রপ্তানী করিতেন। ১ ৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সহিত তাঁহাদের প্রথম পরিচয়। ঐ সনে তাঁগারা হুগলীতে কুঠি করিয়া বাংলার বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। অনেক সময়ে খামখেয়ালী মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচার, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কোম্পানীর বাণিজ্য ধীরে ধীরে বাংলায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা একাধারে বণিক ও যোদ্ধা ছিলেন। সিরাজের নবাব হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই কোম্পানীর ক্ষমতা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কলিকাতা যে স্থানে, সে স্থান তাঁহারা ৪৯৫৲ টাকায় ক্রয় করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা, কাশিমবাজার, হুগলী প্রভৃতি নগরে কোম্পানীর কুঠি বা আড়ত ছিল। কোম্পানী নবাবকে খাজানা দিয়া কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ৩৮ খানি মৌজার জমিদারী করিতেন। এতদ্ব্যতীত বাদসাহী সনন্দের বলে কোম্পানী মুরশিদাবাদের টাঁকশালে নিজেদের টাকা মুদ্রিত করিতে পারিতেন।

কলিকাতা দুর্গও পরিখা দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল। কলিকাতায় ইংরেজদের মেয়র কোর্ট নামে নিজেদের এক আদালত ছিল। ঐ আদালতে ইংরেজদের ও কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীদের বিবাদ বিসম্বাদের নিষ্পত্তি হইত। কলিকাতায় কাজী ছিল না। আইনের মর্য্যাদা করে বলিয়া ইংরাজ ও কলিকাতার ইংরাজ বিচারকের খ্যাতি ছিল। কলিকাতাবাসীদের ধন প্রাণ রাজকর্ম্মচারীর খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করিত না। কলিকাতায় বর্গীর উপদ্রব ছিল না। দেশীয় বণিকরা অথায় নিরাপদে ধন উপার্জ্জন করিত। এই সকল নানা কারণে বিভিন্ন স্থানের লোক আসিয়া কলিকাতায় বাস করিত। পলাসীর যুদ্ধের সম সময়ে কলিকাতা ধনে জনে বাণিজ্যে বিখ্যাত নগর হইয়া উঠিয়াছিল।

কলিকাতার যখন এই অবস্থা, তখন দেশের অবস্থা, মুসলমান রাজার অধীনস্থ প্রজার অবস্থা বড় সুখের ছিল না। মুসলমানী আমলে কর বা রাজস্ব আদায়ের জন্য বাংলা দেশ বহুসংখ্যক পরগণার বিভক্ত

ছিল। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহের জন্য পরগণায় পরগণায় ঠিকাদার নিযুক্ত হইত। খাজনার ঠিকাদারের মৃত্যু হইলে তাহার পদ তাহার ওয়ারীশ লাভ করিত। মুসলমান রাজত্বের এই প্রথা হইতে জমীদারের সৃষ্টি। জমীদারেরা রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিত। তাহার বেশী যাহা আদায় করিত, তাহা তাহাদিগের লাভ থাকিত। জমীদার লাভের জন্য প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে পশ্চাৎপদ হইত না।

রাজস্ব আদায়ের জন্য দেশে যেমন পরগণা প্রভৃতি রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত ছিল, বিচার বিতরণের জন্য সেইরূপ দেশ আবার ইসলামাবাদ, চাটগাঁ, রংপুর, রাজসাহী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি ফৌজদারী বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ফৌজদারিতে কাজী ও ফৌজদার থাকিত। কাজীর আদালতে দুষ্টের শাস্তি এবং প্রজাদের দাবী দাওয়া মীমাংসা হইত। ফৌজদারের অধীনে ফৌজ এবং ফৌজদারীর অধীনে চৌকীদার থাকিত। ফৌজ ও চৌকীদারের কার্য্য ছিল শান্তিরক্ষা। জমীদারের অধীনস্থ চৌকীদারেরা নামেই শান্তিরক্ষক ছিল প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া জমিদারের দাবী আদায়ের সাহায্য করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। মুসলমান রাজত্বের শেষ দশায় পল্টন ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের যোগ্যতা ছিল না, ফৌজ বা পুলিস ও চৌকীদারেরা প্রজাকে রক্ষণ না করিয়া ভক্ষণ করিত, আদালতের টিকটিকি পর্য্যন্ত ঘুস খাইত। স্বল্প সংখ্যক রাজপথও সংস্কারাভাবে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। যখন দেশের এইরূপ অবস্থা, তখন পলাশীর যুদ্ধ ঘটিল। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতন হইল; রাজশক্তি মুসলমানদিগের করচ্যুত হইয়া কোম্পানীর হস্তে আসিল। কিন্তু তাৎকালীন প্রবাসী ইংরেজদিগের নেতা রাজশক্তি পাইয়াও সিংহাসনে না বসিয়া মিরজাফর, মীরকাসেম প্রভৃতি বোনদারকে রাজ সিংহাসনে বসাইলেন।

মীরজাফর পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলার নবাব হইলেন। তিনি ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য কোম্পানীর বাণিজ্য-শুল্ক উঠাইয়া দিলেন, কোম্পানীকে জমিদারী জায়গীর দিলেন, এবং কোম্পানী ও কোম্পানীর ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে প্রচুর টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু ক্লাইভের গর্দ্দভ অঙ্গীকৃত টাকা যথা সময়ে দিতে পারিল না। এদিকে ক্লাইভ সাহেব স্বদেশে গমন করিলেন। কলিকাতার নূতন বড় সাহেব তখন মীরজাফরকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া মীরকাসেমকে তথায় বসাইলেন। কার্য্যদক্ষ বুদ্ধিমান মীরকাসেম মীরজাফরের জামাতা ছিলেন।

সেই সময়ে সদাগর বণিকদিগকে শুল্ক দিতে হইত। কিন্তু মীরজাফর কোম্পানীর বাণিজ্য-শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন। রাজশক্তি কোম্পানীর হাতে জানিয়া কোম্পানীর ইংরাজ ও দেশীয় কর্ম্মচারীরাও কোম্পানীর নিশান তুলিয়া বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিত। তাহারা জিনিষ কিনিবার সময় জোর জুলুম করিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে সস্তায় জিনিষ কিনিত, আবার বেচিবার সময় বেশী দাম আদায় করিত। শেষে এমন অবস্থা হইল যে, কোম্পানীর কর্ম্মচারী আসিতেছে, এ কথা শুনিলে গ্রামের লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইত। জনসাধারণ নবাবকেই এই সব অত্যাচারের জন্য নিন্দা করিত। মীরকাশেম এই সব অত্যাচার প্রতিকার করিবার জন্য

চেষ্টা করিলে কলিকাতার সাহেবরা তাঁহার কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইতেন। মীরকাশেম শেষে যথার্থ নবাবের ন্যায় দেশ শাসন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি ইংরেজের ক্ষমতা বিশেষরূপে জানিতেন। তাঁহার ভয় ছিল, ইংরেজ বিরক্ত হইলে বাংলার সিংহাসনে অন্য লোক উপবিষ্ট হইবে। তিনি স্বাধীন ভাবে নবাবী করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

মোগল-প্রাধান্য-কালে বাংলার সুবেদারেরা আলীবর্দ্দীর সময় পর্য্যন্ত দিল্লীতে সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব প্রেরণ করিতেন। আলীবর্দ্দী খাঁ প্রথম প্রথম দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন। কিন্তু যখন বর্গীরা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ভুলিল, তখন তিনি খাজনা বন্ধ করিলেন। সেই সময় হইতে বাংলা দিল্লীশ্বরের হস্তচ্যুত হয়। মীরকাশেম বাদসাহের সহিত দেখা করিয়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী সনন্দ পাইলেন। তিনি দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন। সম্রাটের সহিত মীরকাশেমের সখ্যতা হইল। উভয়েই উভয়ের বিপদে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

অকর্ম্মণ্য মীরজাফর রাজ্যের কোন খোঁজই রাখিতেন না। বাংলার সৈন্য সংক্রান্ত ভার ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের হাতেই ছিল। মীরকাসিমের অধীনে তেমন সৈন্য ছিল না। মুর্শিদাবাদে সৈন্য সংগ্রহ করিলে ইংরাজের নজরে পড়িবে ও তাহাদিগের সন্দেহ হইবে; অথচ সৈন্যবল না থাকিলে তাঁহাকে চিরদিনই ইংরাজের আজ্ঞায় উঠিতে বসিতে হইবে। তিনি মুঙ্গেরে রাজধানী করিয়া গোপনে সৈন্য-বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ হইলে নবাব কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিলেন। কলিকাতাস্থিত কোম্পানীর উচ্চ কর্ম্মচারীদের সহিত নবাবের মনান্তর ঘটিল। মনান্তর যুদ্ধে পরিণত হইল। নবাব ও দিল্লীর বাদশা একত্র মিলিয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অস্ত্র হাতে বহু সংখ্যক লোক একত্রিত হইলে সৈন্য দল গঠিত হয় না। যুদ্ধ একটী শাস্ত্র। ইংরেজ যুদ্ধশাস্ত্রে এদেশের লোক হইতে সহস্রগুণে পণ্ডিত। গোলাগুলির ব্যবহার তাহারা যেমন জানিত, হিন্দু কি মুসলমান কেহই তেমন জানিত না। ফলে অল্প সংখ্যক সাহসী অধ্যবসায়ী শিক্ষিত ইংরাজ সৈন্যের হস্তে মীরকাসিম ও বাদসাহের পরিচালিত বিপুল জনতা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইংরেজরা বৃদ্ধ মীরজাফরকে পুনরায় নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু মীরজাফর অনতিকাল মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র নাজিম ইংরাজদিগের কর্তৃক নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইতিমধ্যে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে ক্লাইভ ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় 'কোম্পানীর বড় সাহেব হইয়া আবার আসিলেন। ক্লাইভ আসিয়া দেখিলেন, নবাবের হস্ত হইতে যত ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া নিজেদের হাতে আসে, ততই কোম্পানীর সুবিধা। মীরকাসেমের কাণ্ড দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, দিল্লীর বাদসাহের সহিত যদি বন্দোবস্ত করা যায়, তবে নবাব সহসা ইংরেজের প্রতিকূলে যাইতে সমর্থ হইবে না। মোগলী আমলে যে বাংলার শাসন কার্য্য সুবেদারী এবং দেওয়ানী, এই

দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আরংজীবের পৌত্র আজম যখন বাংলার সুবেদার, তখন মুর্শীদ-কুলীখাঁ দেওয়ান ছিলেন। অর্থবল একটী বিশেষ বল। দেওয়ানের হাতে রাজ্যের রাজস্বের চাবি থাকিত। ক্লাইভ বাংলার দেওয়ানী কোম্পানীর হাতে আনিতে স্থির করিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বাদসাহের নিকট হইতে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করিয়া কোম্পানীর নামে দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ আগষ্টে কোম্পানী বাংলার দেওয়ান হইলেন। কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করিয়া সাবেক ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন না। ব্যবসা পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল।

রাজা পল্টন ফৌজ চৌকিদার আদালত রাখিয়া প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা করেন। স্থান হইতে স্থানান্তরে পথ ঘাট করিয়া দেশ সুগম করেন। দেশ সুগম হইলে দস্যু তস্করের অসুবিধা হয়, বাণিজ্যের সুবিধা হয়, বিভিন্ন রীতি-নীতি-প্রচলিত দেশের বিভিন্ন অংশ জমাট বাঁধিয়া নূতন শ্রী ধারণ করে। কিন্তু এই সমুদায় কার্য্য ব্যয়সাধ্য। রাজা সেই জন্য প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। কোম্পানী দেওয়ানী পদ লাভের পূর্ব্বে সৈন্য-সংক্রান্ত ভার কোম্পানীর উপর ছিল। দেওয়ানী পদ লাভ করিলে কর আদায়ের ভার কোম্পানীর উপর পড়িল এবং রাজার অন্যান্য কার্য্য নবাবের হাতে রহিল। ক্লাইব নবাবের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে, নবাব তাঁহার সাংসারিক ও বিচারালয়াদি সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাঠাইবেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় দেওয়ানী সনন্দের ফলে দুই রাজা হইল। এক রাজা জাতিতে বণিক, বিদেশী, এ দেশের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এই নূতন রাজার হাতে রাজস্ব সংগ্রহের ও সেনা রক্ষার ভার পড়িল। অন্য রাজা অকর্ম্মণ্য, বিলাসী, যথেচ্ছাচারী। এই পুরাতন রাজার হাতে শান্তিরক্ষা, বিচার এবং অন্যান্য মঙ্গলকর কার্য্যের ভার পড়িল। বাংলার প্রজাবৃন্দ নিরীহ, মূর্খ, ভীরু! দুই রাজার আদর অভিমানে প্রজার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাংলার সহিত কোম্পানীর কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বা বাংলার জন্য কোন দায়িত্ব ছিল না। দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণের পর বাংলার সহিত কোম্পানীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিল।

রাজস্ব সংগ্রহ দেওয়ানের একটী প্রধান কাজ। প্রজার অবস্থা স্বচ্ছল না হইলে রাজস্ব বাকী পড়ে ও সহজে আদায় হয় না। এই জন্য ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ত্তব্য-পরায়ণ দেওয়ানকে প্রজার অবস্থা ভাবিতে হয়।

পলাশীর যুগে কোম্পানীর সাহেব-কর্ম্মচারীরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিত এবং আরো নানাবিধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিত। দেশীয় বণিকদিগকে কুতঘরে স্থল ও জল পথে পণ্য দ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা ২০।২৫ টাকা মাসুল দিতে হইত। কিন্তু কোম্পানী সাহেব চাকরের দস্তখতী পরোয়ানা থাকিলে পণ্যদ্রব্য বিনা মাশুলে স্থানান্তরে চালান দেওয়া যাইত। দেশী

মহাজনেরা নবাবের প্রাপ্য মাসুল ঠকাইবার জন্য কোম্পানীর সাহেবদিগকে উপহার বা উৎকোচ দিয়া পরোয়ানা যোগাড় করিত। কোম্পানীর আমলাদের বেশী মাহিনা ছিল না। তাহারা মাসে ৫০ টাকা বেতন পাইলেও বাণিজ্য সেলামী প্রভৃতি দ্বারা বৎসরে লক্ষাধিক টাকা রোজগার করিত।

এই সকল ইংরেজ কর্ম্মচারীরা দেশের ভাষা, রীতি পদ্ধতি জানিত না, সুতরাং সমস্ত বিষয়েই তাহাদিগকে দেশী সরকার গোমস্তার উপর নির্ভর করিতে হইত। তখন রেল ষ্টিমার হয় নাই, বিলাত হইতে বাংলায় আসিতে হইলে অনেক পথ ঘুরিয়া আসিতে হইত, অনেক দিন লাগিত। তখন সাহেবেরা এদেশে বিবি লইয়া আসিতেন না। সেইকালে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া যাঁহারা এদেশে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে লাম্পট্য তেমন দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইত না। দেশী সরকার গোমস্তারা সেলাম, খোসামোদ এবং জীবন্ত মাংস সরবরাহ করিয়া বিদেশী মনিবের প্রীতিভাজন হইত। অর্থ উপার্জ্জনের যত রকম গুপ্ত ফন্দি আছে, সরকারেরা মনিবকে শিখাইত। মনিবও চাকরকে দস্তখতী পরোয়ানা দিত, এবং চাকরেরা অত্যাচার উৎপীড়ন দেখিয়াও দেখিতেন না। ইহাতে কৃষকের কষ্ট হইত, দেশী বণিকেরা প্রতিযোগিতায় কোম্পানীর লোকের সহিত পারিয়া উঠিত না। উপরে যাহা বলিলাম; তাহা কোম্পানীর ছোটখাটো সাদা কাল আমলার কথা। কোম্পানীর বড় বড় সাহেব চাকরদের পয়সা উপার্জ্জনের বড় বড় কল ছিল। সিরাজের পর যিনি যিনি এপর্য্যন্ত নবাব হইয়াছিলেন, সকলকেই কলিকাতার বড় বড় সাহেবদের সেলামী দিতে হইত কার্য্যসিদ্ধির জন্য নৈবিদ্যের ন্যায় সেলামী বা ঘুষ এদেশে নিন্দনীয় নয়। মীরজাফর কলিকাতার বড় বড় সাহেবকে কুড়ি লক্ষ টাকা, মীরকাসেম ষোল লক্ষ টাকা দিয়া বাংলার মসনদে বসিয়াছিলেন। মীরকাশেম আবার খোদ কোম্পানীকে বাংলার তিনটী জেলা দান করিয়াছিলেন। মীরজাফর দ্বিতীয় বারের নবাবীর জন্য কোম্পানীকে যুদ্ধাদির বাবদ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং কোম্পানীর কলিকাতাস্থিত চাকর বাকরদিগকে সেলামী ৫০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মীরজাফর রাজকোষ শূন্য করিয়া সর্ব্বাগ্রে সাহেব আমলাবর্গের সেলামী চুকাইয়া দিলেন। কোম্পানীকে দিবার জন্য রাজকোষে এক কপর্দ্দক পর্য্যন্ত রহিল না। তখন সাহেবেরা উপায়হীন নবাবকে নিজেদের সেলামীর টাকা চড়া সুদে ধার দিয়া নবাবের মান বাঁচাইলেন, নবাব পরে সুদে আসলে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিলেন। এই সমস্ত টাকাই প্রজার রক্ত। তখন প্রজার রক্ত দ্বারা আচমন করা নবাবী ক্রিয়াকলাপের প্রথম অঙ্গ ছিল। নবাবই হউন আর সাহেবই হউন, কিম্বা দেশী সরকার হউন, যিনি যাহা অবৈধ উপায়ে লাভ করিতেন, সমস্তই প্রজার ঘর হইতে আসিত। প্রজা কামধেনু নহে, সে কত আর কত জনকে দিতে পারে, লাভে এই হইত যে, প্রজা রাজার প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গত খাজনা দিতে পারিত না, রাজস্বের ক্ষতি হইত। ইতিপূর্ব্বে রাজস্ব আদায় হউক

বা না হউক, কোম্পানীর তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু এখন কোম্পানী বাংলার দেওয়ান। বাদসাহকে ২৬ লক্ষ টাকা নবাবকে ৫৩ লক্ষ টাকা এবং আদায় খরচা বাদ দিয়া যে রাজস্ব থাকিবে, তাহা কোম্পানীর হইবে। ক্লাইব এখন কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী। ক্লাইব সাহেবের যেমন বিচক্ষণ বুদ্ধি ছিল,তেমনি তাঁহার হৃদয় সৎ সাহসে পূর্ণ ছিল। গুণের জন্য তিনি নিজের দেশে লর্ড উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, গরু বাঁচিলে তবে দুধ মিলে। তিনি দেখিলেন, এই ভাবে আরো কিছুদিন চলিলে, এদেশে কোম্পানীর কেবল কলঙ্ক বৃদ্ধি হইবে, এবং দেওয়ানীতে কোম্পানীর লাভ হওয়া দূরের কথা, কোম্পানীকে দেউলিয়া হইতে হইবে। তিনি সেইজন্য এদেশে আসিবার কিছুদিন পরেই উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে কোম্পানীর সাদা কাল সমস্ত কর্ম্মচারীকেই ব্যবসা করিতে কিম্বা সেলামী লইতে নিষেধ করিলেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা সত্য বটে ইহার পর প্রকাশ্য ভাবে ঐ সব না করিয়া বেনামী করিতে লাগিলেন, কিন্তু তবুও এই নিষেধ আজ্ঞায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রজা সাধারণের অশান্তির লাঘব হইল।

লর্ড ক্লাইব রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজ্যের প্রধান প্রধান স্থানে দেশীয় গোমস্তা রাখিয়াছিলেন। ইহারা জমী জমীদারদিগের মধ্যে বিলি করিত। এবং জমীদারদিগের নিকট হইতে খাজনা সংগ্রহ করিত। ইহাদের কার্য্যাবলী ইংরেজ কর্ম্মচারীরা পরিদর্শন করিতেন। কিন্তু এই সকল কর্ম্মচারীরা এদেশের কিছুই জানিতেন না। জমীদারেরা গোমস্তার সঙ্গে কমহারে সুবিধাজনক চুক্তি করিয়া জমীদারী লাভ করিত। অবশ্য এই সুবিধার জন্য গোমস্তারা জমীদারদিগের নিকট হইতে বেশ মোটা রকম সেলামী লইত। আবার জমীদারেরা প্রজাকে নিজের সুবিধা মত বন্দোবস্ত করিয়া জমী বিলি করিত। জমীদারের দুদিক হইতে লাভের উপায় হইত, গোমস্তা বেশ ভাল রকম সেলামী পাইত. কিন্তু মরণ হইত প্রজার,' এবং সেই সঙ্গে রাজস্বেরও ক্ষতি হইত। গোমস্তারা খাজনা মুরশীদাবাদে জমা দিত। কোম্পানীর রাজস্বের জন্য খাজনাখানা মুরশীদাবাদে ছিল. এবং কলিকাতা বাণিজ্যের সদর ছিল।

স্বাধীন মুসলমান রাজত্ব কালে শান্তি রক্ষার ভার জমীদারের উপর ছিল। জমীদারের কাছে প্রজাদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার হইত। আবার কাজীর কাছেও বিচার হইত। ফৌজদারও শান্তিরক্ষক ছিল। ক্লাইবের সঙ্গে নবাবের যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহাতে ঠিক হইয়াছিল যে, নবাব বৎসরে এত টাকা পাইবেন, সেই টাকায় তিনি বিচার ও শান্তি রক্ষাদি করিবেন। নবাব ভাবিলেন, বেশ হইল, আমার টাকার জন্য আর ভাবিতে হইবে না ; দেশে বিচার হোক বা না হোক, শান্তি থাক বা না থাক, আমার বয়ে গেল—আমি আরো বাইজী রাখিব, আমোদে ভাসিব। তিনি কোম্পানীর নিকট হইতে যাহা পাইতেন, সমস্তই নিজের জন্য খরচ করিতে লাগিলেন। কাজী, ফৌজদার, ফৌজকে মাহিনা দেওয়া বন্ধ করিলেন। তাহারা বিচার ও শান্তির নামে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। এদিকে জমীদারের কাছারীর সেই দশা ঘটিল,

জরিমানায় জরিমানায় জমীদারের উদর স্ফীত হইতে স্ফীততর হইল। ফলতঃ দেশ হইতে ন্যায় বিচার, শান্তিরক্ষা লোপ পাইতে বসিল। ক্লাইব সাহেব এই সময়ে দেশে চলিলেন।

"বামুন গেল ঘর—লাঙল তুলে ধর।" ক্লাইব যেই দেশে চলিলেন, অমনি আবার উপহার ও বাণিজ্য-স্রোত কোম্পানীর কর্ম্মচারী মহলে প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। ক্লাইবের পরে যাঁহারা বড় সাহেব হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কোন কার্য্যদক্ষতা ছিল না। নবাব শান্তি রক্ষায় সম্পূর্ণ অমনোযোগী। দেশে চোর ডাকাতের প্রাদুর্ভাব হইল। এমন সময়ে বিপদের উপর বিপদ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ১৭৬৯—১৭৭০ খ্রীঃ বাংলা ১১৭৬ সাল। এই দুর্ভিক্ষ ছেয়াত্তরের মন্বন্তর নামে খ্যাত।

সর্ব্বনাশক দুর্ভিক্ষ। এমন দুর্ভিক্ষ আগে কি পরে বাংলায় হয় নাই। বাংলার প্রজাসাধারণ চিরকাল গরীব। বাংলায় তখন বাণিজ্যের অভাবে টাকার পরিমাণ কম ছিল। ভাল পথ ঘাটের অভাবে খাদ্য দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে শীঘ্র শীঘ্র পাঠান যাইত না, টাকা নাই, খাদ্য নাই, বাংলার লোক দলে দলে মরিতে লাগিল, দেওয়ালী-পোকার মতন জঠরানলে দগ্ধ হইয়া মরিল। বাংলার ফসলের অধীশ্বর মেঘ। বৃষ্টি না হইলেই সর্ব্বনাশ, অতি বৃষ্টিতেও সর্ব্বনাশ। বাংলার লোক তিনবার ফসল কাটে, বসন্তে মসুরাদি রবি শষ্য, শরতে কিছু কিছু ধান, আর শীতে শ্রেষ্ঠ ফসল আমন ধান। বৃষ্টির অভাবে প্রথম দুই ফসল নষ্ট হইল, দেশের সমস্ত চাষা আকাশের দিকে নির্ব্বাক হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল, তবু বৃষ্টি হইল না। ঘটি বাটি বেচিয়া খাইতে লাগিল, শেষে আর কড়ি নাই, আর খাদ্য নাই, পুকুরে জল পর্য্যন্ত নাই—গরু মরিল, ছাগল মরিল, মানুষ মরিল। এক দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোকের দুঃখের জীবনের অবসান হইল।

প্রজার সৌভাগ্যে জমীদারের লক্ষ্মী। একে বাংলার প্রজা গরীব—তাতে দারুণ দুর্ভিক্ষ। প্রজা জমীদারকে খাজনা দিতে পারিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার দেশত্যাগী হইল। তখন বাকী রাজস্বের জন্য জমীদারী বিক্রয় হইত না, জমীদারকে জেলে থাকিতে হইত। নাটোর, নদীয়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতির বড় জমীদাররাও কারাগারের বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন।

দুর্বৎসর, বাংলার ছয় আনা লোক মরিয়া ও দশ আনা লোককে কঙ্কাল-সার করিয়া চলিয়া গেল। আকাশে আবার মেঘ উঠিল। মেঘ দেখিয়া চাষার মনে জীবনের আশা জাগিয়া উঠিল। বৃষ্টি হইল, কিন্তু জমী আবাদ করিবার লোক কোথায়? বিস্তৃত কর্ষিত জমীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম লইয়া বাংলা দেশ। যে জেলায় দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে ৬০০০ গ্রাম ছিল, সে জেলায় ৪৫০০ মাত্র গ্রাম থাকিল। লোকাভাবে আবাদের যোগ্য জমী জঙ্গলে পরিণত হইল। হিংস্র জন্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। অনশনের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াও অনেকে বণ্য জন্তুর উদরে প্রবেশ করিল। রক্ষক নাই, ভক্ষক আছে। হতাশ হইয়া প্রজারা চাষ ছাড়িয়া দিল, অনেক প্রজা বাকী খাজনার জন্য নবাবী জেলে গিয়া বাসা করিল। কিন্তু তখনকার কারাগার পৃথিবীর নরক, বায়ুশূন্য সিক্ত

ঘরে অর্দ্ধাশনে অনেক কয়েদী আর বাহিরের আলোক দেখিতে পাইল না।

দুর্ভিক্ষের কথা, রাজস্বের অবস্থার কথা বিলাতে পৌঁছিল। কোম্পানীর ডিরেক্টারেরা চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, উপযুক্ত ভাবে শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য না করিলে, রাজ্য রক্ষা দূরের কথা, কোম্পানী নিজেই দেউলিয়া হইয়া পড়িবে। তাঁহারা ওয়ারেন্ হেষ্টিং নামক এক কর্ম্মঠ বুদ্ধিমান কর্ম্মচারীকে বাংলার বড় সাহেব নিযুক্ত করিলেন। এদিকে বিলাতের রাজার মন্ত্রীরা এত লোকের জীবন মরণের ভার সদাগর কোম্পানীর হাতে সম্পূর্ণরূপে ফেলিয়া রাখা অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। বিলাতের মহা সভায় আইন পাশ হইল। রাজার মন্ত্রীরা কোম্পানীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ কবিতে আরম্ভ করিলেন। হেষ্টিংসের উপাধি হইল গভর্ণর। কোম্পানীর চাকর হইলেও নিজ কার্য্যের জন্য রাজার নিকটও দায়ী রহিলেন। ১৭৭২ খ্রীঃ হেষ্টিংস সাহেব বাংলার গভর্ণর হইলেন, ইংলণ্ডের সহিত বাংলার রাজনৈতিক সংশ্রব আরম্ভ হইল

শ্রীসুরেন রায়

বিদায়-আশীর্ব্বাদ।

(পুরাতন বর্ষের উক্তি)

বিদায়, যেতেছি আমি,
এস নব বরষ-দেবতা;
কি উদ্দেশ্যে, কিবা কার্য্য,
আমাদের বিরাজে একতা।
সঙ্কল্প করেছি যাহা
হয় নাই এখনো সাধন;
নব বর্ষ হোতা রূপে
করিবে সে যজ্ঞ উদ্‌যাপন।

২

আমার মমতা স্নেহ
উপেক্ষায় ভুলে থাক যদি;
নব বর্ষ স্বস্তি দানে
সে স্মৃতি জাগাবে নিরবধি।
করেছি যে বীজ মন্ত্র
তোমাদের হৃদয়ে রোপণ,
ফলিবে সুকর্ম্ম ফল
পেয়ে নব বর্ষের সেচন।

৩

কত পুণ্যময় দিন
করিয়াছি আনন্দে উজ্জ্বল,
ক্ষেমে প্রেমে সে আনন্দ
নব বর্ষ রাখিবে অটল।
যদি পীড়া দিয়ে থাকি
ক্ষুব্ধ করে থাকি দুশ্চিন্তায়,
নব বর্ষ করিবেতো
পরিণত শান্তি সাধনায়।

৪

দিয়েছি বিগ্রহ যেথা
সেই খানে নববর্ষ আসি,
স্থাপিবে বিজয় কেতু
ধর্ম্মের গৌরব প্রকাশি।
স্বাচ্ছন্দ্য সম্পদ সুখ
সুনীতি যা করেছি প্রদান,
তাদের নিষ্কাম কর্ম্মে
নববর্ষ বাড়াবে সম্মান।

দিছি সেবাব্রত স্বাস্থ্য
শিখায়েছি তত্ত্ব ও কৌশল,
নববর্ষ-প্রতিভায়
হোক্ তারা মহত্ত্বে উজ্জ্বল।
ভুল ভ্রান্তি বশে যদি
শঙ্কায় হৃদয় থাকে ভরি,
অনুতাপ অশ্রুপাতে
নববর্ষ দিবে ধৌত করি।

৬

মিথ্যা বলি ভেঙ্গেছি যা
তোমাদের আদর্শ প্রতিমা,
নববর্ষ দিবে তথা
ধ্রুবজ্ঞান বিশ্বাস মহিমা।
যদি লুব্ধ করে থাকি
করিবেন সে পাপ হরণ,
নববর্ষ পুণ্যফলে
দয়াময় দেব নারায়ণ।

৭

আমা হ'তে তোমাদের
প্রিয়জন হোক্ নববর্ষ,
ঘুচায়ে আমার ত্রুটি
সিদ্ধি দিন সাধিয়া উৎকর্ষ।
তোমাদের অনুরাগে
আমার এ মুকুট উজ্জ্বল,
দিনু নববর্ষ শিরে ;—
বিদায় ফলুক্ শুভ ফল।

শ্রীরসময় লাহা।

কেদার-প্রসন্ন।

জন্ম—১২৭১ সাল ২১শে পৌষ। বাহাদুরী সনদ-লাভ ১৮৫৮ ইং। মৃত্যু—১৩২২, ১৫ই ফাল্গুন, রবিবার।

মানুষ মরে—সে মরণশীল পদার্থ, এ সব ন্যায়ের অথবা অন্যায়ের কূট প্রশ্ন তুলিয়া কেতাব বড় করিয়া আপাততঃ কোন ফল দেখিতেছি না। তবে 'ধ্রুবোজন্ম মৃতস্য চ'- ভারতের এই বাণীটির সার্থকতা আছে বলিয়াই তাহার আলোচনা চাই। মৃতের জন্মান্তর আছে কিনা, আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন কি না, পণ্ডিতের তর্কের বিষয়,—সাধারণ চক্ষুতে অত্যন্ত সহজ ভাবে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মরিলেই ইহলোকের সঙ্গে তাহার সমস্ত যোগ-বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইতেছে না, মরিলেই তাহার সব ফুরাইয়া গেল না; এবং কীর্ত্তিতে স্মৃতিতে, শ্রাদ্ধে তর্পণে—তাহার আধিভৌতিক দেহের অতিরিক্ত এমন একটা কিছু পৃথিবীতে থাকিয়া যায়, যাহার সঙ্গেই মানুষের অর্দ্ধেকেরও বেশী প্রয়োজন আছে; —অনিত্য জগতে নিত্য বস্তুই সেইটুকু দিগন্ত-বিধৌত পার্থিব অসত্য-তরঙ্গের মর্ম্মবাহী সত্যের শীতলতাও ঐ খানেই। তবে, মানুষের মত মানুষ হইয়া মরিবার মত মরিতে পারিলেই তিনি চারিযুগ অমর হইয়া, এমন করিয়া বাঁচিবার মত বাঁচিয়া থাকেন যে, হাজার হাজার লোক ভব-সমুদ্র পার হইয়া গেলেও, তাঁহাকে জাতি খোয়াইতে হয় না; এ পার ওপার, দুই পার হইতেই তিনি পঁক্তির নিমন্ত্রণ পাইয়া থাকেন। এইরূপ মহাত্মাদের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল, কে বলে

মহান্ আত্মা তাঁহাকেই বলিতে চাই, প্রকৃতি যাঁহার হাতে সাধারণ জীবের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করিবার ক্ষমতা, সুযোগ ও প্রবৃত্তি দিয়া দিয়াছেন। সত্য, এ অতীব স্পষ্ট কথাই যে, সেই দৈবপ্রাপ্ত ক্ষমতাদি-রত্ন-ত্রয়ের অপব্যয়েও অনেকের ভাণ্ডার শূন্য হইয়া, যাইবার কালে তাঁহাকে একেবারেই নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। 'তং জনম সত্যসন্ধং' সেই অসত্যকে, ভগবতি বসুন্ধরে! 'কথং বহসি'?--ঋষি কহিয়াছেন, কেন তোমার ভার স্বরূপে বহন করিতেছ? আবার, 'যথার্থ যে দাতা আপনি নামিয়া আসে দান রূপে দরিদ্রের পানে ভূমিতলে'।—সুতরাং ইহাই কি ঠিক নহে যে, অকৃত্রিম সত্যটুকুই যিনি, তাঁর হয় মরণ নাই, নয় 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' ব্যাপারের মধ্যে সব ফুরানের লীলাই মোটে নাই? তাই গীতাকার বলিতেছেন, 'ধ্রুবোর্জ্জন্ম মৃতস্য চ'।—তিনি ফেরেন!—অহরহ ফেরেন!—ইহলোকের মনোজগতে, সেই সত্যেরই আত্মিক দেহ বড়ই সূক্ষ্মভাবে মানবের হিতে ও প্রয়োজনে খাটিবার নিমিত্তই বারে বারে ফিরিয়া ফিরিয়া আসেন। অতএব সেই মহা-হিত-সাধকের কথালোচনা নিতান্ত অহৈতুক ছেলে খেলা না হইতেও পারে।

স্বর্গীয় কেদারপ্রসন্ন প্রকৃতি-মাতার কি দান লাভ করিয়াছিলেন. বাহির হইতে ভিতরের সে খবর জানা না থাকিলেও, চরিত্রালোচনায় কিছু বাহির হইবেই, এই ভরসায় অগ্রসর হইতেছি।

ভদ্রলোক শৈশবে অতি মনোরম কান্তি-বিশিষ্ট ছিলেন। গতিকেই পল্লী জমিদারের একমাত্র পুত্র বলিয়া—চাটুকার ও স্নেহবৎসল সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে তাঁহাকে সমধারায় আদর পাইতে হইত; পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের ত কথাই নাই। তথাপি, আজ বৃদ্ধগণের মুখে শুনা যায়, কেদারপ্রসন্নের স্বভাবের মধ্যে এমন একটা শান্তির আগুন লুক্কায়িত ছিল, যাহা সর্ব্ববিধ মন্দ হইতে তাঁহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া রাখিয়া, আলালের ঘরের দুলাল হওয়া হইতে অনায়াসে তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিত। 'জীবে দয়া' মহামন্ত্র তাঁহাকে কাণে কে দিয়াছিল, ঠিক নাই—কিন্তু শৈশবাবধিই করুণার স্বতঃ আবেগে তাঁহাকে অনেকেই অশ্রুপাত করিতে দেখিয়াছে। দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

গ্রাম্য স্কুলেই তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ হয়। সেকালে, অন্ততঃ এতদঞ্চলে, বিদ্যালয়ে ছবি আঁকা গুরুতর অপরাধজনক কার্য্য ছিল। ৺ কেদারপ্রসন্নের সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ সুরু হয় এখানেই। কারণ তিনি আবহমান কাল শিল্প প্রিয়; তা' যে কোন শিল্পই হউক। লুকাইয়া শ্লেটে ছবি আঁকিয়া ধরা পড়িয়া পণ্ডিতের নিকট শাস্তিলাভ করিয়াছেনও বহুবার; কিন্তু শাস্তির ছাই দিয়া বালকের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ সত্যাগ্নি বেশী ক্ষণ আবৃত থাকিতেই পারে নাই। ঘটনাক্রমে ইহাঁকে পিতার সহিত কাশীধামের বাড়ীতে এই সময় চলিয়া যাইতে হয়। নবযুগের সমীরণ তখন দিগন্তে দিগন্তে শিব-বার্ত্তা প্রেরণ করিতেছে। মহানুভব পিতা পুত্রের যথার্থ কল্যাণ কামনায় একজন সৎপুত্রের হস্তে কেদারপ্রসন্নকে সমর্পণ করেন। বিদ্যালয় হইতে বাহিরের আলোকে আসিয়া বালক মুক্ত বায়ুতে স্বীয় অধিকারোচিত স্বাস্থ্যপূর্ণ যে শিক্ষা-

লাভ করিয়াছিল, আজকাল কোন কোন সংসার-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহার উপরেই বেশী আস্থা স্থাপন করিতেছেন, দেখা যাইতেছে। এই কালেই তিনি উর্দ্দু-সাহিত্যে সুন্দর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ণ যৌবনে তিনি অনাথ হন। অনুধ্যানশীল কল্পনা-প্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এ সংবাদে শিহরিয়া উঠিতে পারেন। যৌবন, ধন সম্পত্তি, প্রভুত্ব এবং অবিবেকতা—ইহাদের একৈকম্ অপি অনর্থায় ; সেখানে চারিটীরই সমন্বয় কি ভীষণ! কিন্তু শিবের ত্রিশূলের বরাবর বরাভয় যে চিত্ত-দেশকে ভরসা-সাহস দিয়া আসিতেছে, সেই ত আসল কাশী ;—ভূমিকম্পে তাহা কাঁপিবে কেন? কেদারপ্রসন্নকে তাই কেহ টলিতে দেখে নাই। তিনি ঐ চারিটী বিষের সংমিশ্রণে আপনার চরিত্রের সাহায্যে এমন একটা অমৃত সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, তাহাই সেবন করিয়া আজ পর্য্যন্ত দাতব্য-চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, কূপ ও দীর্ঘিকাদি রাস্তা-ঘাট এবং পাঠমন্দির প্রভৃতি জীব-হিত-সাধনে সমর্থ ও প্রস্তুত হইয়া আছে।

পিতার অভাবে অবিভাবকের অভাব অনুভব করিবার পর পরই তিনি লাটের খাজনার প্রত্যেক কিস্তীর চালান রওনা হইবার সময় বুঝিয়া, সদর কাছারীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সুমার-বহী সমেত খাজাঞ্চী, সুমারনবীশ ও দেওয়ানকে তলব করিতেন। প্রত্যেক আবশ্যকীয় কাগজ পত্রাদি তন্নতন্ন করিয়া বুঝিয়া লাটের চালান প্রেরণ বাদে আনুমানিক সাংসারিক খরচ রাখিয়া বাকী টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখিতেন। সেই জমা টাকা পরিণামে তিনি কিরূপে উড়াইয়া দিয়াছিলেন, রাজসাহী ধর্ম্মসভার কাগজ হিন্দুরঞ্জিকায় স্মৃতি-আলোড়নে কয়েকটী দফায় তাহার এক তালিকা প্রকাশ করিয়াছি। পিতৃশ্রাদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া—অদ্যকার দিবসের উৎকট শঙ্কট স্বরূপ পণ যৌতুকাদি সহকারে কন্যা পঞ্চকের বিবাহ দানাদি উপলক্ষে কাঙ্গাল গরীবকে ভোজ্য ও অর্থদান, তদ্ভিন্ন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক সূর্য্যগ্রহণ কালীন দরিদ্রদিগকে শীত বস্ত্রাদি-দান, রামপুর-বোয়ালিয়ার ভীষণ অগ্নিদাহ, দুঃস্থের গৃহাদি নির্ম্মাণ কল্পে সাত হাজার টাকা ব্যয়, (জেলার কালেকটর গ্রীনশিল্ড সাহেব এই কর্ম্মের সাক্ষী ছিলেন) দার্জ্জিলিং স্বাস্থ্য-নিবাসদ্বয়ে সাহায্য দান, ১৮৯৭ ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে কতকগুলি অন্নছত্র খুলিয়া দুঃখী কাঙ্গালী ক্ষুধার্ত্তকে আহার দান, রাজসাহী সেরিকল্চার স্কুল-ফণ্ডে এক কালীন ১৫০০০৲ হাজার টাকা সাহায্য প্রদান, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও সম্রাট এডোয়ার্ডের পরলোক গমনে এবং তাঁহার ও বর্ত্তমান সম্রাটের সিংহাসন অধিরোহণ উপলক্ষে সানন্দ সমারোহে গরীবকে অর্থ ও অন্ন বস্ত্রদান—ভাল করিয়া ভাবিলে কিম্বা কাগজ পত্রাদি অনুসন্ধান করিলে এতদনুরূপ প্রচুর মুক্তহস্ততার উল্লেখ করিতে পারা যায়। অনাথ-প্রতিপালন এবং পিতৃমাতৃহীন কুমারীদের বিবাহ-ব্যয় বহন, যে কোন সাধারণ কার্য্যে কেবল মৌখিক নহে, আর্থিক সাহায্যে উৎসাহদান এবং আপন পল্লীর উন্নতি কল্পে যথাসাধ্য সদ্ব্যয় কাশীমপুর-বাসী নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এইগুলী তাঁহার চরিত্রকে শতদলে বিকশিত করিয়া তুলিতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা তিনি কাঙ্গালীকে যেরূপ প্রাণের

সহিত ভালোবাসিতে পারিয়াছিলেন, এমন আর কাহাকেও নহে; তাই, যে কোন উৎসব বা উপলক্ষের অছিলায় তাঁহাদের সম্মুখে নিজের অকৃপণ-হস্তখানি মুক্ত করিয়া ধরিতেন। উত্তমর্ণের বিরোধে কারাগার-প্রবেশোন্মুখ নিরুপায় ঋণীকে ফিরাইয়া, সাহিত্যিককে গ্রন্থ প্রকাশে ও বহুখণ্ড এক সঙ্গে কিনিয়া সহায়তা করিয়া,——

"—ধরার খেলার তরঙ্গ উজায়ে
জীবন-তরণী বাহি'
সে গেছে চলিয়া পার সাগরের আলোক
আলোক কোলে;
আপনার জনে তিতা'য়ে ডুবায়ে নয়ন-
সলিলে, রোলে।"

তবু, তুলসীর দোঁহায় এই শান্তি আছে যে, তুমি এমন কিছু করিয়া চলিয়া গিয়াছ, হে লোকান্তরিত মহাত্মা, যে মহাপ্রস্থান কালে—'তোম্ হাসে জগ রোয়্'।

শত্রুমিত্র বা জাতি বিচারে কেদার-প্রসন্নকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই;—ভাগীরথী-প্রবাহের মত তাঁহার করুণা এমন মধুর বেগবতী ছিল যে, বলিতে গেলে স্তুতির মত শুনাইবে। ইহাঁর আর একটী খাম খেয়ালের কথা শুনিতে পাই—তাহা গুপ্তদান। 'সত্য মিথ্যা জানেন ঈশ্বর'।

কোথাকার এক স্মার্ত্ত পণ্ডিত আসিয়াছিলেন—সে আজ বোধহয় বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে। বার্ষিক-বিদায় গ্রহণই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। নিজের তত্ত্বাবধানে ৺রায় বাহাদুর যমুনা নামধেয় একখানি সুবৃহৎ বজরা নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। একদা সন্ধ্যা-সমাগমে তিনি 'যমুনার' ছাদের উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া চীনা-শিল্পীদের খাটাইতেছিলেন; পার্শ্বে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়াছিলেন সম্মুখে যমুনা-নদী-তীরে প্রজাগণ—দরবার অভিলাষে সম্মিলিত। কেদারপ্রসন্ন তাহাদের অভাব অভিযোগ শুনিতেছিলেন। সন্ধ্যা কালিন্দীর কৃষ্ণ-বসনের অঞ্চলাগ্রভাগ অবলোকন পূর্ব্বক সংস্কারবদ্ধ ব্রাহ্মণ চঞ্চল হইয়া আতিথ্যালয়াভিমুখে গমনাকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইতেছিলেন, জমিদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা চলেছেন?" স্পষ্টবক্তা স্মার্ত্ত উত্তর করিলেন,—"আহ্নিক-কৃত্যাদি সমাপনে; কিন্তু ব্রাহ্মণ-জমিদারের মুখে এ কি প্রশ্ন?—আপনি বুঝি সন্ধ্যাহ্নিক—" এবং প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইলেন,—"না; নীরবে অন্ধকারে একেলা বসিয়া সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ-কৃত্যকে সন্ধ্যাহ্নিক বলিতেছেন ত?—" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হাঁ, করিলে নিজের একটু কাজ হয় বৈ কি!" কেদার-প্রসন্নের স্মিত-গম্ভীর নেত্রপত্র. এবার ফিরিয়া একবার কিয়ৎকাল ঐ আবেদক প্রজামণ্ডলীর প্রতি স্থির হইয়া রহিল। পরক্ষণেই হাস্যাননে ফিরিয়া পুনরায় স্মৃতির পণ্ডিতকে সবিনয়েই কহিলেন—"শাস্ত্রের মতে যাহাই হউক, আমার নিজের মতে, পণ্ডিত মহাশয়, আপন কাজ অপেক্ষা পরের কাজেরই দাম বেশী; পণ্ডিতকেই স্বার্থপর বৈষয়িক আমরা মূল্যবান পরচর্চ্চার উপরেই একটু বেশী প্রাণের টান অনুভব করি। নহিলে আপনাকেও পাইতাম না এবং উপস্থিত প্রজাদের এই কলরব-মধু পান করাও অদৃষ্টে ঘটিত না। সন্ধ্যাকৃত্য অপেক্ষা বিশ্বের নিমিত্ত কর্ত্তব্যপালনেই দেখিতেছি, সদ্য-সদ্য সুখানুভূতি লাভ হয়। হাতে হাতে লাভ কে ছাড়িতে চায় বলুন।"

পরলোক-গমনের কয়েক মাস পূর্ব্বে হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে, ভিতরে ভিতরে অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিতে-

ছিল। চেহারার পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার প্রজাগণ প্রস্তাব করিয়াছিল যে, তাহারাই যে কোন উপায়ে সাহ্লাদে খরচা জোগাইবে—তিনি যাইয়া কাশীবাস করুন। বুদ্ধিমান শুনিয়া হাসিলেন; এবং উত্তর করিলেন, "তোমাদের মুখ-দর্শনই আমার কাশীর বিশ্বনাথ-দর্শন;—পিতা মাতার পদধূলি, নিজের সূতিকা-গৃহ ও আশৈশবের স্মৃতিপূর্ণ এই আমার আবাস পল্লী ভিন্ন পৃথক কোন কাশী লাভ আমার আরামের নহে।"

প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের সময় সেবার রাজসাহীতে একদা অপরাহ্নে বৈঠকখানার পাঠ-প্রকোষ্ঠে তিনি আপন পছন্দানুযায়ী পুরাতন বোয়ালিয়া লাইব্রেরির যে মূল্যবান গ্রন্থগুলি খরিদ করিয়া লইয়া বর্ত্তমান রাজসাহী পাবলিক্ লাইব্রেরি স্থাপনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই গুলি কিরূপ কায়দায় গুছাইয়া রাখিলে সুবিধা হইতে পারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সহরের জনৈক খ্যাতনামা ভদ্রব্যক্তি এই জমিদার সন্তানকে উচ্ছন্নের পথে পরিচালিত করিবেন ও তৎসঙ্গে নিজেও একটু হাসিয়া লইবেন 'দুদিন বইতো নয়'রে সুধাময় হাসি'—এইরূপ মনস্থ করিয়া কিছুদিন হইতে কেদারপ্রসন্নের অকৃত্রিম বন্ধু শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর তখনই বা তাহার একটু পূর্ব্বেই বুঝি—দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা করিয়া কেবল প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বলিলেন—"আজিকার খাটনীতে নিরানন্দের ভাগই বেশী হে, সুদূর গ্রাম হইতে কয়েক জন ক্ষুধার্ত্তের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছি। খাটিয়া যদি বাঁচাইয়া তুলিতেই না পারিলাম—তাহা হইলে মুজরী পোষাইল কৈ?" মস্তকের প্রবল আন্দোলনে এই স্তুতিবিদ্ বন্ধু 'বটেইতো বটেইতো' শব্দে সম্মতিদান করিয়া এই উত্তম সুযোগে প্রস্তাব করিলেন—'বিলাতী বিজ্ঞান নিরানন্দের ত চমৎকার ঔষধ তৈয়ারী করিয়াছে, অতি মাত্রায় শ্রান্ত হইলে অল্প মাত্রায়" চতুর এই ধনী-সন্তান তাঁহার বাক্যে বাধা দিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব করিলেন—"ঠিক কথা মনে করিয়াছ ভাই, কিছু কিঞ্চিৎ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ কি?—নয় ত গোটা পাঁচেক টাকা বাহির কর—সুন্দর অল্প মাত্রারই একটা ছোটখাট আনাইয়া লই।" মুখে মুখে চূণ পাইয়াও জোঁকের মত অকৃত্রিম বন্ধুটী দমিলেন না, বরং পল্লীরাজের হস্তস্থিত কাগজখানির প্রতি শ্যেন দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "উপস্থিত ঐ দশ টাকার নোটটাই কাজ ত এখনকার মতে চালাইয়া আসুক;—তুমি থাকিতে আমি! তা' গরীবের প্রতি এ অত্যাচার যদি তুমি করই, সে—'আজি নহে বঁধু কালি হবে'।" প্রত্যুত্তরে কেদারপ্রসন্ন বৈঠকখানার বাহিরে চাহিয়া বলিলেন—"ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদীয় বিজ্ঞান কি বলিতেছে, চাহিয়া দেখ। অন্নছত্রের জন্য ঐযে কয়েক গাড়ী চাউল আসিয়াছে এই নোটে ঐ গুলির মূল্য দিয়া, চল ঐ চাউল চোলাই করিয়া বুভুক্ষিতের প্রাণের তৃপ্তিই আজিকার মত পান করা যাউক।" বন্ধু অগত্যা ক্ষান্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বসা-বৃদ্ধি রোগে প্রৌঢ়কালেই ইনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন এবং এতদ্রূপে অতি শীঘ্রই কর্ম্মে অপটু হইয়া উঠিয়াছিলেন। সিভিল্ সার্জ্জনের পরামর্শে যেদিন বুঝিলেন, তাঁহাকে প্রত্যহ সিকি গ্রেন্ মাত্রায় মর্ফিয়া ব্যবহার করিতে হইবে, বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে, সেদিন তিনি অশ্রু-

রাজসাহী কাশিমপুরের জমিদার

স্বর্গীয় রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর।

জন্ম—১২৭১। ২১ পৌষ। মঙ্গলবার।   মৃত্যু—১৩২২। ১৫ ফাল্গুন। রবিবার।

'রায়বাহাদুর' সনদ-প্রাপ্তি—১৮৯৮। ১ জানুয়ারী।

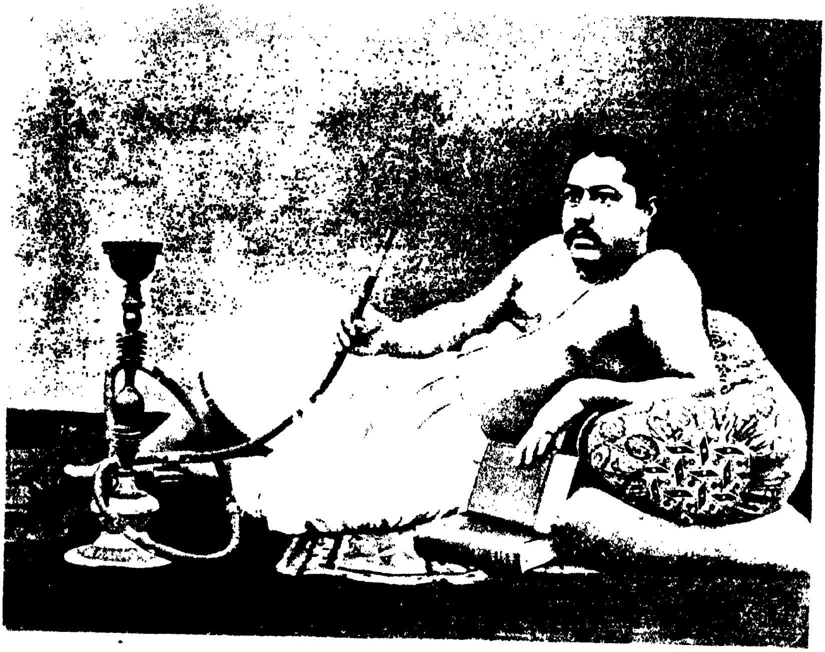

"সে গেছে চলিয়া পার সাগরের অলোক আলোর মাঝে,
আপনার জনে তিতা'য়ে ডুবা'য়ে নয়ন-সলিলে, রোলে।"

U. RAY & SONS. CALCUTTA

পাত করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিংয়ে সেবার ভার্ম্মাটাইটিসের যন্ত্রণা ভোগকালে একদিন তথাকার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বি, সরকার মহাশয়কে আহ্বান করেন। তখন ডাক্তার সরকার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সরলভাবে তাঁহাকে বলিতে হইবে, তিনি কোন প্রকার মাদক সেবনে অভ্যস্থ কি না। উচিতবক্তা কেদারপ্রসন্ন লজ্জায় বহুক্ষণ নীরব ছিলেন। ইহা লেখকের প্রত্যক্ষ ঘটনা।

কেহ কখন কদাচিৎ তাঁহার অপব্যয় লক্ষ্য করিতে পারিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সাংসারিক অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদানকালে এতদ্বাক্যের সাদৃশ্য উল্লেখ করা হইয়াছে।

তিনি আত্মীয় স্বজন ও নিজ গ্রামের উজ্জ্বল নামকে এতই বেশী ভালবাসিতেন, অন্য কেহ তত করে কিনা, সন্দেহ। মানুষ মাত্রেরই অপরাধ ক্ষমা করিতে তাঁহার যে প্রকার অসাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সংহিতা বা দণ্ডবিধি আইনের চক্ষুতে সে ক্ষমা সম্ভবতঃ দোষাবহরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কি দয়া, আর কি করুণা, অশ্রু-পরিপূরিত কি প্রভূত পরিমাণ সকরুণ ক্রন্দন যে তাঁহার বুকের মধ্যে লুকাইয়া লুকাইয়া সঞ্চিত ছিল এবং ক্রমে ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল—মাঝে মাঝে উদাহরণ মাত্রই তাহা লক্ষ্য করিতে পারা গিয়াছে, কিন্তু অবিকলভাবে প্রকাশ করা নিতান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

বিষয় সম্পত্তি লইয়া কাহারও সহিত তাঁহার কিছু কিছু মনোমালিন্য থাকিলেও স্বর্গীয় কেদারপ্রসন্নের সৌম্য ব্যক্তিত্বের প্রতি কোন লোকেরই বহিরান্তরিক অশ্রদ্ধার ভাব ছিল না, মৃত্যুর পরে কতিপয় ঘটনায় তাহা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। আবার, উনিও সেরূপ ক্ষেত্রে কোন মাননীয়কে মান্য দান ও প্রেমাস্পদকে প্রেম এবং স্নেহানুগতকে স্নেহ-বিতরণে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য।

তাঁহার করুণা-প্রসঙ্গে একটু বলিতে ভুলিয়াছি। এই ভদ্রলোক নিজে গোঁড়ামিকে পছন্দই করিতেন না। কেহ কেহ গোঁড়ামী সম্বন্ধে তর্কালোচনা কালে যদি বলিত, গোঁড়ামী প্রাচীন আচার পদ্ধতির একটা স্মৃতি রক্ষা মনে করিয়া পালন করিতে হানি কি? তাঁহার জবাব ছিল, "হাঁ, বাড়ীতে ও কাশীতে পিতার স্থাপিত বিগ্রহাদির সহিত পঞ্জিকার প্রত্যেক পার্ব্বণ ও পূজাকে সাহঙ্কারে অবহেলা না করিয়া যথোচিত বিধানে তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতে কখনই আপত্তি করি নাই! কিন্তু স্বাধীনচিত্তে এবং সে চিত্ত যখন আমারই—তখন আমি কেন আমার বিবেকানুযায়ী উদার সত্যকে নিজের একটা ideal না রাখিয়া যাইব। রক্ত মাংসের শরীর লইয়া মানুষই ত আমি বটে, এই মহৎ লোভ ত্যাগ করিব কি লোভে?"—এই কারণেই ইনি প্রাণের শুভ্র প্রেমোৎসর্গের বেলা আর জাতি বিচার স্থির রাখিতে পারিতেন না। বুঝি প্রাণের ভিতর হইতে এক অজানা মানসী-বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের সেই মহা হরিবোল বাণী উচ্চারণ করিয়া, বৃহত্তম জনসমাজের প্রভূততম হিতসাধনের অতিরিক্ত একটা করুণা-প্রফুল্ল আলিঙ্গন প্রয়াসে, বক্ষের ও চক্ষের অশ্রু ও স্বেদ-বারি-প্রবাহমুক্তায়িত নীহারের মত সমবেদনার একখানি গঙ্গাপ্রতিমা ভাসিয়া বাহির হইত। জীবনের শেষ দশায় ইনি, সমাজ যাহাকে

নিত্য দুইবেলা চোখ রাঙ্গাইয়া বলিতেছে, ওরে তুই পতিত, ইতর. তাহাদের জমি-জমাঘটিত অংশ বিভাগের জন্য আবেদন মাত্রে নিজ হইতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রওনা হইতেন, সেই ধীবরদের পাড়ায় এবং চণ্ডালকে ক্ষৌরী করিয়া যে নাপিত সমাজে একঘ'রে হইয়া আছে, তাহাকে নিরপরাধে সামাজিক দণ্ডভোগ হইতে অব্যাহতি দানের জন্য দৃঢ়সংস্কারাবদ্ধ সমাজের বিরুদ্ধে তাঁহাকে কি বিপুলায়তন অভিমান প্রস্তুত করিতে হইতেছিল, আহা, বিধাতার মত বুঝি অন্যরূপ, তাই ৺কেদারপ্রসন্ন এই অভিশপ্ত অহল্যাসমাজকে পরিত্যাগ করিয়া ঋষি-গৌতমের মতই শিবতম কৈলাসের ঊর্দ্ধদেশে মহাপ্রয়ান করিলেন। তাঁহার প্রজাদের মধ্যে দুইজন নাপিত সন্তানকে তিনি নিজে অন্ন ও অর্থ দান করিয়া উচ্চ শিক্ষাদানে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, তিনজন মুসলমান প্রজাবালককেও, শিক্ষা দিয়াছেন। ধনী হইতে কাঙ্গাল অন্ধ আতুরাদির প্রতিই সহানুভূতি তাঁহার অতীব প্রবল ছিল, তিনমাস পূর্ব্বকার একটী ঘটনায় তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা গিয়াছিল। তাঁহার সমবয়সী জনৈক কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত মুসলমান-প্রজা নিজ জীবনের আশঙ্কায় তাহার রাজ দর্শনে আসিয়াছিল। দেখা হওয়া মাত্র উভয়ের সেই হাহাকার দৃশ্য যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা কেহই নয়নের বারি নয়নে নিবারণ করিতে পারে নাই। তিনিও সম্ভবতঃ তখন হইতেই ভিতরে ভিতরে আপনার অন্তিম যে অদূরে, তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ হাহারব করিয়া উঠিয়াছিলেন। সেই দিনকার আলিঙ্গনলব্ধ প্রেমময় সমাদরে পরিপূর্ণ রাজভোগে আপ্যায়িত মুসলমান, অদ্যাবধি জীবিত রহিয়াছে—মনে মনে কি তাহার ক্রন্দন রোলে এ গান ভরিয়া উঠিতেছে না যে, 'আমিই শুধু রইনু বাকী'?

বেশী কথা আর বলিবার নাই। তাঁহার সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা অত্যল্পই। শেষ জীবনে তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল, দার্জিলিংয়ে—সে এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির আদর্শানুযায়ী গঠিত-জীবন কেদারপ্রসন্নের একেবারে নগ্নশিশু মূর্ত্তিখানি। তিনি Rickshaw খানার আগে আগে হাঁটিয়া হাঁটিয়া পাহাড়ের ইতস্ততঃ বেড়াইতেন এবং হিন্দু মুসলমান, পাহাড়ী, এদেশীয় অথবা ইউরোপীয়, ছোট ছোট ছেলেদের কাহাকেও নৌরঙ্গীটী, কাহাকেও নাসপাতি পেয়ারাটী, আবার কাহারও হাতে chocolateএর টিন্‌টী, সংগ্রহ করিয়া তুলিয়া দিতেছেন। শুধু তুলিয়া দিয়া—দান করিয়াই তৃপ্তি নাই, টিন্ খুলিয়া ফল ছাড়াইয়া নিজ হাতে তাহাদের যখন খাওয়াইয়া দিতেন, —প্রাচীন বাঙ্গালা কবির চক্ষু থাকিলে সেই সময় তাঁহার বাহিরকে অবলম্বন পূর্ব্বক ভিতরে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত সেই—'বনের ফল বড় মিষ্টি ও ভাই কানাই একটা খা' না' 'ক্ষীরসর ননী খাওরে নীলমণি' প্রভৃতির ভাবরূপী ব্রজের রাখাল নিত্য গোপালের শিশুরূপ সাকারে তাঁহার অন্তরে নাচিয়া নাচিয়া লীলার নাচন নাচিতেছে! —সেই নিজের হাতে দোকান হইতে জামা জোড়া পোষাক পরিচ্ছদ কিনিয়া আনিয়া ছেলেদের পরাইয়া দিয়া তাহাদিগের বিস্ময়-বিস্ফারিত প্রফুল্লাননের দিকে পুলকিত নেত্রে চাহিয়া আছেন—তাঁহার সেই সময়কার সেই যশোদা মূর্ত্তি যে দর্শন করিয়াছে, সে ভাগবত পাঠ করিয়াছে। শিশুর

মতনটী হইয়া শিশুর সঙ্গে খেলা করিবার ক্ষমতা-লাভ করা কম ভাগ্যের কথা নয়—ভাবিয়া বুঝিতে হয়।

ভদ্র সন্তানের জীবনে সাহিত্যেরও একটা স্থান ছিল, অত্র প্রবন্ধের প্রথমে তাহা নাম মাত্র তুইবার উল্লেখ করা হইয়াছে। কথাটা আরও এক আধটুকু খোলসা বলা প্রয়োজন এই হিসাবে যে, তাঁহার জীবনের সাত আনা সাড়ে সাত আনা অংশই সাহিত্যের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্বন্ধ ছিল। জিনিসটীকে তিনি এতই ভালবাসিতেন।

পাহাড়ে কয়েক মাস, মহাত্মা কেদার-প্রসন্নকে কেহ আলস্যে কালক্ষেপ করিতে দেখে নাই। তুই প্রহরের নিদ্রাসুখে ইহাঁকে বীতস্পৃহ দেখা গিয়াছে। অজস্র অর্থব্যয়ে তিনি নানাবিধ বই, মাসিক পত্রিকা, সংবাদ-পত্র সমূহ কিনিয়া নিয়মিত ভাবে সেগুলির প্রতি লাইন পড়িয়া শেষ করিয়া তবে নিরস্ত হইতেন। নব্যভারতের দিকে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। নবাগত পত্রাদি পাঠের পূর্ব্বে নব্য-ভারত খুলিয়া তাঁহার রুচি অনুযায়ী প্রবন্ধগুলি চোখ বুলাইয়া একটু দেখিয়া—নির্ব্বাচন করিয়া রাখিতেন। বিজ্ঞ সাহিত্যিকগণের সঙ্গে উচ্চ বিষয়ে সদালাপ তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রীতিকর কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। একটা কথা মনে পড়ে। প্রবন্ধ-লেখক একদা তাঁহার বৈঠক-খানায় পৃথিবীর ইতিহাস-সঙ্কলয়িতার সঙ্গে সাহিত্যের আলোচনা করিতেছিল, রায়-বাহাতুর সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা লাহিড়ী মহাশয়, জীবন-সৃষ্টির মূলে আমি যদি বলি মাত্র accidentই ছিল, আপনারা কি যুক্তিযুক্ত কোন কারণ খাড়া করিয়া সে মত খণ্ডন করিতে আসিবেন?"—বহুক্ষণ আলোচনা গল। 'আমি শুধু বসে আছি চুপ'—প্রবন্ধ-লেখক এককোণে নীরবে আলোচনা শুনিতে-ছিল এবং মনে মনে নিজেকে বিচারকের আসন দান করিয়া বিচার কার্য্যও সম্পন্ন করিতেছিল। তবে গভীর পরিতাপের বিষয়, অভিমন্যুর মত শুধু আলোচনাই শোনা গেল, কিন্তু মীমাংসার নিগম তত্ত্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদের কথোপকথন পৌছাইতে পারে নাই; কারণ সহসা আবেদনকারী প্রজাগণের আবির্ভাবে কেদারপ্রসন্নকে অন্যপথে ব্যস্ত লইয়া উঠিতে হইয়াছিল।

জনৈক প্রসিদ্ধ দরিদ্র সাহিত্যসেবী াহার একখানি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণার্থে রায় বাহাতুরের সাহায্য ভিক্ষায় আগমন করেন। তিনি সংবাদ লইলেন, গ্রন্থকার বহু আয়াসে তিন সহস্র পুস্তকের মধ্যে সাত বছর পূর্ব্বে সত্তর খানা বই ব্যতীত আর যে সমগ্র বিক্রয় করিয়াছিলেন, নানাবিধ সাংসারিক তুর্ব্বিপাক বশতঃ তদর্থের প্রায় টাকাই নিঃশেষিত হইয়াছে,—তবে উপস্থিত শ দেড়েক টাকা হাতে পাইলেই দ্বিতীয় মুদ্রণ-কার্য্যারম্ভ করাইয়া দিতে পারেন। তারপর অর্থাৎ ঐ সাত বৎসরের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত উক্ত ৭০ খানার একখানিও বিক্রয় করিতে পারিতেছেন না। এইবার কেদার-প্রসন্ন টলিলেন। একশত মুদ্রার সমস্ত পুস্তক ক্রয় করিলেন। বয়োবৃদ্ধ গ্রন্থকার আশীর্ব্বাদ করিয়া বাসায় ফিরিলেন। পরদিবস প্রভাতে পুনরায় বৃদ্ধকে ডাকাইয়া আনিয়া তিনি বলিলেন, রাত্রে রুদ্ধ-শ্বাসে তাঁহার গ্রন্থ পড়া সারা হইয়াছে, কিন্তু যেহেতু উক্ত মূল্যবান পুস্তকের পাঠক তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের ভিতর আনুমানিক ত্রিশ জনের

বেশী হইবে না, সুতরাং অনর্থক পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিয়া ফল কি, বরং বাকী ঐ ৫০ খানা বই তিনি ফিরাইয়া লউন।' বৃদ্ধ গ্রন্থকার থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন—মুখ শুকাইয়া গেল। বলিলেন—"কিন্তু রাত্রেই যে কলিকাতাগামী লোক মারফতে ঐ টাকা পাঠাইয়া দিয়া খরচ করিয়া ফেলিয়াছি।" হাস্যাধরে জমিদার বলিলেন—"তাহাতে কি হইয়াছে, খরচ আপনিও করিয়া সারিয়াছেন এবং আমিও করিয়া সারিয়াছি তহবিলের ক্ষত আপনার কাব্যের রস-সুধায় আরোগ্য হইবে, উদ্গীর্ণ অর্থ পুনরায় উদরসাৎ করিয়া নহে মহাশয়। বাকী পঞ্চাশ খানা আপনি পুনর্ব্বিক্রয়ের চেষ্টা করুন। আপনার যে কোন লেখা আমাকে ভবিষ্যতে পড়িতে দিবেন—মাত্র এই দাবী করিয়া রাখিলাম।" তিনি যদিও কিছু লিখিয়া রাখিয়া যান নাই—তথাপি চিঠি পত্রের ভিতর তাঁহার রচনা-প্রণালীর সৌন্দর্য্য চোদ্দ আনাই পরিলক্ষিত হইত। বড় বড় ইংরাজী চিঠি নিজে হাতে রচনা করিতেন; তাহাতে তাঁহার ইংরাজী ভাষার অধিকার সম্বন্ধে সুধারণাই লোকে করিয়া থাকে। কতিপয় পুস্তকের প্রশংসা-লিপি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে, তাঁহার গ্রন্থ পাঠের সাধারণাতিরিক্ত শক্তি ছিল। পাঠান্তে বইএর বিচার করিতে পারিতেন। গদ্য এবং পদ্য উভয় সাহিত্যই তিনি ভালবাসিতেন—তন্মধ্যে ধর্ম্মসাহিত্য,সামাজিক সাহিত্য তাহার অধিক প্রীতি আকর্ষণ করিত। নাট্যকাব্য বা সাহিত্য অপছন্দ করিতেন না, তবে অভিনয় জিনিসটীর প্রতি রায় বাহাদুরের কিছু অরুচি ছিল বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহার মনের নৈতিক তেজের কথা একটী ছোট ঘটনায় প্রকাশ পাইবে। ডাক্তারদিগের পরামর্শে তাঁহাকে একবার কোন স্বাস্থ্য-কর স্থানে কিছুদিন বাস করিতে হইয়াছিল। বাড়ীটার পাশ কাটাইয়া একটী রাস্তা গিয়াছে। কয়েকটী ভদ্রাঙ্গনা ক্ষীণকায় রুগ্ন এক আত্মীয় বালককে সঙ্গে করিয়া ঐ রাস্তা দিয়া দেবদর্শনে যাইতেছিলেন। তাঁহাদিগের সম্মুখ হইতে কয়েকজন ইউরোপীয় সৈন্য ঘোটকারোহণে চলিয়া আসিতেছিল। দুই প্রহরের নির্জ্জন এই রাস্তার উপরে অসহায়া কুলাঙ্গনাদিগের সহিত সৈন্যগণ একটু রসিকতা করিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারিল না। মহিলারা রাস্তার এক পার্শ্বে সরিয়া গেল ও সৈন্যগণ তাহাদের অশ্বগুলিকে সেই দিকেই পরিচালন করিতে লাগিল। তাহাদের পুনঃপুনঃ এবম্বিধ ব্যবহারে ভীতচিত্তে অঙ্গনাকুল কলরব করিয়া উঠিল। কেদারপ্রসন্নের রোগকাতর দেহের ভিতরেও, তচ্ছ্রবনে, কল্যাণময় শিবের ভৈরবী অনুপ্রেরণা জাগিয়া উঠিল। তিনি অকুতোভয়ে তদবস্থাতেও একেলাই কতকগুলি সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ভদ্রমহিলাদের নিরাপদে গন্তব্যাভিমুখে চলিয়া যাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন; এবং তৎপ্রেরিত সংবাদে পুলিশের আগমন-সম্ভাবনা অনুমানে সৈন্যগণ আর পলমাত্র তথায় বিলম্ব করে নাই।

প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ ইংরাজ-রাজসরকার হইতে লর্ড এলগিনের আমলে ইনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন।

এক্ষণে স্বল্প সুযোগে যে কয়েকটী দফায় স্বর্গীয় রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুরের চরিত্র উল্লেখ করা হইল, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ইনি আমরণ জীবনের

মধ্যে উদার সত্যের একটী সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লাভ করিয়াছিলেন এবং সংকীর্ণতার পরিধি ছিন্ন করিয়া বিবেক-বিচারে অনন্ত চিত্ত-স্বাধীনতার মধ্যে আশ্রম স্থির করিয়াছিলেন। প্রকৃতির দান তিনি পাইয়াছিলেন, লইয়াছিলেন এবং সেইগুলির সদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন। তাই তাঁর—

"বিয়োগ বিধুর প্রীতি,
এ শোক সভার সবার কাতর রোদন
জড়ানো স্মৃতি,—
এই দিয়ে সবে মিলন মাঝে অর্পণ
করিতে চাহি"!

যাঁহারা এতদিন তাঁহার উপর সর্ব্ববিষয়ে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রাতুর অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই জাগিবার সময় আসিয়াছে, কেন না, "কেদার-বাহিনী যমুনা গাহিছে—"কেদার প্রসন্ন নাই।"

কিন্তু যদিও যুক্তিবলে তর্কের নিরসন হইবে, প্রমাণ হইবে মরিলেই সব ফুরায় না, তবু ত মানুষ মানুষকেই চায়! এ কামনার তার যতক্ষণ না ছিঁড়িবে, ততক্ষণ কাহারই সাধ্য নাই, ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিবে, কেননা এ যে Affinity. তাই সেই অজ্ঞেয় ভূমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে চাহি—

'তুমি কেও খেলিছ ছেলে খেলা!
এ যে বড় সুতীব্র,নির্ম্মম কি দুর্ব্বোধ লীলা।"

এবং যখন বুঝি যে উত্তর মিলিলেও উত্তরের আসল তত্ত্বটুকু 'নিহিত গুহায়াম্',তখন শ্মশান হইতে এই কথা চীৎকার করিয়া বলিয়া বাড়ী ফিরি যে, Au revoir! বিদায় হে, আবার দেখা হইবেই! শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়।

সামন্তরাজ স্বর্গীয় সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব।

জন্ম—৩রা মে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ।
স্বর্গারোহণ ১১ই মার্চ্চ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ।

বিধাতার ব্যবস্থায় সকলই সম্ভব, সাহারা সদৃশ মরুভূমি সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ জলাশয়ে পরিণত হওয়াই বল, আর সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ জাহ্নবীস্রোত বালুকাপূর্ণ প্রান্তরে পরিণত হওয়াই বল, সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় হইতে পারে। আবার সেইরূপ বিচিত্র পরিবর্ত্তন সাধন সময়সাপেক্ষও নহে, কাহারও উপরোধ অনুরোধ, অনুনয় বিনয়, কাহারও প্রার্থনা ও আব্‌দার অপেক্ষা করে না, সে মহাশক্তির ইচ্ছামাত্র, তাঁহার ইঙ্গিতে সে কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, তাই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভূমিকম্পে আসামে ব্রহ্মপুত্র নদ বহু স্থানে প্রান্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছে, আর শুষ্ক উচ্চভূমি ভাঙ্গিয়া নদে পরিণত হইয়াছে, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের কত স্থান উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য নর নারী জীবন লীলা সংবরণ করিয়াছে, অধিক কি কেবল মাত্র এগার সেকেণ্ড সময় মধ্যে ভূমিকম্পে একদা পর্টুগালের রাজধানী লিজ্‌বন্ নগর ধূলিরাশিতে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং সে লীলাময়ের লীলায় সকলই সম্ভব, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা, তাই আমরা কত রত্নই ক্রমে ক্রমে বিদায় দিয়া এই মরুপ্রায় সংসারে

জীবন ধারণ করিতেছি। পূর্ব্বতন কালের পুণ্য-স্মৃতির আলোচনা ত্যাগ করিলেও, এই সে দিন যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়কে বিদায় দিয়া অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রমুখ বঙ্গ-সন্তানগণ অশ্রুপাত করিয়াছেন, আজও আমরা সে অভাবের অবসাদে ম্রিয়মাণ, এই সে দিন বিদ্যাসাগর হেন দয়ার অনন্ত প্রবাহকে আমরা জাহ্নবী-প্রবাহে মিশাইয়া দিয়া অশ্রু-সিক্ত হইয়াছি,আজও সে চোখের জল শুকায় নাই। এই সে দিন উড়িষ্যাও ঐরূপ বিবিধ গুণসম্পন্ন বামণ্ডারাজ স্যর বাসুদেব সুঢল দেবকে হারাইয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিয়াছে, তাহাদের সে দুঃখের অবসান হইতে না হইতে, তদীয় গুণবান পুত্র প্রজাবৎসল ও মানব-সুহৃদ্ রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব রাজসিংহাসন শূন্য করিয়া, পুত্রকন্যা ও আত্মীয় স্বজনকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া, কত শত দীন দরিদ্রের অশ্রু প্রবাহিত করিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন!

এ দীন হীন কাঙ্গাল সংসারে কত শত অমূল্য রত্ন হারাইয়া আমরা হাহাকার করিয়াছি, সে সকলের সংখ্যা নাই। আজ আবার আমরা এই একটী মানুষের মত মানুষ হারাইয়া প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বামণ্ডাধিপতি সামন্তরাজ সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব সহসা সন্ন্যাস রোগে বিগত ১১ই মার্চ্চ শনিবার প্রাতঃকালে ৫—৩ পাঁচটা তিন মিনিটের সময়ে লোকলীলা সংবরণ করিয়াছেন। মধ্য প্রদেশের ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যার রাজন্য-সমাজে বামড়া সর্ব্বপ্রকারে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে। টাকায় হউক না হউক, মান মর্য্যাদায় ত বটে। মান মর্য্যাদা, তাই কি যেমন তেমন মানমর্য্যাদা? বামড়া প্রাচীন গঙ্গাবংশীয় রাজা। ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও পূর্ব্বে গঙ্গাবংশীয় শাখা প্রশাখা উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের নানাস্থানে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য করিয়াছেন। বামড়া সেই সকলের অন্যতম।

বর্ত্তমান বাম্ড়ার ইহাই অত্যুত্তম পরিচয় নহে। যে মহাত্মার নাম এই প্রবন্ধে আলোচনার বিষয়ীভূত হইল, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় স্যর বাসুদেব সুঢলদেব বামড়াকে ভারতবিদিত করিয়া গিয়াছেন। বহু বহু বিষয়ের আলোচনা-সংবলিত তাঁহার সুবিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা না বলিয়া কেবলমাত্র দুএকটী কথার আলোচনা আবশ্যক, কারণ তাহা না হইলে, রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের মহত্ত্ব ও পুরুষকারের উত্তম পরিচয় লাভ ঘটিবে না।

যে সকল গুণ থাকিলে রাজা রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে সক্ষম হন, রাজা স্যর বাসুদেবে সেই সকল গুণ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারই জীবিত কাল মধ্যে বামড়ার সামান্য সূচনা তাঁহারই সাধনার ফলে, ফলফুলে সুশোভিত নন্দনকাননে পরিণত হইয়া উড়িষ্যা ও ছত্রিশ গড়ের রাজন্য সমাজে এক নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে। একদিকে অসংখ্য রাজ্যের রাজা ও প্রজামণ্ডলী, অপরদিকে সম্রাটশক্তিসম্পন্ন ইংরাজরাজের প্রধান কর্ম্মচারীদল বৎসরের পর বৎসর বামড়াকে আদর্শ রাজ্য বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। ঐ নিত্যপ্রশংসার গীত ধ্বনি যে সহজেই গীত হইত, তাহা নহে। রাজা স্যর বাসুদেবের রাজ্যপালন পদ্ধতির দোষ ত্রুটি ধরিবার লোকের অভাব ছিল না।

কিন্তু সে নিখুঁত কর্ম্ম নিষ্ঠার নিকট সকল সমালোচনা সর্ব্বদা পরাজয় স্বীকার করিয়া নত মস্তক হইয়াছে। তিনি তাঁহার দীর্ঘকাল-ব্যাপী কার্য্যকলাপের মধ্যে সর্ব্বদাই অজেয় পুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষের সামন্ত নরপতিগণের মধ্যে তাঁহার সাধনার ফলে সম্মানিত রাজাসন যে কত উচ্চে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন ব্যাপার।

রাজা স্যর বাসুদেব নিজে অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন। রাজসম্মান অপেক্ষা পণ্ডিত সম্মান অধিকতর গৌরবজনক মনে করিতেন। দেশবিদেশের মিলিত পণ্ডিতমণ্ডলীর সভায় তাঁহাকে শাস্ত্র বিচারে সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যে, অলঙ্কার ও দর্শনে কেহ কখন পরাস্ত করিতে পারিতেন না। তিনি এরূপ বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। এই রাজা রাজ্যের শতবিধ উন্নতির সাধনা ক্ষেত্রে রাজকুমারগণের সুশিক্ষা বিধানের জন্য তদীয় রাজধানীতে বহু অর্থব্যয়ে এক উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সে বহুদিনের কথা। সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলের রাজাদের রাজ্যের আর কোথাও সেরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহার ব্যবস্থা এত সুন্দর ছিল যে, গভর্ণমেণ্ট বনাই ও পাল্লাহরা প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের রাজকুমারগণের শিক্ষা লাভের জন্য তাঁহাদিগকে বামড়ারাজের তত্ত্বাবধানে তাঁহার নিকট রাখিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

পুত্রগণের সুশিক্ষা বিধানের জন্য বিশেষ ভাবে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র তদানীন্তন যুবরাজ সচ্চিদানন্দের শিক্ষালাভ ও জ্ঞানোন্নতির জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার সে প্রয়াস কেবল ব্যর্থ হয় নাই, তাহা নহে; বহুবিধ গুণে অলঙ্কৃত হইয়া ধীরে ধীরে জীবনের পথে, সঙ্গে সঙ্গে পিতৃত্যক্ত রাজসিংহাসনের গৌরব রক্ষা ও বর্দ্ধনে অগ্রসর হইতেছিলেন। রাজপিতা স্যর বাসুদেব রাজপুত্র সচ্চিদানন্দের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষাবিধানের জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া বহু বহু বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া রাজকুমারের জ্ঞানবৃদ্ধি ও রুচি-প্রবৃত্তির পরিমার্জ্জন প্রভৃতি বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। ক্ষত্রিয় রাজকুমারের শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয়বিধ শিক্ষা লাভের উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্যর বাসুদেব-সুহৃদ্ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্ব্বাচনে বর্ত্তমান সময়ের প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এ মহাশয় রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া সর্ব্ব প্রথম বামড়ায় গমন করেন। পরে ন্যায়রত্ন-নির্ব্বাচিত শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন দাস এম্ এ মহাশয় রাজকুমারদের ও সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বামড়ার রাজধানী দেবগড়ে গমন করেন। ইঁহাদের যত্ন চেষ্টার ফলে ও শিক্ষা দান পদ্ধতির গুণে, রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব ইংরাজী বিদ্যায় উত্তম পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। যেমন ইংরাজীতে তেমনি সংস্কৃতে তাঁহার প্রবেশ লাভ ও ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা ত্রিভুবনদেব বিজ্ঞানের অনুশীলনে সর্ব্বদাই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তিনি স্বহস্তে যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, সে সকলের কলাকৌশল বিশেষ প্রশংসার যোগ্য, সেগুলি আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। রাজ্যের শিল্পোন্নতি সাধন মানসে নিজে শিল্প বিদ্যায় প্রচুর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। পিতৃপরিচালিত উন্নতি সোপানে অগ্রসর বামড়া রাজ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতির স্রোতঃ

যাহাতে অবাধগতিতে অগ্রসর হইতে পারে, রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব সে বিষয়ে অনলস শ্রম স্বীকারে সদা ব্যস্ত ছিলেন। কেবল ইহাই তাঁহার বিয়োগ-বিরহকে যাতনাদায়ক করে নাই, ইহা অপেক্ষা আরও অনেক অধিক ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার বিয়োগে ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যা এক অকৃত্রিম সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক সুহৃদ্‌ হারাইয়া আজ হাহাকার করিতেছে। তিনি ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী রাজ্য শাসন ও প্রজাপালনে নিযুক্ত থাকিয়া ও মাতৃভাষায় তের খানি সাহিত্য ও কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহাকাল অকালে তাঁহাকে গ্রহণ না করিলে, বাম্‌ড়া ও উড়িষ্যার আরও কত কল্যাণ সাধিত হইত, কিন্তু এ সংসারে মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, তাই এমন রত্নসম পুত্রধনে বাম্‌ড়া ও উড়িষ্যা আজ বঞ্চিত হইয়া অশ্রুপাত করিতেছে।

রত্নসম পুত্র ধন? হাঁ তাহাই সত্য। কেন সত্য, সেই বিষয়টুকুর আলোচনা করিয়া আমরা নিরস্ত হইব। এখন আর অধিক কিছু বলিব না। রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব চিরজীবন সুরাসেবনবিরোধী ছিলেন। কেবল যে নিজে কখন সেবনার্থে সুরা স্পর্শ করেন নাই, তাহা নহে, বাম্‌ড়ার রাজধানী দেবগড়ের চারিদিকে ২০ মাইলের মধ্যে প্রজামণ্ডলী রাজকর্ম্মচারী ও রাজপরিবারসংসৃষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের সুরাসেবন নিষিদ্ধ। কেবল নিষিদ্ধ নহে, সুরাসেবনে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। সুরা ও অহিফেনসেবী রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না। মাদকসেবন-লোভসংবরণ রাজসংকারে কর্ম্ম পাইবার একটা বিশেষ গুণে পরিণত হইয়াছে। আর বাম্‌ড়া রাজ্য ও তাহার রাজধানী দেবগড়ের রাজদরবারে নারীর মর্য্যাদা সর্ব্বদাই সম্মানসহ সুরক্ষিত হইয়াছে।

"মাতৃবৎ পরদারেষু" মহামন্ত্র স্যর বাসুদেব সুঢলদেবের আদর্শ ছিল। দেশীয় রাজ্য সমূহের সর্ব্বত্র না হউক, অনেক স্থলেই সুরা ও সুন্দরীর বিচরণ যে সহজ, সে বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই।

রাজা স্যর বাসুদেব সুঢলদেব ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর, এই ত্রয়োদশ বর্ষকাল রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব ঐ দুই পিতৃকীর্ত্তি রক্ষা করিতে এবং সে "যত্রনার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা"ও সে "মদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্" নীতির গৌরববর্দ্ধন করিয়া সর্ব্বজনের পূজার পাত্র হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। রাজাত অনেক দেখিলাম, বাঙ্গালাদেশের বনিয়াদশূন্য ও সিংহাসনহীন রাজাও অনেক দেখিলাম, অবসরাভাব নিবন্ধন অশিষ্টাচারপটু ও আলাপে অপটু অনেক রাজাও দেখিলাম, কিন্তু সামন্ত নরপতি স্বরাজ্যে "দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা" দয়াধর্ম্মের অবতার রাজা লোকের গায়ে পড়ে আলাপ ও আত্মীয়তা করে, এমন রাজা ত এ হতভাগ্য দেশে বিরল। সহসা এই বিরল জনসংখ্যার একটী জ্যোতিষ্ক জীবনের মধ্যগগণে অগ্রসর হইতে না হইতে খসিয়া পড়িল, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? রাজা সচ্চিদানন্দের জন্য আজ হৃদয় ব্যথিত, তাই আজ সহজে সে দুঃখ নিবারণ হইতেছে না। দুঃখ নিবারণের, সান্ত্বনা লাভের একমাত্র উপায় তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি তিনটী পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন, এই সেদিন বহু অর্থব্যয় করিয়া দেশ দেশান্তরের বহু বহু অধ্যাপক পণ্ডিত ও অন্য বহু বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে

রাজধানীতে মিলিত করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে কলাহাণ্ডির রাজার সহিত একমাত্র রাজকুমারীর উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। আর সেই শুভানুষ্ঠানের জের মিটিতে না মিটিতে এ কি হইল? ঠিক যেন ঐ কাজটী শেষ করিবার অপেক্ষা করিতেছিলেন!

রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব স্বয়ং যেমন পিতার ন্যায় বিদ্যাগৌরবে অলঙ্কৃত ছিলেন, বহু যত্নসহকারে আপনার কুমারগণেরও শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুবরাজ দিব্যশঙ্কর বাহাদুর, যিনি এক্ষণে পিতার স্বর্গারোহণ নিবন্ধন বামণ্ডারাজ বলিয়া পরিচিত, সেই চতুর্বিংশ বর্ষবয়স্ক রাজা দিব্যশঙ্কর বাহাদুর সমগ্র গড়জাতের অগণ্য তারকারাজি সদৃশ রাজকুমারগণের মধ্যে একমাত্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুশিক্ষার অমল ধবল কীরণ বিকীর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত সুবুদ্ধিসম্পন্ন রাজা। পিতৃপিতামহের পুণ্যফলে—তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে নূতন রাজা বামড়ার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রাণপণ যত্ন করিবেন। নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন, "পদ্মরাগ খনিতে কাচের প্রাদুর্ভাব অসম্ভব।" তাই আজ আমরা স্যর বাসুদেবের পৌত্র ও রাজা ত্রিভুবন দেবের পুত্রের ভাবী জীবনাভিনয়ে সেই পদ্মরাগমণির নির্ম্মল ও সুন্দর ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া অন্তরে আনন্দ অনুভব করিব ও সঙ্গে সঙ্গে শোকের তীব্র জ্বালা কথঞ্চিৎ জুড়াইতে পারিব. ইহাই আমাদের আশা। বিধাতা কৃপা করিয়া আমাদের এই আশা পূর্ণ করুন।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৃথিবীর উৎপত্তি। (২)

ভূতত্ত্বে নীহারিকাবাদ ও উল্কাবাদ।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা পৃথিবীর উৎপত্তি-প্রসঙ্গে দুইটী মতবাদ পাইয়াছি। একটী লাপ্লাস-পরিকল্পিত নীহারিকাবাদ, অপরটী লকেয়ার-ডারুইন-প্রমুখ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ-প্রচারিত উল্কাবাদ। একটী প্রাচীন, অপরটী নবীন। প্রথমটীর মতে অনন্ত বিক্ষিপ্ত বাষ্প-রাশি জমিয়া এই পৃথিবী গঠিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয়টীর মতে, শীতল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কারাজির সমবায়ে আমাদের এই সুবিশাল গ্রহ সংগঠিত হইয়াছে। এই দুইটী মতবাদই জ্যোতিষালোচনার ফল। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা ভূতত্ত্বের ক্ষুদ্র কষ্টি-পাথরে ইহাদিগকে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই।

আমরা দেখিব, পৃথিবীর সুদূর অতীত ইতিহাস যতটুকু আমাদের আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে, তাহার মীমাংসা ও ব্যাখ্যান উপর্য্যুক্ত মতবাদদ্বয়ের কোন্‌টী অবলম্বনে সহজ ও সম্ভব হয়।

এইখানে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথিবীর ইতিহাসপুরাণের আদিপর্ব্ব প্রায় সমগ্রই অজ্ঞাত এবং অনধীত। আমাদের চক্ষে যাহা পৃথিবী-পৃষ্ঠের প্রাচীনতম-শিলা, হয়ত তাহার উৎপত্তির পূর্ব্বেও আমাদের এই গ্রহটীকে লক্ষ লক্ষ শতাব্দীর করস্পর্শ অনুভূত করিতে হইয়াছিল। কত যুগযুগান্তরের ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া যে ঐ শিলাখণ্ড বর্ত্তমান আকার পাইয়াছে, তাহা নির্ণয়ে বিদ্ অক্ষম।

যাহা হউক, সে অক্ষমতাসত্ত্বেও যেখান

হইতে, যে সময় হইতে আমরা ভূপৃষ্ঠ গঠনের পারম্পর্য্যের ধারা অনুসরণ করিতে পারিয়াছি, সেই সময়কার শিলা (Rocks) পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই আমাদিগকে যতদূর সম্ভব, পৃথিবীর আদিম অবস্থা অনুধাবন করিতে হইবে।

পৃথিবীর অতীত কাহিনীর অধ্যয়নে স্তরবিজ্ঞানই (Stratigraphy) ভূতত্ত্ববিদের প্রধান অবলম্বন।

আমরা জানি, নদী, হ্রদ, সাগর প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদয় জলাশয়গর্ভেই প্রতিনিয়ত তটবিধৌত পলিরাশির সন্নিবেশ হইতেছে। আর এই সমস্ত পলির সহিত তাৎকালিক জীবকঙ্কালও প্রোথিত হইতেছে। এই যে পলির সমাবেশ, ইহাকেই ভূতত্ত্বে স্তর (Strata) বলা হয়। আর স্তরমধ্যস্থ জীবাশ্মসমূহই (Fossils) তাহার সন্নিবেশকাল বিনির্ণয়ের প্রধানতম সাক্ষী।

আমাদের এই পৃথিবীর পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহেরও অভিব্যক্তি হইয়াছে। আর এই অভিব্যক্তির ইতিহাস যথাক্রমে স্তরবক্ষে লিখিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই পণ্ডিতগণ জীবাশ্ম পরীক্ষা দ্বারা স্তরের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব নির্ণয় করিতে পারেন এবং এই উপায়েই ভূতত্ত্বে স্তরবিজ্ঞানাধ্যায়ে যুগ বিভাগ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

ভূস্তরের সমাবেশকাল পণ্ডিতগণ চারিটী যুগে ভাগ করিয়াছেন—আদি, প্রাচীন, মধ্য এবং নবীন যুগ।

আদি এবং প্রাচীনযুগের স্তরসমূহের শিলারাজির প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা পৃথিবীর সুদূর অতীতকালের অবস্থা কতকটা বিচার করিতে পারি।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, স্তরবদ্ধ শিলা কখনও পৃথিবী-পৃষ্ঠের আদিম শিলা নহে; অন্য শিলা সমূহের ক্ষয়েই ইহাদের উৎপত্তি। এক্ষণে এই আদিম শিলা, যাহা হইতে প্রাচীনতম স্তররাজির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি এবং অবস্থিতি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

আমাদের ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে এক প্রকার বিস্তৃত শিলাসমাবেশ দৃষ্ট হয়; ইহারা মোটেই স্তরবদ্ধ নহে। পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে নায়েস্ (Gneiss) আখ্যা দিয়াছেন। ইহাদের গঠন অনেকটা গ্রাণাইটের (Granite) মত হইলেও, ইহাদের বিপুল বিস্তৃতি এবং গঠনোপাদান সমূহের সমান্তরাল বিন্যাস প্রভৃতির প্রভূত আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহাদের উৎপত্তি গ্রাণাইট্ হইতে স্বতন্ত্র। গ্রাণাইট্ ভূগর্ভে প্রভূত চাপে উৎপন্ন হয়। পরে উপরিস্থ ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়ে, অথবা কোন নৈসর্গিক কারণে উন্নীত হইয়া, ভূপৃষ্ঠে দেখা দেয়। গ্রাণাইটের উপাদান স্থানীয় খনিজ সমূহ নায়েস্এর অনুরূপ হইলেও ইহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত; নায়েসের মত সমান্তরাল ভাবে সন্নিবিষ্ট নহে। আর গ্রাণাইট শিলাকে এত সুদূর প্রসারী হইতেও দেখা যায় না।

যাহাহউক, এই সকল আদিম নায়েস্ শিলার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ত্তমান ধারণা এইরূপ।

পৃথিবী পৃষ্ঠের শিলা সমূহের কোনও প্রকার স্থায়ী গঠন হইবার পূর্ব্বে পৃথিবী অত্যন্ত উত্তপ্ত, এমন কি, গলিত বা অর্দ্ধবিগলিত অবস্থায় ছিল। আর তখনকার বায়ুর চাপ এক্ষণকার অপেক্ষা বহুগুণে বেশী

ছিল। কারণ বর্ত্তমানে আমরা পৃথিবী-পৃষ্ঠে যে সমস্ত কঠিন ও তরল পদার্থ দেখি, তাহার কতকাংশ তখন বাষ্পীয় আকারে বায়ুতে মিশ্রিত ছিল। আমরা জানি, পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। সে সময় এই তিন ভাগ জল জলীয় আকারে ছিল না, ইহা বাষ্পীয়-ভাবে বাতাসের সহিত আকাশে সঞ্চরণ করিত। তাহা ছাড়া অম্লজান, অঙ্গারাম্লজান প্রভৃতি বাষ্পও তখন প্রচুর পরিমাণে বাতাসের সহিত মিশ্রিত ছিল। পৃথিবী-পৃষ্ঠের অর্দ্ধ-বিগলিত শিলাসমূহ যখন জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল, তখন উপরিস্থ বায়ুর এই প্রভূত চাপে তাহারা সুদূরপ্রসারী শিলা-ক্ষেত্রে পরিণত হইল, আর তাহাদের গঠন অনেকাংশে ভূগর্ভে জমাটবদ্ধ গ্রাণাইটের অনুরূপ হইল।

তাহা হইলে নায়েস্ যদি ভূপৃষ্ঠের প্রাচীনতম শিলা হয়, তবে ইহার গঠন হইতে আমরা দেখিতেছি যে, আদিম অবস্থায় পৃথিবী অতিশয় উত্তপ্ত ছিল। এই সিদ্ধান্তটী জলন্ত বাষ্পময় নীহারিকা মতবাদের সহিত খুবই মিলিয়া যায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া, উল্কাবাদের সহিতও ইহার বিরোধের বিশেষ কারণ দেখি না। কারণ, উল্কারাজি স্বতন্ত্র ভাবে যতই শীতল থাকুক না কেন, ইহারা যখন মিলিত হইয়া একগ্রহে পর্য্যবসিত হইল, তখন নিশ্চয়ই ইহাদের পরস্পরের ঘর্ষণে প্রভূত তাপের সঞ্চার হইয়া থাকিবে, এবং সেই তাপেই গলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাসমূহ স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া এক বিপুল পিণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকিবে। এই গলিত বা অর্দ্ধবিগলিত পিণ্ডই আমাদের আদিম পৃথিবী এবং স্থানে স্থানে ইহার প্রথম জমাটবদ্ধ আদিম আবরণ শিলাই নায়েস্ রূপে দেখা যাইতেছে।

যাহা হউক, ইহার পরে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক সময় আসিল, যখন বাষ্পীভূত জলরাশি শীতল হইয়া ভূপৃষ্ঠে তরল জলরূপে অবতরণ করিল। তখন সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এক অখণ্ড বিরাট মহাসাগরের সৃষ্টি হইল। অতঃপর জলীয় আবরণে আচ্ছন্ন থাকায় পৃথিবীর উপরিভাগের তাপের আর আত্যন্তিক হ্রাস বৃদ্ধি হইল না। কিন্তু ভূগর্ভের উত্তাপ ক্রমেই কমিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আকুঞ্চনও চলিতে লাগিল। ভূগর্ভের এই আকুঞ্চনের ফলে পৃথিবীর কঠিন সমতল পৃষ্ঠদেশে তরঙ্গের সৃষ্টি হইল। উচ্চ নীচ সূচিত হইল। ভূগর্ভের আকুঞ্চনের সহিত তাল রাখিয়া ভূতল ক্রমেই অসমতল হইতে লাগিল। এবং কালে ভূতলাশ্রিত বিপুল বারিরাশি পৃথিবী-পৃষ্ঠের নিম্নভূমি সমূহে আবদ্ধ হইল,—এইরূপে পৃথিবীতে মহাসাগর ও মহাদেশ সৃষ্ট হইল।

আবার মহাদেশ-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ক্ষয়ও আরম্ভ হইল—সঙ্গে সঙ্গে সাগর গর্ভে প্রথম স্তর সন্নিবিষ্ট হইল। আমাদের ভারতবর্ষে এই আদি স্তর সমবায়কে ধারবার-পর্য্যায় (Dharwar System) নাম দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাইয়ের ধারবার প্রদেশে বহুল পরিমাণে ইহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ধারবার পর্য্যায়ের কোনও কোনও স্তরে একপ্রকার শিলাখণ্ডের সমাবেশ দেখা যায়, বিশেষ পর্য্যালোচনার পর পণ্ডিতেরা সন্দেহ করিয়াছেন যে, এই সকল শিলাখণ্ড তুষার-বাহিত (Glacial) হইলেও হইতে পারে।

পর্ব্বত-গাত্রে বা সমুচ্চ উপত্যকা প্রদেশে

অত্যধিক তুষার পাত হইলে, তুষার-কণা সমূহ পরস্পরের চাপে জমাট বাঁধিয়া, ধীর মন্থর শম্বুক-গতিকে নিম্নভূমি অভিমুখে অবতরণ করিতে থাকে। অবতরণ সময়ে এই সচল তুষার স্তূপ (Glacier) নিম্ন ও পার্শ্বস্থ পর্ব্বত-গাত্র ক্ষত বিক্ষত করিয়া লোষ্ট্র ও ও ধূলিকণা সংগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হয়। অবশেষে যখন নিম্নভূমিতে আসিয়া তুষার রাশি গলিয়া যায়, তখন ঐ সকল লোষ্ট্র ও ধূলিরাশি আবার ধরণী-পৃষ্ঠে বিস্তৃত হইয়া বিশ্রাম লাভ করে। তুষার-বাহিত এইরূপ লোষ্ট্র-সমবায় চিনিবার অনেক উপায় আছে। তুষার তাহার হিম-কর-স্পর্শ অনেক স্থলেই শিলাগাত্রে আঁকিয়া রাখিয়া যায়। কাজেই কোটী কোটী বৎসর পরে, স্থানীয় জল-বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও ভূতত্ত্ববিদ্ এই সকল লোষ্ট্র পরীক্ষা দ্বারা তুষার নদের স্থিতি এবং গতিবিধি সবিশেষ বলিয়া দিতে পারেন।

যাহা হউক, ধারবার-পর্য্যায়ের স্থানে স্থানে এইরূপ লোষ্ট্র-সমাবেশ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ও কৌতুহলের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। আদি যুগের ধারবার-পর্য্যায়ের এই তুষার-পাত বিস্ময়কর হইলেও একেবারে অবিশ্বাস্য নহে। কারণ, ইহার ঠিক পরবর্ত্তী সময়ে প্রাচীন যুগের সর্ব্ব নিম্নস্থ কাম্ব্রিয়ান্ পর্য্যায়ে (Cambrian System),চীনদেশেও দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াতে তুষার-পাত নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

ইহার পরে প্রাচীন যুগের শেষভাগে আবার দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারত-বর্ষে বিপুল তুষার-প্লাবন হইয়া গিয়াছে।

কাজেই পৃথিবীর আদি ও প্রাচীন যুগের ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখিতেছি যে, তৎকালে স্থানে স্থানে পৃথিবী-পৃষ্ঠ অত্যন্ত শীতল ছিল। এমন কি, নিরক্ষবৃত্তের অতি নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেও তখন সময়ে সময়ে অজস্র বরফপাত হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর প্রাচীন যুগের ইতিহাসের এই অধ্যায়, আধুনিক পণ্ডিতগণ উল্কাবাদের সমর্থক বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহারা বলেন ‘নবীন অবস্থায় আমাদের এই গ্রহটী যে বর্ত্তমান অপেক্ষা উত্তপ্ত ছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবী যদি শীতল উল্কারাজির সমবায়ে গঠিত হয়, তবেই তাহাদের সংঘর্ষণ এবং আকুঞ্চন-জনিত পৃথিবীর এই উত্তাপ শীঘ্র হ্রাস পাওয়া সম্ভব। এবং তাহা হইলেই পরবর্ত্তী আদি এবং প্রাচীন যুগের এই বিস্তৃত তুষারপাত সমূহ সহজেই মীমাংসিত হয়। পক্ষান্তরে পৃথিবীর কেন্দ্রদেশ যে পরিমাণে উত্তপ্ত, জ্বলন্ত বাষ্পজাত পৃথিবীর পক্ষে তত উত্তাপ ধারণ এবং পোষণ কখনই সম্ভবপর নহে। আর জ্বলন্ত বাষ্প যদি কালক্রমে শীতল হইয়া ঘনীভূত অবস্থায় পরিণত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর পৃষ্ঠ কখনই নিম্নদেশ হইতে ধীরে ধীরে এরূপ তাপ আকর্ষণ করিয়া উষ্ণ থাকিতে পারিত না, শীঘ্রই শীতল হইয়া পড়িত।”

যাহা হউক, এইরূপে পৃথিবীর আদি ও প্রাচীন যুগের* ইতিহাস আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, বাষ্পীয় নীহারিকাবাদ অপেক্ষা শীতল উল্কাবাদ দ্বারাই পৃথিবীর এই অধ্যায়-যুগলের সম্যক ও সঙ্গত ব্যাখ্যান সম্ভবপর। শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত।

---

*আদিযুগ—Archœozoic
প্রাচীন—Palœozoic
মধ্য—Messozoic
নবীন—Cainozoic Era,

সঙ্কণিকা।

(৫১)

সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত এম-এ মহাশয় এবার সভার বার্ষিক অধিবেশনের বক্তৃতার এক স্থানে বলিয়াছিলেন, "I often say to myself how the men and women in our Samaj in the earlier days were like the Puritans in their best days. There was in the Brahma Samaj in those days the same spiritual fevour, the same yearning for communion with God, the same eagerness for obtaining divine guidance in life through prayer, the same strict love of truth and strict purity in conduct and the same eager zeal for the service of men politically, socially, and educatively. Further, there was an untiring zeal for diffusing Brahmomism in spite of all privations and hardships and a sweet love pervading our whole society.

But we have fallen from this standard."

ব্রাহ্মগণের আদর্শ পরিম্লান হইয়াছে, এই কথা ঘোষণা করিয়া তিনি অনেক দোষের কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। বালক এবং যুবকগণের শাসনের জন্য অনেক কঠোর সত্য কথা বলিয়াছেন। সে কথাগুলি প্রণিধানের যোগ্য। কিন্তু উপেক্ষা না করিয়া কেহ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবে কি? বরিশালে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইতেছে শুনিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। এই বরিশালেই না ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক জনৈক বন্ধু বালকগণের দোষের কথা উল্লেখ করিয়া প্রতিহত হইয়াছিলেন? ধন্য বরিশাল, তোমার জয় হউক। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মহাশয়েরও জয় হউক। অভাব-চিন্তন ভিন্ন প্রকৃত মহত্ত্ব জন্মিতে পারে না। সমাজের অভাবের কথা উৎসবের সময় উল্লেখ করায় আমরা যারপরনাই সুখী হইয়াছি। কিন্তু বালক ও যুবকগণ ভিন্ন বৃদ্ধগণ সম্বন্ধে তিনি কি বলেন? সেই আধ্যাত্মিকতা কোথায়, যাহার গৌরবে ব্রাহ্মসমাজ একদিন জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। পরনিন্দা, হিংসা, একাধিপত্য-স্পৃহা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা যে সমাজের অস্থি মজ্জা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, তাহা সংশোধনের উপায় কি? দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে চাহি না, তাহা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই জানেন। সমাজে কিরূপ লোক সকলের বক্তৃতা হইতেছে, কে না জানেন? সান্ধ্য-সমিতিগুলি যেভাবে চলিতেছে, তাহা কে না জানেন? চা চুরুটময় বিলাসিতার হাট সংযমসাধনের পরিপন্থী, তাহা ধার্ম্মিকদিগের পক্ষে সাজে না। তোমরা বড় লোক, তোমাদের পক্ষে সকলই শোভা পায়, কিন্তু নানা চরিত্রহীনতার জন্য যাহারা নামজাদা হইয়াছে, তাহাদিগকে লইয়া নৃত্য কর কেন? যাহারা জীবনে নত, চরিত্র এবং জীবনে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই, তাহাদিগকেই বা "সভ্য" (member) কর কেন? ইহাতে কি নীতিহীনতা প্রশ্রয় পায় না? সঞ্জীবনীতে যা-তা বিজ্ঞাপন ছাপা হইতেছে, অথচ সঞ্জীবনী-সম্পাদক একজন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ নেতা। "নায়ক" এইরূপ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে অবসর পান কেন? টাকা উপার্জ্জনের জন্য যে সব কদর্য্য উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহা কি পরিত্যজ্য নয়? "বেনামী" বাড়ী ক্রয়-প্রথা ব্রাহ্মসমাজে চলিয়াছে, তাহা কি বর্জ্জনীয় নয়? জাল টেলিগ্রাম পাঠাইয়া যে নিরপরাধিনী বালিকার হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হইয়াছে, তাহা কি প্রতিকারযোগ্য নয়? চতুর্দ্দিকে ব্যভিচার-স্রোত যে

অবাধে চলিতেছে, তাহা কি প্রতিবাদযোগ্য নয়? বন্ধু, তুমি কি বল?

(৫৬)

উৎকলের অধীন বামণ্ডার রাজাবাহাদুরের কন্যার বিবাহের বিবরণ পাঠ করিয়া ও শুনিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি এরূপ আদর আপ্যায়নের কথা আমরা বহু দিন শুনি নাই। আমরা জ্যোতিকণায় "পরীক্ষিত কথার" মধ্যে লিখিয়াছিলাম, বড় লোকের বাড়ী খাইতে গেলে তাঁহারা মনে করেন, "উহারা এ সব খায় না, কোথায় পাইবে?" তাঁহারা যদি দরিদ্রের সহিত কথা বলেন, তবে মনে করেন, "কৃতার্থ করিতেছি।" এইরূপ ব্যবহার-পূরিত দেশে রাজামহারাজাদের সদয় ব্যবহারের কথা শুনিলে বড়ই আনন্দ হয়। বামড়ার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা উৎকলের বিদ্যাসাগর ছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজা পিতার ঐশ্বর্য্যের সহিত নানা সদ্গুণে ভূষিত হইয়াছেন। রাজাবাহাদুরের জয়জয়কার হউক। তাঁহার দৃষ্টান্তে আদর্শ চরিত্র উৎকলে অবতরণ করুক।

এই সকল কথা লিপিবদ্ধ হইবার পর শুনিলাম, হঠাৎ রাজাবাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন! এই নিদারুণ সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। স্থানান্তরে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল।

(৫৭)

শুনিতেছি, কলিকাতায় সাধন-আশ্রম (Brahmo worker's shelter) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাতে যাইবে। স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া একতন্ত্রিত্ব, একমন্ত্রিত্ব শিক্ষা দিবার জন্য এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠার সময়ে আমরা প্রতিষ্ঠাতা পূজ্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়কে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম, যে যে কারণে কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রম রাখিতে পারেন নাই, সে সকলের এখনও নিরসন হয় নাই। সুতরাং কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া দল করার সমীচীনতা বুঝি না। প্রত্যেক দাতার টাকা দুই স্থলে ভাগ হইয়া যাইবে, তাহা বাঞ্ছনীয় নয়।" তিনি তখন সে কথা শুনেন নাই। এখন, তাঁহার জীবিতকালেই, ইহার চরমদশা উপস্থিত হইতেছে শুনিয়া, আমরা দুঃখিত। তাঁহার ন্যায় মহাসাধক যখন ইহা রাখিতে পারিলেন না, তখন সাধন-ভজনহীন "বারজন" কি তাহা রাখিতে পারিবেন? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সুদীর্ঘকালে যেরূপ প্রচারকদলের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা সকলেই জানেন। সাধক বিজয়কৃষ্ণ, রামকুমার, শিবনারায়ণ, গণেশচন্দ্র, লক্ষ্মণপ্রসাদ, কেহই এই গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন না, নগেন্দ্রনাথও সদা উপেক্ষিত হইতেন। যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কৃতিত্ব সকলেই জানেন। এইরূপ কৃতীর দল সৃজনের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয়। ক্যাটিকিষ্টের ন্যায় দলসৃজনের কি প্রয়োজন? কেরী মার্সম্যানের পর সেকালের একশ্রেণীর খ্রীষ্ট-মিশনরীগণ যেমন অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা ঘোষণার দ্বারা প্রতিপত্তি অর্জ্জনে মনোযোগী হইতেন, সেরূপ প্রচারকের প্রয়োজন আছে কি? শ্রাদ্ধের গামছা বা বিবাহের যোড়বস্ত্র সংগ্রহের দল বাড়াইয়া কাজ কি? এখন চাই জীবন, চাই বিশুদ্ধ চরিত্র, চাই প্রেম, চাই নিষ্ঠা, চাই বিশ্বাস ভক্তি। তাহা যদি অর্জ্জিত হয়, আপনা আপনি প্রচার

হইবে, আর যদি তাহা না হয়, মজলিসের হরকছম বুলিতে কিছুই হইবে না। নগেন্দ্রনাথ-প্রমুখ প্রচারক-পদপ্রার্থীর দল যখন উপেক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন আর কোন বিশিষ্ট লোক এ শ্রেণীতে আসিবে বলিয়া মনে হয় না। অবিনাশচন্দ্র ভিন্ন সুদীর্ঘকালেও কোন যোগ্যব্যক্তি আসেনও নাই। যাহারা ভাতের কাঙ্গাল, যশমানের কাঙ্গাল. তাহাদিগকে অর্থের প্রলোভনে আকৃষ্ট করিতে পারেন বটে, কেন না, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ কোন সহৃদয় ব্যক্তির দানের অনেক টাকা পাইয়াছেন, কিন্তু টাকার লোভে ভুবনমোহনের শ্রেণীর লোক আকৃষ্ট হইবে কি? শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্রাদর্শে যাহা সাধিত হইল না, তাহা ন-কড়া, ছ-কড়ার দ্বারা হইবার নয়। বৃথা চেষ্টা, বৃথা আয়োজন। যাহা হয়, তাহা হউক; আমরা শুধু ভাবিতেছি. কার্য্যের সংশ্রব ছাড়িয়া শাস্ত্রী মহাশয় শান্তি পাইবেন কি? বড় লোকের দয়া-চাপরাশবাহী যে কালাপাহাড়ের একাধিপত্যে আশ্রমের এই চরমদশা উপস্থিত হইল এবং বাবু বরদাপ্রসন্ন রায় মহাশয় এই আশ্রমের সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি।

(৫৮)

স্বদেশভক্ত ঋষিপ্রতিম মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় মহারাণী স্বর্ণময়ী-কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, এবং সকল ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এ সংবাদে দেশের সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু এক শ্রেণীর লোকের ইহাতে গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৈঠকে এ সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। দুই জন খয়ের-খা বাঙ্গালী এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে লাগিয়াছেন, শুনিয়া যারপর নাই মনোকষ্ট পাইতেছি। এই দেশবৈরী বাঙ্গালী দুজনকে সকলে চিনিয়া রাখুন, আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

(৫৯)

বিগত ২২শে মার্চ্চ (১৯১৬) দিল্লী নগরীতে লাট-সভায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে, বিশেষত্ব ঘুচাইয়া, বোম্বে মান্দ্রাজের ন্যায় প্রভিন্সিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে মহামতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্ম, আসাম ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে এ প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি নাই, গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন। নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতে বাঙ্গালী যেমন দক্ষ, এমন আর কেহই নয়। যে শ্রেণীর বাঙ্গালী দিল্লী রাজধানী যাওয়ায় উল্লসিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে এ হেন প্রস্তাব করিবেন, কিছুই বিচিত্র নয়। ইহাতে কি মঙ্গল সাধিত হইবে, আমরা বুঝি না। ব্যক্তিগত খেয়াল ভারতগবর্ণমেণ্টই সংযত করিয়া থাকেন। বড় লাটসাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলার। এই গৌরব ভারতের আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই। এই গৌরব-বিচ্যুতিতে কি ইষ্ট সাধিত হইবে, আমরা বুঝিতেছি না। কলিকাতাকে সর্ব্বগৌরব-বিচ্যুত করাই কি তথা-কথিত নেতৃবর্গের উদ্দেশ্য?

(৬০)

তাঁহারা বলেন, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ নিয়মতন্ত্র-অনুসারে চলে। কিন্তু এখন আর তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ট্রষ্টিদিগের

নিকট অনুমতি না লইয়াই কতবার কত লোককে যে আহ্বান করিয়া সমাজে বক্তৃতাদি দেওয়া হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। একবার আর্য্যসমাজের একজন মহিলাকে এইরূপে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তিনি অকথ্য ভাষায় শিক্ষিতা মহিলাদিগের নিন্দা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন। এবার মাঘোৎসবের সময় অবৈধরূপে সহকারী সম্পাদক নিয়োগ করা উপলক্ষে যে লাঞ্ছনা হইয়াছিল, সমাজ-ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কৃতী যুবকগণ অবৈধতার বিরুদ্ধে সভা আহ্বান করিয়া ঐ অবৈধতা পণ্ড করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ঐ অবৈধতা উপলক্ষে, তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক বাবু ললিতমোহন দাস মহাশয় যে গুণপনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। যুবকদিগের অনুরোধ ১০ই চৈত্র অন্যতর সহকারী-সম্পাদক মহাশয় যে সভা আহ্বান করেন, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে ১লা চৈত্রের পাক্ষিক তত্ত্বকৌমুদীতে তাহার সম্পাদক বাবু ললিতমোহন দাস, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়দিগের ভোট সংগ্রহ করিবার জন্য যে বিস্তৃত স্বাক্ষরিত পত্র ছাপা হইয়াছে, তাহার উপরে লেখা আছে, "পত্রপ্রেরকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।" ললিত বাবুকে এখানে বহুরূপী বেশ পরিধান করিতে দেখিয়া আমরা দুঃখিত। তৎপর অবৈধরূপে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা দেখিয়াও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তদুপরি অব্রাহ্ম আইন-ধ্বজী ব্যক্তিগণের নজির সংগ্রহ করার ব্যাপার আরও মর্ম্মপীড়ক। কিরূপে আইনজ্ঞেরা এক-তরফা শুনিয়া মত দিলেন, তাহা প্রহেলিকাপূর্ণ। কিরূপে হেরম্ব বাবু তাহা সভাস্থলে উল্লেখ করিলেন, তাহা আরো সমস্যাপূর্ণ। -আনন্দমোহন এবং দুর্গামোহনের সমাজের এই পরিণতি দেখিয়া কে না বিস্মিত হইয়াছেন? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এই হেরম্ব বাবুই না লাট সভার পদপ্রার্থী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন? লজ্জায় মরিয়া যাই, ধর্ম্মসমাজ শেষে কি রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিণত হইবে? মহর্ষি, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, শিবনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এ কাজ করিয়াছেন কি? তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় যদি যুবকদিগের প্রত্যুত্তর ছাপাইবার অবসর দিতেন, কিম্বা এখনও যদি তাহা পত্রিকাস্থ করেন, তবে তাঁহার নিরপেক্ষতা বুঝিব, নচেৎ তাঁহার দ'লো পরিণতি চিরদিন আমাদিগকে ব্যথিত করিবে। ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকার দুর্দ্দশা আর দেখা যায় না। ১২ই মার্চ্চের (১৯১৬) ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে ব্রাহ্মসমাজ কলমে ঢাকা মাঘোৎসবের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ঐ পত্রের সকল দোষের উপরে উঠিয়াছে। দেড় কলমের বর্ণনায় আহারের কথা আছে, কত কত সাজসজ্জার কথা আছে, ভবসিন্ধু বাবুর কত গুণের কথা বারম্বার বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু ১১ই মাঘের অপরাহ্নের উপাসনা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় বি-এ মহাশয় করিয়াছিলেন এবং আমরা শুনিয়াছি, তাহা অতি উপাদেয় হইয়াছিল, তাহা কেবল এইরূপে শেষ হইয়াছিল,—"In the evening the divine service was conducted by Babu Srishchandra Ray." ঐ দিনের প্রাতের উপাসনার কথা ১৯ লাইনে শেষ হইয়াছে। ঐ বিবৃতি ভবসিন্ধু বাবুর গুণ বর্ণনেই আরম্ভ, তাহাতেই পূর্ণ। ঐ লেখা ভবসিন্ধু বাবুর নিজের,

না অন্য কোন দালালের লেখা? তত্ত্বকৌমুদী এবং মেসেঞ্জার এখন যে ব্যক্তিগত খেয়ালে পূর্ণ, প্রতিবারের পত্রিকা হইতে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সমাজ যদি ইহার প্রতিবিধান না করেন, দ'লো লোক ভিন্ন কোন সৎলোক এই দুই কাগজ স্পর্শ করিবে না। বৃদ্ধদের অপেক্ষা ১০ই চৈত্রের সভায় নবীনদিগের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নেতৃবর্গের দ'লো ভাব অপসৃত না হইলে এ সমাজের কলঙ্কে দেশ পূর্ণ হইয়া পড়িবে।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৫২। রামদাস গ্রন্থাবলী। তৃতীয় ভাগ। কুসুমমালা, তত্ত্বসঙ্গীত-লহরী, চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা, কবিতালহরী, ইউরোপদর্শন, সংস্কার-রহস্য ও বিবিধ প্রবন্ধ। ৺রামদাস সেন প্রণীত, মূল্য ১৷৷০। প্রকাশক শ্রীমণিমোহন সেন, বহরমপুর। ৺রামদাস সেন মহাশয় ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যেরূপ বাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, এরূপ আর কেহই করেন নাই। যেমন ছিলেন, ৺ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৺ বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ, তেমনি তিনিও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল গবেষণা গভীর, মৌলিক নির্দ্ধারণ সত্য প্রসূ, তিনি এদেশের অমর সন্তান। তাঁহার ইউরোপ-ভ্রমণ কাহিনী এমন সুললিত সহজ ভাষায় লিখিত যে, পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। এই পুস্তক পড়িয়া আমরা বড়ই উপকৃত হইলাম। তাঁহার গুণধর পুত্র পিতৃ-কীর্ত্তি বজায় রাখিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইলেন।

৫৩। সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব। শ্রীঅভয়কুমার গুহ, এম-এ, বি-এল, প্রণীত, মূল্য ২৲। প্রোফেসর মোক্ষমূলর ও নাইটের ধারণা ছিল, সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান প্রাচীন ভারতে উন্মেষিত হয় নাই। অভয়কুমার গভীর গবেষণা বলে ঐ মতকে খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন, ভারতে সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান যেরূপ অনুশীলিত হইয়াছিল, অল্প স্থানেই সেইরূপ হইয়াছে। এই পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে মোহিত হইয়া যাইতে হয়। এই গ্রন্থপ্রণয়নে গ্রন্থকার যে কত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। এই পুস্তকখানি উপন্যাস ও কবিতা-প্লাবিত দেশে গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে। পুস্তকের শেষ-নির্দ্ধারণের সহিত আমাদের মতের মিল নাই, কিন্তু একথা না বলিলে সত্যের অপলাপ হয় যে, এ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

৫৪। প্রাচীন মুদ্রা। প্রথম ভাগ। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত. মূল্য ২৲। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৺রামদাস সেন, ৺ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী,৺কৈলাসচন্দ্রসিংহের লেখনী নীরব হইয়াছে। এখন রাখালদাস-প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ প্রত্নতত্ত্বের গৌরব-ঘোষণায় তৎপর। রাখালদাসের অসাধারণ

ক্ষমতা। তিনি যখন যাহা লেখেন, তাহাই উপাদেয় হয়। যোগী-জনোচিত সাধনায় তিনি আপনাকে ভুলিয়া যে দেশের মঙ্গলসাধনে তৎপর, এই গ্রন্থ তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যে দেশে ডিটেক্‌টিভ ও চুটকি গল্প লিখিয়া লেখকেরা ধনী হয় এবং সম্পাদকগণ যশস্বী হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হয়, সেই দেশে রাখালদাস আদৃত হইবেন, আশা করা যায় কি? পুস্তক বিক্রয় হইবে কি? হউক বা না হউক, সাধকের সে দিকে দৃষ্টি নাই। তিনি বাণীমন্দিরের একনিষ্ঠ সাধক, কিরূপে বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবেন, তাহাতেই তৎপর! গ্রন্থকারকে আমরা প্রণাম করিতেছি।

বহু গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, গ্রন্থকার ভূমিকায় তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহারই নাম গবেষণা। অনেক গ্রন্থকার অন্যের লেখা চুরি করেন, অথচ তাহা গোপনে রাখেন; কেহ তাহা বলিলে চটিয়া লাল হন এবং সমালোচকের সর্ব্বনাশ সাধনের ব্রত গ্রহণ করেন। এদেশে এই চৌর্য্যবৃত্তি দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। অনেকে এই ব্রত গ্রহণ করিয়া যশস্বীও হইতেছেন। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। রাখালদাস অকপট-চিত্তে বিবৃতিতে এবং নোটে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই একখানি গ্রন্থের দ্বারা রাখালদাস এদেশে অমর হইবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্নতাত্ত্বিকগণের সুনাম তাঁহা দ্বারা গৌরবান্বিত হইবে। এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র আদর হইলে আমরা যারপর নাই সুখী হইব।

৫৫। **কপালকুণ্ডলা তত্ত্ব।** শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ॥০। বর্ত্তমান সময়ে যে কয়েকজন বাণীর অকৃত্রিম সেবকের দ্বারা বাঙ্গালাভাষার গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে, ললিত-কুমার তন্মধ্যে অন্যতম। তাঁহার লেখা অমৃতবর্ষী, গবেষণা অনন্যসাধারণ, সিদ্ধান্ত অকপট। বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দাপ্রচারে তদীয় বন্ধুবর্গও আজকাল আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী পূর্ণচন্দ্র বসু, লোকনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী চলিয়া গিয়াছেন, কে আর বঙ্কিম-প্রতিভার গৌরব ঘোষণা করিবে? ললিতকুমার এই কাজে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। তিনি বঙ্কিম-বিশ্লেষণে যে কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, তাহার আর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। এই একখানি গ্রন্থ লিখিলেই তিনি এদেশে অমর হইতেন। গভীর গবেষণা ও পাণ্ডিত্য বলে ললিতকুমার বঙ্কিম-প্রতিভার ষোলকলা কিরণ বিস্তার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বঙ্কিম-নিন্দুক কি বলিতে চাহেন, আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়। এই গ্রন্থখানি এত সুন্দর হইয়াছে যে, আমরা পাঠে প্রভূত আনন্দ পাইয়া গ্রন্থকারের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। এই গ্রন্থের জয় জয়কারে দেশ পূর্ণ হইয়া যাক্। স্থান বেশী নাই, নচেৎ অনেক কথা বলিতে পারিতাম। গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন।

৫৬। **ধর্ম্মপাল।** শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত, মূল্য ।০। উপাধেয় গ্রন্থ। সংক্ষিপ্ত হইলেও ভাষার মাধুর্য্যে পুস্তকখানি মধুর হই-

য়াছে। মিষ্টতায় সকল উপন্যাসকে ইহা পরাস্ত করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

৫৭। প্রণয় প্রলাপ, মূল্য ১।০। ইংরাজি হইতে অনূদিত। অনুবাদ ভাল হইয়াছে। মৌলিক গ্রন্থের ন্যায় মর্ম্মস্পর্শী।

৫৮। অশ্রুহার। শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর সম্পাদিত ও প্রকাশিত। রুদ্রকরের কুলরাজচক্রবর্ত্তীগণের শোকগাথা। সুসম্পাদিত গ্রন্থ।

৫৯। আশ্রমে। শ্রীনিতাইচাঁদ শীল, মূল্য ৶০। দেওঘর বালানন্দাশ্রমের বর্ণনা। বর্ণনা মধুর।

৬০। মেঘদূত। শ্রীনিতাইচাঁদ শীল অনুবাদিত; মূল্য ॥০। মেঘদূতের পদ্যানুবাদ এদেশে অনেক হইয়াছে। যত পড়া যায়, উহা আর পুরাতন হয় না। এ অনুবাদও ভাল। কবি ৺বরদাচরণের অনুবাদ বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে।

৬১। "হেয়ালি। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। মূল্য ১৲। বিজয়চন্দ্র অনেক কবিতা লিখিয়াছেন এবং তাহা এই বঙ্গে খুব আদৃত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার অনেক পুস্তক লোপ পাইতেছে। "কথা ও বাঁশি" কবিতা "যজ্ঞভস্ম"প্রভৃতি পুস্তকের দুই দশটী কবিতা রাখিয়াছেন, আর সব উপেক্ষার রাজ্যে গিয়াছে। "ফুল তুমি হেস না, পাতা তুমি নড় না। * * এ ক্ষুদ্র হৃদয়খানি হারাইয়া ফেলি পাছে!"—প্রভৃতি মধুর কবিতা আর দেখি না। সমালোচকের ভয়ে তিনি নাকি অনেক কবিতা বাদ দিতেছেন। বিধাতার প্রেরণায় যাহা পাইয়াছেন, তাহা বর্জ্জনের অধিকার তাঁহার আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের একটা অনুরোধ, তাঁহার সমস্ত কবিতা যেন গ্রন্থাবলীতে স্থান পায়। অন্যের লেখা হইলে এ কথা বলিতাম না, তাঁহার কোন্ লেখাটী মন্দ; আমরা জানি না। এই 'হেয়ালি" পুস্তকের কবিতার ন্যায় অনেক কবিতা তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুস্তকে আছে। কবি বিহারীলাল বলিতেন, "লোকের জন্য ত লিখি না, লিখিয়া নিজে সুখী হই, তাই লিখি।" কাহার কথায় তিনি প্রাপ্তধন পরিত্যাগ করিবেন?

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

নিষ্কামপূজা।

একটী কামনা সফল হয়েছে,
　　বেড়েছে কামনা শত;
যত পাইয়াছি প্রভুর নিকটে
　　পুনঃ চাহিয়াছি তত।
বাসনা কামনা ভুলিয়া যখন
　　পূজেছি চরণ তার,
বেদনা যাতনা সব ভেসে গেছে
　　চাহিতে হয়নি আর।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন।

"কবে?"

হৃদয়ের যত সাধ একে একে গেছে ঝরি,
শূন্য এ হৃদয় নিয়ে এক ধারে আছি পড়ি;
মরমে নিভৃতে বাজে বিষাদের ক্ষীণ তান,
ক্ষুধিত অভাব শুধু গ্রাসিবারে চায় প্রাণ!
মরণের সেতু দিয়ে সর্ব্ব দুঃখ পদে ঠেলি
　যারা ছিল ভবে একে একে গেছে চলি।
হৃদয়-আঁধার নাশি, মুছাইয়া অশ্রুধার,
অন্ধকার হ'তে মোরে কবে করে দিবে পার?
প্রীতিফুল্ল হৃদি নিয়ে, পূত-স্নিগ্ধ-শুভ্রবাসে
কবেবা দাঁড়া'ব আসি তোমারি চরণ পাশে?
তোমার চরণে প্রভু ঢালিয়া তাপিত প্রাণ
গাহিতে পারিব কবে তোমারি মহিমা গান?
মিলনের সুলগন কবে সে আসিবে হায়!
এ শূন্য হৃদয় নিয়ে বসে আসি সে আশায়!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

ঝরা ফুল।

ওগো　প্রভাতের ঝরা-ফুল,
কেন　নীরবে মুদিছ আঁখি?
তুমি　অকূলে হারায়ে কূল
কেন　হুতাশে বয়ান ঢাকি?
যবে　সান্ধ্য-গগন বাহি'
শুভ　সন্ধি-লগন চাহি'
কে গো　শ্যামলাঞ্চল দিয়া

যবে পরশিল তব হিয়া
তুমি সোহাগ-জড়িত ললিত অধরে
হাসিলে গরব মাখি'।
যবে উতলা দখিন হাওয়া
ধীরে বহি' গেল সুমধুর,
মৃদু মধ্যম-রাগে গাহিয়া
যবে বাজিল মোহন সুর,
যবে কুঞ্জ-কুটীর দ্বারে
অলি এসেছিল বারে বারে,
দিয়ে স্মর-শরাসন হানা
নব সোহাগ জানালো নানা,
কালি ঊষার কিরণে বরিবে মরণে
ছিল না কি তব জানা ?
ওগো প্রভাতের ঝরা-ফুল,
কেন নীরবে মুদিছ, আঁখি ?
তুমি অকূলে হারায়ে কুল
কেন দুকূলে বয়ান ঢাকি ?
তব ঘন পল্লব মাঝে,
প্রতি পাঁপড়ির ভাঁজে ভাঁজে,
ছিল সজ্জিত কত বাঞ্ছিত মধু
শ্যামল শোভন সাজে ;
আজি তরুণ প্রভাত বেলা
কেন ফুরাইল তব খেলা ?
চারু কুসুম সুবাস-রাশি
কেন লুকালো মোহন হাসি ?
কেন মঞ্জুল তব গন্ধ-সুষমা
নিমেষে হইল বাসি ?
ওগো প্রভাতের ঝরা-ফুল.
কেন মুদিত যুগল আঁখি ?
তুমি আর কি পাবেনা কুল ?
রবে সরমে বয়ান ঢাকি ?

দরবেশ।

আয় চাঁদ আয়।

চাঁদের কপালে চাঁদ চিক্ দিয়া যারে
মার কোলে কচি ছেলে
সোহাগেতে হেলে দুলে
চাঁদমুখে মধুস্বরে 'আয় আয়' ব'লে
হাতখানি দিয়া অই ডাকিছে চাঁদেরে।

আয় চাঁদ চিক্ দেরে চাঁদের কপালে
নভস্তলে পূর্ণশশী
বিমল কিরণ রাশি
ঢালিতেছে হাসিরাশি হাসায়ে সবারে।
যাদু ডাকে আয় চাঁদ আয় আয় ব'লে।

চাঁদের কপালে চাঁদ চিক্ দিয়া যা'রে
তুইত কলঙ্কী চাঁদ
তবু কি মোহন ছাঁদ !
শিশু যুবা প্রৌঢ় মুগ্ধ নিরখিয়া তোরে ;
জানিনাত কত সুধা আছে সুধাকরে।

আয় চাঁদ যাদু তোরে ভালবাসে কত।
তুই কিনা তারি মত,
স্বভাব (ও) তাহারি মত,
হাসিতে সুধার ঢেউ উছলে সতত ;
আয় চাদ যাদু তোরে ভালবাসে কত।

চাঁদের বাজার চাঁদ দেখিবারে আয়
শিশু, চাদ ঘরে ঘরে,
মন প্রাণ আলো ক'রে,
নিষ্কলঙ্ক স্নেহে ভরা পবিত্র হৃদয়।
দেখিবি চাঁদের হাট আয় চাঁদ আয়।

দেখে যা শিশুর মুখে প্রাণহরা হাসি
স্নিগ্ধ চাঁদের আলো
সবারি লাগেগো ভালো'
তার চেয়ে আমি যেগো বেশী ভালবাসি
সরল শিশুর মুখে শুভ্র স্নিগ্ধ হাসি।

চাঁদের কপালে চাঁদ চিক্ দিয়া যারে
কুমুদ হাসিছে জলে,
ফুল ফোটে ডালে ডালে,
চৌদিকে চকোর ফিরে সুধাপান করে।
চাঁদের কপালে চাঁদ চিক্ দিয়া যারে

আয় চাঁদ চিক্ দেরে চাঁদের কপালে
সারাটী রজনী ভ'রে
সুধাকরে সুধাক্ষরে,
অফুরন্ত সুধা করে স্নিগধ সবারে,
বাঁচায় আতপ তাপদগ্ধ ফুল দলে

তাই ডাকি সুধাকরে—আয় আয় আয়।
শিশুর সরল মুখ
জুড়ায় তাপিত বুক,
তার'পরে সুধাধারা ঢেলে দিতে আয়
জুড়াক সংসার-ক্লিষ্ট মানব হৃদয়।

শ্রীপূর্ণ প্র[illegible]ঘো